# ভারতী

## সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

## ১৩২৯ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৶০ ] ভারতী কার্য্যালয় [ বার্ষিক মূল্য ৫৲

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

১৩২৯ কার্ত্তিক—চৈত্র

## বিষয়-সূচী

## বিষয়-সূচী

# চিত্র-সূচী

## চিত্র-সূচী

# চিত্র-সূচী

## চিত্র-সূচী



## চিত্র-সূচী

# ভারতী

## সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

### ১৩২৯ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ ] ভারতী কার্য্যালয় [ বার্ষিক মূল্য ৫৲

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা






বার্ষিক মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা
প্রতি সংখ্যা ।৵৹ সাত আনা

সম্পাদক
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

# ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

১৩২৯ কার্ত্তিক—চৈত্র

## বিষয়-সূচী

# বিষয়-সূচী

## চিত্র-সূচী

## চিত্র-সূচী

# চিত্র-সূচী

## চিত্র-সূচী



## চিত্র-সূচী



পুতনাবধ

প্রাচীন চিত্র হইতে

ভারতী

৪৬শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩২৯ { সপ্তম সংখ্যা

# মৃতের কথোপকথন

## চন্দ্রগুপ্ত, অশোক

চন্দ্রগুপ্ত। কি কুক্ষণেই তুমি কলিঙ্গদেশে পা দিয়েছিলে, অশোক! কি কুক্ষণেই করুণার মোহ তোমার বীর-হৃদয় অভিভূত ক'রে ফেলেছিল! তা না হ'লে, ভারতের ভাগ্য আজ যে আর-এক রকম হ'ত না, কে জানে! সামান্য অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্যে কি না বিপুল ভবিতব্যই নিহিত থাকে!

অশোক। যথার্থ। তা না হলে, ভারত তার অন্তরের ধন খুঁজে পাবে কি রকমে? কি রকমে ভারতের প্রতিভা ভারত ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে? কি রকমে অর্দ্ধ জগৎ শিক্ষায় দীক্ষায় ভারতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে? ধন্য সে মুহূর্ত্ত যখন ভগবান তথাগত বালিকা মূর্ত্তি ধ'রে আমার সম্মুখে উপস্থিত হলেন, আমার আসুরী অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করে দিয়ে, সেখানে দিব্য জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুল্‌লেন! ধন্য আমার সে কলিঙ্গ-অভিযান!

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে তা মঙ্গলকর হ'লেও হ'য়ে থাকতে পারে, আমি জানিনে, সে প্রশ্নও তুলছি নে। কিন্তু দেশের পক্ষে তার মত ঘোরতর অমঙ্গলকর বোধ হয় আর কিছু হয় নি। চণ্ডাশোকের নাম যেদিন হলো প্রিয়দর্শী, রাজা যেদিন ভিক্ষু-ধর্ম্ম অবলম্বন করলে, যোদ্ধারা সব অসির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাপাত্র, বর্ম্মের পরিবর্ত্তে চীর ধারণ করতে আরম্ভ করলে, সেই দিনই জান্‌লেম, চন্দ্রগুপ্তের প্রয়াস বিফল হতে চলেছে। বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক ক'রে শক্তিমান মহারাষ্ট্রে পরিণত করে আমি তুলে ছিলেম, তুমি যুগযুগান্তরের জন্যে সে কাজ পেছিয়ে দিয়েছ।

অশোক। তোমার আদর্শে তোমার পথে আমিও কিছু দিন চলেছিলেম, কিন্তু ভগবান আমার সে ভুল ভেঙে দিলেন। তোমার পদাঙ্ক অনুসরণে চল্‌লে ভারতের দুর্ভাগ্য বই সৌভাগ্য হ'ত না। তাতে হয়ত ভারত একটা বিপুল আসুরী শক্তি হ'য়ে দাঁড়াত, জগতের পক্ষে তা হ'ত একটা বিভীষিকা। আর শুধু ঐহিক আসুরিক শক্তিতে কে কতদিন বড় হতে পারে? যত বড় সে হবে, তার পতনও তত অবশ্যম্ভাবী, ততই দারুণ। কিন্তু আমি ভারতকে যে শক্তির সন্ধান দিয়েছি, আমি যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছি, তা দেহ গেলেও, রাষ্ট্র গেলেও অটুট রয়েছে, অটুট থাকবে। ধর্ম্মের সাম্রাজ্য ভারতের এখনও টলে নি, এখনও তা দেশে দেশে আদর্শে শিক্ষায়-দীক্ষায় মানব জাতির অন্তরের ধনরূপে প্রতিষ্ঠিত। এ কি আমার ব্যক্তিগত লাভ শুধু?

চন্দ্রগুপ্ত। সবল দেহ সজীব প্রাণ বিনা কোন অন্তরাত্মার সম্পদ সমর্থ কার্য্যকরী হ'তে পারে না। সুঠাম রাষ্ট্র বিনা একটা জাতির প্রতিভা পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে ফুটে উঠতে পারে না। তোমার কল্পনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তুমি জগতের উপর ভারত প্রতিভার সূক্ষ্ম প্রভাবই দেখচ কেবল—কিন্তু চেয়ে দেখ

ত বাস্তবের দিকে! অন্যান্য দেশ তোমার ভাবের দ্বারা ভাব-জগতে যতই অনুপ্রাণিত হোক না কেন, বস্তু-জগৎ তারা কখনো তাই বলে ভুলে যায় নি। ভারত তোমার পথে এক-চক্ষু হয়ে চলেছে, তাই সে আজ দীন দরিদ্র দুর্ব্বল পর-পদানত শতখণ্ডে বিদীর্ণ। শরীরকেই বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখবার যার যোগ্যতা নাই, তার আবার অন্তরের ধন খোঁজ করবার সামর্থ্য বা অবসর কোথায়? তাই ত দেখ, বাহিরের জীবনে পঙ্গু হ'য়ে, ভিতরের জীবনেও সে পঙ্গু হয়ে গেছে। ধর্ম্মের জীবন্ত বিকাশ কোথায় ভারতে? ভারতবাসীর ধর্ম্ম? সে ত কেবল আচার-পালন, কায়ক্লেশে কতকগুলি ব্যবস্থা মেনে চলা। বাহিরের অসামর্থ্য তার ভিতরে জাগিয়ে তুলেছে ভয়, তাই ধর্ম্মাচরণ করে সে পাপের ভয়ে, গভীর জীবন্ত সত্য উপলব্ধির জোরে নয়। প্রাণশক্তি যেখানে ক্ষীণ, শরীরই যেখানে জীর্ণ-শীর্ণ, অন্তরাত্মাও সেখানে বিকশিত হতে পারে না।

অশোক। কিন্তু দৈহিক বল, রাষ্ট্রনৈতিক বলই যে শক্তির গোড়া তা আমি মানিনে। গোড়ায় চাই অন্তরাত্মার বল। এই বল যার আছে তার প্রাণে দেহে দেখা দেয় নতুন এক শক্তি। ধর্ম্ম-বলই যে দেহে-প্রাণে কি বল এনে দেয় তার প্রমাণ কি তুমি দেখ্‌ছ না? সমস্ত বৌদ্ধ যুগটা তোমার সম্মুখে। এই যুগে জ্ঞানে কর্ম্মে শিল্পে, বাণিজ্যে ভারত যে কত বড় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, তার চিহ্ন ত এখনও অটুট হয়ে বর্ত্তমান, সেই যুগের শিক্ষা দীক্ষা আধুনিক মানুষকে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছে, তার প্রমাণ ত দুর্লভ নয়। তবে ইদানীন্তন কালে ভারতের যে পরাধীনতা, যে বিচ্ছিন্নতা, যে দৈন্য-দারিদ্র্য তার কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। আমি বলি, ধর্ম্মকে, সত্য পথকে হারিয়েই এমন হয়েছে। আমি যে আদর্শ দিয়েছিলুম, তা থেকে যেদিন সে বিচ্যুত হয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতে পতনের আরম্ভ। বাইরের পতন ঐ ভিতরের পতনের ফল মাত্র।

চন্দ্রগুপ্ত। সে ভিতরের পতনও আরম্ভ হয়েছে তোমার নতুন ধর্ম্ম দিয়ে, তোমার অন্তরাত্মার নতুন অভিব্যঞ্জনা দিয়ে। বৌদ্ধযুগের যে কৃতিত্ব তুমি দেখাচ্ছ, তাতে তোমার ধর্ম্মের আদর ত সন্ন্যাস বৈরাগ্য নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণের চর্চ্চার ফলে সৃষ্টি, এটা কোনন্যায়? জাতীয় প্রচেষ্টা বল, শিল্পকলা বল,—সব রকম সৃষ্টিই ত তোমার ধর্ম্মের বিরোধী। তা নয়, ভারতের জীবন তখনও ছিল, আমি যে নবপ্রাণ জাতির মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছিলেম তার জের তখনও ছিল—যতদিন ছিল ততদিন ভারত সৃষ্টি করেছে। তবে তোমার ধর্ম্ম একটা নতুন ভাবতরঙ্গ এনে দিয়েছিল, কতকগুলি নতুন বিষয় চোখের সামনে তুলে ধরেছিল, ভারতের জীবন্ত প্রাণ সেগুলিকে আশ্রয় করে আত্মসাৎ করে নিজেকে প্রকাশ করেছে মাত্র। তার আরও প্রমাণ, এই প্রাণ যতদিন ভারতের ছিল ততদিন সৃষ্টি হয়েছে, তারপর তোমার ধর্ম্ম যখন ভাল করে সে প্রাণকে অভিভূত ক'রে ফেল্‌লে, তখন ভারতবাসী বাস্তবিকই বুঝ্‌লে সব ঝুটা, কিছুই নয়, বৈরাগ্য নির্ব্বাণই সার—কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ—তখনও সত্য সত্যই তাকে কৌপীন প'রে, দীনদরিদ্র অল্পপ্রাণ অক্ষম হ'য়ে পড়তে হ'ল। যার যেমন শ্রদ্ধা। লক্ষ্মীকে ভারতবর্ষ যেদিন থেকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করেছে, সে দিন থেকে লক্ষ্মীও তাকে পায়ে ঠেলেছে। পূর্ব্বের কিছু সুকৃতি ছিল, তাই ক্ষয় হয়েছে তোমার বৌদ্ধ যুগের ঐশ্বর্য্যে।

অশোক। কিন্তু এ ত একটা ব্যাখ্যা মাত্র—বাস্তবকে সহজভাবে না দেখে, বিকৃত করে দেখা। গুণের ভাগটি সমস্ত নিজের কোলে নিয়ে, দোষের ভারটি অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া। তথাগত যে অন্তরের প্রেরণা ভারতবর্ষে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সর্ব্বস্বত্যাগী শ্রমণের জীবনে! কিন্তু সেই প্রেরণাই অন্যদিকে শিল্পীর প্রতিভা খুলে দিয়েছে, কর্ম্মীর কর্ম্মকে নতুন ছাঁচে ঢেলে দিয়েছে। নির্ব্বাণ হচ্ছে চরম লক্ষ্য। কিন্তু যে সাধনায় সেই চরম সিদ্ধি, সেই সাধনাই অন্তরের শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ প্রেরণা সব ফুটিয়ে তোলে, ঐ এক লক্ষ্যে চালিয়ে দেয়, জীবনের সব ধারাকে বিকশিত করে ঐ এক অভিব্যঞ্জনায়। নির্ব্বাণ অর্থ এমন নয় যে রাজা রাজ্যপালন করা ছেড়ে-ছুড়ে দেবেন, শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম্ম বন্ধ করবেন, গৃহী তাঁর গৃহকর্ম্মে

কিন্তু সে সব কর্ম্মকে ঐ সুদূরের সুরে গেঁথে দিতে হবে। এবং সকলের শেষে কর্ম্মশেষ হয়ে গেলে, সকল প্রেরণা ক্রমে ক্ষয় হয়ে গেলে তখন চরম শান্তিতে আপনাকে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

চন্দ্রগুপ্ত। এটাও তোমার নির্ব্বাণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা মাত্র। কিন্তু এতে প্রমাণ হয়, আমার রক্ত তোমার শরীরে বর্ত্তমান, ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব হতে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পার নি। সে কথা থাক্, কিন্তু তোমার কথাই যদি সত্য হবে, তবে অর্থনীতিক রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও তোমার নির্ব্বাণধর্ম্মের সৃষ্টি ফুটে উঠলো না কেন? এখানে নির্ব্বাণের সৃষ্টি কিছু হয় নি, সকল সৃষ্টিরই নির্ব্বাণ হয়েছে। তোমার প্রভাবে দেশবাসী যখন পরিচ্ছদের মধ্যে একখানা মলিন কার্পাস বস্ত্র, গন্ধদ্রব্যের মধ্যে একটুকু চন্দন বা কর্পূরই সার করলে, তখন ভারতের পণ্যজীবী সম্প্রদায়ে কি হাহাকার পড়ে গিয়েছিল তার খপর রাখ কি? কত মণিমাণিক্য, কত বহুমূল্য কৌষেয় ক্ষৌম বস্ত্র, কত গন্ধানুলেপন, কত দ্রব্য-সম্ভারেই না ভারত ঐশ্বর্য্যান্বিত ছিল, দেশ-বিদেশের সাথে কত বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, সে সকলই একে একে লোপ পেতে চললো। সৌন্দর্য্য সাধনার অভাবে সারা দেশ হতশ্রী হয়ে পড়ল! আর রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা খসে পড়তে লাগলো, দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, সমাজের যত নিম্নস্তরের লোক—শঠ, দস্যু, লুঠেরা—তারা সুযোগ পেলে। প্রত্যন্তদেশের রাজশক্তি—পশ্চিমে যবন, দক্ষিণে চোল পাণ্ড্য, পূর্ব্বে বঙ্গ আবার যুদ্ধ ঘোষণা করতে আরম্ভ করলে; তখন আর বাহুবল নাই, আছে অহিংসা কারুণ্য মৈত্রী, তাই উৎকোচ দিয়ে তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করতে হ'ল। ভারতের বিপুল দুর্ভাগ্যের আরম্ভ এই রকমে।

অশোক। ভোগের জীবন পশুর জীবন। আমি সমাজে একটা ত্যাগের তপশ্চরণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছিলেম, তাতে যদি কারো অনর্থক অর্থলাভের উপায় বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তাতে আমি দুঃখিত নই। ঐশ্বর্য্যের উপর আকর্ষণ পারত্রিক মঙ্গলের অন্তরায়। ভারত যে আত্মসম্বুদ্ধ অন্তরাত্মা, এই সত্যটি সারা দেশের লোকের প্রাণে প্রাণে গেঁথে দেওয়া দরকার হয়েছিল, তাই শরীরের প্রসাধনের জালজঞ্জাল সব নষ্ট যে হয়েছে, তা মঙ্গলের ছাড়া অমঙ্গলের নয়। তারপর যে অরাজকতার কথা বলছ, তা আমি থাকতে হয় নি। আমার পরে আমার কাজটি চালাবার মত লোকের উদ্ভব হ'ল না, নতুবা এই নতুন ধর্ম্ম যদি আরও সম্যকরূপে প্রচারিত হ'ত, বিদেশীর প্রাণ যদি এই ছাঁচে ঢেলে গড়া হ'ত, তবে দেখতে, কি শান্তির, কি যদৃচ্ছাসন্তুষ্টির, কি অধ্যাত্মমুখী জীবন মানব সমাজে ফুটে উঠ্‌তো।

চন্দ্রগুপ্ত। হাঁ, মানব সমাজ তবে হয়ে পড়্‌ত ভিক্ষুকের সমাজ—দুর্ব্বল, দুঃস্থ, কুৎসিত। কিন্তু তা যে একেবারে হয় নি, সে তোমার চেষ্টার ত্রুটির ফলে নয়। তুমি থাকলে হয়ত আরও কিছু করলেও করতে পারতে—কিন্তু বাস্তবিক ও-রকমটি হয় না, মানুষের প্রাণের সত্যকে কতদিন তুমি চেপে দাবিয়ে রাখ্‌তে পার? মানুষের প্রাণ চায় মুক্ত প্রসার শক্তির খেলা, ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি। সামাজিক জীবনে তাই চাই লক্ষ্মীর, কার্ত্তিকেয়ের প্রতিষ্ঠা, চাই বর্দ্ধিষ্ণু অর্থপ্রতিষ্ঠান আর সমর্থ রাষ্ট্র।

অশোক। তবে সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্ম্মের মোক্ষের স্থান নাই, কেবল কাম ও অর্থই সব? সাধারণ মানুষ ত কাম ও অর্থই চায়, চায় প্রাণের বাসনার খেলা, তাই সাধারণ সমাজের গঠনও সেই রকম হয়েছে। কিন্তু মানুষ মানুষ, কারণ এই প্রাকৃত সমাজকে ভেঙ্গে বদ্‌লে একটা আদর্শের ছাঁচে ঢেলে গড়্‌তে চায়—কামে ও অর্থে পরিতৃপ্ত না হ'য়ে মানুষ তার জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চায় অন্তরাত্মার—ধর্ম্মের, মোক্ষের ব্যঞ্জনা।

চন্দ্রগুপ্ত। অন্তরাত্মা, ধর্ম্ম, মোক্ষ—এ-সব নাম মাত্র—এ সবের অর্থ কি? এ সবের মধ্যে প্রাণের খেলার স্থান নাই? চরম লক্ষ্য যদি মোক্ষই—নির্ব্বাণই হয়, তবুও ধর্ম্ম বলতে সন্ন্যাস বৈরাগ্য বা তোমার অষ্টাঙ্গ সাধনাটুকুই কেবল বুঝোয় না। ধর্ম্ম অত সহজ বস্তু নয়। ধর্ম্মের ধারা বহুল জটিল। অন্তরাত্মার প্রকাশ নানাভঙ্গিম।

চলেছে, আর সকলে মিলেই ফুটিয়ে তুলেছে একটা পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের আদর্শ। তুমিই ত স্বীকার করেছ, ধর্ম্মের সাধনা নানাজনের পক্ষে নানারকম। ব্রাহ্মণের যেমন এক ধর্ম্ম, তেমনি আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তেমনি আছে বৈশ্যের ধর্ম্ম, তেমনি আছে আবার শূদ্রের ধর্ম্ম। ত্যাগ সংযম প্রীতি এ-সব এক বিশেষ শ্রেণীর কর্ত্তব্য। এ সব হচ্ছে তাঁদের ধর্ম্ম, যাঁরা সমাজের অন্তরের সম্পদকে বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখ্‌তে চান। কিন্তু সমাজের দেহ প্রাণকেও বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখাও চাই—ধনে ঐশ্বর্য্যে শক্তিতে তাই প্রয়োজন আবার আর এক শ্রেণীর লোক। এই দুটি বিভাগ দুই রকম ধাতুর লোকের উপর ন্যস্ত, অথবা এই দুই রকম কাজ একই সাধকের বিভিন্ন অবস্থা পর্য্যায়ের কাজ। কর্ত্তব্য হিসাবে স্বভাব হিসাবে এই বর্ণ বিভাগ ও আশ্রম বিভাগ যদি না থাকে, তবে সমাজে এসে পড়ে গোলমাল, বিশৃঙ্খলা—পরিণাম তার ধ্বংস।

অশোক। কিন্তু এ কি দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত সত্যের সমন্বয় করার অসম্ভব চেষ্টা নয়? ভগবান তথাগত এই জন্যেই কি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন না? এক দিকে ত্যাগ অহিংসা আর এক দিকে ভোগ হিংসা, এই দুই ধারা একই সমাজের বুকে স্থান পেলে সে সমাজ যে খণ্ডিত হয়ে পড়্‌বে, সে সমাজই যে ধ্বংস পাবে তা'ত আশ্চর্য্য নয়। দুটি বিরোধী ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য চলে না, এদের একটিকেই বরণ ক'রে নিতে হবে। নতুবা গোঁজা-মিল দিয়ে দুই শত্রুকে একসঙ্গে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করলে তার মধ্যে দ্বন্দ্বের বীজ থেকেই যাবে। তা ছাড়া সমাজে এ রকম ভেদনীতি বৈষম্যের, অনর্থক মনান্তরের সৃষ্টি করে। শূদ্রের বেদপাঠের অধিকার নাই, আশ্রমের পর আশ্রম পার না হয়ে গেলে মোক্ষ-সাধনা কেউ করতে পারবে না—এই যে অন্যায় অসঙ্গত ব্যবস্থা, এরই জন্যে ব্রাহ্মণ্যসমাজের এমন দুর্ব্বলতা ও এমন অধঃপতন।

চন্দ্রগুপ্ত। বৈষম্য প্রকৃতির নিয়ম তুমি আমি তা সৃষ্টিও করি নি, তা উল্টোতেও পারি না। প্রত্যেক মানুষের

করেই যে স্বধর্ম্ম গড়ে ওঠে তাই হয় সত্য আর স্বাভাবিক। নিরীহ সাত্ত্বিক কিছু সকলে হতে পারে না, একেবারে সাধু ব'নে যেতে পারে না কারো থাকে জ্ঞানের বল, কারো থাকে বা শরীরের জোর। কারো প্রতিভা খোলে স্থূল বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করায়, আর কারো প্রতিভা খোলে সূক্ষ্ম বস্তু নিয়ে। মানুষে মানুষে এ বৈষম্য স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বৈষম্য থাকলে যে দ্বন্দ্বও থাকবে এমন কোন কথা নেই। ব্যক্তিগত জীবনে কখন কোন অবস্থায় সে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, সেটা তার অন্তরের সাধনার কথা। কিন্তু সমাজে সমষ্টিগত জীবনে এ রকম দ্বন্দ্বের স্থান নেই। সামাজিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই রকম নানা স্বভাবের জন্য নানক্ষেত্র সৃজন ক'রে, একটা উচ্চতর উদ্দেশ্যের লক্ষ্যের সুরে সবগুলিকে বেঁধে রাখা। তোমার আধ্যাত্মিক সাধনা সেই চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'তে পারে। কিন্তু অধিকারীর স্বভাব-অনুসারে সেই সাধনার নানা স্তর ও ভঙ্গী আছে। তাই ত বৈশ্য শক্তির, ক্ষত্রিয় শক্তির উদ্ভব ও প্রয়োজন। আর কিছুর জন্যে না হোক্, সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যেই দরকার—ঐ দুই শক্তি। দৈন্যের পীড়ন থেকে মুক্ত যে সমাজে আছে প্রাচুর্য্য, অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবর্ত্তে যেখানে চলছে সুনিয়ম ও শান্তি—বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শক্তি যেখানে গড়ে তুলেছে একটা সজীব সুনিবদ্ধ জীবন-আয়তন, সেখানেই ত সম্ভব জ্ঞানের চর্চ্চা, অধ্যাত্মের সাধনা। সমাজের যে অধ্যাত্ম চূড়া তার গোড়া বেঁধে রয়েছে একটা সমর্থ অন্ধ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শক্তি। রাষ্ট্রশক্তি আর কিছু না করুক, তা দেশের গড়ে দেয় ধর্ম্মজীবনের আধিভৌতিক বনিয়াদ।

অশোক। তা আমি মানি নে। যে রাষ্ট্র ভোগশক্তির, বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত তার সমাজের প্রতি অঙ্গে রেখে যায় সেই ভোগবাসনার সেই আসুরী শক্তির ছাপ। তার মধ্যে একটা জাতিগত ধর্ম্ম-শৃঙ্খলা গড়ে উঠ্‌তে পারে না। সমস্ত জাতিটিকে যদি আধ্যাত্মিক ছাঁচে ঢালতে হয়, তবে গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে, রাষ্ট্রকে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন ভিত দিতে হবে। উচ্চ-নীচ ব্রাহ্মণ শূদ্র, পুরুষ নারী

হবে না। সবাইকে একই আদর্শে একই পথে একই ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াতে হবে—তবেই সমাজে একটা সঙ্ঘবদ্ধ অটুট জমাট ধর্ম্মশক্তি বাঁধবে।

চন্দ্রগুপ্ত। তুমি চিরকালই একরোখা একচোখো মানুষ রয়ে গেলে, অশোক। এক সময়ে একটি ভাবের বেশী তোমার মাথায় স্থান পায় না। যখন প্রথমে তুমি ছিলে যোদ্ধা, সম্রাট—তখন তোমার মত আর কেউ বোধ হয় এমন বোঝে নি যে বলং বলং বাহুবলং। আবার যখন তুমি হঠাৎ সাধু হয়ে পড়লে, তখন ত্যাগ অহিংসা করুণা মৈত্রীকে চরম ক'রে আঁকড়ে ধরলে। কিন্তু এই দুইএর কোন ভাবই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। শক্তি ও প্রীতির সামঞ্জস্য আছে, হতে পারে। আদর্শ মানুষে, আদর্শ সমাজে উভয়েরই সমান স্ফূর্ত্তি। বাহুবল ঘৃণ্য নয়, বাহুবলের সাথে অন্তরাত্মার বলের দ্বন্দ্বই যে থাকবে এমন কোন কথা নেই। বাহুবলও অন্তরাত্মার বলেরই অভিব্যক্তি হতে পারে। ভারতের প্রাচীন সাধনায় দেহের সাথে আত্মার, ঐহিকের সাথে পারত্রিকের একটা সমন্বয় চিরদিনই করে এসেছে। তোমার তথাগত একটা নতুন তথ্য এনে সে সাধনাকে ভেঙ্গে দিয়ে একটা অযথা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তবুও বুদ্ধদেব তাঁর সাধনা নিয়ে একটা আলাদা ক্ষেত্র তৈরী করে তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন—তুমি কিন্তু এক ক্ষেত্রের ধর্ম্মকে আর এক ক্ষেত্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে মঠের সন্ন্যাসের যে সাধনা তাকে সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের সাধনায় প্রয়োগ করে ধর্ম্মশঙ্কর সাধনা বিপর্য্যয় এনেছ মাত্র।

অশোক। কিন্তু মানুষের এই সাধারণ জীবনের মধ্যেই ত সেই অসাধারণ জীবন ফুটিয়ে ধরতে হবে—কারণ সেই জীবনের সেই জগতের সত্যই সত্য। আমার কর্ত্তব্যই ছিল তাই। ভগবান তথাগত ব্যক্তির অন্তরের জীবনের যে সত্য দিয়েছেন, আমি তাকে সমাজের দেশের জীবনে মূর্ত্ত করে ধরতে চেয়েছি!

চন্দ্রগুপ্ত। সেখানেই ত তোমার ভুল। তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি রাজা। যে কাজের কথা তুমি বলছ তা ত রাজার কাজ নয়। সে কাজ ভিক্ষুর, সাধু-সন্ন্যাসীর, ধর্ম্ম-প্রচারকের। তোমার যদি সে কাজেরই উপর টান হয়েছিল, তবে রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে তা করা উচিত ছিল। বুদ্ধদেব নিজে তাই করেছিলেন। রাজ-সিংহাসনে বসে রাজ-ধর্ম্মই পালন করতে হয়। রাজা হচ্ছেন ক্ষেত্রশক্তির কেন্দ্র—তাঁর উপর ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম চাপিয়ে, তুমি দুটি বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রকে একসঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে গোলমাল পাকিয়েছ।

অশোক। রাজধর্ম্ম কি যুদ্ধ বিগ্রহ, ভোগ ব্যসন নিয়ে? দেশের সমাজের যিনি শীর্ষ স্থানে, তিনি যে পথে চলবেন, সে পথ ধরিয়ে দেবেন, সর্ব্বসাধারণে ত সেই পথেই তাঁকে অনুসরণ করবে? রাজা নিজে যদি অসুর হন, তবে প্রজাকে দেবতা হতে বলা কি সম্ভব?

চন্দ্রগুপ্ত। সৃষ্টির বৈচিত্র্যই মহাসত্য। অসুরের সত্য আছে, দেবতার সত্য আছে, এ জগতের সত্য আছে, ও-জগতের সত্য আছে—প্রত্যেক মানুষের পৃথক পৃথক সত্য আছে। সব সত্যকে একাকার ক'রে নয়, প্রত্যেকের সত্যকে ফুটিয়ে ফলিয়ে সার্থক করে ধরতে পারে যে সত্য তাই পূর্ণ সত্য।

অশোক। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে তোমার কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু সেটা হচ্ছে প্রকৃতির স্বাভাবিক লীলা—মানুষের মানুষত্ব প্রকৃতির লীলায় মানুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা।

চন্দ্রগুপ্ত। মানুষের আদর্শ প্রকৃতির ধর্ম্মকে এড়িয়ে বা জোরজবরদস্তি করে চলতে পারে না। প্রকৃতিকে পরিপূর্ণ করাই মানুষের সার্থকতা।

আশোক। প্রকৃতির জয় করাই মানুষের সাধনা, তাই প্রকৃতির যথার্থ পরিপূরণ।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

# বৈধব্য

বৈধব্য-যন্ত্রণার সৃষ্টি দ্বারা মৃত পুরুষ অপেক্ষা জীবিত নারীর মূল্য কম বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু সত্য অস্বীকার করা এতই কঠিন, যে তাহাতে পুরুষের মৃত্যু অপেক্ষাও নারীর বৈধব্যই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও মৃত্যুর কথা শুনিলে তাহার পত্নীর বৈধব্যের কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে আসে। এদিকে পুরুষের বিপত্নীকত্বের একরূপ অস্তিত্বই না থাকায় তাঁহার যে-কোন বয়সে মৃত্যু হইলে একটী নারী যে বিধবা হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধই থাকে। মানুষ এমনই যথেষ্ট যন্ত্রণা পাইয়া থাকে, তবু এমন নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ও নিপুণতার সহিত মানুষের আবার তাহার উপর খোদকারি কেন? যাঁহারা দীর্ঘ মনোরম বক্তৃতায় বড় বড় কথা বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দের তাক্ লাগাইয়া দেন, তাঁহাদের হৃদয় বলিয়া যদি কোন জিনিষ থাকে, দেখিবার উপযুক্ত চক্ষু থাকে, তবে আমাদের ঘরের নানা বয়সের নানা প্রকৃতির বিধবাদের সত্য অবস্থা ও অন্তরের সংবাদ লইতে অবহিত হউন। তাহা হইলে বক্তৃতার স্রোত জমিয়া হিম হইয়া যাইবে। তবে তাঁহাদের অন্তরের দৃষ্টি উর্দ্ধলোকে আমাদের মর্ত্ত্য মানবের (বিশেষতঃ মানবীর) দিকে তাহার নামিবার ভরসা কম।

তাঁহাদের প্রায় সকলেরই দৃষ্টিতে মৃত্যুর ছায়া লাগিয়া আছে। সত্য অস্তিত্বই লোপ পাইয়াছে। ইহা উচ্চ বৈরাগ্য বা ভগবচ্চিন্তার ফল নহে, ইহাই সাক্ষাৎ মৃত্যু। এই চরম শোচনীয়তা প্রকাশ করিতে ধিক্কার হয়, কারণ "হিতৈষী"দের "আহা-উহু" ও বিলাপে তাঁহারা জর্জ্জরিতই আছেন, তাহা সঞ্চারের চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের আর অপমান করিতে সঙ্কোচ জন্মে। কেবল সমাজের কপটতা দেখিয়া আমাদের জড়ত্বপ্রাপ্ত হিমহৃদয়ের রক্তও উত্তপ্ত হইয়া উঠে ও বাহির হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—এতগুলি অমূল্য নারীজীবন ধ্বংস আর এত যে একনিষ্ঠা, ত্যাগমাহাত্ম্য ও ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যা, ইহা নারীর নিকট হইতে আদায় করিবার

কবিতার নির্ঝর খুলিয়া যায়—তাহার সহিত শ্মশানের ভীষণতা মনে আসিয়া তাঁহাদের প্রাণ কি একবার স্তব্ধ হয় না? এই শ্মশান যতদিন আমাদের গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে, ততদিন আমরা মৃতজাতিই থাকিয়া যাইব নিশ্চয়।

এই "পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যের" কল্পনা আমাদের সমস্ত নারীকুলকে যেরূপ সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, মৃত্যু তাহার কাছে নগণ্য, এমন কি স্বামী-মৃত্যুর দারুণ শোকও তাহার কাছে ম্লান হইয়া পড়ে। ইহা যেন উদ্যত-বজ্রের মত অহর্নিশি সকলের মাথার উপর ঝুলিতেছে কখন্ কাহার উপর আসিয়া পড়িবে কিছুই স্থিরতা নাই। এদিকে কুমারী থাকিয়া ইহা হইতে অব্যাহতি লাভেরও কোন পথ নাই। এইরূপে সমস্ত নারীজাতিকে ভয়ার্ত্ত রাখিবার এমন নিপুণ আয়োজন আর কোন সভ্যজাতির মধ্যে আছে বা কখনো হইয়াছে বলিয়া জানা নাই।

বিধবার এই "পবিত্র দৃশ্য" জগতের আর কোথাও নাই বলিয়া বুক ফুলাইবার সময় ইহা মনে রাখা উচিত। বাস্তবিক, আমাদের নারীরা যে সর্ব্বদা মৃত্যুকামনা করেন, তাহার মধ্যে ইহাই প্রধানতঃ কাজ করে না কি? সহমরণে যাইবার ইচ্ছার কারণও বোঝা যায়। এইরূপে তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা একেবারেই তাহা হইয়া যাওয়া অনেকেই যে শ্রেয় জ্ঞান করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নয়!

ইহার মধ্যে আবার এমন চাতুরী আছে যে, যাঁহারা ইহার বলি, তাঁহাদের আপনাদের সম্বন্ধে একটী কথাও বলিবার উপায় নাই! তাহা হইলে এমন কুৎসিৎ কথা নাই, যাহা তাঁহাদের প্রতি না প্রযুক্ত করা যাইতে পারে! তাই তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই মনে মনে ধিক্কার দিয়া তাঁহাদের নিষ্পেষণ-যন্ত্রটীকেই অধিকতর ভারী করিয়া আপনাদিগকে তাহার নীচে চূর্ণ করিয়া "হিতৈষী"দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। চিরকালের সংস্কারের দারুণ

বাস্তবিক ভীষণ সামাজিক চাপ মাত্র যাহার ভিত্তি, আজকালকার মুক্ত আলোকে সমাজ আর কতকাল তাহা আঁকড়াইয়া রাখিতে পারিবেন? যে বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ, তাহার প্রকৃত অর্থ বহুকাল লোপ পাইয়াছে। আহার ও বিবাহে মাত্র তাহার যেটুকু চিহ্ন ছিল, তাহার প্রথমটী গোপনে অনেকদিনই গিয়াছে, এমন প্রকাশ্যেও যাইতেছে। বিবাহে নারীর সংশ্রব আছে বলিয়াই তাহা অনেকটা আছে; কিন্তু তাহার বন্ধনও অনেকেই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিলাত-যাত্রার শেষবন্ধনসূত্র আমাদের চোখের সম্মুখেই খসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণদেরও যে প্রায় সমান কঠোরতার ব্যবস্থা, তাহা ত পুরাণ-কথাতেই দাঁড়াইয়াছে। পঞ্জিকার কোন্ নিয়ম কে পালন করিয়া থাকেন? এইরূপ অগণ্য দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ থাকিতেও যাহাদের সহস্রগুণ অধিকতর যাতনার বন্ধনে বাঁধা হইয়াছে,—সুতরাং সর্ব্বাগ্রে যাহার প্রতিবিধান আবশ্যক,—তাঁহাদের বেলা শাস্ত্রের বুলি ঝাড়িলেই কি আজকালকার লোকের চোখে ধূলা দিতে পারিবেন? বিশেষতঃ মেয়েরা যদি বলেন "শাস্ত্র আমাদের মত লইয়া গঠিত হয় নাই,—পুরুষের সৃষ্টি মাত্র। দারুণ ভয়ের জন্য নিরুপায় হইয়াই আমরা তাহা প্রধানতঃ পালন করিয়া আসিয়াছি; এবং অজ্ঞানতাবশতঃ তাহার কথাই বিশ্বাস করিয়াছি। উহা পালন করিবার কোন নৈতিক বাধ্যতা আমাদের নাই। বিশেষতঃ সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত অন্য সকল ব্যবস্থার মত আমাদের ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক" তাহা হইলে তাঁহারা কি বলিবেন?

তার পর কি তাঁহারা বলিতে পারেন না—"আমাদের জীবন আমরা কি ভাবে যাপন করিব, কি খাইব বা পরিব, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তার বিষয়? স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তোমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কোথায় পাইলে? আমাদের সকলের বয়স বা শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, শক্তি, প্রবৃত্তি কিছুই সমান নহে, পতিবিয়োগে মাত্র সাদৃশ্য আছে বলিয়াই কি আমরা সকলে সমান হইয়া যাইব, যে তোমাদের ব্যবস্থাপিত ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের জীবনে সর্ব্বপ্রধান শোচনীয় ঘটনা হইলেও জীবন যে তাহাকেও ছাড়াইয়াই চলিতেছে, তোমরা কি তাহার গতি নিবারণ করিতে পারিবে? আর আমাদের সকলেরই কি তাহাতে সমান আঘাত লাগিয়াছে, বা পরে সে আঘাত সকলেরই সমান থাকিবে? কিম্বা তাহার প্রকাশের প্রণালী কি একরূপ, না, শারীরিক কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতাই কি একরকম যে তোমরা আমাদের সকলকেই এক চিহ্নে মার্কা দিতে সাহস করিতে আস? সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কেহ চিরজীবন পতিসেবার পর "স্বামীর কোলে পুত্র দোলাইয়া একগলা গঙ্গাজলে" স্বর্গলাভ করিলে, তাহার পরদিন পতিদেব যখন পুত্রবধূ বা নাতিনীর বয়স্কা বালিকার গলায় মাল্যদান করিয়া তাহাকে "ধর্ম্মপত্নীত্বে" বরণ করেন, তখনই বা তোমাদের এ হিতৈষা কোথায় থাকে? তাহার পর তাঁহার "স্বর্গারোহণে" সেই বালিকার প্রতিই বা তোমাদের যত হিতৈষা অকস্মাৎ কোথা হইতে জাগিয়া ওঠে?"

এই সকল কথা "অধর্ম্ম" ও "পবিত্র প্রেমের বিলোপকারী" ইত্যাদি সকলে বলিতে পারিবেন, কিন্তু সত্য উত্তর কেহ দিতে পারিবেন না। অনেকে বলিবেন—একজন অন্যায় করিলেই কি অপরে করিবে? কিন্তু এখানে অন্যায়টা কোথায়? শাস্ত্রের কথা আগেই বলা হইয়াছে। "পবিত্র প্রেমের" কথা বলিতেও ঘৃণা হয়,—প্রণয়কে এইরূপে "পবিত্র" রাখিতে হইলে তার চেয়ে তাহা অপবিত্র হওয়াই ভাল।

বর্ত্তমানে নারীনিগ্রহ ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কোন বিশেষত্ব দেখা যায় না। ইহা কি তবে স্ত্রীলোকের সমাজ? অনেকে বলিলেন, আমাদের সবই গিয়াছে, নারীরাই কেবল পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্য রহিয়াছেন! এইভাবে তাঁহাদের বাড়াইয়া তুলিয়া মন ভিজাইবার চেষ্টা সকল প্রকার নারীবিগ্রহের শেষ অবলম্বন। ইহার উত্তর এই, নারীরা কি ইতিহাসের পৃষ্ঠা না স্মৃতিস্তম্ভ, যে তাঁহাদিগকে কেবল অতীতযুগের সাক্ষ্য হইয়া থাকিতে হইবে? আমাদের দেশের মেয়েদের গুণকীর্ত্তন শুনিলে একটী কথা মনে পড়ে—

bee ?—Because they take the honey." ইহার মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক আছেন তাঁহাদের ব্যাঘাত হয়, তাঁহারা যে আদর্শ কল্পনা করেন, বাস্তব জগতের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিতে পারেন নাই। আর ঐ আদর্শও বর্ত্তমান আদর্শের তুলনায় পশ্চাদ্বর্ত্তী। বিশেষতঃ ইহা যদি তাঁহাদের এতই বাঞ্ছনীয় বোধ হয়,—পুরুষের পক্ষেও তবে ঠিক এইরকম ব্যবস্থা প্রচলিত করুন। যতক্ষণ তাহা না হয় ততক্ষণ মেয়েদের কিছু হুকুম করিতে তাঁহাদের কোনই অধিকার নাই।

কেহ বলিতে পারেন, এখন বালক ও পুরুষদের মধ্যেও যখন ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ আনিবার কথা হইতেছে, তখন বিধবাদের মধ্য হইতে তাহা দূর করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বাস্তবিক বালকদের একভাবের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জীবনের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য তাহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে, সুতরাং শরীর সকল রকমে কষ্টসহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। তার পর ছেলেরা পুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ার পরও অনেকদিন তাহাদের শরীর অপূর্ণ থাকে, অথচ তাহা একটী বিশেষ শারীরিক উত্তেজনার সময়। সেইজন্য সে সময়ে শরীর-মনের সংযমশিক্ষা বিশেষ আবশ্যক। নতুবা কত যে বিষময় ফল ঘটিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু ছেলেদের বলিয়াই তাহও প্রশ্রয় পাইয়া মানব জাতিকে বংশানুক্রমে হীন ও কুরোগগ্রস্ত করিয়া আসিতেছে। এতকাল ধরিয়া কত নিঃসন্দিগ্ধ নিরপরাধ পত্নী ও সন্তানেরা যে ইহার বলি হইয়া আসিতেছে, তাহার পরিমাণ মনে করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কোন পাশ্চাত্য মনস্বী ইহাকে স্বামার পত্নীকে বিবাহের প্রথম উপহার বলিয়াছেন। ভালরূপে অনুসন্ধান করিলে আমাদেরও বিশেষ কিছু গৌরব করিবার থাকিবে বোধ হয় না। সর্ব্বত্র ঔষধের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপনগুলিই তাহার সাক্ষ্য। তার পর বালকদের ব্রহ্মচর্য্যের সহিত বিধবাদের প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনা হইতে পারে কি? তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য ঠিক একভাবে স্থান, কাল, পাত্র নির্ব্বিশেষে সকলের উপর চিরকাল ধরিয়া চলিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর সংযমশিক্ষা আবশ্যক। কারণ তাঁহাদের মধ্যে আত্মপ্রশয় বাড়িয়াই চলিয়াছে। উহার দেশীয় মুর্ত্তির সহিত সকল রকমের বিলাতী সংস্করণেরই আমদানী হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মদ্যপানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং জাতীয় উন্নতিকামী সকলেরই হইতে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তার পর পুরুষ প্রবল ও রাজসিকধর্ম্ম প্রধান, কিন্তু তথাপি তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে প্রশ্রয় দিয়া দুর্ব্বল, মৃদুপ্রকৃতি নারীদেরই ব্রত, উপবাসাদিতে জর্জ্জরিত করিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া তোলা কিরূপ বিচার? আর পুরুষদের সকলের জন্য কেহ কি নির্দ্দিষ্ট একটী ব্যবস্থা বাঁধিয়া দিতেছে, না, তাঁহাদের কিছুই বিধবাদের সহিত তুলনীয় হইবার সম্ভাবনা আছে?

এইখানে বিধবাদের দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্যের কথা উঠিবে, জানি, কিন্তু তাহা সন্তান জন্ম, পালন এবং বিবাহিত জীবনের নানা দায় ও ভাবনা হইতে মুক্তির জন্য, না, কেবল অনাহারাদির ফল, তাহা কি কেহ বলিতে পারেন? "ইহা সধবা ভিন্ন পারিবার কথা নয়, কারণ একবেলা খাইয়া এত শক্তি হইতে পারে না"—বঙ্কিমচন্দ্র যেন কোথায় এই ভাবের একটা কথা বলিয়াছেন। সুতরাং ইহা তাঁহাদের ক্লিষ্টই করে দেখা যাইতেছে। যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন, দ্বাদশীর দিন তাঁহাদের শরীর কেমন অসুস্থ হয়,—একাদশীটা ত শুইয়াই কাটে। শরীর বুঝিয়া কখনও কখনও উপবাসে উপকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা না হইলে বিষম অপকার ও পরিপাক-শক্তি বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আগেকার ব্যবস্থার খাদ্য এখন অনেকেই সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাদের শরীরও দৃঢ় নহে। তার পর বিধবাদের দীর্ঘজীবনের সত্যতাও ভালরূপে পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। কারণ তাঁহাদের জীবন আমাদের এতই চক্ষুশূল যে তাহা বড়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে দীর্ঘজীবী হইলেই বৈধব্য ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাধিক্য থাকা অবশ্য আশ্চর্য্য নহে। আর এইরূপ জীবন দীর্ঘ হওয়ার

ঐ সকল ব্রত, উপবাসাদির সহিত সর্ব্বদা খাওয়ার চিন্তা কি ভাবে জড়িত আছে, তাহা কথনো কি কেহ ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন? আহারে তাঁহাদের যতই বঞ্চিত করা হইয়াছে, ততই তাহা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, প্রচলিত প্রথানুসারে চলিলে তাঁহাদের ত আপনাদের আহারের আয়োজন ও চিন্তাতেই সকল সময় কাটাইতে হয়, কাটিয়াও থাকে। একাদশী করিতে হইলেই দশমী ও দ্বাদশীতে আহারের বিশেষ আয়োজন আবশ্যক হয়, এবং প্রত্যহই আপনার রন্ধনে ও রাত্রের জলযোগের আয়োজনে তাঁহাদের কি পরিমাণ সময় লাগিয়া থাকে? তার পর একাদশীর অবসন্নতায় কয়জন কি "উচ্চচিন্তা" করিয়া থাকেন, বা কয়জনের তাহার সামর্থ্য থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। দিন যতই শেষ হইতে থাকে, ততই যে পরদিনের আহারের কল্পনা মনে আসে না, ইহা বলিলে সত্য বলা হইবে বোধ হয় না। অনেকে ইহা গোপনও করেন না, আর ইহাতে গোপন করিবার কিছু নাইও। ইহা একান্তই স্বাভাবিক ও অনতিক্রম্য শারীর ধর্ম্ম মাত্র। একাদশীকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহাদের জীবনচক্র ঘুরপাক খাইতেছে। "যুক্তাহার" যোগীদের পক্ষেও প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বিধবারাই কি সৃষ্টি-ছাড়া জীব?

কিন্তু ইহাতে যন্ত্রণা থাকিলেও একরূপ উত্তেজনাও আছে। সেইজন্যই আরও এই সকল এতদিন চলিতে পারিয়াছে মনে হয়। কিন্তু ইহা যাঁহাদের নিকট শিশু-জনোচিত ও অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা এ সকল কি করিয়া করিতে পারেন? অনেকে বলিবেন, সকলেই কি বাধ্য হইয়া করিতেছেন, ইচ্ছা করিয়াও অনেকে কি এ সকল করেন না?

ইহাতে বলিতে হয়, অবশ্যবাধ্যতা দূর না হইলে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। এমন কি তাহার পরেও এতকালের সংস্কারের প্রভাব বহুদিন থাকিতে পারে। তার পর যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া করিবেন, তাঁহাদের ত আর কেহ বাধা দিতেছে না।*

এই সকল স্বামীর "প্রীত্যর্থে" করিতে বলা হইয়াছে। দেহ এবং সংসার হইতে মুক্তাত্মাও যে এমন অসহায়ভাবে আমাদেরই অপেক্ষায় ও পাহারা দেওয়ার জন্য বসিয়া থাকিবেন, ইহা মানিতে প্রবৃত্তি হয় না। তার পর যে স্বামী স্ত্রীকে এইরূপ যন্ত্রণা পাইতে দেখিয়া "প্রীত" হন, তাঁহার প্রীত্যর্থে কিছু করা প্রয়োজন আছে বলিয়াও বোধ হয় না। আর তাহা হইলে অবশ্য স্ত্রীরও "প্রীত্যর্থে" অপরপক্ষেও ঠিক এই সকল ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য।

এখন অনেকস্থলে "দুঃখী বিধবাদের" দুঃখমোচনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাঁহাদের মানুষের অন্ত্রেও "দুঃখী করিয়া রাখিলে, তাহা দূর হওয়ার আশা নাই। সকল বিষয়েই রোগ হইলে ঔষধ দেওয়ার পরিবর্ত্তে রোগনিবারণই বর্ত্তমানযুগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই যে আর্থিক দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা হইতেছে, তাহাও দূর করিতে হইলে উত্তরাধিকার ব্যবস্থার সংস্কার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। স্বামীর সম্পত্তি, অর্জ্জিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, সকলস্থলেই তাঁহার অধিকার ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তার পর কন্যাও পুত্রের সহিত সমানাধিকারী হইলে তাঁহাদের দুর্দ্দশা দূর হওয়ার আর একটী পথ খুলিয়া যাইতে পারে। আর তাঁহাদের স্বাবলম্বী করার যে চেষ্টা হইতেছে, বৈধব্য-যন্ত্রণা দূর না হইলে তাহাও সফল হইবার সম্ভাবনা কম। কারণ উাহার নাগপাশের বন্ধনের মধ্য হইতে কোন সত্য কাজ করার সময় বা সুবিধা পাওয়া কঠিন। একাদশীর অবসন্নতা বা দ্বাদশীর অসুস্থতা কোনটাই কাজের পক্ষে অনুকূল নহে। তার পর ঐ সকল খুঁটিনাটি করিতে গেলে কি আর কাজের সময়ে কুলাইতে পারে? বাস্তবিক বিধবাদের এত বড় শক্তি অনেক পরিমাণে ইহার জন্যও ভাল করিয়া কাজে লাগিবার অনুপযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। "জ্বালার" জন্য অনেকেই তাঁহাদের কোন কাজে রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া থাকেন। অবশ্য ঐ সকল চেষ্টার প্রতি আমাদের কোন বিরুদ্ধতা নাই। সকল কথা খুলিয়া বলাই এখানে উদ্দেশ্য।

জোর করিয়াও "বিধবা" রাখা যে চলিতে পারে না,

সহস্র সহস্র কুমারী-জীবন পক্ষধারী'র সহিত বিবাহ-বিড়ম্বনার শোচনীয় ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতে পারে, এবং তাহার একরূপ অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আবার বৈধব্যের পরিহাস হইতেও উদ্ধার পায়।

এই "সপক্ষ" বিবাহগুলি দ্বারাই বৈধব্য অনেক স্থলেই প্রায় নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার জন্যই বিধবার সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বিপত্নীকদেরও অবাধে পুনর্ব্বিবাহ প্রথায় প্রশ্রয়ের ফলেই অধিকাংশ বালিকা ও যুবতী বিধবার সৃষ্টি করিয়া, তাহার পর তাহাদের বৈধব্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও নৃশংস হইলেও প্রথমটীতে কৌতুকবোধ ও তাহার পরিণামটীতে "আহা, উহুর" বেশী আর কিছু আমাদের এ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শও আমাদের স্থূলচক্ষে পড়িতে পারে নাই। কিন্তু আর এত পাপ সহ্য হইবে না, দেবতা জাগিতেছেন মনে রাখিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের দেশী সকল রকম অন্যায়, পাপের সহিত আবার পাশ্চাত্য নূতন শিক্ষা হইয়াছে দলাদলি ( party-spirit )।—ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একপক্ষ যতক্ষণ না অপরপক্ষের নিকট হইতে কিছু ছিনাইয়া লয়, ততক্ষণ কেহ কিছু করিবে না। আমাদের মেয়েদের ও পাশ্চাত্য নারীর সহিত কোন তুলনা না হইলেও এখন হইতেই অপরপক্ষকে কোমর বাঁধিতে দেখা যাইতেছে যে,—যতক্ষণ না তাঁহারা কাড়িয়া লইতে পারেন, ততক্ষণ কিছুই করা হইবে না। এদিকে তাহাতেও ঘরে বাহিরে আটকানো হইবে, এবং unsexed, unwomanly ইত্যাদি যত রকম কুৎসিত গালিও দেওয়া হইবে। ইহাতে পাশ্চাত্য জাতি ধ্বংসোন্মুখ দেখিয়াও যদি চৈতন্য না হয়, তবে দেশের সম্বন্ধে আশা করিবার বড় কিছু থাকিবে না। মানুষকে তাহার পিতামহের সন্ধান দিলে তাহার পিতামহের স্বভাবটী জাগিয়া উঠিতে পারে জানিলে ডারউইন তাঁহার মতবাদটী বোধ হয় ( struggle for existence ) প্রচার করিতেন না। তাঁহাদের দেশের মনীষীরা কিন্তু এখনই গতি ফিরাইতেছেন। আমাদের কি তবু তাঁহাদের সব পরিত্যক্ত জিনিষই না লইলে চলিবে না ?

বঙ্গনারী।

# হাত

( মোপাসাঁর ফরাসী হইতে )

কতকগুলি লোক, পুলিস-মেজিষ্ট্রেট মঃ-বের্মুতিয়েকে ঘিরিয়া ছিল। স্যাঁক্লুতে যে একটা রহস্যময় ঘটনা হইয়া গিয়াছে,—সেই সম্বন্ধে তিনি তাঁর মতামত উহাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছিলেন। একমাস হইতে, এই অদ্ভুত অপরাধের ঘটনাটা সমস্ত পারী-নগরকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। কেহই ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছিল না।

মেজিষ্ট্রেট, চিম্‌নীর গায়ে পীঠ দিয়া, দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, নানাপ্রকার প্রমাণ দেখাইতেছেন, বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিতেছেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না।

কতকগুলি রমণী আরও নিকটে যাইবার জন্য, গুরুগম্ভীর বাক্য সকল নিঃসৃত হইতেছিল সেই মেজিষ্ট্রেটের কামানো মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কৌতূহল-মিশ্রিত ভয়ে কুঁকড়ি-শুঁকড়ি হইয়া উহারা শিহরিয়া উঠিতেছিল, কাঁপিতেছিল। ভয় পাবার জন্যই যেন একটা দুর্দ্দমনীয় তৃষা, একটা অনিবার্য্য ক্ষুধা উহাদের অন্তরে জ্বলিতেছিল,—উহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

ক্ষণকালীন নিস্তব্ধতার পর, একটি রমণী, যাহার মুখ সর্ব্বাপেক্ষা পাণ্ডুবর্ণ—এইরূপ বলিল :—

—"ভয়ানক ব্যাপার! এটা যেন একটু অলৌকিক বলে' মনে হয়। ভিতরের কথা কখনই জান্‌তে পারা যাবে না।"

—"খুব সম্ভব মাদাম্, ভিতরের কথা কেউই জান্‌তে পারবে না। তবে আপনি যে অলৌকিকের কথা বল্লেন—এক্ষেত্রে অলৌকিকের কোন সংস্রব নাই। এই অপরাধটা এমন নিপুণভাবে কার্য্যে পরিণত করা হয়েছিল, এমন একটা রহস্যের মধ্যে ঢাকা ছিল যে, ওর চারিদিককার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দুর্ভেদ্য জাল থেকে ওকে টেনে বের করতে পারা যাচ্চে না। কিন্তু বহুপূর্ব্বে আমাকে একটা মোকদ্দামার বিচার করতে হয়েছিল, সেটাও এই রকম একটু অদ্ভুত ধরণের বলে মনে হয়েছিল। কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে, সে মোকদ্দামাটা ছেড়ে দিতে হয়। তারও কোন কুলকিনারা পাওয়া যায়নি।"

অনেকগুলি রমণী একসঙ্গে এত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল যে মনে হইল যেন একজনের স্বর :—

"কি আশ্চর্য্যি! বলুন-না, বলুন-না কি হয়েছিল।"

পুলিস-মেজিষ্ট্রেট্ যেরূপ হাসি হাসিতে পারেন সেইরূপ গম্ভীরভাবে মঃ বেমুর্তিয়ে একটু মৃদু হাসিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

—"অন্তত, তোমরা একথা বিশ্বাস কোরো না, যে ঐ ঘটনার মধ্যে কোন একটা অলৌকিক ব্যাপার আছে বলে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে হয়েছিল। আমি প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া আর কোন কারণে বিশ্বাস করি না। যা কিছু আমরা বুঝ্‌তে পারি না, তা "অলৌকিক" না বলে "দুর্জ্ঞেয়" বলাই ঠিক্। যাই হোক, আমি যে ঘটনার কথা তোমাদের কাছে বল্‌তে যাচ্ছি তার চারিধারে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল, তার গোড়ায় যে-সব তথ্য ছিল, সেইগুলাই বিশেষ করে' তোমাদের কাছে আমি বল্‌ব। সেই গুলিই তখন আমার মনকে খুব বিচলিত করেছিল। সেই তথ্যগুলি এই :—

আমি তখন অ্যাজাচিও নগরের পুলিস মেজিষ্ট্রেট ছিলেম। নগরটি ছোট, সাদা ধব্‌ধবে। উঁচু পাহাড়ে ঘেরা একটি সুন্দর উপসাগরের কোলে অবস্থিত।

সেখানে আমার কাছে যত মোকদ্দামা আস্‌ত তা প্রায়ই প্রতিশোধ নেবার মোকদ্দামা। তার মধ্যে কতক-গুলি ভীষণ নিষ্ঠুর, কতকগুলি বীরত্ব-সূচক। তার মধ্যে দেখ্‌তে পাই, কল্পনায় যা ভাবা যেতে পারে এই রকম প্রতিশোধের সুন্দর সুন্দর বিষয়;—সেই সব বৈষয়িক ব্যাপার-ঘটিত শত্রুতা যা মুহূর্ত্তকালের জন্য নিবৃত্তি হতে পারে কিন্তু কখনও একেবারে নির্ব্বাপিত হয় না;—সেই সব জঘন্য ফিকির-ফন্দি;—সেই সব গুপ্ত হত্যা যা পরে হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়—লোকে যা প্রায়ই খুব একটা গৌরবের কাজ বলে' মনে করে। দুই বৎসর থেকে, আমি কেবল "শোণিত মূল্যে"র কথাই শুনেছি, কর্সিকা-বাসীদের সেই ভয়ানক অন্ধ সংস্কারের কথাই শুনেছি, যে সংস্কারের দরুণ,—একজন যদি কাহাকে প্রহার করে, তা হলে, শুধু প্রহারকারীর উপর নয়—তার পুত্র-পৌত্রাদি ও নিকট-আত্মীয়ের উপরেও সেই অপমানের জন্য প্রতিশোধ নেওয়া হয়। আমি বৃদ্ধ লোকদের হত্যা দেখেছি, শিশুদের হত্যা দেখেছি, নিকট-আত্মীয়দের হত্যা দেখেছি; এই সব কাহিনী আমার মাথায় তখন গিজ্‌গিজ্ করত।

দেখ, একদিন আমি শুন্‌লেম; এক ইংরেজ, উপসাগরের পশ্চাৎভাগে একটি ছোট বাগান-বাড়ী, অনেক বৎসরের মেয়াদে ভাড়া নিয়েছে। সে একজন ফরাসী চাকরও সঙ্গে এনেছে। আস্‌বার সময়, মার্সে'ই নগরে এই চাকরকে পায়।

শীঘ্রই সেখানকার সমস্ত লোক, এই অদ্ভুত লোকটার কথা বলাবলি করতে লাগ্‌ল। লোকটি বাড়ীতে একলা থাকে, বাহিরে বেরোয় কেবল শীকার করতে ও মাছ ধর্‌তে। কারও সঙ্গে কথা কয় না, কখন শহরের ভিতর আসে না, আর প্রতিদিন প্রাতে ২ ঘণ্টা ধরে, পিস্তল ও বন্দুক ছোড়ার কস্‌রৎ করে।

তাকে ঘিরে' কতকগুলা কাহিনী জমে উঠ্‌ল। কেউ বল্লে, এ একজন বড় লোক, কোনও রাজনৈতিক কারণে, দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। কেউ বল্লে, কোন একটা ভয়ানক অপরাধের কাজ ক'রে এখানে লুকিয়ে আছে। এমন কি সেই সংক্রান্ত অতি ভয়ানক কতকগুলা ঘটনারও উল্লেখ করলে।

সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর নেব মনে করলেম, কিন্তু কিছুই জান্‌তে পারলেম না। লোকটা শুধু Sir John Rowell এই নামে আপনার পরিচয় দিত।

সুতরাং আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেই সন্তুষ্ট হলেম; তার অধিক আর কিছুই করতে পারলেম না। কিন্তু বাস্তব পক্ষে, তার সম্বন্ধে এমন কোন লক্ষণ বা চিহ্ন দেখতে পেলেম না যাতে আমার মনে কোনও সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে।

কিন্তু তবু, তার সম্বন্ধে তখনও নানা প্রকার গুজব চল্‌ছিল, গুজবগুলো ক্রমেই বেড়ে উঠছিল, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার হচ্ছিল। তাই আমি ঐ বিদেশী লোকটির সঙ্গে নিজে দেখা করবার চেষ্টা করব বলে কৃতসঙ্কল্প হলেম। এই মৎলবে, আমি তার এলাকার আশপাশে নিয়মিতভাবে শিকার করতে সুরু করে দিলেম। অনেকদিন থেকে একটা সুযোগ খুঁজছিলেম। তিতির পাখীর আকারে এই সুযোগটা এসে পড়ল। এই পাখীটাকে ঐ ইংরেজের নাকের সামনেই বন্দুকের গুলিতে মারলেম। আমার কুকুর পাখীটাকে আমার কাছে নিয়ে এল। কিন্তু আমি তখনই শিকারের পাখীটাকে উঠিয়ে নিয়ে শিকারের নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করার দরুণ ইংরাজের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলেম এবং Sir John Rowellকে বল্লেম—আপনি এই মরা পাখীটা গ্রহণ করুন।

ইংরেজটির চুল লাল, দাড়ি লাল, খুব লম্বা-চওড়া পুরুষ; প্রসন্নবদন, মার্জ্জিত-রুচি হার্কুলিস্‌ বিশেষ। যাকে বলে ব্রিটানীয় রূঢ়তা,—এই প্রকার রূঢ়তা তাঁর কিছুই ছিলনা। তিনি ইংরিজি-টানে উচ্চারিত ফরাসী ভাষায়, আমার এই ভদ্র ব্যবহারের দরুণ আমাকে ধন্যবাদ করলেন। এই একমাসের মধ্যে, আমাদের মধ্যে পাঁচ ছয়বার কথাবার্ত্তা হয়েছিল।

অবশেষে, একদিন সায়াহ্নকালে, আমি তাঁর দরজার সাম্‌নে দিয়ে যাচ্চি;—দেখতে পেলেম, তিনি ঘোড়ায় চড়বার ভঙ্গীতে একটা চৌকীতে বসে, বাগানে পাইপ ফুঁক্‌চেন। তাঁকে আমি অভিবাদন করলেম। ঘরের ভিতরে এসে এক আহ্বান করলেন। আমি তাঁকে পুনরুক্তি করবার আর অবসর দিলেম না। চূড়ান্ত ধরণের ইংরেজি ভদ্রতার সহিত তিনি আমার আদর-অভ্যর্থনা করলেন। ফ্রান্স দেশের প্রশংসা করলেন; বল্লেন, কর্সিকা দ্বীপে এই সমুদ্রের তীরটা তাঁর খুব ভাল লাগে।

তখন আমি খুব সতর্কতার সহিত, তাঁর বিষয়ে বেশ-একটু দরদ দেখিয়ে, তাঁর জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেম। তিনিও অসঙ্কোচে উত্তর দিলেন;—বল্লেন, তিনি অনেক দেশে ভ্রমণ করেছেন—আফ্রিকায়, হিন্দুস্থানে, আমেরিকায়। তারপর একটু হেসে আরও এই কথা বল্লেন:—

—"আমার জীবনে খুব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে, Oh! Yes!"

তারপর, আমি আবার শীকারের কথা পাড়লেম; তখন তিনি জল-হস্তী, বাঘ, হাতী, এমন-কি গোরিলা শীকারের খুব কৌতুহলজনক তন্ন তন্ন বিবরণ আমাকে বল্লেন।

আমি বল্লেম:—

"এই জানোয়ারগুল বড়ই ভীষণ।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন:—

"না না, তা নয়; সব চেয়ে খারাপ হচ্চে মানুষ।" এই কথা বলেই তিনি খুব হাস্‌তে লাগ্‌লেন—একজন হৃষ্টপুষ্ট সুখী ইংরেজের যে-রকম খোলা হাসি এ সেই রকম।

—"আমি অনেক মানুষ শীকার করেছি।" তারপর তিনি অস্ত্রশস্ত্রের কথা পাড়লেন এবং বল্লেন, "আমার বাড়ীতে আসুন, আমি আপনাকে বিভিন্ন প্রণালীর বন্দুক দেখাব।"

তাঁর বৈঠকখানা-ঘরটা, জরির পাড়-ওয়ালা কালো রেশমে মোড়া ছিল। সেই কালো রেশমের কাপড়টা বড় বড় হলেদ্‌ রঙের ফুলে আচ্ছন্ন—সেই ফুলগুলো যেন আগুনের মত জলছিল।

তিনি বল্লেন:—

কিন্তু একটা খুব বড় দেয়ালের খোপের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটা চৌকো লাল মখমলের উপর, একটা কালো জিনিস আলগা ভাবে রয়েছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম :— জিনিসটা হচ্চে একটা হাত,—মানুষের হাত। সাদা ও পরিস্কার নর-কঙ্কালের হাত নয়,এ-একটা কালো শুক্‌নো হাত, আঙুলের নোখ্ হল্‌দে, হাতের পেশীগুলো অনাবৃত,—চর্ম্মাচ্ছাদিত নয়; বাহুর মাঝখান থেকে, কুড়ুল-দিয়ে যেন কুপিয়ে কাটা; হাড়ের উপর পুরোনো রক্তের দাগ, ময়লা-পড়ার মত রক্তের দাগ। হাতের কব্জিতে বাঁধা একটা প্রকাণ্ড লোহার শিকল; এই নোংরা হাতের উপর শিকলটা রিভেট করা, ঝালিয়ে যোড়-দেওয়া; বেশ একটা মজবুৎ আঙটা দিয়ে দেওয়ালে ঝোলান রয়েছে,—এমন মজবুত যে একটা হাতীকেও বেঁধে রাখা যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম :—

—"ওটা কি ?"

ইংরেজ বেশ শান্তভাবে উত্তর করলেন :—

—"ও হচ্চে আমার সব চেয়ে-বড় শক্র। অ্যামেরিকা থেকে এসেছিল। ওটা তলোয়ার দিয়ে কেটে, পাথরের অস্ত্র দিয়ে চাম্‌ড়াটা বের করে নিয়ে, আটদিন ধরে রদ্দুরে শুকোতে দেওয়া হয়। Aoh !—এটা আমার পক্ষে খুব ভালই হয়েছিল।"

দেখ্‌লে মনে হয় একটা অতিকায় রাক্ষসের হাত। আমি একবার ছুঁয়ে দেখ্‌লেম। আঙ্গুলগুলো অতিরিক্ত লম্বা, বড় বড় পেশী-বন্ধনে আট্‌কানো রয়েছে। এই শুক্‌নো হাতটা দেখলে ভয় হয়;—স্বভাবতই মনে হয় যেন কোন বুনো লোক প্রতিশোধ নেবার জন্য এই কাণ্ড করেছে।

আমি বল্লাম :—

—"এই লোকটা নিশ্চয়ই খুব বলবান্ ছিল ?"

ইংরেজ মৃদুস্বরে বল্লেন :—

"Aoh yes, কিন্তু আমি ওর চেয়ে বলবান্ ছিলেম। আমি ঐ শিকল দিয়ে ওকে বেঁধে রেখেছি।"

—"এখন ত শিকলের কোন দরকার নেই—হাতটা ত আর পালাতে পারে না।"

Sir John Rowell আবার গম্ভীর ভাবে বল্লেন :—

—"সর্ব্বদাই ওর পালাবার চেষ্টা। এই শিকলটার এখনও খুব দরকার।"

আমি চট্ করে ইংরেজের মুখের ভাবটা একবার দেখে নিলেম; তারপর মনে মনে ভাবলেম :—লোকটা পাগল নাকি, কিংবা একজন বদ্ ঠাট্টাবাজ।

কিন্তু ইংরেজের মুখের ভাব আমার কাছে একেবারেই দুর্ভেদ্য; বরাবর বেশ প্রশান্ত; বেশ মমতাময়। আমি অন্য কথা পাড়লেম, আমি তাঁর বন্দুকগুলার তারিফ কর্‌তে লাগ্‌লেম।

কিন্তু তবু আমি লক্ষ্য করলেম, গুলি-ভরা তিনটে রিভল্‌ভার আস্‌বাবের উপর রয়েছে—মনে হ'ল যেন লোকটা সর্ব্বদাই কোন শক্র হ'তে আক্রমণের আশঙ্কা কর্‌চে।

অনেকবার আমি তাঁর বাড়ী গিয়েছিলাম। তারপর আর গেলেম না। তখন লোকেরা তাঁর অবস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল; তাঁর এখানে থাকা না থাকা সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন হয়ে পড়েছিল।

একবৎসর কেটে গেল। একদিন প্রাতে, নভেম্বরের শেষাশেষি আমার ভৃত্য আমাকে জাগিয়ে দিয়ে খবর দিলে, Sir John Rowellকে রাত্রে কে-একজন গুপ্তহত্যা করেছে।

আধ ঘণ্টার পর, পুলিস-কমিশনার ও পাহারাওয়ালাদের সর্দ্দারের সঙ্গে আমি ঐ ইংরেজের বাড়ীতে গেলাম। তাঁর খানসামা দরজার সম্মুখে বসে' শোকে অভিভূত ও হতাশ হয়ে খুব কাঁদছিল। আমি প্রথমে এই লোকটাকেই সন্দেহ করেছিলেম, কিন্তু আসলে সে নির্দ্দোষ।

আসল অপরাধীকে কেউ খুঁজে বের করতে পারলে না।

সর-জনের বৈঠক-খানা ঘরে ঢুকে প্রথমেই আমার নজরে পড়ল, ঘরের মাঝখানে মড়াটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

—এই সব দেখে মনে হ'ল, খুব একটা যুঝাযুঝি হয়েছিল। ইংরেজকে গলা টিপে মেরেছে! মুখটা কালো, ও ফুলো, ভীতি-বিহ্বল, মনে হ'ল, মুখে যেন একটা জঘন্য ভয়ের ভাব প্রকাশ পাচ্চে! দৃঢ়লগ্ন দুইপাটি দাঁতের মধ্যে কি-যেন একটা জিনিষ ধরে আছে; ঘাড়টা রক্তে মাখা—লোহার খোঁচা দিয়ে কে-যেন ৫টা গর্ত্ত করে দিয়েছে।

তারপর একজন ডাক্তার এসে আমাদের সঙ্গে যুটলেন। মাংসের মধ্যে যে-সব আঙ্গুলের চিহ্ন ছিল, সেগুল তিনি অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তার পর এই অদ্ভুত কথাগুলি বল্লেন :—

—"দেখ্‌লে মনে হয় যেন একটা নরকঙ্কাল একে গলা টিপে মেরেছে।"

আমার পীঠটা শিশ্‌শির করে উঠ্‌ল। যে দেয়ালের উপর আমি পূর্ব্বে সেই শুক্‌নো ভীষণ হাতটা দেখেছিলেম, সেই দেয়ালটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেম। দেখলেম, সেখানে কিছুই নেই। কেবল, ভাঙা শিকলটা ঝুল্‌চে।

তখন আমি মড়াটার দিকে নীচু হয়ে দেখ্‌লেম তার কোঁচ্‌কানো মুখের মধ্যে সেই পলাতক হাতের একটা আঙ্‌ুল রয়েছে—আঙ্‌ুলটার ঠিক দ্বিতীয় ভাঁজ পর্য্যন্ত, দাঁত দিয়ে কাটা—কিংবা আরও ঠিক্ বল্‌তে হলে—যেন করাত-কাটা বলে মনে হয়।

তার পর প্রমাণ সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হ'ল। প্রমাণ কিছুই পাওয়া গেল না। কোনো দরজা, কোনো জানলা, কোনো আস্‌বাব জোর ক'রে ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা হয় নি। দুটো পাহারা দেবার কুকুর ছিল, তারাও জাগে নি।

অল্প কথায় ভৃত্যের এজাহার এইরূপ ;—

"এক মাস থেকে প্রভুর মন যেন বড়ই চঞ্চল হয়েছিল। তিনি অনেক চিঠি পেয়েছিলেন—খানিক খানিক আগুনে পোড়া।

অনেক সময়, পাগলের মত রেগে, একটা ছড়ি দিয়ে সেই দেয়ালে-আট্‌কানো শুক্‌নো হাতটা পেটাতেন। কিন্তু ঠিক এই হত্যার সময় কি জানি কেমন-করে হাতটাকে

তিনি খুব দেরী করে শুতে যেতেন, এবং শোবার আগে ঘরের দরজা-জান্‌লা বেশ সাবধানে বন্ধ করতেন। তাঁর হাতের কাছে সর্ব্বদাই অস্ত্রশস্ত্র থাকৃত। অনেক সময় রাত্রে তিনি খুব চেঁচিয়ে কথা কইতেন—যেন কারও সঙ্গে ঝগড়া করচেন।

দৈবক্রমে ঐ রাত্রে, তিনি কোন শব্দ করেন নি। চাকর জানলা খুল্‌তে গিয়ে দেখ্‌তে পেলে মনিবকে কে খুন করেছে। কারও উপরে তার সন্দেহ হয় নি।

এই মৃত্যু সম্বন্ধে যা কিছু আমি জানতে পেরেছিলেম, সমস্তই মেজিষ্ট্রেট ও পুলিসের লোকদের জানালেম। তাঁরা এই দ্বীপের সব জায়গায় তন্নতন্ন করে তল্লাস করলেন। খুঁজে কিছুই বের কর্‌তে পারলেন না।

এই হত্যাকাণ্ডের তিনমাস পরে, একদিন রাত্রে, আমার ভয়ানক বুক-চাপা দুঃস্বপ্ন হ'ল। আমি, সেই হাতটা, সেই ভয়ানক হাতটা দেখতে পেলেম। আমার মনে হল যেন ঐ ভয়ানক হাতটা, বিছের মত, মাকড়সার মত আমার মশারির গায়ে, দেয়ালের গায়ে দৌড়াদৌড়ি করে' বেড়াচ্চে। তিনবার আমি জেগে উঠলেম, তিনবারই আবার ঘুমিয়ে পড়লেম, তিনবারই দেখলেম্ পাবার মত হাতের আঙ্‌ুল-গুলো নাড়িয়ে ঐ ভীষণ দেহাবশেষটা আমার ঘরের চারদিকে দৌড়ে বেড়াচ্চে।

তার পর দিন, যেখানে Sir John Rowellকে গোর দেওয়া হয়েছিল, সেই গোরস্থানে, সমাধি-শিলার উপর আমাকে দেখতে পেয়ে পুলিসের লোকেরা আমাকে নিয়ে আসে!

তাঁর বংশের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। কোন চিহ্ন ছিল না।

মাদাম, তোমরা আমার বৃত্তান্তটা ত শুন্‌লে। এর চেয়ে বেশী আর আমি কিছু জানি নে।

রমণীরা, হতবুদ্ধি হয়ে, থরথর করে কাঁপছিল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ওর মধ্যে একজন বলে উঠ্‌ল।

—"কিন্তু শেষ পরিণামটা ত কিছুই জানা গেল না—

যতক্ষণ না আপনি বল্‌বেন, আপনার মতে ব্যাপারটা কি হয়েছিল।"

—"আমার মতামতের কথা যদি আপনারা তোলেন, তাহ্‌লে, আপনাদের এই স্বপ্ন-কল্পনা আমি সব মাটি ক'রে দেব, আমার আশঙ্কা হয়। আমার শুধু এই মনে হয়, ঐ হাতের যে প্রকৃত মালিক সে মরেনি। তার বাকি যে হাতটা ছিল সেই হাতটা নিয়ে, অপর হাতটাকে সে খুঁজতে এসেছিল। কিন্তু আমি জান্‌তে পারিনি কেমন ক'রে সে এ সব কাণ্ড করলে। এ এক প্রকার প্রতিশোধ নেওয়া—স্পেন-দেশে যাকে "ভেন্‌ডেটা" বলে।

একজন রমণী বিড়বিড় করিয়া বলিল :—

—"না, তা কখনই হ'তে পারে না।"

—"আমি ত আপনাদের পূর্ব্বেই বলেছিলেম, আমার ব্যাখ্যা আপনাদের ভাল লাগ্‌বে না।"

শ্রীজ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# আলোচনা

## স্ত্রী-লেখিকা

আজকাল মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় অনেক লেখিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে। আমাদের দেশে মেয়েদেরও পরস্পরের মধ্যে দেখাশোনা, মেলামেশার সুযোগ অল্পই, সুতরাং এরূপ পরিচয়ে তাহার অভাবও কতকটা পূরণ হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, তাহার মধ্যে আলোচনার যোগ্য গল্প, প্রবন্ধাদির দর্শন সুলভ নহে। বিশেষতঃ গল্পের ভার যেরূপ বাড়িয়াই চলিয়াছে,—সারের সহিত তাহা সেই পরিমাণে যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। সমস্ত গল্প ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া আগাগোড়া পাঠ করিয়া উঠা, আজকালকার নানা কর্ম্ম-চিন্তায় ব্যস্ত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকের পক্ষে সম্ভব নহে ;—পারিলেও তাহা সময় ও পরিশ্রমের সদ্ব্যয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে কিনা সন্দেহ থাকিয়া যায়। তবু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে তাহার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের দেশে লিখিতে সমর্থ,—সুতরাং "শিক্ষিতা"দের মধ্যেও Mrs. Grundyর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া দমিয়া যাইতে হয়। ইহা অবশ্য আশ্চর্য্যের কথা নহে,—সকল দেশেই ইঁহাদের দর্শন পাওয়া যায় ;—এবং সর্ব্বত্রই ইঁহারা করতালি পাইয়া থাকেন। তবে মেয়েদের উঠিতে হইলে ঘরে বাহিরে কি পরিমাণ বাধা অতিক্রম করিতে হইবে, ইঁহারা কেবল তাহাই মনে করাইয়া দেন। মেয়েদের বিষয় যে রকম অসঙ্কোচে হীনভাবে ইঁহারা বলিতে পারেন, পুরুষের পক্ষে অবশ্য তাহা সম্ভব নয়। আর সর্ব্বত্রই ইঁহাদের বদ্ধ ও স্থূল দৃষ্টি এবং মনের পরিধির সঙ্কীর্ণতা পীড়া দেয়। "দাস-মনোভাব" যে ইঁহাদের কতটা মজ্জাগত তাহা বলাই বাহুল্য। সবটুকু বিদ্যা নিঃশেষে দেখাইবার প্রলোভনও অনেকে সম্বরণ করিতে পারেন না। বাস্তবিক, বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী নারী-জাগরণের দিনে তাহার কোন তরঙ্গই ইঁহাদের স্পর্শও করে নাই, বাঙ্গালী ঘরের বদ্ধ একান্ত দূষিত, হীন, খুঁটিনাটি ছাড়াইয়া কল্পনাও একতিল উপরে উঠিতে পারে নাই। অথচ ইঁহারাই মেয়েদের উপদেষ্টা সাজিয়া আসরে নামিয়াছেন। সন্দেহ হয়, ইঁহাদের অধিকাংশই হয়ত হালে শাশুড়ী হইয়াও থাকিবেন।

মেয়েদের বিষয় প্রবন্ধ যাঁহারা লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ওরূপ নহেন। রচনার প্রণালী যেরূপই হউক, রচনায় তাঁহাদের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েদের উন্নতি ও মঙ্গলেচ্ছা তাঁহাদের আছে। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অপূর্ব্ব কিছু করিবার চেষ্টা দেখা যায়। ইঁহারা তাহাতেই একটী মৌলিক পথ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইঁহারা ধারণা করিতে পারেন না,—ইহাও তাঁহাদের "নারীত্ব" হইতে প্রাপ্ত অদ্ভুত কোন পদার্থ নয়,—অপর পক্ষেরই শিখানো বুলি। তাঁহারাই ত মেয়েদের "পুরুষের মত" করিয়া কিছু করিতে জোরের সহিত বারণ করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিক ইঁহাদেরও মেয়েদের সকল শিক্ষা-দীক্ষা গোড়া হইতে মেয়েলি করিয়া ফেলিবার আগ্রহ দেখিয়া দুঃখও হয়। ইঁহারা অপরপক্ষের চারটী বেশ গিলিয়াছেন বোঝা যায়। মেয়েরা ইঁহাদের মতে চলিয়া "বুদ্ধিমতী" না হইয়া "প্রাণময়ী" বনিতে থাকিলে তাঁহাদের আর সুনিদ্রায় ব্যাঘাত হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না, "প্রাণ"শূন্য "বুদ্ধি" অথবা বুদ্ধিশূন্য "প্রাণ" নরনারী কাহাকেও মানুষ করিয়া তুলিতে পারে না। এবং ইহার বিয়োগেই তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা। আমাদের মেয়েদের "প্রাণে"র অভাব নাই, বুদ্ধিরই অভাব। "প্রাণে"র প্রেরণায় নির্বুদ্ধির কাজ

করিয়া আসাতেই প্রধানতঃ তাঁহাদের আজ এ দশা। তাহার পর তাঁহারা যে "non-cooperation" আদেশ করিতেছেন, "non-voilent" হইলেও তাহার উপর আমাদের ভরসা কম। কর্ত্তারা প্রায় ২০০ বৎসর শিক্ষা-নবিসী করিয়াও যখন তাঁহাদের প্রভুদের সহিত "non-co"তে সিদ্ধকাম হইতে পারিতেছেন না,—তখন মেয়েরা জাগিতে না জাগিতেই যে তাঁহাদের শত্রুনীতি কিছু শিক্ষা না করিয়াই কেল্লা ফতে করিয়া ফেলিবেন, এমন দুরাশা মনে স্থান দেওয়াই কঠিন! তাহা অপেক্ষা নরমে গরমে আমাদেরই যে ধন ও রাজ্য তাঁহারা বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছেন, সম্মিলিত ও অপ্রমত্তভাবে তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্য যুঝিবার চেষ্টা করা উচিত হইবে। জগৎ-অধিকারের বিদ্যা কর্ত্তাদেরও যেমন প্রভুপক্ষেরই নিকট শিখিতে হইয়াছে ও হইতেছে, মেয়েদেরও তেমনি তাহা শিখিতে হইবে;—কারণ তাহা তাঁহাদেরই ভাল জানা আছে। "হৃদয়-জয়" বিদ্যা আর তাঁহাদের শিখাইবার প্রয়োজন নাই। তবে তাঁহাদের যে জাগ্রত ও অপ্রমত্ত থাকিতে হইবে, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। "অনুকরণ" তাঁহারা করিবেন না, তবে পরিপাক করিতে হইবে।

মেয়েদের শিক্ষাও যাঁহারা প্রথম হইতেই "স্ত্রীশিক্ষা" করিয়া তুলিতে চান, সর্ব্বাপেক্ষা ভয় তাঁহাদের জন্যই। কারণ তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলে আর কোন ভাবনাই থাকিবে না;—মেয়েরা এমনি গাধাবোট হইয়াই বরাবর বেশ আরামে (?) থাকিয়া যাইবেন;—অবসর-কাল যা'য়ে যা'য়ে আড়াআড়ি চুলাচুলি করিয়া কাটাইবেন। কর্ত্তারাও বরাবরই তাই চাহিতেছেন, চক্ষুলজ্জায় সবটা পারিয়া উঠিতেছিলেন না। এখন মেয়েরাও তাঁহাদের সুরে সুরে মিলাইলে রক্ষা পাইবেন। কেরাণীগিরি করাইতে ইংরেজী ধরাইয়া বাবুরা Mill, Spencer, Tolstoi, Russel, Wells ইত্যাদি পড়িয়া ফেলায় সাহেবেরা পস্তাইতেছেন। মেয়েদের প্রথম হইতেই সে সম্ভাবনা বন্ধ হইলে তাঁহারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল" বলিয়া সময় সময় ইহাতেও প্রবোধ আসিতে পারে বটে;—কিন্তু "মামা হইলে" তাঁহাকে "কাণা"ই হইতে হইবে? তিনি চক্ষুষ্মান হইলে ত কোন ক্ষতির কারণ দেখা যায় না!

বঙ্গনারী।

---

## একখানা চিঠি

তুমি লিখেছ, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" কথাটা আমি খুবই মানি—তোমাদের চেয়েও বেশী মানি। যে-ধর্ম্মকে আমি প্রাণপণ বলে অবলম্বন করে থাকতে চাই—তা প্রকৃতই আমার "স্ব"ধর্ম্ম,—আমার কল্যাণবুদ্ধি যাকে ধর্ম্ম বলে নির্দ্দেশ করেচে; আমার কল্যাণবুদ্ধি যাকে ধর্ম্ম বলে গ্রহণ ক'রতে কুণ্ঠিত হয়েছে, তা' আমার বাপ-পিতামহের আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের ধর্ম্ম হ'লেও তা আমার কাছে "পর"-ধর্ম্ম। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা ভক্তি আছে বলেই যদি আমি অন্ধভাবে তাঁ'দের ধর্ম্মমতের অনুসরণ করি, তবে সত্যিই তা নিতান্ত ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ বুদ্ধির দাসত্ব অপেক্ষা অকল্যাণকর কিছু মানুষের পক্ষে কল্পনাই করা যায় না।

এটা তুমি ভুল বুঝেছ যে আমি সনাতন-ধর্ম্ম ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েচি। ধর্ম্মের সনাতন কথাটা যা সে হচ্চে 'সত্য, শিব, সুন্দরের' উপাসনা, তা ত্যাগ না করে বরং আরম্ভ করতে উদ্যত হয়েছি বললেই ঠিক কথাটা বলা হয়। আর দ্বিতীয় ভৌগোলিক বিশেষণটার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ধর্ম্ম শব্দের আগে এটা বা এ-জাতীয় কোনটিই বসলে ধর্ম্মের পক্ষে বড় ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। এরা এমনি এক একটা সুনির্দ্দিষ্ট, অনমনীয় অনুষ্ঠান-পদ্ধতিকে এনে ধর্ম্মের মূল স্বরূপটার সঙ্গে জুড়ে এবং খুব সম্ভবতঃ তাকে ঢেকে দেয় যে, ক্রমে, হয় 'ধর্ম্ম' বেচারীকে পালাতে হয়, নয়ত 'নিজ বাস-ভূমে পরবাসী' হয়ে থাকতে হয়।

অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধের প্রয়োজনীয়তা নাই কি? খুবই আছে। কিন্তু তার পূর্ব্বে যদি সনাতন কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়, এবং তাকে দেওয়া হয় ধর্ম্মের ঘাড়ে চড়িয়ে, তবে যার প্রয়োজন ছিল ঘরের ভৃত্যের মত, তাকে করে দেওয়া হয় ঘরের প্রভু, আর বেচারী বুদ্ধিকে আত্মবিস্মৃত হয়ে কর্ত্তার পদ ছেড়ে, একেবারে উঠান ঝাঁট দেওয়ার কাজে লাগতে হয়। তার ফল কখনও শুভ হয় না।

মানব-ইতিহাসের যুগে যুগে নানাবিধ সমস্যা নানাদেশের মানবের সম্মুখে উপস্থিত হয়েচে। আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে, যাতে যতজনের সম্ভব যতদূর সম্ভব কল্যাণ হ'তে পারে, তেমনি বিধি-নিষেধ আচার-অনুষ্ঠান গড়ে সেই সব সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। কিন্তু 'চলেচে মানব যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে', তার জীবন নানা অভিনব মূর্ত্তিতে যুগে যুগে আপনাকে বিকাশ করেচে, তার পরিবর্ত্তনের আর অন্ত নাই। মানবজীবনকে Statical ধরে সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল, dynamical মানবজীবনের সঙ্গে সে কতক্ষণ তাল রাখতে পারে? প্রশ্নটিই বদলে গেচে, অথচ তোমরা সেই একই উত্তর দিয়ে কাজ সারতে চাও! তাতে যে কি হয়, স্কুলের অপদার্থতম ছেলেটিও তা' জানে।

"বঞ্চনা বাড়িয়া উঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি।"

কল্যাণবুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে, ধর্ম্মের সিংহাসনে আচার-অনুষ্ঠানকে বসিয়ে দেওয়ার ফল হয়েচে এই যে, ধর্ম্মের প্রাপ্য একনিষ্ঠ, অচলা ভক্তি মানব-মনে এই বিনা অধিকারে দখল করে নিয়েচে; আজ সমস্যা

বদলেচে বলে সমাধান বদলাবার কথা যদি তোলো, অমনি সমস্ত মানব-মন সংস্কারে আঘাত পাবে, বিদ্রোহী, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশের দিকেই চেয়ে দেখ না। বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান যতটা আমরা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করে নিয়েচি, তেমন জগতের কোন জাতি নয়। তাই, আজ এদের প্রতি আমাদের সংস্কারগত শ্রদ্ধা এত বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এদের অধিকাংশই অকালোচিত ও মানবাত্মার অকল্যাণকর হ'লেও আমরা এদের ত্যাগ করতে পারচি না। আমাদের দেশ-নায়ক যখন আমাকে জনগণকে দুঃখের ক্ষেত্রে, আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে ডাক দিয়েছিলেন, তখন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে দেশ ইতস্ততঃ করে নি; কিন্তু যখন ধর্ম্মের অঙ্গীকৃত 'অস্পৃশ্যতাটা' পরিহার করবার আহ্বান তাঁর কণ্ঠ থেকে এল, তখন দেশের আর সাড়া পাওয়া গেল না। কারণ এই আচারটার গায়ে 'ধর্ম্ম' বলে ছাপ মারা আছে, তাই এর প্রতি বিদ্রোহের কল্পনাতেই আমরা শিউরে উঠি; এ জাল যতদিন পর্য্যন্ত ধরা না পড়বে, অর্থাৎ যতদিন না আমরা জাগ্রত কল্যাণবুদ্ধির দ্বারা একে পরীক্ষা করে দেখতে পারব, ততদিন এর আসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম্মের সঙ্গে আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-পদ্ধতির কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই; এবং ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িয়ে রেখে এদের প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তন-ক্ষমত্বের পথ রুদ্ধ রাখা উচিত নয়, কারণ তাতে করে দুর্দ্দিনেই গলার মালা গলায় নাগপাশ হয়ে ওঠে।

সুতরাং আমার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ এই দাঁড়ায় যে, আমি একটা বিশেষ আচার-পদ্ধতির অধীনতা অস্বীকার করতে উদ্যত হয়েছি। এর উত্তরে আমি কেবল এইমাত্র বলব যে, আমার মানবত্বকে আমি সার্থক ক'রে তুলতে চাই, আমার কল্যাণবুদ্ধিকে আমি দশের নির্দ্দেশের কাছে অন্ধভাবে বলি দিতে পারি না। আমি আজ তোমাদের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে মঙ্গলকর কিছু দেখছি না—বরং আত্মার অকল্যাণকর যথেষ্ট আমার চোখে পড়চে। হয়ত আমি ভ্রান্ত, কিন্তু বিশ্বাস যদি কাকেও করতে হয়, তবে আপনার জাগ্রত বিবেককেই করব, অন্য কাকেও নয়, তা সে ঋষির উক্তিই হোক বা অপৌরুষেয় বাণীই হোক।

কারণ, ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে সত্যের উপাসনা। এবং সত্য তাই, যা'কে আমি সত্য বলে অনুভব করি। আমি যাকে সত্য বলে উপলব্ধি করতে না পারব তা যাই হোক না কেন, তা আমার কাছে পরম মিথ্যা।

এখন তোমার সমগ্র অভিযোগটির উত্তর আমি দিচ্ছি। আমি '—' ধর্ম্ম ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েচি, এই তোমার অভিযোগ। আমি দেখিয়েচি যে আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে না, এবং এগুলিকে বিযুক্ত ক'রে দিলে পৃথিবীর সব ধর্ম্ম এক হয়ে দাঁড়ায়, তার আর কোন ভৌগোলিক বিশেষণ থাকে না; এবং থাকতেও পারে না। কারণ ধর্ম্মের একমাত্র পথ আছে—

'তমেব বিদিত্বা আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ পুরুষং মহান্তম্'—

অনুভব করে যে বিশ্বের সর্ব্বত্র আমার নাড়ীর যোগ আছে, আমরা সকলে—

'অমৃতস্য পুত্রাঃ'

আমি সেই যোগ উপলব্ধি করতে চাই; নিজেকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বা অন্য কোন আখ্যা দিয়ে ক্ষণতরেও সেই যোগসূত্রটাকে বিস্মৃত হতে চাই না। আমি যখন বলব—

"পিতা নোঽসি"

সে যেন সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত চিত্তে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলতে পারি।

সুতরাং দেখতে পাচ্চ যে আমি কোন 'ধর্ম্ম' ত্যাগ করতে যাচ্চি না। আমি যা ত্যাগ করচি সে একটা বিশেষ আচার-পদ্ধতি, যার প্রয়োজনীয়তা বা কল্যাণকরতা অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে, যা আজ কেবল আমাদের বুদ্ধির জাড্য ও আত্মার অকল্যাণ ঘটাচ্ছে। এবং যা আমি আজ অবলম্বন করচি, সে হচ্ছে 'সত্য, সুন্দর, শিবের' সাধনা—এবং সেই হচ্চে চিরন্তন ধর্ম্ম।

**ক্ষীরোদবিহারী।**

---

## সমাজ-সংস্কার

( পণ-প্রথা )

রবীন্দ্রনাথের রচনার কোথাও এই ভাবের একটা কথা পড়িয়াছিলাম, "বিধাতা যুগ যুগ ধরে অনন্তে বসে একটা অঙ্ক কষ্‌ছেন; মানবের শুভ তাহার উত্তর। কিন্তু যতবারই তিনি কষছেন; ততবারই উত্তর ভুল হচ্ছে; আর তিনি রক্ত দিয়ে সমস্তটা মুছে ফেলছেন।" কবি অতি অল্প কথায় জগতের চিরন্তন ইতিহাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মানব জাতির ইতিহাস এই রক্তের ইতিহাস। ধর্ম্মের ইতিহাসে এই রক্তের লেখা পরিস্ফুট। সমাজের ইতিহাস ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, এমন কি যে সামাজিক বিধি আজ প্রয়োজনীয় জ্ঞানে সমস্ত শক্তি দিয়া রচনা করিতে হয়, কাল হয়ত তাহাকেই উৎপাটিত করিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ এক হইতে বহুত্বে পরিণতির নাম জীবন। সেই নিত্য বহুধা-বিভক্ত জীবনকে একটা নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না, সে নিয়ম যতই উদার হউক না কেন! তাহাকে বাঁধিতে হইলে নিত্য নূতন বন্ধনের সৃষ্টি করিতে হয়। এই চিরন্তন সত্যটিকে পৃথিবীর আর কোন দেশে বুঝাইয়া দিতে হয় না, শুধু হতভাগ্য ভারত যে ইহার অনুসরণ করিতেই পশ্চাৎপদ তাহা নয়, ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টাকেও সে দোষারহ বলিয়া মনে করে।

চারা অশ্বত্থ গাছকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার চারিদিকের বেড়া যে গাছের অপেক্ষা বড় নয়, এ কথা আর সকলেই বুঝে এবং বুঝে বলিয়াই গাছের বৃদ্ধির জন্য সে বেড়া সরাইতে কেহ আপত্তি করে না ; কেবল ভারতই সে কথা বুঝার যে প্রয়োজন আছে, তাহা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত। এই জন্যই আমাদের সমাজ অপরিবর্ত্তনশীল, বদ্ধ ও পঙ্কিল। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে ইহাকে লজ্জার বিষয় মনে করি না ; বরং ইহা লইয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি। ফলে যে মানব-মনের বৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য সমাজ আজ সেই চির সত্য মানব মনকে অবজ্ঞা করিয়া সমাজ ও সামাজিক বিধিকেই বড় করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতে সমাজ রক্ষা হইতেছে বটে, কিন্তু সেই সমাজ-প্রাচীরের কঠিন চাপে আজ আমাদের মন গুমরিয়া উঠিয়াছে।

মনের প্রতি এত বড় অত্যাচার বিধাতা আর কোন দেশে এতদিন সহ্য করেন নাই। দৃঢ় হস্তে তিনি সকল বাধা ভাঙিয়া মনকে সকল দেশেই মুক্ত করেন। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই বাঁধনের পর বাঁধন দিয়া মনকে যে দুর্ব্বল করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, আমাদের দুর্ভাগ্য যে আজও তাঁহার রুদ্র বজ্র সেখানে গর্জ্জিয়া নামে নাই, বজ্রাগ্নির লেলিহান্ শিখায় আজও সমাজ পুড়িয়া ছাই হয় নাই। কিন্তু বিদ্রোহী মানবচিত্তের নিম্নে শত শত বৎসর ধরিয়া বিদ্রোহের যে কালো ধুম পুঞ্জীভূত হইতেছে, তাহা যে একদিন উৎসারিত হইয়া ভীষণ ভূমিকম্পে মৃত্যুর দোলার প্রবল দোলানিতে সমস্ত সমাজটাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বিধাতার নিয়মকে রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ইহা আপন পথে সরল গতিতে কাজ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং পশ্চিমে সেই কালো মেঘ দেখা দিয়াছে কিনা, কোন্ অত্যাচারের মধ্যে বিধাতার অভিশম্পাৎ কি ভাবে লুক্কায়িত আছে এবং তাঁহার প্রলয়-বিষাণ বাজিয়া উঠিবার সময় হইয়াছে কিনা, তাহাই বুঝিবার চেষ্টার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা।

আজ এত বড় সত্য কখনই খোলাখুলি ভাবে বলিতে সাহস করিতাম না, যদি না ঝোড়ো হাওয়া দেখা দিত। কিছুদিন পূর্ব্বে পেটেল বিল লইয়া খুব আন্দোলন হইয়াছিল। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা মনে করিয়াছিলেন, কোন রকমে আইনের এই সর্ব্বনাশী পাণ্ডুলিপিটাকে রোধ করিতে পারিলেই আমাদের বৃদ্ধ সমাজ অমর হইবে। এই জন্য লাট-দরবারে তাঁহারা অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে তাহাতেও রোগের শান্তি হইল না, ভয়ের কারণও একেবারে দূর হয় নাই।

বিবাহে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সেই বিদ্রোহেরই সূচনা করিতেছে। এই পণ-প্রথার জন্য ক্রমশ অলক্ষ্যে নানা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সমাজে দেখা দিয়াছে, সে কথা কাহারও অবিদিত নহে। যাঁহারা ধর্ম্মনাশের ভয়ে গৌরী-দান করিতেন এবং অনূঢ়া কন্যা রজস্বলা হইলে সপ্তপুরুষ নরকস্থ হইল ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেন, তাঁহারা যে শুধু কন্যাকে বয়স্থা করিয়া বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা নহে ; উপযুক্ত পাত্র না পাইলে কন্যাকে চিরকুমারী রাখিবার সঙ্কল্পও কেহ কেহ করিতেছেন। অবশ্য স্বীকার করি, এরূপ লোকের সংখ্যা আজও বিরল। কিন্তু নানা কারণে যে কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমশ বাড়িয়াই যাইতেছে, ইহা ত আর অস্বীকার করা যায় না। স্থবির সমাজ আজ আর চোখ রাঙাইয়া তাহা ঠেকাইতে পারিবে না। ইহার উপর পণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন যত বাড়িবে, ততই বুঝিতে হইবে, একটা বৈরীভাব দিন দিন সুস্পষ্ট হইতেছে এবং একটা এমন দিন আসিতেছে যেদিন আকাশ জুড়িয়া প্রবল ঝড় উঠিবে, তাহাতে পথের ধূলি তো উড়িয়া যাইবেই, অধিকন্তু সে ঝড় মানব-মনের সত্য ভাবগুলিকেও কঠিনভাবে নাড়া না দিয়া যাইবে না। কেন, সে কথা খুলিয়া বলিতেছি।

যে যাহাকে ভালবাসে, স্নেহ করে, সে তাহাকে কিছু দিতে পারিলেই সুখী হয়। ইহা মানব-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, চির-সত্য। এইজন্য পিতা-মাতা দুহিতাকে যখন অপরের হস্তে সমর্পণ করেন, তখন শুধু স্নেহের পুতলি কন্যাকে দিয়াই তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না, যাহা-কিছু শ্রেয়, তাহার কিয়দংশ তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা মনে সুখ অনুভব করেন। এইজন্য বেদের সময় হইতেই পিতা-মাতা সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করিতেন। আজ হৃদয়ের সেই চির-সত্য ভাবটিকে উৎপাটিত করিবার জন্য চারিদিকে আন্দোলন, কায়স্থ সমাজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিপুল চেষ্টা, যুবকদিগের প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর প্রভৃতি ব্যাপার হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের হৃদয় এত-বড় একটা অত্যাচারের আঘাত পাইয়াছে, যাহাতে সে বড়ই শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায়, যখন মানব-হৃদয় কোন-কিছুর বিরুদ্ধে শক্ত হইয়া ওঠে, তখনই আকাশ জুড়িয়া ঝড় দেখা দেয় এবং বিধাতার রুদ্রবজ্র গর্জ্জিয়া ওঠে।

ইহা অলঙ্কারের কথা নয়। এই যে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ইহার পরিণতি কোথায়? পণ-প্রথা উঠাইয়া দাও বলিলেই ত পণ-প্রথা উঠিয়া যায় না। স্বার্থ সকল ধর্ম্মের বিধান অপেক্ষা বড়। এইজন্য ধর্ম্মের বিধান কোন দেশেই আটপৌরে সামগ্রী হইতে পারে নাই ; নতুবা সকলেই শুকদেব গোস্বামী হইয়া যাইতেন। তাহা অনেকটা সৌখীন ব্যাপার। দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাহাকে প্রতিদিন-কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের উপযোগী করিয়া তোলা যায় না, তাহা পূজার দালানে, গির্জ্জার উপাসনায়, গুরুর উপদেশে শোভা পায়। যেখানে সুখ-দুঃখের সংঘাত-প্রতিঘাত, সুবিধা-অসুবিধার কথা, স্বার্থের উত্তেজনা, সেখানে মানব-মন ধর্ম্মশাস্ত্রের জটিল পন্থা পরিত্যাগ করিয়া সহজ সরল পথই বাছিয়া লয়। শাস্ত্রবেত্তা ও নীতিবাগীশ ইহাতে ক্ষোভ করিতে

পারেন, কিন্তু এই দুর্দ্দম গতি কোন দেশে কেহ রোধ করিতে পারে নাই। সুতরাং যদি অনুকূল ঘটনা সেই স্বার্থকে বাড়াইয়া তোলে, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত আন্দোলন ও সকল বক্তৃতা ব্যর্থ হইবে; পণ-প্রথাকে কিছুতেই উৎপাটিত করা যাইবে না।

আমাদের সমাজে কন্যার অভিভাবকদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে পণ-প্রথা উঠিয়া না গিয়া ক্রমশঃই তাহা বদ্ধমূল হইবে। যে সমাজে কন্যার অভিভাবকদিগকে যে-কোন উপায়ে কৈশোরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের অনূঢ়া কন্যাগণকে উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহাতে কন্যা বিবাহের পর-মুহূর্ত্তে বিধবা হয় সেও ভাল, কিম্বা বিবাহের পর কন্যাকে চিরজীবন অর্দ্ধাশনে জীবন অতিবাহিত করিতে হয় তাহাতেও আপত্তি নাই, যে সমাজে কন্যার বিবাহ না হইলে পিতার জাতিপাত হয়, সে সমাজে কন্যার পিতারই বিবাহ দেওয়ার গরজ। পতি পত্নীর মিলনের নাম যে বিবাহ এবং বিবাহই যে সমাজের মেরুদণ্ড, এই সত্য বরের বাপের মনে স্থান পাইতে পারে না। তিনি মনে করেন, পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যার পিতাকে চির-কৃতজ্ঞ করিতেছেন। বধূর অভাবে যে তাঁহার পুত্রের জীবন নিষ্ফল হইতে পারিত এবং যিনি সেই জীবনকে সফল করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিও যে কৃতজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন, বর্ত্তমান সামাজিক প্রথায় সে কথা প্রতিপন্ন করিবার উপায় নাই। সুতরাং কন্যার পিতার গরজই সুস্পষ্ট হইতেছে। ইহাতে বরের পিতার আস্ফালন যে ক্রমশঃই বাড়িবে, সে আর বিচিত্র কি! গরজ বড় বালাই যতদিন থাকিবে, ততদিন কোনরূপেই পণ-প্রথাকে নড়ানো যাইবে না। অথচ অচিরে ইহার উচ্ছেদ সাধন না করিতে পারিলে সমাজের ঘোর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

আসল কথা এই যে, বিবাহের সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। সর্ব্বদেশেই কোন না কোন সময়ে এরূপ সংস্কারের প্রয়োজন হয়। যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারা দেশের আবহাওয়া লক্ষ্য করিয়া এবং মানব-মনের গতি বুঝিয়া সময়োপযোগী সংস্কার সাধন করিয়া থাকেন। যে দেশে সেই সংস্কার সাধনে অযথা বিলম্ব হয়, সেই দেশেই ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় একটা ভীষণ বিপ্লব মৃত্যুর অট্টহাস্তের মত দেখা দেয়। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা এ কথা বুঝিতেন। এইজন্য শুনিতে পাওয়া যায়, এত-বড় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকেও আটজন মনু আটবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ যাঁহারা সমাজের কর্ণধার, তাঁহারা হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, প্রাচীন বিধানগুলিকে কিছুতেই একচুল নড়াইবেন না। কিন্তু যখন মানব-চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, তখন হয় সংস্কার

আজ আমরা বিপ্লবের দিকেই চলিয়াছি। জাতিভেদ হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড। কিন্তু আজ আমরা আচার-ব্যবহারে কার্য্যে ও চিন্তায় সেই জাতিভেদকেই ক্ষুণ্ণ করিতেছি। বিবাহ সেই জাতিভেদ-সৌধের একমাত্র অবলম্বন। আজ নানা প্রতিকূল ঘটনায় সেই অবলম্বন দুলিতেছে! যেদিন চূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইবে, সেদিন জাতিভেদ অতীতের গল্প হইয়া দাঁড়াইবে। আজ এই যে পয়সার অভাবে দুঃস্থ পরিবারের কন্যাদিগের বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে বিপ্লব সূচিত হইতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে রূপের উপর বিবাহ নির্ভর করিত না। বংশ-গৌরব, পাল্টা ঘর, কন্যার গুণেরই সমধিক সমাদর ছিল। আজ বিবাহের সময়ে আমরা এ সকল বিষয় প্রায়ই লক্ষ্য করি না। কন্যা দেখিতে কেমন, সে লিখিতে পড়িতে জানে কি না এবং সে বয়স্থা কি না, ইহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। কন্যাও সুন্দরী হইলে কন্যার পিতা অল্প শুল্ক দিয়া অব্যাহতি পান, কিন্তু গুণবতী কন্যা সৌন্দর্য্যহীন হইলে পিতা তাহার বিবাহ দিতে বেশ-একটু বেগ পান। ইহার উপর বয়স্থা কন্যার প্রতিই—অন্ততঃ সহরবাসীর—পক্ষপাতিত্ব দেখা যাইতেছে। ইহা ভাল কি মন্দ সে কথা এখানে উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বয়স্থা কন্যাকে বিবাহ করিলে যেমন অনেক সুবিধা আছে, তেমনি ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, পতি-পত্নীর নির্ব্বাচনের সামান্য ভুলে দাম্পত্য জীবন অশান্তিময় হইয়া থাকে। এই সত্য আমাদের দেশের লোকের মনে ক্রমশঃই আঘাত করিতেছে। যুবকগণ শুধু পিতা-মাতার নির্দ্দেশমত অজ্ঞাতভাবে একজনকে জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগিনী করিতে ক্রমশঃই অস্বীকৃত হইতেছেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে, আমাদের মনের গতি অজ্ঞাতে অনুরাগমূলক বিবাহের দিকে ছুটিয়াছে। বিবাহের বয়স যত বাড়িবে, বর্ত্তমান নিয়মে বিবাহের দ্বারা দাম্পত্য জীবনের সুখ রূপমুগ্ধ যুবকের নিকট যতই কমিবে, সে গতি ততই প্রবল হইবে, অনুরাগমূলক বিবাহ ততই অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে।

নানাদিক হইতে অনুকূল বাতাস এই অনুরাগমূলক বিবাহকেই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। কর্ম্মসূত্রে এক পরিবারের সহিত অন্য পরিবারের মিলন চিরদিনই আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু নরনারীর মেলামেশার পথ আজকাল যত সহজ হইয়া উঠিতেছে পূর্ব্বে তত সহজ ছিল না, কত রকমের কত সূত্রে আজ অন্তঃপুর-চারিণীরা পথে বাহির হইতে বাধ্য হন। এইরূপে পর্দ্দা-সিস্টেম্ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর অবাধ মিলন আজও আমাদের সমাজে সম্ভব নয় সত্য, তথাপি বহু যুবক-যুবতী পরস্পরকে চিনিয়া লইবার সুযোগ পাইতেছে। যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এক হৃদয় অন্য হৃদয়কে আয়ত্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হয়।

নেশায় বিভোর হইলে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা আজও সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাদের মিলনই বাঞ্ছনীয়। এখন সবে অনুরাগমূলক বিবাহের আরম্ভ মাত্র। কিন্তু আমাদের সমাজের পক্ষে ইহা উপযোগী নয়। কারণ ইহাতে জাতিভেদ বিচার করা চলে না। এইজন্যই যখন এ-রকম বিবাহ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, তখন শাস্ত্রকারগণ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের বিধান দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদি অনুরাগ-মূলক বিবাহ আমাদের দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে জাতিভেদ ও হিন্দুসমাজ অতল জলে তলাইয়া যাইবে। অতএব, সাধু সাবধান!

আমি সমাজ-সংস্কারক নই; সুতরাং কি প্রণালীতে সামাজিক সংস্কার আরম্ভ হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার আমার অধিকার বা ক্ষমতা নাই। তথাপি এ বিষয়ে আমার মনে যে-সকল ভাবের উদয় হয়, এখানে তাহা খুলিয়া না বলিলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমাদের শাস্ত্রে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন। পিণ্ডদানের জন্যই পুত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, গার্হস্থ্য জীবন ব্যতীত পুরুষের জীবন সফল হইতে পারে না। পুরুষ উদ্দাম গতিতে সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারে, নারী তাহাকে পালন করে। পুরুষ কর্ম্ম, নারী তাহাকে কেন্দ্রাভিমুখী করিয়া সফল করিয়া তুলে; পুরুষ একটা কালো মেঘ, ভাসিয়া বেড়ায়, নারী তাহাকে আর্দ্র করিয়া বৃষ্টিরূপে মর্ত্তে লইয়া আসে; অতএব গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। একজনের অভাবে সৃষ্টি অচল হইয়া পড়ে। একজনের অভাব জগতের আর সকল পদার্থের দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। এরূপ স্থলে কন্যার অভিভাবককেই অযথা চোখ রাঙাইয়া কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য করিয়া বরের অভিভাবকের গর্ব্ব বাড়াইয়া তোলা কখনই উচিত নয়। বরং বিবেচনা করিয়া দেখিলে নারী অপেক্ষা পুরুষেরই বিবাহের অধিক প্রয়োজন। অতএব বিবাহ বিষয়ে যদি শাসন করিতে হয়, তাহা হইলে পুরুষকেই শাসন করা উচিত। তাহা হইলে কন্যার অভিভাবকের গরজ কমিবে এবং গরজ কমিলে পণ-প্রথা আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে।

আসল কথা এই যে গরজ হইতেই পণ-প্রথার সৃষ্টি। আমরা চিরদিন স্ত্রীলোকদিগকেই শাসন করিয়া আসিয়াছি। সমাজের পক্ষে তাহাদিগকে চিরদিন একটা ভার বলিয়া মনে করিয়াছি, কত রকমের কত অত্যাচার তাহাদের উপর করিয়াছি। এই জন্য আজ পণ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে; কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার জন্যই কত রমণী চিরজীবন কুমারী থাকিতে বাধ্য হইত। যতদিন না আমরা তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিখিব, ততদিন এইরূপ একটা না একটা উৎপাতের সৃষ্টি হইবেই হইবে! অথচ স্ত্রীলোকদিগের যেমন সম্মানের চক্ষে দেখিবার বিধান আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ অন্য কোন শাস্ত্রে দেখি না। নারীর আনন্দ-বর্দ্ধনে দেবতার আনন্দ হয়, ইহাও শাস্ত্রের কথা। পত্নী সখা মিতা সচিব, একদিন আমাদের দেশেরই শাস্ত্রকার-গণ স্ত্রীলোকের এত প্রশংসা করিয়াছিলেন। আজ আর এই সকল কথাকে পুঁথির মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে চলিবে না, তাহাদিগকে আমাদের জীবনের কার্য্যে সফল করিতে হইবে। নতুবা কন্যার বিবাহ একটা দায় বলিয়াই গণ্য হইবে এবং সে দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সঙ্গতি-সম্পন্ন অভিভাবক অর্থ দিয়া গুণহীনা কন্যাকে সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে! আর যতদিন সংসারে এরূপ অভিভাবকের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন পণ-প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

# প্রত্যাবর্ত্তন

## ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### বিয়ের চিঠি

একদিন সকালবেলার ডাকে সুনীতি শৈলাঙ্গিনীর একখানা চিঠি পাইল। ভাঁড়ার ঘরের সাম্‌নে দালানে বসিয়া সে তখন আনাজ কুটিতেছিল। জলদের চা, জলখাবার দেওয়া হইয়া গিয়াছে। এখন আর কাজের তেমন তাড়াতাড়ি নাই। ছেলেরা দুধ খাইয়া চাকরদের কাছে বাহিরে গিয়াছে। তাই নিশ্চিন্ত মনে সে তরকারী বর্ত্তমানের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতিই তাহার মনে উঠিতেছিল। মানুষের আশাপূর্ণ নবীন জীবনে যদি অতর্কিতে দুঃখের আঘাত লাগে, তাহার বেদনা বুঝি সারা জীবনেও আর দূর হয় না! সুনীতির মনে পূর্ব্বের স্বচ্ছন্দ ভাব আর ফিরিয়া আসে নাই। প্রকৃত দুঃখের হেতু কিছু বর্ত্তমান না থাকায় কল্পিত দুঃখের মধ্যে সে নিজ বর্ত্তমানকে অনেক সময় ডুবাইয়া রাখিতে ভালবাসিত। স্বামীর বর্ত্তমান ব্যবহারে অভিযোগের যোগ্য কোন কিছুই নাই থাক্, তবু তাঁহার নিরালা মনটি কি সে আর ফিরিয়া

সময় শৈলর অভাবও তাহার অনুমিত হইত। এ সময় তাহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পাইলে হয় ত মনের এ উৎসাহ-হীন উদাস ভাব ঘুরিতে পারিত। সেও দূরে চলিয়া গিয়াছে!

বড় খোকা একখানি খামে মোড়া চিঠি আনিয়া মার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তোমার চিঠি, মা। আমি বানান করে করে পড়ে দেখেচি, শ্রীমতী সুনীতি দেবী। 'শ'য়ের তলায় একটা দাঁড়ি দেওয়া আছে—কে লিখেচে মা—বল না?"

বড় খোকা এখন প্রথম ভাগ পড়িতে শিখিয়াছে। সুনীতি আনাজ-ধোয়া ভিজা হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চিঠিখানি সোজা করিয়া দেখিয়া কহিল, "তোমার বড় পিশিমা লিখেচেন?"

"বড় পিশিমা কবে আস্‌বেন মা? তপ্‌সি, তনু চলে গিয়ে আমাদের আর পাঠশালা-পাঠশালা খেলাই হয় না। তুমি বড় পিশিমাকে লিখে দাও না মা, শীগ্‌গির করে যেন চলে আসেন!"

মা বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তাই লিখে দেব। কি লিখ্‌ব, শোন্‌। আমি লিখব, বড় খোকা তোমায় শীগ্‌গির আস্‌তে বলেচে, তুমি পত্র পাঠ এখানে চলে এস. না হ'লে তাদের খেলা হচ্চেনা, কেমন এই ত?"

বড় খোকা হাসিয়া, "হাঁ মা ঐ কথা লিখো।" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় অদূরে পিতাকে আসিতে দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুনীতি চাহিয়া দেখিল। একখানি খোলা চিঠি হাতে স্বামী বোধ হয় তাহারই উদ্দেশে আসিতেছেন।

হাতের কাজ বন্ধ করিয়া কোলের উপরের চিঠিখানি সবে মাত্র সে খুলিবার উপক্রম করিয়াছিল। এখন তাহা আবার যথাবৎ রাখিয়া দিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে তাকাইল। কাছে আসিয়া হাস্যমুখে জলদ কহিল, "বাবা লিখেছেন, নিরুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ফাল্গুনের প্রথমেই দিন স্থির করা হবে। আমায় পনের দিনের ছুটি নেবার জন্য দরখাস্ত করতে বলেছেন।"

সুনীতি মুহূর্ত্তে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া কহিল, "ঠাকুরপোর বেশ্ বেশ্। আমার খুব আহ্লাদ হয়েচে কিন্তু।" নীরদ জলদের মেজ ভাই। সে এতদিন বিবাহ-বিরোধীর দলে ছিল। সম্প্রতি ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মত পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

জলদ মৃদু হাসিয়া কহিল, "চিরদিন কখনো সমান না যায়। আচ্ছা, যদি এর চেয়েও আর-একটা ভাল খবর দি—কি দেবে, বল দেখি?" সে মুখে মৃদু মৃদু হাসিতে ছিল বটে কিন্তু সে হাসিতে একটুখানি লজ্জার আভাসও যেন অনিচ্ছাতেও প্রকাশ পাইতেছিল। সুনীতি স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "ডবল বথ্‌শিস্‌। খবরটা কি, শুনি ত আগে?" জলদ মনের ইতস্ততঃ ভাবটুকু চেষ্টায় সরাইয়া সহজ সুরে কহিল, "আমার কিরণ এবার থেকে তোমাদের সকলেরই হলেন। আমারও তিনি মেজ-মা হবেন এবার! কেমন, খুসী ত!"

সুনীতি একদিন স্বামীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, "তোমার কিরণের চিঠি!" জলদ আজ সময় পাইয়া তাহার শোধ লইল। ছেলেটিকে আমরা যত নিরীহ আত্মভোলা মনে করি, দেখিতেছি, আসলে সে ঠিক্ তা নয়।

স্বামীর এ বিদ্রূপের আঘাতটুকু সুনীতি কিন্তু পুষ্পাঞ্জলির মতই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। এ অশ্রু আনন্দ, অভিমান ও মুক্তির ত্রিধারা সংযোগে। চেষ্টা করিয়াও মনের এ অভিনব ভাবাবেগ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহার চোখের জল কপোল বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামী কাছেই দাঁড়াইয়া আছেন। আর মনের এ দুর্ব্বলতা তাঁহার কাছে প্রকাশ যে কত বড় লজ্জার ব্যাপার—তাহা সে স্মরণ রাখিতেও পারিল না। জলদ কাছে আসিয়া তাহার ললাটে সস্নেহে দুই আঙুলের টোকা দিয়া কহিল, "ছিঃ ছেলেমানুষি করোনা, চোখ মুছে ফেলো। বড় খোকা চেয়ে আছে অবাক হয়ে!" বলিয়া সে স্ত্রীকে শান্ত হইবার অবসর দিবার জন্যই পুনরায় ব্যস্তভাবে বৈঠকখানায় ফিরিয়া গেল। তাহার মনে হইল, এইবার বুঝি

হইতে সে অনেকদিন পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তাহার কাঠামোখানা এতদিন ভারী পাথরের মতই স্ত্রীর বুক জুড়িয়া বসিয়াছিল—আজ সে পাষাণভার নিজ হইতেই নামিয়া গিয়াছে। কি আরাম এ, ভগবান!

স্বামী চলিয়া গেলে বিস্মিত বিষণ্ণ-মুখ ছেলেকে কাছে ডাকিয়া, হঠাৎ চোখে ধূলা পড়ার জন্য বার কতক অাঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া, ছেলেকে আদরে ভুলাইয়া, বাহিরে খেলিতে পাঠাইয়া এইবার সে শৈলর চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। শৈল লিখিয়াছে,—

"ভাই বৌ, এবার তোমার ম্লান মুখখানি মনে এঁকে এনে বড় অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেম। হয়ত তাতে ঠাকুর পূজার কোন ব্যাঘাত হয়েছিল। অন্তর্য্যামী তাই কৈফিয়ৎ চাইলেন, "বল; কি হয়েচে? কিছু যে হয়েচে এটা ঠিক না বল্লে কিছুতেই শুন্‌ব না।"

কিন্তু এও কি একটা বলবার কথা নয় কি? তোমার নন্দাই যখন এটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, শুনে তুমি বলেছিলে মনে আছে যে ঠাকুর জামায়ের পরিশ্রম সার্থক হলো—এটা খুব সুখের বিষয়। কিন্তু ভাই কাজটা বড় মন্দ! ওরা এটর্ণীরা নাকি দিনকে রাত করে, জ্যান্ত মানুষকে উড়িয়ে দেয়, বাপের নামেও ডিক্রীজারী করে। কথাটা নিছক না হোক অনেকখানি সত্যি! এই দেখনা কেন তার সাক্ষী! কখন যে ভাল মানুষটির মত আমার মত যুধিষ্ঠিরের শাপ-বিবর্জ্জিতা শৈল অর্থাৎ পাষাণের পেটের কথাটি বার করে নিয়েচেন, জান্‌তেও পারিনি আমি। হঠাৎ সেদিন বাবার চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। বাবা লিখেচেন, "তাঁর জামায়ের চিঠিতে শুনলেন, মহেন্দ্র বাবু ডেপুটির মেয়েকে তোমার নাকি ভারী মনে ধরেচে। নিরুর সঙ্গে তার বিয়ে দিতেই হবে। এটা তোমার আরজি, দাদারও নাকি তেমন অপছন্দ নয়! তবে তোমারই নাকি একান্ত জিদ আর আব্দার।" বাবাকে ত জানই! তোমার আব্দার ঠেল্‌বার তাঁর সাধ্যই নাই! কাজেই উপযাচক হয়ে মহেন্দ্রবাবুকে লিখে তাঁর ডাক্তার ছেলেটির জন্যে মেয়েটিকে ভিক্ষে চেয়েচেন। তোমার অন্ত সাধ, নিরু জ্যান্তর পালা এলো। মাই একটু বিগ্‌ড়ে ছিলেন, "ডাগর মেয়ে শিক্ষিত মেয়ে" ইত্যাদি, তা সে তাঁর এটর্ণী জামাইবাবু একদিন নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে তাঁকে এমন বুঝিয়ে দিয়ে এসেচেন যে, মাও চটপট মত দিয়েচেন। মেয়ে এখন ত্রিপুরায় শুনলুম্। পোড়ারমুখী! আমি মচ্ছি ওঁর ভাব্‌নায় —আর রাণী আমার নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর্চ্চেন। কাল কলি কিনা! বেইমান্ কোথাকার! একটা খবর দেওয়াও দরকার মনে হয়নি। বুঝি এমনিই লো! তবু লোকে দোষ দিতে হলে ননদের দেয়, বলে ভাজ বড় গুণবতী, ননদিনী রাই-বাঘিনী আর 'কুটিলা', আরো কত কি! আচ্ছা, এস তুমি, এর শোধ তোলা রইল।

এইবার কোমরে কাপড় বেঁধে দেওরের বিয়ের উদ্যোগে লাগ্‌বে এস! দু মণ নাড়ুর চাল কুট্‌তে হবে, মনে থাকে যেন। এটর্ণী মশাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন, তাঁর বিলটা কল্লে পাঠাবেন! জানত, এঁরা স্ত্রীর নামেও বিল করেন। হাঁরে বৌ, সূর্য্যি এখন কোন দিকে উঠ্‌চে ভাই? ডোবে বোধ হয় দক্ষিণে? ইতি তোমার আপদ-বালাই চিরদিনের শৈলাঙ্গিনী।"

চিঠি মুড়িয়া অাঁচলে বাঁধিয়া সুনীতি কাপড়ে আবার চোখ মুছিল। তবু অবাধ্য অশ্রুর ধারা ক্রমাগতই ঝরিতে লাগিল। এ অশ্রু দুঃখের নয়, বিষাদের নয়; এ অশ্রু আনন্দের, নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের, পরম সান্ত্বনার। অশ্রুধৌত উচ্ছ্বসিত নির্ম্মল অন্তঃকরণে সে বার বার মনে মনে আবৃত্তি করিল, "আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা কর্ল্লেম কিরণ! জ্ঞানে হে'ক, অজ্ঞানে হে'ক তোমার দেওয়া যে দুঃখ আমি বহন করেচি, তার এতটুকু অভিশাপ যেন কখন তোমায় স্পর্শ কর্‌তে না পারে! তোমার ভবিষ্যৎ যেন চিরসুন্দর চিরমধুময়—তোমার পথ যেন বাধাহীন আনন্দোজ্জ্বল হয়, এই আমার একান্ত আশীর্ব্বাদ! তোমার উপর আমার ত্রুটি চিরদিনের স্নেহ দিয়ে আমি শুধ্‌রে নেব।"

মন যখন কানায় কানায় পূর্ণ থাকে, তখন মানুষ দেউলিয়া হইয়াও নিজেকে বিলাইয়া দিতে ব্যস্ত হয়। সুনীতিরও

নদীতে অকস্মাৎ জোয়ারের প্লাবন আসিয়াছিল। কিরণ ত তুচ্ছ! সে আজ পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলকেই ভাল বাসিতে ব্যগ্র। সকলের জন্যই নিজেকে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত। বিড়ালটা ছোট খোকার দুধের বাটীতে চুমুক দিয়া পলাইয়া গেলে পশ্চাদ্ধাবিতা দাসীকে সে অনুনয়ের সুরে কহিল, "আহা মারিসনে রে, অবোলা জীব। ওদের খাবার ত কেউ দেয়না, কাজেই চুরি করে খায়।" বিস্মিতা দাসী অবাক হইয়া মাতাঠাকুরাণীর পানে চাহিয়া দেখিল। সপ্তাহ তখন অতীত হয় নাই, ঠিক এই অপরাধে উনিই না সেদিন অবোলা জীবের শাস্তি-বিধানে অক্ষম হইয়া ঠাকুর, চাকর ও তাহার মাহিনা কাটিতে চাহিয়াছিলেন। এবং "পোড়ারমুখ বিড়াল" কি জন্য তাঁহার দাসদাসী-রক্ষিত বাড়ীতে ঢুকিবার অধিকার পায়, তাহারই জবাব চাহিয়া তাহাকে গলদঘর্ম্ম করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আজ তাঁহার এ আবার হইল কি? তামাসা ত নয়? তাই হইবে। কোন নূতন ধরণের বকুনি খাইবার সম্ভাবনার ভয়ে দাসী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া দুদিক বাঁচাইয়া অস্পষ্টভাবে কিছু বলিতে বলিতেই কর্ত্রীর চোখের বাহিরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

## চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### বিয়ে বাড়ী

"হ্যাগা ছোট ঠাকুমা, মালী বৌ যে সিঁথি ময়ূর, টোপর মালা সব দিয়ে গেল, তা গোড়ে কই? গোঁড়ে নৈলে কি কখনো বিয়ে হয়? মালা-বদল হবে কি দিয়ে?"

"হয় লো হয়! সাহেব-বিবিদের সব হয়। দেখিস্‌নি আসর সাজানো ডা'লে টাঙ্গাবার পাতার মালাগুলো পর্য্যন্ত প'রে ওদের বিয়ে হয়। ঐ জন্যেই ত আষাঢ় মাসে বিয়ে ঠিক করেছিলুম। তখন বনে বাদাড়ে ফুলে ফুল-বৃষ্টি! তা মহারাণী আমার প্রতিজ্ঞা করে বল্লেন যে, যে ওঁকে যুদ্ধে হারাবে, সেই ওঁর পতি হবে। বুড়ো জমীদার খাঁ, দুধ খেয়ে ভুঁড়ি বানিয়েচে। থুপ্‌থুপে নাদুস নুদুস চেহারাখানি। সে ও সর্দ্দারনি মেয়ের সঙ্গে পার্‌বে কেন, বল্? বেচারী মনের দুঃখে তাই বৌ মারা যেতে কাশী-বাসী হোল গে! এখন অঘ্রাণ মাসে ভাল ভাল যুঁতি ফুলের একটা মালা দিয়েই কাজ সেরে নিতে হবে। মেয়েটা গেল কোথা আবার? আল্‌তা পরেচে ত? বলি মেছুনি, তোর কি আক্কেলখানা, বল্ ত! দুলিয়া জল খাবারের জন্য সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে রয়েচে, তুই কি না স্বচ্ছন্দে বসে গল্প জুড়ে দিয়েচিস্! ওগো বাছারা, মাছগুলো ঐ উঠোনের কোণ ঘেঁসে ঢালোনা। আঁশ বঁটির ভাব্‌না কি! ঐ যে চালার পেছনে গাদা জড় করা রয়েচে! ওগো বাগ্‌দি বৌ, তোরা বাপু মাছ কুটতে বসে যা। রোদ চড়ে' উঠবে যে! ভাজ্‌বে কখন? কামানো-টামানোগুলো সেরে নে'না গো মেয়েরা! সেও কি এই বুড়ীকে নজর রাখ্‌তে হবে নাকি? রানু কোথা গেলি গো? ও রানু—এই নে মা, মেয়ের হার রুলি আর দুল দিয়ে গেল স্যাক্‌রা-বৌ। উচ্ছুগ্যু করে পরিয়ে দিগে যা! তোর লক্ষ্মী-প্রতিমা মেয়ের যুগ্যি হয়নি।" ইত্যাকার মন্তব্য ও তদারক-কার্য্যে মুক্তা ঠাকুরাণী আজ একাই একশ'জনের কাজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। চিরদিন তিনিই সকলের করিয়াছেন। আজ সুযোগ পাইয়া অনেকেই মালতী ও হিমুকে শুনাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার শোধ দিতে চাহিতেছিল। তবু যজ্ঞেশ্বর-হীন যজ্ঞের মত যেখানে তিনি নাই, সেখানেই বিশৃঙ্খলা। মুখে নিজ-নির্ব্বাচিত বরের প্রশংসা এবং অরুণের নিন্দাও চলিতেছিল। চলুক, তবু তাঁহার মুখ চাহিয়া বুঝা যাইতেছে, অন্তরে তাঁহার আজ আনন্দের তুফান বহিতেছিল। এ বাড়ীতে এমন করিয়া মঙ্গল-শঙ্খ ত তাঁহার জ্ঞানে কখনো আর বাজে নাই! তা ছাড়া অরুণ ও হিমু, তা মেয়েটা যেমনই দুর্ম্মুখ হউক না কেন—উহারা যে তাঁহার মনের নিভৃততম প্রদেশে স্নেহের কঠিন শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। ইহাদের একটিকেও ছাড়া যে কত কঠিন ছিল, তাহা তাঁহার দুর্ভেদ্য অন্তঃকরণই শুধু বলিতে পারিত। ভগবানের এই অকল্পিত অঘটন-ঘটনার সমাবেশ দেখিয়া ভক্তিমতী বিধবা বিপুল আনন্দে ভাসিয়া আনন্দময়ের লীলাই কেবল প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। এমন করিয়া এ দুজনের গাঁটছড়া বাঁধা কখনও কি মানুষের হাতে সম্ভব ছিল?

গৌরীপতি যেদিন মুক্তা ঠাকুরাণীর কাছে হিমানীকে প্রার্থনা করিলেন, সেদিন হিমু ও অরুণ গভীর বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়াছিল। এ যেন একটা অসম্ভব ঘটনা! তবু অরুণ ইহাতে খুসিও হইয়াছিল। হিমু এখন হইতে চিরদিনই তাহার কাছে থাকিবে। সে আর পরের ঘরে পর হইয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না! কিন্তু তখনি সে মনকে কঠোর কশাঘাতে ফিরাইয়া লইল,—স্বার্থপর! সে এ কি অন্যায় চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে বসিয়াছে? অরুণ পিতাকে জানাইল, প্রফুল্লর সংবাদ না লইয়া সে সংসারের কোন কিছুতেই স্বীকৃতি দিতে পারে না। গৌরীপতি তাহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন।

এবার সে সহজেই প্রফুল্লর সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিল। আলোকনাথের কর্ম্মচারীদের কাছে সে জানিতে পারিল, মাতৃবিয়োগের পর প্রফুল্ল তাহার রুগ্ন মাতুলকে লইয়া মাতুলালয়েই সেই পর্য্যন্ত বাস করিতেছে। আলোকনাথও স্ত্রী-বিয়োগের পর মার সঙ্গে কাশীবাস করিতেছেন।

হেমাঙ্গিনীর শেষ ইচ্ছা-পূরণার্থ তাহাকে কাশী লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাহার দেহান্তের পর কর্ত্তা ও তাঁহার মাতাঠাকুরাণী কাহারো আর সংসারে ফিরিবার ইচ্ছা না হওয়ায় সেখানেই তাঁহারা রহিয়া গিয়াছেন। অরুণ আরও শুনিল, আলোকনাথ উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রফুল্লকেই দান করিয়াছেন। প্রফুল্ল যদি তাহা গ্রহণ না করে, বা তাহার অবর্ত্তমানে ভবিষ্যতে তাহার উত্তরাধিকারীরা উহা পাইবে। আলোকনাথের আপনার জন্য জীবন-কালতক্ কয়েক শত মাসিক টাকার বন্দোবস্ত আছে মাত্র। মানব-মনের এই আকস্মিক বৈরাগ্যের বিচিত্র সংবাদে অরুণ বিস্মিত হইল। স্ত্রী-বর্ত্তমানে যে মানুষ বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, স্ত্রী-বিয়োগে সে আজ কত অনায়াসে সর্ব্বত্যাগী হইল! অরুণ ভাবিয়া দেখিল, আলোকনাথের চরিত্রের এইটুকুই বিশেষত্ব! হিমুকেও সে এমনি করিয়া প্রত্যাখান করিতে

প্রফুল্লর সহিত দেখা হইলে দুই বন্ধুতে সুখ-দুঃখের অনেক আলোচনাই হইল। অরুণের অপ্রত্যাশিত পিতৃমিলন-সংবাদে প্রফুল্ল আন্তরিক আনন্দ লাভ করিল। অরুণ তাহার মাতৃবিয়োগ ও খুড়ীমার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিলে সে কেবল শান্তভাবে চুপ করিয়া রহিল। সে ক্ষত এত গভীর যে ইহার স্পর্শের বেদনাও বুঝি সহা যায় না! বন্ধুকে সে তাই আনন্দের দিনে তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখের অংশ দিতে পারিল না।

অবশেষে অরুণ যখন মৃদু কুণ্ঠিত বিনম্র স্বরে মালতী দেবীর পক্ষ হইতে তাহাকে হিমুকে বিবাহ করিবার অনুরোধ জানাইল, তখন প্রফুল্ল হাসিতে লাগিল কহিল, "তুমি তাহলে কোন খবরই রাখ না, দেখ্‌চি। তাঁকে 'কাকীমা' বলতে আমার ঘোর আপত্তি ছিল সত্য! কিন্তু 'বৌমা' বলায় একটুও নেই। বিয়ে এ-জন্মে আমি করব না! সেটা হিমুর অভাবে নয় ভাই, আমার প্রয়োজনের অভাবে। তুমি এ থেকে সূক্ষ্ম অর্থ বার করে—ত্যাগের আদর্শ! বন্ধু-প্রেম! নভেলি-লীলা—এ সব ব্যাপার স্থির করো না যেন! স্পষ্ট করে আমার সব কথা বোঝ! আমি মনে করিনা যে জীব মাত্রকেই একই নিয়মে সংসারী হতে হবে। যে যাতে যোগ্য বা অধিকারী সে সেই পথে চলুক। ইন্দ্রনাথ জ্যেঠা মশায় বিয়ে করেন নি। তিনি পরম জ্ঞানী, আনন্দময় স্বভাব সুখী ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্য-সেবাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। আমিও সেই পথকেই কৈশোর থেকে নিজের জন্য নির্ব্বাচন করে নিয়েচি। অবশ্য দুজনের মতের কিছু পার্থক্য আছে বই কি! কাল-হিসেবে সেটা সম্ভবও। দেশের সেবা, গ্রন্থ পাঠ ও প্রণয়ণ এই হচ্চে আমার জীবনের আদর্শ। অবস্থার ফেরে সম্প্রতি একটা প্রফেসরি চাকরী আমি নিয়েচি, সত্য। মামাকে নিয়ে শীঘ্রই সেখানে যাব। কিন্তু তাই বলে মতের বদল আমি এখনও করিনি। চাকরী করাই আমার আদর্শ নয়। আমার আর মামার বই কখানা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই কাজটাই আমায় নিতে হোল। কারণ আমার বা

তুমি বল্‌চ? হাঁ, সে বিষয়েও তোমাকে সব কথা বলা দরকার রয়েচে যে। এখনও সে সম্পত্তি ন্যায়তঃ আমার নয়। তবু ন্যায্য-অন্যায্যের তর্ক আমি এখানে তুল্‌ব না। আমি শুধু বলব—যে মাতৃদ্রোহ দেশদ্রোহের শপথ নিয়ে যা আমি ত্যাগ করেচি, সে সম্পত্তির কণামাত্র স্পর্শ করা আমার আর সাধ্য নয়। কাকা—তাঁকেও আমি দুঃখ দিয়েচি, বিস্তর অন্যায় করেচি। তবু তিনি তাঁর অকৃতজ্ঞ সন্তানকে ত্যাগ কর্ত্তে পাল্লে'ন না। খুড়ীমার শেষ ইচ্ছা-পালনে আর একটা কষ্টকর কাজে আমি কাশী গিয়েছিলাম। অবশ্য দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সেখানেই আমি শুনে এসেচি, কাকা উইল করেচেন। সম্পত্তি যদি নেহাৎ আমি না নিই, আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা তা ভোগ করবে! অরুণ, এটা ন্যায়ের ফাঁকি। কাকার উদ্দেশ্য, আসলে আমি পয়সার দুঃখ না পাই। তাঁর না নিই, ছেলের নেব। এইবারে আমরা আসল জায়গায় এসেচি। যাঁর বিষয়,—ইন্দ্রনাথ জেঠার মনের ইচ্ছা সকলেই জান্‌ত। তিনি হঠাৎ মারা না গেলে তাঁর এ সম্পত্তি—কাকা, বা আমি কোনদিনই পেতেম না—এটা নিঃসন্দেহ। কারণ তিনি বেঁচে থাক্‌তে আমাদের কোন খবর কখনো নেন নি। এর ন্যায্য অধিকারী তুমি! মেসের বাসায় ছ' বৎসর আগে যেদিন প্রথম তোমার পরিচয় জান্‌লেম, সেইদিনই আমার মনে হয়েছিল, এ বিষয় ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তোমারই পাওয়া উচিত, কোন সময়। হিমুকেও এর অধিকার দিতে কাকার মনে ইচ্ছা হয়েছিল, সুতরাং সম্পত্তির অতীত ও বর্ত্তমান, মৃত ও জীবিত প্রকৃত অধিকারী দু'জনের নির্ব্বাচিত পাত্র ও পাত্রীদেরই এ উচিত প্রাপ্য। তর্ক করো না অরুণ! তাতে আমায় তুমি জিত্‌তে পার্‌বে না কখনও। বিশেষতঃ আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী কেউ যখন কখনো থাকচে না, তখন এ তর্কত ঘুচিয়েই গেল। কাকাকে আমি কালই এ-সব কথা বুঝিয়ে লিখব। সম্ভবতঃ এতে তিনি খুসীই হবেন। তিনি হঠাৎ একেবারেই বদলে গেছেন। চল, এইবার মামার সঙ্গে দেখা করবে। কত বড় [illegible] ভাল করে না বোঝ্‌বার সময় পেলে ঠিক বুঝতে পার্ব্বে না! জ্ঞানের আধার! প্রেমের সিন্ধু! দেশকে কি ভালই যে তিনি বেসেছিলেন। দুখানা বই লিখেচেন—দেখো, কি সুন্দর জিনিষ হয়েচে। অরুণ, তুমি এই দুখানা পাব্‌লিশ্‌ করে দিতে পার! তুমি আমার ধার শুধতে চেয়েছিলে,—দেখ, আমি তারও সুযোগ পাইয়ে দিলেম তোমায়!"

## একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### শেষ কথা

প্রফুল্লর সে অপার্থিব প্রফুল্ল হাসি ও স্বর্গীয় আলোক-দীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া অরুণ তাহার সকল আদেশই মান্য করিয়া লইল; প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে আশ্চর্য্য হইল। এ মানুষের বিরুদ্ধেও লোকে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিতে পারে! এবং সেও তা বিশ্বাস করিয়াছিল!

অরুণ ফিরিয়া আসিয়া বিবাহে সম্মতি দিলে, হিমু একদফা গণ্ডগোল বাধাইল। ছি, অরুণ দাদাকে কখনো বুঝি আবার বিবাহ করিতে আছে? এ কি হিন্দুর বাড়ী নয়! ভাই-বোনে বিয়ে? মাগো! কেমন করিয়া বৌ সাজিয়া ঘোমটা টানিয়া সে অরুণের সম্মুখে বাহির হইবে? না, না, এ সব কিছু তাহার দরকার নাই। শেষে মালতীর অনুনয় উপদেশ, ভৎ'সনা তাড়নায় সে যখন মৌন থাকিয়া সম্মতি বুঝাইল, তখন লজ্জায় যেন তাহার আর সীমা রহিল না। সে যেন একদিনেই বড় হইয়া গেল। দিদিমার ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে সে এখন আক্রমণ ত করেই না বরং ভয় করে; আবার তাহাতে আনন্দও পায়। গোপনে অরুণের চিন্তায় অনেক সময় তাহার বুকের ভিতর গুরুগুরু করে, আবার লজ্জাও অনুভূত হয়। অরুণকে সে এখন দেখিতে পায় না। গৌরীপতি অন্যত্র বাসা লইয়াছেন; শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া একেবারে ছেলে বৌ লইয়া বাড়ী ফিরিবেন। লজ্জাবশে অরুণও আর এ বাড়ীতে আসে না। [illegible]

করিয়াছে। এই ত অরুণ নিজের বাড়ী চলিয়া যাইত। সেও আর কখন তাহাকে দেখিতে পাইত না। হয় ত তাহাকেও আর কাহারও কোথায় বন্দিনী থাকিতে হইত! তাহা হইলে?

তবু ভারী লজ্জা করে যে! মাথায় রাশ করা এলো চুলের খোঁপার ভিতর লোহার ছোট কাজল-লতা-খানি লুকাইয়া চন্দন-চর্চ্চিতা লালপেড়ে সাড়ী পরিহিতা হিমু দিদিমাকে দূর হইতে দেখিয়াই পলাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। ঠাকুরাণী কাছে আসিয়া হাসিমুখে কহিলেন, "কৈ গো আমার হেম-বরণী হিমু রাণীর রণ-সাজটা একবার দেখি,—ভ্যাবাকান্ত আমার ভেড়াকান্ত হতে পারবে কিনা! মুখ ফেরা না লো নাত্‌নী, আম্‌রাও একবার চোখ্‌ ভরে দেখি।" বলিয়া তিনি সুর করিয়া গান ধরিলেন, "মেয়ে হ'য়ে রণসজ্জা লাজের মাথা খেয়েছ কি?

ওমা ওমা একিগো মা এমন মেয়ে দেখেছ কি?"

হিমু 'যাও' বলিয়া মৃদু হাসিয়া দিদিমার পানে ফিরিয়া চাহিলে মুক্তাঠাকুরাণী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন, হাতে দুইগাছি ফিতা প্যাটার্ণ সোনার রুলী, গলায় একছড়া সরু গোট হার, আর কানে দুটি রাঙ্গা পাথর বসান দুল! অলঙ্কারের বহর ত এইটুকু—এও হিমুর অঙ্গে আজ নূতন! তবু সে অলঙ্কারের তুচ্ছ শোভাকে ম্লান করিয়া দিয়া তাহার তরুণ অঙ্গে যে অম্লান রূপের হিল্লোল বহিতেছিল, আজ যেন তাহা সম্পূর্ণই নূতন বলিয়া মনে হইল। বালিকা চঞ্চলা হিমুর চোখের দৃষ্টিটিও আজ যেন নূতন ভাবের স্নিগ্ধতায় কোমল হইয়া লজ্জা-নম্র কিশোরীর সদ্য প্রস্ফুটিত হৃদয়-শতদলের অরুণরাঙা বার্ত্তাটি তাহার মনের বাহিরেও ছড়াইয়া দিতেছিল। সে মুখের পানে চাহিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী আজই যেন প্রথম অনুভব করিলেন, এ দেহের জন্য বৃথাই তিনি মণি-মুক্তার লোভ করিয়াছিলেন। ইহাকে সাজাইতে যাওয়া বুঝি ইহার পক্ষে অপমানই!

তিনি হাসি মুখে কহিলেন, "সাধে কি আর ছোঁড়া বুড়ো সবাই পাগল হয়রে! এ রূপ দেখে যে মেয়ে মানুষেরই মুণ্ডু ঘোরে, পুরুষ ত কোন ছার! "কেমনে বল ভাল না বেসে থাকি। পাগল করেচে তোমার ও দুটি আঁখি। কিলো হিমু। বিনি যুদ্ধেই বরকে হার মানালি নাকি?"

হিমু সহসা দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সজল কণ্ঠে কহিল, "তোমাদের কাছেই আমায় রাখ্‌লেনা কেন দিদিমা? ওদের ঘরে কেমন করে আমি দিন কাটাব? তোমাদেরই বা দিন কাটবে কি করে তাহলে?"

"কেটে যাবে ভাই, কেটে যাবে। এম্‌নি করে যুগ যুগ ধরে সবারই যে দিন কেটে আস্‌চে! শুধু খবর যেন পাই দিনগুলো তোর সুখেই কাট্‌চে। আর মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ যখন মেরে যাবে, তখন ঝাল খেতে এক একবার আসিস্‌ দিদি, নৈলে হাঁপিয়েই যে মরে যাব।"

"হ্যাগা পিশি, এখনও নাত্‌নী নিয়ে ঘরের কোণে রঙ্গ করচ? গোধূলিতে না বে? বর ত এলো ব'লে। বরের দাদা প্রফুল্লবাবু এই দলিলপত্রগুলো ভাল করে তুলে রাখতে বল্লেন। তাঁর কাকা আলোকনাথ বাবু তাঁর সমস্ত জমিদারী, ঘর-বাড়ী বিষয়-সম্পত্তি দানপত্র করে বর-কনেকে এতে যতুক দিয়েচেন। কি আশ্চর্য্যি বাবু! কলিকালে এমন যতুক দেওয়া ত কখন শুনিওনি। জ্ঞাতি নয়,—গোষ্ঠী নয়। নাও, এখন তুমি একবার বেরিয়ে হাঁক্ ডাক্ কর। মালতী দিদি ভাল মানুষ, ওর কথা কি কেউ মানে—না, শোনে? বেলা যে পড়ে এলো—!"

প্রতিবাসিনী রোহিণীর কথায় সচকিত হইয়া মুক্তাঠাকুরাণী অশ্রুভরা কণ্ঠে কহিলেন, "বেলা যে আমারও পড়ে এলো রে! এবার তোরাই সব হাল ধর! পরামাণিকের পো, ধুতরো ফুলগুলো রাখ্‌লে কোথা? সাজিয়ে ফেল্‌তে বলে দে না মা! মেয়েদের সব ডাক্ দেখি—বরণের জিনিষ-পত্রগুলো গুছিয়ে রাখুক। ওলো হিমি, কাগজগুলো বাক্সে তুলে রাখ্‌ দিদি! একেই বলে, "যার ধন্ তার ধন্ নয়—নেপোয় মারে দই।" এ বুড়োর ভালবাসা রে,—এ যুগের নয়! বামুক দিকি তোর সাতটা অরুণ, কেমন এমন বাসতে পারে! ও হলে ততক্ষণ জামার আস্তেন গুড়িয়ে আমাদের সেই কাশীর পথের বেঞ্চি দখল করা

স্নেলের সঙ্গী পাঞ্জাবী মেয়েটির মত নিজের দখলী সত্ব ছাড়তে বলে বস্‌ত—লড়োগে জী ?'

"ওগো শাঁখ বাজাগো শাঁখ বাজা ! বর এলো যে।" "অ নদি ! বর দেখ্‌বি আয়। বরকে কি সেজেচে, দেখ !" "বরের কি রূপ ভাই ! রাণু কোথা গেল ? মেয়েকে পুঁথি কোলে দিয়ে পাটে বসাক না, নিজেও দইয়ের হাঁড়িতে হাত ডুবিয়ে বসুক !" "খাসা মানাবে খুড়ী, যেন শিব দুর্গা মিলন হবে।" "মেয়ের তপস্যার জোর আছে বই কি, নৈলে কি আর এমন মিলন মেলে ! দেখ একবার, কোথা থেকে কি জোগাড় হোল !"

"এ যে ভগবানের মেলানো দিদি,—তোমরাও সব মন খুলে আজ আশীর্ব্বাদ কর। আমার দুঃখিনী রাণু রাজা-রাণীর মা হচ্চে। এ দিন যেন তার বর্ত্তমান থাকে !"

"একশোবার খুড়ি, একশোবার ! প্রাতর্বাক্যে একশো বার আশীর্ব্বাদ করচি। ভগবান্ ওদের আমার মাথায় যত চুল, এত বৎসর পরমায়ু দিন। ওঁরা রাম-সীতে হয়ে রাজ্যি করুন !"

শেষ

ইন্দিরা দেবী।

---

# স্বরলিপি

এল যে শীতের বেলা বরষ পরে,
এবার ফসল কাটো লও গো ঘরে।
কর ত্বরা কর ত্বরা
কাজ আছে মাঠ ভরা
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে।

বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যা তারা—
আসন আপন হাতে
পেতে রেখো আঙিনাতে
যে সাথী আসিবে রাতে তাহারি তরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II {গা মা গা। রা সা রা I গা গা (রা। রপা -া -ক্ষা) } I -া। -া -া -া I
এ ল যে শী তে র বে লা ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গা পা পা। পক্ষা ধপা -ক্ষা I গা মা গা। রা সা রা I গা গা -া। -া গা গা I
ব র ষ প ০রে ০ এ ল যে শী তে র বে লা ০ ০ এ বার্

গপা পা -া। পক্ষা পা -া I -া -া -া -া -া -া I পা -না না। নধা পা -ক্ষা II

II -া গা গা। পা পা -া I -া পা ধা। র্সা র্সা -া I পা পা -পা। পা পা -ধা I
০ ক র ত্ব রা ০ ০ ক র ত্ব রা ০ ত্ব রা ০ ক র ০

ধর্সা র্সা -া। -া -া -া I পা -র্সা র্সা। না ধা -া I পনা না -ধা। -পা -া -া I পা না না I
ত্ব রা ০ ০ ০ ০ কা জ আ ছে মা ঠ ভ রা ০ ০ ০ ০ দে খি তে

নধা পা ক্ষা I গা -া -া। -া -া -সা I সগা গা -া। গরা সা -া II
দে খি তে দি ০ ০ ০ ০ ন্ আঁ ধা র্ ক রে ০

II সা ঋা ঋা। ঋা ঋা -া I ঋা সা -ধ্া। -সা -া -া I সা ঋা ঋা। ঋা সা -া I
বা হি রে কা জে র্ পা লা ০ ০ ০ ০ হ ই বে সা রা ০

সপা পা পা। পা পা পক্ষা I পা দা -া। ক্ষা -া -া I গা -মা মা। মা গা -া I পা পা গা।
আ কা শে উ ঠি বে য বে ০ ০ ০ ০ স ন্ ধ্যা তা রা ০ আ স ন্

পা পা -ধা I ধর্সা র্সা -া I র্সা র্সা -া। র্সা র্সা -না। ধা ধা -পনা I ধনা ধপা -া।
আ প ন্ হা তে ০ পে তে ০ রে খে ০ আ ঙি ০০ না তে ০

-ক্ষা -গা -া I গা গনা না। নধা পা ক্ষা I গমা মগা -া। -া -া -া I সগা গা গা।
০ ০ ০ যে সা থী আ সি বে রা তে ০ ০ ০ ০ তা হা র

গরা সা -রা II II
ত রে ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# গিন্নি

এই দেবী পক্ষে থাকবেনা রক্ষে
বউএরে না আনলে ছেলে হবে খাপ্পা,
ভাবি যাই তীর্থে, সংসার মিথ্যে,
নোড়বো যে নড়বার জো আছে কি এক পা !

ঠাকুরের রান্না কর্ত্তা যে খান্ না,
বুড়ো হ'লে বায়নার থাকে না সে অন্ত ;
জ্বলে যায় পিত্তি শুনে শুনে নিত্যি
রকমারি ফরমাস, তবু নেই দন্ত !

জামায়েরে তত্ত্ব মুখে তুলে রক্ত
হবেই ত করতে, চুপচাপ কর্ত্তা—
খোঁচা দিলে ভিমরুল- সম বিঁধে হান হুল,
আক্কারা সব চিজ্, বুঝবে কি পর তা ?

নাতনীর জন্যে খুঁজে খুঁজে হন্যে
মিল্‌চেনা তবু কোনো মনোমত পাত্র,
লেখা যা তা ভাগ্যে হবে সে তা, থাক্‌গে
ঐ নিয়ে ভাবনা খালি দিনরাত্র।

ফুরিয়েছে কয়লা, বড়িগুলো ময়লা
হয়ে গেল ন বউএর দোষে খালি শুদ্ধু ;
বলি যদি অম্‌নি রেগে রাঙা অগ্নি
চুপচাপ্ আছি বাপ, কে করবে যুদ্ধু ?

ঝী বেটিরে তাড়িয়ে দিতে হবে নাড়িয়ে
ছিরি-ছাঁদ নেই তার কোনো কাজ-কর্ম্মে,
ফোটে মুখে তুব্‌ড়ি, চারিদিকে সকড়ি
করে দিলে একশা— খেলে জাত-জন্মে।

বড় মেয়ে শৈল ছ ছ মাস রইল
শ্বশুরের বাড়ী, এবে হবে তারে আনতে,
এলে হয় রোস্‌কে বলি হরি ঘোষকে
ধার-পড়া বঁটিখানা ভাল করে শান্‌তে।

লিখে পড়ে মুখ্যু হয় এ কি দুঃখু,
বড় নাতি নাস্তিক মারে রোজ মুর্গী,
যত অনাছিষ্টি লাগেনাক মিষ্টি
সোজাসুজি মাছ ভাত ডাল রুটি দুধ ঘি !

যাবে যুগ উল্টে নেই তার ভুল্‌টে,
মালতীর বোন হায় দু আঙুল ঘোমটা—
ভাসুরের সামনে, আবার সে খাম্ নে
ইংরিজী চিঠি লেখে, মারে মুখ-ঝাম্‌টা !

ধোপা-বউ কালকে চলে গেল সাল্‌কে,
ছিড়ে দিয়ে পশারিটা—এলে পরে বুঝবো,
পাথরের বাটিটে ঘটি তিন চারটে
হারালে সে ছোট বউ, আমি মরে খুঁজবো !

দেহ আর বয়না, খাটুনিও সয়না,
একটু হেঁটেছি যাই পা দুখানি ফুল্‌লো,
দু দণ্ড বোসবো তারপিন ঘোস্‌বো
অমনি সে বাড়ীময় হৈ-চৈ উঠলো !

খুকি বড় কাশ্‌চে ; স্যাকরা না আসচে
বালা ভেঙে করোগেট চুড়ি দোবো গড়তে,
উঃ এ কি বাত গো ! কাল সারা রাত গো
ঘুমুইনি, বাঁচি পেলে বিছানায় পড়তে।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

# চিত্তদোলা

মার্চ মাসের শেষ। কাল অপরাহ্ণ। ঘনঘটা কোরে তুষারপাত সুরু হয়েছে। বাতাসের বেগও ক্রমেই বাড়ছে।

জাপানের তোকিও শহরে ভারতীয় ছাত্রদের মেস। অরুণের ঘরে প্রাত্যহিক বৈঠক বোসে গেছে। ঘরের এক কোণে লোহার ষ্টোভ আগুনের আঁচে গনগন করছে। বেলা এখনো আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা আসন্ন।

পূর্ণ সেইমাত্র 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানটি শেষ করেছে। সে বেশ গায়, ভারি মিষ্টি গলা। সে যে গাইতে পারে তা তার চেহারা দেখ্‌লেই বোঝা যায়। পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথায় লম্বা চুল ভোমরার মত কালো। ভাসা-ভাসা হুটি আয়ত চোখ। দাড়ি-গোঁফ কামানো, বাঁশির মত নাকের উপর প্যাঁস্‌নে চশ্‌মা। যুগ্ম-ভ্রূ মুখে হাসি লেগেই আছে। সে যেন আনন্দের ঝরণা।

ফণী বল্লে, ওহে পূর্ণ, গান গেয়ে তো মন খারাপ কোরে দিলে বাবা! একে বাদ্‌লা, তাতে আমাদের এই পুরুষের ব্যারাক! দাও, এক কাপ চা এগিয়ে দাও। হুটি জিনিস না থাক্‌লে জগৎ মরুভূমি হোত—চা আর girls!

ফণীর বেশ নাদুশ-নুদুশ চেহারা। মাথায় খাটো, গোঁফ-দাড়ি কামানো। ভুঁড়িটি সহজেই চোখে পড়ে। ঐ ভুঁড়ির দৌরাত্ম্যে বাড়ীর কত লোকের যে বেল্ট্‌ ছিঁড়েচে তার হিসাব নেই। হাতের কাছে যার বেল্ট্‌ পাবে সেইটিই ফণী কোমরে চড়াবে। তারপর একটি জোর হাঁচি বা কাশির ওয়াস্তা, অমনি বেল্টের দফা রফা! ভারি আমুদে লোক। মাঝে মাঝে মাথার উপর হাত তুলে বিপুল ভুঁড়ি দুলিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেচে নেচে গায়—

গয়লা-বৌ আমায় বড়
ভালোবাসে—এ—এ!
গয়লা বেটা দেখ্‌তে পেলে—
গয়লা বেটা দেখ্‌তে পেলে—
রামসুন্দরী কোঁৎকা নিয়ে
ছুটে আসে—এ—এ!

হু'চার চুমুক চা খেয়ে ফণী বল্লে, কি হে! সব নিঃঝুমের পালা কেন! মিইয়ে গেল যে! সবাই যদি এক একটি owl হয়ে বোসে থাকো, তাহলে তো এখান থেকে উঠ্‌তে হয়! নাও 'মাথাবও'! তুমি একটা প্রেমের গল্প বল দেখি! বয়স তো কম হয়নি! এক আধবার প্রেমে-ট্রেমে পড়েছ তো!

ফণী সকলেরই এক একটা অদ্ভুত নামকরণ করে। বিজয়কে সে হুটো নাম দিয়েছে—'মাথাবও' আর 'আজা'। এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। মাথা বড় এক শিশু কথাপ্রসঙ্গে শুনেছিল বড় মাথা থাকা ভারি সুলক্ষণ। যার বড় মাথা তার বড় লোক হওয়ার সম্ভাবনা। তাই সে মাঝে মাঝে আধ-আধ ভাষায় বল্‌তো—মাথাটা বও (বড়) আছে, আজাও (রাজা) হলে হতে পারি!

বিজয়ের দেহ প্রায় ছ'ফুট লম্বা। পা হুখানি বড়-বড়, সবাই বলে শ্রীচরণ। দেহের অনুপাতে মাথাটি প্রকাণ্ড। নাকের ডগা স্থূল, ঠোঁট পুরু, চোখহুটি ছোট-ছোট। তার 'পাইপ' খাবার ভারি সখ, কিন্তু কিছুতেই পাইপটিকে ঠোঁটের মধ্যে বাগিয়ে ধর্‌তে পারেনা। দাঁতের মধ্যে প্রাণপণে পাইপ চাপ্‌তে গিয়ে তার মুখ হয় বেজায় গম্ভীর আর কপালের শিরগুলো ফুলে ওঠে। মনে হয় তার যেন ভারি কষ্ট হচ্ছে। পাইপ টেনে ধোঁয়া বার করা এবং যাতে সেটি ঠোঁট ফসকে পোড়ে না যায় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকাটাই যেন তার জাগ্রত মুহূর্ত্তের একমাত্র লক্ষ্য।

'মাথাবও' হাত দিয়ে ঠোঁটের মাঝ থেকে পাইপটি বার কোরে নিলে। পরেশ অরুণের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করছিল। ফণী সেই দিকে ফিরে বল্লে, Order!

বিজয়ের দিকে চেয়ে হাসিমুখে পূর্ণ বল্লে, বেশ ধীরে সুস্থে ভালো কোরে বল।

কথা বল্‌তে গেলেই বিজয় ভারি nervous হয়ে পড়ে। তার ঠোঁট হুখানি শুকিয়ে গিয়ে ঠকঠক কোরে কাঁপ্‌তে থাকে।

বিজয় বল্লে, "এখানে আসবার দিন পনেরো আগে

কলকেতার টাউন-হলে ইণ্ডা ষ্ট্রিয়াল এসোসিয়েসন্ আমাদের বিদায় দেবার জন্যে একটা ঈভ্নিং পার্টি দিয়েছিলেন। এসোসিয়েসনের সাহায্যে যাঁরা বিদেশ যাবেন, তাঁরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতও ছিলেন, তার মধ্যে কয়েকজন মহিলা। যাঁদের বিদায় দেবার জন্যে এই পার্টির আয়োজন, তাঁরা সবাই সেদিন সাহেবি পোষাক পোরে এসেছিলেন। আমিও তাই।"

ফণী বাধা দিয়ে বল্লে, "ওঃ মনে আছে তো 'মাথাবও'! কলারের ওপর দড়ির মত একটা গাঁট বেঁধে নেকটাই পরেছিলে! শেষে আমি তোমায় পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তবে ঠিক কোরে দিই! বা-আ-বা! সে গাঁট কি সহজে খোলা যায়!"

সকলে হেসে উঠ্লো। কেবল পূর্ণ অনেক কষ্টে হাসি সাম্লালে। বিজয় একবার তার দিকে করুণ চোখে তাকালে। পূর্ণ বল্লে, "আঃ, বাধা দিয়ো না, বল্তে দাও। হ্যাঁ, তারপর?"

বিজয় বল্তে লাগলো, "ডেইসের ওপর এক বাঙালী ওস্তাদ বিকট মুখভঙ্গী কোরে গলায় পাঁয়তারা কশ্ছিলেন। আমি যেখানে বসে ছিলুম তার কাছেই সোফায় একটি মেয়ে বসে। বয়স বছর সতেরো কি আঠারো। কাঁধের দুপাশ দিয়ে অন্ধকারের মত কালো চুলের দুটি বিনুনি ঝুলছে……"

ফণী বলে উঠলো, "আহা! গলায় দিয়ে মর্তে পারোনি!"

বিজয় বল্লে, "অমন সুশ্রী চেহারা জন্মে দেখিনি। তেমনি কি পোষাকটি গায়ে মানিয়েছে! দেখ্লে চোখ জুড়িয়ে যায়। সবুজ ঘাসের রঙের একখানি সাড়ি, তার সোনার পাড় আর আঁচলা আলোয় ঝল্মল করছে। জামাটিও সেই কাপড়ের। তার আস্তিনটি কনুইয়ের ওপর পর্য্যন্ত পৌঁছেচে। বাঁ হাতের কব্জিতে একটি ছোট সোনার রিষ্ট্-ওয়াচ্, যেন একখানি পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প্। ডান হাতে একগাছি ব্রেস্লেট। গলায় চুলের মত সরু চেন-হার চিক্‌মিক্ কর্ছে। আর সাড়ির সোনালি পাড় আর পায়ের কালো বার্নিস জুতোর মাঝে খালি পায়ের খানিকটা দেখাচ্ছে যেন গোলাপী মোমের তৈরি……"

ফণী বল্লে, "আর কানে কি ছিল, বল্লে না?"

বিজয় বল্লে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কানে দুটি লাল চুণির বিন্দু।"

ফণী বল্লে, "যেন তোমার বুকের রক্ত!"

সবাই হেসে উঠ্লো।

বিজয় বল্লে, "মেয়েটি তার পাশের গিন্নির সঙ্গে চাপাসুরে কথা কইছিল। মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু হাস্ছিল। তার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার বুকের মাঝখানটা কেমন যেন কর্তে লাগলো। ওস্তাদ যে অত চেঁচাচ্ছে তা কানেই গেলনা। চারিদিকে অত যে লোকজন যেন সব উবে গেল, মনে হল যেন কেউ কোথাও নেই। কেবল দুটি প্রাণী, আমি আর সে! এমনি কোরে কতক্ষণ কাটবার পর জলযোগের ডাক এল। পাশের ঘরে আমরা উঠে গেলুম।"

ফণী বল্লে, "উঠে গিয়ে মনে আছে তুমি রাংতাসুদ্ধ চকোলেট মুখে পুরে দিয়েছিলে? ভাগ্যিস আমি ছিলুম, নইলে একটা poisoning case হয়েছিল আর কি!"

পরেশ ফণীর দিকে চেয়ে বল্লে, "সেই কোন্ সাহেবের নারকোল খাওয়ার মত, না? সেই যে ছোবড়া চিবুচ্ছিল!"

বিজয় বল্লে, "একটা আইস্ক্রিম খাচ্ছি, হঠাৎ পিঠে এক থাপ্পড়। চেয়ে দেখি, পরিতোষ। কলেজে কিছুকাল তার সঙ্গে পড়েছিলুম। তারপর বছর দুই আর দেখা নেই। সে বল্লে, কিহে চিন্তে পার? আমি বল্লুম, খুব পারি। তারপর তার সঙ্গে নানা গল্প সুরু হল। কলেজে সে আমাকে বিশেষ আমল দিতনা, কিন্তু সেদিন, সম্ভবত আমি বিদেশ যাচ্ছি দেখে আমার ওপর তার একটু শ্রদ্ধা হয়েছিল। এই চিন্তায় মনে-মনে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব কর্লুম।

"পার্টির শেষে, রাত প্রায় ন'টায় সিঁড়ির কাছে এগিয়ে দেখি, পরিতোষ সেই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে কথা কইছে। বয়স্থা গিন্নিটিও দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পরিতোষের সৌভাগ্যে তার ওপর হিংসা হতে লাগ্লো। ভাবছি এগুবো কি পেছুবো এমন সময় হঠাৎ আমায় দেখ্তে পেয়ে পরিতোষ বল্লে, এস। তারপর বয়স্থা মহিলাটিকে বল্লে, মা! ইনি বিজয় বাবু। আমরা একসঙ্গে কলেজে

পড়েছি। ইনি জাপান যাচ্ছেন। তারপর মেয়েটির দিকে দেখিয়ে বল্লে, আমার বোন ছায়া। মেয়েটি আমার দিকে ফিরে হাত তুলে নমস্কার করলে। আমি যে কি করবো বা বলবো ভেবেই পেলুম না। থতমত খেয়ে প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গেলুম। অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলবো, তা আবার যেমন তেমন মেয়ে নয়—এ যে স্বপ্নের অগোচর ছিল! যাই হোক পরিতোষের মা আমায় উদ্ধার করলেন। তিনি বল্লেন, একদিন এসো আমাদের ওখানে। পরিতোষ বল্লে, ঠিকানাটা লিখে নাও, ১৭ আমহার্ষ্ট রো। শনিবার বিকেলে এসো, আমরা বাড়ী থাকবো।

"সেদিন মেসে পৌঁছে মনে হল, এতদিন বৃথাই জীবন ধারণ করেছি। আজ জীবন সার্থক হোল। ছেলেবেলা থেকে শিক্ষিত মেয়েদের অনেক বিদ্রূপ কোরে এসেছি। তাদের বেহ্ম বলেছি, খৃষ্টান বলেছি, বেহায়া বলেছি। সে-সব কথা মনে পোড়ে নিজের ওপর ভারি ঘৃণা হল। শিক্ষিত স্বাধীন মেয়ে যে কত মধুর, কত সুন্দর, আজ তা প্রথম টের পেলুম।

"রাত্রে ঘুমের মাঝে সেদিন এলোমেলো কত স্বপ্নই দেখলুম! সব স্বপ্নেই ছায়া আসা-যাওয়া করছে! তার মধ্যে একটা স্বপ্ন এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। যেন জাহাজে কোরে চলেছি। রাত্রে ডেকের ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর ডেকের ওপর উঠে বেড়াতে বেড়াতে খানিকটা এগিয়ে দেখি, রেলিং ধোরে সেই সবুজ ঘাসের রঙের সাড়িখানি পরে ছায়া দাঁড়িয়ে। আমি তো অবাক। বল্লুম, এ কি! আপনি যে এখানে! ছায়া কিছু বল্লে না, আমার দিকে ফিরে একটু হাসলে। জাহাজ চলতে লাগলো, আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে তার চাঁদের-আলোমাখা আশ্চর্য্য মুখখানি দেখতে লাগলুম! ঝোড়ো হাওয়ায় কয়েকগাছি চুল তার মুখের ওপর দুলছে, তার আঁচল উড়ছে, পায়ের ওপরকার সাড়ি সরে সরে গিয়ে তার গোলাপী-রঙের পা দুখানি খানিকটা বেশী কোরে দেখতে পাচ্ছি!

"হঠাৎ একটা গোলমাল শুনতে পেলুম। অবাক হয়ে ভাবছি ব্যাপার কি, এমন সময় দমাশ কোরে একটা শব্দ হোল। চমকে চোখ মেলে দেখি, ঘরে রোদ এসে পড়েছে। আর বাইরে থেকে খবরের কাগজওলা চ্যাঁচাচ্ছে, বাবু উঠুন না। আমার পয়সাটা দেবেন? নীচের তলা থেকে বামুন আর ঝির কোঁদলের তুমুল আওয়াজ আসছে। বিছানায় উঠে বসে ভাবলুম ছায়া নামে সত্যি কেউ আছে, না, সে কেবল স্বপ্নেই এসেছিল? অমনি গত সন্ধ্যার কথা সব মনে পড়লো।

"কটা দিন যেন একটা যুগ! কাটতে আর চায়না! অবশেষে শনিবার এসে পৌঁছুলো। বেলা তিনটে থেকেই সাহেব সাজতে আরম্ভ করলুম। কলার-নেকটাইয়ের সঙ্গে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর গলদঘর্ম্ম অবস্থায় বেলা পাঁচটায় বার হয়ে পড়লুম। ভাড়াটে গাড়ীর মধ্যে বসে বুকটা গুরু গুরু করতে লাগলো। ছায়ার সঙ্গে আজ বেশ করে আলাপ করতে হবে! সেদিনকার মত জড়ভরত হলে চলবে না! আমি যে একটা খেলো লোক নই, তা আমার কথাবার্ত্তায় ব্যবহারে ভালো কোরে বুঝিয়ে দিতে হবে! এমনিধারা অনেক রকম সংকল্প কোরে ভারি একটা সুখের উদ্বেগ নিয়ে তাদের বাড়ী গিয়ে পৌঁছুলুম।

"ছায়ার মা বল্লেন, এসো। তা এত গরমে আবার এগুলো চাপিয়ে এসেছ কেন? ভাবলুম, ছি! ছি! এ বুদ্ধি আমার হলো না! বাস্তবিকই এগুলো পরে যেন কেমন খাপছাড়া মত বোধ হচ্ছে! মনে হল, ছায়াও যেন আমার অদ্ভুত পোষাক দেখে মুখ টিপে-টিপে হাসছে। অমনি সাহেব সাজার গৌরব এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মনে হল এত সৌন্দর্য্যের মাঝে আমি যেন একটা সঙ!

"বেহারা এসে একটি ছোট তেপায়ার ওপর চায়ের সরঞ্জামশুদ্ধ ট্রেখানি রেখে গেল। কত গল্প করবো ভেবে এসেছিলুম কিন্তু কার্য্যকালে গলা যেন বন্ধ হয়ে গেল। আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। ছায়ার মা আর পরিতোষই এটা সেটা জিজ্ঞাসা কোরে কথা চালাচ্ছিলেন। ছায়া যখন চা তৈরি কোরে এগিয়ে এসে আমার হাতে পেয়ালাটা দিচ্ছেন তখন আমার হাতখানা এমনি কেঁপে গেল যে বাটিটা পড়ে যায় আর কি। তারপর তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, দেখুন

তো চায়ে আরো চিনি লাগবে কিনা, তখন ভেবড়ে গিয়ে এক ঢোকে অনেকখানি গরম চা মুখে পুরে না পারি ফেল্‌তে না পারি গিল্‌তে! অনেক কষ্টে ঢোক গিলে বল্লুম, নাঃ, ঠিক হয়েছে।

"সন্ধ্যা হয়ে এল। ছায়ার মা বল্লেন, ছায়া! বিজয়কে একটা গান শোনাও মা! সে গান আজও কানে বাজছে—

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী!
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা ;—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন-বিহারী!

"মানুষের কণ্ঠে অমন সুর! আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। ছেলেবেলা থেকে গুরুজনদের কাছে শুনে এসেছি গানবাজনা অতি বদ্ জিনিস। যত সব বয়াটে-ছেলের কাজ। আর ভদ্র মেয়েদের গান গাওয়া—সে তো কখনো ভাবতেই পারিনি!

"গানের সুর যেন আমার মনের ওপর রঙিন আল্‌পনা এঁকে দিলে। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে দেখি অনেকখানি আকাশ সিঁদুরের মত হয়ে উঠেছে। সেখানে কেবলই রং বদ্‌লাচ্ছে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হোলো যেন সন্ধ্যার সব সৌন্দর্য্য ছায়ার কণ্ঠে ছায়ার অঙ্গে ফুটে উঠেচে! মনের মাঝে এমন একটা মাত্‌লামি এল যা ঠিক বোঝাতে পার্‌বো না। তার কণ্ঠ, তার রূপ, আসন্ন সন্ধ্যার অপরূপ আকাশ সব মিলে মিশে আমায় যেন পাগল কোরে তুল্লে!

"গান থাম্‌লে ছায়ার মা উঠে গেলেন। পরিতোষ আমার জন্যে গাড়ি ডাকবার ব্যবস্থা করতে নীচে নেমে গেল। ঘরে আমি আর ছায়া। সে আমার খুব কাছেই বোসে ছিল। নির্জ্জন অন্ধকার ঘরে তার নিশ্বাসের শব্দটি পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখের ওপর যেন তার নিশ্বাসের বাতাস এসে পড়্‌ছে। হঠাৎ একতলায় পরিতোষের চটির শব্দ হোল। সে ফিরে আস্‌চে। আমার যে কি হোলো নিজেই

ছায়া আমি তোমায় ভালোবাসি! ছায়া চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো। একটানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমার পানে ফিরে বল্লে, আপনি না ভদ্রলোক! কখনো ভদ্রমেয়ের সঙ্গে মেশেন নি বুঝি! তার চোখ দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছিল।

"তখন আমার জ্ঞান হোলো। সেই মুহূর্ত্তে পরিতোষ ঘরে ঢুকে বল্লে, একি! ভূতের মত অন্ধকারে বসে কেন? বলে ইলেক্‌ট্রিকের সুইচ্ টিপে দিলে।

"আসবার সময় ছায়ার কাছে ক্ষমাও চাওয়া হলনা। সে দিন থেকে ধিক্কারে মন ভরে আছে।"

বিজয় থাম্‌লো। পাইপটা ঠোঁটের মধ্যে চেপে ধরে দেশালাই জ্বাল্‌লে।

ফণী বল্লে, "Rom ntic, although a bit tragic! যাই হোক আর আমি তোমাকে 'মাথাবও' বল্‌বো না। তোমাকে আমি নেহাৎ নীরস কাঠখোট্টা বলে জান্‌তুম হে! দেখচি তুমিও রোমান্সের স্বাদ পেয়েছ!"

অরুণ ঘড়ির দিকে চাইলে।

ক্ষণকাল সকলে স্তব্ধ হয়ে রইলো। কাঠের বাড়ী ঝড়ের দাপটে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগ্‌লো। নির্ব্বাণোন্মুখ ষ্টোভের মধ্যে ফণী এক চুবড়ি কয়লা ফেলে দিলে।

পূর্ণ বল্লে, "এবার ফণীর পালা। কেবল তো বাজে বক্‌ছো!"

ফণী সব কাজেই তৎপর। কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই আরম্ভ করলে, "বয়েস আমার তখন হদ্দ আট কি দশ, তখন একবার প্রেমে পড়েছিলুম। যদিও সে মনোভাবটাকে যে প্রেম বলে তখন তা জান্‌তুম না। পরে বুঝেচি।

"কাশীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে বাবা মা আর সম্ভবত দিদি। যাঁদের বাড়ীতে উঠেছিলুম, সে বাড়ীর কর্ত্তা ন্যায়ালঙ্কার কি তর্কালঙ্কার অমনি একটা কিছু—একজন নামজাদা সংস্কৃত পণ্ডিত। তাঁদের বাড়ীটা ছিল বাঙালীটোলায়, ঠিকানাটা একদম ভুলে গেছি। মনে আছে কেবল অগস্ত্যকুণ্ড। কদিন ছিলুম বল্‌তে পারবো না, তবে হপ্তা

"যে-মেয়েটির কথা বল্‌ছি তিনি সে বাড়ীর বৌ কি মেয়ে তা এতকাল পরে বলা শক্ত, সম্ভবত বৌ। বয়স মনে হয় কুড়ির মধ্যে। তিনি আমায় বড় যত্ন করতেন। কাছে বসে খাওয়াতেন, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, পাখার বাতাস কর্‌তেন, কত গল্প বল্‌তেন। যতক্ষণ বাড়ী থাক্‌তুম, ছায়ার মত আমি তাঁর পিছু পিছু ঘুর্‌তুম।

"তাঁকে আমার যে কী ভালো লেগেছিল বল্‌তে পারিনা! বাড়ীর সবাইকে যেমন ভালোবাসি তাঁকে যেন তার চেয়ে একটু পৃথক রকম ভালোবাস্‌তুম। মনে হোত তাঁর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি, সাধ হোত তিনি আমায় নিজের হাতে খাইয়ে দিন, আমার গলাটা জড়িয়ে বুকের ওপর টেনে নিন, সারাক্ষণ আমার কাছে কাছে থাকুন!

"যে ক'দিন তাঁর কাছে ছিলুম তিনি আমায় কি বলেছিলেন বা না বলেছিলেন কিছুই মনে নেই, কিন্তু কী অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সেই দিনগুলি কেটেছিল তা এখনো যেন অনুভব কর্‌তে পারি!

"বিদায়ের দিন কান্নায় আমায় বুক ভরে উঠেছিল। অনেক কথা বল্‌বার সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিলনা। ছোট ছেলের মনের কথা সে কি কখনো গুছিয়ে বলতে পারে!

"বাড়ী ফিরে আর কিছুই ভালো লাগ্‌লো না। কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেক্‌তে লাগ্‌লো—সবই আছে অথচ কি যেন নেই! কতদিন ভেবেছি তাঁকে একখানা চিঠি লিখি, বলি, তাঁকে ছেড়ে এসে আমার কত কষ্ট। কিন্তু চিঠি একখানাও লিখেছিলুম কিনা তা আজ আর মনে নেই। মাঝে মাঝে ভাবতুম, তাঁর জন্যে আমার মন যেমন ব্যাকুল হয়েছে, তাঁরও কি আমার জন্যে তেমনি মন কেমন করে! কখনো বা মনে হোত কোনো রকমে কি আর-একবার কাশী গিয়ে তাঁকে দেখে আসা যায়না! কিন্তু কে নিয়ে যাবে? রেলে চড়ে কতবার কত জায়গায় গাড়ি বদলিয়ে কতদূর গিয়ে তবে কাশী! আমি ছেলেমানুষ, পারবো কেন! রেলভাড়াই কত লাগে, কে জানে! আমার পকেটে এক আনা, বড় জোর দু'আনা পয়সা। তাও বিশেষ দরকার হলে চুপিচুপি মার কাছে সব চেয়ে মুস্কিল এই, তারা যখন জিজ্ঞেস কর্‌বে কেন কাশী যেতে চাই, তখন কি বল্‌বো! কেন, তা যে বুঝিয়ে বল্‌তেই পার্‌বো না!

"এমনি সব ভাবনায় মনটা গুলিয়ে উঠ্‌তো। বুকের মাঝে কেবলই কান্না জমা হোত! বাড়ীতে কাঁদ্‌বার জো নেই, পাছে কেউ জিজ্ঞাসা করে, কাঁদি কেন! তাই ইস্কুল যাওয়া-আসার নির্জ্জন পথে আমবাগানে গাছের তলায় বসে বসে কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছ্‌তুম। ভারি অভিমান হোত তাঁর ওপর। কেন তিনি আমায় এমন করে কাঁদান? কেন কাঁদান? একখানা চিঠিও দিতে পারেন না কি?

"বহুদিন পরে আজ মনে ভাবি, তিনি যখন দু'দিনের অতিথ্ ছোট ছেলেটিকে কাছে টেনে আদর কর্‌তেন তখন কি জান্‌তেন সেই আদর তার ছোট হৃদয়টিকে কেমন কোরে মথিত কর্‌বে! এখন মনে হয় সেই আমার প্রথম প্রেম যেন কোন্ আদিম বিস্মৃত যুগের ঘটনা—তা যেন একটা স্বপ্ন, যা মোটেই ঘটেনি!

"তারপর জীবনের পথে কত লোকের আনাগোনা হোলো। কত সুখ-দুঃখ, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কত অবসাদ ও উদ্দীপনা—কিছুই মনের মাঝে ছাপ রাখ্‌তে পারেনি। কিন্তু যার চোখের চাহনি, গতির ছন্দ, গায়ের রং, পায়ের গড়ন কিছুই মনে নেই; যার নাম-ঠিকানার খেই হারিয়েছি; সেই আমার শৈশবের প্রেয়সীর ঈষৎ একটু অস্পষ্ট স্মৃতি আজও অন্তরকে সুধারসে স্নিগ্ধ করে।"

অরুণ বল্লে, "বাঃ, ভারি সুন্দর!" এই প্রথম অরুণ কথা কইলে।

পরেশ একবার অরুণের পানে চাইলে। তার আয়ত স্নিগ্ধ চোখদুটি ছলছল কর্‌ছে। পরেশ বয়সে সকলের ছোট। তার মুখে এমন একটি কমনীয় শ্রী আছে যা অতি সহজেই দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রিয়দর্শন যুবক অরুণের একান্ত অনুগত। উভয়েই ভাবপ্রবণ ও চিন্তাশীল, পাঠে উভয়েরই অদ্ভুত অনুরাগ। এই দুটি মানুষের সখ্য গভীর ও অকৃত্রিম। পরেশ সকলকেই নাম ধরে ডাকে, অরুণকে কেবল দাদা বলে।

পাইপটা বার করে বল্লে, "বলহে পরেশ, এইবার বল।"

পরেশ অরুণের দিকে একবার চাইলে। অরুণ বল্লে, বল না।

পরেশ আস্তে আস্তে আরম্ভ করলে। মনে হোলো যেন একটা গল্প পড়ে শোনাচ্ছে।

"উনিশ বছর বয়সে পুরুষের মন চড়াসুরে-বাঁধা তারের যন্ত্রের মত, ঈষৎ আঘাতেই ঝনঝন কোরে বেজে ওঠে। প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হয় যেন একটা আরব্য উপন্যাসের মত অপূর্ব্ব রোমান্টিক ব্যাপার ঘট্‌লো বলে। মন যেন সদাই কি এক অঘটনের আশায় উৎসুক হয়ে থাকে, অথচ সেটি যে ঠিক কি,তার নির্দ্দিষ্ট কোনো ধারণা থাকেনা। তখন আকাশে বাতাসে জলেস্থলে সর্ব্বত্র যেন সোনার মায়া ছড়ানো থাকে!

"আমারো তখন উনিশ বছর বয়স! গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ। য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেছে। হাতে কাজ নেই, অবসর প্রচুর। সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে মুক্ত আকাশের তলে ঘাসের ওপর বোসে দখিনা বাতাসে মনের লাগাম ছেড়ে দি, কল্পলোকের পুষ্পাস্তীর্ণ পথে সে যাত্রা করে! সেখানে কত কিন্নরীর সঙ্গীত, কত অপ্সরার লাস্যলীলা, দৈত্যপুরীতে কত ঘুমন্ত রূপসী রাজনন্দিনী! সেই সময়ের কথা বল্‌ছি।

"বিয়ের পর ছোট বোন প্রথম শ্বশুরবাড়ী গেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি তাকে দেখ্‌তে গেলুম। বাগবাজারের ঘিঞ্জি গলির ভিতর বাড়ী খুঁজে নিতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল।

"সরু খোলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডানহাতি একটা ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। খাটের ওপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ এক ব্যক্তি গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। বয়স পঞ্চাশ না হলেও তার আর বিলম্ব নেই। তিনি আমার পরিচয় শুনে বল্লেন, ওহো! তুমি তো আমাদের বড় কুটুম! বলে একটু গ্রাম্য রসিকতার চেষ্টা করলেন।

জন্যে, আখেরে দেখা যায় তারা লোক সুবিধার নয়। এটি জীবনে অনেকবার লক্ষ্য করেছি। সেই কুদর্শন মাংসবহুল লোকটিকে দেখে এবং তার প্রথম কয়েকটি কথা শুনেই মন তিক্ত হয়ে উঠ্‌লো। প্রথম পরিচয়েই রসিকতার চেষ্টায় তার যে অভব্যতা প্রকাশ পেল তাতে আর তার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি হলনা। অথচ লোকটি যে কে এবং এ বাড়ীতে তার কি সম্বন্ধ তাও আন্দাজ কর্‌তে পার্‌লুম না। আমাকে উদ্ধার করলেন আমার ভগ্নীপতি। তিনি এসে বল্লেন, চলহে পরেশ, ছাতের ওপর চল।

"ছাতে উঠে কানে শুন্‌লুম, এস ভাই এস। আর চোখে দেখ্‌লুম যিনি এ কথা বল্লেন তাঁকে। অমনি চড়াসুরে-বাঁধা আমার অন্তরের তারগুলো উদ্দাম ছন্দে ঝনঝন কোরে বেজে উঠ্‌লো। মনে হোলো, এই তো পেয়েছি! এরি জন্যে তো উনিশ বছর অপেক্ষা করেছি, আজ গোধূলি-লগ্নে যার দেখা পেলুম!

"তার পরনে একখানি বাসন্তী রঙের সাড়ি। হাতে দুগাছি সরু সোনার বালা। বাঁহাতে একরাশ কালো চুল, ডানহাতে একখানি লাল চিরুণি। সিঁথির মাঝে ঈষৎ একটু সিঁদুরের রেখা। সুদীর্ঘ চোখদুটি স্নিগ্ধ করুণ—কুরঙ্গের মত। তার সারা অঙ্গে উদ্বেলিত যৌবন-শ্রী, যেন জোয়ারের নদী! আলতায় রাঙা পা দুখানি যেন লক্ষ্মীর চরণ! সেই আসন্ন সন্ধ্যায় তাকে যে কেমন দেখেছিলুম বলা শক্ত। 'সঞ্চারিণী দীপশিখার মত' বল্লে বোধ করি খানিকটা বলা হয়।

"আমি যেন কতকালের আত্মীয় এমনি অসঙ্কোচে সে আমাকে মাদুরখানা দেখিয়ে বল্লে, বসো। তারপর আমার বোন এল, তার শাশুড়ি এল। গল্প বেশ জমে উঠ্‌লো।

"বাড়ী ফের্‌বার জন্যে বিদায় নিয়ে যখন উঠ্‌লুম তখন গিন্নী বল্লেন, শান্তি-মা নীচে আলোটা দেখিয়ে এস। সিঁড়ি বেয়ে দুজনে নীচে নাম্‌লুম। বাড়ীর বার হবার সময় শান্তি জিজ্ঞাসা করলে, আবার কবে আস্‌বে? যেন

"ইচ্ছা হোলো, বলি, কাল। মুখে বল্লুম, সময় পেলেই আস্‌বো। ঘনঘন এলে আবার বিরক্ত হবেন!

"শান্তি বল্লে, তা একটু বিরক্ত করো।

"শুনে আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠ্‌লো।

"পথে বার হয়ে মনে হোলো, আমি যেন আর আমি নই! যেন আমার পুনর্জন্ম হয়েছে! আজ যা ঘট্‌লো তার তুলনায় এতদিন যা কিছু ঘটেছে সবই যেন নিতান্ত তুচ্ছ, অতি সাধারণ! বাগবাজারের একটা ঘিঞ্জি গলির মধ্যে সামান্য একখানা ভাড়াটে বাড়ীতে এমন রত্নও থাকে! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্যই বা কেন, জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নয়!

"সেদিন থেকে আমার এক চিন্তা এক ধ্যান হোলো—শান্তি। কেবলই দিন গুনি, কবে তাকে দেখ্‌তে পাবো। তাদের বাড়ী থেকে বার হয়েই মনে হয়, এখনি যদি কোনো মায়ামন্ত্রে মাঝের কটা দিন লুপ্ত হয়ে গিয়ে আমার এখানে আসার দিনটি নিমেষে এসে পড়ে তাহলে এখনি আবার শান্তিকে দেখ্‌তে পাই! যতক্ষণ তার কাছে না থাকি কেবলই মনে হয় অমূল্য সময় বৃথায় গেল, নষ্ট হোলো।

"আমাদের ছাতের ওপরের সভায় কোনো কোনো দিন কেবল আমরা দুজনেই থাকি। এমন দিনে গল্পের মাঝে হঠাৎ যখন দুজনেই স্তব্ধ হয়ে পড়ি, মাথার ওপর স্বচ্ছ নীল আকাশ অযুত গ্রহ-তারকায় দীপ্তিমান, দক্ষিণ পবনে যখন তার মুক্ত কেশ আন্দোলিত হ'তে থাকে, তার আঁচলের একটি অংশ উড়ে এসে আমার গায়ে পড়ে, তখন তার ভাবনা যে কি, তা জান্‌বার জন্য ভারি ইচ্ছা হয়। মনে মনে কল্পনা করতে ভালো লাগে, সে আমারই কথা ভাব্‌ছে। হঠাৎ এক সময় তার চোখের পানে চেয়ে দেখি তার চোখদুটি ভারি উদাস আর করুণ হয়ে উঠেছে, যেন এখনি তা থেকে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়্‌বে। ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা করি কি তার ভাবনা, কিসের তার দুঃখ, কিন্তু কেমন যেন বাধবাধ ঠেকে। একটু একটু করে সংগ্রহ করলুম। ঐ যে অথর্ব্ব মোটা লোকটি উনিই শান্তির পাণিগ্রহণ করেছেন যদিও তাঁর প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র শান্তির চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। বিনাপণে বিবাহ, তাই শান্তির বাবা এত সহজে কন্যাদায় হতে নিষ্কৃতি পাবার আনন্দে আর কিছু ভাব্‌বার অবসর পাননি। বিপত্নীক বনমালী বাবু ডাগর মেয়ে খুঁজ্‌ছিলেন এবং শান্তির পিতা অর্থাভাববশত কন্যার বিবাহ দিতে না পারায় শান্তি সতেরো পার হয়ে আঠারোয় পা দিয়েছিল। ফলে সমাজে আর তাঁর নাকি মুখ দেখাবার জো ছিলনা! বিয়ের পর প্রকাশ পেয়েছে, বরের হৃদ্‌রোগ আছে, তাই তিনি অষ্টপ্রহর শুয়েই থাকেন। চিকিৎসা উপলক্ষে সেই যে এ বাড়ীতে ঢুকেছেন তারপর আর বার হননি। শান্তির সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র ঘনিষ্ঠতা ঘটেনি। সে তাঁর আহারের ব্যবস্থা, তামাকের ব্যবস্থা করেই খালাস—তার কুমারী-জীবন অব্যাহতই আছে। বনমালীর সঙ্গে শান্তির বিয়ে! ভাব্‌লে হাস্‌বো কি কাঁদ্‌বো ঠিক করতে পারিনা। ঘুরে ফিরে ইংরেজি বচনটা মনে পড়ে—Beauty and the Beast!

"তখন পার্টিশনের পর স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়েছে। বৈকালে পান্তির মাঠে প্রায় রোজই বড় বড় সভা বসে। একদিন শান্তি বল্লে, তুমি এসে পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে জগতে বাস করছি! এতদিন খাঁচার পাখীর মত দুটি ছুটি চালছোলা পেয়েছি, আর কিছু নয়! শুনতে পাই মেয়েমানুষের নাকি তাই যথেষ্ট, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য জানিনা, আমি ঐ টুকুতেই তুষ্ট হ'তে পারিনা। মন জিনিসটা আমার এখনো মরে যায়নি। দানাপানি গরু ঘোড়াও পায়, মানুষ যে আরো কিছু চায়! তুমি আমার সেই অভাব অনেকটা মিটিয়েছ। অষ্টপ্রহর এই খাঁচার মধ্যে কেবল রান্না আর খাওয়া আর ঘুমানো—প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। তুমি যেদিন আস যেন বাইরের খানিকটা হাওয়া সঙ্গে নিয়ে ঢোক, সেদিন জগতের স্পর্শ একটু অনুভব করি! বাংলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মাবার গ্লানি খানিকক্ষণের জন্যেও ভুলে থাকি।

হতে লাগ্‌লো। বিকেলে বাড়ীর বার হলেই কে যেন আমার পাদুটোকে সেইদিকে চালনা করে! শান্তির মার সঙ্গে বা আমার বোনের সঙ্গে দেখা হলে একটা অজুহাত দেবার চেষ্টা করি। বলি, এইদিকে এসেছিলুম একটু কাজে, মনে কর্‌লুম আপনাদের খবর নিয়ে যাই। শান্তি যে কিছুমাত্র বিস্মিত হয় তা বোধ হয় না, আমার ঘনঘন যাতায়ত সে অতি সহজভাবেই গ্রহণ করে।

"একদিন শান্তি বল্লে, এখানে আসবার সময় আমার জন্যে একখানা করে বাংলা কাগজ এনো। আর পার তো মাঝে মাঝে এক আধখানা বাংলা বই দিয়ো। ছেলেবেলায় মিশনারি ইস্কুলে বছর তিনেক জ্ঞানবৃক্ষের ফলের একটু স্বাদ পেয়ে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে! অল্প-স্বল্প সেলাই শিখেছিলুম, একটা মেশিনের অভাবে আর হয়না; কণ্ঠে সুর ছিল তার কোনো চর্চ্চা হলনা, একটা বাজনার অভাবে; অবোধ প্রাণীর মত দিনে দিনে কেবল বয়সই বেড়ে চলেছে, আর কিছুই হলনা!

"সেদিন রাত্রে মনের মাঝে দুঃখসুখের দ্বন্দ্বে ভালো ঘুম হলনা। শান্তি আমায় একটা কাজের ভার দিয়েছে এই চিন্তায় বড় সুখ হোলো।"

"তার বলবার অপেক্ষায় না থেকে এতদিন একথা আমারই ভাবা উচিত ছিল, এই ভেবে নিজের ওপর যথেষ্ট বিরক্তি হতে লাগ্‌লো। মাঝে মাঝে তার জীবনের দুঃসহ দুঃখের কাহিনী মনে পড়ে অন্তর বেদনার তাপে পীড়িত হয়ে উঠলো। তবুও, আমাকে যে শান্তির একটুও প্রয়োজন আছে সে কথা শান্তির মুখে শুনে সুখাবেশে আমার হৃদয় অধীর হয়ে উঠ্‌লো!"

পরেশ স্তব্ধ হোলো। বোধ করি সে গতদিনের সেই পরম রমণীয় সুখাবেশটি অন্তরে অনুভব কর্‌বার চেষ্টা করছিল। সকলে বল্লে, তারপর? অরুণ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে।

পরেশ আরম্ভ কর্‌লে, "কয়েক মাস থেকেই শিক্ষা-লাভের জন্যে আমার বিদেশ যাত্রার কথা চলছিল। সেই প্রস্তাবটি এইবার পাকাপাকি রকম স্থির হয়ে গেল। পৌষের এক ভরসন্ধ্যায় ধূলিধূমে ধূসর জনাকীর্ণ পথ বেয়ে শান্তিদের বাড়ী গেলুম। ইতিপূর্ব্বে আমার বিদেশ-যাত্রা সম্বন্ধে তাকে কিছুই বলিনি। প্রস্তাবটি যখন প্রথম ওঠে তখন আমারই আগ্রহ ছিল বেশী। এখন কিন্তু মনে হচ্ছিল কোনোগতিকে এই যাত্রাটা বন্ধ হলে বা স্থগিত হলে বাঁচি।

"বাড়ীতে দেখি সকলে শশব্যস্ত। শান্তি বল্লে, আজ আর ভাই বেশিক্ষণ বস্‌তে পার্‌বো না। বনমালী বাবুর অসুখ করেছে।"

"শান্তি অসঙ্কোচে বনমালী বাবুর নাম ধরে। এটি আমি বরাবর লক্ষ্য কোরে আস্‌ছি।"

"দু'এক কথার পর আমি বল্লুম, শীগ্‌গিরই দেশ থেকে বিদায় হচ্ছি, সেই কথা আপনাকে বল্‌তে এলুম।"

"শান্তি বল্লে, তার মানে?"

"আমি বল্লুম, যা মানে ঠিক তাই মানে। অর্থাৎ দিন পনেরো পরে জাহাজে চোড়ে বিদ্যালাভের জন্যে জাপান যাচ্ছি।"

"এক মুহূর্ত্তকাল শান্তি চুপ কোরে রইলো। এত অল্পকাল যে অন্যে বুঝ্‌তে পার্‌তো না। আমি পারলুম। তারপর বল্লে, সে তো বেশ কথা! তুমি বিদ্বান হয়ে আস্‌বে, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর্‌বে, সে তো আমাদের গৌরব!"

"বুকের ওপর কে যেন ঘা মার্‌লে। মনে হোলো, শুধু এই? আর কিছু বল্‌বার নেই?"

"আজ তবে আসি, বোলে উঠ্‌লুম। শান্তি বল্লে, এস। তারপর নীচে সদর দরজার কাছে এসে বল্লে, যাবার আগে তোমার একটা কিছু জিনিস আমায় দিয়ে যেও।"

"আমার ক্ষুব্ধ অন্তর শান্ত হোলো।"

"যাত্রার আয়োজনের মাঝে ডুবে গেলুম। সপরিবারে একদিন পল্লীভবনে যাওয়া হোলো। সেখানে সবাই এমন ভাব দেখাতে লাগ্‌লো যেন এখনি আমি একটা কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠেছি! বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে প্রায়

প্রত্যহই বিদায়-ভোজের নিমন্ত্রণ থাকে। তারপর যাত্রার দুদিন আগে জামার বুক-পকেটে নিজের একখানি ফোটো-গ্রাফ ভরে নিয়ে শান্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

"বাড়ীতে পা দিয়েই শুন্‌লুম কান্নার সোরগোল। শান্তির মা সরব বিলাপ করছেন। এবং কন্যার দুরদৃষ্টের জন্যে বিধাতার কাছে নানা করুণ অভিযোগ করছেন। শুভ্রবেশ রুক্ষকেশ নিরাভরণা শান্তি নীরবে মেঝের ওপর বসে তার চোখের তলায় শুক্‌নো অশ্রুরেখা।"

""ঘরে আর ঢুকলুম না। দোরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম। কাউকে সান্ত্বনার কোনো কথা বল্লুম না। ভণ্ডামি করতে ইচ্ছা হলনা। মনে ভাবছিলুম, যাক্, ভালোই হয়েছে! শান্তির মুক্তি হোলো! কিন্তু শান্তি কাঁদে কার জন্যে? বনমালীর জন্যে, না, নিজের জন্যে?"

"বাড়ী ফিরে এলুম। পকেটের ছবি পকেটেই রইলো! বিদায়ের কালে তার সঙ্গে একটা কথাও হোলোনা!"

পরেশ থাম্‌লো। বাহিরে বিহ্বল বাতাসের প্রবল উচ্ছ্বাস। অন্ধকার ঘরে আগুনের আঁচে রাঙা ষ্টোভের চাপা আলোয় কারো মুখ আর স্পষ্ট দেখা যায়না।

অরুণ উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে পথের পানে চেয়ে দাঁড়ালো।

পরেশ মৃদুকণ্ঠে বল্‌তে আরম্ভ করলে, যেন নিজের মনেই বলছে, কারো শোন্‌বার জন্যে নয়।

"এক বৎসর কেবলই তার কথা ভেবেছি! রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌বার আগে একমনে কামনা করেছি—শান্তি যেন সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে! সকল বিপদ আর দুঃখ থেকে সে যেন রক্ষা পায়! মাঝে মাঝে মনের মধ্যে একটুখানি আশার আলো যে জ্বলেনি তা বলতে পারিনা। হিন্দুমতেও তো বিধবা-বিবাহ হতে পারে!

"তার নিদর্শন আমার কাছে কিছুই নেই। কেবল একবার আমার বোনের চিঠিতে দু'চার ছত্র লিখেছিল, নিতান্ত মামুলি কথা। সেইটুকুই সম্বল। তারপর—" বলে সে থামলো।

জানালার ধার থেকে অরুণ এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে বস্‌লো। সকলে বল্লে, তারপর?

পরেশ বল্লে, "গত মেলে বাবার চিঠি পেলুম। শান্তি পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে!"

বাহিরে হড়কানি সদর দরজার ঘণ্টা টিং-টিং করে বেজে উঠ্‌লো। অরুণ শশব্যস্তে বেরিয়ে গেল। নারীকণ্ঠে জাপানী ভাষায় সন্ধ্যার অভিবাদন শুনে বিজয় বল্লে, "এই দুর্য্যোগে আবার কে এল?"

পূর্ণ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, "অরুণের ভবিষ্যৎ গল্পের নায়িকা!"

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে শ্রেয়ঃপন্থা

Idealismকেই আমি বাংলায় শ্রেয়ঃপন্থা নাম দিয়াছি। সংসারে যা দেখি এবং শুনি, বস্তুজগতে যা অনবরত ঘটিয়া চলিয়াছে, তাকে কল্পনার সামগ্রী করিয়া তোলাই, বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূলকে অন্তরিন্দ্রিয়ের রসায়নাগারে সূক্ষ্ম রূপান্তরিত করাই, এক কথায় মাটির পৃথিবীকে মনের পৃথিবী করিয়া তোলাটাই হইয়াছে শ্রেয়ঃপন্থার কাজ। রূপরসগন্ধস্পর্শের বস্তুলোক হইতে মানবের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে মনোলোকে কান্নার তুচ্ছতাকে একটি সুচিরোজ্জ্বল জ্যোতির্গোলকে মণ্ডিত করিয়া দেখিবার মনোভঙ্গীকেই সাহিত্যে শ্রেয়ঃপন্থা নাম দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেয়ঃপন্থার কল্যাণেই তুচ্ছ এবং সুন্দর, ক্ষুদ্র এবং বৃহতের মিলন ঘটিয়াছে, ইহার কল্যাণেই প্রতিদিন চিরদিনের দিকে অনন্ত অভিসারে ছুটিয়াছে, যা-কিছু সীমাবদ্ধ সীমাহীনতার দিগন্তলীন অনির্দ্দেশ্যতার মধ্যে তা আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে,

অঞ্জন, চির-পরিচিতের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে চির-অপরিচয়ের সুদূরতা, ইহার প্রসাদেই বিশেষ হইয়া ওঠে বিশ্বতোমুখ, বিন্দু আপন বক্ষে বহিয়া আনে ফেনোর্ম্মিরাশির সুগম্ভীর আরাব, ক্ষুদ্র আপন সংকীর্ণ সীমায় প্রকাশ করিয়া তোলে ভূমান্বিত বিরাটের সুবিপুল প্রসার। এই শ্রেয়ঃপন্থার আলোক লইয়াই মানবের হাসি এমন অম্লানোজ্জ্বল হইয়া তার ঠোঁটে ফুটিয়া রহে, তার অশ্রু এমন আশ্চর্য্যরকম করুণ কোমল হইয়া দেখা দেয়, তার চক্ষে নামিয়া আসে নভোনীলের বিস্তার এবং অতলস্পর্শতা, তার বক্ষে বিকশিত হইয়া ওঠে গিরিশৃঙ্গের সমুচ্চ মহিমা, বাজিয়া ওঠে মহাসাগরের তরঙ্গ-গর্জ্জন। এই শ্রেয়ঃপন্থাই ব্যক্তিগত স্নেহপ্রেম ও সুখদুঃখকে সর্ব্বজনের রাজ্যে তুলিয়া ধরে, একলার জিনিষকে সমগ্রের করিয়া দেয়, লোকালয়ের বিচিত্র জীবন-ব্যাপারের মধ্যে লোকাতীতের অস্ফুট লীলা ফলাইয়া তোলে। এই শ্রেয়ঃপন্থারই আলো-গানে প্রকৃতি এমন স্নিগ্ধ-শ্যামল, এমন অনন্ত-যৌবনা, ইহারি পরিব্যাপ্ত পুণ্যাভিসিঞ্চনে আকাশ এমন সুনীল ও সুচিরোজ্জ্বল, ইহারই স্পর্শ পরিবহন করিয়া বাতাস এমন পুলকদায়ী, এমন হৃদয়াভিরাম। ইহারই আলোককে লক্ষ্য করিয়াই কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিখিয়াছিলেন—"The light that never was on land or sea."

আমাদের বস্তুজাবন কত খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ! কতদিক দিয়া তাহা নগ্ন এবং কদর্য্য, কত তুচ্ছ সাময়িকতার তট-বন্ধনের মধ্যে তাহা বিচিত্র আলোড়নে আবিল হইয়া চলিয়াছে। এই সংকীর্ণতার মধ্যে সুমহৎ সুখের সম্ভাবনা যেমন অল্প, সুমহৎ দুঃখের সম্ভাবনাও তেমনি। ইহাতে মিলনের সুখ আছে, কিন্তু ক্ষণিক সম্ভোগেই তা বিলীন হইয়া যায়; ইহাতে বিচ্ছেদের দুঃখ রহিয়াছে, কিন্তু দু'চারিটা হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাসেই তার অপমৃত্যু ঘটে; ইহাতে দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, কিন্তু দারিদ্র্যের সুবিরাট দুঃখ ও ঐশ্বর্য্যের সুবিপুল গৌরবের চেয়ে এখানে বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে একের কুৎসিত জীর্ণচীর ভিক্ষাপুষ্ট শীর্ণতা এবং অন্যের ততোধিক কুৎসিত রেশম-রত্ন-খচিত অনায়াস স্থূলতা। এই বস্তুজীবন ক্ষুদ্র কর্ম্মপ্রবাহে নিয়ত চঞ্চল,—যে ভাবস্থিরতার মধ্যে সৌন্দর্য্যের স্বর্ণপদ্ম স্ফুট মহিমায় বিকশিত হইয়া ওঠে, তার লেশমাত্র অবকাশ ইহাতে নাই, আবার যে প্রচণ্ডতার মধ্যে দুর্দ্দম শক্তির লীলা প্রকট হইয়া ওঠে এই চপল সফরী-নৃত্যের মধ্যে তারই বা অবসর কোথায়!

কিন্তু এই যে আমাদের ক্ষুদ্র অপরিণত বস্তুজীবন, তা কত বড় একটা অর্থহীন ব্যর্থতায় পরিণত হইয়া যাইত যদি না তার গায় গায় লাগিয়া থাকিত একটা পরিণত জীবনের আভাস! এই যে খণ্ডিত তা কত বড় একটা নিরানন্দ মৃতভাবের মত আমাদের উপর চাপিয়া থাকিত যদি না তাহাকে মণ্ডিত করিয়া তুলিত এক অখণ্ডের ছায়াস্ফুট মহিমা! এই যে পরম, এই যে সম্পূর্ণ, পদে পদে তার প্রতিভাস না পাইলে কে এই জীবনকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিত দিন হইতে দিনে, যুগ হইতে যুগে! প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার গায় পূর্ণিমার চাঁদের ছায়াভাসের ন্যায় এই যে অংশ গায় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে পরিপূর্ণতার গোলক-ছায়া তাই নিয়া হইয়াছে প্রকৃত সাহিত্যের কারবার। এই অপরিস্ফুটকে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই হইয়াছে প্রত্যেক চারুশিল্পীর কাজ। এই ছায়াস্ফুট অসীমতাই চিত্রকরের তুলিকাসম্পাতে, ভাস্করের বাটালির ঘায়ে ঘায়ে, কবির লেখনীর মুখে দেশে দেশে নানারূপ লাভ করিয়া আসিতেছে, পাইতেছে একটা "local habitation and a name." অপূর্ণের পূর্ণতার দিকে অভিযান পথে পদে পদে এই যে রসের লীলা তাকে চারুকলায় ফলাইয়া তুলিতে পারে যে শিল্পভঙ্গী তাকেই বলে শ্রেয়ঃপন্থা। এইজন্য শ্রেয়ঃপন্থাই হইয়াছে সমস্ত চারুকলার সব চেয়ে বড় এবং পরিব্যাপক শিল্পরীতি।

কিন্তু আমাদের এই বস্তুজীবন খণ্ডিত অসম্পূর্ণ বলিয়া কোনো শিল্পী তাকে অবহেলা করিতে পারেন না। এই বস্তুজীবনকেই তাঁকে তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, এই বস্তুলোকই জোগায় শিল্পের উপাদান-সমষ্টি, তাকে নাড়িয়া চাড়িয়া বিভিন্ন মিশ্রণে মিশাইয়া বিভিন্ন ভাবে সাজাইয়া তবে ভিতর হইতে শিল্পীকে বিচ্ছুরিত করিয়া দিতে হয় এক ধ্রুবলোকের দ্যুতি; এই বস্তুজীবনেই পাওয়া যায় শিল্পের কাঠাম, যার উপর শিল্পীকে আঁকিয়া তুলিতে হয় বিচিত্র

সৌন্দর্য্যের ছবি। এই বস্তুকে লইয়াই শিল্পীকে যাত্রা করিতে হয় যদিও তাঁর শিল্পপ্রয়াণ হইয়াছে অবস্তুর দিকে, এই রূপকে লইয়াই তাঁর কারবার, যদিও অরূপের জ্যোতি ফুটাইয়া তোলাই হইয়াছে তাঁর শিল্পের চরম অভিব্যক্তি। এই জন্য বস্তুসম্পর্কহীন যে শ্রেয়ঃমুখিতা, শিল্পরাজ্যে তার মূল্য খুব অল্প, এবং তাকে প্রকৃত শ্রেয়ঃমুখিতা বলা যায় কিনা সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" ও "রাজর্ষি"র যে শ্রেয়ঃপন্থা তা বস্তুর ভিত্তি না পাওয়াতে কেমন নিরালম্ব হইয়া রহিয়াছে। জর্জ্জ সাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলির যে শ্রেয়ঃপন্থা তা ব্যক্তি হৃদয়ের বাস্তবতা-বর্জ্জিত গীতোচ্ছাস ছাড়া কিছুই নহে। এই সব রচনার মধ্যে যা প্রকাশ পাইয়া ওঠে, তা শ্রেয়ঃপন্থার সত্য, মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য নয়, বরং তারই বিকার। প্রকৃত যে শ্রেয়ঃপন্থা তা চলে স্থূল বাস্তবতার মাটি মাড়াইয়াই, যদিও তার মাথা তুলিয়া ধরে এক অম্লান জ্যোতির্লোকের সূর্য্যকরোদ্ভাসিত ধ্রুবতার মধ্যে ; এক দিকে তার "নীড়", অন্যদিকে "আকাশ" ; একদিকে রহিয়াছে তার কালো মৃত্তিকার রসপায়ী জটিল শিকড়-জাল, অন্যদিকে ফুলের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তার সারা অস্তিত্বের চরম নিঃশ্রেয়স, তার বহুশাখ তরল বৈচিত্র্যের সুনিবিড় সৌন্দর্য্য-সমন্বয় ; সে হইয়াছে "true to the kindred points of heaven and home." তাই যদি না হইত তবে তার সত্য শিব সুন্দর এক মুহূর্ত্তে এক বিপুল ব্যর্থতায়, এক বিরাট নিরুপাখ্যে পর্য্যবসিত হইয়া যাইত, পর্য্যবসিত হইয়া যাইত এক নিঃসত্ত আকাশ-কুসুমে।

এই শ্রেয়ঃপন্থা ছাড়া আরও দুইটি সাহিত্য-রীতি বস্তু ব্যাপারকে বাস্তবাতীত লোকে তুলিয়া ধরিয়াছে, সে দুইটি হইয়াছে কল্পপন্থা (Romanticism) ও আলোক-পন্থা (mysticism.) সাহিত্য সমালোচনার স্থলবিশেষে এই দুটিকে শ্রেয়ঃপন্থার সহিত অভিন্ন অথবা তারই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এইরূপ ধরিয়া লওয়ার পক্ষে এইটুকু বলা যায় যে মোটামুটি এই তিনেরই কাজ হইয়াছে এক,—সামান্যকে অসামান্য করিয়া আঁকিয়া তোলা। কিন্তু ইহাতেই এই তিনের মধ্যে একটা বিভিন্নতা রহিয়াছে। শ্রেয়ঃপন্থা বস্তুকে লইয়া করবার করিতে তার স্বরূপ, তার আদিম প্রকৃতিটিকে বদলাইয়া ফেলে না, বরং তাকেই একটু নিবিড় একটু আদর্শমুখী করিয়া অঙ্কিত করে। কল্পপন্থা ও আলোকপন্থা * বস্তুর স্বভাবকে অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তিত করিয়া তার মূল প্রকৃতিকে ভাঙিয়া চুরিয়া এক নূতন রূপ দিয়া দেয়। শ্রেয়ঃপন্থী আতস পাথরের ভিতর দিকে বস্তুর দিবালোক দেখা দেয় কোনো বিশিষ্ট এক কেন্দ্রে সংহত হইয়া, তাতে তার শুভ্রতা ও ঔজ্জ্বল্য আরও বাড়িয়া যায়। কল্পপন্থী ও আলোকপন্থী ত্রিফলা কাচের ভিতর দিয়া বস্তুর দিবালোক ফাটিয়া বাহির হয় বিচিত্র বর্ণরাগে, তার মধ্যে তার আদিম শুভ্রোজ্জ্বল রূপের সন্ধানটুকু আর মিলে না। শ্রেয়ঃপন্থা বস্তুজীবনকে দেখে সূর্য্যালোকের মাধ্যন্দিন শুভ্রতায় উদ্ভাসিত করিয়া, কল্পপন্থা ও আলোকপন্থা দেখে উদয় কিম্বা অস্ত-আকাশের বর্ণচ্ছটায় অনুরঞ্জিত করিয়া। শ্রেয়ঃপন্থার মধ্যে আছে একটা ধ্রুবতা, একটা অচপল সদাজাগ্রত শুভ্রদ্যুতি, যা নাকি কল্পপন্থা ও আলোকপন্থায় আসিয়া রূপান্তরিত হইয়া যায় একটা দ্রুতসঞ্চরমান স্বপ্নরঞ্জিত বর্ণচিত্রে, একটা বিচিত্র phanta-magoriaয়। শ্রেয়ঃপন্থায় আছে একটা নিরাময় বলিষ্ঠতা, একটা উজ্জ্বল স্নিগ্ধতা ; কল্প ও অলোকপন্থায় আসিয়া তা জন্মান্তর গ্রহণ করে একটা রুগ্ন শীর্ণতা, একটা উদগ্ররূপ, একটা উগ্র বর্ণরাগের মধ্যে। শ্রেয়ঃপন্থা হইয়াছে সত্য শিব সুন্দরের শুভযোগে গড়িয়া উঠিয়াছে যে শুভ্র দিবালোক। কল্প ও আলোকপন্থা হইয়াছে সত্য ও শিব অংশের রেখা গুলিকে অল্পবিস্তর বাদ দেওয়ায় অবশিষ্ট থাকে যে একক সুন্দরের রেখা, যা নাকি এমন আশ্চর্য্যরূপে রঙীন হইয়া এমন চিত্ত-বিভ্রমকারী মোহ লইয়া দেখা দিয়াছে।†

* পুরাতন "মানসী ও মর্ম্মবাণীর" পৃষ্ঠায় লেখকের "আলোকপন্থা ও কথাসাহিত্যের ধারা" শীর্ষক প্রবন্ধে কল্পপন্থা ও আলোকপন্থার বিভিন্নতা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

† অলোক পন্থা হইয়াছে দুই রকমের—ভুতালোক পন্থা (যেমন রবিবাবুর "ক্ষুধিত পাষাণ" ইত্যাদি গল্পের) ও অধ্যাত্মালোক পন্থা (যেমন তাঁর "রাজা প্রভৃতি নাটকের")। অলোকপন্থা সম্বন্ধে উপরের মন্তব্যগুলিতে বিশেষ করিয়া ভুতালোক পন্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।—লেখক।

রবীন্দ্রনাথের সুচরিতা, জর্জ্জ এলিয়টের এস্থার, কিম্বা টুর্গেনিভের টেনিয়া যদি মনে আনিয়া দেয় এক স্থির নিষ্ঠ শ্রদ্ধাপ্রেমোজ্জ্বল ধ্রুব শান্তি, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের চঞ্চলকুমারী, হিউগোর লা এস্মারেল্ডা কিম্বা সুদারম্যানের রেজিনা পাঠকের মনে ঘনাইয়া আনে বর্ণগন্ধ-নিবিড় এক অপরূপ আকর্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি ছোট গল্পে কল্প-পন্থা ও অলোক-পন্থার রঙ ফলাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেইদিকে তাঁর শুধু নিপুণ সাফল্যের কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। * তাঁর ছাপাইয়া-পড়া শক্তির লীলা নানাদিক দিয়া প্রকাশ পাইয়া উঠিলেও, শ্রেয়ঃপন্থা অথবা বাস্তবানুমোদিত শ্রেয়ঃপন্থাই হইয়াছে তাঁর স্বকীয় পথ, তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্যিক প্রচেষ্টায় তিনি সেই পথই অবলম্বন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কল্প-পন্থী ও আলোক-পন্থী গল্পগুলি বাছিয়া পৃথক্ করা খুব শক্ত নয়। কিন্তু তাঁর অগণ্য ছোট গল্পের মধ্যে শ্রেয়ঃপন্থা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে কোন্ গুলির মধ্যে, বস্তু-পন্থাই বা কোন্ গুলিতে কোন্ গুলিতে, আবার শ্রেয়ঃ ও বস্তু-পন্থা তাদের প্রাধান্য একরূপ সমভাবে ভাগাভাগি করিয় লইয়াছে, সেই সূক্ষ্ম চুল-চেরা শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টা খুব সহজ নহে। তবু আমি যে পদ্ধতিতে সমালোচনা সুরু করিয়াছি তার শেষ বজায় রাখিতে আমাকে সেই দিকে কড়া নজর রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রেয়ঃপন্থা রবিবাবুর প্রায় সব ছোট গল্পেই অল্প-বিস্তর আছে—তবু যেগুলির মধ্যে তা একটু বেশী ফুটিবার অবকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি আজ সেইগুলি লইয়াই একটু আলোচনা করিব। এই আলোচনায় "ঘাটের কথা," "রাজ-পথের কথা," "সুভা," "শুভদৃষ্টি," "সমাপ্তি," "অতিথি," "আপদ," "কাবুলিওয়ালা," "পোষ্ট-মাষ্টার," "মেঘ ও রৌদ্র," এবং "একরাত্রি" এই এগারোটি রচনার মধ্যেই আমার দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখিব।

আমি জানি এই শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে কোনো কোনো দিক্ দিয়া আপত্তি তোলা যাইতে পারে। কিন্তু সবগুলি সব দাবী মিটাইয়া দিবে এরূপ আশা করা বৃথা।

মোটের উপর এই রচনাগুলির মধ্যে রহিয়াছে একটা কাব্যাতিরিক্ততা, যা সমস্ত বস্তু-ব্যাপার হইতে বিকীর্ণ হইয়া তাকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, তাকে তুলিয়া ধরিয়াছে এক অপরূপ লোকে। এদের অনেকের মধ্যে প্রকৃতি রাণী দেখা দিয়াছে মূর্ত্তিমতী হইয়া; উদার আকাশের মধ্যে ব্যাপ্ত তার সৌম্যশান্ত মুখচ্ছবি, বনে বনে বিরাজিত তার জরী-জহরত-খচিত শ্যামল শাটী, নদীতে নদীতে বেড়িয়া তার মুখর মেখলা, দিকে দিকে বিচিত্র রকমের অস্ফুট কলস্বনে বাজিয়া উঠিয়াছে তার মাণিক্য কিঙ্কিণী। এই প্রকৃতি ধরা দিয়াছে আসিয়া একেবারে মানবের গৃহান্তঃপুরের মাঝখানে, শিশুর খেলার মাঝে, কিশোর কিশোরীর হৃদয়ের ছবিতে, মানবের প্রেমে। কোথাও এই প্রকৃতির পশ্চাৎ-দৃশ্যের উপর মানব ব্যাপারের চিত্র আঁকা হইয়াছে, কোথাও বা এই প্রকৃতিকেই করা হইয়াছে মানব মানবীর এক মূক সঙ্গিনী, তাকে দেওয়া হইয়াছে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের গৌরব, অথবা বিচিত্র নর-রঙ্গনাট্যে এক প্রধান নায়িকার মহিমা। রবিবাবুর গল্পে এবং বিশেষ করিয়া এই এগারোটির কয়টিতে প্রকৃতির সহিত মানবের অন্তরঙ্গতার মধ্যে যে রস পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তা শ্রেয়ঃপন্থারই রস। তাছাড়া বিশেষ করিয়া এই এগারোটীতে আছে একটা গীতিকাব্যোচিত বিশিষ্টতা, একটা অসাম আত্মার ক্রন্দন, একটা অপার কারুণ্য, একটা অনির্ব্বচনীয়ের সুর। খাঁটি ছোট গল্পের লক্ষণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, তাহা লিরিকেরই একটি গদ্য প্রকাশ বৈ আর কিছু নহে। তফাৎ এর মধ্যে এই বাস্তবতা ছোট-গল্পে বেশী পরিস্ফুট—তা নইলে খাঁটি ছোট গল্পে থাকিতে হইবে লিরিকেরই মত একটা নিরেট নিটোল ভাব, একটা বাহুল্যের অভাব, একটা বিশেষ অনুভাবের অভিব্যঞ্জনা, একটা সরল একমুখিতা যা একটি ঋজু অলোক-রেখার ... দিকে মিলাইয়া দিয়াছে, নির্ব্বচনীয়

হইতে অনির্ব্বচনীয়ের দিকে তার তর্জ্জনী তুলিয়া ধরিয়াছে। শ্রেয়ঃ পন্থার এই গীতি-কাব্য-সুলভ রসটিও বিশেষ করিয়া এই রচনাগুলিতে মিলিবে।

"ঘাটের কথা" ও "রাজ-পথের" মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝখানেই কবি আমাদিগকে আনিয়া হাজির করিয়াছেন। ঘাটের সোপানাবলীর বুকে সকালে সন্ধ্যায় কত সিক্ত-বসনা তরুণীর পায়ের ছাপ আঁকা হয়, রাজ-পথের উপর দিয়া কত "অরুণ চরণ" চলিয়া যায়, কত প্রেমের কাহিনীর তারা নির্ব্বাক সাক্ষী, কত সুখ-দুঃখের ঢেউ আসিয়া তাদের গায়ে লাগে, অদৃশ্য শিরা উপশিরা আনন্দে রিম ঝিম, কত গন্ধে তাদের অস্ফুট অস্তিত্ব অব্যক্ত প্রকাশ বেদনায় টন্ টন্ করিয়া ওঠে, কেই বা সে সন্ধান রাখে! যে কবি অনুভব করিতে পারেন যে সারা বিশ্ব প্রকৃতির সহিত তিনি ওতঃপ্রোত হইয়া মিশিয়াছিলেন, "লতা-পাতা চাঁদ মেঘের সহিত এক হয়েছিল মিশি," যিনি যত সব "গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে" তার "প্রকাশে"র ভার লইতে পারেন, তাঁর কাছেই ঘাট এবং রাজপথ তাদের অন্তর-রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। জড়ের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিবার যে কবি-হৃদয়েব নিবিড় সহানুভূতি, তাই দিয়াই শুধু এই দুইটি রচনার জন্ম সম্ভব হইয়াছে। কবি আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন লোকলীলার বিচিত্র এবং সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে ঘাট এবং রাজ-পথের বুকে কি কোনো চিরস্থায়ী চিহ্ন, মানব-জীবনের প্রবহমান স্রোতের মধ্যে কোনো বিশেষ তরঙ্গাঘাত কি সেখানে চির-দিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায় নাই? যা-কিছু ভাসিয়া বহিয়া যায় তার মধ্যে কোনো কিছুকে কি তারা স্মৃতির মধ্যে ধরিয়া রাখে নাই? এই প্রশ্ন হইতেই দুইটি কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তারা ঠিক ছোট গল্পে জমিয়া আসে নাই। এই দুইটি হইয়াছে লিরিক ও ছোট গল্পের সীমান্ত দেশের রচনা, দুটিই অব্যক্ত নীহারিকাপুঞ্জ, ছোট গল্পের স্ফুট গৌরবে তারা এখনো প্রকাশ পাইয়া ওঠে নাই। লিরিক ও ছোট গল্পের গোপন সংযোগ-সূত্রটি ইহাদের মধ্যে ধরা পড়ে।

কথা" ও "রাজ-পথের কথা"র প্রকৃতি মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছে, তার ব্যক্তিত্বহীনতা সংহত হইয়া দুটি ক্ষুদ্র মানবীর ব্যক্ত সীমায় পরিস্ফুটতা পাইয়াছে, আকার ও নামরূপ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি আগে ছিল এক অচল দর্শক ও মূঢ় অনুভাবক—এখন দেখি তা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মানবীর সম্বন্ধে আসিয়া নামিয়াছে। এই দুইটি তনুলতার "সূত্র" ঘিরিয়া গল্পও দেখি বেশ জমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই সুভা এবং "শুভদৃষ্টি"র "পাগলাটি" এখনো প্রকৃতিরই মত বোবা, অভিব্যক্ত হইয়া তারা এখনো সমুন্নত মানব শ্রেণীর সম্পূর্ণতায় আসিয়া পৌঁছে নাই। সুভার ভাষা এখনো দীর্ঘ পল্লব বিশিষ্ট বড় বড় দুটি চোখেরই ভাষা—"মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখন প্রসারিত, কখন মুদিত হয়, কখন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখন ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখন অস্তমান চন্দ্রের মত অনিমেষ ভাবে চহিয়া থাকে, কখন দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মত দিকে দিকে ঠিকরিয়া উঠে।" "পাগলী"রও চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে কখনো আনন্দ-ঘন শারদশ্রী, কখনো ভীত ত্রস্ত অব্যক্ত আর্ত্ত ভাব, কখনো বা মূক সহানুভূতির উচ্ছ্বাস। সুভা কাজ-কর্ম্মের অবসর পাইলেই নদী তীরে আসিয়া বসে। প্রকৃতি তার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়—"প্রকৃতির বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা, তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার, ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সঙ্গীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।" মূক প্রকৃতির অন্তরায়রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হইয়া উঠে। পাগলীও শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরে বিকশিত কাশবনটি যেখানে ঝলমল্ করিতেছিল সেখানে তার সরল নবীন মুখখানি লইয়া কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে বনশ্রীর মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গীও তাদের নির্ব্বাক প্রকৃতির অব্যবহিত উপরের স্তরের ভাষাহীন জন্তরা। সুভার ছিল গোয়ালের

গিয়া সে সান্ত্বনা লাভ করিত, আর ছাগল ও বিড়াল-শাবক। পাগলী আমাদের কাছে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল দুইটি তরুণ হাঁসকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, শেষে দেখিলাম তাকে, সে একটি আহত ঘুঘু বুকের কাছে তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে, সে ছিল পাড়ার যত পশু-পক্ষীর সঙ্গিনী।

মূক প্রকৃতির এই যে দুটি বালিকা বিগ্রহ, তার মধ্যে সুভা ছিল শুধু বোবা, পাগলী বোবা এবং কালা দুই-ই। সুভা গল্পের নায়িকা, গল্পের সমস্ত কারুণ্যের কেন্দ্র। বালিকা বয়স হইতেই তার মধ্যে মানবের বুদ্ধি ও অনুভব ক্ষমতা জাগিয়াছে। এমন কি একটি উন্নততর জীব, প্রতাপ নামে একটি প্রতিবেশী বালককে পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিয়াছে। কিন্তু তার যৌবন পূর্ণিমা রাত্রির নিস্পন্দ নির্ব্বাক জোৎস্না-জোয়ারের মত, সে পূর্ণিমা রাত্রির মত "একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া--যৌবনের রহস্যে, পুলকে, বিষাদে, অসীম নির্জ্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্য্যন্ত, এমন কি তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্‌থম্ করিতেছে, একটি কথা কহিতেছে না।" এই প্রচুর অনুভব-শক্তি-বিশিষ্টা ভাষাহীন মেয়েটির চক্ষুর করুণ মিনতি উপেক্ষা করিয়া মা-বাপ তার দোষ লুকাইয়া বহু চেষ্টার পর কলিকাতায় বিবাহ দিয়া জাত রক্ষা করিয়া দেশে ফিরিলেন। তার স্বামীর তাকে বোবা বলিয়া আবিষ্কার করিতে এবং এবার চক্ষু এবং শ্রবণেন্দ্রিয় উভয় দিয়া পরীক্ষা করিয়া একটি ভাষাবিশিষ্টা প্রাণীকে বিবাহ করিয়া আনিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। সুভার এই যে অনভূতি-সম্পন্ন ব্যর্থ জীবনের করুণা আমাদিগকে তা গভীরভাবে ঘা দেয়।

পাগলীর শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমনি কাঁচা যে দেখিয়া মনে হয় সংসার কোথাও তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। যৌবনে পা দিয়াও সেই খবর সে পায় নাই। পশু পক্ষীর প্রতি করুণা ছাড়া কোনো মানবীয় অনুভূতি তার মধ্যে ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। গল্পের কান্তিচন্দ্রের। কান্তি তাকে দেখিয়াই মুগ্ধ হয়, কিন্তু ভুলক্রমে তার নাম জানিল সুধা বলিয়া, 'সুধা'র সহিতই সে বিবাহের প্রস্তাব করে, এবং বাসর ঘরে হঠাৎ জানিয়া বসে তার বিবাহিতা সেই মেয়ে নয়। তখন বাসরের সমস্ত হাসি ঠাট্টা দীপাবলি এবং নববধূর মুখটিও তার নিকট কালিমালিপ্ত হইয়া দেখা দিল। তখন হঠাৎ শশক-শাবকের পিছনে পিছনে দৌড়িয়া পাগলী গিয়া সেখানে হাজির। কান্তি তখন তাকে কালা ও বোবা বলিয়া জানিল। ইহাকে জীবনসঙ্গিনী করার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল মনে করিয়া তখন সে মুক্তির শ্বাস ছাড়িল এবং লজ্জাবনত বধূটির সহিত প্রথম তার শুভদৃষ্টি হইল এবং তার মুখখানি একটি স্নিগ্ধ শ্রী ও শান্ত লাবণ্যে মণ্ডিত দেখিতে পাইল। তারপর আমাদের উপেক্ষিতা পাগলীটি দিনের পর দিন পশু পক্ষীর সঙ্গে তেমনি খেলা করিতে চলিল—তার মধ্যে যে কোনো মানবীয় অভিব্যক্তি সম্ভব হইতে পারে, সে কথা আমাদের মনেই হইল না।

এই অনুভূতির দিক দিয়া সুভা এবং পাগলীতে যেমন দেখিতে পাই একটা বিভিন্নতা, প্রকৃতির প্রতীকরূপেও দেখিতে পাই তাদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য। সুভার মধ্যে "এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মত একটা বিজন মহত্ত্ব আছে।" "রুদ্র মহাকাশতলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া" থাকার মধ্যে সুভার যে ছবি আমাদের চোখের সামনে ধরা হইয়াছে, তার মধ্যে পাই প্রকৃতির অটল গাম্ভীর্য্য, তার চিরস্থির বিরাটের ভাব। আর পাগলীর মধ্যে আছে প্রকৃতির উদ্দামতা, তার চাঞ্চল্য—তাও তেমনভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সুভাই সব দিক দিয়া সমধিক পরিস্ফুট। আধুনিকতম বঙ্গ-সাহিত্যে "শ্যামলী"র কল্পনা এই সুভাই যে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে নাই, তা কে জানে!

"শুভদৃষ্টি"র পাগলীটিতে প্রকৃতির যে উদ্দাম চাঞ্চল্য ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিবার অবকাশ পায় নাই, "সমাপ্তি"র পাগলীটিতে (পুরুষেরা স্নেহ করিয়া মৃন্ময়ীকে পাগলী

বসিয়াছে। তার এই চাঞ্চল্য ও বন্যতা লইয়া মৃণ্ময়ী জর্জ্জ এলিয়টের Maggieকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

"সমাপ্তি" গল্পের মধ্যে বস্তুরস আছে প্রচুর। পিণ্ডাকার গরদের পুঁটলিটির মধ্যে দু-চারিটি রেখাপাতে বাংলার কনের যে ছবি আঁকা হইয়াছে, তাহা অতুল্য। কুলীগঞ্জে নদী-তীরে নির্জ্জন ষ্টেশন-ঘরে ময়লা কাপড় পরা মৃণ্ময়ীর পিতা ঈশান খালি গায়ে ডেস্কে বসিয়া চামড়ায় বাঁধা বৃহৎ খাতা লইয়া অঙ্কপাত করিতেছে—এই বাস্তব চিত্রটি তার সমস্ত করুণা লইয়া আমাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য দাগিয়া বসিয়া যায়। ক্ষুদ্র পল্লীবালার কাছে বাংলার পাশ-করা নব্য যুবক শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় বি এর মর্য্যাদা-রক্ষার প্রয়াসের মধ্যে নূতন প্রণয়ীর মনস্তত্ত্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে। তার কনে-দেখার মধ্যে চোখের বালির মহেন্দ্রর আশা-দর্শন সূচিত হইয়াছে, মাতার সহিত তার মান-অভিমানে মহেন্দ্র-রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধেরই পূর্ব্বাভাস ধরা পড়ে।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও গল্পের কেন্দ্র হইয়াছে মৃণ্ময়ী। নামকে যাঁরা নামমাত্র মনে করেন না, মৃণ্ময়ীর সৃষ্টি-কর্ত্তা হইয়াছেন তাঁদের মধ্যে একজন। আমরাও মৃণ্ময়ী নামটিকে বিশেষ অর্থদ্যোতক বলিয়া মনে করিতে পারি। কবি জড় প্রকৃতিকেই এই ক্ষুদ্র মানবীটির মধ্যে কায়া দিয়াছেন। এ বিষয়ে মৃণ্ময়ী সুভা ও পাগ্‌লারই উত্তরাধিকারিণী। (যদিও "সমাপ্তি" পূর্ব্বোক্ত গল্প দুইটির আগে কি পরে রচিত বলিতে পারি না)। মৃণ্ময়ী প্রকৃতিরই মত উদ্দাম এবং উচ্ছৃঙ্খল। তার প্রতি অঙ্গে বাঁধা আছে প্রকৃতিরই লীলাচাঞ্চল্য ও গতিবেগ, প্রকৃতিরই কলহাস্য ও কেলি-কৌতুক, যা নাকি প্রতি নড়াচড়াও হীরক টুক্‌রা হইতে বিচ্ছুরিত আলোকের মত দিকে দিকে ঠিকরিয়া পড়ে। শিশুরাজ্যে সে ছিল একটি বর্গির উপদ্রব বিশেষ। আগে ভাঙ্গন-ধরা বড় নদীর তীরে মৃণ্ময়ীদের বাড়ী ছিল, সেখান হইতে তারা অপূর্ব্বদের গ্রামে চলিয়া আসে। সেখানে নিত্য প্রকৃতির ধ্বংসলীলা লক্ষ্য করিয়া এবং নদীতীরের তরঙ্গ-দোলায় লালিত পালিত হইয়া এই মানব-শিশু যে বন্ধন-অসহিষ্ণু মুক্তির স্বাদ লাভ করিয়াছিল, এখন যৌবন-সীমায় পৌঁছিয়াও দেখি সে তাহা ছাড়িতে পারে নাই। এখনো তার সবল সুপুষ্ট দেহ লইয়া কোঁকড়া চুল পিঠে দোলাইয়া ব্যাধহীন দেশের হরিণশক্তির মত নির্ভীক কৌতুহলে এই পল্লীনদীর তীরে দাঁড়াইয়া সে নৌকা-চলাচল দেখে। এখনো তার মুখচ্ছবিতে প্রকৃতির স্বচ্ছতা ফুটিয়া রহিয়াছে, "একটি দুরন্ত অবাধ্য নারী প্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্য-মৃগের মত সর্ব্বদা খেলা করে।" এখনো তরু পল্লবের ভিতর হইতে "কৌতুক-প্রিয়া বনদেবী"র মত "নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুর-নিকণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া" বাজাইয়া তুলিতেই তার আনন্দ! সমাজবন্ধন কিম্বা গৃহসীমার ধার সে মোটেই ধারে না। তাই অপূর্ব্বর সঙ্গে যখন তার বিবাহ ঠিক হইল "সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হঠিয়া বলিয়া বসিল, আমি বিবাহ করিব না।" সাগর-বেলায় প্রকৃতির ভীষণ নির্জ্জনতায় পালিত একটি কাপালিক কন্যাও বিবাহের নাম শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়াছিল; তবু তাকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল এবং মৃণ্ময়ী রূপেই তাকে পল্লীজীবন বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল। শিশুকাল হইতে পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়া দিলে তাকে এই মৃণ্ময়ীটিরই মত দেখিতে হইত, তখন তার দিগন্ত বিস্তৃত ভীষণতা পল্লী-সীমার স্নিগ্ধতায় কতকটা মোলায়েম হইয়া আসিত, সাগরের বিপুল তরঙ্গবিক্ষোভ আসিয়া রূপান্তর গ্রহণ করিত কেলিনিপুণা পল্লীতটিনীর লহরীলীলার মধ্যেই। কিন্তু বিরাট কল্পনার এই কপালকুণ্ডলা যে-সাগর হইতে উঠিয়াছিল সেখানেই আবার ফিরিয়া গেল, আর তারই পল্লীসংস্করণের মত এই চঞ্চল মধুর মৃণ্ময়ীটিকে মানব সম্বন্ধে আসিয়া ধরা দিতে হইল। এই উদ্দাম অবাধ্য প্রকৃতির মধ্যে মানবীয়তা ফুটাইয়া তুলিতে কবি অসামান্য নৈপুণ্য এবং মনস্তত্ত্বজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তার মধ্যে মানবীয়তার পরিস্ফূরণ এবং অপূর্ব্বর সহিত তার মিলন দিয়াই গল্পের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই মানবীয়তার দিক দিয়া সুভা এবং পাগ্‌লী হইতে মৃণ্ময়ী অনেক পরিস্ফুট জীব। তারা ছিল বোবা; মৃণ্ময়ীর মুখে ভাষা ফুটিয়াছে, যদিও কথা সে এখনো খুব কমই বলে, স্বামীকে প্রথম চিঠি লিখিতে বসিয়াও কথা তার খুব কমই

জোগায়, এবং একটি উচ্ছ্বসিত কলহাস্য যদিও তার প্রধান ভাষা। তাদের সঙ্গী ছিল মূক পশুপক্ষী, আর মৃণ্ময়ীর সঙ্গী মানব-শিশু এবং পাড়ার যত সব বালক-দস্যু।

প্রকৃতির লীলাচাপল্য ও উদ্দামতা মূর্ত্তি পাইয়াছে মৃণ্ময়ীর মধ্যে; তার উদাসীনতা, তার সুদূর নির্লিপ্ততা মূর্ত্তি পাইয়াছে "অতিথি" গল্পের তারাপদর মধ্যে। গল্পের প্রথমে যে ঔদাসান্য লইয়া সে দেখা দিয়াছে, গল্পের শেষে সে সেইটিকেই অটুট রাখিয়া আমাদের কাছ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এই ঔদাসীন্যের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে আছে একটা সংযত চাঞ্চল্য যাতে সে সুভা ও মৃণ্ময়ীর সমন্বয় রূপেই প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। মৃণ্ময়ী গল্পের প্রথমে মানব হিসাবে নানাদিক দিয়া অপরিণত হইয়া দেখা দিলেও, গল্প-শেষে দাম্পত্য আবহাওয়ার মধ্যে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবিকতারই সুন্দর পরিণাম। তারাপদ জীবহিসাবে প্রথম হইতেই মৃণ্ময়ী হইতেও উন্নততর হইয়াই দেখা দিয়াছে; কিন্তু তার মানবিকতার একটা গণ্ডী আছে, তা সে কিছুতেই ছাড়াইয়া যায় নাই; বহিঃ-পৃথিবীর এই জীবটি গৃহের চৌকাঠ কখনো পার হয় নাই। মৃণ্ময়ীতে ঘোষিত করা হইয়াছে প্রকৃতির উপর মানবের জয়, আর তারাপদে মানবের উপর প্রকৃতির জয়।

এই "অতিথি" হইয়াছে রবিবাবুর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প, তারাপদ তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। "সাধনা"র যুগে রবিবাবু যখন বোটে করিয়া বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেন তখন এই তারাপদ মৃণ্ময়ী ছাঁচের দুই একটি কিশোর-কিশোরী তিনি দেখিয়া থাকিবেন, সেই বাস্তব আদিমেরাই তাঁর কল্পনায় সঞ্জীবিত হইয়া সাহিত্যের অমরলোকে সুভা মৃণ্ময়ী তারাপদ প্রভৃতিরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এরা সব কয়টিই হইয়াছে "নদীতীরে"র জীব। সুভা যখন নদীতীরে বসিত তখন যে কোনো জমিদার বোটে করিয়া সেই দিক দিয়া যাইতেন বোধ করি ভুলেই সেই কথাটা বলা হয় নাই; নহিলে পাগলা যে নদীতীরে যুবক জমিদার কান্তির কাছে প্রথম দেখা দিয়াছিল, মৃণ্ময়ী যে বিদেশী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত উপাখ্যানে তার উল্লেখ আছে। তারাপদও প্রথম আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিবাবুর নৌকায় হাজির হইয়াছিল। এদের সকলের ভিতর দিয়া শিলাইদহের জমিদারটির নৌকাবাসই নিঃসংশয় রূপে উঁকি মারিতেছে। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হইয়াছিল তাঁর তখনই। তখনই তাঁর কাছে মনোহর হইয়া দেখা দিয়াছিল বাংলার বর্ষাস্ফীত নদী, তার বাঁশঝাড় ও আমবাগান, তার গোচারণের মাঠ ও গোষ্ঠপ্রাঙ্গণ, বাঁশের বনে বনে বিরাজিত তার শুভ্রোজ্জ্বল শারদশ্রী, সুনিবিড় ঝোপ-ঝাড় ও লতাপল্লবে ঘেরা তার সবুজ আরাম, তার কুটীর-রাজি ও তাদেরই অন্তরালে অখ্যাত অজ্ঞাত নিভৃত জীবন; তখনই তাঁর পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল এই তারাপদকে। এই তারাপদ হইয়াছে তাঁরই পল্লীপ্রকৃতি উপভোগের সঘন নামরূপ, এই তারাপদর মধ্যে আকার পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছে তাঁরই প্রকৃতির প্রতি রহস্যময় প্রবল আকর্ষণ। মানব প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যে অপরূপ হৃদয়ের লীলাখেলা চলিতেছে, তারাপদ ও প্রকৃতির সম্বন্ধের মধ্যে তাই ধরা পড়িয়াছে।

সমস্ত গ্রামের আদরের ছেলে এই তারাপদ সাত আট বৎসর বয়সেই মা-বাপ ভাই-বোন সকলের স্নেহপাশ এড়াইয়া বাড়ী হইতে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিশিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, কারণ "জন্মনক্ষত্রই তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে;—সে যখনি দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থ গাছের তলে কোন দূর দেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে অথবা বেদেরা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোট ছোট চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্ম্মাণ করিতে বসিয়াছে তখন অজ্ঞাত বাহির পৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।" যাত্রার দলের অধিকারী যখন তাহাকে স্নেহ করিতে লাগিল তখন সেখান হইতেও সে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে "হরিণ-শিশুর মত বন্ধন-ভীরু আবার হরিণেরই মত

বিবাগী করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত।" জর্জ্জ এলিয়টের সুন্দর সৃষ্টি "gipsy girl"টিতেও দেখিতে পাই অনুরূপ সঙ্গীত-মুগ্ধতা, সুরের প্রভাবে তাহারও দেহলতায় জাগিয়া উঠিত এক অপরূপ আন্দোলন। "কেবল সঙ্গীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্য-শিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যার ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলি তাহাকে উতলা করিত।" এই সঙ্গীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া যাত্রার দল হইতে গেল সে পাঁচালীর দলে। এই দলাধ্যক্ষ্যটিও যেই তাকে স্নেহপূর্ণ পক্ষপাত দেখাইতে সুরু করিল সে আবার অন্তর্হিত হইল। এইরূপে নানা দল ঘুরিয়া সে এবার তার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগাঁয়ের জমিদার বাবুদের সখের যাত্রায় যোগ দিতে যাইতেছে। পথে মতিবাবুর সঙ্গে দেখা। মতিবাবুদের গ্রামে আসিয়া সে কয়েক দিনের মধ্যে সকলের মন পুরণ করিয়া লইল, পারিল না শুধু একটি বালিকার, মতিবাবুর মেয়ে চারুশশীর। এই জায়গায় আসিয়া তার সমস্ত মনোরঞ্জিনী বিদ্যা একেবারে নিস্ফল হইয়া গেল, তার ঔদ্ধত্য ও ঈর্ষা, তার নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা ও বিদ্বেষকে সে কিছুতেই জয় করিতে পারিল না। সেই জন্যই বোধ হয় সে এখানে দুই বৎসর টিঁকিয়া রহিল। লেখক এই কিশোরীটির মনস্তত্ত্ব-চিত্রণে, এই দুর্ভেদ্য প্রহেলিকাটির সৃষ্টিতে আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রবল বিরাগ ও অনুরাগ, সুতীক্ষ্ণ কাঠিন্য ও অনুতাপের অশ্রুজল দিয়া তিনি ক্ষুদ্র সময়ের এই যে জটিল রহস্যলীলা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তারাপদ তার নিজের মনের মধ্যে ধীরে ধীরে যখন এই মোহের সন্ধানটি লাভ করিল, যখন বুঝিল যে তার জয় সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং তারই সঙ্গে তার পরাজয়েরও সূত্রপাত হইয়াছে, যখন বিবাহের আয়োজনে চারিদিকে স্নেহের ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এক বর্ষারাত্রে যখন বাহিরে নদীর জল থল থল করিয়া উঠিয়াছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিয়াছে, তখন মানব অন্তঃপুরের এই দুদিনকার আগন্তুকটি আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গেল; মানব তার বিপুল স্নেহ-চেষ্টা লইয়া পরাজিত হইল, প্রকৃতি তার নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য লইয়াই জয় লাভ করিল।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ—

"While he was yet a boy,
The moon, the glory of the sun,
And streams that murmur as they run,
Had been his dearest joy."

বলিয়া "Ruth"এর মধ্যে যে তরুণ যুবকটির বর্ণনা করিয়াছেন, তারাপদ তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু তার মধ্যে দেখানো হইয়াছে প্রকৃতির উদ্দাম আকর্ষণ কি করিয়া মানুষের মধ্যে নীচ প্রবৃত্তিগুলি জাগাইয়া দিতে পারে, তারাপদকে সেই মানবীয় বিকৃতি স্পর্শ করিতে পারে নাই। এইরূপ চরিত্রকে দেখিয়াই আমাদের কর্ম্মহীন কুণো জীবনযাত্রার প্রতি ঘৃণা ধরিয়া যায়। তখনই মনে হয়—

"——Oh better wrong and strife,
(By nature transient) than such torpid life;
Life which the very stars reprove
As on their silent tasks they move!"

মনে হয় "তাহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন।"

"আপদে"র নীলকান্তটি হইয়াছে এই তারাপদরই একটি গন্ধ বিকৃত প্রতিরূপ। তারাপদর মত নীলকান্তও ব্রাহ্মণবালক এবং যাত্রার দলের ছোক্‌রা। যাত্রার দলের লোকগুলি দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া যে অদ্ভুত জীবন যাপন করে, তার মধ্যে একটা করুণ ঘরছাড়া ভাব, একটা চঞ্চল কেন্দ্রহীনতা রহিয়াছে যাহা কবির কল্পনাকে উদ্বোধ করিয়া এই দুইটি সৃষ্টির মধ্যেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তারাপদ লবকুশের গান করিয়া মতিবাবু ও অন্নপূর্ণার

মনোরঞ্জন করিত, নীলকান্ত কিরণের কাছে অভিনয় করিত নলদময়ন্তীর পালার। "ছেলেটির লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই!" এর মধ্যে নীলকান্তের যে ছবিটি আঁকা হইয়াছে তা "তরুণ সম্মার্জ্জিত ব্রাহ্মণশ্রী," "বড় বড় চক্ষু ও বড় বড় চুল" লইয়া তারাপদর আবির্ভাবের ছবিটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়; এবং ইহাই হইয়াছে যাত্রার দলের ছোকরার idealised ছবি। তারাপদর সমস্ত গ্রামের মন-হরণের কথাটা নীলকান্তের চতুর্দ্দিকে একটি ভক্ত শিশুসম্প্রদায় গড়িয়া উঠার কথার মধ্যে পাওয়া যায়। দুইজনই বৃন্তচ্যুত ফুলের মত ভাসিতে ভাসিতে গল্পের চড়ায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, আবার দেখিতে দেখিতে আপন বিধিনির্দ্দিষ্ট কাজ সারিয়া ফেলিয়া মানব-রঙ্গভূমিতে বিচ্ছেদ-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া সেখান হইতে বন্য প্রকৃতির বুকে হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তারাপদর গায়ে যাত্রার দলের আবিলতা লাগে নাই, সমস্ত পঙ্কিলতার ভিতর দিয়া সে হংসের মত তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতাকে অটুট রাখিয়া বহিয়া আসিয়াছে। নীলকান্তে সেই কালি লাগিয়াছে। তারাপদর সকলই ছিল, নীলকান্ত ছিল পিতৃ-মাতৃহীন। তারাপদর আহার ছিল অল্প, নীলকান্ত ভূরি ভোজনের পর দুধের বাটি-ধোওয়া জলটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া ওঠে। কি যাত্রার দলে, কি মতিবাবুর বাড়ীতে, কি অন্যত্র তারাপদ পাইয়াছে পর্য্যাপ্ত স্নেহ, প্রহার সে কখনো লাভ করে নাই। নীলকান্তের আহারের পরিমাণ যেমন ছিল বেশী, প্রহারের পরিমাণও ছিল তার তেমনই; অধিকারীর নিকট হইতে যেমন কিরণের কাছ হইতে অতিরিক্ত স্নেহ পাইলেও শরৎ ও তার ভাই সতীশের নিকট হইতে তেমনই কিলটা চাপড়টা তার দৈনিক বরাদ্দের মতই ছিল; তারাপদ ছিল সকলের প্রিয়, নীলকান্ত কিরণ ছাড়া সকলের কাছেই ছিল এক আপদের মত। নীলকান্ত বিরাজ করিত অবশ্য গাছের শাখায় শাখায় প্রতিবেশীদের আমবাগানে, কিন্তু প্রকৃতির উদ্দামতা তার মধ্যে কতকটা থাকিলেও প্রকৃতির গাছগুলির প্রতি লোভ তার ততটা ছিল না যতটা ছিল

প্রকৃতির চাঞ্চল্য তার মধ্যে কতকটা মানবীয় উচ্ছৃঙ্খলতাতেই বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। "তাহার বৃহৎ তারা-বিশিষ্ট দুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল," "তার ভিতরটা ছিল স্বভাবতঃ কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা লাগিয়া উপরিভাগে পক্কতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।" এই "অকালপক্ক" অথবা "অকাল-অপক্ক" (কারণ তার বয়সটা চেহারা দেখিয়া ঠিক অনুমান করা যাইতনা) বালকটি তাহার চেয়ে অধিক বয়সের বিবাহিতা কিরণকে ভালবাসিয়া যৌবনের সজ্ঞান উপলব্ধিতে উপনীত হইল। কিরণ এই মাতৃহীন বালকের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, তার অন্তরের রহস্যের কথা কিছুই জানিতেন না। প্রেম মানবকে এবং তার চিত্তের বিচ্ছুরিত আলোকে তার পরিপার্শ্বকে দিয়া দেয় একটা শ্রেয়ঃমুখী বিশিষ্টতা, তুলিয়া ধরে একটি আলোকোজ্জ্বল জগতে। যখন তার "গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত," যখন "জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখীর ডাক, এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহুদুইখান এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদল-কোমল রক্তিম চরণযুগল, কি এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত" তখন তার ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা, তার বিকৃতি-লাঞ্ছন ধুইয়া মুছিয়া যাইত, তারই মধ্যে ফুটিয়া উঠিত একটা অরূপের জ্যোতি। কিন্তু হায়, কিরণ তাকে যে বালক বলিয়াই জানিলেন, এ দুঃখ সে রাখিবে কোথায়! তারপর একদিন যে কিরণের প্রতি ভালবাসাই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী সতীশকে জব্দ করিবার জন্য তার দোয়াত-দানটি চুরি করিতে বলিয়া দিয়াছে, সেই কিরণই যখন তার বাক্সে চোরাই মাল আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন তখন সে যে চোর নয়, সে যে লোভে পড়িয়া এ কাজ করে নাই ইহা কিরণকে কিছুতেই বুঝাইতে না পারায় যে নদী-গর্ভ হইতে সে আসিয়াছিল, সেইখানে ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া তার উপায়ান্তর ছিল না। নীলকান্তে যে শ্রেয়ঃ-পন্থা তা প্রেমের

কারুণ্যের যোগেই ফুটিয়াছে তারাপদ ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির যোগে। তারাপদ প্রকৃতিরই বহিঃনিক্ষিপ্ত এক সজীব সচল অংশ বিশেষ, প্রকৃতির প্রতি তাই ছিল তার এক নিগূঢ় রহস্যময় প্রবল আকর্ষণ; কিশোরী চারুশশীর প্রতি প্রেমে তার মধ্যে মানবীয়তার রঙ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র; মানব তাকে দুই হস্তে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে তার আদিম আলয়ে, বহিঃ-পৃথিবীর উদার উন্মুক্ত নির্লিপ্ততার মধ্যে। আর নীলকান্ত তার চেয়ে পরিস্ফুট মানবীয়তা লইয়া, মানবের কাছে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সেখান হইতে উপেক্ষা বহন করিয়াই ফিরিয়া গেল প্রকৃতির কোলে।

বিভিন্নতা থাকিলেও নীলকান্ত তারাপদ এক পর্য্যায়েরই জীব। অ্যাডিসনের উইল্ উইম্‌ব্‌ল্, আর্ভিঙের রিপ ভ্যান্ উইন্‌কল্, রবিবাবুর "স্বর্ণমৃগে"র বনমালী, "সুভা"র প্রতাপ এরা সকলেই নানা বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা লইয়া এই অকেজোর পর্য্যায়টিরই দল পুষ্টি করিয়াছে। কারও মা বাপ নাও থাকিতে পারে, কেউ মা-বাপ হইতে স্বেচ্ছায় পলাইয়া আসিতে পারে, কেউ বা বাড়ী ছাড়িতে পারে গভীর গঞ্জনায়, কিন্তু এরা হইয়াছে যাকে বলে মায়ে-বাপে-তাড়ানোর দল। এরা "নিষ্কর্ম্মা"—অর্থাৎ নানা সৌখীন হাতের কাজে যারা নিপুণ, নিজের অপেক্ষা দশ জনের কাজেই যারা বেশী লাগে, এরা "গৃহহীন", অর্থাৎ যাদের কোনো একটা বিশেষ কেন্দ্র, বিশেষ একটা ঘরই অধিষ্ঠান ভূমি না থাকাতে সকলের আপন ঘর; এরা "লক্ষ্মীছাড়া," অর্থাৎ "রিক্ত যারা সর্ব্বহারা, সর্ব্বজয়া বিশ্বে তারা" এই হইয়াছে যাদের মনের ভাব। তারাপদ হইয়াছে এই পর্য্যায়েরই সব চেয়ে idealised চরিত্রসৃষ্টি, "চোখের বালি"র বিহারী এই পর্য্যায় হইতে "কেজো"র পর্য্যায়ে সবে পা দিয়াছে মাত্র, সম্পূর্ণ দলভুক্ত এখনো হয় নাই, তাই শুভকর্ম্ম চেষ্টা তার মধ্যে এখনো রহিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এই typeটা রবিবাবুতেই প্রথম দেখা দেয়। আধুনিকতম সাহিত্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক কথা-গ্রন্থে এই typeটাই বাস্তবতার দিকে সুন্দর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

যার মধ্যে যা আমরা আশা করিনা তার মধ্যে সেই জিনিষের প্রকাশ দেখিতে পাইলে আমরা মুগ্ধ হই, কারণ চোখের সাম্‌নের ক্ষুদ্রতার মধ্যে "অনাগত অনাহতে"র আবির্ভাবের মধ্যে ফুটিয়া উঠে শ্রেয়ঃপন্থারই দ্যুতি। লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার মধ্যে প্রেমের আলোক জ্বালাইয়া তুলিয়া তার সমস্ত কালিকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইয়াছে। "কাবুলিওয়ালা"র যে আকৃতি এবং প্রকৃতির সহিত আমাদের পরিচয় তার মধ্যে ভীষণতা ছাড়া আর কোনো ভূষণ আছে সেই সম্বন্ধে আমাদের লেশমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। দুরদেশবাসী নিরক্ষর বণিকের স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার অপরিচিত বেশভূষা এবং দুরধিগম্য ভাষাও যে তাহাকে আমাদের কাছে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে তাহা নিশ্চিত। কিন্তু পর্ব্বতের গায়েও ফুল ফোটে, তার ভিতর হইতেও সুশীতল বারি উৎসারিত হইয়া উঠে। এই কুলিশ-কঠোর কাবুলিওয়ালা, এই খুনী রহমৎটিও, কবির সহানুভূতি লাভে বিরত হয় নাই। এই সহানুভাবী কল্পনাই এই কদর্য্যতার ভিতর হইতেও ফুটাইয়া বাহির করিয়াছে এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, এই কাঠিন্যের মধ্যেও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে এক পেলব প্রকাশ। বহুবিধ প্রাথমিক বাকচেষ্টা দিয়া লেখক 'মিনি'র মধ্যে যে মধুর শিশুটিকে সৃষ্টি করিয়াছেন তার মোহটি দেখি কাবুলিওয়ালার চিত্তকেও গিয়া স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু ইহার রহস্য আমরা প্রথমটা কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই। বহু বৎসর পরে রহমৎ যখন জেল হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন এই খুনীকে দেখিয়া আমাদের চিত্ত ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। মিনির সহিত তাহার দেখার প্রার্থনা সফল হইল না। সে ম্লানমুখে ফিরিয়া যাইতেছে দেখিয়া মিনির বাপের দয়া হইল, তাকে ডাকিয়া বসাইলেন। তখনই কথায় কথায় তার বুকের দিকের জামার নীচে হইতে বাহির হইয়া আসিল একটি মলিন তুলট কাগজের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলির ভস্মছাপ। সে তার মেয়ের স্মৃতিকে দেশ হইতে

দেশে, বৎসর হইতে বৎসরে, বুকের মধ্যে লইয়া ফিরিতেছে। মিনির মধ্যে সে দেখিয়াছিল তারই মেয়েকে। এক মুহূর্ত্তে এই ক্ষুদ্র অঙ্গুলি-চিহ্নের বিকীর্ণ আলোকে খুনী কাবুলিওয়ালা জ্যোতিষ্মান হইয়া দেখা দিল, তার সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গেল, এক মুহূর্ত্তে কন্যাবিরহী নিখিল পিতৃহৃদয় এই খুনীর হৃদয়ের সঙ্গে এক তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল।

"পোষ্টমাষ্টার" গল্পটিতে ছোট গল্পের গীতিকাব্যোচিত লক্ষণটি ধরা পড়ে। ইহা লিরিকেরই মত স্বল্প, উজ্জ্বল ও করুণ-কোমল, যেন একটি সূর্য্যালোকিত শিশিরবিন্দু। ইহাতে বাহুল্যের লেশমাত্র নাই, পল্লবিত বাস্তবতায় ইহা নানাদিকে ডালপালা মেলিয়া ধরে নাই, একটি মাত্র কাণ্ডের একটি মাত্র বোঁটায় ইহা তুলিয়া ধরিয়াছে ইহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য, ইহার অশ্রুসজল সুগভীর কারুণ্য, নিবিড় গন্ধোচ্ছ্বাসের মতন মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ একটি উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন। এই গল্পে আছে দুইটি মাত্র চরিত্র, তাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ লইয়াই এই গল্পের পত্তন করা হইয়াছে; এই ভাবের নীহারিকায় আচ্ছন্ন করিয়া চরিত্রদুটিকে অস্পষ্টই রাখা হইয়াছে, তাদের পরিস্ফুট করিয়া দেখিবার দরকার হয় নাই। নির্জ্জন পোষ্টাফিশে তরুণ পোষ্টমাষ্টারটির একমাত্র সাথী ছিল পিতৃমাতৃহীনা রতন—সেই রাঁধা-বাড়ার কাজে সাহায্য করিত। রোগে ভুগিয়া ছুটি না পাইয়া পোষ্টমাষ্টার কাজে জবাব দিয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে। রতন জিজ্ঞাসা করিল—"আবার কবে আসবে?" উত্তর পাইল—"আর আস্‌ব না।" ঘরের প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া কোথাও বৃষ্টির জল টপটপ করিয়া পড়িতেছে। রতন চুপচাপ তার কাজ সারিল, অন্য দিন হইতে অবশ্য বিলম্ব হইল। অনেকক্ষণ পরে আসিয়া বলিল—"দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে?" পোষ্টমাষ্টার হাসিয়া কহিলেন—"সে কি করে হবে?" সেই হাসি ও উত্তর সারারাত্রি রতনের কানে বাজিতে লাগিল। পরদিন সকালে আসিয়া অভ্যস্ত কাজ সারিয়া রতন প্রভুর আদেশ অপেক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভু বলিলেন—

রতন অনেক দিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল—"না না, তোমার কাউকে কিছু বল্‌তে হবে না, আমি থাক্‌তে চাইনে।" যাইবার সময় পোষ্টমাষ্টার পথ-খরচা বাদে তাঁর বেতনের সমস্ত টাকা রতনকে দিতে চাহিলেন। রতন তাঁর পা জড়াইয়া কহিল—"দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাকে কিছু দিতে হবে না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার জন্য কাউকে কিছু ভাব্‌তে হবে না" বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পালাইয়া গেল। পোষ্টমাষ্টারের নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাঁর ইচ্ছা হইল ফিরিয়া গিয়া রতনকে লইয়া আসেন, কিন্তু নৌকা তখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। রতন দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে এই ক্ষীণ আশা লইয়া পোষ্টাফিশের চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল, এই ত গল্প। লেখক এই রচনায় কাঁদিয়া কোনো মামুলি "উচ্চ" প্রেমের গল্প বিবৃত করিতে যান নাই। বরং মানব-হৃদয়ের ক্ষণিক মোহকেই ইহাতে স্থায়ী করিয়া তোলা হইয়াছে। "পুরাণো আবাস" ছাড়িয়া যাওয়ার মধ্যে একটা সুগভীর করুণ ভাব রহিয়াছে। যেখানে কিছু দিন বাস করা যায় সেই গৃহের প্রতি ইষ্টক খণ্ড, প্রতিকোণের সঙ্গে হৃদয়ের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে—প্রতিদিনের অভ্যাসের মধ্যে তার খোঁজ পাওয়া যায় না, কিন্তু চিরদিনের জন্য সেই অজ্ঞাত অলক্ষিত বন্ধন-সূত্রে টান পড়ে আর হৃদয় একেবারে বেদনায় টন টন করিয়া উঠে। যদি পশ্চাতে সেই গৃহে ফিরিয়া আসা যায়, কোনো মানুষকে, যার সঙ্গে দুই দিনের জন্য খুবই অন্তরঙ্গতা ঘটিয়াছিল এবং যার সঙ্গে এই সুদীর্ঘ সংসার-পথে আর কোনো দিন দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে এই বেদনা আরো নিবিড় হইয়া উঠে। হইতে পারে ইহা ক্ষণিক, কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে; হইতে পারে ইহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিয়া মানব "নূতন ভ্রান্তি-পাশে" বদ্ধ হইবার জন্য নূতন দিকে ছুটিয়া চলে, কিন্তু ক্ষণেকের এই অন্তর্গূঢ় বেদনা, এই সুগভীর কারুণ্য

গাঁথিয়াই দিন হইতে দিনে বহিয়া চলিয়াছে। ইহার জন্যই এই সংসার-জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য শুকাইয়া ঝরিয়া যায় নাই, ইহার জন্যই শুষ্ক কঠোরতা জীবনের সমস্ত পেলব শ্যামলতার উপর তার শীর্ণ হাত বুলাইয়া দেয় নাই। এই ক্ষণিক মোহকেই রবিবাবু এই গল্পে অমর করিয়া আঁকিয়াছেন।

"পোষ্টমাষ্টারে" মত "মেঘ ও রৌদ্রে"র মূল গল্পটিও সরল, করুণ ও প্রাণস্পর্শী। ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণ ওকালতী পাশ করিয়া সম্পত্তি সংরক্ষণের নাম করিয়া পড়াশুনা লইয়াই বাড়ীতে বসিয়া আছেন। প্রতিবেশী হরকুমারের মেয়ে গিরিবালা তু'বেলা সেই পথ দিয়া আসে যায় এবং পাঠক শশিভূষণ এবং তার বড় বড় বইগুলির সঙ্গে পরিচয়ের তার ইচ্ছা জাগে; কিন্তু ক্ষীণদৃষ্টি শাশির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে তার সময় লাগিয়াছিল এবং তাকে বহুবিধ কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। শেষে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা হইল—শশিভূষণ গিরিকে পড়ান, তাঁর মোটা মোটা বইয়ের ছবি দেখান, গিরি তার মার ভাণ্ডার হইতে চুরি করিয়া আচার আমসত্ব আনিয়া শশিভূষণকে খাইতে দেয়। কিন্তু তাদের এই সুমধুর খেলা বেশীদিন চলিল না। যে হরকুমারের পক্ষ হইয়া শশিভূষণ অপমানকারী এক "জয়েণ্ট সাহেবরে" সহিত লড়িয়াছিলেন তারই চক্রান্তে তাঁকে দেশ ছাড়িতে হইল। কলিকাতা রওয়ানা হইবার দিন অনিমন্ত্রিত শশি শুনিয়া গেলেন, গিরিবালার বিবাহের সানাই বাজিতেছে। কিন্তু তাঁর কলিকাতা যাওয়াও হইল না। পথে শ্বেতাঙ্গ-পুরুষদের তুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাঁকে পাঁচ বৎসরের জন্য জেলে যাইতে হইল। জেলে থাকিতে তাঁর বাপ মারা যান—সংসারের সহিত তাঁর একমাত্র বন্ধন তাহাতেই ছিন্ন হইয়া যায়। পাঁচ বৎসরের পর এই স্বজনহীন বিশ্ব-পৃথিবীর মধ্যে ছাড়া পাইয়া শশিভূষণ কোথায় যাইবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না; এমন সময় দেখিলেন একটি বড় ঘরের গাড়ী তাঁরই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তিনি সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে অনিশ্চিত ভবিতব্যের তিনি যে বৃহৎ বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিলেন সেখানে একটি জীর্ণ চারুপাঠ ও শ্লেট দেখিতে পাইলেন—তাতে তাঁহারই হাতের লেখা গিরিবালার নাম রহিয়াছে। তিনি কোথায় আসিয়াছেন বুঝিকে পারিলেন। বৈধব্য বেশ পরিহিতা গিরিবালা তাঁর জন্য জলখাবার লইয়া আসিল এবং অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টিতে শশিভূষণের জীর্ণ কঙ্কালসার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। শশিভূষণও কথা খুঁজিয়া পাইলেন না, এক প্রবল উচ্ছ্বাস তাঁর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। তখন অট্টালিকার বাহিরে কীর্ত্তনের দল পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল—এস এস হে।

"মেঘ ও রৌদ্রে" শশিভূষণ ও গিরিবালার যে মোহ তাহা "পোষ্টমাষ্টারের" মোহের মত ক্ষণিক নহে, তাহা স্থায়ীরূপেই তাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাকেই মানুষ প্রেম আখ্যা দিয়া থাকে। গল্পের মূল কথাটি খুবই সরল হইলেও ইহা হইতে অনেক শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে। নানা বাস্তবতার কঠিন সূত্র ঘিরিয়া ইহার রসটি জমিয়া উঠিয়াছে। "পোষ্ট মাষ্টারের" চেয়ে পরিস্ফুট বস্তুর অবলম্বনে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহার করুণ রস আরও গভীরভাবে আমাদের বুকে দাগ চিরিয়া বসিয়া যায়। ইহার চরিত্রগুলিও বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, অস্থিহীনতার পিণ্ডাকৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই, কিম্বা ভাবের বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া একেবারে ছায়াময় হইয়া উঠে নাই। ইহার সব চেয়ে বাস্তব চরিত্র হইয়াছে হরমোহন। এই পাড়াগেঁয়ে নায়েবটি তার ভীরু দুর্ব্বলতা, তার কপট নীচতা এবং মিথ্যাচার লইয়া উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শশিভূষণ হইয়াছেন সংসারানভিজ্ঞ উন্নতমনা যুবক, অন্যায় তিনি কারো কাছ হইতে সহিতে পারেন না, তা সে যত বড় প্রতাপশালী হোক্ না কেন। নিজের ক্ষমতার অভাবের দিকে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি অন্যায়কারী সাহেবের উপর গিয়া পড়েন। মোটের উপর শশির ছিল মনন-জীবন—কর্ম্মজীবন নহে। তাঁর দু-চারিটা কর্ম্ম-চেষ্টা তাঁর মনন-জীবনেরই বহিঃনিক্ষিপ্ত

প্রথম 'স্বদেশী' চরিত্র সৃষ্টি ( অথবা "একরাত্রি" গল্পের নায়কটি )। 'স্বদেশী' চরিত্র হিসাবে শশিভূষণ আদিম বলিয়াই এখনো অপুষ্ট, বিহারীর কর্ম্ম-চেষ্টায় তা এখনো পরিস্ফুটতা লাভ করে নাই, গোরা চরিত্রের সুদৃঢ় মেরুদণ্ড লাভ করিতে তার এখনো অনেক দেরী, দেশহিতের সজ্ঞান উপলব্ধি এখনো তার মধ্যে ফুটে নাই, কিন্তু "একরাত্রি" গল্পের নায়কের মত তা একটা মামুলি ক্ষণিক স্বাদেশিকতার উচ্ছ্বাস লইয়াও প্রতিভাত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু শশি যাঁর ললাটশোভা সেই দেবটির মত আমাদের অধ্যয়নরত শশিভূষণের তপশ্চর্য্যা ভাঙ্গিয়াছিল যে ক্ষুদ্র গিরিবালাটি তার চরিত্রই হইয়াছে এই আখ্যায়িকায় সব চেয়ে উজ্জ্বল এবং স্নিগ্ধ-মধুর। এই মেয়েটি ছিল, চারুশশীর মত অতটা না হোক্, একটি ছোটখাটো প্রহেলিকা। গিরির প্রচুর মান-অভিমান এবং হাসি ও অশ্রুর ভিতর দিয়া তার যে ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বড়ই মধুর। প্রকৃতির মেঘ ও রৌদ্র হইয়াছে এই ক্ষুদ্র মানব হৃদয়ের অশ্রু-হাসিরই জগৎজোড়া রূপক। কিশোরীর এই হৃদয়ের আলেখ্য মেলিয়া ধরিতে তিনিই পারেন যাঁর আছে অতুলনীয় সাহিত্য-নৈপুণ্য, মানব-হৃদয়ের অলিগলির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, আর অনন্য-সাধারণ মাধুর্য্য ফলানোর শক্তি। বাংলা সাহিত্যের এলবামে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে এই ধরণের চিত্র একেবারেই ছিল না, পরে যা হইয়াছে তাদের কাছেও রবীন্দ্রনাথের এইরূপ বহু আলেখ্য সৌন্দর্য্য ও শক্তিতে এখনো দুরতিক্রম্য হইয়াই রহিয়াছে।

বিশিষ্ট চরিত্র এবং বিচিত্র চিত্র থাকা সত্ত্বেও "মেঘ ও রৌদ্রে"র মূল সুরটি এবং অন্তঃপ্রভাবটি (effect) হইয়াছে গীতিকাব্যোচিত। নানা বাস্তব বৈচিত্র্য ছাপাইয়া এবং অন্তরাল করিয়া গল্প শেষে ইহার মূল সুরটি ধ্বনিটি হইয়া উঠিয়াছে একটি গানে। এই গানটিই হইয়াছে এই গল্পের প্রাণ। ইহা যেন গিরিবালার হৃদয় হইতেই স্বতঃউৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তারই হৃদয়ের অনাবৃত আত্মপ্রকাশ। ইহা স্থান এবং কালের এমন আশ্চর্য্য উপযোগী হইয়া দেখা দিয়াছে যে, আমাদের সন্দেহ হয় যে গান রচিত হইয়াছিল সুরটি গল্পের বস্তুবন্ধনে অমর করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে বায়ুচর সুরটি যেমন নামিয়া আসিয়াছে বস্তুরাজ্যের কথার স্থিতিতে, কথাও তেমনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে সুরের অসীমতায়, বিশেষের মধ্যে ঘনাইয়া আনা হইয়াছে বিশ্বের দুঃখ। "নাথ হে ফিরে এস।" নাথ তো ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই যে মিলন তার মধ্যে যে রহিয়াছে বিচ্ছেদের অভ্রভেদী বাধা, তার সুস্পষ্ট বিদারণ-রেখা। মিলনের মধ্যে এই যে বিচ্ছেদের দুর্লঙ্ঘ্যতা তা তো এই গল্পের করুণ রসকে করিয়া তুলিয়াছে এমন অসীম অতলস্পর্শ, এমন বিশ্বতোমুখ গানটির মধ্যেই বাজিয়া উঠিয়াছে এই মিলনের বক্ষোগুহাবাসী অসীম বিশ্ব-বিরহের সুর।

"মেঘ ও রৌদ্রে"র মধ্যে যদি বাজিয়া উঠিয়া থাকে মিলনের মধ্যে থাকে যে অনন্ত বিরহের সুর, "একরাত্রির" মধ্যে তবে ফুটিয়া উঠিয়াছে চিরন্তন বিচ্ছেদের মধ্যে একরাত্রির অনন্ত মিলনানন্দ। গল্পের নায়ক নিজেই তাঁর এক রাত্রির বিপুল আনন্দ আস্বাদের গল্প করিতেছেন। প্রতিবেশী-কন্যা সুরবালার সহিত তাঁর শৈশবে খেলাধূলা চলিত। কিন্তু তিনি দেশহিতে মাতিয়া তার সহিত বিবাহের প্রস্তাবে কাণ দিলেন না। কিন্তু ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি না হইয়া তিনি হইলেন নোয়াখালি বিভাগের একটি ইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার! দেশহিতের আগুনটিও ধীরে ধীরে মনে একেবারে নির্ব্বাণ লাভ করিল। মনের এই অবস্থায় সুরবালার স্বামী সেইখানকার সরকারী উকীল রামলোচন বাবুর সহিত তাঁর আলাপ হইতেছে, তখন পাসের ঘর হইতে চুড়ির টুং টাং, পায়ের একটুখানি খস খস শোনা গেল, বেশ বোঝা গেল দুটি কৌতূহলপূর্ণ নেত্র তাঁকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে পড়িয়া গেল দুটি চোখ—"বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশব প্রীতিতে ঢলঢল দু'খানি বড় বড় চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।" আর যায় কোথা!

তাঁর চিত্ত এক মুহূর্ত্তে প্রেমের সজ্ঞান উপলব্ধিতে জাগিয়া উঠিল। এই প্রক্রিয়া চলিতে লাগিল। যে সুরবালা একমাত্র তাঁরই হইলে হইতে পারিত তাকে আজ চোখে দেখা পর্য্যন্ত অসম্ভব! এই চিন্তাই হইল তাঁর সর্ব্বস্ব, বিশ্বজগৎ কোথায় কোন্ সুদূরে মিলাইয়া গেল। তিনি থাকিতেন একা ইস্কুল ঘরে, সুরবালাদের বাসা ছিল ইস্কুলেরই খুব নিকটে। রামলোচন বাবু সেদিন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। গভীর রাত্রি, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। ঝড় ছুটিল, বন্যায় ক্ষুদ্র সহরটি ভাসাইয়া নিয়া গেল। এক হাঁটু জল মাড়াইয়া তিনি সন্নিহিত পুকুরটির উঁচু পাড়ে উঠিলেন, অন্যদিক হইতে আর একটি রমণীমূর্ত্তি উঠিল। তখন উন্মত্ত মৃত্যু-স্রোত নীচে খল খল করিতেছে, চারিদিকে প্রলয়ের বিভীষিকা, ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, আকাশে তারা বিলুপ্ত হইয়াছে—তখন দুটি কথা বলিতে কোনো দোষ ছিল না; দুটি প্রাণী পাশাপাশি হইল, সমস্ত জগৎ-সংসার হইতে ছিন্ন হইয়া সুরবালা তাঁরই আশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো কথা হইল না। বাকী রাতটুকু এম্‌নি ভাবে কাটিল। সকালের দিকে জল মরিয়া গেলে তারা নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। সেইদিন হইতে এক রাত্রির মিলনের আনন্দে তাদের অনন্ত বিচ্ছেদ-বেদনা ভরপুর হইয়া উঠিল, তাদের সারা অস্তিত্ব ছাইয়া গেল একটি অনন্ত রাত্রির অপূর্ব্ব আস্বাদে, তারই অমৃত হইয়া উঠিল তাদের অন্তহীন জীবন-যাত্রার অফুরাণ আনন্দ-পাথেয়।

বিশ্বপ্লাবী প্রলয়, দুর্য্যোগের জগৎ-জোড়া অন্ধকারের মধ্যে দুটি চির-পরিচিত অথচ চির-অপরিচিত নর-আত্মার নির্ব্বাক মিলনের কল্পনা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কথা-সাহিত্যের চেষ্টার মধ্যে এই গল্পটিকে একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে। সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথের গল্পে লিরিকের অন্যান্য বহুবিধ লক্ষণেরর সঙ্গে পাই একটা প্রবল উচ্ছ্বাস, একটা বুক-ফাটা গুমরি'-ক্রন্দন, একটা প্রাচুর্য্য কিম্বা স্নিগ্ধতা। এই গল্পের মধ্যে আছে একটা রুদ্ধনিশ্বাস সংযম, একটা প্রচণ্ড দৃঢ়তা, প্রকৃতির ভৈরবী লীলার পাশে দুইটি মিলনাকাঙ্ক্ষী নর-আত্মার না-মিলিয়া-পাশাপাশি অবস্থানের মধ্যে এবং তারায় তারায় আলোর কম্পনের মত তাদের বাক্যহীন বার্ত্তা-বিনিময়ের মধ্যে আছে একটা বিরাটের ভাব, যা বিশেষ করিয়া মহাকাব্যোচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নীতিধর্ম্মী হইলেও গীতিকাব্যেরই স্বল্পপরিসরের মধ্যে তিনি ধরিয়া রাখিতে পারেন তার মূর্ত্তি যে বিশ্ব-বাসনার অরবিন্দের মাঝখানে তার অতি-লঘুতার পাদপদ্ম রাখিয়াছে, ফুটাইয়া তুলিতে পারেন বৈশাখের রুদ্রচ্ছবি, ধ্বনিত করিয়া তুলিতে পারেন সমুদ্রের ধীরোদাত্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ। কথাসাহিত্যে ভিক্টর হিউগো ও রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন দুই বিভিন্ন দিকের দুই দিকপাল। বাস্তব জগতে না হউক, মনোজগতে যে উত্তর মেরু মাঝে মাঝে দক্ষিণ মেরুকে গিয়া ক্ষণকালের জন্য হইলেও স্পর্শ করিয়া আসিতে পারে, "একরাত্রি"র মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যায়; কারণ যে কল্পনা মানব ও প্রকৃতির যুদ্ধের বিরাট ছবি * আঁকিতে পারে, অথবা ভীষণ বীচিবিক্ষোভ, প্রবল তুষারপাত ও প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র মানবকের অভিযানের আলেখ্য † ফুটাইয়া তুলিতে পারে, আমরা ক্ষণকালের জন্য ইহাতে আস্বাদ পাই সেই কল্পনার।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

---

* ভিক্টর হিউগোর The Toilers of the Sea.

† „ „ The Laughing Man.

# কবি

"আলো যদি না থাকিত"—কহে বৈজ্ঞানিক,
জনশূন্য—মরুভূমি হ'ত চারিদিক,
হইত না গাছপালা"—
কবি কহে, "আরে
ওসব না হয় ভাই সওয়া যেতে পারে;
অসহ্য বিপদ হ'ত ফেটে যেত বুক
দেখিতে পেতাম না যে প্রেয়সীর মুখ!"

"[illegible]"

# অচল মূর্ত্তির সচল গতি



ডায়নার মূর্ত্তি
শিকারীর গতি ভঙ্গিতে চঞ্চল প্রাণময়

শিল্পী নানা ছাঁদে মূর্ত্তি গড়েন। কবির কথা ছাড়িয়া দিই। ভাস্কর ধাতুর মূর্ত্তি গড়েন,-- তাহাতে রূপ ফুটাইয়া তোলেন,—ভাব গড়িয়া তোলেন। কুম্ভকার তাহার রচিত মূর্ত্তিতেও ভাবের বিকাশ ঘটাইতে পারিলে তাহার শিল্প-প্রতিভার ছাপ আঁটিয়া শিল্প-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পূজা পায়! যে শিল্পী তাঁহার রচিত মূর্ত্তিতে ভাব ফুটাইতে পারেন, গতি জাগাইতে পারেন, প্রতিভার বিজয়মাল্য তাঁহার কণ্ঠ ভূষিত করে!

ভারতের শিল্পী বহুযুগ পূর্ব্বে পর্ব্বতের কঠিন পাষাণের গায়ে ছবি আঁকিয়া তাহাতে প্রতিভার যে ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছেন, আজও তাহা কালের করাল ইঙ্গিতে লুপ্ত হয় নাই,—বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে। তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রে গতির বেগ, ভাবের আবেগ এমন নিখুঁত ফুটিয়াছে যে সে সব চিত্র যেন জীবন্ত প্রাণময়। তার বহু পরিচয় আমরা বহু স্থলেই পাইয়াছি। অচেতন চিত্রে বা গঠিত মূর্ত্তিতে এই প্রাণ সঞ্চার করা অসাধারণ প্রতিভার কাজ।



আতলান্তা
প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে যাঁহার দ্রুত গমনভঙ্গী
অমর হইয়া রহিয়াছে



ছোট্ট ভাইটি

সম্প্রতি এক মার্কিণ শিল্পী ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিতে এমন নিখুঁৎ গতি ফুটাইতে পারিয়াছেন, যে তাহা বিশ্ববাসীর প্রশংসা-



খেলা

**মা ও শিশু**



নিশি-প্রয়াণ

অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছে। এই শিল্পীর নাম পল্ ম্যানশিপ—মার্কিনের ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে ইনি থাকেন; বয়স ইঁহার তরুণ। ইঁহার মূর্ত্তিগুলি সৌন্দর্য্যে পরম রমণীয়—তাছাড়া



**মাতৃক্রোড়ে**

তাহাদের সর্ব্ব অবয়বে নিপুণ ভঙ্গীতে শিল্পী এমন গতি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে মূর্ত্তিগুলি দেখিলে তাহা চঞ্চল প্রাণময় বলিয়া মনে হয়। কঠিন ব্রোঞ্জে গড়া তাঁহার ডায়না, আত্‌লান্তা, মা ও ছেলে মূর্ত্তিগুলি দেখিলে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। এখানে সেই সব অচল মূর্ত্তির কয়েকখানি ছবি দেওয়া হইল,—ছবি-গুলিতে সচল গতির ভঙ্গী সত্যই বিস্ময়কর।



নর্ত্তকী ও নৃত্যশীল মৃগ

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

---

# রাত-জাগা

হায়গো সখি, এমন রাতে
ঘুমিওনা গো, ঘুমিও না!
কোনমতেই চোখ বোঁজা নয়—
আমিও না গো, তুমিও না!
তোমার দুটি চপল আঁখি,
ঘুমিয়ে বুঝি দেবে ফাঁকি?
ওজর-টোজর মিথ্যে তোলা!
আমায় তুমি ভুলিও না!
—ঘুমিওনা গো, ঘুমিওনা!

ধরণী আজ অবাক হয়ে
চন্দ্রালোকের মন্তরে,
দখিন হাওয়ায় ঝর্‌চে কুসুম
নিসুত্‌ রাতের অন্তরে!
গাইছে কোকিল কবির মত,
কানন আঁকা ছবির মত,
আড়াল থেকে বাজ্‌চে নদীর
অশ্রুজল-যন্ত্র রে!
—চন্দ্রালোকের মন্তরে!

ঘুমোলে আজ ঠক্‌তে হবে,
তাইতো আঁখি ঢুল্‌চে না,
তাইতো তোমার কণ্ঠ-ঘেরা
এই বাহুপাশ খুল্‌চে না!
জোছনা-ঝরা মাঠের 'পরে,
রূপকথা যে মূর্ত্তি ধরে!
—ওকি! দেখি, অভিমানে
ঠোঁটদুটি তো ফুল্‌চে না?
—আমার আঁখি ঢুল্‌চে না!

চোখে চোখে চোখ মিলিয়ে
নীরব কথা কইব গো!
যতই চটো, যতই কাঁদো—
মুখটি বুঁজে সইব গো!
কবির সাথে হ'লে বিয়ে,
এমন বিপদ হবেই প্রিয়ে!
ফুট্‌লে গোলাপ, হাস্‌লে শশী,—
জেগেই মোরা রইব গো!
—নীরব কথা কইব গো!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# হাঁসুলী কি ফাঁসুলী*

আমাদের একটা ক্লাব ছিল তার নাম গঙ্গাযাত্রী ক্লাব, সেটা এই গঙ্গার উপরে যে ফেরি-ষ্টীমারগুলো চলে তার একটা-না-একটাতে সকাল-সন্ধ্যো কখনো দুপুরেও বসতো, সেখানে সম অসম এবং একেবারে বিষম বুড়ো থেকে আরম্ভ করে নেহাৎ ছেলেমানুষ পর্য্যন্ত এসে জুটতো —আমোদ করতে। আমার পকেটে থাকতো কবীরের গান, তার কাছে বাজনা, আরেকের কাছে তাল-বেতাল, অন্তের কাছে রসগোল্লা, কারু-কাছে খাস অম্বুরী, কারু কাছে খোস গল্প; সভাপতি ছিলনা, সেক্রেটারী ছিলনা, বক্তৃতা ছিলনা, ইস্কুল মাষ্টার ছিলনা, ইস্কুল-বয় ছিলনা। কেউ এখানে পড়তে আসতো না, বক্তৃতা করতে বা শুনতে আসতো না কিন্তু মিষ্টি গান গাইতে বা শুনতে আসতো, মিঠি খিলি খেতে আসতো, আর মাঝে-মাঝে তপসী মাছ ইলিস মাছ এ ওকে উপহার দিত, কিন্তু নিয়ম ছিল উপহার যদি একলা কেউ ভোগ করতে চাইতেন তবে সেটা তাঁকে মাথায় করে ষ্টীমার থেকে নামতে হতো! আমি সঙ্কট রোগ থেকে উঠে এই ক্লাবে ভর্ত্তি হলেম—লাঠি ধরে, লোকের কাঁধে ভর দিয়ে। আমি রোগা, আমার লাঠি ধরবার দরকার তাও জানালেম কিন্তু ঠিক এক হপ্তা পরে তারা আমার লাঠি মুচড়ে ভেঙে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে! তখন ঘোরতর শীতকাল। একটা ছেলে এল মোটা গলাবন্ধ মোটা কোট পোরে। তার পুরোনো জ্বর, পাঁচন খায়, থেকে-থেকে কাঁপে, মেম্বর হল সে! সাতদিন সময় দেওয়া গেল, তার পর সপ্তাহ পরে তার বুকের বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেলে কম্ফটারটা জলে দেওয়া হল, আর তাকে যতক্ষণ পারে ঢোল পিটতে দেওয়া গেল, খেতে দেওয়া গেল পাঁচন নয় পান যত পারে। ছেলেটার শরীরে দিন-কতকের মধ্যে এতটা ফুর্ত্তি এল যে আমাদের ভয় হলো যে বুঝিবা অতিরিক্ত ফুর্ত্তিতে সে মারা পড়ে কোনদিন! ঠিক এই সময় তার বাড়ির ডাক্তার তাকে একটু ভালো দেখে চেঞ্জে পাঠালে—মানা শুনলে না—ছেলেটা আমাদের সঙ্গ ছেড়ে ডাক্তারের সঙ্গে চলে গেল হাওয়া বদলাতে। অল্পদিন পরেই খবর এল ছেলেটা হাওয়ার সঙ্গে শরীর বদল করে নিয়েছে এতটা যে তাকে আর দেখাই যায় না। দুবছর আমি এই ক্লাবে গঙ্গাযাত্রীদের সঙ্গে কাটিয়ে যখন বেশ আছি সেই সময়ে প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারি—এমনি উৎপাৎ এসে জুটলো, গঙ্গাযাত্রির ক্লাবটাও সঙ্গে-সঙ্গে মরা একটা হাঙ্গরের মতো নদীর ঘাটে এসে কাৎ হয়ে পড়লো। এমনি খুব কম হবে তো পঞ্চাশটা ক্লাব আমি দেখেছি ওই গভরনিং বডি অধ্যক্ষ সদস্য ইত্যাদি ভূতের উৎপাতে মরেছে,—এ উৎপাত নিবারণ না করতে পারলে আমরাও যে বেশিদিন বাঁচবো তা নয়। ক্লাবের উৎসব, তার মধ্যে গান থাক, বাজনা থাক, পান বিড়ি সিগারেট থাক, আর যা খুসি সব থাক, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণও থাক কিন্তু শ্রাদ্ধের পুরোহিত ইস্কুলের মাষ্টার—এরা থাকবে কেন?

গঙ্গাযাত্রীর ক্লাবেও এটা আমরা চলতে দিইনি, আর তোমরা কোন হিসেবে হোষ্টেলে সেগুলো চালাও তা তো বুঝলেম না! এক-একটা সন্ন্যাসী আছে তারা বেঞ্চিতে কাঁটা মেরে তার উপরে শুয়ে এমন অভ্যস্ত হয়েছে যে তাতেই সে আরাম পায় ও আমোদে থাকে, তোমাদেরও দেখছি তাই, সব সভাকে দেখতে চাও তোমরা হয় স্মৃতি, নয় শ্রাদ্ধের পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতো সাজানো। উৎসব করতে এলেম সেও অশৌচ অবস্থার ময়লা মোটা ধুতি পোরে—চুল বাগালেম না, আতর মাখলেম না, ফুল গুঁজলেম না বুকে, রঙে রাঙালেম না গায়ের চাদর, পানে লাল হলনা ঠোঁট, হাঁসি দেখা দিলে না মুখে! আমার পঞ্চাশ বছরে তোমার পঁচিশ কি পনেরো বছরে কি সমান হয়ে গেল! বাগানের ছোটবড় সব গাছ সব ঋতুতে মুড়ো আর বুড়ো হয়ে দেখা দেবে এটাতো প্রকৃতির নিয়ম নয়? কবিরাজের পাঁচন আর মাষ্টার বুড়োর পাঁচন বাড়ি গঙ্গাযাত্রীর ক্লাবের সভ্যের কথা শুনে গঙ্গায় দাও—দেখবে তখন উৎসব আনন্দে ভরবে, প্রাণ

স্ফূর্তিতে সবল হবে। বছরে একটা দিন উৎসব, তাও শুকনো রকমে—এ হলে তোমরা বাঁচবে কতদিন! গান করবে না, নৃত্য করবে না, ঘোড়ায় চড়বে না, কুস্তি করবে না, বাচ খেলবে না, সাঁতার কাটবে না, বাজানা বাজবে না, কেবল পড়বে অন্ধকারে পিদুম জ্বালিয়ে, খেলার মধ্যে খেলবে পিং-পং—যা ছোট ছেলেতে খেলে বিলেতে—নয় তো মাঠে দাঁড়িয়ে ভিজবে, ফুটবল দেখবে, আর বক্তৃতা শুনে জয় অমুকের বলে চেঁচাবে,—এতে করে বাঁচবে কতদিন? শরীর নষ্ট মন নষ্ট হচ্ছে, অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়েছে, সব দিক দিয়ে জীবনে, এটা আমি দেখতে পাচ্ছি অন্ধযুগে অন্ধের মতো বসে থাকতে হবে কতকাল যে তার ঠিক নেই। যদি আনন্দ এসে জড়তায় না ধাক্কা দেয় তবে নিজকে উদ্ধারের সময় যে সব ধাক্কা আসে তার একটাও সইবে না, আমাদের রোগা শরীরে। এখন থেকে যৌবনকে শোভাকে সৌন্দর্য্যকে জীবনে বাদ দিয়ে চল্লে আমরা মন্ত্রী হয়েই বসি, আর রাজসভাতেই চাকরী পাই, কিম্বা পোলিটিক্যাল সভাতেই প্রেসিডেণ্ট হই, কোনো-কিছুকে ভালো করে চালাতে পারবো না আমরা। এমন কি দেশটাও যদি হাতের মুঠোয় কোনো গতিকে চরকার সুতোয় আটকে এসে পড়ে তবুও সেটাকে এমন বিশ্রী রকমে চেপে ধরবো যে হয় সেটা হাত ফসকে পালাবে নয়তো গুঁড়িয়ে মাটি হয়ে যাবে মুঠোর বিশ্রী চাপনে। সুন্দর করে কিছুকে ধরতে পারে না আমাদের জীবন তাই আমরা ফতুর হয়েছি, বাইরের উৎপাতে নয়, নিজেদের ভিতরের হাড্ডিসার বুড়ো গুলোর উৎপাতে, কেন না আমরা আমোদ করতে চাইলেও তারা চোখ রাঙিয়ে বলে খুব গম্ভীর ভাবে—স্মৃতি আর শ্রাদ্ধ সভার ফর্দ্দ ধরে আমোদ কর—দেখো ছেলেমানুষি না হয়! সেকালের লোকের আমোদের ফর্দ্দটা শোনো কত তফাৎ এখন থেকে—যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর, সুবসন্তকসহকার ভঞ্জিকা, নবপত্রিকা, এক শাল্মলী—এমনি একটি নয় বারো মাসে তেরোর অনেক বেশি আমোদ—তখনকার তাঁদের—যাঁরা বাঁচতেন শত শরতের মধ্যে দিয়ে উৎসব লড়াই এবং লেখাপড়া শিল্প চর্চ্চা—সঙ্গীত চর্চ্চা করতে-করতে। খালি মিটিং, খালি আচার্য্য উপাচার্য্য দেবতা উপদেবতার ধমক খাওয়া ছাড়া এখনকার আমরা কিছু করছি একথা বলতে পারিনে। ডবল 'চ' দেওয়া 'চ্চেন' শিশুকাল থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে দেখি, স্থবিরেরাই আমাদের মানুষ কচ্চেন, খেলাচ্চেন, পড়াচ্চেন, পাশ কচ্চেন, ছুটি ছুটি খেতে দিচ্চেন, বিয়ে দিচ্চেন, আমোদ করাচ্চেন, জেলে পাঠাচ্চেন, চরকা কাটাচ্চেন, খদ্দর ধরাচ্চেন। "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" গীতার এই শোলোকটাকে গান বলে ভুল করোনা। সব 'চ্চেন' গুলোর মতো এও একটা ভয়ঙ্কর পুরোনো 'চ্চেন্'; এর মধ্যে থেকে মনঅশ্বটিকে বার করে নিয়ে যাও, ছেড়ে দাও তাকে ইচ্ছাসুখে বিচরণ করতে হে আমাদের স্থবিরের স্থবিরসকল তাকে করতে দাও 'চি'—লিখচি, পড়চি, গাইচি, খেলচি ইত্যাদি শব্দ। তাকে নিযুক্ত হওয়া থেকে ছুটি দিয়ে বিমুক্ত কর; রসগোল্লার রসে মাখানো চাবুকে পিঠ চুলকে দেওয়ার মানে কি তা' সে বুঝে নিক্ একবার আকের ক্ষেতে চরে-ফিরে স্বাধীনভাবে গঙ্গাযাত্রার আগে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# সঙ্কলন

## ভারতের ঐশ্বর্য্য

ভারতের ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সম্রাট শাহ্‌জহানের রাজ্যকালেই পাওয়া যায়। প্রাচ্য রাজসিক ঐশ্বর্য্য-গরিমায় ভারতবর্ষ বোধ হয় সেই সময় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আব্দুল হমিদ্ লাহোরীর

একটি ঠিক ধারণা করিতে পারা যায়। তখনকার টাকার মূল্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ২½ শিলিং অর্থাৎ আঠার আনার সমান। এই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখন এক টাকায় যে জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার সাতগুণ জিনিষ পাওয়া যাইত।

সম্রাটের খাস্ মহালের আয় ছিল ১¼ কোটী টাকা, তাহা হইতে সম্রাটের নিজের খরচ চলিত।

রাজত্বের প্রথম ৭০ বৎসরে শাহ্‌জহান দান ও পুরস্কার কার্য্যে ৯½ কোটী টাকা ব্যয় করেন, তাহার মধ্যে ৪¼ কোটী টাকা নগদ আর ৫ কোটী টাকার জিনিষ-পত্র।

প্রাসাদসৌধ প্রভৃতি নির্ম্মাণে তিনি কি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

| | |
|---|---|
| আগ্রার সৌধমালাঃ— | |
| দুর্গাভ্যন্তরস্থ মোতী মস্‌জীদ, প্রাসাদ ও প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান | ৬০ লক্ষ টাকা |
| তাজমহল | ৫০ ’ ’ |
| দিল্লীর সৌধমালাঃ— | |
| প্রাসাদ-সমূহ | ৫০ লক্ষ টাকা |
| জুম্মা মস্‌জীদ | ১০ ’ ’ |
| দিল্লী নগরীর চারিদিকের প্রাচীর | ৪ ’ ’ |
| দিল্লীর সহরতলীর ইদ্‌গাহ | ½ ’ ’ |
| লাহোরের সৌধমালাঃ— | |
| প্রাসাদ, উদ্যান ও খাল | ৫০ লক্ষ টাকা |
| কাবুলের সৌধমালাঃ— | |
| মস্‌জীদ, দুর্গ, প্রাসাদ ও নগর-প্রাচীর | ১২ „ ’, |
| কাশ্মীরের সৌধমালাঃ— | |
| প্রাসাদ ও উদ্যান | ৮ লক্ষ টাকা |
| কান্দাহারের সৌধমালাঃ— | |
| কান্দাহার বিস্ত ও জমিন্দাবারের দুর্গ | ৮ ’ ’ |
| আজমীরের সৌধমালাঃ— | |
| আজমীর ও আহ্‌মদাবাদ | ১২ , , |
| মুখলিশ্‌পুরের সৌধমালাঃ— | |
| রাজপ্রাসাদ | ৬ , , |
| যুবরাজ দারাশুকোর প্রাসাদ | ২ , , |
| | ২৭২½ লক্ষ টাকা |

সম্রাটের ৫ কোটী টাকার হীরা-জহরত ছিল। তা বাদে ২ কোটী টাকার হীরা-জহরত শাহজাদা ও শাহজাদী ও অন্যান্য সকলকে দান করিয়াছিলেন।

সম্রাট নিজে মাথায়, গলায়, বাহুতে ও কোমরে যে সকল গহনা পরিতেন, তারই হীরা-জহরতের মূল্য ছিল, ২ কোটী টাকা। এই সম্রাটের নিজ ব্যবহার্য্য ২ কোটী টাকা মূল্যের রত্নালঙ্কার হারেমে দাসীদের জিম্মায় থাকিত। বাকী ৩ কোটী টাকার রত্নালঙ্কার বাহিরে ক্রীতদাসদের জিম্মায় থাকিত।

সম্রাটের জপমালায় ৫ খানা রুবি ও ৩০টী মুক্তা ছিল। জপমালাটীর মূল্য ছিল ৮ লক্ষ টাকা। এই জপমালাটী ছাড়া আরও দুইটী জপমালা ছিল। তাহারও প্রত্যেকটীতে ১২৫টী করিয়া বড় বড় রুবি ছিল। প্রত্যেক দুটী জপের দানার মাঝখানে একটী করিয়া ইয়াকুতও (yaqut) ছিল; জপমালার সুমেরুটি (মাঝখানের বড় রুবিটার) ওজন ছিল ৩২ রতি, আর তার মূল্য ছিল ৪০,০০০ হাজার টাকা। আর দু'টো মিলিয়া দাম ছিল ২০ লক্ষ টাকা। এই জপমালার রুবি প্রভৃতির অধিকাংশই সম্রাট আকবরের সংগৃহীত।

প্রথম জপমালাটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর রত্নাদি ছিল। পগ্‌ড়ী ঘেরা সরপেচ—এই (serpech) সব:চেয়ে দামী ও বড় রুবিগুলি ছিল। সিংহাসনাধিরোহণ (জলস) এর বাৎসরিক উৎসবের দিন শুধু এই বহুমূল্য সরপেচ্ সম্রাট পগ্‌ড়ীতে ব্যবহার করিতেন। ইহাতে ৫টী বড় রুবি, ২৪টী মুক্তা ছিল। মাঝখানের বড় রুবিটীর ওজন ২২৮ রতি ও মূল্য ২ লক্ষ টাকা, এবং সরপেচ্‌টীর সর্ব্বসমেত মূল্য ১২ লক্ষ টাকা। ১৬৪৪ খৃঃ ১১ ই নবেম্বরে এই সরপেচের সহিত ৪০,০০০ হাজার টাকা মূল্যের একটী মুক্তা গাঁথিয়া দিয়া ইহার মূল্য আরও বৃদ্ধি করা হয়। সম্রাটের নিজের হীরা-জহরতের মধ্যে সব চেয়ে বড় হীরার ওজন ৪৩০ রতি এবং মূল্য ২ লক্ষ টাকা। এই রুবিটী অবশ্য সরপেচের বড় রুবিটী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। আর একটী ৪৭ রতি ওজনের রুবি ছিল, সেটীর মূল্য ৫৩ লক্ষ টাকা।

১৬৫৩ খৃঃ ১২ই মার্চ্চ তারিখে সম্রাট শাহ্‌জহান সর্ব্বপ্রথম তাঁর বড় সাধের ময়ুর সিংহাসনে উপবেশন করেন। হমিদ লাহোরী বলেন, "সম্রাট আকবর, জহাঙ্গীর, শাহজহান ইঁহারা তিন পুরুষ ধরিয়া বহু হীরা, মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন। লোকে যদি তাহা না দেখিল তবে তাহার মূল্য কি?" সম্রাটও এরূপ ভাবিয়া বাহির-বাড়ীতে ক্রীতদাসদের কাছে যে ২ কোটী টাকা মূল্যের হীরা জহরত থাকিত তাহা হইতে ভাল ভাল কএকটী বাছিয়া লইলেন। এই কএকটীর মূল্য ছিল ১৬ লক্ষ টাকা। সরকারী স্বর্ণকারদের ডাকিয়া এই সকল হীরা মুক্তা প্রভৃতির সঙ্গে এক লক্ষ তোলা সোনাও দেওয়া হইল। তখন এই এক লক্ষ তোলা সোনার মূল্য ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। বেবাদল খাঁ ছিলেন স্বর্ণকারদের প্রধান। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে এই সোনা ও হীরা প্রভৃতি দিয়া ময়ুর সিংহাসন নির্ম্মিত হইল। ময়ুর সিংহাসনখানি ৩¼ গজ লম্বা, ২½ গজ চওড়া ও ৫ গজ উঁচু ছিল। সিংহাসনের ছাদের তলা এনামেল করা হইল; ছাদের ভিতরের দিকে খুব অল্প সংখ্যক হীরা মুক্তা বসান ছিল কিন্তু বাহিরের দিকে অসংখ্য পাথর বসান ছিল। বারটী পান্নার থামের উপর ছাদ। তার উপর মণিমুক্তা-খচিত দুইটী ময়ুর আর এই দুই ময়ূরের মাঝে ঐরূপ মণিমুক্তা-খচিত একটী গাছ।

গদিতে উঠিবার তিনটী সিঁড়ি। সিঁড়িগুলি আবার রেলিং দিয়া ঘেরা

শুধু সম্রাটের বসিবার জায়গার সামনে কোনও রেলিং ছিল না ; অন্য এগার দিকেই রেলিং ছিল। এই এগারটী বেষ্টনীর মধ্যটাই ছিল সবচেয়ে ভাল। এই মধ্যটাতেই সম্রাট হেলান দিয়া বসিতেন। এইটাই তৈয়ারী করিতে খরচ পড়িয়াছিল ১০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্য-মণিটীর দাম ১ লক্ষ টাকা, এই মধ্য-মণিটী পারস্ত সম্রাট প্রথম শাহ আব্বাস সম্রাট জহাঙ্গীরকে উপহার দেন। এই রুবিটীতে তৈমুর, মীর শাহরক্, মীর্জ্জা উলুক বেগ, শাহ আব্বাস, আকবর-পুত্র জহাঙ্গীর ও শাহজহানের নাম খোদিত ছিল। সিংহাসনের ভিতরের দিকে হাজী মহম্মদ জান কুদ্‌শী রচিত একটী কবিতা (৪০ লাইনে) মীণা করা অক্ষরে লিখিত হয়। কবিতাটীর শেষ তিনটী শব্দ ছিল এই—আওরঙ্গ-ই-শাহানশা-ই-আদিল অর্থাৎ "ন্যায়পরায়ণ রাজাধিরাজের সিংহাসন।" তারপর সিংহাসনটীর নির্ম্মাণের তারিখ দেওয়া।

স্বর্ণকার প্রভৃতির মাহিয়ানা বাদে শুধু সিংহাসন তৈরীর মাল-মশলা ক্রয় করিতেই এক কোটী টাকা খরচ হইয়াছিল।

ভারতের এই বিপুল রাজকীয় অর্থ-সম্ভার লুণ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা তখনকার দিনে যথেষ্টই ছিল। অতএব ইহা লুণ্ঠনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সেইরূপ বিপুল সৈন্য-সামন্ত রাখিতে হইত। তাই দেখিতে পাই ১৬৪৮ খৃঃ সম্রাট-বাহিনী ছিল—

২০০,০০০ অশ্বারোহী
৮,০০০ মনসবদার
৭,০০০, আহদী এবং অশ্বারোহী তীরন্দাজ
৪০,০০০ পদাতিক তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ

ইহার মধ্যে ১০,০০০ হাজার সম্রাটের সঙ্গে থাকিত। বাকী ৩০,০০০ হাজার বিভিন্ন সুবায় থাকিত।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন রাজপুত্র ও আমীর-ওমরাহের অধীনে ১৮৫,০০০ অশ্বারোহী ছিল। সর্ব্বসমেত ৪৪০,০০০ পল্টন ছিল। এই সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন পরগণার ফৌজদার ও ক্রোরী আম্‌লাদের অধীনেও যে সকল স্থানীয় পল্টন ছিল, তাহাদের হিসাব ধরা হয় নাই।

শাহজহানর বন্দী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে নিজেকে ৯ লক্ষ সোয়ারের প্রভু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তখনকার দিল্লীশ্বরের পল্টন সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ ছিল, যদিও সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার অধীনে ছিল না।

প্রভাতী, ভাদ্র, ১৩২৯। শ্রীযদুনাথ সরকার।

---

## ভারত-শিল্পতত্ত্ব

শিল্প মানব-চিত্তবৃত্তির ভাব-সম্পদের বাহ্যবিকাশ ;—মানবপ্রতিভা-

শিল্প-শব্দের ব্যুৎপত্তি যেভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ইহার এই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—"শিল্পং কৌশলং শীল্ সমাধৌ।" "শীল্ সমাধৌ"—(উর্ণাদি-সূত্রানুসারে ত-প্রত্যয়ে) নিপাতনে শিল্পশব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছিল। তাহাতে সমাধির,—চিত্তবৃত্তির একাগ্রতার,—উল্লেখ করিয়া, শিল্পকে একাগ্রতা-সমুদ্ভাবিত কৌশলোৎপন্ন বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। এই ব্যুৎপত্তি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে,—সকল শিল্পই কৌশলোৎপন্ন,—সে কৌশল মানব-চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা সমুদ্ভাবিত। তাহা অনুকৃতি নহে,—সৃষ্টি।

সকল শিল্পের উৎপত্তি-রহস্য এক ; কিন্তু সকল শিল্প একরূপ নহে,—লক্ষ্যের তারতম্যে দুই ভাগে বিভক্ত। যাহার মুখ্য লক্ষ্য যেন তেন প্রকারেণ অভীষ্টসাধন, তাহা এক শ্রেণীর শিল্প। যাহার মুখ্য লক্ষ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, তাহা আর এক শ্রেণীর শিল্প। যাহার মুখ্য লক্ষ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, তাহা অধিক প্রতিভাব্যঞ্জক বলিয়া অধিক সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। তাহা যে পরিমাণে চিরসুন্দরের অসীম সৌন্দর্য্যের আভাস প্রদান করে, সেই পরিমাণে অনির্ব্বচনীয় ;—সেই পরিমাণে সকল দেশে, সকল যুগে, সকল মানবের নিকট সমাদর লাভের অধিকারী। পাশ্চাত্য-সাহিত্যে এই শ্রেণীর শিল্প "সুকুমার শিল্প" নামে অভিহিত। কাহারও কাহারও মতে ইহাই কেবল শিল্পপদবাচ্য ; এতদতিরিক্ত শিল্প শিল্প নহে ;—পণ্যদ্রব্য। যতই বিস্ময়োৎপাদক হউক না কেন, তাহা কেবল কল্পনা-কৌতুক ;—যতই মূল্যবান্ হউক না কেন, তাহা কেবল মানব-প্রতিভার অকিঞ্চিৎকর রচনা-বিলাস।

শিল্প-স্রষ্টার সাধারণ নাম—শিল্পী। কিন্তু শিল্প যেমন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, শিল্পীও সেইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাচীন ভারতে দুই শ্রেণীর শিল্পী দুই প্রকার সামাজিক অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। একশ্রেণী "কারু" বা "কারুক" নামে,—আর এক শ্রেণী "শিল্পী" নামে অভিহিত হইত। "কারুকের" তুলনায় "শিল্পী" অধিক মর্য্যাদা লাভ করিত। একালের "কারিকর" শব্দ সেকালের "কারুক" শব্দের অপভ্রংশ। "কারুক" বা "কারিকর" শ্রমজীবী মাত্র ;—উদ্ভাবক নহে। সে কেবল অপরের উদ্ভাবিত কৌশল-শিক্ষায় এবং দ্রব্য নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্ত। "কারুকের" এবং "শিল্পীর" মধ্যে এইরূপ পার্থক্য থাকায়, স্মৃতিশাস্ত্রে উভয়ের নামই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—"যন্ত্রাকরে কারুক শিল্পিহস্তে।" বিষ্ণুসংহিতার এই বচনাংশের "কারুক" এবং "শিল্পী" সেই পার্থক্য সূচিত করিতেছে। আপদ্ধর্ম্মকালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ব্যক্তির পক্ষে জীবনোপায় নির্দ্দেশ করিবার সময়ে, মনুসংহিতায় (১০।১১৬) "শিল্প" একটি উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।

এই বচনোক্ত "শিল্প" কারু নহে, ইহা ইঙ্গিতমাত্রে ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায় ; ইহার ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট লিখন প্রভৃতি কর্ম্মকেই "শিল্প" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন "প্রভৃতি" শব্দ তুল্য-শ্রেণীর কর্ম্ম সূচিত করিয়া বলিতেছে,—আপদ্ধর্ম্মকালে যাহা দ্বিজাতির অবলম্বনীয় তাহা কারু শিল্প নহে, কলা শিল্প। অমরকোষের টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন,—যাহারা "কারু" নামে পরিচিত, তাহাদের মধ্যে পাঁচটি জাতির লোক "শিল্পী" বলিয়াও কথিত। যথা,—"তক্ষা চ তন্তুবায়শ্চ নাপিতো রজকস্তথা।

পঞ্চমশ্চর্ম্মকারশ্চ কারবঃ শিল্পিনো মতাঃ॥"

"এই বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—সকল "কারু" সেকালে "শিল্পী" নামে পরিচিত ছিল, এই বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—সকল "সকল" সেকালে "শিল্পী" নামেও কথিত হইত। এই পাঁচটী জাতির লোক শ্রমজীবী ছিল না ; স্ব স্ব শিল্পকর্ম্মে উদ্ভাবনপ্রতিভারও পরিচয় দান করিত। তজ্জন্য ইহারা গৌরবসম্পদ "শিল্পী" নামও প্রাপ্ত হইয়াছিল। জাতিভেদে সে প্রতিভায় অনাদরের কারণ হইত না, ইহাতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোষশাস্ত্রে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য উল্লিখিত হয় নাই। তাহাতে "শিল্পং কলাদিকং কর্ম্ম" বলিয়া সাধারণভাবে শিল্পশব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং অমরসিংহ কারু এবং শিল্পীকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র কারুশব্দে শিল্প ও শিল্পীকে তুল্য ভাবে সূচিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্থলে শিল্পশব্দ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল শিল্পদ্রব্যই সাধারণভাবে শিল্প নামে কথিত হইতে পারে। কিন্তু মর্য্যাদার তারতম্যে একশ্রেণী কারু শিল্প, আর এক শ্রেণী কলাশিল্প। স্মৃতিপথে সেই পার্থক্য সূচিত হইয়াছে।

শুক্রনীতিসারে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে প্রাসাদ প্রতিমাদির নির্ম্মাণ পদ্ধতির শাস্ত্রকে "শিল্পশাস্ত্র" এবং কাচাদির নির্ম্মাণপদ্ধতির শাস্ত্রকে "কলাশাস্ত্র" বলা হইয়াছে। ইহাতে কৌশল বিকাশ কলা নামে, এবং সৌন্দর্য্যবিকাশ শিল্পনামে অভিহিত হইয়াছে। ভরত নাট্যশাস্ত্রেও এইরূপ পার্থক্য সূচনার্থ ব্যক্ত হইয়াছে,—এমন কলা নাই, এমন শিল্প নাই, যাহা নাট্যে প্রকাশিত হয় না।" যথা— "ন সা কলা ন তচ্ছিল্পং যন্নাট্যে ন প্রকাশিতম্।" প্রধান প্রধান বিদ্যার সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ। এবং কলার সংখ্যা চতুঃষষ্টি বলিয়া শুক্রনীতিসারে উল্লিখিত আছে। তাহাতে বিদ্যার এবং কলার সূচনার্থ লিখিত হইয়াছে যে,—যাহা কেবল বাগ্ব্যাপারসাধ্য তাহাই "বিদ্যা" ; যাহা মূর্খব্যক্তিও সম্পাদন করিতে পারে, তাহাই "কলা।" যথা,— "যৎ যৎ স্যাৎ বাচিকং সম্যক্ কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞিতং।

শক্তো মূকোঽপি যৎ কর্ত্তুং কলাসংজ্ঞন্তু তৎস্মৃতম্॥"

এই লক্ষণানুসারে সংগীত একটি "বিদ্যা";—বাদ্য 'বিদ্যা' নহে,"কলা"। সুতরাং "কলা" কেবল কৌশল ; "শিল্প" তাহা হইতে পৃথক;—তাহা কৌশল নহে, "বিদ্যা," এরূপ শ্রেণীর বিভাগ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বামন-কৃত "কাব্যালঙ্কার সূত্র-বৃত্তিতে" গীত-কলা নামে উল্লিখিত থাকায়, শুক্রনীতির সহিত পার্থক্যই সূচিত হয়। গোপেন্দ্র-ত্রিপুরহর বামনের গ্রন্থের "কাব্যালঙ্কার-কামধেনু" টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে নৃত্যগীতাদি কলা নামে উল্লিখিত এবং কলার সংখ্যা চতুঃষষ্টি, উপকলার সংখ্যা চারি শত বলিয়া উল্লিখিত। তিনি ভামহের গ্রন্থ হইতে চতুঃষষ্টিকলার যে নামাবলী উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বাৎস্যায়নের কামসূত্রোক্ত অথবা শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকায় (১০।৪৫।৩৫) উদ্ধৃত নামাবলীর সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীধর স্বামী যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাকে "শৈবতন্ত্রোক্ত" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সকল দেশে, সকল যুগে, সকল মানবের নিকটেই শিল্পের লক্ষ্য এক ; তাহা সৌন্দর্য্য-বিকাশ চেষ্টা। কিন্তু সৌন্দর্য্যানুভূতির তারতম্যে,—সৌন্দর্য্য-বিকাশক শিল্প-প্রতিভার তারতম্যে,—রচনা-সহায়ক উপাদানবস্তুর তারতম্যে,—শিল্প-সুষমার তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রতিভার তারতম্যে যুগভেদে এবং স্থানভেদে একই দেশে দ্বিবিধ রচনা-রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যুগভেদে, দেশভেদে, অথবা উদ্ভাবয়িতাভেদে শিল্প নানা নামে পরিচিত হয়।

মূল লক্ষ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও, সৌন্দর্য্যানুভূতির তারতম্যে পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে। প্রাচ্য যেখানে সৌন্দর্য্যকে আকার দানের চেষ্টা করিয়াছে, প্রতীচ্য সেখানে আকারকেই সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। ইহা হইতে দুইটি পৃথক্ শিল্পাদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে ;—একটি ভাবসর্ব্বস্ব, অপরটি আকারসর্ব্বস্ব। একটিতে নর নর নহে, দেবতা ; অপরটিতে দেবতা দেবতা নহে, নর।

শিল্প সকলকেই আনন্দ দান করে, কিন্তু সকলকে এক শ্রেণীর আনন্দ দান করিতে পারে না। অধিকারী-ভেদে, চিত্রের এক এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য এক এক শ্রেণীর দর্শকের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে। ইহা বুঝাইবার জন্য বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে (৩।৪১।১২) লিখিত হইয়াছে,—রেখাবিন্যাস আচার্য্যগণের নিকট, বর্ত্তনাবিন্যাস অভিজ্ঞগণের নিকট, অলঙ্কার-বিন্যাস রমণীগণের নিকট, এবং বর্ণবিন্যাস জনসাধারণের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে। যথা,—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি, বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥"

সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩২৯ শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

# ইন্দিরা দেবী

বাঙলায় স্ত্রীশিক্ষার সবে এই আরম্ভ এ কথা বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যে যে সকল মহিলা লেখিকার আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী একজন অগ্রণী ছিলেন। গত বিজয়া দশমী তিথিতে উষার প্রাক্কালে ৪৪ বৎসর মাত্র বয়সে ইন্দিরা দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যু,—হিন্দুনারীর পক্ষে যত শ্লাঘ্যাই হৌক্, তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্‌লা দেশ ও বাঙ্‌লা সাহিত্য যে বহু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

ইং ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে আষাঢ় মাসে ইন্দিরা দেবীর জন্ম হয় কলিকাতা, বাগবাজারে,—তাঁহার মাতামহ ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে। ইন্দিরা দেবী প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা।



ইন্দিরা দেবী

ইন্দিরা দেবী শৈশবে পিতামহ ভূদেব বাবুর কাছেই শিক্ষালাভ করেন। বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান তাঁহার অল্প ছিল না। এই নাতিনীটি ভূদেব বাবুর অত্যন্ত আদরের ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে ভূদেব বাবু তাঁহাকে ছোট ছোট গল্প বলিতেন এবং গল্প লইয়া আলোচনা করিতেন, গল্পের শেষাংশ বানাইতে উৎসাহ দিতেন। একদিন ভূদেব বাবু গল্প করেন,—একটা মাটীর ঢেলা ও একটি গাছের পাতা,—দুজনে ভারী ভাব ছিল। বৃষ্টি হইলে পাতাটি ঢেলাকে ঢাকিয়া রক্ষা করিত, বৃষ্টির জলে সে না গলিয়া যায়—আর ঝড় হইলে মাটীর ঢেলা পাতাটিকে বুকে চাপিয়া রাখিত' ঝড়ে না সে উড়িয়া যায়। পাঁচ বৎসরের মেয়ে ইন্দিরা এইটুকু শুনিয়াই পিতামহকে বলেন,—না, এ গল্প ভাল নয়। ঝড়-বৃষ্টি একসঙ্গে হইলে পাতাও উড়িবে ঢেলাও গলিবে।

দশ বৎসর বয়সে হুগলির গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ইন্দিরার বিবাহ হয়। ললিত বাবু কলিকাতার এণ্ড্ ইউল কোম্পানির অফিসে একজন বড় কর্ম্মচারী।

অনেক সময়ই দেখা যায়, বিবাহ হইলে বাঙালীর মেয়ের লেখাপড়ার শেষ হয়। ইন্দিরা দেবীর তাহা হয় নাই। তাঁহার পাঠানুরাগ ছিল খুব প্রবল। ভূদেববাবু নিজে তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এগারো-বারো বৎসর

বয়সে পিতামহের কাছে ইন্দিরা দেবী রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, ভট্টি, কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যাদি টীকা-সমেত পাঠ করেন। এই সময় তিনি বাঙ্‌লা ছন্দে কুমার, রঘু, ভট্টি কাব্যের অনুবাদও করেন। সুন্দর অনুবাদ তবে সে অনুবাদ কখনো ছাপা হয় নাই। ইহার পর নানা ছন্দে তিনি নানা কবিতা রচনা করেন—কিন্তু ছাপাইয়া সেগুলি লোকচক্ষুর সামনে ধরিতে তাঁহার অত্যন্ত কুণ্ঠা ছিল।

তার পর মাসিকপত্রে দুই-চারিটি গল্পে হাস্যকর উদ্ভটতার সমালোচনা করিয়া তিনি প্রবন্ধ লেখেন। সে প্রবন্ধ 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয়—তাহার নীচে লেখকের নাম থাকিত, "শ্রীঅপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।" এ সমালোচনায় তাঁহার সাহিত্য জ্ঞানের যেমন পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তেমনি বুঝা গিয়াছিল, তাঁর লেখার styleও বেশ পাকা। সে সমালোচনা পড়িয়া ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা লেখকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া সে লেখার খুব তারিফ করিয়া চিঠি লেখেন।

ইন্দিরা দেবীর আসল নাম ছিল, সুরূপা দেবী। প্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁহার মধ্যম সহোদরা। ইন্দিরা দেবী কখনো স্বনামে রচনা প্রকাশ করিতে চাহিতেন না; কেমন একটা স্বাভাবিক কুণ্ঠায় বাধিত। ১৩১৫ সালে যখন শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর সম্পাদন-ভার নূতন করিয়া গ্রহণ করেন, তখন তিনি ইন্দিরা দেবী ও অনুরূপা দেবীর লেখা জোর করিয়া ভারতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে ছদ্মনামে তাঁহার বহু কবিতা এডুকেশন গেজেটেই প্রকাশিত হইত।

ভারতীতে ইন্দিরা দেবীর নামে গল্প ছাপা হইলে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ( মিসেস্ পি, চৌধুরী ) অনেকের কাছ হইতে পত্র পান যে লেখা বেশ হইয়াছে। তিনি তখন ইন্দিরা দেবীকে ( সুরূপা ) চিঠি লেখেন, এ তো বেশ! তোমার লেখার তারিফ পাচ্ছি আমি! অনেক সময় আবার মিসেস্ চৌধুরীর স্বরলিপির তাগিদ্ ইন্দিরা দেবীর কাছে আসিয়া হাজির হইত। ভারী গোল বাধিত। সেই সময় হইতে মিসেস্ চৌধুরীর রচনা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ছাপ মারিয়া বাহির হইতে থাকে—বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর উৎসাহে ইন্দিরা দেবী গল্প রচনায় খুবই ঝোঁক দিলেন; এবং নানা মাসিকপত্রে তাঁহার গল্প প্রকাশিত হইতে লাগিল। তারপর ১৩১৯ সালে ভারতীর বর্ত্তমান অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এক রকম জোর-জবরদস্তি করিয়া তাঁহাকে গল্পের বই ছাপিতে ধরিয়া বসিলেন। তিনি প্রুফ দেখা ও দপ্তরী ছাপাখানার সমস্ত হাঙ্গামা, সব ভার ঘাড়ে লইলে ইন্দিরা দেবী তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'নির্ম্মাল্য' প্রকাশ করেন। খুব শীঘ্রই এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়। তার পর "কেতকী" প্রকাশিত হয়।

## "কেতকী" ও ছোট গল্পের বই

এই সময় ভারতীর বর্ত্তমান সম্পাদক মণিলাল বাবু ও সৌরীন্দ্র বাবু বিদেশীয় উপন্যাসের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দিরা দেবীরও আগ্রহ হয়, তিনি একখানি ইংরাজী উপন্যাসের অনুবাদ করেন। ইংরাজী তিনি অল্পস্বল্প জানিতেন। সে জানায় বহির তর্জ্জমার ভার লওয়া চলে না। কিন্তু এমনি তাঁর উৎসাহ যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়া কোনান্ ডয়েল রচিত মিষ্ট্রিস অফ ক্লুম্বার নামক গ্রন্থ আগাগোড়া পড়িয়া তিনি তাহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থ 'সৌধ-রহস্য' নামে ভারতীতে প্রথম ধারাবাহিক বাহির হয়। অনুবাদ চমৎকার হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা এমন সরল ও প্রাঞ্জল—কোথাও এতটুকু আড়ষ্ট ভাব নাই। ইংরাজীতে কৃতবিদ্য অনেক পুরুষ লেখকও এমন সরস নিপুণ অনুবাদ করিতে পারেন কিনা, জানিনা!

তারপর তাঁর ঝোঁক চাপে মৌলিক উপন্যাস লেখার দিকে। সংসারে নানা কাজ—তিনি কোনদিন সাহিত্যের অজুহাতে সংসারকে অবহেলা করেন নাই। সংসারের প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য কড়ায়-গণ্ডায় তিনি বরাবর চুকাইয়া আসিয়াছেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। আর সেই কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর লেখা চলিত। শুধুই কি লেখা! শিল্পেও তাঁর সুন্দর হাত ছিল। ছবিকে কাপড় পরানো—এমন নিখুঁত করিয়া সারিতেন যে

কোন একজিবিশনে সে ছবি গেলে মেডেলের মালা গলায় দুলাইতে পারিত! কিন্তু এই জাহির হওয়ার দিকে তাঁর প্রবৃত্তিই ছিল না। তাই তাঁর হাতের শিল্প আত্মীয়-স্বজনের গৃহে ও নিজের গৃহেই আজ সংরক্ষিত আছে।

১৩২২ সালে তিনি "স্পর্শমণি" উপন্যাস লিখিয়া শেষ করেন। এই উপন্যাস "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় ধারাবাহিক বাহির হয়। এই গ্রন্থ এতখানি জনপ্রিয় হয় যে অতি অল্পকালেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়! এই গ্রন্থের বিশদ সমালোচনা করেন সমালোচক-প্রবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদীর্ঘ সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"লেখিকার বর্ণনাশক্তি, ভাবাভিব্যক্তি, কলা-কৌশল, রস-সঞ্চার-ক্ষমতা, সকলই প্রশংসনীয়। তিনি ঘটনা-সমাবেশ ( plot ) ও চরিত্র বিকাশ ( character ) উভয় অঙ্গেই সমভাবে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অতি সুকৌশলে ক্রমিক রহস্যোদ্ভেদ হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা আন্তরিকতা-পূর্ণ ও মিষ্ট।...... সকল চরিত্রই লেখিকার প্রতিভাগুণে সুন্দর ফুটিয়াছে। এমন কি ক্ষুদ্র চিত্র,—সেকেলে পিসিমা, মুরারির মাতা, ক্ষীরোদমোহিনী, বিদ্যানাথের বাড়ীর ঝী মাতী, রুদ্রকান্তের অন্দরের মোহিনী ঝী, কল্যাণীদের বাটীর ভৃত্য ভজহরি, এই বাস্তব চিত্রগুলিও নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাস্তব বর্ণনার বেশ মুন্সীয়ানা আছে। গ্রন্থকর্ত্রীর নিজের মন্তব্যগুলি সহৃদয়তা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়।" ( ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৫ )

প্রকৃতপক্ষে এই ছবি আঁকাতেই ইন্দিরা দেবীর প্রতিভা খুলিয়াছে বেশী। তাঁহার প্রত্যেক গল্পে প্রত্যেক উপন্যাসে যে-সব চরিত্রের সমাবেশ দেখি, সেগুলিতে একেবারে গোটা জীবন্ত মানুষই দেখি।

স্পর্শমণির পর তাঁর "ফুলের তোড়া", "মাতৃহীন" দুখানি ছোট গল্পের বই ও 'স্রোতের গতি' উপন্যাস বাহির হয়।

গতবৎসর ইন্দিরা দেবীর শরীর খুবই অসুস্থ হয়। এই অসুস্থ শরীরে তিনি 'পরাজিতা' উপন্যাস রচনা করেন। এই সময় ভারতীর সম্পাদক সৌরীন্দ্র বাবুর ( ইনি ইন্দিরা দেবীর মাতৃস্বসৃ-পুত্র ) আগ্রহে তিনি সেই অসুস্থ শরীরেই "প্রত্যাবর্ত্তন" উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন্। এই উপন্যাসখানি গতবৎসর হইতে ভারতীতে বাহির হইতেছে,—এই সংখ্যায় শেষ হইল। শুনিয়াছি, 'প্রত্যাবর্ত্তন' বহুকাল পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া তিনি আর নানা কারণে অগ্রসর করিতে পারেন নাই। সৌরীন্দ্রবাবুর উৎসাহে তিনি আবার বহুদিনকার পুরাতন জীর্ণ খাতা খুলিয়া বসিলেন। গত বৎসর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অবধি লেখা হইলে তাঁর অসুখ এমন বাড়িয়া উঠিল যে চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি বালিতে গঙ্গার তীরে বাসা লইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং বসিয়া লেখার শক্তিও রহিল না। প্রত্যহ ১০৩। ১০৪ ডিগ্রী জ্বর—কি করিয়া লেখা চলে! তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে সৌরীন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিলেন—ভাই সৌরীন, এ যে বিপদে পড়া গেল। এত অসুখে লেখাও যায় না অথচ পাঠকদের কাছে এত-বড় অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকব! একান্তই যদি আর লিখতে না পারি, তুমি এর শেষ করে দাও। পাঠক-সমাজে যেন এত বড় ত্রুটির কলঙ্ক নিয়ে না চলে যেতে হয়।

সৌরীন্দ্র বাবু তাঁকে আশ্বস্ত করেন, বলেন,—না হয় এক মাস দু'মাস নাই বেরুবে,—ভাববেন না। শরীর সারলে লিখবেন।

কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন এ রোগ সারিবার নয়—তাই কারো নিষেধ না মানিয়া সেই প্রবল জ্বরেই তিনি লেখা শেষ করেন। বহিখানি গ্রন্থরূপে ১লা আশ্বিন প্রকাশিত হইয়াছে—তিনি তাহা দেখিয়াও গিয়াছেন।

এখনো তাঁর বহু রচনা মাসিকপত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার ভগ্নী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সেগুলি প্রকাশের ভার লইয়াছেন।

তাঁর রচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব,—সরলতা আর শান্ত সংযত ভাব। অনেক নারীর রচনায় দেখি, পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ এম্‌নি তীব্র হলকা ফুটাইয়া রহিয়াছে যে গা একেবারে জ্বলিয়া যায়! এই ঝাঁজ ইন্দিরা দেবীর রচনায় মোটেই নাই। সরল অনাড়ম্বর সরস মিষ্ট রচনা—পড়িলে চিত্ত মুগ্ধ হয়। প্লটে ঘনঘটা নাই, বিলাতী লেসের বাহার নাই, ইংরেজীর বুকনি নাই, খাঁটী বাংলা [illegible] খাঁটী [illegible] জিনিষ। এই

আত্মম্ভরিতার যুগে জাহিরপনার ঘটার মধ্যে এ সংযম বড় সহজ শ্রদ্ধার বস্তু নয়। ইংরাজী সাহিত্যে Mrs. Henry Wood এর রচনায় যেমন ঘরোয়া ভাব, সরল মধুর চিত্র ফুটাইয়া চিরদিন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রহিয়াছে,ইন্দিরা দেবীর রচনাও তেমনি যতদিন বাঙলা সাহিত্য বাঙলা ভাষা থাকিবে ততদিন বাঙলার খাঁটী উপন্যাস বলিয়া আদর পাইবে।

তাঁর প্রতিভা-বিকাশের মুখে করিয়া ঝরিয়া গেল! এ দুঃখ কখনো ঘুচিবে না। বাঙলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাই এমন একজন প্রতিভাশালিনী লেখিকা সকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন!

শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী।

# চয়ন

## ডিলের প্রথম উদ্ভাবনের কৌতুককর ইতিহাস

চীনদেশে যেমন দিগ্দর্শন যন্ত্র মুদ্রাযন্ত্র, প্রভৃতি উচ্চ-সভ্যোচিত বহু উদ্ভাবনের প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনই সামরিক ব্যায়াম-প্রণালী (drill) উদ্ভাবনের প্রমাণও পাওয়া যায়। সামরিক ব্যায়াম-প্রণালীর ইতিহাস বিশেষরূপে আমোদপ্রদ হইবে মনে করিয়া, আমরা তাহা সঙ্ক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

চীনের 'উ' (Wu) রাজ্যে হোলু (Holu) নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার আশ্রিত সান্‌জু (Sun Izu) নামে এক মহা তেজস্বী ও মনীষী পণ্ডিত ছিলেন। রাজা সৈন্য গঠনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, সৈন্যদের সুশিক্ষার নিমিত্ত নিয়মপ্রণালী বিধিবদ্ধ করিবার জন্য পণ্ডিত সান্‌জুকে অনুরোধ করেন। সান্‌জু নিয়মপ্রণালীর একটী দীর্ঘপত্র রচনা পূর্ব্বক রাজার হস্তে অর্পণ করেন। রাজা উহা পাঠ করিয়া পণ্ডিতকে বলিলেনঃ—"আমি আপনার ১৩টী অধ্যায়ই মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। স্ত্রীলোকদের উপর ঐগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় কিনা?" ইহাতে পণ্ডিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, রাজা অন্তঃপুর হইতে ২৮০টী স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন।

পণ্ডিত তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের প্রথমে রাজার এক এক বেশ্যাকে স্থাপন করিলেন। এখানে তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সম্মুখ" ও "পশ্চাৎ" বলিতে কি বুঝায় তাহাও জানেন। উত্তরে স্ত্রীলোক সকল বলিল, "হাঁ আমরা জানি।" তখন পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন—"যখন আমি বলিব 'সাম্‌নে তাকান্‌'-তখন অবশ্যই আপনারা বরাবর সম্মুখের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিবেন; যখন বলিব, 'বামদিকে আবর্ত্তন করুন্‌', তখন অবশ্যই আপনারা বাঁদিকে মুখ ফিরাইবেন; যখন বলিব 'দক্ষিণদিকে আবর্ত্তন করুন' তখন অবশ্যই ডান্‌দিকে মুখ ফিরাইবেন; যখন বলিব 'ঘুরিয়া আবর্ত্তন করুন্‌' তখন অবশ্যই আপনারা ডান্‌দিক্‌ দিয়া একেবারে পিছনের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইবেন।" এইরূপে আদেশ বুঝাইয়া দিয়া, তথায় হ্রস্বপরশু ও দীর্ঘপরশু অস্ত্রস্থাপন পূর্ব্বক সামরিক ব্যায়াম আরম্ভ করিবার জন্য ভেরী বাজাইতে আদেশ করিলেন্‌। ভেরীবাদ্যের সঙ্গেই 'দক্ষিণে আবর্ত্তন' করিবার জন্য তাঁহার আদেশ উদ্ঘোষিত হইল। স্ত্রীলোকেরা কিন্তু তাঁহার আদেশ শুনিয়া 'হি হি' করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন পণ্ডিত তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, যদি আদেশ বুঝা না যায়, যদি আদেশ অস্পষ্ট হয়, তবে উহা সেনাপতির দোষ বলিতে হইবে, এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার "বামদিকে আবর্ত্তন করুন্‌" বলিয়া আদেশ উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু এবারও স্ত্রীলোকেরা হাসিয়াই ছিল। পণ্ডিত তখন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আদেশ অস্পষ্ট হইলে বা ভালরূপে বুঝিতে পারা না গেলে সেনাপতির দোষ, পক্ষান্তরে আদেশ স্পষ্ট হইলেও যদি সৈনিকেরা অমান্য করে, তবে তাহাদেরই দোষ হয়। এই বলিয়া তিনি দুইদলের দুইজন নেত্রীরই মস্তক ছেদ

বসিয়া এই কৌতুক-দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তিনি এই ভীষণ দণ্ডের কথা জানিতে পারিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—"সেনাপতির সৈন্য পরিচালনার দক্ষতায় আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তোষলাভ করিয়াছি। কিন্তু এই দুইজন অন্তঃপুর-পাচিকার শিরশ্ছেদ হইলে, আমারা পান-ভোজনের রসাস্বাদ পাইবনা। অতএব ইহাদের শিরশ্ছেদ যেন না করা হয়।" কিন্তু পণ্ডিত তদুত্তরে বলিলেন—"আমি যখন রাজার সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন ঐ পদে কার্য্য করিতে যাইয়া, রাজার কোন কোন আদেশ মান্য করিতে সমর্থ নই।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিজ আদেশ কার্য্যে পরিণত করিলেন এবং অন্য দুইটী স্ত্রীলোককে অগ্রস্থানে স্থাপন করিলেন। ইহা করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বাদ্যের আদেশ দিয়া ড্রিল করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার তিনি যেরূপ বলিতে লাগিলেন, ঠিক্ সেরূপভাবেই স্ত্রীলাকেরা অঙ্গ-পরিচালনা করিতে লাগিল, কোন বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হইল না। এখন তিনি রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকগণ এমনই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছে যে, তাহারা জলের বা আগুনের মধ্য দিয়া যাইতেও দ্বিধা বোধ করিবেনা; রাজা স্বয়ং আসিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। রাজা কিন্তু আসিলেন না বা প্রীত হইলেন না; কারণ তিনি পূর্ব্বেই চটিয়াছিলেন। তিনি বরঞ্চ পণ্ডিতের তামাসার সেনাপতিত্ব ঘুচাইয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পর রাজা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে, পণ্ডিত সান্‌জুই সেনাপতির প্রকৃত যোগ্যপাত্র। তখন সান্‌জু যথারীতি সেনাপতি পদে বরিত হইলেন। তাঁহার সহায়ে রাজা হোলু বহুরাজ্য জয় পূর্ব্বক অপনার রাজসম্পদ ও রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌরবান্বিত হইলেন।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

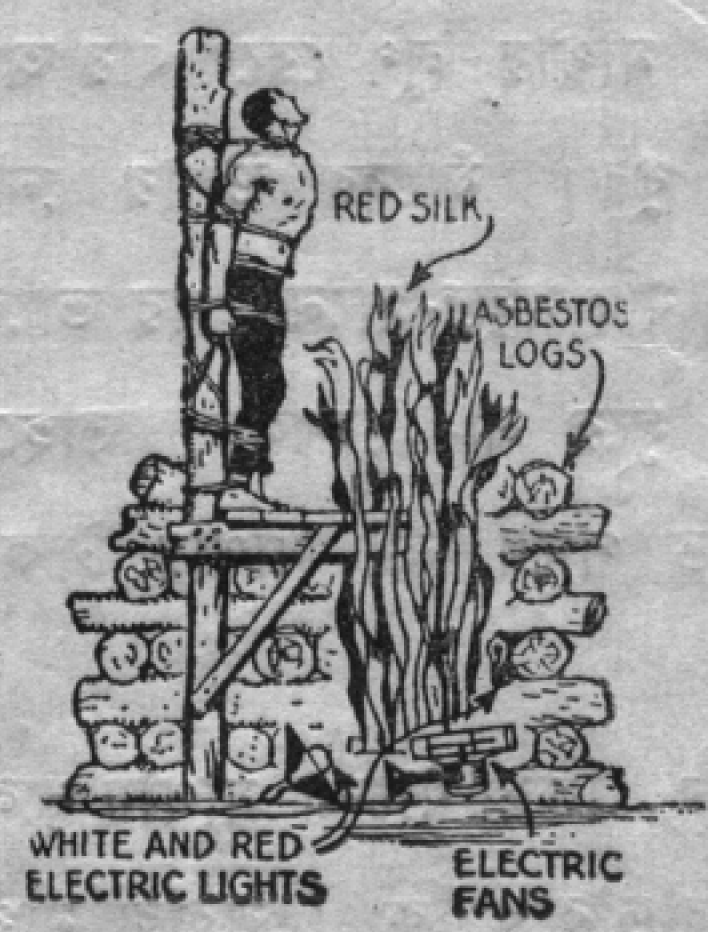
## ষ্টেজের অগ্নিকুণ্ড

থিয়েটারের ষ্টেজে মানুষকে জীবন্ত পোড়ানো হইতেছে, এ দৃশ্য নিখুঁতভাবে দেখানো আজকাল খুবই সম্ভব হইয়াছে; যাহাকে পোড়ানো হইবে, তাহাকে একটুও ভয়-কম্পিত হইতে হইবে না—সে বেশ নির্ভীক বীরের ন্যায় সোজা অগ্নিকুণ্ডে দাঁড়াইয়া থাকিবে, আগুনের শিখা লেলিহান হইয়া উঠিবে অথচ তাহার গায়ে এতটুকু আগুনের আঁচ লাগিবে না—এবং এ দৃশ্যে দর্শকের দল ভয়ে উত্তেজনায় বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইবে। কথাটা শুনিয়া অনেকের তাক্ লাগিতে পারে—তাই ত, কেমন করিয়া এ ব্যাপার সম্ভব হইবে?



রঙ্গমঞ্চে জ্যান্তে দাহ

এ দৃশ্য দেখাইতে যে কাঠের গুঁড়ি সাজানো হইবে, সেগুলা এ্যাস্‌বেষ্টসের তৈয়ারী হওয়া চাই—সেগুলি সরু তারে জড়ানো থাকিবে—আর এই এ্যাস্‌বেষ্টসে কাঠের মত রঙ দেওয়া চাই—তাহাতে ছাইয়ের ছিটার রঙ থাকিবে। কাঠ জ্বলিতেছে, এ দৃশ্য দেখানো হইবে লাল কাগজের পিছনে কতকগুলি ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্ জ্বালাইয়া। আর লাল রেশমের নিশান খাড়া




কৃমির চিতার গুপ্তকথা

করিয়া তাহার নীচে—কাঠের গুঁড়ির মত যেখানে এ্যাসবেষ্টস্ জড়ো করা হইয়াছে—সেইখানে একখানি ইলেকট্রিক ফ্যান্ বসাইয়া দাও। ফ্যান চলিলে উড়ন্ত লাল রেশমে নিশানগুলি হুবহু অগ্নিশিখার ন্যায় দেখাইবে। লাল বাল্‌ব্‌ওয়ালা কতকগুলি ইলেকট্রিক বাতি আশপাশে জ্বালিয়া দিলে চারিধার অগ্নিবর্ণ দেখাইবে এবং দর্শক এ ফাঁকি ধরিতে না পারিয়া ভাবিবে, সত্যই কি বিরাট অগ্নি-ক্রীড়া চলিয়াছে?

—

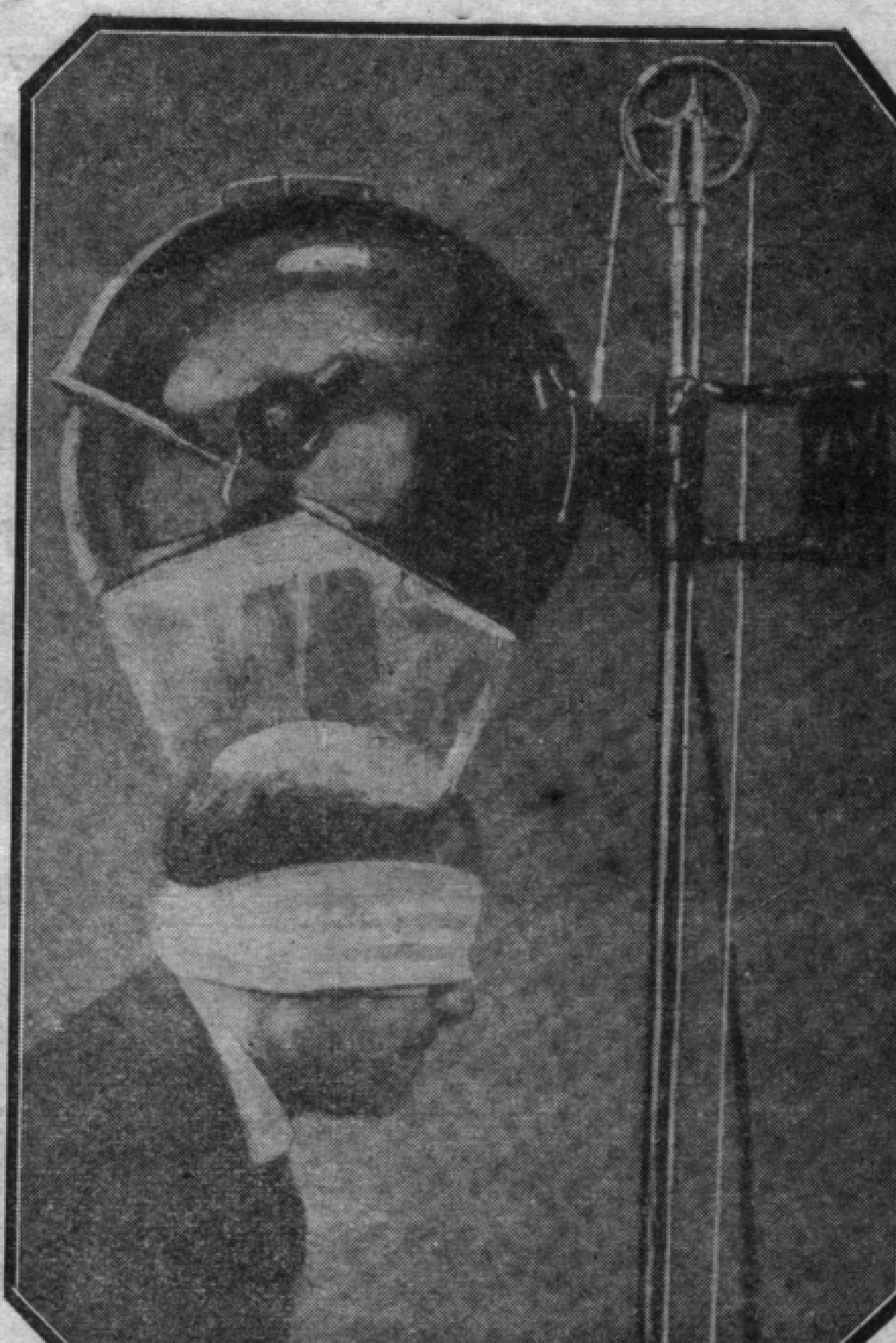
## টাকের ঔষধ

টাকের জ্বালায় অনেকেই জ্বলেন—নানারকম তেল মেখে মাথায় চুল গজাবার চেষ্টায় হয়রাণ হন,—অর্থও তাতে যথেষ্ট নষ্ট করেন—অথচ যে টাক, সেই টাকই মাথায় থেকে যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন তেলে টাক পাকে না। একগাছি চুল মাথা থেকে উঠে গেলে, সেই জায়গায় আবার চুল গজাতে চারটি বছর সময় লাগে। যে চুল টেনে ছিঁড়তে হয়, সে চুলের গোড়া খুব শক্ত আর তা রবারের মত সঙ্কুচনশীল। একটি প্রমাণ লোকের মাথায় কত চুল থাকে, জানেন? চুলের রঙ যদি লাল হয় তাহলে ৩৫০০০ গাছি, কটা রঙের হলে ১০৫০০০ গাছি, কালো চুল ১৫০০০০ গাছি। চুল পাকে কেন? মাথার চামড়া শক্ত হলে—চুলের গোড়া রস পায় না—এই রসই চুলকে কালো রাখে, পাকতে দেয় না। সমুদ্রে নিত্যস্নান করলে মাথার চুল শীঘ্র পাকে। লোণা জল শুকিয়ে মাথায় নুণ রেখে যায় আর তাতে টাক পড়ারও আশঙ্কা খুব। যাঁদের উপায় নেই, সমুদ্রে স্নান করতেই হবে, তাঁরা যদি সমুদ্র-স্নানের পর ভালো অর্থাৎ অ-লোণা জলে মাথা ধুয়ে না ফেলেন, তাহলে তাঁদের চুল চট্ করে পাকতে পারে না, মাথায় টাকও পড়ে না।

যাঁরা মাথায় তেল মাখেন, কিম্বা যাঁদের মাথায় ধুলো লাগে, তাঁদের উচিত প্রতি মাসে দু'বার কি তিনবার মাথা সাফ করা। নিজে নিজে মাথায় ব্রশ চালালে মাথার চুল পাকে, মাথায় টাক পড়ে। ঘনঘন ব্রশ চালালে চুলের গোড়া আলগা হয়, মাথায় চামড়ায় কড়া পড়ে, চুলে রস পওয়া দুর্ল্ভ হয়। অবশ্য স্বাস্থ্য যাঁদের খুব ভালো, তাঁদের চুল চট ক'রে উঠে যায় না।

চুলের দিকে নজর রাখা দরকার। যাঁরা কলে কারখানায় কাজ করেন, তাঁরা যতই সৌখীন বা ধনী হন্ মাথায় তাঁদের টাক ধরেই। মাথায় অতিরিক্ত রৌদ্র লাগালে টাক পড়ে। মেয়েদের মাথায় টাক পড়ে খুব কম। তার কারণ, মেয়েদের চুলের বাড় খুবই বেশী রকমের, আর সে চুল এত ঘন যে চুলের গোড়া সহজে নষ্ট হতে পারে না।



মাথায় আলো-লাগানো

অনেকের মাথায় আবার টাক পড়ার কারণ, পুরুষানুক্রমিকতায়। প্রায় দেখা যায় বাপের মাথায় যেমন টাক, ছেলের মাথাতেও তেমনি টাক পড়ে। পুরুষানুক্রমিক হ'লে এ ব্যাধির প্রতিকার নেই।

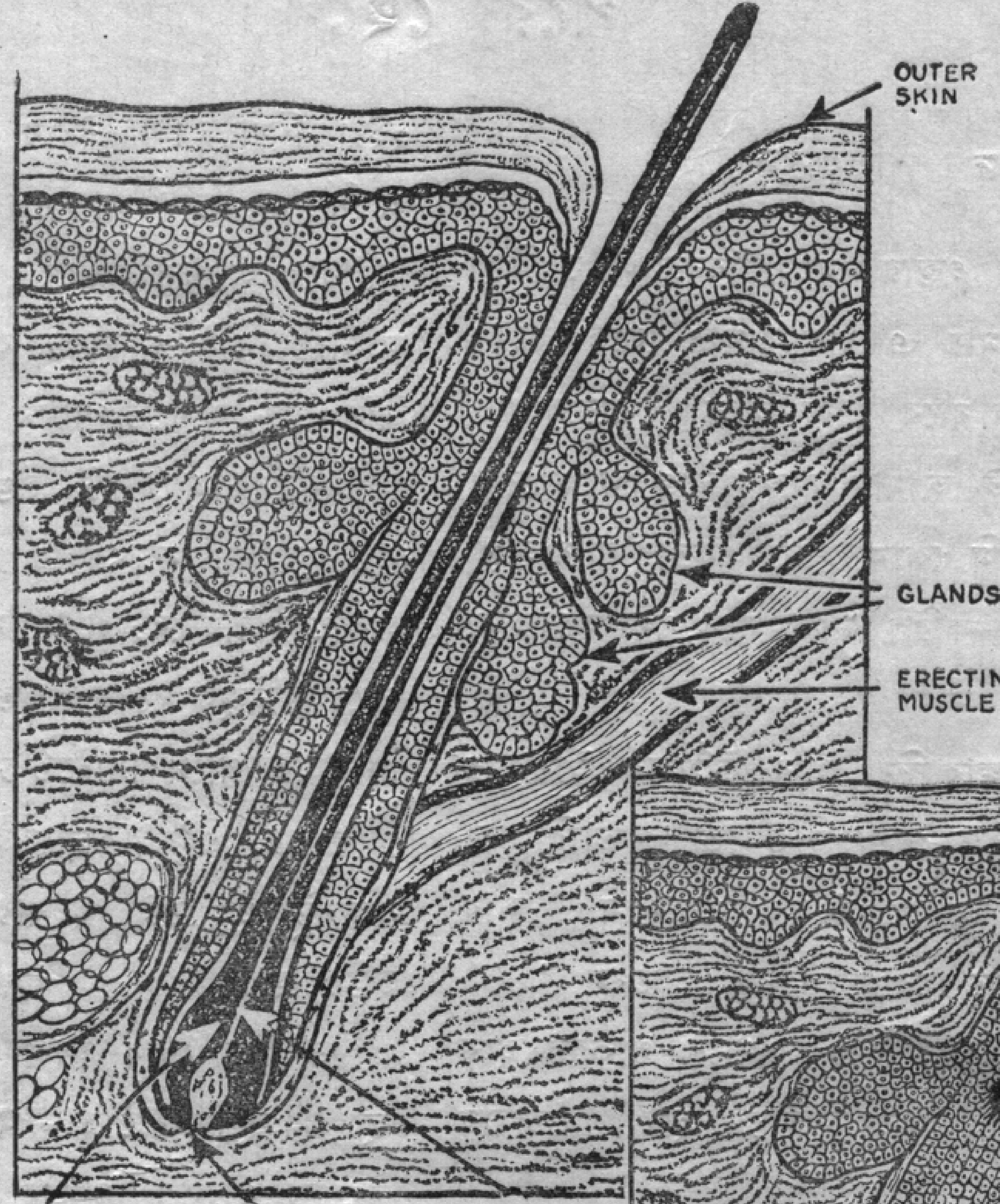
টাইফয়েড বা নিউমোনিয়া রোগে ভুগলে অনেকের মাথায় টাক পড়ে—যত্ন নিলে এ টাক শীঘ্রই সারে। আর

এক রকম টাক পড়া আছে,—সেটা মগজের দোষে। এ টাকের ব্যাধি ছোঁয়াচে। এই ব্যাধিগ্রস্ত টাক-মাথায় যে চিরুণী-ব্রুশ চালানো হয়; সেই চিরুণী-ব্রশে মাথা আঁচড়ালে সুস্থ লোকেরও মাথায় টাক পড়ে। দোকানের হেয়ার কাটারের কাছে চুল ছাটলে এ ভাবে টাক পড়ার ভয় আছে।

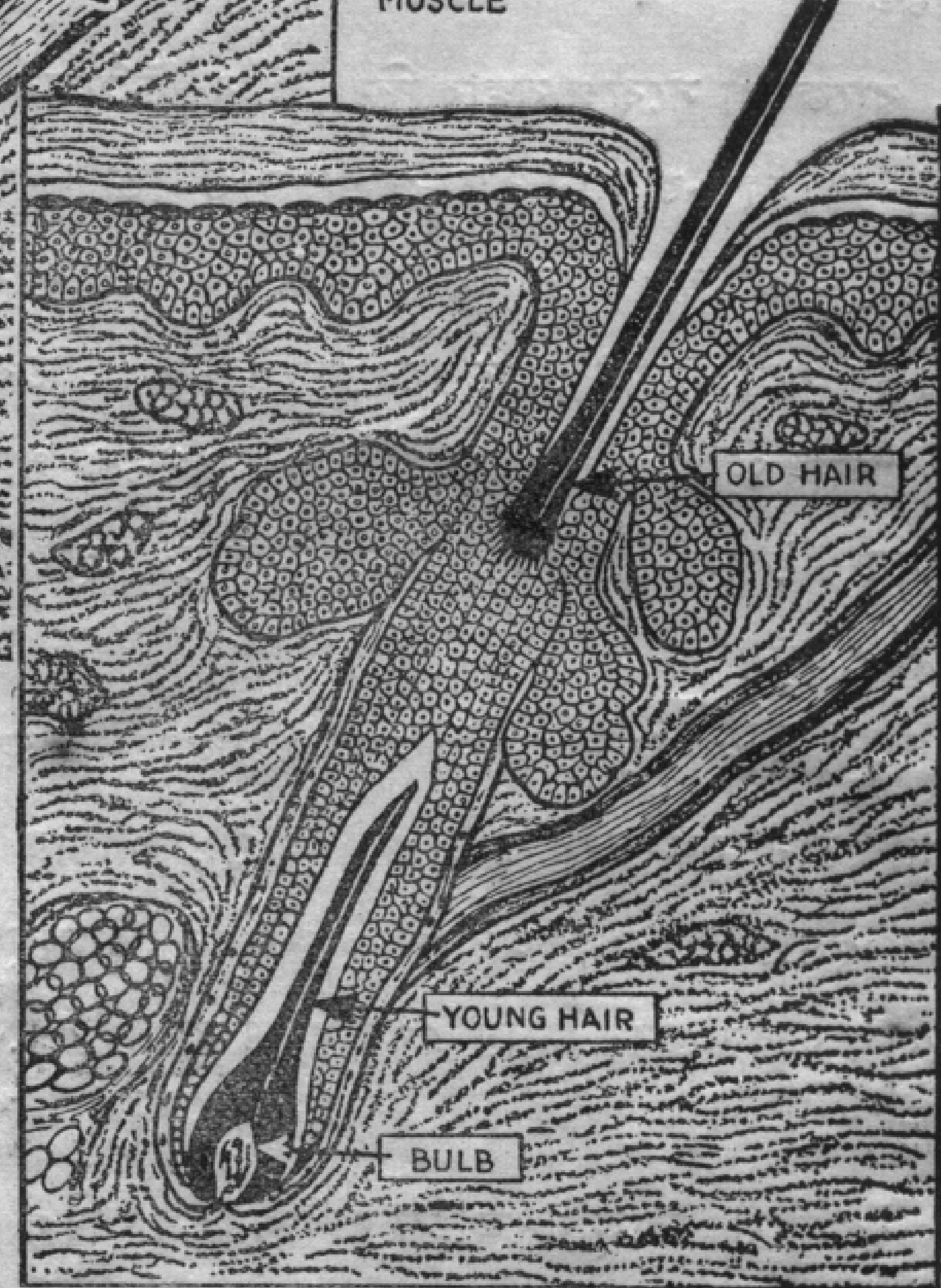
পুরুষানুক্রমিক ভাবে যাঁদের মাথায় টাক পড়ে তাঁদের মাথার চুল প্রথমে খুব পাৎলা হতে থাকে, তারপর ক্রমশঃ টাক ধরে। এঁদের টাক সারানো এক-রকম অসম্ভব। তবে বাকী চুলগুলিকে কোনমতে রক্ষা করা যায় মাত্র। শক্ত অসুখের পর যাঁদের মাথায় টাক পড়ে তাঁদেরও সময়ে চিকিৎসার গুণে টাক সারে। আর যাঁদের মগজের দোষে মাথায় টাক পড়ে, প্রায় দেখা যায় তাঁদের মাথায় প্রথমে মরা মাষ দেখা দেয়, ক্রমে চুল পাৎলা হতে থাকে, শেষে টাক পড়ে। এই টাক পড়া ছোঁয়াচে রোগ।

তেলে এ টাক সারে না। বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন, এ টাক সারে একমাত্র তীব্র ভায়োলেট আলোর রশ্মিতে ( ultra violet rays )। এই আলোর রশ্মি বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে ওজোন গ্যাস (ozone) উৎপন্ন করে। মাথায় এই আলোক-রশ্মি দিলে প্রথমে চিড় চিড় করে এবং ভিতরকার রক্তকোষকে চঞ্চল করে' তোলে। এই চঞ্চল রক্ত-প্রবাহ মগজের দুষ্ট বীজাণুগুলিকে মেরে ফেলে—এবং তাতে নতুন চুল বেরুবার সুযোগ হয়।

মাথায় যাঁরা হ্যাট পরেন, তাঁদেরও টাক পড়ে। এটাও নিবারণ করা যায় ঐ তীব্র ভায়োলেট আলোক-রশ্মিতে।




চুলে শক্তিসঞ্চার হচ্ছে




নূতন চুলের জন্ম ও পুরাতনের পতন

পাশের ১নং ছবিতে মাথায় আলোর রশ্মি কি ক'রে দেয়, দেখুন। তারপর আর দুটি ছবিতে দেখবেন চুলের বাড় কি ক'রে হয়।

বাঁ দিকের ২নং ছবিতে দেখুন, কি করে মস্তিষ্ক চুলে শক্তি সঞ্চার করছে, আর তার ডান দিকের ৩নং ছবিতে দেখুন, পুরানো চুল কি ক'রে গোড়া উখড়ে পড়ে পাশে আর তার নীচে থেকে নতুন চুল ওঠবার উপক্রম করছে!

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

# পরের ছেলে

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরদিনই রাজেশ্বরী গম্ভীর মুখে বিনয়কে ডাকিয়া বলিলেন "বিকেলে আমায় একবার সামলং যেতেই হবে। ওরা কালই এখান থেকে যাবে বোধ হচ্চে! ভদ্রলোকরা যখন এতটুকু আলাপেই আমার সঙ্গে নিজে থেকে দেখা কর্‌তে এল তখন আমি কোন্ লজ্জায় একবার না যাই?" বিনয় একবার আপত্ত্য করিল "এই সবে পথ্য করেছেন, আজই—"

রাজেশ্বরী সবেগে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন "তোমার এই সব হাড়-জ্বালান কথা রেখে দাও তো! ভারি তো অমূল্য জীবন তার জন্যে আবার এই সব মানামানি! আর দিন-দশ পরে বাড়ীই যেতে হবে, তা জানত। তখন!"

"আরও কিছুদিন আমাদের এখানে থাক্‌তে হবে মামিমা, নৈলে এতদিনের উদ্দেশ্য সবই বৃথা হবে। তোমার আর একটু–"

মুখ দ্বিগুণ গম্ভীর করিয়া মামিমা বলিলেন "আমার জন্যে আর তোমাদের ভেবে কাজ নেই বাপু; আমার এর চেয়ে ভাল হওয়া ভগবান্ অদৃষ্টে লেখেন নি। মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্ব বজায় রেখে আমি এখন মানে মানে সর্‌তে পার্‌লেই বাঁচি।"

বৈকালে ট্যাক্‌সি আনিতে আদেশ দিয়া রাজেশ্বরী একবার খোঁজ লইলেন কিশোর কোথায়। দাসী আসিয়া বলিল "খোকাবাবু এখনো পড়্‌ছেন। মাষ্টার মশাইয়ের কথা শুনলেন না। তিনি বেড়াতে যাচ্চেন, খোকাবাবু উঠলেন না।"

"তুই চল্ আমার সঙ্গে।" দাসী সোৎসাহে তাহার বধ্‌শিষের তসরখানি পরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। রাজেশ্বরী বলিলেন "কিশোর এখনো উঠ্‌লো না?" "না।" "থাক্।" রাজেশ্বরী গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দেখিলেন মাষ্টার সুসজ্জিত হইয়া দোয়াধের নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। বিনয় কোথায় হইয়া গিয়াছে। এইবার তাঁহার সহ্যের অতীত অবস্থা আসিল। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া দাসীর দ্বারা মাষ্টারকে আদেশ করিলেন, কিশোরকে যেমন করিয়া হোক্ আনিয়া তিনি গাড়ীতে বসাইয়া দেন। এতটুকু ছেলেকে যিনি শাসন করিতে পারেন না তিনি কিসের মাষ্টার!

মনীবের আদেশটি দ্বিগুণ কর্ত্তৃত্বের সুরে যথোচিত মুখ হাত ঘুরাইয়া সচীৎকারে দাসী জাহির করিল। লজ্জিত অপদস্থ মাষ্টার বেচারী "না যাইলে রাজা বধে যাইলে ভুজঙ্গ" ভাবে অনিচ্ছুক পদেই অগত্যা কিশোরের পাঠ-গৃহের উন্মুক্ত জানালার পানে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইল। বেচারি বোধ হয় এইবার ছাত্রের দ্বারা তাঁহার শিক্ষকত্বের বাকী সম্মানটুকুও নষ্ট হইবার আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

ভগবান বোধ হয় বেচারাকে আর লাঞ্ছনা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মাষ্টার কক্ষদ্বারে পৌঁছিবার আগেই দেখিল কিশোর ধীরপদে বাহির হইয়া গাড়ীর দিকে যাইতেছে। সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে দাসী আপত্তি করিল "ওমা এই হাতে কালি মুখে কালি সাজে? না হাত-মুখ ধোওয়া— না সাজ-পোষাক পরা?" কিশোর নিঃশব্দে মাতার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। কর্ত্রী আবার কিছু হুকুম করেন কিনা তাহার জন্য দুচার মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া শেষে তাঁহার কোনই আদেশ আসিলনা দেখিয়া অগত্যা মাষ্টার সোফারের নিকটে উঠিয়া বসিল এবং তাহাকে মৃদুস্বরে বলিল "সামলং"।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে পর্ণার মা ও মাঝি অত্যন্ত সমাদরের সহিত রাজেশ্বরীকে অভ্যর্থনা করিলেন। উভয় পক্ষেই সানন্দে সাগ্রহে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রাজেশ্বরী দেবী যে অসুস্থ শরীর লইয়াও তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে ভবিষ্যতেও যাহাতে দুই পরিবারের মধ্যে এই দুই দিনের বন্ধুত্ব স্থায়ী হইতে পারে এইরূপ

আলাপ আপ্যায়নের মধ্যে রাজেশ্বরী সহসা এক সময় লক্ষ্য করিলেন, ঝরণা কই আগের মত তাঁহার কাছ ঘেঁসিয়া ত বসে নাই। শুধু সেই নয়—সব ছেলে মেয়ে গুলিই যেন কেমন আজ তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে রহিয়াছে। কিশোর তাঁহার নিকটে নত মুখে নিঃশব্দে বসিয়া আছে, ছেলে মেয়ের দল তো কই কেহ তাহারও কাছে আসিয়া বসে নাই। তিনি এটুকু লক্ষ্য করিতেই সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ত্রীদেরও বোধ হয় সেদিকে নজর পড়িল। ঝরণার মামী ডাক্ দিলেন "ঝরণা কোথায় গেলি! বন্ধু এসেছে তা বুঝি আজ মেয়ের বাড়ী যাবার আহ্লাদে বাপের সঙ্গে যাবার ফুর্ত্তিতে নজর হচ্চেনা? কইরে জিতু, তোরা আজ কি করছিস্? কিশোরকে খেলা করতে নিয়ে যা।" তার পরে কিশোরের দিকে চাহিয়া একটু হাসির সহিত বলিলেন "ছেলের বুঝি পড়তে পড়তেই উঠে আসা হয়েছে? পড়ায় খুব মন তো! বন্ধুর সঙ্গে সবতাতেই মিল্ না হলে কি বন্ধুত্ব হয়?" তার পরে স্নেহের সঙ্গে তাহার পীঠে হাত দিয়া বলিলেন "আজ এত চুপ্ চাপ কেন গো? এত শান্ত-শিষ্ট হওয়া তো ভাল নয়। সেদিন এসে যে কত ছুটোছুটি দেখেছিলাম—"

রাজেশ্বরী গম্ভীর মুখে বলিলেন "শরীরটে ওরও ভাল নেই। আন্‌বনাই ভেবেছিলাম শেষে গাড়ীতে উঠে একা আস্‌তে ভাল লাগ্‌লনা, পড়া থেকে ওকে অমনি উঠিয়ে নিয়ে এলাম। এইবার তাহলে আমরা উঠি।"

"তাও কি হয় দিদি, একটু জল না খেয়ে কি যেতে পারেন?" এইবারে ঝরণার মাতা ও মাতুলানী নিজেদের পুত্র-কন্যাদের ধমক্ দিয়াই ডাকিলেন "তোদের সব আজ হয়েছে কি? কিশোরকে খেলতে নিয়ে যা। ঝরণা আজ দেখছি যাওয়ার উদ্যুগেই মত্ত হয়েছে, বন্ধুর দিকে আজ খেয়ালই নেই। মেয়ের যখন যে ঝোঁক ওঠে।"

এটুকু রাজেশ্বরীর কিন্তু নজর এড়াই নাই যে, সে ঘরের দরজার বাহিরে যেখানে বালক বালিকার দল এক একবার আসিয়া তাঁহাদের উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া আপনাদের মধ্যেই কথাবার্তা করিতে করিতে সুন্দর মুখও দুই তিনবার দেখা গিয়াছিল। ইচ্ছা করিয়াই ঝরণা যে তাঁহাদের কাছে আসিতেছেনা কিম্বা আসিতে ইচ্ছা করিয়াও কোন সঙ্কোচে আসিতে পারিতেছে না, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। জিতু ও তাহাদের মামাতো ভাই বোনেরা এইবার কিশোরের নিকটে আসিয়া তাহাকে খেলার জন্য আহ্বান করিলে কিশোর অসম্মতি জানাইবার পূর্ব্বেই রাজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "আর কতটুকুর জন্য খেলতে যাবে, আসি ভাই আমরা তবে?"

"সেকি একটু মিষ্টি মুখ না ক'রে? আমাদের সেদিন যে খাওয়ানোর চোটে গাড়ীতে বসে বাড়ীটুকু ফিরে আসাই মুস্কিল ক'রে দিয়েছিলেন আর আজ কিশোর এই জল খাবার সময়েই না খেয়ে চলে যাবে? ভ্যাখ তো জিতু চা হ'ল কিনা—আর তোর মামী মাকে বল্ খাবার আন্‌তে! আপনি চলুন হাত মুখ ধোবেন, কাপড় ছাড়্‌বেন।"

গৃহকর্ত্রীর হাত নিজের হাতে লইয়া সবিনয় অনুরোধের সহিত রাজেশ্বরী বলিলেন "আমায় ও-সব বলো না ভাই, পাড়াগাঁয়ের বিধবা মানুষ আমরা আমাদের অনেক লেঠা জানইত! আর এ সময়ে আমি কখনো খাইও না, দেখ্‌ছই তো ভুগে মর্‌ছি এখনো। কিশোরকে একটু চা আর মিষ্টি দাও হাতে, আর দেরী করতে পারছি না ভাই! শরীরটা বড় খারাপ করছে, ওষুধ খাবারও সময় ব'য়ে যাচ্ছে।"

ইহার পর আর কেহ কোন অনুরোধ করিতে সাহস করিল না। ঝরণার মাতার হস্ত হইতে চায়ের পেয়ালা এবং আহারের সজ্জিত স্থান হইতে একটা মিষ্টান্ন তুলিয়া লইয়া রাজেশ্বরী কিশোরের হস্তে দিয়া শীঘ্র খাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। সকলের সঙ্গে বিদায়ের সম্ভাষণ সারিতে সারিতে তিনি লক্ষ্য করিলেন কিশোরের সেটুকু গলাধঃকরণ করিতেও যেন কষ্ট হইতেছে, দুই তিনবার সে বিষম খাইল। ঝরণার মাতা ও মাতুলানী কিশোরের যে ভাল করিয়া খাওয়া হইল না সেজন্য আপ্‌শোষ করিতে লাগিলেন। মিষ্ট বাক্যে তাঁহাদের ক্ষুণ্ণতা দূর করিয়া রাজেশ্বরী কিশোরের হাত ধরিয়া [illegible]

কিশোরকে আর কেহ একটু সম্ভাষণ করিবারও সুযোগ বা সাহস পাইল না।

বারান্দা হইতে নামিয়া ট্যাক্সির নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কিশোর দেখিল বারান্দার একটা থামের গায়ে ঠেস্ দিয়া ঝর্‌ণা দাঁড়াইয়া আছে। কেমন এক রকম মুখ, উন্মনা অন্যমনস্ক, অথচ যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। ব্যাকুলতা এবং বেদনার একটা নিগূঢ় ছায়া বালিকার স্বচ্ছ মুখের উপর স্পষ্টই ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

রাজেশ্বরীও তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন কিন্তু যেই ঝর্‌ণার তরল চক্ষু দুইটির দৃষ্টি আজ হৃদয়ের ভারে গভীর হইয়া তাঁহাদের দিকে নিবদ্ধ হইল, অমনি রাজেশ্বরী দেবীও যেন কি একটা নিগূঢ় অভিমানে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কিশোরের হস্ত ধরিয়া দৃঢ়পদে গাড়ীতে উঠিলেন।

সোফার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া উঠিয়া বসিতে যাইতেছে, এইবার কিশোররা দু-এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই দৃষ্টি পথের অতীত হইবে! সহসা তাহারা দেখিল ঝর্‌ণা গাড়ীর নিকটে ছুটিয়া আসিয়া ত্বরিত ব্যগ্র কণ্ঠে বলিতেছে "বিনয়বাবু? তিনি কবে আসবেন? কাল যে আমরা চলে যাব, তাঁর সঙ্গে তো দেখা হ'ল না?"

রাজেশ্বরী গম্ভীর মুখে চাহিয়া দেখিলেন, কিশোরও অপলক দৃষ্টিতে ঝর্‌ণার সেই ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া আছে কিন্তু কোন উত্তর দিতেছে না, রাজেশ্বরী কিছু বলিলেন না! তাহাদের বাক্‌নিষ্পত্তি করিতে না দেখিয়া সোফার তখন গাড়ীর হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়া ফিরাইলে, মুহূর্ত্তে ঝর্‌ণা তাহাদের দৃষ্টি পথের অতীত হইল, কিন্তু পিছন হইতে আবার সেই স্বর ভাসিয়া আসিল "বিনয় বাবুকে বলবেন—"

আর কিছু শোনা গেল না। কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া রাজেশ্বরী মনে মনে এইবার বলিলেন "অকৃতজ্ঞ মেয়ে। আর আমরা যে তোকে এত ভালবেসেছিলাম সে কথা তোর একবারও আজ মনে হ'ল না! মর্‌তে আমি কিশোরকে এই অহঙ্কারী মেয়ের কাছে আজ নি, ছেলে আমার মেয়েটির স্বভাব বোধ হয় বুঝেছিল।"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অহঙ্কারী মেয়ের অন্যান্য দিনের চরিত্রটা মনে পড়িয়া তাঁহার এই মানসিক সমালোচনাটা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্ট সেই ব্যাকুল বেদনা ভরা মুখের ছবি, সেটাও রাজেশ্বরীর মনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বালিকার এই আকস্মিক স্বভাব পরিবর্ত্তনের কারণ মনে মনে অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি এমন জায়গায় গিয়া পৌঁছিলেন যেখানে আর তাঁহার মন নিজেই অগ্রসর হইতে চাহিল না। ঈষৎ অপমান জ্ঞানের সঙ্গে একটা নিগূঢ় বেদনাও যেন বাজিয়া উঠিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দল তারা, তারা কি এই খবরেই এত সঙ্কুচিত, এত অবাক্ হইয়া তাঁহাদের সহিত এমন নূতন ভাবে চলিতেছিল? অসম্ভব।

কিন্তু এইটাই যে সম্ভব তাহা তিনি শিশু-চরিত্রের অনভিজ্ঞতাবশতঃ বুঝিতে পারিলেন না। যাহাদের সংসারের সকল হালইওয়াকিব আছে সেই বয়স্ক ব্যক্তিরাই এ ব্যাপারেও অবিকৃত মনে থাকিতে পারে, কিন্তু যাহারা এখনো সংসারের কিছুই জানে না তাহারা যে এ সংবাদে কতখানি আশ্চর্য্য এবং আপনাদের ভিতরেই স্তম্ভিত হইয়া যায় তাহা তাহারাই জানে। বাপে মায়ে নিজের ছেলেকে অন্যকে দিতে পারে? সে ছেলে আর তখন একেবারেই তাদের থাকে না। সেই ছেলেও তখন পরের ছেলে হ'য়ে যায়, পরকে বাপ মা বলে ডাকে? নিজের বাপ মা তখন আর তার বাপ মাই থাকে না? এই যে তাহাদের হৃদয়-ক্রিয়াস্তম্ভনকারী চরম আশ্চর্য্য সংবাদ, এ সংবাদের আঘাতে তাহারা যে জড় হইয়া যাইতে পারে!

এতটা বুঝিতে না পারিলেও রাজেশ্বরীর অন্তরে অজ্ঞাতে একটা এমন আঘাত আসিল যে, তিনি আর ঝরণাদের সমালোচনাটা মনে মনেও চালাইতে পারিলেন না। ছেলের পানে চাহিয়া দেখিলেন সে যেন ঈষৎ

তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিজের অঙ্গাবরণের মধ্যে ঢাকিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া হইলেন।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আরও প্রায় মাসখানেক রাঁচিতে থাকিয়া মাতুলানীর অর্জ্জিত স্বাস্থ্যের ত্রুটীটুকুর পুনঃ সংস্কার করিয়া লইয়া তবে বিনয় দেশে ফিরিতে সম্মত হইল।

ঘরে ফিরিয়া রাজেশ্বরী দিন-কতক ঘরকন্না ও বিষয়-আশয়ের দিকে এমনি ভাবে মনঃসংযোগ করিলেন, যেন এত দিনের না দেখার শোধটা তিনি সেই দিন-কয়েকের মধ্যেই পোষাইয়া লইতে চান। বিনয়কেও সেজন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ও ব্যস্ত থাকিতে হইতেছিল! এতদিন তো বিনয় এ-সব ব্যাপার হইতে প্রাণপণে দূরেই থাকিত, মাতুলানীর শত সাধ্য সাধনা এবং অনুযোগ কিছুতেই ত তাহাকে টলাইতে পারে নাই। কিন্তু গৃহে তাহার যে দার্ঢ্যতা এতদিন অটল ছিল, এই প্রবাস-যাত্রায় তাহার মূল পর্য্যন্ত যে নড়িয়া গিয়াছে বিনয় এইবার গৃহে ফিরিয়া তাহা নিজেই বেশ বুঝিতে পারিল। এই প্রবাস-যাত্রার উদ্যোগ হইতে সেখানের যত যা কিছু সকলেরই যে বিনয়ই একমাত্র কর্ত্তা হইয়াছিল! মাতুলানী বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই বিনয়ের আদেশ বা ঈঙ্গিতমত ফিরিয় ঘুরিয়া একরকম অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে তাহাকে নিজেদের অভিভাবক পদে বসাইয়া লইয়াছিল। এখন ঘরে ফিরিয়াও বিনয় যাহা সে কখনো হইবেনা ভাবিয়াছিল, নিজের অজ্ঞাতে কখন যে সে তাহাই হইয়া বসিয়াছে, একথা বুঝিতে পারিয়াও নিজের সেই প্রসারিত হস্ত-পদকে আরতো কর্ম্মের মত পূর্ব্বস্থানে ফিরাইয়া আনিতে পারিলনা। বরং তাহার মাণিকের সম্পত্তির কোথায় কোন্ ক্ষতি হইয়াছে বা এতদিনের তত্ত্বাবধানের অভাবে হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার ত্রুটী সংশোধনের জন্য রাজেশ্বরীর সঙ্গেই একযোগে লাগিয়া পড়িল। গৃহে এতদিন যে উদাসীই হইয়াই দিন কাটাইয়াছ দিনকতক গৃহের বাহিরে গিয়া সে পূর্ণমাত্রায় সংসারী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাহার মাণিকের সংসার বলিয়া এ সংসারকে এখন আর তেমন বিশ্রী তো লাগিতে ছিলই না বরং ইহার শুভাশুভের উপর একটা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য এবং ইহার উপরে একটা আসক্তি ধীরে ধীরে বিনয়ের মনে স্থায়ী ভাবে আসন পাতিতেছিল।

ধীরে ধীরে সকলেরই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, কিন্তু পরিবর্ত্তন হইলনা সেই বালকের। রাঁচির হাসি-খেলা অবাধ ভ্রমণ একদিনে সমস্ত বন্ধ করিয়া আবার সেই কয়মাস পূর্ব্বের কিশোরই তাহার পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিল। একবৎসর পূর্ব্বে সেই যে এখানের খেলাধূলা সে ছাড়িয়া দিয়াছিল এখনো তাহার সেই স্বভাবই বজায় রাখিল। বালকের দল তাহাকে বাটী হইতে বাহির হইতে না দেখিয়া এবং কোন খেলায় সঙ্গীভাবে না পাইয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসাই ত্যাগ করিল। তাহারা বাড়ী না থাকায় বিনয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বালকদিগের ক্রীড়ার স্থান আগাছায় ভরিয়া উঠিয়াছিল এবং সেখানে তাহারা আর খেলিতেও আসিত না।

মাসখানেক পরে সহসা একদিন রাজেশ্বরীর চমক হইল সত্যই তো,—কিশোর যে রোগা হইয়া যাইতেছে, পাতের খাবার বাটির দুধ তাহার অর্দ্ধেকের বেশীই যে পড়িয়া থাকে! বিনয় যে তাহার এক্‌সারসাইজের বন্দোবস্ত করিয়াছে কই তাহাতে তো কোন সুফল পাওয়া গেলনা! রাঁচী হইতে মোটে একমাস তাঁহারা আসিয়াছেন—নিজে তো তিনি ক্রমশঃ মোটাই হইতেছেন—বিনয়ও এখন বেশটি হইয়াছে, কিন্তু ছেলে কেন এর মধ্যে রোগা হইল? বিনয়কে তিনি বিষয় দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাইতেছেন এবং সর্ব্বদা ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এদিকে আসল দিকেই যে নজর পড়ে নাই। তখনি সেকালের রাজা-রাণীর মত হুকুম ছুটিল "ডাক বিনয়কে।"

সেকালের 'রাজার পাত্র' (মন্ত্রী) না হইয়াও বিনয়ের কপালে মাতুলানীর সমস্ত অসংগত ও সঙ্গত হুকুম গুলি পালন করিতে না পারিলেও এক চোট আসিয়া ঠিকই পড়িত।

বিনয় তাঁহার অভিযোগ শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিল "ছেলেটিকে তো দেখছ ই, নিজের জেদ্ আবার দেশে পা

দিয়েই মাথায় ঢুকেছে। ব্যস্ত হয়োনা—আপনিই আবার সাম্‌লে যাবে।"

"তুমি তো তাই বল্‌ছ—এদিকে রোগা হয়ে যাচ্চে যে।"—

"থাক্‌না, ওটুকুতে কোন ক্ষতি কর্‌বেনা, একসার্‌-সাইজ তো দুবেলাই করে,—নাই বা বেড়ালে।"

"তুমি বলকি? মোটে খেতে পারেনা। না বেড়ালেও ভাল থাকেনা এ আমি বেশ দেখ্‌ছি। যাও তোমায় অন্য কিছু কর্‌তে হবেনা—কিশোরকে নিয়ে বেড়িয়ে এস খানিক। বিকেলে সকালে ওকে বাড়ী থেকে খানিক বার করতেই হবে তোমায়, যেমন ক'রে পার।"

বিনয় একটু চিন্তিত মুখে বলিল "মামীমা জানতো ওকে—"

"বেশ জানি বাছা, আর তোমাকেও বলিহারী যাই, যে ঐটুকু ছেলেকে এত সমীহ ক'রে চল,—ওরে কে আছিস্‌ ডাক্‌ত কিশোর।"

কিশোর ঘটনাক্রমে সেই দিকেই আসিতেছিল—মাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই রাজেশ্বরীর আদেশের স্বরে বলিলেন "কিশোর, আজ থেকে তোমায় রোজ সকালে বিকেলে বিনয়ের সঙ্গে বাড়ীতে যেমন বেড়াতে তেমনি বেড়াতে যেতে হবে। এখনি বেরোও তোমরা দুজনে।"

কিশোর একটু থমকিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া বিনয় যেন অপ্রস্তুত হইয়া কৈফিয়ৎ দাখিল করার ভাবে মৃদুস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তুমি নাকি খেতে পারনা—রোগা হয়ে যাচ্চ—"

বাধা দিয়া যেন বিরক্তির স্বরে কিশোর বলিয়া উঠিল "কে বল্লে খেতে পারিনে?"

"আমি বল্‌ছি আবার কে বল্‌বে?" মাতার উত্তর শুনিয়া কিশোর আর প্রতিবাদ করিল না। বিনয় বলিতে লাগিল—"আর মাষ্টারও বলে রোজ তুমি—"

পিতার দিক হইতে একেবারে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজেশ্বরীর পানে চাহিয়া ত্বরিত কণ্ঠে কিশোর "আচ্ছা

অন্যদিকে চলিয়া গেল। রাজেশ্বরীরও আর এমন সাহস আসিল না যে তাহাকে এ বিষয়ে অন্য কোন আদেশ করেন, কেবল বিনয়ের সাক্ষাতে একটা গূঢ় লজ্জায় ও সঙ্কোচে তিনি একটু স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বিনয়ও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিঃশব্দে সেখান হতে নিজ কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

সেই কণ্টক! না—কোথায় এর নিবৃত্তি,—এই তো সে আবার বুক জুড়িয়া খচ্‌ খচ্‌ করিতেছে। রাঁচিতে মাত্র প্রথম কয়েক মাস এ ব্যথার কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই, তারপর শেষের দিকে সে তো আবার তাহার অস্তিত্ব জানাইয়াছিল। সেই যে অমল বালিকাটি, সে তাহার অদৃষ্টের কথা শুনিয়া ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া সমবেদনার রংয়ে বিনয়ের অন্তরে তাহার সেই করুণ মুখখানির স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে শেষ দেখাটাও যে বিনয় এই ব্যথায় কাতর হইয়াই করিতে পারে নাই। কিশোর বুঝি তাহার সঙ্গও ভালবাসেনা,—কিশোর বুঝি সত্যই তাহাকে—না চিন্তা আর যে অগ্রসর হইতে পারেনা!

কিসের এ সংসার,—এখানের এ আধিপত্য,—কার সম্বন্ধে? একদিন ভবিষ্যতে নজর হইবে বলিয়া এই ধনজন সম্পত্তিকে বিনয় যে চোখে দেখিয়াছিল—আজকাল যে তাহার মাণিকের বলিয়া তদপেক্ষা শতগুণ অধিক আশক্তির চোখে দেখিতেছে! ইহার এক কড়াও অপচয় সে সহিতে পারেনা! নিজের চিরাভ্যস্ত জীবন ত্যাগ করিয়া এখন সে যে মাণিকের বিষয় সম্পত্তি রক্ষণে একেবারে মাতিয়াই উঠিয়াছে। বেহালাখানাকে রাঁচি হইতে ফিরিয়া এতদিন একবার স্পর্শ করিবার কথাও যে তাহার মনে হয় নাই। মাণিক,—মাণিক,—সত্যই কি সে তাকে—

না না না, এ হইতে পারে না! এ যদি সত্য হয়, তো বিনয় বাঁচিবে কি করিয়া! মাণিক তাহাকে ঘৃণা করে! মাণিক তাহাকে একটুও ভালবাসেনা?—একি সম্ভব! সে কি জানেনা, সে কি শোনে নাই যে কি জন্য তাহাকে বিনয় পরকে দিয়াছে? নিজের জন্য কি! তবে কেন—

ভিত্তি-গাত্রে লম্বিত পত্নীর সেই মাণিককে কোলে লইয়া উপবিষ্টা মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বিনয় আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তুমি বল— তুমি বল একি সম্ভব ? আমার সেই মাণিক তোমার সেই মাণিক সে কি সব জানেনা ? তুমি তো সব জান,—বল, সে কি জানেনা,—বোঝে না ?"

আধিগ্রস্থ বিনয়ের মনে হইল তাহার পত্নীর শান্ত স্নিগ্ধ মুখকান্তি যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিল—আশ্বাস দিল, যেন বলিল "একি সম্ভব ! আমাদের সেই মাণিক,—সে কি জানেনা, বোঝেনা ? ভ্রম, তোমার এ ভ্রম !"

বিনয় চোখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। হায় অভাগা, এ সান্ত্বনা যে তোমার নিজের অন্তরেরই ; যতক্ষণ আশার শেষ সূত্রও না ছিন্ন হইয়া যায় ততক্ষণ যে মানুষকে সে এমনি করিয়াই ভুলাইয়া রাখে ! নহিলে মানুষ যে বহিতে পারেনা,—বাঁচিতে পারেনা !

উঠিয়া বসিয়া বিনয় ধীরে ধীরে ছবিখানি পাড়িয়া কোলের উপর রাখিল। দেখিতে দেখিতে মনে হইল নিশ্চয় মাণিক বাপের সঙ্গে বেড়াইতে তেমন সাচ্ছন্দ্য পায়না তাই সে এমন করে। এখন সে বড় হইতেছে, এ তো স্বাভাবিক। বিশেষ সে যে জেদী আবদারে আদুরে স্বভাবের ছেলে ! বিনয়ের সঙ্গে বেড়াইতে হয়ত তার কুণ্ঠা আসে,—স্বাধীন ভাবে চলিতে পায়না—তাহাকে একটা ভয় বা সমীহ করে বলিয়াই তাঁহার এ আপত্তি ! এটুকুতে বিনয়ের এতখানি মনে করা উচিত নয়।

নিজের চোখ বুঁজিয়া তখন বিনয় ছবিখানিকে নিজের মুখের কাছে তুলিয়া, কাচের আবরণের সেই শীতল স্পর্শের উপর মুখটাকে চাপিয়া ধরিয়া, অস্ফুটভাষায় এমন কতকগুলা শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল, যাহা তাঁহার নিজের কানেও পৌছিতে পারিলনা। তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে কেবল 'আমার' এই শব্দটুকুই মাত্র সে নিজেও বুঝিতে পারিতেছিল।

( ক্রমশঃ )

শ্রীনিরুপমা দেবী

---

## শরৎ

নির্ম্মল নীল নভতলে কার প্রসারিত হেরি অঞ্চল ?
সোনালি রৌদ্র পরশনে কেন দেহমন হ'ল চঞ্চল ?
কি সে অনুরাগে কাঁপে পল্লব উজ্জ্বল তার কায়া ?
মাখানো কি তাতে গত রজনীর জ্যোৎস্না-চুমার মায়া ?
ভোরের বেলায় কোন্ রূপসীর কায়ার ছায়ায় হেরে
উন্মনা যত সাদা মেঘ নীল আকাশে ভাসিয়া ফেরে ?
অথবা ওরা কি কাশফুল ? ওরা ফুটেছে গগন-ক্ষেতে ?
ওরা কি ভোরের স্বপ্নের জাল উড়িছে নেশায় মেতে ?
বাতাসেতে কার বাঁশরি বাজিছে মন নাহি ঘরে রহে !
বাহিরেতে আজ আকাশ বাতাস স্বর্ণরেণু কি বহে ?
প্রকৃতি কি এক মহাপতঙ্গ মেলিয়াছে তার ডানা ?—
(যার) সবুজ জৌলুসে লাগে বিভ্রম, চরাচর হ'ল কানা ?
নয়ন কি তার নীল অম্বর ? দীপ্তি সোনার শিরে
শরৎ তপন-হাসি দিয়া গড়া ? আঁখি তাই নাহি ফিরে ?
এত আয়োজন এত আনন্দ মুখে যার এত হাসি
মনের গোপনে অতীত দিনের দুঃখ ওঠে কি ভাসি' ?
অধরেতে হাসি চোখে ঝরে জল, হাসি-কান্নার মেলা !
আদিকাল হতে জগতের হাতে চলেনি কি এই খেলা ?
ফণীমালা নহে, বলাকার মালা নীলকণ্ঠের গলে !
ললাট-বহ্নি স্নিগ্ধ কি আজি অমৃত কি হলাহলে ?
নিবিল কি তাঁর ক্রূর শোকাগ্নি বর্ষাধারায় ভাসি' ?
দিকে দিকে তাই বিরাজিত আজি তাঁর প্রসন্ন হাসি ?

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

# আমার দেখা লোক

## মিঃ জি এম করি

১৮৮৭ অব্দে গয়ার আরাঙ্গাবাদ মহকুমা হইতে তিন মাস ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলাম। আমার পূজ্যপাদ ৺ অগ্রজ মহাশয় তখন বুদবুদে ( মানকর রেলওয়ে ষ্টেসন ) মুনসেফ ছিলেন। প্রতি শনিবার বাটী আসিতে পারিতেন। রবিবার পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেবের গাড়ীর পিছনে পিছনে দুই ভাই ঘোড়ায় চড়িয়া আয়মার বাগানে যাইতাম। ৺ উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( হুগলীর উকীল ), তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া আমাদের যাইবার সময় দেখিয়া একদিন পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে বলিয়াছিলেন—"বড়লাট সাহেবেরও আপনার ন্যায় 'বডিগার্ড' নাই।" ঐ সময়টা কি সুখেই কাটিয়াছিল! আমার ছুটীর শেষাশেষি একদিন দাদা বলিলেন—"বাবা বলিতেছেন—'ছুটী শেষে দূরে বদলী করিলে আমাদের এই সাপ্তাহিক মিলনটা থাকিবে না', ওঁর তুষ্টির জন্য আমরা কবে কি করিয়াছি? তুমি নিকটে একটা স্থানে যাইতে চেষ্টা করার জন্য বরং দার্জ্জিলিং যাও।" তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তথায় যাওয়ার পূর্ব্বে বক্লণ্ড সাহেবের সহিত রেভিনিউ বোর্ডে দেখা করিয়া আমার ও দাদার ইচ্ছার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন—"সাধারণ ভাবে ভাল জায়গা রেলের উপর এবং নিকটে চাহিলে ফল পাইবে না। মাথা ঘামাইয়া খাতা-পত্র লইয়া কে কোথায় কতদিন আছে, সে সব কোন্ সেক্রেটারী খুঁজিবেন? সুতরাং—'আচ্ছা দেখা যাইবে' উত্তর লইয়া ফিরিতে হইবে; তাহাতে ফল হয় না। উলুবেড়িয়া খালি হইতেছে বলিয়া আমি জানি। শনিবারে শনিবারে বাড়ী যাইতে পারিবে। হাবড়ায় মিঃ করি আছেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত একান্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন।" আমি দার্জ্জিলিং গিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেবের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন এডসার সাহেব চীফ সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিলাম। তিনি বর্দ্ধমান, শ্রীরামপুর, চব্বিশ পরগণা এবং হাবড়ার স্থান খালি আছে কি না আফিসে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বেই উত্তর আসিল—'খালি নাই'। আমি তখন বকলণ্ড সাহেবের উপদেশ মত উলুবেড়িয়ার কথা তুলিলাম। এবারে উত্তর আসিল—'খালি আছে'। সাহেব সেই কাগজের উপরই আমার নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পূজার ছুটীর মধ্যেই কলিকাতা গেজেটে হুকুম বাহির হইল।

উলুবেড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট করি সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। দীর্ঘাকার, বলবান পুরুষ, কিন্তু চক্ষের ভাবটায় দয়ালু বলিয়া মনে হইল না। শনিবারে শনিবারে বাড়ী চলিয়া আসার অনুমতি চাহিলে বলিলেন—"সে কিরূপে হইবে? ওখানে একজন সব-ডেপুটীও নাই!" আমি সব কথা খুলিয়া বলিলাম:—"যদি বাড়ী গিয়া মধ্যে মধ্যে পিতৃদেবকে দর্শন করিতে না পাই তাহা হইলে হুগলী কলেক্টারির সংস্পৃষ্ট উলুবেড়িয়ায় থাকায় আর বগুড়া বা চট্টগ্রামে থাকায় প্রভেদ নাই; তবে স্বাস্থ্যকর আরাঙ্গাবাদ ছাড়িয়া আসিয়া কি হইল! আমি আর কি বলিব—যাহা পারেন করিবেন।" আমাকে প্রকৃতই দুঃখিত দেখিয়া এবং শেষের ঐ নিরাশার নির্ভরের কথাটা শুনিয়া সাহেব একটু মুচকি হাসিলেন—চক্ষের সে ভাবটা পরিবর্ত্তন হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইল! বলিলেন—"তবে তাহাই হউক, তুমি প্রতি শনিবারে আমাকে একখানি পত্র লিখিবে—'আপনার অনুমতি অনুসারে পিতাকে দেখিতে বাড়ী যাইতেছি—কোর্ট সব-ইনস্পেক্টরকে বলিয়া যাইতেছি যে তেমন কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটিলে আপনাকে টেলিগ্রাম করিয়া কাগজ-পত্র লইয়া আপনার নিকট হাবড়ায় যাইবে।' প্রতি সোমবার ফিরিয়া আবার আমাকে পৌছান সংবাদ দিও।" এইরূপ দুইখানা করিয়া পত্র লিখিয়া প্রতি সপ্তাহে বাড়ী যাওয়া প্রকৃতপক্ষে ঘটিবে না, মাঝে মাঝে যাওয়াই ঘটিবে, এইরূপ মনের মধ্যে হইতেছে—সাহেব যেন তাহা সুস্পষ্টই বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন—"প্রতি সপ্তাহে ইহা করিতে লজ্জাবোধ করিও না; প্রয়োজন আছে। কোন হাঙ্গামা ঘটিলে [illegible]

চার্জে থাকিয়া যাইতে দিয়াছিলাম'—আর তোমার সেই সপ্তাহের পত্রখানি মাত্র বাহির করিব।" দেখিলাম বকলণ্ড সাহেবের কথা একান্তই সত্য; অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে বাস্তবিকই অসাধারণ সহানুভূতি! ইহা শিখিবার জিনিষ এবং শিখাইবারও যোগ্য কথা।

করি সাহেব পাঁচটা বাজিলেই হাবড়ার আফিস বন্ধ করার নিয়ম করিয়াছিলেন; কাজের ভিড় পড়িলে পাঁচটার পরও খাটিতে হয়, বাতি জালিতেও হয়। করি সাহেবের আমলে হাবড়ায় তাহা হইতে পাইত না। বাস্তবিকই পাঁচটার পরে খাটান বড়ই নির্দ্দয়তা। সাহেব মধ্যে মধ্যে ঠিক পাঁচটার সময় আফিসে আসিয়া দেখিতেন যে হুকুম পালিত হইতেছে কি না।

একবার উলুবেড়িয়া পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন; দেখিলাম প্যাণ্টালুন কর্দ্দমাক্ত। বলিলেন রাস্তা ছাড়িয়া কোণাকুণি মাঠ ও নালার ভিতর দিয়া দশ ক্রোশ পাখী শিকার করিতে করিতে আসিয়াছেন। যে গ্রাম্য চৌকিদার মারা পাখীর মোট লইয়া আসিয়াছিল তাহাকে চারি টাকা বকশিস্ দিয়া বিদায় করিলেন।

আমার আফিসের কার্য্য খুব তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শন করিয়া বলিলেন—"তোমাকে বাড়ী যাইতে ছুটী দিই বলিয়া কোথাও কোন কাজের বিলম্ব হয় কি না ভাল করিয়া দেখিলাম; বেশ কাজ চলিতেছে।" বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিলাম এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে আরও একটা সুশিক্ষা হইল—কার্য্যের নিখুঁত পরিদর্শন এবং উপযুক্ত প্রশংসা।

কিছুদিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের জন্য দুই দিনের ছুটী চাহিলাম; উত্তর আসিল না। পুনরায় পত্র লিখিলে সাহেব 'প্রাইভেট আর্জেন্ট টেলিগ্রামে' বাড়ী যাইবার অনুমতি দিলেন। বাউড়িয়াতে প্রায় এক মাস পরে দেখা হইলে বলিলেন—"দেখ, তোমার প্রথম পত্রের উত্তরে ছুটী দিয়াছিলাম বলিয়া কেমন মনে হইয়াছিল। তাহার পর তোমার দ্বিতীয় পত্র পাইয়া দেখিলাম যে চিঠি লিখিলে তুমি তাহা সময়ে পাইবে না। তখন টেলিগ্রাম করিয়া টেলিগ্রাম কেন আসিয়াছিল; সাহেব নিজেকে জরিমানা করিয়াছিলেন এবং আমাকে ছুটী দেওয়া কতকটা বে-সরকারী ভাবেই চালাইতে দিলেন।

সকলের কাছেই আমি করি সাহেবের সুখ্যাতি করি। ক্রমে সাহেবের চরিত্রের আর একটা দিকের কথা লোকমুখে জানিতে পারিলাম এবং মর্ম্মাহত হইলাম। (১) মফঃস্বলে রাস্তার ধারে দরিদ্র তাঁতিরা সুতা (টানা) গুছাইয়া লইতেছিল; ঘোড়া হইতে নামিয়া স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সুতা ছুরি দিয়া মাঝামাঝি কাটিয়া দিয়াছিলেন;—সরকারী রাস্তায় কেন ও-সব করে! (২) 'পানীয়' জলের কষ্ট কোথাও জিলা মধ্যে ঘটিয়াছে কিনা গবর্ণমেণ্ট জানিতে চাহিলে হৃদয়হীন ভাবে উত্তর দেন যে তিনি বাঙ্গালীদের ভাষা বুঝেন না—উহাদের দুঃখ-কষ্ট জানিবেন কিরূপে? বিহার হইতে তাঁহাকে বাঙ্গালায় বদলী করার সময়ইত তাহা বলিয়াছিলেন; তবে তিনি 'চক্ষে' দেখিয়াছেন যে হাবড়া জলের দেশ, ইহার জল নিকাশই প্রয়োজন! (৩) মিউ-নিসিপাল আফিসের বারাণ্ডা হইতে একজন বাঙ্গালী অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটকে স্বহস্তে ধাকা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বলেন—'এ তোমার পায়চারী করার জন্য নিজের বাড়ীর বারাণ্ডা নহে"।

দাদার সহিত সাহেবের এই দুই বিপরীত মূর্ত্তির কথা হইল। তিনি তাঁহার অননুকরণীয় কৌতুক-মিশ্রিত দার্শনিক বিশ্লেষণ সহ বলিলেন:—(১) প্রজাপীড়ক জমিদারগণও নিজের চাকর এবং গোমস্তা দিগের প্রতি সদয়। (২) খোদ সরকার বাহাদুর পুলিস বিভাগের প্রতি সদয়তর হইতেছেন (৩) কোন কোন স্ত্রীলোক বড়ই ক্ষুদ্র দৃষ্টি—'আপনার ছেলেটী, খায় এতটী বেড়ায় যেন লাঠীমটী'—আর—পরের ছেলে, খায় অতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।'—তোমার যিনি উপরিতন কর্ম্মচারী তিনি তোমায় সম্বন্ধে ভাল ব্যবহার করিলেও তোমার জাতিকে ঘৃণা করেন—সুতরাং তোমারও পনের আনা তিনপাইকে ঘৃণা করেন। তিনি চাণক্যের মতে লঘুচিত্ত:—

উলুবেড়িয়ায় যাওয়ার কিছু পূর্ব্বে আমার ছুটীর মধ্যে একদিন কলিকাতার রাস্তায় প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিয়ান বাবু ত্রৈলোক্যনাথের সহিত দেখা হয়; তিনি বলেন—"তুমি না এখন আরা জেলায় নিযুক্ত? এ সময়ে এখানে কিরূপে?" আমি বলিলাম—"তিন মাস পুরা বেতনে ছুটী লইয়া আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন—"শরীর ত ভাল দেখিতেছি। প্রিভিলেজ লিভ শুধু শুধু লইতে নাই; ব্যারাম-আরামের জন্য ওটা হাতে রাখিতে হয়; সাহেবদের কথা স্বতন্ত্র। দেশীয় যেই সাধ করিয়া পুরা মাহিনায় ঐ ছুটী লয়, প্রায়ই তাহাদের শীঘ্রই অর্দ্ধেক মাহিনায় মেডিকেল লীভ লইতে হয়। তবে তোমার সেরূপ হইয়া কাজ নাই।"

কথাটা যে কাহার কাহার পক্ষে ঠিক তাহা অল্পদিন মধ্যেই বুঝিলাম। উলুবেড়িয়ায় আমার ৫৪ দিন টানা জ্বর হইয়াছিল। জ্বরারম্ভের ৭।৮ দিন পরে করি সাহেবকে ছুটীর দরখাস্ত দিয়া পত্র লিখি। জ্বরের ধমকে কি কি লিখিয়াছিলাম সমস্ত মনে নাই। তবে বলিয়াছিলাম—'উলুবেড়িয়ায় সব-ডিবিজন্যাল অফিসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটী পবলিক পয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের প্রস্তুত মৃত্যুর কল (ডেথ্ ট্রাপ); আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ আহম্মদ এবং তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র টাইফয়েড জ্বরে মারা যাইতেন, জ্বর গায়েই সরিয়া বাড়িতে যাওয়ায় বাঁচিয়া গিয়াছেন; আমাকেও শীঘ্র সরিয়া যাইতে দেওয়া হউক এবং আমার পরবর্ত্তী দিগের প্রাণরক্ষা জন্য বাটীর পার্শ্বের পচা ডোবা তিনটী এবং নিম্ন-ভূমি খানিকটা ভরাট করা হউক।' করি সাহেব আমাকে অবিলম্বে ছুটী দিয়াছিলেন। রোগ-মুক্তির পরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য গেলে বলিয়াছিলেন—"তোমার সেই চিঠিটা পড়িয়া আমার বড় লজ্জাবোধ হইয়াছিল। আমার এবং সিভিল সার্জ্জনের এবং ইঞ্জিনিয়ারের ঐ বাড়ীটার সুস্পষ্ট অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়াও কখন উহার উন্নতি জন্য আমাদের কাহারও কিছু করিতে কেন মনে হয় নাই তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার সেই চিঠিই গবর্ণমেন্টে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং (খুব হাসিয়া) শুধু লিখিয়াছিলাম—'মৃত্যুমুখে পতিত ধীর-স্বভাব কর্ম্মচারীর নির্ভীক সত্য কথা!' উহাতে অবিলম্বেই কাজ হইয়াছে। দু হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।" দাদাকে এ-সব কথা বলায়, তিনি বলিলেন—"ইউরোপীয় কেহ উলুবেড়িয়ায় নিযুক্ত হন না; তুমিও জজ কলেক্টর কাহাকেও খাওয়াইতে বাসায় লইয়া যাও না, তাহা করিলে উহাঁদের বারাণ্ডায় পদার্পণ করিয়াই মনে হইত—'বাড়ীটা ভাল, কিন্তু চতুষ্পার্শ্বটা ত ভাল নয়।' সেই ইউরোপীয় ঘনিষ্ঠতার অভাবে চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি হয় নাই। পুলিশের থানা প্রভৃতির বাড়ী দিন দিন উন্নত হইয়াছে। উহাতে যে পুলিশ-সাহেবেরা গিয়া থাকেন! করি সাহেবের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা উলুবেড়িয়ায় দুঃখ পায় ইহা তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়াতেই এবারে তাঁহার সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল।"

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

---

# পলাতক

অতৃপ্ত এ পলাতক প্রকৃতি আমার
মোরে বারবার
লয়ে যায় বাঁধনের পারে;
কোন না আগারে
দুরন্ত হৃদয়

ভাঙ্, ভাঙ্, খালি মোর উঠিছে আহ্বান—
তাই মত্ত প্রাণ
ভেঙে ভেঙে চলে দিবা যামি'
তৃপ্তি পানে রূপ পানে মুক্তি-পথগামী।
অবোধ এ চিত্ত মোর

মোহ-ভরা ভুবন-বাঁধনে ;
চপল চরণে
যাই যাই যাই কার পানে
ভেদিয়া পাষাণে ;
টুটিয়া এ দুঃখ-সুখ-বর্ম্ম-আবরণ
ছুটি অনুখন
অতলের প্রশান্তি সীমায়
আকাশের সর্ব্বহারা মৌন নীলিমায় !
কই কই কোথা তৃপ্তি ?—
কোথা পাব নিতি
বাঞ্ছিত সে অজানা সুধায়
আমার এ পরাণের ব্যাকুল ক্ষুধায় !
ভুবনের কোণে কোণে
এ বিক্ষুব্ধ জীবনের দুঃখে হরষণে
মেটে নাই, মেটে নাই আশা !
দুরন্ত পিপাসা
আমারে নাচায়ে চলে পাগলের মত,
তাই অবিরত
ছোট বড় যত বাঁধা ধরা
সব-চূর্ণ-করা
উঠিছে ক্রন্দন—
ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ এ বন্ধন।

দুঃখ সুখ সবে আসে যায়
আমারে দোলায় ;
ছুটে ছুটে যাই
চাই চাই আরো আরো চাই।
উন্মত্ত চরণ
করে নিষ্পেষণ
যত বাঁধা যত কারাগার,
ঝাঁপায়ে পড়িতে খুঁজি মুক্তি পারাবার।

কিবা চাই কিবা কেবা জানে
শুধু জানি প্রাণে—
নহে নহে এ মোর ভবন,—
ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ এ বন্ধন।
ভেঙে ভেঙে চলি তাই
ছুটে ছুটে ভেসে যাই
পিপাসার, মুকতির দোলে
কোন্ শান্তি-কোলে !
আমার সীমায়
রুধিবারে পারি না আমায়,
আমারে উপচি' নিশিদিন
আমি কোথা লীন !
এ সীমা আমার
খালি বারেবার
আমারে বাঁধিতে আসে,
সে কঠোর পাশে
ক্ষিপ্র হাতে কাটিয়া পালাই,
যাই যাই, চাই শুধু চাই।
এ আমার সুতীব্র তিয়াস,
এ আমার দুরন্ত দুরাশ
এ আমার বাঁধা-ভাঙা উন্মত্ত গমন
এমনি যে অনুখন
ছুটায় আমারে
ভুবনের, জীবনের সবার ওপারে।
চল চল প্রাণ
টুটিয়া পাষাণ
অজানার আকুল সন্ধানে
উন্মুক্ত বিমানে,
সত্য মিথ্যা কিছু নাহি চাই
ভেঙে ভেঙে ভেসে ভেসে যাই।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

---

# চল্‌তি কথা

**উত্তর বঙ্গে জলপ্লাবন**—মানুষকে চিরদিনই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম কোরে বাঁচতে হয়েছে, বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এই সংহারময়ী উদ্দাম প্রকৃতিকে বশ করতে পারে-নি। তার যখনই তার খেয়াল হয়েছে তখনই সে অবলীলায় মানুষের প্রাণ, মানুষের ঘরবাড়ী খেলার ছলে নষ্ট কোরে দিয়েছে। তাকে রোধ করবার শক্তি

আমাদের এই বাংলা দেশ প্রকৃতির লীলাভূমি বলেই হয়। এখানে প্রতি বৎসরেই কোনো না কোনো স্থানে ঝড় কিংবা প্লাবন লেগেই আছে। প্রকৃতির সংহারমূর্ত্তি এমনিতেই ভয়াবহ, মানুষের স্বার্থান্ধতার সহযোগিতায় এই রুদ্রমূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর হোয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে ঘাটালে বন্যা হোয়ে সে দেশবাসীর কি দুর্দ্দশা হয়েছিল

না থামতেই উত্তরবঙ্গের রাজশাহী ও পাবনা জেলার কয়েকটি জায়গা যমুনা ও আত্রাই নদীতে বন্যা এসে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বন্যার জলে গ্রামগুলির অধিকাংশ বাড়ীই পড়ে গিয়েছে। গ্রামে এক মানুষ, দেড়-মানুষ, সমান জল আটকে গিয়েছিল! লোকেরা রেলের লাইন ও অন্য অন্য উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়ে কেনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়েছে। গৃহপালিত পশু যে কত মারা গিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। মানুষ মরেছে নিশ্চয়, কিন্তু কত মানুষ মারা গিয়েছে তা জানবার উপায় নাই। সেদিন একটা ইংরেজ পরিচালিত কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল যে, প্রায় চারশো লোক মরেছে। কেউ কেউ বলছেন যে, দশলক্ষ লোকের মধ্যে চারলক্ষ লোক মারা গিয়েছে, কোনো সংবাদে প্রকাশ মাত্র চারটি লোক মরেছে। মানুষের মৃত্যুর সংবাদগুলি এমন পরস্পর-বিরোধী যে, কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। তবে এটা স্থির যে, বন্যার ফলে অনেক মানুষ মরেছে।

গবর্মেণ্টের তরফ থেকে এ সম্বন্ধে এখনও কোনো সংবাদ প্রকাশ করা হয়-নি। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, অতি সামান্য ব্যাপারেও পাবলিসিটি অফিসার ঘন ঘন কামউনিক বার করতে থাকেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যখন চারিদিক থেকে মানুষ মরা সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব এত রকমের গুজব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, তখন পাবলিসিটি কেন যে নীরব হোয়ে রয়েছেন তার কারণ ঠিক জানতে পারা যাচ্ছে না।

শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে,সরকার থেকে সাহায্যের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ; কিন্তু বন্দোবস্তের কোনো বিবরণ আমরা পাই-নি।

বন্যা-পীড়িত দুঃস্থ লোকদের সাহায্যের জন্য আচার্য্য প্রফুল্লকুমার রায় প্রমুখ কয়েকজন মিলে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেছেন। এরা চাঁদা আদায় ও বন্যাপীড়িত স্থান সমূহে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাবার ভার নিয়েছেন। এঁদের সঙ্গে কলকাতা কংগ্রেস কমিটির ও বাংলার যুবক সমিতির কর্ম্মীরাও যোগ দিয়েছেন! শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু এবং আরও অনেক স্বেচ্ছাসেবক পীড়িতদের সাহায্যের জন্য সেখানে গিয়েছেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সেবকেরাও এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বেঙ্গল

শোনা যাচ্ছে বন্যার ফলে দশলক্ষ লোক গৃহহীন হয়েছে। জল সরে গেলেও তাদের আবাস ও আহারের কষ্ট যাবে না। জল সরবার পর মহামারী হওয়াও সম্ভব, সুতরাং এদের সাহায্যের জন্য বিস্তর অর্থ আবশ্যক। সাহায্যের জন্য যে রকম অর্থ পাওয়া যাচ্ছে তাতে কতদিন সাহায্য চলতে পারবে তা হিসাব কোরে বলা সুকঠিন। এ-বছর অন্যান্য বছর অপেক্ষা ধানের অবস্থাও আশাপ্রদ ছিল. কিন্তু প্লাবনে অধিকাংশ ক্ষেতই নষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যতে হয়ত এই সকল স্থানে দুর্ভিক্ষও হোতে পারে।

বন্যা, প্লাবন, ঝড় বাংলা দেশে নতুন নয়। ইংরেজরা এদেশ অধিকার করবার আগেও এমন প্লাবন বহুবার হয়েছে,এখনও হচ্ছে। যাঁরা বন্যাপীড়িত স্থানগুলিতে দুঃস্থদের সাহায্য করতে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলছেন যে উঁচু রেলের রাস্তা থাকার জন্য জলের স্বাভাবিক গতি বন্ধ হোয়ে জল আটকে যায় এবং সেইজন্যই লোকদের কষ্টেরও অবধি থাকে না এবং সেই বন্ধ জল কোনো দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পেরে সেইখানেই বসতে থাকে এবং ভবিষ্যতে মহামারীর কারণ হয়। রেলের রাস্তা উঁচু এবং সেখানে জল নিকাশের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে culrvrt এর ব্যবস্থা নাই।

রেলের প্রতি আমাদের কিংবা এই সব সেবকের কোনো বিদ্বেষ নাই। একথা শুধু যে দেশের লোকই বলছে তা নয়। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের বড়কর্ত্তা ডাক্তার বেণ্টলিও বন্যাপীড়িত স্থানে গিয়ে এই কথাই বলেছেন।

রেল-রাস্তার প্রতি এই অভিযোগ বহুদিন থেকেই আমরা শুনে আসছি। রেলের রাস্তা উঁচু থাকায় এবং তার মধ্যে দিয়ে জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা না থাকাই যে বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার একটি প্রধান কারণ—রাজা দিগম্বর মিত্রের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশের আপামর সকলেই জানে এবং এর জন্য দেশবাসী চীৎকারও কিছু কম করে-নি। রেল সকল দেশেই আছে, কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থার অনুপাতে আমরা রেলের যে মাশুল দিয়ে থাকি অন্য কোনো দেশের লোককে তত মাশুল দিতে হয় না। তার ওপর

এ-সব ছাড়াও রেল-রাস্তায় জল নিকাশের সুব্যবস্থা না থাকায় বছরে বছরে কত অর্থ ও প্রাণ নাশ হয় তার ইয়ত্তা নাই। এর সুব্যবস্থা হওয়া চাই। সারা সিরাজগঞ্জে রেলপথ যখন চওড়া করা হয় তখন এজন্য অনেক চেঁচামেচি করা হয়েছিল কিন্তু কর্ত্তারা সে সময় তা গ্রাহ্য করেন নি। বন্যার জলকে ঠেকাবার সাধ্য দেশবাসীর নাই কিন্তু বন্যার জলের স্বাভাবিক গতি যে রেল-রাস্তা রোধ কোরে আছে তার বন্দোবস্ত যদি গবর্মেণ্ট না করেন তা হোলে জমিদারকেই হোক আর গবর্মেণ্টকেই হোক, প্রজারা যে খাজনা বন্ধ করতে পারে তার প্রমাণ গবর্মেণ্ট একাধিক বার পেয়েছেন।

**প্রিন্সেস প্রোটেকশন বিল**—সম্প্রতি কাউন্সিল অব ষ্টেট থেকে প্রিন্সেস প্রোটেকশন বিল নামে একটি বিল পাশ করা হয়েছে। এই বিলের মোদ্দা কথাটা এই যে, কোনো দেশীয় সামন্ত রাজ্যের বাইরে সেখানকার কোনো আন্দোলন হোতে পারবে না। গবর্মেণ্টের তরফ থেকে প্রথমে এই বিলটি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে (Inidan Legislative Assembly) পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার সভ্যরা এই প্রস্তাবটিকে নাকচ কোরে দেওয়ায় শেষকালে কাউন্সিল অব ষ্টেটে বড়লাটের সুপারিশে বিলটি পাশ হয়েছে।

হঠাৎ সাত-তাড়াতাড়ি কেন যে এই রকমের একটা বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হোলো তার কারণটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাজনীতি জিনিষটা আমরা খুব বুঝি এই গর্ব্ব আমাদের মনে যতই থাকুক না কেন, একথা ধ্রুবসত্য যে রাজনীতিক চালবাজীতে (Diplomacy) ইংরেজের কাছে আমরা দুগ্ধপোষ্য শিশু। এ বিল পাশ করার হালফিল কোনো কারণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিনা বটে, কিন্তু এর যে গূঢ় কোনো কারণ নাই সে কথা বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না।

দেশীয় সামন্ত রাজ্য অথবা ব্রিটিশ অধিকৃত রাজ্য যেখানেই হোক, যদি কোনো শাসক সম্প্রদায় দেশের অধিকাংশ লোকের স্বার্থের বিরোধী কোনো কাজ করতে চান তা হোলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার অধিকার সে অন্যায়ের প্রতিকারের কোনো উপায় না থাকে ও ব্রিটিশ অধিকৃত সাম্রাজ্যে আন্দোলন করলে যদি তার প্রতিকার হবার সম্ভাবনা থাকে, তা হোলে অন্যায়ের প্রতিকারের এই স্বাভাবিক পন্থা এমন ভাবে বন্ধ কোরে রাখবার উদ্দেশ্য কি?

দেশীয় কোনো কোনো সামন্ত রাজ্যের মধ্যে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁর কাজের এবং কথার ওপর কারো কিছু বলবার অধিকার নাই। আমরা কোনো কোনো রাজ্যের কথা জানি যেখানে রাজনীতি তো দূরের কথা সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতির বিরোধী এমন অনেক কাজই অবাধে হোয়ে থাকে যা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই সব ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া দরকার। কিন্তু একথা সকলেই জানেন যে, সামন্ত রাজ্যে রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা তো দূরের কথা, অতি সামান্য কারণেই প্রজার বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার কোনো প্রতিকার নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বসে এই সব বিষয়ের আন্দোলন চলতো, এবার থেকে তাও বন্ধ কোরে দেওয়া হোলো। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি?

দেশীয় সামন্ত রাজ্যের বাইরে রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন কোরে অনেকবার সুফল পাওয়া গিয়াছে। শুধু প্রজার দিক দিয়ে নয়, রাজার ওপর অত্যাচার হয়েছে এমন অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে এখানে আন্দোলন কোরেও তার প্রতিকার হয়েছে। প্রিন্সেস প্রোটেকশন বিলে এক ঢিলে দুইপাখী মারা হোলো বোধ হয়।

**গুরু-কা-বাগের হাঙ্গামা**—গুরু-কা-বাগে যে সব আকালি শিখ বাগানে কাঠ কাটতে যাচ্ছিল গবর্মেণ্টের পক্ষের লোকেরা তাদের ওপর নির্ব্বিচারে লাঠিবাজী করায় অনেক শিখ হতাহত হয়েছে। কিছুদিন থেকে লাঠিবাজী বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু শিখেরা এখনও আগেকার মতনই সেখানকার বাগানে কাঠ কাটতে যাচ্ছে। গবর্মেণ্টের লোকেরা তাদের গ্রেপ্তার করছে এবং বিচারে তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে।

কোনো সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারী নিজের হাতে লাঠিবাজী কোরে শিখদের পিটেছিলেন। এই বিষয়ে তদন্ত করবার জন্য কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এঁরা তদন্ত সুরুও করেছেন। প্রবন্ধক কমিটি পঞ্জাব গবর্মেণ্টকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা ইচ্ছা করলে এই তদন্ত কমিটিতে এসে সাক্ষীদের মুখে অত্যাচারের বিবরণ শুনতে পারেন এবং উকীল কিংবা ব্যারিষ্টার পাঠিয়ে সাক্ষীদের জেরাও করতে পারেন। কিন্তু পঞ্জাব গবর্মেণ্টের চীফ সেক্রেটারী তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, যেহেতু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই সব অত্যাচারের জন্য তদন্তের আগেই পুলিশ কর্ম্মচারীদের নিন্দা করেছেন এবং যেহেতু তাঁরা নিরুপদ্রব শিখদের ব্যবহারের জন্য তাদের ধন্যবাদ দিয়েছেন সেই হেতু দেখা যাচ্ছে যে, আগে থাকতেই এই হাঙ্গামা সম্বন্ধে তাঁরা একটা মত স্থির কোরে ফেলেছেন, সেইজন্য তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হোলো।

এই তদন্ত কমিটি গবর্মেণ্টের তরফ থেকে সাক্ষীদের জেরা করবার জন্য লোক ডেকে সুবিবেচনার কাজই করেছিলেন। অন্ততঃ তাঁদের যে সত্য কথা অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা আছে এই ব্যবহার থেকে তা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। তদন্ত কমিটি সাক্ষীদের জেরা করবার জন্য গবর্মেণ্টের তরফ থেকে লোক ডেকেছিলেন, কমিটির সভ্যদের জেরা করবার জন্য নয়। সাক্ষীদের মুখ দিয়ে জেরার সময় যে সকল কথা প্রকাশ হোয়ে পড়ত সে কথা সাধারণে সকলেই জানতে পারতো। তদন্ত কমিটির সভ্যারা যদি সাক্ষীদের মুখে প্রকাশিত কোনো বিবরণের বিরোধী মত কিংবা সংবাদ প্রকাশ করতেন তা হোলে তাঁদের কথা কেউ বিশ্বাস করত না। এক্ষেত্রে গবর্মেণ্টের পক্ষ থেকে কমিটিতে লোক এলে সাধারণের মনে একটা বিশ্বাস হোতে পারতো যে, তাঁরা সত্য অনুসন্ধানের যথার্থ অভিলাষী।

গবর্মেণ্টের তরফ থেকে জানান হয়েছে যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আকালিদের সাহস ও আত্মসংযমের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আকালিদের যে সাহস আছে এবং এই ব্যাপারে যে তারা যথেষ্ট আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছে সে কথা গবর্মেণ্টও ভাল কোরে জানেন। তবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাদের এজন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন আর গবর্মেণ্ট ধন্যবাদ দেন-নি, এই যা তফাৎ।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি আকালিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন—ওয়ার্কিং কমিটি দ্বারা নিযুক্ত তদন্ত কমিটি নয়। কিন্তু তাই বলেই যে তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত কমিটি পুলিশের বিরুদ্ধে মত পোষণ করবেন এমন কথা বিশ্বাস করবার কিছু হেতু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি সে কথা বিশ্বাস করতে হয় তা হোলে গবর্মেণ্টের নিযুক্ত তদন্তকারীরা যে শিখদের বিরুদ্ধে আগে থাকতেই একটা ধারণা পোষণ করছেন না সে কথাই বা বিশ্বাস করা চলে কি কোরে?

গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে একটা তদন্ত সুরু করেছেন। সত্যকথা বলতে কি সে তদন্তের ফলাফল জানতে দেশের লোক বেশী ব্যগ্র নয়।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

# সমালোচনা

**ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য**—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। দীনেশবাবু তাঁর নিজের কথা এবং সাহিত্য-সমালোচনার পাতা দিয়ে যে বইটা ভর্ত্তি করেন নি সেজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিই। দীনেশবাবু লেখক বলেই এতদিন সবার কাছে পরিচিত হয়ে আসছেন, তিনি যে নিজের মধ্যে খুব ছোট অথচ চমৎকার ছবি নেবার ফটোযন্ত্র নিয়ে পঞ্চাশ বছরের উপরে আমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা কারো জানা ছিলনা। এসব পল্লীজীবনের ছোট ছোট ছবি, অদ্ভুত চরিত্রের সব মানুষের চটপট আঁকা চিত্র, এক হিসেবে এগুলি একদিক দিয়ে উপকথার মতো মনোহর আর একদিক দিয়ে এগুলি বাংলার নিখুঁত ইতিহাস। গত দশ-বিশ বছরের মধ্যে একাল ও সেকালের মাঝে যে পাঁচিল উঠে গেছে, সেই ব্যবধানটা দীনেশবাবুর বইখানা পড়তে-পড়তে যেন চোখের সামনে থেকে সরে যায়, রাস্তার যে মোড় ঘুরে এসেছি সেই মোড়ে গিয়ে যেন মুখ ফিরিয়ে দেখে নিই--ফেলে-আসা পথের নানা সৌন্দর্য্য নানা সুখ-দুঃখ হাব-ভাবপূর্ণ ছবি সব। একালের যুবকদের বইখানা কেমন লাগবে বলতে পারিনে কিন্তু সেকালের সুরের রেশ এখনো যাদের ভিতরে বাজছে এ বই তাদের আদর পাবেই। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



দময়ন্তী ও হংস

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত

# ভারতী

৪৬শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ { অষ্টম সংখ্যা


## বাঙ্‌লার 'প্রথম'

[ ১ ]

### প্রথম বাঙ্‌লা ব্যাকরণ

ইংরেজী ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হালহেডের লেখা ব্যাকরণই প্রথম বাঙ্‌লা ব্যাকরণ, ঠিক এই কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। হালহেডের পূর্ব্বে বাঙ্‌লা ব্যাকরণ যে ভারতবর্ষে বাহির হয় নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের বাহিরে একখানি পুস্তক ১৭৪৩ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল। * সেখানি পর্ত্তুগীজ ভাষায় লেখা। লিসবনে এই গ্রন্থখানি ছাপান হয়। ইহার ১ হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাঙ্‌লা ব্যাকরণ ; ৪৯ হইতে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাঙ্‌লা পর্ত্তুগীজ অভিধান এবং ৩০৭ হইতে ৫৭৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ-বাঙ্‌লা অভিধান। সমগ্র পুস্তকের বাঙ্‌লা অংশ রোমান অক্ষরে লেখা। এই পুস্তক বাহির হইবার পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে হালহেডের ব্যাকরণ ছাপা হয়। এইখানিই বাঙ্‌লার প্রথম মুদ্রিত ব্যাকরণ। সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহার পূর্ব্বে বাঙ্‌লায় কোন ব্যাকরণ ছিল না। প্রাচীন বাঙ্‌লা পুথির তালিকায়ও কোন বাঙ্‌লা ব্যাকরণের অস্তিত্বের নিদর্শন আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যত দিন কোন অপ্রকাশিত ব্যাকরণের নিদর্শন না পাওয়া যায়, তত দিন ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত ব্যাকরণকেই বঙ্গভাষার প্রথম ব্যাকরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আজকাল বাঙ্‌লা ব্যাকরণের ছড়াছড়ি। এগুলির অধিকাংশ ব্যাকরণেই সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি, কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্‌লার সন্ধি, প্রত্যয় আলোচনা করিবার প্রয়াস ক্বচিৎ দু'একখানি

* বঙ্গভাষার প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ তিনখানি। এ তিনখানি পুস্তক লিসবনে ১৭৪৩ সালে Manoel de Asamcao পর্ত্তুগীজদের চেষ্টা ও যত্নে বাহির করেন। ১ খানির নাম "Compendium des Mysterios da Fe´ etc" [a compendium of the mysteries of the faith] এই বইখানি Asiatic Society of Bengalএ সংরক্ষিত আছে। ইহার ভূমিকা হইতে বোঝা যায় যে ইহা ১৭৩৪ সালে লেখা হইয়াছিল। বইখানি কিন্তু ১৭৪৩ সালে বাহির হয়। ২য় খানির নাম "Cathecismo da Doutrina Christ'a" [Catechism of the Christian doctrine]। এই গ্রন্থখানি Don Antonio নামক ভূষণানিবাসী বাঙ্গালী কর্ত্তৃক রচিত এবং Frey Manoel de Asampcao কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। ৩য় পুস্তকখানির নাম "Vocabulario em idioma Bengala Portuguesa"[Vocabulary in the Bengali and Portuguese Language]। এই তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রমাণ-পঞ্জী (authorities) নিম্নে দেওয়া গেল :—

(ক) Barbosa Machado—Bibliotheca Lusitana Histerica etc. Vol III, p 183.

(খ) Catalogo dos Mss. da Bibliotheca Publica Evorera ordenada par J. H, de Cunha Rivara,

ব্যাকরণে দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালা বঙ্গভাষার এইরূপ বর্ত্তমান ব্যাকরণ কিন্তু একেবারে অধুনাতন আকারে গড়িয়া ওঠে নাই। বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইতে ইহার অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। প্রথম প্রথম ব্যাকরণে সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, ষত্ব, ণত্ব, অলঙ্কার, এই কয়টী বিষয় আদৌ আলোচিত হয় নাই। হালহেড ইংরেজী ১৭৭৮ সালে, কেরী ১৮০১ সালে, কীথ ১৮২০ এবং রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে * চারিটী ছন্দের নিয়ম সামান্যরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। পরে ১৮৩৪ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় বিস্তৃতভাবে ছন্দের আলোচনা করেন। তারপর ১৮৫২, ১৮৫৭ ও ১৮৬১ সালে ছন্দোবিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়। শেষে ১৮৬৪ সালে মধুসূদন শর্ম্মা ৮৮টী ছন্দের বিস্তৃত আলোচনা করেন। ১৮২০ সালে মথুরমোহন দত্ত কর্ত্তৃক সন্ধি প্রথমে আলোচিত হয়। ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৫ সালের মধ্যে সন্ধিপ্রকরণের পুনরালোচনা হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে শ্যামাচরণ সরকার সন্ধি-প্রকরণের যথোচিত সংস্কার করিয়া, ইহাকে সাময়িক সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তোলেন। ইহার পর সকলেই ব্যাকরণে সন্ধি-বিধি করিতে আরম্ভ করিলেন। সমাসের আদি পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়। ইনি বহুব্রীহি, উপপদ ও কর্ম্মধারয়, এই তিনটী সমাসের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইনি আবার চলিত বাঙ্‌লাপদের সমাস প্রথম অনুশীলন করেন (১৮৩৩)। পরে ১৮৫২ সালে শ্যামাচরণ সরকার সমাসের রীতিমত প্রয়োগবিধি প্রদান করেন। এই সময় হইতে বাঙ্‌লা ব্যাকরণে সমাসের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। রাজা রামমোহন রায় কয়েকটী বাঙ্‌লা প্রত্যয় ও স্ত্রীত্বের নিয়ম করেন। ষত্ব-ণত্বের প্রথম পথ দেখাইলেন শ্যামাচরণ সরকার। ষত্ব-ণত্বের বিস্তৃত আলোচনা ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'সরল ব্যাকরণে' দেখা যায়। শ্যামাচরণ সরকারই সর্ব্বপ্রথমে ব্যাকরণে যমক ও অনুপ্রাস এই দুইটী অলঙ্কারের বিবরণ প্রদান করেন। পরে ১৮৫৭ সালে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও কয়েকটী অলঙ্কার সংযুক্ত করেন। অতঃপর ১৮৭৪ সালে জয়গোপাল গোস্বামী ছন্দঃ ও অলঙ্কারসমূহের বিশদ ব্যাখ্যাসহ এক সুন্দর গ্রন্থ বাহির করেন। এইরূপে ছন্দ, সন্ধি, সমাস, ষত্ব, ণত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি ক্রমশঃ ব্যাকরণের মধ্যে একে একে প্রবিষ্ট হইয়া আধুনিক বাঙ্‌লা ব্যাকরণের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। এইরূপে পরিপুষ্ট ব্যাকরণগুলি ঠিক বাঙ্‌লা ভাষার ব্যাকরণের কাজ করে নাই। বিদেশী পণ্ডিত বাম্‌স্ (১৮৭২-৭৯) সালে এবং হর্ন্‌লে ১৮৮০ সালে বাঙ্‌লার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া তাহার আসল রূপ বাহির করিবার প্রথম প্রয়াস করেন। তারপর ১৮৮১ সালে চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ লিখিবার উদ্যম বাঙালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম করেন। তারপর পদ্মনাভ ঘোষাল ভাষাতত্ত্বের ভিতর দিয়া,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শব্দতত্ত্বের' দিক্ দিয়া, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'শব্দ-কথায়', যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি 'বাঙ্গালা ব্যাকরণে', বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও বিধুশেখর শাস্ত্রী বিবিধ প্রবন্ধে বাঙ্‌লা ব্যাকরণের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখনও ইহার কিছুই করা হয় নাই। বাঙ্‌লা ব্যাকরণের মূল সূত্র বাহির করিবার চেষ্টামাত্র হইয়াছে। এখন বাঙ্‌লা ভাষা যে সমস্ত ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া নিজ কলেবর পরিপুষ্ট করিয়াছে, বঙ্গভাষার আলোচনায় সেই সমস্ত ভাষারও অনুশীলন দরকার।

যাক্—এ সমস্ত কথার আলোচনা ছাড়িয়া এইবার আমরা হালহেডের ব্যাকরণের কিছু পরিচয় সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিব।

হালহেড-কৃত ব্যাকরণের নাম "A Grammar of the Bengal Language"। এই পুস্তকে যে কেবল ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় আছে, তা' নয়, একজন বিদেশীকে বাঙ্‌লাভাষা শিখিতে হইলে যাহা জানা দরকার, সেগুলি ইহাতে মোটামুটি আছে; কিন্তু কোন বিষয়েরই আলোচনা ইহাতে ভালরূপ নাই। তখনকার অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে, একজন বিদেশীর পক্ষে এরূপ সময়ে এমন গ্রন্থ রচনা করা কম শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় নয়। হালহেডের এই ব্যাকরণ অত্যন্ত যত্ন ও নিতান্ত পরিশ্রমের সহিত

* রাজা রামমোহন রায় পূর্ব্বেই পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের পরিচয়-পত্রটী ( Title-page ) এইরূপে লেখা আছে—

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

# A GRAMMAR OF THE BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED

AT

HOOGLY IN BENGAL

M DCC LXXVIII.

গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে হালহেড্‌ পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটী ভূমিকা তাঁহার ব্যাকরণে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

প্রতিজ্ঞায় প্রথমেই তিনি বঙ্গদেশ শাসন সম্বন্ধে বৃটিশ

য়াছেন। এদেশের উচ্চ-আদালত প্রতিষ্ঠার কথায় হালহেড্‌ বঙ্গদেশের উপর বেশ একটু জোর দিয়াই লিখিয়াছেন। রাজা ও প্রজার মিলন-সূত্র কি, সে বিষয়েও তিনি দু কথা বলিতে ছাড়েন নাই। কোন দেশকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে হইলে সে দেশের প্রচলিত ভাষাগুলি শিক্ষা করা

তিনি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ভারতবাসী, আমরা শাসিত হইব, আর ইয়ুরোপের অধিবাসীরা আমাদের শাসন করিবেন, হালহেড্ এ কথা স্পষ্ট বলিয়াই জেতাকে বিজিত জাতির ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিদেশীর ভাষা শিক্ষার জন্যই এই ব্যাকরণের উৎপত্তি ধরিয়া লইলেও, স্বীকার করিতে হইবে, ইহাদ্বারা আমাদেরও ব্যাকরণ রচনার পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল।

হালহেড্ ভূমিকায় ভারতীয় সাহিত্যের মূল লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি তিনি দিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই এখনকার দিনে আর খাটে না। তবু তখনকার আলোচনা হিসাবে ইহার কিছু মূল্য থাকিতে পারে। হালহেড্ বলেন, পারস্য উপসাগর হইতে চীনসমুদ্র পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃত অতি সুষ্ঠু ও প্রাচীন ভাষা। তবে তাহা ব্রাহ্মণদের পুথিশালাতেই আবদ্ধ। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে পার্সী, আরবী, লাটিন ও গ্রীকের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। তিনি বলেন, সভ্যতার প্রথম অবস্থায় যে ভাষা ও শব্দের সামঞ্জস্য ছিল, তাহা বেশ বোঝা যায়। সংস্কৃত অক্ষর প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, আসাম, নেপাল কাশ্মীর ও অন্যান্য অনেক রাজ্যের মুদ্রায় সংস্কৃত অক্ষরের ছাপ। এগুলিতে পৌরাণিক কালের দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। নেপাল ও ভুটানের মুদ্রায় এইরূপ ছাপ তিনি দেখিয়াছেন। মিসরের ভাষা, রাজ্য-শাসন-পদ্ধতি ও ধর্ম্মে তাহাদের মৌলিকতা আছে বলিয়া মিসর-বাসী দাবী করে। হালহেড্ কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কৃষ্ণনগর-রাজবাড়ীর পুথিশালায় এমন অনেক পুথি আছে, যেগুলিতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, মিসর ভারতের নিকট ঋণী। এই সকল গ্রন্থের বলে তিনি বলিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে মিসরে ও ভারতে বাণিজ্যাদি সম্পর্ক ছিল। মিসর যে ভারতের শিষ্য ছিল, তাহা এই সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রীকেরাও যে ভারতের নিকট ঋণী, এ কথাও এই সকল গ্রন্থে আছে। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থেও পাওয়া যায় যে, গ্রীক গ্রন্থকারগণও সে সময়ের ব্রাহ্মণদের খুব

জেসুইট দুপোঁ ( Jesuit Dupont ) সংস্কৃত ভাষার ধাতু প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক অবান্তর কথা বলিয়া অনেককে ভ্রমে ফেলিয়াছেন। সংস্কৃতের শব্দসংখ্যা ও বিষয়-বৈচিত্র্য যে গ্রীকের চেয়ে বেশী, হাল্‌হেড্ তাহা মানিতে চান না। ভূমিকায় আমাদের দেশের সেই সময়ের অবস্থা বেশ সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। আদালতের কার্য্য ব্যতীত যে অন্য সমস্ত কার্য্যই সেই সময় বাঙ্‌লা ভাষায় পরিচালিত হইত, তাহা ভূমিকায় বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। হাল্‌হেড্ কিরূপে ব্রাহ্মণের নিকট অতিকষ্টে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও তিনি বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হাল্‌হেড্ ভূমিকার শেষভাগে হাস্যোদ্দীপক এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ADVERTISEMENT.

"It is recommended not to bind this book till the setting in of the dry season as the greatest part of it has been printed during the rains."

তখনকার ছাপার কালির এমনই মাহাত্ম্য!

বাঙ্‌লা লিখন-প্রণালী, যুক্তাক্ষর, বর্ণের উচ্চারণ, বানান, লিঙ্গ-নির্ণয়, কারক, বচন, সর্ব্বনাম, বিভক্তি-বিচার, ধাতুরূপ, বাঙলা অর্থযুক্ত সংস্কৃত ধাতুর তালিকা, বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণের সম্বন্ধ, সংখ্যা, অঙ্ক-শাস্ত্রের তালিকা, ছন্দ এবং পত্রাদি লিখিবার ধারা—এইগুলি হাল্‌হেডের ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়। এই পুস্তকের বাঙ্‌লা অংশ হস্তলিপির বর্ণের অনুকরণে কাঠে ক্ষোদাই করা অক্ষর দিয়া ছাপা। কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং প্রাচীন সঙ্গীত হইতে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য এই যে, কিছু বলিতে গিয়া শব্দের উদাহরণ ব্যতীত সকল স্থানেই উদাহরণ গ্রন্থ হইতেই হালহেড দিয়াছেন। নিজের স্বকপোল-কল্পিত দৃষ্টান্ত নাই।

প্রথম অধ্যায়ে কাশীদাসী মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব

করা হইয়াছে এবং ইংরেজিতে তাহার উচ্চারণ (transliteration) ও তর্জ্জমা দেওয়া হইয়াছে। হাল্‌হেডের সময় মুদ্রিত বাঙ্‌লা পুস্তক ছিল না; সুতরাং তাঁহার ব্যাকরণ সঙ্কলন করিবার সময় তাঁহাকে বাঙ্‌লা হস্ত লিপিরই সাহায্য লইতে হইয়াছিল। হস্তলিপিতে "সকার-ত্রয়," "উভয় জ," এবং "ন'দ্বয়" লিপিকরগণ যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখিয়া হাল্‌হেডও বাঙ্‌লা ভাষার এরূপ প্রয়োগ-বিধিকেই মানিয়া লইয়াছেন। এইরূপ প্রয়োগে 'সান্ত্বনা' প্রভৃতি কোনও কোনও যুক্তবর্ণের শব্দে "ব"-কারের লোপ পাইয়াছে। হাল্‌লেড সকার, জকার ও নকারের যদৃচ্ছা প্রয়োগ-বিধি স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষায় এগুলির প্রয়োগ বিভিন্ন হইলেও বাঙ্‌লায় তাহারা পরস্পর পরিবর্ত্তনীয়। হাতের লেখায় "কু" ও "ক্ক"-র প্রভেদ সামান্যই। 'ক্ক' দিয়া 'কু' এখন আর চলে না। এই পুস্তকে 'ষ'এ "ণ" যোগ করিয়া "কৃষ্ণ" বানানও লেখা হইয়াছে। বাঙ্‌লা অনুস্বারের রূপ "ং" এইরূপ; কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে "বংশী" প্রভৃতি এইরূপ "॰" দিয়া ছাপিয়াছেন। এখনও কোন কোন বৃদ্ধ "॰" এবং 'কু' বুঝাইতে "ক্ক" লিখিয়া থাকেন।

তাঁহার ব্যাকরণে "৫" র অন্যতর আকৃতি "২" দেওয়া হইয়াছে। "৭" এই অক্ষরটী কেন পত্রাদির উপর লেখা হইত, সে সম্বন্ধে হাল্‌হেড বলেন যে, সর্ব্বজ্ঞানের আকর গণেশের স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ ইহা পত্রাদির উপরে লেখা হয়। ইহাকে গণেশের "আঁকৃড়ি" বলে। গণেশের আঁকৃড়ি, সিদ্ধিরস্তু, পেটকাটা 'ব'-র বিবরণ তাঁহার ব্যাকরণে আছে, ক্ল, ঌ কথাও আছে, কিন্তু 'ক'এর আগে "আঁজী" বলিয়া বর্ণোচ্চারণ-পদ্ধতি লোপ পাইয়াছে বড় বেশী দিন নয়। হাল্‌হেডের ব্যাকরণে এই অনাবশ্যক উচ্চারণ নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, "৺" ঈশ্বর-বোধক চিহ্ন। সম্মানসূচক 'শ্রীশ্রী' শব্দের উপর তিনি দু'কথা না বলিয়া ছাড়েন নাই। বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। তাদের মধ্যে একটা নিয়মের উদাহরণ দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—দুইটী স্বর একত্র থাকিলে "ঞি" হয়, যথা,—গোঁসাই—গোঁসাঞি, ওই—ওঞি, ইত্যাদি।

এই তো গেল প্রথম অধ্যায়ের কথা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি লিঙ্গ প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি "সান্তিপুরী" (শান্তিপুরনিবাসী) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নূতন ধরণের এক অদ্ভুত শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন—"সান্তিপুরিনী।" "বাঘ" শব্দের পুংলিঙ্গে "বাঘা"—স্ত্রীলিঙ্গে বাঘী, বাঘনী; এইরূপ হরিণ—হরিণী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটী গীত আছে। কাহার রচিত, স্থির করিতে পারিলাম না। গীতটী এই:—

গীত

ভব সিন্ধু পাররে কে যাবা ভাইরে
হরি নামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারি
বাহ.বাহ বল্যা ডাকে দুই বাহু পসারি
ঠাকুর নিতাইয়ের ঘাটে অদান খেয়া বয়
কত অন্ধ অতুর তারা সব পার হয়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সর্ব্বনাম। 'আমি' শব্দের কর্ম্মকারকের একবচনে 'আমা' এবং সম্প্রদানের একবচনে "আমারে" এবং অপাদানের একবচনে "আমাতে।"

করণ হইতে অধিকরণের বহুবচনে—(৩) আমার-দিগেতে, (৪) আমারদিগেরে, (৫) আমারদিগেতে, (৬) আমারদিগের, (৭) আমারদিগে। সে দিনও বাঙ্‌লা ব্যাকরণে এগুলি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তুমি শব্দের বহুবচনে "তোমা" এবং কর্ম্মকারকের একবচন ও বহুবচনেও "তোমা"। দ্রষ্টব্য—

| একবচন। | বহুবচন |
|---|---|
| ইনি | ইনা |
| আপনি | আপনারা |

এই অধ্যায়ে বিশ্বেশ্বরী 'সত্যনারায়ণ' হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সেটী এই—

দাস দাসী জত তারা পলাইয়া গেল।

চতুর্থ অধ্যায়ে ধাতুরূপ ও ধাতুর তালিকা।

তারপর কৃদন্ত। হালহেডের মতে বাঙলায় কৃদন্ত প্রকরণের পৃথক্ বিবরণ অনাবশ্যক। তবে বাঙলায় এক প্রকারের কৃদন্ত হইতে পারে, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া তিনি যে পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা কৃৎ-প্রকরণ লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর হইতে কিছু তুলিয়া দিলাম :—

The form which I would describe, is a noun of reciprocation, implying either a mutual co-operation or a mutual opposition. This noun is composed of the participle of the passive voice prefixed to the participle present of the active: as of the verb হানন *to wound* হানা is the passive participle ***wounded,*** and হানি the active participle ***wounding.*** These two united make হানাহানি ***a mutual wounding***; as

দুই বীরে হানাহানি সংগ্রাম ভিতরে "There was a ***mutual wounding*** by the two heroes in the midst of the battle."

This kind of alliterative sound is particularly pleasing to a Bengali ear; for which reason a great number of words has been formed in imitation of this species, which preserve their reciprocative energy, tho' derived from common nouns. Such are কানাকানি ***with ear to ear,*** ( that is ***a mutual whispering*** ) from কান ***an ear.***

Some few words of this sort seem to imply completion; as মাসামাসি ***a complete month.*** বেলাবেলি ***a complete day.*** তরাতরি ***complete haste.***

A third class;......consists of words combined to imitate sounds. These have and do not convey any mutual or reciprocative meaning.

থরথরি a noise like that of trees in a storm.

ঝরঝরি a noise like the dashing of waves.

ঝনঝন a noise like the falling of a shower.

এ ছাড়া তিনি কৃদন্ত সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলেন নাই।

তাঁহার বাঙলা ব্যাকরণে সমাস-বিধির কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার ব্যাকরণ-পাঠে বোধ হয়, তিনি বাঙলা ব্যাকরণে সমাস-প্রকরণ আদৌ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সে বিষয়ে নীরব ছিলেন। ইহার পর হালহেড সংখ্যা-পরিমাণ-সূচক আনা, কড়ি প্রভৃতির বিবরণ দিয়া শিশুবোধকের ব্যাপারটা সারিয়া লইয়াছেন।

অনুষ্টুপ, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, শর্করী, অতিজগতী, অতিশর্করী, এই কয়টী সংস্কৃত ছন্দের আভাস দিয়া, একপদী, ত্রিপদী, তোটক ও পয়ার সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। হালহেড 'ধুয়াতালের' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'ধুয়া'তালির সহিত গীত হইলে তাহার নাম "ধুয়াতাল" হয়।

তাঁহার সময় বিচারালয়ের বাঙলা এক অদ্ভুত রকমের। তাহাতে আরবী ও পার্সীবহুল শব্দের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর, ঐ সময় যিনি ঐরূপ শব্দবহুল বাঙলা বলিতে পারিতেন, তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন হইতেন। হালহেড তাঁহার ব্যাকরণে যে একখানি সেই সময়ের বাঙলা দলিলের নমুনা দিয়েছেন, তাহা আমরা পাঠককে উপহার দিলাম।

"৭ শ্রীরাম—

"গরিবনেওাজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল—

তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকাস্তি হইয়াছে—

সেই দুই গ্রাম পয়স্তী হইয়াছে চাকলে

একবরপুরের—

শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধরি আজ রায়

ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির
শরবরাহতে—
মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার জে শরকার
হইতে আমিন—
ও এক চোপদার শরজমিনতে।
পহুচিয়া তোরফেলকে—
তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া
হকদারের হক দেলায়া—
দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল
তারিখ ১১ শ্রাবণ—
ফিদবি—
জগতধির রায়"

১৭৫১ খৃষ্টাব্দের ২৫এ মে, ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার (Westminster) প্রদেশে নাথানিয়েল ব্রেসী হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) অক্সফোর্ডশায়ারের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হালহেডের পিতামহ নাথানিয়েল হালহেড (Nathaniel Halhed) Exchange Alleyতে দালালি করিতেন। এখানে তিনি বড় রকমের কিছু সম্পত্তিও করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথম, এলিজাবেথ (Elizabeth) উইলিয়ম হটনের (William Houghton, of Reading, Berks) কন্যা। ইনি আটটী সন্তান রাখিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে (১৭ ৭ খৃঃ, ৩০ মার্চ) মরেন। নাথানিএল হালহেড দ্বিতীয়বার যাঁহাকে বিবাহ করেন, তাঁহার নামও এলিজাবেথ। ইনি জর্জ মেসনের (George Mason of Noke Herefordshire) কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী। ইঁহারই গর্ভে বাঙলা ব্যাকরণ-রচয়িতা হালহেডের পিতা উইলিয়ম হালহেডের (William Halhed of the Noke, and of Great George's Street, Westminster, etc) জন্ম হয়। এই পুত্রটী রাখিয়া এলিজাবেথ ২১ বৎসর বয়সে (১৭২৯ খৃঃ, ১৬ অক্টোবরে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। উইলিয়ম হালহেড আঠার বৎসর ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের একজন তত্ত্বাবধায়কের (Director) কার্য্য করেন। (Frances Caswall) বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে (১) নাথানিয়েল ব্রেসী, (২) রবার্ট উইলিয়ম ও (৩) জনের জন্ম হয়। উইলিয়ম হালহেডের দ্বিতীয় পত্নীর নাম জানিতে পারি নাই। উইলিয়ম হালহেড কিছুদিন হারো (Harrow) নামক স্থানে বাস করিতেন। এই সময় তাঁহার পুত্র বালক নাথানিয়েল ব্রেসী হালহেড হারোতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—ডকুটর সামারের নিকট দশ বৎসর Classical সাহিত্যে রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্‌স্‌ফোর্ডের ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজে (Christ Church College) প্রবেশ করেন। অক্‌সফোর্ডে তিনি ১৭৬৮ হইতে ১৭৭০ পর্য্যন্ত ছিলেন। হারোতে অবস্থানকালে তিনি শেরিডানের (Richard Brinsley Sheridan) সহিত একই শ্রেণীতে পড়িতেন। এইখানে উভয়ের প্রথম বন্ধুত্ব হয়। কিছুকাল পরে (১৭৭১) উভয় বন্ধুতে মিলিয়া 'Aristaenetus'এর পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। অক্‌সফোর্ডে অবস্থানকালে তাঁহার উইলিয়ম জোন্সের (ইনি পরে Sir William Jones হন) সহিত পরিচয় হয়। হালহেড পূর্ব্বে কোন প্রাচ্যভাষা জানিতেন না। উইলিয়ম জোন্সই তাঁহাকে একদিন প্রাচ্যভাষা শিখিতে উপদেশ দেন। তাঁহারই কথায় প্রণোদিত হইয়াই হালহেড উত্তরকালে আরবী প্রভৃতি কয়েক প্রাচ্যভাষা শিক্ষা করেন।

Mooreএর মতে হালহেড ও শেরিডান উভয়েই কুমারী লিনলীর (Miss Linley) পাণিগ্রহাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। একদিন কথায় কথায় শেরিডান সম্বন্ধে কথা ওঠে। কুমারী লিনলী শেরিডানের পক্ষ সমর্থন করিয়া হালহেডকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দেন। হালহেড লিনলীর বিদ্রূপপূর্ণ অপমানে মর্ম্মাহত হন। ঠিক এই সময় তাঁহার একটী সুযোগ ঘটে। হালহেড কয়েকটী প্রাচ্যভাষা জানিতেন বলিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে তাঁহার মুহুরীর কাজ (writership) জোটে। তিনি কুমারী লিনলীর আশা ছাড়িয়া নিতান্ত

১৭৭১ সালের প্রথমেই * বঙ্গদেশে গমন করেন। এখানে আসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ভারতশাসনকর্ত্তা গুণগ্রাহী ওয়ারেন হেষ্টিংসের (Warren Hastings) নজরে পড়েন। হেষ্টিংস্ তখন মাদ্রাজে। কিন্তু শীঘ্রই কলিকাতায় কাউন্সিলে দ্বিতীয় পদ লাভ করিবেন। এমন সময় হালহেড নিজের বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার নিকট জাহির করায় সুফল ফলিল। তিনি খুব বড় বড় কাজ পাইলেন। কোম্পানির নিকট ও হেষ্টিংসের নিকট তাঁহার কদর খুব বাড়িয়া গেল। হালহেড প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে বিবাহ করিবেন না। কিন্তু কুমারী লিনলীর (ইনি শেরিডানকে বিবাহ করেন) ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি সাত-পাঁচ ভাবিয়া শেষে ভারতেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন।

সাহিত্যেই তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। রাজনীতির চর্চ্চাও সামান্য সামান্য তাঁহার ছিল। হেষ্টিংস্, উইলিয়ম জোন্স, স্যর এলিজা ইম্পে (Sir Elijah Barwell Impey), শেরিডান প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইম্পে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। † তিনি বলিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ হাল্‌হেডের সঙ্গে অনেক দিন থেকেই তাঁদের পারিবারিক বন্ধুত্ব। তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন। হালহেডের সঙ্গে হেষ্টিংসের ও তাঁহার পিতার বন্ধুত্ব ভারতবর্ষ থেকেই আরম্ভ হয়। এত রকম বিষয়ের আলোচনা একসঙ্গে করিতে পারেন, এমন লোকের সঙ্গে তাঁর আর জানাশুনা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। প্রতিভা তাঁহার যেমন উজ্জ্বল ছিল, হৃদয়ও তাঁহার তেমনই মধুর ছিল। হেষ্টিংস্‌কে তিনি বিখ্যাত শাসক ও রাজনীতিক বলিয়াই জানিতেন, তাহা নহে; তিনি যে কি করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার জানা ছিল। হেষ্টিংস্‌কে হালহেডের চেয়ে ভাল কেহই জানিতেন না। হালহেডই জানিতেন, কি বিপৎসঙ্কুল পথে কত কষ্টে ভারতশাসন-ব্যাপারে হেষ্টিংস্‌কে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ছয় বৎসরেরও অধিককাল তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। হালহেড ও শেরিডানের লেখার মধ্যে অধিকাংশ লেখাই বোধ হয় হালহেডের। তরল বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় সুদূর প্রবাসে সাহিত্য-সাধনাই তাঁহার একমাত্র আরাধ্য ছিল। হালহেড প্রথম জীবনে বিশেষ কিছু জানিতেন না বটে, কিন্তু উত্তর জীবনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ বরাবরই ধর্ম্মানুগত ছিল। ভারতে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়া তিনি চুঁচুড়ার ডাচ শাসনকর্ত্তার কন্যা কুমারী হেলেনা লুইসা রিবোকে (Miss Helena Luisa Ribaut) বিবাহ করেন। কিছুকাল ইঁহাদের বিবাহিত জীবন বোধ হয় খুব সুখের হয় নাই। হালহেড নিজের আদর্শকে এমন করিয়া দেখিতেছিলেন যে, তাঁহার পত্নীর অক্লান্ত সেবায়ও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। পত্নী কিন্তু তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ প্রীতি লইয়া পতির সেবায় জীবন পণ করিলেন। তাহাতেই হালহেডের জীবনের দুঃখময় দিনে হেলেনার হৃদয়ের অপার্থিব গুণাবলী হালহেডকে যথেষ্ট সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল।

হালহেড কাজ খুব ভালবাসিতেন। Civil servantদের বেতন নাম মাত্র ছিল। কিন্তু তখন ভারতবর্ষে সম্মান, প্রতিপত্তি ও অর্থোপার্জ্জনের অপূর্ব্ব সুযোগ ছিল। তখন উপঢৌকনরূপে, ব্যবসায়সূত্রে ও অন্যান্য উপায়ে অর্থাগমের পথ সুগম ছিল। কিন্তু হালহেড অর্থার্জ্জনের জন্য তত ব্যগ্র ছিলেন না। তিনি সরকারী কাজকর্ম্ম করিতেন বটে,

---

* "He went in the beginning of 1771 to Bengal"—Unpublished Letters of Warren Hastings (1856), p, 6। ল্যানম্যান (Charles R. Lanman) তাঁহার বঙ্গে আগমনের ঠিক সময় না জানিয়া লিখিয়াছেন—"Wilkins, the Caxton of India, arrived in 1770, and Halhed at about the same time, Sir William Jones and Colebrooke arrived in 1783. and Carey in 1793"...J, A,O,S,vol 40, pt 4.Oct, 1920. ডক্টর সুশীল কুমার ১৭৭২ সালের কাছাকাছি তাঁহার আগমনের কথা লিখিয়াছেন—Bengali Literature in the Ninetinth Century pp 78-79।

† Life of Sir W. Jones by Lord Teignmouth এবং

সরকারী কাজের সময় ব্যতীত সকল সময় তিনি অধ্যয়ন করিতেন। এই অবসরেই তিনি Gentoo Code ও বাঙলা ব্যাকরণ রচনা করেন।

১৭৭৪ সালে হেষ্টিংসের ইঙ্গিতক্রমে তিনি একখানি অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। আর এই বইখানি অনুবাদ করিতে তাঁহার দুই বৎসর লাগিয়াছিল। ১৭৭৬ সালে তাঁহার অনুবাদ শেষ হয়—গ্রন্থখানির নাম হয় Gentoo Code। * ইতিহাসপাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, হেষ্টিংসের আদেশে এগার জন ব্রাহ্মণ † সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ হইতে ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে বিধি ব্যবহারের একটী সার সঙ্কলন করেন। এই সার-সঙ্কলনটী পারসী ভাষায়ও তর্জমা হইয়াছিল। হালহেডের যে তর্জমা, তাহা পারসী সংস্করণ অবলম্বনেই হইয়াছিল—সংস্কৃত পুস্তক হইতে হয় নাই। হালহেডের Gentoo Codeএর কয়েক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। পরে, ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদও বাহির হইয়াছিল। ১৭৭৪ সালে ১লা ডিসেম্বর Commissioners of the Court of Requests for Calcutta হালহেডকে তাঁহাদের কোর্টের কমিসনার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে লিখিয়া জানান। প্রত্যুত্তরে হালহেড তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। পত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল ( এই পত্রখানি পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। Imperial Recordsএর নথি ‡ হইতে সংগৃহীত ) :—

"To the Gentlemen commissioners of the Court of Requests for Calcutta.

Gentlemen,

In regard to the nomination as a commissioner of your court which you Honor'd me with on the 1st inst I beg leave to represent that I have already served eleven months in the courts.............................................. ( চিহ্নিত অংশ একেবারে অস্পষ্ট ) there is a limited time for refusing to serve in the court of requsts and I hope the present application comes within that period, but I flatter myself that these pleas will be unnecessary when I inform you that my time is completely taken up by my several employments in the company's service which I fear will interfere with a conscientious attendance upon the duties of your court—

I have the honor to be Gentlemen

Your most obedient Hble servant

(Sd) Nath Brassey Halhed"

Calcutta 3rd Decer 1774.

হালহেডের পত্র গ্রাহ্য হইল না। Court of Requests যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা ও হালহেডের নির্ভীক প্রত্যুত্তরের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল—(এই পত্রগুলিও অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব ) :—

TO

THE HON'BLE WARREN HASTINGS

GOVERNOR GENERAL

& COUNCIL AT FORT WILLIAM.

Hon'ble Sir and Sirs,

We find ourselves concerned that we are under the necessity of representing the absolute refusal of Messrs Halhed and Livius to serve as Commissioners of this Court, and beg leave to enlose you the copy of our proccedings as far as relates to such refusal.

We are of opinion that the reasons they assign for not serving as commissioners in no way admissable as the necessary attendance will not occur in the regular rotation more than once in three weeks. We however beg leave to submit our sentiments to your determination and are With respect.——

Court of Requests Hon'ble Sir and Sirs,
Decer, 10th 1774 Your most obdt

* তৎকালীন বহু সাময়িক পত্রে ইহার আলোচনা হইয়াছিল। Gentoo Code এবং Halhedএর Grammar Imperial Library এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে।

† Cal. Rev. 1909.

‡ এই নথির ১৭৭৪ হইবে ১৭৭৮ সাল দ্রষ্টব্য।

| | |
|---|---|
| Roger Gale | Hble Servants |
| James King | Wm. Larkins |
| I. B. Smith | Ar. Hesilrige |
| | R. H Holmondely |
| Eldred Addision | I Sykes |
| Thos Braithwaile | Francis Fawke |
| R. Bathursts | W. Atkinson |
| | C, Burrowes. |

[ Ref ( Original ) Home Dept. 1774.
Public O. C. 12 Dec. No. 5. ]

At a general court held 10th December 1774.

The clerk lay before the court the following letters from Messrs Halhed and Livins.—

To W. Douglas Esq. Clerk to the
Court of Requests for Calcutta.

Sir,

I am very sorry any objection should have arisen to my first letter to the Commissioners of the court of requests, I can think that all the Gentlemen in service can make the same as myself, when I have been only so lately released from the Duty of the Superior Court of Aldemen and while there is a great number of gentlemen here who have not served in either of the courts. When that is not the case I shall certainly think myself bound to obey the General Letter you have favoured me with, but at present, cannot but suppose myself authorised to decline serving :—

I mentioned to Mr. Syhrone I am of the Commissioners of the Court of Requests the names of several gentlemen who have not served in either capacity,

( sd ) N. B. malhed

The clerk begs before the court the following Letters from Messrs Halhed and Livius.

At a court held on Saturday the 3rd December Present Messrs.

Lindsay
Withers
Cole
Burrowes

To The Gentlemen Commissioners of the court of Requests for Calcutta

Gentlemen,

In regard to the nomination as a Commissioner of your court which you honor'd me with on the 1st Inst, I beg leave to represent that I have already served eleven months in the ( অস্পষ্ট ) there is a limited time for refusing to serve in the court of Requests and I hope the present application comes within that period, but I flatter myself that these pleas will be unnecessary when I inform you that my time is completely taken up by my several employments in the company's service which I fear will interfere with a conscientious attendance upon the duties of your court,

I have the honour to be Gentlemen
Your most obedient Hble Servant

Calcutta, 3rd Decer, 1774 (sd) Nath. Brassey Halhed.

Sat morning

Resolved that a Ceneral Court be summoned to meet on Tuesday the 6th to take the above letters into consideration.

At a General Court held Tuesday the 6th of December :—

The court taking the above Letters into consideration are unanimously of opinion that the reasons assigned by Mrs. Halhed and Livius, for not serving as Commissiouers of this court cannot be admitted.

Resolved that the clerk do inform them of the above Resolution and ( একেবারে অস্পষ্ট ) the Hon'ble the court of Directors dated the 11th Feby 1756, that they may not be ignorant of the sentiment of their uon'ble Masters on this subject.

Messrs Halhed and Livius having positively refused serving as commissioners of this court.

Resolved that such refusal be represented to the Governor General and Council together with such extracts of our proceedings as relates thereto.

A true Extract
W. Douglas

To Messrs. ualhed and Livius

Gontlemen,

I am directed by the Commissioners of the Court of Requests to acknowledge the receipt of your letters of the 3rd Inst and to inform you that the reasons you assign for being exempted to serve as commissioners of this court are in no way admissable as every Gentlemen in the Company's services might with equal propriety allege the same excuses, they therefore request your final determination and enlose you the copy of a paragraph of a General letter from the Hon'ble the Court of Directors on this subject.

I am gentleman

Court of Requests Your most ob servant

১৭৭৫ সালের শেষ ভাগে হালহেড Supreme Courtএর দোভাষীর পদপ্রার্থী হন। ঐ পদে বিচারপতি চেম্বার্সের ( Justice Robert Chambers ) ভ্রাতা W. William Chambers কাজ করিতেছিলেন। তিনি ছুটী লওয়ায় হালহেডকে ঐ পদে কার্য্য করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। *

১৭৭৮ সালে হালহেড ও চার্লস্ উইলকিন্স্ হুগলীতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই মুদ্রাযন্ত্রই ভারতের আদি মুদ্রাযন্ত্র। + এই বৎসরই তিনি হুগলী হইতে বাঙ্‌লাভাষায় আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাকরণখানি প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণে যে সমস্ত বাঙ্‌লা অক্ষর ক্ষোদিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত চার্ল্‌স্ উইলকিন্স্ স্বহস্তে ক্ষোদাই করিয়াছিলেন। ‡

১৭৭৮ সালের জুলাই মাসে তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি দরখাস্ত করেন যে, পারিবারিক ব্যাপারে তাঁহাকে দেশে যাইতেই হইবে। শরীরও খারাপ। সুতরাং তিনি অনুমতি লইয়া কার্য্যে ইস্তফা দিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। * ফলে, তিনি ছুটীর অনুমতি লইয়া ঐ বৎসরই ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি-লাভের জন্য কয়েক বৎসর দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। বঙ্গদেশের আবহাওয়ায় ও পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তিনি পুনরায় ১৭৮৪ সালে কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু ভারতের জল-বায়ু তাঁহার আর সহ্য হইল না। তিনি বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার

---

* [ অপ্রকাশিত পূর্ব্ব ]

TO MR. JUSTICE CHAMBERS

Sir,

We have been favoured with your application of the 26th inst, on behalf of your Brother Mr. W, Wm Chambers.

As we shall be always happy in complying with any request which you make to us when we can do it consistently with the rules of the pub. Service we on this occasion readily give consent to Mr. N. B. Halhed's holding the office of Interpreter to the Supreme Court of Judicature, and acting as such for your brother until his arrival period Mr. Halhed has nor already officiated in that capacity without our permission,

F, Wm the 3rd Oct, 1775
(Pub 1775 Dept).

\+ গোয়ার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র ১৫৫৩ সালে স্থাপিত হয়।

‡ ইনি পরে Sir Charles Wilkins হন। ইঁহাকে কেহকে 'Caxton of Bengal' বলিয়াছেন। উইলকিন্স্ পঞ্চানন কর্ম্মকারকে অক্ষর খুদিতে শিখাইয়াছিলেন। পঞ্চাননের নিকট হইতে অপরে ক্ষোদাই শিখিয়াছে। Cal. Rev, vol: xiji, pp 133:4, Men whom India has known,' 1874, p 156, East and West,

---

[ অপ্রকাশিত পূর্ব্ব ]

* TO
THE HON'BLE WARREN HASTINGS Esq.
GOV. GENERAL
AND MEMBERS OF THE SUPREME COUNCIL.

Hon'ble Sir and Gentlemen

A long continuance of ill-health and particularly the severe fit of illness which I suffered last season, has so far debilitated my constitution, that I fear it is impossible for me to obtain a thorough re-establishment without a change of climate. Having experienced for several months past that even absence from Calcutta ( which place has always been prejudicial to my health), was not sufficient to complete my recovery, I had determined to sollicit your Hon'ble Board for leave to make a short voyage to some other part of India as soon as the season should permit a ship to sail.

But having within this month received accounts by the Eagle Packet and later ships that the private concerns of my family at home require almost indispensably my personal appearance, I now entreat that you will be pleased to indulge me with permission to resign the service to deport for Europe as soon as I can find an opportunity.

With the greatest respect I have the honour to remain

Hon'bie Sir and Gentlemen
Your most obedient and most humble servant
(Sd) N. B. Halhed.
[ (Original)
Home 1778 Dept.
Pubiic

১৭৮৫ সালে ইংলণ্ডে চলিয়া যান।* এ সময় তাঁহার শরীরের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার উপর তাঁহার এক মনস্তাপের কারণ উপস্থিত হইল। ১৭৮৬ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর তাঁহার পিতার ৬৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। বস্তুতঃ ১৭৯০ সাল পর্য্যন্ত তিনি সামান্য সামান্য সাহিত্যিক আলোচনা ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে পারেন নাই। ১৭৯০ সালে আবার তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৎসর সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি লিস্টারের ( Leicester ) boroughর জন্য পার্লামেণ্টের সদস্যপদ-প্রার্থী হন। সামুয়েল স্মিথ এই পদের প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী ছিলেন। কয়েক দিন যথেষ্ট অর্থব্যয় ও চেষ্টার পর মন্‌তোলিউর ( Montolieu ) সহিত পরামর্শ করিয়া ইহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন ; কিন্তু ১৭৯১ সালের মে মাসে সদস্যের পদ শূন্য হওয়ায় লিমিংটন (Lymington, Hants) সহরের জন্য সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৭৯৫ সাল পর্য্যন্ত ঐ পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৭৯০ সালে হালহেড Herley Streetএ বাস করিতেন। বেজায় খরচ পত্র করিতেন। এই সময় একটী ব্যাপারে তিনি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়েন। M. Necker সেই সময় ফরাসী ভাণ্ডারের একজন বড় পাণ্ডা। অনেক ফরাসী, কোম্পানীর ( French Funds ) কাগজ ক্রয় বিক্রয় করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছিল, আবার অনেকে ফতুরও হইতেছিল। হালহেড লোভে পড়িয়া এবং নেকারের কৃতিত্বে বিশ্বাস করিয়া ফরাসী কোম্পানীর কাগজ কেনা বেচা করিয়াই এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হন। তাঁর লোকসান ৩০,০০০ পাউণ্ডের কম হয় নাই।

১৭৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে Mr. Richard Brotheraএর ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থাবান্ হইয়া তাঁহার প্রচারিত মতাবলম্বী হন। রিচার্ড ব্রাদার্‌স্‌কে লোকে "Brothers the Prophet" বলিত। পূর্ব্বে তিনি প্রাচ্য mysticism-এর শক্তি দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইতেন। এখন তিনি Brothers-এর কথা শুনিতেন, কথাগুলি পরীক্ষা করিতেন, আর প্রাচ্য mysticism-এর সঙ্গে ব্রাদার্সের মতের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া এক রকম সেই মতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। তিনি ব্রাদার্সের মতের এতই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ঐ বৎসর ৩১এ মার্চ বুধবার তাঁহার বন্ধু Sir Elija Impey-র বহু নিষেধ সত্ত্বেও তিনি House of Commons"-এর একটী প্রকাশ্য বক্তৃতায় তিন ঘণ্টাকাল অসামান্য বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া Richard Brothersএর ঐশব্যক্তজ্ঞানের ( Revealed knowledge ) পক্ষ সমর্থন করেন, এবং এমন কি, এই জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে সদস্যদিগকে অনুরোধ করেন।* সকলে তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে সমর্থন করেন নাই। বরং এ জন্য তাঁহাকে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। "Linqua Sacra"-প্রণেতা David Levi, Brothers এর বিরুদ্ধে পত্রের পর পত্র লিখিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। † কিন্তু তবুও হালহেড Brothersএর পক্ষ ছাড়েন নাই। শুধু তাই নয়, একবার Brothers রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হন। তখন তাঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া brothersএর কার্য্য যে রাজদ্রোহিতার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। ২১এ এপ্রেল ব্রাদার্সের নামে প্রচারিত একখানি

* "In 1778 Mr, Halhed returned to England, and employed some of his succeeding years in travelling and amusement." Unpublished letters of Warren Hastings (1856) p. 8.

Dictionary of National Biographyতে লিখিত আছে যে হালহেড ১৭৮৫ সালে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। পূর্ব্বে যে তিনি গিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থের মতাবলম্বন করিয়া অনেকেই এই ভুল করিয়াছেন। ডক্টর সুশীল কুমার দেও এই ভুল

* Register of the Times, April, 1795 ; Unpublished Letters, p 14,

† Letters to N, B, Halhed, M, P, in answer

warrantএর বিরুদ্ধে বিশেষরূপ লড়িয়াছিলেন। তাঁহার এই দুই চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন নাই। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই হালহেড তাঁহার পদত্যাগ করেন। ব্রাদাসে'র মতে তাঁহার বিশ্বাস অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু না হইলেও ইহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সাহিত্যিক ও সামাজিক জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়। ১৭৯৬ সাল হইতে ১৮০৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি সামাজিক কোন কার্য্যে যোগদান করেন নাই। এমন কি, বড় একটা কাহারও সঙ্গে মেশেনও নাই। তাঁর মানসিক অবস্থা দেখিয়া আত্মীয় স্বজনেরা তিনি প্রকৃতিস্থ নন মনে করিয়া তাঁকে বিশেষ নিয়মাধীন রাখিবার ব্যবস্থা করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। যাহা হউক, এ অবস্থায় ১৮০৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি John Bright নামক এক ব্যক্তিকে পত্র লিখিতেন। ইনি জাতিতে সূত্রধর এবং হালহেডের ন্যায় প্রথমে Richand Brothersএর শিষ্য হন, পরে হালহেডের সহিত Brothers-কে পরিত্যাগ করেন।

আর্থিক কষ্টে পড়িয়া তিনি ১৮০৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর চাকরীর জন্য George Canningএর নিকট দরখাস্ত করেন। কোন কর্ম্ম দিতে না পারায় লজ্জিত হইয়া ২৮ এ তারিখে ক্যানিং দরখাস্তের উত্তর দেন। ১৮০৯ সালের জুলাই মাসে তিনি East India House-এ একটী চাকরী পান। ১৮০৮ সালে চিঠি পত্র লেখা পুনরায় আরম্ভ করেন। তবে বড় বেশী লেখেন নাই। Sir Elijah Impey ও Hastings-কে যা কিছু লিখিতেন। শেষ জীবনে তিনি বধির হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি যে শুনিতে পাইতেন না, তাহা ১৮০০ সালের একখানি পত্রে লিখিয়াছেন। হালহেডের সন্তান ছিল না।* তাঁর চরিত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। কোন সামান্য কারণেই তিনি মনে বড়ই ব্যথা পাইতেন। মনে হাজার কষ্ট থাকিলেও তিনি বন্ধুদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিতেন। তাঁহার ছোট ছোট কবিতা লিখিবার ইচ্ছা বলবতী ছিল। অবসর পাইলেই কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার পাতড়ার ভিতর হইতে অনেক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি তিনি ছাপিবার জন্য লেখেন নাই। একটী কবিতায় তাঁহার প্রকৃত মনোভাব বেশ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কবিতাটী নীচে দেওয়া গেল :—

N. B. H. o's Prayer

I ask not life, I ask not famee
I ask not gold's deceitful store ;
The charms of grandeur's wealth and name
Thank heaven are charms to me no more.
To do thy will, Oh God I ask
By faith o'er life's rough sea to swim,
With patience to work out my task,
And leaue the deep result to him.

[ ১৮০৬ খৃঃ, ৩রা জুলাই ]

স্বনামে বেনামে হাল্‌হেড অনেক খবরের কাগজে লিখিতেন। "Morning Chronicle"-এ তাঁর অনেক লেখা বাহির হইয়াছে। ইংরেজি থেকে লাটিন এবং লাটিন থেকে ইংরেজি তিনি খুব ভাল তর্জ্জমা করিতে পারিতেন। হাল্‌হেড এ দেশের অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেগুলি British Museumএর Trusteeরা কিনিয়া লন। অন্যান্য পুথি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি Nathaniel John Halhedএর

* Bengal Obituaryতে (P. 204) এবং Friend of India (9th Aug, 1838)তে Nathaniel John Halhedকে উক্ত বৈয়াকরণ Halhedএর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা ভুল। কেন না, Halhed যে অপুত্রক ছিলেন তাহা Impey's Memoirs (P, 360 fn), Unpublished Letters of Warren Hastings (1856) (p. 1) স্পষ্ট বলিয়াছে। Dictionary of National Biographyও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছে। John Halhed যে বৈয়াকরণ হালহেডের পুত্র নন তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী Gentleman's Magazine (N. S, 1838)। ইহাতে আছে—

"Aug I—At Calcutta, N. J, Halhed. Esq., Bengal Civil Service, eldest son of the late John Halhed, Esq, of Yately house, Hants." । এ ছাড়া Bengal Obituaryতে (P. 671) দ্রষ্টব্য।

নিকট ছিল। John Halhedএর প্রতিনিধি ১৮৬৩ সালে তাঁহাদের Executor Dr John Grantএর নিকট হইতে এগুলি লইয়া আসেন। এইগুলির মধ্যে তাঁহার Warren Hastingsএর সহিত পত্রাদি বিষয়ক একখানি পুস্তক ছিল। ১৮০০-১৮১৬ সালের মধ্যে হালহেড একখানি পারসী গ্রন্থ হইতে মহাভারতের অধিকাংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পাণ্ডুলিপি এখনও Asiatic Society of Bengalএর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। *

১৮৩০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ৭৯ বৎসর বয়সে West Square-এ (Surrey) তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন—এ অন্তর্গত Petershamএ তাঁহার পরিবারস্থ লোকদের সমাধির নিকট তাঁহার দেহ সমাহিত হয়। তাঁহার প্রিয় পত্নী তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় দেড় বৎসর জীবিত ছিলেন। † ইহার মৃত্যুর পর হালহেডের ভ্রাতুষ্পুত্র Nathaniel John Halhed সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

জন হালহেড কতিপয় প্রাচ্যভাষায় বিশেষতঃ বাঙ্‌লা ভাষায় এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, কখন কখন তিনি ছদ্মবেশে আমাদের দেশী পোষাক পরিয়া আপনাকে দেশী লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সহসা কেহ বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। যখন তিনি পাঁচজনের সঙ্গে বসিয়া তামাক খাইতেন, তখন তাঁহাকে ইয়ুরোপীয় বলিয়া চেনা দায় হইত। ‡ বৈয়াকরণ হালহেড অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে Gentoo code ও বাঙ্‌লা ব্যাকরণেরই আদর খুব বেশী। আমরা তাঁহার লিখিত গ্রন্থের একটী তালিকা দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

হাল্‌হেড্‌ প্রণীত গ্রন্থাবলী, যথা :—

১। 'The love Epistles of Aristaenetus, translated from the Greek into English metre" ১৭৭১ (8vo) [ভূমিকায় স্বাক্ষর—H (alhed) & S (heridan); ১৮৫৪ খৃঃ, Bahn's Classical Libraryতে পুনর্মুদ্রিত] এখানি প্রথম ভাগ।* দ্বিতীয় ভাগ কখনও বাহির হয় নাই।

২। "A Code of Gentoo Laws, or ordinations of the Pundits from a Persian translation." ১৭৭৬, (4to) (মলাটে অনুবাদকের নাম নাই, ভূমিকার মধ্যে নাম আছে); ২য় সংস্করণ, ১৭৭৭ (8vo; ৩য় সংস্করণ, ১৭৮১ (8vo); ফরাসী সংস্করণ,—J. B. R. Robinet-কৃত নাম—"Code des lois gentovx," প্যারিস্‌ ১৭৭৮, (4 to)

৩। "A grammar of the Bengal Language", হুগলি, ১৭৭৮, (4 to)

৪। 'A narrative of the events which have happened in Bombay and Bengal relative to the Mahratta Empire since July 1777;' ১৭৭৯ (8vo).

৬। "The letters of Detector on the seventh and eightth Reports of the Libel Committee; ১৭৮৩ (4vo).

৭। "Imitations of some of the Epigrams of martial,"১৭৯৩ (4 to)। লেখকের নাম নাই; লাটিন ও ইংরেজিতে লিখিত।

৮। "The whole of the Testimonies to the authenticity of the Prophecies of Richard Brothers and of his Mission to recall the Jews (I.) Cruick-shank-অঙ্কিত চিত্র হইতে White ক্ষোদিত হাল্‌হেডের চিত্র সহ + (8vo).

* Friend of India, 1865 Cal, Rev, 1909.

† National biographical Dictionary লিখিয়াছে যে হালহেডের জীবিতাবস্থায় তাঁহার পত্নী রিবো কালগ্রাসে পতিতা হন। এটী সম্পূর্ণ ভুল। Unpublished Letters (p, 76) ইহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট লিখিয়াছে—"His amiable wife survived him about a year and a half,"

‡ Cal, Rev, Vol 7, Unpublished Letters, p. 2; Friend of India, Aug 9, 1838; Bengal Obituary, p 204, ১৮৩৮ সালের ঐ Friend of Indiaতে লেখা আছে, বর্দ্ধমান রাজবাড়ীতে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের গুণ পিতৃব্যের উপর চাপাইয়া লিখিয়াছিলেন(A Catalogue of Bengali books 1855. p 61)—"Helhed was so remarkable for his proficiency in colioquial Bengali that he has been known to disguise himself in a native dress and to pass for a Bengali in assemblies of Hindus," ইহা বৈয়াকরণ হালহেড সম্বন্ধে খাটে না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরই ঐরূপ গুণ ছিল।

* "The original is divlded into two parts; the present essay contains only the first, by its success the fate of the second be determined"—ভূমিকার শেষে এই কথাগুলি লিখিত ছিল।

৯। "A word of admonition to the Rt. Hon. William Pitt, in an Epistle occasioned by the Prophecies of Brothers.

১০। "Two letters to the Rt, Hon. Lord Longhborough" ১৭৯৫ (8vo).

১১। "Speeeh in the House of Commons, March 31, 1795 relating the confinement of Mr Richard Brothers the prophet"—১৭৯৫ (8vo) (ঐ বৎসর ৩১এ মার্চ ২য় সংস্করণ)।

১২। "Second speech in the House of commons, April 21,1793, respecting the detention of Mr.Brothers the Prophet" (ঐ বৎসর ২১এ এপ্রেল, ২য় সংস্করণ)।

১৩। "Liberty and Equality, A Sermon or Essay" 1795 8vo।

১৪। "A Calculation of the millenium Reply to Dr. Horne," ১৭৯৫ (8vo)। ঐ বৎসর ২য় ও ৩য় সংস্করণ, ৩য় সংস্করণে ১১ সংখ্যায় পুস্তকখানিও মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৫। "On Answer to Dr.Horne's Second Pamphlet entitled "Occasional Remarks"। ইহার সহিত ১৩ সংখ্যার পুস্তকও মুদ্রিত হইয়াছিল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

---

# মুক্তির দিশা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### পটলার কথা

তার পিতৃদত্ত নাম ছিল দুর্গাগতি, ছেলেবেলার ডাক-নাম ছিল পটলা। লেখা পড়া শিখে, নভেল পড়ে, কবিতা লিখে, রোমান্টিক ফ্রেণ্ডশিপ করে, তাদের ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ ক্লাবে লেকচার দিয়ে পটলা যখন মানুষ হ'লো, তখন তার বয়স চব্বিশ। "এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?"—কাজেই অসহায় পটলা সে স্রোতে একদম কুটোগাছির মত ভেসে গেল, অর্থাৎ তার চূর্ণ চিকুর কুন্তলে ওরফে বাবরিতে লতার বল্লরীর মত কুঞ্চন দেখা দিল, গোঁফ ও দাড়ি কামানোর চোটে একেবারে লোপাট হয়ে রক্ত ওষ্ঠ আর গৌর চিবুক বেরুল; তার অঙ্গেও এল লতার মত আশ্রিতার ভাব, চলনে জাগলো "সখি আমায় ধর ধর" ভঙ্গী, তার চোখের চাহনি হলো কখন উদাস, কখন বিলোল, কখন "আধ-মেলা ভাব-ডুবুডুবু।" সঙ্গে সঙ্গে পটলার ডাক-নাম আর বাপ-মায়ের দেওয়া ঐ অসভ্য নামটা বদলে গিয়ে পোষাকী নাম দাঁড়াল জ্যোৎস্নাজীবন সান্যাল।

বলা বাহুল্য যে তার এই সব ভাবান্তর দেখে নির্দ্দয় বন্ধুর দল তার পেছু লাগলো। কেউ নাম দিলে জ্যোৎস্না-

ডাক-নামটারই একটা স্ত্রী-সংস্করণ করে নিয়ে নাম রাখলো শ্রীমতী পটলবালা দেবী। বন্ধুদের বড় দোষ ছিল না, কারণ পটলা উড়ুনি মাটিতে লুটিয়ে চলতো, তুলে গায়ে দেবার সময় উড়ুনি তোলবার ভঙ্গীতে মনে হতো বুঝি কোন সীমন্তিনী তার খসা আঁচলখানা বুকে দিচ্ছে। তার ওপর পটলার অমন উদারা কণ্ঠস্বর কি করে যেন ক্রমে ক্রমে মুদারা থেকে তারায় চড়ে সেই পর্দ্দার পঞ্চমে গিয়ে দাঁড়ালো। সে অন্য ঘর থেকে যখন গাইত "যদি বারণ কর তবে গাহিব না," তখন মনে ভ্রম হ'তো, হয়তো কোনো তরুণী বাঈজী বা গলা সাধছে। কাউকে চিঠি লিখতে হ'লে তার দশ পাতার কমে চলতো না, আর সেই দীর্ঘ গল্পকথিকার অন্ততঃ বার আনা অংশ থাকতো রবিবাবুর গানের ও কবিতার কোটেশন।

সে নিজেও কবিতা লিখতো মন্দ নয়, কিন্তু সে কবিতার ভাব-ভাষা-ঝঙ্কার সবই ছিল রাবীন্দ্রিক। কোন বড় লোককে কোনভাবে চলতে বলতে লিখতে দেখলেই পটলা কেমন যেন স্বভাব-বশে তা নিজের কাজে-কর্ম্মে হাবে-ভাবে নকল করতো! এই রকম করে-করে তার নিজের অন্তরের মানুষটি ফেটবার কোন সুবিধা ও সুযোগ না পেয়ে ক্রমে ক্রমে বেঙ্কুড় আকার ধারণ করলো! ফলে পটলা হ'লো

নকল! তা ছাড়া জগদ্ধিতায় একটা না একটা বড় খেয়াল তার মাথায় সদাসর্ব্বদা বাসা বেঁধে থাকতোই; কখন দেশোদ্ধার, কখন বিশ্ব-মানবতা, কখন বিধবা-বিবাহ আবার কখন আজীবন কৌমার ব্রত, কখন বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং পরক্ষণেই চণ্ডীদাসের ভক্তিরসের পদাবলী। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নানা আদর্শের মুখরোচক পকান্ন বুদ্ধির খোলায় পাক করে করে পটলার ধ্রুব ধারণা হয়েছিল, যে তার এ দুর্ল্লভ জীবনটা মানব-জাতির কল্যাণের জন্যই হয়েছে। যার বাস্তব জীবনে এক - রতি ত্যাগ, তপস্যা বা বা পর-হিত ছিল না, সে দিবারাত্র দধীচির নামে কবিতা লিখতো, নয় একচ্ছত্র গণতন্ত্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধ ভাঁজতো, অথবা দারিদ্র্য ব্রতের মহিমা কীর্ত্তন করে বন্ধু-মহলে বক্তৃতা দিত যে, তার জীবনে শুধু উপযুক্ত অবসর আর সুবিধারই যা অভাব, নইলে সে একটা সেণ্ট বার্ণাড বা লিঙ্কলন্ নিশ্চিতই হতে পারতো। এই রকম ফাঁকা ভাব-বিলাসিতা আর ক্ষুদ্র স্বার্থপর জীবনের চাপে পটলার ভিতরটা ক্রমে ক্রমে পচে আসছিল।

এই অবস্থায় তার বাপ কার্ত্তিকচন্দ্র সান্ন্যাল একদিন জীবনের জমা-খরচ শেষ করে ভব-পারে চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে পটলাকে গেলেন অকূল সাগরে ভাসিয়ে। কারণ তাঁর অতুল সম্পত্তি দিয়ে গেলেন বিধবা মেয়ে তারামণিকে, যে সম্পত্তির পনের আনা গেল বিশাল বিপুল ঋণ-ভার চোকাতে। বিষয়ী ধূর্ত্ত পরিণামদর্শী কার্ত্তিকচন্দ্র এতদিন ছেলের সব আব্দার যেমন রক্ষা করে এসে ছিলেন তেমনি বুঝেও ছিলেন, যে, পটল এ বিষয় হাতে পেলে তাঁর নামে অপযশ আনবে। গরদ-পরা নিরাভরণা ভক্তিমতী মেয়েকে তিনি বিশ্বাস করতেন বেশী, মেয়েও তাঁর এ বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখলো; পিতার মৃত্যুর পর দেনাদারদের ডেকে ডেকে তাদের পাই-পয়সাটি অবধি চুকিয়ে দিয়ে সামান্য টাকা নিয়ে সে ভদ্রাসন বাড়ীখানি আগলে বসে রইল তার ভরা জীবনের শূন্য-হাট সাজিয়ে, আর কলকেতার মেসে রয়ে গেল পটলা, যার সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের এত সাধের স্বপ্ন-সৌধ আজ এক

দাঁড়াল। তার ওপর যত নির্দ্দয় ফিঙের পাল আজ ঝড়ো হাওয়ায় চিল-বেচারীকে কাবু দেখে ঠোকরাতে সুরু করল। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বন্ধুদের কেউ বললো, "ওর ভাবনা কি? Plain living and high thinking ওর অভ্যেস আছে"; কেউ বললো, "আহা, দধীচির অস্থি এবার জগতের কাজে লাগে, বুঝি!" কেউ তার পিঠ ঠুকে বললো, "ভায়া হে, Son of God hath no place to rest his head, ওটা মহাপুরুষেরই লক্ষণ।"

যে পটল তার এসেন্স সাবান ছড়ি ঘড়ি ইত্যাদি পুরোদস্তর বাবুয়ানীর জীবনে মাসে এক শ' দেড় শ' টাকা অবধি উড়িয়েছে, তার আজ পেটের ভাত জোটানো দায়। একমাস সে একটা নতুন মাসিকের সহকারী সম্পাদকী করে ছেড়ে দিল, একজনের লেখা নভেল নিজের বলে ছাপাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হলো, শেষে দু' মাস বেকার বসে ওয়াণ্টেড্ কলমটা নিত্য আশায়-নিরাশায় পাঠ ও চাকরীর উমেদারীতে কাটাল। ক্রমে যখন মেসের ঋণ উত্তমর্ণের চক্রবৃদ্ধি হারের সুদের মত নির্ম্মম অঙ্কে বেড়ে চললো, তখন পটলের শেষে মনে পড়লো, তার বিধবা বোন তারামণির কথা।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### পটলা-হরণ

বাপ বেঁচে থাকতে পটল কখনও বাড়ী যায় নি, সবাই জানতো কার্ত্তিকচন্দ্র তাঁর একমাত্র পুত্র-সন্তানকে তার প্রয়োজন অধিক অর্থ দেন, কিন্তু তার মুখ দেখেন না। এত-বড় ব্যাপারটার কারণ কিন্তু কেউ জানতো না, জানতো শুধু মুখ-বোজা নীরব মেয়ে তারামণি। মেসের ছেলেরা এই নিয়ে পটলাকে অনেক রকমে বেয়ে-চেয়ে দেখেছে, কিন্তু এ রহস্যের কোন একটা কূল-কিনারা করতে পারে নি। আজ চার মাস পর পিতৃবিয়োগে সত্যি সত্যি চারদিক অন্ধকার দেখে আর পরম হিতৈষী বন্ধুদের ঠাট্টা-তামাসায় উদ্বাস্তু হয়ে পটলচন্দ্র বাড়ী এল। তখন ডুবন্ত রবির

রাঙিয়ে দিচ্ছে, দিগন্তের কোল থেকে আপন ছায়া-শ্যাম নীলাম্বরীখানি তুলে নিয়ে অঙ্গ ঢাকতে ঢাকতে সন্ধ্যা-বধূ সবে জড়িত চরণে তাঁর শয়ন-মন্দিরে আসছেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের পাঁচিল-ঘেরা ইটের বাড়ী, সামনে ফুল-বাগান, পেছনে খিড়কীর পুকুর। বাড়ীখানি আম জাম নিম অশথ শিউলী কদম গাছে গাছে ঢাকা, দূর থেকে ছাতের শেওলাপড়া আলিশার কোণটুকু মাত্র দেখা যায়। পটল যখন বাড়ী এল, তখন তারামণি সবে স্নান করে সিক্ত বস্ত্রে তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করছে, ভাইকে দেখে ইসারায় ঘরে উঠতে বলে তারামণি একমনে মালা জপতে বসে গেল। তার আহ্নিক শেষ হ'তে লাগলো এক ঘণ্টা, ততক্ষণে পটল জলযোগ সেরে হুঁকোটি নিয়ে দাওয়ায় তামাক খাচ্ছে। দাসী লক্ষ্মী এগারো বছরের মেয়ে, মা-হারা অনাথা মেয়ে তারামণির হাতেই মানুষ, সে পটলের ফাই-ফরমাস শেষ করে সবে হেঁসেল নিকোতে লেগে গেছে।

তারামণি ভুঁয়ে আঁচল পেতে দোর-গোড়ায় বসে ভাইকে জিজ্ঞেস করলো,—বড় রোগা দেখছি যে?

পটল। এই, অমনি আর কি।

তারা। আজ আমি চার মাস একাটি পড়ে, আগে এলেই পার্‌তিস্‌!

পটল। তোমার ঘর-দোর, দিদি, যদি ঢুক্‌তে না দাও।

তারা। ওমা! ও কি কথা? তুই আমার মার পেটের ভাই নোস্‌?

পটল। তা' হলে কি হয়, এতদিন এ-মুখো হবার পথ ছিল?

তারা। সে বাবার জন্যে। তিনি পুরুষ মানুষ, কঠিন-প্রাণ। আমি তো তোর বোন।

পটল আর কিছু বললো না, তার একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো মাত্র। অনেকক্ষণ ভাই-বোনে সেই সন্ধ্যার ঘোরে নীরবে বসে রইল। হঠাৎ তারামণি একটু কেশে একটু ইতস্ততঃ করে বলে ফেললে,—তার ওপর কিছু রাখিস্‌?

পটল চম্‌কে উঠে বললো,—কার?

তারা। বিন্দুর?

পটল। না,—আমি কি করে জানবো।

আবার অনেকক্ষণ দু'জনেই নীরব। ঘরে উঠানে কলা-ঝোপে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। আজকের সন্ধ্যা বড় কুহকময়, বড় ছমছমে। ঘরেও আলো নেই। দূরে পশ্চিম আকাশের ওষ্ঠে তখনও উদাস হাসির পাটল আভাসটুকু জেগে রয়েছে। সেও যেন কি মর্ম্মান্তিক রহস্যের স্মৃতিটুকু বুকে ধরে কত কি অর্থ-ভরা উদাস হাসি হাসছে।

তারা অগত্যা বললো,—তোরা পুরুষ মানুষ বড় নির্দ্দয়!

পটল। কেন?

তারা। কেন আবার? বলতে লজ্জা করে না? হতভাগীকে এমন সর্ব্বনাশের পথে তুলে দিয়ে কিনা তুই পালিয়ে গেলি!

পটল হাতের হুঁকো রেখে দিল, সনিশ্বাসে বললো,—তুমিও দিদি তাই বিশ্বাস কর?

তারা। তবে কি হয়েছিল, আমায় বল্‌।

পটল। হয়েছিল আমার মাথা আর মুণ্ডু। বিন্দু কত বড় দস্যি মেয়ে, তা' কি তুমি জানো না? আমি তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারি? আমি তাকে নিয়ে পালিয়ে ছিলুম, না, সেই-ই আমায় নিয়ে পালিয়েছিল।

তারামণি চুপ করে রইল। দিদির বিশ্বাস হয় নি বুঝে পটল অকূল সাগরে পড়লো, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হুঁকোটা আবার তুলে নিয়ে বললো,—আমার কপাল, তা' তুমি বিশ্বাস করবে কেন?

তারা। ওরে, আমি তোর মুরোদখানা জানি। সে না সায় দিলে তুই তার কাছে এগুতে পারবি নে, তা' কি আমি বুঝি নে? আমায় সব কথা বল্‌, যেখানে মিথ্যে বলবি আমি ধরে ফেলবো।

পটল। সে কি মেয়েমানুষ, না রাক্ষুসী? সাধে কি হারশদা নাম রেখেছিল জেনারাল বিন্দি। তুমি তো সবই জান, ছেলেবেলা থেকে—আমাদের কত ভাব! তার যখন জমিদার-বাড়ী বিয়ে হবে-হবে হয়েছে, তখনি সে এমনিতর পালাতে চেয়েছিল, আমি যেতে রাজী হইনি। চিরদিন আমিও তাকে ভাল বেসেছি, কিন্তু কেমন যেন কোনদিকেই হাত-পা এগোয় নি।

তারা। টাকার লোভে তার বাপ-মা যে হনুমানের হাতে দিলে, তাতে না পালানোই আশ্চর্য্যি! হিঁদুর মেয়ের সবই সয়। আমরা তো মেয়ে নই, শাপগ্রস্তা পাষাণী অহল্যা, কবে এদেশে শ্রীরামচন্দ্রের মত পুরুষ জন্মাবে—তবে তার পরশে আবার এ পাষাণীরা সত্যিকার মেয়ে হবে!

পটল। এই গাঁয়ে আর আশেপাশে জমিদার-পুত্তুর যত কাণ্ড করেছে সবই তো বিন্দু ছেলেবেলা থেকে শুনে এয়েচে। বিয়ের রাত্রে আমার কাছে যে বুক-ভাঙা কান্নাটা কেঁদেছিল,—

তারা। তাই তো বলি, পুরুষ মানুষ তোরা বড় পাষাণ—

পটল। কেন? আমার দোষ কি?

তারা। তোর দোষ কি, দোষ বিধাতার! সে তোকে শক্ত ধাতুতে গড়লে বিন্দুর মত মেয়েটার জীবন শ্মশান হয়ে যেতে পারে?

পটলা মুখ ভার করে বসে রইল, তার পর বললো,—যা বলছিলুম, বলি। পাঁচ বছর আগের সেই দুর্য্যোগের রাত্তির তোমার মনে আছে, আমি আসছিলুম নসিপাড়া থেকে। তখন কালো ঘন চাপ-চাপ মেঘে সারা আকাশ আঁধার, বৃষ্টি হয়-হয়। রাত্রি আটটা। ওদের বাড়ীর খিড়কীর পুকুরের বাঁশ-ঝাড় থেকে বিন্দু বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। আমি তো অবাক্। তার বাঁ'হাতে আঁচলে ঢাকা একটা পুঁটলীর মত কি। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি, সে আমায় টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললো,—যদি কাল ঐ পুকুরে আমার মরা দেহ ভাসতে না দেখতে চাও, তা'হলে এখন আমায় কিছু জিজ্ঞেস করো না। যেখানে নিয়ে যাই, চলো। যখন মুষল ধারে বৃষ্টি নেমে এলো, তখন আমরা ষ্টেশনের টিনের চালায় পৌছে গেছি। সে আমাকে দিয়ে কাশীর দু'খানা টিকিট করালে, টাকা সেই দিলে। গাড়ীতে বসা অবধি আমায় মুখ খুলতে দিল না; যতবার কথা বলতে গেছি, ততবার সে এমন করুণ চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছে যে, আমার বাক্ আপনি হরে গেছে। গাড়ী ছাড়বার পর সে বেঞ্চির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো আর ঝাড়া এক ঘণ্টা ফুলে ফুলে কাঁদল। তারপর হঠাৎ চোখ মুছে উঠে বসে এলোচুলগুলো হাতে জড়িয়ে বাঁধলো, আর শেষে আমার দিকে শান্ত চোখে চেয়ে বললো, "এই বার বল, কি বলবে।" তখন দেখি, বিন্দী হাসছে। দিদি, তোমরা মেয়েমানুষ এক তাজ্জব জিনিষ!

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### বিন্দুর চিঠি

আমি বললুম,—বিন্দু! আমায় আগে বল এ ব্যাপারটা কি?

বিন্দু। কি আর? আমি পালিয়ে যাচ্ছি।

আমি। পালিয়ে যাচ্ছ? কোথায়?

বিন্দু। যে দিকে দুই চক্ষু যায়।

আমি। আর আমি? আমাকে টানলে কেন?

বিন্দু আবার আমার দিকে সেই রকম করে চাইল, তার চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়লো। তাড়াতাড়ি তা' মুছে ফেলে কঠিন স্বরে বললো, 'আমি একটা আস্তানা ধরলে তুমি তোমার পথে যেয়ো।' এর পর আমার যেন কেমন কণ্ঠরোধ হয়ে এল। অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে গাড়ীর জানালা দিয়ে বাহিরে গাছ-পালার ছায়াবাজির দিকে চেয়ে ছিলুম। তখন চাঁদ উঠেছে, জগত হাসছে! অনেক ভেবে-চিন্তে আমি এ কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারলুম না,—'বিন্দু! আমরা পালাচ্ছি, তা' হ'লে এত পথ লুকিয়ে এসে গাড়ী ছাড়বার আগে অমন করে গাঁয়ের কেষ্ট কাকার সামনে ঘোমটাটা তুললে কেন?' বিন্দু প্রথমে কিছু উত্তর দিল না, তারপর বললো, 'ও গিয়ে যা' দেখেছে তা বলবে বলে। আমার ফেরবার পথে কাঁটা দিয়ে যাচ্ছি, বিন্দী আজ থেকে ওদের কাছে যাতে মরার বাড়া হয়ে যায়।'

আমি। তোমার যা' হবার হ'লো, আমাকেও কলঙ্কে জড়ালে!

বিন্দুর মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠলো, সে চেঁচিয়ে বললো,—তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার কি? ঘরে ফিরে যেয়ো, সমাজ তোমায় মাথায় তুলে নেবে। আর দেবতার কাছেও তো তুমি [illegible]

মরার জীবন থেকে বাঁচাতে এইটুকু বদ-নামের ক্ষতি সইতে পারো না?

আমার মুখে যেন কে চড় মারলো। আমি এর পর আর কথাটি কইলাম না।

তারা। তার পর?

—তার পর আর কি? কাশীতে পৌঁছে আমরা একটা ঘর ভাড়া করে কয়েক দিন ছিলাম, তারপর আমি একবার দেশে এলাম, বাবা ব্যাপারটা কি-চোখে দেখছেন জানতে এসে সেই-এস্তক এখানেই আছি।

তারা। কাশীতে সে একা থাকে?

পটল। না, গিরীনের বাড়ীতে আছে।

তারা। গিরীন কে?

পটল। একটি ছেলে, সেও কাশীতেই আছে, বেশ পয়সাওয়ালা। জীবনে যেন কি দাগা পেয়ে দেশান্তরী হয়ে আছে। গঙ্গার ধারে বাড়ী, একা মানুষ, খুব বিদ্বান, ফর্সা, ঢ্যাঙা, সুপুরুষ, চোখে চশমা—

তারা। থাক্, আর বর্ণনা করতে হবে না। বিন্দীর ঠিকানা আমায় দে।

ভাই-বোনে কথা হবার পরের দিন তারামণি কাশীতে বিন্দুবাসিনীকে পত্র দিল। সাত দিন পরে জবাব এল, অভাগিনী লিখেছে,—

শ্রীচরণে শতকোটী প্রণামান্তর নিবেদন—

তারা দিদি, আজ আমার অমানিশির মাঝে চাঁদ উঠেছে, আমার ঘর-ছাড়া সমাজ-ছাড়া বুঝি ধর্ম্ম-ছাড়া ছন্ন-ছাড়া জীবনে তুমি দুয়ার ঠেলে এসেছ! এত মানুষ থাকতে এই মুখপুড়ীকে মনে করলে কেন, বোন? আমি সকল আপনার জনের কাছে মরে ছিলাম—পাথর-চাপা জীবনের চেয়ে আমার মরাই সুখের মনে হয়েছিল। কিন্তু হাজার দুঃসাহসী গোঁয়ার হলেও আমি বাঙালীর ঘরের মেয়ে তো, এত-বড় অকূলে একা ঝাঁপ দিতে সাহসে কুলিয়ে উঠ্‌লো না, তাই তোমার ভাইটীকে টেনে এনে তোমাদের দুঃখ দিয়েছি। আজ এই পাঁচ বছরে আমি অনেক ঠেকেছি, অনেক সয়েছি, তাই অনেক শিখেছি। আজ দরকার পারি। আজ আবার নতুন করে মরবার সাধ হলে একাই মরি, সঙ্গে সঙ্গে আর কাউকে ডোবাই না, কিন্তু সে দিন আমার কাঁচা মন, কাঁচা বয়েস। সত্যি দিদি, জীবনেও যেমন মরণেও তেমনি মানুষ সাথী চায়। যে একা পথ চল্‌তে পারে, সে হয় দেবতা আর নয় পশু। মানুষ পারে না, তার মন প্রাণ চিত্ত হাজার টানে মাটির সঙ্গে বাঁধা, একা পথ চলা যে সব অবলম্বন খুইয়ে পাখীর মত আস্‌মানে ওড়া।

তুমি জিজ্ঞেস করেছ, এমন কাজ করলুম কেন? সে কথার উত্তর আগেই দিয়েছি, তোমাদের ঐ পাথর-চাপা জীবনের চাইতে এ আমার ঢের সুখের লেগেছিল। আজ আমার ওপর আমার অন্তর-দেবতা ছাড়া আর কারুর দাবী নেই, এ কি কম মুক্তি! তুমি বল্‌বে, "স্বামী" কে আমার স্বামী, দিদি? আমার মনুষ্যত্ব, আমার নারীত্বের অপমান কর্‌বার অধিকার তাকে কে দিল? ধর্ম্ম? তাহলে অধর্ম্ম কি? সমাজ? তা হলে দাসী বেচার হাট কি? একধারে আমার শিক্ষক, গুরু, বন্ধু, আমার বাবা মারা গেলেন, আর পাড়া-পড়সীর সঙ্গে পরামর্শ করে টাকার লোভে বনেদী বংশের লোভে মা আমায় যার হাতে তুলে দিলেন, সে কি পদার্থে তৈয়ারী, তা তোমরা শুনেছ, জান না। আমি জানি, আমি ছ' মাস তার ঘর করেছি, আমার নারীত্ব আর মনুষ্যত্ব তাকে যথেচ্ছা পায়ে করে দলতে দিয়েছি। শেষে যখন একদিন রাত্রে আমার ঘরে এসে দেখলাম, নসিপাড়ার বামুনদের কচি বৌটা সেখানে কাটা পায়রার মত পড়ে ছটফট করে কাঁদছে, তখন আমার পাষাণে-বাঁধা ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তাকে চুরি করে বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম,, সকালে শুনলুম, হতভাগী রক্ষিতদের পুকুরে ডুবে মরেছে। সেই রাত্রে আমি পালাই। একা পালাতে পার্‌তাম না আমিও হয় তো তারি মত ডুবেই মর্‌তাম। কিন্তু কে প্রাণের মাঝে ডেকে বল্‌লো, "তোর পথ দেখাবার মানুষ পথেই পাবি।" তাই গয়নার পুঁটলি হাতে করে বেরিয়ে ছিলাম, নিজের অদৃষ্ট-দোষে তোমার ভাই আমারই মরণ-

পড়লাম। যে সন্দেহ কাণা সমাজ করবে, তুমি তা করবে না, জানি, কারণ তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি জান, কোন একটা বড় ভাল কাজ বা মন্দ কাজ করবার শক্তি ওর নেই। তুমি বলেছ, এ মুখপুড়ীকে দেখতে আসবে। এসো দিদি। কাশী ত তীর্থ, সহজেই আসা যায়। আমার মুক্তির সুখ একবার দেখে যাও, যার কাছে আছি, তার কথা চিঠিতে বল্‌বো না। আগে তাকে চোখে দ্যাখো, তার পর সাক্ষাতেই সব বলবো। যদি জিজ্ঞেস কর, সে আমার কি, বল্‌তে পারি নে। এ সম্বন্ধকে আমাদের সমাজে প্রকাশ করবার ভাষা নেই। এ সমাজে কোন মেয়ে মানুষের এমন বন্ধু থাক্‌তে নেই! ইতি তোমার বিন্দী।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### সাক্ষাতে

যখন তারামণি নিতান্ত নিমরাজি পটলাকে একরকম গ্রেপ্তার করে নিয়ে কাশীতে গিরীনের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'লো তখন বেলা তিনটে। বিন্দু পটলকে আন্‌তে এক রকম স্পষ্টই বারণ করেছিল, অথচ তারা যখন তারই সঙ্গে এসে বিন্দুর সাম্‌নে দাঁড়াল, তখন তার মুখ গাল কাণ সব রাঙা হয়ে উঠলো, আয়ত নিবিড় চোখ দুটি কেঁপে কেঁপে উঠে পড়ে শেষটা প্রায় মুদে এল। এক মিনিটে সে সাম্‌লে নিয়ে তারার হাত ধরে আসনে বসাতে বসাতে বললো, "এস দিদি, এস।" পটলের দিকে খানিকক্ষণ আর ফিরেও চাইল না। তারামণি এইটুকু দেখতেই ভাইকে নিষেধ-সত্ত্বেও সঙ্গে এনেছিল। এখন তার এত দিনের মনের ধোঁকা কাটলো। পটল এতক্ষণ নিতান্ত অপ্রস্তুতভাবে কামানো গোঁফে যেন কতই অন্যমনস্কে তা' দিচ্ছিল, এখন গিরীনের ঘরের দিকে আস্তে আস্তে সরে পড়লো। তারামণি বিন্দুর চিবুক ধরে বললো,—এখন বুঝেছ বোন, মেয়ে মানুষের মুক্তি নেই। বিধাতার রাজ্যে বুঝি পুরুষেরও নেই, তাই জ্ঞানী শাস্ত্রকাররা নারীর সতীত্বের আর একনিষ্ঠার এত মর্য্যাদা দিয়েছেন!

বিন্দু। ওটি তোমার ভুল, দিদি।

বিন্দু। (লজ্জিতভাবে) না, যা' বললে।

তারা। কি ভুল, বল?

বিন্দু। সেই বাঁধনই সুখের, যে বাঁধন আমি নিজের আনন্দে নিয়েছি, শাস্ত্র ধর্ম্ম সমাজ তাই শুধু স্বীকার করে নেবে, তারই নাম বিবাহ,—সে মানুষ হাজার অপদার্থ হোক্‌, সেই আমার স্বামী।

বল্‌তে বল্‌তে বিন্দুর কালো চোখে সন্ধ্যার গভীরতা ছেয়ে এল, সুখালস দৃষ্টি যেন বহু দিনের কোন্ হারানো পথের সন্ধানে চলে গেছে।

তারামণি বললো,—তারপর? এ জীবন নিয়ে কি করবে?

বিন্দু। তা' তো জানি নে। ভাবনা করে কি হবে? আমি বেশ আছি।

পাশের ঘরে কার শান্ত পদবিক্ষেপ শোনা গেল, যে মানুষ যেন স্বপ্নে চল্‌ছে। বিন্দু গলার স্বর উঁচু করে ডাকলো,—রাঙাদা, এদিকে এস, তারাদিদি এয়েচেন।

যে এলো তার খুব বড় চোখ, বাঁরালো নাক, ক্ষীণ পাৎলা ঠোঁট, চক্ষে গভীর তন্ময়তা, নিটোল সবল দীর্ঘ শ্যাম অঙ্গখানি ব্যেপে এক অপূর্ব্ব শান্তি ও শুচিতা বিরাজ করছে। গিরীন এসে নমস্কার করে মৃদুস্বরে বললো,—এয়েচেন, বেশ করেছেন। অনেক কাল পরে টুন্‌টুনি কথা বলার সঙ্গী পেল। আমার মত বোবা মানুষের সঙ্গে বাস করে সহজ মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে। আচ্ছা, তোমরা গল্প কর, আমি যাই।

এবার বিন্দু তারামণির মুখের দিকে কৌতূহল-ভরা চোখে চেয়েছিল, গিরীন চলে গেলে জিজ্ঞেস করলো,— দেখলে, দিদি?

তারা। হুঁ।

বিন্দু। কেমন মানুষ?

তারা। খুব উঁচু দরেরই বটে।

বিন্দু। দেবতা দিদি, ও দেবতা। নইলে আমার মত পাপের বোঝা খামকা মাথায় করে?

তারা। কেমন করে পরিচয় হলো?

কীর্ত্তিমান পুরুষ এখান থেকে সরে যাবার আগে বুঝি একটুখানি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তাড়ায় ওকে বলে যায়। তার পর দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে সরাসরি আমায় বল্‌লো, "আপনি আমার বাড়ীতে থাক্‌বেন, চলুন।"

আমি। আপনার বাড়ীতে কে আছে?

গিরীন। কেউ না, একা আমি।

আমি। আমি এইখানেই থাকি, আপনি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাবেন যে মরে আছি কি বেঁচে আছি।

গিরীন। তাতে দোষ কি? আপনি আমি খাঁটি থাক্‌লেই হলো, লোকের কথায় আমাদের কি এল গেল?

আমি। আমি নিঃস্ব, হাতের পয়সা সব খরচ হয়ে গেছে। আমায় একটা রোজগারের উপায় বলে দিতে পারেন? কারুর বাড়ী দাসী বা রান্নার কাজ?

গিরীন। আমার কাছে অনেক টাকা আপনার গচ্ছিত আছে।

আমি; সে কি?

গিরীন। তা নয় তো কি! আমি একা মানুষ, কি করবো এত টাকা? আর ভগবান দেখুন, আপনাকে এখানে এমন অবস্থায় এনে ফেললেন, এই তো পষ্ট ইঙ্গিত যে ও টাকা কিছু আপনার কাজে লাগবে।

আমি। না, আমি খেটে খাব।

গিরীন। বেশ, আমার বাড়ীই খেটে খাবেন চলুন, আমি রাঁধুনী আজই তাড়িয়ে দেব, আপনি রাঁধবেন।

দিদি, ও-মানুষ যা ধরে তাই করে। ওকে বোধ হয় কেউ না বলতে পারে না। এই তো আছি, একা মেয়েমানুষ, অথচ মনে হয় যেন কোন্ স্বর্গের মানুষের সঙ্গে আছি—যার সঙ্গে যেন মেয়ে মানুষের কোন সম্পর্কই থাক্‌তে পারে না। কচি ছেলের মত সরল, চোখে ওর দৃষ্টিই নেই তা' আমায় দেখবে কি? অথচ নীরবে আমার জন্যে সব করে, কিন্তু কিছু চায় না!

দেশে ফেরবার দিন সজল চোখে তারামণি বিন্দুকে কোলে নিল, মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,—দুঃখী মেয়ে, নিজের দুঃখের বোঝা আর বাড়িও না। এমন দেবতার সঙ্গ পেয়েছ, তবু অপদার্থ একটা মানুষের জন্যে তোমার বুকে পাষাণ চেপে আছে? তুমি না বুদ্ধিমতী?

বিন্দু অনেকক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে রইল, তারপর বল্‌লো,—দিদি, নারীর হৃদয় কাণা। সে মানুষের ভিখারী, দেবতা নিয়ে কি করবে?

তারা। না বিন্দী, আমাদের দেশের মেয়েরা একদিন এম্‌নি দেবতারই দেবী ছিল। আজ তাদের সে মহত্ব গেছে বলেই তাদের এত দুঃখ। তুই মুক্তি মুক্তি করিস্, ভেতর থেকে মুক্তি না এলে নারীর মুক্তি কস্মিন্‌কালেও নেই। মানুষের জন্ম-জন্মের পায়ের শেকল ঘোচাবে কে? সে শেকল যে প্রকৃতির দান! এম্‌নি দেবতাই মুক্ত, মানুষ মুক্ত নয়, তা' যত ভাল সমাজেই থাক্।

বিন্দু। দিদি, তুমি ভুল করছ। ওর জীবনে প্রবেশের কোন পথ নেই, যে পথ আছে তা আমি পাই নি।

তারা। তাহলে নিজেকে নিয়ে কি করবি?

বিন্দু। কেন? আমি বেশ আছি। ছেলেবেলা যাকে পেলে জীবন সুখের হতো, সে মানুষ নয়। তবে মিছে হা-হুতাশ করে কি হবে, দিদি? মানুষ কি এতই বড় যে তাকে না হলে আমার চলে না? যিনি এ জীবন দিয়েছেন, এক দিন সেই বিশ্বনাথের পথ পাবো, আগে এম্‌নি নিরর্থক বসে বসেই হাজার সাধ-আকাঙ্ক্ষার হাটগুলো ভাঙুক!

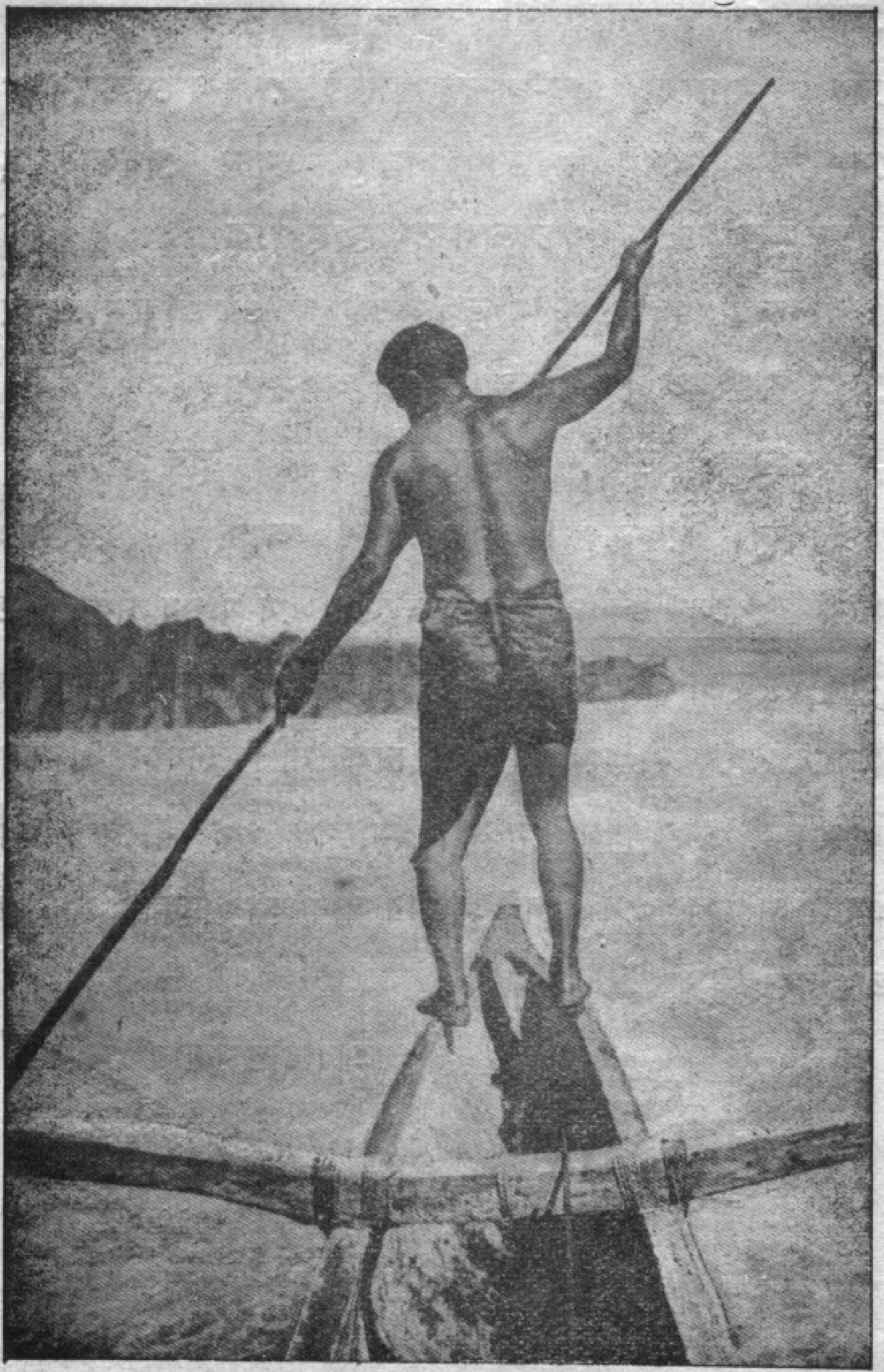
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

---

# মতি-মহলে

বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা পরিয়ে দিলে যে মুক্তোর অমর্য্যাদা করা হয় এটা আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আস্‌ছি। সুতরাং বাঁদর ছাড়া কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ এমন মানুষ আর দেখা যায় না যে মুক্তোর কদর বোঝে না। এহেন যে মুক্তো, পৃথিবীর মধ্যে যা নাকি একটা শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলে বিবেচিত, কত রাজ্যেশ্বর সম্রাট যাকে সাদরে শিরোভূষণ করে রাখে, কত রাণী রাজকুমারীদের কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে যে তাদের ইন্দ্রবাঞ্ছিত বুকের ওপর পড়ে থাকবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে ধন্য হয়েছে, সে জিনিসটা যে কি—তা বোধ হয় অনেক মুক্তোবিলাসিনীই জানেন না, এমন কি অনেক মুক্তোব্যবসায়ীও সম্ভবত সে বিষয়ে অজ্ঞ।

সেকালে প্লিনি বলে রোম রাজ্যের একজন প্রাচীন জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি বলে গেছেন যে 'মুক্তা ফল জমাট শিশির-বিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়। শিশির-বিন্দু যদি বিশুদ্ধ, অমলিন, ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ঝিনুকের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে মুক্তাটীও সুন্দর নিটোল ও উজ্জ্বল হয়; কিন্তু শিশির-বিন্দু যদি কোন রকমে দোষযুক্ত হ'য়ে প'ড়ে, তাহ'লে মুক্তাও কদাকার ও মলিন হ'তে বাধ্য!'



ভারতীয় মুক্তা-সন্ধানী



জাপানী মুক্তা-সন্ধানী

শিশির-বিন্দুই যে জমাট বেঁধে মুক্তোয় পরিণত হয় এ ধারণা পৃথিবীর সকল লোকেরই অনেকদিন ধ'রে ছিল। সম্প্রতি কিছুদিন হ'ল মুক্তোর ছদ্মবেশ ধরা পড়েছে। স্বাতী-নক্ষত্রের জল পড়ে স্থান কাল পাত্র হিসেবে গজমতি প্রভৃতির জন্মলাভের যে পৌরাণিক কাহিনী আশৈশব শুনে আস্‌ছিলুম—হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে, ও-সব একেবারেই গাঁজা-খোরের গল্প! যার শুভ্র উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক রূপ-শ্রীও সৌন্দর্য্যের প্রতীক্ স্বরূপ, যা রাজপ্রাসাদের শোভা ও সম্পদ স্বরূপ, যা দেব-দেবীরও কণ্ঠাভরণ ও শিরোভূষণ—সে যে একটা জলজ কীটের বল্মীক ছাড়া আর কিছুই নয়, এ কলঙ্কের কথা আজ দেশ দেশান্তরে প্রকাশ হয়ে গেছে!

এই ক্ষুদ্র কীটের সমাধি-স্তূপের তুলনায় তাজমহলও নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে, এমন আশ্চর্য্য মতি-কবরে কোনও শাহান্‌শা বাদশারও মৃতদেহ অবস্থান করতে পায় না। সভ্যজগতের



অষ্ট্রেলিয় মুক্তা-সন্ধানী
( ঝিনুক খুলে তার ভেতর থেকে মুক্তো সংগ্রহ করছে )

সামাজিক ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে এটাকে যেন আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার এবং বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় বলে মনে হয় যে, শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণীরা কেন তাঁদের কণ্ঠহার ও অলঙ্কার স্বরূপ এমন একটা জিনিস এখনও আপনাদের বর অঙ্গে বহন করে বেড়াচ্ছেন—যেটা শামুক ও ঝিনুক-বাসী পরভূজ মৃতদেহাবরণ মাত্র!

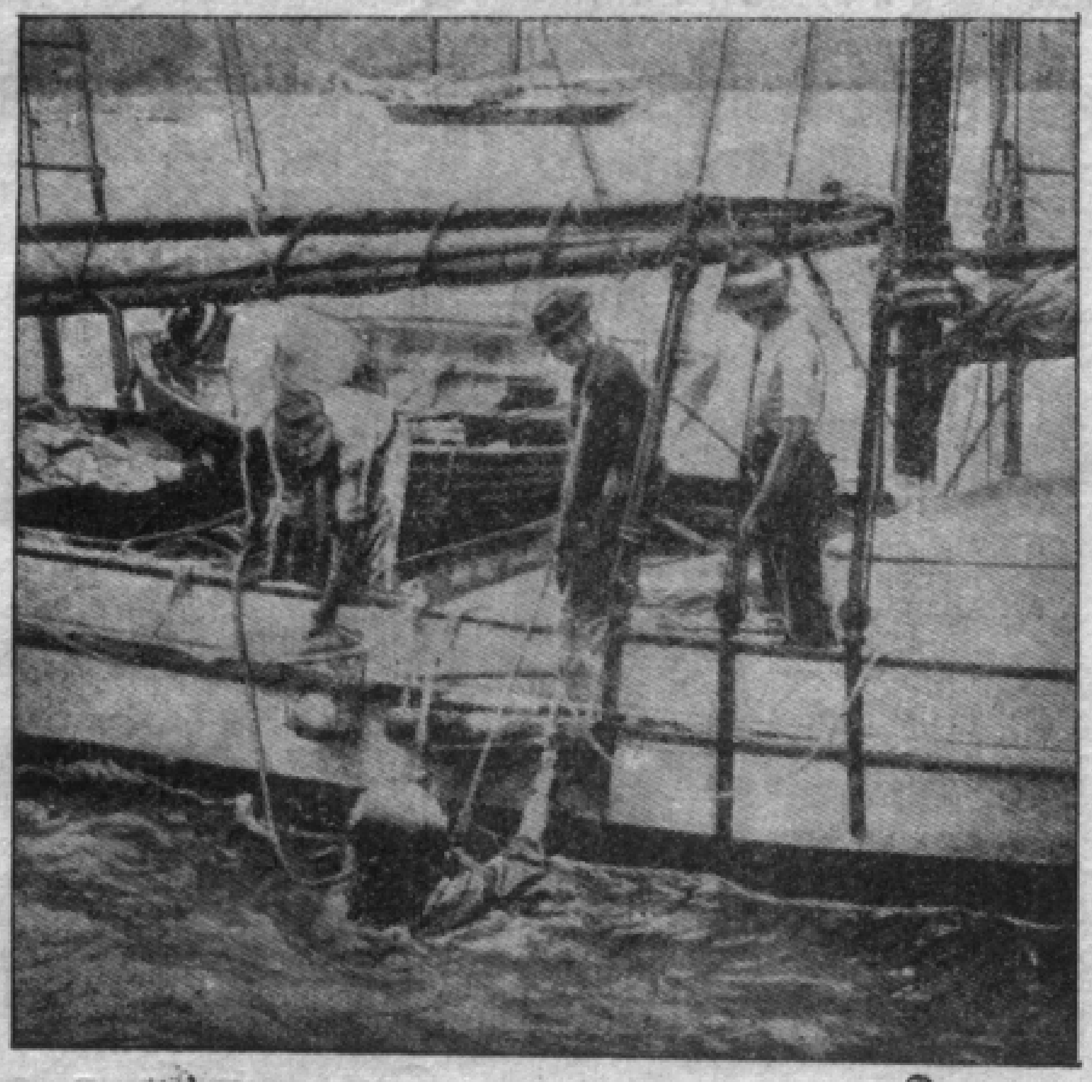
কবিরা সুহাসিনী নায়িকার অধর-প্রান্ত বিকশিত দন্ত পাঁতির বর্ণনা ক'রতে গিয়ে বার বার এই মুক্তাপাঁতিরই শরণ নিয়েছেন। যা কিছু উজ্জ্বল, ঐশ্বর্য্যময় ও নিষ্কলঙ্ক, তাকে বোঝাতে হলে মুক্তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া—ছাড়া যেন আর উপায় নেই! কালিদাস থেকে আরম্ভ ক'রে সেক্স্‌পীয়ার পর্য্যন্ত সকল মহাকবিই মুক্তার স্তুতিগান না ক'রে থাকতে পারেননি। কিন্তু রাসায়নিক একে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে বলেছেন যে এর মধ্যে খড়িমাটি আর শুক্তি-বিনির্গত এক রকম দ্রব পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই!

ঝিনুক সকলেই দেখেছেন। ইংরিজিতে ঝিনুকের ভিতরের অংশকে বলে 'মুক্তোর মা" (Mother of pearl)। ঝিনুকের ভেতর দিকটা খুব চকচকে, আর মনে হয় তা থেকে যেন রামধনু রংয়ের আভা ফুটে বেরুচ্ছে। কিন্তু শুনে বোধ হয় অনেকেই আশ্চর্য্য হবেন যে, এ ব্যাপারটা একেবারে নিছক ফাঁকি! ওটা সম্পূর্ণ আমাদেরই দৃষ্টি-বিভ্রম! ঝিনুকের ভেতরটা সূক্ষ্মতম বলি-রেখাঙ্কিত। অনুবীক্ষণের সাহায্যে তা মানুষের চোখে কিছুতেই ধরা পড়ে না, অথচ সেই সূক্ষ্মতম বলিরেখাগুলোই আলোক-রশ্মির প্রতিবিম্বকে বাধা দিয়ে সপ্তবর্ণে সমুজ্জ্বল টুক্‌রো টুক্‌রো রামধনুর সৃষ্টি করে তোলে! এখানে হ'য়ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে বলি-রেখাগুলোই যদি ঔজ্জ্বল্যের হেতু, তবে ঘ'সে মেজে পালিশ ক'রে ফেল্‌বার পরও মুক্তোর বা শুক্তির চাকচিক্য নষ্ট হয় না কেন? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, এত অসংখ্য সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ স্তর পরের পর জমাট বেঁধে গিয়ে এ জিনিসটার সৃষ্টি হয় যে, যতই কেন তাকে কেটে-কুটে ঘসে-মেজে পালিস ক'রে ছেড়ে দাও না, একটা স্তর তার সূক্ষ্মতম বলি-রেখা নিয়ে ঠিক ওপর দিকে জেগে উঠবেই। এই রেখা ও স্তরের পরিমাপ এত সূক্ষ্ম যে, এক ইঞ্চির পঞ্চসপ্ততি শত ভাগের একভাগ অপেক্ষাও কম!

শুক্তির গর্ভে মুক্তার জন্ম প্রকৃতির এক অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড! যে সব ডুবুরী মুক্তা সংগ্রহ করে, তারা তাদের বহুকালের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছে যে, সুন্দর সুগঠিত পরিপুষ্ট ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার সন্ধান পাওয়া



অষ্ট্রেলিয়ার মুক্তা-সন্ধানী জলে নামছে



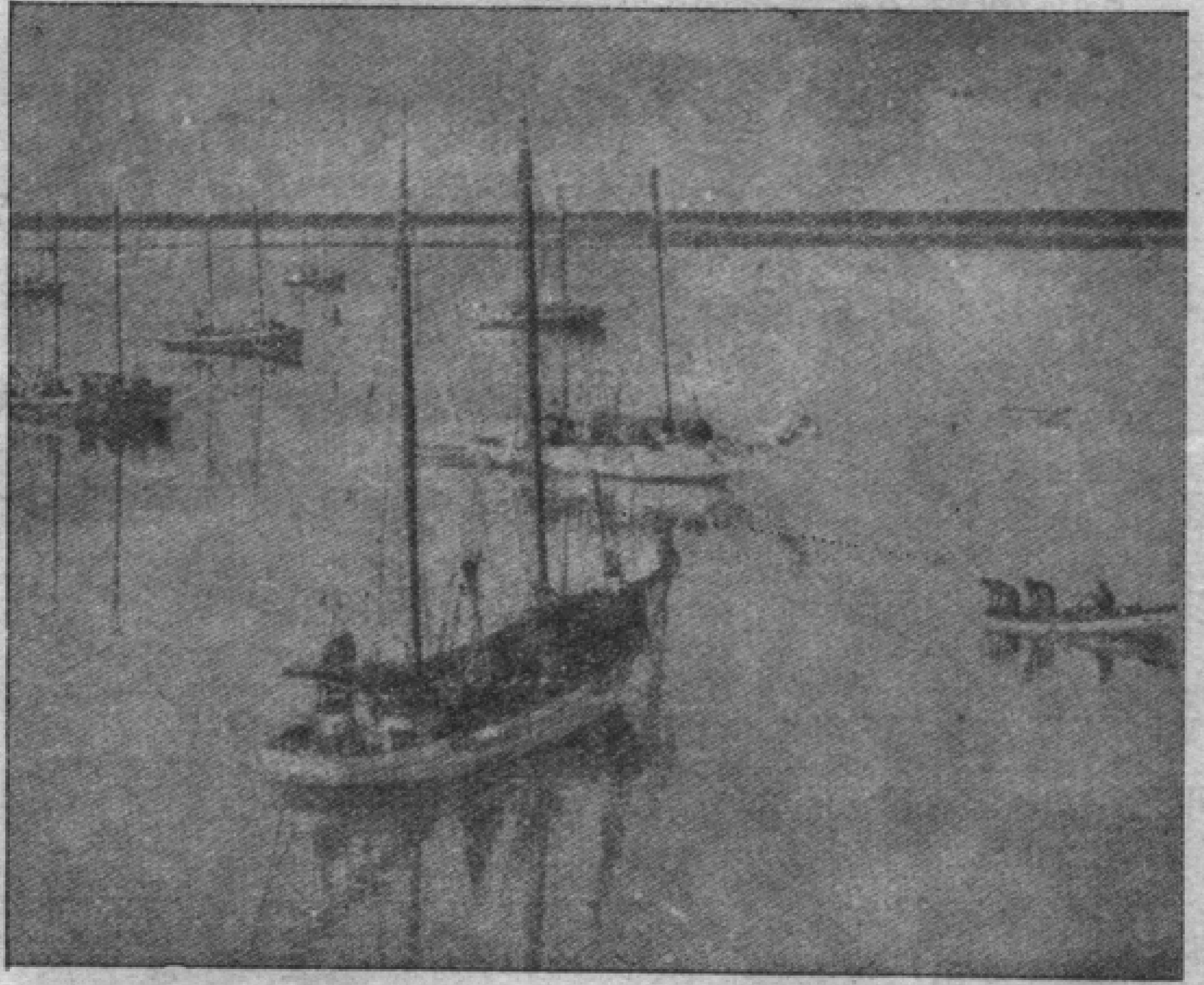
মুক্তা সংগ্রহ করে ফিরুছে

যায় না। মুক্তা মেলে যত শুঁচা, বিকৃত-গঠন, কদাকার ঝিনুকের ভিতরে—যাদের খোলা অপরিপুষ্ট পরভুজ কীট-দষ্ট, এবং অতি বিশ্রী বিজ্‌কুড়ি ফোস্কায় ভরা! অর্থাৎ কিনা সুস্থ-সবল ঝিনুক কখনও মুক্তা প্রসব করে না, ব্যাধিগ্রস্ত দুর্ব্বল ঝিনুকের মধ্যেই এ জিনিসটা হ'তে দেখা যায়, অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার জন্ম তার রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতারই পরিচায়ক।

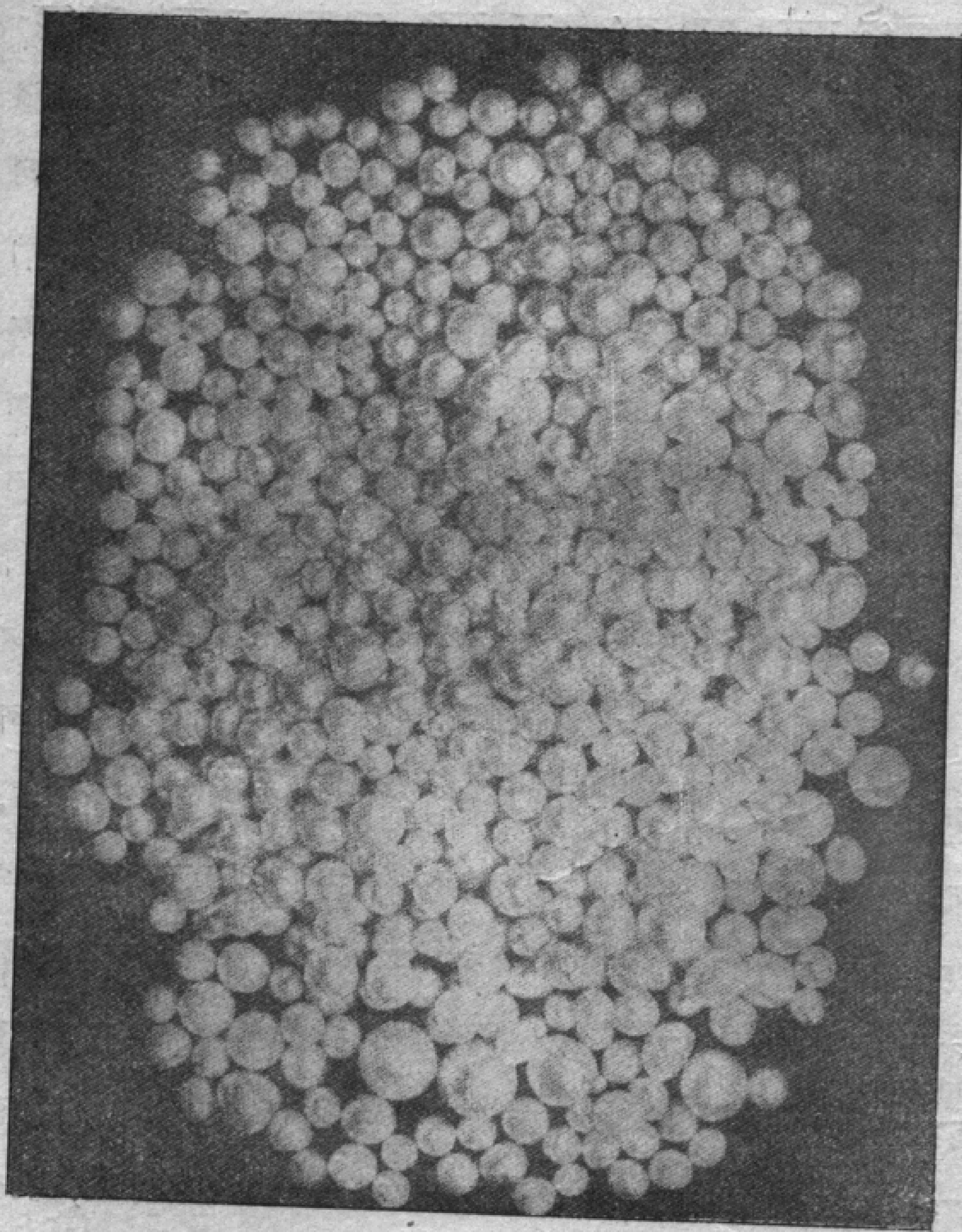
আগে লোকের ধারণা ছিল যে, শুক্তির মধ্যে কোনও রকমে বালুকণা প্রবেশ করলে, সেই বালুকণাটিকে ঘিরে ঘিরে তার চারিদিকে ঝিনুকের স্তর জমে জমে ক্রমে তাকে মুক্তোয় পরিণত ক'রে; কিন্তু এখন প্রমাণ হয়ে গেছে যে, যদিও উপরোক্ত উপায়ে নকল মুক্তোর সৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু আসল মুক্তো ঠিক ওভাবে উৎপন্ন হয় না। যে জীবটি মুক্তোর প্রধান কারিকর, সে একেবারেই শুক্তি নয়, প্রকৃত পক্ষে শামুক বা গেঁড়ীকেই বরং মুক্তোর জনক বলা যেতে পারে। তবে এটাও ঠিক যে, শামুকের একার চেষ্টায় মুক্তোর সৃষ্টি হয়না, আরও একটি ক্ষুদ্রতম জীবের সাহায্য দরকার। বৈজ্ঞানিকেরা এখনও মুক্তোর জন্মলাভের সমস্ত রহস্যটা আগাগোড়া ধ'রে ফেল্‌তে পারেননি, তবে যেটুকু জান্‌তে পেরেছেন, সেটুকু ভারি চমৎকার।

খুব সরু সরু ছোট ছোট চক্রাকার একরকম জলো পোকা, ইংরিজীতে যাকে বলে Ceslode তারই সদ্য অণ্ডোদ্ভিন্ন বাচ্চা প্রায়ই জলের উপর ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। কোনও রকমে সেই পোকা একটা যদি ঝিনুকের ভেতর ঢুকে পড়ে, তাহ'লে দুর্ভাগ্যক্রমে সেইখানেই তার মৃত্যু হয়; তখন ঝিনুক তার সেই মৃতদেহটীকে কবর দেবার জন্যে তার ওপোর মুক্তোর এক চমৎকার সমাধি-স্তূপ নির্ম্মাণ করে। সেই সমুজ্জল সমাধিস্তূপ নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ হচ্ছে, সিন্ধুজাত 'কার্বনেট অফ্‌লাইম'। যতগুলি মুক্তা ইদানীং বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, সবগুলির মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত চক্রাকার জীবের সদ্যঅণ্ডোদ্ভিন্ন বাচ্চার মৃতদেহ দেখ্‌তে পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, শুক্তির মধ্যে এই বিজাতীয় জীব প্রবেশ করবামাত্র ঝিনুকের একটা পীড়া উপস্থিত হয় এবং সে প্রাণপণে আত্মরক্ষার জন্য তাকে ঝিনুকের আবরণে ঢেকে ফেল্‌বার চেষ্টা করে! এখনও মুক্তার জন্ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধান চল্‌ছে এবং আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে আমরা এহেন নিখিল-জন-প্রিয় রত্নের জন্ম-রহস্যটা সমস্তই জান্‌তে পার্‌বো।

এইত গেল মুক্তোর জন্ম সম্বন্ধে আলোচনা; এইবার পৃথিবীতে মুক্তোর প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান ক'রে দেখা যাক্‌। কে সে লোক, কি করে সমুদ্র-গর্ভ থেকে সর্ব্বপ্রথম মুক্তার মুক্তি সাধন ক'রেছিল, সেটা জান্‌বার জন্যে একটা কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু দুঃখের



মুক্তা-সংগ্রাহী নৌকা ( অষ্ট্রেলীয় )



অষ্ট্রেলীয় মুক্তা

বিষয় সে ভাগ্যবানের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে এটুকু জানতে পারা গেছে যে, পুরাকালে ক্রীতদাসদের সাহায্যে সমুদ্র-গর্ভ থেকে শুক্তি তুলে আনিয়ে তার ভিতর থেকে মুক্তা সংগ্রহ করা হতো! কারণ এ কাজটা তখন এতই বিপদজনক বলে লোকের ধারণা ছিল যে, কোন লোকই নিজের ইচ্ছায় স্বয়ং এ কাজে অগ্রসর হ'তে সাহস ক'রতো না। আজকাল কিন্তু মুক্তোর দেশের লোকেরা নিজেরাই এ কাজের ভার নিয়েছে।

পৃথিবীর অনেক প্রদেশেই মুক্তোর কারবার আছে, কিন্তু সিংহল দ্বীপে যে মুক্তো পাওয়া যায় তাইই সব চেয়ে দামী। দ্বীপের উত্তরে মানার উপসাগরে চৈত্র মাসের গোড়ায় মুক্তো সংগ্রহ সুরু হয় এবং একমাস কি বড় জোর চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত এই কাজ চলে। মুক্তো-ধরা সুরু কর্ব্বার আগে গভর্মেণ্টের বিশেষ কোনও কর্ম্মচারী আগে এসে শুক্তি পরীক্ষা করে দেখে। যদি বোঝা যায় যে, এ বছর প্রচুর মুক্তো পাবার সম্ভাবনা আছে, তাহ'লে গভর্মেণ্টের তরফ থেকে চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে, এ বছরে মুক্তো ধরা হবে! এই ঘোষণা পড়তে না পড়তে মানার প্রভৃতি উপসাগরের কূলে যেখানে ইতিপূর্ব্বে ধূ ধূ ক'রছে বালিরাশি ছাড়া আর কিছুই দেখা যেতোনা সেখানে একেবারে সহর ব'সে যায়। গভর্মেণ্ট অফিস-আদালাত, জেলখানা, সেনা-নিবাস, খাজনাখানা, দোকান-পাট হাটবাজার, বসতবাড়ী, হোটেল প্রভৃতিতে সেস্থান এক মাসের জন্যে একেবারে জমজমাট হয়ে ওঠে! কিছু না হবে ত অন্ততঃ তিরিশ-চল্লিশ হাজার লোককে সেখানে এই একমাসের জন্যে বসবাস করতে যেতে হয়।

ফাল্গুনের শেষা-শেষি অসংখ্য মুক্তো-তোলা নৌকো সেখানে জড় হয় এবং চৈত্রমাস আরম্ভ হতে না হ'তে মুক্তো আহরণ সুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক নৌকোতে অন্ততঃ কুড়িজন লোক থাকে। দশজন থাকে নৌকো বাইবার জন্যে, আর দশ জন থাকে ডুবুরী, মুক্তো তোলবার জন্যে। সকালে গভর্মেণ্ট অফিস থেকে তোপ পড়লে অমনি সব নৌকো ছাড়া হয়। প্রত্যেক নৌকোর ডুবুরীরা নিজেদের



সমুদ্রগর্ভে ঝিনুক তোলা

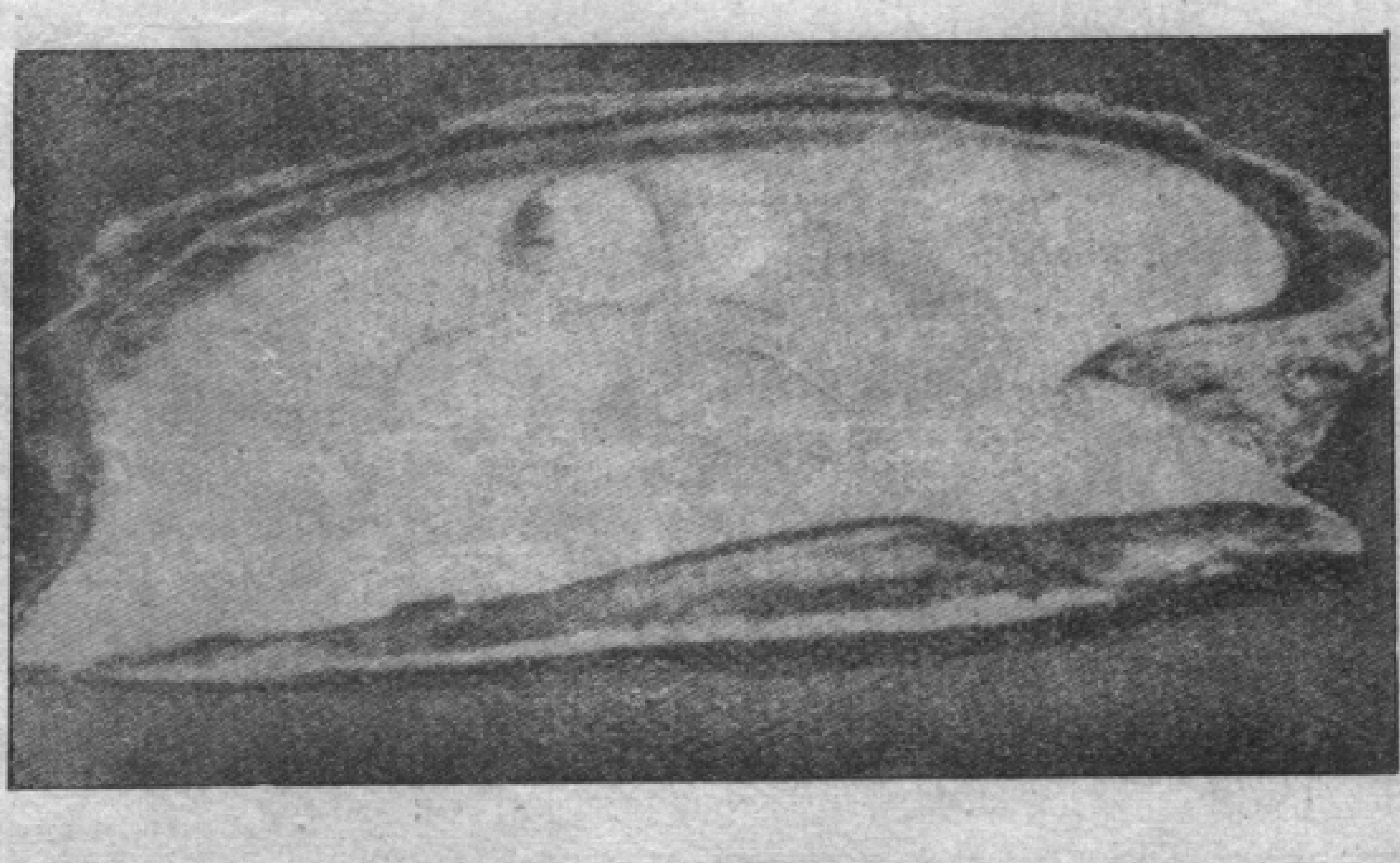


বৃহত্তম অষ্ট্রেলীয় ঝিনুক

দুভাগ ক'রে নেয়। অর্দ্ধেক লোক যখন কাজ করে, অর্দ্ধেক লোক তখন বিশ্রাম করে। জলে ডোববার সময় তারা কেবল একটা নেংটি প'রে থাকে মাত্র, তাদের হাতে একটা ক'রে জালের থলে থাকে, শুক্তি কুড়িয়ে সেই জালের থলের মধ্যে ভরে নিয়ে তারা ওপরে উঠে আসে। জলে নামবার সময় তারা একটা দড়ি ধরে নেমে যায়, দড়ির মুখে একখানা পঁচিশ তিরিশ সের ভারি পাথর বাঁধা থাকে। এই পাথরের ভারে তারা চট্ করে সমুদ্রের তলায় গিয়ে পৌছয়। তারা সকলেই প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ সেকেণ্ড জলের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে ; তার মধ্যে যে কটা ঝিনুক পারে কুড়িয়ে নিয়ে থলেয় ভ'রে দড়ি নাড়া দেয়, তখন দড়িশুদ্ধ টেনে তাদের নৌকোর ওপরে তুলে নেওয়া হয়! কেউ কেউ আশী সেকেণ্ড পর্য্যন্তও ডুবে থাক্‌তে পারে, তবে সে রকম ডুবুরী খুব কম।

প্রত্যেক ডুবুরী বারবার জলের মধ্যে নামে, যতক্ষণ না একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একদল যখন ঝিনুক কুড়োয়, আর একদল তখন নৌকোর ওপরে বসে সেগুলো ঝেড়ে বেছে সাফ ক'রে রাখে। বেলা বারোটা-একটা নাগাদ দুদ'ল ডুবুরীই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন নৌকো নিয়ে সব ডাঙায় ফিরে আসে। প্রত্যেক নৌকোর চালান গভর্মেণ্টের সদর আফিসে নিয়ে গিয়ে হাজির ক'র্‌তে হয়, সেখানে আবার প্রত্যেক নৌকোর মাল তিনভাগ করা হয়, দু'ভাগ গভর্মেণ্ট সদরে জমা করে নেন আর একভাগ মুক্তো সংগ্রহকারীরা পায়। তারা আবার তাদের ভাগটা তখনি খদ্দেরদের বেচে ফেলে। ডুবরীদের কাছ থেকে তাদের ভাগের মুক্তো কেনবার জন্য সেখানে বিস্তর ক্রেতা উপস্থিত থাকে। গভর্মেণ্ট সমস্তদিন ধরে প্রত্যেক নৌকোর কাছ থেকে দু'ভাগ ক'রে ঝিনুক আদায় ক'রে নিয়ে তারপর নিলাম ক'রে সমস্ত দিনের সঞ্চিত মাল বিক্রয় করে দেয়। ক্রেতারা সেই মাল নৌকোর খোলের মধ্যে জল পুরে তাইতে ফেলে রেখে দেয়; ঝিনুকগুলো প'চে উঠ্‌লে তারপর তাদের খুলে ভিতর থেকে মুক্তো বার ক'রে নেয়। ঝিনুকের ভেতরের কোমল অংশে যে মুক্তোটি নিটোল গোল হয়ে আল্‌গা প'ড়ে থাকে, সেই মুক্তোই সব-চাইতে মূল্যবান। কিন্তু ঝিনুকের ভেতর মুক্তো আল্‌গা ভাবে থাকে খুবই কম। প্রায়ই মুক্তোগুলো ঝিনুকের খোলের মধ্যে লেপ্‌টে এঁটে থাকে। অনেক সময় চিম্‌টে দিয়ে টেনে ছাড়াতে হয়। মাঝে মাঝে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো আছে কিনা দেখতেই পাওয়া যায় না, পরে খোলা ভাঙ্‌বার সময় হয়ত হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে! এর কারণ আর কিছুই নয়, সেই মুক্তোটির ওপরে ঝিনুকের স্তর এত বেশীরকম সঞ্চিত হয়ে পড়ে যে, মুক্তোটি একেবারে চাপা পড়ে যায়।

সমুদ্রের তলায় নেমে গিয়ে মুক্তো সংগ্রহ ক'রে আনা বড় সোজা কাজ নয়। সমুদ্র-গর্ভে অনেক রকম বিপদ-আপদের সম্ভাবনা আছে। দম বন্ধ ক'রে থাকা এবং সমুদ্রের তলায় ডুব-মারা প্রভৃতি আয়াস-সাধ্য দুঃসাহসের কাজগুলো ছেড়ে দিলেও, হাঙ্গর প্রভৃতির ভয়টা সমুদ্র-গর্ভে



শুক্তি-শয়নে মুক্তাবালা



জুলীয়স্ সীজারের মুক্তা পরীক্ষা

খুবই বেশী। এই জন্যে অনেক ডুবরী বর্ষা সড়কী প্রভৃতি অস্ত্র সঙ্গে ক'রে নিয়ে নামে। এ ছাড়া প্রত্যেক নৌকোয় একজন ক'রে হাঙ্গর-কুমীরের রোজা উপস্থিত থাকে, জলে নামবার আগে তারা না মন্ত্র পড়ে দিলে কোন ডুবুরীই জলে নামতে সাহস ক'রে না; এ তো গেল তাদের একটা সংস্কারের কথা, অনেক সময় শুক্তিই এমন শক্ত হ'য়ে ওঠে যে ডুবরীরা কিছুতেই তাকে বাগিয়ে তুলতে পারেনা।

সিংহল দ্বীপের উপকূলে মুক্তা সংগ্রহ করার ভার ১৮৯১ সাল থেকে গভমে'ণ্ট নিজের হাতে নিয়েছেন, কিন্তু ১৮৯১ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত এই বিশ বৎসর কাল গর্মে'ণ্টের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তখন লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হার্ডম্যান এবং স্যার রে ল্যাঙ্কাষ্টার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে তাঁদের দ্বারা সমুদ্র-গর্ভে ঝিনুকের অবস্থা পরীক্ষা করিয়ে তাঁদের পরামর্শ-অনুসারে নূতন উদ্যমে ও নব-ব্যবস্থায় কাজ সুরু হয়েছে। অধ্যাপক হার্ডম্যান পরীক্ষা করে বলেছেন যে, সিংহলের মুক্তা-ভাণ্ডার অফুরন্ত, সমুদ্র-গর্ভে এক-একটা দঙ্গলে অন্ততঃ এক হাজার কোটী ক'রে ঝিনুক প্রতি বৎসর জন্মাচ্ছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সবগুলো শেষ পর্য্যন্ত টে'কে না। স্যর্ রে ল্যাঙ্কাষ্টারের মতে, পঞ্চাশ লক্ষ ঝিনুকের মধ্যে একটামাত্র শেষ পর্য্যন্ত টেঁকৃতে পারে।

অধ্যাপক হার্ডম্যানের উপদেশ অনুসারে কাজ ক'রে গভমে'ণ্টের মুক্তার কারবার এখন আশাতীত উন্নতি লাভ ক'রেছে চৈত্র মাসে আজকাল প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ-ষাট লক্ষরও বেশী ঝিনুক পাওয়া যায়। তার দাম খুব কম ক'রে ধরলেও অন্ততঃ দেড়লক্ষ টাকা।

কোন্ ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো আছে আর কোন্‌টার মধ্যে নেই, এ দেখবার জন্য আজকাল আর প্রত্যেক ঝিনুকটি খুলে পরীক্ষা ক'রতে হয়না, 'এক্স্-রে' আলোকের সাহায্যে সহজেই এ কাজ হচ্ছে। যে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো এখনও হয়নি তাকে আবার জলে ছেড়ে দেওয়া হয়! চীনেরা মুক্তাহীন ঝিনুকের মধ্যে ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি পূরে জলে ছেড়ে দেয়, কিছুদিন পরে সেই ঝিনুক আবার ধরা পড়লে দেখা যায় বুদ্ধমূর্ত্তিটী একেবারে ঝিনুকে ঢাকা পড়ে যেন রূপান্তর গ্রহণ করেছে! তখন সেই মূর্ত্তিটী বাজারে অনেক দামে বিক্রয় হয়!

ইংলণ্ডে একরকম উৎকৃষ্ট মুক্তো পাওয়া যেতো আগে তার রীতিমত কারবার চল্‌তো। প্রবাদ আছে যে জুলিয়স সীজার এই মুক্তোর লোভেই রোম থেকে অত কষ্ট স্বীকার ক'রেও ইংলণ্ড জয় করতে এসেছিলেন। ইংলণ্ডে নেমেই তিনি সর্ব্ব প্রথমে মুক্তো তুলিয়ে যাচাই ক'রে দেখেছিলেন। ইংলণ্ড-বিজয় ক'রে রোমে ফিরে গিয়ে তিনি 'ভেনাস্' দেবীকে ইংলণ্ডে সংগৃহীত মুক্তোর একটা বক্ষ-মালা উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে খাস্ ইংলণ্ডে আজকাল আর মুক্তো পাওয়া যায় না, তবে ইংলণ্ডের অধিকৃত নানা প্রদেশে মুক্তোর ছড়াছড়ি বটে!

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

# কন্যা-শরৎ

দোপাটি ফুল—চুটকি পায়ের,
সন্ধ্যামণির নাকছাবি ;
গোট পরেছে অপরাজিতার,
কুন্দকুঁড়ির সাতনরী-হার,
আঁচল-খুঁটে 'রিং'টি ভরা
কৃষ্ণকলির লাখ চাবি !

শাদা-মেঘের গামছা ভাসে
আকাশ-দীঘির ডুব-জলে,
সাঁতার দিয়ে কে ধরে তায় ?—
স্বপন যে ছায় আঁখির পাতায় !
নাইতে নেমে বাড়ছে বেলা—
দুপুর-রোদে রূপ জ্বলে !

মাটির 'পরে লুটোয় যে তার
বারাণসীর সেই চেলি,
আলোয়-কালোয় ওই যে বোনা
কন্যাখানির সাঁচ্চা-সোনা—
পথের ধুলোয়, বনের ফাঁকে
হেথায় হোথায় দেয় মেলি' !

শিউলিগুলি খোঁপায় পরে'
সাঁঝের প্রদীপ নেয় জ্বেলে,
ভোর-আঁধারে চুলটি খুলে'
আবার সে-সব দেয় ফেলে ;
লক্ষ্মী-পূজোর পূর্ণিমাতে
আল্‌পনা দেয় আপন-হাতে,
রাত পোহালে জল্‌কে চলে—
সোনার ঘটে কাঁখ চাপি' ।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ।

---

# আলোচনা

## সাহিত্যে রাজা-রাণী

রাজা নাই রাণী নাই, তাস খেলি কেমন করিয়া ?
রাজা নাই রাণী নাই, গল্প লিখি কাহাকে লইয়া ?

বাস্তবিকই সমস্যা। বাদল দিনের দমকা হাওয়ায় তাসের রাজা-রাণী দুজনে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ঝড়ো বাতাসের ঝাপ্‌টা খাইয়া এলোমেলো ছড়াইয়া আছে আর সব কখানি তাস—এক হইতে দশ পর্য্যন্ত, আর উড়ে যেতে-যেতে পড়ে আছে গোলামখানি। চারজন খেলতে এসে দেখে আসল রাজা-রাণীই নাই ! দুখানি তাসের অভাবে খেলাই বুঝি আজ মাটি হয় ! চারজনই তখন বসে ভাবছে, রাজা-রাণী নাই, তাস খেলি কি করিয়া !

একজন তার মধ্যে ছিল বেশ বুদ্ধিমান্‌। সে বল্‌লে, এমন দিনটা মাটি করা হবে না ; নাই বা থাকলো রাজা-রাণী, আর সবই ত আছে। তাই দিয়ে আমরা নতুন খেলা গড়ে নেবো। ওই গোলাম আছে আর দশখানি তাসের মধ্যে ওই হবে বড় ; কিন্তু ততক্ষণ, যতক্ষণ আর সবগুলি ওর পাশে থেকে ওকে বড়র পদ দেবে।

রাজা-রাণী নাই তবু সেদিন খেলা হল, কিন্তু মামুলি খেলা নয়। রাজা-রাণীর অভাবে নতুন একটা খেলা তৈরী করতে হয়েছিল। নতুন

কালচক্র-আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার রাজা-রাণীও তাসে[র] রাজা-রাণীর মতই উড়ে কোথায় গিয়ে ঠিক্‌রে পড়ছেন তা[র] খোঁজ বড় একটা কেউ রাখে না। তা বলে কি দুনিয়ার খেল[া] আটকে আছে ? তাতো মনে হয় না, বরং ওই আমেরিকা, যার কো[ন] কালে রাজা ছিল না ; বা ওই ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া যাদের রাজা-রাণী হারিয়ে গেছে, তারাই আজ নতুন খেলায় কেমন নতুনতর সভ্যতা গড়ে তুলেছে। ইংলণ্ডের আর জাপানের রাজা সাক্ষী-গোপাল ; তাই খেলায় এক রকম তফাৎ বল্লেও চলে, তাই সে-সব দেশের খেলোয়াড়ের বড় একটা পিছনে পড়ে নাই। পুরানো দিন চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াটা পুরানোকে ছেড়ে নতুন গড়ে নিয়েচে। বিশ্বের খেলাঘরে ে[...] রাজা-রাণী না হলেও চলে, তা বেশ প্রমাণ হয়ে গেছে।

এবার আসচে সাহিত্যের কথা। রাজা নাই রাণী নাই গল্প লিখি কাহাকে লইয়া ?

গত ভাদ্রমাসের ভারতীতে 'সাহিত্যে রাজা-রাণীর' লেখক বলেছেন—রামায়ণ মহাভারত থেকে ইলিয়াড্‌ ওডিসি, আরব্য উপন্যাস থেকে ঠাকু'মার রূপকথা, কালিদাস হতে সেক্‌স্‌পীয়র সকলেরই প্রধান চরিত্র রাজা রাণী, আর তা না হলে অন্ততঃ একজন রাজপুত্র আর তাঁ[র]

সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজা-রাণীকে সাহিত্যের আসরে টেনে এনেছেন। এই রাজা-রাণীর চারিদিকে ঘেরা কত ষড়যন্ত্র-জালের কথা নিয়ে নিহিলিষ্ট, বলশেভিক ও বিপ্লববাদী অন্যান্য দল সম্বন্ধে কত কৌতূহলোদ্দীপক গল্প ও উপন্যাস রচিত হয়েছে। তাই লেখক মহাশয় দুঃখ করেছেন, 'দুনিয়ায় রাজা-রাণীর অভাবে কল্পনার একটি চিত্ত-বিনোদন রাজ্য লুপ্ত হইবে ও সাহিত্যের একটি ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কক্ষ শূন্য হইবে।'

লেখক মহাশয়ের সহিত আমরাও একমত। তবে ভাব্‌বার আর একটা দিক্ আছে। সেই দিক্‌টা দেখানোই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই যে রাজা-রাণী বা বড় ঘরের কথা নিয়ে যে-সাহিত্য গঠিত হয়েছে, তাকে অভিজাত সাহিত্য নাম দিলেই ঠিক হয়। বড় ঘরের কথা, বড় ঘরের সুখ-দুঃখ, বিলাস-সম্ভোগই সে সব আখ্যায়িকার মূল বিষয়। তার নীচে দরিদ্রের সুখ-দুঃখ চাপা পড়ে আছে। তার দৈন্য দশা দেখে লেখকেরা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইতে ঘৃণা করেন। এই উপেক্ষাটুকু সাহিত্যের একটা দ্বার বাস্তবিকই রুদ্ধ করে রেখেছে।

দেড় শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডে অভিজাত-সাহিত্যের বাহুল্য দেখেই গ্রে, গোল্ডস্মিথ-প্রমুখ লেখকগণ সাহিত্যের এই ধারাটা উল্টে দিয়ে উপেক্ষিত পথে চল্‌তে সুরু করেছিলেন। তারই ফলে সাহিত্য গ্রের কাছ থেকে পেয়েছিল—Short and Simple annals of the poor; গোল্ডস্মিথের অমর লেখনী থেকে বেরিয়েছিল Deserted Village এর করুণ কাহিনী—বিলাসের নন্দনকানন মহানগরী লণ্ডনের নৈশ বিভীষিকায় গৃহহীন পথশায়িত অনাথ দরিদ্রের জন্য একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস। মহাত্মা টলষ্টয়ও সেই পথ নিয়েই দরিদ্রের সুখ-দুঃখের কথা বলে গেছেন। তবুও সাহিত্যের এ দিক্‌টা যে খুব ভাল করে ফুটে উঠেছে, তা' বলা যায় না। রাজা রাণী বা তেমনি বড় লোকের ঘটনাই লেখককে সাধারণতঃ আকৃষ্ট করে। তাই অভিজাত সাহিত্যের নীচে এখনও দরিদ্রের দিকটা বাস্তবিকই অনেকখানি চাপা পড়ে আছে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের কথা মনে হলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। অন্যান্য সাহিত্য তবু এই উপেক্ষিত দিকটা একটু নাড়া-চাড়া করে দেখেছে। বাংলা সাহিত্য এ সম্বন্ধে মূক বল্লেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎ বাবু পর্য্যন্ত, রবি বাবু হতে আধুনিক কবি সকলেই যেন এ-দিকটা বেশী দেখতে চান না। রবিবাবুর কয়টি কবিতা ও গল্প এবং শরৎ বাবুর শ্রীকান্ত প্রভৃতি দু'একখানি বইয়ে মধ্যে মধ্যে দরিদ্রের দু-একটি সুখ-দুঃখের কথা থাকলেও তা পর্য্যাপ্ত বলে মনে হয় না। সৌরীন্দ্র বাবু, জলধর বাবু, কালীপ্রসন্ন বাবু ও অন্যান্য ক'জন ঔপন্যাসিক যদিও চেষ্টা করছেন, তবুও এ-দিকটার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলবার আছে, মনে হয়। সৌরীন্দ্রবাবুর হারামণি, ফেল-জামিন গল্পগুলি এদিকে বেশ নিপুণ ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু আর কৈ? আরো চাই যে আমরা তাঁর কাছে। মণিলাল বাবুর ইদানীংকার গল্পগুলিতে বাংলার দরিদ্রের সুখ-দুঃখের কথা আছে। তাঁর 'দুঃখী' প্রভৃতি গল্পগুলি পড়ে খুবই আশা হয়েছিল, তিনি এ পথে চলবেন। কিন্তু তিনি লেখার পাট সম্প্রতি উঠিয়েই দিয়েছেন, দেখছি। ভারতীর এই দুই সম্পাদকের কাছে আমরা যে অনেক আশা রাখি। এই প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড লালবিহারী দের Bengal Peasant Life উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু মনে হয় বাংলার কৃষকের সকরুণ কাহিনী শক্তিমান্ লেখকের লেখনীমুখে বাংলাতেই ফুটত ভাল। আমাদের বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ লেখিকা যাঁরা, তাঁরা যেন ইচ্ছা করেই দরিদ্রের সুখ-দুঃখের কথাটাকে অবহেলা করে চলেন, এটা বাস্তবিকই বড় দুঃখের বিষয়। বড় ঘরের কথায়, তার সুখ-দুঃখে দেশের হাজার হাজার দরিদ্রের হৃদয়-তন্ত্রী যে সাড়া দেয় না, তা সকলেই স্বীকার করবেন। তাই যে-দেশের শতকরা নিরানব্বই জন ভাগ্যহীন, সেখানে যদি তাদের সুখ-দুঃখের কথা তাদেরি বলা হয়, তাহলে তাদের সম-অবস্থাপন্ন একজনের অবস্থার কথা মনে করেও তারা প্রাণে একটু শান্তি টেনে আন্‌তে পার্ব্বে, রাজা-রাজড়ার গল্প, কি প্রেমের কথা তাদের সে শান্তি একটুও দিতে পারবে না। রাজা-রাণীর গল্প, বড় ঘরের উপন্যাস সাহিত্য অনেক পেয়েছি, এখন কিছুদিন ওটা চাপা থাকলেও চলে। এখন আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ওই উপেক্ষিত দিক্‌টাকে আমাদের সাধ্যমত সাহিত্যের জমকালো আসরে একটু স্থান করে দেওয়া।

সে সুযোগটুকু আমাদের দেবার জন্যই জগতে আজ এমন বড় একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। তারই ফলে রাজা-রাণী যাবেন, বড় ঘর যাবে, থাকবে শুধু সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতা। যারা যাবে বা গেছে, তাদের জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। এই সুযোগে আমাদের উপেক্ষিত দিক্‌টাই হাতে তুলে নিয়ে সাহিত্যের মধ্যে দরিদ্রের সুখ-দুঃখের একটু স্থান করে দিতে হবে। রাজারাণী-বিহীন সাহিত্যে এটাই হবে আমাদের চরম লাভ।

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল।

## জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি?

চিকাগো ইউনিভার্‌সিটির জনৈক অধ্যাপক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। উহা লণ্ডনের "The Inquirer" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্ঞানের পরিমাণ:—জ্ঞানের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

(১) তুমি কি সত্যের ও ন্যায়ের জন্য হৃদয়ে প্রকৃতই আকুলতা অনুভব কর?

(২) তুমি কি দুর্ব্বলের ও পতিতের সহায় ও বন্ধু?

(৩) তুমি কি দশের হিতের জন্য ভাব ও কাজ কর ?

(৪) তুমি কি দশজনকে ভালবাসিতে পারিয়াছ ও সে বন্ধুতা কি স্থায়ী হইয়াছে ?

(৫) কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে তুমি কি উদারচিত্ত ও সুখী হইতে পারিয়াছ ?

এরূপ আরও প্রশ্ন আছে, কিন্তু ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদিতে তোমার বিদ্যা কত সে সম্বন্ধে একটী প্রশ্নও করা হয় নাই। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কেহ বিদ্বান্ হইয়াও প্রকৃত জ্ঞানী "truly educated" নাও হইতে পারে। অনেকেই ইহা ঠিক বোঝেন না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

## নারীর প্রতি অবিচার

শ্রীমতী তমাললতা বসু নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার অবহেলা বা অসম্ভব ঘৃণার প্রতিকার নাই বলিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন,তাহার উত্তর :—

১। যে সকল অভাব-অভিযোগ নারীজাতির মধ্যে আছে, তাহার প্রতিকার পুরুষ জাতির হস্তে কিরূপে, কোন্ হিসাবে, এই কথাতেই কি পুরুষ জাতিকে উচ্চ আসনে বসানো হইতেছে না ?

২। সৃষ্টিকর্ত্তা গড়িয়াছেন সকলকে। পুরুষকেও গড়িয়াছেন, সেই জন্যই কি তাহার স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইয়া দিতে হইবে ? স্ত্রী জাতির প্রতি দুর্ব্যবহার বা অবিচার যাহা হইয়াছে ও হয় বা হইতেছে, প্রায় তাহা সমস্তই স্ত্রীজাতির দ্বারা হয় না কি ? পুরুষ অনেক স্থলে কারণ মাত্র হয়। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ-হিসাবে ( দুই-চারিটা উদাহরণ ছাড়িয়া দিন ) নারীজাতি কোথায় কঠোর শাসনে নিষ্পেষিত হইতেছে ? যেখানে হয়, সেখানে স্ত্রীজাতির দ্বারাই পীড়িত হইতেছে ইহার সহস্র প্রমাণ আছে।

৩। স্বামী কোন কোন স্থলে স্ত্রীকে ত্যাগ করে বা প্রহার করিয়া থাকে, তাও তার মাতা ও ভগ্নীর কঠোর প্ররোচনায়, অতএব সমস্ত দোষটা তাহার হইতে পারে না।

৪। নারীর জীবন ব্যর্থ হয় নারীর নিজ-দোষে। সে যে নিজেকে উপযুক্ত করিতে জানে না এবং জানিবেও না, সে দোষ কি অন্যের ? .

৫। অনেক স্থলে অনেক সতী-সাধ্বী রমণী বিদ্যাবতী, রূপবতী, নানাগুণে গুণবতী হইলেও, অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া থাকেন, এবং সন্তান ও ঐ হতভাগ্য স্বামীর মুখ চাহিয়া তাঁরা সমস্ত সহ্য করেন, ইহাও দেখা যায়। খুব সম্ভব ঐ স্বামী মদ্যপায়ী—( যাহারা নেশার বশীভূত, তাহাদিগকে স্বাভাবিক মানবজাতির মধ্যে ধরা যায় না ) আর এরূপ দুর্গতি, ইউরোপিয়ান ও বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান—( যাহাদের স্ত্রীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন ) তাহাদিগের মধ্যেও আছে। তাহারা ত ইচ্ছা করিলে ঐ স্বামী

৬। অত্যাচারে বহু দুর্ভাগিনী প্রতি বৎসর দুর্লভ জীবন ত্যাগ করিতেছে। তাহাদের উপর অত্যাচার করে শাশুড়ী, ননদ ও স্বামী। কেবলমাত্র একা স্বামীর অত্যাচারেই কেহ মরে না।

৭। তার পর—সভা-সমিতি ও লেখাপড়ায় এ সকল দুঃখ দূর হয় না। এ সকল দুঃখ দূর হয় স্ত্রীজাতির অন্তরের হীনতা নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা দূর হইলে। এ কার্য্যে কে অগ্রসর হইবে ?

৮। গাড়ীতে যাইতে হইলে, দরজা জানলা বন্ধ আর কোথায় ? অবরোধ প্রথা, ( ভাল হউক অথবা মন্দ হউক ) কোথাও তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে রাস্তায় বাহির হইলে পুরুষরা এমন ভাবে তাকাইয়া থাকে, যাহাতে তাহাদিগের মনের কুৎসিততার পরিচয় পাওয়া যায়। সৌভাগ্য এই যে সকল-লোকগুলাই সমান নয়, সকলেই ভাল ও মন্দের মিশ্রন আছে। স্ত্রীলোকের বাহির হওয়ার নূতনত্ব ঘুচিয়া গেলে, তখন আর কেহ অমন করিয়া তাকাইবে না।

৯। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার—ইহা জগতের আদি নিয়ম, ( চির-প্রচলিত ) যদিও ভদ্রতার পরিচয় নয়,—( এবং ধর্ম্মের সূত্রে দুর্ব্বলের প্রতি দয়া করার বিপক্ষে ) তথাপি ইহা আদি কাল পর্য্যন্ত সকল জীবের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। সেই হিসাবে স্ত্রীজাতি একা কোথাও যাইতে সাহস করে না, এবং ক্ষমতা না হইলে কোথাও তার যাওয়া উচিতও নয়। এ কথা বাঙালী পুরুষের সম্বন্ধেও কি খাটে না ? সকল পুরুষ কি সমানে টক্কর দিয়া পথ চলিতে পারেন ? কাহারও গোরার ভয় আছে, কাহারো বা গুণ্ডার। তবে ?

১০। ভদ্র অভদ্র, চোর সাধু, দরিদ্র ও ধনবান্, সকল দেশেই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। তবে ভদ্রতা শিক্ষা করা ( আমাদিগের দেশে ) পুরুষ জাতির মাতার নিকট হইয়া থাকে—তাহা যে কি পরিমাণে হয়, তাহা নারী জাতিই বেশ জানেন।

১১। পুরুষ স্বভাবতই যদি কাহারও কোন উপকারে অগ্রসর হন্, তাহাতে তাঁহার মাতা ভগ্নী পত্নী যে বাধা প্রদান করিবেন, ইহা নিশ্চিত সত্য।

১২। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী—এ প্রবাদ-বচনসত্ত্বেও সেই স্ত্রীজাতির পরামর্শানুসারেই ( এ দেশে ) সকল সংসার চলিয়া থাকে। আর বিবাহ-ব্যাপারে যে নারী জাতির অখণ্ড প্রতাপ, সে বিষয় কি কাহারও জানিতে বাকি আছে ? গৃহিণী ও কন্যার অমনোনীত কন্যা আনিতে কোন্ পুরুষের সাহস আছে, আমি জানিতে চাই ? যদি বা কোন স্থানে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তথায় কন্যার আজন্ম যন্ত্রণা শাস্তি একেবারে নিশ্চিত। এমন কি কন্যাটির জীবনান্ত পর্য্যন্ত হয় ; কুটুম্বের সহিত চির-অশান্তি ; আর কন্যাটির সত্য-মিথ্যা সহস্র খুঁটিনাটি দোষের কথা আহারান্তে স্বামী-পুত্রের নিকট সবিস্তরে বর্ণনা করিয়া, তাহাদিগকে

অত্যন্ত হীনতা ও নীচতার পরিচয়। কাগজে লিখিলে তাহা অশুদ্ধ হয় কিন্তু ইহা একান্ত অপ্রিয় সত্য। সত্য কথা কহিলে তাহা দোষেরই হইয়া থাকে।

১৩। আমি আশ্চর্য্য হইতেছি যে পুরুষরা এই সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন কথা কহেন নাই! বোধ হয় তাঁহারা এ সকল প্রবন্ধ পাঠ করেন না অথবা অবলা কোমলার বিপক্ষে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করেন না—কিংবা তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না! যাহা হউক, আমি কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নারীর প্রতি অবিচার প্রবন্ধের উত্তর দিলাম।

আর একটা কথা, শ্রীমতী তমাললতা বসু নারীজাতির প্রতি অবিচার, অত্যাচার দেখিয়াছেন মাত্র—ইহার মূলে যে স্বয়ং নারী জাতিই পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছেন, তাহা দেখা তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই!

শ্রীতরলাবালা দেবী।

---

# দুই পর্ব্ব

সকালবেলায় বসে বসে বই পড়ছিলাম।

জানলার গরাদে টপ্‌কে প্রভাত-সূর্য্যের এক ঝলক আলো টেবিলে এসে পড়েছিল; আর থেকে থেকে আসছিল টবের মাটিতে জাওয়ানো গাছ থেকে সন্ত-ফোটা ফুলের গন্ধ। কিন্তু দামিনী-চমকের ক্ষণিকতার মত তাকে উপভোগ করার চেষ্টাও বড় ছিল না।

পাতার পর পাতা উল্টে চলেছি, কারণ পড়তে মন্দ লাগছিল না। কেমন করে ধন সঞ্চয় করা যায়; তার মূল সূত্রটাই বা কি; উপায়ই বা কি? যৌথ কারবার, কল-কারখানা ইত্যাদিতে কেমন করে দশের সাহায্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করা যায়, কেমন করে পথের ভিখারী লক্ষপতি হয়ে দাঁড়াল। একদিন যার গৃহের অভাবে অন্নের অপ্রাচুর্য্যে, পরিচ্ছদের স্বল্পতায় কষ্টের সীমা ছিল না, কেমন করে, কোন্ উপায়ে সে অর্থের মূল্যে সুখ-সম্পদ ক্রয় করলে। পড়তে পড়তে ভাবছিলাম—মোটরে চলা, লিফ্‌টে ওঠা, প্রাসাদে থাকা, যন্ত্রের সাহায্যে জীবনের গতিকে নিয়মিত করা, এতেই কি সুখ? মানি, সুখ অনুভব কর্‌বার জিনিষ; কিন্তু মনের উপর শরীরের প্রভাবও কম নয়, কাজেই material comforts অর্থাৎ দৈহিক সুখ বলতে যা বুঝি, তা প্রত্যক্ষে শরীরের উপভোগ্য হলেও পরোক্ষে সেটা মনেরই উপভোগের সামগ্রী···

এম্‌নি কত কি ভাবছি, হঠাৎ আমার চিন্তার সুরজাল ছিন্ন করে একটা কান্নার রেশ কাণে এসে পৌঁছুল···

চেয়ে দেখি, আমাদের পাশের বাড়ীর বাসিন্দাদের ছোট

ছেলের মা কলতলায় ভিজে কাপড়ে বসে—সাম্‌নে একরাশ ছাই-মাখা বাসন। কলতলার পাশে হাত-দুয়েক চওড়া একটুখানি রক। রকের উপর একপাশে একটা উনানে আগুন গন্‌গন্ করচে।

ছেলেটার কথায় কাণ না দিয়ে তার মা বল্লেন—বীণা, ও বীণা, চট্ করে ভাতের হাঁড়িটা চড়িয়ে দিয়ে যা'না মা, আঁচটা যে বয়ে গেল।

দেখি, মার আহ্বানে একটি বছর ন'-দশের মেয়ে কাপড়ের আঁচলটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে এসে ভাতের হাঁড়ি চড়াতে গেল।

ছেলেটা কাঁদতে লাগল, কিন্তু তার মা তাতে ভ্রুক্ষেপও না করে সেই বাসনগুলো ধুতে ধুতে আপন-মনে বক্‌তে লাগলেন—চৌবাচ্ছায় এখনও জল ধরা হলো না, আমারও নিজের চান সারা হলো না—ওদিকে আবার আটটা বাজে। কোন্‌দিক দিয়ে যে কি করি, ভেবে পাইনে······

তাঁর বকুনি থামবার আগেই যিনি সেখানে আবির্ভূত হলেন, তাঁকে দেখে ছেলের কান্না আর গৃহিণীর বকুনি উভয়ই যুগপৎ থেমে গেল। তিনি গৃহস্বামী-সুলভ গম্ভীর স্বরে বল্লেন—দাও চাবিটা, টাকা বার করে আনি, ঝী আসেনি,— বাজার করে আন্‌তে হবে ত। পারিও না ছাই, আজ আবার সকাল-সকাল বেরুতে হবে।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে আঁচল থেকে চাবির গোছাটা রকে ফেলে দিলেন। এতক্ষণে তাঁর ছেলের দিকে নজর পড়ল।

খোকা আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে তার বাপের পিছন-পিছন চল্ল।

ততক্ষণে গৃহিণী বাসন-মাজা শেষ করে কাকস্নান সেরে উনানের সাম্‌নে গিয়ে বসলেন। আর বীণা বলে সেই মেয়েটি একটা চুপড়ি নিয়ে কুটনো কুট্‌তে বসল।

গৃহস্বামী অল্প পরেই বাজার করে ফিরলেন। গৃহিণী হেঁসেল ছেড়ে আঁশ-বঁটী বার করে মাছ কুট্‌তে বসলেন।

একবার মিনিট কয়েকের জন্যে ঘুরে এসে,—সাড়ে আটটা বাজে, আর ত দেরী কর্ত্তে পারি না—বলে গৃহস্বামী স্নান কর্‌তে নামলেন।

তারপর চল্‌লো একপ্রস্থ তাড়া-হুড়োর ব্যাপার। সদ্য-কোটা ধোয়া মাছগুলো আধ-ভাজাভাজা করে খানিকটা বাটনা-গোলা জল কড়ায় ঢেলে গৃহিণী উনানে পাখা দিতে আরম্ভ করলেন। মেয়েটি কুটনোর খোসা ইত্যাদি ফেলে দিয়ে সেই জায়গাটা পরিষ্কার করে সেইখানে আসন পেতে দিলে।

ধোঁয়া-ওঠা ভাত আর সদ্য-নামানো গরম ঝোল দিয়ে গৃহকর্ত্তা অতি অদ্ভুতভাবে ভাতের গ্রাস গিলতে লাগলেন।

আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—আহা বেচারীরা, কিন্তু এঁদের এই জীবন-যাত্রা উপভোগ কর্‌ছিলাম মন্দ নয়। এমন সময় বেয়ারা খবর দিয়ে গেল, একটি বাবু এসেছেন। কাজেই তখনকার মত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে হল। জীবন-যাত্রার এ পর্ব্বটার শেষ পর্য্যন্ত দেখার ইচ্ছা থাকলেও তা হয়ে উঠল না।

২

ইচ্ছাটা কিন্তু ভূতের মত এম্‌নি ঘাড়ে চেপে বসেছিল যে, সারাদিনের কর্ত্তব্য-কাজের মাঝে খালি ঐ ইচ্ছাটিই জাগছিল, কখন্ কাজ সারা হবে, কখন্ বাড়ী যাব। সেই জানলার ধারে বসবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ কচ্ছিল।

শেষে সন্ধ্যায় বাড়ী এসে সেইখানে গিয়ে বসলাম, আর চোখদুটো সেই পাশের বাড়ীর দিকে চেয়ে রইল।

বীণার মা বলছিলেন - বীণা, মা, একটু কাণ রাখিস্, উনি এলে আলোটা ধরিস্। তিনি সেই রকটায় বসে রাঁধছিলেন। কাছেই একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছিল। তারি খানিক দূরে একটা মাঝারি হারিকেনের আলোয় বসে বীণা কি বুনছিল আর খোকা আধ-শোয়া আধ-বসা ভাবে একটা কি বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে বোধ হয় ছবি দেখছিল।

হঠাৎ বই বন্ধ করে খোকা জিজ্ঞাসা করলে—মা, বাবা কখন্ আসবে ?

—এই যে আসবার সময় হয়েছে। তুমি যেন তখন দুষ্টুমি করো না। খেতে পুড়ে আসছেন, তখন জ্বালাতন করলে তিনি রাগ করবেন। বুঝলে, লক্ষ্মী হয়ে থেকো—বলে খানিকটা আপন-মনে বল্লেন—সেই কোন্ সকালে মানুষ গেছে এখনও আসবার উদ্দেশ নেই! খেটে খেটে শরীর কালি হলো। তারপর আবার বীণাকে সতর্ক করে দিতে দিতে চকিতে উৎকর্ণ হয়ে বল্‌লেন—কে ?

—আমি গো—বলে সাড়া পৌঁছুতে না পৌঁছুতে পরিচিত পদশব্দ শুনেই বীণা আলো নিয়ে ছুটে গেল। খোকাও তার পিছন-পিছন চল্‌লো। খোকার মা হাতের খুন্তি ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বীণাকে সাম্‌নে রেখে খোকার হাত ধরে গৃহকর্ত্তা সিঁড়ির ধাপ কটা উঠে তাঁর ঘরে ঢুকে আগে জুতো খুলে তারপর কোটের পকেট থেকে গোটা দুই সুতোর গুলি বীণার হাতে দিলেন। খোকা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলবার আগেই তিনি পকেট থেকে একটা লাল রবারের বল বার করে দিয়ে বল্লেন—এই নাও, তোমার কিছু বলবার নেই।

খোকা আনন্দে কলরব করে উঠল। খোকার মা ইতিমধ্যে দরজার কাছে এসে উপস্থিত।—আর আমার কি ? বলে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

খোকার বাপ পকেট থেকে তাঁর মাইনের নোটগুলো বার করে খোকার মার হাতে দিলেন।

দুজনের সম্মিলিত দৃষ্টিতে কি-এক সুন্দর ভাব-ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল!...

মুহূর্ত্তে আমার সকাল-বেলাকার বইয়ে-পড়া সুখের ধারণাটাই বদলে গেল।

শ্রীরূপণি চৌধুরী।

# কৃষ্ণভাবিনী দাস

১৯০৪ সালে কৃষ্ণভাবিনীর সহিত আমার প্রথম দেখা হয়। সে সময় আমি দার্জ্জিলিংএ ছিলাম। Mallএর বাগানের কাছেই আমার বাড়ী ছিল। প্রায় প্রত্যহ Mallএ য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা একটী বঙ্গমহিলাকে দেখিতে পাইতাম। একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিতাম, কারণ ইংরাজী পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইলেও তাঁর মুখের ভাব কি নম্রতায় পূর্ণ ছিল! অমন নম্র মুখের ভাব সচরাচর চোখে পড়ে না। দুজনেই দুজনকে দেখিতাম, চাহিয়াও থাকিতাম, কিন্তু কখনো কথা কহিতে পারি নাই। একদিন Mallএর বাগানের কাছ দিয়া একটি Funeral যাইতেছিল, Boscolo হোটেলে এক মেমের একটি শিশু সন্তান মারা যায়, শুনিয়াছিলাম। সেই সময় আমি ও কৃষ্ণভাবিনী পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিলাম। তার পর যে যার গন্তব্য পথে যাই। পুনরায় যখন সেই শোকার্ত্তা জননী গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন Mallএর একটী দোকানের কাছে আমাদের দেখা হয়। ঘটনাক্রমে আমরা উভয়েই বেড়াইয়া সেই স্থানে আসিতেছিলাম। উভয়েই সেই শোকার্ত্ত জননীর সহিত কথা কহিতে অগ্রসর হই। সেই শোকের অশ্রুর সঙ্গে আমার কৃষ্ণভাবিনীর সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তার পর প্রায় প্রত্যহ নিয়মিত Mallএর বাগানে আমাদের দেখা হইত। সেই আমাদের আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত; কিন্তু তখনো তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাই নাই দার্জ্জিলিং হইতে আসার পর তাঁহার কথা বেশী মনেও হয় নাই। তবে মাসিক পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার লেখা দেখিতাম। তার কয়েক বৎসর পরে আমি বোলপুরে যাই।

একমাস বোলপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের মধ্যেই বাস করি। সেখানে একদিন শুনিলাম যে দু-হপ্তার মধ্যে কৃষ্ণভাবিনী দাসের স্বামী ও কন্যা পরলোক গমন করিয়াছেন। শুনিয়া মন ব্যথিত হইয়াছিল। তার কয়েক বৎসর বাদে শ্রীমতী সরলা দেবী ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য্য

সহকারিণী করেন। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল আরম্ভের পর ১৯১৪ সালে, কলিকাতায় আমার সহিত পুনরায় কৃষ্ণভাবিনীর সাক্ষাৎ। যদি পূর্ব্বে পত্রে জানা না থাকিত যে তিনি সেইদিন সেই সময় দেখা করিতে আসিবেন, তাহা হইলে আমি কোনমতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিতাম না। কোথায় সেই ইংরাজী পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা মহিলা, আর এ একেবার হিন্দু ঘরের বিধবার মত আসিয়া উপস্থিত! এখনো যেন চোখের সামনে তাঁহাকে দেখিতেছি! সেই দিন হইতে তাঁহার সহিত আমার যথার্থ পরিচয় হইল। তার পর তাঁর জীবনের সকল ঘটনার কথাই তিনি আমার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। সেই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হইত। যখনি কলিকাতায় গিয়াছি, ছুটিয়া আসিয়াছেন। ক্রমে কি গভীর ভালবাসাই জন্মিয়াছিল! তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন, আমাকে দেখিলেই তাঁর মৃতা কন্যাকে মনে পড়ে। হয় ত সেই কারণে অত গভীর স্নেহ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, জীবনে কখনো তাঁর সঙ্গ বেশী ভোগ করিতে পারি নাই।

একবার সেই ১৯১৪ সালে জুলাই মাসে তাঁর সঙ্গে দুই দিনের জন্য বোলপুর গিয়াছিলাম। পথে কি যত্ন! সেদিন যাত্রার পথে ট্রেণে উভয়ের জীবনের ঘটনা উভয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহাকে সেইদিন আমি বলিয়াছিলাম, "আপনার জীবন-কাহিনী আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখুন।" প্রথমে তিনি অস্বীকার করেন। পরে আমায় বলিয়াছিলেন যে, লিখিতেছি। একবার আমায় তাহা দেখাইয়াও ছিলেন।

আমরা সন্ধ্যার সময় বোলপুরে উপস্থিত হইলাম। যে দুই রাত্রি বোলপুরে ছিলাম, আমি শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর গৃহেই শয়ন করিয়াছিলাম। রাত্রে দুইজনে কত গল্প করিতাম! সেই দুই রাত্রে তিনি তাঁহার জীবনের



স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস
( প্রবাসীর সৌজন্যে )

আমি পৃথিবীতে অনেক বিদুষী মহিলা দেখিয়াছি, অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর মত স্বর্গীয় পবিত্র সরল মন অতি অল্প মহিলারই আমি দেখিয়াছি। পৃথিবীতে কোন মহিলাকে আমি এমন শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই। তিনি পূজার যোগ্যই ছিলেন। নিজে তিনি নিজের কোনও গুণই জানিতেন না, বা সে বিষয়ে তাঁর কোনও আকর্ষণও ছিল না! বড় হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। মাটিতে মিশিয়া মাটি হইয়া তিনি কাজ করিতেন। তাঁহার সেই শুভ্র বিধবার বেশ মনে কেমন একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগাইয়া দিত। সেই সুন্দর মুখে সর্ব্বদা কেমন এক পবিত্র আলো জাগিয়া থাকিত। সেই জ্যোতিপূর্ণ চক্ষে কি নম্রতার ভাব ছিল, অত বয়স

হইয়াছিল, কিন্তু একটু কোন প্রশংসার কথা বলিতে গেলেই লজ্জায় মুখ রাঙা হইয়া উঠিত। সকল সময়েই যেন সকলকে সঙ্কোচ! কতবার তাঁহাকে মর্ম্ম-বেদনায় নীরবে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়াছি। কত অন্যায়ভাবে লোকে তাঁকে কত কথা শুনাইয়াছে। কখনো একটা কথার উত্তর দিতে দেখি নাই। আমি তাঁকে কতবার এজন্য কত কথা বলিয়াছি, এমন কি ধম্‌কাইয়াছি, "কেন আপনি এত সহ্য করেন?" ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের মিটিংএ মাঝে মাঝে তাঁকে কত কথাই শুনিতে হইত। তিনি কতবার চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিয়াছেন। তবু কখনো তাঁর দোষ নাই, এ সরল সত্য কথাটুকু বলিয়াও প্রতিবাদ করেন নাই। নীরবে কত কাজই করিয়াছেন, সে কাজের কি হিসাব আছে! তিনি নিগৃহীতা মেয়েদের উদ্ধার করিতে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, সেজন্য তাঁহাকে পুলিস-কোর্টেও যাইতে হইয়াছে। আমি কতবার মানা করিয়াছি, কিন্তু তাঁর একাগ্রতা দেখিলে বাধা দেওয়া কঠিন হইত। সেই সব মেয়েদের লইয়া ভবানীপুরে যে বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে দুবার সেখানেও গিয়াছিলাম। কোথায় অনাথ আশ্রম, কোথায় নিবেদিতার স্কুল, কোথায় কার বাড়ী, সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছি। তাঁর সঙ্গে ঘুরিতে কি ভালই লাগিত! মনে হইত, কত শিখিবার আছে। অনেক সৌভাগ্যে তাঁর মত বন্ধু লাভ করিয়া ছিলাম, কিন্তু বেশী দিন তাঁর সঙ্গ পাই নাই।

তাঁর 'জীবনের দৃশ্যমালা' যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানিবেন, সেই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁর জীবনী কিরূপ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তিনি শৈশবেই বিবাহিতা হন, ও সেই সময় হইতে স্বামীর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় প্রণয়ে তাঁর হৃদয় বিকসিত হয়। উপযুক্ত স্বামীর হাতে পড়িলে স্ত্রীর জীবনের কিরূপ বিকাশ হয়, তাহা আমার বিশেষভাবে জানা আছে বলিয়াই শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর হৃদয়ের সহিত আমার যেমন গভীরভাবে পরিচয় হইয়াছিল, তেমন খুব কম লোকেরই হইতে পারে।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর জন্ম অনুমান ১৮৬৪ সালে। তিনি বহরমপুরের অন্তর্গত 'কাজলা' গ্রামে কোনও জমীদারের গৃহে জন্মিয়াছিলেন। দশ বৎসর বয়সে কলিকাতার বৌবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাসের পুত্র স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার বিবাহের দুই বৎসর বাদে দেবেন্দ্রনাথ বিলাত গমন করেন। তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ছয় বৎসর বাদে তাঁহার স্বামী যখন বিলাত হইতে প্রত্যাগত হন, তখন তাঁহার শ্বশুর-মহাশয়, তাঁহার জননী সকলেই সেই ইংলণ্ড-প্রত্যাগতকে সমাজে লইতে চাহিলেন না, এবং কৃষ্ণভাবিনীকে স্বামী ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন; বলিলেন, তবুও তিনি যদি স্বামীর সহিত যান, তাহা হইলে সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। তখন তাঁহার শিশু কন্যার বয়স পাঁচ বৎসরের একটু উপর হইয়াছিল। সমাজের ও নিষ্ঠুর আত্মীয়দিগের কঠিন শাসনে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সতীর ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইলেন।

যখন তিনি স্বামীর সহিত গমন করিলেন, তখন শিশু কন্যাকে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট রাখিয়া গেলেন। কারণ তিনি স্বামীর সহিত ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অর্থাভাবে কন্যাকে সঙ্গে লইতে পারিলেন না। যখন পুনরায় দুই মাস পরে তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডে যাইবার সময় তাঁহাকে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন, তখন মায়ের নিষেধ, শ্বশুর-মহাশয়ের আদেশ, কন্যার স্নেহ কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি এ সকল ত্যাগ করিয়া গেলেন! কিন্তু তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। তখন ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাঙ্গালীদের সমাজে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই ইংলণ্ড-প্রত্যাগত পুত্রকে পিতা পরিত্যাগ করিলেন; অর্থসাহায্যেও বঞ্চিত করিলেন। সেজন্য কৃষ্ণভাবিনী শিশু কন্যার মঙ্গলের জন্য তাহাকে শ্বশুর মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সেই কন্যার স্নেহ-বন্ধনে উভয় পক্ষের মঙ্গলই হইবে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও কন্যাটিকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। যখন পতিপ্রাণা সতী স্বামীর সহিত চলিলেন, তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া বলিল, ( জীবনের দৃশ্যমালা )

"যাই যদি সব ত্যজি স্বামীর সদনে,
তাহলে ছাড়িতে হবে আত্মীয়-স্বজনে।

হায়রে নিষ্ঠুর নর এমন আচারে
কেমনে সৃজিলি তুই ভারত-মাঝারে ;
আজ যে প্রভাবে তোর ভাঙ্গিছে আমার প্রাণ
কবে তোর তেজ হবে এ দেশেতে অবসান ?”

তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আর সমাজের সে কঠিন শাসন নাই! এখন ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাঙ্গালীকে সমাজ সকল শ্রেণীতেই স্থান দিতেছে। অর্থের দ্বারা এখন সকলই সম্ভব হইয়াছে।

বিদায়-গ্রহণের সময় তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া দেখেন, তাঁর জননীকে ভাই-বোনে সান্ত্বনা দিতেছে। কন্যাকে আদর করিয়া অন্যে কোলে লইতেছে। দূরে স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিতেছেন, স্ত্রী কি করেন! কৃষ্ণভাবিনীর হৃদয় ফাটিয়া গেল, তবু কর্ত্তব্যে অটল হইয়া বলিলেন, ( জীবনের দৃশ্যমালা )

“দাঁড়াও ক্ষণেক নাথ,
করি শেষ প্রণিপাত,
মাতার চরণে মম, কন্যারে চুম্বন,
বেঁধেছি হৃদয় দেখ, কেটেছি বন্ধন।
ফিরিব তোমার সনে,
যথা যাবে মাঠে বনে,
স্বজন সমাজ তোমা ত্যজিল বলিয়া
ভেবো না ভার্য্যার প্রেম এ জগতে মায়া।”

তারপর সেই স্বদেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালীর কুলবধূ, ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ নারী বিদেশে স্বামীর সহিত যাইবার পথে সমুদ্র দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কার্য্যের বাসনায় মন পূর্ণ হইল। সেই স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা দেখিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল।

ইংলণ্ডে গিয়াও তিনি নিজের সাধ্যমত স্বামীর সকল বাসনা পূর্ণ করিতে যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার চাল-চলন, রীতি-নীতি, মনের আদর্শ, ভাব, পুরাকালের সাধ্বী সতী নারীর মতই ছিল। তাঁর জীবনের কামনাও ছিল তাই।

সে সাধ তাঁর পূর্ণ হইয়াছে। সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী স্বামীর জন্য জগতের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল ইংলণ্ডে যখন ছিলেন, তখন অশেষ পরীক্ষার মধ্য পক্ষে বিদেশীয় আচার, ব্যবহার, ভাষা, রীতি, নীতি শিক্ষা কতদূর কঠিন হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেই সময় আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদে কন্যার বিরহে তিনি বলিয়াছেন :—

“কেন না করিলে পিতঃ পাষাণ হৃদয়
অবস্থা যেমন,
কেন এ মায়ের হৃদে করিয়াছ দান
স্নেহ প্রস্রবণ ?”

বিলাতের শত চাকচিক্যময় বাহিরের দৃশ্যে কিন্তু তাঁর মন ভোলে নাই, বঙ্গের জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে ; তিনি তাই নিজের ভাষায় বলিয়াছেন

“কে বলে বিলাতে এসে মন ভুলে যায় ?
বঙ্গ প্রাণ মুগ্ধ হয় মোহিনী মায়ায়!
মন যদি ভুলে যায়,
তবে কেন এ হৃদয়
হয়েছে ব্যাকুল মা তোমার তরে
দেখিতে সে জন্মভূমি বহুদিন পরে।”

তবু তিনি নীরবে সকলি সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা তিনি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার নবম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় নবম বর্ষে গৌরীদানের ফল লাভ করিয়া এক ধনী-গৃহে কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। পাত্র সুরূপ, কিন্তু সুপাত্র নহেন। সেই সংবাদ বজ্রাঘাতের মত তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। সে দুঃখ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর যায় নাই, সে কথা একদিনও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি ক্রমাগত বলিতেন, কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য তিনি পালন করেন নাই বলিয়াই জীবনে এত পরীক্ষা এত কষ্ট সহিয়াছেন। সেই সংবাদ পাইয়া লেখেন –

“সহসা বিদেশে আজ কি শুনিনু হায়
ভাবিতে যে সংবাদ প্রাণ ফেটে যায়।
সংসার-তুফান হতে বাঁচাবার আশে,
রেখেছিনু কন্যা মোর পিতার সকাশে।
হায় সে প্রাচীন পিতা, অবহেলি ভাল কথা,
ভাসায়েছেন সে তনয়া অপাত্র-সাগরে,—
এ হেন বারতা কি গো সত্য হতে পারে ?”

তাহা হইলে মেয়েকে জলে ভাসাইয়া দিতেন, এ কষ্টের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেন। মেয়ের প্রাণের ব্যথায় তাঁর মর্ম্মস্থল পুড়িয়া গিয়াছিল, তাই তিনি অমন করিয়া অন্তঃপুর-শিক্ষার কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। সে কাজে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। পরের মেয়েদের যাতনায় তাঁর প্রাণ যে কি অধীর হইত, আমি তা দেখিয়াছি, আমি তা জানি, তাই আজ তাঁর কথা এমন করিয়া লিখিতে পারিলাম। তিনি সকল বেদনাই নীরবে সহ্য করিতেন। সমুদ্রের গভীর জলের মত তাঁর মন স্থির ছিল, তাঁর গভীর বেদনা ভাষায় ফুটিত না। এই সহিষ্ণুতা-গুণ তাঁর জীবনে কি বেশীই ছিল!

ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে তাঁহার জীবনের উপর দিয়া অনেক পরীক্ষাই গিয়াছে। অবশেষে সেই বিদেশে স্বামীর কঠিন পীড়ার সময় তিনি কাতর হইয়া বলিলেন,

"নাহি পিতা লোক-বল, নাহি বেশী অর্থ-সম্বল
একা আমি সাহস বা কত ?
কর পিতা দয়াদান, বাঁচাব তাঁহার প্রাণ
চলে যাই স্বদেশে আবার।"

ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন; ১৮৯০ সালে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

সেখানকার শিল্প, স্বাধীন তনয় ও তনয়া সব দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেও তাঁর মনের অভাব ঘোচে নাই!

স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্বদেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। স্বদেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁর প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল, তিনি তাই বলিয়াছেন,

"যদি প্রাণ দিয়া ওই দুঃখরাশি,
এক বিন্দু মাগো ঘচাতে পারি।
করিব তা আমি সুখে-দুঃখে ভাসি
ব্যঙ্গ-উপহাসে ভয় না করি।"

দেশে আসিয়া যদিও দূরে থাকিতেন, তবু জননীর স্নেহ ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু কন্যার সঙ্গে আর সম্বন্ধ রহিল না। কন্যাকে তাঁহার নিকট কেহ পাঠাইল না। দূর হইতে একবার দেখিতে চাহিলেও, কন্যার শ্বশুর বা জামাতা কেহ তাঁহাকে দেখিতে দিল না।

এই অপমানে তাঁর জীবন জ্বলিয়া গিয়াছিল। শুধু কি তাঁরই এই যাতনা! কত ঘরে এই প্রকারে নিষ্ঠুরতায় দাহনে কত শত মায়ের প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে, তার ঠিকানা কোথায়? ধরিয়া বাঁধিয়া নিষ্ঠুর দেশাচারের নামে জাতি বাঁচাইবার জন্য বিবাহ দিয়া কত স্থানে কত কুফল ফলিতেছে, তাহার হিসাব কোথায়?

তিনি স্বামীর প্রণয়ে স্বর্গ-সুখে সুখী হইলেও, আর পুত্র-কন্যা না হওয়ায় মনের দুঃখে ছিলেন। সকল সময়েই তাঁহার মনে হইত যে, তিনি কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন নাই বলিয়া, অন্য সন্তান হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাই লিখিয়াছেন—

"আমি ত স্নেহের ভরে পরশিতে বুকে ধরে
শীতল করিতে চাই হৃদয় আমার।
জীবন ঘটনা বলে, তাহাতেও বাধা পড়ে
শোভিবে না কভু এ শূন্য সংসার?
সংসারের অভিজ্ঞতা বুঝিবার আগে পিতা
রাখিয়াছিলাম দূরে সন্তান আমার,
সে পাপের প্রতিফল এই কি উচিত ফল
দিতেছ জীবনে মম করুণা-আধার!"

সেই একমাত্র কন্যা যদি সুখী হইত তাহা হইলে মাতৃবক্ষে এরূপ শেল বিঁধিত না। কন্যা জন্মদুঃখিনী হইল। ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্রবধূ হইয়াও কন্যা চিরদিন স্বামীর প্রণয়ে বঞ্চিতা ছিল। কন্যাও চিরকাল পিতার ভালবাসা কিরূপ জানিত না। যখন মিঃ দাস বিলাতে ছিলেন তখন কন্যার জন্ম হয়, কন্যার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি দেশে প্রত্যাগত হন। তাহার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে, পিতা মাতা দুইজনেই ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেল। যখন ফিরিয়া আসেন, সে তখন বিবাহিতা, মাতা গিয়াও দর্শন পান নাই।

তারপর তিনি ও মিঃ দাস যখন সেণ্ট্রাল কলেজ স্থাপন করেন, তখন সেই ছেলেদের দেখিয়া তাঁহার মনে হইত যে কি পাপে তাঁর এই দশা হইল, তাঁর গৃহ কলরব-শূন্য হইল! শিশুহীন ঘরের শূন্যতায় প্রাণে ওই কথাই জাগিয়া উঠিত। শিশুহীন গৃহ বড় নিরানন্দময়, বড় জীবনশূন্য মনে হয়।

তার পরে পরে তিনি অনেকগুলি শোকের আঘাতে কাতর হইয়াছেন। মাতৃশোক, ভ্রাতৃশোক আর নানা আত্মীয়-বিয়োগে হৃদয়ে অনেক আঘাত পাইয়াছেন; স্বামীর মুখ চাহিয়া কিন্তু সব সহিয়াছিলেন।

স্বামীর অসুখের সময় তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। সকল কাজ নিজের হাতে করিয়া পথ্য রাঁধিয়া যে প্রকারে পারিয়াছেন, নিজে সব করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই স্বামীকে বাঁচাইতে পারিলেন না। তাঁর মত সতী সাধ্বীর এই যে যন্ত্রণা, ইহা বড়ই হৃদয়ভেদী! স্বামার সঙ্গে সঙ্গে সকল সুখ-সাধ তিনি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। স্বামী-কন্যাকে একসঙ্গে হারাইয়া কি যন্ত্রণাই পাইয়াছেন! তিনি বলিয়াছিলেন, একবারও ভাবি নাই যে আবার উঠিতে পারিব। কন্যা শ্বশুরালয়ে নানা প্রকারে নিগৃহীতা হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন, আসিয়াও তিনি জুড়াইতে পারিলেন না। মরণ আসিয়া তাঁহার সকল দুঃখ দুর করিয়া সেই অমৃতধামে লইয়া গেল। স্বামীর উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন—

"জীবনের সর্ব্বসুখ সংসারের সার
দিবা-রাতি পূর্ণরূপে হৃদয়ে আমার
রয়েছ জীবিত তুমি—আগেতে যেমন
পূজেছি তোমায় নাথ! ভরিয়া জীবন
তোমারি স্মৃতির ধ্যান করিব এখন।

বিধবা হইয়া তিনি সকল প্রকার আরাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শয়ন-কক্ষে তাঁর খাটে কখনো শয়ন করেন নাই, ভূমিতলে শয্যা পাতিয়া শুইতেন। কখনো ভালো দ্রব্য বা ভালো ফল ও মিষ্টান্ন খান নাই; সব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কতবার বলিয়াছি, এরূপে শরীর থাকিবে কেন? মৃত্যুর বৎসর দুই পূর্ব্ব হইতে তাঁহার মাথা ঘুরিত, কতবার একটু মাখন মিছরী, একটু ডাবের জল খাইতে বলিয়াছি, তিনি হাসিতেন।

ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের জন্য তিনি কি অশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কত দীন-দুঃখী বিধবার অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকল বাটীতেই তাঁর অবারিত দ্বার, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের জন্য যখন শ্রীমতী সরলা দেবী 'সাত ভাই চম্পার' অভিনয় করান, তখন তাঁহাকে সেজন্য কি রকম খাটিতেই হইয়াছিল। অথচ কখনো কোথাও বাহবা লইবার জন্য তাঁহাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখি নাই, সকলের পিছনে লুকাইয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। যেখানে একটু কঠিন হইতে হইবে, সেখানেই আমার নিকট আসিয়া বলিতেন, 'আমার সঙ্গে চলুন'। চারিদিকে কাজ করিয়া ক্লান্ত হইয়া মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিতেন, এক পেয়ালা চা আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম, কি তৃপ্তি কি আনন্দেই তাহা পান করিতেন। বলিতেন, সব ছাড়িয়াছি, এইটি পারি নাই।

আমার সহিত শেষ-দেখা তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে। জুলাই মাসে আমি পৃষ্ঠে Curbuncle লইয়া ডাঃ মিত্রের বাড়ীতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শয্যাগত ছিলাম, সেই সময় দুইদিন আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন। তখন কি জানিতাম যে সেই শেষ দেখা! তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯১৯ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে।

তিনি এত লেখাপড়া জানিতেন, কেহ তাহা বুঝিতেও পারিত না। আট বৎসর একাদিক্রমে বিলাতে ছিলেন, তবু তাঁর কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই। ভাসুর ও বড় যা'কে যথেষ্ট মানিয়া চলিতেন। কি সেবাই করিতেন! সেবা যেন তাঁর জীবনের প্রধান কাজ ছিল। কত কাজই তিনি করিতেন, কখনো ক্লান্তি বোধ করিতেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অল্পাহারেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বাঙলার এ দুর্দ্দিনে কৃষ্ণভাবিনীর মত একজন সেবা-পরায়ণা কর্ম্মশীলা নারীকে হারাইয়া আমরা যে কতখানি হীনবল হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

# আমাদের 'অ্যাডভেঞ্চার'

ক

সাম্‌নেই সাজানো ফুলবাগান,—তার ওপরে বাঁকা-শশীর তিলক-পরা রজনীর খানিক কালো খানিক আলো মাখানো রয়েছে। বাড়ীর চাতালে মাদুর পেতে আমরা সবাই শুয়ে-হেলে-ব'সে, মাঝে মাঝে যা-খুসি-তাই গল্প বা মাদল বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের মুণ্ডচর্ব্বণ করছিলুম—দুনিয়ায় যে কলকাতা ব'লে আবার একটা সহর আছে, সে কথা একেবারেই ভুলে!

আমাদের দলে ছিলেন কবি শ্রীগি—, সুলেখক শ্রীপ্রে—, কবি শ্রীন—, চিত্রকর শ্রীচা—, পুস্তক-প্রকাশক ও কালে-ভদ্রে সাহিত্যিক শ্রীসু— ও (বলা বাহুল্য) আমি। তা ছাড়া ছিলেন আরো দুইজন উদীয়মানা লেখিকা। পূজোর ছুটিতে আমরা কয়টি সুখের কপোত কার্মাটারে এসে একত্তরে বাসা বেঁধেছিলুম এবং এক্ষেত্রে ব্রততী-বেষ্টিত বনস্পতিরূপে আমাদের সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন শ্রীমতী ত— ও কবি শ্রীগি—।

হঠাৎ শ্রীপ্রে—ব'লে উঠলেন, "দুর ঘোড়ার ডিম! এ-রকম ক'রে আর তো ভালো লাগ্‌চে না—ঠিক কলকাতার মত সবই কেমন একঘেয়ে! অ্যাড্‌ভেঞ্চার নেই, কিছু নেই—খালি গল্প আর গল্প,—ধেৎ!"

আমরা মহা সমস্যায় প'ড়ে গেলুম। কারণ সকলেই জানেন, বাঙালী-জীবনে নিতান্ত ছোটখাট গোছের 'অ্যাডভেঞ্চারের' সুযোগ হওয়াও কতখানি শক্ত কথা! আমাদের বন্দুকের 'পাস' নেই যে, শিকারে যাব;—গায়ে জোর নেই যে, ডাকাতি করব; প্রাণে সাহস নেই যে, সাহেবের সঙ্গে হোটেলে ব'সে খানা খাব (সাহেবের সঙ্গে খানা খাওয়াও বাঙালী-জীবনে একটা মস্ত-বড় 'অ্যাডভেঞ্চার')! কাজেই 'অ্যাডভেঞ্চারে'র প্রস্তাবে আমাদের একটু সমস্যায় পড়বারই কথা।

একজন বল্‌লেন, "চল, কাল বনভোজনে যাওয়া যাক্‌।"

এ প্রস্তাবে কারুর অমত হোলো না। কিন্তু কোথায়

কাল ঝাঁঝার পাহাড়ে গিয়ে সকলে মিলে বনভোজন করা যাবে। এবং এই ব্যাপারটার ওপরে একটুখানি 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র রং ফলাবার জন্যে আরো ঠিক্ করা হোলো যে, আজ রাত একটার ট্রেণেই ঝাঁঝায় যাত্রা করতে হবে। ঝাঁঝায় ট্রেণ পৌঁছবে রাত সাড়ে-তিনটের সময়ে। তারপর বিদেশে, বিনা-আশ্রয়ে, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাতে প্রভাতের অপেক্ষায় 'হা-পিত্যেশ' ক'রে ব'সে থাকা—এটা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' নয় তো কি?

কিন্তু শেষ-প্রস্তাবে আমার মনটা তেমন খুসি হোলো না। আমি সবে কল্‌কাতার রোগশয্যা ছেড়ে এখানে এসেছি—দেহে এখনো রোগের চিহ্ন বর্ত্তমান। কালকের দুপুরে-মাতনের ওপরে আবার সারারাত জাগরণের কথা শুনে আমার ভয় হবারই কথা। কিন্তু বন্ধুদের স্বাস্থ্যসবল ফুসফুসের জোরে আমার ক্ষীণ প্রতিবাদ অল্পক্ষণেই পলাতক হ'তে বাধ্য হোলো।

আমি ছাড়া আমাদের দলে আর একজনও বড়ই দমে গেল—সে হচ্ছে সু। একে তো ভগবানের অবিচারে সে গজ-কচ্ছপ-জাতীয় একটি দেহের অধিকারী হয়েছে—সে দেহে পান-ভোজন করা যেমন সহজ, নড়ন-চড়ন তেমনি অসম্ভব! সু'র দেহের কোমর থেকে গলা পর্য্যন্ত অংশটা ছিল অবিকল উদরাকৃতির! তার ওপরে সু'র ঘুমিয়ে পড়্‌বার ক্ষমতা ছিল এমনি অসাধারণ যে, শুন্‌লে আপনারা হয়ত তা বিশ্বাস করতেই রাজি হবেন না। সু'র মতন নিদ্রাদেবীর অকৃত্রিম ভক্ত সাধক এই চিরঘুমন্ত বাঙালী জাতির মধ্যেও আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। কাজেই রাত জেগে 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র নামে সু'র সদানিদ্রাকাতর চক্ষু যার-পর-নাই হতাশ হয়ে পড়্‌ল। কিন্তু নান্যঃ পন্থা—'পড়েচি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!"

খ

রাত একটার সময়ে ট্রেণে উঠ্‌লুম। সকলের আগেই সু তাড়াতাড়ি একখানা বেঞ্চের উপরে গিয়ে ধপাস্ ক'রে

পোঁ বাজ্‌বার আগেই তার নাকের বাঁশী নিশ্চিন্ত পুলকে বেজে উঠ্‌ল।

যথাসময়ে—অর্থাৎ রাত সাড়ে তিনটেয় ট্রেণ গিয়ে ঝাঁঝায় থাম্‌ল। আমরাও সবাই একে একে নেমে পড়্‌লুম। আগে সঙ্গের বান্ধবী দুটিকে নিয়ে গিয়ে চা-পান করবার ঘরে বসিয়ে একপাত্র চা খেয়ে বেরিয়ে এসে দেখি, সু ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। একবার তার নাম ধ'রে ডাক্‌লুম। সাড়া পেলুম না। ভাবলুম, এই অভিযানের জন্যে আমাদের ওপরে সে অভিমান করেচে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি, অভিমান-টভিমান কিছু নয়,—মাথাটা কাঁধের একদিকে কাৎ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অকাতরে সে ঘুমিয়ে পড়েচে। আমি তো অবাক! তাড়াতাড়ি আর সবাইকে ডেকে দ্বিপদের এই চতুষ্পদ-সুলভ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখালুম। সকলের হাসির আওয়াজে সু'র ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে নিজের মনেই সে ব'লে উঠ্‌ল—"বাপ্‌ রে, পয়সা খরচ ক'রে কি কষ্ট!"—কেবলমাত্র এই কয়টি কথা ব'লেই, আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপকে একটুও আমোল না দিয়েই সে ভুঁড় দুলিয়ে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে একখানা বেঞ্চির ওপরে গিয়ে বস্‌ল এবং বস্‌তে না বস্‌তেই আবার নিদ্রাহত হয়ে হেলে পড়্‌ল। খানিক পরে আমরা সকলে "অপেক্ষা-গৃহে" গিয়ে আশ্রয় নিলুম। বলা বাহুল্য, এখানেও আগেই একখানা ইজি-চেয়ার দখল ক'রে সু সর্ব্বাগ্রে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর কোথাও ঠাঁই না পেয়ে সু'র দেহের উপরেই অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় শেষ রাতটা কর্ত্তন ক'রে ফেল্‌লুম। আমার দেহের চাপে তার অসুবিধা হ'লেও নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হোলো না। সে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বারবার অস্ফুট স্বরে এই কথাগুলি মাত্র ব'লেছিল—"উঃ, বড্ড লাগ্‌চে! উঃ, বড্ড লাগ্‌চে!"

গ

ভোরের হাওয়ায় রাতের মুখ থেকে অন্ধকারের নিবিড় ঘোমটা যখন খসে পড়্‌ল, সাম্‌নেই দেখ্‌লুম পাহাড়ের পর পাহাড়ের সবুজ পাঁচিল চোখের গতিকে বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে

তারি পাশ দিয়ে মাল-পত্তর ঘাড়ে ক'রে আমরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হলুম। প্রায় মিনিট-দশেক চ'লে পাহাড়ের কোলের ভিতরে আমরা যে জায়গাটি নির্ব্বাচন করলুম, তা যেমন নির্জ্জন তেমনি মনোরম। চারিদিকেই ছোট-বড় সারি সারি পাহাড়,—তাদের আগাগোড়া সবুজ চাদরে মোড়া। একদিক দিয়ে সাদা বালির বিছানায় ছোট্ট একটি নদীর ঝর্‌-ঝরে জল লুটোপুটি খেয়ে পরম কৌতুকে চলে যাচ্ছে,—তারই উপল-সঙ্কুল তটে দুটি গাছের তলায় আমরা শয্যা পেতে বসে পড়্‌লুম।

খানিক পরে বন্ধু আর বান্ধবীরা হাট থেকে দরকারী তরি-তরকারি কেনবার জন্যে চ'লে গেলেন। আমার রুগ্ন শরীর তখন অনিদ্রা আর পরিশ্রমে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল—কারণ সব-চেয়ে বেশী মাল বইতে হয়েছিল আমাকে, তাই আমি আর বন্ধুদের সঙ্গী হলুম না। সু হাটে যাবার নাম শুনেই "ওঃ, কাল সারা রাত ঘুম হয় নি" ব'লে হাই তুলে শুয়ে পড়ল এবং বেশ একটি নূতন নিদ্রা দেবার বন্দোবস্ত করতে লাগল।

ইতিমধ্যে পাশের একটি ঝোপেই দুটি স্ত্রীলোকের একরাশ মাথার চুল ও দু-গাছা মোটা দড়ি আবিষ্কার করা গেল। হয় তারা সেখানে আত্মহত্যা করেচে, নয় কেউ তাদের হত্যা করেচে—অন্ততঃ আমাদের তাইই মনে হোলো।

সু'ও শুয়ে শুয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সব শুনলে। আমি বল্‌লুম, "যাও না, উঠে গিয়ে ব্যাপারটা একবার দেখে এস না।" "পাগল!" ব'লে সু ওপাশ ফিরে শু'ল।

আমি বল্‌লুম—"সু, আমি এখন বনের ভেতরে বেড়াতে যাব!"

আসন্ন নিদ্রার জড়তাকে জোর ক'রে তাড়িয়ে, ধড়্‌মড়িয়ে উঠে ব'সে সু বল্‌লে, "অ্যাঁ, বলেন কি?"

আমি বল্‌লুম, "এখানে অনেক মাল-পত্তর রয়েচে—তুমি ওগুলো আগ্‌লে থেকো।"

সু পাশের ঝোপের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বল্‌লে, "আপনি চ'লে যাবেন, আর আমি একলা থাকব?"

সু তাড়াতাড়ি জামা আর চাদরখানা কাঁধে ফেল্‌লে, তারপর কোনরকমে কাছা-কোঁচা গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে ও হাঁস-ফাস্ করতে করতে প্রায় দৌড় মারলে।

আমি বল্‌লুম, "যাও কোথায়?"

সু বল্‌লে, "ওদের সঙ্গে হাটে।"

আমি চাদরের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার সঙ্গে আর দুটি বালক বা তরুণ যুবক ছিল, তারাও শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

ঘ

চমৎকার!... ... ...তখনো রোদ ওঠে নি, উষা তখনো নরম আলোর পিচকারি নিয়ে আকাশের হাল্‌কা মেঘগুলিকে রঙিন্ ক'রে তুলছিল, আর তাই দেখেই যেন বনস্পতির অন্তঃপুরে ব'সে ভোরের পাখীরা সব খুসি হয়ে কলস্বরে কাজ্‌রী-গানের সুমধুর পালা সুরু ক'রে দিলে। সেই বিজন উপত্যকার বিপুল শ্যামলোৎসবের মধ্যে রূপপিয়াসী নয়ন-মন ডুবিয়ে, আমি যেন লাবণ্য-সায়রের কোন্ অতলে তলিয়ে গেলুম।

আমি যে সহুরে মানুষের একটি জীর্ণ-শীর্ণ ও জামা-কাপড়-চশমা-পরা ক্ষুদ্র সংস্করণ, সে স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্যে মনের ভেতর থেকে মিলিয়ে গেল। উপরে আমার বিচিত্র রঙিন গগন, মাথায় আমার ঘনশ্যাম তরু-ছত্র, সর্ব্বাঙ্গে আমার পেলব তৃণের পুলক-স্পর্শ এবং সাম্‌নে আমার শৃঙ্খলিত শৈলমালার কঠোর বুক ঢেকে তরুণ সবুজের হিন্দোলা! সুন্দর! মনে হোলো, আমি যেন সেই সৃষ্টি-প্রভাতের আদিম শিশু, প্রকৃতি-মাতার কোলে শুয়ে অপূর্ব্ব বিস্ময়ে তাঁর প্রশান্ত মুখের পানে চুপ ক'রে তাকিয়ে আছি!

কবি-অকবি সব মানুষই প্রকৃতিকে স্নেহময়ী জননীর মতই ভালোবাসে,—তবে কেউ জ্ঞাতসারে, আর কেউ বা অজ্ঞাতসারে। তাই কল-কারখানা-সহর বসিয়ে যে প্রকৃতির মুখ আমরা ধুলো আর ধোঁয়ায় কালো ক'রে দি, রোগে-শোকে-দুঃখে সেই প্রকৃতির কোলেই আবার পালিয়ে এসে সান্ত্বনা ও শক্তি লাভ করি। তাই তো সংসারের কাজের ফাঁকে ছুটি পেলেই আমরা বায়ু-প্রকৃতির উন্মুক্ত বক্ষই আমাদের স্বদেশ এবং সহরেই আমরা প্রবাসী।

বেলা বাড়তে লাগল। তেম্‌নি ভাবেই এক জায়গায় চুপচাপ শুয়ে রইলুম—আমি যেন প্রকৃতির ঐ হাজার হাজার গাছ, অগণ্য পাহাড় ও শিলা আর লক্ষ-কোটি তৃণদলেরই একজন।... ...

রবীন্দ্রনাথের "চয়নিকা" খুলে প্রথম যে পাতায় চোখ পড়্‌ল, সেখানে দেখ্‌লুম, প্রকৃতির আজ্‌কের রূপটিই ছাপার হরফে বন্দী হয়ে আছে—

"চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে-স্থলে নভস্তলে, সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়া-রৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে

* * *

যেন আকাশ-বীণার
রবি-রশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুর-বালিকার
চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে সঙ্গীত-ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া।"

ঙ

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ স্তব্ধতার ঘুম ভেঙে গেল—হাট-ফেরৎ বন্ধুদের কোলাহলে। উঠে ব'সে দেখি, তাঁদের সঙ্গে পেট ভরাবার সকল রকম আয়োজনই এসেচে—চাল, ডাল, তরকারি, মাছ, হাঁড়ি, সরা, দুধ ও খাবার প্রভৃতি। শ্রীমতী ত ও শ্রীমতী ক তাড়াতাড়ি নদীতে স্নান ক'রে নিয়ে খিচুড়ীর আয়োজনে লেগে গেলেন, আমরা সবাই কেউ বন থেকে শুক্‌নো কাঠ কুড়িয়ে এনে, কেউ বা তরি-তরকারি কুটে তাঁদের যতটা-পারি সাহায্য করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে কামাটার থেকে সকালের ট্রেণে আমাদের দ্বিতীয় দল এসে বনভোজন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এ দলে ছিলেন বনবাসী সওদাগর শ্রীরাঃ বাবু, তিনটি মহিলা আর জন-তিনেক বালক-বালিকা। এঁরা রাত্রের 'অ্যাডভেঞ্চার' বাদ দিয়ে সুচতুরের মতন সকালে

করতে। কিন্তু এঁরা ভ্রমেও বোধ হয় ভাবতে পারেন-নি যে, এঁদের চাতুর্য্য দেখে অদৃষ্টের অদৃশ্য ওষ্ঠপ্রান্তে কতখানি নিষ্ঠুর হাস্য ফুটে উঠেছে!

এদিকে শ্রীমতী ত চারিদিকে শুভ-সংবাদ রটনা ক'রে দিলেন যে—খিচুড়ী প্রস্তুত, আহারে বস্‌লেই হয়।

প্রে, চা, ন, সু ও আমি তখনি শ্রীমতীকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে, দ্রুতপদে বন-পথে ধাবিত হলুম—একটু তফাতে গিয়ে নদীর জলে নাম্‌ব ব'লে। শ্রীগি খিচুড়ীর হাঁড়ির দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে, গাছতলাতেই স্থিরভাবে ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে রইলেন।

হঠাৎ আকাশের কোণের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে ব'লে উঠলুম—"ওহে, ছাখ ছাখ!"

বন্ধুরা বললেন—"কি?"

—"একখানা মেঘ। কি ভয়ানক কালো, দেখেচ!"

—"ও কিছু নয়" ব'লে বন্ধুরা জলের ভিতরে লাফ মারলেন এবং বালকের মত উচ্ছ্বসিত আনন্দ-ধ্বনিতে সেই নির্জ্জন বনভূমির শান্ত স্তব্ধতাকে চঞ্চল ক'রে তুললেন। আমিও মেঘের কথা ভুলে সকলের সঙ্গে যোগ দিলুম। তারপর সেই "স্তব্ধ নীরব গহন গভীর, যেথা কোনদিন আসে নি কেহ"—সেইখানে খানিকক্ষণ ধ'রে কয়জনে মিলে অশ্রান্ত জল-ক্রীড়ায় এম্‌নি মেতে গেলুম যে, এক-একবার মনে হ'তে লাগল, আবার বুঝি সুখের শৈশব আমাদের শুক্‌নো জীবনে দয়া ক'রে ফিরে এসেচে! আমাদের নিশ্চিন্ত মনগুলি তখন থেকে থেকে খালি ব'লে উঠছিল—

"শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে!"

সহর আর সভ্যতা মানুষকে যৌবনেই বুড়ো ক'রে তোলে, মনের উপরে অতি-বিজ্ঞতার জগদ্দল পাথর চাপা দেয়। কিন্তু প্রকৃতির সাজঘরে এলেই আমাদের সে কৃত্রিম বেশ আবার বদ্‌লে যায়,—আমাদের মুখের মুখোস আবার খুলে পড়ে, আমাদের গোপন শিশুত্ব আবার আমাদের চাপল্য দেখে ভয় পেয়ে "ন" জলে না নেমেই দৌড়ে স'রে পড়লেন।

চ

এরি মধ্যে আচম্বিতে চোখ তুলে দেখি—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে হোলো, অদূরে মাঠের মধ্যে গাছতলায় আমাদের পোঁট্‌লা-পুট্‌লি, ব্যাগ ও খিচুড়ীর হাঁড়ির কথা! বর্ষা তো নিজের নির্ব্বোধ খেয়ালেই "গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য"কে শিউরে তুলে মাথার উপরে এসে হাজির, এখন এই তেপান্তরে আমাদের দশা কি হবে?

টপ্, টপ্, টপ্! বড় বড় ফোঁটা! আমরা তীরের মত বনভোজন-ক্ষেত্রের দিকে ছুট্‌লুম। নদী পার হ'তে গিয়ে চোরাবালির ভিতরে আমার পা গেল হুস্ ক'রে ঢুকে। ভাগ্যে আমার আর একখানা পা ছিল শক্ত জমিতে, এ-যাত্রা তাই অল্পে-অল্পেই মুক্তি পেয়ে ওপারে গিয়ে উঠলুম।

ততক্ষণে মাল-পত্তর সমস্ত গাছতলায় টেনে এনে গাদা ক'রে রাখা হয়েচে এবং শ্রীমতী ত তাঁর অত-কষ্টে-রাঁধা খাবার দু'হাতে আগ্‌লে ম্লানমুখে ব'সে আছেন।

তারপর যে ধারা-পাত সুরু হোলো, তা অবর্ণনীয় ব্যাপার! সয়তানের চেয়েও কালো, "গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে" এবং প্রত্যেক গর্জ্জন ও পাহাড়ের শিখরে শিখরে তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনে থেকে থেকে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হ'তে লাগ্‌ল। কাব্যের বর্ষা প্রত্যক্ষে যে কতখানি মারাত্মক, আজ তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল। "গাছের ওপরে বাজ পড়বার ভয় বেশী" ব'লে জনকতক সঙ্গী চটপট স'রে পড়লেন। খানিক তফাতে ছিল সাহেবদের এক গোরস্থান। তার ফটকের ওপরে হাত-কয়েক চওড়া একটু নামমাত্র আচ্ছাদন ছিল। মেয়েদের নিয়ে সবাই তারই মধ্যে গুঁতোগুঁতি করতে লাগলেন। শ্রীগি ও শ্রীমতী ত মেঘের

সা নে গাছতলাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। গি'র মাথায় ছিল একটি ছাতা—কিন্তু সে কেবল 'শোভার্থে'। কলকাতায় ও পল্লীগ্রামে অনেক বৃষ্টি দেখেচি—কিন্তু আজ্কের এ পাহাড়ে-বৃষ্টি অতুলনীয়। এক-একটা ফোঁটা যেন তরল ইট-পাথরের টুক্রো! সেইসঙ্গে ঝড়,—চারিদিকের গাছপালা উদ্দাম বাতাসের তোড়ে আহত হয়ে এলোমেলো চীৎকারে একবার এদিকে, আর একবার ওদিকে ঠিক্‌রে পড়তে লাগ্‌ল—প্রকৃতি যেন হঠাৎ উন্মাদিনী হয়ে তাঁর এলানো নীল চুল উস্কখুস্ক ক'রে তুলে ক্রন্দন সুরু ক'রে দিলেন!

প্রাণপণে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-গান গেয়ে অস্থির মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা পেলুম—কিন্তু সে অসম্ভব চেষ্টা! কারণ এককলি গাই, আর পাঁচমিনিট দাঁতে দাঁত লেগে হি-হি ক'রে শীতে কাঁপি! কাজেই "এস হে এস সজল-ঘন বাদল-বরিষণে" গাইবার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, সঙ্গীদের দশা দেখবার জন্যে একবার গোরস্থানের দিকে ছুটে গেলুম। দেখ্‌লুম তাঁদেরও অবস্থা তথৈবচ! সকলেই প্যাঁচার মতন গোম্‌ড়া মুখে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপচেন—কেবল মেয়েদের মুখের হাসিখুসি তখনো মুছে যায় নি!

পেটুক সু'কে বল্‌লুম—"এস, এইবেলা খিচুড়ীটা সেবা ক'রে নি!"

সু আহারের নামে আজ কিছুমাত্র উল্লাস প্রকাশ করলে না—বিমর্ষভাবে ঘাড় নেড়ে করুণ স্বরে শুধু বল্‌লে, "উঁহু!"

আবার গাছতলার দিকে ছুটলুম—ভিজেচি না ভিজতে আছি! আস্‌তে আস্‌তে দেখি, এই অল্প সময়ের মধ্যেই সেই শীর্ণকায়া গিরি নদীর বুকে যেন কোন্ কুহকীর মায়ামন্ত্রে অপূর্ব্ব যৌবন-সমাগম হয়েচে—বিপুল স্রোতের ধারা দুই কূল ভাসিয়ে চক্রে চক্রে ফুলে উঠে, পাগলীর মত নেচে, উল্কা-বেগে ছুটে চলেচে উৎকট আনন্দে,—তার ভেতরে পড়্‌লে এখন গোটা মানুষকে-মানুষই কোথায় ভেসে যাবে!

শ্রীমতী ত বল্‌লেন, "এত ক'রে রাঁধলুম, সব নষ্ট হোলো!"

আমি উবু হয়ে বসে দুই হাত পেতে বল্‌লুম, "সে কি

গি, ন, ও আমি তখনি হাতের ওপরে শালপাতা বিস্তার ক'রে ধর্‌লুম, শ্রীমতী একহাতা ক'রে গরম খিচুড়ী দেন আর আমরা তীর্থের কাকের মত তাড়াতাড়ি এক এক গ্রাসে তা সাবাড় করি! সেই ঝড়-ঝাপ্‌টা-বৃষ্টিতে, খোলা মাঠের ভিতরে ব'সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে গরম অন্ন আহার—এ এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা! যদি কেউ সুধোন—রান্না কেমন হয়েছিল? তবে আমরা এই সার্টিফিকেট দেব যে, শ্রীমতী ত সেদিন দ্রৌপদীরও গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রেছিলেন!

ন-এর পিঠের দিকে হঠাৎ চোখ পড়্‌ল—দেখি, তার কাছার ওপরে প্রকাণ্ড এক পাহাড়ে-বিছে! বিছে যে এত বড় হয়, না দেখ্‌লে আমি তা কখনোই বিশ্বাস করতুম না—প্রায় সাপের মত বল্‌লেও চলে। এ পাহাড়ে-বিছে কামড়ালে কি আর বাঁচোয়া আছে?

তাড়াতাড়ি বল্‌লুম—"ওহে, তোমার কাছার ওপরে বিছে – বিছে!"

শুনেই ন প্রবল আতঙ্কে ঠিক যেন ক্ষেপে গেলেন! দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে বিছেটাকে ঝেড়ে ফেল্‌বার জন্যে, দুহাত শূন্যে তুলে তিনি মিনিট-তিনেক ধ'রে এমন প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করলেন যে, সে-নাচ দেখ্‌লে তাণ্ডবের বিখ্যাত ওস্তাদ স্বয়ং মহাদেবেরও ত্রিনয়ন বিস্ময়ে নিষ্পলক হয়ে যেত!

বিছেটা নাচের ঠেলায় অবশ্যই মাটিতে প'ড়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ লগুড়াঘাতে তার প্রাণসংহার করা হোলো।

ছ

সেদিন বরুণের ভৃঙ্গার বোধ করি ছ্যাঁদা হয়ে গিয়েছিল—কারণ বৃষ্টি তো কম্‌লই না, উল্টে মেঘের কালো পটের উপরে নূতন ক'রে মেঘের ঘটা জম্‌তে লাগ্‌ল। মাঠের উপরে থৈ থৈ করচে ঘোলা জল—যতদূর চোখ চলে খালি জল আর জল আর জল, পাহাড়ের এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো ঢালু গা বেয়ে হু হু ক'রে জলের ধারা লাফাতে লাফাতে নেমে আসচে, নদীও এক-এক জায়গায় উপচে প'ড়ে মাঠের উপরে এসে গড়াগড়ি দিতে সুরু করলে—আর একটু পরেই হয়ত নদী আর মাঠের সীমারেখা লুপ্ত

তখন যা-থাকে-কপালে ব'লে আমরা দলে দলে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করলুম। শ্রীরা-বাবু ছোটখাটো পাহাড়ের মতন একটা প্রকাণ্ড মোট কাঁধে নিলেন, আমিও আমার ভারি 'সুট কেসটা' কাঁধে ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। জলমগ্ন পথ দিয়ে সেই মোট নিয়ে প্রায় মাইলখানেক যাওয়া, —সে যে কি কষ্ট, তা আর বলবার নয়!

কোনরকমে একে একে ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষম বৃষ্টি ঠিক স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেল! ষ্টেশনের লোকেরা হাঁ ক'রে অবাক হয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় ভাবলে, আমরা সবাই পাগলা গারদ থেকে সদ্য সদ্য পালিয়ে আসচি!

ভাগ্যে সঙ্গে 'সুটকেস'টা ছিল! তাই অনেকে আমার শুকনো জামা, কাপড়, চাদর—এমন-কি তোয়ালে পর্য্যন্ত পরিধান ক'রে সে যাত্রা ত'রে গেলেন। সেই অপূর্ব্ব বেশেই আমরা যথাসময়ে ট্রেণে চ'ড়ে বসলুম।

এই আমাদের এবারকার বন-ভোজনের সজল ইতিহাস! অনেকটা 'অ্যাডভেঞ্চারে'রই মতন নয় কি? কিন্তু এই 'অ্যাডভেঞ্চারে'র ফলে শ্রীচা-য়ের ট্রেণে চ'ড়েই জ্বর এল, পরে শ্রীগি রও জ্বর হয়েছিল, আমার কর্ণমূল ফুলে ঢ্যাপ্‌ হয়ে উঠল এবং শ্রীমতী ত—কেও দীর্ঘকালের জন্যে রোগশয্যায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

## শরৎ

আবরি আকাশতল আষাঢ়ের ঘননীল মেঘে
যে বরষা এসেছিল কম্পমান আকুল আবেগে,
পাগলের পারা;
সে যেন রে—চির-গৃহছাড়া
পথে পথে ছুটে চলা মুক্ত বাধা ভয়—
প্রিয়াহারা প্রণয়ীর মূর্ত্তিমান উদ্দাম হৃদয়।

স্খলিত ধূসরবাস অযতনে লুটায় ভূতলে,—
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাহে, সে কেবল ছুটে ছুটে চলে
দিকে—দিগন্তরে;
ছিন্নহার মুক্তা ঝ'রে পড়ে,
বজ্র-ভাঙা বিদ্যুতের তলোয়ার দিয়া
ত্রিলোকের বক্ষ চিরে প্রিয়ারে সে ফিরেচে খুঁজিয়া।

নিমেষে সীমার শেষে নীলিমায় উড়ে চলে যায়,
অতলের অন্ত হতে সচকিতে আসে পুনরায়
অস্থির চঞ্চল;
শ্রাবণের নিবিড় অঞ্চল
ভিজায়ে পাঁজর-গলা অশ্রুর ধারায়,
আপনারি আঁখি-নীরে অবশেষে পথটি হারায়!

তরল আলোতে গুলে আভের কণিকা নিরমল
নিভৃত কল্পনা-এলা আল্পনাতে ভরি নভতল
নেমে এলো ধীরে,—
—যে শরত সবুজের তীরে;
সে যেন—পলক-হারা প্রতীক্ষার পর
প্রিয়েরি বারতা-পাওয়া প্রেয়সীর চকিত অন্তর।

আরক্ত পদ্মের দলে বুকের কাঁপন-লাগা তার
আজন্মের ব্যথা আজি পাখা মেলি চাহে উড়িবার,
তবু ফিরে ফিরে—
আঁচলের আবরণে ঘিরে
উচ্ছ্বসিত উরসেরে করি সম্বরণ;
প্রিয়েরে বরিয়া নিতে সাজায় অযুত আয়োজন।

সহসা আকাশে ঐ ডমরুতে বাজে গুরু গুরু
শিহরণে দিশেহারা হিয়া তার করে দুরু দুরু,
শিথিল শরীর,
আধ-গাঁথা মালা—শেফালির
অলক্ষ্যে খসিয়া গেছে, লুটে ধূলি 'পরে,
ডমরুর গুরু গুরু দূরে নহে—বুকেরি ভিতরে!

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

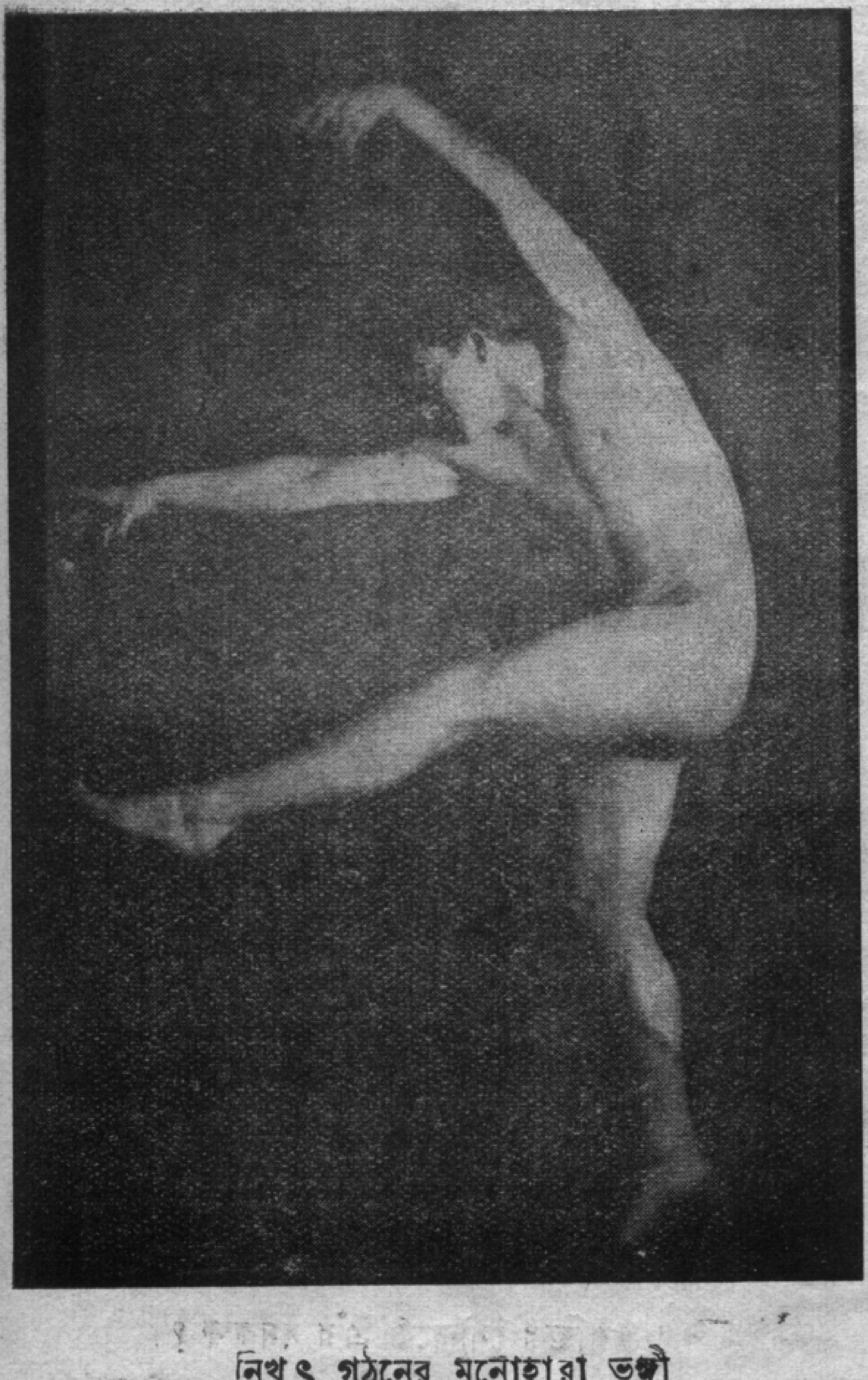
# দেহের আদর্শ

যদি প্রশ্ন করা যায় যে—ইহলোকে ব'সে পরলোকে অবলম্বন খোঁজে কে? তবে তার সর্ব্বসম্মত একটি মাত্র উত্তর আছে। এবং সে উত্তরটি হচ্ছে—বাঙালী।

আত্মা যখন এই পৃথিবীর দেহের মধ্যেই বাস করে, তখন দেহের কথা ভুলে সর্ব্বদা অপার্থিব দেহাতীতকে লাভ করবার চেষ্টা ভালো কি মন্দ, তা জানিনা; তবে এটুকু বেশই জানি যে, দেহটা যতই স্থূল হোক্ তাকে অবহেলা করলে এ পৃথিবীতে রীতিমত ঠকে যেতে হয়। এ হিসাবে বাঙালী জাতি-কে-জাতিই ঠকে গেছে। সমগ্র পৃথিবীর কথা ধরি না, কারণ পৃথিবীর বিস্তার অসামান্য,—কিন্তু কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই দেহ-হিসাবে বাঙালীর মত খাটো জাতি বেশী দেখা যায় কি? পেশোয়ারী, পাঞ্জাবী রাজপুত, মারাঠী, গুজরাটী, উত্তর-পশ্চিমী, বেহারী—এমন কি কোল-ভিল সাঁওতাল পর্য্যন্ত সকল জাতিই দেহ-হিসাবে বাঙালীর চেয়ে ঢের-বেশী শ্রেষ্ঠ



একটি বিলাতী নাচের দৃশ্য। নর ও নারী—
কে বেশী সুন্দর?

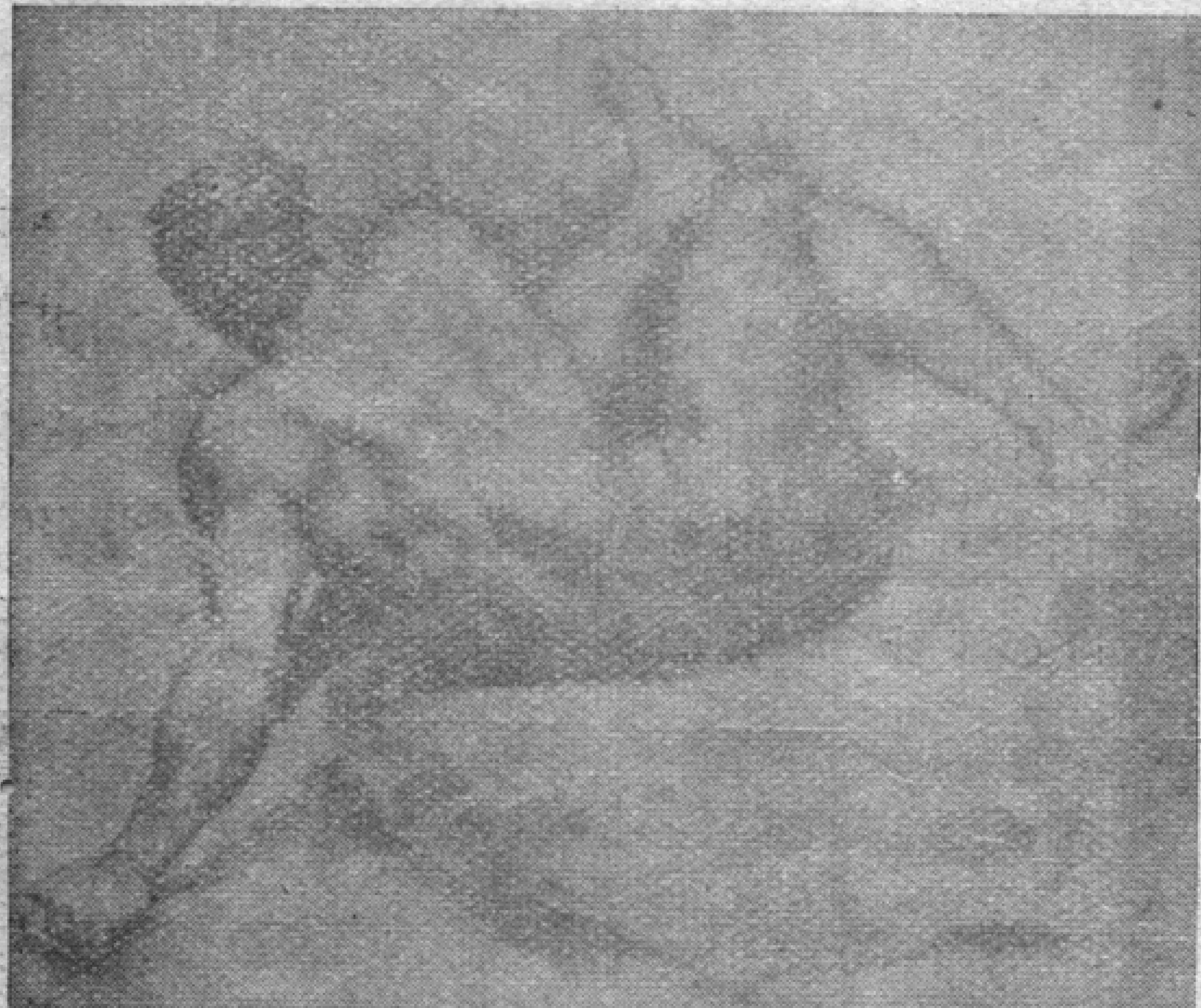


নিখুঁৎ গঠনের মনোহারা ভঙ্গী

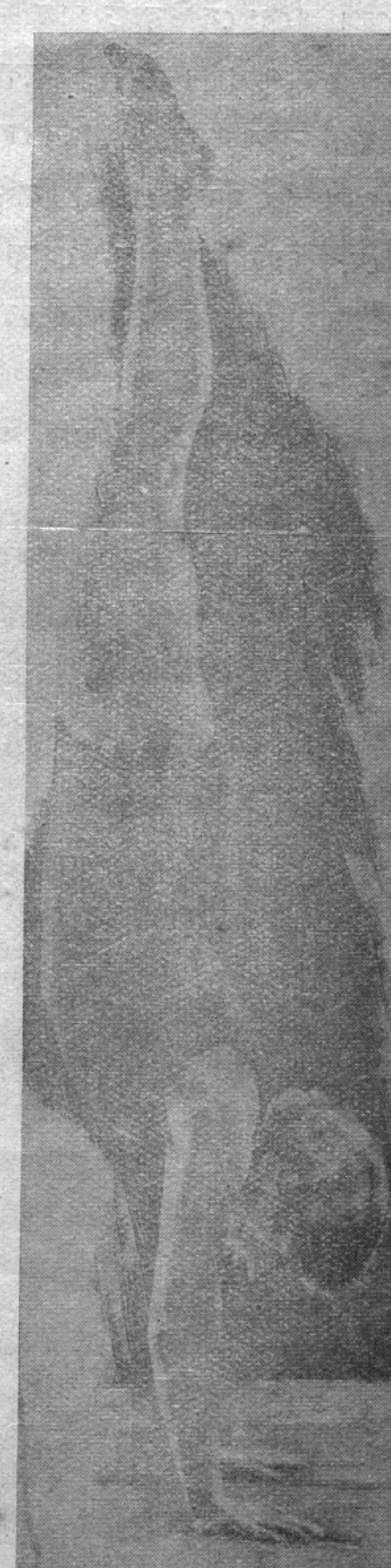
যাঁরা সৌন্দর্য্য-রসজ্ঞ তাঁরা জানেন যে, কেবল মুখশ্রী বা রঙের বাহারের জন্যে কারুকে সুন্দর বলা চলে না। প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, দেহের গড়নের মধ্যে। এই জন্যেই একালের উচ্চশিক্ষিত, বিদ্যাপীড়িত ও জীর্ণ-শীর্ণ দেহধারী কোন বাঙালী পুরুষ বা নারীকে, অশিক্ষিত এবং মুখশ্রী ও বর্ণে কুৎসিত কোন সাঁওতালী পুরুষ বা

নারীর পাশে দাঁড় করিয়ে দিলে, প্রথমোক্তকেই লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হবে।

অনেক বাঙালীরই রং গৌর ও মুখশ্রী নিখুঁৎ,—কিন্তু একমাত্র গঠন-হীন, দুর্ব্বল দেহের জন্যেই তাঁদের সৌন্দর্য্য



বারোপযোগী আদর্শ পুরুষ-সৌন্দর্য্য
( একখানি প্রাচীন ইতালীয় নক্সা থেকে )





বাংলায় ক'জন নারী গঠনে ও শক্তির সৌন্দর্য্যে এঁর সমকক্ষ ?

পরিপূর্ণ নারীত্বের সৌন্দর্য্য



জলে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে দেহের
তেজস্বী ভঙ্গী মাধুর্য্য

চোখকে আকৃষ্ট করে না। স্বা[illegible]ত সুন্দর সুডৌল দেহ বাঙালী জাতির মধ্যে খুবই কম দেখা যায়।

নর ও নারীর দেহের আদর্শ কি-রকম হওয়া উচিত, প্রাচীন গ্রীক শিল্পীরা তার যথেষ্ট নমুনা রেখে গেছেন। সে-সব আদর্শ গ্রীক শিল্পীর দ্বারা পরিকল্পিত হ'লেও তা কেবলমাত্র গ্রীক আদর্শ নয়—সেগুলি অনায়াসেই পৃথিবীর সার্ব্বজনীন আদর্শ ব'লে গণ্য হ'তে পারে; এবং সেই হিসাবেই তাদের এত বেশী সার্থকতা।

সৌন্দর্য্যের আদর্শ সম্বন্ধেও বোধ হয় আমাদের ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। কারুর চেহারা চোখে ভালো লাগলে আমরা বলি,—'আহা, যেন কার্ত্তিকটি!' কিন্তু কুমোররা কার্ত্তিকের যে দেহ গড়ে, তাতে কমনীয়তা হয়ত আছে,—তবে সবল সৌন্দর্য্য যে মোটেই নেই, এটা জোর ক'রে বল্‌তে পারি। আমাদের রুচি এম্‌নি বিকৃত হয়ে পড়েচে যে, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে শক্তির ধারণা আমরা করতে পারি না। কৃষ্ণকে তাই আমরা গোপীজনবল্লভ ননীগোপাল, মাখন-চোরা প্রভৃতি অনেক মূর্ত্তিতে বারংবার কল্পনা করলেও,



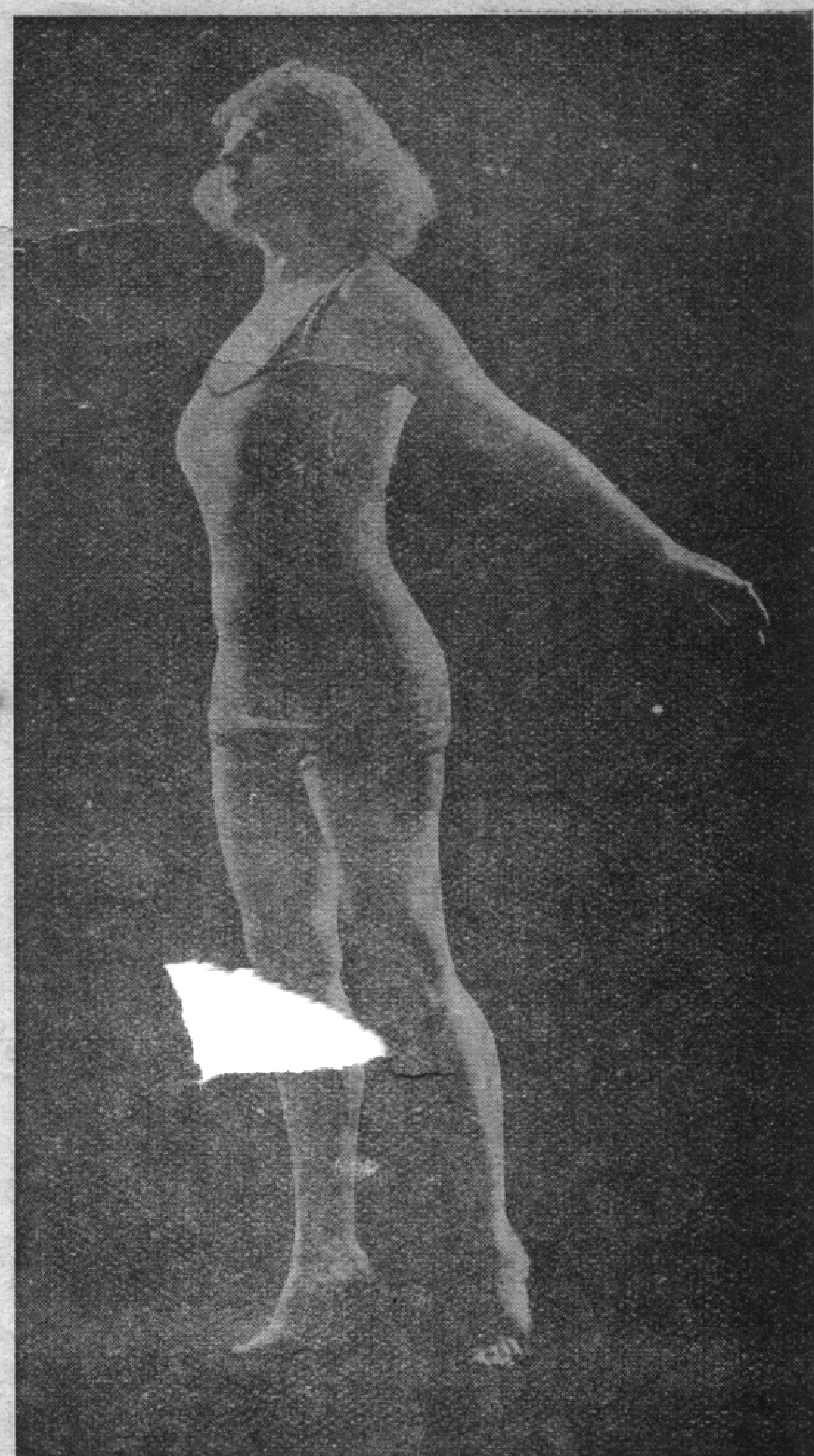
আদর্শ পুরুষত্বের সৌন্দর্য্য



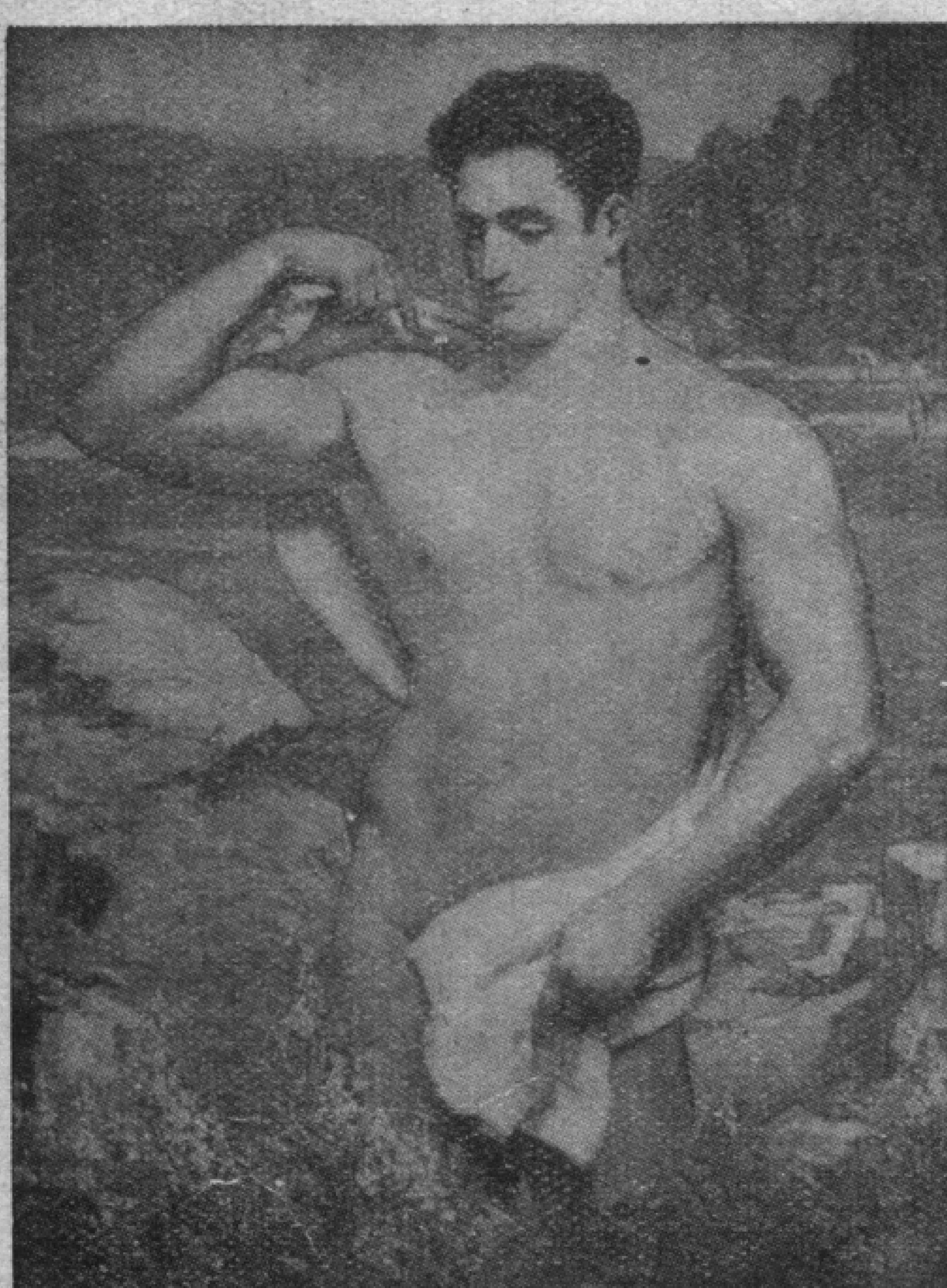
কমনীয় পুরুষত্বের সৌন্দর্য্য

তাঁকে গোবর্দ্ধনধারী-রূপে পরিকল্পিত হ'তে খুব কমই দেখেচি।

তারপর দেখি, এদেশে যেখানে শক্তি আছে, সেখানেও সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক খুব অল্প। এদেশী পালোয়ানরা স্যাণ্ডোর মতন শক্তিমান হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁরা কি স্যাণ্ডোর মতই সুন্দর? তাঁদের বিপুল দেহগুলি শক্তির মূর্তিমান অত্যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা জীর্ণশীর্ণ নন বটে, কিন্তু অতিরিক্ত মাংস-স্তূপ তাঁদের দেহের গঠনকে একেবারে বেঢপ ক'রে ফেলে।



নারীর আদর্শ গঠন



চার্ল্‌স্ সিসি লিয়ানো—এমন পরিপূর্ণ পুরুষত্বের আদর্শ বাংলায় সুলভ কি?

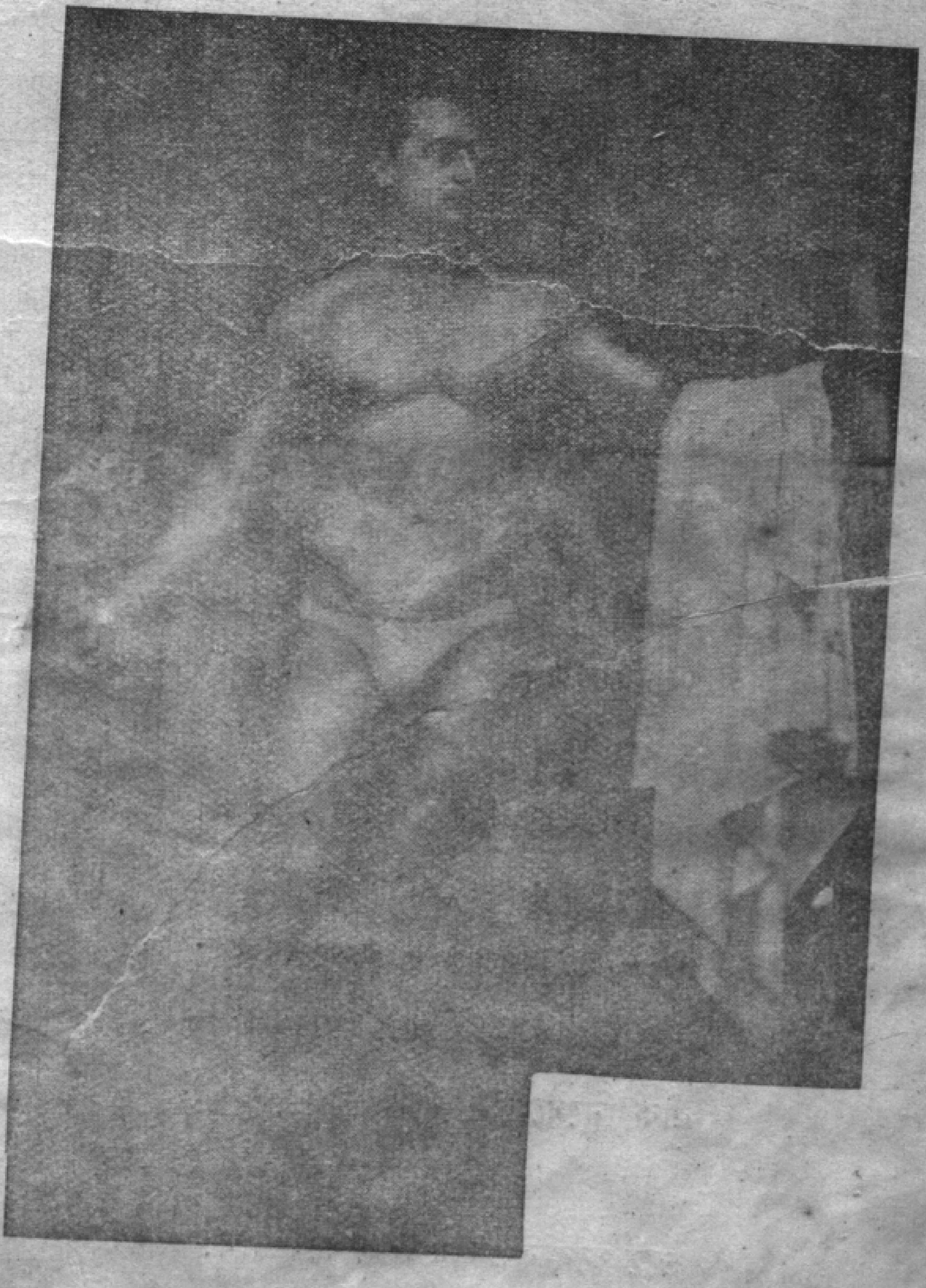


নৃত্যে বিকশিত পুরুষ-সৌন্দর্য্যের আর এক রকম নমুনা। এই ছবিটী ভারত-শিল্পীর বিখ্যাত মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য মনে করিয়ে দেবে।

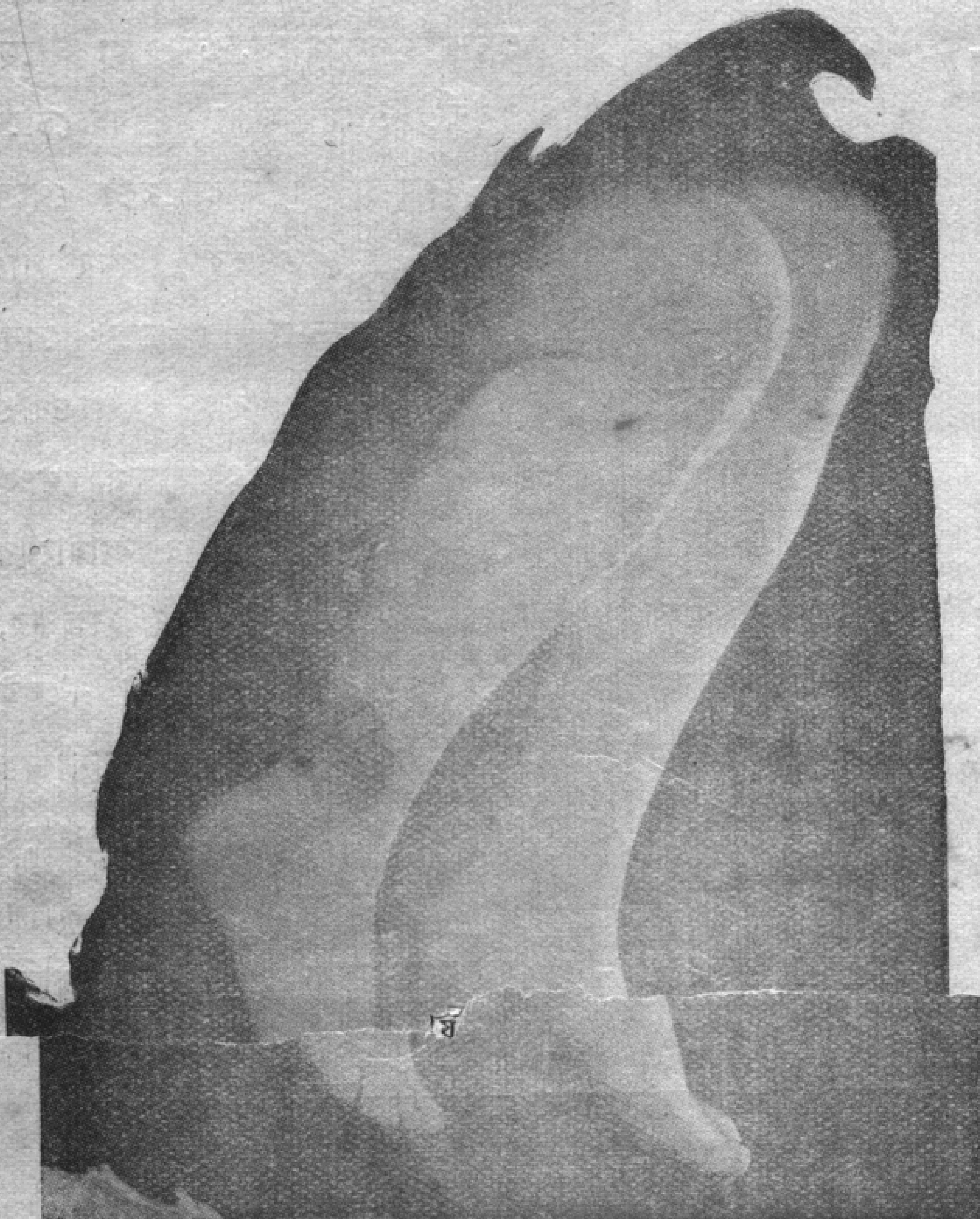
দুর্লভ। বঙ্গনারীদের সুন্দর মুখ আছে, সুন্দর রং আছে, কিন্তু সুন্দর গঠনের পরিপূর্ণতা তাঁদের মধ্যে প্রায়ই চোখে পড়ে না। অন্তঃপুরের প্রাচীরের চাপের মধ্যে থেকে থেকে তাঁদের দেহে জীবন-চাঞ্চল্য প্রকাশিত হবার সময় পায় না। ঠিক মাথা উঁচু ক'রে সরলভাবে দাঁড়াতে পারেন, আমাদের অন্তঃপুরের মধ্যে এমন নারীর সাক্ষাৎ পাওয়াও কঠিন। বাংলায় পুরুষত্ব ও নারীত্ব নিখুঁৎ সৌন্দর্য্য থেকে এমন বঞ্চিত হয়ে আছে কেন? প্রধানতঃ ব্যায়ামের অভাবে। বাংলাদেশে ব্যায়ামের প্রস্তাবই যেন হাস্যকর,—কারণ ব্যায়ামকে এখানে ভদ্র-ঘরের উপযোগী ব'লেই মনে করা হয় না। ফলে সৌন্দর্য্য-লাভের উপায় আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকলেও, সে উপায়কে আমরা কাজে লাগাতে পারচি না। এমন উদাসীন থেকে আমরা খালি সৌন্দর্য্যকেই হারাই-নি, সেই সঙ্গে মনুষ্যত্বকেও অনেকখানি

সামঞ্জস্যের অভাবে সৌন্দর্য্য অসম্ভব। মাংসপেশী ও দেহের বিপুলতা শক্তির পরিচায়ক বটে এবং শক্তিই যে সৌন্দর্য্যকে বিকসিত ক'রে তোলে, তাও সত্য কথা। কিন্তু এর মধ্যেও সামঞ্জস্য থাকা চাই, নইলে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ ব্যর্থ হয়ে যাবে। এদেশের শরীর-সাধকরা এই সত্যটি বোঝেন না।

পুরুষের মত নারীর সৌন্দর্য্যও দেহের সুঠাম গঠনের উপরেই নির্ভর করে। আলমারিতে সাজিয়ে রাখবার মোমের পুতুলের মতন হ'তে পারলেই নারীর রূপ সার্থক হয় না—কারণ মোমের পুতুল নরম হ'লেও, প্রাণহীন। নারীর দেহেও জোরালো ভঙ্গী ও সবল গতিপূর্ণ জীবনের লক্ষণ থাকা চাই,—বাঙলার নারী-সমাজে যা অত্যন্ত



নিখুঁৎ নরদেহের আদর্শ (প্রাচীন মূর্ত্তি অ্যাপলোর অনুসরণে)



নারীর আদর্শ চরণ

খাটো ক'রে ফেলেচি। কারণ যার দেহ দুর্ব্বল, তার মনও সবল হবার সুযোগ পায় কম।

সৃষ্টিকর্ত্তা খুব কম লোককেই জন্ম-সুন্দর ক'রে পৃথিবীতে পাঠান। কিন্তু এজন্যে আমাদের কারুর হতাশ হবার দরকার নেই। অসুন্দররা নিজেদের রূপহীনতার জন্যে যদি সৃষ্টিকর্ত্তাকে দায়ী করেন, তবে ভুল করবেন। কারণ অসুন্দরকে জন্ম থেকে রূপৈশ্বর্য্যে ধনী না করলেও, সৃষ্টিকর্ত্তা তাকে রূপের উপাদান থেকে বঞ্চিত ক'রে পৃথিবীতে পাঠান না। উপাদান আমাদের সকলেরই হাতে আছে। দেহ-চর্চ্চার দ্বারা এই উপাদানকে কাজে খাটিয়ে আমরা অনেক কুৎসিতকেই চোখের সামনে সুন্দর হয়ে উঠতে দেখেচি। নিয়মিত পানাহার ও ব্যায়ামের ফলে যে-কোন দেহই দেখতে চমৎকার হয়ে ওঠে—এটা আমরা স্পষ্ট ভাষায় লিখে দিতে পারি। দেহ-চর্চ্চার দ্বারা যেমন জন্ম-কুৎসিত সুন্দর হয়, দেহ-চর্চ্চার অভাবে তেমনি জন্ম-সুন্দররাও ক্রমেই কুৎসিতের শিরোমণি হয়ে পড়েন এবং এর সাক্ষী আমরা বাংলা দেশের চারিদিকে নিত্যই হাজার হাজার দেখ্‌তে পাচ্ছি। এথেকে বোঝা যায়, [illegible] কর্ত্তব্য দেহ-চর্চ্চায় মন দেওয়া।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে ছবিগুলি দেওয়া গেল, সকলে লক্ষ্য করলেই বুঝবেন যে, এই-সব চিত্রে যে মানুষগুলি দেখা যাচ্ছে, এদের অনেকেরই মুখ-চোখ খুব আহা-মরি নয়। কিন্তু তবু যে এদের দিকে চাইলে চোখ খুসি হয়, তার আসল কারণ হচ্ছে,—দেহ-চর্চ্চার দ্বারা এরা আপন আপন শরীরকে সুগঠন ক'রে তুলতে পেরেছে। এরা বিধাতার দেওয়া উপাদানের অসৎ ব্যবহার করে নি।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

## নিমেষের কাণ্ড

এ কথা কিন্তু ঠিক
এক নিমেষেই হ'য়ে যায় শেষ
যা' কিছু সাংঘাতিক!
মাথায় যখন পড়ে গো বজর
লাগে কি তখন দু'চার বছর?
এক নিমেষেই চট্‌ ক'রে পড়ে
কাঁপায় দিগ্বিদিক্!
ওঠে যবে ঝড়—ডাকে যবে বান,
নিমেষেই সব করে খান খান,
লাগেনা সময়—এক নিমেষেই
ভাসায় চতুর্দ্দিক!
তোমার সাথেও ঠিক তাই সখি,
একবার যেই হ'ল চোখোচোখি,
অমনি আমার বসন্ত-বনে
কুহরি' উঠিল পিক!
এক নিমেষেই হ'য়ে গেল হায়,
যা' কিছু সাংঘাতিক!

"বনফুল"

# রিক্তা

১

অতি-গ্রীষ্মে ছটফট করিতে করিতে দুপুর-বেলাকার দীর্ঘ নিদ্রার পর অরুণ যখন চোখ-মুখ ধুইয়া ঘড়ির দিকে চাহিল, তখন বেলা সাড়ে চারিটা মাত্র।

চারিদিকে তখনো খুব রৌদ্র। উত্তপ্ত পথ-ঘাট একটুও ঠাণ্ডা হয় নাই। ফুটপাথের উপর একটা শিরীষ গাছের ডালে ডালে হলুদ রংয়ের ফুল ফুটিয়া পাষাণ-পুরীর রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষ মূর্ত্তিটার একটুখানি স্নিগ্ধতা জানাইতেছিল। এই ফুল গাছটীর উপরেই গোটাকতক ভ্রমর-মৌমাছির অশ্রান্ত গুঞ্জন সেই প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি একই ভাবে চলিয়াছে।

ডাক পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। অরুণ ব্যগ্রভাবে চিঠি কয়খানি নাড়িয়া একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া গেল। তারপর আবার চোখ তুলিয়া ব্র্যাকেটের উপরকার ঘড়ির দিকে চাহিল। সেখানে কাঁটার গতি মিনিট কয়েক মাত্র অগ্রসর হইয়াছে।

একখানা পোষ্টকার্ড তুলিয়া সে আবার একবার পড়িতে লাগিল। এ চিঠিখানি তার বাবার লেখা। তাতে লেখা ছিল—

"তোমার ছোট মামা তাঁর ছেলে কনকের বিবাহ উপলক্ষে তোমাকে কটকে যাইবার জন্য লিখিয়াছেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধ, সুতরাং তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে কটকে যাইবে। সেখান হইতে এখানে আসিবে। সর্ব্বসমেত দশ-বারো দিনের অধিক বিলম্ব যেন কোন মতেই না হয়।"

অরুণের ছোট মামা কটকে থাকেন। অরুণের মাতামহও কটকেই থাকিতেন। এখন তাঁরা সেইখানেই বাড়ী-ঘর করিয়া এমনি ব্যবস্থা করিয়াছেন যে হয়তো বা তাঁর তৃতীয় পুরুষকে কটক-নিবাসী বলিয়াই পরিচয় দিতে হইবে।

অরুণের কলেজ ইতিপূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে কনকের একান্ত অনুরোধে পড়িয়াই আজও বাড়ী যাইতে পারে নাই।

অরুণ একজন বড় জমিদারের সন্তান। তার পিতা জগৎ বাবু অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। অরুণ ও তার ছোট ভাই শুভেন্দু দুইজনেই পিতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি যতখানি করিত, তার চেয়ে ঢের বেশী ভয় করিত। পিতার অনুমতি অপেক্ষা করিয়াই সে বসিয়াছিল।

পিতার অনুমতি পাইয়া অরুণের বুকটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

পাশের ঘর হইতে কনক আসিয়া বলিল, "অরুণ, তোমার চিঠি এসেচে না?"

"এসেচে তো।"

"এসেচে? কই, দেখি, দেখি—"

অরুণ পোষ্টকার্ডখানি ঠেলিয়া দিল। পড়িয়া কনক উৎসাহের সহিত বলিল, "ব্যস! তবে আর কি! চলো, আজই বেরিয়ে পড়ি—"

অরুণ একটু রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "উঃ, আর দেরী সইচে না বুঝি!"

কনক আরক্ত মুখে ঘাড় নামাইয়া বলিল, "আরে যাঃ, তা নয়!"

একটু থামিয়া কনক আবার বলিল, "তবে আজই বেরুনো ঠিক তো অরুণ? রাত আটটায় কিন্তু ট্রেণ!"

হাসিমুখে অরুণ বলিল, "আচ্ছা।"

"বাহবা! আচ্ছা আবার কি? তোয়ের-টোয়ের হয়ে নাও, সাতটায় ষ্টার্ট না করলে ওদিকে ট্রেণ পাবে না, তা জানো?"

অরুণ আর একখানা চিঠিতে চোখ রাখিয়া বলিল, "ঘড়ি দেখ বাবু, ঘড়ি দেখ, এই মোটে চারটে হল, এরি মধ্যে তো ট্রেণ ফেল হচ্ছে না তোমার!"

অরুণের হাসি দেখিয়া কনক অপ্রতিভ হইল, নতমুখে বলিল, "আমি শুধু জিজ্ঞাসা করচি যে, আজই যাওয়া ঠিক কি না! তা হলে আমি গিয়ে একবার বিনয়কে বলে আসি।"

অরুণ বলিল, "তা যাও!"

অরুণ কনকের চেয়ে মাস তিন-চারেকের বড়, কিন্তু মামাতো-পিসতুতো ভাই হইলেও ছেলেবেলা হইতেই তারা পরস্পরকে নাম ধরিয়াই ডাকিয়া আসিয়াছে। কনক বিবাহ বিষয়ে কিছু আগাইয়া গেলেও কলেজে সে অরুণের চেয়ে অনেকখানিই পিছাইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য কনকের পিতা অনেক উপায়ে হারিয়া তবে আপাততঃ তাকে ভালো ছেলে অরুণের অধীন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু বেচারি কনক বিস্মিত হইয়া ভাবিত, এই পাশ-করা 'ভালো ছেলেটী'র পাশ-স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি কোন্ দিকে? আর সকলকার মতই তো সেও পড়ে শোনে ঘুরিয়া বেড়ায়, তবু সে পাঁচজনকে জিতিয়া চলে কি উপায়ে?

তবে অরুণের নবারুণের মতন এই সুন্দর রূপ যে একটী চাহিয়া দেখিবার জিনিষ, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিত না, কনকও না। অরুণের রূপেই হউক বা গুণেই হউক, কনক তার বশ হইয়া পড়িয়াছিল।

কনক চলিয়া গেলে অরুণ পথের দিককার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দীর্ঘ পথের এ মোড় ও মোড় অবধি রৌদ্রে-পোড়া পথের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। পথিকের সংখ্যা এখন কম। মাল বোঝাই করা গরু-মহিষের গাড়ীই সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। শ্রম-ক্লান্ত মহিষগুলা মুদিত চক্ষে শিথিল গতিতে বোঝা টানিয়া চলিয়াছে।

আধ ঘণ্টা পরে সে চায়ের তাগাদায় গিয়া দেখিল, কনক বসিয়া চায়ের পাত্র প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে। সে অরুণকে দেখিয়াই বলিল, "তোমার মত মানুষ আমি আর দেখি নি কিন্তু!"

হাসিয়া অরুণ বলিল, "আচ্ছা, কি রকম দেখেছো? কার মত?"

কনকও হাসিল, বলিল, "কি অন্যায়—এমন সব ফাজিল ছেলেরাও আবার পাশ করে?"

অরুণ বলিল, "আর যত গাধাগুলো করে কিনা ফেল! ভারি অন্যায়! ভারি অন্যায়!"

কনক আর কিছু না বলিয়া চায়ের পেয়ালাতেই মন দিল। অরুণ ধীরে সুস্থে তার জিনিষপত্র সব ট্রাঙ্কে সুট্‌কেসে বোঝাই করিতে লাগিল। কনক চা পান শেষ করিয়া আবার দুই একজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইয়া গেল; ফিরিবার সময় একেবারে একখানা ভাড়াটে গাড়ী সঙ্গে করিয়া বাসায় ফিরিল। চার-পাঁচ দিন পরেই কনকের বিবাহ,—সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তার প্রতি পত্রেই বাড়ী যাইবার তাগাদা আসিত, তা ছাড়া তার নিজের তাড়াও কম ছিলনা, সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অরুণ ভাড়াটে গাড়ীর দিকে চাহিয়া রাগিয়া উঠিল, বলিল, "এত আগে গাড়ী কি হবে? রাত্রের খাওয়াটা খেয়ে যেতে হবে তো!"

কনক আর কোন কথা না বলিয়া চাকরের সাহায্যে গাড়ীর মাথায় মোট চাপাইতে লাগিল। কলেজ বন্ধ হওয়ার পর বিদেশী ছাত্র সকলেই প্রায় যে যার দেশে চলিয়া গিয়াছে, কেবল তারা দুইজনেই পড়িয়া আছে। যে জন্য পড়িয়া থাকা তা যখন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন আর একটা ঘণ্টাও দেরী করিতে কনকের মন রাজী নয়!

বাসার চাকরটীও সেদিন খুব চট্‌পট্ হুকুম পালন করিতেছিল, যাওয়ার সময় বাবুদের কাছে কিছু বখ্‌শিশের আশা আছে। বামুন ঠাকুরটীরও তাই। যথা-সময়ে তপ্ত খাবার নাকে-মুখে গুঁজিয়া অরুণ ও কনক সেই ভাড়াটে গাড়ীতে গিয়া বসিল।

ঘড়্‌ঘড়্ হট্‌হট্ করিতে গাড়ী হাওড়া অভিমুখে চলিল, কনক তাগাদা দিয়া বলিল, "এই, আর একটু জোরে হাঁকা, আর একটু জোরে!"

কিন্তু গাড়োয়ানের মুখের হট্ হট্ শব্দ ছাড়া গাড়ীর গতির কোনো পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ট্রেণও ফেল হইল না। ঠিক সময়েই তারা হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ ধরিল। কনককে টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া অরুণ প্লাটফর্ম্মে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া তারপর ট্রেণে গিয়া বসিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে অরুণ হাতের টাইম টেব্‌লখানি রাখিয়া রাত্রে ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইতেছিল। পাশেই ফিমেল কম্পার্টমেন্ট্—একটানা কচি ছেলের ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছিল, অনেকক্ষণ পরেও না থামাতে অরুণ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "নাঃ—এ রাতটা দেখ্‌চি বসেই কাটাতে হবে,—ঘুমোতে আর দেবে না!"

কনক কিছু না বলিয়া হাসিয়া নিজের শুইবার জায়গাটুকু ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইল। সে অরুণের চেয়ে কিছু বেশী গৃহী মানুষ; অল্পে বিরক্ত হওয়া তার অভ্যাস নয়। তিনটী ষ্টেশনের পরই সে দেখিল, অনিদ্রা-আশঙ্কা-পীড়িত অরুণ বেশ গভীর ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

২

কটকে মামার বাড়ীতে আসিয়া মামাতো ভাই ও সহাধ্যায়ী বন্ধু কনকের বিবাহ উপলক্ষে দিনকয়েক খুব মাতামাতির পর উৎসব-শেষে যখন বাড়ীটা শান্ত হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়েই যেন গ্রীষ্মের তীব্রতা সকলে বেশী করিয়া বুঝিতে লাগিল।

মধ্যাহ্নের সূর্য্যোত্তাপ যেন একেবারে অনল-কণা বর্ষণ করিতেছিল। অসহ্য গরমের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া অরুণ ঘর ছাড়িয়া একটু স্নিগ্ধ ছায়ার লোভে বাড়ীর পিছন-দিককার বাগানে চলিয়া গেল।

সেখানে বকুল কদমের ঝোপের মাঝে যে শান-বাঁধানো জায়গাটুকু ছিল, সেইটাই আরামে ঘুমাইবার মত স্থান বুঝিয়া সে একখানা হাতপাখা, একখানি ইংরাজী উপন্যাস ও একটা বালিশ লইয়া বসিল।

গাছগুলির ভিতর দিয়া যে ঝির্ ঝির্ করিয়া স্নিগ্ধ বাতাসটুকু আসিতেছিল, তাহাতেই সে "আঃ" বলিয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল।

অরুণ এ-বাড়ীর বাসিন্দা নয়, তাই সে জানিত না যে, অন্তঃপুর-সংলগ্ন এই বাগানটুকু মেয়েদেরই অধিকার-ভুক্ত, দিবারাত্র যারা অবরোধে আটক হইয়া আছে, এমন তৃপ্তিপ্রদ ঠাঁইটুকু তারা পাইলে ছাড়িয়া দিবে কেন? এ বাগানটী মেয়েদের রাজ্যভুক্ত বলিয়া বাড়ীর ছেলেরা প্রায় কেহই এদিকে বড় একটা আসিত না।

পরম তৃপ্তিতে সবে মাত্র যখন অরুণের ক্লান্ত দুই চক্ষু জুড়িয়া ঘুম আসিয়াছে, হাতের নভেলখানা হাত হইতে খসিয়া একরাশি শুক্‌নো পাতার উপর স্থান পাইয়াছে, ঠিক সেই সময়েই চুড়ি-চাবির মৃদু নিক্কণে ও চাপা-গলার সমবেত গুঞ্জন-ধ্বনিতে চমকিয়া তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সে চাহিয়া দেখিল, অদূরে বকুলতলায় তিনটী তরুণী নিবিষ্ট মনে ফুল কুড়াইতে বসিয়াছে। একজন কনকের বড় ভাই হীরকের স্ত্রী শান্তি, দ্বিতীয়া কনকের বোন্ বিমলা, আর দুজনের আড়ালে যে বসিয়াছিল তাকে স্পষ্ট দেখা গেল না।

অরুণ নিতান্তই বিপদে পড়িল। মেয়েরা না হয় এখনো তাকে দেখে নাই, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া সেই বা এমন করিয়া পড়িয়া থাকে কি বলিয়া? আবার ইহাদের সুমুখে উঠিয়া পালানোই বা কেমন হয়! মেয়েদের উপর সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

সহসা উচ্চ কোমল কণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া তৃতীয়া কিশোরীটি "আঃ!" বলিয়া এক মুঠা ফুল শান্তির দিকে ছুড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ফুলগুলি অরুণেরই মুখে মাথায় গায়ে ঝরিয়া পড়িল। অরুণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বাঃ বৌদি!"

চকিতে শান্তির মাথার কাপড় আবক্ষ নামিয়া পড়িল, আর সেই লজ্জিতা কিশোরীটি তার মাথার কাপড়ের দৈর্ঘ্যে প্রাণপণে মাথা নামাইয়া শান্তির পিঠের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। অরুণের মুগ্ধ দৃষ্টির একটি পলকই তার আনত সুন্দর মুখখানিকে আরো একটু রাঙাইয়া তুলিল।

শান্তির হাতের একটু সুমিষ্ট টিপুনিতে সে তার আরো কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—যেন যতখানি পারে, নিজেকে আড়াল করিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়।

বিমলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, "কি দাদা, আমাদের এখানে যে বড়?"

অরুণের বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টি তখনো সেই রাঙা মুখখানিতে লাগিয়াছিল। সে চোখ নামাইয়া বলিল, "আমি জানতুম না যে এটা তোমাদের আড্ডা!"

শান্তি ঘোমটার ভিতর হইতেই হাসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আহা!"

অরুণ উঠিয়া যাইতেছিল, বিমলা বলিল, "উঠচেন কেন? আপনি না হয় থাকুন,—আমরা তো যাচ্ছিই।"

অরুণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, তা কেন?" বলিতে বলিতে সে বাগানের বাহির হইয়া গেল।

বিমলা অর্থপূর্ণ চক্ষে মেয়েটীর দিকে চাহিয়া হাসিল।

কিন্তু সে এই প্রশ্নময় তামাসার কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না; তখনো তার সে সময় হয় নাই।

অরুণ বাহিরে গিয়া দেখিল, সেখানে হীরক, কনক ও বিমলার স্বামী যতীন এরা সব তাস পাড়িয়া বসিয়াছে, তাকে দেখিয়া হীরক বলিল, "কি রে তুই তল্পী-তল্পা নিয়ে গিয়েছিলি কোথা?"

বালিশটা ধপ্ করিয়া ফেলিয়া ইজিচেয়ারে হাত পা মেলিয়া শুইয়া পড়িয়া অরুণ বলিল, "হ্যাঁ গিয়েছিলুম তো,—কিন্তু—"

কনক বলিল, "আবার কিন্তু কি হলো? বাগানে তো গেলে, দেখলুম—"

চট্ করিয়া সোজা হইয়া অরুণ বলিল, "তুমি যদি জান্‌তে, তাহ'লে আমায় বারণ করে দিলে না কেন?"

"কেন, তোমার হলো কি?"

"কি আর হবে, খেদিয়ে দিলেন তাঁরা।"

"তাঁরা কারা? কে খেদিয়ে দিলেন?"

মুখ বাঁকাইয়া অরুণ বলিল, "তা আর তোমাকে কষ্ট করে জানতে হবে না!"

সকলে মিলিয়া হাসিয়া আবার খেলায় মন দিল। চোখের সামনে খোলা বইখানি ধরিয়া অরুণ আবার চেয়ারে হেলিয়া পড়িল।

সুন্দরী কিশোরীর হস্ত-নিক্ষিপ্ত ফুলের ঘায়ে যৌবনোদ্দীপ্ত তরুণ বুকটাতে এক অনির্ব্বচনীয় উচ্ছ্বাস-কম্পন জাগিয়া সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। তার কোঁকড়া কালো চুলের উপর তখনো কয়েকটা ফুল আটকাইয়া ছিল, তা দেখিয়া যতীন বলিল, "তুমি কি বকুল-তলায় গড়াগড়ি দিয়ে এলে না কি হে?"

অরুণ বলিল, "তার মানে? কিসে বুঝলে?"

"তার আর আশ্চর্য্য কি! কনকের অবধি বিয়ে হয়ে গেল যখন, আর—"

"তাতেই বুঝি প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমি বকুল-তলায় গড়াগড়ি দিয়ে আস্‌ছি—"

"আরে, মাথাময় যে বকুল ফুল রয়েছে!"

"ও, তাই নাকি!" বলিয়া সে মাথাটা ঝাড়িয়া ফেলিল, কিন্তু তবু মনটাকে এমন চট্ করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না।

উকিল শ্যামানন্দ বাবুর অবস্থা হীন নয়, তবু তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কন্যার বিবাহে একটী পয়সাও পণ দিবেন না। ইহাতে কোনো যথার্থ খাঁটী মানুষ তাঁর কন্যাকে বিবাহ করে ভালই, না হয় তো তাঁর কন্যা কুমারীই থাকিয়া যাইবে। এই রকম কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজেরও সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য তিনি তাঁর কন্যা জ্যোতিকে ছেলেদের সঙ্গে সমান করিয়া শিক্ষা দিতেছিলেন।

জ্যোতি সম্প্রতি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া অবসর যাপন করিতেছিল। তার ফুটন্ত গোলাপের মত অম্লান সৌন্দর্য্যে, প্রচুর প্রফুল্লতায় এখনো সংসারের ধুলা-মাটীর ছোপ পড়ে নাই। প্রণয়-ঘটিত কোনো ব্যাপারের সহিত সে কোনো সম্পর্ক রাখে না, পড়াশুনার চাপে এখনও ও-সকল তথ্য তার পুঁথি-পত্রের আড়ালেই রহিয়া গিয়াছে। তার স্বভাব-সঙ্কোচে সে অচেনা পুরুষ মাত্রেরই সুমুখে পড়িলে রাঙিয়া ওঠে, অরুণের সামনেও তাই হইয়াছিল। শান্তি বা বিমলার ঠাট্টা-তামাসার নিগূঢ় মর্ম্ম এখনো সে ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না, অর্থহীন দৃষ্টিতে তাদের মুখের পানে চাহিয়া থাকে, কিংবা কখনো যদি কোনো কথার অর্থ বুঝিতেও পারে তো মুখ নামাইয়া একটু হাসে। যার হাতের ফুলের আঘাত খাইয়া অরুণ বাগান ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সে এই জ্যোতি! অনিন্দনীয়া সুন্দরী, ষোড়শী—বিমলার ননদ বলিয়াই সে কনকের বিবাহ-উপলক্ষে যতীনের সঙ্গে এ বাড়ীতে আসিয়াছিল।

স্কুলের ছাত্রী শিক্ষিতা মেয়েদের তুলনায় অতি সাধারণ গৃহস্থ মেয়েদের তুলনা করিলে এমন একটু বিশেষত্ব পাওয়া যায় যাহাতে ওই ছাত্রীদের উপর একটু বেশী রকম চোখ পড়ে! ভদ্রতা ও সভ্যতায়, ফ্যাসন দুরস্ত ব্লাউসের ছাঁটে, শাড়ীখানি পরিবার ও চুল বাঁধিবার কায়দায় এমন একটী অনাড়ম্বর সহজ হাল্‌কা শ্রী ফুটিয়া ওঠে যে তাহা স্বভাবতই দৃষ্টি আকর্ষণ করে! অর্থাৎ একটু নূতনত্ব!

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু তবু অরুণ জানিতে

পারিল না যে ওই মেয়েটী কে! এই পরিচয় জানা না জানার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকিলেও সে জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। যেন জানিতে পারিলে একটা অকারণ কৌতুহল নিবৃত্ত হয়!

অরুণের মাতুল মহাশয় চিরদিনই প্রবাসী। তিনি গ্রাম্য রীতি-নীতির কোনো খোঁজই রাখিতেন না। আবাল্য দেশের বাহিরে থাকিয়া বাহিরের আচার ব্যবহারে তিনি একজন নব্য তন্ত্রের লোক হইয়া পড়িয়াছেন। যদিও ইদানীং মুখে তিনিও মাঝে মাঝে বন্ধু-মহলে আধুনিক নব্য ফ্যাসনের নিন্দাই করিতেন, তবু কোনো দিকে কুল না পাইয়া তিনিও ঐ উদার মতের দলেই ছিলেন। তাঁর ছেলেরা বলিত, আমাদের বাবার মত মানুষ আর হয় না।

ইনি নিজের ছেলেদের বিবাহে নিজের চেয়েও ছেলেদের মতামত বেশী বিবেচনা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাতে তারা বিবাহ-বিষয়ে পিতামাতাকে দোষী না করে, সে ব্যবস্থা তিনি পূর্ব্বেই করিতেন। ছেলেরাও তাদের মনের কথা পিতার কাছে বলিতে বা পরামর্শ লইতে সঙ্কুচিত হইত না।

একদিন অরুণ কি একটা দরকারে মামার কাছে যাইতেছিল, তিনি তখন বাড়ীর ভিতর বিশ্রাম করিতেছিলেন। অরুণ সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, সেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সেই সুন্দরী মেয়েটী হাস্যোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কি যেন বলিতেছে!

সে সরিয়া আসিল। নীচে সব-চেয়ে ছোট মামাতো ভাই সুধাংশু খেলা করিতেছিল, অরুণ তাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "ওপরে মামার ঘরে কে রয়েছেন রে?"

সুধাংশু এক-দৌড়ে দেখিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি আর জ্যোতি-দি!"

অরুণ আর কোনো কথা বলিল না, নিঃশব্দে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু দিন দুই-তিনের মধ্যেই অরুণের মনের অপ্রকাশিত আভাস একেবারে রূপ ধরিয়া প্রকাশ হইয়া উঠিল।

মনের দর্পণে যে ছায়াখানি পড়িয়াছিল, কালে তাহা ভাসিয়া মিলাইয়া যাওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়, কিন্তু জনরব যেন উত্তাপ দিয়া সেটুকুকে শক্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় কোমর বাঁধিল।

এমনি করিয়া উকিল শ্যামানন্দ গাঙ্গুলীর রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী কন্যাটীর বার্ত্তা অরুণের মামা মহাশয়ের হাতের পত্রের ভিতর দিয়া তার পিতা জগৎবাবুর হাতে গিয়া উঠিল। কিন্তু কি উত্তর আসে না দেখিয়া অরুণকে কিছু জানানো হইবে না, তাই সে এত কথা জানিত না।

অরুণের মামা ও তাঁর ভগ্নীপতি জগৎবাবুর দৃঢ়তা জানিতেন, একবার অমত করিলে যে তিনি আর কিছুতেই মত দিবেন না, এও তাঁর জানা ছিল। এজন্য তিনি প্রথমতঃ জগৎ বাবুকে পত্র দিতে ইতস্ততও করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামানন্দ বাবুর কাছে অরুণকে মানুষ বলিয়া পরিচিত করিয়া দিবার আগ্রহ তিনি দমন করিতে পারেন নাই! তা ছাড়া অরুণের মাতামহীরও একান্ত উপরোধ ছিল, তিনি তাই মায়ের কথা বলিয়া ঠেলিতে পারেন নাই।

সকাল বেলা চা ও খাবার খাইয়া অরুণ বাহিরে আসিবার জন্য উঠিতেছিল; সেই সময়ে তার দিদিমা একখানি চিঠি হাতে দিয়া বলিলেন, "এই জগতের চিঠি পড়ে ত্যাখ,—আমাদের কোনো কথা কি আর তিনি কখনো রাখেন?"

অরুণ প্রথমেই শিরোনামায় তার মামার নাম দেখিয়া বলিতে যাইতেছিল, তা আমাকে কেন? কিন্তু কিছু না বলিয়া খুলিয়া পড়িল। তার পিতা এ চিঠি তাকে লেখেন নাই, তার মামাকেই লিখিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন—আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই অরুণের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কন্যাপক্ষ তেমন অবস্থাপন্ন নন, তাই বিবাহে বিশেষ কিছু আড়ম্বর হইবে না। কিন্তু ইহার আর অন্যথা করিবার কোনো উপায় নাই। অধিকন্তু তিনি পছন্দ করেন না যে, তাঁর ছেলে সাহেবদের মত নিজেই দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করে। ইহাতে যে পিতার স্নেহে ও শুভাকাঙ্ক্ষায় অবিশ্বাস করা হয়, তাহাতে সন্দেহ কি! বিশেষ তিনি দরিদ্রের সংসারে যে রত্ন খুঁজিয়া পাইয়াছেন, ধনী ঘরের শিক্ষালোক-প্রাপ্তা মেয়ের চেয়ে সেও কম হইবে না।

তাছাড়া শ্যামানন্দ গঙ্গুলীকে তিনি চেনেন। এবং তিনি যে একেবারে একজন ব্রাহ্ম ধরণের লোক তাও তিনি জানেন। অতএব অরুণের মামা যে এ বিষয়ে আর অনুরোধ করিয়া তাঁকে বিপন্ন না করেন এবং অরুণকে সত্বর পাঠাইয়া দেন, ইত্যাদি—

সুদীর্ঘ পত্র। পত্রখানার প্রতি ছত্রেই অরুণ যেন তার বাবার সেই অটল অবিচল মুখের আভাস পাইতেছিল। তাঁর কথার একটী বর্ণও কখনো বৃথা হয় নাই, বৃথা কথা বলা তাঁর অভ্যাস নয়, এবারেও তাঁর কথা মিথ্যা হইবে না।

মুখখানা অন্ধকার করিয়া অরুণ বলিল, "তা এ চিঠি আমাকে কেন দিচ্চো? আমি কি করবো?"

অরুণের দিদিমা বলিলেন, "কি আর করবে, বাছা, পড়ে ভাখো,—আমরা তো লিখেও ছিলুম,—তা সে—"

অরুণ তিক্ত স্বরে বলিল, "আমি কি কিছু লিখতে আর না লিখতে বলেছিলুম নাকি? আমি তার কি জানি!"

চিঠিখানি খামে মুড়িয়া দিদিমার পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া সজোরে জুতার শব্দ তুলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ চলিয়া গেলে, শান্তি বলিল, "উনি কি রাগ করলেন নাকি ঠাকুমা? মনে হল, যেন বড্ড রেগে গেছেন।"

ঠাকুমা অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "তা রাগ করেই বা কি হবে! ওর তেমন বাপ্ নয় যে মত ফেরাবে,—সে চিরকাল সমান একগুঁয়ে। একবার না বল্লে কার সাধ্যি হাঁ বলায়! জগতের বাপও অমন ছিল না!"

শান্তি বলিল, "তিনি যদি একবারটী এখানে আসতেন, তা হলে জ্যোতিকে দেখলে আর অমত করতে পারতেন না,—সেই কোন্ পাড়াগাঁয়ের একটা ছাই মেয়েকে বউ করতে আর ইচ্ছেই করতো না, যদি জ্যোতিকে দেখতেন,—নয় ঠাকুমা?"

"তা সে আসবেও না, দেখবেও না। সে যে কি বোঝে, তা সেই জানে,—এখন ছেলেটা মন-মরা হ'য়ে না থাকে, তবেই ভালো!"

"না, না, মন-মরা কেন হবেন! মন-মরা হবার আর ওঁর কি হয়েছে! ভালো বউ হলে খুসিই হয়েই যাবেন!"

"আহা, তাই হোক্! তা হ'লেই তো বাঁচি গো!"

অরুণের মামা ডাকিলেন, "মা!"

শান্তি তাড়াতাড়ি একটী ছোট চৌকি পাতিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি আসিয়া বসিয়াই বলিলেন, "এ চিঠি এখানে কেন? কে আন্‌লে মা?"

মা বলিলেন, "ঐ, অরুণকে দেখলুম, তার বাপের চিঠি—"

"অরুণকে? অরুণকে এ চিঠি দেখাবার কি দরকার ছিল বল দিকি? ছি—ছি!"

মা একেবারে অপ্রতিভ হইয়া গেলেন, বলিলেন, "আমি ভাবলুম, একবার তাকে জানিয়ে দিই যে—"

"ভাল করনি মা, ভয়ানক খারাপ করেছ। আমি যে জগৎবাবুকে চিঠি দিয়েছি কি এ বিয়ের কোনো চেষ্টা করছি, এ তো ও জানতো না। কেন জানাতে গেলে? তুমি এতটুকু বুঝলে না যে—যাক্।"

তিনি গম্ভীর মুখে চিঠিখানি হাতে করিয়া নাড়িতে লাগিলেন। যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইলেও আর কোনো কথা বলিলেন না। রাগ, ক্ষোভ ও দুঃখের সময় নীরব থাকাই তাঁর অভ্যাস ছিল।

পুত্রের চিন্তাচ্ছন্ন মুখ দেখিয়া তাঁর মা মনে মনে জামাইয়ের অবিবেচনার উপর আরো বেশী করিয়া রাগিয়া গেলেন।

৩

বাড়ীর ভিতর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াও অরুণ বসিতে বা দাঁড়াইতে পারিল না। সেখানে প্রচুর হাসি গল্পের মাঝে সে টিঁকিতে না পারিয়া রৌদ্রের মাঝেই ছাতি মাথায় দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মের শুভ্রোজ্জ্বল রৌদ্রের তাপ শীঘ্রই অসহনীয় বুঝিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া বড় চেয়ারে শুইয়া পড়িল। তার মনে প্রথমে ভয় হইল যে, তার বাবা কি তাকেও ইহার মধ্যে আছে ভাবিয়া রাগ করিয়াছেন?

তার পরে মনে মনে যে কাল্পনিক গরীবের মেয়েটীকে নিজের ভবিষ্যৎ পত্নীরূপে দেখিল, তাতে তার মন তো আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলই না, বরং বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এই সঙ্গে শিক্ষিতা সুন্দরীর তুলনা করিয়া তুলসীমঞ্জরীর সঙ্গে গোলাপ বা পদ্মফুলের তুলনা তার মনে পড়িল।

কত প্রভেদ! কত প্রভেদ! হায় রে অদৃষ্ট! চিরদিনকার অন্ধকার ঘরে এ আলো সহিবে কেন? সেই অসভ্য হা-ঘরে ঘরের মেয়েই কি এত ভালো?

এতক্ষণে তার মনে পড়িল, যে তাকে দশ-বারো দিনের মধ্যে ফিরিতে বলার অর্থ কি। তারই বিবাহ—কিন্তু এটুকু আগেও একটু স্পষ্ট সংবাদ দেওয়া তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই! কেন করেন নাই? সে বুঝি একটা মানুষ নয়?

অরুণের সমস্ত মন ঝাঁঝিয়া বিশ্ব-জগতের উপরই তিক্ত হইয়া উঠিল।

কনক আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি হলো অরুণ? এইবার খুব করে হাসো-টাসো, তোমারও তো দিন এসে পড়লো!"

যতীন বলিল, "কিন্তু আমাদের কি একটা নেমন্তন্নও করবে না নাকি? তোমার মতলব কি অরুণ?"

অরুণ মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমিও তোমার বিয়েতে কিছু খাই নি, মনে করে ন্যাখো ভাই।"

"বা রে! সেবারে তুমি এলে না কেন? আচ্ছা, তুমি নেমন্তন্ন নাই বা করলে, আমি ওমনিই খাবো।"

"ওহো! বরযাত্রী যাবে বুঝি! আচ্ছা, তাই যেও, গাছতলায় বসে, দিব্যি ক'রে চাল চিঁড়ে দই খেয়ে এস। বেশ হবে, সেই বেশ হবে!" অরুণ কথাটা শেষ করিয়া তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া উঠিল।

নীরদ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "বাঃ, বাঁদ্‌রামি করে না আর! দুদিন বাদে শ্বশুর বাড়ী হবে, তাকে অমন করে বলে না।"

"তোমরাই তো বলাচ্ছো—" বলিয়া অরুণ তিক্ত মনে সত্য সত্যই চুপ করিল। যে লোকের অকাট্য ফাঁসির হুকুম হইয়া যায়, সেই মৃত্যু-দণ্ডের আসামী যেমন ওই চরমতম ব্যাপারের প্রতীক্ষাতেই ব্যাকুল হইয়া ওঠে, যতক্ষণ সেটা না হইয়া যায়, ততক্ষণ আর সে শান্ত হইতে পারে না, অরুণের অবস্থাও তেমনি হইয়াছিল। এই অনিবার্য্য অপ্রিয় কাজটারই শেষ না করিতে পারিলে তার আর স্বস্তি নাই, নিস্তারনাই!

বৈকাল বেলায় ঠিক অরুণের মনের মত করিয়াই মিলাইয়া মানাইয়া ঘন কালো মেঘের রাশিতে আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণ একেবারে নবীন নীরদ বর্ণে ভরিয়া উঠিল, প্রকৃতির এলায়িত নিবিড় কুন্তল-জালে সোনার চিরুণীর মত এক একবার বিদ্যুতের আঁচড় টানিয়া গেল।

কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মত্ততার চেয়ে, মানুষের এই ছোট বুকের মাঝে যে সর্ব্বজ্ঞ মনটী থাকে, ঝড়ে মাতিলে তারও মত্ততাও কিছু কম নয়—বরং অনেক বেশী, অনেক তীব্র!

বাড়ীর সকলকার সতর্ক চক্ষু এড়াইয়া কদমতলা হইতে একরাশি কদম ফুল কুড়াইয়া আনিয়া সুধাংশু ঝাঁটার কাটি দিয়া রথ তৈয়ার করিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে মাথা তুলিয়া এক-আধ ছত্র গানও গাহিতেছিল। এমন সময় অরুণের ব্যগ্র চটি জুতার শব্দ পাইয়া সে গান থামাইয়া মুখ তুলিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

সেখানেও শুভ্র তরুণ কপালের উপর একখানি শ্রাবণের মেঘই যেন বেশ গভীরভাবে ঘনাইয়া রহিয়াছে। অরুণ কোমল স্বরে বলিল, "সুধাংশু, যা না ভাই, দিদিমাকে বলে আয় গে যে আজই আমি বাড়ী যাবো।"

সুধাংশু অধিকতর বিস্ময়ে তার মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আজ?"

"হাঁ, আজই। তুই যা না, দিদিমাকে বলে আয় না চট্ করে।"

তবু সুধাংশু ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, "বিষ্টি আস্‌ছে যে! কেমন করে যাবেন?"

বিরক্ত হইয়া অরুণ বলিল, "সে আমি যেমন ক'রে হয় যাব'খন, তুই ব'লে আয় না!"

সুধাংশু নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। একটু পরে

দ্রুতপদে হীরক আসিয়া বলিল, "কি রকম! ব্যাপার কি? আজই চল্‌লে তার মানে?"

"না, মানে আবার কি? তবে বাবা শীগ্‌গির ফিরতে বলেছেন, তাই—"

"তা আর কি দিন পেলে না? এই দিনে কি কেউ বাড়ী ছেড়ে বেরোয় কখনো?"

অরুণ দৃঢ়স্বরে বলিল, "তা হোক্‌, আমি আজই যাব, হয় হবে বৃষ্টি, আমি ট্রেণের ভেতর থাকবো, কি আর হবে তাতে!"

হীরক অরুণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্যই বলিল, "পাগল আর কি! আজই কখনো যাওয়া হয়?"

"কেন হবে না,—দেখে নাও, হয় কি না হয়!"

হীরক হার মানিয়া দিদিমাকে গিয়া ধরিল। তিনি একটু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "যে কথা রাখবে না, তাকে আর ধ'রে পাক্‌ড়ে লাভ কি! ওর যা খুসি করুক।"

অরুণের মামাও ওই কথাই বলিলেন, তবে তিনি একটু অন্য ভাবে। মনে মনে তিনিও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। হীরক আবার মিনতি করিয়া বলিল, "আজকের দিনটা থেকে যা অরুণ। এই ঝড়-বৃষ্টির মাঝে নাই বা গেলি! শুধু একটি রাত্তির থেকে যা, এতই কি তোর জরুরি কাজ যে, আজই না গেলে সৃষ্টি রসাতলে যাবে!"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "তোমারই বা কি এমন ক্ষতি হবে আমি না থাক্‌লে, তাই এমন আটকাচ্চো?"

"তা হবে। তা ব'লে এমন দিনে—"

"এমনি দিন ব'লেই তো আরও যেতে চাচ্ছি। রেলে ব'সে বেশ ঝড়-জল দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।"

হীরক রাগ করিয়া চুপ করিল। সেই দিনই অরুণ বুক-ভরা অভিমানের ব্যথা লইয়া কটক ছাড়িয়া গেল। এই অভিমান তার পিতার উপর, কিন্তু উগ্র গম্ভীর-প্রকৃতি সেই পিতার সম্মুখে এর একটুও প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না; শুধু এ বেদনার কাঁটা তারই বুকে বিঁধিয়া যন্ত্রণা দিবে জানিয়াও সে আপনাকে এই দুর্ব্বলতা হইতে বাঁচাইতে পারিল না!

সে তো কোনো দোষই করে নাই। তবে তার বাবা শুধু শুধু সাহেবদের মত দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করা ইত্যাদি কথা কেন তুলিলেন?

যৌবনের অন্ধ কল্পনা, তাকে উষ্ণ উগ্র বিদ্রোহের পথেই নাচাইতেছিল; স্নেহের স্নিগ্ধ ছায়া সে কোথাও দেখিতে পাইল না। বিশ্বব্যাপী মরুর মত একটা শুষ্কতা রুক্ষতা তার চোখের সামনে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

চলন্ত ট্রেণের গর্ব্ভে বসিয়া, বাহিরে উন্মত্ত ঝড়ের তাণ্ডব নাচ দেখিয়া তার মনে হইতেছিল যেন নিজের মনেরই একটা চলন্ত প্রতিরূপ দিগ্‌দিকে আছাড়ি-পিছাড়ি করিয়া ফিরিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীহারবালা দেবী।

---

# সঙ্কলন

## বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমার মনে এর ভাবটি, সঙ্কল্পটি কোন একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবে চিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সঙ্কল্পের বীজ আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন যে আমি যথোচিত ভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলিনি। আমার পরিবারে আমি যেভাবে মানুষ হয়েছি তাতে ক'রে আমাকে সংসার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল,—আমি একান্ত-বাসী ছিলাম। মানব-সমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিলনা, আমি তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি। "জীবন-স্মৃতি"তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দূরে বাস করতুম বলে, তার দিকে বাতায়নের পথ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দূরের দুর্লভ জিনিষের প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর ছিল। কলকাতা সহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইঁট কাঠ পাথরের

মধ্যে আমার গতিবিধি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারিদিকেই বাড়ীগুলি মাথা তুলে থাকৃত, আর তাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্য কয়েকটি গাছ-পালা আর একটী পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু দূরে আমাদের পাড়ার বাইরে বেশী বড় বাড়ী ছিলনা, একটু পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

সে সময় আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়েছিল। মনে আছে মধ্যাহ্নে লুকিয়ে একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোট ছোট কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ীর ছাদের উপর থেকে যে জীবন-যাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম, তা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। এর মধ্যে মানব-প্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনো বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সুর কখনো বা প্রভাতের ঘুম জাগানো গান আর উৎসব কোলাহলের নানা রকম ধ্বনি আমার হৃদয়কে উতলা করে দিয়েছিল। বর্ষার নব মেঘাগমে আকাশের লীলা-বৈচিত্র্য আর শরতের শিশিরে ছোট বাগানটীতে ঘাস ও নারিকেলরাজির ঝলমলানি আমার কাছে অপূর্ব্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার অপেক্ষা করেছি। সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদয়ে নিবিড় গভীর আনন্দ-বেদনার সঞ্চার করেছে! বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বার বার করে আহ্বান করে বলেছে,—"তুমি আমার আপনার, আমার মধ্যে যে সত্য আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তবুও তোমায় আমায় এই বিরহের মধ্যেও মাধুর্য্য রয়েছে।" তখনও এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্ট ভাবে ঘনিয়ে উঠেছে, ছোট ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরের ডাক গভীর ভাবে মুগ্ধ করেছিল।

তারপর আমার মনে আছে যে প্রথম যখন আমাদের সহরে ডেঙ্গু-জ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মত এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকট ভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারিনা। আপনারা অনেকে পল্লীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ। আপনারা তার শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাক্‌বেন কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। ইঁট কাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্প লোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠীর পানসি দক্ষিণ দিকে যেত সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর দুধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবন-যাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তর্পণ এই সকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগুলি যেন গঙ্গার দুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে—পিপাসার জলকে স্তন্যরসের মত গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া, আর সে সময়ে সেখানকার সূর্য্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কি অপরূপ লেগেছিল তা কি বলব! এই যে বিশ্বজগতে প্রতিমুহূর্ত্তে অনির্ব্বচনীয় মহিমা উদ্ঘাটিত হচ্ছে, আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলে ও অতি পরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কেজো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্ব্বতা একবার "না" হয়ে গেছে, নেই বলেই হয়। তার রহস্য, মাধুর্য্য তার মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য্য একটি কাব্যগ্রন্থে পাতার পর পাতা উদ্ঘাটন করে' বিশ্বকবির মর্ম্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে, আমরা মাঝখান থেকে অতি পরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যে রকম উৎসুক হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে যায়নি এ কথাটা বলার দরকার আছে। এতটা আমি ভূমিকা স্বরূপ বল্লুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবন-যাত্রা তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যাপার।

এমনি আর একটি অনুকূল ঘটনা ঘটল যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। পদ্মাতটের সেই আম-জাম-ঝাউ বেত আর শর্ষের খেত, ফাল্গুনের মৃদু সৌগন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জ্জন চরে কলধ্বনি মুখরিত বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যা তারার জ্বল জ্বল করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা এ সব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।

অল্প বয়সে আমি আর একটি জিনিষ পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাটিয়ে থাক্‌লেও আমি বাড়ীতে আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গীত সাহিত্য শিল্প-কলার চর্চ্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি, এটি আমার জীবনের খুব বড় কথা। আমি শিশু কাল থেকে পলাতক ছাত্র, মাষ্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্ব সংসারের যে সকল অদৃশ্য মাষ্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে যেন তাদের কাছে কোনো রকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়ীতে নিয়ত ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের ও সঙ্গীতের আলোচনা হ'ত আমি এ-সবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এই সকল বিদ্যা যথার্থ ভাবে শিক্ষা লাভ না করলেও এথেকে ভিতরে ভিতরে আশ পাশ

হ'তে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বড়দাদা তখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে নিরত ছিলেন। বনস্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে, ফল ধরিয়ে ও ইতস্ততঃ বিস্তর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার চেয়ে ছেঁড়া কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলা ফেরার রাস্তা সেই সব বিক্ষিপ্ত ছিন্নপত্রে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেই সকল অবারিত সাহিত্য রচনার ছিন্নপত্রের স্তূপ আমার চিত্ত-ধারায় পলিমাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

তারপর আপনারা জানেন আমি খুব অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চ্চায় মন দিয়েছি আর তাতে করে নিন্দা খ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটা বড় সুবিধা ছিল যে সাহিত্য ক্ষেত্রে এত প্রকাশ্যতা ছিল না, সাহিত্যের এত বড় বাজার বসেনি,—ছোট হাটেই পসরা দেওয়া-নেওয়া চল্‌ত। তাই আমার বাল্য রচনা আপন কোণটুকুতে কোনো লজ্জা পায় নি। আত্মীয়-বন্ধুদের যা একটু আধটু প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই যথেষ্ট মনে করেছি। তারপর ক্রমে বঙ্গ সাহিত্যের প্রসার হল, তার চর্চ্চা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্য ক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রির আকাশে তারার আবির্ভাবের মত, সাহিত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বারা খচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জ্জনতাই ছিল। এই বিরল বাসই আমার একান্ত আপনার জিনিষ ছিল। অতিরিক্ত প্রকাশ্যতার আঘাতে আমি কখনো সুস্থ বোধ করিনি। আমি ৪০।৪৫ বছর পর্য্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসটীতে আপন খেয়ালে সাহিত্য রচনা করেছি। আমার কাব্য সৃষ্টির যা কিছু ভালমন্দ তা সে সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরের একটী আহ্বান একটী প্রেরণা এল যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হ'ল। যে কর্ম্ম করবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হ'ল তা হচ্ছে শিক্ষাদান কার্য্য। এটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিল না তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হ'ল তার কারণ হচ্ছে আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাক্‌বে। আমি এ কথা বলছি না যে এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে—সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন হতে পারছে না—সর্ব্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে abstract ব্যাপার করে ফেলা হয়।

তখন আমার মনে একটি দূর কালের ছবি জেগে উঠ্‌ল। যে তপোবনের কথা পুরাণ কথায় পড়া যায়, ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে তপোবনের শিক্ষা-প্রণালীতে খুব একটি বড় সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য্য আছে তেমনই অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-সম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তখন মানব জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোম-ধেনু দোহন করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা প্রাচীনকালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে, একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড় শিক্ষা আছে। এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি, তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য্য আছে তা সকল কালের। বর্ত্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।

এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তি-নিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে তিনি কি পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগ সাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্ত ভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের ছিল না। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে বসে' প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে সুধা ধারা পান করেছেন। যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বকবির মধ্যে উপলব্ধি করা এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হ'ল যে যদি ছাত্রদের মহর্ষির সাধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারি

বাকিটুকুর জন্য আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে, তাঁর নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে হবে, যে স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে যোগাতে হবে।

তখন আমার সঙ্গী-সহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভাল বাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বল্লেন, "আপনি মাষ্টারী করতে না জানেন আমি সে ভার নিচ্ছি।" আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য করুণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি, কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটী ছোট গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে ৫।৭ দিন ধরে একটী ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে গল্প তৈরী করবার আমার শক্তি ছিল। এই সব বানানো গল্পের অনেকগুলি আমার "গল্পগুচ্ছে" স্থান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে-গল্পে-গানে রামায়ণ মহাভারত পাঠে সরস হয়ে ওঠে, তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি ছেলেদের এম্নি ভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া একটা attitude তৈরী করে তোলা খুব বড় কথা। মানুষের যে এতবড় বিশ্বের মধ্যে এতবড় মানব সমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এত বড় উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরী এবং বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানব বিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে।

আমাদের দেশবাসীরা "ভূমৈব সুখম" এই ঋষি-বাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করচে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধন পথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে তাঁরা জেনেছেন যে "ভূমৈব সুখম্" দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্যও অকিঞ্চিৎকর জীবন যাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটচে।

তাই শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল যে আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে গঙ্গার ধারা গিরিশিখর থেকে উত্থিত হয়ে দেশ-দেশান্তরে বহমান হয়ে চলেছে, মানুষ তার জলকে সংসারের ছোট বড় সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি যে পাবনী বিদ্যাধারা কোন উত্তুঙ্গ মানব চিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলচে; যা পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী হয়ে দিকে দিকে নিরন্তর স্বতঃ উৎসারিত হচ্ছে, তাকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাঁধ বেঁধে ধরে রেখে দেখ্‌ব না, কিন্তু যেখানে তা পূর্ণ মানব-জীবনকে সার্থক করে তুলচে, তার সেই বিরাট বিশ্বরূপটি যেখানে পরিস্ফুট হয়েচে, সেখানে আমরা অবগাহন করে শুদ্ধ নির্ম্মল হব।

"স তপোঽ তপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বম সৃজত যদিদং কিঞ্চ।" সৃষ্টিকর্ত্তা তপস্যা করচেন, তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করচেন। প্রতি অণু-পরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ চক্রপথের আবর্ত্তন। সৃষ্টিকর্ত্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেচে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেন না মানুষও সৃষ্টিকর্ত্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে, এই তার বড় পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃ-ক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্চে তপস্বী, এই কথাটী উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করিতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবেরা সত্য ধর্ম্ম বলে বড় করে জানতে হবে।

আজকার দিনে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব্ব জাতির ও সর্ব্বদেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েচে, আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙালী বলে' আমাদের সাহিত্য রসের চর্চ্চা কেবল বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্ব সংসারে জন্মাই নি? আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করচেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে?

আমার মুখে এই কথা অহমিকার মত শোনাতে পারে। আজকের কথা প্রসঙ্গে তবু আমার কথা বলা দরকার যে য়ুরোপে আমি যে সম্মান পেয়েচি তা রাজা-মহারাজারা কোন কালে পায় নি। এর দ্বারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে মানুষের অন্তর প্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতি-বিচার নাই। আমি এমন সব লোকের কাছে গিয়েচি যাঁরা মানুষের গুরু, কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছন্দে নিঃসঙ্কোচে এই পূর্ব্বদেশ-বাসীর সঙ্গে শ্রদ্ধার আদান-প্রদান করেচেন। আমি কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পেরেচি, কেন যে য়ুরোপের মহাদেশ বিভাগে এরা আমাকে আত্মীয়রূপে সমাদর করেচে সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত হই। এমনি ভাবেই স্যর জগদীশ বসুও

যেখানে নিজের মধ্যে সত্যের উৎস-ধারার সন্ধান পেয়েচেন এবং তা মানুষকে দিতে পেরেচেন সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিয়েচে।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসী ও জার্ম্মানদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনো ঘটে নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'স্কুল-বয়' হয়ে একটু একটু করে মুখস্থ করে পাঠ শিখে নিয়ে পরীক্ষার আসরে নামব, তার পর পরীক্ষা পাশ করেই সব বিস্মৃতির গর্ত্তে ডুবিয়ে বসে থাকব? কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিময় হবে না? এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্ব-ভারতীতে আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তাঁরা একজনও সেই আমন্ত্রণের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্ততঃ আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্চেন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ফরাসী পণ্ডিত সিলভঁ্যা লেভি। তার সঙ্গে যদি আপনাদের নিকট সম্বন্ধ ঘটত তা হলে যে তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ, তাঁর হৃদয় তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সঙ্কোচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানালুম, তাঁকে বল্লুম যে আমার ইচ্ছা যে ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাক্ষেত্র স্থাপন করি যেখানে সকল পণ্ডিতের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একত্র সমাবেশের চেষ্টা হবে। সে সময় তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল। হার্ভার্ড পৃথিবীর বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নাম-ধাম কেউ জানে না, অথচ এই অখ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি সাহেব অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন "এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গবাস।" তিনি যেমন বড় পণ্ডিত ছিলেন তাঁর তদনুরূপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়েছিল তাও বলা যায় না কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্ম্মগৌরব অনুভব করেছেন, তাই এখানে এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে ফ্রান্স জর্ম্মনি সুইজারল্যাণ্ড অষ্ট্রীয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগীরূপে পাবার জন্য শান্তিতিকেতনে আমরা সাধ্যমত আসন পেতেছি কিন্তু এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনই একপক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমবায় সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গায় নিজেকে কোণ-ঠেসা করে রেখেছে সেখানে কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবে না? ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বকে একঘরে করে রাখার স্পর্দ্ধাকে নিজের গৌরব বলে জ্ঞান করবে?

আমার ইচ্ছা, বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটী তৈরী হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনুভব করতে হবে যে এমন একটী জায়গা আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগৌরব বা দুঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চাত্য বন্ধুরা আমাকে কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করেচেন—তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের গ্রহণ কর্ব্বে? আমি তার উত্তরে জোরের সঙ্গে বলেছি, 'হাঁ নিশ্চয়ই, ভারতীয়েরা আপনাদের কখনো প্রত্যাখ্যান করবেনা।' আমি জানি যে বাঙালীর মনে বিদ্যার গৌরব বোধ আছে, বাঙালী পাশ্চাত্য বিদ্যাকে অস্বীকার করবেনা। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই সর্ব্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা, বাঙালীর রক্তের জিনিষ হয়ে গেছে। যারা অতি দরিদ্র,—যাদের কষ্টের সীমা নেই—তারাও বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা ভদ্র পদবী লাভ করবে বলে' আকাঙ্ক্ষা বাংলা দেশেই করে। বাঙ্গালী যদি শিক্ষিত না হতে পারে তবে সে ভদ্র সমাজেই উঠ্‌তে পারল না। তাই তো বাঙ্গালীর বিধবা মা ধান ভেনে' সুতো কেটে প্রাণপাত করে' ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। তাই আমি মনে করেছিলুম যে বাঙালী, বিদ্যা ও বিদ্বানকে অবজ্ঞা করবে না, তাই আমি পাশ্চাত্য জ্ঞানীদের বলে এসেছিলাম যে 'তোমরা নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে আমাদের দেশে আসতে পার তোমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না।'

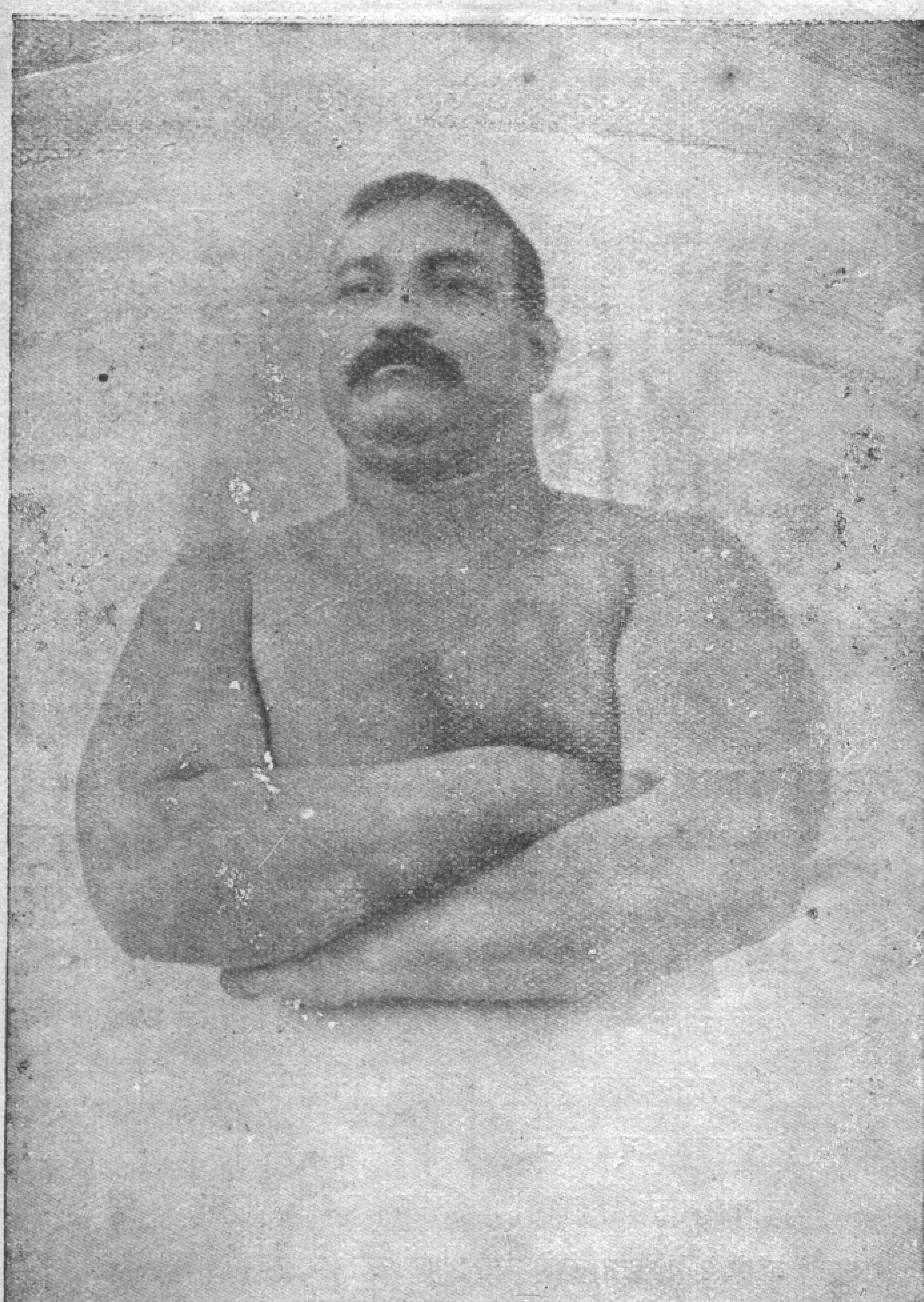
আমার এই আশ্বাস-বাক্যের সত্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি এইখানে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বৃহৎ মানব সমাজে যেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলচে সেখানে সত্য-হোমানলে আহুতি দেবার অধিকার আমাদেরও আছে; সমস্ত দেশ ও কালের জ্ঞান-সম্পদ আমরা আপনার বলে দাবী করতে পারি, এই গৌরব আমাদের; মানুষের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে, কোনো মোহ বশতঃ আমরা তার থেকে লেশমাত্র বঞ্চিত নই; আমাদের মধ্যে সেই বর্ব্বরতা নেই যা দেশকাল পাত্র নিরপেক্ষ জ্ঞানের আলোককে আত্মীয় রূপে স্বীকার করে না, তাকে অবজ্ঞা করে লজ্জা পায় না, প্রত্যাখ্যান করে' নিজের দৈন্য অনুভব করতে পারে না।

নব্যভারত, আশ্বিন ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# 'ভীম-ভবানী'

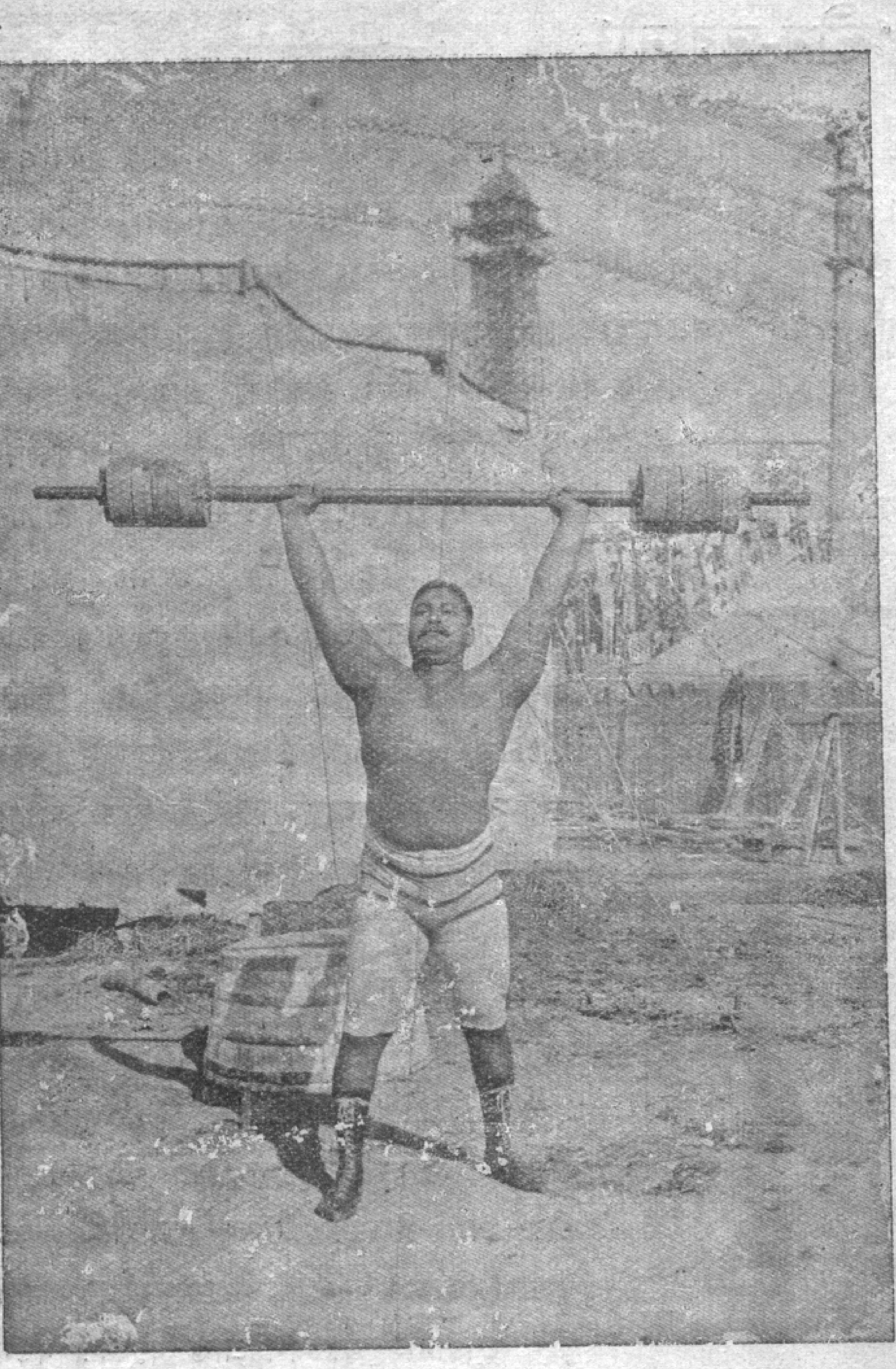
বাংলার নরম মাটিতে যে বীর্য্যের বীজ ফল্‌তে পারে, দু'চারজন বাঙালী গায়ের জোরে তার জোরালো প্রমাণ দিয়ে গেছেন। ভবেন্দ্রমোহন সাহা ছিলেন তাঁদেরই একজন। ভারতে তিনি "ভীম-ভবানী" নামে সুপরিচিত। গায়ের জোর ছিল তাঁর এম্‌নি অসাধারণ যে, লোকে এ-কালের এই বঙ্গযুবকটির তুলনা খুঁজতে গিয়ে, দ্বাপরের ভীমসেন ছাড়া আর কারুর নাম মনে আন্‌তে পারে-নি। বাঙ্‌লার দুর্ভাগ্য, গত ষোলোই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার ভীম-ভবানী ভরা যৌবনের জোয়ার নিজের বিপুল বুকের পাটার ভিতরে নিয়েও, মৃত্যুর বিধানে অকালে ইহলোক ত্যাগ ক'রে গেছেন।

বালক-বয়সে ভীম-ভবানী বিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিলেন। তখন গায়ের জোরেও তাঁর কোন বিশেষত্বের পরিচয় পাই-নি এবং লেখাপড়াতেও তিনি এমনধারা ছিলেন না, যাতে-ক'রে তাঁকে "সুবোধ বালক" বলা যেতে পার্‌ত। কিছুদিন পরে হঠাৎ মা-সরস্বতীর সঙ্গে আড়ি ক'রে তিনি পিঠটান দিলেন। তারপর বহুকাল আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। তাঁর স্মৃতি আমার মন থেকে একেবারে মুছে গেল।



ভীম-ভবানী
( মানসীর সৌজন্যে )

বছর-কয়েক আগে কলকাতার চারিদিকেই ভীম-ভবানীর নাম শুনতে লাগলুম। লোকের মুখে মুখে তাঁর সুখ্যাতি ক্রমেই বেড়ে উঠল। অনেকেই গল্প করতে লাগলেন, ভীম-ভবানী যে বার-বেল ভাঁজেন তার ওজন পাঁচমণ! তিনি লোহার কড়ির ওপরে ত্রিশজন লোক বসিয়ে নিজের কাঁধে তুলে সেখানা আকর্ণ-বিশ্রান্ত ধনুকের মতন বেঁকিয়ে ফেলতে পারেন! তিনি প্রত্যেক খানিতে পঞ্চাশজন ক'রে লোক বসিয়ে, একসঙ্গে দুখানা গরুর গাড়ীকেই নিজের বুক আর উরুর উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে দেন। তিনি সার্কাসের শেখানো নয়—প্রকাণ্ড বুনো হাতীর দেহের ভার অনায়াসে নিজের বুকের উপরে তুলতে পারেন! তিনি একসঙ্গে তিন-তিনখানা মোটর গাড়ীর গতি টেনে বন্ধ ক'রে রাখতে পারেন! এ-ছাড়া আরো নানারকম কাহিনী শুন্‌তে লাগলুম—স্বচক্ষে না দেখ্‌লে যে-সব কথা বিশ্বাস করা শক্ত।



ভীম-ভবানী পাঁচমণ বারবেল ভাজচেন।
( মানসীর সৌজন্যে )

মোহন—মা-সরস্বতীর প্রিয়পাত্র হ'তে না পেরে যিনি অসময়ে পাৎতাড়ি ফেলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছিলেন!

ভবানী যে বীণাপাণির নিরীহ ভক্তে পরিণত হ'তে পারেন নি, বাঙালীর পক্ষে সেটা সৌভাগ্যের কথা। বাংলা দেশের মাটিতে কি গুণ আছে জানি-না—এখানে লেখাপড়ায় যে যত ভালো, দেহের দিকে তার তত কম নজর! নিশ্চয়ই এটা আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যা-যন্ত্র চায়, দেহকে পিষে গুঁড়িয়ে মনকে জাহির করতে। তাতে মন হয়ত শিক্ষিত হয়, কিন্তু দেহটা এই সংসারের ঝড়-ঝাপ্‌টায় বেশীদিন টিকতে পারে না। ফলে মন শিক্ষিত হয়েও দেশের ও দশের কাজে আশামত আত্মনিয়োগে অক্ষম হয়। কারণ অকালে দেহের পতন হ'লে, শিক্ষিত মনের সার্থকতা কোথায়? দেহই তো মনের ভিত্তি!

ঠিক এর উল্টো দিকটাই নজরে পড়ে ইউরোপে আর আমেরিকায়। সেখানে একসঙ্গে দেহের ও মনের চর্চ্চা হবার চমৎকার সুযোগ আছে। প্রতীচ্যের বাসিন্দারা প্রমাণিত করেচে যে, দেহ-চর্চ্চার দ্বারা মনের শিক্ষা অধিকতর দ্রুত হয়ে ওঠে। কেবল তাই নয়, ব্যায়ামে সুদৃঢ় ও নীরোগ দেহ নিয়ে সেখানকার লোকেরা দীর্ঘজীবী হয়ে দীর্ঘকাল ধ'রে মনের সদ্ব্যবহার করতে পারে। আমাদের বাপ-মায়েরা সন্তানরা এম্‌এ-বিএ পাস করলেই ভেবে বসেন, এতদিনে তারা মানুষ হোলো। কিন্তু এমএ-বিএ পাস ক'রে পণ্ডিত হ'লেও সত্যিসত্যিই মানুষের মতন মানুষ তারা হয় কি? পথে-ঘাটে কতবার স্বচক্ষে দেখেচি—বড় বড় হোম্‌রা-চোম্‌রা 'গ্রাজুয়েটে'র তথাকথিত "মনুষ্যত্ব", ফিরিঙ্গীর ক্রোধ-কটাক্ষে লুণের স্পর্শে জোঁকের মতন শোচনীয়-রূপে সঙ্কুচিত হয়ে

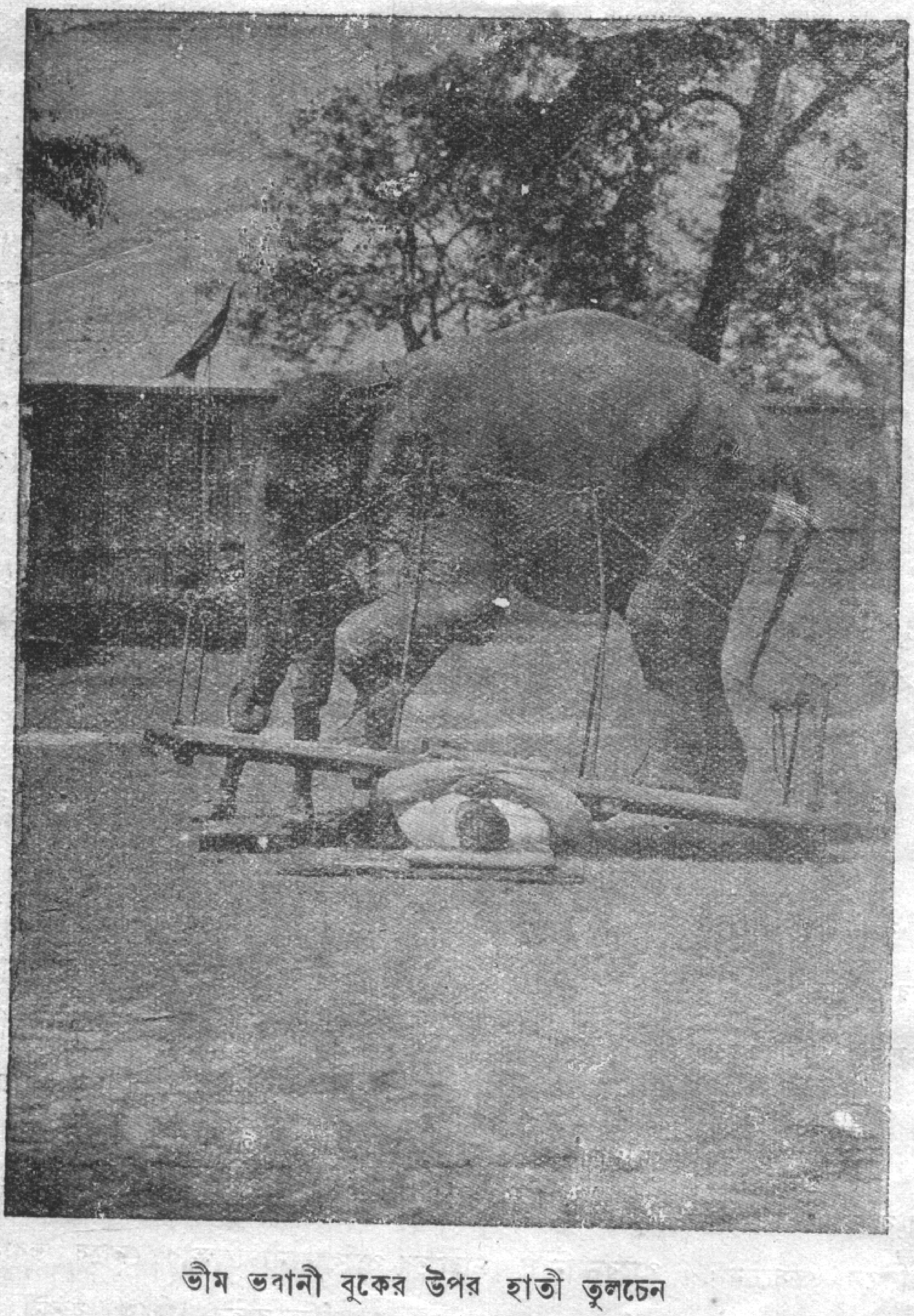
একদিন আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচরণ গুহের (গোবর পালোয়ান) বৈঠকখানায় ব'সে গল্প করছি, এমন সময়ে গোবর বল্‌লেন, "হেমেন্দ্রবাবু, ভীম-ভবানীর সঙ্গে আলাপ আছে?"

পিছন ফিরে দেখি, একটি মস্ত-বড় চেহারার যুবক হাস্য মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখখানা যেন চেনা চেনা মনে হোলো—কোথায় যেন আগে দেখেচি। একটু পরেই মনে পড়ল—ইনিই আমার সেই বাল্যকালের সহপাঠী ভবেন্দ্র

এককোণে স'রে যাচ্ছে। অথচ সামান্য কোন মূর্খ ও দরিদ্র কাবুলিওয়ালা, পাঠান বা পাঞ্জাবীর সামনে ঐ ফিরিঙ্গীই কখনোই দুই চক্ষুকে ও-রকম রক্তবর্ণ ক'রে তুলতে ভরসা পেত না। এখানে আসল মানুষ বলব কাদের? বিদ্বান বাবুদের? না, এই মূর্খ কাবুলী, পাঠান ও পাঞ্জাবীদের?

ভীম-ভবানী বিদ্বান ব'লে নাম কিনে বিয়ের বাজারে মেয়ের বাপদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি বটে,—কিন্তু তিনি যথার্থ মানুষ হয়েছিলেন,—যে-রকম মানুষ এই কোটি কোটি বাঙালীর জন্মভূমিতেও "কোটিকে গোটিক" মাত্র।

গোবর ও ভবানী দু'জনেই স্বর্গীয় পালোয়ান ক্ষেতুগুহের শিষ্য। প্রথম প্রথম ভবানী কুস্তি লড়াতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এই লড়ার অভ্যাসটা একটানা বজায় রাখতে পারলে আজ তিনি নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর কুস্তিগীর হয়ে দাঁড়াতেন। কিন্তু পরে তিনি নিয়মিত কুস্তির অভ্যাস ছেড়ে দৈহিক শক্তির বাহাদুরী দেখানোর দিকেই বেশী ঝোঁক দেন। মাঝে মাঝে কুস্তি লড়তেন বটে, জনকয়েক মাঝারি দরের দেশী-বিদেশী পালোয়ানকে হারিয়েও দিয়েছেন, কিন্তু তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষ-কিছু করতে পারেন নি।



ভীম ভবানী বুকের উপর হাতী তুলচেন

( মানসীর সৌজন্যে )

তবে দৈহিক শক্তির যে পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন, তাঁর আগে পৃথিবীর আর কেউ তা কল্পনাও করতে পারেনে। পূর্ব্বেই তাঁর যে-সব বাহাদুরীর উল্লেখ করেচি, সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বিখ্যাত বলবান রামমূর্ত্তি প্রথমে ভবানীকে সাদরে নিজের দলে নিয়েছিলেন। রামমূর্ত্তির কাছে ভবানী দৈহিক শক্তি প্রদর্শনের অনেক কায়দা শিখেছিলেন। কিন্তু শুনতে পাই, ছাত্রের বাহাদুরিতে নিজের গর্ব্ব খর্ব্ব হবার ভয়ে রামমূর্ত্তি পরে ভবানীকে আপনার দল থেকে সরিয়ে দেন। কথাটা যদি সত্য হয়, তবে এটা বলতে পারি যে, রামমূর্ত্তির ভয় মিছে-ভয় নয়। কেননা ভবানী গায়ের জোরের যে নমুনা দিয়েছেন, রামমূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত অতটা দেখাতে পারেন নি। বুকের উপর পঁচিশ জন লোকশুদ্ধ চল্লিশ মণ ভারি পাথর চাপানো, পাঁচজন লোক শুদ্ধ একটা সিমেণ্টের পিপেকে দাঁতের জোরে শূন্যে



স্যাণ্ডো" নামে যে শক্তিমান লোকটি এসে কিছুকাল আগে বিখ্যাত হন, ভবানী তাঁর কাছ থেকেও গুরু ভার উত্তোলনের কৌশল শিক্ষা করেছিলেন।

কিন্তু দৈহিক শক্তিরও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। ভবানী যে-শ্রেণীর ব্যায়াম-কৌশল দেখাতেন, দেহকে তা অতিরিক্ত পরিশ্রমে বাধ্য করে —কাজেই দেহের পক্ষে তা অনিষ্টকর। পাশ্চাত্য দেশের অনেক বলবান লোক এই রকম বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে অঙ্গহানি করেছেন—এমন কি পক্ষাঘাতগ্রস্তও হয়েছেন। ব্যায়ামে শক্তিবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য-রক্ষা হয় সত্যকথা—কিন্তু তা পরিমিত মাত্রার ব্যায়ামে। পরন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন, ত্রিশ-ব'ত্রিশ বৎসর বয়সের পরে এ-রকম গুরুতর ব্যায়ামের অভ্যাস ত্যাগ করাই উচিত।

ভীমভবানী এ-বিষয়ে সাবধান না হয়ে অন্যায় কাজ

ভীম-ভবানী মল্ল-ক্রীড়ার পোষাকে

( মানসীর সৌজন্যে )

তোলা, বুকে অশিক্ষিত প্রকাণ্ড হাতীর ভার-সওয়া ও একসঙ্গে তিনখানা মোটরগাড়ীর গতিরোধ করা প্রভৃতি ব্যাপার রামমূর্ত্তিরও দ্বারা কোনদিন সম্ভব হয় নি। কিন্তু ভেতো বাঙালীর ছেলে ভবানী ভারতের ভিতরে-বাহিরে এই-সব অমানুষিক শক্তির লীলা দেখিয়েই নাম কিনে এসেচেন। জাপানের সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁর শক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। কল্‌কাতায় "রাসিয়ান

করেছিলেন। কেননা আমাদের বিশ্বাস, এই অমানুষিক ব্যায়ামই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ। শেষ দিন ব্যায়াম-দেখিয়েই তাঁর মাথার ভিতরে ব্যথা হয়। তারপর তিনি শয্যাগত হন। সে শয্যা ছেড়ে আর তিনি উঠতে পারেন নি। ভারতের পালোয়ানী শিক্ষার দোষে ভবানীও দুর্ভাগ্যক্রমে আহার ও শক্তি-বৃদ্ধির দিকে যতটা দৃষ্টি দিয়েছিলেন, দেহের দিকে ততটা নজর দেন নি।

এটাও তাঁর অকাল মৃত্যুর আর এক কারণ হ'তে পারে।

সংপ্রতি তিনি গোবরের দিগ্বিজয়-ক্ষেত্র আমেরিকায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু সে সাধ তাঁর আর পূর্ণ হোলো না। তিনি বিবাহ করেন নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আন্দাজ তেত্রিশ।

নিজের বিভাগে ভীম-ভবানী খালি বাংলায় নয়, সারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। শ্যামাকান্ত, অম্বু গুহ, ক্ষেতু গুহ, গোবর ও তিনি হাতে-নাতে প্রমাণিত করেছেন, বাঙালী চেষ্টা করলে সবল হ'তে পারে না এ অপবাদ মিথ্যা। শ্যামাকান্ত ও গুহ-বীরদ্বয় পরলোকে, ভীম-ভবানীও আমাদের ফাঁকি দিলেন। কিন্তু এঁরা যে আদর্শ রেখে গেলেন, বাঙালী জাতি কবে তার অনুসারী হবে? বাঙালী কবে বুঝবে যে, মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করতে হ'লে বিদ্যার আগে দরকার শক্তি?--শক্তি—শক্তি, শক্তি বিনা গতিরনাথা - এমন-কি, দুর্ব্বলের ব্রহ্ম বা ধর্ম্মলাভও অসম্ভব—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ!" আমরা শাস্ত্র-ভক্ত ব'লে বিখ্যাত,—কিন্তু এই বিখ্যাত শাস্ত্র-বাণী আমরা ক'জন মানি?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# বাদল-রাতের গান

বাঁশী বাজে বাদল-রাতে
বৃষ্টিধারার সাথে সাথে,
বাঁশী বাজে, বৃষ্টি পড়ে
গাছের পাতায়, ঘরের ছাতে।

গভীর রাতে নিদ্রাহারা--
মনের ঘরে বেড়ায় কারা?
চম্‌কে ওঠে বাতির আলো,
দেয়ালে সব কালো-কালো
ছায়া নাচে—হাতটি হাতে,
বাদল-বাঁশীর সাথে সাথে!
আলে-কাঁপে, ছায়া নড়ে—
দেখ্‌ছি শুয়ে বিছানাতে।

বাঁশী বাজে ব্যাকুল শ্বাসে,
বৃষ্টি-ধারায়, বিজন বাসে।
হারা-দিনের স্বপনগুলি
চোখের পাতা দেয় যে খুলি,'
যা' ছিল যা' হবে না আর—

বাজায় বাঁশি বাদল-রাতে,
বৃষ্টিধারার সাথে সাথে!

বৃষ্টি পড়ে ঘরের ছাতে—
জ্যোৎস্না নামে আঁখির পাতে!
বাদল-মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
চাঁদ ওঠে যে—কোকিল ডাকে!
বাদল-ধারায় বাঁশি বাজে
দুপুর-রাতে প্রাণের মাঝে!

একটি সে পথ ছায়ায়-ঢাকা,
আঁধার-আলোর মায়ায় মাখা—
সেই সে পথে এক তরুণী
—এখনো তার কাঁকণ শুনি—
ভর্‌তে আসে কলসটিরে
হাসির গাঙে, সুখের নীরে!
হঠাৎ গেল পথ হারিয়ে—
কার ঘরে সে উঠ্‌ল গিয়ে!
আজকে যে তা'র সে মুখখানি,

নিদ্রাহারা আঁখির পাতে
স্বপন দেখায় বাদল-রাতে !

বাদল-মেঘের অশ্রুজলে
দেখ্ছি যে তার কুম্ভ ভরা,
উছ্‌লে ওঠে কক্ষতলে,
আঁকড়ে তবু বক্ষে-ধরা !
দাঁড়িয়ে ঝুঁকে শিথান 'পরে,
বৃষ্টিধারার গান সে করে !
কালো চোখে পলক যে নাই,
কালো কেশের দিশা না পাই !
কেবল অধর তেম্‌নি আছে—
তেম্‌নি রাঙা, বুকের আঁচে !
সেই সাহসে মনের ভুলে
দিতে গেলাম মুখটি তুলে—
জান্‌লা ঠেলে দম্‌কা হাওয়া
ধমকে বলে, "আবার চাওয়া !
সিঁদুর ও যে সিঁথির রেখায়—
পরের ঠোঁটে চুমু কি খায় !"

বাঁশী বাজে বাদল-রাতে
বৃষ্টিধারার একটানাতে,
'হ'ত যা' তা' আর হবে না'—
গাইছে তার সাথে সাথে !
আবার স্বপন ঘনিয়ে আসে,
বাঁশী বাজে ব্যাকুল শ্বাসে,
গাছের মাথায় বাতাস মাতে,
গভীর দুপুর-বাদল-রাতে ।
আলো কাঁপে, ছায়া নড়ে—
দেখ্ছি শুয়ে বিছানাতে ।
বাঁশি বাজে—বৃষ্টি পড়ে
গাছের পাতায়, ঘরের ছাতে ।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ।

---

# পরের ছেলে

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কয়দিন হইতে রায় ষ্টেটের কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা মহা-উত্তেজনা পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের সদর কাছারির মধ্যেই কালেক্টর সাহেব বাহাদুর শীকারের ব্যপদেশে আসিয়া ডাক্ বাঙ্গলায় আস্তানা গাড়িয়াছেন এবং গ্রামের উত্তরে যে প্রকাণ্ড বিল্ আছে তাহাতে পক্ষী শীকার করিতেছেন। একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রয়ী শক্তির বিকাশ স্বয়ং তাহাদের সান্নিধ্য স্বীকার করায় তাহারা সালোক্য হইতে সাযুজ্য প্রাপ্তির গর্ব্বে কি উপায়ে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে, তাহার শত শত উপায়-উদ্ভাবনে তাহাদের প্রধান দিগের মস্তিষ্ককে নিযুক্ত রাখিয়াছে এবং অপ্রধানরা গ্রামের তাহাই আহরণ করিয়া প্রভুর সেবার্থে ডালি পাঠাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। কেহ-বা তাঁহার শীকারের সর্ব্ব প্রকার সুবিধার উপায়ে এবং সে সময় তাঁহার শ্রমাপনোদনের বন্দোবস্তের তদ্বিরে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে। স্বয়ং ভগবান যদি রায় ষ্টেটে অতিথি হইতেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সমাদর বেশী পাইতেন কি কম পাইতেন, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল।

ম্যানেজার বাবু কর্ত্রীর নিকটে সাহেব-সম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের এই পরিচর্য্যায় সাহেব যে বিষম সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার এই সন্তোষ শীঘ্রই যে কোন না কোন মূর্ত্তিতে তাহাদের বালক-প্রভুর উপর বর্ষিত হইবে, সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া

বিনয়ের একটু নিন্দা করিয়া নিজের মনের ক্ষোভটাও নিবারণ করিতেছিলেন। বিনয়বাবু অন্যান্য বিষয়ে বুদ্ধিমান হইলেও এগুলি মোটেই বোঝেন না, তাই ষ্টেটের এমন একটা শুভযোগের সন্ধিস্থলেও অমন উদাসীনভাবে নিজের নির্দিষ্ট কাজেই নিযুক্ত আছেন। আমাদের এই ব্যস্ততাকে বরং তিনি একটু ঠাট্টাই করিতেছেন। উনিই এখন বাস্তবতঃ কিশোর বাবুর একজন অভিভাবক। স্বর্গগত কর্তা এবং বর্তমান কর্ত্রী দুজনেই বিনয়বাবুকে সাদরে যখন এই পদেই বরণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার উচিত নয় কি যে কিশোরের যাহাতে মঙ্গল হয় সে বিষয়ে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা?—এই যে সাহেব আমার মুখে নিঃসন্তান কর্তা মহাশয়ের এই সন্তান লওয়ার খবরে খুব সন্তোষ প্রকাশ করে' কিশোর বাবু কত বড় ও কেমনটি হয়েছেন একবার দেখতে চেয়েছেন, বিকেলে তাকে নিয়ে গিয়ে সাহেবকে সেলাম করিয়ে আনতে হবে তো! তা বিনয়বাবুকে বললে তিনি কি যাবেন? সেই আমাকেই হয়ত যেতে হবে, কিন্তু—

বাধা দিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "সে কি? আমি বললে আর কিশোরের দ্বারা যেটা করানো অবশ্য-কর্তব্য ব'লে বুঝবে সে কাজ বিনয় নিশ্চয়ই করবে। আপনি মিথ্যা ভাবচেন। আমি বললেই বিনয় নিশ্চয় যাবে। আমি তাকে এখনি এ কথা বুঝিয়ে ব'লে রাখ্‌ছি।"

বৈকালে বিনয় নিজ কক্ষে বসিয়া তাহার বেহালাখানিকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিল। কিছুদিন হইতেই আবার তাহার জীবনের সঙ্গীকে মনে পড়িয়াছিল। কাজের অবসরে এই রকমে এখন সে নিজের অন্তরের অব্যক্ত ক্রন্দনকে সুরে ঝরাইয়া ফেলিয়া আবার তাহাকে কিশোরের কার্য্যে নিযুক্ত করিত। নিজের আর তাহার কিসের সংসার, কিসের কাজ!

সে ইমন গাহিতেছিল, সেই উদাস গানটি—

"ঘাটে বসে আছি আনমনা"

* * * *

দিন যায় ওগো দিন যায় দিনমণি যায় অস্তে,
নাহি হেরি বটে দূর তীরে মাঠ ধূসর গোধূলি ধূলিময়।"

যখন ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার আর্ত্ত উদাস সুরে বাজিতেছিল,

"ঘরের ঠিকানা হলনাগো মন করে তবু যাই যাই—"

সেই সময়ে রাজেশ্বরীর অনুরোধ তাহাকে আসিয়া মনে করাইয়া দিল, গাড়ী তৈয়ারী! এখনি কিশোরকে লইয়া তাহাকে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে।

ধীরে ধীরে বিনয় বেহালাখানিকে নামাইয়া রাখিল। গানের ভাষার ঢেউ অন্তরে তখনো উলটি পালটি করিয়া তাহার মনকে দুকূল-হারা করিয়া দিতেছিল,—

"তীর হ'তে হের শত ডোরে বাঁধা আছে মোর তরীখান
রসি খুলে দেবে কবে মোরে ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।"

শত ডোর নয় একটিমাত্র, কিন্তু তাহারই এমন সুদৃঢ় বন্ধন যে "রসি খুলে দেবে কবে মোরে" এ কথাটুকু মাত্র উচ্চারণ করিবারও ক্ষমতা তাহার কোথায়! "ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ!" মিথ্যা, মিথ্যা এ গান গাওয়া তাহার!

"ছোটবাবু পোষাক পরতে গেছেন, আপনি ঠিক্ হ'য়ে নিন্—গিন্নিমা বললেন।" পুনর্ব্বার পরিচারকের দ্বারা এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বিনয় তখন উঠিয়া দাঁড়াইল।

হাঁ, যাইতে হইবে বৈকি! কিশোরের প্রয়োজনে তাহাকে কি না করিতে হইতেছে, এখনো কি না করিতে হইবে! তাহার আর কিসের লজ্জা, কিসের ব্যথা? লোকে দেখিয়া না হয় মনে করিবে, একটা নির্লজ্জ হৃদয়হীন ব্যক্তি! স্বচ্ছন্দে আপনার একমাত্র ধনকে পরকে দিয়া কেমন অম্লান মুখে লোক-সমাজে আসিয়া দাঁড়ায়! এই সেই বাপ যে মজুর খাটিয়াও আপনার একটিমাত্র সন্তানকে প্রতিপালন করিতে পারে নাই, পরকে বিলাইয়া দিয়াছে। সাহেবটা হয়ত মনে করিবে, পয়সার লোভে ক্ষমতা-প্রতিপত্তির লোভেই বুঝি এ লোকটা এ কাজ করিয়াছে! নিজের একটি ছেলেকে পালন করিতে পারে না, এমন অকর্ম্মণ্য জগতে আছে, এ কথা ঐ পশ্চিমের লোকটা কখনই বিশ্বাস করিবেনা। ঠিক্ বুঝিবে, এই এষ্টেটের মালিক হইবার জন্যই এই হেয় লোকটা এ কাজ করিয়াছে এবং সেই ছেলের সঙ্গে তাহার অভিভাবক সাজিয়া আসিতে ইহার লজ্জাও করে নাই!

কাপড়-জামা পরিতে পরিতে বিনয় মনে মনে হিসাব

করিতেছিল, আজ কয়দিন মাণিক তাহার সহিত একটা মুখের কথাও কহে নাই। বুঝি আজ দুইদিন হইতে দিনান্তে তাহার সহিত একবার চোখোচোখিও হয় নাই! যে দু-একবার বিনয় কোন-কিছুর অছিলা করিয়া তাহার পড়ার ঘরে গিয়াছে, তখন মাণিক যেন ইচ্ছা করিয়াই মুখখানা বইয়ের মধ্যে একেবারে গুঁজিয়া রাখিয়াছিল। তাহার সহিত একসঙ্গে কোথাও যাওয়া সেই রাঁচির পর এই তিন-চারমাস বাদে আজ রাজেশ্বরীর অনুরোধ ও জোর আদেশেই যে সংঘটিত হইতেছে, তাহা বিনয় বেশ বুঝিতে পারিতেছিল!

সত্যই কি তবে মাণিক তাহাকে—কি ভাবে?—কি মনে করিয়া সেগুলা করে? উভয়ের সম্বন্ধ স্মরণে আসে অথচ উভয়ের এইরূপ পর হইয়া যাওয়ার জন্য এক অব্যক্ত কষ্ট যাহা লজ্জার আকারেই আত্ম-প্রকাশ করে, তাহারই প্রভাবে কি মাণিক তাহার নিকটে আসিতে চায় না? সুমুখে পড়িলে মুখ ফেরায়? বসিয়া থাকিলে মুখ লুকায়? অথবা এ কি মাণিকের ঘৃণা—তাচ্ছিল্য—দেখিতেই না পারা? কি এ!

বিনয়ের মনে হইতেছিল, তাহার হৃদয়কে যেন একটা লৌহ মুঠিতে কে সজোরে চাপিয়া ধরিতেছে! নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, শরীর দুলিয়া উঠিতেছে! ধপ্ করিয়া বিনয় একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই আদেশ,—"দেরী করবেন না বাবু, চলুন, খোকাবাবু গাড়ীতে উঠেছেন, সাহেবের সঙ্গে দেখা করার সময় নষ্ট হয়ে যাবে।"

ঠিক্! নূতন করিয়া কেন আর এ-সব চিন্তা! এ-সব সমস্যার কি সেই একদিনেই মীমাংসা হইয়া যায় নাই—যেদিন মাণিককে সুস্থ করিতে না পারিয়া বিনয় মামীর নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিল!

এক রকম টলিতে টলিতেই বিনয় সেই অর্দ্ধ-সমাপ্ত বেশে সদরে গিয়া গাড়ীর পা-দানে পা দিল। তাহার বেশ ও ভাব দেখিয়া সকলেই একটু বিস্মিত ভাবে তাহার পানে চাহিতেছিল। গাড়ীর নিকটে ম্যানেজার দাঁড়াইয়া করিতে হইবে, সে বিষয়ে তখনো বালককে তালিম্ দিতেছিলেন। সহসা কিশোর পিতাকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "এ কি! আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না ম্যানেজারবাবু! উনি কেন?"

ম্যানেজার কি বলিল, তাহা আর বিনয়ের কাণে গেল না, শুধু তীক্ষ্ণ বাণের মত, ছোট একটু বাজের মত, মাণিকের তীব্র কণ্ঠস্বর আবার তাহার কাণে আসিল, "মা বলুন! বিনয়বাবু গেলে আমি যাব না।"

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী হইতে ছিট্‌কাইয়া কিশোর বাহির হইয়া পড়িতেই যে একটা অস্ফুট কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল এবং খানিকক্ষণ গণ্ডগোলের পর ম্যানেজার এবং মাষ্টার উভয়ে যে কিশোরকে লইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গিয়াছে, এ-সব ঘটনা গেটের কাছে প্রস্তরমূর্ত্তির মত দণ্ডায়মান বিনয়ের যেন একটা স্বপ্নের মতই অস্পষ্টভাবে মনে আসিতেছিল! কেবল কানে বাজিতেছিল, সেই স্বর—সেই কথা কয়টি! "উনি কেন?...বিনয়বাবু গেলে আমি যাব না।"

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই রাজেশ্বরীর মনে পড়িল, বিনয়ের কথা, সে কি করিতেছে! রাত্রে কয়েকবার খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলেন সে নিজ-কক্ষেই আছে। আহার করে নাই বোধ হয়। তবে সেজন্য তাহাকে কেহ যেন পীড়াপীড়িও না করে, সে বিষয়ে রাজেশ্বরী সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। পাচক গিয়া নিঃশব্দে তাহার শয়ন-কক্ষে খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া আসিয়াছে! এরূপ মাঝে মাঝে তাহাদের করিতে হইত। কথাটা সকলে জানিলেও বিনয়ের আচরণে কোন-কিছু প্রকাশ পায় নাই। তথাপি রাজেশ্বরী কি এক অজ্ঞাত ভয়ে কেমন যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিলেন।

খবর পাইয়া জানিলেন, বিনয় নিজের ঘরেই আছে। তখন তিনি একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া স্নান পূজা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। অন্যান্য দিনের মতই

দাসী রোহিণী আসিয়া জানাইল, বিনয় বাবু এখনো বাড়ী আসেন নাই বা স্নানাহার করেন নাই।

চমকিত হইয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "সে কি! এই তো সকালে বল্‌লি, সে নিজের ঘরে আছে!"

"তাই তো ছিলেন,—তারপর কখন বেরিয়ে গেছেন, কে জানে!" ব্যাপার কি? বাহির হইতে এইটুকুমাত্র খবর পাওয়া গেল, বিনয় বাবু সকালে বেড়াইতে বাহির হন, এখনো পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই।

রাজেশ্বরীর নিঃশব্দে অভুক্ত অবস্থায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকার সংবাদ ক্রমশঃ ম্যানেজার প্রভৃতির কর্ণগোচর হওয়ায় তখনি চারিদিকে লোক ছুটিল। ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে চারিদিকের গ্রাম ওলট-পালট করিয়া আসিয়া তাহারা সংবাদ দিল, বিনয় বাবুর সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি কোথায় গিয়াছেন কেহই তাহা বলিতে পারে না।

রাজেশ্বরী তেমনি অভুক্ত অবস্থাতেই সমস্ত দিন কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার বাক্য-রহিত অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রিয় দাসী রোহিণীও তাঁহাকে খাইবার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিতে সাহস পাইল না; কেবল মাঝে মাঝে বলিল, "মন খারাপ হয়েছে—তাই দু-দশ দিনের জন্যে হয়ত কোন দিকে বেড়াতে গিয়েছেন, মনটা ভাল হলেই আবার ফিরে আসবেন।"

এ সম্ভাবনার কণামাত্র কিন্তু রাজেশ্বরীর মনে উদয় হইল না। যদি সে ফিরিয়াই আসিবে তাহা হইলে এমন ভাবে কখনই যাইত না। তিনি বিনয়ের ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত ঘর হাতড়াইতে লাগিলেন, যদি সে তাঁহাকে কিছু লিখিয়া গিয়া থাকে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, তাঁহাকে বিনয় পত্র লিখিয়া যাইবে, এ কি সম্ভব! আজ বিনয়ের এ অবস্থার মূল কারণ কে? এখন তিনি বিনয়কে যতই স্নেহ দেখান, সে কি সে কথা ভুলিতে পারে? কাহার অসংযত লোভেরই এই ফল!

বিনয়ের ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া রাজেশ্বরী ভাবিতেছিলেন, আজ যদি কর্ত্তা থাকিতেন! তখনি মনে হইল, তিনি থাকিলে এ কাণ্ডের সূত্রেরও সৃষ্টি হইতে পাইত কি? এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বাপর ঘোর অনিচ্ছার কথা এবং সর্ব্বশেষ তাঁহার পত্নীকে শপথ গ্রহণ করানো, সমস্তই জল্ জল্ করিয়া তাঁহার মনে আগুনের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। মৃতের যদি এই মর্ত্ত্যভূমির সঙ্গে জীবনান্তে কোন সম্বন্ধ থাকে—ইহার সুখ-দুঃখে যদি তাহারও কোন যোগসূত্র থাকে, তাহা হইলে আজ স্বর্গবাসী স্বামী তাঁহার উত্তরাধিকারীর এই অবস্থা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন? রাজেশ্বরীর তো অবিদিত নাই, তিনি কাহাকে নিজ সম্পত্তির মালিক করিয়া গিয়াছেন! যদি বিনয়ের দৃঢ়তাটুকু ভগবান মাণিকের রোগ দিয়া না ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে রাজেশ্বরীর অন্য দত্তক-গ্রহণ ক্ষমতায় কুলাইত কি! বিনয়কে ভয় দেখাইবার জন্য যে ষড়যন্ত্রই তিনি করুন, অন্য কাহারো পুত্রকে গ্রহণ করিবার শক্তি তো তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত হইত না। তাহা হইলে আজ বিনয় যে সর্ব্বস্বের মালিক হইয়া থাকিত! আজ তাহা হইলে কি তাহাকে তাহার মাণিকেরই তাচ্ছিল্যে এমন করিয়া দেশত্যাগী গৃহত্যাগী হইতে হইত!

কিন্তু কেন বিনয় এমন কাজ করিল? যাহা হইবার তা তো হইয়া গিয়াছিল, সেও তো শেষে শান্ত হইয়া তাহার মাণিকের শুভার্থী হইয়াই এ সংসারে আসন গ্রহণ করিয়াছিল! আজ সেই মাণিক তাহাকে অবহেলা করিলেও বিনয়ের মাতুল-দত্ত সম্পত্তির তো অভাব ছিল না! সে কেন এমন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া চলিয়া গেল?

কেন গেল, তাহাও রাজেশ্বরীর অবিদিত ছিল না! তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ কাঠের মত হইয়া তিনি কেবল বসিয়া বিনয়ের ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন! কিছুই কি সে লইয়া যায় নাই? তাহার সাধের বেহালাখানি—সেখানিও তো ঐ পড়িয়া রহিয়াছে! মাতুল-দত্ত দ্বিতীয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত যে সে স্পর্শ করে নাই, তবে আর অন্য কিছু কি লইবে? সে যে সজোরে নিজের প্রাপ্য সম্পত্তিই দখল করিতে পারিত! তাহা যখন সে তুচ্ছ তৃণের মত ত্যাগ করিয়া গেল, তখন নিজের জীবনোপায়ের কথা কি ভাবিয়া গিয়াছে? জীবনের কথা সে আজ একেবারেই হয় তো ভাবে নাই।

গভীর রাত্রে রোহিণী দাসী আসিয়া যখন তাঁহাকে

একবার "মা, খোকাবাবু ছট্‌ফট্ করচেন, একা বোধ হয় ঘুমুতে পাচ্চেন না, আপনি আসুন" বলিয়া ডাকিয়াছিল, তখন অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রাজেশ্বরী উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার যেতে দেরী হবে। তুই ঘরের মেঝেয় শো গিয়ে।" এখন আবার প্রভাতে আসিয়া সে তাঁহাকে সেইভাবেই বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "মা আপনার অসুখ করবে যে!"

রাজেশ্বরী অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার যেন কাহাকেও মুখ দেখাইতেও লজ্জা করিতেছিল।

দাসী আবার বলিল, "খোকাবাবু খাচ্চেন না—আপনাকে ডাকছেন যে, উঠুন।"

রাজেশ্বরী এইবার তাহার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমায় ডাক্‌ছে কি?"

দাসী এইবার আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "মুখ ফুটে ডাকেন নি, তবে মুখ ধুলেন না—খেলেন না, উঠেই পড়ার ঘরে চলে গেলেন—বারণ কর্‌লেও শুন্‌লেন না, তাই—"

সে যে মুখ ফুটিয়া এখন তাঁহাকে ডাকিবে বা এ সম্বন্ধে কাহারো কাছে কোন একটু কিছু দন্তস্ফুট করিবে, এমন স্বভাবই যে তাহার নয়, তাহা এই কয় বৎসরে রাজেশ্বরী বেশই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহা করিবার সে করিবে, কিন্তু সে সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার মুখে শুনিতে পায় নাই, এইটুকু-ছেলের এই দৃঢ় স্বভাবের কথা ভাবিতে রাজেশ্বরীর অন্তর আজ ভয়ে যেন শিহরিয়া উঠিল। এত দিন এই সব ধাক্কা এই সব আঘাত সহিবার বুঝি তাঁহার একজন দোসর ছিল! বিনয়ের অভাবে আজ তাঁহার নিজের একজন সমব্যথী গেল বলিয়া নিজেকে সংসারে একেবারে একা বলিয়াই তাঁহার মনে হইল! এখন হইতে যাহা কিছু সে করিবে, সব একা তাঁহাকেই বুক পাতিয়া বহন করিতে হইবে! তাঁহার কোন ব্যথার যে কিশোর কখনো অংশ গ্রহণ করিবে, এমন আশা ক্রমশঃই তাঁহার লোপ পাইতেছিল। পরের ছেলে আপন করিতে চাওয়ার এই ফল। এই যে সমস্ত রাত্রি তিনি এইভাবে এখানে পড়িয়া আছেন—সে কি কিছু জানে নাই, না, বোঝে নাই? তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং ততোধিক তীক্ষ্ণ অনুভব-শক্তির পরিচয় তো পদে পদেই পাওয়া যায়; তবে রাজেশ্বরীর সুখ দুঃখ আঘাত বা বেদনার প্রতি সে এত উদাসীন কেন? সে কি একবার "মা এস" বলিয়া আজ দ্বারের কাছে দাঁড়াইতে পারিত না? আর এই যে কাণ্ডটি হইল—অতখানি স্নেহময় বাপ যে তাহার ব্যবহারে এমন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া গেল, সেজন্যও কি তাহার একবার অনুতাপ বা কষ্ট বোধ হইতেছে না? দাসদাসী লোকজনগুলা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার কি একটু ক্ষোভও হয় নাই? তা যদি হইত তো নিশ্চয় সে রাজেশ্বরীর নিকটে আসিত! বিনয়ের যে কতখানি স্নেহ তাহার উপর ছিল, সে-ই যে বিনয়ের সর্ব্বস্ব ছিল, তাহা তো সে জানিত! যখন সেই স্নেহের কিশোর এই প্রতিদান দিল, তখন রাজেশ্বরী নিজের ভবিষ্যতের মূর্ত্তি দেখিয়া যেন দ্বিগুণ স্তব্ধ হইয়া গেলেন! এই হৃদয়হীন ছেলে কি তাঁহাকেই মানিবে? তাঁহার এই শতব্যথা শতঝঞ্ঝা-সহনকারী চিরদিনের আকুল স্নেহের আনুগত্য মানিবে?—কখনই নয়! তাহা হইলে, বিনয়ের প্রতি তাহার এ ভাব হইত না!

এবারে যখন দাসী ফিরিয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "মা, খোকাবাবুর যে জ্বর হয়েছে,—মাষ্টার মশায় নিয়ে এসে বিছানায় তাঁকে শুইয়ে দিয়ে গেলেন," তখন রাজেশ্বরী ধীরে ধীরে উঠিয়া কিশোরের শয়ন-কক্ষের দিকে চলিলেন। অন্ততঃ এমনি যা হোক একটা কিছু সংবাদ নহিলে তাঁহার পা যেন এতক্ষণ পর্য্যন্ত উঠিতে পারিতেছিল না! ছেলের জ্বর হইয়াছে,—হউক, এই একেবারে 'কিছুই-নয়ে'র চেয়ে এও যেন প্রার্থনীয়! শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য বা কাল খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকার জন্য ঠাণ্ডা লাগিয়াই হয়ত কিশোরের এ জ্বর-ভাব,—তবুও রাজেশ্বরী ইহাতে যেন একটু পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার বস্তু পাইলেন।

( ক্রমশঃ )

# চয়ন

## জার্ম্মাণী এখন কি পড়ে

### রবীন্দ্রনাথের আদর

আজকাল জার্ম্মাণরা যত বই কিনচে ও পড়চে, তত আর কখনো দেখা যায়-নি। যে-সব বইয়ে কল্পনাবাদ থাকে, জার্ম্মাণীতে এখন সেইগুলিরই বেশী কাট্‌তি হয়। অবশ্য প্রণয়-মূলক পুস্তকেরও কাট্‌তি খুব এবং অন্যান্য দেশের মতন জার্ম্মাণীতেও এখন প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থমালার পাঠকের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গেছে। কিন্তু সব চেয়ে প্রাধান্য হয়েচে সেই শ্রেণীর পুস্তকের, যাতে দার্শনিকতার হাল্‌কা দিকটা ফুটে উঠেচে।

জার্ম্মাণীর মধ্যে এখন সব-চেয়ে জন-প্রিয় জাতীয় দার্শনিক হচ্ছেন হার্ম্মান কিয়ারলিং। নিট্‌সের অগ্নিময় ধর্ম্ম-মতের উপরে আজ স্থান পেয়েচে, রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত দার্শনিকতা। যুদ্ধের আগে নব্য জার্ম্মাণদের কাছে প্রিয় ছিলেন নিট্‌সে, এখন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সাফল্য বিস্ময়কর—এ বৎসরে আর কারুর বই তাঁর চেয়ে বেশী বিক্রী হয় নি। ভারতের এই স্বপ্ন-বিলাসীর কাছে জার্ম্মাণীর কোন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার বা কবি এগুতে পারেন নি। প্রত্যেক পুস্তক-বিক্রেতার জানলাতেই রবীন্দ্রনাথের নানা সংস্করণের ও নানা মূল্যের গ্রন্থাবলী সাজানো আছে। রবীন্দ্রনাথের সব-চেয়ে সস্তা যে বই বিক্রী হয় তার দাম পনেরো মার্ক (১মার্ক—বারোআনার কিছু কম)। রবীন্দ্র-নাথের এক সেট গ্রন্থাবলীর দাম ২৫০ মার্ক থেকে ৩০০ মার্ক পর্য্যন্ত। (পাঠক মনে রাখবেন যে, রবীন্দ্রনাথের রচনার কিয়দংশ মাত্র ইউরোপে ভাষান্তরিত হয়েচে।) উলফ নামে প্রকাশক রবীন্দ্রনাথের আট লক্ষ বই বিক্রী ক'রে ফেলেছে।

জার্ম্মাণীতে ঔপন্যাসিকের আদর এখন বড় বেশী নয়। জার্ম্মাণরা কেবলমাত্র নাটকের অভিনয় দেখেই খুসি হয় না—নাটক না কিনে পড়লে তাদের মন মানে না। কাজেই সেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকাবলীর পাঠক এখনো সব-চেয়ে বেশী। জার্ম্মাণীর জাতীয় নাট্যকারদের মধ্যে বর্ত্তমানে হপ্‌টম্যানের স্থান সর্ব্বোচ্চে। আজ তাঁর বয়স ষাট বৎসর এবং তাঁর আদর এখনো ক্রমেই বেড়ে চলেচে। আধুনিক নাটকে হপ্‌ট্‌ম্যান মানুষকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর স্তরে তুলতে চেষ্টা পেয়েছেন।

বার্ণার্ড স'র নাটকও জার্ম্মাণীতে বেশ কাটে। তবে তাঁর আগেকার এবং লঘুতর মিলনাত্মক নাটকগুলিরই ক্রেতা অধিক।

জার্ম্মাণ সাহিত্যে এখন সবল জীবনী-শক্তি প্রকাশ পেয়েচে। যদিও বই ছাপাবার খরচ আগের চেয়ে বিষম-রকম বেড়ে উঠেচে, তবু জার্ম্মাণীর পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকদের উন্নতির আর অবধি নেই।

---

## "বিজয়ী মানব"

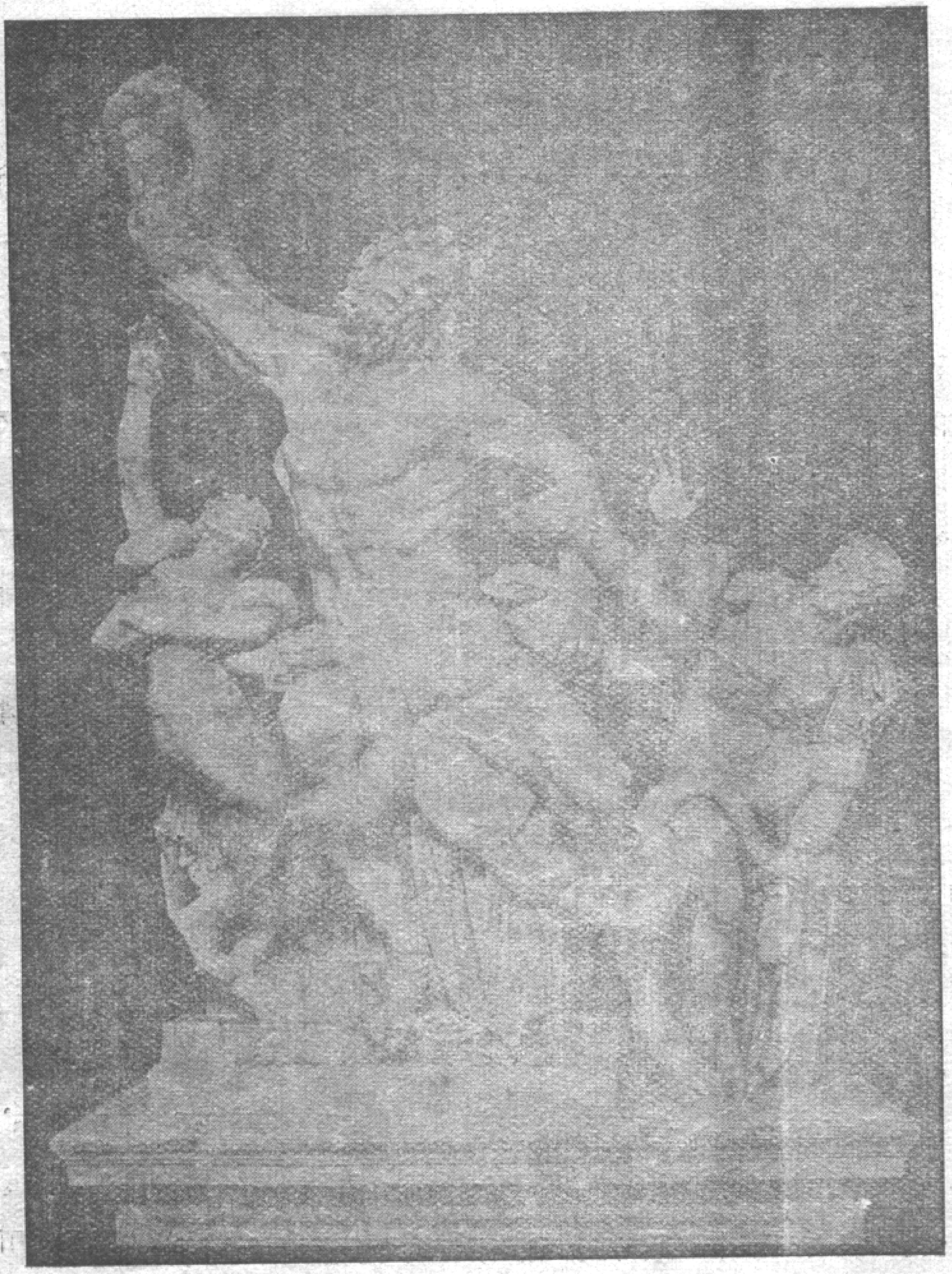
ডেভিড এড্‌স্‌ট্রম জাতিতে 'সুইডিস-আমেরিকান'। আজকাল ভাস্কর্য্য-কলায় তাঁর নাম সকলের কাছেই পরিচিত হয়েছে। সংপ্রতি তিনি একখণ্ড মর্ম্মর-শিলার উপরে মানব-জীবনের সমস্ত রহস্য—তার মূল, তার গভীর অর্থ, তার ক্রমোন্নতির পদ্ধতি এবং তার বিপুল পরিণাম—অপূর্ব্ব কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ইংরেজী প্রবাদে বলে, চিন্তা হচ্ছে বস্তু। কথাটা মিথ্যা নয়। এড্‌স্‌ট্রমের চিন্তা বা কল্পনা এই জাতীয়। পাথরের উপরে তিনি যে চিন্তাগুলি লিখে রেখেছেন, জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মানুষকে তা শান্তির প্রসাদ এনে দেবে। তাঁর "বিজয়ী মানব" ললিত কলায় একখানি অমর মহাকাব্যের মত বিরাজ করবে।

প্রাচীন গ্রীক ভাস্করের গড়া "লায়োকুনে"র নাম এখন সকলেই জানেন। নিয়তির কঠিন কবলে প'ড়ে মানুষ যে ভগবানের খেলাঘরের খেলনায় পরিণত হয়, "লায়োকুনে"

প্রতিমূর্ত্তি। এড্‌স্‌ট্রম স্থির করলেন, তিনি তার বিপরীত দিকটাই দেখাবেন। তাঁর "বিজয়ী মানব" সেই চিন্তারই ফল। এখানেও সেই সাপে ও মানুষে বিরোধ চলেছে—কিন্তু মানবই এবারে বিজয়ী। এর মধ্যে গল্পত্ব আছে যেটুকু, তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এড্‌স্‌ট্রমও রূপকের মধ্য দিয়ে মানুষের চিরকালের জীবন-সংগ্রামকেই প্রকাশ করেছেন—তাঁর অবলম্বিত গল্পের ভিতর থেকে আসল অর্থটুকু ধরতে না পারলে, "বিজয়ী মানবে"র সৌন্দর্য্য কিছুই বুঝতে পারা যাবে না।

"বিজয়ী মানবে"র স্তম্ভ-মূলের চারিদিকে আরো চারখানি শিলা-চিত্র আছে। তাতেও প্রায় ষাটটিরও বেশী মূর্ত্তি ক্ষোদিত হয়েছে। প্রথম চিত্রফলকে দেখানো হয়েছে, সাধারণ দৈনন্দিন জীবন। দ্বিতীয় ফলকে, বিচার-শক্তির দ্বারা বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কি লাভ করেছে। তৃতীয় ফলকে মানুষের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান স্বপ্রকাশ। ললিতকলার মধ্য দিয়ে মানুষের বিজয়-পুলককেই শিল্পী দেখাতে চেয়েছেন। চতুর্থ ফলকের বিষয়, দেশাত্মবোধ, আত্ম-ত্যাগ, নিঃস্বার্থ পরোপকার ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা মানুষের সিদ্ধিলাভ। এই চারিখানি চিত্রফলকের সঙ্গে স্তম্ভ-শীর্ষের তিনটি বিপুল-দেহ যুবক-মূর্ত্তি দেখলে বেশ বোঝা যাবে যে, মানুষ পাপের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে ধাপে ধাপে কিরূপে উন্নত হয়ে উঠেছে এবং পুরুষকারের দ্বারা কিরূপে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। উপরের তিনটি মূর্ত্তি প্রারম্ভিক শিক্ষা, একাগ্রতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাকে প্রকাশ করছে। এই তিনে এক হয়ে সমানভাবে চেষ্টা করলে পৃথিবীতে কোন্ সাধনায় না



লায়োকুন—বিধাতার ক্রীড়নক

গ্রীক শিল্পী রূপককে আশ্রয় ক'রে সেই সত্যটিই প্রকাশ করেছেন। লায়োকুন ছিলেন ট্রয় নগরে আপলো-দেবের মন্দিরের পুরোহিত। তিনি গ্রীকদের বিরোধী ছিলেন ব'লে দেবী মিনার্ভা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দুই পুত্রের উপরে দুই প্রকাণ্ড অজগর সাপ লেলিয়ে দেন। ছেলেদের বাঁচাতে গিয়ে লায়োকুন নিজেও নাগ-পাশে বদ্ধ হয়ে মারা পড়েন। এই পৌরাণিক কাহিনীটিই ছিল গ্রীক শিল্পীর অবলম্বন।

"লায়োকুনে"র মূর্ত্তি দেখে এড্‌স্‌ট্রমের মনে এক নূতন চিন্তার ছায়া পড়ল। "লায়োকুন" হচ্ছে মানবের পরাজয়ের



বিজয়ী মানব

সিদ্ধিলাভ করা যায়? বলা বাহুল্য, শিল্পীর বহু বৎসরের পরিশ্রমের ফলেই "বিজয়ী মানবে"র কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

## বাঙালীর দিগ্বিজয়

বাঙলার গৌরব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবর) যে আমেরিকায় গিয়ে "লাইট-হেভি-ওয়েটে" সমগ্র-পৃথিবী-জয়ী উপাধি লাভ করেছেন, সে খবর আমরা গত-বৎসরে যথাসময়ে ভারতীর পাঠকগণকে জানিয়ে রেখেছি। তারপর গোবর অনেক শ্বেতাঙ্গকে ধরাশায়ী করেছেন। সংপ্রতি আমেরিকার একখানি সংবাদ-পত্রে গোবরের আরো দুটি কুস্তির চিত্তাকর্ষক বিবরণ বেরিয়েছে। আমরা সেই বিবরণ দুটি তুলে দিলুম।

## গোবর বনাম হেকেনস্মিথ

একজন বড়-দরের বড় চেহারার পালোয়ান যে একজন বড়-দরের ছোট চেহারার পালোয়ানকে হারিয়ে দিতে পারে, গোবর বনাম হেকেনস্মিথের কুস্তিতে আবার তারই চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল। গোবর ভারতের হিন্দু পালোয়ান। জন হেকেনস্মিথ আমেরিকার শিকাগো সহরের পালোয়ান। কুস্তির সর্ত্ত ছিল এই যে, গোবর একঘণ্টার মধ্যে হেকেনস্মিথকে চিৎ করবেন।

"হেক" প্রথমে আত্মরক্ষার জন্যে বিপুলবপু গোবরের নাগালের বাইরে থাকবার চেষ্টায় ছিলেন। তারপর "হেক" গোবরের ওপরে হাতের নানানরকম প্যাঁচ কষে ও কাঁচি মেরে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করবার চেষ্টা করেন, গোবর কিন্তু সে-সব প্যাঁচ অল্পক্ষণেই ব্যর্থ ক'রে দেন। গোবরও কুস্তিটা তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে "হেকে"র ওপরে প্রায় বারো রকমের প্যাঁচ কষেও প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করতে পারেন নি।

দর্শকরা সবাই ছিল "হেকে"র পক্ষে। তারা ক্রমাগত চেঁচিয়ে বলছিল—"যাও, লোকটাকে পাকড়াও"! "ওকে (গোবরকে) ভেঙে দুখানা ক'রে ফেলো"! "হেক্, লোকটাকে মাটিতে চেপে ধর!" "হেক্, এইবার ওটাকে সাবাড় ক'রে দাও!"—এই-সব কথা শুনে "হেক্" যতবারই উৎসাহিত হয়ে গোবরকে আক্রমণ করতে যান, গোবর ততবারই ঠ্যাং ধ'রে তাঁকে আছাড় মারেন।

সাঁইত্রিশ মিনিট ত্রিশ সেকেণ্ড কুস্তির পরে গোবর, পায়ের প্যাঁচ মেরে "হেক্"কে চিৎ ক'রে ফেললেন। গোবরের জয়ে দর্শকরা চটে গিয়ে বেজায় গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিল।

## গোবর বনাম মণ্ড্

"Island Grove Park"এ হিন্দু পালোয়ান গোবরের সঙ্গে "টুটুস্" মণ্ডের কুস্তি হয়ে গেছে। কুস্তির সর্ত্ত ছিল, তিনবারের মধ্যে যে বেশাবার তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎ করতে পারবে, সেইই জয়লাভ করবে। গোবরের দেহের ওজন দু' মণ সাড়ে বত্রিশ সের এবং মণ্ডের দু' মণ



গোবর

সাড়ে তেইশ সের। মুষ্টিযোদ্ধা রূপেও মণ্ডের অল্পবিস্তর নাম আছে।

কুস্তি সুরু হবার চার মিনিট বিশ সেকেণ্ড পরেই মণ্ড্ গোবরের পা ধ'রে এক আছাড় মারেন এবং তাঁকে চিৎ ক'রে ফেলেন। প্রথম বাজীতে মণ্ডেরই জিৎ হোলো। প্রথম বাজীর পর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম।

দ্বিতীয় বাজীতেও গোড়া থেকেই মণ্ড্ ক্রমাগত গোবরকে আক্রমণ করতে থাকেন। গোবরও তিন-তিনবার "গা-কাঁচি" মেরে মণ্ডুকে বিলক্ষণ কাবু ক'রে আনেন বটে, মণ্ড্ কিন্তু তিনবারই গোবরের হাত ছাড়িয়ে স'রে যান। গোবরকে হারাবার জন্যে মণ্ড্ প্রায় বিশ রকম প্যাঁচ মারেন, গোবর কিন্তু বিষম গায়ের জোরে সব প্যাঁচই ব্যর্থ ক'রে দেন। আটাশ মিনিট বিশ সেকেণ্ড পরে গোবর ও মণ্ড্ যখন জড়াজড়ি অবস্থায় ধরাশায়ী, গোবরের প্যাঁচে মণ্ড্ তখন প্রথমবার চিৎ হন। তারপর দশ মিনিট বিশ্রাম।

তৃতীয় বাজীতেও মণ্ড্ গোবরকে প্রায় চিৎ ক'রে এনেছিলেন, গোবর কিন্তু প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ ক'রে আপনাকে প্রতিপক্ষের কবল থেকে ছাড়িয়ে নেন। বাজী সুরু হবার তেরো মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ড পরে মণ্ডের পা ধ'রে আছড়ে ফেলে গোবর তাঁকে দ্বিতীয়বার চিৎ করেন। ফলে গোবরই জয়ী হন। এখানে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্যাণ্টেল বনাম লণ্ডোর কুস্তির পরে এমন ভালো কুস্তি আর হয় নি।

## কেজো লোকের ব্যায়াম

অনেকে "ব্যায়াম করেন না কেন" জিজ্ঞাসা করলে ওজর দেন, "সময় নেই"। তাঁদের মুখবন্ধের জন্যে আমরা নীচে ব্যায়ামের একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ধার ক'রে দিলুম। এই ক'টি ব্যায়ামের দ্বারা গলা, শিরদাঁড়া, পিঠ, বুক, পেট ও পায়ের প্রধান প্রধান সমস্ত মাংসপেশীই সঞ্চালিত হবার সুযোগ পাবে। যাঁরা বেশী ফল পেতে চান, তাঁরা ব্যায়ামের সময়টা স্বেচ্ছা ও শক্তি মত বাড়িয়ে নিতে পারেন। পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা কাল

পর্য্যন্ত এই ক'টি ব্যায়াম করলে অল্পদিনেই স্বচক্ষে শারীরিক উন্নতি দেখতে পাবেন।

১ম চিত্র হাত সামনের দিকে



২য় চিত্র হাত পাশের দিকে

৩য় চিত্র হাত নীচের দিকে

৪র্থ চিত্র হাত উপরের দিকে

যাঁরা কখনো ব্যায়াম করেন-নি, আরম্ভে তাঁরা খালি হাত সজোরে মুঠো ক'রে ব্যায়াম সুরু করবেন। মাসখানেক অভ্যাসের পরে ডাম্ব-বেল ব্যবহার করলে উন্নতি দ্রুততর হবে। হপ্তায় একদিন বিশ্রাম।

ক। ১ম চিত্রের মত দু-হাত সামনের দিকে বিস্তার ক'রে দাঁড়ান। সজোরে সরলভাবে হাত দুটো পিছিয়ে, পাশের দিকে বিস্তৃত করুন (২য় চিত্রের মত)। ব্যায়ামের সময়ে কনুই যেন নোয় না।

খ। ২য় চিত্রের মত পাশের দিকে হাত বিস্তার ক'রে দাঁড়ান। তারপর সজোরে হাত নামিয়ে দুই পাশে আনুন (৩য় চিত্রের মত,—এর বেশী হাত নামবে না)। তারপর আস্তে আস্তে হাত আবার পূর্ব্বাবস্থায় তুলুন। কনুই নুইবে না। ব্যায়ামের সময়ে পেশীগুলি দৃঢ়-সংবদ্ধ রাখবেন।

গ। ৩য় চিত্রের মত অবস্থায় হাত রেখে, দুই হাত পাশের দিক থেকে ২য় চিত্রের অবস্থায় আনুন (এবারে কিন্তু ধীরে ধীরে নয়—সবেগে)। তারপর ধীরে ধীরে হাত আবার পূর্ব্বাবস্থায় নামান,—আবার সজোরে ও সবেগে উপরে তুলুন। কনুই নুইবে না।

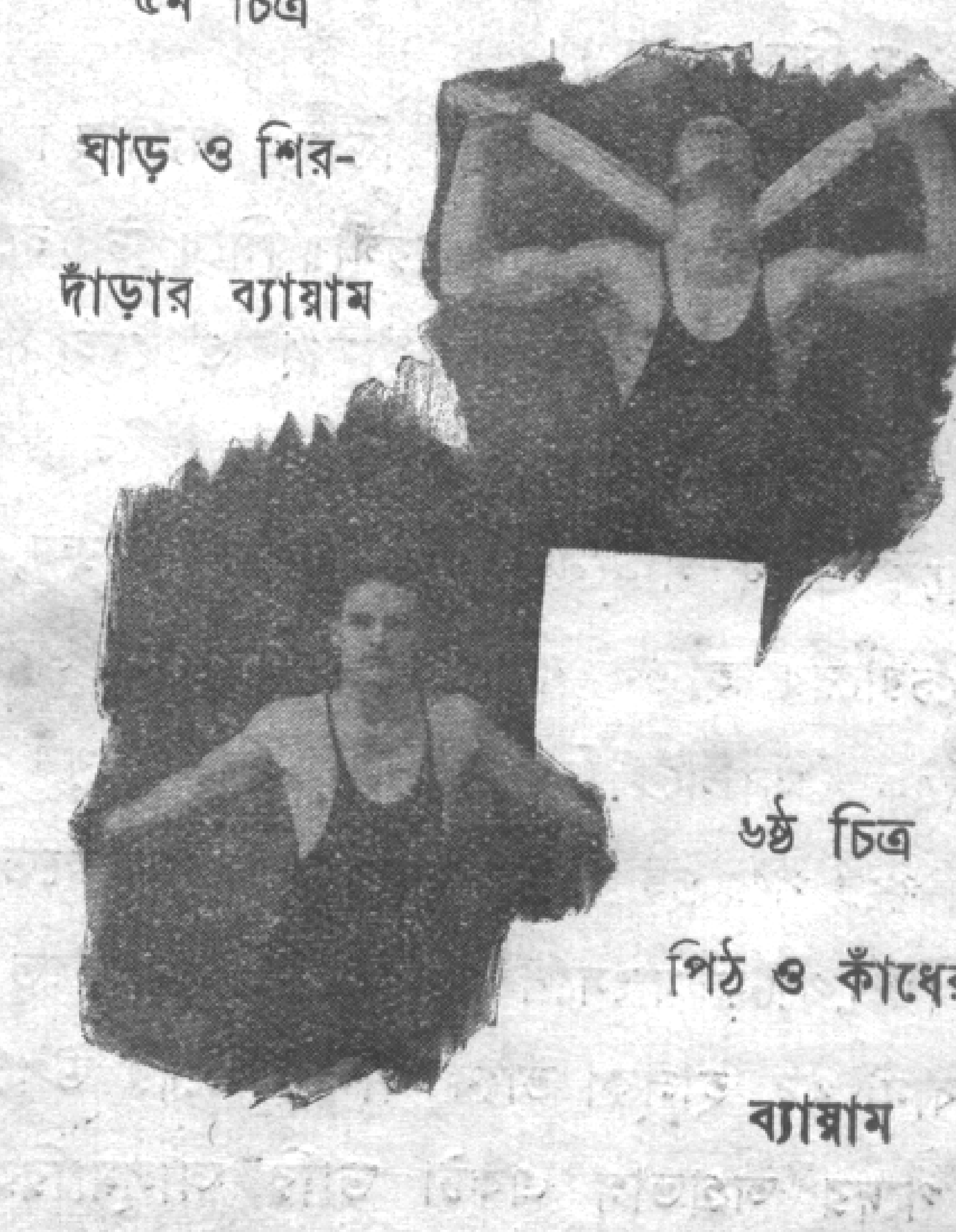
ঘ। ২য় চিত্রের মত পাশের দিকে হাত বিস্তার ক'রে দাঁড়ান। তারপর সজোরে ও সবেগে দু-পাশ দিয়ে মাথার উপরে তুলুন (৪র্থ চিত্রের মত)। ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে পূর্ব্বাবস্থায় আনুন। আবার সবেগে উপরে তুলুন। কনুই নুইবে না।

ঙ। ৪র্থ চিত্রের মত মাথার উপরে দু-হাত তুলে দাঁড়ান। তারপর সবেগে ও সজোরে হাত দুইদিকে নামিয়ে আনুন (২য় চিত্রের মত)। ধীরে ধীরে দু-হাত আবার উপরে তুলুন। আবার সবেগে নামিয়ে আনুন। কনুই নুইবে না।

এই কয়টি ব্যায়ামেই দেহের পেশীগুলি প্রাণপণে দৃঢ়-সংবদ্ধ ক'রে রাখবেন।

চ। একগাছা শক্ত বাঁশের ডাণ্ডা সংগ্রহ করুন। দেহের দুইদিকে দুই ফুট তফাতে ডাণ্ডাটা শক্ত ক'রে ধ'রে সামনের উরুর উপরে রাখুন। দুই পায়ের গোড়ালি যুক্ত ক'রে ঠিক সিধা হয়ে দাঁড়ান। তারপর দুইহাত সাম্‌নের দিকে

৫ম চিত্র ঘাড় ও শির-দাঁড়ার ব্যায়াম



৬ষ্ঠ চিত্র পিঠ ও কাঁধের ব্যায়াম



৭ম চিত্র

পায়ের ব্যায়াম

৮ম চিত্র পেটের ব্যায়াম

যতটা পারা যায় বিস্তার ক'রে ডাণ্ডাটা ধীরে ধীরে মাথার উপরে তুলুন। তারপর ধীরে ধীরে পিছনদিকে হাত নামিয়ে উরুর পিছনটা ছুঁইয়ে ডাণ্ডা নামান ( ৬ষ্ঠ চিত্র দেখুন )। আবার ধীরে ধীরে মাথার উপরে তুলে ডাণ্ডাটা সাম্‌নের উরুর উপরে নামিয়ে আমুন। এর মধ্যে একবারও কনুই নুইবে না। এটি পিঠ ও কাঁধের চমৎকার ব্যায়াম।

ছ। গলা ও শিরদাঁড়ার ব্যায়াম। গলার পিছনে একখানা বড় তোয়ালে পাট ক'রে দুই হাতে চেপে ধরুন। প্রথমে চিবুকটা যতটা সম্ভব বুক ঘেঁসে রাখুন। তারপর মাথা তুলে পিছন দিকে হেলান—সঙ্গে সঙ্গে তোয়ালের দ্বারা খুব জোরে কণ্ঠের পশ্চাৎ-গতিকে বাধা দেবার চেষ্টা করুন ( ৫ম চিত্র দেখুন )।

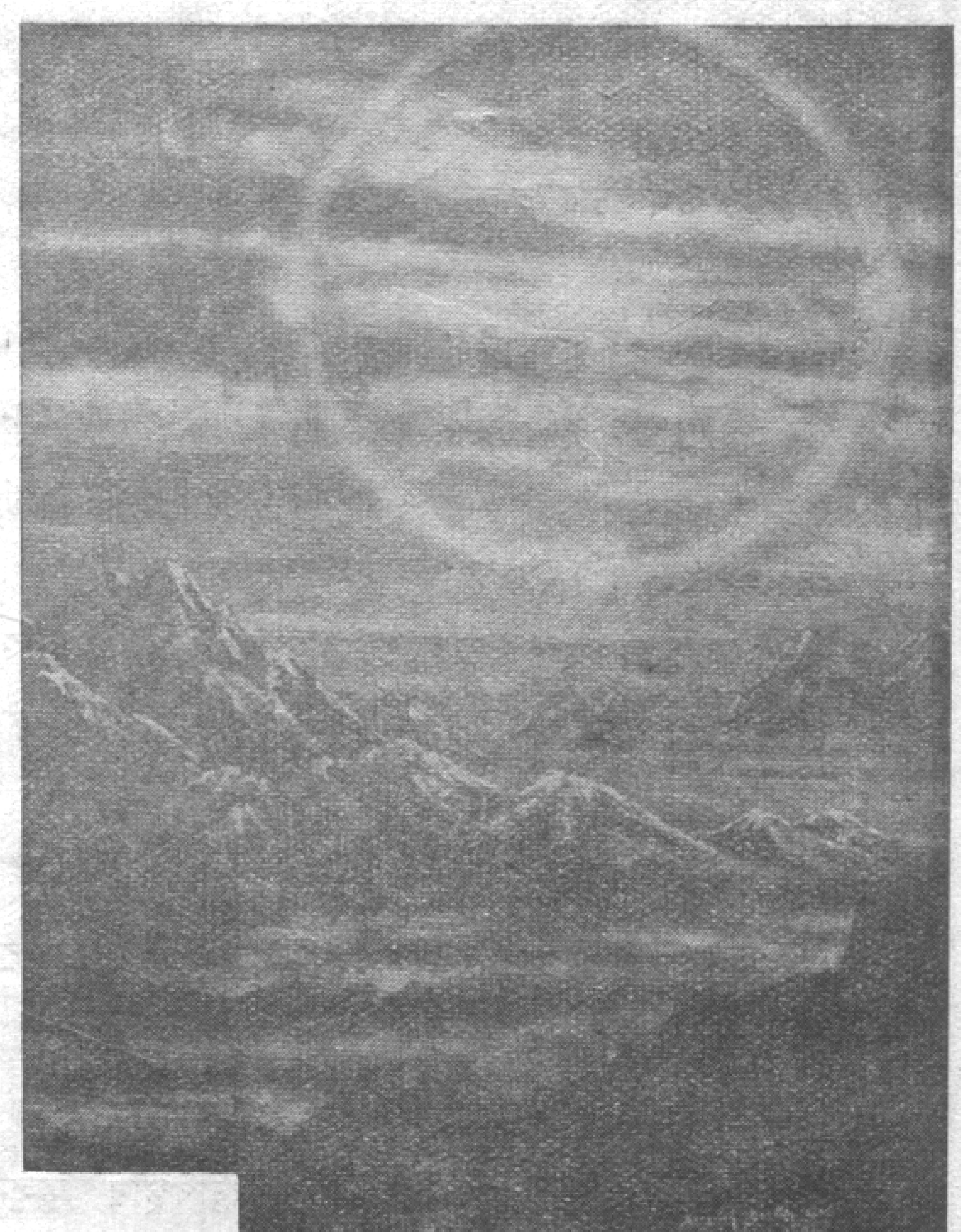
জ। উরুদেশ ও পায়ের ডিমের ব্যায়াম। চেয়ার বা মাটি থেকে উঁচু কোন একটা জায়গায় গিয়ে উবু হয়ে বসুন। কাঁধদুটো পিছনে ঠেলা, মাথা সিধা ও দেহ সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত থাকবে। বাম পদাগ্রভাগে ভর দিন। বাম উরু সরলভাবে ভাবে সাম্‌নের দিকে বিস্তৃত করুন, বামহাত দিয়ে চেয়ারের হাতল ধ'রে টাল সামলান এবং ডান পা সুমুখদিকে আগিয়ে দিন ( ৭ম চিত্র দেখুন )। এই ব্যায়াম পরে পরে দুই পায়েই সমান সংখ্যায় করতে হবে।

ঝ। পেটের মাংসপেশীর ব্যায়াম। মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে, বাম পদ হাল্‌কা ভাবে দক্ষিণ পদের উপরে রাখুন। দক্ষিণ পদের অগ্রভাগ একটা ভারি আলমারির তলদেশে সংলগ্ন করুন। দুইহাত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে ঘাড়ের তলায় রাখুন—অষ্টম চিত্রের মত। তারপর কোমর থেকে উপরের দেহ সম্পূর্ণ সরল রেখে উঠে বসুন। দেহ একটুও না নুইয়ে আবার শুয়ে পড়ুন। পরে ডান পা বাঁ পায়ের উপরে রেখে এই ব্যায়াম করতে হবে। একমাস পরে মাথার পিছনকার দুইহাতে দুটি ডাম্ব-বেল ব্যবহার করবেন।

এই ব্যায়ামগুলি করবার সময়ে একটি কথা মনে রাখবেন। অন্যমনস্ক হয়ে ব্যায়াম করলে কোন ফলই হবে না। ব্যায়াম তো কেবল মাংসপেশী নিয়ে হয় না, সেই-সব মাংসপেশীর চালক স্নায়ুগুলি এবং মস্তিষ্ককেও সমানভাবে ব্যায়ামে নিযুক্ত করিতে হয়। যিনি যত একাগ্রমনে ব্যায়াম করবেন, তিনি ততই শীঘ্র উপকৃত হবেন। উপরে ব্যায়ামের যে নিয়মগুলি দেওয়া গেল, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। ——

## জীব-সৃষ্টির গুপ্তকথা

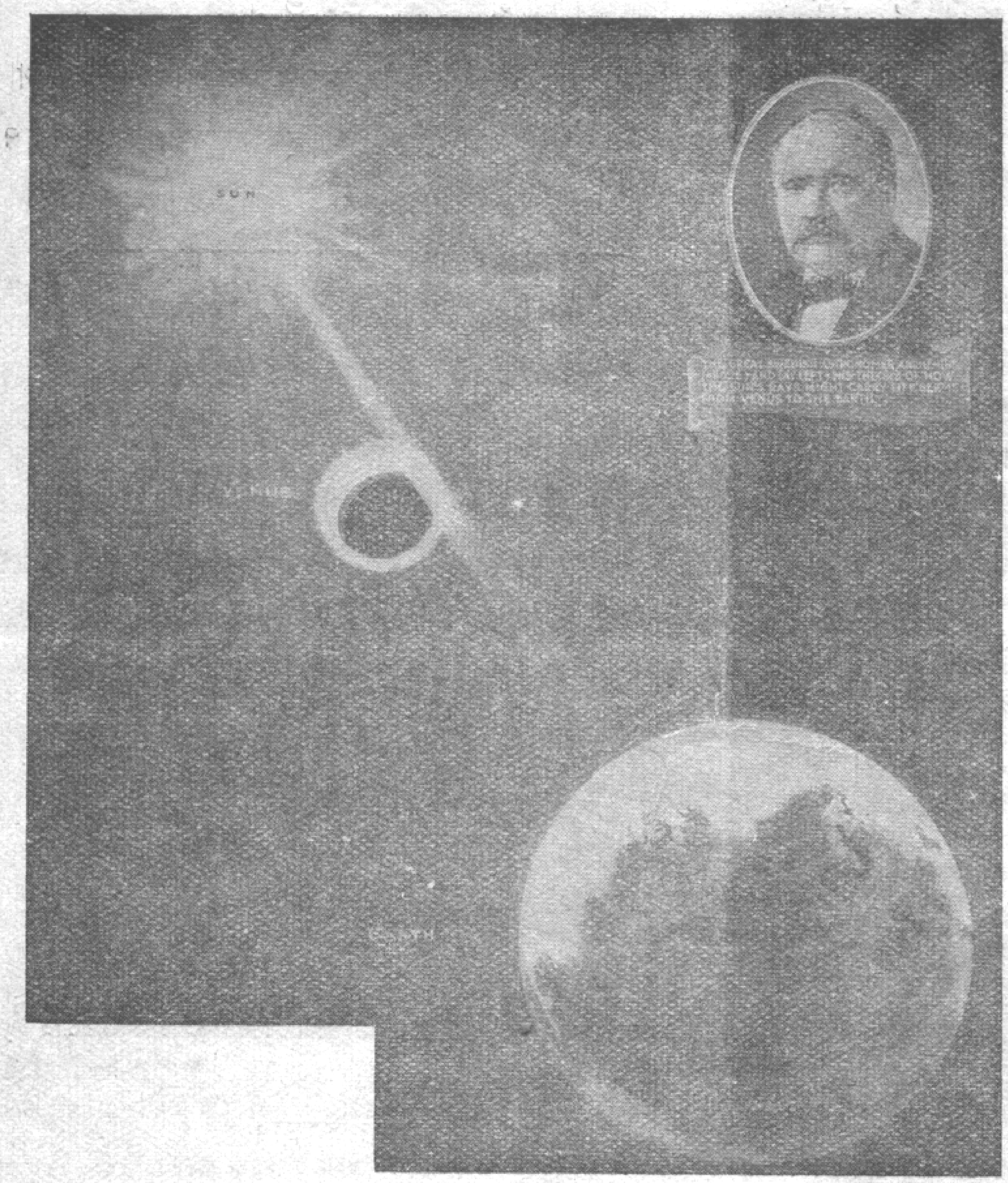
মঙ্গল ( Mars ) ও শুক্র ( Venus ) গ্রহে জীবের



শুক্রগ্রহের দৃশ্য

অস্তিত্ব নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। একদল পণ্ডিত বলেন, মঙ্গলগ্রহে হাতে-কাটা খাল দেখা যায়। সুতরাং সেখানে জীবও আছে। অন্যদল বলেন, সেখানকার আবহাওয়ায় জীব থাকা অসম্ভব। পৃথিবী থেকে আমরা যা সমুদ্র বা খাল ব'লে ভাবচি, আসলে তা জলাভূমি মাত্র। তার চেয়ে শুক্রগ্রহের আবহাওয়াতেই জীব থাকার সম্ভাবনা বেশী।

ক্রিভেন বোল্টন নামে এক পণ্ডিত শুক্রগ্রহের যে আনুমানিক দৃশ্য এঁকেছেন, আমরা এখানে তার প্রতিলিপি দিলুম। শুক্রগ্রহের পর্ব্বতমালা আমাদের পৃথিবীর চেয়ে দ্বিগুণ বড়। শুক্রগ্রহ কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তার আকাশ মেঘলা। বিখ্যাত সুইডিস বৈজ্ঞানিক অগষ্ট আর্য়েনিয়াসের মতে, শুক্রগ্রহ নিম্নস্তরের জীব-বীজ ও রোগ-জীবাণুতে পরিপূর্ণ। শুক্রগ্রহের আকাশে প্রায় সর্ব্বদাই চমৎকার সৌর-মণ্ডল দেখা যায়।



শুক্রগ্রহ থেকে পৃথিবীতে জীব-বীজ ও রোগ-জীবাণুর আগমন। শুক্র এখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝ দিয়ে যাচ্ছে। উপরে ডান কোণে বৈজ্ঞানিক আর্য়েনিয়াসের প্রতিকৃতি।

মঙ্গল ও শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে কোন্ দলের মত সত্য এখনো ঠিক ক'রে তা বলা যায় না। কিন্তু শুক্রগ্রহের আকার, তাপ ও আবহাওয়া যে অনেকটা পৃথিবীরই মত, পণ্ডিতরা তার নানা প্রমাণ দিচ্ছেন।

আর্য়েনিয়াসের বিখ্যাত মত এই:—শূন্যের মধ্যে অগণ্য জীব-বীজ ও জীবাণু বিচরণ করে। সেগুলি সর্ব্বদাই নানা গ্রহে গিয়ে প'ড়ে জীব-সৃষ্টি ক'রে থাকে। শূন্যে যে-সকল ধূলি-কণা ওড়ে, তাও জীব-বীজে ভরা। সূর্য্যের কিরণের দ্বারা বাহিত হয়ে এই ধূলি-কণাগুলি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে গিয়ে পড়ে। এই আলোক-শক্তির আঘাতে পৃথিবীর আবহাওয়া থেকেও কত জীবাণু যে অন্য গ্রহে গিয়ে পড়ছে, কে তার হিসাব রাখে? হিসাব ক'রে দেখা গেছে, মঙ্গল, শুক্র ও পৃথিবীর মধ্যে এইভাবে আনা-গোনা করতে জীবাণুর বিশ দিনের বেশী সময় লাগে না। জীব-বীজের চেয়ে রোগ-জীবাণুরা আকারে ক্ষুদ্রতর ব'লে আলোর চাপে তাদের আরো সহজে গ্রহে গ্রহে চালান ক'রে দিতে পারা যায়। আর্য়েনিয়াসের মতে, পৃথিবীর সব-চেয়ে নিকট-প্রতিবেশী শুক্রগ্রহ থেকে সম্ভবতঃ অনেক মড়কের জীবাণু পৃথিবীতে এসে মানুষের সর্ব্বনাশ করেছে।

এই মত সত্য হ'লে বলতে হবে যে, মঙ্গল, শুক্র ও অন্যান্য গ্রহে যদি জীবের অস্তিত্ব থাকে, তবে পৃথিবীর জীবের সঙ্গে তাদের আকার-গত সাদৃশ্য আছে যথেষ্ট—কারণ এক জাতীয় জীব-বীজ থেকেই তারা সকলেই জন্মলাভ করেছে।

—

## ভাস্করের সুবিধা

আর্ট ও বিজ্ঞানের মধ্যে যোগ-সূত্র ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠচে। সংপ্রতি আমেরিকার উদ্ভাবকরা ভাস্করের শ্রম-লাঘবের এক চমৎকার উপায় ক'রে দিয়েছেন। এতদিন হাতুড়ী আর বাটালি নিয়েই ভাস্করের খোদাই কাজ চ'লে আসছে, কিন্তু নতুন একরকম হাওয়া-ভরা যন্ত্রের দ্বারা ভাস্কররা এবার থেকে আগেকার চেয়ে সহজে ও শীঘ্র অথচ সুক্ষ্মতর খোদাই-কাজ করতে পারবেন। নতুন বাটালির



যন্ত্র-শক্তিতে মূর্ত্তি খোদাই

সঙ্গে ছোট একটি গ্যাসোলিন ইঞ্জিন ও বায়ু-সঙ্কোচন-কারী যন্ত্রের যোগ থাকবে,—বাটালি চালাবার শক্তি আসবে সেইখান থেকেই।

—

## মশাল-রিভলভার

রাত্রে পথে-বিপথে দুষ্ট লোকের অত্যাচারের কথা প্রায়ই শুনা যায়। সে-সময়ে কাছে রিভলভার থাকলেও



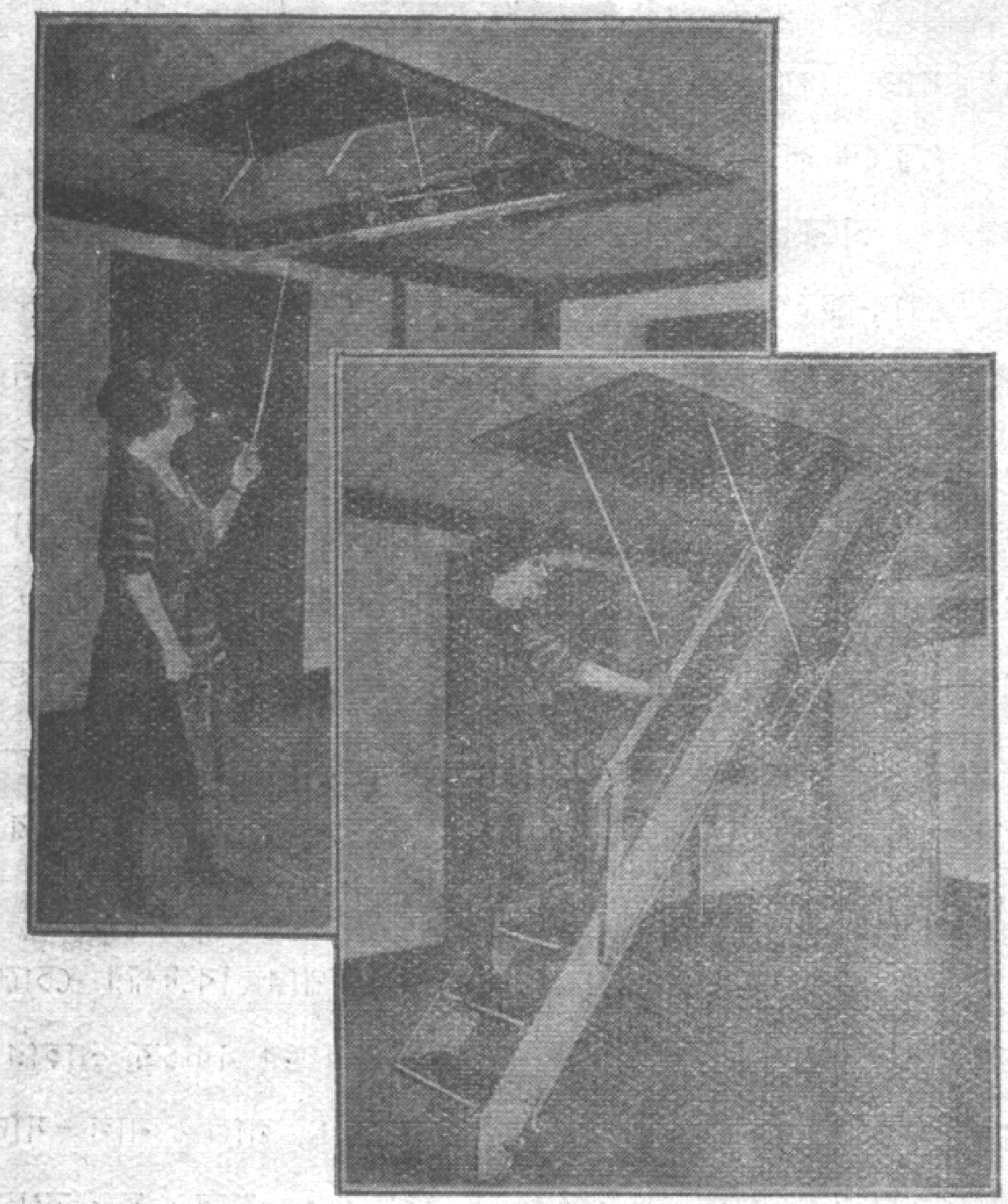
মশাল-রিভলভার

অন্ধকারে তা ব্যবহার করা শক্ত হয়ে ওঠে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে একরকম নূতন রিভলভার উদ্ভাবিত হয়েছে, তার ভিতর থেকে একসঙ্গে গুলি ও উজ্জ্বল আলোকের ঝটকা বেরিয়ে আসে। দরকার হ'লে গুলি না ছুটিয়ে কেবলমাত্র আলো জ্বালাও চলে।

—

## অদৃশ্য সিঁড়ি

বাংলো বা ছোট বাড়ী, যেখানে স্থায়ী সোপান-শ্রেণীর স্থান-সংকুলান হবে না, সেখানকার জন্যে একরকম নূতন সোপান-শ্রেণী তৈরি হয়েছে। এই সিঁড়ি ছাদের তলায় একটি কাটা দরজার আড়ালে লুকানো থাকে। শিকলি ধ'রে টান্‌লেই খুব সহজে দরজা খুলে সিঁড়িটি আস্তে আস্তে



অদৃশ্য সিঁড়ি

নীচে নেমে আসে। তারপর একটুখানি ঠেলে দিলেই সিঁড়িটি আবার কলের সাহায্যে দরজাশুদ্ধ আপনি ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রসাদ রায়

---

## চীনা থিয়েটার

চীনা থিয়েটার বা নাটকের রচনা-পদ্ধতি এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনিই আছে—শাস্ত্রের নিয়ম-নিগড়ে তার হাত-পা বাঁধা। সে নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। চীনা থিয়েটারের নিয়ম,—অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ডান দিক দিয়া ষ্টেজে প্রবেশ করিবে ও বাঁ দিক দিয়া প্রস্থান করিবে—আজ পর্য্যন্ত এই নিয়মই অটুট আছে। তারপর চীনা নাটকের পাত্রপাত্রীর সামাজিক 'পদ-মর্য্যাদা' নানা বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। পোষাক আর মেক-আপ্ দেখিয়া চিনিয়া লইতে হইবে, পাত্রপাত্রী সমাজের কোন্ স্তরের লোক। ভিখারী রেশমী পোষাক পরিতে পারে, তাহাতে বাধা নাই—কিন্তু সে রেশমী পোষাক একখানা গোটা কাপড়ে তৈয়ার করিবার জো নাই; কয়েকখণ্ড টুকরা সিল্কে জোড়া-তালি লাগাইয়া ভিখারীর পোষাক তৈয়ার করা চাই। এই রঙের দ্বারাই আবার পাত্র-পাত্রী চেনা হয়—তাহাদের পদমর্য্যাদা কি, তাহাও এই রঙের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হয়। তাছাড়া চিত্তের নানা ভাবও এই রঙের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। লাল রঙের অর্থ আনন্দ, গৌরব, উচ্চপদ। সাদা রঙ শোকের চিহ্ন। কালো আচার-গত শোকের চিহ্ন প্রকাশ করে—তাছাড়া কালো রঙের অর্থ হয়, হীন অবস্থা ও কাঠিন্য।

'মেক-আপে' শাস্ত্রের বাঁধা নিয়ম পালন করিতে হইবে। কোন অভিনেতার সাধ্য নাই, 'মেক-আপে' নিজের স্বাধীন ইচ্ছা চালায়—তা সে যত বড় শক্তি-শালী অভিনেতাই হৌন। নিয়ম ভাঙ্গিলে দর্শকের দল এমন চীৎকার করিয়া তাহাদের বিরাগ প্রকাশ করিবে যে অভিনেতার পক্ষে মঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনয় করা চলিতেই পারিবে না। দৃশ্যপট প্রভৃতিও ইঙ্গিতে দেখানো হয়। অর্থাৎ ঘোড়া বুঝাইতে চাহিলে একটি চাবুক দেখাইতে হইবে; জল বুঝাইতে হইলে মাছ-আঁকা নিশান খাড়া করিতে হয়। এক-একখানি চীনা নাটকের অভিনয় এমন দীর্ঘ হয় যে সময় সময় দুই-তিন দিন ধরিয়া অভিনয় চলে।

চীনের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মোঙ্গল সম্রাটদের সময় অভিনেত্রী প্রচুর ছিল,—কিন্তু সম্রাট কি-এন্-লং একজন অভিনেত্রীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করেন,—সেই অবধি চীনের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীর পাঠ বন্ধ হইয়া যায়। তারপর হইতে নারীর ভূমিকা যুবাদের দ্বারা অভিনীত হয়। এখন কেবল সাঙ্গ-হাইএ মউ-ইউল্-হাই অর্থাৎ 'বিড়াল থিয়েটারে' স্ত্রী অভিনেত্রী আছে—আর কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী নাই।

অভিনেতা চীনের সমাজ ঘৃণার পাত্র। ষ্টেজে অভিনয় করিবার জন্য এ ঘৃণা নয়—এ ঘৃণা তাহাদের জন্মগত হীনতার জন্য। অভিনেতার শিক্ষার কাল চীনে খুব দীর্ঘ,—তারপর প্রথম দশ বৎসর তাহারা এত অল্প মাহিনা পায় যে কোন ভদ্র-ঘরের ছেলের পক্ষে ষ্টেজে অভিনয় করিতে আসা চলে না। চার হইতে ছয় বৎসর কাল পর্য্যন্ত শিক্ষানবীশীর যুগ। এই সময়টা নানা ভূমিকা মুখস্থ করা, আবৃত্তি করা, গান গাওয়া, জিমনাষ্টিক, অস্ত্র-খেলা এই সব শিখিয়া কাটাইতে হয়। তারপর ছয় বৎসর কাল গুরুর অধীনে থাকিয়া তাঁর কাজকর্ম্ম করিয়া ফাই-ফরমাস খাটিয়া কাটাইতে হয়। সে সময়টা একরকম পেট-ভাতায় তাহাকে থাকিতে হয়। তার পর এই দীর্ঘ সময় কাটিলে অভিনেতা মানুষ হইল; অর্থাৎ এখন সে যেখানে ইচ্ছা গিয়া খুঁটিয়া খাইতে পারে।

চীনের নাটক নীতি-কথার পুঁথি। চীনে থিয়েটার শুধু আমোদ-প্রমোদের জায়গা নয়; এখানে আসিয়া দেশের জন-সাধারণ শিক্ষা পাইবে—ইহাই হইল চীনা থিয়েটারের লক্ষ্য। চীনা থিয়েটারের দর্শকের স্বাধীনতা প্রচুর। থিয়েটারে গিয়া তাহারা ধূমপান করে, চা পান করে, খাবার খায়, এমন কি মধ্যাহ্ন-ভোজনও এখানে অনায়াসে বসিয়া তাহারা সারিতে পারে, এবং সারিয়া থাকেও। থিয়েটারে স্বদেশ-প্রেম ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা শিক্ষা দিবার জন্য এমনি ধরণের কাহিনী লইয়া নাটকে পাপকে ঘৃণা করিতে শিখাইতে হইবে; বিশ্বাসঘাতককে সাজা দিয়া, অকৃতজ্ঞকে বিপদে ফেলিয়া, বিশ্বাসঘাতিনী পত্নীকে দারুণ শাস্তি দিয়া নাটক লিখিতে হয়।

চীনে প্রহসনেরও রেওয়াজ আছে। প্রহসনে সমাজের দোষ-ক্রটিগুলাকে বিপর্য্যয় রকমে বিদ্রূপ করিয়া দর্শকের চোখের সামনে ধরা হয়। নীতির কড়াকড়ির জন্য চীনের নাট্যকারকে খুব উঁচু সুরে নাটক বাঁধিতে হয়। নাট্যকারের স্বাধীন ভঙ্গীতে যেমন-খুসি নাটক লেখা চলে না। তাহার ফলে প্রেমের ব্যাপার চীনা নাটকে নাই বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হয় না। নাটকে শুধুই পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, স্বদেশপ্রেম, বীরত্ব, অপত্যস্নেহ—এমনি কয়টা মামুলি বিষয়ই পুনঃপুনঃ দেখানো হয়। চীনা রঙ্গমঞ্চে নাচ একরকম দুর্ল্ভ।

তবে চীনা থিয়েটারের একটি ব্যাপার বিদেশীর চোখে ভারী সুন্দর ঠেকে। সেটা ঐ রঙের বিচিত্র বাহার। মঞ্চে যেন রঙের খেলা চলিয়াছে! লাল নীল সাদা কালো জরদা রঙের ছবির পর ছবি ফুটিতেছে! এই রঙের খেলায় শৃঙ্খলা আছে, তাহার মধ্যে একটা ছন্দও আছে—সেটুকু ভারী মিঠা। কিন্তু নাটকের কথাবার্ত্তা বড় একঘেয়ে মামুলি সুরে চলে,—সেই বাঁধা নিয়মে। রঙের স্বপ্নে এই মামুলি স্বরের একঘেয়ে ঝঙ্কার,—এ যেন ফুলের সঙ্গে কাঁটার মতই বেদনা দেয়!

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

---

# রিক্সার গান

( রিক্সার ঘণ্টাধ্বনি-ছন্দে )

বাবুদের আদরের রাজধানী কল্‌কাতা,
ধুলো আর কাদাতে আছে তার কোল পাতা।
ছোটে ঐ ঘোড়গাড়ী, ধোঁয়া-ভরা ট্যাক্সি—
গরিবের প্রাণ-কাড়া তেড়ে-ধরা আঁকসী!
কোন পথ খুব সোজা, নাহি তার সীমানা,
কোন পথ তেল-ঢালা, গাড়ী ছোটে হড়্‌কে,
কোথাও বা ঢিল-খোয়া কাটে চোটে গোড়্‌কে।
তার মাঝে আমি যাই—খেটে খেটে মুখ চুণ—
রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্, রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্!

ঠিক ভরা দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে রদ্দুর,—
জান্ গেল—বাবুগো! আরো যাব কদ্দূর?
আকাশেতে আংরা, বাতাসেতে ফিন্‌কি—
তাতা পথ লাল চাটু—ভাজা চলে নির্মকি!
দেখ, পায়ে ফোস্কা, ঘামে গা স্যাঁৎসেতে,
আর যে গো পারি না, গতর যে ন্যাৎনেতে!
তেষ্টাতে ফাটে ছাৎ—বুকে জ্বলে হল্‌কা,
কাছে মোর কেহ নাই, মুখে বলে—জল খা'!
রোদ পুড়ে দেহ কাঠ, মাথা মোর পাকা ঝুন্—
রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্, রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্!

*

যাই বাবু, যাই বাবু—কেন আর তাড়া দাও—
নই আমি গরু-মোষ, যতই গো ভাড়া দাও
ভুলোনা, চড়েচ মানুষের ঘাড়েতে,
বে-দমে ছোটা দায় এই ভাঙা হাড়েতে,
আমারো প্রাণ আছে তোমারি মত হায়,
দুঃখেতে ঝরে লোর, সন্দেহ নাহি তায়।
কত পাপ করেচি ও-জন্মে কে-জানে,
গোলামের গোলামী করি তাই এখানে।
কেন মা, মারো-নি আঁতুড়ে দিয়ে নুন?—
রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্, রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্!

*

এল মোটে চিৎপুর—যেতে হবে হাওড়া,
ছুটি আর মনে হয়—মেয়ে সবে মা-ওড়া!
কখন্ বা খাবে সে, বেজে গেল একটা,
উপায় তো নেই কিছু—খালি যে গো ট্যাঁকটা!
বাবুকে নামিয়ে পাব ঠিক ছ'আনা,
দানা-পানি তারপর, আর কারে বওয়া না!

আরেকটু কাঁদ বাছা—বাবা তোর যাবে ঘর,
হেথা নেই দরদী, এরা যে রে সব পর!
পিঠ ছেড়ে নাম্‌বে না, ছুটে যদি হই খুন্—
রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্, রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্!

*

এখানেও হাসে চাঁদ, জোছনারি রাত্রি!
ময়দানে যেতে চায় খুসি-ভারি যাত্রী!
মাঠ-ভরা চাঁদিনী—স্বরগের দেয়ালী—
পিঠে মোর ছাড়ে তান মরতের খেয়ালী!
আসে গো দখিনা, মুখে পড়ে হুসহুস্,
খিল-খোলা দিল ওরে সুখে করে উসখুস্!
ফাগুনীর জাগে গান, আপনি ফোটে ফুল,
যখ্‌ন চাগে প্রাণ, তখনি ছোটে ভুল!
হায় আমি হীন মুটে, কল্‌জেতে ধরা ঘুণ্—
রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্, রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্!

*

আমাদের প্রাণ কিরে একেবারে ফ্যাল্‌না,
কাঙাল সে বুঝি গো খেলাঘরে খ্যাল্‌না?
সবে কয়, দয়াময় ভগবান—ভগবান!
তাই বুঝি গরিবের ছাতি কর খান্-খান্?
অপরাধ, টাকা নেই—তাই ব'লে 'দয়াময়'!
কুবেরের বুটজুতো পৃষ্ঠে কি এত সয়?
ধনীরই ভাঁড় ভরো মোসাহেব-রূপে হে!
তাই কেহ সওয়ারী—কেউ ঘোড়া দু-পেয়ে!
হুঁসিয়ার! ডাইনে যা'! ঘণ্টা বাজে ঐ শুন্—
রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্, রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# পোষ মানা

## ( গল্প )

নীরদ ছিল একজন কলিকাতার বড় মানুষ। বেশ গৌরবর্ণ রং, দোহারা খর্ব্বাকৃতি নধর শরীর, গোল ভারি মুখ। তাহার একটা অস্পষ্ট শিখা ছিল যা দশ আনা ও ছ' আনা কাটা চুলের সামানায় থাকিয়া দশ আনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভ্রম হইত—ইহার পৃথক সত্বা হঠাৎ ধরা পড়িত না।

নীরদের নিজের ও বাড়ীর চাল-চলন ছিল বনিয়াদা ধরণের। পুরাতন ক্রিয়াকলাপ, বার-ব্রত, পূজা-উপবাস হইতে সুরু করিয়া মোটর গাড়ী, হাট, কোট, সাহেব বাড়ীর লেস্ জ্যাকেট, কেক্, চকোলেট, এমন কি মেয়েদের পাল্কি করিয়া গঙ্গাস্নানে যাওয়া পর্য্যন্ত সবগুলারই সমান সমাদর ছিল।

মেয়েদের বলিতে কেবলমাত্র গৃহিণী শর্ম্মিষ্ঠাকে বুঝাইত, কারণ তিনি ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোক সে গৃহে ছিল না, অবশ্য ঝীয়ের পাল ছাড়া। গৃহিণী আচার-বিচার ও সংসারের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, এবং স্বামী নীরদের মনে নিশিদিন একটা সন্দেহের ভাব উদ্রেক করিয়া রাখিতেন। ইঁহাদের দুইটী ছেলে; নাম, আলোক ও তিলক, তাহারা মাকে বেজায় ভয় ও বাপের কাছে দিন-রাত আব্দার করিত।

দিনগুলা বেশ সুখেই কাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন গৃহিণী কলেরা রোগে সংসার, স্বামী, পুত্র সব ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

শোকের প্রথম বেগ কাটিয়া গেলে বারো বছরের ছেলে তিলক বাপের গলা জড়াইয়া কহিল, "বাবা, তুমি বুঝি আবার বে' করবে ? আমি বল্‌চি, কখ্‌খনো করো না ! বল, করবে না ?" দাদার কথার সূত্র ধরিয়া সাত বছরের ছেলে আলোক কহিল, "বাবা যদি বিয়ে করে, সে বৌকে আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব।"

নীরদ ছিল বড় ঢিলা বাপ ; ছেলেদের তেমন শাসন করিত না ; কাজেই ছেলেরা বাপের কাছে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিত এবং তাহাতে শিষ্টতার মোটামুটি নিয়মগুলি অনেক সময়ে লঙ্ঘন হইয়া যাইত। ছেলেদের কথায় বাপ কোন উত্তর না দিয়া তাহাদের বুকে চাপিয়া ধরিল ; তাহারাও আশ্বস্ত হইল।

স্ত্রী-বিয়োগের দুঃখটা নীরদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, লোক দেখিলেই সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতে লাগিল। তাহার মাথার চুল ঝাঁকড়া-মাকড়া হইয়া বেজায় বড় হইতে লাগিল, কাপড়ে কাছা দিতে সে অহরহ ভুলিয়া যাইতে লাগিল এবং গৈরিক বসন পরিধানটা হব-হব হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বন্ধুর দল,—যাহারা সিদ্ধি-সেবনে বা সময়-বিশেষে আরো তীক্ষ্ণতর পানীয়-পানে সান্ধ্য মজলিসে তাহার নিত্য সঙ্গী ছিল, প্রমাদ গণিল। উৎকট শোকের আর-একটী নিদর্শনের অভাব হইলেই ইহারা যে কি করিত তাহা বলা যায় না, সৌভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তির মত এই নিদর্শনটা অন্য সবগুলিকে আবছায়ায় ফেলিয়া রাখিল ; অর্থাৎ প্রাত্যাহিক সিদ্ধি-সেবনটা অধিকতর জুৎ করিয়া চলিতে লাগিল। যথা, রাবড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল, রাবড়ি অধিকতর ঘন হইতে লাগিল, গোলাপ ও পেস্তা-বাদাম অপর্য্যাপ্ত মাত্রায় সিদ্ধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সংসারের প্রতি নীরদের বিরাগ ও তাহার প্রতি বন্ধুবর্গের অনুরাগ বেজায় বাড়াইয়া দিল।

২

এইভাবে দিন কতক কাটিয়া যাইবার পর সুযোগ বুঝিয়া নীরদের শুভানুধ্যায়ীরা তাহার আসন্ন জটা চুলের রাশি কাটাইয়া দিলেন, কিন্তু শিখাটী নীরদ কিছুতেই স্পর্শ করিতে দিল না। কাজেই যে-শিখা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত মিটি মিটি জ্বলিত, তাহা সহসা লম্বা হইয়া লক্ লক্ করিয়া মাথার পিছনে দুলিতে লাগিল। বন্ধুরা কাছে

দিয়া কাপড় পরিবার জন্য নীরদকে অতিরিক্তভাবে অনুরোধ করায় সে গৈরিক আলখাল্লা পরিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠিল। অবশেষে মাঝামাঝি রফা করিয়া স্ত্রী-বিয়োগে ব্যথিত নীরদ কাছা-বিহীন ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরিতে স্বীকৃত হইল।

আবহমান কালের প্রথা-অনুযায়ী পানীয়ের সহিত আমিষ-আহারের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। নীরদের মজলিসে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইদানীং নীরদ নিছক নিরামিষাহারী হইয়া উঠায় ছোলা, মটর-ভাজা, পেঁয়াজের ফুলুরি অথবা সন্দেশ জিলাপী আমিষ আহার্যকে একেবারে বেদখল করিয়া বসিয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে বন্ধুবর্গ একটা বিরাট আপত্তি তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু নীরদ কহিল, স্বামী-বিয়োগে স্ত্রীর যদি নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা থাকে, তবে স্ত্রী-বিয়োগে স্বামীর তাহার অন্যথা হইবে কেন? যুক্তিটা মা-বসুমতীর মতই পুরানো অথচ ইহার মন-মত জবাবও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জবাব দিবার জন্য বন্ধুরা নানারূপে মাথা ঘামাইতে লাগিল, কেহ কিন্তু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না।

বৈরাগ্য-গ্রস্ত নীরদ সকরুণভাবে সকলকে কহিল, "তোমাদের একটা কথার সিদ্ধান্ত করে দিতে হবে। তোমরা সকলেই জানো, আমার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী কিরূপ নিষ্ঠাবতী ছিলেন!" দুই ফোঁটা চোখের জল গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়ায় নীরদ তাহা কোঁচার খুঁটে মুছিয়া ফেলিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বন্ধুবর্গ বলিল, "তা আর বলতে!"

নীরদ বলিতে লাগিল, "তাঁর সময় আমরা বাইরে চপ্ কাট্‌লেট্ খেতুম, তিনি কখনো আপত্তি করতেন না, ভিতরে কিন্তু তিনি অনাচার ঢুকতে দিতেন না।"

উপস্থিত সকলে সমস্বরে কহিল, "অনাচারে প্রশ্রয় তিনি কখনই দিতেন না।" লোহিতবর্ণ আঁখি ড্যাব্‌ডেবে করিয়া নীরদ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল ত?" উত্তর হইল,—"কেন বল ত?" একজন একদম কাঁদিয়া ফেলিল। নিজের কোঁচার মুড়ায় তাহার আঁখিজল মুছাইয়া দিয়া নীরদ কহিল, "কেঁদো না ভাই, তোমার কান্না দেখে আমার কান্না পায়।"

ইহাতে কান্না ভুলিয়া, বন্ধুবর চীৎকার করিয়া কহিল, "কাঁদব না? একশ' বার কাঁদব, হাজার বার কাঁদব, দশ হাজার বার কাঁদব।" কি একটা হার হইয়া যায় ভাবিয়া দলের অন্যান্য সকলে এক কাঠি বাড়িয়া গর্জ্জন তুলিল, "লক্ষবার কাঁদব। কাঁদব না? কাঁদতে কখন জন্মেছি—"

বাধা দিয়া নীরদ কহিল, "তোমাদের কি ভাই? যার গেছে তার গেছে।" কথাটা বলিয়াই সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাজেই সকলকে কাঁদিতে হইল; কারণ প্রত্যেকেই নিজেদের অন্তর্দেশ অতিমাত্রায় সিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কান্নার বেগ সামলাইতে না পারিয়া একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া গান ধরিল,

সখি কাঁদিতে জনম,—
কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে কাঠিটী হলাম।

কান্না জুড়াইয়া গেলে, ক্ষণিক গালে হাত দিয়া কি ভাবিয়া লইয়া, নীরদ স্থির কণ্ঠে বলিল, "বাহিরে মাংস, অন্দরে শুচি।"

সকলে কহিল, "চুপ্, চুপ্!"

নীরদ আবার কহিল, "বাহিরে মাংস, অন্দরে শুচি।"

এবার সকলে কহিল, "আহা, কি সুন্দর! বাহিরে মাংস অন্দরে শুচি।"

নীরদ কহিল, "অন্দরে কি? না, অন্তরে! জানো, আমি আজকাল শাস্ত্র পড়ছি!"

একজন কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "কেন ভাই, এমন কু-কাজ করছ?"

নীরদ কহিল, "শাস্ত্র পড়ব না? বামুনের ছেলে, বিপত্নীক—ব্রহ্মচর্য্য পালন করব না?"

অন্যান্য বন্ধুরা কহিল, "আল্‌বৎ পড়বে। হাজার বার পড়বে।" কাজেই কাঁদ-কাঁদ বন্ধুটী ভয়ে কান্না চাপিয়া গেল।

নীরদ কহিল, "যেখানে ভাল, সেখানে মন্দ; যেখানে উন্নতি, সেখানে অবনতি; যেখানে জন্ম, সেখানে মৃত্যু—"

নীরদ এত কথা এক সঙ্গে কখনো কহে নাই ভাবিয়া

একজন উৎসাহ দিয়া কহিল, "বলে যাও ভাই, আমরা বিলকুল মনোযোগ।"

তখন নীরদ বলিয়া ফেলিল, "যদি অন্তরে শুচি চাও, তবে বাহিরে মাংস খাও।"

সকলের মাথার উপর হইতে যেন একটা জমাট-বাঁধা মেঘ কাটিয়া গেল। সমস্বরে সকলে ফুকারিল, "Bravo! কি চমৎকার শাস্ত্র! আমাদের শাস্ত্র, ভাই! টুঁ শব্দটী করবার যো নেই! যদি অন্তরে শুচি চাও, তবে বাহিরে মাংস খাও। তবে আর কি! এবার থেকে—"

নীরদ কহিল, "বুঝলে ত ভাই, আমার সহধর্ম্মিণী কত বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন! তিনি মানুষ ছিলেন না, দেবী ছিলেন। হায় রে, এমন স্ত্রী বাঁচে না!" বলিয়া নীরদ আবার ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর সকলেও তাহাতে নিজের নিজের পছন্দ-মত যোগ দিল।

ইতিমধ্যে তিলক নীচে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বাবা, তোমরা বড় চেঁচামেচি করছ! আমাদের পড়া হচ্ছে না।"

৩

"পিমি, হতচ্ছাড়ি! শুনে যা।"

একটা ক্ষুদ্র গলির ভিতর একটা অতি-ক্ষুদ্র বাড়ীতে টলিতে টলিতে প্রবেশ করিয়া নীরদের এক বন্ধু জড়িত অথচ ক্রোধ-তপ্ত স্বরে ডাকিল, "পিমি, হতচ্ছাড়ি, শুনে যা।"

নেপথ্য হইতে বালিকা-কণ্ঠে উত্তর আসিল, "যাই বাবা।"

বাড়ীটার অন্দর-বাহির নাই। গৃহে প্রবেশ করিতে বাঁ-হাতি একটা ছোট ঘর; সেই ঘরে একটা মলিন আলো একটা মলিন ল্যাম্পে মলিনভাবে জ্বলিতেছিল। ভূপতি মলিন বিছানা-পাতা তক্তার উপর বসিয়া পড়িয়া দুই জানুতে দুই হাত রাখিয়া কহিল, "দাঁড়াও, আজ বেটীকে মজা দেখাচ্ছি।"

একটু পরেই, পনেরো ষোল বছরের একটি বালিকা ঘরে আসিয়া কহিল, "কি বাবা?"

মাথা তুলিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া ভূপতি কহিল, "এখন, কি বাবা? বল্ বেটী, শাস্তর পড়তে তোকে কে বল্লে?"

কন্যা উত্তর করিল, "শাস্তর ত আমি পড়ি নি।"

জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরা মাতালের মেয়ের রূপে দারিদ্র্য-জীর্ণ ঘরটী তখন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল।

মেয়েকে ভেংচাইয়া, গলা সরু করিয়া ভূপতি কহিল, "আমি তঁ শাস্তর পঁড়ি নি! তুই পড়িস্ নি ত পড়লে কে? আমি?—আমি কোথায় মেয়ের বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি, আর বেটী আমার সোহাগ করে শাস্তর আলোচনা করচেন! বেহ্মদত্তি হবেন! বিবাগী হবেন!"

এ হেঁয়ালির অর্থ না বুঝিতে পারিয়া প্রিয়ম্বদা অবাক হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। এদিকে ভূপতি আপনার মনে বকিয়া যাইতে লাগিল, "কম বুদ্ধিটা খরচ করে! মাথার চুল ছোট করে কাটালুম, শান্তিপুর ফরেস-ডাঙ্গার ধুতি পরালুম—উঃ, বুদ্ধিটা কম খাটিয়েছি! আর-পারিনে!" সুপ্তোত্থিত সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া ভূপতি কহিতে লাগিল, "বল্ বেটী কেন শাস্তর পড়লি? দি তোর কানটা ছিঁড়ে-" এবং কথামত যেমনি সে হাত বাড়াইবে, অমনি সে ঘরে গৃহিণী আসিয়া কহিলেন, "এ্যাঁ! করছ কি? হ্যাঁ গা, সব-আক্কেলের মাথা কি খেয়ে বসে আছ?" তার পর এক দিকে ঘাড় হেলাইয়া গালে হাত দিয়া গিন্নি কহিতে লাগিলেন, "আ আমার পোড়া কপাল! আজ করেছ কি? আজ বুঝি সিদ্ধি ভাঙ্ চরসে আর কুলিয়ে ওঠে নি?"

ভ্রূকুটি করিয়া ভূপতি কহিল, "তুমি আবার কোন গগনের চন্দরবিন্দু? আমি নিজ হস্তে সন্তান-বধে রত ছিলুম, তুমি আবার কে এসে বাধা দিলে?"

গিন্নি। কথার ছিরি দেখ। হ্যাঁ গা আমার পোড়া কপাল এমন করে পোড়াতে তোমায় কে বলেছিল!

ভূপতি। বুঝলে না ত! এ হলো,—অন্তরে যদি শুচি চাও, তবে বাহিরে গিয়ে মদ খাও, গাঁজা খাও, মাংস খাও।

গৃহিণী নীতিটা একেবারেই বুঝিতে না পারিয়া, লজ্জায় ম্রিয়মানা হইলেন ও ঘৃণায় মরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সে অবস্থায় ভূপতির সান্নিধ্যটা যে অস্বাস্থ্যকর সে কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে কুণ্ঠিতা হইলেন না, কাজেই প্রিয়ম্বদাকে লক্ষ্য করিয়া ভূপতি কৈফিয়ৎ তলব করিল, "কেন ও শাস্তর পড়লে? কেন, পড়লে কেন?"

তখন গিন্নিকে কহিতে হইল, "কে শাস্তর পড়েছে ? পিমি ? শাস্তর কি পড়লেই হলো ? পয়সা লাগে, টাকা লাগে। বাছাকে একখানা ভাল কাপড় পরতে দাও না, ও আবার শাস্তর পড়বে !"

ভূপতি। একখানাও কাপড় দিই নি ?···না। দিই নি ত। ও যে আমার বড় আদরের মেয়ে। আমার একমাত্র সন্তান। কই ? ওকে একখানা ভাল কাপড় কখনো পরতে দিই নি ত। ও যে আমার বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করা মেয়ে, ও যে এই গরীব বাপের বুক জোড়া ধন; কই একখানাও ভাল কাপড় ত দিই নি। কি হবে ?"

মাতাল নিজের বুক চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, সে কান্না দেখিয়া গিন্নিকেও আঁচলে চোখ মুছিতে হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভূপতি কহিতে লাগিল, "ওকে শাস্তর পড়তে বারণ কর। আমি মেয়ের বে দেবো না। আমি মাতালের হাতে, দোজবরের হাতে আমার অমন সোনার প্রতিমে দেবো না। রাজ-রাণী হবার উপযুক্ত মেয়ে আমার, ঘর-আলো-করা মা-লক্ষ্মী আমার—ওকে মাতালের হাতে দিতে পারব না। ওকে শাস্তর পড়তে বারণ কর।"

গিন্নি। কার কথা বলচ ? নীরদের ?

ভূপতি। হুঁ, শাস্তর পড়ছে; বেস্মদত্তি হবে। ঐ মেয়েটার জন্যে কত খোসামোদ করেছি, আজ মাতাল পর্য্যন্ত হয়েছি। ওগো, আর পারিনে। আমার পিমি, আমার মা লক্ষ্মী, আমার পিমি মা—

ভূপতি তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িল।

৪

পাঁচ-সাত দিন পরে ভূপতি ক্লান্ত দেহে অফিস হইতে বাড়ী ফিরিতেছে, এমন সময় নীরদের আড্ডার নিকুঞ্জর সঙ্গে তাহার পথের মাঝে দেখা। ভূপতি পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া নিকুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপতি বাবুর যে বড় দেখা পাই নে ?"

ভূপতি। কাজ-কর্ম্মের বড় ভিড় ভাই, সময় পাই নে।

[illegible]। সন্ধ্যের পর আর কাজ-কর্ম্ম কি !

ভূপতি। আমি ভাই গরীব মানুষ, কায়ক্লেশে সংসার চালাই, আমার অনেক ঝঞ্ঝাট।

নিকুঞ্জ। তাইত আমিও বলি। মানুষের উঠ্‌তে-বস্‌তে কষ্ট। তার ভেতর যদি একটু-আধটু আমোদ করে নেওয়া যায় ত ক্ষতি কি !

ভূপতি। গরীবের কি আমোদ-আহ্লাদ সয় ভাই ?

নিকুঞ্জ। তা সওয়ালেই সয়। যাক্ বাজে কথা ! বলি, মেয়ের বিয়ের কি করলেন ?

ভূপতি। যার অর্থ নেই, ভগবানই তার একমাত্র ভরসা ! তাঁরই উপর নির্ভর করে বসে আছি।

নিকুঞ্জ। তিনি সকলেরই ভরসা। কি গরীব, কি বড় মানুষ। বলছি কি, নীরদের সঙ্গে দিয়ে ফেলুন না।

ভূপতি। নীরদ কি বে করবেন ?

নিকুঞ্জ। তার আর দেরী নেই। সন্ধ্যের পর ব্রহ্মচর্য্য পালনটা কি রকম চলছে, তা জানেন ত।

ভূপতি। ঐ আবার আর এক ভয়, আমার একটী মাত্র মেয়ে।

নিকুঞ্জ। ভয় পাবার কিছু নেই। বিয়েটা হয়ে গেলেই বৈরাগ্য ভাব নিজে থেকেই কমে যাবে।

ভূপতি। আমি কি বৈরাগ্যের কথা বলছি !

নিকুঞ্জ। আমি কি আর বুঝি নি ? জানেন না, বৈষ্ণবের বৈরাগ্য হল মালপো-ভোজনে, আর শাক্তের হল মাদক-পানে, এটা সেই রকমের বৈরাগ্য আর কি।

ভূপতি। নীরদ কি আমার মত গরীবের মেয়ে বিয়ে করবেন ?

নিকুঞ্জ। না করার কারণ ত কিছু দেখি না, তায় আবার শুনেছি, আপনার মেয়েটী দেখতে বড় সুশ্রী।

ভূপতি। বাপ হয়ে আর নিজের মুখে কি বলব, তবে মা আমার লক্ষ্মীর মতই বটে।

নিকুঞ্জ। তবে আর কিসের ভাবনা, বলুন ?

ভূপতি। আমি গরীব বলে কি একটা মনের মত পাত্রে আমার মেয়ে দিতে ইচ্ছে করে না ?

নিকুঞ্জ। করে বৈ কি, অবশ্য করে, তবে নীরদ এমন কি মন্দ পাত্র ? দ্বিতীয় পক্ষ বটে, ঐটুকু যা। বয়স

এমন বেশী কিছু হয় নি, অর্থের অভাব নেই ; স্বামী-হিসেবে লোকটা নেহাৎ মন্দ হবে না। ও যে-প্রকৃতির তাতে স্ত্রীর খুব বেশী রকমই যত্ন হওয়া সম্ভব। তা'ছাড়া ওর চেয়ে একটা ভাল পাত্রও ত পাওয়া চাই।

ভূপতি। সব যেন মান্‌লুম, এখন বের কথাটা উত্থাপন করে কে ?

নিকুঞ্জ। সে ভার আমার। আমি যেমন বলি, তেমনি করুন দেখি।

ভূপতি। বেশ, রাজি হলুম।

আর খানিক কথাবার্ত্তা কহিয়া দুজনে নিজ-পথে প্রস্থান করিল।

৫

সখ করিয়া বেড়াইতে যাওয়াটা প্রিয়ম্বদা বা তাহার মায়ের কখনো ঘটিয়া ওঠে নাই। হঠাৎ একদিন ভূপতি উভয়কে চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে লইয়া গেল।

নানারকম জীব-জন্তু দেখিয়া প্রিয়ম্বদা যেমন আমোদ পাইল, তেমনি অবাক হইল। নানা দেশের নানা রকম পশু-পক্ষী দেখিতে দেখিতে সে এমনি বিভোর হইয়া পড়িতেছিল যে স্বাভাবিক সঙ্কোচের ভাবটুকু পর্য্যন্ত তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন কি বালিকার সদা-বিষণ্ণ মুখখানি হইতে বিষাদের ছায়াটুকু সরিয়া গিয়াছিল। যখন প্রিয় ও তাহার পিতা মাতা কাঙ্গারুগুলার খাঁচার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাদের অদ্ভুত চেহারা নিরীক্ষণ করিতেছে, নিকুঞ্জবিহারী তখন নীরদকে সঙ্গে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ; ভূপতিকে কহিল, "এই যে মশায়, অনেকদিন পরে দেখা।" ভূপতির গৃহিণী ঘোমটা টানিয়া একদিকে সরিয়া গেলেন ; প্রিয়ম্বদা মায়ের পাশ ঘেঁসিয়া অন্য দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। নিকুঞ্জ ভূপতির সহিত লম্বা গল্প ফাঁদিয়া দিল। নীরদ অনূঢ়া প্রিয়ম্বদার মাথার মস্ত খোঁপা টক্‌টকে ঘাড় এবং সেই ঘাড় ও কবরীর পাশ দিয়া তাহার লজ্জারক্ত টুকটুকে গণ্ডদেশের যতটুকু দেখা যাইতেছিল সেইদিকে সসঙ্কোচে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

নিকুঞ্জর যে এত কথা বলিবার ছিল তাহা নিকুঞ্জও জানিত না, ভূপতিও না। কারণ কথা যেন তাহার শেষ হইতেই চাহে না। নিকুঞ্জ যখন ভূপতিকে কহিল, "মেয়েদের বুঝি 'জু' দেখাতে এনেচেন" তখন গল্প করিতে করিতে প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট কাটিয়া গিয়াছে।

ভূপতি। হাঁ, এই 'জু'টা দেখবার মেয়ের অনেক দিনের সাধ। একে ছুটীর অভাব, তা'য় আবার গাড়া-ভাড়াটাও নেহাৎ কম নয়। আজ সুবিধে হল তাই—

নিকুঞ্জ। নীরদ যে একেবারে বোবা হয়ে গেলে !

ভূপতি। উনি বোধ হয় আমায় ভুলে গেছেন।

অপ্রতিভ নীরদ প্রথমটা কথা কহিতে পারিল না, তারপর ত্রুটি-সংশোধনের চেষ্টায় নিজের ত্রুটি অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া কেমন একরকম গোলমাল পাকাইয়া "ভূপতিবাবু ভাল আছেন ?" বলিয়া একটা নিরর্থক প্রশ্ন তুলিয়া বসিল।

নীরদ পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া আর দুএকটা কথার পরই নিকুঞ্জ তাহাকে অন্য দিকে লইয়া গেল। একটা সিংহ-শাবকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিকুঞ্জ কহিল, "ভূপতির মেয়েটীর মত সুন্দরী বাঙালার ঘরে দেখা যায় না।"

নীরদ। মেয়েটীর কি বিয়ের ঠিক হয়েছে ?

নিকুঞ্জ। শুনেছি যেন হয়েছে। অমন মেয়ে কি পড়ে থাকে ?

আগ্রহের সহিত নীরদ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ঠিক হল হে ?"

নিকুঞ্জ। তা ঠিক জানিনে, শুনেচি যেন মফঃস্বলের কোন্ এক জমিদারের সঙ্গে। পাত্রের নাকি সবই ভাল, শুধু বয়সটা ষাটের ওপর।

নীরদ। বল কি হে ? এমন অপ্সরার মত মেয়েকে একটা ষাটের মড়ার সঙ্গে বে দেবে ?

নিকুঞ্জ। উপায় কি ! অর্থ ত আর নেই।

অজ্ঞাতসারে নীরদের বুকের মধ্য হইতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিয়া হাওয়ায় মিশাইয়া গেল।

আবার তাহাদের ভূপতিদের সহিত দেখা হইল, এবার উভয় পক্ষ আসিয়া পড়িল সাম্‌না-সাম্‌নি। এবার নী- সহিত প্রিয়ম্বদার চোখোচোখি হইল। অনব-

মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া নিকুঞ্জ তাহাকে টানিয়া লইয়া অন্যদিকে প্রস্থান করিল। বাঁদর-উল্লুকেরা খাঁচার ভিতর বসিয়া 'উকু' উকু' করিয়া লোকের কান ঝালাপালা করিয়া দিতেছিল; কিন্তু সে শব্দ নীরদের কর্ণে প্রবেশ করিল না। বিশ্ব-বিস্তৃত চিড়িয়াখানার মানুষ চিড়িয়া নীরদ তখন এক অদৃশ্য ব্যাধের জালে পড়িয়া উতলা হইয়া উঠিয়াছিল।

আবার দেখা; আবার চোখোচখি! নিকুঞ্জ যখন তাহাকে গাড়ীতে গিয়া তুলিল, তখন নীরদের সমাধি-ভাব।

৬

কবি গাহিয়াছেন, "সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে।" এই ভাবটা হওয়া উচিত ছিল প্রিয়ম্বদার; হইল কিন্তু অন্যরূপ। প্রিয়ম্বদার মুখখানি একেবারে গিয়া নীরদের মনের বাসরে ঝাঁপাইয়া পড়িল ফিরিয়া যাইবার নামও করিল না। কাজেই নীরদের ইচ্ছাবৃত্তি নববধূর সাজ একবার প্রিয়ম্বদার দিকে অগ্রসর হয়, আবার পিছাইয়া যায়, একবার ধীরে ধীরে আসে, পরমুহূর্ত্তে লাজে ফিরিয়া যায়!

নীরদের দোষ কি? সবে তার চৌত্রিশ বৎসর বয়স। মায়াবিনী সংসার মন-ভোলানো লক্ষ থাবা বাহির করিয়া তাহাকে কাছে টানিতেছে অথচ বৈরাগ্যের নীচে সুরা এবং সিদ্ধিতে গড়া ভিদ্‌টা বড় কাঁচা। এক দিকে মৃত পত্নীর স্নেহ-বিজড়িত মুখ বটে, কিন্তু আর একদিকে এই বিচিত্র সৃষ্টির বিচিত্র ভোগের আকর্ষণ! একদিকে অতীতের লুপ্ত ছায়া, আর এক-দিকে বর্ত্তমানের প্রবল শক্তি, একদিকে স্মৃতির ক্ষীণ ক্রন্দন, আর-এক দিকে ক্ষুধার্ত্ত মনোবৃত্তির নিশিদিন তাড়না। নীরদের অপরাধ কি!

এমন সময় একদিন নিভৃতে নিকুঞ্জ আসিয়া কহিল, "ভূপতির মেয়ের আজ পাকাপাকি হয়ে গেল।"

নীরদ ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একেবারে পাকাপাকি?"

নিকুঞ্জ। পাকাপাকি জিনিষটা একেবারেই হওয়া ভাল; দুবার বা তা'র বেশীতে পাকাপাকি যখন গিয়ে দাঁড়ায় তখন পাক কাঁচিয়ে গিয়ে কাঁচাপাকা হয়ে দাঁড়ায়।

নীরদ। আঃ বাজে কথা রাখ না! বল, এখন উপায় কি?

নিকুঞ্জ। তোমার অবস্থাটা যে এমন নিরুপায় সে কথা ত আমায় আগে বল নি।

নীরদ। এ বিয়ে ভূপতিবাবু দিতে যাচ্ছেন কেন?

নিকুঞ্জ। তোমার দুরদৃষ্ট আর ভূপতির কুবুদ্ধি।

একটা ঢোক গিলিয়া নীরদ কহিল, নিকুঞ্জ, পাপ কাকে বলে?

নিকুঞ্জ। পাপ পাপকে বলে।

নীরদ। লোভকে পাপ বলে? মিথ্যাকে পাপ বলে?

নিকুঞ্জ। বলে বৈ কি। জানোনা, Thou shalt not covet your neighbour's—আরে, ভুল হয়ে গেল, এ ক্ষেত্রে যে wife নয় daughter।

নীরদ। লোভ যদি পাপ হয়, লোভ পুষে রাখা ভাল, না আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি করে লোভের নিবৃত্তি করা ভাল?

নিকুঞ্জ। ভাই, আমার নাম plain নিকুঞ্জবিহারী রায়, শাস্ত্র-চূড়ামণি কিংবা বিদ্যাদিগ্‌গজ জাতীয় নামের ভূষণ এখনও হাসিল করিতে পারিনি।

নীরদ। আঃ, বল না।

নিকুঞ্জ। বোধ হয় লোভ নিবৃত্তি করাটাই ভাল।

নীরদ। ঠিক ত? যেখানে লোভ পুরোদস্তুর সেখানে লোভ নেই বলে লোক ঠকানো,—যা সত্যি নয় তা সত্যি বলে লোকের চোখে ধূলো দেওয়া পাপ নয় কি?

নিকুঞ্জ। খুব পাপ।

নীরদ। ভাই, এ বিয়ে ভাঙ্গে না? আমি বে করব।

নিকুঞ্জ। তুমি বিয়ে করতে রাজি হলে এমন সম্বন্ধ হাজারটা কাঁচিয়ে দিতে পারি, এটার কথা ছেড়ে দাও।

নীরদ। তবে তাই কর, কিন্তু—

নিকুঞ্জ। কিন্তু আবার কি? পরিষ্কার করে বল।

নীরদ। যদি পরলোকে দেখা হয়? আর তিনি যদি বলেন, এ কাজ কেন করলে?

নিকুঞ্জ। বলো, নরকের ভয়ে। ভূপতির মেয়েরও কি একটা দাবী নেই? অমন সোনার প্রতিমা, ওই কচি বয়স, ওর কি একটা মড়ার হাতে পড়া উচিত?

নীরদ। আমিই কি এমন একটা কিশোর?

নিকুঞ্জ। তবুও ষাট বছরের বুড়ো নও তো!

নিকুঞ্জর জয় হইল। কিন্তু পরাজয়টা কাহার হইল তা'ত জানিনা। বোধ হয়, নীরদের মৃতা পত্নীর। কিন্তু নীরদ কি করিবে? তাহাকে সংযমের কথা কেহ কখনও বলে নাই।

৭

বিবাহ হইয়াই গেল; অতি চুপি-চুপি। তিলক-আলোক কেহ ঘুণাক্ষরেও টের পাইল না।

সন্ধ্যার আড্ডা লুপ্ত হইল। নীরদের মাথার টিকিটা অলক্ষ্যে অদৃশ্য হইল; এবং কাছা তাহার প্রকাশ্যভাবে আসিয়া দেখা দিতে ইতস্তত করিতে লাগিল।

দিন কতক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় দুই ছেলেকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া নানা রকম গল্প করিতে করিতে নীরদ বলিয়া ফেলিল, "তোরা একটা মা নিবি?" লাফাইয়া উঠিয়া তিলক কহিল, "নতুন মা বুঝি? আমরা চাইনে।" আলোক কহিল, "কখ্‌খনো নয়।"

নীরদ কহিল, "তোদের সে খুব আদর-যত্ন করবে। বড় লক্ষ্মী মা।"

তিলক। তাও চাইনে।

কিন্তু দিন কতক পরে নূতন মা আসিল। বই-পত্র লইয়া তিলক রাগিয়া নীচের বাহিরের একটা ঘরে চলিয়া গেল। আলোক কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিয়ম্বদাকে কহিল, "যাও, তোমাকে মা হতে দেব না; কখ্‌খনো দেব না। কেন তুমি মা হলে?" তখন আর উপায় ছিল না, কাজেই প্রিয়ম্বদা আলোককে জোর করিয়া কাছে টানিয়া কোলে বসাইয়া রাখিল।

তিলক পোষ মানিবার ছেলে নয়! একদিন সে খাইল না, বাপের সাধ্য-সাধনাতেও কোন ফল হইল না। সে ত্রিতলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল; দুবেলা খাইবার সময় ঠাকুরের কাছে খাবার চাহিয়া খাইয়া যায়; নূতন মা আধ ঘোমটা দিয়া সম্মুখে বসিয়া বাতাস করে, সে একবারও ফিরিয়া চাহে না; সকালে বিকালে রেকাবিতে জল খাবার সাজাইয়া ঐ বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া—কিন্তু তাহা অভুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

এমনি ভাবে চার-পাঁচটা দিন কাটিয়া গেল। সেদিন শনিবার; দেড়টার সময় স্কুলের ছুটী। তিলক নিজের ঘরটীতে টেবিলে বই ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, জামা-কাপড় ছাড়িল না, জুতা পর্য্যন্ত খুলিল না। আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে তেরো বছরের ছেলের মাথাটা টেবিলে লুইয়া পড়িল।

এমন সময় নিঃশব্দে আসিয়া একজন ঘরে প্রবেশ করিল। টেবিলের একধারে এক রেকাবি খাবার ও এক গেলাস জল রাখিল। তারপর বালকের মাথায় সস্নেহে কর স্পর্শ করিয়া সে ডাকিল, "তিলক—"

মাথা তুলিয়া তিলক দেখিল যে এই অনাহূত আগন্তুকটী সেই, যাহাকে সে পৃথিবীর ভিতর সব চেয়ে বেশী এড়াইয়া চলিতে চায় এবং যাহাকে লোকে বলে তাহার নূতন মা।

তিলক উঠিয়া দাঁড়াইল; রক্ত জবার মত চোখ দুটী কোঁচার মুড়ায় মুছিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে তাহার একখানি হাত ধরিয়া প্রিয়ম্বদা কহিল, "যেয়ো না বাবা, বসো।"

যে-তিলককে নীরদ কখনও আটকাইতে পারে নাই, সে আজ নড়িতে পারিল না।

নূতন মা কহিল, "বাবা, আমি কি তবে চলে যাব? তোমরা আমায় চাও না? বল, তাহলে—" আর চোখের জল ধরিয়া রাখা গেল না; চোখে আঁচল দিয়া নূতন মা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া ছেলেরও চোখেও জল অমনি উথলিয়া উঠিল।

তিলক যখন শান্ত হইল, তখন সে দেখে, তাহার মুখখানি তাহার বালিকা মাতার স্নেহতপ্ত বুকে এবং তাহার চোখের জলে তাহার মাথার চুল ভিজিয়া গিয়াছে। মৃতা মাতা নূতন মায়ের রূপে পুরানো স্নেহ বুকে পুরিয়া আসিল, কিম্বা কি হইল, জানি না, তবে সে দিন তিলক প্রিয়ম্বদার হাতের দেওয়া জল-খাবার তৃপ্ত হইয়া খাইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

## এক

বিহগের বাণীময় তানে
নির্ঝরের গানে
তটিনীর জলনৃত্য-রোলে
সিন্ধুর কল্লোলে
নিখিলের সব ধ্বনিমাঝে
এক কণ্ঠ শুনি শুধু বাজে,
হৃদয়ে আমার
এক সুর গুঞ্জে অনিবার
সে সুর তোমার।

চিরদিন এই ধরিত্রীতে
অকলঙ্ক শ্রীতে
বসুধার সকল শ্যামলে
পত্রে, পুষ্পে, ফলে

বসন্তের সবুজ উৎসবে
শরতের শেফালি-গৌরবে
আঁখি সমুৎসুক
এক মুখ হেরি পায় সুখ
তোমারি সে মুখ!

গেহমাঝে, গহনে, প্রবাসে
ব্যথায়, উল্লাসে
উষারাগে, নিশার তিমিরে
আতপে শিশিরে
নিত্য নব সোহাগে, আশায়
ছন্দে, গীতে, বিচিত্র ভাষায়
বিশ্বভোলা কবি
যে ছবিটি আঁকিয়া গরবী
তোমারি সে ছবি।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

---

# আমার দেখা লোক

### লাট ডফারিন

[আমার কোন বন্ধু লাট ডফারিনের গোঁড়া। লাট ডফারিন যে কিরূপ ধরণের রাজপ্রতিনিধি (ভাইসরয়) এবং কিরূপ রাশভারী তেজস্বী শাসনকর্তা (প্রান্সিং প্রোকন্সল) ছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য বন্ধুবর একটী গল্প বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ঘটিয়াছিল এরূপ মনে করিতে যে নিষেধ, 'তাহা' ভুলিলে রসভঙ্গ হইবে। চিত্রটীর সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য ভারতবর্ষীয় স্থানের এবং ভারত-সংসৃষ্ট নামের ব্যবহার, ইহা 'বুদ্ধিমান' ব্যক্তিকে বলা বাহুল্য নয় কি? আমি লাট ডফারিনকে কখনও দেখি নাই; কিন্তু বন্ধুবর দেখিয়াছিলেন। তাহাতেই আমার দেখা লোকের মধ্যে পড়িয়াছে।—ইতি প্রস্তাবনা।]

স্থান ভেরাগুফুলি ষ্টেশন। সময় একটা রেলওয়ের প্রথম খুলিবার দিন। প্লাটফরমে শালু পাতা। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উহার দুইপাশ দিয়া অবিরত চলাফেরা করিতেছেন। শালুতে কেহ পা দিলে সার্জ্জেণ্টরা অল্প একটু ধাক্কা দিতেছে। পাশে দাঁড়াইলেও তাই। 'অবিরত' চলাফেরা চাই (অর্থাৎ ইংরাজীতে 'নো ক্রাউডিং' এবং 'বি কনষ্টাণ্টলি অন দি মুভ')। একখানি স্পেশিয়াল ট্রেণে রাজা-মহারাজা প্রভৃতি আসিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, লাট সাহেবের আসার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ীতেই বসিয়া থাকেন এবং লাট সাহেবকে প্লাটফরমে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে অল্প-দূরস্থিত সামিয়ানার নিম্নে যাইবেন। প্লাটফরমে বা নিকটে অন্যত্র বসার জন্য কোন

ব্যবস্থা ছিল না; ওদিকে তাঁহাদের গাড়ীশুদ্ধ কোন 'সাইডিংয়ে' রাখিয়া দেওয়ার কথাও কাহারো মনে পড়ে নাই বা তাহা করা আবশ্যক বলিয়া কেহ ভাবে নাই।

পুলিস সার্জ্জেণ্ট। (গেট ডাউন কুইক্‌লি বাবুজ্‌) বাবুরা শীঘ্র নামিয়া পড়ুন।

দেবেন্দ্রনাথ। ইহাঁরা সকলেই বাবু নহেন; রাজা-মহারাজা আছেন।

সার্জ্জেণ্ট। ও সবই প্রায় একই দাঁড়ায় (ওহ্‌ ইট অল কম্‌স্‌ টু দি সেম থিং) নামো শীঘ্র। (গেট ইউ ডাউন)!

দেবেন্দ্রনাথ। বসিব কোথায়? ধাক্কা খাইতে খাইতে প্লাটফরমে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিব না। নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে; এখন না হয় কনষ্টেবল দিয়া হাত ধরিয়া নামানো হউক!

পুলিস সাহেব (ইতিমধ্যে তথায় আসিয়া)। সে কাজ সহজেই হইতে পারে। (ওহ্‌ দ্যাট ইজ্‌ ইজিলি ডন্‌) কনষ্টেব্‌ল্‌! কনষ্টেবল আসিলে ইহাঁদের নামাইয়া দাও।

দেবেন্দ্রনাথ (পুলিস সাহেবকে)। এর জন্য পরে মজা দেখিবে (ইউ উইল রিগ্রেট দিস্‌)।

রাজা লালকৃষ্ণ। ইহাই যথেষ্ট,—হাত ধরিতে হইবে না। আমরা নামিতেছি। (নামিয়া দেবেন্দ্রনাথকে) এর জন্য একটু বলা আবশ্যক। ঐ যে ছোট লাট! আপনিই বলুন।

দেবেন্দ্রনাথ (অগ্রসর হইয়া)। আমি এবং নিমন্ত্রিত রাজা-মহারাজাগণ অপমানিত হইয়াছি।

ছোটলাট। আমি তোমাদের দুঃখ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে জ্বালাতন (আই অ্যাম সিক অফ্‌ হিয়ারিং ইয়োর গ্রীভান্‌সেস্‌)। বেলভেডিয়ারে গিয়া এর পর জানাইও। এখন আমার সময় নাই।

বৃদ্ধ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের চোপদার (খুব লম্বা, ফর্সা শ্বেত শ্মশ্রু-সমন্বিত, সুসজ্জিত, সুপুরুষ—লর্ড ডফারিন ইহার কিছু পরে শালুর উপর দিয়া আসিয়া নিকটে পঁহুছিলে উচ্চৈঃস্বরে) রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর!

লর্ড ডফারিন। (অমায়িকভাবে মুচকি হাসিয়া হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক) এখানে দেখা পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম (ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ হিয়ার)। (শালুর উপর টানিয়া লইয়া করমর্দ্দনপূর্ব্বক) এস, একত্রে যাই।

রাজা রাজেন্দ্রনারাণ (সবিনয়ে)। আমি আর যাইব না; বড়ই অপমানিত হইয়াছি। ইনি বাবু দেবেন্দ্রনাথ। ইনিই সব কথা বলিবেন।

লর্ড ডফারিন (দেবেন্দ্র বাবুর দিকে ফিরিয়া)। কি হইয়াছে? বলুন।

দেবেন্দ্রনাথ। (সম্পূর্ণ ঘটনা এবং সার্জ্জেণ্টের এবং পুলিস সাহেবের উক্তি ঠিক ঠিক বলিয়া)—ছোটলাট বাহাদুরকে এ সকল কথা জানানোয় তিনি বেলভেডিয়ারে গিয়া এ সকল কথা জানাইতে বলিলেন!

লর্ড ডফারিন। (নিকটবর্ত্তী ছোটলাটের দিকে ফিরিয়া) তুমি ইহার কি জানো, সার রি—?

সার রি—। হাঁ, আমাকে একটা দুঃখের লম্বা কাহিনী বলা আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু—

লর্ড ডফারিন। আর তুমি বলিলে যে বাড়ীটা পুড়িয়া যাক, তার পর 'ফায়ার এঞ্জিন' (দমকল) ডাকা হইবে! এখানে ব্যবস্থার ভার কাহার উপর ছিল?

সার রি—(এত লোকের সাক্ষাতে ঐ ভাবের ধমকানি ও বিদ্রূপে সঙ্কুচিত হইয়া হেঁটমুখে)।—কমিশনর বী—।

লর্ড ডফারিন।—কোথায় সেই কমিশনর বী—। (আরদালিরা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে এবং তিনি আসিয়া 'আমি মিষ্টর বী—'এই কথা বলিলে) কিন্তু কি কাজ কর—তুমি বীমসই হও আর টীমসই হও তাহাতে কিছু আসে যায় না। (বাট্‌ হোয়াট্‌ আর ইউ—ইট ডজ নট্‌ ম্যাটার হোয়েদার ইউ আর বী অর্‌ টী)।

কমিশনর। আমি এখানকার কমিশনর।

লর্ড ডফারিন। আর তুমি যেভাবে তোমার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাক, এই তাহার নমুনা! যাঁহারা এখানে আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রিত (ইনভাইটেড টু মীট মি হিয়ার) তাঁহারা অপমানিত হন! (ব্যাপারের গুরুত্বটা 'এইবার' সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়া সকল ইংরাজ পরস্পরে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া হেঁটমুখ করিল) কোথায় তোমার

সেই **পুলিশ** সাহেব, যাহার উপর ভার দিয়া তুমি **নিশ্চিন্ত? তোমার** সকলেই এইরূপ? নিজেরা কিছু **দেখনা,** পর-পর নীচের কর্ম্মচারী যাহাই করুক, তাহাতে 'তোমাদের' হাত নাই।

**পুলিশ সাহেব** (**সরিয়া** পড়িয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড ডফারিন **কয়েক মিনিট অপেক্ষা** করিয়া দাঁড়াইয়া রাহলেন দেখিয়া **অগত্যা তাঁহাকে আনা হইল**)। আমি মিঃ—।

**লর্ড ডফারিন।** তোমার মতে গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদের **উপাধি-ভূষণে সম্মানিত** করিয়া নিজেকে সম্মানিত বোধ **করেন, তাঁহারা সম্মানের** যোগ্য নহেন! কিন্তু গবর্ণমেণ্টের **চাকরেরা গবর্ণমেণ্টের** প্রদত্ত সম্মানকে সর্ব্বথা গৌরব **করিতে বাধ্য। তুমি দেখিতে পাইবে** যে **তোমার আচরণের ফল কি!** (রাজা রাজেন্দ্রর স্কন্ধে বন্ধুর ন্যায় হস্ত **রাখিয়া অতীব** মিষ্টভাবে) চল রাজা, অগ্রসর হওয়া **যাউক।**

রাজা রাজেন্দ্র। অপমানিত আমরা এইখান হইতেই ফিরিব। তবে আপনি যাহা বলিলেন, সেজন্য আপনাকে **আন্তরিক ধন্যবাদ** করিতেছি।

**লর্ড ডফারিন।** তাহা হইবে না। কি করিলে **আপনারা আমার সঙ্গে** যাইবেন, তাহা বলুন। আমি **মহারাণীর প্রতিনিধি,** আমার কথা রাখিবেন বৈ কি!

বাবু দেবেন্দ্রনাথ। আপনি যাহা হুকুম করিবেন **তাহাই** অবিচারিতভাবে সকলের **দ্বারাই** পালিত হইবে বৈ কি! তবে পুলিশ সাহেব **জনে-জনের** কাছে গিয়া ক্ষমা **প্রার্থনা** করিলে মনে **দুঃখ থাকে না।**

সার রি—। ইহা একেবারেই অসম্ভব কথা (দ্যাট্স্ অ্যান ইম্পসিবল্ প্রপোজিসন)।

**লর্ড ডফারিন।** যখন আমি **হুকুম** দিতেছি, তখন তুমি **হস্তক্ষেপ করিতে** আসিতেছ কেন, সার রি—? **যখন** তোমার হস্তক্ষেপ কর্ত্তব্য ছিল, তখন ত তুমি কিছুই **কর নাই।** (হোয়াই ডু ইউ ইন্টারফীয়ার হোয়েন আই **অ্যাম** গিভিং **অর্ডার্স,** সার রি—? ইউ ডিড নথিং হোয়েন **ইট ওয়াজ ইয়োর** ডিউটী টু ইন্টারফীয়ার)। [পুলিশ **সাহেবের প্রতি] ইহা খুবই** সোজা কাজ, অর্থাৎ ...

ক্ষমা প্রার্থনা করা মূলেই **অসম্ভব নয় (নথিং ইজিয়ার)।** আরম্ভ কর, বেকার (বিগিন বেকার)।

পুলিশ সাহেব (শেষ দুই কথায় কড়া সুরে থতমত খাইয়া, হেঁটমুখে)। রাজা বাহাদুর, আমার **অভদ্রতার** জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। মহারাজা বাহাদুর, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। **দেবেন্দ্র বাবু, আমি দুঃখ** প্রকাশ করিতেছি।

দেবেন্দ্র বাবু। আমি ত **বলিয়াছিলাম, তাহা করিতে** হইবে! এইবার **সাধারণভাবে সকলের নিকট একত্রে** ক্ষমা প্রার্থনা করুন; বড়লাট সাহেব **অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া** রহিয়াছেন।

লর্ড ডফারিন। (**পুলিস** সাহেব **উচ্চৈঃস্বরে পুলিসের** এবং নিজের অভদ্রতার জন্য **সাধারণভাবে সকলের নিকট** দুঃখ প্রকাশ করিলে) ভদ্র মহোদয়গণ **এবং সংবাদ পত্রের** রিপোর্টারগণ, এই লজ্জাকর ব্যাপারটা (**ডিস্গ্রেসফুল** ইন্সিডেণ্ট) সকলে **একেবারেই ভুলিয়া যান।—নূতন** নূতন রেলওয়ে খোলা যে **এই বিস্তীর্ণ মহাদেশের পক্ষে** বিশেষ উপকারী, **তাহাই স্মরণ রাখিয়া এইবার একত্রে** আনন্দ উপভোগ করা যাক।

—বন্ধুবরকে **বলিয়াছিলাম, "ছবিটী বেশ আঁকিয়াছ**—কিন্তু লোকে মনে **করিবে, বুঝি প্রকৃত ঘটনা!" বন্ধু** বলিলেন **যে যাঁহারা লর্ড ডফারিনকে চিনেন এবং তিনি** কিরূপ লিখিয়ে, **বলিয়ে,** তেজস্বী **কাজের** লোক **এবং উচ্চ** রাজনৈতিক (ডিপ্লোমাট) তাহা **জানেন, তাঁহারা** অবশ্যই বলিবেন যে এরূপ ঘটনা কোথাও **ঘটিয়া** থাকিলে **লর্ড ডফারিন ঠিক ঐরূপই** ব্যবহার করিতেন **এবং খবরের কাগজেও যাহাতে ঐ সব কথা** বাহির **না হয়, সেজন্য ঠিক ঐভাবেই ব্যবস্থা করিতেন।**

বন্ধুবর ইহার পর **লর্ড** ডফারিন **সম্বন্ধে একটি** সর্ব্বজন-বিদিত **প্রকৃত** ঘটনার **উল্লেখ** করেন। **প্রাসঙ্গে** ব্যাঙ্ক দেউলিয়া **হওয়ায়** অনেক লোকের বিস্তর **টাকা** লোকসান হয়। **লর্ড ডফারিন ঐ** ব্যাঙ্কের একজন **ডিরেক্টর** ছিলেন। ওরূপ **বুদ্ধিমান** এবং ক্ষমতাপন্ন **লোকের** [illegible]

হইয়াছে, এই বিশ্বাসে সকলেই লর্ড ডকারিনের উপর চটিয়া যায়। লর্ড ডকারিন যখন শেয়ার হোল্ডারদিগের এবং ডিপজিটরদিগের সমক্ষে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী কাতরভাবে হাত ধরিয়া বলেন, "যাইও না। লোকে তোমাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবে; বড়ই রাগিয়াছে।" লর্ড ডকারিন বলেন "আমার কথা শুনিয়া কেহ কি কখনো অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়াছে? এখানেও আমি জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিব।" তিনি দ্বার-বদ্ধ গাড়িতে করিয়া কোনরূপে পঁহুছিয়া ব্যাঙ্কের জানালার নিকট গেলে চীৎকার উঠিল, "ঐ সেই স্কৌন্‌ড্রেল" (ঐ সেই জুয়াচোর বদমাইস) কিন্তু কেহ ইট ছুড়িবার পূর্ব্বেই লর্ড ডকারিন বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, দুই মিনিট আমার কথা শুনিবার পর যাহা ইচ্ছা করিবেন— আমাকে ইট মারিয়া চূর্ণ করিবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এখান হইতে সরিব না।" অমনি সব চুপ; এমনি তাঁহার মিষ্ট মনোহর ধরণ এবং স্বর ছিল!

লর্ড ডকারিন বুঝাইলেন যে কি কি ভুলে এবং দোষে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে। তিনি অন্যত্র দূরে ছিলেন; কাজ দেখিতে পারেন নাই, শুধু নাম রাখিতে দিয়াছিলেন, সেজন্য নিশ্চয়ই তিনি অপরাধী। ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগের লিমিটেড লায়াবিলিটী। যাহার যত শেয়ারের টাকা তাহাই তাঁহাদের গেল। কিন্তু তিনি নিজের জন্য "অনলিমিটেড লায়াবিলিটী" স্বীকার করিয়া লইতেছেন; পৃথিবীতে তাঁহার যে কিছু ধন-সম্পত্তি পৈত্রিক বা স্বোপার্জ্জিত আছে, সমস্তই তালিকাভুক্ত করিয়া আনিয়া দিয়াছেন; ব্যাঙ্কের লিকুইডেটারেরা তাহা পাওনাদার-দিগকে বণ্টন করিয়া দিবেন। তিনি কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া সেখান হইতে গৃহে ফিরিবেন; এবং চাকরির টাকাতেই গ্রাসাচ্ছাদন করিবেন।

বাগ্মীর কথা ঠিকই হইল!—লর্ড ডকারিনের বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব্বেই যাহারা উঁহাকে 'জুয়াচোর বদমায়েস' বলিয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারাই তখন চীৎকার করিতে লাগিল, "লর্ড ডকারিন দীর্ঘজীবী হউন" (লং লিভ লর্ড ডকারিন)!

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

---

# সমালোচনা

**রংমশাল।**—শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও চারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত। তৃতীয় বর্ষ, ১৩২৯। প্রকাশক, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। নববিভাকর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা বারো আনা। এখানি ছেলেমেয়েদের পূজার বার্ষিকী উপহার,—ছবি, গল্প ও কবিতার বিচিত্র ডালি। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'জলযাত্রা'—কবিবরের হস্তাক্ষরে ও চিত্র-শিল্পী অসিতকুমার হালদারের চিত্রে অপূর্ব্ব বর্ণে সুষমায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। তারপর অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন, নরেন্দ্র দেব, প্রিয়ম্বদা দেবী, কবি কিরণধন, গিরিজাকুমার, ওস্তাদ শিশু-লেখক মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রভৃতি ওস্তাদ লেখকদের লেখা গল্পে কবিতায় রংমশালে রঙের ফুলঝুরি ফুটিয়াছে। চিত্রশিল্পী সম্পাদক চারুচন্দ্র রায়, পুলিনবিহারী দত্ত, যতীন্দ্র সেন প্রভৃতির ছয়খানি রঙীন ছবি ও পনেরো খানি এক রঙা ছবিতে রংমশালের পাতায় পাতায় বাহার খুলিয়াছে। এ বইখানি বাঙলার গৌরব, বাঙালীর গৌরব—যে-কোন দেশের সাহিত্যে অলঙ্কার। এ বই যে ছেলেমেয়েরা হাতে না পাইবে, তারা নিতান্তই দুর্ভাগা।

**উনপঞ্চাশী।**—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২নং রামরতন বোস লেন, শ্যামবাজার কলিকাতা। কোহিনুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এই গ্রন্থে 'অবতারের মহিমা', 'কলের ভক্তি', 'অপারের নৌকা,' 'হিরি চরণের চুঁচো,' 'স্বদেশী গোসাই,' 'ধর্ম্মের ব্যবসা' প্রভৃতি সন্দর্ভ সংগৃহীত হইয়াছে। সন্দর্ভগুলিতে সমাজ ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে এত কথা লেখক ইঙ্গিতে ও প্রচ্ছন্নভাবে আলোচনা করিয়াছেন যে সেগুলি পাঠ করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। এগুলিতে যথেষ্ট রস সঞ্চার করিয়া লেখক লিপি-নৈপুণ্যের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রচুরই উপভোগ্য। লেখকের রচনায় হাস্য-কৌতুকের মধ্যে একটু

সামাজিক দুর্দ্দশায় ব্যথিত চিত্তের এমন করুণ দীর্ঘ নিশ্বাস আসিয়া জমিয়াছে যে সন্দর্ভগুলিকে লঘু গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না—বহু চিন্তার খোরাক ইহাতে পুঞ্জিত আছে। সমাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রকেই আমরা এই বইখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। বর্ত্তমান রাজনীতির সম্বন্ধে লেখক এমন সতর্ক নিপুণ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে তাঁহার শক্তি দেখিয়া অবাক হইতে হয়। যাঁরা গল্প ভাল বাসেন, এ বই তাঁহাদের ত ভাল লাগিবেই, আর যাঁহারা গল্পের খোসা ছাড়াইয়া ভিতরকার রস গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহারা যে আনন্দ ও শিক্ষা পাইবেন, তা একেবারে অমূল্য।

**হিন্দু সমাজের প্রতি ৺বিদ্যাসাগরের শিষ্যের উক্তি।**—শ্রীযুক্ত হৃদয়চাঁদ পাত্র প্রণীত। কলিকাতা ৫নং গোমেস্ লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এ্যাংলো সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত। বিনামূল্যে বিতরিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক বিধবা-বিবাহের সমর্থন করিয়াছেন। রচনা গদ্যে ও পদ্যে। যুক্তি মামুলি।

**রূপ-রেখা।**—শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত। প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স। ৯০।২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। চেরি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানিকে ঠিক গল্পের বই বলিতে পারি না, লেখকও তাহা বলেন নাই। লেখক শুধু রেখার সাহায্যে জীবনের কান্না হাসি এবং বিশেষ করিয়া অভাব এবং অতৃপ্তির ছবিটুকুই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। 'মালিনী', 'শিশির', 'বাতায়ন', 'জলছবি,' 'মা', 'আলো ও ছায়া', 'দুই সন্ধ্যা', 'পূজারিণী', এবং 'অনন্ত আশা' এই কয়টি রেখায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রচনায় কৌশল আছে, তবে কয়েকটিতে কাব্যের মাত্রা-সীমা ছাপাইয়া গিয়াছে; এবং সে কাব্যে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষাও বড় ছায়াপাত করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও রেখা-চিত্রগুলি চিত্তে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়। 'মালিনী', 'শিশির,' 'মা', 'দুই সন্ধ্যা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে ভাবের যে মাধুরী ফুটিয়াছে, তাহা হাল্কা হইলেও উবিয়া যায় না। প্রজাপতির পাখার মতই তাহা বিচিত্র ও উপভোগ্য।

**পাপের ছাপ।**—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ, ডি, এল প্রণীত। প্রকাশক, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা চারি আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস—বাঙ্‌লার উপন্যাস-সাহিত্যে মানব-চিত্তের একটা উপেক্ষিত দিককে আলোক-কিরণে লেখক ভারী সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উপন্যাসখানির গোড়ার পাতায় লেখক একটু ভূমিকা ফাঁদিয়াছেন—'উপোদ্‌ঘাত'—সেটি পড়িয়া উপন্যাসখানি পড়িতে বসিলে অনেক আদর্শ-পিয়াসী সমালোচকের চোখ খুলিবে, আর যাঁরা কেবলমাত্র উপন্যাসের রস পান করিতে চান্ তাঁরাও উপকৃত হইবেন। এ গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা,—লেখক বলিয়াছেন,—"নিতান্তই মানুষ। তাই তাহাদের যেমন এক দিকে আদর্শ আছে, অপর দিকে তাদের রক্তমাংসের শরীরটাও আছে, তাই তারা কোনও পূর্ণাদর্শের অভ্রান্ত কল্পনাও করে নাই, তার অনুশীলনেও পায় পায় ঠেকিয়া গিয়াছে। তাহাদের কোনও আদর্শ যে ঠিক, এ কথা আমি হলপ করিয়া বলি নাই, কোন্ ঘটনায় তাহার ত্রুটি তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করি নাই। ইহার একটা সহজ কারণ এই যে আমি উপন্যাস লিখিতে বসিয়াছি—জীবনকে সত্যভাবে আঁকিতে বসিয়াছি—প্রচারকের আসনে বসিয়া নীতি-কথা গাঁথিতে বসি নাই" এ কথাটা কতদূর খাঁটি, তা যাঁহারা উপন্যাসকে আর্টের দিক দিয়া, রস-সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। জীবনকে সত্যভাবে আঁকা—ইহাই হইল উপন্যাসের কাজ। মানুষ রক্ত-মাংসের জীব; তার মনে একটা না একটা আদর্শ যে উঁকি দেয় না, এমন নয়; তবে ঘটনাচক্রে সে-সব আদর্শের কতটা ভাঙ্‌চুর হইয়া যায়, তাহা নিজেদের জীবনে শতকরা নিরানব্বই জন লোকই উপলব্ধি করিয়াছেন—অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপন্যাস বা গল্পকে সত্যের অনুসরণ করিতে দেখিলে, 'আদর্শ' 'আদর্শ' বলিয়া মার্-মার্ করিয়া আসেন—আশ্চর্য্য! এ উপন্যাসখানির প্রধান গুণ, ইহার নরনারীগুলি লেখকের হাতে জীবন্ত মানুষ হইয়াই দেখা দিয়াছে—প্রথম ভাগের গোপাল-মূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই। মেঘনাদের জীবন একটা আদর্শ ধরিয়াই সংসারের পথে যাত্রা সুরু করিয়াছিল; কিন্তু ঘটনাচক্র তার আদর্শের আবছায়া ঘুচাইয়া তাহাকে যে সত্যকার মানুষে গড়িয়া তুলিল, সে-মানুষটি পটুয়াদের আইনে-ছাঁকা আদর্শ মানুষের চেয়ে ঢের কাজের, ঢের সুন্দর। মডেল বা আদর্শ অনুযায়ী আঁকা ছবি ঘরে টাঙ্গানোর জন্য,—টাঙ্গাইয়া রাখিলে দেওয়ালের বাহার খুলিতে পারে, তবে তার প্রাণ কোথায়? তাহাকে লইয়া সংসার করা চলে না। তারপর মনোরমা—এই চরিত্রে লেখক criminologyর একটা অতি সত্য কথা ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে চরিত্রটি অনুপ্রাণিত তবে এক-আধ জায়গায় তাঁহার purposeটুকু একটু তীব্র রেখায় ফুটিয়া চরিত্রটিকে একটু পুঁথির দিকে হেলাইয়া ধরিয়াছে! তা থাকুক, লেখকের এ চেষ্টা উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। ইহার প্লটে নূতনত্ব আছে, ব্যঞ্জনায় নিপুণ হাতের কারিগরি আছে। বইখানি চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকার উপভোগের সামগ্রী; বাঙলার উপন্যাস-সাহিত্যে বেশ সরেস জিনিষ হইয়াছে। মামুলি একঘেয়ে প্লট আর প্রাণহীন আদর্শ রচার যুগে বইখানি পাঠক-পাঠিকার পীড়িত মনে স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়া বহিয়া আনিবে, আঁধার-ঘেরা চিত্তে আলোয় লহর খুলিয়া দিবে। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাইও ভালো।

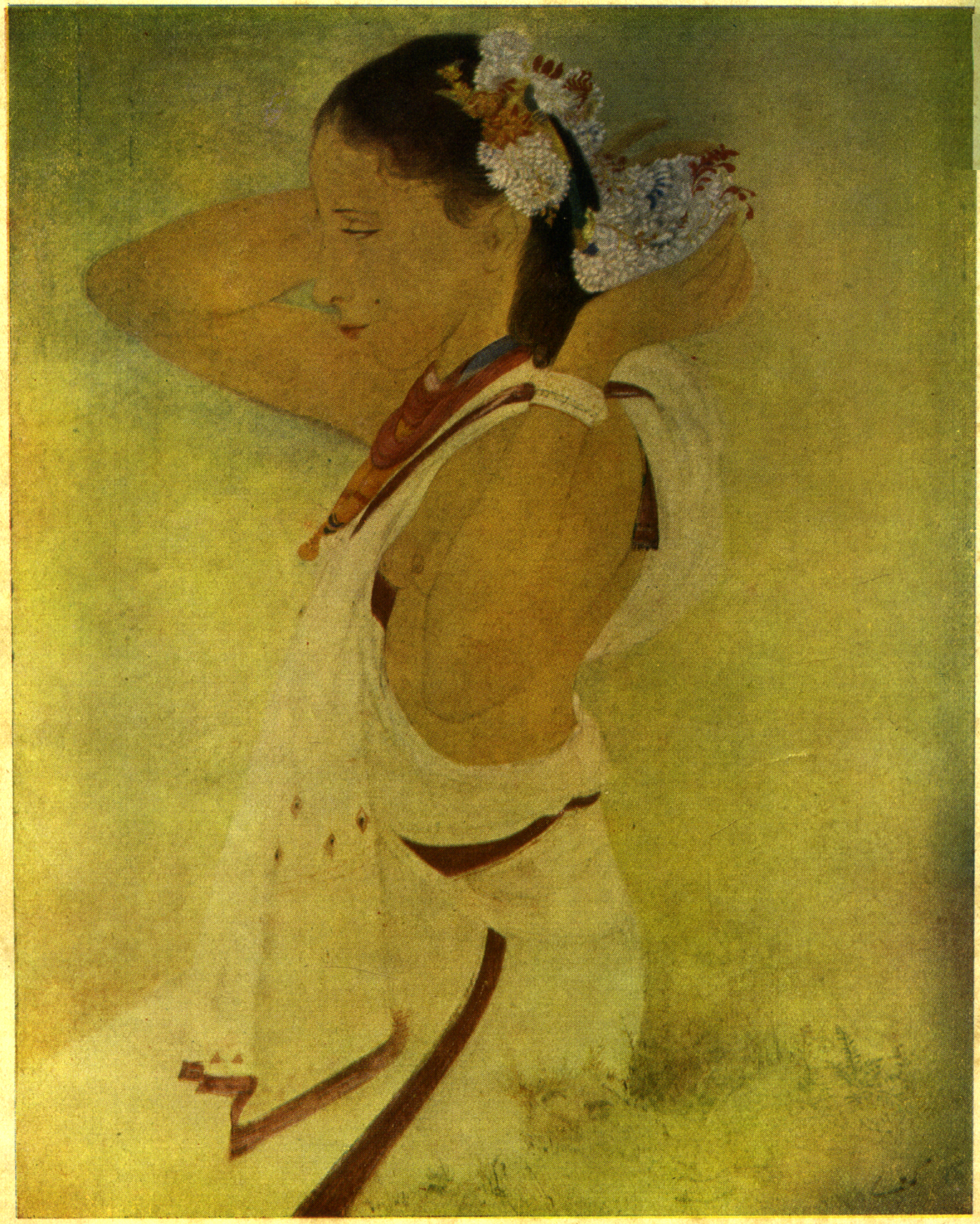
**জন্মতিথি।** শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে প্রণীত। কলিকাতা কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৬৭নং সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা। এখানি ছোট উপন্যাস; Oscar Wilde-রচিত সুবিখ্যাত নাটিকা Lady Windermere's Fan অবলম্বনে রচিত। লেখক বিলাতী নামগুলি বদলাইয়া বাঙালী করিয়াছেন। তাঁর রচনা বেশ ঝরঝরে, ভাষা সরল, অবান্তর কথা নাই। তবে Oscar Wilde-এর এই নাটিকাখানিকে 'বাঙলা' করা কঠিন, কারণ তার আবহাওয়া এমনি বিলাতী যে ও, প্লটে তাহা করা চলে না। লেখককে ইহার জন্য 'বিলাত-ফেরত' সমাজের আশ্রয় লইতে হইয়াছে; তা হইলেও ভিতরকার হাওয়াটা বাঙলা হয় নাই, এবং তা হইবার নয়ও। লেখকের লিখিবার শক্তি আছে; তবে তিনি এ পথ ধরিয়া ভুল করিয়াছেন। দেশে লিখিবার বস্তু প্রচুর আছে। বাঙালীর চিত্তের সুখদুঃখের কথা লিখিবার চেষ্টা তিনি করুন, সফল হইবেন, রচনা-রীতি দেখিয়া এ আশা আমাদের বিলক্ষণ আছে।

**মোহ।** উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বি-এল প্রণীত। প্রকাশক, অন্নদা বুকষ্টল, ২২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গুপ্ত প্রেসে শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা। এ উপন্যাসখানি মনস্তত্বের দিক দিয়া অভিনব হইয়াছে। বিনোদিনী গণিকা,—বয়স হইলেও তার রূপ-লাবণ্য আছে—একটি কন্যাও আছে, সুশীলা। মেয়ের বয়স বছর দশ। বিনোদিনীর কুহকে সারা সহর আত্মহারা। তার অগাধ বিষয়-সম্পত্তি। প্রকাণ্ড বাড়ীর এক অংশে কন্যা সুশীলা ঝী মোক্ষদার কাছে থাকে, অপর অংশে মার বিলাস-লীলা চলে। দিনের বেলায় মেয়েকে লইয়া সে মা সাজে, আর রাত্রে সে মেয়ে ভুলিয়া মাতৃত্ব ভুলিয়া বিলাসিনী সাজিয়া কুহকের জাল পাতে, লোক ভুলায়। বড়লোকের ছেলে সৌরেন সুন্দরী কিশোরী পত্নী শোভার সলজ্জ প্রেমে সুখ না পাইয়া 'প্রখর অগ্নিশিখার মত' রূপসীর বুকে 'জ্বালাময়ী প্রেম, চাহিয়া বিনোদিনীর কুহকে ভুলিয়া ঘর-সংসার, স্ত্রী মা সব ভুলিয়াছিল। পরে হঠাৎ একদিন পীড়িতা কন্যার কাছে সেবা-পরায়ণা বিনোদিনীকে দেখিল, তার ছলনা বুঝিল, বুঝিয়া সে ঘরে ফিরিল। ওদিকে ঘটনা-চক্রে মেয়ের মায়ায় বিনোদিনীও কেমন জড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মেয়ে বাপের পরিচয় চায় দেখিয়া মেয়ের মায়ায় সে মেয়ের মা ও বাপ দুই হইবে বলিয়া মেয়ের কাছে অঙ্গীকার করিয়া বসিল যে, সে মেয়েকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবে না। এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি। বিনোদিনী চরিত্রের এই দুইটা দিক এই মা ও বিলাসিনী, লেখক ভারী সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এইখানে তাঁর আর্টের কৃতিত্ব। গ্রন্থে ঘটনার ঘনঘটা নাই; তবু প্লটটি নূতন ভাবের ব্যঞ্জনায় বিচিত্র রসে চমৎকার বৈচিত্র্যে ফুটিয়াছে। আর এই সৌরেন, বিনোদিনী ও সুশীলার পাশাপাশি লেখক রেবা ও ননী নামে দুটি বালিকা তার 'ম্যানিকা' নামে একটি ডাগর ছেলের যে চিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা এমনি সরস ও প্রাণময় হইয়াছে যে ও-তিনটি প্রাণী এক-নিমেষে কেমন আপনার জন হইয়া যায়। অল্প ইঙ্গিতে, সামান্য কথায় এই কয়টি চরিত্রের কথায় বার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে বর্ত্তমান সমাজের একদিককার ছবি পরিপূর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে, তার দোষ-গুণ লইয়া। রুচিবাগীশ তাহাতে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রেবার মা, নগেন প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলিও বেশ গোটা জীবন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। লেখকের এই প্রথম উদ্যম কিনা জানিনা, তবে এখানিই তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই প্রথম উপন্যাসখানিতেই তিনি যে রচনার সংযম, চরিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য ও যে 'ষ্টাইলের' পরিচয় দিয়াছেন, তাঁর রচনায় নব্যযুগের নূতন আলোর যে আভাষ-ইঙ্গিত দেখা দিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাঁর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

**৺স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন-কথা।** তদীয় পত্নী শ্রীমতী হরসুন্দরী দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত। কলিকাতা, সাম্য প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। ৺শ্রীনাথ দত্ত একজন কর্ম্মী কৃতী পুরুষ ছিলেন। তাঁর জীবন-কথা নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, এবং অনেককে পথের সন্ধান দিবে। এই জীবন-কথা তাঁহার পত্নী বেশ দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোথাও ভাবের অসংযম ঘটে নাই বা পক্ষপাতিত্বে দুষ্ট হয় নাই। সরল সহজ ভাষায় সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত এই জীবনী-গ্রন্থখানি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি শিক্ষাপ্রদও হইয়াছে।

**যুধিষ্ঠির।** শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। এলাহাবাদ ও কলিকাতা। মেটকাফ্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্যনিষ্ঠা ও প্রেম—এই কয়টি গুণের আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটিয়াছিল যুধিষ্ঠির-চরিত্রে। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠিরের চরিত্র-কথা লইয়া এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তাঁর চরিত্রের বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে করা হয় নাই। না হৌক, তাঁর চরিত্রের মূল সুত্রটি এ জীবন-কথায় উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইয়াছে। ছেলেমেয়েদের জন্য এ গ্রন্থখানি স্কুলপাঠ্য করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। গ্রন্থে পাঁচখানি ছবি আছে—তিনখানি একরঙা; দুইখানি তিনরঙা। ছবিগুলি খুব ভালো হইয়াছে। ছাপা-বাঁধাইও চমৎকার।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।



মালিনী

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ভারতী

৪৬শ বর্ষ } পৌষ, ১৩২৯ { নবম সংখ্যা

# পথের তিনটি হাতছানি

আমি সকাল-সন্ধ্যা মণিকর্ণিকায় স্নান করতে যেতাম ; সঙ্গে যেতো জন্ম-হাবা ভুতো। ভুতোর বয়স বারো, বুদ্ধি বলে কোন পদার্থই তার ঘটে আদৌ নেই, তার ওপর সে কালা। আমারও তখন বিশ বছর বয়সে সবে কপাল পুড়েছে, মুখপোড়া বিধির দেওয়া অঙ্গ-ভরা সে রূপ আমার চুল কেটে, থান পরে, হাতের শাঁখা ভেঙে, সীঁথের সীঁদুর মুছে কিছুতেই ঢাকতে পারি নি। পোড়াকপালে বিধাতার সবাইকে নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা, আমাকে নিয়েও তার খাম-খেয়ালীর অন্ত ছিল না!

আমি বামুনের ঘরের মেয়ে, তার ওপর গরীব। বাবা যথাসর্ব্বস্ব থুইয়ে যার হাতে আমায় তুলে দিয়ে চক্ষু মুদলেন তার জরাজীর্ণ কঙ্কালসার দেহখানি ধরে শমনের পেয়াদা তখন ক্রোক বসিয়েছে। আমার তিন বছরের জন্যে স্বামী ঘর করতে আসা, না, ঘাটের মড়া আগলাতে আসা! স্ত্রীলোকের পতি নাকি পরম গুরু,—কে জানে গুরু কেমন তা' তো জানিনে। ষষ্ঠীদের বাড়ী তাদের কুলগুরু আসতেন,—কালো ষাঁড়ের মত চেহারা, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, পায়ে এক হাঁটু ধুলো, লাঠির ডগায় হুঁকো আর একটা পুঁটলী বাঁধা, কপালে গঙ্গামৃত্তিকা আর মুখে অনর্গল শ্লোক। সবার দেখাদেখি সাষ্টাঙ্গে আমিও পেন্নাম করতুম, কিন্তু মনে যদি একরত্তি ভক্তি হতো! হ্যাঁ গা, তোমাদের সোয়ামী কি সেই রকম গুরু?

হিন্দুর ঘরের মেয়ে, দুটি চক্ষু মুদেই সোয়ামীর ঘরে আসে। তার আগে একবার যখন ছানলা-তলায় ভয়ে-তরাসে লজ্জা-বিড়ম্বনায় চার চক্ষে মিলনের জন্যে চেয়ে দেখা, তখন বিয়ে আর ফেরে না। কপাল-গুণে ভাল লোকের হাতে পড়লো তো দেবতা বল, গুরু বল, সবই সাজে, নইলে একটি আস্ত গরুর হাতে প'ড়ে হতভাগীর সারাটা জীবন জীয়ন্তে চিতেয় শয়ন।

সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার হয়েছিল ভাল ; শাঁক উলু বাতি রোশনাই নিয়ে আমার যখন আনন্দের বাসর সাজলো, তখন সোয়ামীর কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে, কপালের শিরা দড়ার মত ফুলে উঠেছে। দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়ে এল! বুঝলাম, জাত-ধর্ম্ম বজায় রাখবার কত বড় দায়ে গরীব বাবা আমার মেয়ের সুখের ঘরে আপন হাতে এমন করে আগুন দিয়েছেন! অতটুকু বয়েসে সোয়ামী শ্বশুরঘর একটা ভয়ের অজানা অস্বোয়াস্তির জিনিষ, পরে জীবনের নতুন মানুষটির আদর পেলে কি হয় জানি নে, আমার বাপু হয়েছিল "ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।" তাই যখন হাতের নোয়া এয়োতের চিহ্ন ঘুচে আমার সর্ব্বস্ব ফুরোলো, তখন পাড়া-শুদ্ধু কেঁদে হল্লাক হ'লো, কাঁদলুম না কেবল আমি!

কাঁদলুম না বটে, কিন্তু একটা মাস ভিটেয় এসে ঘরে দোর দিয়ে দিন রাত পড়ে রইলুম। শ্বশুর-গুষ্টি এমনতর

অলুক্ষুণে রাক্ষুসী বউকে ঘরের কড়ি দিয়ে বিদেয় করে সোয়াস্তির নিশ্বেস ফেলেছিল। এক মাস পাষাণের মত পড়ে পড়ে ভাবলুম, এ আমার হলো কি? কিই বা আমার লাভ হয়েছিল আর কিই বা আমার গেল! সোয়ামী মরায় আমার অন্তরে সিকির সিকিও ব্যথা লাগে নি, লেগেছিল যতখানি মর্ম্মান্তিক নিজের নিরাভরণ থান-পরা চুল-কাটা এই যাচ্ছেতাই চেহারা দেখে। কালো যমুনার ফুলে ফুলে ওঠা ঢেউয়ের মত একরাশ চুল আমার সমস্ত পিঠ ঢেকে হাঁটুর নীচে লুটিয়ে পড়তো। আমি হাসতে হাসতে বুকের একখানা পাঁজর দিতে পারতাম, তবু চুল দিতে পারতাম না। তারপর চাঁপার অঙ্গে সেই পাতলা চেন-হারটুকু আর পদ্মের ডাঁটার মত সুডোল হাতে সোনার চুড়ি ক'টি ছিল আমার প্রাণ। যাক্ গে, সে সব ছাই-পাঁশ দুঃখের কথা। যা' বলছিলুম, তাই বলি।

সে দিন কার্ত্তিক পূজো, শীতের বেশ একটু আমেজ দিয়েছে। আজ তিন দিন হলো, আমি আমার ভাবনার অনন্ত শয্যা ছেড়ে উঠেছি। রোজই গঙ্গা-স্নানে যাই, সন্ধ্যা আর ঊষায় আঁধার আঁচলখানিতে এ পোড়া রূপ ঢেকে আনমনে গঙ্গাস্নানে যাই। গঙ্গা কি জানি কেন যেন আমায় বড় টানে, ঐ দুই কূল-ভরা ঢেউ-ভাঙা ছল ছল জল আমার বড় ভাল লাগে। মনে হয়, বিধবা হওয়া এটা আমার একটা দুঃস্বপ্ন, আসলে বুঝি আমিও ঐ রকম। নিঝুম আঁধার হিম উষায় শূন্য ঘাটে চান করার চেয়ে সাঁঝের ভরা ঘাট আমার লাগতো ভাল, ঐ মানুষের হাটে যেন আমার কি আপন জিনিস আছে, খুঁজে নিতে হবে! তাই খোঁজবার জন্যেই যেন আমার রূপ-যৌবন সাধ-আশা, এই খুঁজতে খুঁজতে পেতে পেতেই যেন আমার পথ চলা!

সে দিন মাটির দিকে চেয়ে ভূতোর পেছু পেছু চলেছি। মনটা বড় উদাস, বুকের মাঝে আঁটুপাঁটু করছে, মনে হচ্ছে এ বেঘোরে একটা যা-হোক পথ না পেলে আজ থেকে আমার দিনগুলো সত্যি সত্যিই অচল হবে। কেমন যেন প্রাণের কোলে বসে কে বলে দিলে, "জীবনের তে-মাথায় এয়েছিস্, কোন পথে যাবি, দেখে নে।" দাশু ময়রার গলির মুখে এসে মুখ তুলে দেখি, আঁধার দুয়োরে সেজে-গুজে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। এ হতভাগীদের রোজই ঐ পাপের পসরা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আজ যাকে দেখলাম সে বড় রূপসী। আঁকা ভ্রূ-দু'টির তলায় কালো কালো বড় বড় চোখ,—সে অতল-নিবিড় কালো বড় টানে, বুঝি জগৎ-সংসারকে মজায়, জ্বালায়, সর্ব্বনাশ করে ছেড়ে দেয়। মেয়েটার শরীরেও সেই রূপ, রূপ তো নয় আগুন, যেন শীতল কোমল হয়ে মূর্ত্তিমান আগুনের হল্‌কা দাঁড়িয়ে আছে! তাকে দেখে মন আমায় ডেকে বললে, "এই একটা পথ, যাবি?" পথ বটে, কিসের? সুখের, না, মরণের, না, জীবন-চিতার? পথে বেরুলে হিঁদু মেয়ের রোজগারের পথ দু'টোই বটে, —দেহ বেচা আর দাসীবৃত্তি!

যা আমি চাই নে, যে আত্মঘাত এমন করে ভয় করি তাও যেন কেমনতর টানে! আমার ভেতরের দেবতা যাকে দূরে ঠেলে, পশু তারই দিকে লোভের চাউনিতে চায়। নরকের উত্তেজনাতেও তার অসাধ নেই, হোক ভয় আঁধার অজানার বাঁকা গলি, তবু তো নতুন। আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। কাছেই ঘাট, নামতে গিয়ে দেখি, পাশে জলের ধারে খুব ভিড় হয়েছে। মনটা কেমন যেন ঐদিকে টানতে লাগলো, আমার আর নাওয়া হ'লো না। এগিয়ে গিয়ে ভিড়ে গলা বাড়িয়ে আমি শিউরে উঠলুম। এ কি? এ কার শব? যাকে এখুনি দাসু ময়রার গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে হাসতে দেখলাম, এ যে তারই মুখ! সেই তুলির আঁকা সরু সুরেখা ভ্রূ, সেই বড় বড় চোখ, তার ঘন রোমের কালো পাতা, সেই আমদিগলো মুখ, জোড়া ধনুর মত বাঁকানো ঠোঁট দু'টি। আমি ভিড় ঠেলে হুড়মুড় করে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলুম। কারা যেন বলে উঠলো, "ছুঁয়ো না, বাছা, ছুঁয়ো না, অপঘাতের মড়া।" আরও কত লোকে কত কি বললো ভিড়ের অত গণ্ডগোল আমার যেন খুব দূরে-শোনা হাটের রোলের মত কানে আসতে লাগলো। নুয়ে পড়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে দেখি, না সে নয় বটে; তবে তেমনি মুখ, সে শুধু জীয়ন্তে মরা, আর এ সত্যিকার মরা! আহা!

কি দুঃখের বোঝা না জানি নামিয়ে বোন আমার বেঁচে গেছে। কালো একরাশ ভিজে চুলে কাদা আর জল গড়িয়ে পড়েছে, মুদিত চোখ ভরে যেন স্বস্তির ঘুম, সর্ব্বাঙ্গে ভিজে কাপড় জড়িয়ে-জড়িয়ে সে রূপ ঢেকে-ঢেকে তবু খুলে-খুলে দেখাচ্ছে, হাত পায়ের আঙুল জলে হেজে গেছে। কে যেন আমায় ঠেলে তুলে দিল, লোকে বললে, "পুলিশ এসেচে।" আমি চোখে কিছু দেখি-নি, কিছুক্ষণ চোখের দৃষ্টি যেন কোথায় চলে গেছল!

সে ঘাটে আমার নাওয়া হলো না। পাশের ঘাটে অনেকক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে তার পর আস্তে আস্তে জলে নামলুম। ডুব দিতে যাব, পাশে বড় স্নেহমাখা মিষ্টি স্বরে কে বললে, "হ্যাঁ গা বাছা, তুমি তো ডুব দিচ্ছ, আমার ঠাকুরটি খুঁজে দেবে?" চোখ তুলে দেখি, একজন আধা-বয়েসী মেয়ে, কপালে শ্বেতচন্দন, চুল এলোনো যেন জীবন্ত সরস্বতীর প্রতিমাখানি। হাতে একটি ফুল-চন্দন-সিঁন্দুরমাখা পিতলের সিংহাসন, চোখ দু'টি জলের দিকে! আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার ঠাকুর কোথা?"

মেয়েটি বললে, "ঐখেনে জলে পড়ে গেছে, গোকুলনাথ বাল-গোপালের রূপ, কালো পাথরের বিগ্রহ। চান করাতে এনেছিনু বাছা, পা পিছলে সামলাতে গিয়ে পড়ে গেছে।"

আমি অনেক ডুব দিলুম, সারা ঘাটটা হাতড়ালুম, শেষে হাঁপিয়ে গিয়ে ঘাটের চাতালে উঠে দেখি, সে মেয়েটি দিব্যি শান্তশিষ্ট হয়ে কেমন যেন আনমনে বসে আছে। তার পাশে মাটিতে ঠাকুরের শূন্য সিংহাসনটি পড়ে আছে। আমায় দেখে তার শান্ত উদাস চোখ তুলে সে বললে, "থাক্ বাছা, তুমি আর খুঁজো না। ঠাকুর আমায় মুক্তি দিয়ে গেছেন, ভিতরের পূজোয় সব ভরপুর, বাইরের পূজো আর পেরে উঠছিলুম না, বড় ভার বোধ হচ্ছিল, তাই বাইরের ঠাকুর সরে গেলেন।" আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে সেই উজ্জ্বল স্নিগ্ধ মানুষটিকে দেখছি—তাই তো, এ আবার কেমন মেয়ে! সে হঠাৎ চোখ তুলে বললে, "যাক গে, তুমি পথ পেলে, বাছা? তোমার যে সময় হয়েছে, পথ খুঁজে নাও, বেলা পড়ে এলে আর চোখে দেখতে পাবে না; এই ভরা হাটে পারের বেচা-কেনা করে নাও।"

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

---

# পূর্ব্বস্মৃতি

আজকে সখি, পড়চে মনে সেই অতীতের সন্ধ্যাবেলা
বসতে যখন কাছটি ঘেঁষে কঠিন হতো গল্প বলা!
নীলাম্বরীর আঁচল নিয়ে খেলতো বায়ু লীলার ছলে,
মন-ভোলানো মন্ত্রে তোমার মনটি কখন্ পড়তো গ'লে!

আকাশ ভরে' উঠতো তারা, ফুটত হাসি চাঁদের মুখে,
হাতের ভিতর হাতটি ধরা, কতই কথা মনের সুখে!
সন্ধ্যা-তারা অবাক হয়ে মুখের 'পরে থাকতো চেয়ে
ফুলের মত মনটি তোমার আমার প্রাণে রইতো ছেয়ে!

লেখাপড়ার পুঁথির মতন পড়ে ছিলে আমার এ মন,
স্বপ্নিহরা দৃষ্টি তোমার, স্পর্শ তোমার অমূল রতন!
স্বপ্নপুরীর কল্পলোকে উড়িয়ে দিতেম ভাবের পাখা,
বিশ্ব ছিল সবুজ তখন, আকাশ ছিল সোনায় আঁকা!

মাঝখানেতে উঠলো যে ঝড় ঘূর্ণী বাতাস মাথায় করে'
তলিয়ে দিলে কোন্ অতলে মানস-সরের পদ্মিনীরে!
রঙ্গভূমির দৃশ্য 'পরে নামলো কালের যবনিকা,
ঘূর্ণী বায়ুর আঘাত পেয়ে নিভ্‌ল মনের দীপ্ত শিখা!

অতীত এখন শুধুই অতীত, নাই সে মনের উদ্দীপনা,—
বুকের তালে নূপুর তোমার শোণিত-স্রোতে যায় যে চেনা!
মিথ্যা সখি, জাগানো আজ অতীত্ দিনের অতীত্ কথা,
হয়ত তাতে পাবেনা সুখ, হয়ত মনে পাবে ব্যথা!

ইন্দিরা দেবী।

৪

প্রকাণ্ড টেবিলের উপর একরাশ কাগজ-পত্র চাপানো ছিল। একপাশে চেয়ারে বসিয়া জমিদার জগৎবাবু স্তূপাকার খাতাপত্রের মধ্যেই হেঁট হইয়া খস্ খস্ করিয়া কলম চালাইয়া যাইতেছেন। একজন মুহুরী কাছে দাঁড়াইয়া নীরবে একখানির পর আর-একখানি কাগজ আগাইয়া দিতেছে। ঠিক সামনা-সাম্‌নি খোলা জানালা দিয়া দূর হইতে কেবল জমিদার বাবুর মাথা-জোড়া সুগৌর টাকটুকু দেখা যাইতেছে।

ভয়ে-সন্ত্রস্ত চাকরেরা কেহ সে জানালার ধার দিয়াও যায় না। জগৎবাবু অত্যন্ত গম্ভীর মানুষ, কখনো বেশী বাক্-বিতণ্ডা না করিলেও তাঁর একটী মাত্র আজ্ঞাতেই যে দৃঢ়তা থাকিত, তার উপর আর দ্বিরুক্তি করিবার সাহস সে বাড়ীতে কাহারো ছিল না। অকাল-বার্দ্ধক্যে তাঁকে যথার্থ বয়সের অপেক্ষা বেশী বয়স্ক বলিয়া দেখাইলেও মুখে যে তেজোব্যঞ্জক দৃঢ়তা ছিল, তার এতটুকুও ব্যতিক্রম হয় নাই।

আপিস ঘরের সম্মুখ হইতে লাল কাঁকর-বিছানো পথ যেন লাল-পাড় শাড়ীর চওড়া পাড়ের মত গেট অবধি গিয়াছে, পথটীর দুই পাশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাগান,—অজস্র দেশী ও বিলাতী ফুলে ভরা। সবুজ গালিচার মত নরম ঘাসের উপর বাড়ীর পুরানো বুড়ো মালীর ছেলে তখন ঘাস-কাটা কল ঠেলিয়া ঠেলিয়া বেড়াইতেছিল। মালী তখন বড় কাঁচি হাতাইয়া মেহেদী গাছগুলির মাথা কাটিয়া সমান করিয়া দিতেছিল। গাছগুলিতে তখন ছোট ছোট নীল রংয়ের স্তবকে প্রচুর ফুল ফুটিয়াছিল।

ষ্টেশন হইতে হাঁটা-পায়ে শুষ্ক মুখে বিনা-খবরে অরুণকে আসিতে দেখিয়া ইহারা একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মোটর গাড়ীর সোফার সতীশ তখন অবসর-সময়ে বাগানেরই এককোণে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানিতেছিল। সে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা গাছের গায়ে ঘষিয়া নিবাইয়া ফেলিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল যে, ষ্টেশনে গাড়ী লইয়া যাইবার কথা কেহ তাকে বলিয়াছিল কি না? কৈ, না, কেহ তো বলে নাই, সুতরাং সে নির্দ্দোষ ও নির্ভয়।

অফিস-ঘরের বারান্দায় বসিয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতে করিতে হঠাৎ অরুণকে দেখিয়া পাইক-পেয়াদারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

অরুণ একেবারে পিতার সুমুখে গিয়া তাঁকে প্রণাম করিল। তিনি মুহূর্ত্তকাল কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া পুত্রের শুষ্ক মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "হেঁটেই আসছো?"

অরুণ নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

তিনি বলিলেন, "কেন, আগে খবর দিলেই তো গাড়ী যেত!"

অরুণ চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল তিনি বলিলেন, "সেখানকার সব খবর ভাল তো?"

"ভাল।"

কর্ত্তা আবার কলমটা তুলিয়া লইয়া কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। অরুণ ধীরে ধীরে গিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

দেড় বৎসর পূর্ব্বে অরুণের ছোট বোন্ কমলার বিবাহ হইয়াছিল; তিন মাস হইল সে একটি শিশুপুত্র রাখিয়া মাকে কাঁদাইয়া অকালেই চির-বিদায় লইয়া গিয়াছে।

সকলকার ছোট, কোলের সন্তান, একমাত্র কন্যার শোকে মা মেনকা বড় বেশী রকম মুষ্‌ড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মা-হারা শিশুটীকে তিনি ছাড়িতে পারেন নাই; কমলার স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া সেটীই আজ তাঁর সমস্ত বুক জুড়িয়া আছে।

এক চক্ষের জল মুছিয়া আর-এক চক্ষে কাঁদিয়া তিনি সেই শিশুটীকে পালন করিতেছিলেন।

এই বয়সে মা হারাইয়া যে হতভাগা বাঁচে, সে যে কেবল মাকেই হারায় তা নয়, বাপকেও প্রায় ওই সঙ্গে তাহাকে হারাইতে হয়। কুড়ি বৎসর বয়সে যার পত্নী-বিয়োগ

হইয়াছে, তার দ্বিতীয় পত্নী লাভ করিতে দেড় মাসের বেশী বিলম্ব হইল না। সুতরাং সে যে দ্বিপত্নীক, অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে যে এক-সংসার পাতিয়া হারাইয়াছে, নূতনের কাছে সে-পুরাতনকে জাগাইতে সে চাহিত না। ছেলেটীর খোঁজ-খবরও কাজেই সে খুব কমই রাখিত।

ভগ্নীর এই অকাল-মৃত্যুর পর, মায়ের সঙ্গে অরুণের এই প্রথম দেখা, তাই মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে তার কেমন বাধিতেছিল। কারণ সে জানিত, যে এই একটী মাত্র মেয়ে কমলা মায়ের কি প্রাণের বস্তু ছিল।

দোল্‌নার উপর খোকাটীকে শোয়াইয়া মেনকা তখন চাকরকে বাজার করিতে পাঠাইতেছিলেন; এমন সময় খবর পাইলেন, অরুণ আসিয়াছে। তিনি পয়সা গোণা স্থগিত রাখিয়া বলিলেন, "অরুণ এলো? কৈ, খবর তো আয় নি!"

বলিতে বলিতে অরুণ আসিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিতেই তাঁর মেয়ের শোক উথলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু ছেলের শুষ্ক মুখ, ম্লান আকৃতি দেখিয়া তিনি কিছু না বলিয়া চাপিয়া গেলেন। একটা সুগভীর নিশ্বাস ছাড়িয়া শুধু বলিলেন, "অরুণ, তোর বুঝি শরীর ভাল নেই?"

অরুণ দোল্‌নার শিশুটীর দিকে চাহিয়া কহিল, "না,—ভালই ত আছি।"

"হ্যাঁ, যে চেহারা দেখ্‌চি,—একেই ভাল থাকা বলে বটে! কটকে গিয়েছিলি না?"

"গিয়েছিলুম। সেখান থেকেই আস্‌ছি—"

"কনকের বিয়ে হয়ে গ্যালো? কেমন হল বউটী?"

"কেমন আর হবে! ভালই হয়েছে।"

"তবু কার মত রং হবে? হীরুর বৌয়ের মত হবে তো?"

অরুণ বলিল, "অত জানিনে, বেশ বউ হল এই জানি, কার মত রং, কার মত চোখ, কার মত গড়ন, অত আমি কাগজে টুকে আনি নি!"

অরুণকে হাত-পা ধুইতে পাঠাইয়া মেনকা তার খাবারের আয়োজনে গেলেন।

তিন-চার দিন পরে একদিন জগৎবাবু অরুণকে ডাকাইয়া তাঁর স্বাভাবিক সংক্ষিপ্ত ভাষায় জানাইলেন যে তার বিবাহের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে; তাঁরা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, অরুণ যেন বাড়ীতে থাকে এবং প্রস্তুত থাকে।

যে-অরুণ কখনো পিতার সুমুখে মাথা তুলিয়া কথা বলে না, জীবনে কখনো পিতার কথার প্রতিবাদ করে না, সেই অরুণ অতি সংযত কণ্ঠে জানাইল যে, সে বিবাহ করিবে, কিন্তু ইচ্ছায় নয়, শুধু পিতার আদেশে; আর এতে তার কোনো কর্ত্তব্যের দায়ও কোনো কালে থাকিবে না!

এ মামুলি বাঁধা গৎ টিঁকিল না।

কন্যাপক্ষ পাত্রের এ কথা শুনিলেন কি না শুনিলেন, তা জানা গেল না, কিন্তু এ বাড়ীতে আসন্ন শুভকাজের উদ্যোগ-আয়োজন পুরা দমে চলিতে লাগিল। এই সাড়ায় মেনকার শোকাহত মনের বলও যেন চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

এই সব কাজের ব্যস্ততার ফাঁকেও একদিন এক চমকে মেনকার কেমন সন্দেহ হইল যে, তাঁর ছেলের মন কেন এমন অসাড়, এমন নিরুৎসাহ!

হাতের কাজ মাটীতে নামাইয়া তিনি অরুণের কাছে আসিয়া বসিলেন। অরুণ বিছানায় শুইয়া বই পড়িতেছিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কি মা?"

"কিছুই নয় বাবা।"

"নিশ্চয় কিছু। বল তুমি, কি?"

"আচ্ছা অরুণ, আজ বাদে কাল তোর বিয়ে হবে আর তুই অমন মুখ ভার করে থাকিস্ কেন, বল্ তো? কি হয়েছে তোর?"

অরুণ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা বিয়ে করতে হলেই যে নেচে বেড়াতে হয়, তাই বা কেমন করে জানবো,—আর তা ছাড়া, অমন করে নেচে বেড়াতে দেখলে লোকে যে পাগল বলবে!"

"শোনো একবার পাগল ছেলের কথা! তুই মত করবি, হাস্‌বি-খেল্‌বি, তবেই তো বিয়ের আমোদ!"

"তা আর কৈ হচ্ছে! আমি তো আর বলিনি কিছু!"

"কিন্তু আর একটী কেউ ঘরে না এলে আমি কেমন

করে থাকি বাবা, তাই বল্‌তো! এই সেদিনে কমল আমার—"

মা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ছেলে অপলক উর্দ্ধপানে চাহিয়া কড়িকাঠ গণিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল কেহ কোনো কথা বলিল না। শঙ্কিত মায়ের মন সন্তানের অকল্যাণের আশঙ্কায় এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু আর তো প্রতিকারের সময় নাই, উপায়ও নাই। মা মনে মনে ভাবিলেন, কর্ত্তা এ কি করিলেন!

বিবাহের একদিন পূর্ব্বে হীরক ও কনক আসিয়া পড়িল। আড়ম্বর যতই কম করা হোক, এদের দুই ভাইকে বাদ দেওয়ার উপায় ছিল না।

মেনকা এ কয়দিন সমস্ত দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করিয়া রাখিতেছিলেন, যেন অরুণের মন ভাল হয়, সে খুসী হয়! কিন্তু অরুণের বিশেষ কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

বিবাহ-যাত্রার সময়ে বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া যখন অরুণকে সুন্দর হইতেও সুন্দরতর করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল সেই সময়েই সে কথা-কাটাকাটি করিতে বসিল। সমস্ত কথাগুলিই তার তীব্র বিদ্রূপে ভরা। কিন্তু সে বেশ হাসিয়া হাসিয়াই কথা বলিতেছিল।

মেনকা একছড়া বড় মুক্তার মালা হাতে করিয়া আনিয়া নিজের হাতে অরুণের গলায় পরাইয়া দিয়া গেলেন। এই মালাগাছটী গলায় দিয়া অরুণের পিতা-পিতামহও বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন। মা চলিয়া গেলে অরুণ হাসিয়া বলিল, "এটা আবার মা কি দিয়ে গেলেন!"

হীরক বলিল, "থাক্, থাক্, ও একটা অলঙ্কার!"

"কি মুস্কিল! এ আবার কেন?"

"ও একটা থাকা দরকার, না থাকলে তারা কি মনে করবে?"

"তারা? তারা তো এটাকে খুব চিন্‌বে,—ভাব্‌বে বুঝি, সেই কি বলে ও-গুলোকে—?"

"কি আবার বলে! যাঃ!"

"আহা, ঐ যে ছোট ছোট ফলগুলো! ও, বঁইচ। ভাববে, বুঝি বঁইচের মালা গলায় দিয়ে এসেছে!"

"আরে যাঃ! পাগল কোথাকার!"

হীরক ও কনক হাসিয়া উঠিল। ছেলেদের এই উচ্ছ্বসিত কৌতুক-হাস্যের শব্দে পাশের ঘরে থাকিয়া মেনকা তবু অনেকটা আশ্বাস পাইতেছিলেন। হয়তো এই হাসির তরঙ্গে, আনন্দের হাওয়ায়, অরুণের মনের মেঘটুকু কাটিয়া আবার নির্ম্মল হইয়া উঠিবে!

যেমন আর পাঁচজনেরও হইয়া থাকে, মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া ছোট ভাই শুভেন্দুর হাত ধরিয়া অরুণ গিয়া গাড়ীতে বসিল। তার দূর সম্পর্কের একজন ঠাকুমা দেখিয়া বলিলেন, "ওমা! এই দেখলুম, বৌমার ভাবনার আর অন্ত নেই, এদিকে ছেলেরও তো একটু দেরী সইছে না! ও-সব আজকালকার ছেলেদের ঢং! এর জন্যে আবার লোকে ভাবে!"

মেনকার ভাবনার কারণ হইয়াছিল কেবল ছেলের ধরণ-ধারণে স্ফূর্ত্তির অভাব দেখিয়া। তাছাড়া ছেলের মনের আর কোনো কথাই তিনি জানিতেন না। কিন্তু তাঁর চেয়ে তাঁর ছেলের মনের আঁচ বেশী করিয়া জানা ছিল যাদের, তারাও এ কাজে খুব উৎসাহ লইয়াই যোগ দিয়াছিল। কোন্ অজানা এক তরুণী নারীর স্নিগ্ধ-কোমল মুখের প্রভাবে এ সব যে নিমেষেই ফরসা হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে তাদের কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। বিবাহের পর সংসার আরম্ভ হইলে কে কোথায় আবার অতীতের খেয়ালকে আশ্রয় করিতে চায়, না পারে!

মেনকার সাধ ছিল, তাঁর মূর্ত্ত-চাঁদের মত ছেলের বৌটীও যেন পরীর মত সুন্দর হয়, কিন্তু কর্ত্তার নিজের মুখে কোন কথা না শুনিলেও তিনি অন্যের মুখে শুনিয়া ছিলেন যে, তাঁর এ সাধ আর পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবু তিনি কর্ত্তাকে কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। বলিলেও কোনো ফল হইত না, বহু দিন এক সঙ্গে ঘর করিয়া এ জ্ঞানটুকু মেনকার জন্মিয়াছিল। বিশেষ কর্ত্তা না বুঝিয়া কোন কাজই করেন না, এখানেও তিনি নিশ্চয়ই কিছু ভালই বুঝিয়াছেন।

অদৃষ্টের দোষ দিয়াই তাঁকে থামিতে হইল।

কিন্তু মন মানুষের থামে কই? ভাবিয়া লাভ নাই জানিয়াও তো না ভাবিয়া থাকা যায় না। তিনি আপনা-আপনি মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, রূপ যেন তার নাই থাকিল, কিছু গুণও যদি থাকে, ছেলেটাকে যদি খুসী করিতে পারে, তবেই হইল। বৌ তো কেবলমাত্র দেখিবারই সামগ্রী নয় যে, রূপের দরকারই সব-চেয়ে বেশী! কিন্তু তবু,—তবু, ভাবিতেও ভাল লাগে না যে, অমন ছেলের বৌ কি না সুন্দর হইল না!

এই রূপের জন্যই তাঁর বড় আগ্রহ ছিল যে,—তাই কি তাঁর অত-বড় সাধটায় দেবতা এমন বাদ সাধিলেন! অরুণ যে সৌখীন রুচি-বাগীশ, সে-ই কি রূপহীনা স্ত্রী পছন্দ করিবে?

৫

নিরাপদে অরুণের বিবাহ হইয়া গেল। বেশী জাঁক-জমক হয় নাই, তাই কোনো গোলমালও হয় নাই। তবু যারা বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিল, তারা তৃপ্ত হইয়াই ফিরিয়াছিল।

বিবাহের পরদিন অরুণের সঙ্গে সেই দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের কন্যা আসিয়া এই ঐশ্বর্য্য-স্বর্গের মাঝে দাঁড়াইল। মেয়েটী নিতান্ত কচি নয়! সুতরাং নিজের অবস্থা বুঝিয়া লওয়া তার পক্ষে খুব বেশী কঠিন হইল না। ভয়ে সঙ্কোচে সে যেন কাঠ হইয়া গিয়াছিল।

বিবাহের সময় একবারমাত্র অরুণের অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি স্ত্রীর উপর পড়িয়াছিল। তখন তার মুখখানি ঘোমটায় ঢাকা, কেবল অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণের হাত দুখানি দেখা যাইতেছিল মাত্র। অরুণের নিজের গৌর-সুন্দর হাতের উপর সে হাত নিতান্তই শ্রীহীন দেখাইতেছিল। অরুণ দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া কঠিন হাসি হাসিল। বিদ্যুতের আলোয় যেমন আগুন থাকে, তেমনি তার এ হাসির মধ্যেও অপরিমিত উত্তাপ ছিল।

বিদায়ের কিছু আগে মেয়ের মা অরুণকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু অরুণ বাহিরে বসিয়াই মাথা নাড়িয়া ডাকটা গ্রহণ করিল মাত্র উঠিয়া গেল না।

মেয়ের মা ভাবিয়াছিলেন যে, এই এতদিনকার বুকের ধন মেয়েটীকে পরের হাতে সঁপিয়া দিবার আগে দু কথা বুঝাইয়া বলিবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হইল না! তিনি জামাইয়ের দেখা পাইলেন, একেবারে বিদায়-বরণের সময়। তখন সেখানে অনেক লোক ছিল, তাঁর আর কোনো কথা বলা হইল না। চোখের জলে ছল-ছল মুখে মেয়েকে তিনি গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা পাঁচজনে এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের জামাইয়ের রূপ-গুণের খ্যাতি গাহিয়া ও মেয়ের সৌভাগ্যের কথা বলিয়া আত্মীয়-স্বজনদের এই সদ্য বিরহ-ব্যথায় অনেকখানি সান্ত্বনা দিয়া গেল। বিজয়ার দিনে, শূন্য চণ্ডী-মণ্ডপের দিকে চাওয়া মাত্র যেমন আগামী বছরের কল্পনাই সান্ত্বনা হইয়া মনে পড়ে, তেমনি মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখের ছবিই মায়ের মনে একমাত্র সান্ত্বনা রূপে দেখা দিল।

ফুল-শয্যার দিন, মেনকা নিজেই উদ্যোগী হইয়া ঝি-চাকর লাগাইয়া অরুণের ঘরখানির সংস্কার করিতে বসিলেন। পড়ার ঘরখানিকে শোবার ঘরের আকৃতি দিতে, নানা হাঙ্গামায় তিনি যখন মহা ব্যস্ত, তখন অরুণ একবার আসিয়া মায়ের কাজ দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ও কি মা?"

মেনকা হাসির শব্দে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, "তুই! অচম্‌কা হাসির শব্দে আমি চমকে উঠেছি।"

অরুণ বলিল, "আজ তোমার বুঝি আর কোনো কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই? এ সব কি করতে বসেছো? যাও, ওঠো!"

মেনকা সস্নেহ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না, আজ আমার আর কোনো কাজ-কর্ম্ম নেই। তুই যা, ওদের দেখিয়ে দি গে যা, তোর ওই পুরানো ক্যাটালগের বোঝা কোথায় রাখতে হবে? আমি ওগুলো সব তোর নীচেকার পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিলুম।"

"বেশ করলে! কেন তুমি আমার ঘর ওলটাতে এলে বল তো মা,—কত দরকারী জিনিষ ছিল সব!"

"ছিল তো আমি কি সব খেয়ে ফেলেছি রে? বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি, তুই দেখে নিগে যা না।" বলিয়া তিনি বৌয়ের জন্য টেবিলের উপর দোয়াত-

কলম সাজাইতে লাগিলেন। অরুণ চাকরদের সামনে কোনো কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু দোয়াত-কলমের বদলে গোয়াল ঘরের কাজই যে এই নূতন বৌটীকে মানাইত ভাল, এই কথাই তার মনে হইয়াছিল।

মায়ের কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া সে দালানে দাঁড়াইয়া একটা পেঁপে গাছের দিকে চাহিয়া ছিল। একটা কাক নিরুপদ্রবে ঠোকর দিয়া পাকা পেঁপে খাইতেছিল।

কনক আসিয়া বলিল, "এখানে কি করছো অরুণ? ছোট পিসিমা তোমার ঘর সাজাচ্ছেন, দেখেচো? একবারে নতুন উপকরণে—"

অরুণ কট্‌মট্‌ করিয়া তার দিকে চাহিল। কিন্তু এবার কনক দমিল না, হাসিয়া বলিল, "কেন, তোমার রাগের কি হল এতে? অমন করে তাকাচ্ছো যে!"

"তবে কি চোখ বুজে থাকবো নাকি? ধাঁধা তো লাগে নি!"

কনক এতটু আশ্চর্য্যভাবে বলিল, "ধাঁধা! ধাঁধা লাগ্‌বে কেন?"

অরুণ আর কিছু বলিল না। ক্ষুব্ধ আক্ষেপে তার মুখ কালো হইয়া উঠিল।

"ছি, ছি, অরুণ! তামাসা করবার কি আর কথা পাওনা তুমি?"

ফুলশয্যার রাত্রে আগাগোড়া ফুলের সাজে সাজানো পালঙ্কে কোমল বিছানার কোণে জড়সড় হইয়া শুইয়া তরুণী সবিতা নিজের বুকেরই অস্বাভাবিক গতি-স্পন্দনের ধুপ্‌ ধুপানি শুনিতে শুনিতে কোন্ এক সময়ে ঘোমটার ভিতর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সংসারে প্রথম প্রবেশ-পথ-যাত্রী, এই দুটী তরুণ প্রাণীর সুপ্ত প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া তুলিবার মত বিলাসের সহস্র উপকরণ দিয়া নব দম্পতীর প্রথম আলাপ রাত্রির এই ঘরখানিকে অমিশ্র সুখের স্বর্গের মত করিয়াই সাজানো হইয়াছিল। লজ্জা-পীড়িতা সবিতা যতক্ষণ জাগিয়াছিল, তার পাৎলা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর হইতে বিস্ময়-বিমুঢ় চক্ষে ততক্ষণই এই ঘরের সাজসজ্জা দেখিতেছিল!

প্রতিবার পা ফেলিতে গিয়াই তার মনে হইতেছিল, বুঝি বা ফুলগুলা মাড়াইয়া দিয়া সে একটা অপরাধ করিয়া বসিবে! সঙ্গে সঙ্গে তার এই স্বর্গের তুলনায় নিজের বাপের বাড়ীর সেই অনাড়ম্বর শান্তিময় ঘর-কন্নার কথা মনে পড়িল। এই আলোকময়, ফুলময়, রাজ-প্রাসাদের মত ঐশ্বর্য্য ভাল, কি, সেই ছায়া-সুনিবিড় ছোট গ্রামখানির বহুদিনকার পুরানো শেওলা-ধরা সেই বাড়ীখানি ভাল, তা সে তখনি বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

তবে দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে যখন মানুষ সুখের ছবি কল্পনায় রং ফলাইয়া আঁকে, তখন এর চেয়ে কি বেশী করিয়া আঁকিতে পারে?

একটা খড়্‌ খড় শব্দে সবিতার ঘুমটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, তার স্বামী ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পায়ের ঠেলায় একটা কৌচকে জানালার দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন। ঘরের মাঝে টেবিলের উপর মস্ত বড় জুয়েল ল্যাম্প তখনো দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু তাঁর চোখের উদাস দৃষ্টি কোনো দিকেই পড়িল না।

কৌচটা জানালার কাছে সরাইয়া লইয়া অরুণ সশব্দে জানালাটা খুলিয়া দিল। খোলা জান্‌লার কাছে চটি জুতাটা খুলিয়া রাখিয়া সে কৌচটার উপরই শুইয়া পড়িল। সেই শ্বেত পদ্মের মত শুভ্র সুন্দর খোলা পা দুখানির উপর সবিতার দৃষ্টি পড়িল! কিন্তু সে তখনি চোখ ফিরাইয়া লইল।

বাহিরে সেদিন জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল। আকাশের তরঙ্গিত মেঘ-সমুদ্রের ভিতর দিয়া চাঁদের পাণ্ডুর আলো মূর্চ্ছিতা সুন্দরীর মত চারিদিকে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। অরুণ একটীবারও চোখ ফিরাইয়া দেখিল না যে, সেই ঘরেই একটা সাগ্রহ ব্যাকুল দৃষ্টি তারই পানে চাহিয়া আছে!

সবিতা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছিল, কি অদ্ভুত প্রকৃতি এই!

ঢং ঢং করিয়া রাত দুইটা বাজিয়া গেল। সবিতার মন তখন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে বেশ বুঝিল যে, একবারের জন্যও না চাহিলেও তার অস্তিত্ব জানিয়াই

স্বামী সমস্ত রাত্রিটা কৌচে পড়িয়া কাটাইলেন। কিন্তু কি দরকার ছিল এর? তাড়াতাড়ি একটা কোনো বাড়াবাড়ি করিলে পাছে বাড়ীময় গোলযোগ রটে, তাই অরুণ এই বুদ্ধি করিয়াছিল।

বিছানার উপর আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া সবিতা রাতটুকু কাটাইল।

শেষ রাত্রে জানলা দিয়া দীঘির স্নিগ্ধ-শীতল জলো হাওয়া দুইজনেরই তপ্ত মাথায় চুম্বন দিয়া গেল।

ভোরে যখন পূর্ব্বাকাশ ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই তখন সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের উপরকার আলোটা সারারাত পূরা দমে জ্বলিয়া নিবিয়া আসিতেছিল। ভোরের কপালে দীপ্তিময় টিপের মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল কেবল শুকতারাটী।

সকাল বেলাকার আলোয় স্বামীর দিকে সবিতা আরো একবার চাহিয়া দেখিল। অরুণ তখনো সেই কৌচের উপরই হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। তার আস্তিন গোটানো ছিল। স্থল-পদ্মের পাপড়ির রংয়ের বলপুষ্ট মোটামোটা হাতের দিকে চাহিয়া সবিতা নিজের রূপের দৈন্যে কুণ্ঠায় তাড়াতাড়ি দুয়ারের কাছে গিয়া দুয়ার ঠে

কপাটে খিল দেওয়া ছিল না, তাই ঠেলিবামাত্রই দ্বার খুলিয়া গেল। সেও বাহির হইয়া দাঁড়াইল। প্রকাণ্ড বাড়ীটী তখন একেবারে চুপ। বাড়ীর কেহই জাগে নাই। সবিতা দালানের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রেলিংয়ের ধারে ধারে টবের ফুল গাছগুলিতে দুটী-একটী বিদেশী ফুল ফুটিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে মেনকা উঠিয়া দালানে আসিয়া সবিতাকে দেখিলেন, বলিলেন, "এই যে এখুনি উঠেছ মা! এত ভোরেই উঠলে?"

সবিতা নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মেনকা অরুণ উঠিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে অরুণ ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে বাহিরে চলিয়া গেল।

কাল যার বিবাহ হইয়াছে, আজ তার মুখে এতটুকু আনন্দের দীপ্তি নাই কেন? লজ্জা? লজ্জা কি একেই বলে?

মেনকার স্মিত প্রফুল্ল মুখখানি আরও অপ্রসন্ন অন্ধকার হইয়া উঠিল। সবিতার ভাগ্যাকাশের বিপ্লব যেন ঘন হইয়াই তাকে আরো সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

৬

সবিতা খুব সুন্দরী নয়; মাঝামাঝি রকমের, তবে তার মুখখানি একটু বেশী পরিষ্কার। বড় বড় চোখ দুটী শরৎ-প্রাতের নীল-পদ্মের মত,—আয়ত, স্বচ্ছ, বুদ্ধির আভায় উজ্জ্বল।

সে দরিদ্রের ঘর হইতে আসিলেও চিরদিন দরিদ্র ছিল না। তার মাতামহ গ্রামের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে যতটা আগ্রহ দেখাইতেন, সংসারের দিকে ততখানি পারিতেন না। কিন্তু একমাত্র কন্যাকে যখন পাত্রস্থ করেন, তখন সুপাত্র দেখিয়াই করিয়াছিলেন।

যে বৎসর সবিতার পিতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া রাঁচিতে যান, সেই বৎসর সবিতার জন্ম হয়। সুলক্ষণা বলিয়া সকলেই তখন সবিতার আদর করিত। কিন্তু তার এ আদর বেশী দিন রহিল না। সাত বৎসর বয়সেই পিতৃহীনা হইয়া সে মায়ের সঙ্গে দাদামহাশয়ের কাছে ফিরিয়া আসিল।

তার বাপের বাড়ীর অবস্থা এখনো ভাল। পিতামহ সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। কাকারা এতদিন কন্যাদায়-গ্রস্তা বিধবার কোনো খোঁজ করেন নাই। এই বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার পর খবর পাইয়া সম্প্রতি তাঁদের স্নেহ-সমুদ্র অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিয়াছে! তাঁরা লোক ও চিঠি পাঠাইয়া জানাইলেন যে সবিতার যে পিতা নাই, সে তাঁদেরই বহু দুর্ভাগ্যের ফল, কিন্তু তা বলিয়া তাঁদের কন্যার বিবাহ যে পৈতৃক ভিটা হইতে হইতে পাইবে না, এ বড় দুঃখের কথা ইত্যাদি—

সবিতার বিধবা মা পূর্ণ তেজের সহিত উত্তর দেন

অনাথার মেয়ের বিয়ে গরীবের মতই হইবে। কাকারা যে দু'দিনের দয়া দেখাইয়া ঋণী করিয়া রাখিবেন, সে তিনি চাহেন না।

তাঁরা কন্যাদায়-গ্রস্তা বিধবাকে সভয়ে এতকাল এড়াইয়া আসিয়াছেন, আজ সুযোগ পাইয়া দেশের লোকের কাছে জানাইলেন যে, তাঁদের বিধবা ভাজের এই রূঢ় ব্যবহারের জন্য কি দায়ী তাঁরা? এইজন্য তাঁর সম্বন্ধে দেওরেরা এত উদাসীন থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অনাথা বিধবার এত লম্বা লম্বা কথার ঝাঁজ কে সয়! এই কথাটা সত্যই, মিথ্যা নয়। সবিতার মায়ের মধ্যে এমন একটা তেজ ছিল। আর জন্মাধিকার-সূত্রে সবিতাও তার কিছু পাইয়াছিল।

কিন্তু এ জিনিষ সম্পূর্ণ পৃথক! ইহা অহঙ্কার নয়! স্বামীর চিত্তে রূপহীনা সবিতা একটুও স্থান পাইল না! পথশ্রান্ত, আশ্রয়-বিতাড়িত পথিক যখন জন্মের মত এক দেশের মায়া কাটাইয়া অন্য দেশে গিয়া দেখে, সেখানেও তার সকল দুয়ার রুদ্ধ, তখন তার যেমন মনের অবস্থা হয়, সবিতারও ঠিক তাই হইল!

এখনো অরুণের সারা বুক জুড়িয়া সেই-একদিনকার-দেখা টুক্‌টুকে হাসিমুখখানিই লুটোপুটী করিতে থাকে। কালো ভ্রমরের মত লীলা-চঞ্চল সে চোখদুটীর কাছে সবিতার শান্ত নম্র দৃষ্টি যে নিমেষেই পরাভব মানিয়া যায়! তাছাড়া তার সে দৃষ্টিই বা চোখ তুলিয়া দেখে কে?

বিবাহের পর একমাস গত হইয়াছে। অরুণ তার কলিকাতার বাসায় চলিয়া গিয়াছে। সেই ফুল-শয্যার দিন ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে সে আর দেখাও করে নাই।

এ কথা মেনকা জানিতেন, কিন্তু তিনি লোকের কাছে বলিলেন, পড়ার সময় ছেলে-বৌয়ে বেশী মেশামেশি হওয়া কর্ত্তার ইচ্ছা নয়!

ইহাতে সবিতার দুর্ভাগ্যের লজ্জা কতকটা ঢাকা পড়ে বটে কিন্তু সকলেই তো এ কথা বিশ্বাস করে না।

দোতলার ঘরের জান্‌লার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, নীচেকার সিঁড়ির সামনে গাড়ী থামিয়া আছে।

বাবাকে মাকে প্রণাম করিয়া অরুণ হাসিমুখেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তার সোনার চশমায় আবৃত চোখের সহাস দৃষ্টি যদি ভুল করিয়াও একবার উপরদিকে উঠিত, তবে দেখিতে পাইত যে, সেখানে সে ব্যগ্র ব্যাকুল মুখখানির সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া সে মুখ কি রকম সাদা হইয়া গিয়াছে!

মেনকা ফিরিয়া উপরে উঠিবার আগেই সবিতা আঁচল দিয়া তার ঝাপ্‌সা চোখ ঘসিয়া মুছিয়া, তাড়াতাড়ি গিয়া ছোট খোকাটীকে আদর করিতে বসিল। এ বাড়ীতে এই শিশুটীই তার বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিল। যখন-তখন সে এটীকে লইয়া বসিত।

মেনকা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "ওরে সদু, খোকাটার দুধ খাওয়ার সময় যে উৎরে গেল! বোতলে একটু দুধ ভরে দে দেখি, চট্‌ করে দে।"

সবিতা তখন দুধের বোতল ধরিয়া খোকাকে দুধই খাওয়াইতেছিল, তা দেখিয়াও মেনকা সন্তুষ্ট হইলেন না। মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "ও—তুমি দুধ খাওয়াচ্ছ!"

সবিতা মেনকার মুখের পানে চাহিয়া অবাক হইল। দুধ খাওয়াইবার সময় দুধ খাওয়াইয়াছে বলিয়াও অপরাধ হইল নাকি? তারপর ভাবিল যে, সদ্য সদ্য ছেলেকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন তাই গিন্নির মন ভাল নাই, সেই জন্যই মুখ ভার করিয়া আছেন।

খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া, তাকে কোলে করিয়া সবিতা নিজের ঘরে ঢুকিল। সবিতা আসিবার আগে এ ঘরখানিতে অরুণের একারই অধিকার ছিল; এখনো ঘরের গায়ে তার কিছু কিছু চিহ্ন আঁকা ছিল।

ঘরের একদিকের দেওয়ালে তিনটী ভাই-বোনের ফটো টাঙ্গানো ছিল। তাতে অরুণ ও শুভেন্দুর মাঝখানে ফ্রক-পরা মাথায় খোলা চুলে রিবন দিয়া ফাঁস বাঁধা বালিকা কমলার চেহারা।

দেখিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া তার ছেলের মৃতা মায়ের ছবিখানি দেখিতে ভাল লাগিতেছিল।

একটু পরে খোকার ঝি আসিল, খোকাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে। একগোছা ফুলের মত শিশুটীকে বুকে চাপিয়া চুমু খাইয়া সে তাকে ঝিয়ের কোলে দিল। তার পর শুধু হাতে সে চুপ করিয়া খাটের উপর বসিয়া রহিল।

ঘরের আর এক দিকে অরুণের এক বছর আগেকার তোলা ফটোটার দিকে চাহিয়া সে যেন স্বামীকে একটু চিনিবার চেষ্টা করিল।

ফটোর ছায়া আলমারির আয়নায় আসিয়া পড়িয়াছিল। সে মুখ তো এমন অকাল-গম্ভীর অন্ধকার মুখ নয়! সবিতা এই বাড়ীর পুরানো ঝিয়ের মুখে শুনিয়াছে যে, এই ফটোখানি অরুণ কমলার বিবাহের পর দিন তোলাইয়াছিল, আর সে সময় হাসিয়া বলিয়াছিল, আর-একখানা তোলাব নিজের বিয়ের পর দিন!

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। বাহিরের কোনো কথাই সবিতা বড় একটা শুনিতে পাইত না। সে বুঝিতে পারিত না যে, তার দাদামশায় এখনো তাকে লইয়া যাইবার নামটি অবধিও করেন না কেন!

ছেলের যে বৌয়ের উপর কত টান, তা বুঝিতে মেনকার অবশ্য বেশী দেরী লাগে নাই। সুতরাং প্রথমটা তিনি সবিতাকে যত আদর দেখাইয়াছিলেন, অল্প কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তাঁর সে আদর একেবারে বর্ষা-শেষের কাদার মতই শুকাইয়া কঠিন হইয়া উঠিল! যাকে দিয়া ছেলে সুখী হইল না, এমন বউয়ে আবার কি দরকার? এ মেয়ের না আছে রূপ, না আছে গুণ! সমান ঘরের মেয়েও নয় যে সংসার বুঝিয়া লইয়াও সে সাহায্য করিবে! কাজেই এই নির্ব্বান্ধব পুরে, দিন-রাত্রির স্নেহ ও শাসনের একমাত্র কর্ত্রী যিনি, তাঁর কাছেও একটু-কিছু পাওয়ার প্রত্যাশাও সবিতার রহিল না। তিনিও তার প্রতি বিমুখ হইলেন।

তার সময় কাটাইবার একমাত্র অবলম্বন হইল এই শিশু ভাগিনেয়টী! সাত-আট মাসের এই খোকার সঙ্গেই গল্প করিয়া সে যতটুকু পারে আপনাকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত! ফলে মেনকার হাত হইতে ছেলেটীর সমস্ত ভার খসিয়া একেবারে সবিতার হাতে আসিয়া পড়িল।

রাত্রে খোকার ঝি তারা সবিতার ঘরে শুইত, একটু-আধটু গল্পও করিত। তারা একদিন বলিল, "হ্যাঁগা বৌদিদি, তোমার কি বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করে না?"

সবিতার চোখ দিয়া প্রায় জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, প্রাণপণ বলে চোখের জল চোখেই মারিয়া সে শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "না, মন কেমন করবে কেন!"

"ওমা, মন কেমন আবার কেন করবে! বাপের বাড়ী যাবে না?"

উদাস স্বরে সে বলিল, "সে যখন যাব, তখন যাব।"

তারা বলিল, "তা বৈকি,—তোমার দাদাবাবু নাকি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তা মা-ঠাকরুণ রাজী হলেন না। এঁরা নাকি এখন পাঠাবেন না।"

সবিতা চুপ করিয়া রহিল। অনেক দিন সে মা বা দাদামশায়ের কোনো খবর পায় নাই, ঝিয়ের মুখের এতটুকু খবর পাইয়াও আজ তৃপ্ত হইল। এঁরা যদি না পাঠান, সে আলাদা কথা! দাদামশায় তো চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাঁর আর দোষ কি!

খোকার জন্য সবিতার ঘরে সারা রাত আলো জ্বলিত, কিন্তু ঝিয়েরা সে আলোটা পরিষ্কার করিতে ভুলিয়া যাইত; কেন না সবিতা তো বড় লোকের মেয়ে নয়!

ঝিয়েদের সঙ্গে অনর্থক বকাবকি না করিয়া সবিতা সেদিন নিজেই ছাই দিয়া চিমনীটা মাজিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। এমন সময়ে ধীর গম্ভীর জুতার শব্দে চোখ তুলিয়া চাহিয়া সে সসম্ভ্রমে আড়ষ্টভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশুর!

এদিকে এমন সময়ে শ্বশুরকে যাওয়া-আসা করিতে সে আর কোনো দিন দেখে নাই। জগৎবাবু স্নেহ-স্নিগ্ধ চক্ষে একবার সবিতার দিকে চাহিলেন। বুঝি বা হারানো

মেয়ের স্মৃতি মনে পড়িল। তিনি নিঃশব্দে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ঝিয়েরা অমনি ছুটিয়া আসিয়া সবিতার হাতের কাজ কাড়িয়া লইল। তাদের কারো মুখই প্রসন্ন নয়, মেনকারও তীব্র শ্লেষ-বাক্য সেই দিন হইতে প্রথম সবিতার উপর বর্ষণ সুরু হইল।

তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন, "শ্বশুরকে দেখিয়ে বাড়ীর ব্যবস্থাকে অপদস্থ করবার কি দরকার ছিল তোমার! যেমন ছোট মন,—সেই পরিচয় দেওয়া চাই তো!"

সবিতা আরক্ত মুখে চুপ করিয়া রহিল। এমন হইবে জানিলে কি সে কখনো চিমনী মুছিতে বসিত! মেনকার তীব্র বকুনি নিঃশব্দে শুনিতে শুনিতে সে অন্য ঘরে গিয়া খোকাকে আদর করিতে বসিল। অবোধ শিশুর হর্ষ-কাকলীই যেন তার সমস্ত দুশ্চিন্তার বোঝা গঙ্গাজলে ধুইয়া নির্ম্মল করিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় মেনকা যখন আহ্নিক করিতে বসিলেন, তখন সে শাশুড়ীর বিমুখ মনকে প্রসন্ন করিবার জন্য আবার তাঁর পায়ের কাছে মাথা নীচু করিয়া বসিল। কতক্ষণে তিনি গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া প্রসন্ন মুখে কথা কহিয়া তাকে কাজের আদেশ দিয়া কৃতার্থ করিবেন, তারই সে প্রত্যাশা করিতে লাগিল। ( ক্রমশঃ )

শ্রীনীহারবালা দেবী।

# আলো-বীণা

ফুল-ফুটানো আলোর বীণা
শুনেচ ?
কিরণ-তারে যতির গতি
গুনেচ ?
ঝলমলানো আলোর জ্বালা,
চন্‌মনে ও সুরের মালা!
সেই মালাতেই পরীর স্বপন
বুনেচ ?
প্রাণের কাণে আলোর বীণা
শুনেচ ?

উষার কোলে পূর্ব্বতে কি
উঠচে ও ?
সাত-রঙা ঐ আলোর সুরই
ছুটচে গো!
কমলদলের পাতায় পাতায়
( জলবালার গানের খাতায় )
আলোর স্বরলিপি মার,
ফুটচে গো!

দুপুর-বেলায় আলোক-দেবের
তানপুরায়,
দাউ-দাউ-দাউ সুরের শিখা
প্রাণ পুড়ায়।
রুদ্র-বীণার দীপক-রাগে
বিশ্ব-হিয়ায় আগুন লাগে—
ফিনিকে তার সবুজ লতার
জান্ ফুরায়!
মূর্চ্ছনা কি শুন্‌ছ না রে
তানপূরায়!

সন্ধ্যা-মেঘে বাজ্‌চে আলোর
মন্দিরা,
গান ধরেচে পরলোকের
বন্দীরা!
সূর্য্য গেল অন্ধ হয়ে,
ডুব্‌ল হাসির ছন্দ লয়ে—
সঙ্গে গেল অরুণ-রাগের
ছন্দীরা।

ঝিম্‌ঝিমিয়ে ঝিমায় কালো
রাতিয়া,
চিত্ত হা রে আন্ধিয়ারে
তাতিয়া।
ভাঙা-মেঘের গোপন চাঁদে,
বুক-চাপা ঐ কি সুর কাঁদে,
এলিয়ে প'ড়ে যায় যে ভিজে
ছাতিয়া।
কোন্ সুদূরের বেহাগ-ভরা
রাতিয়া।

এম্‌নি ক'রে আলোর বীণা
বাজ্‌চে গো!
হাস্‌চে আহা, নাচ্‌চে আহা,
কাঁদ্‌চে গো!
শোনো, গভীর মর্ম্মকোষে,
দীপ্ত বীণার যন্ত্রী ব'সে,
তন্ত্রীতে সে সুর খেলিয়ে
যাচ্ছে গো—
আলোর পরে আলোর ধ্বনি
বাজ্‌চে গো!

**শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।**

---

# সুখ

## ( মোপাসাঁর ফরাসী হইতে )

তখন চায়ের সময়, তখনো ঘরে প্রদীপ প্রবেশ করে নি। এই পল্লী-ভবনের নীচেই সমুদ্র বিস্তৃত; সূর্য্য অস্ত গেছে—যাত্রা-পথে আকাশকে একেবারে গোলাপী রঙে রাঙিয়ে গেছে। গোলাপী রঙের জমি, সোনার গুঁড়ো দিয়ে যেন ঘসা। ভূমধ্য সাগরে একটি রেখা নাই, একটি লহরী নাই; বেশ মসৃণ; মুমূর্ষু দিনের-আলোয় এখনো ঝিক্‌মিক্ করচে। মনে হচ্চে যেন ঘসা-মাজা ধাতুর একটা প্রকাণ্ড পেটা-পাত।

দূরে, দক্ষিণে, সূর্য্যাস্তের ফিঁকে বেগ্‌নীর উপর,—দস্তুর গিরিমালা স্বীয় পার্শ্বমুখ এঁকে দিয়েছে।

তখন প্রেম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, এই চির-পুরাতন কথাটা নিয়ে তর্কবিতর্ক চল্‌ছিল; যে-সব কথা পূর্ব্বে কতবার হয়ে গেছে, ফিরে-ফির্‌তি আবার সেই কথারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল। গোধূলির মধুর বিষণ্ণতা কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা থম্‌থমে ভাব এনে ফেলেছিল, উপস্থিত প্রত্যেকের অন্তঃকরণে একটা কোমল আর্দ্রভাব ভেসে বেড়াচ্ছিল, এবং এই "প্রেম" শব্দটি—যা পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হচ্ছিল, কখন বা পুরুষের জোরালো গলায় কখন বা রমণীর তীব্র লঘু কণ্ঠস্বরে—এই প্রেম-শব্দটি ছোট ঘরটিকে মুখর করে তুলেছিল, পাখীর মত ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছিল, প্রেতাত্মার মত স্তব্ধভাবে শূন্যে ভাসছিল।

—একাদিক্রমে বহু বৎসর ধরে' কি ভালবাসতে পারা যায়?

কেহ বলিল,—হাঁ পারা যায়।

আবার কেহ কেহ বলিল,—না, পারা যায় না।

এই বিষয়ের আলোচনার সময় বিশেষ-বিশেষ অবস্থার উল্লেখ করা হচ্ছিল, এক-একটা সীমা নির্দ্দেশ করা হচ্ছিল, উদাহরণ দেখান হচ্ছিল; এবং কি পুরুষ, কি রমণী সকলেরই এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার চিত্র-বিক্ষোভী স্মৃতি অন্তরে জেগে ওঠায় ঐ সব কথা তাদের ঠোঁটের গোড়ায় আসছিল, অথচ বল্‌তে পারছিল না। দুই প্রাণীর মধ্যে এই যে রহস্যময় মনের মিল, এই সাদামাটা ব্যাপারটার কথা সকলেই গভীর আবেগে ও অনুরাগের সঙ্গে বলাবলি করছিল।

কিন্তু একজন যার দৃষ্টি দূর-দিগন্তে নিবদ্ধ ছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল:—

"দেখ দেখ, ওদিকে ওটা কি ?"

সমুদ্রের উপর, দিগ্‌বলয়ের শেষ প্রান্তে, ধূসর রঙের ও এলো-মেলো ধরণের একটা প্রকাণ্ড মৃৎপিণ্ড উত্থিত হয়েছে, দেখা গেল।

রমণীরা দাঁড়িয়ে উঠে এই আশ্চর্য্য জিনিসটা দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পারলেনা। তারা এ রকম আগে কখন দেখেনি।

কেউ বল্লে :—

ওটা কর্সিকা-দ্বীপ! বায়ুমণ্ডলের কোন বিশেষ-বিশেষ অবস্থায়, যখন আকাশ বেশ স্বচ্ছ থাকে, জল-বাষ্পের কুয়াসায় দূর দিগন্ত ঢেকে না যায়, তখন এই রকম দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

পর্ব্বতের চূড়াটা অস্পষ্ট রকমে সবাই দেখ্‌তে পেলে; মনে হ'ল যেন গিরি-শিখরস্থ বরফ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্চে। জগতের এই একটা আকস্মিক আবির্ভাব, সাগরোত্থিত এই ছায়ামূর্ত্তিটা দেখে সকলেই বিস্মিত, উৎকণ্ঠিত—এমন কি ভীত হয়ে পড়্‌ল।

এই সময় একজন বৃদ্ধ লোক, যিনি এতক্ষণ কোন কথা কননি—এই কথা বল্লেন :—

—দেখ, আমাদের সম্মুখে এই যে দ্বীপটি দেখা যাচ্চে—আমরা যে বিষয় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কচ্ছিলেম,—তারই একটা প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ নিজেই যেন খাড়া হয়ে উঠেছে। একটা পুরোণো কথা আমার মনে পড়েছে।

আমি ইতিপূর্ব্বে এই দ্বীপে একটা স্থায়ী অটল ভালবাসার দৃষ্টান্ত দেখেছিলেম। অথচ সে ভালবাসায় প্রেমিক যুগলের সুখী হবার সম্ভাবনা বড় একটা ছিল না।

দেখ, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, আমি একবার কর্সিকা দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলেম। এই বুনো দ্বীপটা, অ্যামেরিকার চাইতেও আমাদের অপরিচিত ও দূরবর্ত্তী—যদিও আজকের মত কখন-কখন ফ্রান্সের উপকূলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

মনে মনে কল্পনা কর,—একটা নূতন জগতের এখনো যেন কোন শৃঙ্খলা হয় নি—সব গোলমাল, সব অস্থির; কতকগুলো বিচ্ছিন্ন পর্ব্বত;—তাদের পৃথক্ পৃথক্ খদ্ একেবারে সোজা খাড়া হয়ে উঠেছে—খদের গা বেয়ে জলস্রোত সবেগে গড়িয়ে পড়ছে; একটাও সমতলভূমি নেই। কেবল পাষাণের বিরাট তরঙ্গলীলা, ঝোপঝাপের জঙ্গল, অথবা উত্তুঙ্গ বনস্পতি-মণ্ডিত ভূখণ্ডের তরঙ্গ-বিস্তার। মাটি অক্ষত, অকর্ষিত, মরুপ্রতিম—যদিও কখন কখন একটা গ্রাম দেখা যায়,—সে গ্রাম গিরিশিখরস্থ কতকগুলো শৈল-স্তূপের মতো। সেথায় না আছে চাষ, না-আছে শ্রমশিল্প, না-আছে কোন শিল্পকলা। গায়ের উপর কাজ-করা এক টুক্‌রো কাঠ কিংবা খোদাই কাজ-করা একখণ্ড পাথরও দেখা যায় না। সুন্দর জিনিসের উপর পূর্ব্বপুরুষদের শিশু-সুলভ রুচিরও কোন স্মৃতিচিহ্ন আদৌ নেই। এই কঠোর দেশের যে বিশেষত্বটুকু চখে পড়ে তা এই;—চিত্ত-বিমোহন আকৃতির অনুসন্ধান যাকে আর্ট বলে—সেই আর্ট সম্বন্ধে একটা কৌলিক ঔদাসীন্য।

ইটালি,—যেখানকার প্রত্যেক প্রাসাদ, সেরা-সেরা শিল্পসামগ্রীতে পূর্ণ—এবং প্রাসাদগুলি নিজেরাও শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা; যেখানে মার্ব্বেল, কাঠ, ব্রন্‌জ, লোহা, ধাতু ও পাথর, মানব-প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়, যেখানে প্রাচীনকালের খুব ছোটখাটো জিনিস যা পুরাতন বাড়ীতে দেখা যায়—সেই সব জিনিসও এই দিব্য ভগবৎ-দানের পরিচয় দেয়; আমরা সকলেই এই পূতভূমি ইটালীকে যে এত ভালবাসি তার কারণ, ইটালী আমাদের কাছে সৃজন-বুদ্ধির উদ্যম চেষ্টা, মহত্ত্ব, শক্তিমত্তা ও বিজয়-গৌরব প্রকাশ করে।

এবং এই ইটালীর সম্মুখেই—এই বুনো কর্সিকা, পূর্ব্বকালে যেমনটি ছিল, এখনো তেমনিই রয়েছে। এই দ্বীপবাসীরা তাদের রূঢ়-ধরণের ঘরে বাস করে, তাদের নিজের জীবনযাত্রা কিংবা পারিবারিক ঝগ্‌ড়াঝাঁটি ছাড়া তারা আর সব বিষয়েই উদাসীন। অশিক্ষিত, প্রকৃতি, বিদ্বেষপরায়ণ, রক্তপিপাসু জাতিদের যে সব দোষ, সেই সব দোষের সঙ্গে, তাদের কতকগুলো গুণও তাদের মধ্যে রয়ে গেছে। তারা খুব আতিথেয়, বদান্য, পরসেবা-রত, সরল স্বভাব; স্বচ্ছন্দচিত্তে পথিকদের নিজগৃহে আশ্রয় দেয় এবং কারও কাছে একটু মমতার চিহ্ন দেখ্‌তে পেলে, তারা বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে পড়ে।

এই প্রকাণ্ড দ্বীপের মধ্যে আমি একমাস কাল বিচরণ

করেছি। না-আছে পানাগার, না-আছে বড় রাস্তা। পর্ব্বতের গায়ে কতকগুল কুটীর যেন হুক্ দিয়ে আট্‌কান রয়েছে। খুঁড়ি গো-পথ দিয়ে সেইখানে পৌছান যায়—নীচে বাঁকা-চোরা গভীর খাদ ; সায়াহ্নে সেখান থেকে একটা এক-টানা আওয়াজ, জলপ্রবাহের একটা চাপা গম্ভীর শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়।

আমি কুটীরের দ্বারে ঘা দিতাম। রাত্রের জন্য আশ্রয় এবং পরদিবস পর্য্যন্ত চল্‌তে পারে এইরূপ কিছু খাদ্য-সামগ্রী কোন গৃহপতির কাছে চাইতেম। তার পরিবারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আহার করতেম এবং সেই ক্ষুদ্র বাটীতে নিদ্রা যেতেম। তার পরদিন আমার আশ্রয়দাতা সাদরে আমার হস্তপীড়ন করে আমাকে গ্রামের শেষ-সীমায় পৌছিয়ে দিত।

তারপর একদিন সায়াহ্নে, দশ ঘণ্টা হাঁটার পর একটি নিঃসঙ্গ ক্ষুদ্র কুটীরে এসে পৌছলেম—এই কুটীরটি একটা খাড়া উপত্যকার পশ্চাদভাগে অবস্থিত—এই উপত্যকা-ভূমি প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে সমুদ্রে গড়িয়ে পড়েছে। পর্ব্বতের খাড়া ঢালু জমির দুইধারে—বড় বড় পাথর, বড় বড় গাছ এই উপত্যকাকে প্রাচীরের মত ঘিরে যার পর নাই বিষাদময় করে তুলেছে।

কুটীরের চারিদিকে, কতকগুলা আঙুরের লতা, একটি ছোট বাগান ; এবং আর একটু দূরে, বড় বড় চেষ্টনট গাছ,—এই গরীব দেশের এই একমাত্র ধন-সম্পদ ও জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়।

যে স্ত্রীলোকটি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, তিনি বৃদ্ধা, কঠোর-দর্শন ও যার-পর-নাই ভদ্র। পুরুষটী খড়ের কেদারায় বসেছিল, দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে অভিবাদন কর্‌লে, তারপর একটি কথা না বলে' আবার বসে পড়ল।

স্ত্রীলোকটি আমাকে বল্লেন :—

—"ওঁকে মাপ কর্‌বেন ; উনি এখন কালা। ওঁর বয়স ৮২ বৎসর।"

স্ত্রীলোকটি ফ্রান্‌সের ফরাসী-ভাষাতেই কথা কইলেন। আমি আশ্চর্য্য হলেম।

আমি স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম :—

—"আপনি কর্সিকার লোক নন ?"

তিনি উত্তর কর্‌লেন :—

—"না ; আমরা ফ্রান্‌সের লোক। আমরা এই ৫০ বৎসর ধরে' এখানে বাস কর্‌চি।"

যেখানে মানুষের বাস,—সেই সব নগর থেকে দূরে, এই অন্ধকূপের মধ্যে এরা কিনা ৫০ বৎসর কাটিয়েছে—এই কথা মনে করে আমার মনে যেন একটা যন্ত্রণা ও আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। একটি বৃদ্ধ চাষা এই সময় ঘরে প্রবেশ করে আহার করতে বসে গেল। এক ডিশ্ ঘন সুপ ;—আলু, কপি, ও চর্ব্বি মিলিয়ে রাঁধা হয়েছে। আর কোন রান্না নেই।

খাওয়া শেষ হলে, আমি দরজার সম্মুখে গিয়ে বসলেম। এই বিষাদময় ভূদৃশ্যের প্রভাবে আমার মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কোন বিষণ্ণ সায়াহ্নে কোন কোন উজাড় জায়গা দেখ্‌লে ভ্রমণকারীদের মন এই রকমই খারাপ হয়ে পড়ে। আমার মনে হল, যেন সব শেষ হয়ে আস্‌ছে, জীবের অস্তিত্ব শেষ হয়ে আস্‌ছে, বিশ্বজগৎ লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে। মনের উপর প্রতিভাত হ'ল জীবনের ভীষণ দুঃখ, সমস্তের বিচ্ছিন্নতা, সমস্তের নশ্বরতা এবং যে হৃদয় মৃত্যুপর্য্যন্ত, নানা স্বপ্নের মোহে মুগ্ধ হয়, আত্মপ্রবঞ্চনা করে, সেই হৃদয়ের গভীর বিজনতা।

বৃদ্ধা আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল ; যে অন্তঃকরণ খুব শান্ত সমাহিত, তার ভিতরেও এক একবার কৌতূহলের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল।

—"আপনি তাহলে ফ্রান্স থেকে আস্‌ছেন ?"

—"হাঁ, আমি আমোদের জন্য এই রকম দেশ-বিদেশে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই।

—"আপনি পারী-নগর থেকে আসছেন বোধ হয় ?"

—"না, আমি নান্‌সী থেকে আস্‌ছি।"

আমার মনে হ'ল,এই কথা শুনে, বৃদ্ধার মনে যেন একটা ভয়ানক আবেগ উপস্থিত হ'ল। কেন যে আমার মনে হল, তা আমি বল্‌তে পারি নে।

বৃদ্ধা ধীরস্বরে আবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে,

—"আপনি নান্‌সী থেকে আসছেন ?"

এই সময়ে পুরুষটি দরজার সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। কালারা যেমন হয়ে থাকে, সে একেবারে নির্ব্বিকার।

আবার বৃদ্ধা আরম্ভ করিল :—

—"ওঁর কাছে সবই সমান; উনি কিছুই শুন্‌তে পান না।"

একটু থামিয়া আবার বললে :—

—"তাহলে আপনি নান্‌সীর লোকদের জানেন ?"

—"জানি বৈকি—সকলকেই জানি।"

—"স্যাৎ-আলেজের পরিবারবর্গকে জানেন ?"

—"খুব ভাল জানি। তাঁরা আমার পিতার বন্ধু ছিলেন।"

—"আপনার নাম কি ?"

আমি আমার নাম বল্লেম। বৃদ্ধা আমার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তার পর নিম্নস্বরে এই কথাগুলি বল্ল।

—"আমার বেশ মনে আছে। এখন ব্রিস্‌মার-পরিবারবর্গ কোথায় ?"

—"সবাই মারা গেছে—"

—"আর সির্মো-পরিবার ? তাদের আপনি জানেন ?"

—"বংশের শেষ সির্মো এখন সেনাপতি।"

এই কথা শুনে বৃদ্ধা কি-জানি মনের কি-একটা প্রবল আবেগ-ভরে,—যা' এতদিন অন্তরের অন্তস্তলে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই সমস্ত কথা আমার কাছে খুলে বল্লে :—

—"হাঁ, আঁরি-দে-সির্মো। আমি তাকে বেশ জানি। সে আমার ভাই।"

বিস্ময়াভিভূত হয়ে আমি তার দিকে তাকালেম। আর তখনি সমস্ত কথা আমার স্মৃতিপথে এসে উপস্থিত হ'ল।

সেই সময় লোরেন্‌-প্রদেশে একটা ভারী কেলেঙ্কারি ঘটনা ঘটেছিল। একটি সুন্দরী ও ধনশালী নবযুবতী—তাকে হরণ করে নিয়ে যায় সৈন্যমণ্ডলীর একজন সেনানায়ক। যুবতীর পিতা ছিলেন সেনাপতি। তাঁরই অধীনস্থ এই সৈনিক-কর্ম্মচারী।

যুবকটি দেখ্‌তে সুশ্রী, চাষার ছেলে; কিন্তু বেশ পরিপাটী বেশবিন্যাস করত। এই সৈনিক তার কর্ণেলের মেয়ের মন হরণ করে। অশ্বারোহী সৈন্যের কুচ-কাওয়াজের সময় সম্ভবত তরুণী তাকে দেখেছিল। কিন্তু-কি করে তাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ হ'ল, কথাবার্ত্তা হ'ল, প্রেমালাপ হ'ল, তা কেউ বল্‌তে পারে না।

কেউ কিছু অনুমান করতে পারে নি, কেউ তার একটু আঁচও পায় নি। একদিন সায়াহ্নে, যেমন ঐ সৈনিকপুরুষটির কাজের সময় শেষ হ'ল অমনি সে তরুণীটিকে নিয়ে অন্তর্ধান করলে। তাদের অনেক খোঁজ করা হ'ল, কিন্তু আর তাদের ফিরে পাওয়া গেল না। সেই অবধি তাদের সংবাদ নেই—লোকে মনে করলে তারা মারা গেছে।

এতদিন পরে এখন আমি সেই তরুণীকে এখানে দেখ্‌তে পেলেম।

আমি আবার তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলাম :

—"হাঁ, আমার বেশ মনে পড়ে। তুমিই সেই কুমারী সুজান।"

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে এই কথায় সায় দিল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। তারপর, যে বৃদ্ধটি দরজার সাম্‌নে অচলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দৃষ্টির ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধা বল্লে :—

—"এ সেই।"

তখনি আমি বুঝ্‌লাম, সে ঐ বৃদ্ধকেই বরাবর ভাল-বেসে এসেছে; এখনো মোহিনী দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগ্‌ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলেম :—

—"যাই হোক্, তুমি কি সুখী হয়েছ ?"

সে উত্তর করল :—তার গলার স্বর যেন একেবারে হৃদয়ের ভিতর থেকে বেরোলো।

—"হাঁ, আমি খুব সুখী। উনি আমাকে খুব সুখী করেছেন। আমি চলে এসেছি বলে, একদিনের জন্যও আমার অনুতাপ হয় নি।"

ওঃ! প্রেমের কি প্রভাব! আমি বিষণ্ণভাবে,

বিস্ময়স্তম্ভিত হয়ে বৃদ্ধাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। এই ধনশালী বালিকা—এখন বৃদ্ধা—এই চাষার সঙ্গে চলে এসেছে; আর নিজেও চাষানী হয়ে পড়েছে। এখানে এসে যে রকম জীবন যাপন করছে তার ভিতর কোন সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ নেই, কোন বিলাসিতা নেই, কোন প্রকার সূক্ষ্ম সুকুমার ভাব নেই। কেবল কতকগুলা সাদাসিধে অভ্যাসে আসক্ত হয়ে রয়েছে। এখনো এই বধির বৃদ্ধকে ভালবাসে। সে এখন পুরাপুরী চাষা; চাষার মত টুপি, চাষার মত পরিচ্ছদ। কাঠের টেবিলের ধারে, খড়ের চৌকীতে বসে, মাটির থালায়, আলু, কপি ও চর্ব্বি দিয়ে রাঁধা শুধু একটা সুরুয়া খায়। বৃদ্ধের পাশে একটা খড়ের শয্যায় শয়ন করে।

তাকে ছাড়া আর কিছুই সে ভাবে নি। কি সাজসজ্জা, কি কাপড়-চোপড়, কি জিনিসপত্রের পারিপাট্য, কি কোমল আসন, কি পর্দ্দায় ঢাকা কামরার সুগন্ধ মৃদু উত্তাপ, কি পালোকের শীত-আচ্ছাদন—এই সবের অভাবে সে একটুও আপশোষ করে নি। তাকে ছাড়া সে আর কিছুই চায় না। কিছুরই প্রয়োজন অনুভব করে নি।

সে তার তরুণ জীবনের আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে এসেছে, সমাজকে ছেড়ে এসেছে, যারা তাকে লালন-পালন করেছিল সেই আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে এসেছে। এই বুনো উপত্যকার দেশে তার সঙ্গে একলা এসেছে। এই বৃদ্ধই তার জীবন-সর্ব্বস্ব, স্বপ্নের নিধি, চির-আকাঙ্ক্ষা ও চির-আশার একমাত্র অবলম্বন। বৃদ্ধ সৈনিক তার সমস্ত জীবনকে সুখে পূর্ণ করেছে।

সে এর চেয়ে বেশী সুখী আর কিছুতেই হতে পারে না। বৃদ্ধ সৈনিক সমস্ত রাত্রি খড়ের শয্যায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়—পাশে তার সেই সঙ্গিনী যে এত দূরে তার সঙ্গে এসেছে—এই উপকরণ-বিরল সাদাসিধা সুখের দৃশ্য, আমি মুগ্ধ হয়ে ভাবতে লাগলেম।

তার পর সূর্য্যোদয় হলে, এই বৃদ্ধ দম্পতীর হস্ত পীড়ন করে বিদায় হলেম।

গল্পের বক্তা এইখানে চুপ করল। একজন রমণী বল্‌ল :—

—"বোঝা গেছে। ওর প্রেমের আদর্শটা খুবই সহজ ধরণের ছিল। ওর আশা-আকাঙ্খা আদিম যুগের মত একেবারে সাদাসিধে। মেয়েটা নিতান্ত হাবাগোবা।"

আর একজন ধীর স্বরে বল্‌ল।

—"তাতে কি আসে-যায়! সে ত সুখী হয়েছে।"

তারপর, যার তীরভূমি এই ক্ষুদ্র প্রেমিক-যুগলকে আশ্রয় দিয়েছিল, এবং তাদের গল্প বলবার জন্যই যেন স্বয়ং ছায়ামূর্ত্তি ধরে আবির্ভূত হয়েছিল, এখন সেই কর্সিকা-দ্বীপ দূর দিগন্তে, নৈশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে, ধীরে ধীরে সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# আলোচনা

## বৈধব্য

গত কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে বঙ্গনারীর 'বৈধব্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া সন্তোষলাভ করিয়াছি। সমাজের এই বৈধব্য-ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতির উপায় বঙ্গনারী যাহা দেখাইয়াছেন, তাহার সকলগুলিই কার্য্যে পরিণত করা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। দুঃখী বিধবাদের দুঃখ-মোচনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা স্বাবলম্বন। আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে বিধবাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে বিধবাদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা কতকটা পরিবর্ত্তিত হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্থিক দুর্দ্দশার সম্পূর্ণ মোচন হইবে না। আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বিধবাদের কর্ত্তব্য—আত্ম-নির্ভরতা। কুমারী বা বিবাহিত জীবনে স্বামী বা পিতা-মাতার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিলে, অথবা শিল্প বা চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাঁহারা অনায়াসেই পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া নারী-নিগ্রহ-যন্ত্রণার লাঘব করিতে পারেন। নারীরা পরের মুখাপেক্ষী বলিয়াই তাঁহাদের নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। এই নিগ্রহের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে

পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পথ করিয়া আত্মনির্ভরশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গনারী বলিয়াছেন, বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিলে তাঁহাদের বৈধব্য যন্ত্রণার লাঘব হইবে। বঙ্গনারীর এই উক্তিটি কার্য্যে পরিণত করিলে বিধবার অথবা সমাজের কোনও বিশেষ উপকার সাধিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রেম, গৌণ উদ্দেশ্য-বংশবিস্তার। হিন্দু শাস্ত্রকারের মতে বিবাহের এই প্রেমবন্ধন অচ্ছেদ্য। স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতে এই বন্ধন খসিয়া বা ভাঙ্গিয়া যায় না। অতএব স্ত্রীর কর্ত্তব্য, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিরহিণীর মত মৃত্যুর পর স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলনের আশায় জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়েকটি অতিবাহিত করা। যাঁহারা বালবিধবা, যাঁহারা বিবাহের পবিত্র প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পুনর্বিবাহে নিজেদের এবং সমাজের মঙ্গল। কিন্তু পরিণত বয়সে যাঁহারা বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদের পুনরায় বিবাহ করা "এঁটো পাত্ চাটা" বই আর কিছুই নয়! আর যদি হৃদয়ের বিনিময়ে কেবল আর্থিক কষ্ট লাঘব করিবার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে সেই বিবাহে অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল কখনো হইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত, যে পরিণত বয়স্কা বিধবা দু'একটি পুত্র-কন্যা লইয়া অপর পুরুষকে বিবাহ করিবেন, বিধবার পুত্র-কন্যা আপনার নয় বলিয়া তিনি তাহাদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। পাশ্চাত্য দেশে এরূপ ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। "ডেভিড্ কপারফিল্ড" নামক উপন্যাসে থ্যাকারে সমাজের এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া একটি নিখুঁৎ ছবি আঁকিয়াছেন। দ্বিতীয় স্বামী বিধবার পুত্র-কন্যার উপর নিগ্রহ অথবা অত্যাচার করিলে বিধবা কি তাহা মোচন করিতে পারিবেন? বিবাহে তাঁহার নিজের আর্থিক কষ্টের লাঘব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পুত্র-কন্যার কোনও আর্থিক কষ্টের লাঘব হইবে কি? ইহা অপেক্ষা নিজের গৃহে স্বাবলম্বিনী হইয়া স্বামীর স্মৃতি ও ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করিয়া পুত্র-কন্যার ভরণপোষণে ও শিক্ষাদানে জীবন যাপন করা তাঁহার নিজের ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলের নয় কি? প্রকৃতপক্ষে স্বামীর পবিত্র প্রেমের স্মৃতি লইয়া জীবন-যাপনে বিধবার যন্ত্রণা কিছুই নাই। বিধবা স্বামীর ভালবাসায় ব্রহ্মচর্য্যের যে কঠোরতা স্বাধীনভাবে পালন করেন, তাহাতেও তাঁহার যন্ত্রণা হয় তখন—যখন সমাজ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কঠোরতা পালন করিতে বাধ্য করায়—সমাজ যখন তাঁহার চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাঁহাকে নাগপাশের বন্ধনে পরাধীন করিয়া দেয়। এই নাগপাশ হইতে মুক্তির উপায় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে সমাজে আর একটি অমঙ্গল সাধিত হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রায় সমস্ত দেশেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে অনেক কুমারীকে অবিবাহিতা থাকিতে হইবে। তাহাতে সমাজে অমঙ্গলেরই আশঙ্কা।

নারীনিগ্রহ সম্বন্ধে বঙ্গনারী যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন তাহা অনেক স্থলেই সত্য। বঙ্গনারী আরও বলিয়াছেন, সকল বিষয়েই রোগ হইলে ঔষধ দেওয়ার পরিবর্ত্তে রোগ নিবারণই কর্ত্তব্য। সমাজের এই রোগ নিবারণের উপায়—প্রকৃতির উপদেশ মানিয়া চলা ও প্রকৃতির অনুকরণে সমাজ এবং পরিবার গঠন করা।

প্রকৃতির যতগুলি সৌন্দর্য্য আছে, তাহার প্রত্যেকটির মধ্যে সাম্যভাবের উপদেশটি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রসূর্য্য জগতে যে আলো দিতেছেন তাহা কোনও বিশেষ ব্যক্তি সমাজ জাতি বা দেশের জন্য নহে—তাহা সকলের জন্য। স্ত্রী বলুন, পুরুষ বলুন, সধবা বলুন, বিধবা বলুন, বালক বলুন অথবা বৃদ্ধই বলুন, সকলে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা সমানভাবে সূর্য্য ও চন্দ্রের আলোক পাইতেছে। গাছে যে ফল ফলিতেছে, লতায় যে ফুল ফুটিতেছে, ঝরণা ও স্রোতস্বিনীতে যে সুপেয় জলধারা বহিতেছে, পুষ্পে যে সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাও কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা সমাজের জন্য নহে—তাহা সকলের জন্য, সমাজের প্রত্যেক নরনারীর জন্য। যেখানে এই সুন্দর সাম্যভাব থাকিবে সেইখানেই মৈত্রী ভাবটি ফুটিয়া উঠিবে এবং যেখানে মৈত্রীভাব থাকিবে সেইখানেই স্বাধীনতা আসিবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতর সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ছবিটি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত রহিয়াছে। মানুষের কর্ত্তব্য সমাজ বা পরিবার-গঠনে প্রকৃতির এই উপদেশটি গ্রহণ করা।

কোনও সমাজ বা পরিবার যখন অবনতি তথা ধ্বংসের পথে যাইতে থাকে, তখন একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব ঐ অবনতির কারণ আর কিছুই নহে—শুধু স্বার্থপরতা অর্থাৎ আত্মত্যাগের অভাব। আমি নিজে ধনী হইব, মানী হইব, সুখী হইব, জ্ঞানী হইব এবং স্বাধীন হইব, কিন্তু আমার পরিবারের অথবা সমাজের কাহাকেও বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগকে ধনী, মানী, সুখী, জ্ঞানী অথবা স্বাধীন হইতে দিব না অথবা সহায় হইব না,—এইরূপ স্বার্থ ভাব যখন কোনও সমাজে আসিয়া প্রবেশ করে তখন তাহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। একবার প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখুন, প্রকৃতি কি করিতেছে। সূর্য্য নিজের আলোকে আলোকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে তাহার কিরণ ছড়াইয়া দিতেছে। সূর্য্যের আলোতে গাছ গজাইতেছে, ফুল ফুটিতেছে, সৌরভ ছুটিতেছে, মানুষ জাগিতেছে। এক কথায় বলিলে সূর্য্য নিজে ফুটিয়া ইহাদিগকে বিকশিত করিতেছে। মানুষের কর্ত্তব্য নিজে ধনী হইয়া সমাজের আর সকলকে ধনী করিয়া দেওয়া, জ্ঞানী হইয়া অপরকে জ্ঞানী করা, এবং স্বাধীনতা পাইয়া অপরকে স্বাধীন করা।

প্রকৃতির আর একটি উপদেশ দেখাইয়া আমি আলোচনা শেষ করিব।

সমাজে কিংবা পরিবারে সুখ ও শান্তি স্থাপন করিতে হইলে সকলকেই কিছু কিছু ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি যে পরিমাণে নিঃস্বার্থভাবে অম্লানচিত্তে আত্মত্যাগ করিবেন, সুখের পরিমাণ তাঁহার সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। দেখুন, শীতকালে প্রকৃতি দেবী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন। কন্‌কনে হাওয়ায় বৃক্ষ হইতে লতা পাতা ফুল সবই ঝরিয়া যায়। প্রকৃতি দেবী নীরবে অকাতরে অম্লানচিত্তে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে নিরাভরণা হইয়া যান। তার পরই ঋতুরাজ বসন্তের আগমন। বসন্ত আসিয়া নিরাভরণা প্রকৃতিকে সুশোভন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে। গাছে গাছে সবুজ কোমল পাতা গজায়, লতায় লতায় নানা রকমের রঙ-বেরঙের সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া ওঠে, বিহঙ্গগণ শাখায় শাখায় মধুর কূজন করিতে আরম্ভ করে, মধু-পান-মত্ত মধুমক্ষিকা মধুর গুঞ্জন করিয়া ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া বেড়ায়! শীতের পরই বসন্তের এই দৃশ্য দেখিতে কত সুখ! শীতকালে প্রকৃতি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন বলিয়াই বসন্তে তাঁহার এত সুষমা, এমন সৌন্দর্য্য। তাই মানুষ ত্যাগ না করিলে কিছুই পাইতে পারে না। প্রকৃতির ত্যাগ ও সৌন্দর্য্য প্রাপ্তির এই উদাহরণটি আমাদের সমাজে বা পরিবারে অতি সুন্দররূপে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইতে পারে।

আমাদের সমাজের বর্ত্তমান দুঃখ ও দুরবস্থার প্রধান কারণ—সমাজ প্রকৃতির উপদেশ ও নিয়ম গ্রহণ বা পালন করে নাই। রাজার নিয়ম মানিয়া না চলিলে মানুষ যেমন রাজ-বিচারে দণ্ডিত হয়, প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করিবার জন্য প্রকৃতিও মানুষকে সেইরূপ শাস্তি দিয়া থাকেন। রাজার দণ্ড হইতে মানুষ বাঁচিতে পারে কিন্তু প্রকৃতির হাত হইতে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব। যিনি প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করিয়াছেন, তিনিই ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন। তাই সমাজে যে আজ এত দুঃখ ও দৈন্যের দিন আসিয়াছে, তাহা সমাজের প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন-হেতু পাপের প্রায়শ্চিত্ত বই আর কিছুই নহে। অতি শীঘ্রই প্রকৃতি সমাজের সকল আবিলতা ও আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার সুখ ও সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, আশা করা যায়।

শ্রীক্ষীরোদমোহন চক্রবর্ত্তী।

---

## আমাদের পলিটিক্‌স্

রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি ইংরাজী পলিটিক্‌সের প্রতিশব্দরূপে আমাদের ভাষায় চলিত হয়ে আসছে। তবে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে (Political Scienceএ) পলিটিক্‌স্ বল্‌তে যা' বুঝায় রাষ্ট্র-নীতি বা রাজ-নীতিতে ঠিক তা' বুঝায় কিনা বলা বড় কঠিন।

ইউরোপীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে পলিটিক্‌স্ বল্‌তে কি বুঝায় তা দেখা যাক্। বিখ্যাত জার্ম্মাণ অধ্যাপক ব্লুন্টলীর (Bluntschlia) রচিত "Theory of the State" রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। পলিটিক্‌স্ যে কি তা' Bluntschlia মত অবলম্বন করে' বোঝবার চেষ্টা করা যাক্। পলিটিক্‌সের স্বরূপ জানতে হ'লে পলিটিক্যাল্ সায়ান্স, 'ষ্টেট' ও 'নেশন্' এই তিনটি বস্তুর তত্ত্ব ও তথ্য অবগত হওয়া আবশ্যক।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান (Political Science) তাকেই বলে, যে-বিজ্ঞান রাষ্ট্রের (Stateএর) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর যে বিজ্ঞান রাষ্ট্রের অবস্থা-ব্যবস্থা মূল প্রকৃতি, নানাবিধ আকার ও প্রকাশ এবং ক্রম-বিকাশের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রকে বোঝবার ও ধারণা করবার চেষ্টা করে।

পলিটিক্‌স্ রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থার (Public Lawর) মতনই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত একটা বিভাগ বিশেষ। রাষ্ট্রের জীবন ও স্বভাব ধর্ম্মের সঙ্গেই পলিটিক্‌সের সম্বন্ধ। রাষ্ট্রীয় জনগণের চেষ্টা উদ্যম কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে চলিত হবে তা' স্থির করে দেয় পলিটিক্‌স্, আর সেই লক্ষ্যস্থলে পৌছুতে হলে কোন পন্থা অবলম্বন করবে, তাও নির্দ্ধারিত হয় পলিটিক্‌সেরই সাহায্যে। পলিটিক্‌স্ রাষ্ট্রীয় বিধি-নিয়মের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে এবং অনিষ্টকর পরিণাম থেকে রাষ্ট্রকে কি ভাবে রক্ষা করা যেতে পারে ও প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি কিরূপে সংশোধিত হতে পারে, সে বিষয় বিচার বিবেচনা করে। রাষ্ট্রের জীবন নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা (Public Law) ও পলিটিক্‌সের 'পরে। রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্র নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনেই পলিটিক্‌সের পূর্ণ বিকাশ ও স্পষ্ট প্রকাশ। পলিটিক্‌স্‌কে বিজ্ঞান না বলে' একটা কৌশল বলা যেতে পারে—"Politics is more of an art than of a Science." রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের মহদ্ভাব দ্বারাই পলিটিক্‌স্ নিয়ন্ত্রিত; রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নেশনের কল্যাণ বিধানই পলিটিক্‌সের লক্ষ্য—"Politics aims at the welfare of the nation." মোট কথা, পলিটিক্‌সের আরম্ভ ও শেষ, বিকাশ ও বিনাশ State বা রাষ্ট্রকে আশ্রয় করেই। সুতরাং রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে পলিটিক্‌সের স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনা করা কখনও সম্ভব হতে পারে না। তাহলে এখন রাষ্ট্রের স্বরূপ কি, তা' দেখা যাক্।

ষ্টেট্ বা রাষ্ট্র বল্‌তে আধুনিক কালে দাস-জাতির অধ্যুষিত পরদেশীর শাসিত পরাধীন দেশকে বুঝায় না। 'Modern state' বা আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি গণ-তন্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক রাষ্ট্রে মানবের ন্যায্য অধিকার হ'তে কাকেও বঞ্চিত করা হয় না; মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মুক্ত মানব নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে স্বাধীনভাবে আত্ম-বিকাশের অভিমুখে অগ্রসর হ'তে পারে। রাষ্ট্রে বড় ছোট, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-

মূর্খ সবাইর সমান অধিকার। রাষ্ট্রের-জনগণের সম্মতি নিয়েই আইন কানুন, বিধি-ব্যবস্থা রচিত হয়; জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সবারই প্রতি সে-সব সমান ভাবে প্রযোজ্য। রাষ্ট্র (State) নেশনের উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে না। নেশনের রচিত বিধি-নিয়মের দ্বারাই রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব সীমাবদ্ধ। আধুনিক রাষ্ট্র নেশনের সংহত শক্তির সাহায্যে গঠিত অনুষ্ঠান বিশেষ। আধুনিক কালে রাষ্ট্র বল্‌তেই স্বাধীন রাষ্ট্র বা ন্যাশন্যাল্ ষ্টেটকে বুঝায়—"Modern States are essentially national States."

ন্যাশন্যাল ষ্টেট যে কি, রাষ্ট্রের স্বরূপ যে কি, তা জানতে হলে নেশনের রূপ-দর্শনেরও প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে নেশনের কল্পনা কিংবা নেশনকে ছেড়ে Conception of State বা রাষ্ট্রের ধারণা কখনো সম্ভব নয়। গৃহ আর গৃহীর যে সম্বন্ধ রাষ্ট্র ও নেশনের সঙ্গেও অনেকটা তেমনি ধরনের সম্বন্ধ। একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সম্মিলিত ও সঙ্ঘ-বদ্ধ জনগণের সমষ্টিকেই সাধারণতঃ 'নেশন' বলা হয়। রাষ্ট্রের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই নেশনের জন্ম হ'য়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় অধিকার হ'তে বঞ্চিত, জড়-পদার্থের ন্যায় শাসিত দাস-জাতি 'নেশন' বলে পরিগণিত হয় না। যে রাজ্য প্রভু-তন্ত্র শাসনে শাসিত, সেখানে নেশন বা স্বাধীন-জাতির উৎপত্তি হ'তে পারে না, সেখানে সৃষ্টি হয় শুধু দাস-জাতির—"Despotism knows nothing of Nations; only of subjects." রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা না হ'লে নেশন গড়ে উঠতে পারে না—"No State, no Nation." নেশনের উদ্ভব বল্‌তে রাষ্ট্রীয় ক্রম-বিকাশ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টিকেই বুঝায়—"The rise of a Nation implies merely political process, the creation of a State." স্বদেশে স্বাধিকার হ'তে বঞ্চিত যে জাতি, তাদের স্বাধীন জাতির পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ার কোন দাবী-দাওয়া নাই। তারা 'নেশান নামে অভিহিত হ'তে পারবে তখনই—যখন স্বদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে' স্বাধীন-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করবে। পর-রাষ্ট্র স্বদেশকে স্ব-রাষ্ট্রে পরিণত করতে পার্‌বে যে দিন—সে দিনই পর-তন্ত্র স্বদেশবাসী স্বতন্ত্র হ'য়ে 'স্বাধীন' আখ্যায় ভূষিত হওয়ার অধিকারী হবে।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। ইউরোপীয় রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিকগণ আধুনিক-রাষ্ট্রের মাহাত্ম্য ও মহিমা নিয়ে দরাজ-গলায় যত ওয়াজ-নছিয়ৎ করুন না কেন, আর আধুনিক-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিকাশের যত বড়াই করুন না কেন, ঋষি টলষ্টয় আধুনিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রতিকূল মত ব্যক্ত করেছেন। 'Modern State' or আধুনিক রাষ্ট্রকে আদর্শ-রাষ্ট্র বলে' মেনে নিতে তিনি একেবারেই নারাজ। টলষ্টয় বলেন যে, রাষ্ট্রের বাহিরের কতক দোষ হ'লেও অন্তঃপ্রকৃতির কোন সংস্কার হয় নাই। ইউরোপের আধুনিক রাষ্ট্রে যে প্রজা-তন্ত্র শাসন প্রচলিত আছে, সেইটে রাজতন্ত্র বা স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনের চেয়েও নিকৃষ্ট। রাজতন্ত্রে প্রজাদের উপর প্রভুত্ব করেন একজন, আর প্রজাতন্ত্রে কর্ত্তৃত্ব করেন একের চেয়ে বেশী জন। গণতন্ত্রের নামে জনগণের 'পরে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব বিস্তার করে' বসে কতগুলি সামান্য ব্যক্তি—যারা ধূর্ত্ত, চতুর, দুষ্ট-স্বভাব ও ক্রূর-প্রকৃতি। আধুনিক রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা বা গণতন্ত্রের গঠনই এমন ধরণের যে এর ফলে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব এই ধাতের লোকদের হাতে আসবেই, রাষ্ট্রের যন্ত্র-তন্ত্র, যত-কিছু সমস্তই হবে এদের হস্তগত—"power will be seized by cunning, immoral and artful mediocreties," (The Russian Revolution—Leo Tolstoy) টলষ্টয় তাঁর "Kingdom of Heaven" নামক গ্রন্থে "non-resistance to evil by evil' নীতির আলোচনা-প্রসঙ্গে ইউরোপের আধুনিক রাষ্ট্রে প্রচলিত গণতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক স্থলে ঐ একই মত প্রকাশ করেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে এ বিষয়ে একেবারে স্পষ্ট ভাবেই তাঁর অভিমত অভিব্যক্ত হয়েছে।

যা হোক্, পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনায় মোটামুটি আমরা এইটে বুঝতে পারি যে, আধুনিক-রাষ্ট্রে ভারতবর্ষের কোনো স্থান নাই ও ভারতবাসী 'নেশন' বলে' পরিগণিত হওয়ারও অধিকারী নয়। বিদেশীর শাসিত বলে' ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত হতে পারে না; আর ভারতের অধিবাসী পরাধীনতার দরুণ অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয়—'নেশনের' শ্রেণীভুক্ত হওয়ার অধিকার একেবারে নাই। সার কথা হচ্ছে এই—ভারতবাসী ভারতবর্ষের হ'লেও ভারতবর্ষ ভারতবাসীর নয়; 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' বলেই ভারতবাসী জগতের স্বাধীন জাতির সমাজ থেকে আজ বহিষ্কৃত।

তাহ'লে আমরা এই দেখতে পাই যে, স্ব-রাষ্ট্র ও স্ব-তন্ত্র হ'য়ে 'নেশন' গড়ে তুল্‌তে না পারলে পলিটিকসে কোনো অধিকার জন্মে না। স্ব-রাষ্ট্রহীন স্ব-তন্ত্র-বর্জ্জিত জাতির পক্ষে পলিটিক্‌স্ আকাশকুসুম; পরাধীনের পলিটিক্‌স্ 'আষাঢ়ে স্বপ্নের' মতই অলীক বস্তু; দাস-জাতির পক্ষে পলিটিক্‌স্ একেবারেই অচল।

ইউরোপীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞান মতে পরাধীনের পক্ষে পলিটিক্‌স্ অচল হ'লেও আমাদের দেশের পঙ্গু-পলিটিশিয়ানরা সে অচল ডিঙিয়ে চল্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা করে' বীর-রসের নামে হাস্য রসেরই উদ্রেক করেন। অচল পলিটিক্‌স্ বা পলিটিক্‌সের অচল উল্লঙ্ঘন কর্‌বার মতন শক্তি সঞ্চয় তাঁরা করুন আর নাই করুন, চেষ্টার বিরাম নাই, অধ্যবসায়ের ত্রুটি নাই। তাঁদের ঐশী-শক্তিতেও আস্থার অভাব। কনষ্টিটিউশন্যাল য়্যাজিটেশন (Constitutional agitation) বা পরদেশীর মর্জ্জি-মত রচিত নিয়ম-বিধির নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে থেকে যে আন্দোলন, সেই হ'ল গিয়ে তাঁদের অবলম্বন। এই কনষ্টিটিউশন্যাল্ য়্যাজিটেশনে বা

'বিধি-বন্ধ আন্দোলনে তাঁদের যে অচল বিশ্বাস, তারই বলে পলিটিক্সের অচল ডিঙিয়ে যেতে চান অবাধে অবোধ পঙ্গু-পলিটিশিয়ান্।

আমাদের দেশের এই শ্রেণীর পঙ্গু-পলিটিশিয়ান্‌রা পলিটিক্স্ বল্‌তে বোঝেন—'কনষ্টিটিউশন্যাল্ য়্যাজিটেশন্' প্রভৃত নির্দ্দোষ গোলযোগে গলাযোগ; আর বোঝেন, ফিকির-ফন্দী কিংবা সন্ধি; নইলে পরকীয় আইনের আবর্ত্তের মধ্যে থেকে ফুরসুতের ফাঁকে-ফুকে বক্তৃতা-মঞ্চে আস্ফালন, নাচন-কুঁদন ও তর্জ্জন-গর্জ্জন; অথবা সংবাদ পত্রের স্তম্ভে লেখনী-চালন—তার মানে, সম্পাদকের কুস্তির আখড়ায় ভোঁতা কলমের কসরৎ-করণ। এঁদের পলিটিক্সের চরম্ পরিণতি প্রভু-জাতির শ্রীচরণ-কমল-সমীপে করুণ-কোমল আবেদন নিবেদন, কিংবা খুব জোর কালাপানির ও-পারে ডেপুটেশন প্রেরণে। এই বিচিত্র পলিটিক্সের সাধনায় তাঁরা 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' নীতির অনুবর্ত্তন করে' নিয়ত গা বাঁচিয়ে চল্‌তে ভোলেন না। একেবারে নেহাৎ ঠেকা হ'লে তাঁরা বেশ হুঁসিয়ার হ'য়ে খুব চড়া-গলায়, মিঠে-কড়া সুরে, কাউনসিলে গলাবাজী করে' পলিটিক্সের অনুশীলন করেন। এইভাবে শরফরাজী, কারসাজী ও গলাবাজীর ভিতর দিয়ে হরদম্ ডিগ্‌বাজী খেয়ে পলিটিক্সের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চান পঙ্গু-পলিটিশিয়ান। তাঁদের পলিটিক্সের সাধনায় সফলতা-বিফলতা নির্ভর করে' প্রভু-জাতির অনুগ্রহ-নিগ্রহের 'পরে। আকাশ যখন নির্ম্মল-নির্মেঘ থাকে, তখন পঙ্গু-পলিটিশিয়ানরা পঙ্গ-পালের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে এসে দেখতে না দেখতে রাজ-নীতিক্ষেত্র ভরে' ফেলেন—আবার তখনই সরে' পড়েন, যখন শুনতে পান "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা"য়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত পলিটিক্সের আলোচনা-প্রসঙ্গে 'কুকুর-জাতীয়' পলিটিক্স্ সম্বন্ধে যা' বল্‌ছেন, সে হচ্ছে এই—"দেখিলাম শিবু-কলুর পৌত্র দশম বর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া একবার দাঁড়াইয়া চাহিয়া ক্ষুণ্ণ মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্য পাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া গিয়াছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক একবার কলু-পুত্রের অন্নপরিপুরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম, দেখিলাম এই ত পলিটিক্স্—এই কুক্কুর ত পলিটিস্তন। তখন মনোভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর প্যাকা পলিটিকেল্ চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলু-পুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক—কুক্কুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে আঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখ পানে চাহিয়া, হ্যা হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলু-পুত্রের দয়া হইল; তাহার পলিটিকেল্ এজিটেসন সফল হইল; কলুপুত্র একখানি মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন ও হজম করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টক সম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিস্তনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া পলিটিস্তন আবার বালকের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপন মনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোররবে অন্ন ভোজন করিতেছে—কুক্কুর পানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটি bold move অবলম্বন করিল। জাত পলিটিস্তন, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন; আর একবার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় বলিতেছিলেন, "হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই।" তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—একমুষ্টি ভাত কুক্কুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দন-কাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেল উল্‌সী বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন, কুক্কুর সেই সুখে অন্ন অন্ন মুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে দেখিয়া কলুপত্নী রোষকষায়িত লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুল সংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাগরাগিণী আলাপচারি করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।"

এই 'কুকুর পলিটিস্তন'এর 'পাকা পলিটিকেল চাল'এর মধ্যে, তার 'bold move' ও 'পলিটিকেল্ এজিটেস্তন'এর ভিতর যে পলিটিক্সের পরিচয় পাওয়া গেল, তারই নাম দিয়েছেন কমলাকান্ত 'কুকুর জাতীয়' পলিটিক্স্।

তাহ'লে এখন দেখা যাক্, 'আমাদের পলিটিক্স্' কি। আমাদের যখন রাষ্ট্র নাই, 'নেশন' হিসাবে কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তখন স্বাধীন জাতির পলিটিক্সে সত্যই আমরা অনধিকারী। স্বরাষ্ট্র-বিহীন স্বাতন্ত্র্য-বর্জ্জিত দাস-জাতি আমরা—ইউরোপীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের পলিটিক্সে আমাদের এখন কোনো প্রয়োজন নাই; কিন্তু তা বলে' পঙ্গু-পলিটিশিয়ানের মেকী পলিটিক্সকে—কমলাকান্তের কুকুর জাতি পাথের-রূপে গ্রহণ করে' কখনো স্বাধীনতার তীর্থে যাত্রা করতে পারে না। পঙ্গু-পলিটিশিয়ানের ভাঙ্গা ডিঙি-নাওতে চড়ে' পরপারে

স্বাধীনতার দেবলোকে পাড়ি দিলে, ঝড়-বাদলে ক্ষুদ্র-সিন্ধুর অতল জলে ডুবে' মর্‌তে হবে যাত্রীকে। স্বাধীনতা-প্রয়াসী, মুক্তিকামী আমরা—স্বদেশের স্বাধীনতা, স্বদেশবাসীর মুক্তি 'আমাদের পলিটিক্‌স্'। বন্দিনী জন্মভূমির বন্ধন মোচন করে' স্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, পরাধীন জাতিকে দাসত্বের নরক থেকে উদ্ধার করে' স্বাধীন জাতির সৃষ্টি—'আমাদের পলিটিক্‌স্'। রাজনৈতিক যাদুকরের ভোজবাজী কিংবা 'প্রফেসন্যাল পলিটিশিয়ানের' ফাঁকিবাজী আমাদের পলিটিক্‌স্ নয়। 'আমাদের পলিটিক্‌স্' পলিসি নয়—একটা জীবন্ত ধর্ম্ম, একটা নিছক সত্য। 'আমাদের পলিটিক্‌সের' গতি কুটিল ও বক্র নয়—সরল ও ঋজু, 'আমাদের পলিটিক্‌সের' পথ সংকীর্ণ নয়—প্রশস্ত।

বহির্মুখ জাতিকে অন্তর্মুখীন করা, পরমুখাপেক্ষী স্বদেশবাসীকে অশনে-বশনে শিক্ষায়-দীক্ষায়, চিন্তায় ও কার্য্যে সর্ববিষয়ে আত্ম-নির্ভরশীল করে' তোলা, কৃষক, শ্রমজীবী, শিল্পী প্রভৃতি দেশের masses বা সাধারণ জনকে সঙ্ঘবদ্ধ করে' জাতীয় সংহতি-শক্তির বিকাশ সাধন—এই সমুদয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই অনুশীলন কর্‌তে হবে 'আমাদের পলিটিক্‌সের'। স্বদেশের লুপ্ত শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার করে' স্বার্থপর বিদেশী বণিকের লোলুপ গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা, নিরন্ন-বস্ত্রহীন স্বদেশীয় নর-নারীর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, অশিক্ষিত ও নিরক্ষরকে শিক্ষাদান, দীন-দরিদ্র, পতিত-কাঙাল, অনাথ-আতুরের সেবা, আভিজাত্যের মিথ্যা বৈষম্য দূর করে' সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা, কুসংস্কারের কুহক-জাল ছিন্ন করে' নারী-জাতির স্বাতন্ত্র্য স্থাপন—এই হ'ল 'আমাদের পলিটিক্‌স্' সাধনার অঙ্গ। দেশাত্মবোধের উদ্বোধন, আত্ম-শক্তির স্ফুরণ, সঙ্কুচিত আত্মার সম্প্রসারণ—সে মহা-সাধনার পন্থা। 'আমাদের পলিটিক্‌সের সাধন-ক্ষেত্র—ভারতের শক্তি-পীঠ ও শক্তি-নিকেতন পল্লীভূমি। 'আমাদের পলিটিক্‌সের' সাধনায় সাধক তাঁরাই—যাঁরা নির্ভীকভাবে সত্য প্রচার করে' মনুষ্যত্বের আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখ্‌বেন; নিঃস্ব হয়ে নিঃশেষে মায়ের পায়ে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেবেন, মাতৃসেবায় দুঃখ-বিপদকে প্রসন্ন-চিত্তে বরণ ক'রে নিতে কুণ্ঠিত হবেন না, আর যাঁরা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান ও আত্ম-ত্যাগের মধ্য দিয়ে সার্থক করে' তুল্‌বেন স্বাধীনতার এই সত্য ও সনাতন সাধনাকে।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়।

---

# অনাচার

"গেরস্তর খোকা হোক্!"

বকুল-বিজনে সপ্তম স্বরের কুহক-মন্ত্র কুহরিয়ে তুলে পাখীটা ডাকলো,—আর ম'ণমালা চকিতে চম্‌কে উঠে মনে মনে পাখীকে শাসন করে বল্‌লে, "ফের্ পোড়ারমুখো! আরে অবুঝ, তোর তরুণ প্রাণের সবুজ গান এ-বাড়ীতে গাইবার নয়!"

মণি বিধবা।

ধুবড়ো মেয়ে ধাড়ি বউ হয়ে ঘরে ঢুক্‌লে সংসারের শ্রী থাকে না। অত বড় মেয়ে আইবুড়ো রাখ্‌লে তারা চায় ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে—গৌরী-দানের মত পুণ্য আর দুনিয়ায় নেই—স্মৃতিরত্ন মশায় এই সব ভাল ভাল হেতুবাদ দেখিয়ে বাচস্পতি খুড়োকে খাঁটী খাঁটী ধর্ম্ম-কর্ম্ম বোঝালেন। গাঁয়ের যে কটী মাথা, মানে সাবেকী বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্য—নধর ভুঁড়ি, টেকো মাথায় লাল সালু কাপড়ের মালার থলে, ফোক্‌লা গালের ওপর টোল খাইয়ে কুঁচ্‌কে তোলা মুচকি হাসি ইত্যাদির দল তাঁরা এসে স্মৃতিরত্নের কথায় সায় দিলেন। বাচস্পতি খুড়ো নির্ব্বিঘ্নে কন্যাদায় হতে নিষ্কৃতি লাভ করে বাড়ী ফির্‌লে গাঁয়ের নিষ্কর্ম্মার ধাড়ি নিরেট মূর্খ নিধে ওরফে নিধুরাম এসে স্মৃতিরত্নকে বল্‌লে, "ছোট খুড়ো, এই যে বাচস্পতি মশাই—"

স্মৃতিরত্ন হেসে বল্লেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, বাচস্পতি খুড়ো একটা মানুষের মত মানুষ—অষ্টমবর্ষে গৌরীদান করতে জমিদারদের মতামতও গ্রাহ্য কর্‌লেন না—সাত্ত্বিক লোক,—ধার্ম্মিক লোক—"

তার চার বছর পরে নিধি গিয়ে একদিন মণিমালাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে এল। অবুঝ মেয়ে আট বছরেরটী,—পুতুল খেলারই খেয়ালে যেন শাঁখা-সাড়ী প'রে কাদের অচেনা বাড়ীতে বউ পাতিয়ে খেলতে গিয়েছিল! সেদিন তার চোখে জলের ধারা বারণ মানে নি, মায়ের বুকের ভেতর মাথা গুঁজে শুয়ে যে আর ঘুমোতে পাবে না এই ভেবে! আর আজও তার ছাতি ফেটে কাঁদন ফুঁপিয়ে বেরিয়ে এল—তার নিজের কপালের ভাঙাটা ব্যথা করে উঠ্‌ছিল বলে নয়, মায়ের ডাকছাড়া কান্নার আকুলি-বিকুলি আক্ষেপে

সেদিনও মণিমালার আশার নেশায় ভুলে আপনহারা হয়ে যাবার বুদ্ধি ছিল না—আজও বুঝে দেখ্‌বার মত এতখানি অভিজ্ঞতা তার হয় নি যে সে টের পাবে, কি অভিশম্পাতে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড জ্বলে উঠে যা-কিছু তার আশা, আনন্দ, সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে!—যৌবনের নবীন দিনে হরিৎ হাসির দোলে চম্‌কে-ওঠা তরুণী ধমনী তার অন্তরে-বাহিরে একা-জীবনে অসহনীয় উপদ্রবের মত শুধু একটা বিয়োগান্ত বেদনার পশরা ভারী করে আন্‌বে! কে এসে বালিকার সিঁথির ওপর থেকে সিঁদুরের সরু ফালি দাগটা মুছে দিয়ে টুক্ করে সাড়ীখানি খসিয়ে নিয়ে থান কাপড় একখানা পরিয়ে দিয়েছিল—সেও—কি-একটা অঘটন ঘটে গিয়েছে, আমায় এই-ই কর্‌তে হবে এখন,—এই কথা মনে করে তাতে আপত্তি তোলেনি। শুধু মোটা কথা এইটুকু বুঝে ছিল যে সে বিধবা। কিন্তু তাতে কতখানি ক্ষতি, তা বোঝবার মত তার অনুভব ছিল কই? ঠাকুমাও তো বিধবা—তাতে কি হয়েছে!

আরো চারটে বছর এমনি করেই তার কেটে গেল। কিন্তু কি হয়েছে, তার উত্তরটা এখন ওই পাখীর ডাকে তার প্রাণে বড় রূঢ় হয়ে লাগে!

এইবার যে তার বয়সের বাণ জোয়ার ডেকে দেহ ছাপিয়ে এসেছে। সমাজের মাথার 'দিব্যি' কি আর স্বভাবের নিয়মকে হেঁট করে দিয়ে—তার নব বসন্তের অঞ্জলি-ভরা দান তরুণীকে বঞ্চিত ক'রে কেড়ে নিতে পারে? মণিমালার মনের বনে ফাগুন মাসের রেণুতে-বোনা রঙিন্ ওড়্‌না চপল হাওয়ায় উড়ে উঠ্‌লো। কিন্তু নিখিল আজ তার কাছে কেবল ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি! সমাজ নিয়মের ইন্ধন এনে প্রচুর জুগিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু পুড়ে তা ভস্ম হয়ে যাচ্ছে কই? সকল ধৈর্য্যের বাঁধন টুটে যে প্রাণের প্রার্থনা চাওয়ার মৌন ক্রন্দন কেঁদে ওঠে, সে মানা শোনে না, মিনতি মানে না, শুধু চায় আর চায়!

"বয়স বাড়ল" আর তার বুকের কালোটার ওপর এক অপরিস্ফুট রক্ত-কুমুদের আভাস-অরুণ মণিমালার মুখে-চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌লো। চৌধুরী বাড়ীর বড় বউদির সন্ধানী চোখের সতর্ক দৃষ্টিকে মণির এ গোপন কথা এড়িয়ে যেতে পারলে না। তিনি বাচস্পতি মশাইকে বলে তাঁর বাইরের আটচালায় একটী মেয়ে-ইস্কুলের পত্তন করলেন, ভাবলেন, এই রকমের এটা-ওটা নিয়ে তবু যদি বেচারী তার এই অভাব ভুলে যেতে পারে! নিধে কাট-ফাটা রোদ্দুর মাথায় করে মাঠের ওপরে ছুতোর-বাড়ী ঘুরে-ঘেরে বেঞ্চি, চেয়ার, টেবিল, টুল সব জোটালে, বাড়ী বাড়ী ঘুরে মেয়ে খুঁজে আন্‌লে। বৌদি সব খরচ দিলেন। মণিমালা হল সে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। স্মৃতিরত্ন মশাই কথাটা শুনে একবার একটু হেসে পরের বার কাশলেন, তারপর ছোট করে বল্‌লেন, এ অনাচার! বড় জোরে কথাটা ফুটলো না—কারণ বড় বৌদি একঘণ্টা করে এসে মেয়েদের সেলাই শেখাতেন। তবু ঐ ছোট কথাটীও বড়বাবুর কানে গিয়ে পৌঁছুলো, তিনি স্মৃতিরত্নকে ডেকে বল্‌লেন,—খবরদার স্মৃতিরত্ন, তুমি যদি এই ইস্কুলের কথায় লাগ্‌তে আস, গাঁয়ে ডাং পিটিয়ে বেড়াও তো তোমার ছেলের পড়ার খরচ বন্ধ হয়ে যাবে, আর যে-টাকা আমি এতদিন দিয়েছি, ভিটে-মাটী উচ্ছন্ন করে তা আদায় করে নেব।

স্মৃতিরত্ন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে হাত কচলিয়ে নিতান্ত বিনীত হয়ে বল্‌লেন,—আরে রাধামাধব, বাবুর মতের ওপর আবার কথা! বাবু যা ভাল বুঝেছেন, সেই তো শাস্ত্র। বাবুর ইচ্ছে শাস্ত্রই। ইচ্ছেময়ী তারা মা।

মণির জীবনের ছেঁড়া পাতাখানার পাশে নতুন এক দিস্তে কাগজের তালি দিয়ে ছেঁড়াটা আট্‌কে নেবার চেষ্টা হল বটে কিন্তু রঙটা সে জোড়ার মুখেও নীলের ওপর নীলেরই ছোপ নিয়ে গাঢ় হয়ে ফুট্‌তে লাগ্‌লো।

এর মধ্যে রুড়কী থেকে ইঞ্জিনিয়ারীং পরীক্ষা দিয়ে সুশীল বাড়ী এল। টাই, বুট, হাট-কোট পরা পুরোদস্তুর সাহেব—তাকে দেখে তো স্মৃতিরত্নের আপাদমস্তক ভূমি-কম্পের মুখে উঁচু বাড়ীর গম্বুজের মত কেঁপে উঠে খড়ের গাদাতে বেধে আগুন-জ্বালার মত জ্বলে গেল। ছিঃ করে তার ভিখারী

অনাচার! টিকি কেটে পোষাক পরে তুই সাহেব হয়েছিস্ সুশীল?

সুশীল মাথা নীচু করে বল্‌লে,—সেখানকার এই দস্তুর বাবা।

—অ্যাঁ, এই করতে তোকে সেখানে পড়তে পাঠিয়ে ছিলাম? সাহেবীআনার অনাচার শেষে আমারি ঘাড়ে এসে চেপে বসলো! ইচ্ছেময়ী তারা মা।

সুশীল আর কিছু জবাব দিলে না।

নিধে এসে বল্‌লে,—মণিমালা বিধবা হয়েছে। সুশীল আজ প্রথম এ কথা শুন্‌লো। মণি বিধবা! ফুলের মত মুখখানি ছিল—আট বছরের কচি মেয়ে! সেদিন যে তার বিয়ে হল, সুশীলের বি-এ পাশ করার বার। সেই মণি বিধবা! কি করে কাটবে এই দীর্ঘ-পথের একা জীবন-যাত্রাটা তার! হতভাগিনী! সুশীল একটা নিশ্বাস ফেল্‌লে।

ওদিকে মণিমালা আপন-প্রাণের বালাই নিয়ে বেচারী মরতে পার্‌লে বাঁচে, তার ওপর আবার স্মৃতিরত্নের জ্বালা! আজ কোন্ ভীম একাদশীর নির্জ্জলা উপবাস, কাল কোন্ বিষুব সংক্রান্তি, এ মঙ্গলবার ও রবিবার,—না কর্‌লে পাপ হয়। কি আর কর্‌বে, সবই তারার ইচ্ছে—ইচ্ছেময়ী তারা মা!—ইত্যাদি।

শুনে মণিমালা কিছু বলে না; নিধে শুধু প্রতিবাদ করে' চেঁচিয়ে ওঠে, কাঁচা মেয়ে, কচি বিধবা—ওর অত সব কর্‌তে হবে না।

স্মৃতিরত্ন বলেন,—আরে মূর্খ—এ যে ঋষিদের বিধান, স্মৃতির ব্যবস্থা—এ সব পালন না করে কি ঐ ছাই-পাঁশ সব পড়াগুলো কর্‌তে হবে? মেয়েদের কেতাবী শিক্ষা? কি অনাচার, কি অনাচার!

নিধে বলে,—ইচ্ছেময়ী তারা মা!

স্মৃতিরত্ন চটে গিয়ে বলেন,—শাস্ত্র-বিধান নিয়ে ঠাট্টা?

নিধে উত্তর দেয়,—বাজে শাস্ত্র! যে শাস্ত্রের আইনে আমার মত মূর্খকেও বামুন বলে মেনে নেবার বিধান দিতে পারে, সে অশাস্ত্র—আপনি সেই অশাস্ত্রে পণ্ডিত! —আর বলবেন না।

—গর কর্‌তে কর্‌তে চলে যান। এম্‌নি একদিন স্মৃতিরত্ন নিধির মুখের ওপর অজস্র গালি বর্ষণ করে চলে গেলে মণিমালা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লে,—আমার জন্যে তোমায় এমন অপমান সইতে হয় নিধি—কেন দরকার কি?

—তা দিয়ে তোর কাজ কি পোড়ারমুখী! বাঁচ্‌বি কি করে? বলে নিধে বেরিয়ে গেলে—মণিমালার দু'চোখ ভাসিয়ে জলের বন্যা নেমে এল। সে অনেকক্ষণ বসে বসে কেঁদে কলসীটী কাঁখে তুলে নিয়ে পদ্ম-পুকুরের দিকে চলে গেল। নাইতে হবে—বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল।

পদ্মপুকুরের শাণ-বাঁধা ঘাটের ধারে একটা ছোট ঝোপের কাছে বসে সুশীল মাছ ধরছিল। বঁড়শীর ডোরে বাঁধা শোলার ফাৎনাটীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বসেছিল—কে আস্‌ছে, যাচ্ছে, তা দেখ্‌বার তার মোটেই ফুরসৎ ছিল না। হঠাৎ একটা কি মাছ এসে বঁড়শীর 'আহারে' ঠোক্ দিতেই চট করে সুশীল ছিপে খোঁচ্ দিলে কিন্তু বঁড়শীতে মাছ না গেঁথে টানের জোরে তা উঠে এসে কার কাপড়ের সঙ্গে আট্‌কে গেল। মণিমালা তখন সিঁড়ির পাশ বেয়ে নাম্‌ছিল। মণিমালা হঠাৎ চম্‌কে একটা শব্দ করে উঠ্‌তেই সুশীল তাকিয়ে দেখ্‌লে, মণিরই কাপড়ে বঁড়শী বিঁধেছে। সে একটু হেসে দাঁড়া দাঁড়া মণি, আমি খুলে নিচ্ছি—বলতেই মণির ঠোঁটের ওপর একবার মোটে হাসির সরু একটী রেখা ফুটে উঠে পরক্ষণেই মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সুশীল ছিপ ফেলে উঠে এল। মণির হাত বেড়ে হাতখানা পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে আর-একহাতে বঁড়শীটা টেনে খোল্‌বার সময় আঁচলের পাশটা সরে বুকের কাছটা একটু উদ্‌লো হয়ে গেল। মণিমালার শরীর চকিতে লহমায় একবার ঝিম ঝিম করে উঠল। সুশীল দেখ্‌লে, যৌবন তার দেহে বিদ্রোহী হয়ে জেগে উঠেছে! মোটা কাপড়ের কড়া শাসনকে উপেক্ষা করে সে দুর্নিবার হয়ে উঠ্‌তে চায়!

কিছু না বলে মণি আস্তে আস্তে ঘাটে নেমে গেল। মণি স্নান কর্‌বে বলে সুশীল আর মাছ ধর্‌তে বস্‌লো না—ছিপ তুলে নিয়ে চলে এল।

জলের ভেতর দুইপায়ের পাতা ডুবিয়ে সিঁড়ির ওপর বসে বসে মণি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। সুশীলের হাতের সে তড়িৎ স্পর্শ তার সারা দেহে কি বিদ্যুতের স্পন্দন যে জাগিয়ে তুলেছিল! কি সে স্পর্শ! কিন্তু আমার কি! এইবার সুশীল পাশ করে বড় চাকরী করে মস্ত লোক হবে; বিয়ে করে চাঁদপানা বউ ঘরে আন্‌বে। সুন্দরী-তার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে তরুণের মনের পাতার কত কাব্যেরই মধু-ছন্দ কুসুমের বুক-ফাটা রঙে, অশোক কুঁড়ির ঘোমটা-খোলা ঠোঁটের টাট্‌কা লালে লিখে উঠবে, আর আকুল দুজনের প্রাণের তৃপ্তি পলাশ হয়ে ফুটবে বিনিদ্র রাতের নিশীথ-প্রহরে, বিজন ঘরের গোপন মিলনের লগ্নে কোন্‌খানে? কিসের ওপর?…থাক সে কথা!

স্নান সেরে মণিমালা বাড়ী ফিরে এল। সুশীলের ঘর-কন্নার কল্পনার ছবি তার মনের পাতার ওপর রূপ-যৌবন নিয়ে শোভায় শোণিমায় রেখা এঁকে চললো। সুশীলের প্রিয়তমার জীবনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তার বয়স ও বাসনা সব সুন্দর সম্পূর্ণ সার্থক করে আকাঙ্ক্ষা-কামনার সফলতায় একটা অনন্ত বরেণ্য দানে তাকে গৌরবান্বিত করে তুলবে —ভাবতেই মণিমালার বুকের ভেতর আকুল ব্যর্থতার প্রতিধ্বনিতে একটা হায়-হায় চীৎকার উঠলো। হায়রে, আমার জন্যে সমাজের এই বিধান—এরই বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য সারা জীবন আমায় যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু পারিনে, আর যে পারিনে! এ যে কি অনুভবের বাণ এসে আমার মর্ম্মের ভেতর ব্যথা হয়ে বিঁধেছে—অনবরত বিঁধছে, তাকে এড়িয়ে নেবার বল যে আমার এই অপরিতৃপ্ত তরুণ বয়সের কাঁচা হৃদয়ের মধ্যে নেই গো!

সেদিন তার আবার নতুন করে মনে পড়লো—সুশীল ছিল তার খেলার সাথী। কত দিন খেলাঘরের ঘর-কন্নায় গিন্নি হয়ে সে সুশীলের সঙ্গে বউ-বউ খেলেছে অথচ স্মৃতিরত্ন মশাই জেনে শুনেও তাকে ভিনগাঁয়ের অচিন আঙিনায় অপরিচিতের মাঝখানে বউ সাজিয়ে পাঠিয়েছিলেন। বাবার তো তেমন মত ছিল না—স্মৃতিরত্ন মশাই-ই তো জেদ করে তাঁকে ধরে পড়েছিলেন।

আজ সুশীল একটা লোকের মত লোক। কিন্তু সে-ই কি সুশীলের অযোগ্য! এ গায়ের রঙ তো সে দিনও এমনি ফর্‌সাই ছিল। চোখ দুটী? না, তা এত বড়, এমন চাউনির ছলা-কলায় এতখানি চপল ছিল না, কিন্তু কালো তো ছিল! সে কালোর আড়ালে ভবিষ্যতের তার এ মনোমোহন আভাসও তো লুকিয়ে ছিল,—এ দেহ মরুক গে ছাই!

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা বড় বৌদি এসে বলে গেলেন, সুশীলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে, তার পরদিন বিকেল থেকে সুশীল রোজ এসে তাকে ইংরিজী পড়াবে—আর প্রাথমিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কিছু কিছু পড়াবে।

মণি ভাব্‌লো, কিন্তু—

কিন্তু বড় দেরীতে সময় কাটবে—অবসর ছেড়ে দিয়ে সুশীল আজ আস্‌ছে—এত কাছাকাছি। শুধু ব্যর্থতা! এত বড় একটা অতৃপ্তির মাঝখানে একটা অপরূপ তৃপ্তির আভাস টেনে এনে বিফলতার ব্যর্থতাকে আরো বড় করে তোলা! অপূর্ণতাকে বরণ করা—পরিপূর্ণতার শ্রাবণ-সায়রের মাঝখানে ডুব দিয়ে! পাওয়াটাকে মুঠোর ভেতর নিয়ে বুঝে দেখা—তার কাছে অ-পাওয়া কি বেদনার, কত ছোট! শুধু হাহাকার! তবু আসুক—আসুক সে!

সুশীল এল মণিমালাকে পড়াতে।

স্মৃতিরত্ন বল্লেন,—কাজটা অনাচার! না, না, চৌধুরী বাড়ীর বড় বউমার ইচ্ছে! ইচ্ছেময়ী তারা মা!

নিধি বল্‌লে,—তাই ত।

আর মণিমালা বল্‌লে,—এস।

একরাশ কথা অনেকগুলো পাতা মণিমালা পড়লো! সুশীলের পাশে তার কোলের কাছে বসে বসে সে লিখলো। সুশীল সরল মনে, সহজে, স্বচ্ছন্দে মণিমালাকে পড়িয়ে যায়, মণিমালার কিন্তু অন্তরের বীণার তারে কার আঙুলের গোপন স্পর্শ অজানিতে লেগে মোহের জালে বুনিয়ে তোলা একখানা রঙীন সুর কোমল হয়ে বেজে ওঠে! সুশীলের চোখের পানে তাকিয়ে দুজনে চোখোচোখি হয় যখন, মণিমালার গলায় ভেতর তখন কথা যেন কি আঘাতে বেধে যায়! সে সুশীলের কাছে পড়া-শুনা করে তার ভিখারী

প্রাণের জন্য কি যেন অপূর্ব্ব দান পেতে এসেছিল, কিন্তু পেলে যতখানি, হারিয়ে গেল যে তার চেয়ে ঢের বেশী! কৈশোর-পারের কাঁচা কাঞ্চন দেহের তটে বাঁশী বাজিয়ে মনের বনে দু-কুল-হারা প্রেম-অভিসারের গোপন যাত্রার বাণীও শুনিয়ে গেল। গমন-পথের নদী-তীরে সুশীলই বুঝি আজ তার সে-পারের খেয়ার তরুণ নেয়ে!

সুশীল তাকে পড়ায় যত, সে মুখের পানে তাকিয়ে দেখে তত, বারে-বারে। সুশীলের হাসি বুঝি কোনো কল্প-লোকের লীলা-ঝরণার বারি ঝর-ঝর। সুশীলের কথা বুঝি কোনো অমৃত-গাঙের কলোচ্ছ্বাস, সুশীলের অতর্কিত স্পর্শ বুঝি স্বর্গ-নটীর চরণ-ভঙ্গে পুলক-চপল লাস্য-লীলার বিদ্যুৎ-গতি! হৃৎপিণ্ডের ওপর সে স্পর্শ-শিহরণ বিচিত্র স্বপ্নের সাত-রঙা স্মৃতির মতন একটা অপূর্ব্ব মধুরিমায় একখানা অপরূপ গানের সুরে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় স্পন্দিত হয়ে ওঠে, হারিয়ে ফেলে, আপনাকে ভুলে যায় একেবারে! তার সকল চিন্তা সকল কাজের ওপর জেগে থাকে পড়ার কথা—মনে পড়ে, সুশীল আসবে, আজও আবার! সুশীল আসে। মণিমালা বলে,—এস!

ওগো অন্তরতম, ওগো সুন্দর আমার, এস! আমার লুকোনো বুকের গোপন আঙিনায় নিতি নিতি তুমি এস! আমার মনের মন্দির-দ্বারে, কত আরাধনার দেবতা তুমি, আজ এস! এস গো আমার গভীর রাতের বিজন-ঘরে সখা আমার, এস! আমার অরুণ আলোর লহর ধরে কিরণ-ধন তুমি এস! আমার শ্যামলা ধরণীর মধুরিমা হয়ে এস, আমার ফাগুন মাসের ফুলগন্ধ হয়ে এস; আমার সংসারের শত কোলাহল হয়ে এস; সুখ হয়ে এস, অশ্রু হয়ে এস; রক্ত হয়ে এস, সবুজ হয়ে এস। নিখিল ধ্বনির মধ্যে মধুর হয়ে বাজুক শুধু তোমার পায়ের ধ্বনি—আর অখিল আমার চোখে মুছে গিয়ে শুধু তুমি হয়ে থাকো সারা বিশ্বময়!—আমার অসীম আত্মার নীল আকাশে তুমি এস গো আমার অনন্ত, অপরিসীম অনন্ত-অনাগত দিন-রজনীর জন্য লীলায়িত তোমার হিয়ার মধ্যে অগাধ ভালবাসা দিয়ে আমায় ঢেকে নাও—নাও, ওগো নাও! হে প্রিয়তম, এস, তুমি এস!

সুশীল কিন্তু অমন করে চাওয়া তার প্রাণের এ মৌন নিবেদনের কথা কিছুই জানতো না, সে পড়িয়েই যেত আপনার মনে।

কিন্তু তারও মনে কি আর ঐ দুটী চঞ্চল-তার চক্ষুর আবেশ-ভরা দৃষ্টি, গুচ্ছ আলোকের এলোবাশে হাওয়ায় দোদুল হিন্দোলা, নিটোল তনুর তনিমায় প্রগল্‌ভ যৌবনের ভঙ্গিম রঙ্গ, সুডৌল দুটী বাহুর পাশ দিয়ে রূপ-কথার ছন্দে-ছন্দে দোল দুলে ওঠা—মাণিক টুক্‌রো করা রূপের স্বপ্ন, এ-সব চুপি চুপি এসে ব্যাকুল হয়ে গোপন স্পর্শ দিয়ে মর্ম্মের ভেতর থেকে প্রাণ তার চুরি করে নিয়ে পালায় না! তা পালায়। নিঝুম রাতে আকাশের বুক-ছেঁচা ব্যথা বাদল-ধারে যখন ঝরে পড়ে—সুশীল তখন শুয়ে শুয়ে ভাবে, এই মেঘলা নিশির দুই প্রহরে একলা মেয়ে—তার প্রাণের আঘাতের দুঃখ-বেদন কাঁদন হয়ে ঐ জলের ঝরঝরের মতই বুঝি মণিমালার দু-গাল বেয়ে পড়ছে। যদি কিছু উপায় থাক্‌তো, সে ছুটে গিয়ে তাকে শঙ্কা-বিহীন তার বুকের বাঁধনের ভেতর বন্দী করে জড়িয়ে এনে কানে কানে তার কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুলের কথা—সোনার খাটে ঘুমন্ত রাজকুমারীর মুখের ওপর কোন্ অজানিত দেশের রাজপুত্র তার মরমী বন্ধুর ব্যাকুল চুম্বনের চিহ্ন-স্বপ্নে ফুটে উঠে রাজকুমারী চমকে জেগে উঠলে চোখে ঘুমের ঘোর নিয়েও দেখলে তার সম্মুখে ব্যাকুল ভিক্ষার নিবেদন নিয়ে দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্নের রাজপুত্র—এই সব গল্প শুনিয়ে মণিমালার জীবন-রাজ্যে কল্পলোকের মোহন রূপ-কাঠিটীর সোনা ছুঁইয়ে স্বপ্ন দিয়ে সার্থকতা দিয়ে চিরন্তন-সুখের বিচিত্র ছবি একখানা এঁকে তুল্‌তো! সুশীলেরও বুঝি মনের মালঞ্চে মাতাল হাওয়া পাগল হয়ে এসে ফুলের দলগুলিকে সব ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু প্রাণ হারিয়ে যাবার সত্য কথা মুখ ফুটে সে স্পষ্ট করে বল্‌বার সাহস পায়নি।

এমনি করে কদিন গেলে একদিন সন্ধ্যার প্রদীপগুলি জ্বেলে দিয়ে মণিমালা এসে পড়তে বস্‌লো। আকাশ ছেয়ে সেদিন মেঘ করে এসেছে। কালো মেয়ে কে যেন আজ আকুল কেশের রাশ উড়িয়ে ধরে নীল রেশমের সাড়ীখানি তার নগ্ন আকাশের অঙ্গ ঢেকে বিছিয়ে দিয়ে নিজের

বসন-বিহীন লজ্জায় মরে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে,—রুদ্ধ তার নিশ্বাস—তাই নীচে ধরণীর বুকে তরুগুলি স্থির। সুশীল এসে পড়াতে বস্‌লো মণিমালা বল্লে,—বড্ড মেঘ করেছে।

সুশীল বল্লে, মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে।

—উঠবে? উঠুক, উঠুক ঝড়। বলে মণিমালা মুখখানা ফিরিয়ে নিলে। তার চিত্তের মধ্যেও বুঝি একটা ভীষণ ঘূর্ণি ঘন ঝঞ্চা চেপে ফোঁপাচ্ছিল।

ঝড় এল—কানন-বীথি কাঁপিয়ে, বেণু-বনের বুকে বুকে আঘাত দিয়ে, বিপ্লবের দিনে বিদ্রোহী জনতার মত উচ্ছৃঙ্খল কোলাহল তুলে, গাছের মাথায় মাথায় ধ্বংসের করাল-কর হেনে, মৃত্যুর পাণ্ডুর মুখের বিভীষিকা দিকে দিকে বীভৎস করে তুলে। নির্ম্মমের মত শক্তির মত্ততায় ঝড় নাচতে লাগলো,—পাগল! তাকে ধরে থামিয়ে রাখা যায় না! ঘন মেঘের বাদল-ধারা উন্মাদ বাতাসের কল-শব্দের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে একটা কি যেন মর্ম্ম-ফাটা ব্যথায় দাপাদাপি কর্‌তে লাগলো স্থির প্রকৃতির শান্ত বুকের ওপর—প্রলয়ের তাণ্ডব-লীলায়!

ঘরের আলোটা দমকা বাতাসের প্রথম নিশ্বাসেই নিবে গেছে। এতক্ষণে একবার চপলা-লতা চকিতে চমকে উঠে জানলার ফাঁক দিয়ে রেখা ফেলে এসে মণিমালার মুখের ওপর শঙ্কা হয়ে ফুটে উঠলো। আকাশের অন্তর ফালি-ফালি করেই বুঝি বিদ্যুৎ ঝিলিক্ মেরে উঠছিল প্রকাণ্ড, অসীম, অনন্ত সে! বিপুল হৃদয়-বেদনায় বজ্র-গর্জ্জন আর্ত্তধ্বনি করে উঠলো। একা ঘরে তরুণ-তরুণী, কাছে কেউ নেই দূরে কে আছে, কারা আছে বোঝা যায় না। মনের মাঝেও বুঝি এই মেঘলা রাতের বাঁধন-হারা মাতামাতি—তাকে আর মানিয়ে রাখা যায় না—আর পারেও না!

আবার সেই বিজলী-খেলা! মেঘ-বালিকার প্রাণ-ভরা কাতর ডাক! মণিমালা কি এক ভয়ে নিমেষের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে দুই হাত দিয়ে সুশীলকে জড়িয়ে ধরলে।

সুশীল মণির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভাঙা গলায় ডাকলে, মণি—বড় আকুল সে ডাক!...

ভয়-চকিত মণি সব ভুলে সুশীলের গালের উপর মুখ রাখলে মুহূর্ত্তের জন্য। তার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল—হঠাৎ তীব্র ঝট্‌কায় বাহুর বাঁধন ছিঁড়ে সে সরে দাঁড়াল, বললে,—না, না, গোপন যা, তা লুকোনো থাক! মরণে আমার তরুণ বন্ধু, জীবনে তোমাকে পাব না—পেতে পারিনে! পেতে দেবে না—তুমি নিলেও তেমন করে নিতে পাবে না। তাই এ পুণ্য, সত্য, সুন্দর, মধুর—তোমার আর আমার অন্তরের ব্যগ্র উপহার পুণ্যই হয়ে থাক্ লোকের চোখে, সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিচারের কাছে এসে অনাচার পাপ বলে ধরে দেবার দরকার নেই।...যাও তুমি, আর দেখা পাবে না আমার।

বলে মণিমালা ছুটে বেরিয়ে গেল। ঝড় তখনো গর্জ্জে গর্জ্জে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে।

পরদিনই সুশীল চাকরী কর্‌তে কোন্ বিদেশে বেরিয়ে চলে গেল।

—অতদূরে চল্‌লি চাকরি করতে? ইচ্ছেময়ী তারা মা—বলে স্মৃতিরত্ন সুশীলকে বিদায় দিয়ে সেখান থেকে বাড়ী ফির্‌লেন—নিজের দু'চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল দুটী মুক্তোর মত টল্-টল্ করে এল। স্মৃতিরত্ন মরণ-পর্য্যন্ত সুশীলের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রইলেন...

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

## গৃহকর্ম্মে নারী

অনেকে বলেন, পল্লীগ্রামে গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের ঘরকন্নার কাজেই যে রকম সমস্ত সময় কাটে, তাতে তাঁদের বেড়ানো লেখাপড়ার চর্চ্চা ইত্যাদি করা অসম্ভব। ইহা সম্পূর্ণ এমন কথা বলা যায় না। শিক্ষা এবং পড়াশুনা, যাওয়া ইত্যাদির সুবিধা থাকিলে তাঁহারা যথাসা... ...াহার করিতেন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য দেশে যেখানে ...সকল সুবিধা অনেক পরিমাণে আছে, সেখানে ঘরের ... করিয়াও তাঁহাদের ঐ সবই করিতে দেখা যায়। ...বাহিরে যাতায়াতের পথ খোলা থাকায় ঘরের কাজও ... অনেক পরিমাণে অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া করিতে

পারেন। যেমন বাজার করা, ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, চিঠি ডাকে দেওয়া, টেলিগ্রাম করা, ছেলেদের বেড়াইতে লইয়া যাওয়া ইত্যাদি কাজ তাঁহারা নিজেরাই করেন। ইহাতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের মুক্ত বাতাসে বেড়ানোর উপকারও তাঁহারা লাভ করিয়া থাকেন।

আর সত্যই তাঁহাদের এতটুকু সময়ও না থাকিলে বলিতে হয়, গৃহস্থালীর নিয়মই বদলানো দরকার। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে পুরুষকে অত্যন্ত অলস অবস্থাতেই থাকিতে দেখা যায়! তাঁহারা প্রধানতঃ দলাদলি, পর-নিন্দা ও তামাকের শ্রাদ্ধ লইয়াই থাকেন। সুতরাং সেখানে শ্রম-বিভাগ বড়ই অসমান দেখাইতেছে। অতএব তাহার পরিবর্ত্তনও একান্ত আবশ্যক। তাহাতে অলস হস্ত ও মনের সহিত শয়তানের সম্পর্কের যে প্রসিদ্ধি আছে পুরুষদের পক্ষে তাহা নিবারিত হয়। মেয়েরাও কতকটা মানুষের যোগ্য জীবন যাপন করিবার সুবিধা পান।

এইখানে আরও একটী কথা মনে আসিতেছে। মেয়েরা দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাদের অনেক কাজ করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু "গৃহকর্ম্ম" করিতে তাঁহাদের যে বাসন-মাজা, জল-তোলা ইত্যাদি অতি শ্রমসাধ্য ও মাছ কোটা, গোবর-লেপা, ও মল-মূত্রাদির কাজ করানো হয় তাহা কি দুর্ব্বল ও "মহিলাজনোচিত?" তার পর শারীরিক কোন ব্যায়াম করিলে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য হীন হইবে বলা হয়, কিন্তু ঐ সকল বিশেষ শ্রমসাধ্য কাজ ও দিবারাত্রি অগ্নিতাপে রন্ধন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের কতটা ক্ষতি করে, যাঁহারা তাহার সংবাদ রাখেন তাঁহারাই জানেন। বাস্তবিক ঘরকন্নার কাজ ঠিক এখনকার মত ভাবে কেবল মেয়েদের ঘাড়ে চাপাইয়া রাখা ঠিক নয়। কোন কাজই কাহারও একচেটিয়া করা বা ঘাড়ে চাপানো অন্যায়! তবুও মেয়েরাই প্রধানতঃ ঐ সকল কাজ স্বভাবতঃই করিবেন, দেখা যাইবে। সুতরাং তাহাতে প্রলয় ঘটিবারও আশঙ্কা নাই।

গৃহকর্ম্মপটুত্বের সহিত "নারীত্বে"র কোন যোগ না ইহাতে নৈপুণ্য, সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি সকলেরই থাকা স নয়। লেখাপড়া শিখুন বা না শিখুন, এখনও ... না এবং থাকিতে পারে না। কিন্তু হইলেই কি তাঁহাদের নিন্দনীয় হইতে হইবে? কাহার কেমন স্বভাব, ও কে কি-ভাবে জীবন যাপন করে, তাহা লইয়াই মানুষের বিচার; বিশেষ একটী কাজ কে কতখানি করে, তাহা লইয়া নহে। অনেক মন্দপ্রকৃতি নারীও সবিশেষ গৃহকর্ম্ম-নিপুণ হইতে পারেন।

তাহার মধ্যে আবার "গৃহকর্ম্ম" বিশেষ একটী কাজ নহে। তাহার কোন একটী বিষয়ে কাহারও নিপুণতা এবং অপরটীতে আবার তাহার অভাব থাকিতে পারে। Charlotte Bronteর গৃহকর্ম্মে অবহেলা বা "নারীত্ব"র অভাবের কথা কেহ বলিতে পারিবেন না;—তবু তিনি বলিয়াছেন, "I hate cooking"। গৃহকর্ম্ম যথেষ্ট করা সত্বেও ঐ কাজটী মাত্র তিনি ভালবাসিতেন না। তাঁহার ভগিনী Emily আবার আরও অনেক দৃঢ়প্রকৃতির হইয়াও অধিকাংশ রন্ধন করিতেন। বাস্তবিক "গৃহকর্ম্ম" সংজ্ঞায় কত বিচিত্র প্রকারের কাজ একসঙ্গে বোঝাই, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। এত রকমের কাজে পারদর্শী হওয়ার দাবী পুরুষদের কোন একটী কাজে নাই। আর সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত ইহার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়া কাজ অনেক বাড়িয়া গেলেও এখনও পুরুষেরা পত্নীদের ঠাকুরমাদের মত রন্ধনে ত্রুটি হইলেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ও হা-হুতাশ করিতে থাকেন। কিন্তু রন্ধনেও কেবলমাত্র ঠাকুরমাদের মত হইলে তাঁহাদের মন ভরিবে না নিশ্চয়।

তার পর সন্তান-পালন ত সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির স্বতন্ত্র কাজ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার গুরুত্ব এত বেশী হইলেও "গৃহকর্ম্ম"কেই (বিশেষতঃ আমাদের দেশে) সর্ব্বত্র যেন অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহাতে আপনাদের রসনাতৃপ্তি ও আরাম আছে, ইহাই কারণ কি? বাস্তবিক রন্ধন যতই ভাল জিনিষ হউক, পুরুষের ভালবাসা রসনাগ্র হইতে আর একটু গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিবার সময় আসিয়াছে। খাওয়ার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ যে শেষ উচ্চ জিনিষ নহে, ইহা মনে রাখিয়া তাহাকে অযথা ইয়া তোলা ভাল নয়। এ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ইহা ক্ত প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। মেয়েদের উহাই কাজ, এবং তাঁহাদের ভাগ্য ইহার উপরই

অনেকটা নির্ভর করে, ইহাও তাহার কারণ, সন্দেহ নাই। রন্ধনে বৈচিত্র্য এবং স্বাস্থ্যকারিতা থাকা অবশ্য উচিত, কিন্তু তাহা যে-কোন উপায়ে বা সম্মিলিত চেষ্টায় হইলেই হইল। তাহার জন্য মেয়েদের সকলকেই সব সময়ে তাহাতে লাগিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ অবশ্যবাধ্যতা দূর হইলে যাঁহাদের ঐ বিষয়ে পটুত্ব আছে, তাঁহারা তাহার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে ও অন্যকেও সুযোগ দিতে পারিবেন, এবং ঐ বিভাগে যথার্থ দক্ষতালাভে যত্ন করিবেন। ইহাতে রন্ধনবিদ্যার উন্নতি হইবে, তাহার বাজার-দরও বাড়িবে। অন্য সকল "গৃহকর্ম্ম" সম্বন্ধেই ইহা কম বেশী খাটে।

এখন সব বিষয়েই বিশেষজ্ঞের যুগ। আনাড়ী লোকের হাতে সময় ও দ্রব্যের অপচয় না হইয়া যাঁহারা যাহা করিবেন, তাঁহাদের তাহাতেই পাকা হইতে হইবে। আগে যে সকল কাজ প্রত্যেককে আপন-আপন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য করিতে হইত, সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত ক্রমেই তাহা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিশেষজ্ঞের হাতে ব্যবসায়ে পরিণত হইতেছে। তাহাতে ঐ সকল শিল্পের যেমন উন্নতি হইয়াছে, প্রত্যেককে সকল কাজ স্বতন্ত্রভাবে করিতে গেলে যে বস্তু ও সময় নষ্ট হইত, তাহাও নিবারিত হইয়া মানুষ গৃহ হইতে অবসর পাইয়া ক্রমেই নব নব ক্ষেত্রে আপনার প্রতিভা ও শক্তি নিয়োগ করিতে সক্ষম হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বস্ত্রবয়ন, তৈলঘৃতাদি প্রস্তুত এবং সকল প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই নাম করা যাইতে পারে। আগে প্রত্যেককে নিজের জন্য ঐ সকলই স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইত। গৃহকর্ম্মের মধ্যেও ক্রমেই তাহার প্রসার হইতেছে, সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা আবহমানকাল হইতে মেয়েদের অশিক্ষিতপটুত্বের উপর প্রত্যেক গৃহে স্বতন্ত্রভাবে ফেলিয়া রাখায় ইহাতে যে কত রকমের শিল্পকর্ম্ম আছে, তাহা কাহারও ভাল করিয়া চোখে পড়ে নাই, এবং ঐ সকল কাজেরও তেমন উন্নতি হইতে পারে নাই। ইহার দিকে ভালরূপে দৃষ্টি পড়িলে ইহার মধ্যকার অনেক কাজকেই স্বতন্ত্র ব্যবসায়ে পরিণত করা যাইতে পারে। তাহা হইলেই গৃহকর্ম্ম অনেক সহজ, সুন্দর ও অল্পায়াসসাধ্য হইতে পারিবে। দাস-দাসীও দিন দিন যেমন দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। এদিকে ইহাতে অনেকের অন্নসংস্থানের পথও খুলিয়া যাইবে। পাশ্চাত্য দেশে ইহার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইতেছে, গৃহকর্ম্মের শ্রমলাঘবের নানাপ্রকারের নূতন যন্ত্রও সেখানে নিত্যই আবিষ্কৃত হইতেছে। কেবল আমাদের দেশেই মেয়েদের সমস্ত সময় মান্ধাতার আমলের নিয়মে "ঘরকন্নার কাজে"ই ব্যয়িত হইবে?

অনেকে বলিবেন, বড় বড় ব্যবসায়ের দাসত্ব হইতে কুটীর-শিল্পের দিকেই এখন লোকের মন যাইতেছে; সুতরাং গৃহকর্ম্মগুলিকেও ওরূপে স্বতন্ত্র করার চেষ্টা ভাল নহে। কিন্তু কেবল "কুটীর-শিল্প" এখন কোন জাতির অভাব দূর করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতেই পারে না। তবে তাহাও থাকা ভালো; এবং অনেক বিশেষ কাজ তাহাতে ভাল হইতে পারে বলিয়াই তাহার আদরও থাকিবে। বড় বড় ব্যবসায়গুলিও এখন নূতন আদর্শে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে, দেশের উন্নতি করিতে হইলে সেদিকে মন দেওয়াও বিশেষ আবশ্যক। তার পর গৃহকর্ম্মগুলির যেরূপ বিভাগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কুটীর-শিল্পেও উৎসাহই দেওয়া হইবে।

বাস্তবিক, মেয়েদের "ঘরের কাজ" "ঘরের কাজ" বলিয়া এত যে চীৎকার হয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অর্থ-ব্যবহারের জ্ঞান থাকা যে তাঁহাদের কত প্রয়োজন, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি দেখা যায় না কেন? অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতার সহিত অর্জ্জিত অর্থের রক্ষণ এবং ব্যবসা ও বিষয়-কর্ম্ম চালাইতে যে সকল শিক্ষার প্রয়োজন, তাহাতে তাঁহাদের কি শোচনীয়রূপেই না অজ্ঞ রাখা হয়! কেহই আপনাদের সহিত অর্থ কিভাবে রক্ষিত হয় ও পাওয়া যাইতে পারে, তাহা কি উপায়ে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক হইতে পারে এবং তাহার জন্য কি করিতে হয়, বা আপন-আপন জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কিভাবে পরিচালিত ও রক্ষিত হয়, তাহার কিছুই মেয়েদের এতটুকুও শিখাইবার চেষ্টা করেন না। একটু বিপদ ঘটিলেই ইহার শোচনীয় কুফল কেমন চোখে পড়ে! বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষায়

মধ্যে অর্থব্যবহারের জ্ঞান শিক্ষনীয় বিষয়ের অন্তর্গত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার উপর প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীর বিশেষ বিশেষ ব্যবসা ও অর্থসঞ্চয়ের ব্যবস্থা মেয়েদের ভালরূপে শিখান উচিত। অর্থ থাকিলে "ঘরের কাজে"র জন্ম বিশেষ ভাবনা নাই; আর তাহার অভাবে ত "ঘরের কাজে"র অস্তিত্বই লোপ পায়। সুতরাং এত গুরুতর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহা অপেক্ষা অল্প প্রয়োজনীয় জিনিষকে অত বাড়াইয়া তোলার কারণ কি? স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে ইহা তিনিই করিয়া থাকেন, এবং পত্নীর উপর গৃহকর্ম্মের ভার থাকাতেই তাঁহারা ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন না, বোধ হয়। কিন্তু একটু বিপদ হইলেই পত্নীর কি দশা হয়, তাহা কি কেহ দেখিতে পান না? আর বিবাহের পর অর্থোপার্জ্জন প্রধানতঃ স্বামীর উপর থাকাই উচিত হইলেও, বিবাহে আপনাদের স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মেয়েদের অর্থোপার্জ্জনে যোগ্যতা লাভ করাও আবশ্যক। কারণ বিবাহই তাঁহাদের জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠায়, ইহাতে তাঁহাদের নির্ব্বাচনের পথ বন্ধ হইয়াছে এবং ইহা হইতেই বরপণ ইত্যাদি বরপক্ষের যথেচ্ছাচারমূলক অস্বাভাবিক প্রথার আমদানি!

বঙ্গনারী।

# হাসির ঢেউ'এ

আমি জানি হাসির কথা,
হাসির ভাষা সব—
প্রাণে বাঁশী বাজায় হাসির 'সুর'।
হাসির হ্রদে ভেসে আমি
চিনেছি হাসির রব,
শুনেছি তার হরেক-মতো সুর।
কোথাও হাসি চাপা—
ফোটে বোশেখ-চাঁপা!
কোথাও হাসি খলখল—
প্রভাত অরুণ-ঝলমল!
কোথাও হাসি মিলন-মুখের
কোথাও সে বিধুর;—
হাসির ঢেউ'এ ভেসে' ভেসে'
গেছি অনেক দূর!

খোকার মুখের হাসিখানি
কতই মিঠা রে!
কেমন সরল নিখুঁত হাসিটুক;
রূপময়ীর হাসিটি ঐ
গুড়টি চিটা রে!
লুটকে ভাঙে মক্ষিকারি বুক;
উদার লোকের ভোলা-

দুঃখীজনের ঠোঁটে
করুণ হাসি ফোটে;
কোথাও হাসি মুখেই মিলায়,
কোথাও শাণিত-ক্ষুর;—
বন্ধু মুখের হাসিটি যে
সব-চেয়ে মধুর!

কৌতুকেরি ছ্যাবলা হাসি,
নম্র হাসিখানি
সঙ্কোচে ফিক্‌ফিক্,
রুদ্র হাসি, ক্ষমার হাসি,
হাসির ওজন জানি—
চিনেছি সব ঠিক।
দাতার মুখের হাস—
গোলাপ বিলায় বাস!
কপট হাসি কালো,
মুছায় দিনের আলো!
হাসির আড়ে মিছরি-ছুরি
কঠোর ও নিঠুর;
দেবের প্রসাদ-ঝরা হাসি
দেখেছি অ-ক্রুর।

# নন্দ

অজন্মার বছর নন্দর বাপ যখন ষোলবছরের ছেলের মাথার উপর একটা মস্ত সংসারের ভার চাপিয়ে পৃথিবী হতে চলে গেলেন, তখন সে ভার মাথায় বইবার মত ক্ষমতা নন্দর ছিলনা; কারণ প্রথমতঃ তার বয়স ছিল মোটে ষোল বছর, আর দ্বিতীয়তঃ, টাকা বলে যে জিনিষটা থাকলে কোনো ভাবনাই থাকেনা, সেই জিনিষটারই অভাব ছিল ষোল আনা। কাজেই সদ্যপিতৃহারা অর্থহীন নন্দর অবস্থা হয়ে পড়ল, অগাধজলে সাঁতার না-জানা লোকের নিঃসহায়তার মতো।

ঘরে সদ্যবিধবা মায়ের শোক-মলিন কাতর মুখ, চার পাঁচটা ভাই-বোনের ক্ষুধা-কাতর করুণ দৃষ্টি তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। অথচ সে কোনো উপায়ই দেখতে পাচ্ছিল না। চোখের উপরে ছোট ভাই-বোনদের এই কাতর নীরবতা তাকে একেবারে ঘরে অতিষ্ঠ করে তুল্লে। শেষে কারুকে কোনো কথা না বলে নন্দ ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বার হয়ে পড়ল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, এ কষ্ট ঘোচাতে পারি ত ফিরবো, আর নয়ত......বাকীটা সে ভাবতে পারলে না। শুধু কল্পনায় সে ছবিটা একবার দেখেই শিউরে উঠল।

২

অনেক দিনের পর; একটা জয়ের উল্লাস নিয়ে পুলিশ-কোর্ট থেকে বেরুবার পথে নন্দর চোখ পড়ল, মলিন কাপড় পরা রুক্ষম্লান মূর্ত্তি একটা বছর চৌদ্দ পনেরর ছেলের উপর। হঠাৎ তার মনের আনন্দটা আঘাত পাওয়া সুর-বাঁধা বাঁশের মত বেসুরো হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি সে ছেলেটার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে—কিরে, অমন করে দাঁড়িয়ে কেন রে?

ছেলেটা শুধু অল্প ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কি ভেবে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—কিছু খাস্‌নি বুঝি, খিদে পেয়েছে?

ছেলেটা শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ। হঠাৎ একটু হেসে আমার সঙ্গে আয় বলে নন্দ তার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চল্ল।

সাম্‌নেই একটা উড়ের দোকান ছিল। নন্দ তার জামার পকেট থেকে একটা আনি বার করে বল্লে—এই, চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি দে ত। সাম্‌নে দড়িতে কতকগুলো কলা ঝুলছিল সে দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—কলা ক'টা ক'রে? কি বল্লি, তিন্‌টে ক'রে? আচ্ছা, দুপয়সার কলা নিলুম, তুই দু পয়সার মুড়ি-মুড়কি দে! বলে নন্দ দড়িটা থেকে হিসাব-মত কলা নিয়ে, সেগুলোর খোসা ছাড়িয়ে একটা নিজে খেয়ে বাকিগুলো ছেলেটার হাতে দিয়ে বল্লে—আগে কলা খেয়ে গলাটা ঠিক করে নে, তারপর খাবার খা। নইলে গলায় বাধবে।

মুড়ির ঠোঙাটা তার হাতে দিয়ে অল্পদূর গিয়ে একটা খাবারওয়ালার দোকান থেকে আনা-দুয়েকের লোনৃতা ও মিষ্টি কিনে ছেলেটার হাতে দিয়ে বল্লে—নে খা। খাওয়া শেষ হ'লে, রাস্তার একটা কল টিপে তাকে জল খাইয়ে, তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল্ল তাদের আড্ডাতে। সারাটা রাস্তা নন্দ ছেলেটার হাত চেপে ধরে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চল্ল। ছেলেটা নন্দর এই রুক্ষ স্নেহের অত্যাচারে কি যে কর্ব্বে ভেবে পাচ্ছিল না। তার মনে আনন্দ ও ভয়ের স্রোত একসঙ্গে পাশাপাশি বয়ে চলছিল।

আড্ডায় এসে যখন তারা পৌছল, তখন শীতের সন্ধ্যা ধোঁয়ার জালে কলকাতা সহরটাকে ঘিরে ফেলেছে। আড্ডা-ঘরে একটা উজ্জ্বল ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে দেখে ছেলেটা থম্‌কে গেল। ভাবলে, কোথায় এল সে! সে এর আগে আর একবার তার বাপের সঙ্গে কলকাতায় জমিদারের বাড়ী এসে এইরকম আলো জ্বলতে দেখছিল। কাজেই নন্দর মত একটা লোকের বাড়ী সেই রকম আলো দেখে থম্‌কে যাবারই কথা। নন্দ তার এ ভাব লক্ষ্য ক'রে বল্লে—একে ইলেকট্রীক লাইট বলে, বুঝলি? দুদিন থাক্, সব বুঝবি। হঠাৎ চুপ করে খানিক পরেই সে প্রশ্ন করলে—তোর নাম কি রে? ছেলেটা জড়সড় ভাবে বল্লে—দুলাল। নন্দ নিজের হাতের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে হো হো করে হেসে বল্লে—দুলাল, বাঃ বেড়ে নাম ত।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলে—তোর দেশ কোথায় রে ?

তার রকম-সকল দেখে দুলাল অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ভয়ে ভয়ে সে উত্তর দিলে—চণ্ডীপুর।

—কলকাতায় এসেছিস্ কেন ? টাকা রোজগার কর্ত্তে নাকি ? ব'লে নন্দ আবার বিশ্রীভাবে হেসে উঠল।

দুলাল নিশ্চল ভাবে রইল, হ্যাঁ বা না কিছুই তার মুখ থেকে বার হ'ল না।

—আচ্ছা, একটা কাজ কর দেখি, কিছু রোজগার হবে—বলে নন্দ হাঁকলে—হীরু, একে নিয়ে যা তোদের সঙ্গে, তোদের লোক কম পড়েছে না ?—তারপর "যা, ওদের সঙ্গে যা" বলে নন্দ হীরু নামে সেই লোকটির দিকে দুলালকে ঠেলে দিলে।

দুলাল ভয়ে ভয়ে তার সঙ্গে গেল।

৩

ঘণ্টা-চারেক পরে তারা যখন ফিরে এল তখন সে ঘরে দস্তুরমতো আড্ডা জমে উঠেছে।

দুলাল ত ভয়ে আড়ষ্ট। নন্দ মত্ততার জড়তায় প্রশ্ন করলে—সব খবর ভাল ? নতুন ছোকরা কাজের লোক হবে তো রে ? নীচ সামাজের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে থেকেও দুলাল তার প্রশংসা শুনতে পেলে।

নন্দ খুসী হয়ে বল্লে—বুঝলি, এত বচ্ছর এই কলকাতায় লোক চরিয়ে কে কাজের লোক হবে না হবে এখন দেখলেই চিন্‌তে পারি! তারপর দুলালের দিকে চেয়ে মত্ত কণ্ঠে বল্লে—কালই তোকে বখশিস্ দেব।...

আবার আড্ডায় মদের হল্লা চল্ল।

দুলাল বেচারী ভয়ে কাঠ। এই গুণ্ডা ও গাঁট-কাটা দলের সঙ্গে থাকতে তার একদণ্ডও ভালো লাগছিল না। অথচ এখান থেকে চলে যেতেও তার ভয় কচ্ছিল। মদের তীব্র গন্ধে তার কষ্ট হচ্ছিল আর তাদের চীৎকারে তার বিরক্তি ধরছিল। কিন্তু উপায় কি ?

ভাবতে ভাবতে সারাদিনের ক্লান্তিতে সে অসাড় হয়ে

৪

সকালবেলা যখন তার ঘুম ভাঙল তখন জানলা দিয়ে রোদ্দুর আসছিল। রাস্তা থেকে একটা মিশ্র শব্দও ভেসে আসছিল। চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে উঠে ব'সে দেখে, তখনও নন্দ আর গোটাকয়েক লোক মিলে চুপ করে ব'সে বসে মদ খাচ্ছে।

দেখেই গত রাত্রির বীভৎস ব্যাপারের কথা মনে জেগে উঠতেই তার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত এখান থেকে পালাতে চাইলে। কিন্তু পালানোর ত কোনো পথ নেই, সে জানেও না। হাতে একটাও পয়সা নেই যে দেশে ফিরে যাবে। এখানকার বাতাসে যেন তার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হ'ল নন্দ তাকে বখশিশ দেবে বলেছিল। সেই টাকা নিয়েও ত সে দেশে চলে যেতে পারে! দেশে ফিরে যাবার কথাটাতেও যেন তার নিশ্বাস সহজ হয়ে এল। কিন্তু টাকা চাইতে তার ভয় হচ্ছিল, কি ব'লে চাইবে সে ? অবশেষে অনেকখানি সাহস বুকে জমিয়ে সে নন্দর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তাকে দেখে গেলাস থেকে মুখ তুলে নন্দ হেসে বল্লে—কিরে, রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল ত ?

ঘাড় নেড়ে দুলাল তেমনি ভাবে তার সাম্নে দাঁড়িয়ে রইল।

—কিরে, খাবার চাই নাকি ?—বলে নন্দ আবার গেলাস থেকে মুখ তুলে তার দিকে চাইলে।

একবার, দুবার, তিনবার চেষ্টা ক'রে দুলাল আম্‌তা আম্‌তা ভাবে বল্লে—আমায় একটা টাকা দেবেন কি ?

নন্দ হেসে বল্লে—টাকা নিয়ে কি কর্ব্বি রে ?

তাদের সঙ্গ দুলালের অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সে দেশে যেতে চায়, কিন্তু সত্য কথা বলবার সাহস তার হচ্ছিল না। তার মুখ থেকে যেন আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়ল—দেশে পাঠাব।

গেলাসটা মুখ থেকে নামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর স্বরে নন্দ বল্লে—দেশে পাঠাবি ? কাকে ?

—আমার মা আর ভাইবোনরা সেখানে থেকে

কথাটা শেষ হতে না হতে নন্দ যেন কেঁপে উঠল। তার হাত থেকে প'ড়ে কাঁচের গেলাসটা চুরমার হয়ে গেল। তার মনের চোখের সুমুখ দিয়ে সেই ষোল বছরের অসহায় অবস্থায় গৃহত্যাগ থেকে আর আজকের পর্য্যন্ত তার জীবনের শত সহস্র ঘটনার সুদীর্ঘ ফিল্‌ম্‌ মুহূর্ত্তে ঘুরে গেল। নিঃসহায় তার মা-ভাই-বোন, তাদের খোঁজও সে করেনি কলকাতায় এই সঙ্গস্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে! আর আজ আর একটা ছেলে তাদেরি চক্রে এসে পড়েছে—যেমন সে এসে পড়ছিল। মুহূর্ত্তে একটা ভাবের ধাক্কায় সে পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট দুলালের গায়ে ছুড়ে দিয়ে কর্কশ স্বরে বলে উঠল—যা যা, এখান থেকে পালা। শীগ্‌গির বেরো!—

নন্দর এ অপরূপ রূপ-পরিবর্ত্তন দেখে দুলাল ভীত ও চমকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নন্দ আরো রুক্ষভাবে বলে উঠল—দাঁড়িয়ে রইলি যে, এতে হবেনা? আচ্ছা এই নে, এই নে—

বলতে বলতে সে দাঁড়িয়ে উঠল। পকেট থেকে আরও খান-দুয়েক নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে, তাকে প্রায় গলাধাক্কা দিয়েই বার ক'রে দিলে।

তার পরে ঘরে এসে গুম্‌ হয়ে বসে রইল।

তার সঙ্গের লোকগুলো নন্দর মুখে বিস্ময়ের দৃষ্টি ফেলে চুপ করে রইল।

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

---

# কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

একটা জিনিষে মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে আমাদের দেশে সৃষ্টির চেয়ে সমালোচনার মূল্য বেশী! ইহাতে কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নাই! আমাদের দেশ স্বপ্ন-বিলাসীর দেশ। এখানে এরোপ্লেন দেখিলে আমরা পুষ্পক রথের কথাই স্মরণ করি এবং বৃক্ষের প্রাণ-স্পন্দনের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের মৌলিকত্ব কিছু দেখিতে পাই না! করার চেয়ে বলা সহজ, কাজেই বলিতে আমাদের কিছু বাধে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া আলোচনা ইহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। ইট-কাঠের বাড়ীর মত কেহ যে ইহাকে তৈয়ার করিয়াছে তাহা নয়; আপনার প্রয়োজন-অনুসারেই ইহা বাড়িয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকালস্থায়ী সকল প্রতিষ্ঠানই এমনি প্রাণবান জিনিষ। ইহা নিতান্ত যন্ত্রবদ্ধ কিছু বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে, কেননা ইহার মধ্যে দেশের লোকের মিলিত ইচ্ছাশক্তি কার্য্য করিতেছে। আপনার ক্রমবর্দ্ধিত ভাবে আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িত; সমালোচনার সাবল-কোদালের দরকার হইত না।

যাঁহারা বলেন, ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারি, তাঁহারা বিশেষ একটা দিক হইতে দেশের শিক্ষার কথা বিচার করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার গুণকীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠ অথচ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর খড়্গহস্ত তাঁহাদের মনের ভাব বুঝা কঠিন।

তাঁহাদের দিক দিয়াই কথাটার বিচার করা যাক। তাঁহারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই, সে চলিতেছে না, চালিত হইতেছে—বিশ্ববিদ্যালয় এঞ্জিনের মত একটা যান্ত্রিক বস্তু—তাই তার গোড়ায় এত গলদ। প্রথমতঃ গলদের কথা ধরা যাক, "গোড়ার" কথা শেষে ধরিলে চলিবে।

গলদের মধ্যে প্রথম হইতেছে অর্থের অনটন; দ্বিতীয় হইতেছে আয়োজনের বাহুল্য।

ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। দেশের নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রধানতম। যাত্রা কথকতা টোল পাঠশালা যে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু শিক্ষার কেন্দ্র আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সরিয়া আসিয়াছে। শিক্ষিত বলিতে বিশেষভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সন্তানদেরই বুঝায়। হইতে পারে, শিক্ষা ছাড়াও বিবিধ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় এতটা গৌরব লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আজ যে একটা বিপুল শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে ত আর ভুল নাই। সে কথা অস্বীকার করিলে প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করা হয়! বাঙলা দেশের যাঁহারা কর্ম্মী পুরুষ, তাঁহারা সকলেই না হউন অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতিতে শিক্ষা-প্রাপ্ত।

অতএব দেখা যাইতেছে, দেশের জীবন-লীলার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণের একটা আন্তরিক যোগ আছে। এই সম্বন্ধ না থাকিলে সে এতদিনে শুকাইয়া গুটাইয়া ঝরিয়া মরিয়া যাইত। অর্থাভাবই অসার্থকতার নিদর্শন নহে, দারিদ্র্য-দোষ গুণরাশিনাশী হইলে কবি কালিদাস হইতে মাইকেল মধুসূদন পর্য্যন্ত গুণহীন হইয়া পড়িতেন!

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রচার—এ কথা স্কুলের ছেলেটিও জানে। উদ্দেশ্য লইয়া কোন তর্ক নাই, উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় লইয়াই গোল। কিন্তু সত্যই কি এই কোলাহলের প্রয়োজন আছে?

প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। সেই শিক্ষা আপনার প্রয়োজন-অনুসারে ক্রমে ক্রমে স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য ছাত্রবৃন্দের পরীক্ষায় মাত্র পর্য্যবসিত হইত; তখন সকলে কপালে করাঘাত করিয়া বলিত, "হায়রে, আমাদের কপালগুণে বিশ্বভারতী সুধাভাণ্ড ছাড়িয়া মানদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে।" তারপর দেবী সরস্বতীর কৃপায় যখন আজ পরীক্ষা-পীঠ শিক্ষা-পীঠে রূপান্তরিত, তখনো হাহাকারের বিরাম নাই! তখন আবার আমাদের রক্ষণশীল চিত্ত ফিরিয়া বলিতেছে, "মা, শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া যে বিশ্ববিদ্যালয় বিষম ব্যয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, এ বড় অন্যায়।" তা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার ভার মাত্র গ্রহণ করিয়াছে।

বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে টাকার দরকার হয় না, কিন্তু সংসারীর পক্ষে অর্থের মধ্যে অনেক সার্থকতাই লুকানো থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় বৈরাগী নয়, সংসারী। তাহার পক্ষে অর্থের প্রয়োজন নিরর্থক নহে। যখন জীবনসংগ্রাম সহজ ছিল, শিক্ষাটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ব্রহ্মচর্য্য ছিল, তপোবন ছিল, অর্থাৎ যখন রেলগাড়ী ম্যালেরিয়া, চটের কল, চিমনির ধোঁয়া এবং বিলাতী শাসন ছিল না, তখনকার দিনে গাছের তলায় তৃণাসনে বসিয়া পড়া এবং পড়ানো উভয়ই চলিত,—সত্য কথা। কিন্তু এখন তৃণাসন রাখিতে গেলে গ্রাস্‌কাটার দিয়া ঘাসের ডগাগুলা সমান করিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়, এবং বর্ষা বাদল-রৌদ্রের হেতু ছাত্রদের জন্য বিশেষ আয়োজন না করিলে আকাশকে লেক্‌চার শুনাইতে হয়, কাজেই এখন নিশ্চিন্তভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবার উপায় একেবারেই নাই।

যখন প্রলোভন কম ছিল, সম্মান বেশী ছিল, পদ-ধূলির মূল্য ছিল, তখন অধ্যাপকের নিরাহারে দিন কাটানো শক্ত ছিল না, কেননা তখন অনাহারের ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার দিনে যখন ডেপুটি অনায়াসে আটশো টাকা রোজগার করিয়া মেয়েকে সুপাত্রে সমর্পণ করিবার শুল্ক সঞ্চয় করিতেছে, পরের বই বিক্রয় করিয়া প্রকাশক এবং পরের সংবাদ গ্রহণ করিয়া পত্র-ব্যবসায়ী সিন্দুকে হাজারের উপর হাজার স্তূপাকার করিতেছে, তখন বেচারা অধ্যাপক খাটিয়া-খুটিয়া দুশো কি তিনশোখানি টাকা রোজগার করিলেই কি দেশের অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যাইবে? অধ্যাপক হইয়াছে বলিয়া তাহাকে যেন ছেলের পড়ানোর খরচ জোগাইতে হইবে না, মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে না, ডাক্তারের ভিজিট দিতে হইবে না, মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স দিতে হইবে না, ট্রামের টিকিট কিনিতে হইবে না, রেলের মাশুল লাগিবে না, ঝীয়ের মাহিনা লাগিবে না, কুটুম্বের বাড়ী তত্ত্ব পাঠাইতেও হইবে না! আর কিছু

হইলেও বিলাতে অর্ডার দিয়া বই আনাইতে হইবে, আর দেশী হউক বা বিলাতী হউক, দোকানদার মাত্রই বিনামূল্যে জিনিষ ছাড়ে না, এমন কি বই পর্য্যন্ত নয়।

এমনি সব অধ্যাপক লইয়া ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসার। কাজেই ইউনিভার্সিটির টাকার প্রয়োজন হয় বৈ কি!

আমরা আজ দোটানার মধ্যে পড়িয়া মারা যাইতে বসিয়াছি। একদিক দিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিতেছেন, মাড়োয়ারীর মত কোমর বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া অর্থ-উপার্জ্জনে লাগিয়া যাও অজরামরবৎ, দেশের তাহাতেই উন্নতি। আবার আর একদল বলিতেছেন, অর্থের কথা ভাবিও না, অধ্যাপক হইয়া অজরামরবৎ শুধু বিদ্যার চিন্তা কর, ত্যাগেই মুক্তি।

ত্যাগেই মুক্তি, এ কথায় সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কোন্ খানে এবং সে কতখানি? এই ত্যাগ মানে পলে পলে শুকাইয়া মরা নয়, আপনার প্রাপ্য হইতে আপনাকে বঞ্চিত করা নয়, জীবনকে কুঞ্চিত করিয়া এতটুকুর মধ্যে গুটাইয়া আনা নয়, সংসারী হইয়াও উপার্জ্জনে ঘৃণা নয়। ইহার অর্থ দেশের আহ্বানে আত্মত্যাগ, যা সকল স্বদেশ-প্রেমিক করে, সকল সৈনিক করে। অধ্যাপকতা ও অর্থোপার্জ্জন এ দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন জিনিষ, এমন যুক্তিও মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, একদিন ছিল যখন কবি বিনামূল্যে সুধা বিতরণ করিতেন। আজ সকল দেশের সকল কবি, সকল সাহিত্যিক বই ছাপাইয়া টাকা রোজগার কল্লেন কেন? ত্যাগে মুক্তি কাহার? যিনি সংসারের বন্ধন তুচ্ছ করিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য্য ষ্টিফেন হয় ত সেই ত্যাগে অধিকারী, অভাবক্লিষ্ট সংসারী নহে। সকলের কৃপার পাত্র দরিদ্র কেরাণীকুলের পক্ষেও দুইশত টাকা বেতন আজ প্রচুর নয়। সেই দুইশত টাকা একজন প্রয়োজন-পীড়িত দরিদ্র অধ্যাপক দাবী করিতে পারেন না? বিদ্যা-বিক্রয়ে আজ কবিও যখন

আজ আইডিয়ালের জট পাকাইয়া গিয়াছে। অর্থ না বুঝিয়া আমরা বলি ত্যাগ কর, অর্থ না বুঝিয়া আমরা বলি অর্থ উপার্জ্জন কর। দুইটা কথাই ঠিক, অথচ প্রয়োগ না জানিয়া যখন-তখন যাহাতে-তাহাতে এই দুটা বড় বড় বাক্যের বুকনি দিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয় না। ঝন্‌ঝন্ শব্দে থলির মধ্যে টাকা পুরিতে পুরিতে তুড়ি মারিয়া আমরা অধ্যাপককে বলি, ছি, টাকা লইও না।

এদিকে অধ্যাপকের দুইশত টাকা মাহিনা লইয়া নিদারুণ আগ্রহে মাথা কুটাকুটি করিয়া মরি, ওদিকে সামরিক ব্যয়-বাবদে হিসাবের উপর দুইদশ কোটি টাকা বেশী খরচ হইয়া গেলেও আমরা একবার শুধু 'তাইতো' বলিয়া হাই তুলিতে থাকি! ও যেন নিয়তি, উহার উপর কথা কহাই বৃথা! দাসমনোভাবের ইহাও আর এক লক্ষণ। বাষট্টি কোটি টাকা আমরা একরূপ বিনা-প্রতিবাদে জঙ্গী-লাটের হাতে তুলিয়া দিই, কিন্তু ইউনিভার্সিটি যদি দুহাজারের উপর দুশো খরচ করিয়া বসে, তাহা হইলেই আমরা মাথার ঘায়ে পাগল হইয়া উঠি! এ ব্যবহার হইতেছে সেই সব কাপ্তেন বাবুদেরই মত, যাহারা বিলাস-ব্যসনে একরাত্রে লাখো টাকা হাস্যমুখে উড়াইয়া দিয়া পাঁচ পয়সা দামের মাল দর কসাকসি করিয়া, জোর করিয়া দুই পয়সায় লইতে লজ্জা বোধ করে না। যে সব পত্র-পত্রিকায় এ দুয়েরই আলোচনা থাকে, সেই সব কাগজে ইউনিভার্সিটির ত্রুটি ও বিচ্যুতির খতিয়ানে মাসে মাসে বা দিনে দিনে কতখানি স্থান আর সামরিক অপব্যয়ের হিসাব দেখাইবার জন্য কতটুকু স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া, এই উভয়ের তুলনায় সমালোচনা করিয়া লইলে উপরি-উক্ত উপমার সার্থকতা চোখের সমক্ষে জলের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। গভর্মেণ্টের উপর আমাদের হাত নাই, প্রতিবাদে ফল নাই, সেখানে আমরা মিছামিছি চেঁচাইয়া মরি কেন? কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ঘরের জিনিষ, কাজেই সেখানে আমাদের চুল-চেরা অধিকার লইয়া চুলোচুলি যদি করি, তাহাতে আর লজ্জা কি! যে জাতির

নহে, এ মনোভাব সেই জাতির লোকেরই উপযুক্ত বটে!

বেতনের দিক দিয়া যদিই বা কোনরূপে তর্কের তাল সামলানো যায়, তখনি আবার তর্ক আসে, এত আয়োজনের বাহুল্য কেন? বাঙ্গালা ছাড়া বাহিরের যে কোন লোক এ কথা বলিতে কিন্তু করিত, কেননা অতিরেক অপেক্ষা অভাবই তাহার দৃষ্টিকে পীড়া দিত। তবে বাঙ্গালাদেশ না' কি সৃষ্টিছাড়া দেশ, তাই এখানে প্রত্যক্ষকেও প্রমাণ করিতে হয়!

বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে দেড়খানি ইউনিভার্সিটি আছে। আধখানি ইউনিভার্সিটি ঢাকায় পড়িয়া আছে, গোটা ইউনিভার্সিটিটা কলিকাতার পথপ্রান্তে বসিয়া অবাঙ্ মুখে 'পাবলিকের' মুখের দিকে চাহিয়া আছে। আধখানির কথা ছাড়িয়া দিলে—এবং এখন দিনকতকের জন্য সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া চলে—দেখা যায় যে এত বড় দেশটার মধ্যে একটিমাত্র সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার জন্য উন্মুখ দেশের সহস্র সহস্র বালকের জন্য, বাৎসরিক নয় লক্ষ টাকা মাত্র আয়ের পুঁজি লইয়া, আকুল-ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। পনেরো ষোল লক্ষ টাকা নহিলে একটা ক্ষুদ্র-তম বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় সংকুলান হয় না, আর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটির জন্য বাঙ্গালার একমাত্র বিশ্বভারতীর জন্য, নয় লক্ষ টাকা ব্যয় এত অধিক হইয়া গেল,—যাহার হেতু কেবল বেতনভোগী অধ্যাপককে নয়, অবৈতনিক অধ্যক্ষকে পর্য্যন্ত অভিধান-বহির্ভূত বিশেষণে আপ্যায়িত করিতে হইবে!

বিশ্ববিদ্যালয়ে সবশুদ্ধ জোর একুশটা বিভাগ আছে। এ কয়টির মধ্যে কোনটিতে এমন কিছু অসাধারণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহা অন্য ইউনিভার্সিটিতে দিলে বিধান ছাড়া কিছু হইয়া পড়িত। সভ্যতার ইতিহাসই হোক আর নৃতত্ত্বই হোক যে-কোন সাধারণ বিষয় শিখিতে হইলেই কি বিলাতে দৌড়াইতে হইবে? এখনও কি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার সময় বহুদূরে? পরের মুখে ঝাল না খাইলে কি আমাদের মুখশুদ্ধি হইবে না? যাহার পয়সা আছে, সে বিদেশ হইতে বিদ্যা আহরণ করিয়া আসুক, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু যে দরিদ্র ছাত্রের অর্থ নাই কিন্তু উৎসাহ আছে, সঙ্গতি নাই কিন্তু ইচ্ছা আছে, জন্মভূমি কি তাহার শিক্ষার কোন সুযোগ করিয়া দিবে না?

এই সুযোগ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই কি বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কর্ম্মবীরকে অটোক্রাট আখ্যায় আখ্যাত হইতে হইবে? গুণে এবং জ্ঞানে গরীয়ান বাঙ্গালার যে সব রত্ন advancement of learning-এ তাঁহার সাহায্য করিয়াছেন, কলমের কালি ছিটাইয়া তাঁহাদিগকেও কালো করিয়া তুলিতে হইবে?

শ্রদ্ধা জিনিষটাকে তোষামোদ বলিয়া তর্ক করা বিশেষ শক্ত নয়। ধার্ম্মিককে ভণ্ড এবং বলবানকে গুণ্ডা বলিলে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ আনা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া পড়ে। নেপোলিয়ানের উপর সৈন্য ও সেনানীদের অসীম বিশ্বাস খোসামোদ না হইতে পারে। সিংহের ছবি মানুষে আঁকে, মানুষের চিত্র আঁকিবার অবসর সিংহের কোথায়? সিজারের প্রতিভা সম্ভবতঃ তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল, তাই বলিয়া বহুমানাস্পদ ব্রূটাসের দল রোমের প্রতি প্রেম দেখাইতে কার্পণ্য করেন কি করিয়া?

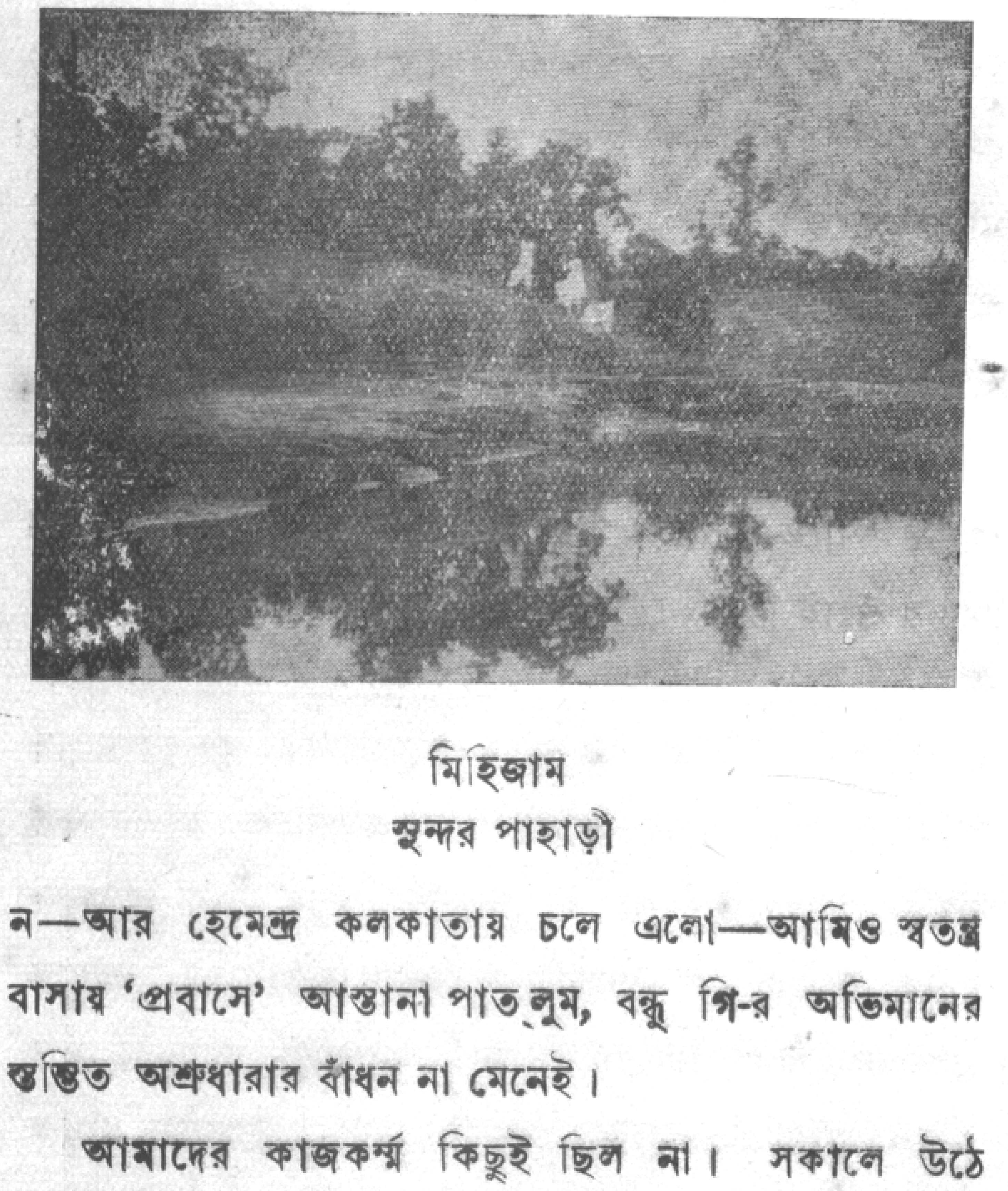
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাঙ্গালায় নয়, ভারতের গৌরবের বস্তু। পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সমাবেশ বিশ্ব-বিদ্যালয়কে আজ তীর্থস্থানে পরিণত করিয়াছে। দূর-দূরান্তরের বাণী-সাধকেরা পর্য্যন্ত তাহার কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। জ্ঞানের ভিতর দিয়া শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সে নবযুগের অভ্যর্থনা করিয়াছে। তাহার প্রাণশক্তি আজ নব নব রূপে বিকাশলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সেই প্রেরণাকে সার্থক করিবার সাধনায় আমরা যেন আমাদের পূর্ণ উদ্যমকে নিয়োজিত করিতে সঙ্কুচিত না হই।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

# অনুকূল যাত্রা

( অ্যাড্‌ভেঞ্চার নয় )

এবার পূজার পরেই রোগ-শয্যা থেকে উঠে কলকাতার বাহিরে যখন নির্জ্জন একটু কোণ সন্ধান করছিলুম বিশ্রামের জন্য, তখন কর্ম্মাটার থেকে সাহিত্যিক বন্ধুদের আহ্বান এলো, এইখানে এসো। তাঁরা কর্ম্মাটারে সদলে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছিলেন। তাঁদের সে আহ্বান ঠেলতে না পেরে রুগ্ন শরীরকে চাঙ্গা করবার জন্য তখনই সপরিবারে কর্ম্মাটার যাত্রা করলুম। আমি কর্ম্মাটারে পৌঁছুলুম হেমেন্দ্রদের 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারের' পরেই। শ্রীমতী ত—তখন রোগে শয্যা নিয়েছেন। সেখানে পৌঁছে হপ্তাখানেকের জন্য গি-র গৃহে অতিথি হলুম—তারপর



মিহিজাম
সুন্দর পাহাড়ী

ন—আর হেমেন্দ্র কলকাতায় চলে এলো—আমিও স্বতন্ত্র বাসায় 'প্রবাসে' আস্তানা পাত্‌লুম, বন্ধু গি-র অভিমানের স্তম্ভিত অশ্রুধারার বাঁধন না মেনেই।

আমাদের কাজকর্ম্ম কিছুই ছিল না। সকালে উঠে চা-পানান্তে বেলা ন'টা অবধি ষ্টেশনে আড্ডা জমাতুম। কলকাতা থেকে অনেকেই এবার কর্ম্মাটারে জমায়েৎ হয়েছিলেন। ষ্টেশনে বসে বসে রাজা-উজীর মারা যেত, তারপর আপ্ ট্রেণ ৮—৫৪ মিনিটে এসে উপস্থিত হতো; গাড়ীর এ-মুড়ো ও-মুড়ো উঁকি পেড়ে সকলে দেখতুম, চেনা-শোনা কেউ আছেন কি না! তারপর ট্রেণ ছেড়ে দিলে বাড়ী ফিরতুম। ছেলেরা তখন ফুলে-ফুলে আলো-করা বাগান থেকে রাশ-রাশ জিনিয়া আর কস্‌মস্ ফুল তুলে খেলার ঘর পেতে বস্‌তো, আমিও তাদের সঙ্গে সে খেলায় যোগ দিতুম। সোমবারে আর শুক্রবারে গি— আর আমি আহারের চেষ্টায় অর্থাৎ 'বাজার-কারণ' মধুপুরে ছুট্‌তুম—বাজার করে ফিরতুম বেলা দেড়টার এক্সপ্রেসে! বেশ লাগতো এই নূতন জীবন-ধারা।

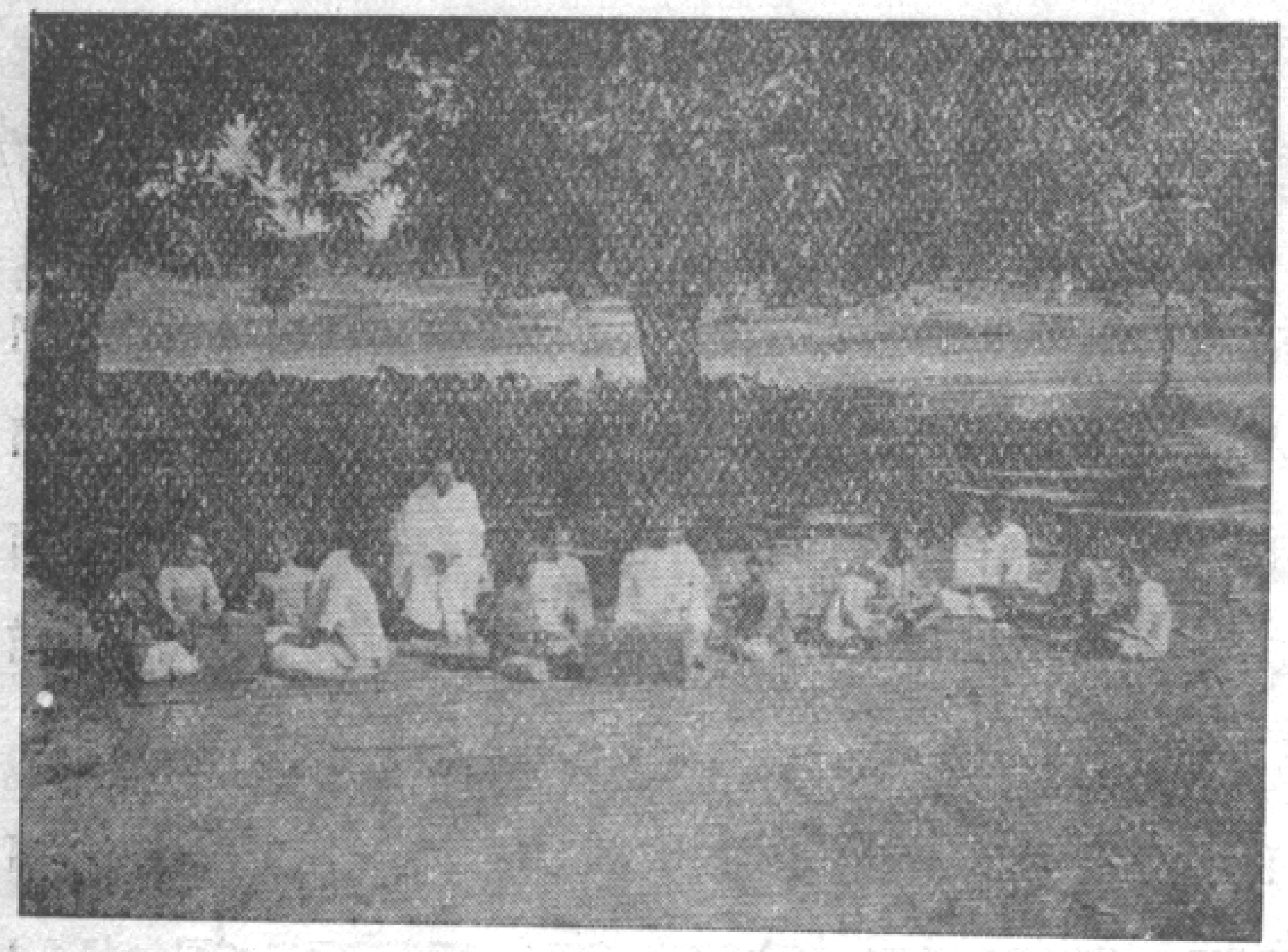
এমনি আছি, এমন সময় হঠাৎ মিহিজাম থেকে প্রবাসী বন্ধুর দল কর্ম্মাটারে এসে হানা দিলেন। অধ্যাপক ক্র—বাবু, জমিদার শি—বাবু ফটোগ্রাফার-বন্ধু প্রভৃতি সমেত। ওদিকে কলকাতা থেকে গায়ক বন্ধু ন—ও কর্ম্মাটারে এসে গি-র গৃহে অতিথি হলেন।

মিহিজামে বেড়াতে চললুম। শি—বাবুর জমিদারী এখানে। মিহিজামের ভৌগোলিক বিভাগে একটু রহস্য আছে---এর খানিকটা পড়েছে সাঁওতাল পরগণার মধ্যে, আর খানিকটা বর্দ্ধমান জেলায়। শি—বাবুর জমিদারী বর্দ্ধমান জেলায়।

ষ্টেশন পেরিয়ে পথে পড়তেই দেখি, সামনে পাহাড়, কাননগো—কাননগুহার অপভ্রংশ। পাহাড়ের বন্ধুর গা শ্যামল তৃণ-লতায় ছেয়ে আছে—অপূর্ব্ব বেশ! তার নীচে ধানের ক্ষেত,—সবুজের ঢেউ বয়ে চলেছে! ধানের ক্ষেতে কতকগুলো বক—মাঝে মাঝে উড়ছে বসছে। ন—গান ধরে দিলে,

মেঘের কোলে কোলে যায়রে চলে বকের পাঁতি।

খানিক আসতেই ডাহিনে পড়ল একটা পুকুর, বাঁয়ে কলকাতার এস, পি, চাটার্জ্জির নার্শারি। পুকুরের ধারে হরিতকী গাছের সারি। কতকগুলো হরিতকী পেড়ে পকেটস্থ করা গেল। মাঝে মাঝে কয়েকটা আরো কি গাছ, তাতে অদ্ভুত রকমের ফল, চ্যাপ্‌টা ত্যাবড়ানো-গোছ মূর্ত্তি। শুনলুম, ভ্যালার গাছ। খানিকটা পথ আরো এসে



মিহিজাম রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ

শি—বাবুর আস্তানায় পৌঁছুলুম। তাঁর বাড়ীর পরই মাঠ ধূ-ধূ করছে। অদূরে তুটো পাহাড়—ভগা পাহাড়, আর সুন্দর পাহাড়। সুন্দর পাহাড়ের মাথাটি বেশ সমতল—তার উপর ঘর-বাড়ী বানালে তোফা হয়, রাঁচির মোরাবাদিতে জ্যোতিবাবুর বাড়ীর মত! শি—বাবুর ইচ্ছা আছে, শুনলুম, সেখানে বাড়ী করাবেন। সুন্দর পাহাড়ী তাঁর জমিদারীর মধ্যে।

খানিকটা বিশ্রাম করবার পর দেখি, শি—বাবু, গ্ন—বাবু প্রভৃতি পাঁওরুটী কাটতে সুরু করেছেন, চাও তৈরী। তার ওপর টিফিনের জন্য এল ওড়ার মত প্রকাণ্ড চুবড়িতে জিলিপি আর বোঁদের রাশ—আরো-একটা মেওয়া ছিল, ক্ষীর!

আধ-শোয়া গোছ অবস্থায় কি একখানা বাঙলা উপন্যাসের পাতা ওন্টাচ্ছিলুম, কিছুতেই মন বসছিল না। এমনি বদ লেখা যে অক্ষরগুলোয় হোঁচোট খেয়ে মন ঠিকুরে-ঠিকুরে পড়ছিল। ঐ সব খাদ্য-সামগ্রী দেখে উঠে পড়া গেল। "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনা স্বদেশীয় ভাষা মেটে কি আশা!" কথাটা খাঁটী। শুধুই কি ভাষা, সব বস্তুর সম্বন্ধেই এ কথা খাটে, 'স্বদেশী'র কাছে কিছু আছে আর! পাঁউরুটির দিকে আমি আর ন—মোটেই ভিড়লুম না। ঐ জিলিপি আর বোঁদেতেই মুখ-সংযোগ করা গেল। ন—পেয়ালার ক্ষীরে বোঁদে ফেলে পায়েস বানিয়ে ফেললে; দেখে আমিও তার পথ অবলম্বন করলুম। কি মধুরই লাগল যে! তুজনে কতগুলো জিলিপি খেয়ে ফেললুম, বলতে পারিনা! জিলিপি নিঃশেষ হতে ভাবনা হলো, তাইতো, বুক জ্বলে অম্বলের ঢেকুর তুলে মরবো এখনি যে!

গ্ন—বাবু ভারী সাবধানী হুঁসিয়ার লোক। পকেটে তাঁর টাইকো সোডা ট্যাবলেট্ সর্ব্বদাই থাকে—নড়েন-চড়েন আর তুটো-চারটে গুলি গলাধঃকরণ করেন। তিনি তাঁর শিশি আমার সামনে ধরতেই শি—বাবু বললেন,—রামঃ, কিছু ভাববেন না মশায়, এ জিলিপি খুব ভালো ঘীয়ে ভাজা—একটুও অম্বল হবে না।

তার পর ঘুরে ঘুরে সহর দেখা গেল। পশ্চিমে পাহাড়ের সার সীমা রচে দিয়েছে। বাড়ীর সংখ্যা কম। একটি স্কুল আছে শান্তিনিকেতনের আদর্শে। গাছের তলায় বেদীর উপর বসে ছেলেরা পড়চে। আমাদের কথা হলো, এখান থেকে আরো ডাউনে (অর্থাৎ কলকাতার দিকে) সোলানপুর ষ্টেশন। সেখান থেকে ছ-সাত মাইল দূরে এক মন্দির আছে বরাকর নদীর উপর,—সেই মন্দিরে কল্যাণেশ্বরী প্রতিমা আছেন, দেখতে যেতে হবে। বেশ! ভাবলুম, ওদের ঝাঝার একটা নূতন সংস্করণ হয় যদি!

ঠিক হলো, মিহিজামে কে ডেভিড্ সাহেব থাকেন, তাঁর মোটর আছে—সেই মোটর ভাড়া করে যাওয়া যাবে। মোটর ওঁরাই ঠিক করে কর্ম্মাটারে আমাদের খপর দেবেন।



কল্যাণেশ্বরী
মন্দির-পথে

ভারী তৃপ্ত হয়ে আমরা তিন বন্ধুতে সে-রাত্রে কর্ম্মাটারে ফিরলুম।

তার দু'চার দিন পরে গিরিডি থেকে ফিরচি তিনজনে গি—,ন—আর আমি। মধুপুরে চেঞ্জ করে এ লাইনের গাড়ীতে উঠবো, এমন সময় গু—বাবুদের সঙ্গে দেখা। তাঁরা বৈদ্যনাথ থেকে ফিরছেন। তাঁরা বললেন,—মোটর গাড়ী ঠিক। কালই আপনারা দুপুরের ট্রেণে সোলানপুরে আসবেন। সেখানে মোটর থাকবে। একখানামাত্র মোটর —এত লোক একসঙ্গে ধরবে না—দুটো দল করে যাওয়া যাবে। কথা হলো, গি—আর আমি সস্ত্রীক যাব।

পরের দিন ঝঞ্ঝাট বাধলো। আমার গৃহিণী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হবেন না! দুবেলা তিন-চার ক্রোশ বেড়ানো—কলকাতার শকট-বিহারিণীর পক্ষে সহ্য হবে কেন? তাঁর যাওয়া হবে না শুনে কাজেই ও-বাড়ীর শ্রীমতী ত—সঙ্গিনীবিহীনা একাকিনী যেতে সম্মত হলেন না। অগত্যা আমরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়লুম,—বাড়তি হলো আমার সপ্তমবর্ষীয় পুত্র দিগ্বিজয়ী দস্যু রমি। এই দুরন্ত পুত্রটিকে দাবিয়ে রাখা অসম্ভব হলো। গি—আরো প্রশ্রয় দিলে, বললে,—চলো না নিয়ে।

আবার ছুটে ষ্টেশনে ট্রেণ ধরা! আমার ট্রেণ ধরায় একটু মজা আছে। কখনো যথাসময়ে ষ্টেশনে এসে আমি পৌছুতে পারি না! এ চিরকাল দেখে আসছি। 'প্রোফেসনাল্ কল্' রাখতে গিয়েও এমন হয়েছে, দু'তিনবার ট্রেণ ফেল করে সুদীর্ঘ পথ—কলকাতা থেকে বারাকপুর—ট্যাক্সি চড়ে গিয়েছি, গাঁটের পয়সা ব্যয় করে। অর্থাৎ হয় কি জানেন, হয়তো ট্রেণ বেরিয়ে যাবার পর ষ্টেশনে এসে উদয় হই, নয় তো ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে ইন্ হচ্ছে এমনি সময়। সেদিনও তাই হলো। ডাউন এক্সপ্রেস কর্ম্মাটার ছাড়বার কথা বেলা একটা কুড়িতে। আমি ষ্টেশনে পৌছে দেখি, একটা বেজে বাইশ মিনিট হয়ে গেছে।

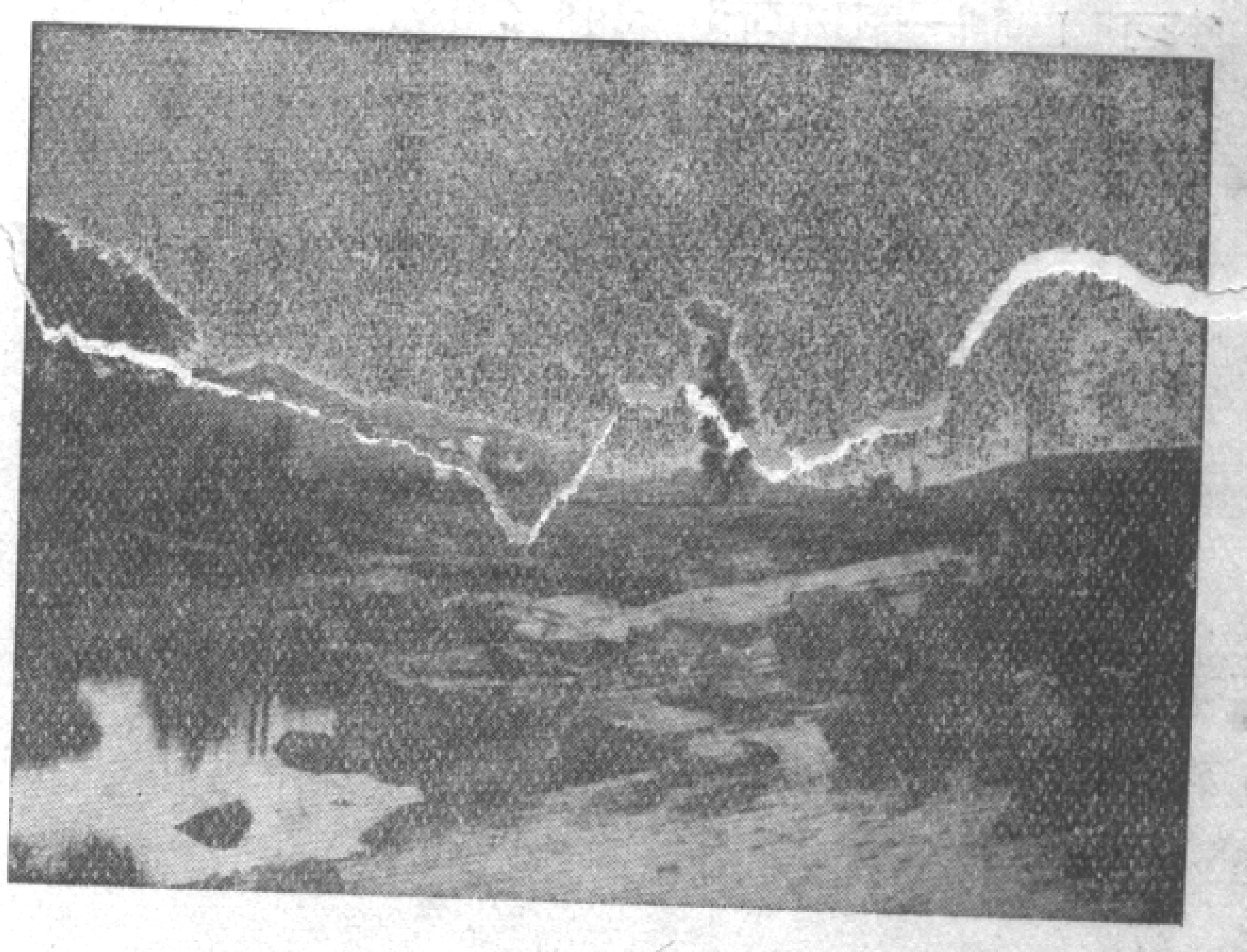
গি—আর ন—ওয়েটিং রুমে বিরাজ করছিলেন। সিগন্যাল পড়ে আছে! মনটা ছাঁৎ করে উঠলো। গি—কে বললুম,—কিহে ব্যাপার কি?

গি—অবিচলিত কণ্ঠে বললে,—ব্যাপার আর কি! তোমার জন্যে যাওয়া হলো না! তুমি এসে হাজির হলে না—

আমি বললুম,—বা, একেই ত বলে বন্ধু-প্রীতি! ট্রেণ লেট বুঝি?

ন—হেসে বললে,—হ্যাঁ।

তারপর বারো-তেরো মিনিট কাটলে ট্রেণ এলো। কি ভিড়! একখানা ইণ্টার কম্পার্টমেণ্টে ওঠা গেল—কোনমতে বেঞ্চি স্পর্শ করে রইলুম আর কি! ফ্রী-পাশ রেল-কর্ম্মচারীর দল বালিশ-বিছানা বিছিয়ে ট্রেণের কামরায়



কল্যাণেশ্বরী ঝুলো পুল

এই বেলা দুপুরকেই রাত দুপুর করে তুলেছেন! জ্বালাতন! এই যে আমরা চারজন প্রাণী উঠলুম, তাঁরা সেদিকে দৃক্‌পাতও করলেন না—গ্রাহ্য করা দূরের কথা! হাত-পা ছড়িয়ে নিজেদের গল্প-গুজবেই সব বিভোর! কোথায় কার বড় বাবু হুঁসিয়ার লোক হলেও তাঁর চালাকি ধরতে পারেন না,—কোথায় কে সাহেবকে খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছেন, থোড়াও কেয়ার করেন নি—বীরত্বের এমনি সব ঝাঁঝালো কাহিনী! আঃ—এ রোগ বাঙালীর কি কখনো ঘুচ্‌বে না! এ রকম বড়াইয়ের কথা বাঙালী তো পাঁচিল-ঘেরা অন্দরের আড়ালে কপাট-আঁটা ঘরে স্ত্রীর কাছেই করে থাকে, খোলা গাড়ীতে এমন প্রকাশ্যভাবেই এরা সে গল্প করছে। বাখানি সাহস বটে!

ট্রেণ জামতাড়া-মিহিজাম ছাড়িয়ে রূপনারাণপুরে এসে

আমাদের গাড়ী ঠিক যেন একটা উঁচু ছাদের ওপর, আর সামনের পথ, দু-ধারে মাঠ সব কোথায় কোন্ পাতাল-পুরীর অতুক বুকে গিয়ে সেঁধিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একগাদা চিম্নি—কালো ধোঁয়ায় ওধারকার আকাশ ছেয়ে গেছে, ধোঁয়ার স্পর্শে রৌদ্রও যেন ছায়ায় ঢাকা! শুনলুম, ওটা কুল্টির কারখানা।

মোটর ছুটেছে তো ছুটেইছে—সামনেকার মাঠ, আকাশ, সব নাচতে নাচতে যেন ক্রমে আমাদের বুকের উপর উঠতে আসছে! আকাশের সীমা রচে দিয়েছে কতকগুলো পাহাড় —ধোঁয়ার আব্ছায়ায় সেগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন ছাই-রঙা কাগজে আঁকা ছবি!

নীচে, নীচে, নীচে মোটর গড়িয়ে চল্লো, বিপুল তেজে! আশে-পাশে সাঁওতালী চেহারার ছেলে-মেয়ে তরুণ-তরুণী—কেউ মাঠের উপরকার ইঁদারা থেকে জল নিচ্ছে, কেউ খেলা করছে, কেউ গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, আবার কেউ বা অলস দৃষ্টি তুলে মোটরের এই পাগলের মত ছোটা লক্ষ্য করছে! বায়োস্কোপের ছবির মত চোখের সামনে দিয়ে যেন দ্রুত ঠিক্‌রে চলেছে চতুর্দ্দিক, বিদ্যুতের গতিতে!

গি—বল্লেন,—ঐ দ্যাখো গ্র্যাণ্ড-কর্ড লাইন—আর ঐ দূরে বরাকরের পুল।

সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখি, দূরে প্রকাণ্ড খাদের মত নদী—আর তার বুকের উপর অতিকায় হাতির কতকগুলো মোটা মোটা পা—ঐটেই বরাকরের পুল। বরাকর নদীর বুকের বালিও স্পষ্ট নজরে পড়ল। নদী খুব চওড়া, জল বেশী নেই! মোটর এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীও ক্রমে তার দেহ স্পষ্ট দীর্ঘ করে চোখের সামনে জেগে উঠতে লাগল, শেষে—

ঐ মন্দির! নীচে, একেবারে পাতাল ফুঁড়ে ধব্‌ধবে সাদা চুড়ো জেগে উঠেছে। ও যেন কারো হাতে গড়া নয়—পাতাল থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে কোন্ মন্ত্রবলে! এখানে পথ এমন নীচু হয়ে গেছে যে মনে হয় পথ গিয়ে নদীর গর্ভে সেঁধিয়েছে! পথের ঠিক সামনে পথকে রোধ করে দাঁড়িয়ে মন্দির—কাজেই বেচারা পথ আর পথ না পেয়ে দক্ষিণে বেঁকেছে! ডাইনে মোটা মোটা

পাথর ঘাটের ধাপের মত প

একটা স্রোত কোন মতে যেন ছু

উঁচু পাথরের দেওয়ালে আড়াল-করা ে

জায়গাটায় কেবলই পাহাড় আর পাথ

পাহাড়—প্রকাণ্ড কালো মোষের মত নদী

সমস্ত জল শুষে যেন পড়ে আছে সব! বেচারী

বধূর মত ভয়ে লজ্জায়-সঙ্কোচে কোথায় পালিয়ে ে

তার পালিয়ে-যাওয়া পায়ের নূপুরের রেশের মত পাথ

ফাঁকে-ফাঁকে জল কোথাও সরু ধারে নেহাৎ কুণ্ঠিত কম্পিত সুরে বয়ে চলেছে, কোথাও বা বন্ধ—যেন থম্‌কে থেমে গেছে! পাহাড়ে পাহাড়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঢাকা মন্দিরটি এক রহস্যের জালে ঘেরা! ছায়া-স্নিগ্ধ এই শীতল কোণটুকু পেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।



কল্যাণেশ্বরী নদীবক্ষে

মোটর থেকে নেমেই দেখি, অগ্রবর্ত্তী বন্ধুরা সাম্‌নে দাঁড়িয়ে,—কপালে সিঁদুরের টিপ। মন্দিরের ফটকের সুমুখে হাড়কাঠ,—সদ্য বলির রক্তে জমি রাঙা হয়ে আছে। জুতা খুলে মন্দিরের মধ্যে সকলে ঢুকলুম। মন্দিরের মধ্যে নাট-মন্দির, প্রাঙ্গণ সবই আছে। একধারে একটা গাছে বোধ হয় অমন দশ হাজার ছোট নুড়ি বাঁধা! যাত্রীর দল দেবীর কাছে

..র, কার কি মানৎ সফল হয়েছে,—
..র ভারে ভক্তিটুকুও গুঁড়িয়ে ধূলো
..র খবর রাখে!

..বলুম। বিচিত্র মূর্ত্তি! ললাটে সোনার বরণ ..লক,—ঝক্‌ঝক্ করছিল অন্ধকারের মধ্যে, ..মত! মন্দিরের ঘরটী অন্ধকার—প্রকাণ্ড দীপ ..। আমরা প্রণামী দিলুম। দেবীর কাহিনী শুনতে ..লুম। দু-চার জন পূজারী ব্রাহ্মণ ছিল—কেউ বল্‌লে, এ দেবী রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রতিষ্ঠিত। কেউ বললে, বীরভূমের কোন্ রাজার প্রতিষ্ঠিতা এই দেবীমূর্ত্তি। একজন বললে,—এখানে এক সাধু থাক্‌তেন, বাঙালী সাধু। তাঁর কাছে বিস্তর ভক্ত আসতেন, প্রণামী দিতেন। তাঁর সমাধি হলে দেখা গেল, যেখানে তিনি বসতেন, সেই জায়গায় মাটীর নীচে প্রচুর অর্থ। সকলে মিলে সেই অর্থ সংগ্রহ করে এই মন্দির তোয়ের করিয়ে দিয়েছেন, আর ঐ টাকাতেই দেবীর পূজার বন্দোবস্ত আছে!

এ কাহিনী মেনে নিয়ে আরো কেউ কেউ বললেন,—মন্দিরের কথা তাই বটে, তবে প্রতিমা রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রতিষ্ঠিত।

যাই হোক্, সাহিত্যের কুঞ্জে মাঝে মাঝে টিনের বাঁশী বাজিয়ে লোককে চকিত সন্ত্রস্ত করে বেড়াই তো—ভেবেছিলুম, সে কুঞ্জে এবার প্রচণ্ড হুঙ্কার তুলে প্রত্নতত্ত্বের ভীষণ গদা ঘুরিয়ে যাব! কিন্তু হায়রে, 'বিধি তুষ্ট' নেহাৎ 'রুষ্ট', কাজেই সঠিক তথ্য আর অবিষ্কার হলো না। ক্ষ-বাবু বললেন,—কাহিনীর বই কিনতে পাওয়া যায়!

কিন্‌তে চাইলুম। সেখানকার লোকজন বললে, বই নেই। তবে পয়সা রেখে গেলে তারা বই সংগ্রহ করে কর্ম্মাটারের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে পারে।

বিষয়-মদমত্ত অবিশ্বাসী মন লোককে হঠাৎ বিশ্বাস করতে চায় না, বিশেষ তীর্থের পাণ্ডাকে! কাজেই পয়সার মায়া প্রবলভাবে ব্যাগকে সেঁটে ধরে রইল। তাদের কাছে কাহিনীর অগ্রিম মূল্য জমা দিয়ে আস্‌তে পারলুম না, অতএব সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের বিভাগটাকে আলোর ঝলকে ঝলকিত করার বাসনাও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত রইলো!

মন্দির দর্শন করে পাথুরে সিঁড়ি ভেঙ্গে নদীর গর্ভে পাথরের গায়ে এসে বসা গেল। শি-বাবু প্রভৃতি মিলে তখন চা তোয়ের করতে ব্যস্ত। ক্ষ-বাবুরা ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আমি আর ন- সামনে ঐ তুঙ্গ গিরি দেখে লোলুপ ভঙ্গীতে পাথরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মন্দির পেরিয়ে একেবারে ও-পারের চড়াইয়ে গিয়ে উঠলুম। চারিধারের গম্ভীর সুন্দর দৃশ্যে মন এমন দোল খেয়েছিল যে স্থান-কালের কথা ভুলে গেছলুম। মনে হচ্ছিল, আবার সেই সোনার শৈশব ফিরে পেয়েছি! মুক্ত প্রান্তরে দুজনে ঘুরতে ঘুরতে এসে দেখি, নদীটা বেঁকেছে এক জায়গায়। জল সেখানে গভীর—আর দুধারে পাথরের পাহাড়। নদীর ব্যবধান ঘুচিয়ে দুই পাহাড়কে বেঁধেছে এক ঝুলো পোল। পোলটি বেশ খরচ করে তৈরী। এ দৃশ্য দেখে দুজনে বিভোর হলুম। ছুটতে ছুটতে বন্ধুর দলে এসে বললুম—চলো হে, এটা না দেখলে এখানে আসাই মিছে হবে। ফটোগ্রাফার বন্ধুকে বললুম,—ঐ পুলের ছবি নাও ভাই, stereoscopeএ ভারী সুন্দর দেখাবে।

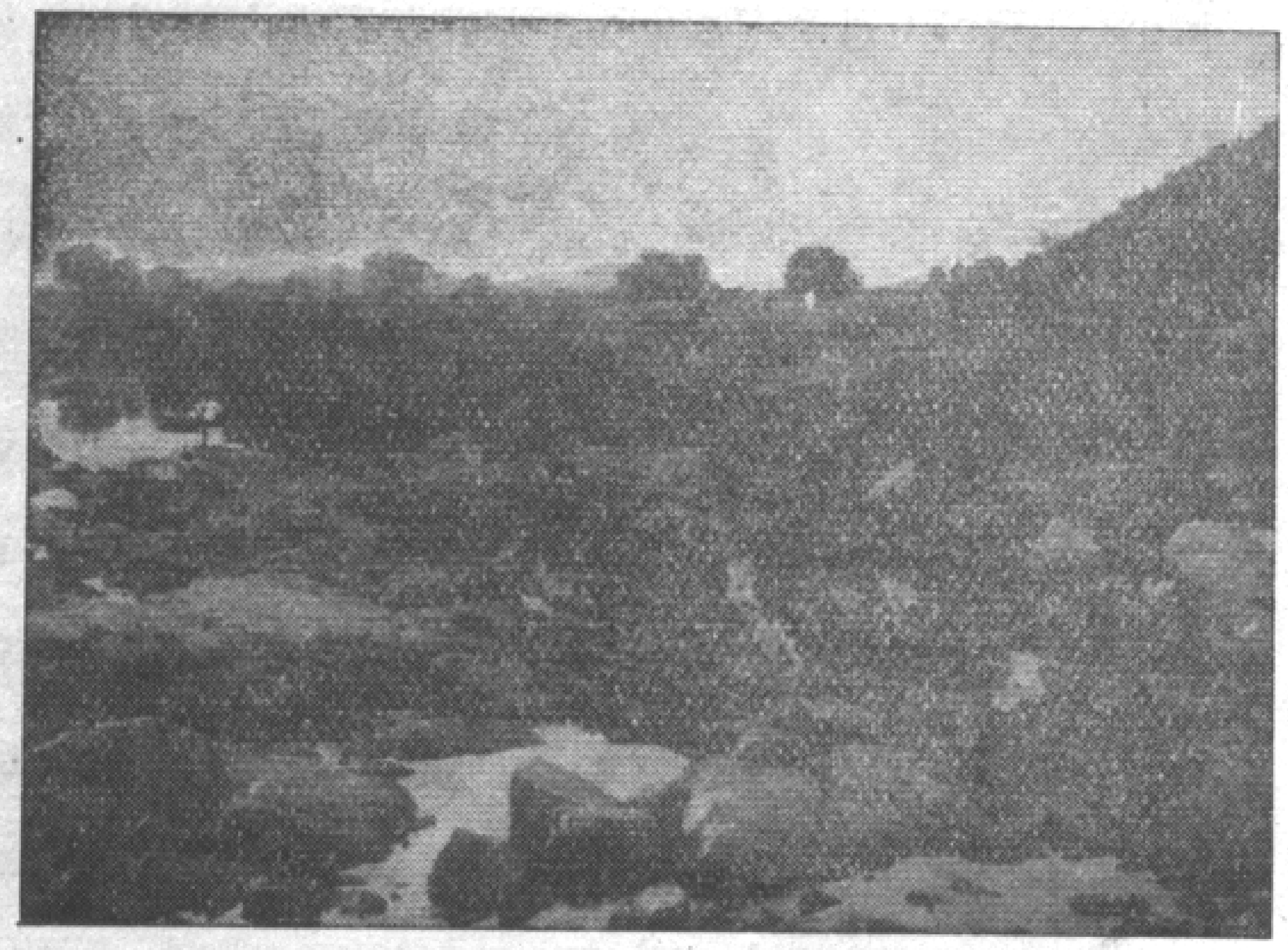
তখন দল-শুদ্ধ সকলে জিলিপি আর চায়ের টিফিন সেরে সেই পুলে এলুম। ফটোগ্রাফার-বন্ধু ক্যামেরা খুললেন। ন—পুলের তারে দোদুল-দোলা বানিয়ে বসে গেল। গি—মাঝে মাঝে বাঁকা শ্যামের নাচের ভঙ্গীতে পুলকে নাচতে লাগলো।

সূর্য্য ওধারে রক্তচ্ছটা বিস্তার করে ঢুলে পড়ছিল—পাহাড়ের গায়ের সবুজ তৃণগুল্মের উপর গোলা আবীরের মত সে রঙ্ ছিটিয়ে পড়ছিল। শি—বাবু বললেন,—আর নয়, গাড়ীতে চড়ুন, নইলে ট্রেণ ধরতে পারবেন না!

তখন সনিশ্বাসে এসে গাড়ীতে চড়লুম। বিদায়, বিদায় দেবী কল্যাণেশ্বরী, বিদায় ধূম্রশ্যামল স্নিগ্ধ পাহাড়, বিদায় ওগো পাথর-পুরী—কি বিপুল আনন্দের ঝরণাই যে বহিয়ে দিলে সহরের ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার এই প্রাণে! মেয়েদের সঙ্গে আনা হয়নি, তাঁরা এ দৃশ্য দেখতে পেলেন না, এ কথা ভেবে সকলেই দুঃখিত হলেন।

মোটর হু-হু করে ছুট দিলে—মিহিজামে পৌঁছে ট্রেণ ধরতে হবে। ধুলো উড়িয়ে সে চললো, ক্ষ্যাপার মত,

অতীতের মায়া পিছনে ফেলে। আশে-পাশে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমাদের বিদায় দিয়ে প্রকৃতি ম্লান দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন! আর কি কখনো দেখা হবে! আকুল মনে পিছন-পানে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখছিলুম—পাহাড়, মাঠ, ধানের ক্ষেত ক্রমেই যেন নিজেদের সঙ্কুচিত করে তুলছে—



কল্যাণেশ্বরী নদীবক্ষে টিফিন অদূরে পাহাড়

স্নেহের সহস্র বাহুর মায়াজাল গুটিয়ে নিচ্ছে! শেষে কখন্ যে এক নিমেষে চোখের সামনে সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা একখানা পর্দ্দা পড়ে গেল! ভাবের ঘোর কাটতে দেখি, মিহিজাম ষ্টেশনে মোটর এসে থেমে গেছে।

নেমে পড়লুম। মোটর তখন আবার চললো বাকী-দলকে আনতে—শি-বাবুরা সেখানে আছেন; তাঁদের ট্রেণের তাড়া ছিল না, মিহিজামেই থাকেন। মন্দির থেকে ষ্টেশনে পৌঁছতে ঠিক বিশ মিনিট সময় লাগল।

প্লাটফর্ম্মে এসে আমি সন্ধ্যার ছায়ায়-ঘেরা দক্ষিণ দিকের পানে চেয়ে ছিলুম—সন্ধ্যায় ছায়া নিবিড়, আরো নিবিড় হয়ে আসছিল! ক্রমে ওদিককার মায়াপুরী একেবারে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

একটা নিশ্বাস ফেলে দেখি, গি—বা ন—কেউ কাছে নেই। কোথায় গেল? খুঁজে পেলুম, হারায়নি। মিহিজাম ষ্টেশনের ঠিক বাইরে এখানকার যে একমেবাদ্বিতীয়ং জিলিপির দোকান্, সেইখানে দাঁড়িয়ে গি—জিলিপি কিনছে, ন-তার পাশে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি আমার তখন মনে হলো, না, ভাবুকতা আর নয়, এ মায়া, মরীচিকা! কাজেই মায়ার মায়া ত্যাগ করে কায়ার দিকে মন ফেরালুম, আমিও ঠোঙা ভরে বোঁদে-জিলিপি কিনলুম।

তারপর ঘণ্টা পড়ল। প্লাটফর্ম্মে এসে দেখি, কপালে জ্বল্‌জ্বলে আলোর টীপ পরে ঐ আসছে, আমাদের বাঞ্ছিত এক্সপ্রেশ! বাতিওয়ালা মই ঘাড়ে করে প্লাটফর্ম্মের আলোগুলো জেলে দিলে,—ট্রেণও চকিতে হুস্-হুস্ শব্দে এসে ষ্টেশনে দাঁড়াল। আমরা একটা ইউরোপীয়ান কম্পার্ট-মেণ্ট খালি দেখে উঠে পড়লুম।

তারপর? তারপর ট্রেণে ন—তার কণ্ঠ ছেড়ে গান ধরে দিলে।

সেই গানের সুরে সুরে, আর কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরের পাহাড়ের নদীর স্মৃতির নেশায়-নেশায় মশ্‌গুল চিত্ত নিয়ে কর্ম্মাটারে এসে যখন পৌঁছুলুম, তখন সেখানকার প্রবাসী বন্ধুর দল প্লাটফর্ম্মেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা অনুযোগের সুর ছাড়লেন,—বারে, আমাদের ফাঁকি দিয়ে দিব্যি সব picnic করে এলেন!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

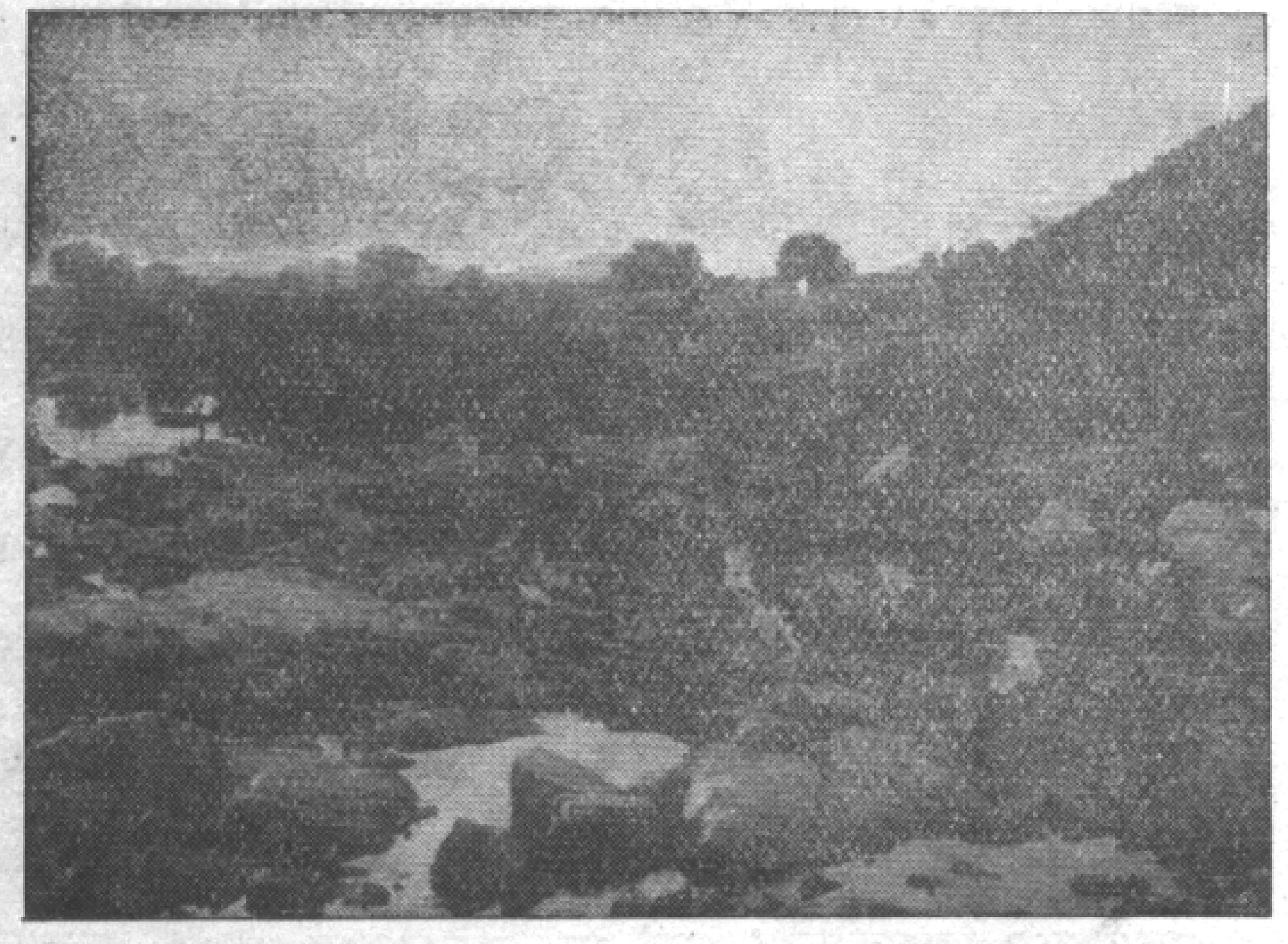
# নট-মঙ্গল

( বঙ্গীয়-নাট্যশালার অর্দ্ধশতাব্দ উৎসব উপলক্ষে )

সে কোন্ অনাদি যুগে সৃষ্টির আদিম তিথি হ'তে
যেদিন প্রথম সুরু হয়,
নিখিলের রঙ্গালয়ে নরনারী পশুপক্ষী কীট
সবার অনন্ত অভিনয়;

জন্ম হ'তে মরণের মুহূর্ত্ত অবধি চলিয়াছে
অবিরাম সে মহানাটক,
বিবিধ বিচিত্র রসে; সমাপ্তির শেষ যবনিকা
কভু যারে করেনি আটক;

অতীতের মায়া পিছনে ফেলে। আশে-পাশে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমাদের বিদায় দিয়ে প্রকৃতি ম্লান দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন! আর কি কখনো দেখা হবে! আকুল মনে পিছন-পানে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখছিলুম—পাহাড়, মাঠ, ধানের ক্ষেত ক্রমেই যেন নিজেদের সঙ্কুচিত করে তুলছে—



কল্যাণেশ্বরী নদীবক্ষে টিফিন অদূরে পাহাড়

স্নেহের সহস্র বাহুর মায়াজাল গুটিয়ে নিচ্ছে! শেষে কখন্ যে এক নিমেষে চোখের সামনে সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা একখানা পর্দ্দা পড়ে গেল! ভাবের ঘোর কাটতে দেখি, মিহিজাম ষ্টেশনে মোটর এসে থেমে গেছে।

নেমে পড়লুম। মোটর তখন আবার চললো বাকী-দলকে আনতে—শি-বাবুরা সেখানে আছেন; তাঁদের ট্রেণের তাড়া ছিল না, মিহিজামেই থাকেন। মন্দির থেকে ষ্টেশনে পৌঁছতে ঠিক বিশ মিনিট সময় লাগল।

প্লাটফর্ম্মে এসে আমি সন্ধ্যার ছায়ায়-ঘেরা দক্ষিণ দিকের পানে চেয়ে ছিলুম—সন্ধ্যায় ছায়া নিবিড়, আরো নিবিড় হয়ে আসছিল! ক্রমে ওদিককার মায়াপুরী একেবারে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

একটা নিশ্বাস ফেলে দেখি, গি—বা ন—কেউ কাছে নেই। কোথায় গেল? খুঁজে পেলুম, হারায়নি। মিহিজাম ষ্টেশনের ঠিক বাইরে এখানকার যে একমেবাদ্বিতীয়ং জিলিপির দোকান্, সেইখানে দাঁড়িয়ে গি—জিলিপি কিনছে, ন-তার পাশে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি আমার তখন মনে হলো, না, ভাবুকতা আর নয়, এ মায়া, মরীচিকা! কাজেই মায়ার মায়া ত্যাগ করে কায়ার দিকে মন ফেরালুম, আমিও ঠোঙা ভরে বোঁদে-জিলিপি কিনলুম।

তারপর ঘণ্টা পড়ল। প্লাটফর্ম্মে এসে দেখি, কপালে জ্বল্‌জ্বলে আলোর টীপ পরে ঐ আসছে, আমাদের বাঞ্ছিত এক্সপ্রেশ! বাতিওয়ালা মই ঘাড়ে করে প্লাটফর্ম্মের আলোগুলো জেলে দিলে,—ট্রেণও চকিতে হুস্-হুস্ শব্দে এসে ষ্টেশনে দাঁড়াল। আমরা একটা ইউরোপীয়ান কম্পার্ট-মেণ্ট খালি দেখে উঠে পড়লুম।

তারপর? তারপর ট্রেণে ন—তার কণ্ঠ ছেড়ে গান ধরে দিলে।

সেই গানের সুরে সুরে, আর কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরের পাহাড়ের নদীর স্মৃতির নেশায়-নেশায় মশ্‌গুল চিত্ত নিয়ে কর্ম্মাটারে এসে যখন পৌঁছুলুম, তখন সেখানকার প্রবাসী বন্ধুর দল প্লাটফর্ম্মেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা অনুযোগের সুর ছাড়লেন,—বারে, আমাদের ফাঁকি দিয়ে দিব্যি সব picnic করে এলেন!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

# নট-মঙ্গল

( বঙ্গীয়-নাট্যশালার অর্দ্ধশতাব্দ উৎসব উপলক্ষে )

সে কোন্ অনাদি যুগে সৃষ্টির আদিম তিথি হ'তে
যেদিন প্রথম সুরু হয়,
নিখিলের রঙ্গালয়ে নরনারী পশুপক্ষী কীট
সবার অনন্ত অভিনয়;

জন্ম হ'তে মরণের মুহূর্ত্ত অবধি চলিয়াছে
অবিরাম সে মহানাটক,
বিবিধ বিচিত্র রসে; সমাপ্তির শেষ যবনিকা
কভু যারে করেনি আটক;

শৈশব যৌবন জরা জীবনের প্রতি পলে পলে
অগণিত কত ভূমিকায়
বিয়োগ-মিলন-রঙ্গে নানা ভঙ্গে নানা দৃশ্য পটে
অবতীর্ণ হয়ে চলে যায়
প্রকৃতির পাত্রপাত্রী, সংসারের কুশীলব তারা—
অভিনেতা-অভিনেত্রী সবে,
দেবোত্তর-বিশ্বনাট্য নিশিদিন সমারোহে গাহে
নাহি জানে শেষ তার কবে ?
...... ... ......
তারি ছায়া, তারি কায়া, রীতি, নীতি, তাহারই প্রকৃতি
কণামাত্র করিয়া সঞ্চয়,
মানুষ গড়িয়াছিল খেলিবারে ক্ষুদ্র নাট্যশালা
প্রদর্শিতে খণ্ড অভিনয় !
বিরাট জীবন-নাট্য জলধি হইতে উচ্ছ্বসিত
ক্ষণভঙ্গ তরঙ্গ-হিল্লোল,
ক্ষুদ্র সেই রঙ্গালয়ে তুলেছিল কোটী মুগ্ধ মনে
পুলক-চঞ্চল ফুল-দোল !
জন্ম যার আনন্দের যোগাইতে সুন্দর ইন্ধন
বন্ধন-কাতর নারী-নরে,
সে কবে পশেছে আসি সঙ্গোপনে রঙ্গালয় হ'তে
মানবের নিভৃত অন্তরে,
জাগাইয়া জাতীয়তা, লোক-শিক্ষা করিয়া প্রচার
আদর্শ চরিত্রে নটরাজ,
সৃজন করিছে নিত্য জীর্ণ গৃহে জ্ঞানালোক জ্বালি
নবভাবে নূতন সমাজ !
...... ...... ... ..
তারি সার্থকতা বুঝি, একদা এ পতিত প্রাঙ্গণে
এক কোণে ভাগীরথী-কূলে
বঙ্গের অঙ্গনে মিলি বাঙ্গালীর ক'টি বীর ছেলে
সবার বিরুদ্ধে শির তুলে
খুলেছিল রুদ্ধদ্বার নটনাথ শিবের মন্দির
বঙ্গের প্রথম রঙ্গালয়,—
চৌদিকে ধ্বনিত যার যশ গান খ্যাতির দুন্দুভি
নাট্য-কলা-নৈপুণ্য-বিজয় !
সেদিন কি জানে তারা সেই মহা শুভ পুণ্যক্ষণে
যাহারা রচিল নাট্যশালা,
ঘুচাবে সে একদিন এ জাতীয় জীবনের গ্লানি
পুঞ্জীভূত অন্তরের জ্বালা !
শ্রীরঙ্গ-মন্দিরমাঝে আবির্ভূত দেখেছি সেদিন
বহুরূপী নট ধুরন্ধর
সেই মূর্ত্তি অপরূপ পঞ্চাশৎ বর্ষশেষে আজও
উদ্ভাসিত করিছে অন্তর।
...... ...... ......
'অর্দ্ধেন্দু' শোভিত ভালে শুভ্রোজ্জ্বল হাস্য-জ্যোতি-রেখা
'নীলকণ্ঠ' 'অমৃত' মূরতি,
'মহেন্দ্র' 'মাধব' 'রাম' চর্চ্চিত চরণ-পদ্মদ্বয়ে,
সুরা'সুর' সকলের 'মতি'—
মেঘে যথা 'কাদম্বিনী' সেই মত জটাজালে যার
'ক্ষেত্রমণি' 'গঙ্গা' অধিষ্ঠান—
যাদুমন্ত্রে ভুজঙ্গিনী কণ্ঠলগ্ন নিশিদিন যার,
'সুকুমারী' 'সুশীলা'-সমান !
'নগেন্দ্র'-'বিহারী' দেব রজত-'কিরণ' মুখ-প্রভা
শরৎ সুন্দর শ্বেতকায় !
মৃত্যুঞ্জয় 'অমরেন্দ্র' মহাযোগী 'মাধুকর' ব্রতী
শ্রীহরি সেবক সদা পায় ;
প্রীত যিনি 'বেল'পত্রে শৃঙ্গরব ডমরু-নিনাদে
গীতি-বাদ্য-নৃত্য-অবতার—
দ্বীপিচর্ম্ম কটিবাস অঙ্গরাগ ভস্ম-বিলেপনে
হাড়মাল্য-'কড়ি' অলঙ্কার !
...... ...... ......
নমঃ নমঃ নটনাথ ! হে 'গিরীশ', দেব গৌরীপতি
নাট্য-রথী, নট-চূড়ামণি,
সার্দ্ধশত বর্ষোৎসবে জাগে আজি মনে সেই তব
নব রূপ রঙ্গ-রস-খনি !*

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

# পরের ছেলে

## দ্বিতীয় খণ্ড

### প্রথম পরিচ্ছেদ

যেদিন বিনয়-অভাবে কিশোরের স্বভাব এবং নির্দ্দয় স্নেহহীন অন্তরের আভাস পাইয়া ভবিষ্যৎ-চিন্তায় রাজেশ্বরী দেবী চমকিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন, তাহার পরে কয়েক বৎসরই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেই যে বিনয় চলিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার আর কোন সন্ধানই মেলে নাই। অনুসন্ধানে ত্রুটি হয় নাই—অসংখ্য উপায়ও দেখা হইয়াছিল, সংবাদ-পত্রে দুই-এক বৎসর ধরিয়া "তোমার মামী" স্বাক্ষরে বিনয়ের উদ্দেশে অনেকখানি ব্যথা-মিশ্রিত আহ্বান প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার পরে তাহার আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া পুরস্কার ঘোষণাও কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

চিরদিনের মত এখনো রাজেশ্বরী দেবীই কিশোরের এষ্টেট ও তাহার বিদ্যা-শিক্ষা এবং সর্ব্বপ্রকারের অভিভাবকত্বের ভার বহন করিয়া চলিয়াছেন। বলিতে গেলে তিনি কিশোরকে সন্তানত্বে গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত একাই এ সমস্ত করিয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণই ছিল। চির-উদাসীন বিনয়ের সেই কয়দিন সংসারী সাজার স্মৃতি তাঁহার মনে এখনো দাগ কাটিয়া বসিয়া আছে বটে, কিন্তু তবুও তাহার অভাবে এ বিষয়ে কিছুই আটকায় নাই।

আর যে বিষয়ে তিনি সব-চেয়ে বেশী ভাবিয়া ছিলেন সেই কিশোরের সম্বন্ধে চিন্তা, এই হৃদয়-হীন বালক বুঝি তাঁহারও বশীভূত হইবে না, না জানি এ কিরূপ স্বেচ্ছাচারী কি উদ্ধত প্রকৃতিরই হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে আরো কত অনুতপ্তই করাইবে—তাঁহার এই যে বিষম চিন্তা,—বিনয়ের যাওয়ার পর হইতে যাহার দংশনে তিনি মাঝে মাঝে অধীর হইয়া উঠিতেন, সে চিন্তাও তাঁহার এখন সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনয়ের সঙ্গে সেই ব্যবহারের পর কিশোর আর এ-পর্য্যন্ত কাহারো সহিত ঔদ্ধত্যই প্রকাশ করে নাই। এমন কি দাসী-চাকরকে কখনো কটু কথা বলিয়া বেদনা দেয় নাই। রাজেশ্বরীর তো সে একান্তই বশ। বিনয় থাকিতে মাঝে মাঝে অনেক একরোখা একগুঁয়েমি প্রকাশ করিয়াছে বটে কিন্তু বিনয়ের সেই গৃহ-ত্যাগের পর হইতে সে যেন অন্য কিশোর বনিয়া গিয়াছে। একান্ত শান্ত বিনয়ী ধীর প্রকৃতির বালকটিকে এখন যে দেখিত সেই প্রশংসা করিত। ইহাতেও কিন্তু রাজেশ্বরী মাঝে মাঝে মনে বেদনা বোধ করিতেন। হায়, তবে সেইই কি কিশোরের এত বিদ্বেষের পাত্র ছিল? তাহার সংসর্গের জন্যই কি কিশোর সর্ব্বদা এত রোষ-ভাবাপন্ন থাকিত? সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বরীর মনে অনেক কথাই জমিয়া উঠিত। সেই বিনয় আর তার সেই মানিক। কিসে এমন হইল? সেই তাহার চক্ষের মণি বক্ষের মাণিক তাহার কোন্ অপরাধে বাপকে চক্ষুশূল বোধ করিল যে তাহাকে তাড়াইয়া তবে ছেলে নিশ্চিন্ত হইল? এতদিনেও সেই নিরুদ্দিষ্ট পিতার সম্বন্ধে একটা কথা, একটু বেদনা বা একটু অনুসন্ধানের ইচ্ছাও সে কাহারো কাছে ব্যক্ত করে নাই।

একদিন ভুলিয়াও কি সে-বাপের নাম বা তাহার বিষয়ে কোন কথা মুখে আনিতে নাই! এইটুকু বালকের এতখানি নির্দ্দয়তা—এ যেন অনন্যসাধারণ! শোনা যায় বটে যে পোষ্যপুত্রগুলা প্রায় এমনিই হয়, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও তো কত জায়গায় দেখা গিয়া থাকে। সেই কোমল শিশু কি করিয়া এমন কুলিশ কঠোর হইয়া উঠিল!

এই তো এখনো সেই কিশোর, কিন্তু কে বলিবে যে সেই? এখন সে আঠারো বছরের যুবা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই নয়, যেদিন হইতে বিনয় গিয়াছে সেই দিন হইতেই তো তাহার চরিত্র আশ্চর্য্য রকম বদলাইয়া গিয়াছে! কি অপরাধে বিনয়েরই উপর তাহার এত দ্বেষ জন্মিয়াছিল? অপরাধের মধ্যে তো কাঙাল বাপ্ তাহাকে রাজেশ্বর করিয়া দিয়া নিজেই কাঙাল বনিয়াছিল! অকৃতজ্ঞ সন্তানের ইহাতেই কি এমন পিতৃদ্রোহ!

কিন্তু অলক্ষ্যে তাঁহার অনুভবশীল অন্তর নিঃশব্দে আরও যেন কি তাঁহাকে শুনাইত,—তাই তিনি সমস্ত কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষে হঠাৎ এক সময় একটু শিহরিয়া নতশিরে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার মনে হইত, এমন যেন জগতে আরও অনেক ঘটিয়া গিয়াছে! এ কথা নূতন নয়। এরূপ কাণ্ডের পর সন্তানের এইরূপ পূর্ব্ব-পিতৃ-বিদ্বেষ যেন বহু স্থানেই দেখা গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কি যে একটা হয় তাহা তাহারাই জানে. কিন্তু পূর্ব্ব পিতা-মাতাকে যে সহ্য করিতে পারে না ইহা একটা বহু পরীক্ষিত সত্য। এ কথা তিনি কি কখনো শোনেন নাই? শুনিয়া ছিলেন বৈকি, কিন্তু কিশোরকে পাইবার জন্য তাঁহার সেই উন্মত্ততার সময়ে এ তথ্য চোখ মেলিয়া দেখিবার শক্তি তাঁহার ছিল না! স্বামী দেখিয়াছিলেন, তাই শত প্রকারে বাধা দিয়াও পত্নীকে এই সাংঘাতিক বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা তখন বিনয়ের জন্যও স্বতন্ত্র সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন যে রাজেশ্বরী যাহা ভাবিতেছেন তাহা হইবে না! বিনয়ের অদৃষ্টে অনেক কষ্টই আছে!

কিন্তু এতটা বোধ হয় তিনিও ভাবিতে পারেন নাই। বিনয় যে মাণিকের বিনিময়ে জগতের কিছুই গ্রহণ করিবে না এতখানি বোধ হয় তিনিও জানিতেন না। জানিলে হয়তো পত্নীকে শেষ অনুমতিটুকুও দিয়া যাইতেন না। কিশোর হয়ত জানে না, রাজেশ্বরী তো জানেন, মাণিকের ব্যারামে বিধাতা যদি বিনয়কে বিচলিত না করিতেন, তাহা হইলে আজ এ সম্পত্তি আর ঐ মাণিক সবই বিনয়ের থাকিত! যাহার এই সর্ব্বস্ব, সে আজ কোথায় ভিখারী হইয়া বেড়াইতেছে! এবং ইহার একমাত্র কারণ রাজেশ্বরী নিজে!

মানুষের বিবেক মানুষকে অনেক সময় এমন অনেক জ্ঞান এবং দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া থাকে কিন্তু দুর্ব্বল মানব কতক্ষণ সে কথা কান দিয়া শোনে বা সে চোখ দিয়া দেখে? দেখিবার শক্তিই যে তাহার নাই! সে সত্যকে সহ্য করিবার শক্তি তাহার কোথায়? তাই তখনি সে মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র সরিয়া যায়! রাজেশ্বরীরও তাহাই বেশীক্ষণ দাঁড়াইতেই পারিতেন না; তখনি তাঁহার সাজানো সংসারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। এখন তাঁহার সেই সুখের সময় আসিয়াছে যাহার চিন্তায় তিনি বহুকাল হইতে তৃষিত আছেন। শত ঝঞ্ঝা সহিয়াও ইহারই বাসনায় এমন করিয়া জগতের নিকট হইতে সন্তান আদায় করিয়াছেন। ভগবান দেন নাই, উপায় কি—এ নিরুপায় নৈরাশ্যকে চেষ্টার দ্বারা সরাইয়া তিনি পুত্রহীনা নাম ঘুচাইয়াছেন। তাঁহার কিশোর এখন তাঁহার একান্ত-বশ্য সুসন্তান! সর্ব্ব বিষয়েই তাহার সুযশ—বিদ্যা-মন্দিরেও কিশোর দিন দিন নব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে, আর তিনি অতৃপ্ত চক্ষে তাহার এই ক্রমবর্দ্ধনশীল দিব্য কান্তির দিকে চাহিয়া ভাবিতেছেন যে এইবার তাঁহার কিশোরের একটি বৌ আনিতে পারিলেই সংসারটি সাজন্ত হইয়া ওঠে! সঙ্গে সঙ্গে নাতি নাতিনীর মধুর চিত্রগুলি তাঁহার শেষ বয়সের সমৃদ্ধি সূচনা করিয়া মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হইত। রাজেশ্বরী ইতিমধ্যে দুই এক জায়গায় সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যার সন্ধানও লইয়াছেন কিন্তু তাহাতে পুত্রের এত বেশী নিরুৎসাহী ও অবসাদপূর্ণ ভাব দেখিয়াছেন যে সেদিকে তাঁহার আর বেশী অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয় নাই। মনে করিয়াছেন, থাক্, তবে আরও কিছুদিন যাক্। ছেলের অন্তরের কিশোরত্ব ঘুচিয়া সেখানে যেদিন যৌবনের আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেদিন ছেলে এ বিষয়ে নিজেই আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে। এখন সে তবে আরও কিছুদিন বালক কিশোরের বেশে তাঁহার কোলের কাছেই থাকুক।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বাড়ী আসিয়া কিশোর পরীক্ষার দুরন্ত উদ্বেগের অবসরে শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছিল, আর রাজেশ্বরী ভাবিতেছিলেন, আর কেন, এইবার মনের মত বৌ আনিয়া সংসার সাজাইয়া ফেলি। ছেলে উনিশ বৎসর অতিক্রম করিল, তিনটা পাশ দিল, ছেলেরও আর কিছু আপত্তি থাকিতে পারে না। পরীক্ষায় এবারও যে সে

তিনি তখন তাঁহার দূরস্থিত আত্মীয়-স্বজনকে সুন্দরী এবং সদ্বংশ-জাতা কন্যার সন্ধান দিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পূর্ব্বে অনেক সম্বন্ধই আসিয়াছিল—এখন হইবেনা বলিয়া তাহাদের নিরাশ করিয়াছেন; এখন তাহারা কেহ আশায় আছে কিনা এবং তাহাদের বংশ এবং কন্যা কিরূপ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাহার আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হইলেন।

বিনয়কে কি আজ তাঁহার মনে পড়িতেছিল না? সর্ব্বক্ষণেই পড়িতেছিল কিন্তু কোন উপায় তো নাই। আজ প্রায় দশ বৎসর সে চলিয়া গিয়াছে—কোন উপায়ে তাহার সামান্য খোঁজটুকুও তো পাওয়া যায় নাই। রাজেশ্বরীর মনে অলক্ষ্যে একটা আশা জাগিতেছিল যে কিশোরের বিবাহের কন্যা ও দিন স্থির করিয়া একবার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া দেখিবেন, যদি সেই উপলক্ষে বিনয় তাহার মাণিককে ও তাহার বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসে। কিন্তু সব চেয়ে প্রধান কথা—সে বাঁচিয়া আছে তো! কপর্দ্দক-হীন অবস্থায় পথে বাহির হইয়া সেই চিরসুখ-লালিত বিনয় কিরূপে আপনার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, না জানি। নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছে ত? অথবা অনাহারে নিরাশ্রয়ে কিই না জানি তাহার হইয়াছে।

এ চিন্তা কিন্তু রাজেশ্বরী বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিতেন না। আছে, নিশ্চয় সে বাঁচিয়া আছে! তাহার কি এতটুকু সামর্থ্য হয় নাই যে নিজের দেহ আর প্রাণটাকে রক্ষা করিয়া চলে! এ তো অতি-অজ্ঞেও পারিয়া থাকে, সেও নিশ্চয় পারিয়াছে। দেখা যাক্, যদি এই বিবাহ উপলক্ষেও সে ফিরিয়া আসে।

গ্রীষ্মের তখন মধ্যভাগ। দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম সুখ একেবারে যেন অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে। দরজা জানালার খস্‌খসের পরদায় মাঝে মাঝে জল ছিটাইয়া এবং ঘরের মধ্যে অনবরত টানা পাখার হাওয়া বহাইয়াও সে বাতাস স্নিগ্ধ হইতেছিল না। রাজেশ্বরীর মনের মধ্যেও উত্তেজনার একটা প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিতেছিল যাহার প্রভাবে তিনি বেশীক্ষণ আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। ঘুম সেদিন এক রকম আসেই নাই। বহু কন্যাপক্ষদিগকে অনর্থক দুরাশা হইতে ক্রমে নিরাশায় ফেলিয়া এতদিনে তাঁহার মন একটি কন্যাকে তাঁহার তরুণ অরুণের মত সুন্দর কিশোরের উপযুক্ত বলিয়া মনে ধরিয়াছে। এই ধারণা জন্মিবামাত্র তিনি ধৈর্য্য-ধারণে অক্ষম হইয়া পড়িতেছিলেন। সেদিন দ্বিপ্রহরের নিদ্রাটুকুও আর তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না। কিশোরের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষায় এতক্ষণ কষ্টে শয্যায় পড়িয়াছিলেন,—তিনটা বাজিতেই উঠিয়া কিশোরের ঘরের দিকে চলিলেন।

পাখা চলিতেছে। ঘর নিস্তব্ধ দেখিয়া ভাবিলেন, তবে কিশোর বুঝি এখনো ওঠে নাই! ফিরিয়া যাইতে যাইতে ফাঁক দিয়া গৃহের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন, ঘরের কোন জানালা খোলা আছে—কিশোর জাগিয়া হয়ত কিছু পড়িতেছে! আঃ ছেলের কোন কাণ্ড-জ্ঞান নাই, এই রৌদ্রেও জানলা খোলে! তাহা হইলে ঘর কিসে ঠাণ্ডা হইবে! ধীরে ধীরে আল্‌গা দরজা খুলিয়া রাজেশ্বরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, খাটের নিকটেরই জানালাটা খুলিয়া দিয়া কিশোর উপুড় হইয়া পড়িয়া নিবিষ্ট মনে একটা কাগজ দেখিতেছে। দূর হইতেই তিনি বুঝিলেন, ওটা খবরের কাগজ। কিশোর এতই নিবিষ্ট চিত্তে সেদিকে চাহিয়া আছে যে তাঁহার গৃহে প্রবেশ বা পালঙ্কের নিকটে উপস্থিত হওয়া কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। রাজেশ্বরী যখন একেবারে পুত্রের পার্শ্বে পালঙ্কের উপরে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "কি দেখ্‌ছিস?" কিশোর তখন চমকিত হইয়া মুখ তুলিল। রাজেশ্বরী কতকটা শিক্ষিতা ছিলেন। বাংলা লেখা-পড়া বেশ ভালই জানিতেন, এবং ইংরাজিরও অক্ষর-পরিচয়, যথা চিঠির শিরোনামা বা ছাপার কাগজের মোটামুটি বিষয়গুলা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন; তাই কাগজখানার দিকে নজর পড়িতেই তিনি তখন একটু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কিরে তোর বি-এর খবর বেরিয়েছে নাকি?"

কিশোর তখন মাথা নামাইয়া উত্তর দিল, "না মা।"

"না কি রে,—এই তো! ও, বি-এ নয়, ইণ্টার-মিডিয়েট, তোদের আই এ বুঝি, না? তোর কোন বন্ধু আই এ দিয়েছে বুঝি? ঐ যে খুব মোটা লাল দাগ দিয়েছিস্! প্রথম

দিকেই নাম যে। তোর মতই খুব ভাল পাশ হয়েছে, দেখ্‌ছি—না? নামটা—"নির্ঝরিণী মজুমদার, বেথুন কলেজ।—"

একরাশ বিস্ময় লইয়া রাজেশ্বরী পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে একভাবেই মাথা নামাইয়া কাগজখানার দিকে চাহিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে নিজের সেই প্রভূত বিস্ময় সবলে দমন করিয়া সহজ কণ্ঠে রাজেশ্বরী কিশোরকে প্রশ্ন করিলেন, "কেরে মেয়েটা? তোর কি জানা-শোনা?"

"হ্যাঁ, আর তোমারো।"

"আমারো? আমিও তাকে জানি? কে রে?"

"রাঁচির সেই ঝর্‌ণা।"

"রাঁচির ঝর্‌ণা? সেই পরীর মত মেয়েটুকুন্‌,—তারই এত সাধ্যি? বলিস্‌ কি?"

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া রাজেশ্বরী আবার সহজ স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "সেই ঝর্‌ণা, তুই কি করে জান্‌লি?"

মাথা নামাইয়া মৃদু হাসিয়া কিশোর বলিল, "আমি জানি।" ছেলের সেই মৃদু হাস্য-রঞ্জিত তরুণ সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে রাজেশ্বরী বলিলেন, "তাহলে তোর সঙ্গে তার আলাপ আছে—জানাশোনা আছে?"

"না।"

"না? তোর সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাশোনা আলাপ নাই থাক্‌, পরোক্ষে জানাশোনা একটুও তো আছে! নইলে কি করে বুঝ্‌লি, সেই ঝর্‌ণা?"

ধীর মৃদুকণ্ঠে কিশোর বলিতে লাগিল, "আমি যখন আই এ পাশ করি তখনো এই নামে একজন বেথুনের মেয়ে ম্যাট্রিকে ইউনিভারসিটিতে সেকেণ্ড্‌ হয়ে পাশ হয়েছে দেখেছি,—আবার এবার এই দেখ্‌তেই পাচ্ছ।"

বিস্ময়ের আবার একটা ধাক্কা কাটাইয়া সহসা সবেগে রাজেশ্বরী বলিয়া উঠিলেন, "তাতেই তুই মনে করেছিস্‌ সেই ঝর্‌ণা? পাগ্‌লা কোথাকার! নির্ঝরিণী মজুমদার কি আর কোন মেয়ের নাম থাক্‌তে পারে না?"

"পারে, কিন্তু এ নির্ঝরিণী সেই ঝর্‌ণা! তারাও

শিক্ষিতা করা হয়। তার বড় বোন্‌ বেথুনে পড়ে পাশ দিয়েছে, তখনি তো শুনেছিলে। আর বছর-খানেক হল একদিন আমি তাকে দেখেছি। বেথুনের বোর্ডিংয়ের দুয়োরে একটা ঘরের গাড়ী দাঁড়ালো আর সেই ঝর্‌ণারই মত দেখ্‌তে একটি বড় মেয়ে, সঙ্গে আরও ছোট-বড় কজন মেয়ে নাম্‌লেন। কে একজন যেন ঝর্‌ণা নামটাও বল্লেন।"

পুত্রের আরক্তিম আনত মুখের পানে চাহিয়া রাজেশ্বরী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "দশ বছরের কথা—কতটুকু তখন তোমরা। এ বাপু তোমার মনের একটা ভুলও হতে পারে ত!"

"পারত যদি না আমি আর একটু বেশী জান্‌তে পার্‌তাম! সেদিন আমি নিজের দরকারে তখনি চলে যাই। আবার একদিন সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে সেইখানে সেই গাড়ীখানাকে খালি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা করি, সেখানা মোহিনী বাবুর বাড়ীর গাড়ী কি না? সহিস্‌ বল্লে—হ্যাঁ, তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা বোর্ডিংয়ে বেড়াতে এসেছেন।"

"ঝর্‌ণার বাপের নাম কি মোহিনী বাবু? মজুমদার?"

"হ্যাঁ—তুমিও তো শুনেছিলে। ভুলে গেছ?"

রাজেশ্বরী মনে মনে একটু হাসিয়া ভাবিলেন, বাপু তোমাদের মত এ-সব বিষয়ে স্মৃতিশক্তির জৌলুস্‌ কি আমাদের হইতে পারে! তারপর কিভাবে কথাটাকে আরও অগ্রসর করিতে পারেন, তাই একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "তা যদি সেই ঝর্‌ণাই ঠিক্‌ বুঝেছিলি, তাদের বাড়ী গিয়ে একটু আলাপ-পরিচয় করিস্‌নে কেন এ পর্য্যন্ত?"

মাতার পানে এইবার মুখ তুলিয়া সহজভাবে কিশোর উত্তর দিল, "কি যে তুমি বল মা! তা কি করে সম্ভব হবে! বলা নেই, কওয়া নেই, অমনি একদিন হুড়মুড় ক'রে তাঁদের বাড়ী গিয়ে, আমি সেই রাঁচির কিশোর গো—বল্‌লেই কি হ্‌ল? পাগল ভাববেন না কি তাঁরা?"

"এর আবার পাগল কি? পুরোনো জানাশোনা থাক্‌লে বহুকাল পরেও কি এমন লোকে যায় না?"

মনেও পড়্‌বেনা। আর যদিই বা পড়ে—দরকার কি তাতে ?"

"তাই বল্‌। নৈলে তোর যখন মনে আছে, তখন তারই বা থাক্‌বে না কেন! বিশেষ যে অসাধারণ মেয়ে দেখ্‌ছি—নিশ্চয় সেও আমাদের ভোলেনি। তুই গিয়ে দেখ্‌লিনে কেন ?"

কিশোরের শুভ্র সুন্দর মুখ আবার আরক্ত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ যেন ঈষৎ স্ফুরিত হইল—মাতাকে কি যেন একটা বলিবে। রাজেশ্বরী প্রতীক্ষাপূর্ণ নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কিশোরের এমন একটা ভাবান্তর আসিয়া গেল যে দেখিয়া আবার তিনি বিস্মিত হইলেন। মুখ যেন একেবারে রক্তলেশহীন,—কাগজের মত সাদা, ঠোঁটদুটি নীল। যে চক্ষু কিসের একটা আলোক-পাতে হীরার মত জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সে চক্ষু তখনি নিষ্প্রভভাবে অবনত হইয়া গিয়াছে। রাজেশ্বরী তাঁহার বিস্ময় এবার দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিরে তারা কি অজাত্‌? ব্রাহ্ম না আর কিছু ?"

বহুদূর হইতে যেন কিশোর উত্তর দিল, "তাতো আমি জানিনে মা, আর জেনেই বা কি হবে ? তাঁরা যাই হোন্‌, আমি যা তাই তো! অন্যের পরিচয়ে আমার কি দরকার ? আমার পরিচয়—" বলিতে বলিতে সহসা নিস্তব্ধ হইয়া কিশোর অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

"তোর আবার পরিচয় কি! তোকে যদি তাদেরও মনে থাকে তোর পরিচয়ও তাঁদের মনে পড়বে। না পড়ে, আবার আলাপ করলেই জান্‌তে পারবেন। আমি তো একবার কালীঘাটে পুজো দিতে যাবই,—তোর যেতে লজ্জা হয়, আমায় একবার তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিস্‌। আমি জানি, এখন শিক্ষিত হিন্দু সমাজেও মেয়েদের এরকম লেখা-পড়া শেখায়—তাদেরও তখন আমার সেই রকমই বোধ হয়েছিল, কিন্তু দেখতে হবে বাপু, অজাত্‌ না হয়।"

"মা তুমি কি বল্‌ছ! আলাপ করতে চাও, কর—মোহিনীবাবু আলিপুরের জজ্‌। তাঁর বাড়ী খুঁজে বার করা এত বেশী শক্ত হবে না! কিন্তু জাত-অজাত্‌—ও-সব কথা কেন আন্‌ছ ? তাঁরা ব্রাহ্ম কি শিক্ষিত হিন্দু, সে খবরে আমাদের দরকার ?"

মৃদু হাসিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "দরকার আছে কি না সে পরে দেখা যাবে। এখন এম-এ পড়তে তুই কল্‌কাতায় কবে যাবি, বল্‌ ?"

"দাঁড়াও মা, আগে পাশই হই।"

"ঝরণা এমন পাশ হয়েছে, আর তুই ফেল্‌ হবি—এ কথা ভাব্‌তে লজ্জা করেনা তোর ?"

কিশোর সহাস্যে বলিল, "কি জানি, বলা তো যায় না।"

ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

---

# বাঙ্‌লার প্রথম

[ ২ ]

## প্রথম বাঙ্‌লা অভিধান

পর্তুগীজদের বাণিজ্য যখন কোন কোন প্রাচ্যদেশে চলিতেছিল, তখন Nuno da Cunha ( ১৫২৯—১৫৩৮ ) তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশের সহিত রীতিমত ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করেন। ফলে ১৫৮১ সাল হইতে চট্টগ্রামে আগমন করিত। ক্রমশঃ Da Cunhaর চেষ্টায় পর্তুগীজ বঙ্গে বাস করিতে লাগিল। তার পর দুই শত বৎসর চলিয়া যায়; অতঃপর ধর্ম্মের তথা বাণিজ্যের কোন এক খেয়ালের বশে বাঙ্‌লা ভাষার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। ইহারই ফলে ১৭৩৪ সালের ২৮এ আগষ্ট তারিখে Padre Frey Manoel da Assumpc, ao নামক ঢাকার নিকটবর্ত্তী ( ভাওয়ালের ) "নগরী"র একজন

ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতের একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি এবং ইহার আর দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ সালে লিসবন হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় পুস্তকখানি বাঙ্‌লা ব্যাকরণ ও অভিধানের ঐতিহাসিক আলোচনা সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান্। এই গ্রন্থখানির নাম—"Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas partes"*

এই পুস্তকখানি আমি কখনও দেখি নাই। ভারতবর্ষে কোথাও আছে বলিয়া জানিও না। Grierson তাঁহার Linguistic Surveyতে ( ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ১৩ ) ইহার একটী অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ( বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, ১ম ভাগ পৃঃ ১৭ ( ১৯১৭) ) ও ডক্টর সুশীলকুমার দে ( Bengali Literature, পৃঃ ৭৫, ১৯১৯ ) মহাশয় ইহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে এই অভিধানের পরিচয়-পৃষ্ঠার ও কতকগুলি পত্রের কয়েকটী আলোকচিত্র তুলিয়া আনিয়াছেন এবং গ্রন্থখানির পরিচয় দিবার মত অনেক শব্দাদি এই পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াও আনিয়াছেন। প্রবন্ধাকারে শীঘ্রই তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত ও পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। আসুমশাওর এই গ্রন্থের ও অপর দুইখানি গ্রন্থের বাঙ্গালা কথাগুলি রোমান অক্ষরে লিখিত। এই গ্রন্থের ৫৫ বৎসর পরে Henry Pitts Forsterএর অভিধান মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থখানি Imperial Library ও ১৮, হরীতকি বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের নিকট আছে। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। তারপর ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ও ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ( Bengali Literature, পৃঃ ৮৮-৯২ ) অপর যাঁহারা ফর্ষ্টারের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রসঙ্গতঃ দুই চারি কথা বলিয়াছেন মাত্র। ফর্ষ্টারের জীবন-বৃত্তান্ত Dictionary of National Biography ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছু পাই নাই। আমার পূর্ব্বের লেখার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল

হেন্‌রী পিট্‌স্ ফর্ষ্টার ( Henry Pitts Forster ) ১৭৬১ সালে * জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস এখনও জানিতে পারা যায় নাই। ১৭৮৩ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে চিহ্নিত কর্ম্মচারী হইয়া ভারতে পদার্পণ করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরার কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। এই বৎসর তিনি ১৭৯৩ সালের 'Cornwallis Code' বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। বইখানি সরকারী ছাপাখানায় ছাপা হয়। ইহারই পর বৎসর ফর্ষ্টার ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্ট্রার হন। ১৭৯৮ সালে কিছু দিনের জন্য তিনি বেকার ছিলেন। ঐ বৎসর হইতে ১৮০৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি সরকারী কোন কাজ করেন নাই। ইনিই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষার বহুল প্রচার ও উন্নতি কামনায় ১৭৯৯ সালে বাঙ্‌লা ও ইংরেজি উভয় ভাষা-সম্বলিত একখানি বাঙ্‌লা অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার প্রথম খণ্ড ঐ বৎসর প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ বাঙ্‌লা হইতে ইংরেজির অংশ ১৮০২ সালে বাহির হয়। ভারতে সে সময় যে সকল ইংরেজ আসিতেন, তাঁহারা বাঙ্‌লা জানিতেন না। বাঙালীরাও বড় একটা ইংরেজি জানিত না অথচ এ অবস্থায় ভারতে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে,

* ইহার পরিচয়-পৃষ্ঠা Title-page এইরূপ—"Vocabulario em Idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes, dedicado ao, Excellent e Rever. Senhor D. Fr. Miguel de Tavora, Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy deligencia do Padre Fr. Manoel da Assumpc, am Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congre-gac, ao da India Oriental, Lisboa : Na Offic, de Francisco da Sylva. Livreiro da Academia Real, e do Senado, Anno M.

উভয় জাতির মধ্যে একটা আত্মীয়তা সংস্থাপনের প্রয়োজন। অথচ কেহ যদি কাহারও ভাষা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সম্বন্ধ সংস্থাপনের পথে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইবে। বাঙ্‌লাভাষী বাঙালী যদি রাজপুরুষদিগের নিকট তাহাদের নিজের ভাষায় অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে না পারে এবং রাজপুরুষেরাও যদি তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে সুবিচার ও সুশাসনের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটিবে। এই দুইটী রাজনৈতিক যুক্তি ও ফষ্টারের সাহিত্যানুরাগ, এই কারণত্রয়ের সম্মিলনে তাঁহার অভিধানের সৃষ্টি হয়।

ফষ্টারের অভিধানখানি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় বিশ্বকোষের ন্যায়। ইহাতে ৪৪২ পৃষ্ঠা আছে। ইহার বাঙ্‌লা অক্ষরগুলি চার্লস্ উইল্‌কিন্স্ কর্ত্তৃক ক্ষোদিত। শব্দসংখ্যা ১৬৫০০। পুস্তকখানি কলিকাতায় Post Press-এ মুদ্রিত ও P. Ferris কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অভিধানখানির নাম "A Vocabulary, in two parts, English and Bengalee and Vice Versa by H. P. Forster, Senior Merchant on the Bengal Establishment." অভিধানখানি Thomas Graham Esqrকে উৎসর্গীকৃত।

ভারত-প্রবাসী ইংরেজেরা যাহাতে সহজে বাঙ্‌লা ভাষা বুঝিতে পারেন, তাহার পথ মুক্ত করাই যেন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফষ্টারের অভিধানের রচনা-প্রণালী দেখিলে যেন তাহাই বোধ হয়।

সাধারণতঃ বঙ্গাভিধানে সাহিত্য-সম্মত সাধু শব্দ থাকে। বঙ্গভাষার কোন চলিত শব্দ অভিধান হইতে বাহির করিতে হইলে সেই কথার সাধু শব্দ কি, তাহা জানা দরকার হইয়া পড়ে। সেইটুকু যাঁহার জানা নাই, তাঁহার পক্ষে অভিধান হইতে শব্দ বাহির করিবার চেষ্টা—অনেক সময়ই দুরাশা হইয়া পড়ে। কিন্তু ফষ্টার-কৃত অভিধানে সাধু ও চলিত উভয় ভাষার শব্দই একত্র সংগৃহীত ও ইংরেজিতে অনূদিত বা 'প্রথমত' ব্যবহৃত হয়, চলিত বা গ্রাম্য ভাষায় সেখানে 'আগে' এই কথাই প্রচলিত। ফষ্টার-কৃত অভিধানে এইরূপ যে কথাটী খোঁজা যাইবে, সেই কথাটী অনেক সময়ই পাওয়া যাইবে। তাঁহার অভিধানে 'অ'কারের তালিকায় আছে,—

অগ্রে Ogre—Above all, before, already ইত্যাদি।

'আ'কারের তালিকায় আছে—

আগে Age—Above all, before, already ইত্যাদি।

'প্র' তালিকায় আছে—প্রথমতঃ Prothomotho —Above all, before ইত্যাদি -

| | | |
|---|---|---|
| 'আ'র কোঠায় | আচম্‌কা / আচম্বিতে | Sudden, Suddenly, |
| 'হ'র ... | হটাৎ / হঠাৎ | Sudden, per chance. |
| 'প'র ... | পতিত waste ( সাধু ) | |
| 'আ'র ... | আচোট waste ( গ্রাম্য ) | |
| 'অ'র ... | অযথাব্যয়ী extravagant ( সাধু ) | |
| 'উ'র ... | উড়নচণ্ডে extravagant ( গ্রাম্য ) | |
| 'ই'র ... | ইতস্ততঃ পতিত scattered ( সাধু ) | |
| 'উ'র ... | উলচুল hurly burly ( গ্রাম্য ) | |
| 'স'র ... | সায়ং evening, twilight ( সাধু ) | |
| " ... | সাঁজবেলা " " ( গ্রাম্য ) | |
| 'আ'র .. | আকর্ষণ to drag ( সাধু ) | |
| 'হ'র .. | হেঁচকান " ( গ্রাম্য ) | |
| 'প'র ... | পরিশ্রম labour ( সাধু ) | |
| 'খ'র ... | খাটনী " ( গ্রাম্য ) | |
| 'চ'র ... | চন্দ্রাতপ tent ( সাধু ) | |
| " ... | চাঁদোয়া tent ( গ্রাম্য ) | |
| 'স'র ... | স্পর্শ touch ( সাধু ) | |
| 'ছ'র ... | ছোঁয়া " ( গ্রাম্য ) | |

জোল pool, trench

আনাড়ি novice

আবডান screen

আলগোছ To be on tiptoe

যে সময় তাঁহার অভিধান প্রকাশিত হয়, সে সময়ে বাঙ্‌লা ভাষা ইংরেজের আদালতে বা দপ্তরে গ্রাহ্য হইত না। যে দেশে যে জাতি যখন রাজত্ব করে, সে দেশে তখন রাজভাষারই সর্ব্বত্র সমাদর ও সম্যক্‌ প্রচলন হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে পারসীভাষার সমাদর ও আইন-আদালতে ঐ ভাষাই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাঙ্‌লার অসংখ্য অধিবাসীর অধিকাংশই নিরক্ষর ছিল। তাহারা কোন ভাষাই লিখিতে বা পড়িতে জানিত না। কথাবার্ত্তায়ও বাঙ্‌লা ছাড়া অন্য ভাষার ব্যবহার করিতে পারিত না; অথচ রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ বাঙ্‌লা জানিতেন না, পারসীতে পণ্ডিতও ছিলেন না, তাঁহাদের অমনই কাজ চালান গোছ সামান্য জ্ঞান ছিল মাত্র—ইহাতে অনেক সময় বিচার-বিভ্রাট ঘটিত। এক সময় একজন ডোম তাহার এক প্রতিবেশী দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া প্রতিবিধানের জন্য পুলিস আদালতে নালিস করে। সে অবশ্য তাহার নিজের বাঙ্‌লাভাষার জবানবন্দী করিয়াছিল। বাঙ্‌লা ও পারসী উভয় ভাষায় তুল্য অভিজ্ঞ দারোগা মহাশয় সেই ডোমের জবানবন্দী তাঁহার নিজের পারসীতে তরজমা করিয়া আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন। বিচারপতি মহাশয়ের অভিজ্ঞতা, দারোগা মহাশয়ের সেই কিম্ভূত-কিমাকার তরজমার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া হতগজ রকমের এক রায় প্রকাশ করিলেন। এই দৃষ্টান্ত এবং এই রকমের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ফর্ষ্টার বঙ্গদেশের আইন-আদালতে পারসী ভাষা প্রচলনের অনৌচিত্য ও অনিষ্টকারিতার প্রমাণ দেখাইয়া, উক্ত ভাষা ব্যবহার স্থগিত রাখিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে বাঙ্‌লা ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব করিলেন। কেরী, মার্শম্যান্‌, শ্রীরামপুরের যাবতীয় পাদরেগণ, রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন বন্ধু ফর্ষ্টারের এই সাধু যত্নে ও চেষ্টায় বাঙ্‌লা ভাষা বঙ্গ-বিভাগের আইন-আদালতে প্রচলিত হয়।

বাঙ্‌লাভাষার প্রচলন সংসাধিত করিবার পরই ফর্ষ্টার সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ২৬এ আগষ্ট তারিখের কলিকাতা গেজেটে তাঁহার বাঙ্‌লা অভিধানের এক বিজ্ঞাপন বাহির হয়। এই বিজ্ঞাপনে ইহাও প্রকাশিত হয় যে, তিনি "Essay on the principles of Sanskrit Grammar" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা সঙ্কলন করিয়াছেন—শীঘ্রই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে এবং তাহারই উপসংহারস্বরূপ বোপদেব-প্রণীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। ১৮১০ সালে তাঁহার Essay প্রকাশিত হয়, কিন্তু শেষোক্ত অনুবাদ যে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার Essayর মুখবন্ধ পড়িয়া জানিতে পারি যে, ১৮০৪ সালে তিনি তাঁহার সঙ্কলিত মুগ্ধবোধের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি College Councilএর হস্তে ন্যস্ত করেন। কোল্‌ব্রুক, কেরী ও উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে যে কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে সময় তাহার একখানিও প্রকাশিত হয় নাই।

১৮০৩ সালে ফর্ষ্টার কলিকাতার টাঁকশালের একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮০৪ সালে নিজের কৃতিত্বে তিনি ঐ টাঁকশালের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ১৮১২ সালেও কিছুদিনের জন্য তিনি বেকার থাকেন। ১৮১৫ সালে তিনি ষ্ট্যাম্প কাগজের উপর সহি করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসের ১০ই তারিখে এই ভারতভূমিতেই তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়। তাঁহার নশ্বর জীবনের অবসান হইয়াছে। কিন্তু যে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যতদিন বাঙ্‌লাভাষা থাকিবে, ততদিন উন্নত শিখরে জনসমাজে দণ্ডায়মান থাকিবে। ফর্ষ্টারের বঙ্গদেশের প্রতি যে এত টান, বাঙ্‌লাভাষার উন্নতিসাধনে যে তাঁহার এত প্রয়াস, এত যত্ন, অবাস্তর হইলেও তাহার একটী কারণ

আসেন, তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন। এই দেশে অবস্থিতিকালে তিনি এক জাঠরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী বঙ্গভাষায় বিশেষ বুৎপন্না ছিলেন। এই রমণীর সহিত বৈবাহিক বন্ধনের খাতিরে তাঁহার এদেশের প্রতি মায়া, বঙ্গভাষার প্রতি ঝোঁক। এই জাঠ-রমণীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের নাম হেনরী ফর্ষ্টার। পরে ইনি কর্ণেল হেন্‌রী ফর্ষ্টার সি, বি, বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি সৈনিক-বিভাগে কর্ম্ম লইয়া ১৮১৬ সালে কর্ণেল পদবী পাইয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালের ২০এ জুন তিনি লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল হইয়া ১৮৫৭ সালের ২০এ জুন কর্ণেল-পদে বৃত হন। স্যর ডি অকৃটরলনির অধীনে থাকিয়া তিনি মহারাষ্ট্র যুদ্ধে ও পিণ্ডারি যুদ্ধে শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতে তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে ভারতীয় সৈনিক-বিভাগের সর্ব্বোচ পুরস্কার-পদকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

ফর্ষ্টার বাঙ্‌লা ভাষার মৌলিকতা সম্বন্ধে এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বাঙ্‌লা ও ইংরেজি অভিধানের মুখবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন :—

"The Bengalee in its present corrupted state is perhaps the purest dialect of the venerable Sanskrit now spoken in any part of India, its corruptions being principally confined to revenue and judicial terms, and some few commonplace familiar expressions.

The observation however is not meant to be applied to the Bengalee spoken in and near the larger towns and cities, which have long been the seats of foreign governors, and the rendezvons of all nations, nor in general to the pleadings in the courts of justice, which necessarily partake more or less of the modern Hindoostanee or

: e we have generally

: of communication."

য ...রবার একটী উপায় নির্দ্ধারণ

কা ...হার মতে যে শব্দে দুইটী স্বরের একত্র সংযোগ হইয়াছে, অথচ সন্ধি হয় নাই, সেই সকল শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্‌লা শব্দ।

বঙ্গদেশে যাহাতে পারসীর পরিবর্ত্তে বাঙ্‌লা ভাষারই প্রচলন হয়, তৎপক্ষে ফর্ষ্টার নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে ভারতের সকল স্থানে ইংরেজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এক বঙ্গদেশের আয়তনই সেই সময়কার সমগ্র ইংরেজ-শাসনাধীন প্রদেশসমূহের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ ছিল এবং বিভিন্নজাতীয় রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে বাঙালী কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় দশভাগের ছয় ভাগ ছিল এবং এই দেশের চিঠিপত্র বা দলিল পত্রাদি প্রায় সমুদায়ই বাঙ্‌লা ভাষা অবলম্বনেই লিখিত হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রথমতঃ বাঙ্‌লায় লিখিয়া, পরে অন্য ভাষায় তরজমা করা হয়। অতএব যেখানকার প্রজারা বাঙ্‌লা ভিন্ন অন্য ভাষা জানে না এবং যেখানে রাজাও প্রজারই মত পারসীভাষায় অনভিজ্ঞ, সেখানে পারসী ভাষার প্রচলনের পরিবর্ত্তে বাঙ্‌লা ভাষাই প্রচলিত করা উচিত। রাজা ও প্রজা উভয়কেই দ্বিভাষীর কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয়, ইহাতে বিচার-বিভ্রাটের বিশেষ সম্ভাবনা। দ্বিভাষী হয় তো অনেক স্থলে উৎকোচের লোভে নিজের ইচ্ছামত পক্ষবিশেষের অনুকূল বা প্রতিকূল পথ অবলম্বন করিতে পারে এবং অনেক সময়ই যে এরূপ হইয়া থাকে, তিনি তাহারও উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার মতে যদি প্রজার নিজের ভাষাই নগণ্য হইল, তবে রাজা তাঁহার নিজের ভাষার প্রচলন না করিয়া, উভয়েরই অপরিজ্ঞাত অপর একটা ভাষা ব্যবহার করিবেন, ইহার কোন নীতিসঙ্গত যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একজন সাক্ষী নিম্ন আদালতে এক প্রকার জবানবন্দী দিয়া আসিয়াছে, হয়তো উচ্চ আদালতে গিয়া ঠিক তাহার বিপরীত জবানবন্দী করিল; সে বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে অম্লানবদনে নিঃশঙ্কচিত্তে বলিবে, আমি সেখানে যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহাই বলিতেছি; সে যে কি বলিয়াছে বা বলিতেছে, তাহা

নিম্ন আদালতের হাকিমও
বুঝাইয়া দিবে, সেইরূপই বুঝিবে
তিনি সাধারণ ভারতবাসীর চরিত্র
দুই এক কথা বলিতেও ছাড়েন নাই।

Many such documents have come through my hands, and exist at this day among the record of the Nizamut Adaulat, and every Court in the country to confirm my assertion. What opportunity this double mode of doing business must afford to designing and corrupt officer is evident. How often they avail themselves of it, let those say who know the almost invariable character of an Indian to be dishonest and ever to watch to gain some personal end by imposition.

ফর্ষ্টার হালহেড-প্রণীত বাঙলা ব্যাকরণ দেখিয়াছিলেন। নিজেও একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ সঙ্কলন করিতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার অভিধানের বিজ্ঞাপনে ফর্ষ্টার, বিশেষণ হইতে বিশেষ্য সাধন করিবার কয়েকটি নিয়ম দিয়াছেন। সেগুলি আমরা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়া প্রবন্ধে উপসংহার করিলাম :—

Rules for forming substantive from adjectives. Nouns substantive are formed from concrete nouns, by adding the terminations য yo ত্ব two তা ta ইমা ima. Whenever the adjective takes a য yo the first vowel is changed into the corresponding vowel of its class; See Table termed বৃদ্ধি bridhi; thus, from পণ্ডিত pondito, learned, comes পাণ্ডিত্য pandityo, learning, from পৃথক separate, পার্থক্য parthokyo, separation, from উচিত oochito, fit ঔচিত্য ouchityo, fitness; from ধীর dheer patient, ধৈর্য্য, dhyrjyo, patience, from স্থির, Sthir, steady, স্থৈর্য্য, Sthyrjyo, steadiness; from শুক্ল, Shooklo, white, শৌক্ল্য, Shouklyo, whiteness. But when the substantive is formed by adding ত্ব two or তা ta; thus from অধিকারিন্ Odhikarin, possessed অধিকারিত্ব Odhikarito possession. When the substantive is formed by the affix ইমা ima, the last vowel of the adjective is dropped, thus, from কাল Kalo, black comes কালিমা Kalima, blackness. Adjectives ending in উ oo, make the substantive by Changing the first vowel into its বৃদ্ধি bridhi, and the উ oo into a ব bo at the end; thus from মৃদু mridoo, mild is formed মার্দব mardobo, mildness, from লঘু laghoo, light, লাঘব laghobo, lightness, ইত্যাদি

The following words and particles are used in forming words implying

1. Made of, কল্পিত Kolpit নির্ম্মিত Nirmit সম্বন্ধী Shombondhi এর er র r ঈয় eeyo আত্মক atmok জন্য Jonyo ইক ik ময় moy ঘটিত ghotit রচিত rochit.

2. void of, হীন heen ত্যক্ত tyokto রহিত rohit বর্জ্জিত borjit শূন্য shoonya উজ্ঝিত oojjhit নির nir ন no.

3. Possessing বান্ ban বন্ত bonto মান man মন্ত monto যুক্ত jookto যুত juto ল lo আলু alloo বী bee মী mee ইত ito.

4. Deserving অনীয় oneeyo য jo.

5. Capable তব্য tobyo উপযুক্ত oopojukto উচিত oochit উপযোগি oopojogi অর্হ orho

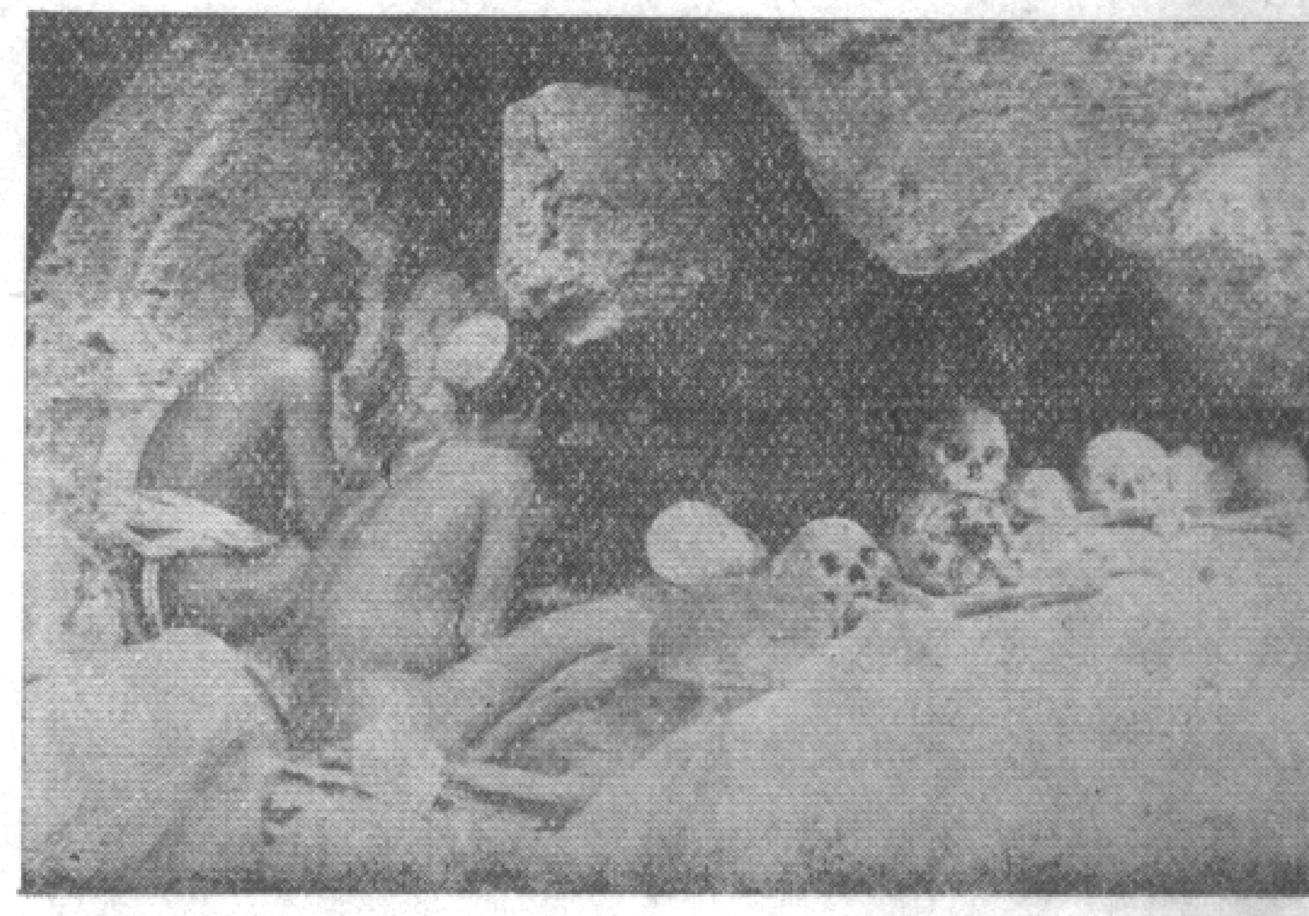
6. Like তুল্য toolyo সম shom মত mot সদৃশ shodrisho, সমান shoman নিভ nibho সঙ্কাশ shonkash উপম oopom বৎ bot ইব ibo.

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

অ

# মমির কথা

আত্মা যখন মানবদেহকে জীর্ণ-বাসের মতন পরিত্যাগ করে, তখন সে দেহ অগ্নি-সৎকার দ্বারা পঞ্চভূতে বিলীন করিয়া দিতে হইবে,—ইহাই সনাতন আর্য্যধর্ম্মে শবের ব্যবস্থা। এ প্রথা ভারতে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন মিশরে কিন্তু ঠিক ইহার উল্টা ব্যবস্থা ছিল। সেখানে শব রক্ষা করা হইত এবং এই শব-সংরক্ষণ-বিদ্যা দস্তরমত শিল্পকলার সামিল ছিল। সে সম্বন্ধে গত ভাদ্রের ভারতীতে শ্রীযুক্ত কনক মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলোচনা করিয়াছেন। সে-সব হাজার হাজার বছরের অতীত কাহিনী। কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কয়েকশ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে আজও মৃতদেহকে 'মমি' করিয়া রাখিবার নিয়ম প্রচলিত



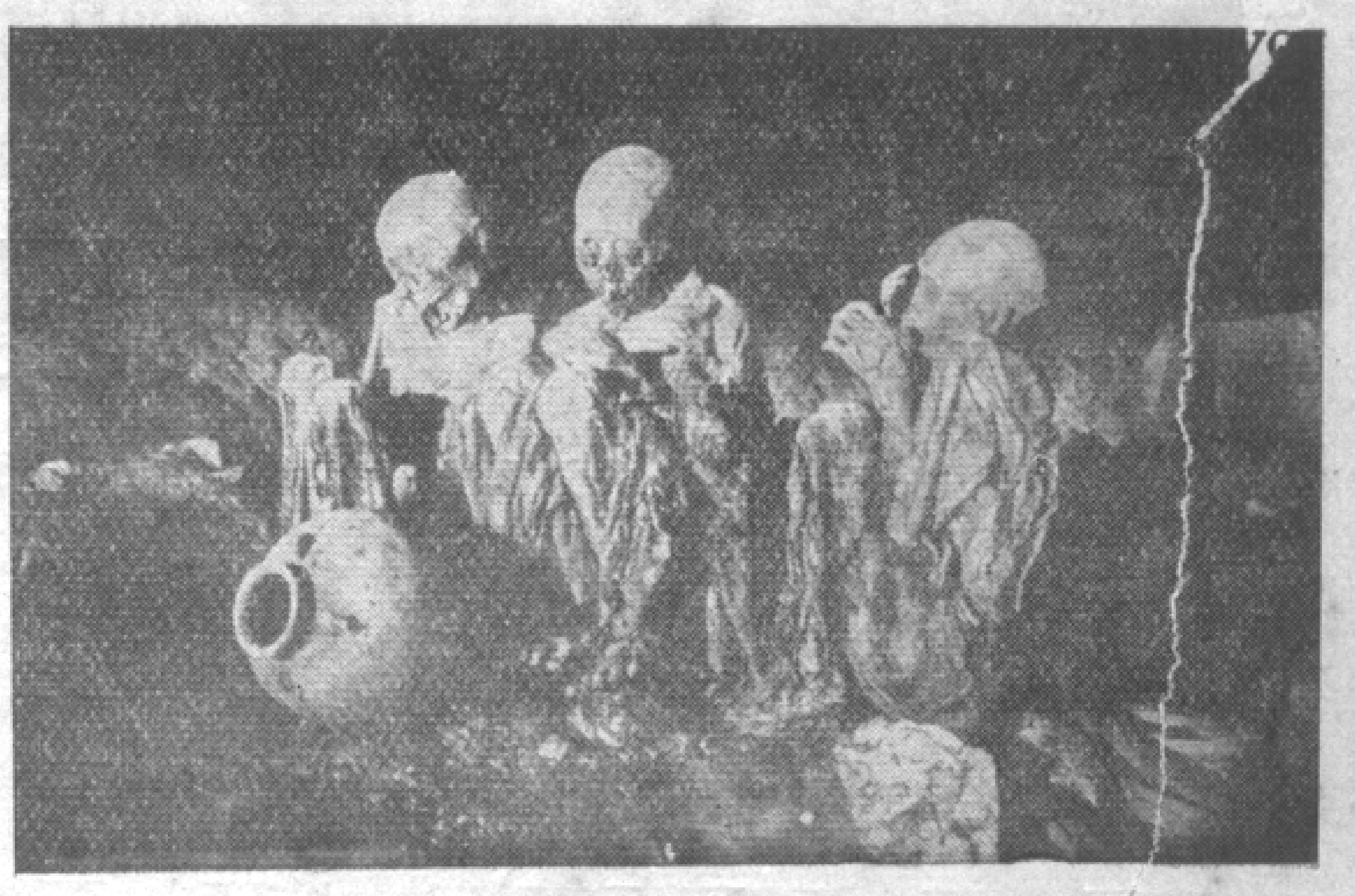
পর্ব্বত গুহার মমি



ধনী ইগরোতের মৃতদেহ—২৪ দিন ধোঁয়ানোর পর

আছে। ইহাদের সাধারণ নাম "ইগরোত।" মালয় আর্কিপেলেগোর প্রাকৃতিক অবস্থা শব-সংরক্ষণের পক্ষে ততটা অনুকূল নয় এবং ইগরোতদের প্রণালীও প্রাচীন মিশরীয়দের মত উন্নত বা বিজ্ঞান-সম্মত নয় বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া 'মমি'গুলি অবিকৃত থাকে না। ইগরোত মাত্রেরই মৃতদেহকে যে মমি করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই, কেবল সঙ্গতিপন্ন লোকের শবই মমি করা হইয়া থাকে। কারণ, মৃতদেহ মমি করাইতে হইলে বেশ দুপয়সা খরচ করিতে হয়। অধিকাংশ ইগরোতকেই সাধারণভাবে গোর দেওয়া হয় এবং পরে তাহার অস্থিগুলি একত্র করিয়া পাহাড়ে তাহার অন্যান্য মৃত আত্মীয়ের অস্থির সহিত একসঙ্গে রাখিয়া দেওয়া হয়। দু-এক পাল গরু-ছাগল, ভেড়া, শূকর এবং দু'চার গোলা শস্য জীবিত অবস্থায় সঞ্চয় করিয়া খাইতে পারিয়াছে এমন কোন ইগরোতের মৃত্যু: হইলে সেই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী দু'দশগ্রামের লোক জুটিয়া মহানন্দে ভোজ সুরু করিয়া দেয়। যতদিন খাইবার মতন কিছু অবশিষ্ট থাকে ততদিন পর্য্যন্ত কেহ নড়িবার নামটি করে না। এই কয়দিন, মৃতদেহকে কাপড় জামা পরাইয়া একটা উঁচু বাঁশের মাচার উপর পা ঝুলাইয়া বসাইয়া নীচে প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দেওয়া হয়। অহোরাত্রব্যাপী উত্তাপ এবং ধোঁয়ার চোটে পোকা,

মাছি, কিছুই মৃতদেহে বসিতে পায় না। যতদিন এইরূপ ধোঁয়া দেওয়া চলে, ততদিন সকলে মিলিয়া অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে রাক্ষসের মতন মদ-মাংস উদরস্থ করিয়া দিনরাত তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে এবং একদিন গায়ক মৃতব্যক্তির গুণগান করে।



ধনী ইগরোত-পরিবারের মমির মেলা



পর্ব্বত-গুহায় মমির স্তূপ

ইগরোতদের এই মৃত্যু-ভোজ বা "কানিয়াও" নেহাত ছোটখাট ব্যাপার নয়। ভোজের উপকরণ হইতেছে প্রধানতঃ, প্রচুর গো-ছাগ-মেষ-মহিষ-শূকর প্রভৃতি পশুর মাংস; 'গাবি', 'উবি', 'কামোত' প্রভৃতি আলুজাতীয় উদ্ভিদ্-মূল এবং ভাত পচাইয়া প্রস্তুত করা "টাপুই" মদ। আমাদের দেশে, সাঁওতালরাও এই মদ প্রস্তুত করে, তাহারা ইহাকে "হাঁড়িয়া" বলে। অনেক স্থলে এই মৃত্যুভোজ এক মাসেও শেষ হয় না। এই সময়টা মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী, পুত্র, কন্যা, কেহই ঘরের বাহিত হইতে পায় না।

অবশেষে প্রয়োজনানুরূপ সঙ্কুচিত এবং শুষ্ক হইলে শবকে মহাধুমধামের সহিত 'গোরস্থানে' লইয়া যাওয়া হয়। 'গোরস্থান' বলিলে, প্রেত-সমাকুল বলিয়া পরিত্যক্ত নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ একটি পর্ব্বতগুহা বুঝিতে হইবে। সেখানে লইয়া গিয়া 'মমিকে' তাহার বংশের অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের 'মমির' মধ্যে একত্র বসাইয়া দেওয়া হয়। সকল সঙ্গতিপন্ন পরিবারেরই এইরূপ একটি করিয়া পৃথক্ গোরস্থান আছে।

মৃত ব্যক্তি শীর্ণদেহ হইলে এবং প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল থাকিলে মমিগুলি দীর্ঘকাল ঠিক থাকে এবং আবরণ-



ইগরোত্ মমি

আচ্ছাদনহীন হইলেও অনেক সময় মিশরের মমি বলিয়া ভ্রম হয়।

ইগরোতরা প্রাচীন কাল হইতে এই প্রথা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু পাশ্চত্য সভ্যতার আলোক আজ ফিলিপাইনের পর্ব্বতকন্দরে গিয়া পৌঁছাইতে বাকী নাই। তাহার ফলে আজকাল ধীরে ধীরে এই প্রথা উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক একটি ভোজে মৃত ব্যক্তির সঞ্চিত সম্বল এমন ভাবে নিঃশেষ হইয়া যায় যে তাহার পরিবার-বর্গকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করিতে হয়; এই জন্য কতকগুলি ইগরোত এই প্রথার ভয়ঙ্কর বিরোধী।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

---

# ঘুঘুর ডাক

দুপুর-রাতের জ্যোৎস্না যেন—দুপুর-নিঝুম রৌদ্রখানি
অলস-শিথিল বাহুর ডোরে
ছায়ার গলা জড়িয়ে ধরে',
এলিয়ে দিয়ে আলোক-তনু স্বপন দেখে কার না জানি!
বিজন-বনের বুকের ব্যথা,
তরুলতার মনের কথা,
তপ্ত হাওয়ার হাই লেগে হয় পাতায়-পাতায় কাণাকাণি;
দূরে—কোথায় নদীর 'পরে
নৌকা চলে পালের ভরে—
থির-নিথরের মধ্যিখানে চলন-টি তার ঘুমপাড়ানি!

এমন সময় অশথ-শাখে
ওই না কোথায় ঘুঘু ডাকে—
রূপালি-সুর উঠ্‌ল বেজে দুপুর-বীণার সোনার তারে!
আব্‌ছা' হ'ল আঁধার যে তায়,
নীল মেড়ে দেয় সবুজ পাতায়,
টুক্‌রা-রোদের আল্‌পনাটি ফুটিয়ে কে দেয় দুধের ধারে!
বদ্‌লে গেল আলো-ছায়া,
দুপুর-দিনেই রাতের মায়া—
ঝাঁ-ঝাঁ-আকাশ জুড়িয়ে গেল হঠাৎ-ফোটা তারার হারে!

ঘুঘু ডাকে, আবার ডাকে—
এক নিমেষে মিলিয়ে যে যায় সহজ-চোখের শ্যাম-সোণালি!
দাঁড়িয়ে সে কোন্ সাগর-কূলে,
চোখের উপর হাতটি তুলে'
দিগন্তরের ধূসর সীমায় দেখ্‌ছি দিনের শেষ-দীপালি!
যে-সুখ আমার নেইক জানা,
যে-দুখ বুকে দেয় নি হানা—
তাই যে বুকে পরশ করায় আঁধার-আলোর ঐ মিতালি!

রূপ-কথারি রূপের রাণী পাথর-পুরীর প্রাচীর-তলে,
সাঁজের আলোর আব্‌ছায়াতে বন্দী-যুবার বক্ষে ঢলে;
রাত প্রভাতের কঠিন মরণ
আপন মাথায় করলে বরণ,
তার চরণের শিকলখানি জড়িয়ে বাঁধে আপন গলে!
বিদায়-বেলার সেই যে হাসি,
নয়ন-ভরা চাউনি রাশি—
গভীর রাতের চাঁদের মতন, নীল-আকাশের অগাধ জলে—
সেই চাহনির কালো-ফিতায়,
সেই হাসিটির জরীর সূতায়,
দুপুর-দিনের ঘুমের শাড়ীর পাড় বুনে দেয় সুরে সুরে—
ঘুঘু ডাকে ওই যে দূরে!

ঘুঘু-ঘুঘু! ঘুঘু-ঘুঘু!—

পেলেম দেখা সেই বিদেশে
ছায়া-পুরীর প্রান্তে এসে—
একটি যে গাছ, তারি তলায়—তারি শাখায় ডাক্‌ছে ঘুঘু!
পেলেম দেখা, চিন্‌লে না সে!
বাঁধ্‌তে গেলাম বাহুর পাশে—
পিছিয়ে দাঁড়ায়, মাঝখানে সেই মাঠ যে দেখি করছে ধুধু!
অস্তপারের একটি তারা
তাকায় যেমন পলকহারা,
তেম্‌নি করে রইল চেয়ে মুখের পানে সে-জন শুধু!

ঘুঘু—ঘু—ঘু—ঘু!—
পোড়ো-বাড়ীর আঙ্গিনাতে,
শিউলি-ঝরা শরৎ-প্রাতে
সোণার জলের ছড়া কে দেয়?—সেই কথা কি ঘুঘু বলে?
ঝুলে-পড়া বারান্দাতে,
ভাঙা-ছাতের আলিসাতে
চাঁদের আলোর হাহা-হাসি—ঘুঘু শুধায়—কিসের ছলে?
শ্মশান-পথে যাত্রা-করা
বধূর দু'পায় আল্‌তা পরা—
মরণ-বিয়ের বাসর ঘরে রঙ্গ করে এয়োর দলে?

ঘুঘুঘু—ঘু—ঘু!—
ঘুঘুর ডাকে অলস দুপুর
একটি পায়ের বাজায় নূপুর—
আওয়াজটি তার থিতিয়ে ওঠে গভীর নীরবতার বুকে;
কোন্ বিধবা রুক্ষ-কেশে
জান্‌লাটিতে দাঁড়ায় এসে,
ঘুঘুর ডাকে উলুধ্বনি শুনছে সে কি স্বপন-সুখে!
সুরটি ঝিমায় বুকের তলে,
রৌদ্র যেমন দীঘির জলে—
কান্না-চাপা' গানের মত ক্ষণেক ভোলায় সকল দুখে!
চির-রোগীর পাণ্ডু ঠোঁটে
পান-খাওয়া লাল-রংটি ফোটে,
অন্নহীনের প্রেমের চুমা উপোস-করা প্রিয়ার মুখে!

ঘুঘু ডাকে? আর ডাকে না—
সুরটি যে তার যায় না চেনা,
রৌদ্র-পাথার নিথর হ'ল, বনের ছায়া ঘনিয়ে আসে;
ঘুঘুর ডাকের সুরের তুলি
আঁক্‌ছিল যে স্বপনগুলি—
মেঘের শাদা ননীর মত মিলায় তারা নীল আকাশে!
ঘুঘু ডাকে কেমন সুরে?
ডাকে সে যে অনেক দূরে!
মনের মাঝে হারিয়ে যে যাই—সে সুর এখন কোথায় ভাসে!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

---

# অভাগী

বয়সের দশটা ধাপ ছাড়িয়ে যাবার মুখেই হঠাৎ একদিন একখানা লাল চেলীর কাপড় পরিয়ে মা-বাপ তাঁদের ছোট মেয়েটিকে চোখের জলে বিদায় করে' দিলেন।

তারপর অজানা লোকজনের মধ্যে, আর কচি কচি [illegible]

যাঁর সঙ্গে আমার অদৃষ্টকে সাতটা কঠিন পাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো—সেই-তিনিই যেদিন একান্ত অবহেলায় আপনার নশ্বর দেহকে চিতার আগুনে নিঃশেষ করে চলে গেলেন, সেদিন আমারো কাছে সংসারের যত-কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আশা-ভরসা একেবারে চিরদিনের মতো ওই

একদিন মাধুর্য্য ও আনন্দের উৎস খুলে দিয়ে যারা আমায় বরণ করেছিল, আজ তারাই আবার অভিশপ্ত জীবনের সমস্ত অনাদরের বোঝা আমারি মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

আজকাল হাসিতে আমার বিষ ছড়িয়ে পড়ে, চাউনিতে অমঙ্গলের কি এক গভীর ইঙ্গিত ভাস্‌তে থাকে!

বাহিরের অনেকখানিকে যে বদ্‌লে ফেল্‌তে হয়েছিল আমাকে... ... ...

লোকে জান্‌তো আমায় পাথরের দেবী বলেই। কারণ তারা মানুষের সকল রকম ন্যায্য অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত করেই রেখেছিল... ...

আশ-পাশের তরঙ্গায়িত জীবনের দিকে চোখ তুলে চাইলেই শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমায় হাঁ-হাঁ করে' ওঠেন। আর তখন ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা থর থর করে কাঁপতে থাকে। তাদের সকলের কঠোর ভর্ৎসনায়,প্রতি অঙ্গ দহনের তীব্র সুরে ভরে' গিয়ে নিথর-নিস্পন্দ হয়ে পড়ে......

সেদিন ঠাকুরঝির কাছে বসেছিলুম! কথায় কথায় তার মুখে ঠাকুর-জামাইয়ের অপরিসীম সোহাগের কথা শুনে কি রকমে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, জানিনা! চেয়ে দেখি, শাশুড়ী পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমার এই সামান্য ভাবান্তরটুকু তাঁরে চোখকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। চোখের পাতার সবটা খুলে ফেলে হাতদুটো কোমরের উপর রেখে, চীৎকার করে তিনি বলে উঠ্‌লেন,—অ কালামুখী, এখনো সাধ মেটেনি তোমার? বসে বসে ঐ সব কথার আলোচনা হচ্ছে বুঝি? সব যে উড়িয়ে পুড়িয়ে খেয়েছ, তা'ও কি মনে নেই?

সংসার তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমার কাছে আদায় কর্‌তে থাকে কেবল দাসীর পরিচর্য্যা, আর পেতে চায় নারী-জীবনের পরিপূর্ণ মহিমা!

নিজের সঙ্গে প্রায়ই বোঝা-পড়া করি,—আচ্ছা, দেবীই যদি হয়ে থাকি, তবে মানুষের তুচ্ছ ক্ষুধা তৃষ্ণা অতৃপ্তিগুলো সব সময়ে আমায় এমন গ্রাস করতে চায় কেন? সারা অঙ্গ মাঝে মাঝে কি-এক অব্যক্ত শিহরণে পূর্ণ হয়ে ওঠে কেন? কেবলই মনে হয়, কি যেন পেয়েও পাইনি! আর সেই না-পাওয়াটাই বুঝি আমার সব-পাওয়াকে একেবারে ব্যর্থ করে দিয়েছে!

তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে যে, আমার এই শূন্যতা বোধ কেন? এত অশান্তি কিসের?

কিসের! ভোগের পূর্ণমাত্রাটা মুখের কাছে এনে আমারি চোখের সাম্‌নে যখন অম্লান বদনে চুমুক দাও, চারিপাশের সংসারকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ দিয়ে যখন অকুণ্ঠিত চিত্তে উপভোগ করতে থাক, তখনো কি তোমাদের বুঝতে বাকী থাকে যে, আমার এই রিক্ততা কিসের? নারী আমি, মানবী আমি, তাই রক্ত-মাংসের দাবীকে সহজে ঠেলে ফেল্‌তে পারি না। ওগো, কালের পরশ আজ দেহের বাঁধনকে কিছুতেই যে মানতে চাইছে না। নারীত্ব লাভের বিপুল আবেগ যে আমায় সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে! এ-সব কেন? আজ কোথায় আমি? সমগ্র জীবনের সঞ্চিত আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, স্নেহ, প্রেম সকলই একটা নূতন রূপের সৃষ্টি করতে চায়, আর চায় সেই সৃষ্টির মধ্যেই এই সব জিনিসগুলোকে একটা বিচিত্র সার্থকতায় ভরিয়ে তুল্‌তে। অন্তরের দেবতাকে বঞ্চিত, নারীত্বকে পঙ্গু, উদ্দেশ্যবিহীন করে ফেলে বাহিরের দেবতাকে পূজা করা—আমার পক্ষে সে যে একেবারেই অসম্ভব!

সকলে মানুষ হয়ে জন্মেও আমায় আজ কেউ মানুষ বলে চিন্‌তে পার্‌লে না! সত্যই কি তবে আমি দেবী.........

বিচার, বুদ্ধি, বিবেক সব একদিকে, আর অভাগিনী নারী আমি অন্যদিকে, মাঝে একটা কেবল নির্ব্বিকার, নিষ্করুণ হিমাচলের মতো প্রকাণ্ড প্রাচীর। তাই দুই পাশের জীবনের মধ্যে সাড়া নেই, শব্দ নেই, কিছু নেই.........

শ্রীবিনয় চক্রবর্ত্তী।

# সঙ্কলন

## বৌদ্ধযুগে নারীর স্থান

মহাপ্রজাপতীর বিশেষ আগ্রহে মহাত্মা গৌতম নারীগণের জন্ম সন্ন্যাসাশ্রমের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ে নানাশ্রেণীর নারী স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজপত্নী, রাজকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনা হীনা নারী পর্য্যন্ত সকলেই ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেন। কুমারী, সধবা, বা বিধবা ; চিরনির্ম্মলা, বা পতিতা সকলের জন্যই ইহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। নিম্নজাতি বলিয়া কাহাকেও এ অধিকারে বঞ্চিত করা হয় নাই—উচ্চ এবং নীচ সর্ব্বজাতির নারীই এই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগের বৈষ্ণবী এবং মধ্যযুগের "খৃষ্টান ভগিনী" সম্প্রদায়কে দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণও সম্ভবতঃ ঐ প্রকার অশিক্ষিতা ছিলেন। কিন্তু এই প্রকার বিশ্বাস নিতান্তই অমূলক। অনেক ভিক্ষুণী ধর্ম্মের গভীরতম ও জটিলতম তত্ত্ববিষয়েও পারদর্শিনী ছিলেন। কোশলের রাজা প্রসেনজিতও তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহের সহিত ইঁহাদিগের নিকট গমন করিতেন। উপনিষদে দুইজন প্রসিদ্ধা রমণীর নাম পাওয়া যায়—একজন মৈত্রেয়ী, অপরজন গার্গী। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত প্রকাশ্য রাজসভায় ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে বিচার করিয়াছিলেন। যিনি প্রকাশ্য সভায় এই ভাবে বিচার করিতে পারেন, তিনি সাধারণ নারী নহেন। কিন্তু বৌদ্ধভিক্ষুণীগণ নূতন কিছু করিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধনায় সিদ্ধা ও তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শিনী হইতেন—তাঁহারা পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সকলকেই ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

অনেক ভিক্ষুণী ধর্ম্ম-কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা 'থেরীগাথা' নামে বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। থেরীগাথাতে ৭৩ জন ভিক্ষুণীর বিবরণ পাওয়া পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন 'সংযুক্তনিকায়,' 'মজ্‌ঝিমনিকায়' প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থেও ইঁহাদিগের উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। অদ্য তিনজন ভিক্ষুণীর জীবন ও উপদেশ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

---

### (১) মহাপ্রজাপতী

ভিক্ষুণী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিবার জন্য মহাপ্রজাপতী অশেষ প্রকার [illegible] করিয়াছিলেন। মহাপ্রজাপতীর ধর্ম্মজীবন যে অতি উন্নত ছিল, মহাত্মা বুদ্ধদেবও তাহা প্রকাশ্য ভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

'অপদান' নামক গ্রন্থে মহাপ্রজাপতীর রচিত একটী অংশ পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত অংশ ঐ স্থল হইতে গৃহীত। বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন :—"হে সুগত! আমি তোমার মাতা ; হে বীর! তুমি আমার (ধর্ম্ম) পিতা। হে নাথ! তুমি সদ্ধর্ম্ম সুখ-দাতা। হে গোতম! তোমা দ্বারা আমি (অর্থাৎ আমার ধর্ম্ম-জীবন) জাত। হে সুগত! আমি তোমার দেহ বর্দ্ধিত করিয়াছিলাম ; আর তুমি আমার অনিন্দিত ধর্ম্মতনু বর্দ্ধিত করিয়াছ। আমি তোমাকে যে দুগ্ধ পান করাইতাম, তাহা দ্বারা মুহূর্ত্তের জন্য তোমার তৃষ্ণা নিবারিত হইত ; কিন্তু তুমি আমাকে যে ধর্ম্মক্ষীর পান করাইয়াছ তাহাতে আমি পরাশান্তি লাভ করিয়াছি। মান্ধাতাদি নরেন্দ্রদিগের মাতার নাম ভবসাগরে নিমজ্জিত ; আর তোমার জন্য আমি ভবসাগর পার হইয়াছি। 'রাজমাতা' বা "রাজমহিষী" এ প্রকার নাম স্ত্রীলোকের পক্ষে সুলভ কিন্তু "বুদ্ধমাতা"—এ নাম পরম দুর্ল্লভ। স্ত্রীলোকদিগকে প্রব্রজ্যায় অধিকার দিবার জন্য আমি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। হে সুরশ্রেষ্ঠ! ইহাতে যদি আমার কিছু দোষ হইয়া থাকে তুমি তাহা ক্ষমা কর। হে বীর! তোমার অজ্ঞাতে আমি ভিক্ষুণীদিগকে শাসন করিয়াছি, তাহাতে যদি আমার কোন ত্রুটি থাকে, তাহা তুমি ক্ষমা কর।"

মহাপ্রজাপতী ধর্ম্মসাধন করিয়া 'অর্হত্ত্ব' লাভ করিয়াছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্রে 'রাগক্ষয়' দ্বেষক্ষয়' ও 'মোহক্ষয়' কে 'অর্হত্ত্ব' বলা হয় (সং নিঃ ৩৮।২)। 'অর্হত্ত্ব' লাভ হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তি।

থেরী গাথার একটী গাথা (৫৫) মহাপ্রজাপতীর রচনা।

---

### (২) ক্ষেমা

ক্ষেমা মগধদেশে সাগল নামক স্থানে রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা বিম্বিসারের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বুদ্ধের উপদেশে ইনি "থেরী" হইয়াছিলেন এবং সাধনবলে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে ইঁহার জ্ঞান অতি গভীর ছিল।

এক সময়ে রাজা প্রসেনজিৎ ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ববিষয়ে ইঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং ক্ষেমা তাহার যথাযথ উত্তরও দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন কয়েকটী এই :—

( ১ ) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন ইহা কি সত্য ?

( ২ ) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না ইহা কি সত্য ?

( ৩ ) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন এবং থাকেন না—এতদুভয়ই কি সত্য ?

( ৪ ) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন এমনও নহে এবং থাকেন না এমনও নহে—এতদুভয়ই কি সত্য ?

ইহার প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তরে ক্ষেমা বলিলেন—"ভগবান্ বুদ্ধ এ প্রকার বলেন না।"

প্রসেনজিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আর্য্যে! কি হেতুতে কি উদ্দেশে ভগবান ইহা প্রকাশ করেন নাই ?"

তখন ক্ষেমা বলিলেন—

"হে মহারাজ! এস্থলে একটী প্রশ্ন করিতেছি। আপনার কি এমন গণক, বা মুদ্রারক্ষক বা 'সংখ্যায়ক' আছে যে গঙ্গার বালুকা গণনা করিয়া বলিতে পারে যে এতসংখ্যক বালুকা আছে বা এতশত, এত সহস্র বা এতলক্ষ বালুকা আছে ?"

প্র। "হে আর্য্যে! নাই।"

ক্ষে। "হে মহারাজ! আপনার কি এমন গণক, মৌদ্রিক বা সংখ্যায়ক আছে যে সমুদ্রের জলরাশি পরিমাপ করিয়া বলিতে পারে যে, ইহাতে এত আঢ়ক জল আছে বা এত শত আঢ়ক বা এত লক্ষ আঢ়ক আছে ?"

প্র। "হে আর্য্যে! নাই।"

ক্ষে। "ইহার কারণ কি ?"

প্র। "কারণ এই মহাসমুদ্র গভীর অপ্রমেয় ও দুরবগাহ।

ক্ষে। "হে মহারাজ! যে "রূপ", যে বেদনা, যে সংজ্ঞা, যে সংস্কার এবং যে বিজ্ঞান দ্বারা তথাগতকে বিজ্ঞাপিত করা যাইতে পারে, তথাগতের সেই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, উচ্ছিন্নমূল হইয়াছে, জ্ঞানবৃক্ষের ন্যায় উৎপাটিত হইয়াছে এবং পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা বিদূরিত হইয়াছে। তথাগত এই সমুদয় হইতে বিমুক্ত এবং মহাসমুদ্রের ন্যায় গভীর অপ্রমেয় এবং দুরবগাহ। সুতরাং মৃত্যুর পর (১) তথাগত থাকেন এপ্রকার বলা যায় না, (২) থাকেন না এপ্রকার বলা যায় না; (৩) থাকেন এবং থাকেন না উভয়ই সত্য এপ্রকার বলা যায় না; (৪) "থাকেন এমনও নহে, থাকেন না এমনও নহে" এই দুইটাই সত্য এরূপ বলাও সঙ্গত নহে।"

ইহা শুনিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণী ক্ষেমার বাক্যকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্ষেমা যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই :—

যাঁহারা তথাগত ( তত্রাগত ), যাঁহারা মৃত্যুর পরপারে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে কোন কথাই বলা যায় না। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ভিন্ন আমরা কিছুই জানি না। কোন বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে রূপ বেদনাদি দ্বারাই তাহা বর্ণনা করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা মুক্ত পুরুষ তাঁহারা রূপ বেদনাদির অতীত, সুতরাং ইঁহাদিগের বিষয়ে কোন কথাই বলা যায় না। গীতাকার এই পরম সত্তার বিষয় বলিয়াছেন, যে তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন। ক্যান্টের ( Kant ) Thing-in-itself উপনিষদের তুরীয় ব্রহ্ম ইত্যাদিও আবাঙ্‌মনসো-গোচর।

প্রসেনজিতের মত রাজা যাঁহার নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হন, তিনি সামান্যা নারী নহেন। আর তিনি যে প্রকার জটিল প্রশ্নের সামাধান করিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা অনুভব করা যাইতে পারে।

থেরী গাথার একটী গাথা (৫২) ইঁহার রচনা।

তিনি যে কেবল পণ্ডিতাই ছিলেন তাহা নহে; তিনি অর্হৎও হইয়াছিলেন। জনসমাজ ক্ষেমাকে আদর্শ ভিক্ষুণী বলিয়া সম্মান করিত। এক স্থলে ( সং নিঃ ২৭।২৪ ) বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,

"হে ভিক্ষুগণ! যখন উপাসিকা নিজের একমাত্র প্রিয় এবং মনোমোহিনী কন্যাকে সম্যক্ উপদেশ প্রদান করে, তখন বলিয়া থাকে—"যদি তুমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর, তবে ভিক্ষুণী ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণার ন্যায় হইও। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা যে প্রকার, তাহাই ( ধর্ম্মজীবনের ) তুলা এবং পরিমাপ।"

গৌতম বুদ্ধও ক্ষেমাকে কি ভাবে দেখিতেন, এখানে তাহা বুঝা যাইতেছে। ( উৎপলবর্ণার বিষয় পরে আলোচিত হইবে )।

---

## ৩। সুমেধা

সুমেধার জন্ম মন্তাবতী নগরে। ইনি রাজার কন্যা; পিতার নাম কোঞ্চ; রাজার প্রধান মহিষী ইঁহার মাতা। থেরীগাথাতেই ইঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাটী পাওয়া যায় ( থেঃ ৭৩ )।

বাল্যকাল হইতেই সুমেধা "শীলবতী, সুবক্ত্রী, বহুশাস্ত্রে পণ্ডিতা এবং বুদ্ধানুশাসনে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। একদিন তিনি মাতা ও পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"হে মাতা, হে পিতা, তোমরা দুইজনেই আমার কথা ( একবার ) শুন। নির্ব্বাণে আমি অভিরত। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহা স্বর্গীয় হইলেও অশাশ্বত। কাম্যবস্তু অল্পাস্বাদ এবং বহুবিঘ্নপূর্ণ, ইহাতে কি লাভ ? কামনা আশীবিষের ন্যায় তীব্র, মূর্খেরাই ইহাতে মুগ্ধ হয়।

পাপকর্ম্মা ও পাপবুদ্ধি অধোগতি লাভ করিয়া শোক প্রাপ্ত হয়। মূর্খ ব্যক্তি কায় বাক্য ও মনে সর্ব্বদাই অসংযত। মূঢ়গণ প্রজ্ঞাহীন এবং অচেতন। কি প্রকারে দুঃখের উৎপত্তি হয়, সে বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ; উপদেশ দিলেও, তাহারা ধারণা করিতে পারে না: 'আর্য্যসত্য' তাহারা বুঝে না। বুদ্ধ-শ্রেষ্ঠ যে উপদেশ দিয়াছেন, বহুতর লোক তাহা জানে না। সুখ উৎপন্ন হইবে ইহাই তাহারা অভিনন্দন করে, এবং দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিবার জন্য স্পৃহা করিয়া থাকে। দেবগণের মধ্যে যে উৎপত্তি, তাহাও অশাশ্বত: যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহাই অনিত্য। তোমরা দুই জনেই অনুমতি দাও—আমি বুদ্ধানুশাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব। ঔৎসুক্য-বিহীন হইয়া, জন্ম মরণ বিনাশ করিবার জন্য আমি সচেষ্ট হইব। এই জন্মগ্রহণে, এই অসার দেহে কি সুখ! তোমরা অনুমতি দাও, 'ভবতৃষ্ণা' নিরোধ করিবার জন্য আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব। এখন বুদ্ধগণের উৎপত্তির যুগ: অক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, সুক্ষণ আসিয়াছে। জীবিতাবস্থায় যেন 'শীল' ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য অবহেলা না করি।" তিনি আরও বলিলেন—

"হে মাতা পিতা! গৃহস্থা থাকিয়া আমি আর আহার গ্রহণ করিব না, বরং আমি অনাহারে মরিব।"

ইহা শুনিয়া মাতা দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন, পিতা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং সুমেধাও ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তখন পিতা তাঁহাকে বলিলেন:—

"বৎসে। উঠ! কেন শোক করিতেছ? অনিকর্ত্ত বারণাবতীর রাজা এবং তিনি সুরূপ। (তুমি জান) তাঁহারই হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। তুমি অনিকর্ত্ত রাজার ভার্য্যা ও অগ্রমহিষী হইবে। 'শীল' ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রব্রজ্যা অতি দুষ্কর। হে পুত্রি! রাজ্যের প্রভুত্ব, ধন, ঐশ্বর্য্যভোগ সব তোমারই হইবে! কাম্যবস্তু তুমি ভোগ কর। এ সমুদয় তুমি বরণ করিয়া লও।"

সুমেধা বলিলেন:—

"এ সমুদয় অসার। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, না হয় মৃত্যুকে বরণ করিব। আমি অদ্যই অভিনিষ্ক্রমণ করিব। অসার ভোগসুখে আমার বাসনা নাই। কাম্য বস্তু আমার নিকট ঘৃণিত।"

তদনন্তর সুমেধা বিলম্বিত কৃষ্ণকেশ খড়্গদ্বারা ছেদন করিলেন এবং প্রাসাদদ্বার রুদ্ধ করিয়া "প্রথম" ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার প্রাণ সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে সুমেধার সম্মতি গ্রহণ করিবার জন্য অনিকর্ত্ত সেই দিন এই স্থলে সমাগত হইবেন। তদনুসারে তিনি ... উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সুমেধার

"আমার রাজ্যের প্রভুত্ব, ধন ঐশ্বর্য্য, ভোগসুখ তোমার হউক। কাম্যবস্তু ভোগ কর; পৃথিবীতে কাম্যবস্তুর ভোগ সুদুর্লভ। ভোগবস্তু ভোগ কর, যথেচ্ছ দান কর। দুঃখিতমনা হইও না, তোমার মাতা পিতা দুঃখিত হইয়াছেন।"

কিন্তু সুমেধার সমুদয় কামনা ও মোহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বলিলেন:—

"কামভোগ অভিনন্দন করিও না; ইহার দুঃখবিপদ দর্শন কর। চাতুর্দ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি মান্ধাতা কামভোগিগণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয় নাই—অতৃপ্ত অবস্থাতেই তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দশদিকে কেবল যদি সপ্তরত্নই বর্ষিত হয়, তথাপি কামনার পরিতৃপ্তি নাই; মানুষ অতৃপ্ত অবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কামনা অসিধারবৎ; কামনা সর্পশিরঃসদৃশ, উল্কাবৎ দহনকারী অস্থিকঙ্কালসন্নিভ (ঘৃণিত); কামনা অনিত্য, অধ্রুব, বহুদুঃখপূর্ণ এবং মহাবিষময়। কামনা তপ্ত লৌহগোলকসম সন্তপ্ত; পাপ ইহার মূল, দুঃখ ইহার ফল। কামনা দুরারোহ বৃক্ষের ফল-সদৃশ, কামনা স্বপ্নবৎ বঞ্চক; কাম শক্তিশেলোপম। কাম রোগবিশেষ, ইহা গণ্ড, 'অঘ' ও 'নিঘ'; ইহা জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ; ইহা পাপ, ভয় ও বধের মূল। কামনা বহু দুঃখের কারণ এবং মুক্তির অন্তরায়। তোমরা যাও, সংসারে আমার আর বিশ্বাস নাই। আমি দীপ্তশীরা, অপরে আমার কি করিবে? জরামরণ সকলকে অনুসরণ করিতেছে। ইহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য আমি কৃতসঙ্কল্প।"

সংসারের অনিত্যতার বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিবার পর রাজাকে সম্বোধন করিয়া সুমেধা পুনরায় বলিলেন:...

"অমৃতত্ব থাকিতে কেন তোমার পঞ্চকষায় সেবন? আর পঞ্চকষায় অপেক্ষা কামনা ও আসক্তি যে কটুতর। অমৃতত্ব থাকিতে কেন তোমার কামলালসা? সমুদায় কামনা ও আসক্তি প্রজ্জলিতা 'কুথিতা' 'কুপিতা' এবং 'সন্তাপিতা'। মোক্ষ বিদ্যমান থাকিতে বধবন্ধমূলক কাম কেন? কামই বধবন্ধ; কামকামী দুঃখ অনুভব করে। তৃণরচিত জ্বলন্ত উল্কা যে হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকে তাহার হস্তই দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যে উল্কা ফেলিয়া দেয় তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না। উল্কার ন্যায় কামও দগ্ধ করে; কিন্তু যে পরিত্যাগ করে, তাহাকে দগ্ধ করেনা। কামজনিত অল্প সুখের জন্য বিপুল সুখ পরিত্যাগ করিও না। মৎস্যের ন্যায় বড়শী গিলিয়া পশ্চাতে যেন অনুতপ্ত হইতে না হয়। কামে অনুরক্ত হইলে অপরিমিত দুঃখ, চিত্তের বহু গ্লানি অনুভব করিতে হইবে। অধ্রুব কামনা পরিত্যাগ কর। অজরত্ব বর্ত্তমানে জরমূলক কামনা কেন? আমি যে বস্তুর কথা বলিতেছি তাহা অজর অমর। ইহা অজরামর পদ; ইহা অশোক,

অনৃতপদ লাভ করিয়াছে—এখনও ইহা লাভ করা সম্ভব। যাঁহারা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন তাঁহারাই লাভ করেন, অপরে পারে না।'

এই কথা বলিয়া সুমেধা কর্ত্তিত কেশরাশি অনিকর্ত্তের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন।

তখন অনিকর্ত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সুমেধার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"সুমেধাকে প্রব্রজ্যায় অনুমতি দিন ; ইনি বিমোক্ষ ও সত্য দর্শন করুন।"

মাতা-পিতা অনুমতি দিলেন। তখন সুমেধা প্রবজ্যা অবলম্বন করিলেন। তিনি সাধন করিয়া ষড়ভিজ্ঞা (= ছয়টি বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান) এবং অগ্রফল' ( =সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল ) লাভ করিলেন।

থেরী গাথাতে ইহার পরে লিখিত আছে—"ইহা আশ্চর্য্য! ইহা অদ্ভুত! রাজকন্যা নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।"

নব্যভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

---

## শূকর-বলি

শূকরবলির কথা শুনিলে হয়ত অনেকেই মনে করিবেন যে, এই প্রথা পাহাড়িয়া অসভ্য জাতির নিকট হইতে অনুন্নতমস্তিষ্ক হিন্দুগণ অবিচারিতচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ ধারণার অনুকূল কোনও প্রমাণ নাই ; প্রত্যুত হিন্দুর বিভিন্নগ্রন্থে প্রতিকূল প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরিকৃত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের বলিপ্রকরণে কথিত হইয়াছে যে 'দেবতার উদ্দেশে শূকর বলিদান করিলে দেবতার পঞ্চাশ বৎসর প্রীতি হয়"। * আরও অনেক গ্রন্থে শূকর বলিদানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। অনাবশ্যক বোধে প্রমাণান্তরোপন্যাস উপেক্ষিত হইল। বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন দেবতার নিকট অদ্যাপি শূকর বলিদান হইয়া থাকে। অনুসন্ধানের ফলে আমরা এ পর্য্যন্ত যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ থানার অধীন গাঙ্গাটিয়া গ্রামে থলকুমারী দেবতার পূজায় এই দেবতা প্রাদেশিক ) শূকর বলি হইয়া থাকে। ময়মনসিংহ জেলার কুলবাড়িয়া থানার অধীন পুটিজানা দেবগ্রাম অঞ্চলে বনদুর্গার পূজায় নাপিত ক্ষুরের দ্বারা শূকরের গলা কাটিয়া দেয়। মহামারী নিবৃত্তির জন্য কৌলিকগণ কালীপূজায় শূকর বলিদান করিয়া ঐ শূকর মাটিতে প্রোথিত করিতেন, এমত শুনা গিয়াছে। মুক্তাগাছার ছোট হিস্‌সার অন্যতম পুরোহিত শ্রীমান্ শশিভূষণ কাব্যবিনোদের নিকট জানা গেল, মুক্তাগাছার জমিদার মহোদয়দিগের কৌলিক নিয়মানুসারে বনদুর্গার পূজায় একটি শূকর ও একটি শূকরী বলিরূপে উপন্যস্ত হয়। শূকরের গলার একটু স্থান ক্ষত করিয়া তাহা হইতে কলার অগ্রপাতে ২-৪ বিন্দু রক্ত দেওয়া হয় ; ঐ পাতে শূকরীটিকে শোয়াইয়া ষাট্-ষাট্ বলা হয়। পরে শূকর ও শূকরীকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ডোমে অথবা মেথরে ঐ শূকর ধরিয়া লইয়া যায়। ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুড়াপাড়ার সন্নিহিত গোলাকান্দাই অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তিতে ঠাকুরপণ্ডিতের ( প্রাদেশিক দেবতা ) নিকট শূকর বলি হইয়া থাকে। নমঃশূদ্রের বাড়ীতে পূজার অনুষ্ঠান হয়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণগণও নমঃশূদ্রের বাড়ীতে শূকর পাঠাইয়া কাটান।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যের বাজার থানার অধীন সোনারগাঁও পরগণার কৃষ্ণপুরানিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট জানা গেল, তাঁহাদের প্রদেশে "গৌড়পালের" ( প্রাদেশিক ) পূজায় শূকর বলি দেওয়া হয়। পূজা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতই করেন। পূজার পদ্ধতি আছে।

উক্ত তর্কতীর্থ মহাশয় বলিলেন, তাঁহাদের তিন ভ্রাতার জন্যই গৌড়-পালের পূজা ও শূকরবলি মানসিক আছে। শিশুকালে ছেলেদের শরীর হঠাৎ নীলবর্ণ হইয়া যায়, এবং শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দুর্লক্ষণ দেখা দেয়, এমন অবস্থায় গৌড়পালের পূজা মানসিক করা হয়। সকল পূজায় শূকর বলি হয় না, পাঁঠা বলি হইয়া থাকে। অর্দ্ধশূকর বলি মানসিক করিলে একটি শূকর দিতে হয়। একটি মানসিক করিলে দুইটি দিতে হয়। সাধারণতঃ লোকে উহাকে "গুড়া পালের" পূজা বলে। এই পূজা বাহিরে উঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজায় শূকরকে চিৎ করিয়া তাহার গলা কাটা হয়। যে তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে এই তথ্য সংগৃহীত হইল, কুমিল্লা প্রভৃতি প্রদেশে ইঁহার বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য আছেন। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে উচ্চ শ্রেণীর নৈয়ায়িক। এক সময়ে কৃষ্ণপুরাতে ৪২টি ন্যায়ের টোল ছিল।

রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট জানা গেল, পাবনা জেলার অন্তর্গত বেরা থানার অধীন করঞ্জা গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর নিকট শূকর বলিদান হইয়া থাকে। এই দেবী একটি পাথরের ঢিপি মাত্র। জ্যৈষ্ঠমাসে সিদ্ধেশ্বরীর মেলা হইয়া থাকে।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মান্দা থানার অধীন

প্রথম বাইছের দিনে অর্থাৎ বৎসরের প্রথম যেদিন বিলে জাল ফেলান হয় সেইদিন "শূকরকালীর" পূজা হইয়া থাকে। উহাতে শূকর

পূজা করা হয়। পূজা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতই করেন। পূজার অন্তে ডোমে শূকর ছেদন করে। কিন্তু শূকর উৎসর্গ করা হয় না। কালীর উদ্দেশে শূকর বলিদান করা হয়, সম্ভবতঃ এই কারণেই দেবী "শূকরকালী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজসাহী তানোর থানার অধীন কামার গাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিবরণটি সংগৃহীত হইল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বর্ত্তমান বয়স ৭৮ বৎসর।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই মহাশয়ের নিকট শূকরকালী সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত বিবরণ জানা গিয়াছে। তাঁহারা পুরাতন প্রস্তর-মূর্ত্তি সংগ্রহের সময়ে রাজসাহীর একস্থানে গাছতলায় একটি ভগ্ন মকরমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। তত্রত্য সাধারণ লোকেরা উহাকে "শূকর কালীর" মূর্ত্তি মনে করিয়া, উহার উপর পুষ্প, সিন্দুর প্রভৃতি প্রদান করিত। ইহাতে মনে হয়, অতি দীর্ঘকাল হইতে ঐ প্রদেশে শূকরকালীর পূজা অর্থাৎ কালীর নিকট শূকর বলিদান প্রচলিত হইয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।
অগ্রহায়ণ, ১৩২৯।

---

## সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে ?

( বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে মিঃ এল কে এল্‌ম্‌হার্ষ্টের "মাটীর উপর দস্যুবৃত্তি" প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আলোচনা )

এল্‌ম্‌হার্ষ্ট সাহেব বলেছেন যে আমরা মাটি থেকে উৎপন্ন আমাদের যা কিছু প্রয়োজনীয় পদার্থ যে পরিমাণে লাভ করছি মাটিকে সে পরিমাণে ফিরিয়ে না দিয়ে তাকে দরিদ্র করে দিচ্ছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারটা একটা চক্রের মত। আমাদের জীবনের, আমাদের সংসারের গতি চক্রপথে চলে। মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীর নদী বা সমুদ্র থেকে জল ...ষ্পাকারে উপরে ওঠে, তারপর আকাশে তা মেঘের আকার ধারণ ... বৃষ্টিরূপে আবার নীচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই ... পায়, তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না আর অনাবৃষ্টি, ... মাটিতে ফসল ফলানো সম্বন্ধে ... এই চক্রপে... মাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে, কিন্তু ... কত দিন থেকে চলছে তা

সম্পদ পাচ্ছে, তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্ত্তন গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। মানুষ তার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর একটি জগৎকে সৃষ্টি করেছে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদান ও প্রদানের যোগ প্রতিযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সে ইঁটকাঠের প্রকাণ্ড ব্যবধান তুলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মানুষের মত বুদ্ধিজীবি প্রাণীর পক্ষে এই সকল আয়োজন উপকরণ অনিবার্য্য সেকথা মানি তবুও একথা তাকে ভুললে চলবে না যে, মাটির প্রাণ থেকে যে তার যে প্রাণময় সত্তার উদ্ভব হয়েছে, গোড়াকার এই সত্যকে লঙ্ঘন করলে সে দীর্ঘকাল টিঁকতে পারে না। মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয় তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিক মত চলে তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। মাটির খাতায় যখন দীর্ঘকাল কেবল খরচের অঙ্কই দেখি আর জমার বড় একটা দেখতে পাইনে তখন বুঝতে পারি দেউলে হতে আর বড় বেশী বাকি নেই।

বক্তামহাশয় বলেছেন প্রাচীনকালে পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতা আবির্ভূত হয়ে আবার নানা বাধা পেয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সভ্যতাগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জনতাবহুল সহরের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং তাতে করে পূর্ব্বে যে মাটিতে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হ'ত অথচ তা দরিদ্র হ'ত না, সে মাটি সহুরে মানুষদের দাবীদাওয়া সম্পূর্ণরূপে মিটাতে পারল না। এমনি করে সভ্যতাগুলির ক্রমে ক্রমে পতন হ'তে লাগল। অবশ্য আধুনিক কালে অন্তর্বাণিজ্য হওয়াতে সহরবাসীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এক জায়গাকার মাটি দেউলে হয়ে গেলেও অন্য জায়গার অতিরিক্ত ফসলের আমদানী হচ্ছে এমনি করে খাওয়া দাওয়া স্বচ্ছন্দে চলছে কিন্তু মাটিকে অবহেলা করলে মানুষকে নিশ্চয়ই একদিন কোনোখানে এসে ঠেকতে হবে।

যেমন প্রাণের চক্র আবর্ত্তনের কথা বলা হয়েছে তেমনি মনেরও চক্র আবর্ত্তন আছে, সেটাকেও অব্যাহত রাখতে হবে সে কথা মনে রাখা চাই। আমরা সমাজের সন্তান, তার থেকে যে দান গ্রহণ করে মনকে পরিপুষ্ট করছি তা যদি তদনুরূপ না ফিরিয়ে দিই, তবে খেয়ে খেয়ে সব নষ্ট করে ফেলব। মানুষের সমাজ কত চিন্তা কত ত্যাগ কত তপস্যায় তৈরী, কিন্তু যদি কখনো সমাজে সেই চিন্তা ও ত্যাগের স্রোতের আবর্ত্তন অবরুদ্ধ হয়ে যায়, মানুষের মন যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে প্রথার অনুসরণ করে তাহলে সমাজকে ক্রমাগত সে ফাঁকি দেয়; এবং সে সমাজ কখনো প্রাণবান প্রাণপ্রদ হতে পারে না, চিত্তশক্তির দিক থেকে সে সমাজ দেউলে হতে থাকে। ভারতবর্ষে সমাজের ক্ষেত্র ও বিস্তৃতি হচ্ছে পল্লীগ্রামে। যদি তার পল্লীসমাজ নূতন চেষ্টা চিন্তা ও অধ্যবসায়ে না প্রবৃত্ত হয় তবে তা নির্জীব হয়ে

বক্তামহাশয় বলেছেন যে ধানের খড় গাড়ী বোঝাই হয়ে গ্রাম থেকে সহরে চলে যাচ্ছে আর তাতে করে কৃষকের ধানক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সহরের উচ্ছিষ্ট গঙ্গা বেয়ে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে বলে তা মাটির থেকে চিরকালের জন্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মনের চিন্তা ও চেষ্টা ঠিক এমনি করেই সহরের দিকেই কেবল আকৃষ্ট হচ্ছে বলে আমাদের পল্লী সমাজ তার মানসিক প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না। যে পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা আমার আছে, আমি দেখেছি সেখানে কি নিরানন্দ বিরাজ করছে! সেখানে যাত্রা কীর্ত্তন রামায়ণ গান সব লোপ পেয়েছে, কারণ যে লোকেরা তার ব্যবস্থা করত তারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে, তাদের শিক্ষাদীক্ষা এখন সে পন্থায় চলে না, তার গতি অন্যদিকে। পল্লীবাসীরা আমাদের লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা প্রাণবান হতে পারছে না, তাদের মানসিক প্রাণ গানে গল্পে গাথায় সজীব হয়ে উঠছে না। প্রাণরক্ষার জন্ম যে জৈব পদার্থ দরকার, মনের ক্ষেত্রে তা পড়ছে না। প্রাণের সহজ সরল আমোদ আহ্লাদই হচ্ছে সেই জৈব পদার্থ, তাদের দ্বারাই চিত্রক্ষেত্র উর্ব্বর হয়। অথচ সহরে যথার্থ সামাজিকতা আমরা পাই নে। সেখানে গলিতে গলিতে ঘরে ঘরে কত ব্যবধানের প্রাচীর তাকে নিরন্তর প্রতিহত করে। সহরের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তাবন্ধন সম্ভবপর হয় না, গ্রামেই মানবসমাজের প্রাণের বাধাহীন বিকাশ হতে পারে। আজকাল ভদ্রলোকদের পক্ষে গ্রামে যাওয়া নাকি কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ তাঁরা বলেন যে সেখানে খাওয়া দাওয়া জোটে না, আর মনের বেঁচে থাকবার মত খোরাক দুষ্প্রাপ্য। অথচ যাঁরা এই অনুযোগ করেন তাঁরাই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করাতে তা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রামের এই দুর্দ্দশার কথা কেউ ভাল করে ভাবছেন না, আর ভেবে দেখলেও স্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করছে না। কেবল বিদেশীর সঙ্গ ত্যাগ করার মধ্যে বাঁচনের রাস্তা নেই। বাঁচতে হলে পল্লীবাসীদের সহবাস করতে হবে। পল্লীগ্রামে যে কি ভীষণ দুর্গতি প্রশ্রয় পাচ্ছে তা খুব কম লোকেই জানেন। সেখানে কোন কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রাচীন ধর্ম্ম এমন বিকৃত, বীভৎস আকার ধারণ করেছে যে সে সব কথা খুলে বলা যায়না।

এল্‌ম্‌হার্ষ্ট সাহেব প্রশ্ন করেছেন যে প্রাণরক্ষার উপায় বিধান কোন্ পথে হওয়া দরকার। আমারও প্রশ্ন এই যে সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে? একটা কথা ভেবে দেখা দরকার যে গ্রামে যারা মদ খায়, তারা হাড়ি ডোম মুচি প্রভৃতি দরিদ্র শ্রেণীরই লোক। মধ্যবিত্ত লোকেরা দেশী মদ তো খায়ই না, বিলাতি মদও খুব অল্পই খেয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে যে দরিদ্র লোকেদের মদ খাওয়া দরকার হয়ে পড়ে, তাদের অবসাদ আসে। তারা সারাদিন পরিশ্রম করে। সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে যে ভাত নিয়ে যায় তাই ভিজিয়ে দুপুর বারটা একটার সময়ে খায়, তারপর ক্ষিদে নিয়ে বাড়ী ফেরে। যখন দেহ প্রাণে অবসাদ আসে তখন তা প্রচুর ও ভাল খাদ্যে দূর হতে পারে, কিন্তু তা তাদের জোটে না। এই অভাবপূরণ হয় না বলে তারা ৩।৪ পয়সার ধেনো মদ খায়, তাতে কিছুক্ষণের জন্ম অন্ততঃ তারা নিজেদের রাজা-বাদশার মত মনে করে সন্তুষ্ট হয়,—তার পর তারা বাড়ী যায়। আচার ও চরিত্রের বিকৃতির মূলেও এই তত্ত্ব।

আমি যে পল্লীর কথা জানি সেখানে সর্ব্বদা নিরানন্দের আবহাওয়া বইছে, সেখানে মন পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খোরাকের দ্বারা সতেজ হতে পারছে না। কাজেই নানা উত্তেজনা ও দুর্নীতিতে লোকের মন নিযুক্ত থাকে। মন যদি কথকতা পূজা পার্ব্বণ রামায়ণ-গান প্রভৃতি নিয়ে সচেষ্ট থাকে তবে তাতে করে তার আনন্দরসের নিত্য যোগান্ হয় কিন্তু এখন সে সকলের ব্যবস্থা নেই, তাই মন নিরন্তর উপবাসী থাকে এবং তার ক্লান্তি দূর করবার জন্ম মানসিক মত্ততার দরকার হয়ে পড়ে। মনে করবেন না যে জবরদস্তি করে, ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে এই উভয়রূপ মদ বন্ধ করা যাবে। চিত্তের মূলদেশে আত্মা যেখানে ক্ষুধিত হয়ে মরতে বসেছে, সেই গোড়াকার দুর্ব্বলতার মধ্যেই যত গলদ রয়েছে, তাই বাইরেও নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। পল্লীগ্রাম চিত্ত ও দেহের খাদ্য থেকে আজ বঞ্চিত হয়েছে, সেখানে এই উভয় খাদ্যের সরবাহ করতে হবে।

অপরদিকে আমরা সহরে অন্যরূপ মত্ততা ও উন্মাদনা নিয়ে আছি। আমাদের এই বিকৃতির কারণ হচ্ছে যে আমরা দেশের সমগ্র অভাব উপলব্ধি করি না, তাই অল্পপরিসরের মধ্যে উন্মাদনার আশ্রয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে শান্ত করি। উচ্চৈঃস্বরে রাগ করি, ভাষায়, লেখায় বা অন্য আকারে তাকে প্রকাশ করি। কিন্তু আমরা যতক্ষণ যথার্থভাবে দেশের লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারব, তাদের জ্ঞানের আলোক বিতরণ না করব, তাদের জন্য প্রাণপণ ব্রত গ্রহণ না করব পূর্ণ আত্মত্যাগ না করব, ততক্ষণ মনের এই গ্লানি ও অসন্তোষ দূর হবে না। তাই ক্ষুব্ধ কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে প্রশান্ত করবার জন্ম আমরা নানা উন্মাদনা নিয়ে থাকি, বক্তৃতা করি, চোখ রাঙাই—আর আমার মত যারা কাব্যরচনা করতে পারেন তারা কেউ কেউ স্বদেশী গান তৈরী করি। অথচ নিজের গ্রামের পঙ্কিলতা দূর হল না সেখানে চিত্তের ও দেহের খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা হল না। তাই হাড়ি ডোমেরা মদ খেয়ে চলেছে আর আমাদেরও মত্ততার অন্ত নেই।

কিন্তু এমন ফাঁকি চলবে না। প্রতিদিন আপনাকে দেশে ঢেলে দিতে হবে, পল্লীবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি একদল

ছেলেকে জানি তারা নন্‌-কো-অপারেশনের তাড়নায় পল্লীসেবা করতে এসেছিল। যত দিন তাদের কলকাতার সঙ্গে যোগ ছিল, কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, ততদিন কাজ চলেছিল, তার পর সব বন্ধ হয়ে গেল।

তাঁরা হাড়ি ডোমের ঘরে কি তেমন করে সমস্ত মন দিয়ে ঢুকতে পেরেছেন? পাড়াগাঁয়ের প্রতিদিনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তাঁরা কি দীর্ঘকাল-সাধ্য উদ্যোগে প্রবৃত্ত হতে পেরেচেন? এতে যে উন্মাদনা নেই, মন লাগে না। কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধির কোনোরূপ খাদ্য তো চাই, সেই খাদ্য প্রতিদিন জোগাবার সাধ্য যদি আমাদের না থাকে তাহলে কাজেই মত্ততা নিয়ে নিজেদের বীরপুরুষ মহাপুরুষ বলে কল্পনা করতে হয়।

আজকাল আমরা সমাজের তিনস্তরে তিন রকমের মদ খাচ্ছি,—সত্যিকারের মদ, দুর্নীতির মানসিক মদ, আর কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রশান্ত করবার মত মদ। হাড়ি ডোমের মধ্যে এক রকম মদ, গ্রামের উচ্চস্তরের মধ্যে আর এক রকম মদ, আর সহরের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও এক প্রকারের মদ। তার কারণ সমাজে সব দিকেই খাদ্যের জোগানে কম পড়েচে।

শান্তিনিকেতন, কার্ত্তিক, ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# বিসর্জ্জন

"বিসর্জ্জন" এই নাটকের নামকরণ কোন্ ভাবকে অবলম্বন করে হয়েছে? আমরা দেখতে পাই যে নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা-বিসর্জ্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আরেক বিসর্জ্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল।

সুতরাং প্রতিমা-বিসর্জ্জন এই নাটকের শেষ কথা নয় কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল জয়সিংহের আত্মত্যাগ—কারণ তখনই রঘুপতি সুস্পষ্টভাবে এই সত্যকে অনুভব করতে পারল যে প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পুজা প্রেমের দ্বারাই হয়। এই মৃত্যুতে সে বুঝতে পারল যে সে যা হারাল তা কত মূল্যবান্। ছাগশিশুর পক্ষে প্রাণ কত সত্য জিনিষ সে কথা অপর্ণাই বুঝেছিল কিন্তু রঘুপতির পক্ষে তা বুঝতে সময় লেগেছিল—সে প্রিয়জনকে নিদারুণভাবে হারিয়ে তারপর অনুভব করতে পারল যে প্রাণের মূল্য কত বেশী, তাকে আঘাত করলে তার মধ্যে কত বেদনা।

এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ! রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দ করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল তার চৈতন্য হল, বোঝবার বাধা দূর হল, প্রেম জয়যুক্ত হল।

নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথমেই দেখা দিলেন রাণী গুণবতী। তাঁর সন্তান হয় নি বলে সন্তানলাভ করবার আকাঙ্ক্ষা দেবীকে জানাতে মন্দিরে এসেছেন। তিনি দেবীকে বললেন,—"আমাকে দয়া করে সন্তান দাও! আমার সব আছে, দাস দাসী প্রজা কিছুর অভাব নেই কিন্তু আমার তপ্ত বক্ষে আমার প্রাণের মধ্যে আরেকটি প্রাণকে অনুভব করবার ইচ্ছা হয়েছে। আমি এমন একজনকে পেতে চাই যার প্রতি প্রেম আমার নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী হবে। এই বক্ষ বাহু—তা কতখানি ভালবাসা পেতে চায়। শিশু তো একটু প্রাণের কণিকা কিন্তু তাকে স্নেহ করবার জন্য মার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে আছে। তাকে জন্ম দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে সে তার প্রতি তার সমস্ত সঞ্চিত ভালবাসা অর্পণ করবে।

নাটকের গোড়াটা গুণবতীর এই ব্যাকুল প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে কেন? তার কারণ হচ্ছে প্রথমেই এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে একটুখানি যে প্রাণ, প্রেমের কাছে তার মূল্য কত বেশী। একদিকে রাণী 'মানত' করেচেন যে বিশ্ব-মাতার কাছে ছাগশিশু বলিদান দেবেন, অন্যদিকে তিনি সে বলির পরিবর্ত্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালবাসাটুকু ভোগ করতে চান। একদিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ অন্যদিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কত বড় জিনিষ তা বুঝেছেন। সুতরাং রাণীর মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে, তিনি জানছেন যে ভালবাসা এত প্রগাঢ় হতে পারে যে তার জন্য লোকে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে; আবার অপর পক্ষে অসহায় প্রাণীদের প্রাণের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে নি।

তার পর প্রথম অঙ্কে অপর্ণা এল সেই কথাটাই বোঝাতে। সে বললে,—"তুমি যদি একদিক দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে প্রাণের আদর কতখানি, তুমি যদি মা হয়ে প্রাণকে লালন পালন করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর তার জন্য বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ—তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে চাও? বিশ্বমাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণহত্যায় খুসী হন?...যদি তিনি তা বোঝেন তবে কেমন করে এ ভিক্ষা তাঁর কাছে করছ?"...মায়ের ভিতর দিয়ে প্রাণের মমতা কি করে বিশ্বে প্রকাশ পায় অপর্ণা প্রথম দৃশ্যে সেই কথাটা বলে গেল। গুণবতী সন্তান পাবার জন্য একশত ছাগবলি দিতে চান, তিনি এত প্রাণের অপচয় করতে রাজি আছেন,—অথচ চিন্তা করে দেখলেন না যে এই ভিক্ষার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠুরতা

প্রাণের মূল্য কত গভীর একদল সে কথা বুঝেছে, অন্যদল তা বোঝে নি তাই দুইদলে বিরোধ বাধল। গুণবতী ও রঘুপতি একদিকে এবং গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ ও অপর্ণা অন্যদিকে।

জয়সিংহ রঘুপতিকে পিতার মত ভক্তি করত, সে বাল্যকাল থেকে মন্দিরের সকল অনুষ্ঠান ও পশুবলি দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই, যেখানে ভালবাসা সেখানে রক্তপাত চলে না এই উপলব্ধি তার মনে সম্পূর্ণরূপে স্থান পেতে দেরী হয়েছিল। অপর্ণার ক্রন্দনেই প্রথমে তার পূর্ব্ব বিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় হতে সুরু হল। গোবিন্দমাণিক্য এই পশুবলির মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না কিন্তু জয়সিংহ শিশুকাল থেকে রঘুপতির কাছে মানুষ হয়েছে যখন তার বিচার করবার শক্তি জন্মায় নি তখন থেকে এই রক্তপাত দেখে দেখে তার অভ্যাস হ'য়ে গেছে। তাই তার মনে দুই ভাবের বিরোধ উপস্থিত হল রঘুপতির প্রতি ভক্তি ও বলির জন্য চিরাভ্যাসের কঠিন বন্ধন তার মনকে কতকটা অসাড় করে দিয়েছিল অথচ সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছিল যে কত বড় অন্যায়কে সে সমর্থন করে এসেছে।

অপর্ণা এসে জয়সিংহের মনকে চঞ্চল করে দিল। যে জীবকে অপর্ণা কোলে করে পালন করছে তারই রক্তধারা মন্দিরের সোপান বেয়ে পড়ছে, এই দৃশ্য দেখে সে কেঁদে উঠল। জয়সিংহের মন তাতে নাড়া খেল, সে প্রতিমার দিকে ফিরে বলল, "একি তোমার মায়া? এই হত্যায় মানুষের প্রাণ কেঁদে উঠছে আর তুমি বিশ্বজননী হয়ে এতে সায় দিচ্ছ, তোমার কি দয়া নেই?" জয়সিংহের মন প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, সে এই প্রথম আঘাত পেল, তারপর ক্রমে তার মনের মধ্যে এই সংগ্রাম বর্দ্ধিত আকার ধারণ করল। দুই শক্তি জয়সিংহকে দুইদিক হতে আকর্ষণ করতে লাগল। একদিকে অপর্ণা তাকে মন্দিরের সীমানায় ধরে রাখতে চায়।

রঘুপতির মনে দয়া মায়া নেই, সে নিষ্ঠুর প্রথাকে পালন করে এসেছে এবং এমনিভাবে শক্তিলাভ করে বড় হয়ে উঠেছে। সে দেবীর সেবক বলে লোকের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়ে এসেছে! সে জয়সিংহকে তার সপক্ষে আনতে চায়, মন্দিরের প্রথার গণ্ডির মধ্যে বাঁধতে চায়। কিন্তু অপর্ণা আরেক বিরুদ্ধ শক্তি নিয়ে জয়সিংহের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বললে যে, "এই নির্দ্দয় পূজার মধ্যে তুমি বাস কোরোনা তুমি মন্দির ত্যাগ করে বেরিয়ে এস।" জয়সিংহের মনে তখন বিরোধ বেধে গেল। একদল লোক বাহ্য শক্তি ও প্রাচীন প্রথাকে চিরন্তন করে রাখতে চায় অন্যদল বলছে প্রেমই সব চেয়ে বড় জিনিষ। জয়সিংহ এই দোটানার মাঝখানে পড়ল এবং কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ পথ তা চিন্তা করে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

রঘুপতি পণ্ডিত, বৃদ্ধ, সম্মানিত ও শক্তিশালী আর অপর্ণা বালিকা, ভিখারিণী ও সমাজে অখ্যাত। কিন্তু যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ করছে। বাইরে থেকে তাকে দুর্ব্বল বলে মনে হয় কিন্তু কার্য্যত তারই জয় হল। অথচ রঘুপতি শক্তিশালী তার দিকে শাস্ত্রমত, দেশাচার, লোকমত সব রয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার বেশে সত্য প্রেমের দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে বিশ্বমাতার মূর্ত্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল। প্রেমের সৈন্যসামন্ত অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই নেই কিন্তু হৃদয়ের গোপন দুর্গে তার শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে।

শান্তিনিকেতন, কার্ত্তিক, ১৩২৯।	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ ও দেহভঙ্গী

চলাটা যে একটা খুব উচ্চ অঙ্গের আর্ট তা আমরা সাধারণত লক্ষ্য করি না। অথচ যুগ-যুগান্তরের কত কবি কত রকমে ঐ চলার উপর মনের ভাব প্রকাশ করে গেছেন।

খালি পায়ে হাঁটলে, যে রকম সমস্ত শরীর দোলা পায়, পাদুকার সাহায্যে সে রকম হতে পারে না।

কলসী কাঁখে বাংলার মেয়েরা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান, তাঁদের চলনে অতি সুন্দর একটা দেহের ভঙ্গী ফুটে ওঠে, উঁচু-গোড়ালি জুতাপরা মেয়েদের মধ্যে যা দেখতে পাওয়া যায় না। কলসী কোমরে নেবার দরুণ নিতম্ব একটু হেলে যায়; ঐ সামান্য হেলা সমস্ত দেহে এমন একটি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, যা বিলিতি সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি নিয়ে মাপা যায় না, যাকে বাঙালার চোখ দিয়েই দেখতে হয়।

আজকালকার সভ্য যুগে মেয়েদের গায়ে বিলিতি বডিস না থাকা কেউ কেউ বেজায় অসভ্যতা মনে করেন। দেহের গঠনই সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য্য, কিন্তু সেইটাকেই আমরা বিলিতি অনুকরণে নানারকম আড়ম্বরে জমিদার বাড়ীর ফরাশের তাকিয়া করে ফেলি। গোড়ালি উঁচু জুতো-পরা বিলিতি ধরণে পাটের মতো শুকনো চুলঝোলান মেয়েরা

যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান, তখন তাঁদের পায়ের খটাং খটাং শব্দ বড়ই কর্কশ শোনায়। তাঁদের চলবার গতিতে কোন লীলা নেই, যেন মিলিটারি মার্চ, কেবল হিসেব করে পা ফেলা। দেহকে এত বেশি জামা-কাপড় পরিয়ে তাঁরা ফাঁপিয়ে তোলেন যে, তার নীচে রক্ত-মাংসের শরীর আছে কিনা, তা বুঝতে পারা যায় না।

কাজের খাতিরে অবশ্য অনেক কিছুই পরতে হয়, তা বলে 'সভ্যতা'র পতাকা উড়িয়ে আর্টের জগতে বিজয়ী হওয়া যায় না। যেটা সত্য তাকে কতকগুলো মানুষের তৈরি জিনিষ দিয়ে ঢাকা যায় না। আর্ট সত্যের উপরেও সৌন্দর্য্য দিতে পারে, কিন্তু মূলে তাকে সত্যকে আশ্রয় করতে হবেই।

প্রত্যেক সুগঠিত স্ত্রীলোকের উচিত এমন পোষাক পরা, যার মধ্যে একটা এলো-থেলো ভাব থাকে। অথচ যার দ্বারা চলার তরঙ্গ-ভঙ্গী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হ্যাভেল সাহেব বলেন, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে নিজ নিজ দেহের সৌন্দর্য্য পরস্পরকে দেখাবার একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে।

আধুনিক যুগের শীলতার চাপে মেয়েরা নিজেদের দেহকে এত জড়সড় করে ফেলেছেন যে, তাঁদের চলা, বলা এমন কি হাসির মধ্যেও কোন স্বাধীনতা নেই। সর্ব্বত্র শীলতার কড়া পাহারা সঙ্গিন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কাশীতে সকাল বেলা, গঙ্গার ঘাটে মেয়েরা—একটা দেখবার জিনিষ। হাল্‌কা রংএর কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে তাঁদের দেহ বেঁকে চুরে জড়িয়ে একটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করে চাঁপাফুলের মত মুখের রংএর উপর ফিকে গোলাপী চাদরের ছায়া তাঁদের একটি ছবির আদর্শ করে তোলে; তারপর আছে তাঁদের চরণের গতিতে একটি স্বর্গীয়-লীলা এবং মাঝে মাঝে আধ-খসা ঘোমটার ভিতর থেকে বিক্ষিপ্ত একটু চাহনি!

পুরুষ মানুষকে দেখলে, আমাদের মেয়েদের মত তাঁরা ভয়ে জড়সড় হয়ে দেওয়ালে কোণঠাসা হয়ে দাঁড়ান না। দরকার হলে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁরা কথা বলতেও নারাজ নন; অবশ্য মুখটা একটু অন্য দিকে বেঁকিয়ে। হয়, তা বাস্তবিক তাঁদের না দেখলে অনুভব করা যায় না। কাঁচুলীর নিবিড় বেষ্টনীর মধ্যে যে সৌন্দর্য্য তা বিলিতি জ্যাকেট-পরা মেয়েদের বোঝা শক্ত। শক্ত কঠিন মাটির উপর নরম সুগঠিত রঙিন আঙুলের খেলা, বহু যুগ ধরে চিত্রকর, কবি এবং ভাস্কর তাঁদের কাজে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন।

তাঁরা বুঝ্‌তেন, চলার ভঙ্গীর মধ্যে এমন অনেক কিছু বস্তু ফুটে ওঠে, যা ভেবে-চিন্তে বার করা যায় না।

অনেক স্থানে দেখেছি, আমাদের মেয়েরা, নম্রতার খুব বেশিরকম ভাণ করতে গিয়ে নিজেদের কুঁজো করে ফেলেছেন। তাঁদের বোধ হয় ধারণা—মাথাটা খুব নীচু করে চল্‌লেই নম্রতার শেষ সীমানায় গিয়ে পৌছনো যায়। আমাদের মতে মেয়েদের সোজা চল্‌লে খুব ভাল দেখায়—অবশ্য মিলিটারি হিসেবে সোজা নয়।

মেয়েদের বেতালা পা ফেলা চোখে খুব ভাল লাগে। চলনের মধ্যে যদি বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম না থাকে, তা হলে তার মধ্যে আপনা হতে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে, যেটা বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না; কারণ বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে সেইটুকুই সুন্দর দেখায়, যার জন্যে বাঁধাধরা নিয়ম করা হয়েছে।

চলনের মধ্যে তার স্বাভাবিক লীলা ফুটিয়ে তোলা স্ত্রীলোকের পক্ষে বোধ করি খুবই সহজ হয়, যদি তাঁরা নৃত্যকলা কিছু কিছু আয়ত্ত করেন।

অভ্যাসের দ্বারা ব্যায়ামের মত নৃত্য জিনিষটাও খুব সহজেই আয়ত্ত করা যায়। পুরাকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত নৃত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলা বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

'মোলেই বাঁচি' শরীর নিয়ে, যাঁরা অন্ধকার ঘরের কোণে বসে জীবন কাটান, তাঁদের কাছে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন কথা বলাই বৃথা, কারণ বাইরের খোলা আলো যাঁরা দেখেননি, তাঁদের কাছে রূপ কোন আকার নিয়ে ফুটতে পারে না।

পুরুষের চলা সম্বন্ধে লেখা বিড়ম্বনা, কারণ বাংলায় সুগঠিত পুরুষের একান্ত অভাব।

## চেনা-পথের শিল্পী

আজকাল আর্টে দলাদলির আর অন্ত নেই। "কিউ-বিষ্ট", "ফিউচারিষ্ট", "ডাডাইষ্ট," "সুপ্রিমেটিষ্ট" এবং আরো কত অপূর্ব্ব নামে পরিচিত শিল্পী-সম্প্রদায় ললিত কলার মধ্যে অগুন্তি দলের সৃষ্টি করেছেন। এঁরা সবাই বাঁধি গতের চরম বিরোধী। ফ্রান্সে এঁরা "আর্ট-সাম্রাজ্যে বুনো জন্তু" আখ্যা লাভ করেছেন। এঁদের হাতে পড়ে অনেকস্থলে কলালক্ষ্মীর গা থেকে সৌন্দর্য্যের আঁচটুকু পর্য্যন্ত মুছে যাবার জোগাড় হয়েছে।



১নং কামিনী মূর্ত্তি ( নিকোলফ )



২নং কামিনী মূর্ত্তি ( নিকোলফ )

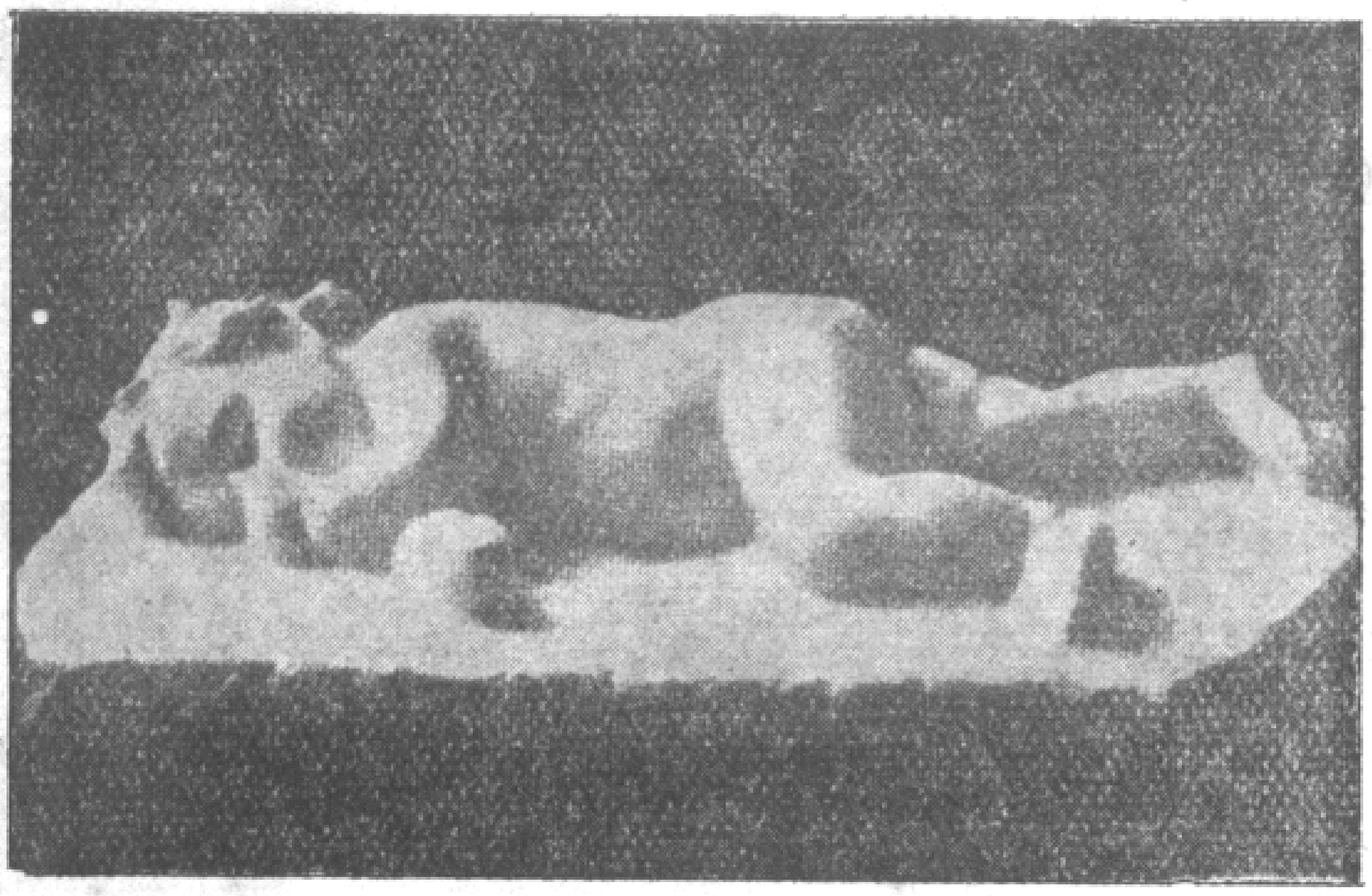
এই বিদ্রোহের মধ্যে থেকেও সংপ্রতি একজন শিল্পী পুরাণো পথ ধ'রেই সকলের সামনে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর নাম আন্দ্রী নিকোলফ,—বুলগেরিয়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর হাতের কাজে স্থানে স্থানে রোদাঁর ছায়া দেখা গেলেও, তিনি মোটেই আধুনিক তন্ত্রের অনুসারী নন। আধুনিক



৩নং কামিনী মূর্ত্তি ( নিকোলফ )

তন্ত্রকে তিনি ঘৃণা করেন। তিনি হাতে-নাতে দেখিয়ে দিয়েছেন, পুরাণো তন্ত্র এখনো অকেজো হয়ে পড়েনি ;—শক্তি আর চেষ্টা থাকলে পুরাতন তন্ত্রের মধ্যেই এখনো নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া যায়। এখন তাঁর বয়স প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর। প্রথমে স্বদেশ, তারপর ফ্রান্স

দেশে তিনি ললিত কলা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এখন তিনি স্বদেশেই কলা-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। বুলগেরিয়ায়, ফ্রান্সে ও রোমে এবং স্বদেশের রাজদ্বারে আজ তিনি ওস্তাদ-শিল্পী ব'লে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর হাতের কাজের নমুনা এখানে দেওয়া গেল।



ঘুমন্ত শিশু ( নিকোলফ )

---

## তুরুস্কের আঁধারে-আলো

সকলেই জানেন, তুরুস্কের নারী-সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন জাগরণের সূচনা হ'লেও, নারী-জাতির অবস্থা আজও সেখানে আশাপ্রদ হয়-নি। কিন্তু এমন অন্ধকারেও সেখানে এক জীবন্ত আলোক-শিখা দেখা দিয়েছে। তাঁর নাম শ্রীমতী হালিদে এদিব হানাউম। আজ তাঁর নাম জানেনা, পৃথিবীতে এমন দেশ নেই। পাশ্চাত্য-দেশে তাঁকে "তুরুস্কের জোয়ান অফ আর্ক" ব'লে ডাকা হয়। কারণ তুর্কী-জাতির পুনরুত্থানের মূলে তাঁরও হাত আছে অনেকখানি। আজকাল তুরুস্কে কমল পাশার পরেই তাঁর নাম করা হয়। তিনি কমল পাশার বিশেষ বান্ধবী,—রাজ্য-সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ে কমল পাশা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ ক'রে থাকেন।

হানাউমের বাপ ছিলেন রাজ্যচ্যুত সুলতান আব্দুল হামিদের কোষাধ্যক্ষ। তিনি উদার মতের লোক ব'লে নিজের মেয়েকে পাশ্চাত্য ভাষায় লেখাপড়া শেখাতে কুণ্ঠিত হন নি। ফলে তুরুস্কের মত দেশে থেকেও হানাউম গ্রাজুয়েট হ'তে পেরেছেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে নিজের কলেজের অধ্যাপকের প্রেমে প'ড়ে তিনি তাঁকেই বিবাহ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁর স্বামী আবার এক বিবাহ করাতে, তিনি ঘৃণাভরে স্বামীকে ত্যাগ ক'রে চ'লে আসেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেন।



শ্রীমতী হানাউম

আব্দ্‌ল হামিদের নির্ব্বাসনের পর থেকেই, তিনি স্বদেশের নারী-সমাজের নেত্রীরূপে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান ক'রে আসছেন। স্ত্রী-জাতির শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি অগুন্তি প্রবন্ধ লিখেছেন, এবং তাঁর চেষ্টা-যত্নেই তুরুস্কের নারী-বিদ্যালয় নূতনভাবে গঠিত হয়ে উঠেছে।

আগে তিনি ইংরেজদের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি পাশ্চাত্য জাতিদের এমন শত্রু হয়ে দাঁড়ান যে, ইংরেজরা তাঁকে বন্দী ক'রে নির্ব্বাসনে পাঠাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি ছদ্মবেশে পালিয়ে সে যাত্রা বেঁচে যান। তার পর থেকে তিনি নানা বিভাগে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়্‌তেও তাঁর নারী-হৃদয় বিচলিত হয় নি। আনোয়ার, টাল্লাট ও জেমাল প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষমতাশালী তুর্কী রাজপুরুষকে তিনি যথাক্রমে কায়মনো-প্রাণে সাহায্য ক'রে এসেছেন।

এই অপূর্ব্ব নারী একাধারে কবি, লেখক, শিক্ষক, রাজনৈতিক ও সৈনিক। তুর্কী ভাষায় তিনি অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতির রচনাও তর্জ্জমা ক'রেছেন। সামাজিক উৎসবাদি থেকেও তিনি স'রে দাঁড়ান না—যেখান দিয়ে যান, হাসি-রাশি ছড়িয়ে দিয়ে যান। তাঁর রূপও বিদ্যুতের শিখার মত চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। যথার্থ শিক্ষালাভ করলে, প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে থেকেও নারী যে কেমন ক'রে নিজের পথ কেটে নিতে পারে, হানাউমই তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

—

## মায়াবী কমল পাশা

তুরস্কের মৃতদেহে যিনি নূতন জীবন সঞ্চার করেছেন, সেই কমল পাশার নাম আজকাল সকলেই জানেন। তাঁর পূরো নাম মুস্তাফা কমল পাশা। তিনি মুসলমানের ঔরসেই জন্মেছেন বটে, কিন্তু তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের দেহে স্পেনীয়-ইহুদী রক্ত বর্ত্তমান ছিল। কিছুকাল আগে কমল পাশার নাম পর্য্যন্ত কেউ জান্‌ত না। কিন্তু নিজের রাজনৈতিক বুদ্ধিতে এবং অপূর্ব্ব রণ-প্রতিভায় আজ তিনি হঠাৎ স্বদেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন,—তাঁর স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেয়, তুরস্কে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নেই। তাঁর আকস্মিক উন্নতি দেখে অনেকে তাঁর সঙ্গে নেপোলিয়নের তুলনা করেছেন।



মুস্তাফা কমল পাশা

গত যুদ্ধে যোগ দিয়ে এবং হেরে গিয়ে তুরস্কের অবস্থা হয়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তার এই অসহায় অবস্থায় সুযোগ পেয়ে চির-শত্রু গ্রীস মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারতে এগিয়ে এসেছিল এবং ইউরোপের আর সব জাতি নীরব সহানুভূতির সঙ্গে গ্রীকদের অগ্র-গতি নিরীক্ষণ করেছিল।

সকলেই বুঝেছিল, এবার তুরস্কের মৃতদেহ পর্য্যন্ত ধুলায় মিশিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এর মধ্যেই মায়াবী কমল পাশা যে কোন্ সঞ্জীবন-মন্ত্রে মৃত তুরস্ককে আবার জাগিয়ে তুল্‌লেন, কেউ তা জান্‌তেও পারলে না। কিন্তু হঠাৎ একদিন শোনা গেল, গ্রীসের বিষ-দাঁত একেবারে ভেঙে গেছে, গ্রীক সৈন্য প্রাণপণে পলায়ন করছে এবং তার পিছনে ছুটছে বিজয়ী তুর্কীগণ! অষ্টার্লিট্‌জ্ রণক্ষেত্রে বিজয়ী হয়ে নেপোলিয়ন যেমন ফললাভ ক'রেছিলেন, গ্রীকদের হারিয়ে কমল পাশাও আজ তার চেয়ে কম লাভবান হন নি।

কমল পাশা গরিবের ছেলে। অল্প বয়সেই তিনি ফৌজে গিয়ে ভর্ত্তি হন। নিজের চেষ্টায় ও যত্নে খুব কম দিনের ভিতরেই তিনি পাকা সেপাই ব'লে নাম কেনেন। প্রথম বল্‌কান যুদ্ধের সময়ে তিনি মেজরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্রের সময়ে তিনি মেজর-জেনারেলের পদলাভ করেছিলেন। কিন্তু আজ তিনি এমন এক উচ্চস্থানে আসন পেয়েছেন, তুরস্কের সুলতানীও তার তুলনায় যৎসামান্য।

কমল পাশা ধার্ম্মিক মুসলমান—জীবনে মদ্য স্পর্শ করেন নি। আকারে তিনি দীর্ঘ এবং বয়সেও এখনো তাঁকে নবীন বলা চলে। অতএব আশা করা যায়, এখনো তিনি পৃথিবীকে অনেকবারই নব নব বিস্ময়ে সচকিত ক'রে তুলবেন!

---

## কালোর ঘুসি
## বনাম
## সাদার কাঁদুনী

কালোর এক ঘুসি খেয়ে সারা ইউরোপ আজ ব্যথায় আর লজ্জায় ককিয়ে উঠেছে। আপনারা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছেন যে, ইউরোপের সব-চেয়ে আদুরে ছেলে ও বড় মুষ্টিযোদ্ধা জর্জ্জেস কার্পেনটিয়ার অল্পদিন আগে আফ্রিকার এক কাফ্রি পালোয়ান ব্যাটলিং সিকির কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছে।



ব্যাটলিং সিকি

এই সেদিন সাহিত্য-ক্ষেত্রেও ফ্রান্সের এক কাফ্রি ঔপন্যাসিক ম্যারান্, সেখানকার আর সব শ্বেত লেখককে হারিয়ে বিখ্যাত "গণকোর্ট প্রাইজ" লাভ করেছেন। তার উপর শারীরিক শক্তি-পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যাট্‌লিং সিকি একজন সর্ব্বপ্রধান শ্বেত পালোয়ানকে হারিয়ে দেওয়াতে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজের মান ও জাতি-গর্ব্ব একেবারে

ভূমিসাৎ হবার উপক্রম হয়েছে। ফলে, এখন যে-কোন বিলাতী কাগজ খুলে পড়ি, তাইতেই দেখি, সাদার দল পাতার পর পাতা কেবল হাহাকারেই ভরিয়ে তুলেছেন! বিলাতী কাগজ-ওয়ালারা স্পষ্ট-ভাষাতেই বলছে যে, তুরস্কের জয়লাভের চেয়েও কাফ্রি সিকির এই সাফল্য ইউরোপের গর্ব্বকে বেশী-মাত্রায় আহত করেছে!

সিকির সঙ্গে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বেকেটের ঘুসির লড়ায়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ ভারি চালাক জাত। পাছে ইংলণ্ডের গণ্ডেও চুণ-কালির প্রলেপ পড়ে, সেই ভয়ে বিলাতের রাজপুরুষরা এই লড়াই বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। কালো যদি সাদাকে ন্যায়-যুদ্ধেও হারায়, তাতেও এত অপমানের ভয়! কিন্তু এমন ক'রে পাত-চাপা দিলে শ্বেতের কল্পিত শ্রেষ্ঠতা ও পৌরুষের গর্ব্ব সত্যই কি বজায় থাকে?

নিয়তির চাকা নিয়তই ঘুরে যাচ্ছে! হয়ত আজ সাদার দিন ফুরিয়ে আসছে—মাথার উপরে জেগে আছে নূতন প্রভাতে কৃষ্ণের জাগরণ! কালোরাও যে সাদাদের চেয়ে কোনদিকেই খাটো মানুষ নয়, এর-মধ্যেই নানা ব্যাপারে তারা সেটা বুঝিয়ে দিতে সুরু করেছে—পরে যে সে পরিচয় আরো ভালো ক'রেই দেবে, তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নেই! তখন দেনা-শোধের পালা আস্‌বে!

---



জাপানী "গেইসা" নারী

## গেইসার স্বাধীনতা

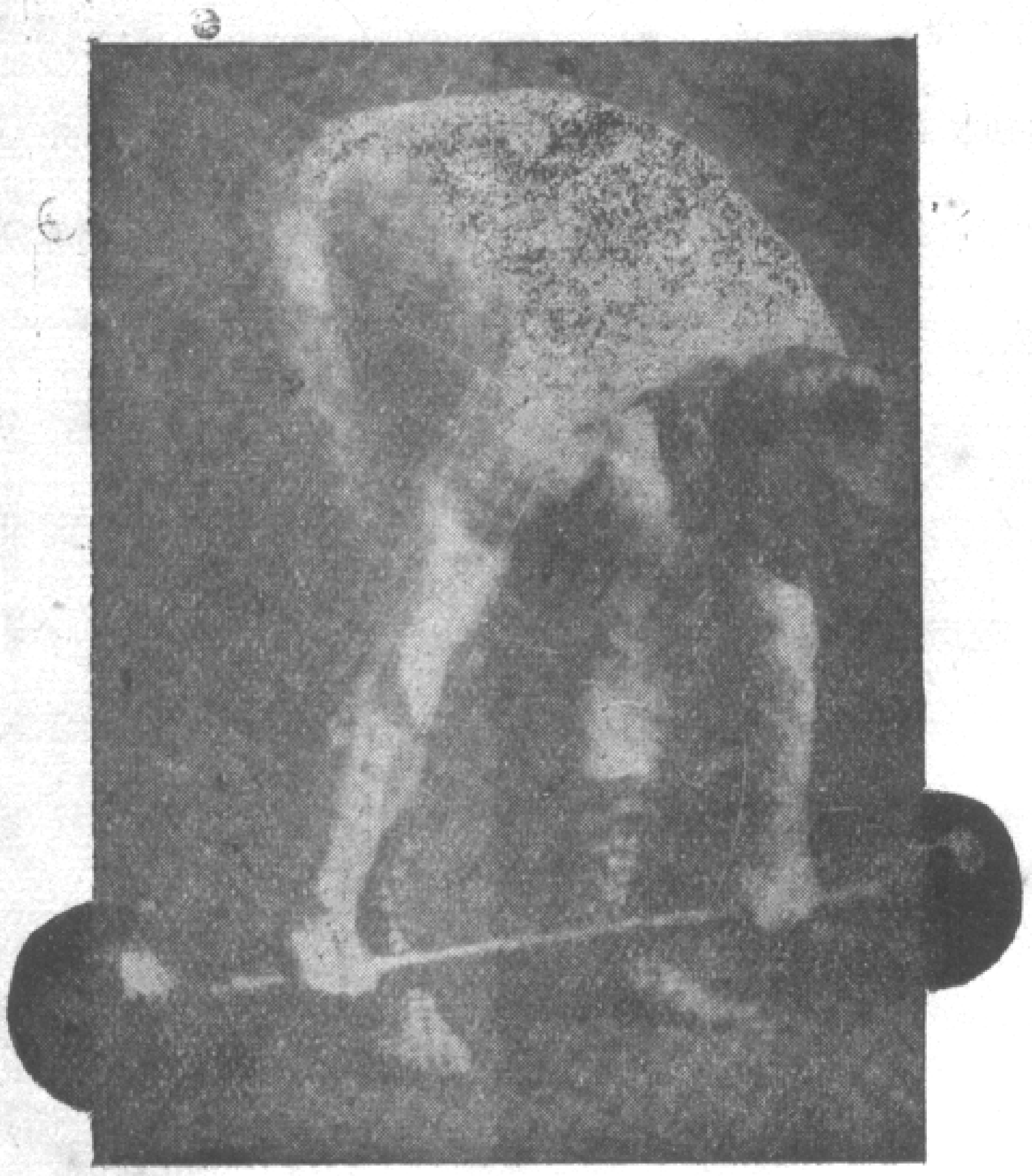
জাপানে "গেইসা" নামে একশ্রেণীর নারী আছে তাদের বারবনিতা বলা চলে না, তবে বাইজীদেরই মত নাচ-গান ও গল্পগুজবের দ্বারা পরের চিত্ত-বিনোদন করাই হচ্ছে তাদের ব্যবসা। প্রাচীনকাল থেকেই গেইসাদের এই ব্যবসা চ'লে আসছে। গরীব বাপ-মায়েরা যে-সব মেয়েকে বিক্রী করে, তারা প্রায়ই গেইসা হয়। ক্রেতারা বালিকাদের নাচ-গান-বাজ্‌নায় নিপুণ ক'রে তোলে। তারপর তারা আগন্তুকদের কাছ থেকে যে টাকা রোজগার করে, ক্রেতা মনিবরা তার বেশীর ভাগই নিজেদের পকেটে ফেলে। মনিবদের কাছ থেকে চুক্তিপত্রে সই ক'রে গেইসাদের প্রায় বাঁদীর মতই থাকতে হয়—তাদের স্বাধীন ইচ্ছার কোনই মূল্য নেই। সংপ্রতি জাপানী আইন গেইসাদের এই দাসত্বের মূলে কুড়ুলের ঘা মেরেছে। জাপানী আদালতে গেইসাদের সঙ্গে মনিবের চুক্তিপত্র আর গ্রাহ্য হবে না। অর্থাৎ এখন [illegible] বালিকারা ইচ্ছা করলেই গেইসা-জীবন ছেড়ে, স্বাধীন ও ভদ্র জীবন যাপন করতে পারবে। নূতন হাওয়ার মুখে পুরাতন সর্ব্বত্রই ঝরে যাচ্ছে!

---

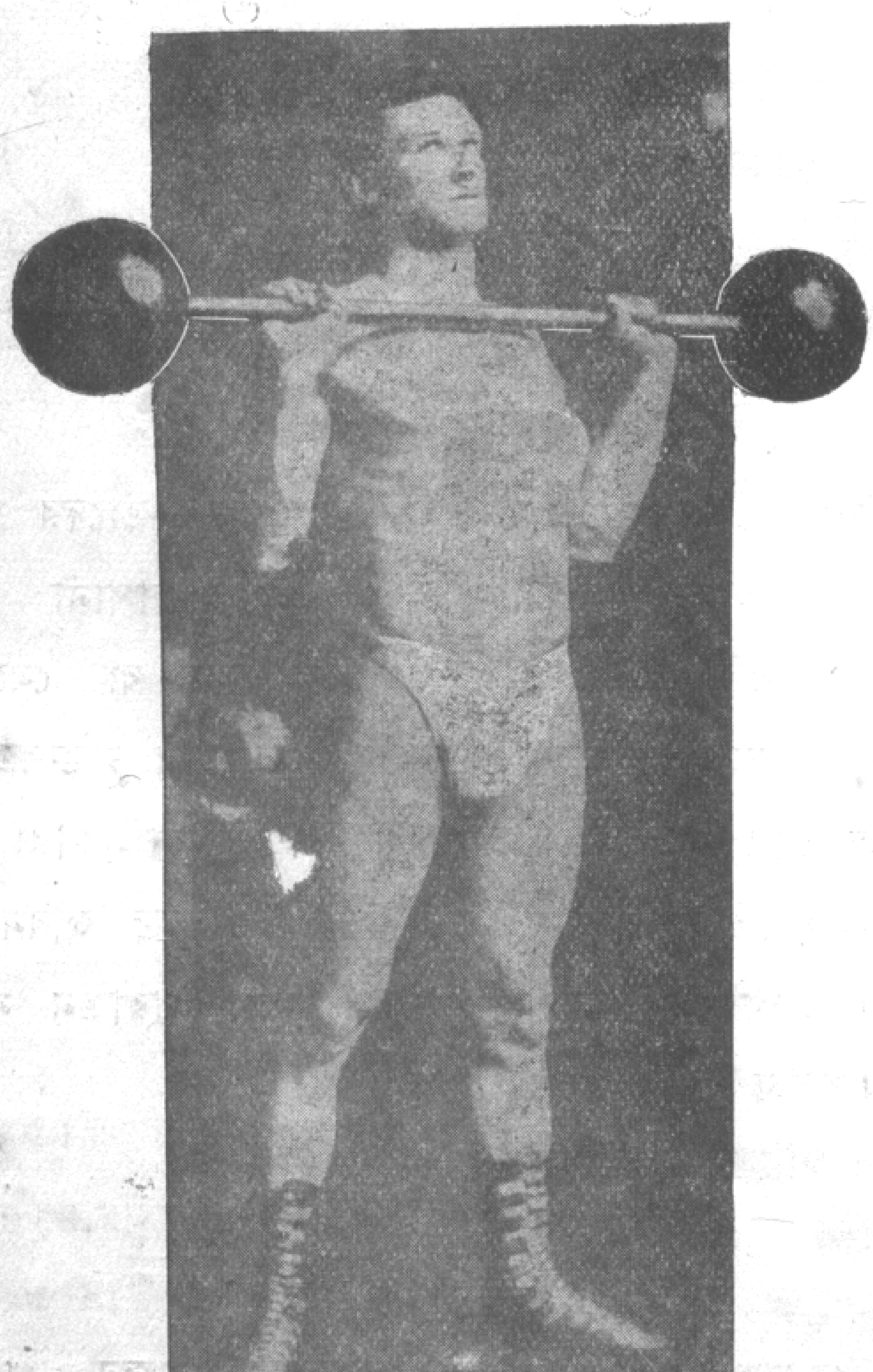
## হপ্তায় তিনদিনের ব্যায়াম

যে-সকল যুবক আপনাদের দেহের ওজন বাড়াতে, চর্ব্বি ও অনাবশ্যক মাংস কমাতে এবং দেহকে সুগঠিত ও

বলবান করতে চান, তাঁরা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ব্যায়াম করলে, এক বৎসরের মধ্যেই আশাতীত ফল পাবেন।



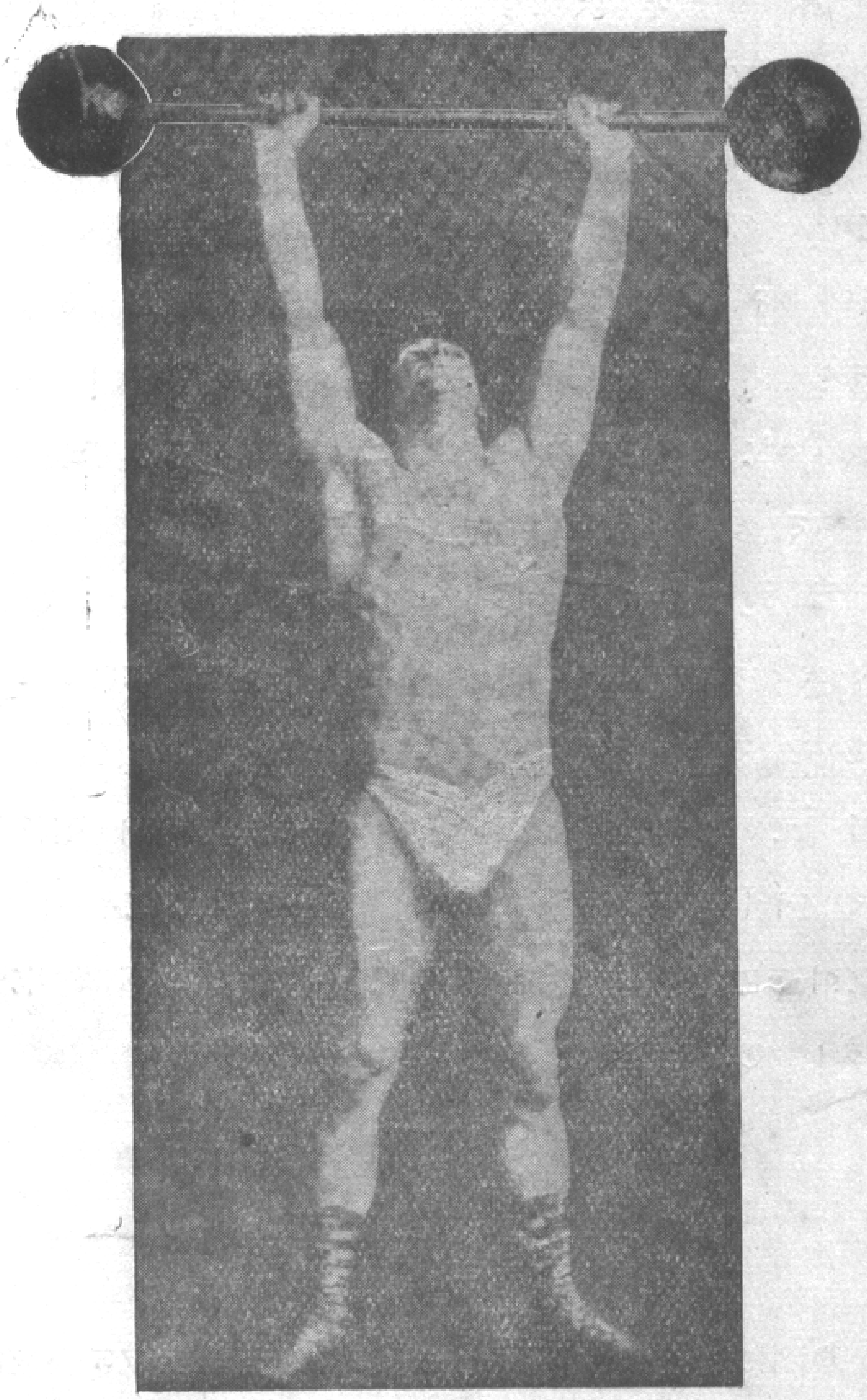
১নং ছবি



২নং ছবি

স্বেচ্ছামত ওজন বাড়ানো যায়, এমন একটি বার-বেল তৈরি করিয়ে নিন। এ-রকম বার-বেল বাজারে কিনতেও পাওয়া যায়, তবে যে-কোন ঢালাই লোহার কারখানায় ফরমাশ দিয়ে তৈরি ক'রে নিলে ঢের সস্তা হয়।

প্রথমে দশ থেকে পনেরো সের ওজনের বার-বেল নিয়ে ব্যায়াম সুরু করবেন। হপ্তায় তিনদিন এই ব্যায়াম-

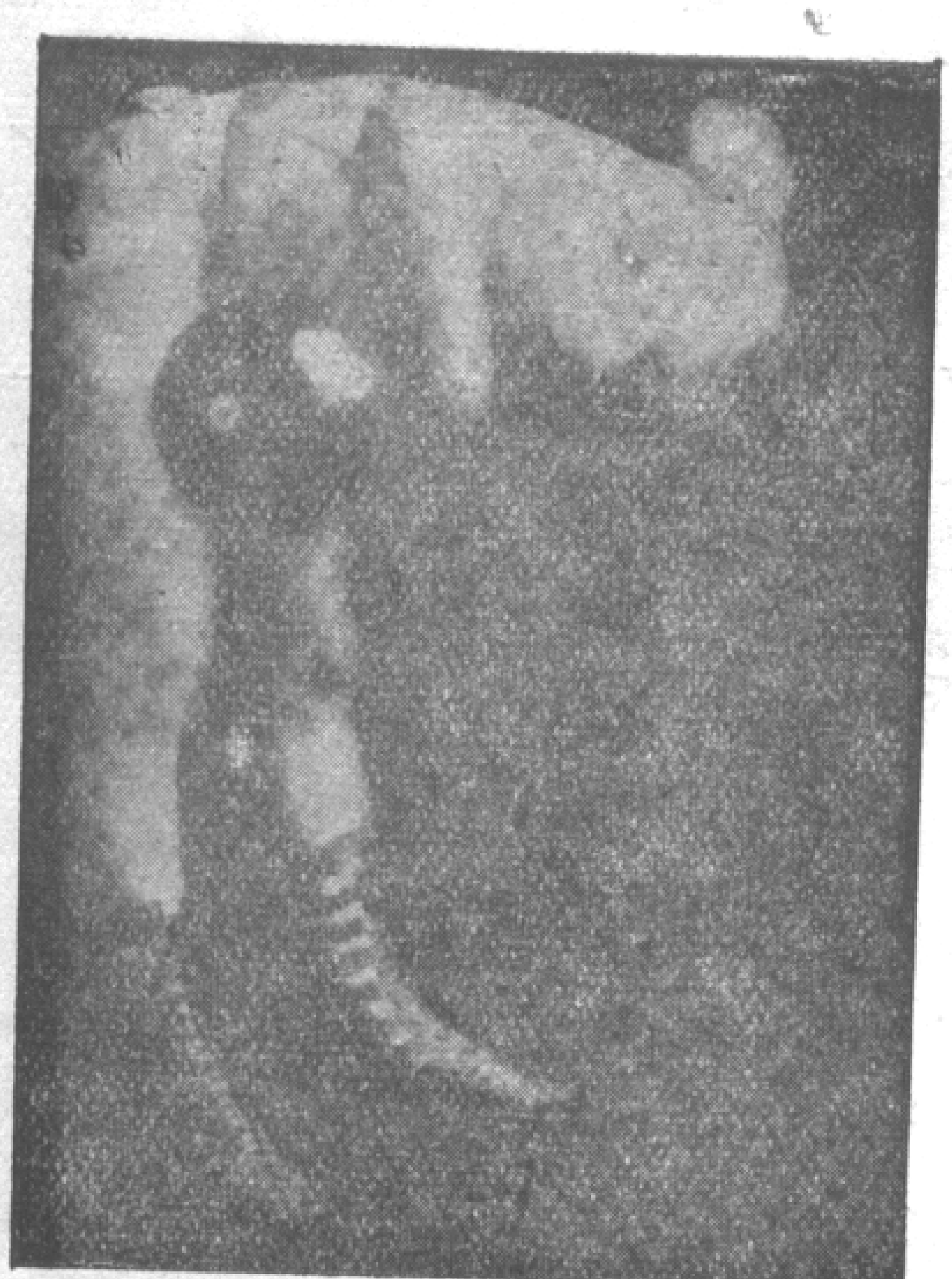


৩নং ছবি

গুলি অভ্যাস করলেই যথেষ্ট হবে। এমন করে ব্যায়াম অভ্যাস করবেন, যেখানে বাতাসের চলাচল আছে। কুড়ি-ত্রিশ মিনিটের বেশী ব্যায়াম করতে হবে না।

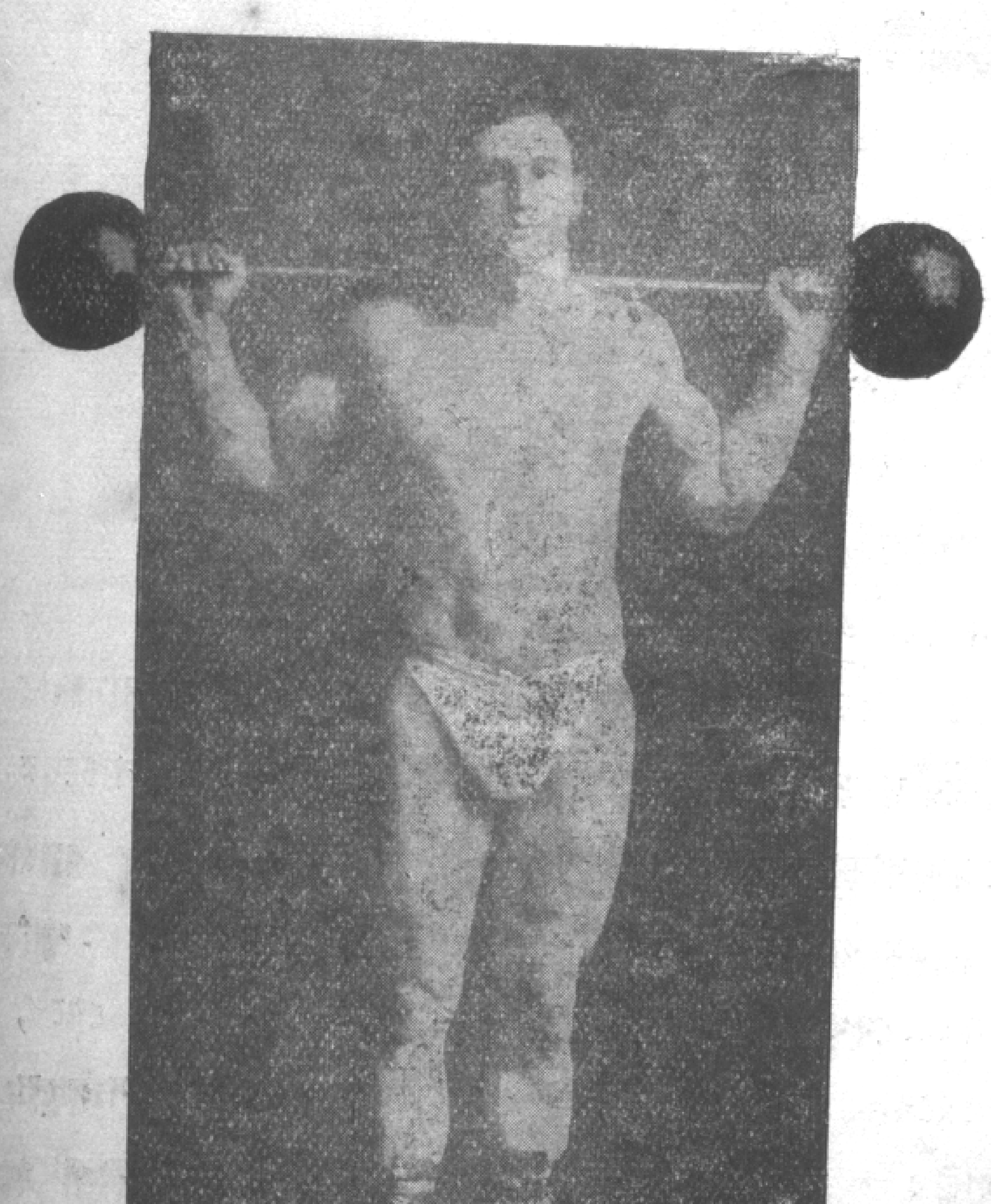
১ম ব্যায়াম। ১ম চিত্রের মতন অবস্থায় দাঁড়ান। শীঘ্রগতিতে বারবেলকে বুকের কাছে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ান (২য় ছবি দেখুন)। তারপর বারবেল মাথার উপর—যতদূর হাত যায়—হাত ছড়িয়ে তুলুন (৩য় ছবি দেখুন)। বারবেল আবার বুকের কাছে নামান এবং

আবার মাথার উপরে তুলুন। এম্‌নি ভাবে যখন কুড়িবার বারবেল তোলা-নামা করতে পারবেন, তখন বারবেলের ওজন পাঁচ সের ক'রে বাড়াবেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম :— বারবেল মাটি থেকে বুকের কাছে তোলবার সময়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে নেবেন; বুক থেকে মাথার উপর তোলবার সময়ে নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দেবেন; আবার বুকের কাছে নামাবার সময়ে নিঃশ্বাস টানবেন; আবার মাথার উপরে তোলবার সময়ে নিঃশ্বাস ছাড়বেন।



৪নং ছবি

২য় ব্যায়াম। পিঠের মাংসপেশীর পক্ষে এটি অত্যন্ত উপযোগী। চতুর্থ ছবির মতন অবস্থায় বারবেল নিয়ে সাম্‌নে হেঁট হয়ে পড়ুন। পা ফাঁক থাকবে, হাত নিম্নমুখী। নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে পেটের কাছ থেকে বারবেলটা বুক পর্য্যন্ত আনুন ( বুক যেন স্পর্শ করে )। নিঃশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বারবেল আবার পেটের কাছে আনুন। বার-বেল যখন বুক স্পর্শ করবে, তখন হাতদুটো সমান্তরালভাবে থাক্‌বে। পনেরো থেকে কুড়িবার পর্য্যন্ত এই ব্যায়ামটি করতে পারলেই বারবেলের ওজন পাঁচ সের বাড়াবেন।



৫নং ছবি

৩য় ব্যায়াম। কাঁধের উপর বারবেল নিয়ে (৫ম ছবি দেখুন) বৈঠক দিন—উপর-দেহ একটুও না বাঁকিয়ে বা হেলিয়ে ওঠবার সময়ে নিঃশ্বাস টান্‌বেন, নামাবার সময়ে ছাড়বেন। কুড়িবার পর্য্যন্ত করতে পারলেই বার-বেলের ওজন পাঁচ সের ক'রে বাড়াবেন।

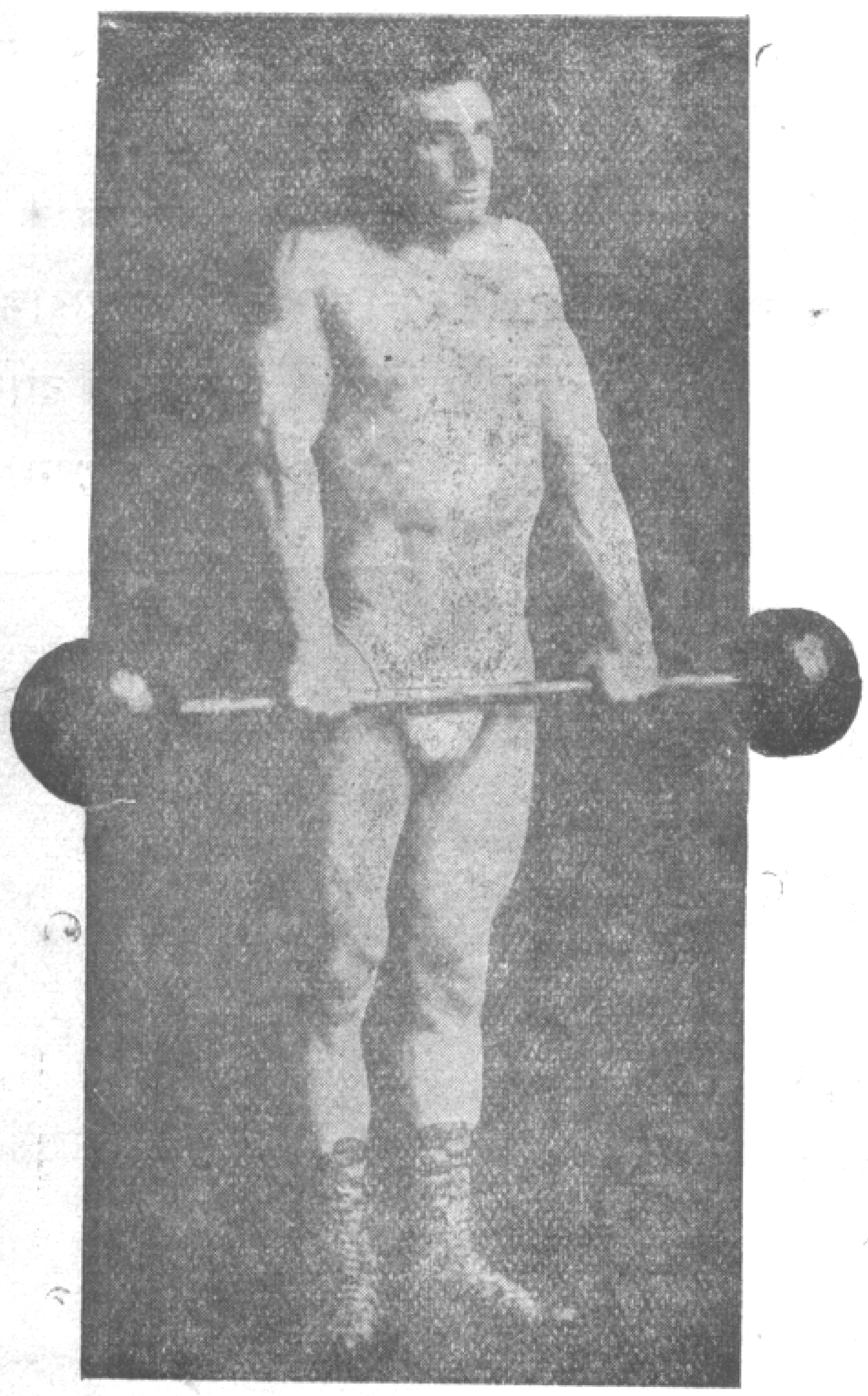
৪র্থ ব্যায়াম। ৬নং ছবির মতন অবস্থায় বারবেল নিয়ে দাঁড়ান—হাত সরল-ভাবে থাক্‌বে। দুই কাঁধ যথাসম্ভব উপরদিকে তুলুন ( ৭ম ছবি দেখুন ), তার পর আবার পূর্ব্বাবস্থায় আনুন। কাঁধ তোলবার



৬নং ছবি

সময়ে নিঃশ্বাস টানবেন, নামাবার সময়ে ছাড়বেন। কুড়িবার পর্য্যন্ত অভ্যাস হ'লেই পাঁচ সের ওজন বাড়াবেন।

৫ম ব্যায়াম। পা ছুটি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রেখে, উরুর মাংসপেশী সঙ্কুচিত ও কঠিন ক'রে হেঁট হয়ে, মাটি থেকে বারবেল তুলে সিধে হয়ে দাঁড়ান (৬নং ছবির মতন অবস্থায়)। আবার হেঁট হয়ে মাটির উপরে বারবেল রাখুন, আবার সিধে হয়ে দাঁড়ান। হাত যেন নোয় না।

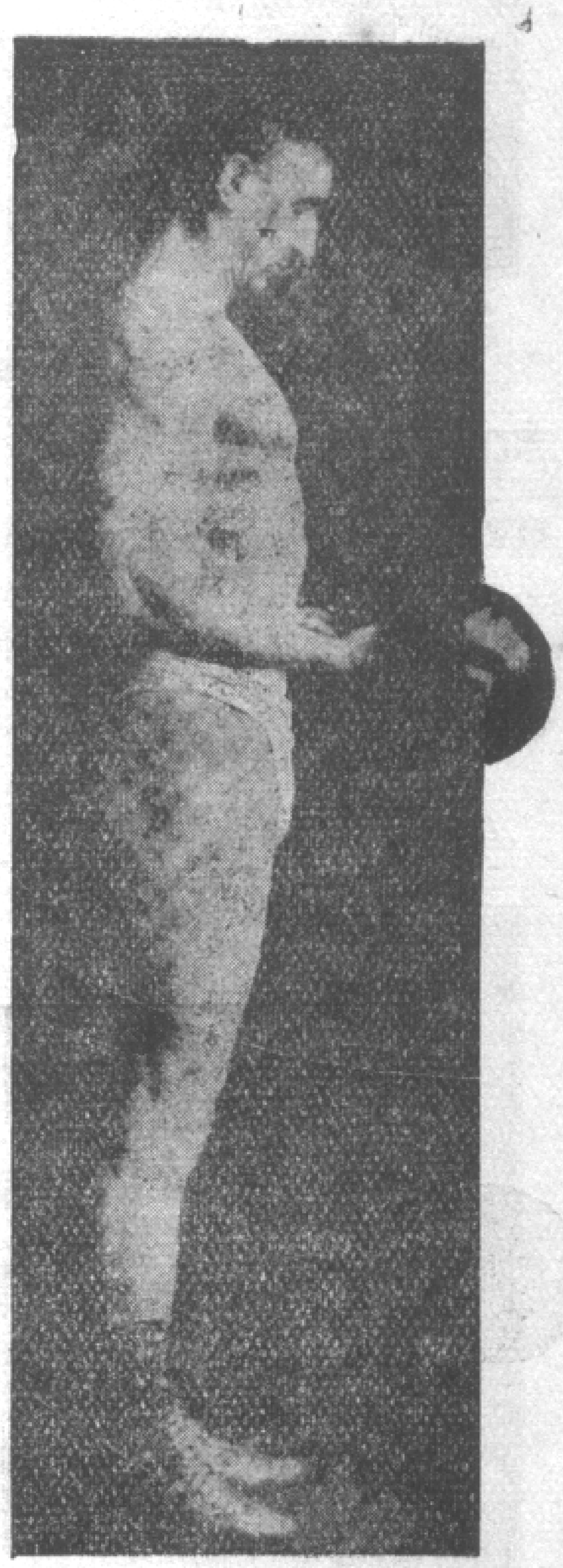


৭নং ছবি

ওঠবার সময়ে নিঃশ্বাস টানবেন, হেঁট হবার সময় ছাড়বেন। কুড়িবার পর্য্যন্ত অভ্যাস হ'লেই পাঁচসের ওজন বাড়াবেন।

৬ষ্ঠ ব্যায়াম। ৬নং ছবির মতন অবস্থায় বারবেল নিয়ে দাঁড়ান। হাত সরল ভাবেই রেখে, সাম্‌নের দিকেই বিস্তার ক'রে বারবেল মাথার উপরে তুলুন (৩নং ছবির মত)। আবার হাত পূর্ব্বাবস্থায় আনুন। হাত তোলবার সময়ে নিঃশ্বাস টানবেন, নামাবার সময় ছাড়বেন। কুড়িবার পর্য্যন্ত অভ্যাস হ'লেই পাঁচসের ওজন বাড়াবেন।

৭ম ব্যায়াম। সোজা হয়ে দাঁড়ান। হাতের চেটো সাম্‌নের দিকে রেখে, বারবেল উরুর উপরে রাখুন। তারপর ৮নং ছবির মত বার বেল বুক স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত উপর দিকে তুলুন। তারপর বারবেল আবার পূর্ব্বাবস্থায় আনুন। হাত তোলবার সময়ে নিঃশ্বাস টানুন, নামাবার সময়ে ছাড়ুন। এই ব্যায়ামে কেবল হাত ব্যবহার করবেন,—দেহের উপরে একটুও ঝোঁক দেবেন না। পনেরো বার পর্য্যন্ত অভ্যাস হ'লেই পাঁচসের ওজন বাড়াবেন।



৮নং ছবি

৮ম ব্যায়াম। ৯নং ছবি দেখুন। মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে, বারবেলটা যথাসাধ্য উপরে তুলুন। আবার হাত নামান। হাত তোলবার সময়ে নিঃশ্বাস টানবেন, নামাবার সময়ে ছাড়বেন। কুড়িবার পর্য্যন্ত অভ্যাস হ'লেই পাঁচসের ওজন বাড়াবেন।

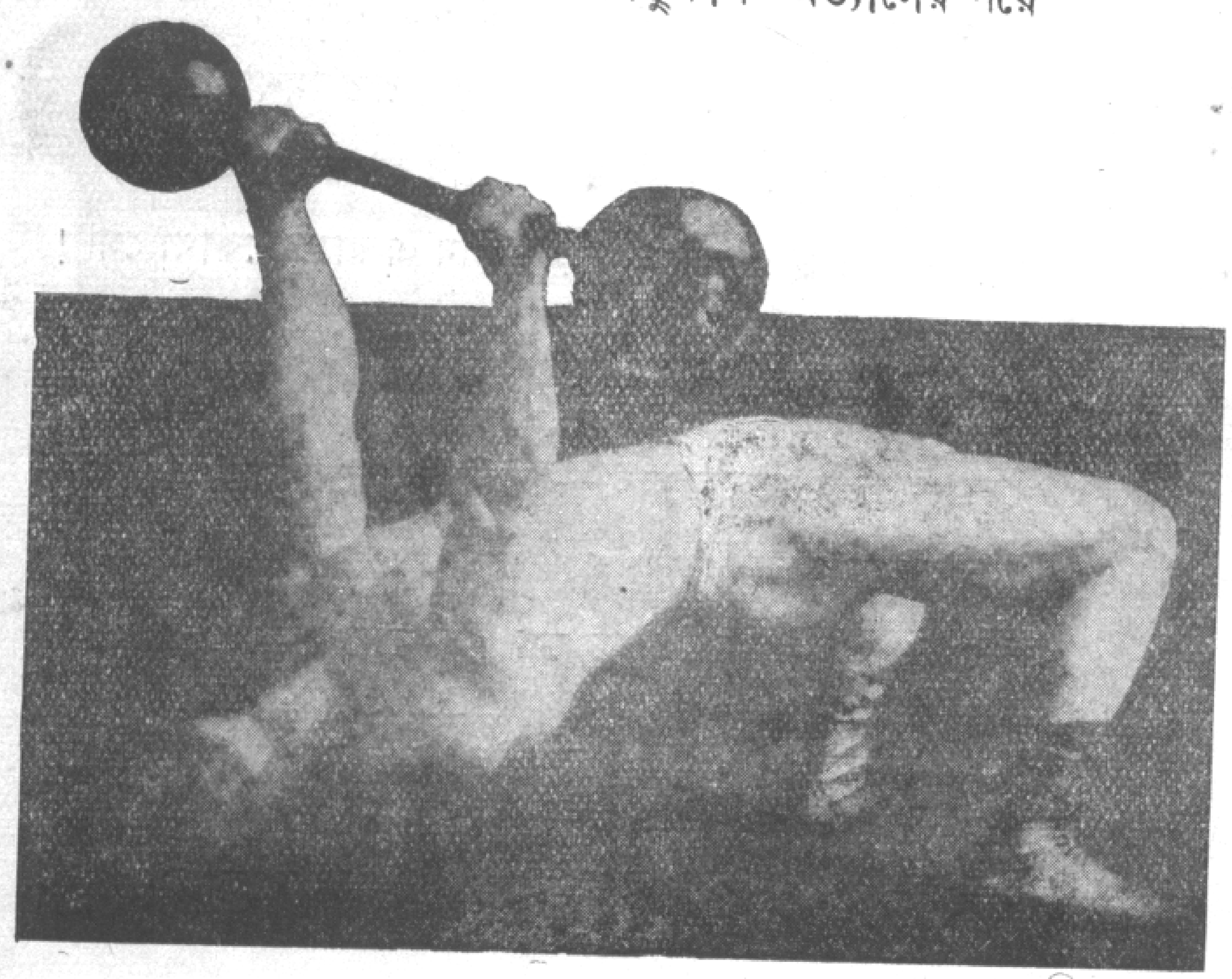
৯ম ব্যায়াম। গলার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ১০নং ছবি দেখুন। মাথার তলায় একটা বালিশ রেখে, বারবেল বুকের উপর নিয়ে, পা ও মাথার সাহায্যে মাটির উপরে ধনুক বা খিলানের আকারে অবস্থান করুন। সেই অবস্থাতেই যতক্ষণ না গলা শ্রান্ত হয়, বারবেল যথাসাধ্য উপরে তুলুন এবং নামিয়ে আনুন। যথাসময়ে পাঁচসের ওজন বাড়াবেন।

এগুলি বলবান লোকের ব্যায়াম নয়—যে কোন সাধারণ যুবক এগুলি অভ্যাস করলে উপকৃত হবেন। প্রথমে অল্পে



৯নং ছবি

অল্পে, নিজের শক্তি বুঝে অভ্যাস করলেই ব্যায়ামগুলি যার-পর-নাই সহজসাধ্য হবে। কিছুকাল অভ্যাসের পরে



১০নং ছবি

এই ব্যায়ামগুলির সঙ্গে ডন-বৈঠকও দিলে শারীরিক উন্নতি হবে দ্রুততর।

---

## একমিনিটে কামানো

আমেরিকায় একরকম দুরন্ত ক্ষৌর-যন্ত্র উঠেছে, যার দ্বারা এক মিনিটেই গোঁফদাড়ি কামিয়ে ফেলা যায়। এই যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। এর ক্ষুরের দু'দিকেই ধার,—যন্ত্রের দ্বারা ক্ষুরখানি মিনিটে পাঁচশোবার ঘুরতে পারে। এই নতুন ক্ষুর এমন কায়দায় তৈরি যে, মুখের উপরে খুব জোরে চেপে ধ'রে, লম্বালম্বি কি আড়াআড়ি ভাবে টান্‌লেও চাম্‌ড়াতে একটু আঁচড় পর্য্যন্ত লাগবে না।

---

## চেয়ারে বসার নিয়ম

ঠিকভাবে চেয়ারে বস্‌তে না জান্‌লে শরীরের গড়ন খারাপ হয়ে যায়ই, তাছাড়া দেহের মধ্যে



বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে খুর চালানো




ভুলভাবে বসা — ঠিক ভাবে বসা

মারাত্মক ও ভীষণ ভীষণ ব্যাধির সঞ্চার হয়। এই সবকারণে বৈজ্ঞানিকরা এখন ইস্কুল, কারখানা, আফিস ও গাড়ীর উপযোগী আদর্শ-চেয়ার গড়বার চেষ্টা করছেন। পাশের ছবি-দুখানতে দেখানো হয়েচে, কিরূপ ভঙ্গীতে চেয়ারে বসা উচিত। দেহকে দুমড়ে নয়, সরলভাবে রেখেই চেয়ারে বসা উচিত।

প্রসাদ রায়।

---

# বিরহে

তোমারি স্মৃতি তোমারি ছবি মরমে রাখি আঁকিয়া,
বিরহে নিতি কী সুখ লভি জানিবে তা কি হে প্রিয়া ?
নয়নে বারি ঝরে না কভু কহিলে কথা এ হেন,
বোঝাতে নারি আঁখিরে; তবু প্রাণে সে ব্যথা কে যেন
অমিয় ঢালি সুরভি করে—সুখেরি মত লাগে সে,
স্মরণে খালি মাধুরী ঝরে স্বপনাহত আবেশে !

পরাণে-মনে ফুটিয়া ওঠে অযুত যূথী মালতী,
সে ফুলবনে মধুপ ছোটে করিয়া স্তুতি বিনতি,
মুখানি তব নয়নে মম কুহেলি ঘন হরিয়া
পউষে নব চাঁদিনী সম উজলে মন ভরিয়া,
চমকি ফোটে দীপালি লাখো বাজে কী মধু রাগিণী,
জাগিয়া ওঠে যেখানে থাকো তোমারি বঁধু কাহিনী !

কাঁকনে বাজে রিনিকি-ঝিনি আসিয়া পশে শ্রবণে,
সকালে সাঁজে সারাটা দিনই ভাসিয়া ও সে পবনে,
আকাশে জলে আলোতে হেরি কাহার ও ছায়া নিরখি ?
তৃণানীদলে কুসুমে ঘেরি রচিল মায়া কে সখি ?
তোমার ও কালো অলকরাশি নেহারি মেঘে গগনে,
ঊষার ও আলো তোমারি হাসি রয়েছে লেগে নয়নে।

বিরহানলে দহে না খালি জ্বলে সে আলো আঁধারে,
'কোথা সে ব'লে'—প্রণয়ে গালি পাড়া কি ভাল কাঁদায়ে ?
গিয়েছ দূরে রয়েছে পড়ে তোমারি যত নিশানা,
যা দেখি জুড়ে হাজারো ডোরে মাধুরী শত মিশানা,
কামিনী গাছে ধরেছে কুঁড়ি তোমারি হাতে পোঁতা গো,
গড়ানো আছে শাঁখা ও চুড়ি—তুমি এ রাতে কোথা গো !

দেয়ালে ছবি রয়েছে মারা—তোমারি হাতে টাঙানো,
দুটি সুরভি ফুলেরি চারা ও পাশে ছাতে রাঙানো,
দেরাজে ভরা খুঁটি ও নাটি ভরা সে সাড়ি-সেমিজে,
শিশিতে করা মধুও খাঁটি; ও কি ও ? হাঁড়ি দেখি যে !
এখানে কাঁটা ওখানে জাঁতি, কাগজে মোড়া ওটা কি ?
সুপুরি কাটা; এটা কি ? বাতি সিকটা পোড়া যা বাকি !

বিরহে একা রয়েছি ভালো, কী সুখে কব কাহারে ?
জীবনে দেখা পেয়েছি আলো কী অভিনব আহা রে !
পুরোনো চিঠি তোমারি শত—জ্বলে সে লেখা বলে গো
—রেখেছি মিঠি চুমা যা যত, দেবো তা দেখা হলে গো !
সে আশা বুকে তোমারি পানে রয়েছি আমি চাহিয়া,
দুখে ও সুখে তোমারি ধ্যানে দিবস-যামি হে প্রিয়া !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

# প্রাচীন ভারত*

ভারতবর্ষের অতীতের আলোচনা করতে প্রথম যখন আমি নিযুক্ত হয়েছিলেম সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত ৩৯ বৎসর পার হয়ে গেছে। অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে আমি আমার সময় ও শক্তির শ্রেষ্ঠ অংশ এই কার্য্যেই ব্যয় করে এসেছি। নীরব অধ্যয়নের ভিতর দিয়ে কত সব নাম, কর্ম্ম, কীর্ত্তি, আনন্দ ও বেদনাকে বিস্মৃতির উদাত গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য আমি নিঃশব্দে যুদ্ধ করেছি এতকাল; সুদূর অতীতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের যে সব জয়-পরাজয় আর দুঃখ-সুখের বিপর্য্যয়, যা নাকি সকল কালের সকল মানুষেরই অদৃষ্টে ঘটে থাকে আমি সরল মনে তারও যেন অংশভাগী হয়েছি। এতে ক'রে আমার একটী মাত্র লক্ষ্য ছিল—বিজ্ঞানের সেবা করা, আর বিজ্ঞানের সেবা দ্বারা সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করা। ফ্রান্সের রিপাব্লিক যখন আমাকে College de Franceএর অধ্যাপকের আসন দেন, তখনই আমি আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছি। কখনো আমার এমন আশা করবার সাহস হয় নি যে, একদিন ভারতবর্ষের দুইটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদর নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি এখানে আস্‌ব, আর ভারতীয় ছাত্রদের কাছে ভারতবর্ষেরই ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করব। তবে আমি আপনাদেরি একজন কবির গ্রন্থে পড়েছি—

দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোপ্যন্তাৎ
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিঃ অভিমতম্ অভিমুখীভূতঃ।

কবিরা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। কিন্তু কবি শ্রীহর্ষ, যাঁর লেখা থেকে আমি এই যুক্তিপূর্ণ সুললিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করেছি তিনি কেবল কল্পনারাজ্যের বা স্বপ্নপুরীর মানুষ নন। তিনি ছিলেন সারা হিন্দুস্থান-জোড়া প্রকাণ্ড রাজ্যের অধিপতি। সমগ্র এসিয়ার রাষ্ট্র-জীবনের সংস্পর্শে তাঁকে আস্‌তে হয়েছিল বলে সেই বিচিত্র সংস্পর্শের প্রভাবে জীবনের তত্ত্ব সকল তাঁর কাছে বাস্তব হয়ে উঠেছিল। সুতরাং তাঁর জ্ঞান ছিল নিজেরি জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ। রাজা পুলকেশী দাক্ষিণাত্যের দিকে তাঁর গতিপথ রুদ্ধ করায় যখন সেই দুর্দ্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তিনি যুদ্ধে রত, তখন কজন চীন রাজদূত এদেশে আসেন। তিনি তাঁদের সাদরে তাঁর রাজসভায় অভ্যর্থনা করে নিয়েছিলেন। সেই চীনদূতেরা যে মিলনের অগ্রদূত হয়ে এসেছিলেন সে মিলন রাজা হর্ষেরই জয়-গৌরবের নির্দ্দেশক। ভারতবর্ষের সীমানার বাইরে দেশ-দেশান্তরের ভিতর দিয়ে সংযোগের যে বিচিত্র বন্ধন মানব জাতির অন্তর্নিহিত ঐক্যেরই প্রমাণ রূপে বিদ্যমান, তারও কিছু কিছু চকিত জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। আমাদের একালে সেই ঐক্যের বিষয় আমরা আরো ভালো করে জেনেছি, আর বিশ্ব-ইতিহাসের রাজ্যে সেই ঐক্যটীকেই উপলব্ধি করছি; এখানে আমার আজকার এই উপস্থিতি সেই ঐক্যেরই ছোটখাট একটী প্রতীক।

ভাষা, আচার-ব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষা ও ভক্তি-বিশ্বাস প্রভৃতির বিভিন্নতা দ্বারা বাইরের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন যে মানব সমাজ তাদের মধ্যে পরস্পরকে জান্‌বার, একে অন্যকে কাছে টান্‌বার মূলে শুধু অলস আমোদ নয়, একটা আবশ্যকতা আছে। কোন এক সময় দারুণ নৈরাশ্য-ভরে কোন একজন দার্শনিকের পক্ষে একথা বলা সম্ভব হয়েছিল—যে, "মানুষ মানুষের কাছে ব্যাঘ্র বিশেষ।" এ কথা ঠিক যে, প্রকৃতি মানুষের চেয়ে নির্দ্দয়তর। সে তার দানকে ভাগ ক'রে দেবার বেলায় খেয়ালের ঝোঁকে যা-তা একটা অসমান ভাগ ক'রে বসে। আর তাতে ক'রে চার পাশে কেবল হিংসা-দ্বেষ আর ঝগড়ারই বাজ ছড়িয়ে দিয়ে আমোদ পায়। কিন্তু মানুষ বৃহৎ, সে মহৎ,—প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রে চলার শক্তি তার যথেষ্টই আছে। যে শক্তির মূলে ছিল কু-মতলব, তাকে দিয়ে সে সুকাজই করিয়ে নিতে পারে। যে মহা সমর বর্ত্তমানের বুকে ক্রোধ বিদ্বেষের তুমুল ঝড় বহিয়ে দেয়, সেই আবার ভাবীকালের সার্থক মৈত্রী-বন্ধনের উৎপাদক। মিডিয়ান্ বিজয়ের ফলে গ্রীকের সভ্যতা, তার শিল্প, সাহিত্য ও স্বাধীনতা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে বলেই গ্রীক্‌দের মনে চকিত ধারণা জন্মে, আসলে কিন্তু

মিডিয়ান-বিজয়ের পরে গ্রীসের কর্ম্মশক্তির কাছে একটা বৃহত্তর জগতের দ্বারই খুলে গিয়েছিল। সেকন্দর শার পাঞ্জাব-অভিযানের ফলস্বরূপ কয়েকটী দেশের আয়তন নিয়ে যে বিশাল ভূভাগ পরবর্ত্তী কালে "রোমান্" এই একমাত্র নামে অভিহিত হয়েছিল, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ মিলন হয়।

সহজ ভাবে গেলে যুদ্ধের ইতিহাসটাকেই মানব ইতিহাসের সমস্তটা বলে বোধ হয়; কিন্তু জাতির সঙ্গে জাতির মিলন ঘটবার এই যে পথ, এর আর সব দিক আড়াল করে শুধু রৌদ্র রূপটাই সবার চোখে পড়ে। সৈন্যেরা যে পথে রক্তপাত করে অগ্রসর হয়েছে, সেই পথ দিয়েই তাদের পিছনে বণিক, প্রচারক ও পণ্ডিতেরাও এসেছেন। সকলেই অলক্ষ্যে, এমন কি অনেক সময় নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জাতির ভবিষ্যৎকে মহত্তর করে গিয়েছেন। এরা সব প্রচ্ছন্ন কর্ম্মীর দল, ইতিহাস তাদের নামের সঙ্গে তাদের কাজের চিহ্ন কিছুই রাখে নাই।

বাস্তবিক একদল গোঁড়া লোককে এমন ছেলেমানুষী একটা মত পোষণ করতে দেখা যায় যে,কোন জাতির সভ্যতা পুরোপুরি সেই জাতিরই সৃষ্টি, এবং যে কোন একটী সভ্যতা একটী জাতির একলারই দ্বারা গঠিত। নিজ নিজ জন্মভূমির সীমান্ত থেকেই অসভ্যদেশের আরম্ভ বলে স্থির করে বসে আছেন, আজও এরকমের ঢের লোক পাওয়া যায়। এই সব লোক একালে জন্মগ্রহণ করেও সে কালের দিকেই তাকিয়ে আছেন। এই শ্রেণীর লোকের সর্ব্বদাই আশঙ্কা যে, প্রতিবেশী কোন জাতি যদি তাদের সভ্যতার সামান্য অংশেরও ভাগ দাবী করে, তাহলে তাদের জাতির সম্মানেই যেন আঘাত লাগে। ভগবৎ-প্রীতি যেমন অনেক জায়গায় বিচার-হীন উন্মাদনায় রূপান্তরিত হয়, স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধেও সেই কথা খুব খাটে। নিজের দেশই বিশিষ্ট দেশ, শিল্প বিজ্ঞান আবিষ্কার উদ্ভাবন যা-কিছু সব সেইখানকার বিশেষ ভুঁই ফুড়েই উঠেছে; এই রকমের একটা বিশ্বাস ছাড়া এঁদের উৎকট স্বদেশ-প্রেমের বাতিক ঠাণ্ডা হয় না। এ হেন ছেলেমানুষী মনোভাবের দ্বারা সত্যকেই পীড়িত করা হয়। সভ্যতা কোনো জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি হতে পারে না; সে হচ্চে সমগ্র মানব জাতির সমবেত চেষ্টার সমষ্টিফল। সভ্যতা গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই বিশ্ব-মানবের জন্য কাজ করে চলে।

আমাদের একালের বিজ্ঞান অতীতের যতটা বিশ্লেষণ করে উঠতে এখনো ব্যস্ত রয়েছে, ততটা দূর না গিয়ে শুধু গ্রীসের দিকেই একবার তাকানো যাক। দুনিয়ায় এমন কোন জাতি আছে,যে নাকি জ্ঞান বিজ্ঞান সত্য ও সৌন্দর্য্যের সাধনায় তার কাছে ঋণী নয়! কিন্তু সে নিজেও কার থেকে ঋণ গ্রহণ না করেছে? ফিনিসিয়ানদের কাছ থেকে লিখন-প্রণালী ও ইজিপ্সিয়ানদের কাছ থেকে যে ফিলসফি নিয়েছে, তা সে নিজেই স্বীকার করে গিয়েছে। আর আজ তার অতীত সম্বন্ধে আমরা তার নিজের থেকেও বেশী জেনেছি বলে তার সভ্যতার সন্ধানে বেরিয়ে আমরা ক্লাসিক গ্রীসকে ছাড়িয়েও এমন একটী এজিয়ান্ (Agean) সভ্যতায় এসে পৌঁছেছি—যা নাকি এসিয়ারই আব-হাওয়ায় গঠিত Pasteurএর বিশ্লেষণগুলির দ্বারা জীব বিজ্ঞান থেকে যে স্বতঃসম্ভবতা-বাদ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে, সে বাদ ইতিহাসের বেলাতেও আর খাটে না।

কেউ হয় তো আপত্তি তুলতে পারেন যে অতীতের জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ নই; সেই জন্যে আমাদেরি এই কালের পুরা আয়ত্তাধীন একটা বিষয় থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া ভালো। ধরা যাক্—ফরাসী সাহিত্য। ষোড়শ শতাব্দীর (Renaissance) রেনেসাঁসের সমসকার ফরাসী সাহিত্যের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সবই গ্রীক আর ল্যাটিন আদর্শে অনুপ্রাণিত। তার কিছুকাল পরেই ফরাসীর মন ইটালির রুচি প্রবৃত্তি ও কলা-কুশলতার দিকে আকৃষ্ট হয়। তারো পরে Corneilleর গুরুগম্ভীর ওজস্বী আর্ট দ্বারা তার উপর স্পেনের প্রভাব। পরে Racine এ বাইবেল আর Euripides এর একত্র সমাবেশ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের চালক হয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জননী ইংলণ্ড। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর জার্ম্মাণ রোমাণ্টিক ভাবের সুরু আর সম্প্রতি নরওয়ে সুইডেনের নাটক ও রুষিয়ার নভেল বর্ত্তমান ফরাসী মনের উপর ছাপ মেরেছে। এতে করে কি ফরাসীর জাতীয় প্রতিভা কিছু নেই বলেই প্রমাণ হচ্চে,

না তার উল্টোটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে? এইসব সহজ পরিপাকের প্রণালীর ভিতর দিয়ে সে তার নিজের শক্তিরই পরিচয় দিয়ে আস্‌ছে। যে বিভিন্ন মণ্ডলীর সমবায়ে জাতি গঠিত হয়, সেই মণ্ডলীগুলির বিচিত্র রুচি ও প্রবৃত্তিকে একটী ঐক্যের আবেষ্টনে টেনে আন্‌বার যে শক্তি, তার নামই তো জাতীয় প্রতিভা। মানুষের বিভিন্ন রুচি ও প্রবৃত্তির ভিতরে যেগুলি কেবলমাত্র ক্ষুদ্র কালের ও ক্ষুদ্র দেশের, সেগুলিকে বর্জ্জন করে যেগুলি অপেক্ষাকৃত নিত্য ও সকল দেশবাসীর পক্ষেই সাধারণ সত্য তাদের গ্রহণ করাতেই জাতীয় প্রতিভার প্রতিষ্ঠা। চারদিকের সীমান্ত প্রদেশগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত রেখে তাদের সব কটীর উপর একই শাসনের অধিকার আর একই নিয়মতন্ত্র বা আইন-কানুনের অধীনতা চাপানো মাত্র জাতি-গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই উপায়ে কোন বর্ব্বর বিজেতা সাম্রাজ্য গঠন কর্‌তে পারে? কিন্তু তার নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তার ভঙ্গুর সাম্রাজ্যও লুপ্ত হয়ে যায়। কোন একদল লোককে একটা জাতিতে পরিণত হতে হ'লে সেই উচ্চস্তরের ঐক্যের আবেষ্টনে একত্র মিলতে হবে—যে ঐক্য জয় ও পরাজয়ের বিপর্য্যয়ে অটুট থেকে আপন অস্তিত্বকে তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছে। এ ঐক্য অস্পষ্ট ভাবের ঐক্য নয়, বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনায় উপলব্ধি করা সত্য। ইতিহাসেও দেখি, আকস্মিক ঘটনার ঝোঁকে গঠিত যে সব দল বা মণ্ডলী তার মধ্যে যেখানেই জাতীয়তার অনুভূতি এসেছে, সেইখানেই সে সহজ সরল ও গভীর যে ঐক্য একমাত্র তাকেই স্থায়ী হতে দিয়েছে। জোর-জবরদস্তি দ্বারা ক্ষণকালের জন্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলেও গভীর ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জাতি সে মরেনা, বরং দুঃখের আঘাত তার ঐক্যের সহজ অন্তভূতিকেই আরো গাঢ়তর করে তোলে। তখন সে জাতি একটা যন্ত্র মাত্র নয়, সে তখন একটী সজীব পদার্থ; সজীব শক্তির তৌল মাপে সে তখন আঘাতকে অনুভব করে। এহেন সুদৃঢ় গঠিত প্রাণবন্ত সমাজের ভিতর বিচিত্র জীবনী-শক্তির সঞ্চালন-লীলার ভাব ও চিন্তায় একটী সাধারণ ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। তার পর কালক্রমে কোন নতুন মতবাদ বা গ্রন্থাদি জাতির সাধারণ রুচির সুমুখে প্রচারিত হলে পর সর্ব্বসাধারণের মিল ও গরমিলের মাপে তাদের ওজন চল্‌তে থাকে, এইরূপ ওজনের ফলে যেটী টিঁকে গেল সেইটীই classic হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব জাতীয় প্রতিভার কাজ হচ্চে সমালোচনা, নব নব সৃষ্টির যা কিছু গৌরব তার অধিকারী হচ্চে ব্যক্তিগত প্রতিভা—সে নয়। তবে একথাও অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এই সৃষ্টিকরণের রাজ্যেও সমাজের প্রভাব—তা সে যত অল্পই হোক—কিঞ্চিৎ আছে; সমাজেরই কাঠামোর উপর আপন সৃষ্টিকে দাঁড় করাতে হয় বলে তার প্রভাবের একেবারে বাইরে ব্যক্তিগত প্রতিভা যেতে পারে না।

সুতারং দেখা যাচ্ছে—জাতির প্রতিভা ও বিদেশের দানের ভিতর বিরোধ রয়েছে বলে কেউ কেউ প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হলেও আসলে তা নেই। আদান-প্রদানের যে একটা চিরন্তন স্রোত চলে আস্‌ছে, তাতে কোরেই পৃথিবীর জাতি সকলের যা কিছু কর্ম্মফল ও প্রচেষ্টা পরস্পরের কাছে প্রচারিত হয়ে থাকে। আর যাবতীয় প্রতিভা আপন অভিজ্ঞতা-লব্ধ রুচি ও বিচারবুদ্ধি বলে তার ভিতর থেকে যা কিছু নিজের গ্রহণীয় বলে মনে করেছে, তাকে গ্রহণ করে বাদ-বাকিকে বর্জ্জন করে চলেছে। এই গ্রহণ-বর্জ্জনের পদ্ধতিতে একদিকে সে যেমন ঐশ্বর্য্যশালী হয় আর একদিকে তেম্নি আপন বৈশিষ্ট্যেরও পরিচয় দিতে থাকে। অবশ্য যত দিন পর্য্যন্ত সে নিজের রুচিকে স্বাধীন ভাবে অনুসরণ করে চল্‌তে পারে, অন্ততঃ তত দিন এই প্রণালী তার পক্ষে ফলপ্রদ। জাতীয় প্রতিভা জাতিরই ভিতর আবদ্ধ। সেইজন্য যে জাতির ভিতর সে তার নিজেকে প্রকাশ করে, সেই জাতির বিলোপের সঙ্গে সে নিজেও বিলুপ্ত হয়। কবি Horaceএর ভাষায় বল্‌তে গেলে—"গ্রীস বিজিত হয়েও তার দুর্দ্ধর্ষ জেতাকে জয় কর্‌তে পেরেছিল," কিন্তু গ্রীসের স্বাধীনতা লোপের পর তার জাতীয় প্রতিভাও বেশী দিন টেঁকেনি। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, যদিও উৎপাদিকা শক্তি তার ভিতর আর ছিল না তবু তারি একটু ফিনিক্ বা রেশ সেই প্রাণহীন দেহেও

যেন আভাসের মতন লাগা ছিল। এবং হাজারো বছরের বিস্মৃতির তল থেকে খৃষ্টান প্রতীচ্য যখনি তাকে আবার আবিষ্কার করলে সে তখন Renaissanceএর দ্বারা সারা য়ুরোপের ইতিহাসের গতি ফিরিয়ে দিয়েছে।

ভারতবর্ষকে দেখে মনে হয় যেন সে এই সাধারণ নিয়মপাশ থেকে নিজেকে খসিয়ে নিয়েছে। তার ব্রাহ্মণ রচিত সাহিত্যের প্রকাণ্ড ভাণ্ডারে যুগান্তর ধরে যে সব প্রবাদ প্রবচন সংগৃহীত রয়েছে, তার ভিতর নিজের চতুঃসীমার বাইরে যে ব্যাপক বিশ্ব তার সম্বন্ধে কোন খবরই নেই। প্রকৃতি নিজেই যেন একটা গণ্ডী টেনে সারা দুনিয়া থেকে তাকে পৃথক করে দিয়েছে। অবিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালায় তার উত্তর দিকের পথ রুদ্ধ, তার পূব ও পশ্চিমের বিজন সীমায় মহান সমুদ্রের অতল-স্পর্শী পরিখা। সমুদ্র আর পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী যে মরুভূমি সেও আবার সিন্ধু-তীরস্থ দেশের পথরোধক হয়েই রয়েছে। এই দেখে সহজেই মনে হয় যে কোন একজন বিদ্বেষ-প্রবণ দেবযোনি এই ভারতবর্ষকে একটী ছিদ্রহীন পাত্রেরই মতন পেয়ে অনুকূল অবস্থার জোরে মানবতা নিয়ে নিজেরি খেয়ালমত যেন কি একটা তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর্‌তে চেয়েছিল। সমাজও তার তরফ থেকে প্রকৃতির কাজেরই সাহায্য করে আস্‌ছে। এই সমাজের মতন পরদেশীকে বাদ দিয়ে চলার অপূর্ব্ব পদ্ধতি আর কোথাও খুঁজে বার করা দুর্লভ। এখানকার বর্ণাশ্রমের মৌলিকতা নিয়ে আমি কোন কথা বল্‌তে চাইনে। ভারতীয় সমাজের হিতসাধন যা সে করেছে তাই ধরে কেউ তার প্রশংসা করুক বা কেউ তার দোষের উল্লেখ করুক, তার সম্বন্ধে কঠোর অভিমতই দিক, সে যে ভারতবর্ষের চারদিকে একটী দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে সারা দুনিয়া থেকে তাকে পৃথক করে রেখেছে, এ বিষয়ে সকলকেই একমত হতে হবে। অন্তত্র ভিন্নদেশী লোক ইচ্ছা করলে যে কোন দেশবাসীর স্বজাতীয় বলে পরিগণিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে; কিন্তু এখানে তাকে চিরকালের জন্য বাইরেকার লোকই থেকে যেতে হবে। দৈবক্রমে যদি হিন্দুর ঘরে তোমার জন্ম হয়, তবেই তুমি হিন্দু; দিকের প্রাকৃতিক বাধার সঙ্গে ভিতরকার এই সৃষ্টিছাড়া সামাজিক ব্যবস্থা মিলে মানুষের এমন একটী অদ্ভুত দল গঠন করেছে, আমরা জানিনে কি করে তার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হয়। নৃতনের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ এক নয়। রক্তের এমন বিচিত্র মিশ্রন ভারতবর্ষের জাতির মধ্যে যতটা স্পষ্টরূপে বিদ্যমান ততটা আর কোথাও বড় দেখা যায় না। ভাষার দিক দিয়েও সে এক নয়। এখানকার জাতির চেয়ে ভাষার সংখ্যা বেশী। তবু একথা মানতেই হবে যে, ভারতবর্ষের ঐক্য কেবল প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত একটা ভৌগোলিক সীমার মধ্যবর্ত্তী -খণ্ডের ঐক্যই নয়। মানুষের তরফ থেকেও সে ঐক্যের একটা বিশিষ্ট রূপ ও মূল্য আছে।

ভারতবর্ষের যে বিশেষ একটী সভ্যতা আছে, আর সেই সভ্যতা যে এক ভাষা, এক সাহিত্য এবং একই আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একথা কেউ অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না! আসমুদ্রহিমাচলের অধিবাসী শিক্ষিত নিরক্ষর নির্ব্বিশেষে সকলেই অপার্থিব নীতিমূলক ধর্ম্মে, কর্ম্মানুযায়ী জন্মান্তর ও নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল সংসার-তত্ত্বে সমবিশ্বাসী। এখানে ধর্ম্মনীতি ও দর্শন দুয়ে একমত হয়ে একত্রে মায়াবাদ প্রচার করে আসছে। দেবভাষা সংস্কৃত দু-তিন হাজার বছর ধরে সমান শ্রদ্ধা পেয়েছে। ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাসকে রচনানীতি, কাব্যকলা ও রুচির আদর্শ বলে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে থাকে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ নরদেবতারূপে পূজিত। কিন্তু কোন দেশের বিশেষ একটী সভ্যতা থাকাই যে সেই দেশবাসীদের নিয়ে একটী (নেশন্) মহাজাতি গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, ভারতবর্ষ তারি একটা প্রমাণ যে প্রাচীন জাতিগুলি classic হয়েছে, তাদের সঙ্গে তুলনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, ভারতবর্ষের কি চাই।

ভারতবর্ষ বল্‌তে এখানে আমি প্রাচীন ভারতকেই ধরে নিয়েছি, বর্ত্তমানে যে সব বাদানুবাদ ও ভাবোন্মাদনা চল্‌ছে একান্ত ইচ্ছা করেই আমি তার মধ্যে যোগ দেবো না। একমাত্র সত্যেরই সেবা যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য তাকে দাঁড়াতে হবে,—হয় সেই উচ্চস্তরের নির্জ্জনতায় ল্যাটিন কবি

প্রশংসা করেছেন, নয়তো সেই নীতির সমতল ক্ষেত্রে বৌদ্ধেরা যাকে বলেছেন "ধর্ম্মধাতু" যেখানে গেলে পার্থিব বস্তুমাত্রেরই গা থেকে সংসারের স্বাভাবিক মলিনতার বীজ একেবারে গলে গিয়ে ধুয়ে মুছে যায়। রাজা দুষ্মন্ত যখন মাতলি-চালিত ইন্দ্রের রথে স্বর্গের পথে নেমে আস্‌ছিলেন, শকুন্তলার সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যটী বোধ করি আপনাদের মনে আছে। অসুর-জয়ের আনন্দে তখনো তাঁর মন উৎফুল্ল, ক্ষণিকের বিভ্রমে প্রিয়াকে পরিত্যাগ করার ব্যথা তখনো তাঁর বুকের ভিতরে স্পন্দিত, আবেগের উন্মাদনায় তাঁর চিত্তের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়ন চল্‌ছিল, কিন্তু শূন্য পথে চল্‌তে চল্‌তে রথটী কাশ্যপ মুনির পুণ্য তপোবনের পবিত্র সীমায় আস্‌তেই রাজা তাঁর মনের নিভৃতে এমন একটী শান্তির ভাব অনুভব কর্‌লেন যার আভাস পূর্ব্বে কখনো তিনি পাননি। এইরূপে তাঁর চিত্ত পবিত্র ও প্রশান্ত হলে পর ঋষিদের সান্নিধ্য লাভের উপযুক্ত হয়ে তিনি যখন তপোবনে প্রবেশ কর্‌লেন—তখনই তিনি ভাগ্য বিধাতার পরম প্রসাদ পেলেন। বিজ্ঞান-শাসিত সত্যের রাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে হলে আমাদেরও মনের যা কিছু চাঞ্চল্য দোরের বাইরে থেকেই ঝেড়ে ফেলতে হবে,—তবেই সত্যের উজ্জ্বল আলোর যাহোক কিছু লাভ কর্‌বার যোগ্য আমরা হব।

আমি বল্‌ছিলেম—একই সভ্যতায় সংযুক্ত হয়েও ভারতবর্ষের লোক একটা নেশন্ বা মহাজাতিতে পরিণত হতে পারেনি। উচ্চস্তরের জীবদেহে বিচিত্র কর্ম্মের যেমন একটী সুবিন্যস্ত পর্য্যায় বিভাগ দেখা যায় যা নাকি তার প্রাণশক্তিকে সঞ্চালিত, সংযমিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, ভারতের বিরাট সমাজ-দেহে ঠিক সেই জিনিষটীর অভাব ছিল। ব্যক্তি-বিশেষের মতন জাতি-বিশেষেরও সম্মিলিত কর্ম্মশক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হৃদয় ও মগজ দুই থাকা চাই। সেই কেন্দ্র হতেই একদিকে যেমন শক্তি সকল উৎসারিত হয়ে থাকে আর একদিকে তেমি তাতেই আবার প্রত্যাহৃতও হয়। এই হৃদয় ও মগজ ছাড়া বাস্তবিক পক্ষে কোন বিশেষ কাজই হবার জো নেই। দেহ সম্বন্ধে যা কিছু ঘটনা তা যত গৌণ ও চকিত ভাবেই ঘটুক না কেন—তাদের হিসাব এরা রাখে। এরা যখন আঘাত পায়, তখন সারাটী দেহের বল ও স্মৃতিশক্তি অতিমাত্র আহত হয়ে ওঠে।

বহু নগরীতে বিভক্ত, এসিয়ার সাগর-সীমা থেকে সিসিলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বিচ্ছিন্ন গ্রীক চারিদিক থেকে এথেন্সে এসে সম্মিলিত হয়েছিল। এথেন্সকে বাদ দিলে গ্রীক ইতিহাস ধূলোমাটী বই আর কিছুই নয়। আটলাণ্টিক সাগর থেকে ইউফ্রেটিস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রোম সাম্রাজ্য একমাত্র রাজধানীরই সঙ্গে অবচ্ছিন্নভাবে গাঁথা, রাজধানী থেকে রাজ্যকে আলাদা করে দেখা অসম্ভব। সারা সাম্রাজ্যের উপর রোম রাজধানীর এই প্রভাবকে শেষ classical কবি Rutilius Namatiames কয়েকটী মাত্র শব্দের সাহায্যে আশ্চর্য্য রকম গুছিয়ে বলেছেন—"আগে যাকে পৃথিবী বলা হতো তাকেই তুমি রোম নগরীতে পরিণত করেছ।" ইংরেজ জাতির পক্ষে লণ্ডন ও ফরাসী জাতির পক্ষে পারি নগরীদ্বয় যে কি সে কথা এখানে বলা বাহুল্য। রাজ্যের সঙ্গে রাজধানীকে জড়িয়ে রাখা এই নাম গুলিকে মনে রেখে ভারতবর্ষের দিকে একবার তাকানো যাক্। কোথায় তার সেই সংযোজক কেন্দ্রের খোঁজ আমরা পাব? বারাণসীতে? বারাণসী ভারতের বিপুলতম ধর্ম্মকর্ম্মের ক্ষেত্র, কিন্তু তার রাজনৈতিক জীবনের কোন কিছুরই অভিনয়-স্থল সে নয়। পাটলিপুত্র কান্য-কুব্জ উজ্জয়িনী পুষ্কলাবতি, কান প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি তার যে সব রাজধানী যারা কিছুকাল চকিত প্রভায় জেগে উঠে উত্তরকালে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যেই কি আমরা সেই কেন্দ্রের সন্ধান পাব? আলেয়া যেমন অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে রাত্রির বিপুল স্তব্ধতায় মিলিয়ে যায়—এই সব নাম ও তেম্নি ঐতিহাসিককে দৃষ্টি আকর্ষণের আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই সকল ঘটনা ভারতের বিরাট দেহের ভিতরকার যে একটা দুঃখকর অসঙ্গতি তাকেই আরো নির্ম্মমভাবে প্রকাশ করে দেয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে কিছু নেই। পরিবার বিশেষের মতন জাতি-বিশেষেরও একটা করে দপ্তরখানা বা ভাণ্ডার থাকে। যে সব খেতাব ও খ্যাতি তার অতীতের

সম্মান-সূচক আর ভাবী কালেরও গতি-নির্দ্দেশক, সে সমুদয়ের যা কিছু বিবরণ তা সে সেই ভাণ্ডারে সংগৃহীত করে একান্ত আগ্রহ সহকারে রক্ষা করতে থাকে। জাতিরও ঐতিহ্য আছে, যার ভিতর সকলকালের চল্‌তি লোক পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন কালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখে যায়। জাতির ভিতর যে সব শ্রেষ্ঠ লোকের আবির্ভাব হয় তাদের আদর্শে জাতি নিজেকে অনুপ্রাণিত কোরে তৃপ্তিলাভ করে, আর কালের কুহেলিকা-বর্ত্মের সঙ্কটে তাঁরাই তার রক্ষক ও চালক বলে সে তাঁদের শ্রদ্ধা করতই বলে। সেই সব শ্রেষ্ঠ লোকের স্মৃতিকে ধ্বংসের উদ্যত গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে তার তৎপর চেষ্টার অন্ত নেই, তাঁদের সম্বন্ধে যে কোন খবরের তুচ্ছ আভাসটীকেও অতি মূল্যবান অভিজ্ঞানের মতন সযত্নে সংগ্রহ না করে সে ছাড়ে না। ভারতবর্ষও যে তার ধর্ম্ম ও সাহিত্য জগতের কয়েকটী শ্রেষ্ঠ নামকে বাঁচিয়ে রেখেছে—একথা ঠিক, কিন্তু বাঁচিয়ে সেগুলিকে আবার পরস্পর-বিরোধী অসংখ্য আজগুবি গল্পে বা স্বপ্নলোকের কুহেলিকায় ডুবিয়ে দিয়েছে। তার শঙ্কর যিনি বোধ করি Lutherএরই তুল্য একজন মহাপুরুষ—তাঁকে নিয়ে সে কি করেছে? কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার বা একঘেয়ে অলস তর্কযুদ্ধের নায়ক বানিয়ে একবার তাঁকে ঠেলে দিয়েছে—খৃষ্টের জন্মের এক হাজার বছর আগে, আবার তাঁকে টেনে নামিয়েছে—তাঁর জন্মকালের হাজার বছরের মধ্যে। কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শতাব্দীর নির্দ্দিষ্ট নাম বা ঘটনায় তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা আজ একরকম অসম্ভব। তবুও তাঁর বিশিষ্ট জীবনের এম্নি একটা প্রভাব আজও আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি যা নাকি মানুষের চিন্তার স্রোতকে একটী বিশেষ ধারায় প্রবাহিত করেছে, এবং বর্ত্তমান ভারতেরও চিত্তে যার ছাপ আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট বিদ্যমান। ভারতের কালিদাস, অতবড় একজন শ্রেষ্ঠ কবি, অপূর্ব্ব চরিত্রাঙ্কনে আর সর্ব্ববিধ ভাব-বিন্যাস সৌন্দর্য্য-রচনায় অমন নিপুণ শিল্পী, তাঁকে সে কি বানিয়েছে? কতকগুলি বাজে হাসি-তামাসা আর কৌতুকময় আখ্যানের নায়ক করে খেয়াল-মতন একবার তাঁকে নিয়ে গিয়েছে খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায়, আবার তাঁকে এনে ফেলেছে হাজারো বছর পরে কার ভোজ রাজার পারিষদ মহলে। আর তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রামচন্দ্র, পণ্ডিতগণ ও রামায়ণ মহাভারতের অসংখ্য আখ্যানের পাত্রদের সম্বন্ধে তার খুঁটিনাটি বিবরণের অন্ত নাই। মহান আদর্শের আধার স্বরূপ এই সব চরিত্র রচনার জন্য ভারত প্রকৃতই গৌরব কর্‌তে পারে, কিন্তু নিজেরি স্বপ্নে বিভোর হয়ে খালি ঐ সবকে জড়িয়ে ধরায় অপেক্ষাকৃত অল্প মনোরম বাস্তবেরি কাছ থেকে সে যেন পালিয়ে ফিরেছে। সাধারণ নিয়মের এমনি একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম আজ এই ভারতবর্ষে ঘটতে দেখা যায়—যে নিজের প্রকৃত গৌরব ও মহত্বের জ্ঞানও সে আজ লাভ করতে আরম্ভ করেছে—পরেরই কাছ থেকে। তার আপন ছেলেদের যিনি শ্রেষ্ঠতম সেই বুদ্ধকে পর্য্যন্ত সে ভুলে গিয়েছিল। ও দিকে তিব্বত, চিন, কোরিয়া, জাপান ও 'ইণ্ডোচায়না' সেই মহাপুরুষের জীবনের অসংখ্য গল্প ও গাথা ভক্তিভরে নিত্য আবৃত্তি করে এসেছে, আর আরো বেশী করে জানবার জন্যে এতকাল ধরে উৎসুক চোখে বৃথাই তাকিয়েছে তাঁর জন্মভূমি সেই ভারতবর্ষেরই দিকে—যে নাকি তাঁকে জন্ম দিয়ে ছিল অথচ তাঁর সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেনি।

নেপাল তার উপত্যকা-তলে সংস্কৃতে লেখা মূল বৌদ্ধ-গ্রন্থমালা এতকাল ধরে বৃথাই রক্ষা করে ছিল। বৃথাই সিংহলদ্বীপ নানান্ বিপ্লব-বিজয় ও অভিমানের বাধা অতিক্রম করে ভারতের ভাষা সংস্কৃতের ছোট বোন, পালিতে লেখা তিন ঝুড়ি বৌদ্ধগ্রন্থ দুহাজার বছরেরও অধিকদিন ধরে বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করে এসেছে; ব্রাহ্মণ্যের বিজয়ের দিনে জয়ী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বুদ্ধের পুণ্য নাম—অবজ্ঞাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্ব সাধারণের উদাসীনতায় সে নাম এদেশ থেকে এম্নি ভাবে লুপ্ত হলো যে, সাধারণ ঔৎসুক্য বা সহানুভূতির দিক দিয়েও তাকে কেউ আর ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি। বুদ্ধকে যে আবার ভারতের কাছে ফিরিয়ে এনেছে—সে হচ্ছে য়ুরোপ। য়ুরোপই তার পরিব্রাজক,

প্রচারক ও পণ্ডিতগণের দ্বারা তিব্বতের অধিত্যকা থেকে প্রশান্ত সাগরের তীর পর্য্যন্ত ভূভাগে বৌদ্ধ প্রভাবের চমৎকার নিদর্শন সকল আবিষ্কার করেছে।

তার জানবার আকাঙ্খা ছিল আরো বেশী তাই Hodgson ও Burnouf দুজনেই তার সেই জ্ঞান-পিপাসা মেটাবার জন্যে একজন যুগিয়েছেন উপকরণ আর একজন সংগ্রহ করে গিয়েছেন তথ্য। আং--সারা জগতের শ্রদ্ধা পাওয়ার পরে বিস্মিত ভারতবর্ষ তার বহুকাল বিস্মৃত আপন ছেলের মহত্ব-গৌরব নিজে উপলব্ধি করতে শিখ্‌লে।

ভারতীয় রাজাদের ভিতর একজন ছিলেন যিনি নাকি অতি-বড় গৌরবশালীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন,—তিনি হলেন মৌর্য্যবংশের অশোক। পিতামহের প্রতিষ্ঠিত আর নিজের জয়ে বিস্তৃত প্রায় সমস্তটা ভারত-জোড়া প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি। তিনি ন্যায়ধর্ম্মের আচরণ ও প্রচারের কার্য্য বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিশাল রাজ্যের সকল জায়গায় পর্ব্বতগাত্রে ও প্রস্তরস্তম্ভে অসংখ্য উপদেশাবলি খোদাই করিয়েছিলেন। জনসাধারণের বোধগম্য সরলভাষার সেই সব উপদেশ, শিষ্টতা, সাধুতা, শ্রদ্ধা ও দানশীলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে মানব-জ্ঞানের চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু সেই-সব উপদেশের হরফগুলি বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাণহারা হয়ে একজন Prinsepরই অপেক্ষায় বসেছিল। Prinsep এসে সোণার কাঠি ছোঁয়াতেই সেই বোবার দল আবার সজীব হয়ে কথা বল্‌চে। তাই আজ তারা এমন একটা গৌরবময় যুগের সন্ধান বলে দিয়েছে—যে যুগে হিন্দুশাসনপদ্ধতি নিজের শক্তিমাহাত্ম্যে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে রোম ও কাথিজিয়ান রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী সাইরেনিকা ও ইপাইরাস্ পর্য্যন্ত আপন প্রভাব বিস্তারের দাবী কর্‌তে পারে!

সংস্কৃত সাহিত্যের বহুলতার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এমন একটী আশ্চর্য্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্ম দিয়েছিলেন, যিনি নাকি সাহিত্যের সকল দিকেই আপন শক্তিকে পরিচালনা করেছিলেন, তিনি হলেন অশ্বঘোষ। খৃষ্টীয় সংস্কারের স্রোতধারা বয়েছিল তিনি তার প্রায় সবগুলিরই প্রস্রবন-কেন্দ্র। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার গল্পলেখক, প্রচারক, নীতি-বেত্তা ও দার্শনিক। এই সকল শিল্পকলারই তিনি যেমন উদ্ভাবক তেমি তাঁর হাতে এগুলি চরম উৎকর্ষতাও লাভ করেছিল। তাঁর বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য Milton, Goethe, Kant আর Voltaireএর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ত্রিশ বছর আগে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নামের উল্লেখটী পর্য্যন্তও ছিল না। অশ্বঘোষ পরিপূর্ণরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষারই বিজয়ের ফল। তালিকা আরো বাড়িয়ে চলা বাহুল্যমাত্র; ভারতবর্ষ তার প্রকৃত আত্মোপলব্ধির জাগরণের জন্য য়ুরোপের কাছে যে কতখানি ঋণী তা এতে কোরেই যথেষ্ট স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হচ্চে। আর এই ঘটনা ভারতবর্ষের বিপক্ষে এই প্রমাণই দিচ্ছে, যে জাতি বিশ্বমানবের চলন্ত সভ্যতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একান্তে জীবন কাটাতে চায় সে তার আপনার কতবড় সর্ব্বনাশ আপনিই সাধন করে।

কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল ধরেই কি এই একলা সরে থাকার ভাবটীকে পোষণ করে এসেছে? খৃষ্টাব্দের হাজার বছর পরেকার গজনীর মাহ্‌মুদের ভারত আক্রমণের সময় থেকে যা কিছু ঘটনা তার আলোচনা করলেই এর সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়। সেই সময় থেকে চারদিকের লোভ হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা বধ্য পশুর মতন আক্রান্ত ভারতবর্ষ ইস্‌লামের ইতিহাস আর য়ুরোপের অদৃষ্টের সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ। আবার আমরা সুদূর অতীতের দিকে যদি একবার চোখ ফেরাই তাহলে দেখতে পাই যে, সে কালের বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার মুখে তার এই আপাত বিচ্ছিন্নতার স্থান একেবারেই নাই। তার ইতিহাসের অনুসন্ধান করবার প্রথম আলোক-রশ্মি আমরা পাচ্ছি আরমেনিয়ায় আবিষ্কৃত একখানা কীলক-লিপির গ্রন্থে। তারপর বেবিলন ও পারস্যের কাগজপত্র সুদূর শতাব্দীর অন্ধকার পথে কতকটা আলোক দেয়। তার পরেই আলোকোজ্জ্বল গ্রীসের পর্য্যায়। গ্রীস বাদ দিলে ভারতের

থাকে না। তার যা কিছু শৃঙ্খলা ও পর্য্যায় তা গ্রীসেরই দেওয়া। এখানকার চন্দ্রগুপ্ত আর সেকেন্দরশার ঐতিহাসিকদের Sandro Cottos একই ব্যক্তি বলে William Jones যেদিন সনাক্ত করলেন সেইদিন থেকেই ভারত ইতিহাসের সন তারিখ নির্দ্দেশ করবার কেন্দ্র নির্ণয় হলো। একহাজার বছর কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রীক্‌দেরই প্রদত্ত হিন্দুস্থানের বিবরণ।

এতটাকাল পর্য্যন্ত দুই দেশের পরস্পর-সংস্পর্শের ফলে ভারতীয় প্রতিভার মৌলিকতা নিয়ে তর্ক ওঠে। খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে চীন ভারতের সংস্রবে এসেছিল। তারপর হাজার বছর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে তার ধর্ম্মের পলিটিক্সের আর বাণিজ্যের সম্পর্ক চলতে থাকে। এই দুই দেশের ভিতর আদান প্রদান চলার দুইটী পথ দেখা যায়। তার মধ্যে স্থলপথ যেটী—সে পামির পর্ব্বতের ধার দিয়ে বা তাকে অতিক্রম করে—ওয়েশিসের পর ওয়েশিস ধরে তুর্কস্থানের মরুভূমির উপর দিয়ে গিয়েছে,—আর সমুদ্র দিয়ে আস্‌বার পথ যেটী সে Insulindia ভিতর দিয়ে ভারতীয় ও চীন বন্দরের সংযোগ সাধন করেছে। এই দুই সভ্যতার সংমিশ্রন দুয়েরি তরফে এক অপূর্ব্ব সম্মিলনের সৃষ্টি করেছিল। একদিকে সম্রাট Juistinianএর সময়কার গ্রীকরা যাকে বলেছে "Serindia" অপর দিকে আজকাল আমরা যাকে বলি Indo-China, উভয়েই একার্থ বাচক হয়ে একটী দোদুল দাঁড়ির দুই বিপরীত পাল্লার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রুচি, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা ও সমাজের তুলাদণ্ড-রূপে বিদ্যমান। এই প্রচ্ছন্ন সংগ্রামে ভারতবর্ষকেই বেশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জয়ী থাকতে দেখা যায়। সম্প্রতি মধ্য এশিয়ার খননে, সেখানে ভারতীয় প্রভাবের আশাতিরিক্ত নিদর্শন সকল আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলা-লিপি কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতির পাঠ ও পরিদর্শন—যা কিছু করা হয়েছিল আর এখনো করা হচ্চে তাতে করে Indo-China ও Insulindiaতে হিন্দু উপনিবেশ থাকার চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে। এই দুই দেশই ভারতীর ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্পকীর্ত্তির যুগব্যাপী বিশ্বস্ত রক্ষক। সর্ব্বশেষে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে জয় করে। আর তার ফলে তিব্বতের অধিত্যকায় বর্ব্বর অধিবাসীর দল দেখলে—মঠ-মন্দিরের চূড়ায় তাদের দেশ শোভিত হচ্চে আর বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল অক্লান্ত চেষ্টায় সংস্কৃত থেকে—অসংখ্য ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করে ফেল্‌ছে।

এইরূপে ভূমধ্য সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডময় দূর ও নিকটের যত জাতি সকলেই—চারদিক থেকে ভারতবর্ষকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, তাদের সকলকার কেন্দ্রাভিসারী রশ্মিরেখায় তার অতীতের শুদ্ধ রাত্রি আলোকিত! আমাদের মনের চোখে যে চিত্রটী ফুটে উঠছে অবশ্য আমাদের ইচ্ছানুরূপ সম্পূর্ণ চিত্রটী সে নয়; অনেক সময় দলিল পত্রগুলি একেবারে কিছুই বলে না, আবার যখন তারা কিছু বল্‌বে বলবে বোধ হওয়ায়, আমাদের জানবার ঔৎসুক্য একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছায়, ঠিক সেই সময়েই তারা হয়তো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে; তাছাড়া সে সব অংশে আলোকপাত হয়েছে—তাতে যে সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ দেখা যায় সে গুলি আপাততঃ এতই অকিঞ্চিৎকর বলে বোধ হয় যে, তাতে করে ছাত্রেরাও প্রায়শঃই বিরক্ত ও নিরাশ হয়ে ওঠে! তবু, সত্য আর স্বদেশের সেবার জন্য এই কাজটীকেই বরণ করে নিতে আপনাদের বার বার আমি বল্‌ছি। হয়তো কোন কোন লোক আপনাদের বল্‌তে পারে যে, এ হলো আলস্যের আর অ-দরকারের কাজ, বল্‌তে পারে যে—বর্ত্তমানের জন্য যাঁদের নিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজন তাঁরা হচ্চেন রাসায়নিক ও ইঞ্জিনিয়ার। অবশ্য রাসায়নিক ও ইঞ্জিনিয়ারের কাজকে আমি খর্ব্ব করে দেখি না, দুঃখময় মানব-জীবনকে সহজ ও সুচারু করবার জন্যে তাঁদের কাজ যতখানি ততখানিকে আমি মান্য করি। কিন্তু গত কালের একটী ভয়ানক ঘটনায় আমরা এমন শিক্ষা পেয়েছি যাতে করে আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি যে, কেবল কল-কারখানাই হলো যে সভ্যতার উপকরণ, আসল সভ্যতার স্বজাতির সে নয়, প্রকৃত যে সভ্যতা সে হচ্চে মনের।

বুদ্ধের এই মনোরম বাণী এখানে যতটা গভীর সত্য বলে প্রমাণিত হচ্চে এতটা আর কখনো হয় নাই।

আকাশ-জোড়া গৃহ নির্ম্মাণ আর মস্ত-বড় সব সেতু গঠনের এই যুগে একমাত্র মনই ভারতবর্ষের জন্য সেই নিরাপদ সেতুটী গড়ে তুলতে পারে, যা নাকি অন্ধকার আর ঝঞ্ঝার সাগর পার হয়ে তাকে সেই ওপারের তীরে নিয়ে যাবে—যে তীরে তার জন্য যুগান্তরের শান্তি ও সম্মান সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। ভারত আজ তার তীর্থঙ্কর রূপে আপনাদের চায়, কিন্তু কি করে আপনারা তাকে সুমুখের পানে চালিয়ে নেবেন—যদি আগে থেকেই তার পিছিয়ে পড়বার ধাপগুলিকে আপনারা খুঁজে বার কর্‌তে না পারেন! পৃথিবীর জাতি সকলের মধ্যে নিজেদের মাতৃভূমিকে সম্মানিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত দেখ্‌তে আপনারা চান, কিন্তু যে তরুণ তেজের বলে সারা এশিয়ার সভ্যতা গঠনের ক্ষেত্রে এতবড় একটা অঙ্কের অভিনয় সে করেছিল, সে শক্তির পরিপূর্ণ সন্ধান যদি আপনারা না জানেন, তবে কত গুরুতর সব পরীক্ষা'র ভিতর দিয়ে যে আপনাদের চল্‌তে হবে তা কি আপনারা ভেবে দেখেছেন! অসংখ্য সন্তানের জননী যে প্রাচীন ভারত বিজয়ের উৎসব আর পরাজয়ের দুঃখের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ যুগ কাটিয়ে এসেছে, সে আজ আবার পুনর্যৌবনশালিনী অসংখ্য সন্তানের জননীরূপে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে পথের জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। মাকে কেবল সাহায্য কর্‌লেই যথেষ্ট হলো না, তাকে সাহায্য করুন।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

---

# এক ফোঁটা গল্প

গভীর, নিস্তব্ধ রাত্রি। আলো জ্বালিয়া দুরূহ পরীক্ষার পড়া পড়িতেছি ও ঢুলিতেছি। পাশেই দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুন্দরী স্ত্রী 'নিদ্রায় মগন'—উন্মুক্ত জানালা দিয়া অজস্র জ্যোৎস্না তাহার হাতে মুখে গায়ে পড়িয়া সৌন্দর্য্যের তুফান তুলিয়াছে।

আর আমি নীরস গণিতের Formula মুখস্থ করিতেছি! এক-একবার ভাবিতেছি—যাই, পাশে গিয়া শুইয়া পড়ি, আর পারি না! আবার পরক্ষণেই পরীক্ষার বিভীষিকা কালো মেঘের মত সমস্ত প্রাণকে ছাইয়া ফেলিতেছে। অমনি বই পড়িতেছি। আবার ভাবিতেছি—না থাক্।

মনের যখন এইরূপ দোদুল্যমান অবস্থা, ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাহিরে ভীষণ শব্দ হইল—"গোঁ—গোঁ—গোঁ—দুম্—ধপাস্!" একেই আমার তখন মাথার ঠিক নাই—তাহার উপর গভীর নিশীথে বাহিরে এমন বেয়াড়া শব্দ—আমি দস্তুরমত ঘাবড়াইয়া উঠিলাম। শুধু তাই নয়, তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া চেয়ার উল্টাইয়া সশব্দে পড়িয়াও গেলাম। আমার পা লাগিয়া টেবিলের উপর হইতে আলোটা পড়িয়া গিয়া ঝন্-ঝন্ শব্দে চুরমার হইয়া গেল!

স্ত্রীর সশঙ্ক চীৎকার শুনিতে পাইলাম—"কি হ'ল গো?" এ্যাঁ!"

বলিলাম—"শীগ্‌গির দেশলাই জ্বালো—ভয়ানক কাণ্ড!"

ভয়ানক কাণ্ড কিন্তু কিছুই হয় নাই! আলো জ্বালিয়া, সন্ধান করিয়া জানা গেল যে, বারাণ্ডায় যে 'উড়ে' মালীটা খাটিয়ায় শুইয়াছিল, সে স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়া খাটিয়া হইতে পড়িয়া গিয়াছে! তাই এই বিপত্তি!

স্ত্রী একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আর প'ড়ে কাজ কি! খুব বীরত্ব হয়েছে, এবার শোবে চল।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া শুইয়া পড়িলাম। জানালা দিয়া তেমনি জ্যোৎস্না আসিতেছে—তেমনি মৃদু হাওয়া বহিতেছে, পড়া ফেলিয়া স্ত্রীর পাশে আসিয়া সে-ই শুইতে হইল,—মাঝ হইতে কেবল পা-টা মচ্‌কাইয়া গেল। একেই বলে লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং।

# পরমহংসদেব *

কালের সঙ্গে আচারের বহু পরিবর্ত্তন হয়। যে-কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখি, বহু কালের প্রাচীন আইন-কানুনে-বাঁধা সমাজ কালের পরিবর্ত্তনে ক্রমে সে-সব আইন-কানুনের বিস্তর কাট-ছাঁট করিয়া সুবিধামত নূতন আইন-কানুন বাঁধিয়া সমাজকে সজীব সবল রাখে। সামাজিক জীবন-সম্বন্ধে এ কথা যেমন খাটে, ধর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধেও তেমনি। সমাজের আদিম যুগে শিক্ষার যখন সমধিক প্রসার সাধিত হয় নাই, তখন বিস্তর কুসংস্কারের দোহাই পাড়িয়া সামাজিক জীবদের একটা শৃঙ্খলার গণ্ডীর মধ্যে আটক রাখিতে হয়—পরে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারগুলা দূর হইলে সে-সব গণ্ডীর rational সার্থকতাও মানুষ বুঝিতে পারে।

মানুষ প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তিগুলিকে সাধারণের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া দাবে রাখিতে হয়। তা না রাখিলে কাটাকাটি-মারামারির আর অন্ত থাকে না, মানুষের জীবনও ঘোর অশান্তিময় দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে।

প্রবৃত্তিকে দাবে রাখিবার দুইটি উপায় আছে—এক, শিক্ষার দ্বারা মনোবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন—আর, মহাপুরুষদের উপদেশ ও জীবনাদর্শের অনুকরণ। কিন্তু জীবনাদর্শ অনুসরণ করিব বা উপদেশ মানিয়া চলিব, এমন মহাপুরুষের দেখা পথে-ঘাটে নিত্য পাওয়া যায় না। নির্লোভ নিঃস্বার্থপর, নিষ্কাম, নিষ্পাপ ব্যক্তি ব্যতীত কাহারো উপর তেমন অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখাও সম্ভব নয়। তাই মহাপুরুষও কোন দেশে সুলভ নন্। তাঁহারা ঢাক পিটিয়া বেড়ান না বলিয়া অনেক সময় সমাজে তেমন কোন মহাপুরুষের অস্তিত্ব থাকিলেও আমরা চট্ করিয়া তাঁর সন্ধান পাই না।

আবার ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইহাও আমরা দেখিয়াছি, যখনই কোন দেশে প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া মানুষ দুনিয়াকে সরা জ্ঞান করে, তখন প্রকৃতির এমনি বিধান, যে এমন নির্লোভ নিঃস্বার্থপর মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। তাঁর চিত্তের সংস্পর্শে প্রবৃত্তির একটানা স্রোতে বাধা পড়ে—মানুষ প্রবৃত্তির-মার্গে ছুটিতে ছুটিতে সহসা সচকিত হইয়া থামিয়া দাঁড়ায়। মহাপুরুষের বাণী তাহার কানে যায় এবং দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ পথের সন্ধান পাইয়া আবার তখন ঠিক পথে চলিতে পারে। এমনি করিয়াই সমাজ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজ ও ধর্ম্মের বিপ্লবের এমনি সন্ধিক্ষণে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য নানক প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সে-কালে। এ কালেও রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতায় গা ঢালিয়া এ দেশের লোক যখন আপনার অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছিল, তখন এই সকল মহাপুরুষের মহাবাণী শঙ্খনাদে জাগিয়া উঠিল এবং তাহার ফলে আমাদের জাতিটাই বৈশিষ্ট্য হারাইবার মহা-সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়া গেল।

সেই মহাপুরুষ পরমহংসদেবের জীবন-কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে পরমহংসদেবের জন্ম হয়, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। এ দেশে তখন বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে। ক্যাণ্ট, কোম্‌টে, সোপানহর প্রভৃতি মনীষীবর্গের চিন্তা-ধারা হিন্দুর চিরন্তন সংস্কারগুলিকে প্রবলভাবে তখন নাড়া দিতেছে—আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতির ধারণা, শাস্ত্রবাণী—এ সকলকে হিন্দু অমূলক জল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে। হিন্দু সমাজের সে এক ঘোর দুর্দ্দিন। একদিকে তান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচার, অন্য দিকে ভাক্ত-বৈষ্ণবের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাশ্চাত্যধর্ম্মের উজ্জ্বল ফাঁদ। তারপর চারিদিকে নানা মত, নানা পথ—ধর্ম্ম-পিপাসুর দল ভীত, কম্পিত। এমনি সময়ে পরমহংসদেবের আবির্ভাব ক্লিষ্ট বিপন্ন সমাজের সামনে পথের সন্ধান ধরিয়া দিল।

পরমহংসদেবের পিতৃদত্ত নাম গদাধর। পিতা ক্ষুদিরামের মুখে ছেলেবেলা হইতেই পুরাণ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে গদাধরের মনে একটা দুর্নিবার পিপাসা জাগিয়াছিল—তাহা চরিতার্থ করিতে তিনি সাধু-সঙ্গ-প্রার্থী হইলেন। ধর্ম্ম-কথা শাস্ত্র-কথার আলোচনাতেই তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইত; তাছাড়া প্রাচীন কাহিনী-সংগ্রহে তাঁহার বিপুল অনুরাগ ছিল। গ্রাম্য কবির রচিত পুরাণ-কাহিনী আবৃত্তি করিয়া গান গাহিয়া দেশে সর্ব্বত্র সর্ব্ব-সমাজে তিনি বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ভাবাভিনয় দেখিয়া সকলে তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

তারপর সেই শৈশবেই একটী ঘটনায় তাঁহার তেজস্বী মন জীর্ণ আচারের শৃঙ্খল কাটিতে কি রকম উদ্দীপ্ত তাহা বুঝা গেল। তাঁহার উপনয়ন-কাল উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, তাঁহার সূতিকা-গৃহের ধাত্রী ধনী কামারণীর কাছ হইতে তিনি প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। সকলে আপত্তি করিল,—সে যে অসম্ভব ব্যাপার! তিনি বলিলেন, ধনীর কাছে তিনি অঙ্গীকার-বদ্ধ। যে সত্য ভঙ্গ করে, সে ব্রাহ্মণের অধিকার গ্রহণ বা পবিত্র যজ্ঞসূত্র ধারণের যোগ্য নয়। এমন

সার্ব্বভৌম উদার-চিত্ত না হইলে কেহ এত লোকের শিক্ষা-দীক্ষায় ভার লইতে পারেন না।

তারপর দক্ষিণেশ্বরে মন্দির রচিত হইলে তাঁহার অগ্রজ সেখানে বিগ্রহের পূজার ভার লইলেন ; গদাধরও এখানে আসিয়া অগ্রজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শৈশব হইতেই পার্থিব বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য প্রবল ছিল—সে ঔদাসীন্য বাড়িয়াই চলিল। এই মন্দিরে তাঁহার একদিন ইচ্ছা হইল মহাদেবের মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিবেন। গঙ্গাতীর হইতে মৃত্তিকা আনিয়া তিনি মূর্ত্তি গড়িলেন—সে মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল।

তারপর অগ্রজের মৃত্যুর পর তিনি দেবীর পূজার ভার লইলেন। এই সময় তিনি পৈতা ফেলিয়া দেন ও প্রায়ই ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্য-চৈতন্য বিলুপ্ত হইত। পৈতা ফেলার কথা তুলিলে তিনি বলিতেন,—অষ্ট পাশ মুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। ঘৃণা লজ্জা ভয় জাতি-অভিমান সব ত্যাগ করতে হয়। ধ্যান করা শেষ হলে পৈতা কাপড় সব পরে ফিরে যাব।

এই সময় হইতেই তিনি সাধনায় রত হইলেন। জ্ঞানের আলোয় হৃদয়ের আঁধার কাটিয়া গেল—ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে এতটুকু তিনি ভেদ জ্ঞান করিতেন না—অর্থকে ধূলি-জঞ্জালের মতই তুল্য দৃষ্টিতে দেখিতেন—আর রমণীকে দেখিতেন, মাতৃস্বরূপিনী—শক্তিময়ীর অংশসম্ভূতা। তারপর তাঁর চরিত্র-গুণে আকৃষ্ট হইয়া ছোট-বড় অনেকেই তাঁহাকে মানিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। নিরহঙ্কার মহাপুরুষ নির্ব্বিকারচিত্তে সাধনা লইয়াই রহিলেন। আপনাকে জাহির করিবার মত ক্ষুদ্রতা তাঁহার চিত্তকে মোটেই স্পর্শ করিতে পারে নাই।

এ-যুগে এত বড় মহাপুরুষের দেখা পাওয়া যায় নাই। এই মহাপুরুষের মানবতার কথা, সাধনার কথা, সার্ব্বভৌমিকতার বৃত্তান্তে এ জীবনী-গ্রন্থখানি ভরপুর। লেখক প্রবীণ, এবং রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ-সুখ-লাভে আপনাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার ওস্তাদী কলমে অনাড়ম্বর সরল ভাষায় অত্যন্ত সহজ কথায় মহাপুরুষের জীবন-কথার অন্তরটিকে যে ভাবে তিনি সাধারণের কাছে ধরিয়া দিয়াছেন, মন তাহাতে আপনিই আকৃষ্ট হয়। লেখায় কোন রকম গোঁড়ামি নাই,—সত্য কথা সহজ সরল ভাষায় সুশৃঙ্খল ভঙ্গীতে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। রচনার গুণে পরমহংসদেবের সংস্কারমুক্ত নিরহঙ্কার হৃদয়ের ছবি, তাঁহার সাধক মূর্ত্তি জ্বলজ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে আমাদের চোখের সামনে। ধর্ম্ম-গুরু বলিয়া সকলে তাঁহাকে নাই মানুন, তিনি যে এ যুগের একজন অসাধারণ ত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন, এ বইখানি পড়িয়া পাঠক মাত্রকেই সে কথা স্বীকার করিতে হইবে। এ বইখানি এই পরিচয়ই ঠিক-ঠিক দিতে পারিয়াছে—এইখানেই ইহার সার্থকতা।

আর একটি বিশেষত্ব,—এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননীর পুণ্যস্মৃতি-মন্দির-কল্পে উৎসৃষ্ট। এ বইখানি কিনিয়া পড়িলে শুধুই যে অশান্ত চিত্তে শান্তি মিলিবে তাহা নয়—একটি মহদনুষ্ঠানে রত কর্ম্মীদের কিছু সহায়তাও করা হইবে। সেটুকু উপেক্ষার জিনিষ নয়।

গ্রন্থখানিতে নানাবর্ণে রঞ্জিত অনেকগুলি চিত্র দেওয়া হইয়াছে—পরমহংসদেবের ছবি ছাড়া তাঁহার জন্ম-স্থান, সাধনার ক্ষেত্র প্রভৃতির ছবিগুলি প্রকৃতই উপভোগ্য। বাঙালী-মাত্রকেই এ গ্রন্থের সমাদর করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

# ছেঁড়া খাতা

আমি ছেঁড়া খাতা। ওপরের মলাট ময়লা হয়ে গেছে—হাতে করতে ভয় হয়—পাছে আমার গায়ের ময়লা হাতে লেগে হাত কালো হয়ে যায়! কত পাতা কুঁচিয়ে গেছে—কত পাতা ছিঁড়ে গেছে। আমার এ অবস্থা দেখে মনেই হয়না যে আমি এককালে কি সুন্দর চক্চকে ঝক্ঝকেই ছিলাম!

এ জন্মেই আমি খাতা, কিন্তু খাতা হয়ে জন্মগ্রহণ করবার আগের জন্মে আমি যা ছিলাম, তা আমার বেশ মনে আছে। আপনাদের মানুষদের পূর্ব্বজন্ম আছে কিনা, তা কি আপনারা জানেন? কেউ জানেন না। সবাই আপনারা নিজেদের ঝগড়া প্রমাণে এক এক মত নিয়ে আছেন। কেউ বা জন্মান্তরবাদী—কেউ বা নন। যাঁরা জন্মান্তরবাদী তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা নাকি একবার বলেছিলেন যে তিনি পূর্ব্বজন্মে বারাণসীর গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণ ছিলেন। আর তাই শুনে আর একজন পুরুষ বলেছিলেন যে তাঁরও মনে আছে যে তিনি সেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ছিলেন। আর মাঝে মাঝে তাঁর শতমুখীর আকাশমুখী হয়ে সজোরে ধরণীমুখী হবার কথাও বেশ মনে পড়ে। আমার

পূর্ব্বজন্মের বিবরণ কিন্তু অমন নয় তা' মনে রাখবেন। কারণ তার প্রমাণ নিয়েই আমি নবজীবন লাভ করেছি।

পূর্ব্বজন্মে আমি ছিলাম কাগজ। মনে আছে, কাগজ জন্মলাভ করার পরে একদিন নীল নীল মোটা কাগজে আমাকে আর আমার অনেক কাগজ-ভাইকে একসঙ্গে বেঁধে এক গুদোমে নিয়ে গিয়ে রেখে দিল। তারপর একদিন গাড়ী বোঝাই হয়ে অনেক পথ ঘাট পেরিয়ে যেখানে গিয়ে পৌছলাম, সেখানে আমার কাগজ জন্মের শেষ হয়ে গেল। সেখানকে আপনারা বলেন দপ্তরী-বাড়ী! সেখানে ভেঁজে চেপে—তারপর নাক কাণ ফুঁড়ে নানারকম পোষাক আদি পরিয়ে আমাকে কাগজ থেকে খাতায় রূপান্তরিত করে ফেল্‌লে যার নির্দ্দয় অথচ করুণ হাত—তাকে আপনারা দপ্তরী আখ্যায় অভিহিত করে থাকেন। যে জন্ম ছিল—তাতে কেউ আর ফিরে চাইত না। কিন্তু এবার যা হলাম দপ্তরীর কলের চাপ আর পোষাকের জলুষে তাতে কারো ঝাঁ করে চোখ ফিরিয়ে যাবার কারো যোটি রইল না। খানিকক্ষণ অন্ততঃ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলকে চেয়ে থাকতেই হত আমার দিকে। এই দিন থেকে আমার জন্মান্তর আরম্ভ হ'ল—আমি হয়ে পড়লুম সুন্দর শোভন বাঁধনো খাতা।

এরপর একদিন আমার মত দেখতে আরও জন কতকের সনে আমাকে নিয়ে গিয়ে একজন লোকরাস্তার ধারে দোকানের সামনে সাজিয়ে রেখে দিলে। পর পর এক-জনের ওপর আর একজন আমরা পড়েছিলাম—আমার ওপরে একজন ছিল, তার নীচেই আমি। সেইখানে শুয়ে শুয়ে আমরা দেখছিলাম আপনাদের মত মানুষের গড়া এই সহরের বিচিত্র রূপ আর বিচিত্র গতি। কত লোক যে আমাদের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে গেছে রাস্তা দিয়ে যাবার সময়ে তার লেখাজোকা নেই—ছুটো একটা মনে আছে। আমাদের সাজিয়ে রাখবার খানিক পরেই একটা লোক এল সেই দোকানে কি যেন কিনতে। সে লোকটা দেখতে কি কদাকার। এম্নি মোটা

লোকটা রাসভ-নিন্দিত সুরে বলে উঠল—বাঃ, বেশ খাতাগুলি তো! সত্যি বল্‌ছি, শুনে আমার একটুও ভালো লাগ্‌ল না। তারপর আমার সেই লোকটা তার কাঁচা কলার মত মোটা আঙুলগুলো নিয়ে আমার ওপরের খাতাখানা নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল। ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে রইলাম, কখন্ তার ছোঁয়াচ আমার গায়ে বেজে ওঠে! ভাগ্যিস্ লাগেনি!

সে লোকটা কিন্তু নিলে না আমাদের কাউকে। খানিকক্ষণ লুব্ধদৃষ্টিতে আমাদের গা জ্বালিয়ে চলে গেল। হাড় জুড়ুলো!

তারপর এল এক কলেজের ছেলে—দেখতে মন্দ নয়! চোখে চশমা, গায়ে খদ্দরের ঢিলে পাঞ্জাবী, পরনে বিলিতি কাপড়, পায়ে নাগরা জুতো, হাতে একখানা দিশী খাতা, আর একখানা বিলিতি বই। পকেট থেকে একটা বিলিতি ফাউনটেন উঁকি দিচ্ছে—এসে আমাদের সামনে থম্‌কে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি শুধু প্রশংসায় ভরা—লোভ নেই! কিছু মুখে বল্‌লে না বটে কিন্তু তার চোখের সেই প্রশংসমান দৃষ্টিতেই তার সব বলার চেয়ে সেরা বলা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল—হয় ত ভাবছিল, খাতাখানাকে নোট বই করলে মন্দ হয় কি! ভেবে ভেবে না কেনাই স্থির করে বেচারী চলে গেল। একটু দুঃখ হ'ল! দূর থেকেই কি আমরা ভাল—আপন করে কি নিতে পারতে না?

এমন কত লোক এল—কত লোক গেল! কিন্তু দাম শুনে শেষ অবধি কেউ এগুলো না! এমনি করেই সেদিনটা কাটলো—রাত্রে রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলে উঠলো! আমার মনিব তাঁর ম্যাণ্টল্ দেওয়া গ্যাসের আলো জ্বেলে বেচাকেনা কল্লেন। তার পর বেশী রাত্রি হলে অন্ধকার এক আলমারিতে আমাদের বন্ধ করে আপন-মনে গান গাইতে গাইতে নিজের বাড়ী চলে গেলেন। আমরা সেই অন্ধকারে রাতটা কাটিয়ে দিলাম সেই নানা-জাতীয় জন্তুর সঙ্গে।

পরদিন দোকানী যখন দোকান খুললে সকল তার

থেকে আমরা অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পাচ্ছিলাম,—ভোঁ বাজিয়ে পথিকদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করে মোটর চলেছে—ঢং ঢং করেও মানুষকে নিজের গতি সম্বন্ধে সচেতন করতে না পেরে ট্রাম চলেছে—আর সামনেওয়ালা ভাগো বলতে বলতে ঘরের গাড়ী দৌড়েছে—ছক্কড়ের ত' বিরামই নেই, ধুঁকতে ধুঁকতে সে অবিরাম চলেইছে, চলেইছে!

দোকানী এসে দোকান খুল্‌ল; ঝাঁট দিয়ে সব সাফ করলে। তারপর অনেকদিনের পুরানো একটা ধুনুচীতে করে ধুনো দিয়ে ঘরে গঙ্গাজল ছড়ালে। তারপর পর-পর আট-দশ জন ক্রেতাকে 'বউনি'র লোভ দেখিয়ে বেশ সস্তায় বিক্রী করে ডবল লাভ করল। আমরা আবার লোকের চোখের সামনে আমাদের রূপের পসরা খুলে ক্রেতার দিকে চেয়ে রইলাম।

ক্রেতা এল বিকেল বেলা, নেহাৎ ছোট এক স্কুলের ছেলের সাজে। কিন্তু এমন সুন্দর তাকে দেখতে যে কোলে তুলে চুমু খেতে ইচ্ছে করে। তবে দুঃখের বিষয় আমাদের কোলও নেই আর চুমু দেবার মুখও নেই! ছেলেটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল চাকরের সঙ্গে, ইস্কুল-ফেরৎ। হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমাদের দিকে। সে ত' আর কলেজের ছেলে নয় যে হিসেব করে তবে কিনবে। আমাদের দেখে তার ইচ্ছে হ'ল একখানি তার চাই—অমনি হুকুম হলো—ভগলু ঐ খাতা কিনতে হবে!

ভগ্‌লু কিন্তু নেহাৎ পাকা লোক কিনা—সে বল্‌লে—ও খাতা ভাল না আছে—ওকি হোবে?

কিন্তু ছেলেটির—পরে জেনেছিলাম তার নাম মণ্টু—ঝোঁক কম্‌ল না।

সে বল্‌লে—না ও কিনতেই হবে।

অগত্যা কিন্‌তেই হোল। ওপরের খানা সেই মহিষাসুরের হাতের স্পর্শ পেয়েই হোক আর রাস্তার ধুলো লেগেই হোক, একটু ময়লা হয়ে গিয়েছিল। তাই সেখানা পছন্দ হ'ল না। আমার বুকটা গুরগুর কচ্ছিল—ভারি লোভ হচ্ছিল ওই ফুলের মত সুন্দর ছেলেটির সম্পত্তি হবার মত সৌভাগ্য নিতে। যদি শেষে দাম শুনে তার মত বদলে যায় কি আমাকে না নিয়ে আমার চেয়েও সুন্দর বলে আর কোন খাতাকে নিতে ইচ্ছা হয়।

যাহোক অনেকক্ষণ বুকটা গুরগুর করে শেষে শান্ত হল তখন, যখন আমাকেই নেওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেল। দাম চোকাবার পালা ভগ্‌লুর। আমার ছোট মনিবটী আমাকে নিয়ে তাঁর বই রাখবার ব্যাগটী খুলে অতি সন্তর্পণে তার ভূগোলের পাশে আমাকে রেখে দিলে। তারপর আবার সে বাড়ীর দিকে চলল!

যে ভূগোলের পাশে আমাকে রেখে দিয়েছিল তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কে ভাই? মনটা ভারী খুসী ছিল কিনা! কিন্তু সে ভারী বদ—সে বল্‌লে, তুমি খাতা ত! আমরা সবাই তোমার চেয়ে কুলীন, আমরা ছাপা ভূগোল! ছাপা হলে কি হবে—গায়ে কালি পড়ে পাতা ছিঁড়ে সে এক অদ্ভুত চেহারা হয়ে ছিল। তবুও তার কৌলীন্য-গর্ব্ব যায় নি! রাগ করে আর কথাই কইলাম না!

শেষে যখন বাড়ী এসে পৌছলাম—তখন আমার ছোট্ট মনিবটী আমাকে বের করে আমার প্রথম পাতে তাঁর কলম দিয়ে লিখলেন—শ্রীমণ্টু। লিখতে লিখতে কিসের আগ্রহে যেন আমার ছোট্ট মনিবটির ছোট্ট বুক ছাপিয়ে উঠছে, বুঝতে পারছিলাম।

তাঁর নাম লেখা শেষ হয়ে গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়েই সে কাপড়-চোপড় ছাড়লে,—আমাকে এতটুকু কাছ-ছাড়া করবার মত ধৈর্য্য তার যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তারপর হাত পা ধুয়ে, মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দিদি এসেছে কিনা। বলে সে খেতে বসল।

অর্দ্ধেক খাওয়া হয়েছে এমন সময় একখানা ভারী গাড়ীর গুরুশব্দ দরজার সামনে এসে থেমে গেল, আর তার খানিক পরেই সিঁড়ি দিয়ে একজনের জুতো-পায়ে ওঠ্‌বার শব্দ শোনা গেল। মণ্টু অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—দিদিভাই, দিদিভাই!

উত্তর এল—কেনরে মণ্টু? কি মিষ্টি তার সুর!

মণ্টু বলে উঠ্‌ল—একটু শুনে যাওনা দিদিভাই, লক্ষ্মীটি!

তখনি পরদা সরিয়ে একটি তন্বী তরুণী প্রবেশ কল্লেন—তাঁর হাতে একরাশ বই।

মা বল্লেন—কাপড় চোপড় ছেড়ে এলেই পারতিস, উৎস।

উৎস উত্তর দেবার আগেই মণ্টু বলে উঠল—না ভাই দিদি, আগে তোর জন্যে কি এনেছি, তাই দি!

তখন বুঝতে পারলাম কার জন্যে এত আগ্রহ করে কেনা! পথে আসতে আমাদের দেখে তার দিদিভাইয়ের কথা মনে পড়েছে—আর বাড়ী ফিরেও অধীর আগ্রহে সে এরই প্রতীক্ষায় ছিল। কখন দিদিভাইয়ের হাতে এমন সুন্দর খাতা দিয়ে দিদিভাইয়ের সস্নেহ আদর লাভ করবে। আর এই ভাই-বোনের মাঝের স্নেহের আকর্ষণের সুতীব্র পরিচয় পেয়েছিলাম সেইদিন যেদিন মণ্টুকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে মণ্টুর দিদিভাইয়ের অশ্রু বাঁধন-হারা হয়ে আমার প্রথম পাতে মণ্টুর নিজের হাতে লেখা 'শ্রীমণ্টু' কথা-কটি'র ওপর অজস্রধারে ঝরে পড়েছিল। আমার বুকে যে অশ্রু নেই—আমার বুকে যে শুধুই শুকনো পাতার মেলা। নইলে আমিও হয়ত সেদিন কেঁদে গলে খসে পড়তুম! তাই এইদিনের কথা স্মরণ করে একটা শুকনো দীর্ঘশ্বাস আমার বুকের পাতাগুলো নেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। যাক্ সে কথা!

মণ্টুর দিদির চোখমুখও আমায় দেখে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল। মণ্টুকে তার প্রাপ্য সস্নেহ চুম্বন দান করে সে আমায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মণ্টুর দান বলেই হয়ত আমার অধিকারিণী তাঁর বুকের সকল ইতিহাস সেই দিন থেকে আমার বুকে লিখে রেখে দিতেন। রোজ সন্ধ্যায় তাঁর কলেজে পড়ার মত আমাকে প্রতিদিনের কাহিনী শোনানো তাঁর বাঁধা কাজের মধ্যে হয়ে পড়েছিল। তাঁর কথা শুনে শুনে আমি আমার অধিকারিণীর সুখ-দুঃখের অংশভাগী হয়ে পড়েছিলাম। দিনের পর দিন তাঁর আশা তাঁর আকাঙ্ক্ষার কাহিনীর সঙ্গে আমার এমন ঘনিষ্ঠ যোগ হয়ে পড়ল যে আমি তাঁর জীবনের ছোট্টখাট্ট বিচিত্র মধুর ইতিহাস হয়ে গড়ে উঠলাম।

দেখতে দেখতে অনেকদিন কেটে গেল। তারপর একদিন দেখলাম বাড়ীতে ভারী ধুমধাম পড়ে গেল। তারপর থেকে কিছুদিন আমার অধিকারিণীর আর কোন খোঁজ আমি আমার নির্দ্দিষ্ট কোণে থেকেই বুঝতে পারতাম। তারপর যেদিন তাঁর দেখা পেলাম সেদিন মাথায় লাল সিঁদুরের রেখা নিয়ে তিনি তাঁর গত কয়েকদিনের মধুর ইতিহাস লিখে রাখলেন। লিখতে লিখতে তাঁর মুখ সেই সিঁদুরের মতই লাল হয়ে উঠছিল। নতুন প্রেমের নতুন আশা আকাঙ্ক্ষার সুরে বাঁধা সে কাহিনী!

এরপর আর আমার পাতা পরিপূর্ণতার দিকে বেশী অগ্রসর হ'তে পারেনি।

তারপর একদিন হঠাৎ বাড়ীতে বিষাদের বাণ ডেকে গেল। ওপারের ডাক এসে মণ্টুকে ডেকে নিয়ে গেল। আমার পাতা ব্যথার অশ্রুতে অভিসিঞ্চিত হয়ে উঠবে! তারপর একদিন শুনলাম উৎসর স্বামী বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। লালপেড়ে কাপড় পরে মাথায় সিঁদুরের টক্‌টকে লাল রেখা টেনে উৎস স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। আঁধারে কুণোর মাঝে একটা কোণে বসে বসে সুদীর্ঘ কাল আমি অতীতের কাহিনী বুকে রেখে কাটিয়েছি। অতীতের চিহ্ন আমার বুকে পিঠে রেখা টেনে দিয়ে গিয়েছে। অতীত! সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না আশা-নিরাশা-বিজড়িত অতীত! আর সেই অতীতের কাহিনী বুকে করে ছিলাম আমি বহুদিন।

তারপর এই সেদিন আমি আবার পৃথিবীর আলোর সাম্‌নে বেরিয়ে এসেছি, আমার এই জীর্ণ দীর্ণ সাজ নিয়ে। কিন্তু আমার জীবনের প্রথম যুগে আমার বাইরের জলুস ছিল আমার সব—অন্তর ছিল আমার পুণ্য। আজ বাইরে আমার জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যের চিহ্ন। কিন্তু অন্তর—এ অন্তর আমার আজ অতীত দিনের স্মৃতির লেখায় উজ্জ্বল!

উৎস ফিরে এসে আমায় আবার কোণ থেকে বের করে এনেছে। কিন্তু এ উৎস সে উৎস নয়—সে পাঠ-নিরতা সদা-প্রফুল্ল নয়, সেই নববিবাহিত ব্রীড়া-বিজড়িত নয়! এ উৎস লোকের স্পর্শে ধীর স্থির গম্ভীর ভাই-হারা স্বামী-হারা বিজ্ঞ।

এর বুকে যে আগুনের জ্বালা, তার একমাত্র শান্তি রয়েছে আমার এই দীর্ণ জীর্ণ বুকের মাঝে। আমার এই জীর্ণ বুকে ধূলোয় ভরা পাতার আড়ে সেই অতীতের হর্ষোজ্জ্বল দিনের শান্তিমাখানো স্মৃতি!

## মিঃ ডবলু বি টমসন

আমি তখন বাঁকিপুরে (১৯০৬)। ময়মনসিংহের কালেক্টর শ্রীযুক্ত টমসন সাহেব পাটনায় বদলি হইয়া আসিলেন। কিরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল বলিতে পারি না কিন্তু শুনিলাম যে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে গুপ্ত সার্কুলার-অনুযায়ী কি-একটা করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে বদলি করিয়া দেশের কার্য্যে উদ্বুদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে একেবারে সুদূর বিহারে আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উনি নাকি বলিয়াছিলেন যে যাহা কিছু করা গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় বোধ করেন তাহা প্রকাশ্যভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া মঞ্জুর করাইয়া ফেলুন—গুপ্ত হুকুমে বা আইনের বাহিরে তিনি কোন কার্য্য করিবেন না। এ সকলের সত্য মিথ্যা জানা অসম্ভব—কিন্তু মানুষটা ঐরূপই তেজস্বী, সত্যপূত, সুমিষ্ট এবং সরল ছিলেন এবং যদি কখন কোন সিভিলিয়ান ঐ ভাবের কথা বলিয়া থাকেন—তবে তিনি নিশ্চয়ই মিঃ টমসন। ইহার পরে ময়মনসিংহে ক্লার্ক সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টন সাহেবের দ্বারা জিলা দুইটী উত্যক্ত এবং নিষ্পেষিত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত টমসন সাহেবকে ঐ দুই জিলাতেই ক্ষত হৃদয়ে মলম লাগাইবার জন্য পর পর পাঠানোয় ঐ জনরবে একটু আস্থা অনেকের হইয়াছিল। ফলতঃ নিখুঁত ন্যায়পরতার জন্য টমসন সাহেবের ন্যায় কয়েক জন কর্ম্মচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভ স্বরূপ।

আমি তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এবং সার্টিফিকেট ডিপার্টমেণ্টের ভার-প্রাপ্ত। 'মেঝলি-নবাবের' জমিদারীতে মজঃফরপুরের অনেকগুলি নীলকরের ইজারা। ইঁহারা সাধারণতঃ ঠিক নির্দ্ধারিত দিনে জমিদারের প্রাপ্য খাজনার টাকা দাখিল করিয়া দেন। তবে ঐ সময়ে "কাঁটি" কুঠীতে একটু বে-বন্দোবস্ত চলিতেছিল। টমসন সাহেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কালেক্টরের নিকট "নোট" লিখিয়া দিয়াছিলাম যে কাঁটি কুঠীর নিকট টাকা বাকীর জন্য সাধারণ পত্র, রেজেষ্টারি নাই; এখন কি করা যায়?" সে সাহেব লিখিলেন, "আমি একখানি ডেমি অফিসিয়াল (আধা সরকারী ভাবে) পত্র লিখিলাম।" তাহাতে কিছুদিন পরে টাকা আসে। টমসন সাহেবের আমলে ঐরূপ ঘটনায় সাহেব আমাকে লিখিলেন, "সকল ঠিকাদারের সহিতই কি এইরূপ মৃদুভাবে চলা হয়—তা যদি না হয় ত কেন হয় না? এক্ষণে উহাদের তারে খবর দাও যে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে টাকা দাখিল না হইলে সার্টিফিকেট মোকদ্দমা দায়ের হইবে।"—দেখিলাম এখানে দেশী বিলাতীর কোন পার্থক্য নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহেবের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর লোক নহেন পরন্তু প্রথম শ্রেণীর প্রথম! এরূপ লোকের অধীনস্থ কর্ম্মচারী থাকায় গৌরব বোধ করিলাম। মনে হইল, এইরূপ দূরদর্শী ভাল লোকের জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অটুট রহিয়াছে—বল-দর্পিত শত শত কড়া (ষ্ট্রং) দিগের জন্য নহে।* সে যাহা হউক কাঁটি কুঠির টাকা তিন দিনের মধ্যে আসিল কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সাহেবের নিখুঁত কথামত সার্টিফিকেট দায়ের হইয়া গিয়াছিল। আমি লিখিলাম, "একদিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, ষ্ট্যাম্প খরচাটা লইয়া সুদ মাফ করা হউক।" সাহেব হুকুম দিলেন, "অর্দ্ধেক সুদ মাফ কর; সবটা করিও না। সকল ঠিকাদারের সহিতই এই ভাবে চলিও। তবে দেশীয়দিগের মধ্যে কোথাও কোথাও বিবেচনার সহিত প্রথম প্রথম অল্প একটু বেশী সময় দিও; উহাদের সকলেই ক্ষিপ্র কার্য্যে অভ্যস্ত নয়। নীলকরগণ সবই জানিয়া বুঝিয়া সক্ষম থাকিয়াও অগ্রাহ্য করিতেছিলেন।"

৺গঙ্গাতীরে একটা চরের তিন শত বিঘা জমি কোন মুসলমান ডেপুটী কালেক্টরের মাপের ভুলে গবর্ণমেণ্টের খাস-মহলভুক্ত হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ ঘোষ

* যাঁহাদের সাধারণতঃ ষ্ট্রং অফিসর বলিয়া নাম জাহির হয় তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সরল-চরিত্র নহেন; ভিতরে ভীরু এবং বাহিরে কড়া মাত্র। পাঞ্জাবে যাঁহারা সহস্র সহস্র নিরস্ত্রের হত্যাকাণ্ড জালিয়ানওয়ালাবাগে (১৯১৬) করাইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃতই ভয়

ডেপুটী কলেক্টর অন্ত পার্শ্ববর্ত্তী চর মাপিবার সময় ঐ ভুল ধরিতে পারেন ; কিন্তু কুড়ি বৎসর পার হইয়া যাওয়ায় তাহার 'প্রতিকার হইতে পারে না' বলিয়া রিপোর্ট লেখেন। সাহেব স্বয়ং ঐ চরে গিয়া মাপ দেখিয়া ২০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভুল হইয়াছিল তাহা বুঝিলেন। তাহার পর হুকুম লিখিলেন—"তামাদির উল্লেখে পরের প্রাপ্য না দেওয়া কোন ভদ্রলোকের উপযুক্ত কার্য্য নয় ; একটী মহৎ সাম্রাজ্যের পক্ষে উহা একান্তই অসঙ্গত ( অন্‌ওয়ার্দি অফ্ এ গ্রেট্ গবর্ণমেণ্ট )। আমি বোর্ডের মঞ্জুরি হইবে এই বিশ্বাসে ( ইন অ্যান্টিসিপেশন্ অফ্ স্যাংসন্ ) জমিটা মালিক জমিদারকে ছাড়িয়া দিলাম।" এরূপ মহত্বের এবং তেজের ভাব আমি অপর কোন সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীতে দেখি নাই। ইহাই প্রকৃত তেজ—সত্য এবং ন্যায়ের কাজ—ভগবৎ তেজের স্ফুলিঙ্গ !

হরিহর ধারী সিংহের এষ্টেটেও তামাদির জন্য দেনা বাতিল করা হয় নাই ; তবে অধিক সুদ ছাড়াইয়া মিটমাট করিয়া দেওয়া হয়। আমার মনে হইয়াছিল যে ঋণ না দিলে নরকস্থ হইতে হয় এইরূপ পবিত্র হিন্দু সংস্কারই যেন সাহেবের ভিতরে জন্মান্তরের সংস্কাররূপে ঢুকিয়া রহিয়াছে !

কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীনে অক্ষম ( ডিসকোয়ালি-ফায়েড ) মালিকদিগের মধ্যে কোন নবাব একান্ত অকৃতজ্ঞভাবে একখানি পত্র লিখিলে আমি মনে করিয়াছিলাম যে সাহেব একটু ক্রুদ্ধ হইবেন ; কিন্তু সাহেব শুধু লিখিলেন, "ইহারা যে গুণবান ( কোয়ালিফায়েড ) নহেন তাহা গবর্ণমেণ্টের সেরেস্তায় রেজেষ্টারী করা রহিয়াছে—সুতরাং কৃতজ্ঞতা থাকার আশা করাই অসঙ্গত।—পত্রের ভাষার দিকে দৃষ্টি না করিয়া অভিযোগ এবং অভাব সম্বন্ধে 'যেটুকু' সত্য আছে তাহার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা কর।" এই ধীর ভাব সকলেরই অনুকরণীয়। পাটনা মিউনিসিপালিটিতে ৩০০৲ টাকা মাসিক মাহিনা দিয়া একজন ইঞ্জিনিয়ার সেক্রেটারী রাখার প্রয়োজন বোধ হইল। সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ টুগুড ঐ সময়ে পেনসন লইলেন ; কিন্তু পুত্রের কাজ-কর্ম্ম গুছাইয়া রাখার অপেক্ষায় দুই বৎসর পরে দেশে ফিরিবেন এইরূপ কথা হইল। টমসন সাহেব উঁহাকেই ঐ সেক্রেটারীর কার্য্য দেওয়া সঙ্গত মনে করিয়া সে কথা কোন কোন কমিশনারকে বলিলেন। কমিশনারদিগের মধ্যে পরামর্শে স্থির হইল যে দেশীয় কাহাকেও লইতে হইবে। কমিটির অধিবেশনে মিঃ টুগুডের পক্ষে খুব কম ভোট হইল। রুড়কী কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( মিঃ টি এন ব্যানার্জি—পরে কলিকাতা কর্পোরেশনে উচ্চ কর্ম্ম পাইয়াছিলেন ) অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে নিযুক্ত হইলে সভা ভাঙ্গিবার পরে টমসন সাহেব হাসি মুখেই ব'ললেন, "আমি যে কেন টুগুড সাহেবকে চাহিয়াছিলাম তাহা আপনারা স্বতঃই বুঝিতে পারিবেন মনে করিয়া সব কথা বলি নাই। কিন্তু দেখিতেছি আপনারা মনে করিয়াছেন যে ইংরাজ বলিয়া আমি উহার দিকে মত দিয়াছিলাম এবং সেই জন্য জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ( রেস কোয়েশ্চন ) আনয়ন করিয়াছেন। পাটনায় প্লেগ—ইহার ড্রেনগুলি ভাল করা আবশ্যক। কাল যিনি এখানে সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তাঁহার প্রস্তুত প্ল্যান্ গবর্ণমেণ্টে মঞ্জুর হইতে ক্ষণবিলম্ব হইবে না। এইজন্যই আমি উঁহাকে এত কম মাহিনায় এই কার্য্য লইতে স্বীকৃত করিয়াছিলাম।" সকলকেই একটু অপ্রতিভ হইতে হইল। বৎসরখানেক পরে মিঃ টি এন ব্যানার্জির প্রতি মিউনিসিপ্যাল কমিশনরগণ বিরূপ হইলেন। তিনি ইংরাজদের কুঠীতেও যাইতেন না—দেশীয়দিগের কাছে গিয়াও হাজুরি দিতেন না। সমস্ত সহরের সাফাই সম্বন্ধে অক্লান্ত ভাবে যত্ন করিতেন—ইংরাজের কুঠী বা কমিশনরদিগের গলির জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন না। আবার জটলা হইল ; এবং বজেট প্রস্তুতের সময় সেক্রেটারীর মাহিনা ৩০০৲ হিসাবে না ধরিয়া ২৫০৲ ধরা হইল ; কারণ দেখানো হইল যে মিউ-নিসিপ্যালটির ব্যয় অত্যধিক, উহার সঙ্কোচ আবশ্যক। অধিবেশনের দিনে টমসন সাহেব প্রথমেই হাসিমুখে বলিলেন, —"হয়ত আপনারা কেহ মনে করিয়াছেন যে যখন বর্ত্তমান সেক্রেটারীর নির্ব্বাচন আমার মতের বিরুদ্ধে হইয়াছিল তখন উঁহাকে কোনরূপে তাড়ানোয় আমারও প্রীতি হইবে।

কিন্তু আমি কেন মিঃ টুগুডকে চাহিয়াছিলাম তাহা গত বৎসর জানাইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনারা ভাবিয়া দেখুন যে কোন ব্যক্তিকে দুই বৎসর কার্য্যে বিশেষত্ব দেখাইবার অবসর না দিয়া তাড়ানো কি উচিত (ফেয়ার)? মিঃ ব্যানার্জি এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে কার্য্যকরী জীবনের প্রথমেই (ইন্ দি ভেরি বিগিনিং অফ্ হিজ্ প্র্যাক্‌টিক্যাল্ লাইফ্) একটা অযথা ধারণার প্রচার করিয়া—যেন উনি পাটনায় ভাল কাজ করিতে পারেন নাই—উহাঁকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে! আমরা এখানে কোন প্রকারেরই অসৎ কার্য্যের জন্য ত একত্র হই নাই। যদি সকলের মত হয় তাহা হইলে বজেটে সাবেক মাহিনাই বসাইয়া দিই।" সকলেরই অগত্যা মত হইল। তাহার পর সেদিনের অপর কার্য্য চলিতে লাগিল। একজন বিহারীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনর আমাকে বলিয়াছিলেন—"আমরা একটা ছোট কাজ করিতে যাইতেছিলাম। শ্রীভগবান টমসন সাহেবের মুখের কথার দ্বারা আমাদের রক্ষা করিলেন!" লোকটার সংস্পর্শে এমনই মনের ভাব আসিত বটে!

আমার বাসার ঠিক পাশের বাড়ীতে একবার বাঁকিপুরে বিহার কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। কোন বিষয়ের কাগজপত্র লইয়া সাহেবের কুঠীতে গিয়া একটা কাজ শেষ করিয়া লওয়ার পর টমসন সাহেব বলিলেন—"তোমার বাসার পাশেই খুব বক্তৃতা হইতেছে; উঁহারা কি প্রকৃতপক্ষেই মনে করেন যে আমরা চলিয়া গেলে রাজকার্য্য এইভাবে চালাইতে পারেন?" আমি বলিলাম—"উঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিন; উঁহারা কতকটা আইরিশদিগের মত গ্রহণ করিয়া লইয়া বলেন অশান্তি কোন দেশে নাই! আমরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মারামারি করিয়াছি—বাহিরের সহিতও করিয়াছি এবং ভিতরেও করিয়াছি; সে জন্য ত নির্ম্মূল হই নাই। বরং সংখ্যায় ২০।২৫ কোটি হইয়াছি! দুর্ভিক্ষে প্লেগে, ওলাউঠায়,ম্যালেরিয়ায় যত লোক মরে তাহার শতাংশও যুদ্ধে মরে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংলণ্ড ২॥০ লক্ষ হারাইয়া (সাহেব কথার মধ্যেই বলিলেন, 'অত নয়'), রুশ্-যুদ্ধে জাপানীরা ছয় লক্ষ যোদ্ধা হারাইয়া দুর্ব্বল হয় নাই, বরং তাহাদের মধ্যে কর্ম্মঠ নেতাদিগের আবির্ভাব অধিকতর সংখ্যায় হইয়াছে। ফলতঃ কংগ্রেসের দল কোন জাতির অপেক্ষা হীনাবস্থ থাকিতে কষ্টবোধ করেন এবং সেই জন্যই রাষ্ট্রীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন।" সাহেব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন এবং তাহার পর বলিলেন—"মোটের উপর উহাদের ঐ মনের ভাবটা ঠিক (আফ্‌টার্ অল্ দে আর্ রাইট্)!" আমি বিস্মিত হইয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কি সুমিষ্ট স্নিগ্ধ হাসিই দেখিলাম—বুঝিলাম যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন টমসন্ সাহেবের কংগ্রেসের সকল ধরণ বা উক্তি পছন্দ না থাকিলেও ইহাদের লক্ষ্য যে "রাষ্ট্রীয় উন্নতি" যে ভারতবাসী মাত্রেরই প্রীতিকর তাহা বুঝিয়া আমারও ঐ সম্বন্ধীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি বোধ করিতেছিলেন! অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—"যাহার যতটুকু শক্তি এবং সুবিধা আছে, স্বদেশীয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাহার সমস্তটুকুই সাধারণের কার্য্যে সৎপথে প্রয়োগই জাতীয় উন্নতির একমাত্র পথ—সকল কালে, সকল দেশে, সকল অবস্থাতেই ইহা সত্য; বৃথা বিচলিত হইয়া বা বিচলিত করিয়া লাভ নাই।"

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

---

# সমালোচনা

**বেহার-চিত্র।** প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি, এল প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানি, ৬৮।৫ রসা রোড নর্থ, কলিকাতা। চেরি প্রেসে মুদ্রিত মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। এই গ্রন্থে "হুজুর", "গরিব-পরবর", "রায়-সাহেব," "ভিখারী মণ্ডর," "মাস্তবর", "সিদ্ধার্থ", "সৃষ্টিধর" প্রভৃতি কয়েকটি চিত্র বা নক্সা সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে দুই-তিনটিতে আবার করুণ রসের ধারাও বহিয়া গিয়াছে,—বাকীগুলি নিছক নক্সা—হাস্যরসে মণ্ডিত। নক্সাগুলি পড়িতে বসিয়া ৺ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের

"চিত্র-বিচিত্র" বইখানির কথা মনে পড়ে। "বেহার-চিত্রের" রচনায় আর্ট পুরামাত্রায় না থাকিলেও ইহার হাস্যরসটুকু উপভোগ্য। অনেকগুলি নক্সা গোড়া হইতে বেশ জমিয়াছে, কিন্তু শেষের দিকে 'ছেলেমানুষী'-গোছ হইয়া পড়িয়াছে—যেমন, 'গরিব-পরবর', 'বেহার-পরদীপ।' আমাদের ভাল লাগিয়াছে, "হুজুর", "সিদ্ধার্থ", "রায় সাহেব" ও "মান্যবর" নক্সাগুলি। এগুলিতে নক্সার জান্ আছে—হাসিও ফুটিয়াছে বেশ তীব্র রকমের। বহিখানিতে প্রকাশকের একটি ত্রুটি হইয়াছে, গ্রন্থের গোড়ায় সূচী দেন নাই। যাহা হৌক, মোটের উপর গ্রন্থ সরস, সুখপাঠ্য।

**ভুলের ফসল।** শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এল, জি প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র, ১নং নিকাশিপাড়া লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। গ্রন্থকার "কৃষিবিভাগের একজন উৎসাহশীল কর্ম্মচারী।" এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়। তিনি বলিয়াছেন, গ্রন্থকারের "অদম্য উৎসাহ ও আন্তরিকতা দেখিয়া বাস্তবিকই আমি আশ্চর্য্য হই। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকদিগের প্রকৃত অবস্থা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ।" সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি কয়টি গল্প লিখিয়াছেন—আর গল্পগুলিতে তিনি কৃষি-কথারই আলোচনা করিয়াছেন। কৃষকদিগের সুখ-দুঃখ, তাহাদের অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধার কথাই গল্পগুলির জান্। লেখকের ভাষা ভালো, রচনাও সরস হইয়াছে। এ গল্পগুলি পড়িয়া কৃষি-বিষয়ে অনেকেই প্রচুর জ্ঞান লাভ করিবেন। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

**নালন্দা।** শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু, এম, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার, বি-এ, কর মজুমদার এণ্ড কোং, কলিকাতা। বীরভূম, শান্তি-নিকেতন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। নালন্দা প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়—এক মস্ত বড় কীর্ত্তি। নালন্দার বিবরণ লইয়া লেখক গল্পটি লিখিয়াছেন। গল্পটি সরস, সুখপাঠ্য। লেখকের রচনায় সরলতা আছে। লেখার গুণে গল্পটি কৌতূহলোদ্দীপক যেমন হইয়াছে, তেমনি উপভোগ্যও হইয়াছে। এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী। ভূমিকাটিতে তিনি বৌদ্ধযুগের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ ইতিহাস দিয়াছেন—সেটুকু বাঙলা সাহিত্যে অমূল্য সামগ্রী। ভূমিকায় তিনি নালন্দার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমরা জানিতে পারি,—নালন্দায় দশহাজার ছাত্রের একত্র অবস্থান ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় একদিকে যেমন জ্ঞাননিষ্ঠ ভিক্ষুগণ ছিলেন, অপর দিকে তেমনি ধনীরাও ছিলেন—তাঁহাদের অর্থেই এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হইত। চীন, তিব্বতের লোকেরা এখানে দলে দলে পড়িতে আসিত—আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ভারতের বহু-বহু লোক চীনে যাইত, তিব্বতে যাইত, আর চীনা-তিব্বতী ভাষায় অধীত সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদ করিত। ভারতের এই প্রাচীন কীর্ত্তি-কথা প্রচার করিয়া লেখক বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন—এজন্য বাঙালী তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

**দন্তবিকাশ।** শ্রীযুক্ত উদ্‌ভ্রান্তচৈতন্য গোস্বামী কর্ত্তৃক বিকাশিত ও শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন গোস্বামী বি-এ, দ্বারা মুখোদ্ঘাটিত। প্রকাশক, শ্রীশান্তিপদ সিংহ, ৭নং প্রতাপ চাটার্জ্জির লেন, কলিকাতা। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এ পুস্তিকাখানিতে এই কয়টি হাসির গান ও কবিতা আছে,—ম্যালেরিয়া (গান), ম্যালেরিয়া-বধ (কাব্য), প্রণয়-সঙ্গীত, মিলন-মাধুরী, উদারা-মুদারা-তারা, তামাক খাও, গরম চা-স্তোত্রম্, কাব্যে প্রত্নতত্ত্ব এবং চৈতন্-চুট্‌কি। এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া আমরা প... পরিতৃপ্ত হইয়াছি, প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া বাঁচিয়াছি। এই বিরাট গাম্ভীর্য্যের যুগে মুখ-হাঁড়ি করার সভায় লেখক হাসাইবার যে আয়োজন করিয়াছেন, তাঁর সে আয়োজন সার্থক হইয়াছে। হাসাইবার ক্ষমতাও তাঁর বেশ আছে। হাসির কবিতায় যে 'ন্যাকামি'র প্রাচুর্ভাব সম্প্রতি দেখা যায়—সে ন্যাকামি ইহার কোথাও নাই। "তামাক খাও" দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাল্‌সা খাও'-এর সুরে রচিত—তা হইলেও নিজস্ব হাসির ছটায় ভরপুর। "গরম চা-স্তোত্রম্"—ভাবে-সুরে রস-সাহিত্যে চিরোজ্জ্বল থাকিবে ;

'কেটলি' হইতে ঝর-ঝর ঝারে
ঝরসি তু 'কাপে' তরল হি ধারে।
নামি 'সসারে' চুম্বসি বদনম্
সটান গচ্ছসি 'লিভার'-সদনম॥'

প্রভৃতি ছত্রগুলি চমৎকার। লেখক ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন, কাজেই আমরা তাঁহাকে সাহিত্য-সমাজে ধরাইয়া দিলাম না—তবে সভায় মজলিসে উদ্‌ভ্রান্ত-চৈতন্য গোস্বামী'কে অনেকেই দেখিয়াছেন। তা সত্ত্বেও যিনি তাঁহাকে চিনিতে না পারিবেন, তাঁহার জন্য আমরা দুঃখিত। এ বইখানির আদর, যাঁরা হাস্যরসপিয়াসী, তাঁদের কাছে হইবেই।

**লালটুপী।**—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, ২৪নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দোতলা) কলিকাতা। মিত্র প্রেসে শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি গল্পের বই ; ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। চারিটি গল্প আছে—লালটুপি, পুসীর কীর্ত্তি, বুড়ো আঙুল আর পরী। গল্পগুলি বিচিত্র রসের—ছেলেমেয়েরা পড়িয়া আমোদ পাইবে। লেখকের গল্প বলিবার ভঙ্গীটুকুও বেশ,—একটা বাজে কথা নাই, আড়ম্বর নাই, ছেলেমেয়েদের মনে গাঁথিয়া যায়। অনেকগুলি রঙীন ছবিও আছে—ছবিগুলি মজার। ছাপা কাগজ ভালো।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বুদ্ধ-বৈরাগ্য

আব্‌দার রহমান চাগ্‌তাই অঙ্কিত

ভারতী

৪৬শ বর্ষ } মাঘ, ১৩২৯ { দশম সংখ্যা

# পরের ছেলে

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজেশ্বরীর ভবিষ্যৎবাণীই সফল হইল। ইহার দিন কয়েক পরেই গেজেট বাহির হইলে সকলে দেখিল, কিশোর সম্মানের সহিত বি এস্ সি পাশ করিয়াছে। রাজেশ্বরী হাসিয়া পুত্রকে বলিলেন, "কেমন ?" কিশোর মৃদু হাসিয়া মুখ নামাইল। তিনি বলিয়া চলিলেন, "যাক্, আমারো বুক্ থেকে একটা পাহাড় নাম্‌লো। তোকে মুখে ভরসা দিয়েছি কিন্তু আমারো মনে এবারে ভয় জেগেছিল, কি জানি কি হয়! তোর বিষয়ে এমন ভয় কখনো কিন্তু আমার হয়নি।"

কিশোর সকৌতুকে মাতার পানে চাহিয়া বলিল, "এবার যে হলো মা ?"

"কি জানি! হয়তো ঐ দস্যি মেয়ের কাণ্ড দেখে। ও অনার বিয়ে স্কলারশিপ নিয়ে অমন ক'রে পাশ হচ্চে—আর তুই পাছে ওর কাছে হেরে যাস, এই আমার বড় ভয় হয়েছিল। তোর সে কথাও নিশ্চয় মনে আছে, দুবছরের ছোট হয়েও ঝর্ণা তোর সঙ্গে সমানে টক্কর দিত, বরং এক এক জায়গায় উঁচিয়ে যেত! মনে পড়ে ?"

কিশোর মাথা হেঁট করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "পড়ে বৈ কি মা।"

"তাই বুঝি, সেই রাঁচি থেকে ফেরায় পর অত বদলে গিয়েছিলি। ছেলের কি পড়ায় মন! ক' বছর ইস্কুলে ডবল প্রোমোশন পেয়ে তাই বাপু তুমি ঝরণাকে এ দু'বছর এগিয়েছ! নৈলে তোমায় ওর সঙ্গেই আজ আই-এ পাশ কর্‌তে হতো, নয় কি ?"

"সেই ভয়েই তো আরও অস্থির হয়ে থাক্‌তাম। এই ক' বছর থেকে কেবলই পরীক্ষার কাগজ আর গেজেট খুঁজতাম, যদি ওর নাম দেখ্‌তে পাই!"

"আচ্ছা, মনে কর, যদি ও পড়্‌তে না পেতো,—পাশ না কর্‌তো, কিম্বা বিয়ে হয়ে যেত ওর—তা'হলে ত পদবী বদ্‌লে যেতো! তাহলে কি করে চিন্‌তিস্ ?"

কিশোর সোৎসাহে বলিল, "সে আমার মনই বল্‌তো যে এমন কখনোই হবে না। ওর দিদিকেও যে এই রকম পড়ানো হয়েছে—শুনেছিলে,—মনে নেই ? যে বাড়ীর এ-রকম রীতি, সে বাড়ীতে কি একটি মেয়েকে কৃতবিদ্য ক'রে আর-একটিকে মূর্খ রেখে স্নায় ? বিশেষ ঝর্ণার মত মেয়েকে! তখনি ওদের কথা-বার্ত্তায় বুঝতাম, ছেলেদের মত ওদের মেয়েদেরও পড়ানোটাই অবশ্য-করণীয়। খেলা-ধূলা, সংসারের অন্য সব—তারপরে।"

"এখন তাহ'লে ঝর্ণার বয়স সতেরো পূর্ণ হয়েছে। তুই যেমন কুড়ি বছরে পড়্‌লি সেও তেমনি আঠারো'

পড়েছে। আমাদের ঘরে এমন কত হয়। যাক্, তুই এখন এম-এ পড়ার ব্যবস্থা করতে কবে কল্‌কাতা যাবি, বল্ দিকি? আমিও যাব কিন্তু তোর সঙ্গে এবার! তারপরে—"

কিশোর মাতাকে বাধা দিয়া বলিল, "সে না হয় করা যাবে—বাসা তো আমাদের আছেই, তুমি কিছুদিন গেলে তো ভালই হয়। এর আগে কতবার বলেছি, তুমি রাজী হওনি। কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কিরে? এবারে নিজে থেকে বল্‌ছি বলে বুঝি ছেলের গুমোর হচ্ছে!"

"গুমোর নয় মা, কিন্তু তুমি যে ওঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় জুড়ে দেবে বল্‌ছ— !"

"সে কি করে হবে! কে তাদের বাড়ী খুঁজ্‌বে—কেই বা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে—এই তো তোর ভাবনা জুটলো? ভয় নেই বাপু, তোমার ভরসায় আমি যাবনা। এই এতদিন তাদের জানো—অথচ কোন-একটা ছলে একদিন তাদের সঙ্গে যখন একটু আলাপও করতে পারনি এ পর্য্যন্ত, তখন তোমার যোগ্যতা বোঝা গিয়েছে। আমি ভবতারণকে সঙ্গে নিয়ে যাব,—আলিপুরের মোহিনীবাবু জজের বাড়ীর সন্ধান করে। সে আমায় তাদের বাড়ী ঠিকই নিয়ে যেতে পার্‌বে—কিম্বা যা-হয় একটা উপায় কর্‌বে।"

কিশোর ক্ষণেক কি যেন চিন্তা করিয়া বলিল, "দরকারই বা কি এমন মা! এই যে এত দিন জেনে-শুনেও দেখা-শোনা আলাপ-পরিচয় করিনি, তাতে কি দিন যাচ্ছে না? কি ভাব্‌বে এতে তারা! কত লোকের সঙ্গেই তো এমন কত লোকের কোনো কালে হয়ত কোনো সুযোগে একবার জানা-শোনা হয়—কিন্তু তাই বলে কি তাদের পেছনে চিরদিনই ধাওয়া করতে হবে যে আমরা তোমাদের চিনি গো—চিনি?"

রাজেশ্বরী এবার আর একটু বেশী রকম অবাক্ হইয়া পুত্রের যথার্থ অনিচ্ছাপূর্ণ মুখের পানে চাহিলেন; ঝিলেন, কিশোর যেন সত্যই অনিচ্ছুক। থতমত খাইয়া নি বলিয়া উঠিলেন, "তবে এ মনে রাখা জানা-শোনার কতা কি?"

"সার্থকতার কথা কি বল্‌ছ মা? অসার্থকই বা কিসে! আমাদের খেলার সঙ্গী সেই ঝরণা—সে এখন এমন হয়েছে, হয়তো এর পরে আরও কত কি হবে! এ ভাব্‌তে কি বেশ ভালো না? সুখ হয় না? আমার কত দিন মনে হয়েছে, আমি যদি তাদের কলেজের সাম্‌নে মাঝে মাঝে যাই—হয়তো কোন দিন সে আমার সাম্‌নেও পড়তে পারে। সেই তো একদিন পড়েও ছিল! সে হয়তো জানতে পারে না—চিনতেও পারে না, তার হয়ত আমাদের কথা মনেই নেই, কিন্তু আমাদের কি এ কথা ভাব্‌তে বেশ ভাল লাগবে না যে আমরা তোমায় জানি, তোমাকে আমরা চিনি! তুমি একদিন আমার সঙ্গে খেলা করেছ।

রাজেশ্বরী অবাক্ মুখে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়াই রহিলেন। কিশোরের মুখের চারিদিক দিয়া যেন একটা আলো ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার সেই দশ বৎসর আগেকার রাঁচির কথা মনে পড়িতেছিল। এই ঝরণার উপলক্ষেই সেই চির-চাঞ্চল্যহীন বালক কিশোর তাঁহার নিকটে এমনি করিয়া কত কথাই বলিয়াছিল, আবার আজও তাই! অন্য কোন বিষয়ে কিশোর এমন অন্যমনস্ক তো কোন দিন হয় নাই—সে যেন কি রকম একটু আবিষ্টভাবে আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, "কিন্তু তবুও মা, আমি তো একদিনও যাইনি। প্রথম সেদিন যে ঐটুকু দেখেছিলাম, সেটা দৈবাৎ ভগবানের ইচ্ছে, আমার তো তাতে হাত ছিলনা। দ্বিতীয় দিন গাড়ীখানা দেখাও তাই। তবু আমার আলাপ কর্‌তে তো ইচ্ছে হয়নি। কি দরকার? তার চেয়ে এইই ভালো!"

রাজেশ্বরী ইতিমধ্যে নিজের বক্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, "তোর যেন দরকার নেই, আমার যে আছে। এই শ্রাবণ মাসে তোর বিয়ে দেব! তারা পরিচিত লোক, বিশেষ সে তোর খেলার জুড়ি! তাদের যখন এমন ক'রে মনে রেখেছিস, আমি তাদের এমন সময়ে একবার নিমন্ত্রণও কর্‌বো না?"

কিশোর সহসা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে মাতার পানে চাহিল; বিমূঢ়ের মত বলিল, "বিয়ে?"

"হ্যাঁ, বিয়ে। কুড়ি বছরের হলি, তিনটে পাশ করলি—এবার বিয়ে দেবনা? আমায় কি চিরদিনই এমনি একা একা বুকে হাঁটু গুঁজে কাটাতে হবে? সাধ-আহ্লাদ নেই আর কিছু?"

কিশোর স্তব্ধ হইয়া গেল, দেখিতে দেখিতে মুখের সে অরুণকান্তি ঘুচিয়া তাহার উপরে কে যেন একটা নীল ছাপ মারিয়া দিল। একবার ক্ষীণস্বরে সে যেন কোথা হইতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "একা কেন মা? আমি তো আছি।" কিন্তু রাজেশ্বরী যখন সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাবলে কি আমার বৌ হবেনা—নাতিপুতি হবে না? এ-সব নাহলে কিসের সংসার পেতেছি তবে?" তখন তাহার মুখে আর কোন প্রতিবাদই বাহির হইল না। সত্যই তো, সংসারের যাহা যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা হইতে রাজেশ্বরী কেন বঞ্চিত থাকিবেন? নহিলে তিনি এ কি খেলাঘর পাতিয়াছেন? কিসের জন্য তবে কিশোরকে পুত্রত্বে গ্রহণ করিয়াছেন? ভিখারীর সন্তানকে রাজা করিয়াছেন? এ তো শুধু খেলামাত্র নয় যে কিশোর যাহা ইচ্ছা করিবে, যেমন ভাবে তাহার সাধ, সেই ভাবে জীবন যাপন করিবে! অন্য লোকের মত তাহার কি স্বাধীন জীবন? তাহার এই হেয় জীবনের মালিক যে তাহাকে এইভাবেই রাজেশ্বরীর নিকটে দান করিয়াছেন। রাজেশ্বরী যে তাহাকে পুত্রের মত স্নেহে লালন-পালন করিতেছেন, সর্ব্ব-ক্ষমতার অধীশ্বর করিয়াছেন, ইহা তাঁহার মহত্ব। কিন্তু তিনি যদি বলেন,—"এই পর্য্যন্ত! এখন আমি যাহা বলি, আমার যাহা ইচ্ছা,—তাহাই তোমায় করিতে হইবে,—তাহা হইলে ইহার সামান্য প্রতিবাদ করিবারও কিশোরের ক্ষমতা আছে? তাহার এই বিক্রীত দাসজীবনের সে স্বাধীনতা কোথায়? বলির পশুর মত উৎসর্গিত বস্তুর আবার নিজের ইচ্ছা বলিয়া একটা মিথ্যা বিড়ম্বনা কেন।

রাজেশ্বরী দেখিলেন, কিশোর আর কোন প্রতিবাদ করিল না, শুষ্ক শ্বেতমুখে সে খানিক পরে উঠিয়া গেল। রাজেশ্বরী ভাবিলেন, অন্যত্র বিবাহের নামে ছেলের এই ভাবান্তর! তাঁহার সুবোধ কিশোর তাঁহার মতের উপর প্রতিবাদ তো করিতে জানেনা—কিন্তু অনিচ্ছাটা কোথায় যাইবে? মনে মনে হাসিয়া তিনি বলিলেন, তবে নাকি আলাপের দরকার নেই? মুখচোরা ছেলে নিজে যা পেরে ওঠেনি, মাকেও তা করতে দিতে ভয় তাথায়। আমি সে যেমন করেই হোক্ সব ঠিক্ ক'রে নেব, তা ছেলের বুদ্ধিতে আস্‌ছে না? তখন তাঁহার মনে হইল, হয়তো কিশোর তাঁহার মতলবখানা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়াই এরূপ বিষণ্ন মর্ম্মাহত হইয়া গেল। পুত্রবধূ-সম্বন্ধে রাজেশ্বরীর রুচি ও আদর্শ সাধারণ হিন্দুগ্রাম্য মহিলার চেয়ে যে উঁচু, ইহার প্রমাণ তো সে কখনো পায় নাই। অবশ্য এতদিন রাজেশ্বরীর তাহা ছিল না; আজ যে কাহার সুখেচ্ছায় তিনি তাঁহার আজন্ম-পোষিত সংস্কারও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন, তাহা দুদিনের বালক কিশোর কি বুঝিবে! আজ যদি বিনয় থাকিত, তবেই এ কথা একজন বুঝিত! যাক্, তিনিও এখন ছেলের নিকট আসল কথাটা ভাঙ্গিবেন না, কতদূর কি হয় আগে দেখাই যাক্, তাদের সঙ্গে পুনরায় আলাপ করিয়া তাহারা কেমন লোক আর-একবার বুঝিয়া লওয়া হউক্! কন্যা এখন বয়ঃপ্রাপ্তা ও শিক্ষিতা হইয়াছে, কন্যা ও কন্যাপক্ষের মতামতটাও তো একবার বুঝিতে হইবে। আগে হইতে ছেলেকে নাচানো ঠিক্ নয়—সে এখন যেমন ভাবে আছে, তেমনি থাকুক।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিশোর একটু বিস্মিতভাবেই লক্ষ্য করিল, তাহার বিবাহের উদ্যোগ বা সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা তো আর কিছুই হইতেছে না—কেবল কলিকাতা যাইবারই খুব ধুম-ধাম পড়িয়া গিয়াছে। একবার মাত্র সে মাতাকে জানাইল যে তাহার এম-এ পড়া ঘরে বসিয়াই হইতে পারিবে, সেজন্য এখন মাতার কলিকাতা-বাসের কষ্ট-স্বীকারে প্রয়োজন নাই। সে একবার কলিকাতা হইতে বই-টই কিনিয়া আনিতে মাত্র সেখানে যাইবে। কিন্তু মা সে কথা যেন কানেই তুলিলেন না। দেশে এ সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য ইত্যাদি নানা কথা তুলিয়া তিনি যে এখন কলিকাতায় বাস করিতে ইচ্ছুক, তাহা প্রকারান্তে

কিশোরকে বুঝাইয়া দিলেন। কাজেই কিশোরের আর বলিবার কিছুই রহিল না।

রাজেশ্বরী কিশোরকে যাহা যাহা বলিয়া অভয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অক্ষরে অক্ষরেই পালন করিলেন। ঝরণাদের সঙ্গে পুনরায় আলাপ জমাইবার জন্য কিশোরের কিছুমাত্র সাহায্য তিনি লইলেন না। সাহায্য চাহিলেও বিশেষ যে কিছু পাইতেন তা নয়, কিশোরের যেটুকু সম্বল ছিল তাহা সে পূর্ব্বেই মাতার নিকটে নিবেদন করিয়াছে। তাঁহার বৃদ্ধ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ভবতারণকে দিয়াই তিনি সকল ব্যাপার সমাধা করিলেন; এবং একদিন বৈকালে বালিগঞ্জের দিকে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন। মাতার পার্শ্বে কিশোরও বসিল। ড্রাইভারের নিকট সেদিন ভবতারণ উঠিতেছে দেখিয়া ব্যাপারটা কতক সে আন্দাজ করিয়া লইল। মাতার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কিশোর বলিল, "মা, আমাকেও কেন আর নিয়ে যাচ্চ?"

"আমাকে আর ভবতারণকে নামিয়ে দিয়ে তুই বেড়াতে চলে যাস,—আর ঘণ্টাখানেক পরে নিয়ে আসিস্। তোকে সেখানে নাম্‌তে হবে না। তবে শুধু কর্ম্মচারীর সঙ্গে প্রথমটা কি যাওয়া চলে?"

"তাতো নয়ই, তবে তোমার রোহিণীকে নাও না মা সঙ্গে। আস্‌বার সময় ভবতারণবাবু একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আস্‌বেন তোমায়। তাতে এমন কিছু খারাপ দেখাবে না।"

"নারে বাপু—সেও ভাল দেখায় না! রোহিণীকে না হয় নিচ্চি, কিন্তু তোমাকেই গিয়ে আন্‌তে হবে। দুয়োরে গাড়ী নিয়ে দাঁড়াবে মাত্র বই তো না, তোমায় তো নাম্‌তে বল্‌ছিনা—তাতে কি ক্ষতি!" বলিয়া রাজেশ্বরী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার তুষ্ট হাস্যটুকু গোপন করিলেন।

গাড়ী রিচি রোডে পৌঁছিলে ভবতারণ ড্রাইভারকে কি একটু বলিয়া দিলেন; দেখিতে দেখিতে একটা সুদৃশ্য বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী দাঁড়াইয়া পড়িল এবং ভবতারণ নামিয়া গেলেন। কিশোর রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া আড়ষ্ট আবার একটু বিস্মিত হইলেন। লজ্জায় কি মানুষের মুখ এমনি নীলবর্ণ হইয়া যায়! আর লজ্জার মতই বা ইহাতে এমন কি ব্যাপার আছে! তাইই যদি থাকে—তবে আর ও সব কেন? এ ছেলের দেখছি অন্ত পাওয়া ভার! তাঁহার চিন্তা আর অগ্রসর হইতে পাইল না, একজন দাসী ও তাহার সঙ্গে দুই তিনটি কিশোর-কিশোরী তাঁহাদের দিকে আসিতেছে দেখিয়া ড্রাইভার দ্বার খুলিয়া দিতেই তিনি নামিয়া পড়িলেন এবং কিশোরের উদ্দেশে মৃদুস্বরে বলিলেন, "থাক্, তোমাকে আর নিতে আস্‌তে হবেনা, আমি ভবতারণের সঙ্গেই আধঘণ্টাটাক পরে যাব"

কিশোর মাতার কণ্ঠস্বরে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার ক্ষুণ্ণ গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল এবং ততোধিক মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, "না—আমিই ফিরে আস্‌ছি।"

আন্দাজ তিন কোয়ার্টার পরে কিশোর সেই দরজায় আসিয়া ট্যাক্সি দাঁড় করাইবা মাত্র ঘরের ভিতর হইতে তাহারি সমবয়সী একটি সুদর্শন যুবা বাহির হইয়া গাড়ীর নিকটে আসিল এবং তাহাকে নামিতে অনুরোধ করিল। কিশোর আপত্তি জানাইয়া মাতাকে সংবাদ দিতে বলায় যুবক হাসিয়া বলিল, "আমায় বুঝি কিশোরবাবু চিন্‌তে পারছেন না! আমি জিতু। আপনি না নাম্‌লে মা খুব রাগ করবেন। খবর দি তাঁদের যে আপনি নাম্‌ছেন না!"

কিশোর তখন সুবোধ বালকের মত নামিয়া পড়িয়া তাহাদের বাহিরের ঘরে ঢুকিল এবং প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে মাতাকে সংবাদ দিতে মিনতি জানাইল।

"এই যে দিচ্ছি—কিন্তু তাতে যে বেশী সুবিধা হবে, তা মনে করবেন না। আপনি ততক্ষণ বসুন ভাল হয়ে।"

বাড়ীর ভিতরে সংবাদ গেল এবং অপরম্বা কিং ভবিষ্যতির ভাবনায় কিশোর আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল। কেন না, জিতুবাবুর চাপা কণ্ঠস্বরে চা এই শব্দটা তাহার কানে আসিয়াছিল। এইবার ভদ্রতার যে একট যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে, তাহা সে মনশ্চক্ষেই দেখিতে পাইতেছিল।

কিন্তু শীঘ্রই মাতার কণ্ঠস্বরে সে আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া

বলিতে বলিতে একজন মহিলার হস্ত ধারণ করিয়া রাজেশ্বরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে যাহারা আসিতেছিল, তাহারা যেন বাধা পাইয়াই দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইতে তাহাদের বসনের কতকভাগ মাত্র চক্ষে পড়িল। তাহারা আসিয়া পড়িয়া যেন পিছাইতেও লজ্জা পাইতেছে—অগ্রসরও হইতে পারিতেছে না!

রাজেশ্বরীর চক্ষের ইঙ্গিতে মহিলাটির নিকটস্থ হইয়া প্রণামের জন্য কিশোর অবনত হইবামাত্র "এই যে বাবা—এত বড়টি হয়েছ? বেঁচে থাক—" বলিয়া তিনি তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তার পরে তাহার মুখের দিকে সহাস্যভাবে চাহিয়া বলিলেন, "কেন বাবা, নাম্‌তে চাওনি কেন? জিতুকে চিন্‌তে পারোনি বুঝি? তোমার যে ওরা কত বন্ধু ছিল—কত খেল্‌তে তোমরা! ঝরণারও বুঝি লজ্জা হলো? রাঁচির কথা মনে নেই না কি—?" বলিয়া সহাস্যে তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন। কে যেন দ্বারের ভিতর হইতে আগাইয়া আসিতেছে ইহা অনুভব করিবামাত্র সেই যে কিশোর মাথা নামাইল—ইহার পর রাজেশ্বরী কোন্ কোন্ ভাষায় কিশোরকে চা বা মিষ্টান্ন যোগের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন এবং শীঘ্রই আবার একদিন আসিবার প্রতিশ্রুতি ও জিতুকে নিজেদের ঠিকানা দিয়া কিশোরকে সঙ্গে লইয়া যে গাড়ীতে উঠিলেন—কিশোরের সে সব যেন একটা অন্ধতার মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া গেল। গাড়ী যখন রাস্তায় পড়িয়া ছুটিয়া চলিল, তখন তাহার যেন চক্ষের দর্শনশক্তি ও কর্ণের শ্রবণশক্তি আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে,—এমনি মনে হইল।

সেদিন সমস্তদিন ধরিয়াই রাজেশ্বরীর অন্তরের উচ্ছ্বাস নানা ভাষায় কিশোরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। "কি চমৎকার অমায়িক মানুষ ওরা! সত্যি কথা বল্‌তে গেলে কতটুকুই বা আলাপ ছিল—অমন তো কত হয়! তবু আমি নিজে থেকে খোঁজ করে দেখা করতে গিয়েছি ব'লে কতই আনন্দ প্রকাশ করা! ওরাও একদিন আসবে বলেছে,—জিতু তার আগেই এসে দেখা ক'রে যাবে। আমি যা ভয় করেছিলাম, তা তো মোটেই নয়—ঠিক আমাদেরই মত ঘরকন্না! বাইরেটা সাহেবী-সাহেবী দেখালেও ভেতরটা একেবারে আমাদেরই মত। মেয়েটা এখন কি শান্তই হয়েছে—কে বল্‌বে সেই ঝরণা! আর কি সুন্দর হয়েছে—তখন কেমন রোগা রোগা ছিল—এখন যেন ভেঙে চুরে গড়েছে। বড় মেয়ে কল্যাণীকেও দেখ্‌লাম—ঝরণার চেয়ে সে অনেকটা বড়—একটি খোকা হয়েছে তার। সেটি কিন্তু আমাদের ঝরণার মত অমন সুন্দর নয়—"। কিশোর গতিক দেখিয়া সেদিন মার কাছ হইতে একটু দূরে দূরেই সরিয়া থাকিতে চেষ্টা পাইতেছিল্।

পরদিনই জিতু বা শ্রীমান্ অজিত তাহাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়া রাঁচির শৈশব-স্মৃতি লইয়া এমন গল্প জুড়িয়া দিল যে কিশোরের বিস্ময় লাগিতেছিল। এগুলা কি তাহার মাতা-ভগ্নীর মুখে শুনিয়া কল্পনার রঞ্জিত কাহিনী অথবা তাহার আলাপ করিবারই একটা ছুতা মাত্র! জিতু বা অন্য কাহারো সঙ্গে যে সে এত খেলা করিয়াছে—এমন কি এই জিতু-শ্রীমান্‌কেই যে তাহার একেবারে মনে ছিল না! এখন অবশ্য পড়িয়াছে। কিন্তু এতদিন মাত্র একটি স্মৃতি একটি চিত্রই তাহার সেই শৈশব-জীবন হইতে যৌবনের জীবন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিল! রাঁচির স্মৃতির গৎটা মাত্র সেইটিকে ঘিরিয়াই গাহিয়া ফিরিত! আর অন্য কিছু তো তাহার মনে নাই।

জিতুর সঙ্গে আবার সেদিনও রাজেশ্বরী, "একটু বেড়িয়ে আসি—বসে বসে সময় যেন কাটে না"—বলিয়া তাহাদের বাড়ী চলিয়া গেলেন; কিশোরের গতিক বুঝিয়া তাহাকে আর বেশী উৎপীড়ন করিলেন না।

সেদিন খানিক রাত্রেই অজিত আসিয়া তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। কিশোর তখন একমনে তাহার বিজ্ঞান-রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। একমুখ হাসি লইয়া রাজেশ্বরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কেমন! যেমন গেলে না, তেমনি নিজেই ঠক্‌লে! শুন্‌তে পেলেনা!"

কিশোর একটু বিস্মিত সপ্রশ্ন নয়নে মাতার পানে চাহিয়া থাকিতেই রাজেশ্বরী নিজ হইতে বলিয়া উঠিলেন, "না রে, ভুলই বল্‌ছি! তাদের যেমন ধরণ-ধারণ—তুই সঙ্গে থাক্‌লে হয়ত আমিই শুন্‌তে পেতাম না। কি সুন্দর গায় আর বাজায় দুই বোনে। বিশেষ আমাদের ঝরণা যে

কি বেহালা বাজায়—এমন আমি কক্খোনো—” বলিতে বলিতে রাজেশ্বরী নিজের উচ্ছ্বাসের উপরই যেন একটা কি আঘাত পাইয়া একটু থামিয়া গেলেন—তারপরে সেটুকু যেন সাম্লাইয়া লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, “অতটুকু মেয়ের এমন বাজানো কখনো শুনিনি। রীতিমত মাষ্টার রেখে মেয়েদের গাইতে বাজাতে শেখানো হয়। তবে তার মধ্যেও একটু অসাধারণত্ব আছে। মেয়েদের কে একজন কাকা আছেন, অবিশ্যি তিনি একজন মাষ্টারই, তবু তাঁদের একজন আত্মীয়ের মতই হয়ে থাকেন!”

কিশোর নিঃশব্দে নিজের পুস্তকের পানে চাহিয়াই রহিল, আর রাজেশ্বরী একটা চৌকি টানিয়া জানালার নিকটে বসিয়া পড়িয়া—কে যেন তাঁকে সমস্ত খুঁটিয়া বলিবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিতেছে, এমনি ভাবে বলিয়া চলিলেন, “কাল ঝরণাকে খুব শান্ত আর গম্ভীর গম্ভীর লেগেছিল। অনেকদিন পরে দেখা—আর মেয়ে এখন একটা যে-সে নেই ত। ওমা, আজ দেখি যে ঝরণা সেই ঝরণা,—কিন্তু ঝরণার চেয়ে গোপ্পে তার দিদিই বেশী—কল্যাণী মেয়েটি! তাদের সেই মাষ্টার কাকার গল্প আর মেয়েদের ফুরোতে চায়না! তাকে তারা পেয়েছে বলেই এতটা শিখেছে, নৈলে বাইরের লোকের কাছে তো তাদের অমন ক'রে শেখা চলতো না। আগে বলে তারা তাদের বাবার কাছে খানিকটা শিখেছিল। মোহিনী বাবুর নাকি গান-বাজনার ভারি সখ্। নিজে ওস্তাদ রেখে সব শিখেছেন। একদিন তার বাবা বসে বাজাচ্ছেন আর তারা শুনছে, এমন সময়ে একটা লোক—বলা নেই কওয়া নেই—রাস্তায় জানালার গোড়া থেকে মুখ বাড়িয়ে বল্লে, “ও কি মশায়! মেয়েদের ভুল শেখাচ্ছেন কেন? আপনি যে-কটা বাজালেন, সবগুলোতেই যে ভুল রয়েছে।” বাপ একটু অবাক হয়ে তখনি তাকে ডেকে এনে খাতির ক'রে বসিয়ে তাকে নিজের হাতের বেহালা দিয়ে তার গান শুন্লেন। সেই থেকে তাঁর ওপর ওদের বাপের কি যে মন পড়ে গেল, তিনি বাড়ীরই একজন হয়ে গেলেন। বড় বড় লোকেদের নিমন্ত্রণ ক'রে মোহিনী বাবু তাঁর গান শোনান্—লোকটি এমন গুণী। মেয়েদের সঙ্গে গান-বাজনার কথা তুল্লেই তাদের এই কাকার গল্প আগে শুন্তে হবে—ঝরণার মা মেয়েদের ঠাট্টা ক'রে হাস্তে হাস্তে এই কথা বল্ছিলেন আর মেয়েদের তাতে যা রাগ দেখানো!”

কিশোর মাতার এই অবারিত গল্প-স্রোতে এইবার একটু বাধা দিয়া বলিল, “খাবার কি হয়নি মা?”

“তাতো এখনো খবর নিইনি,—রোহিণী, দেখ্ তো ঠাকুরের কতদুর! ন'টা বাজে যে—এখনো কিশোরের খাবার দিলে না? সেদিন তুই চা খেয়ে আসিস্নি ব'লে ঝরণার মার আর দিদির যা আমার ওপর অভিমান। এই রবিবারে মোহিনী বাবুর সঙ্গে আলাপ কর্বার জন্যে তোর নিমন্ত্রণ হবে—”

কিশোর একটু যেন আতঙ্কের স্বরে বলিল, “মা তুমি—”

এইটুকু বলিতেই রাজেশ্বরী সজোরে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “সে আবার কি কথা! মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের লেনা-দেনা কর্তে গেলে এ-সব তো করতেই হয়। এতে আঁত্‌কালে চল্বে কেন বাপু? ঝরণার মা আর মেয়েরাও শীগ্‌গির একদিন বেড়াতে আস্বে। আমরাও রবিবারের আগেই নাহয় তাদেরও একদিন খাওয়াব। এত লজ্জা কিসের বাপু? তুই যে কচি ছেলের বাড়া দেখছি।” ইতিমধ্যে রোহিণী দাসী আসিয়া “খোকাবাবু, খাবার এসেছে” বলিয়া ডাক দিতেই সে-রাত্রের মত সে আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

সেই শীঘ্র যে তাহার পরদিন আসিয়া পড়িবে তাহা কিশোর আন্দাজ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ সে সময়টা সে বাহিরেই কাটাইত। বৈকালে সে পাঠগৃহেই বসিয়া এইবার বেড়াইতে যাইবে এইটুকুমাত্র ভাবিতেছে, এমন সময়ে তাহার মাতা একজন মহিলা ও একটি যুবককে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেই তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঝরণার মা অনুযোগের সুরে বলিলেন, “কেন বাবা, তোমার এত লজ্জা কিসের! জিতুর সঙ্গে ঝরণার সঙ্গে কত ভাব ছিল তোমার, কত খেলেছ, তা বুঝি আজ আর মনে নেই? আয়রে কল্যাণ, কিশোরের সঙ্গে আলাপ করবি আয়!

তুইও যে কিশোরের মত হলি,—কিশোর তো তোর চেয়ে অনেক ছোট! ঝর্ণাটা তো এলোই না। কি যে এদের সব লজ্জা!"

একজন সুবেশা যুবতী একটি ক্ষুদ্র বালকের হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলিল, "কি যে বল তুমি মা, খোকা যে জ্বালাতন করছে।"

"পাজীকে জব্দ করি দাঁড়াও তবে আমি!" বলিয়া রাজেশ্বরী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং অভিমানের সঙ্গেই বলিলেন, "ঝর্ণার আর সময় হলোনা আস্‌তে?"

কল্যাণী সলজ্জে সে কথারও কি একটা কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কল্যাণীকে প্রণামটা সারিয়া লইয়া কিশোর খোকার সহিত ভাব করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। ঝর্ণা যে আসে নাই, ইহাতে কিশোর তখন যেন আরামই বোধ করিল। খোকার মামা হইয়া একটু পরেই খোকার মার সঙ্গেও তাহার 'দিদি' ও 'ভাই' সম্বন্ধটিও দিব্য জমিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

---

# মদালসার উপদেশ

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসার উপদেশ কয়টি আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজ, রাজনীতি ও ধর্ম্ম হিসাবে অতিশয় সারবান। পৌরাণিক যুগে ভারতের গার্হস্থ্য জীবনে রমণীর স্থান, ভারতবর্ষের রাজধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, ও আচার-ব্যবহার এই উপদেশকয়টিতে অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ইহার আরও একটী মূল্য এই যে, উপদেশগুলি একজন বিদুষী নারীর উপদেশ। এই হিসাবে আমাদের দেশের আধুনিক নারী-সমাজে ইহার মূল্য হইবে।

মদালসা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা ও রাজা শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজের সহধর্ম্মিণী। বিবাহের সময় মদালসার সখী কুণ্ডলা রাজপুত্রকে স্নেহ করিয়া বলিতেছেন—

ভর্ত্তব্যা রক্ষিতব্যা চ ভার্য্যা হি পতিনা সদা।
ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধ্যৈ ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী॥
যদা ভার্য্যা চ ভর্ত্তা চ পরস্পর বশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গতম্॥ *

অর্থাৎ পতি পত্নীকে সর্ব্বদা রক্ষা ও ভরণ করিবে। স্ত্রী পতির সহায় হইলে ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্যক্‌রূপে সিদ্ধিলাভ করে। যখন স্বামী স্ত্রী পরস্পরের বশবর্ত্তী হয় তখন ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিনটির মিলন হয়। এই বলিয়া সখী রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। "বর্দ্ধত্বমনয়া সার্দ্ধং ধনপুত্রসুখায়ুষা"; আপনি ইহার সহিত ধনপুত্র আয়ু ও সুখ দ্বারা বর্দ্ধিত হউন।

বিবাহের পর রাজপুত্র পত্নীর সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতা আশীর্ব্বাদ করিলেন,

"তৎপুত্র ধনবীর্য্যৈস্ত্বং বিবর্দ্ধস্ব সুখেন চ
গন্ধর্ব্বতনয়া চেয়ং মা ত্বয়া বৈ বিযুজ্যতাম্।" †

পুত্র, তুমি ধন, বল ও সুখ দ্বারা বর্দ্ধিত হও। এই গন্ধর্ব্ব-তনয়া যেন তোমার সহিত বিযুক্তা না হন।

পিতার আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন লাভ করিয়া রাজপুত্র পত্নীর সহিত সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই বিদুষী নারীও প্রতিদিন প্রাতঃকালে—

শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ প্রাণিপত্য চ সা শুভা।
প্রাতঃ প্রাতস্ততস্তেন সহরেমে সুমধ্যমা॥ ‡

---

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ) একবিংশ অধ্যায় ৭০, ৭১

† মার্কণ্ডেয় পুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ) একবিংশ অধ্যায়, ৭৯।

‡ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২১।১০৩

শ্বশুর-শাশুড়ীর চরণ বন্দনা করিয়া স্বামীর সহিত সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মদালসার একটী পুত্র হইল। স্বামী তাহার নাম রাখিলেন, বিক্রান্ত। পৌত্র-মুখ দর্শন করিয়া রাজা শত্রুজিৎ পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। পুত্র জননীর ক্রোড়ে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জননীও প্রতিদিন তাহাকে কথার ছলে আত্মজ্ঞান দান করিতে লাগিলেন। রোদন করিলে মাতা পুত্রকে বলিতেন—

শুদ্ধোঽসি রে তাত ন তেঽস্তি নাম
কৃতং হি তে কল্পনয়াধুনৈব
পঞ্চাত্মকং দেহমিদং তবৈত
নৈবাস্য ত্বং রোদিষি কস্য হেতোঃ ॥ *

তাত, তুমি শুদ্ধ। তোমার কোনও নাম নাই। কল্পনার সাহায্যে তোমার একটী নাম রাখা হইয়াছে। তোমার এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক। এই দেহ তোমার নহে তুমিও ইহার নও। অতএব তুমি কাঁদিতেছ কেন?

জ্ঞানমার্গে পুত্রের শিক্ষার ভার জননীর উপর অর্পিত হইল। মাতা পুত্রকে সযত্নে উপদেশ সহ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

তাতোত কিঞ্চিৎ তনয়েতি কিঞ্চিৎ
অম্বেতি কিঞ্চিদ্দয়িতেতি কিঞ্চিৎ
মমেতি কিঞ্চিৎ ন মমেতি কিঞ্চিৎ
ত্বং ভূতসংঘং বহু মানয়েথাঃ ॥
দুঃখানি দুঃখোপশমায় ভোগান্
সুখায় জানাতি বিমূঢ়চেতাঃ
তান্যেব দুঃখানি পুনঃ সুখানি
জানাত্যবিদ্বান্ সুবিমূঢ়চেতাঃ ॥ †

পিতা পুত্র মাতা দয়িতা আত্মীয় অনাত্মীয় কিছুই নাই। তুমি ইহাদিগকে বহুমাননা করিও না। মূর্খ মানুষ দুঃখকে দুঃখোপশমের হেতু আর ভোগকে সুখের কারণ বলিয়া জানে। অবিদ্বান ও মূঢ় ব্যক্তি সেই সেই দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে করে।

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২৫।১১

† মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২৫।১৫,১৬

এইরূপে পুত্র মাতার নিকটে শৈশবে আত্মজ্ঞান পাইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মে একেবারেই স্পৃহাশূন্য হইল। কিছুদিন পরে মদালসার দ্বিতীয় একটি পুত্র হইল। তারপর তৃতীয় পুত্র হইল। জননা দুটি পুত্রকেই বাল্যকাল হইতে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মজ্ঞান দান করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কাম ও গৃহধর্ম্মে স্পৃহাহীন করিলেন। রাজা প্রমাদ গণিলেন। উপরি উপরি তিনটি পুত্র জননীর শিক্ষায় সংসারে আসক্তি-শূন্য হইল। পিতৃপিণ্ড ও রাজধর্ম্মও বিলুপ্ত হইবে আশঙ্কা হইল। এই সময় মদালসার চতুর্থ পুত্র জন্মিল। মাতা তাহার নাম রাখিলেন—অলর্ক। এইবার রাজা মাদলসাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

যদি তে সৎপ্রিয়ং কার্য্যং যদি গ্রাহ্যং বচো মম
তদেনং তনয়ং মার্গে প্রবৃত্তেঃ সন্নিযোজয়
কর্ম্মমার্গং সমুচ্ছেদং নৈবং দেবি গমিষ্যতি
পিতৃপিণ্ডনিবৃত্তিশ্চ নৈবং সাধ্বি ভবিষ্যতি ॥ ‡

যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা তোমার মত হয়, আর যদি আমার কথা পালন কর, তবে এই তনয়কে প্রবৃত্তি-মার্গে নিয়োজিত কর। হে দেবী, হে সাধ্বি, তাহা হইলে কর্ম্মমার্গ সমুচ্ছেদ হইবে না, পিতৃপিণ্ডও লোপ পাইবে না। মদালসাও স্বামীর কথায় এইবার পুত্রকে রাজধর্ম্মে ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মে উপদেশ দিয়া শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। মাতা পুত্রকে বলিলেন, প্রজারঞ্জনই রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপালন করিতে হইলে রাজা সর্ব্বদা মন্ত্রীদিগের পরামর্শ ও মন্ত্রণা মানিয়া চলিবেন। নরপতি দেখিবেন যেন শত্রুরা উৎকোচ দিয়া মন্ত্রিগণকে দূষিত না করে। গুপ্তচর দ্বারা রাজা সর্ব্বদা শত্রুর ও মন্ত্রিগণের গতি-বিধি লক্ষ্য করিবেন। কাহাকেও বিশ্বাস করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ষড়্গুণে গুণান্বিত হওয়া রাজার কর্ত্তব্য। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান ও হর্ষ এইগুলি নরপতির শত্রু। সুতরাং এই রিপুগুলিকে সর্ব্বাগ্রে জয় করা বিধেয়। এইগুলি জয় না করিয়া শত্রুর সহিত বিরোধ করা রাজার অনুচিত। রাজা পাণ্ডু কামাসক্ত হওয়ায় নিপতিত হইয়াছিলেন; ক্রোধের জন্য অনুহ্লাদ পুত্র-লাভ করিতে পারেন নাই।

‡ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২৭।২৭,২৮

লোভবশতঃ ঐলরাজ বিনাশ পাইয়াছিলেন; মদের নিমিত্ত বেণরাজ নিহত হইয়াছিলেন, অভিমানের জন্য বলী রাজা বদ্ধ এবং হর্ষবশে পুরঞ্জয় নিহত হইয়াছেন। এই সকল মনে করিয়া দোষ পরিত্যাগ করা রাজার বিধেয়। নরপতি চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় রাজনীতি প্রয়োগ করিবেন। তিনি সর্ব্বদা প্রজারঞ্জন করিবেন, পদ্ম ফুলের মত সকলের চিত্তহারী হইবেন, সর্ব্বদা বিক্রম প্রকাশ করিবেন, শত্রুকে ধ্বংস করিবেন, পিপীলিকার ন্যায় সদা সঞ্চয়শীল ও গোপাঙ্গনার মত কল্পনাপটু হইবেন।

মহীপালন করিতে হইলে নৃপতির ইন্দ্র, সূর্য্য, যম, চন্দ্র ও বায়ুর অনুরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্র যেমন জল বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর সকলকে আপ্যায়িত করেন, রাজা সেইরূপ অর্থ দান করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিবেন। সূর্য্য যেমন রশ্মিদ্বারা জল শোষণ করেন, নরপতিও সেইরূপ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। যম যেরূপ প্রাপ্তকালে কি প্রিয় কি দ্বেষ্য সকলকেই লইয়া যায়, রাজাও সেইরূপ কি অপ্রিয়, কি দুষ্ট, কি অদুষ্ট সকলের প্রতিই সমদর্শী হইবেন। বায়ু যেরূপ গুপ্তভাবে সকল স্থানে বিচরণ করে, নৃপতিও সেইরূপ চরদ্বারা পৌর, অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবের চরিত্র অন্বেষণ করিবেন। পূর্ণচন্দ্রমা দেখিয়া লোকের মনে যেরূপ সুখ হয়, রাজার আচরণ দেখিয়া প্রজাপুঞ্জও যেন সেইরূপ সুখ অনুভব করে। রাজা সর্ব্বদা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন ও রক্ষণ করিতেন। ইহাই রাজধর্ম্ম।

পুত্রকে রাজধর্ম্মে উপদেশ দিয়া মদালসা বর্ণধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মাতা বলিলেন, ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ আছে। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এবং শুদ্ধভাবে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ তাহার জীবিকা। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই তিনটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং পৃথিবী রক্ষা ও শস্ত্রচালন এই দুইটি তাহার জীবিকা। বৈশ্যের ধর্ম্ম দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এবং জীবিকা পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষি; শূদ্রের ধর্ম্ম দান, যজ্ঞ ও বর্ণত্রয়ের সেবা আর জীবিকা কারুকার্য্য, বিপ্রসেবা, পশুপোষণ ও ক্রয়-বিক্রয়। প্রথম তিনটি বর্ণের উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ তিনটি দ্বিজাতি নিজের ইচ্ছানুসারে ব্যবহার, আলাপ ও আহার করিতে পারে কিন্তু উপনয়ন হইবামাত্র তাঁহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান করিতে হইবে। গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীকে স্বাধ্যায়, অগ্নি-শুশ্রূষা, স্নান, ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ, গুরুকে নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া ভোজন, গুরুর কার্য্যে উদ্যোগ, তাঁহার প্রীতি-উৎপাদন ও অনন্যচিত্তে অধ্যয়ন করিতে হইবে। একটি দুইটি কিম্বা তিনটি বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুর আদেশ লইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত দক্ষিণা সমর্পণ পূর্ব্বক হয় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, না হয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া আজীবন গুরুগৃহে অবস্থান করিবে অথবা নিজের ইচ্ছানুসারে বানপ্রস্থ কিংবা যতি আশ্রয় অবলম্বন করিবে। যিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবেন তাঁহাকে স্বীয় অনুরূপা কন্যা বিবাহ করিতে হইবে। গৃহস্থ নিজের কর্ম্মদ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়া ভক্তির সহিত পিতৃ-দেবতা ও অতিথির তৃপ্তি বিধান ও আশ্রিতজনের পোষণ করিবে। ভৃত্য, পুত্র, দীন, অন্ধ, পতিত ও পশুপক্ষী প্রভৃতিকে শক্তি-অনুসারে অন্নদ্বারা পালন করিবে এবং পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ইহাই গৃহস্থাশ্রম। তারপর বানপ্রস্থাশ্রম। দেহের অবনতি দর্শন করিলে সন্তান-সন্ততির উপর রাজ্য অথবা সংসারের ভার অর্পণ করিয়া আত্মার শুদ্ধির জন্য দ্বিজাতির ভার্য্যার সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সেখানে বনজ ফলমূল ভক্ষণ, তপস্যা দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাধন, ভূমিতলে শয়ন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, পিতৃ-দেবতা ও অতিথিগণের সেবা, হোম, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, জটাবল্কল ধারণ ও সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করিবে। এই আশ্রমের পর ভিক্ষুনামা চতুর্থ ও চরম আশ্রম। এই আশ্রমের কর্ত্তব্য—সর্ব্ব-সঙ্গ-পরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, রোষশূন্যতা, ইন্দ্রিয় দমন, একস্থানে বহুদিন অবস্থান না করা, কর্ম্ম-বিসর্জ্জন, ভিক্ষান্নে একবার মাত্র ভোজন, আত্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা এবং আত্মদর্শন। এইগুলি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। সত্য শৌচ, অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অকৃপণতা ও সন্তোষ এই আটটি সকল বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম। সকল

যাহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, রাজা তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন।

জননী মদালসা চারিটি আশ্রমধর্ম্ম বর্ণনা করিয়া পুত্র অলর্ক যাহাতে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে তজ্জন্য ঐ আশ্রমের মুখ্যতা দেখাইতে লাগিলেন। মাতা বলিলেন,

বৎস গার্হস্থ্যমাদায় নরঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
পুষ্ণাতি তেন লোকাংশ্চ স জয়ত্যভিবাঞ্ছিতান্॥
পিতরো মুনয়ো দেবাঃ ভূতানি মনুজাস্তথা।
কৃমিকীটপতঙ্গাশ্চ বয়াংসি পশবোঽসুরাঃ॥
গৃহস্থমুপজীবন্তি ততস্তৃপ্তিং প্রযান্তি চ।
মুখঞ্চাস্য নিরীক্ষন্তে অপি নো দাস্যতীতি বৈ॥
সর্ব্বস্যাধারভূতেয়ং বৎস্য ধেনুস্ত্রয়ীময়ী।
যস্যাং প্রতিষ্ঠিতং বিশ্বং বিশ্বহেতুশ্চ যা মতা॥ *

বাছা, মানুষ গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া জগতের পোষণ করে; আর সেইজন্যই বাঞ্ছিত লোক লাভ করে। পিতৃগণ, মুনিগণ, ভূতসমুদায়, মানুষ, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী, অসুর ইহারা সকলেই গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করে এবং তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। "গৃহস্থ আমাদিগকে খাইতে দিবে কিনা" এই ভাবিয়া ইহারা গৃহীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। বাছা, গাভীর ন্যায় গৃহস্থ সকলের আধার-ভূত। সমস্ত বিশ্ব এই ধেনুর উপর প্রতিষ্ঠিত আর এই ধেনুই জগতের কারণ। এইজন্য গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রম হইতে উৎকৃষ্ট। গৃহী সদাচার-পরায়ণ হইয়া সংসারের সমস্ত ভার বহন করিবে এবং হব্য, কব্য ও অন্নদান করিয়া বিশ্বের সকল ভূতের অর্চ্চনা করিবে।

গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পুত্রকে উপদেশ দিয়া গৃহীর যে সকল সদাচার পালন করা উচিত, মদালসা পুত্র অলর্ককে তাহা বলিতে লাগিলেন:—

অর্জ্জিত অর্থের চতুর্থাংশ পারত্রিক ধর্ম্মের জন্য সঞ্চয় করা গৃহীর কর্ত্তব্য। অর্দ্ধাংশ দ্বারা আত্মপোষণ ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন এবং অবশিষ্ট অংশ মূলধন রূপে রাখিয়া দেওয়া বিধেয়। অসৎকথা, মিথ্যাকথা ও কর্কশ বাক্য এবং অসৎশাস্ত্র, অসৎবাদ ও অসৎসেবা গৃহীর সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা উচিত। কোনপ্রকার অনিষ্ট বা উত্তেজনা না করিলে কোন লোকের দোষ প্রকাশ করিতে নাই। ব্রাহ্মণ, রাজা, দুঃখাতুর, আপন-অপেক্ষা অধিক বিদ্বান্, গুর্ব্বিণী, ভারবাহী, যুবক, মূক, অন্ধ, বধির, মত্ত, উন্মত্ত, কৃতবৈর, বালক ও পতিতকে পথ প্রদান করিবে। কাহারও উপানৎ, বস্ত্র অথবা মাল্য পরিধান করিতে নাই। কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া বা কাহারও প্রতি আক্রোশ প্রদর্শন অনুচিত। দম্ভ, অভিমান ও তীক্ষ্ণ ব্যবহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মূর্খ, উন্মত্ত, বিপন্ন, বিরূপ ও হীনাঙ্গ এই সকল ব্যক্তিকে কখনো পরিহাস করা উচিত নয়। অন্যের প্রতি এবং উপদেশ দিবার জন্য পুত্র ও শিষ্যের প্রতি দণ্ড বিধান করা অনুচিত। লোহিতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা চিত্রিত বসন পরিধান করিতে নাই। জীর্ণ অথবা ছিন্ন বস্ত্রও পরিত্যাগ করা উচিত। কথা বলিতে বলিতে ভোজন করা অথবা যাহারা উপস্থিত রহিয়াছে তাহাদিগকে কিছু না দিয়া আহার করা গৃহীর কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বদা শুভ্র বসন পরিধান করিবে এবং সদাচার-পরায়ণ সাধুদিগের সহিত মিত্রতা করিবে। যে দেশে ঋণ-প্রদাতা, বৈদ্য, শ্রোত্রীয়, সজলা নদী, শস্যবতী ভূমি, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বলবান্ রাজা আছেন এবং যে দেশের লোকেরা সুসংযত ও নিত্য ন্যায়পথাশ্রয়ী সেই দেশে বাস করা গৃহীর কর্ত্তব্য। প্রত্যেকদিন বেদপাঠ করিবে, সম্যক্ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে, ধর্ম্মানুসারে যত্নের সহিত ধন উপার্জ্জন করিবে। যে কার্য্য করিলে আত্মা জুগুপ্সিত না হয় এবং যাহা মহাজন-সমীপে গোপনীয় নহে এইরূপ কার্য্য নিঃশঙ্ক হৃদয়ে করিবে।

এইরূপে পুত্র স্নেহময়ী জননীর নিকট বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনে শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিয়া সম্যক্ বিধানানুসারে দার পরিগ্রহপূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। রাজা ঋতুধ্বজও পুত্র অলর্ককে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পত্নী মদালসার সহিত বন-গমনে ইচ্ছা করিলেন। বুদ্ধিমতী মাতা জানিতেন, পুত্রকে যে শিক্ষা দান করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নহে। এই শিক্ষার

জ্ঞানলাভ হয় নাই। পাছে বালকের মন সংসারে স্পৃহাহীন হয়, এই ভয়ে জননী কূট দর্শনশাস্ত্রে কোন উপদেশ দেন নাই। রাজা এবং গৃহস্থের যে শিক্ষাটুকু প্রয়োজন পুত্র তাহাই পাইয়াছে। গৃহীর ধর্ম্ম বিষয়ে যে পরিমাণ জ্ঞান আবশ্যক জননী পুত্রকে ঠিক তাহাই দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে মাতা সন্তোষ লাভ করিলেন না। মদালসরে ভয় হইল, দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের অভাবে পুত্র সংসারে অতিশয় মমতা-পরায়ণ হইতে পারে, কামোপভোগে রত হইতে পারে, অথবা প্রিয়বন্ধুর বিয়োগে কিংবা শত্রুর আক্রমণ ও অর্থক্ষয়-জনিত দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতে পারে। তখন জননীর শিক্ষায় কোন ফল হইবে না। বালক বিপদে হতাশ হইয়া পড়িবে। এই ভয়ে জননী বনে যাইবার সময় একটি অঙ্গুরীয়কের ভিতরে কয়েকটি উপদেশ লিখিয়া পুত্রকে বলিলেন, "রাজ্য শাসন করিতে করিতে যখনই কোন দুঃখ পাইবে, তখন এই স্বর্ণাঙ্গুরীয়ের ভিতর আমার উপদেশ-কয়টি পাঠ করিও।" এই বলিয়া নিজের স্বর্ণাঙ্গুরীয়টি পুত্রকে প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বামীর সহিত তিনি বনে প্রস্থান করিলেন।

জননীর বন-গমনের বহুদিন পরে কাশীর রাজা অলর্কের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কাশীরাজ অলর্কের নগর অবরোধ করিয়া তাঁহার সামন্ত দুর্গপাল ও আটবিকগণকে অর্থ, ভেদ ও সামনীতিদ্বারা নিজের বশে আনিলেন। রাজা অলর্ক এইরূপে শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া দিন-দিন হীনবল ও ক্ষীণকোষ হইয়া পড়িলেন। কোথাও কোন সান্ত্বনা বা আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলেন না। এই বিপদে জননীর সেই আংটির কথা তাঁহার মনে পড়িল। অঙ্গুরীয়কটি খুলিয়া মাতার উপদেশ কয়টি পড়িবামাত্র তাঁহার শরীর ও মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অঙ্গুরীয়ে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল,—

সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ সচেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥
কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ো জ্ঞাতুঞ্চেচ্ছক্যতে ন সঃ।
মুমুক্ষাং প্রতি তৎকার্য্যং সৈব তস্যাপি ভেষজম্॥ *

শ্রীক্ষীরোদমোহন চক্রবর্ত্তী।

---

# বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেবের জন্ম কোন্ সময়ে হইয়াছিল অথবা তিনি কখন্ নির্ব্বাণ লাভ করেন ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। ডাক্তার ফ্লীট ও অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৪৮৭ অব্দে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভ হয়। নির্ব্বাণলাভের সময় বুদ্ধের ৮০ বর্ষ বয়স হইয়াছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৬৭ অব্দে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ প্রবাদ আছে, বুদ্ধদেব অন্তিম জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ৫৫০ বার পশু-পক্ষী ও মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের এই সকল জন্ম-কাহিনী "জাতক" নামক পুস্তকে সবিস্তারে লিখিত আছে। অন্তিম জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে বুদ্ধ "তুষিত" নামক স্বর্গে দেবরূপে বাস করিতেন। পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে বুদ্ধ চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি পৃথিবীতে কোন্ ভাগ্যবানের গৃহে ধারণ করিয়া ধন্য হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন ও তদীয় রাজ্ঞী মায়াদেবীর কথা মনে হইল।

বিশ্রামাগারে মায়াদেবী সুখসুপ্ত। সহসা মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিলেন, এক ষড়্দন্ত শ্বেতহস্তী তাঁহার জঠর-দেশের দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিল। মায়াদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল—তিনি ভীত-চকিত হইয়া রাজার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন বিস্মিত হইয়া রাজপুরীর জ্যোতিষিগণকে আহ্বান করিলেন। জ্যোতিষিগণ বলিলেন, মহারাণীর গর্ভে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যদি সংসারাসক্ত হন, তবে চক্রবর্ত্তী সম্রাট্রূপে পৃথিবীতে জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রচারক হইবেন। আর যদি তিনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন, তবে তিনি পরমজ্ঞান লাভ করিয়া "বুদ্ধ" পদ প্রাপ্ত হইবেন।




বুদ্ধের জন্ম ও সপ্তপদী গমন

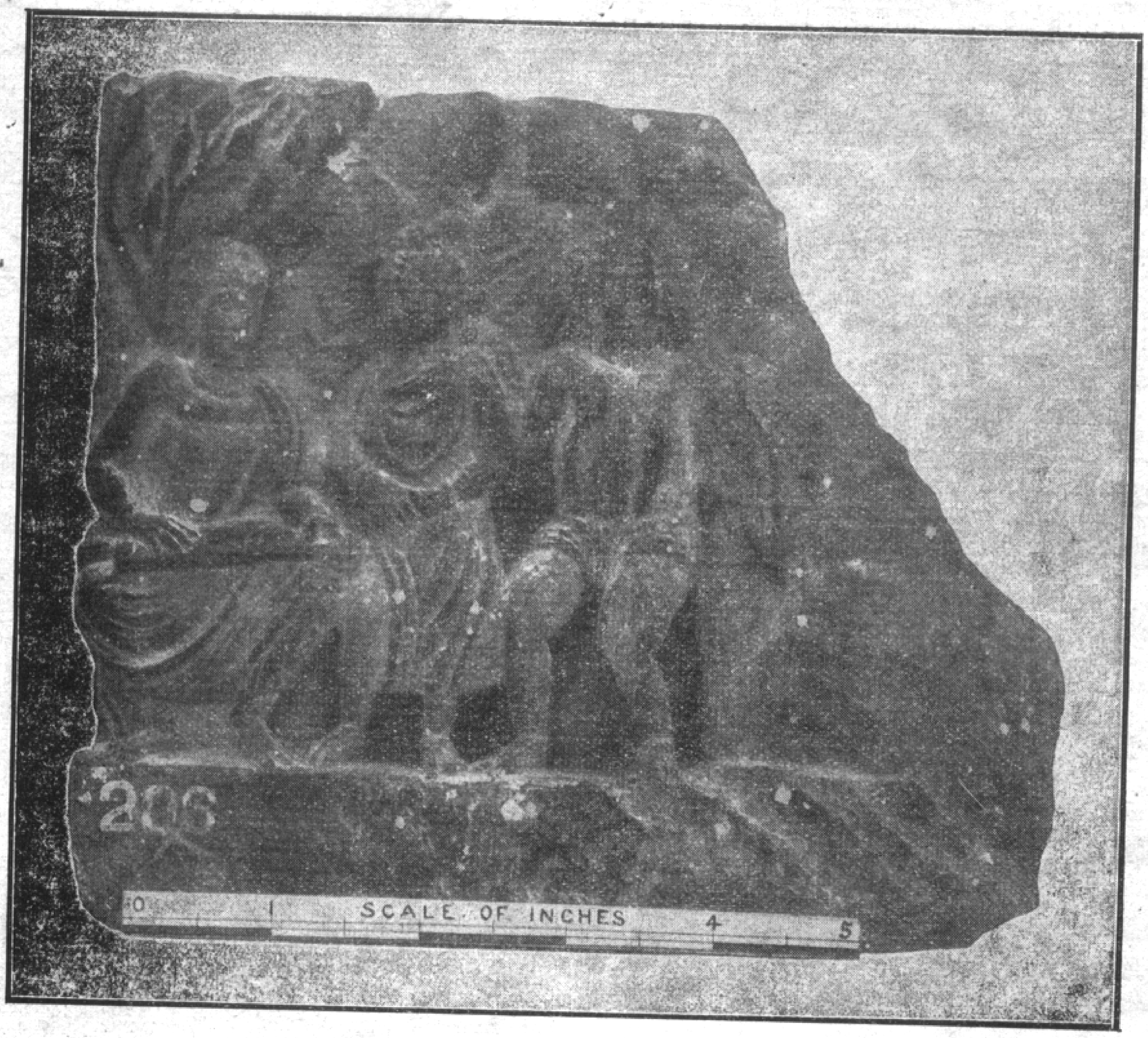
যথাকালে মায়াদেবীর দোহদ-লক্ষণ আবির্ভূত হইল। রাজা শুদ্ধোদন ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া মুক্ত হস্তে দান করিতে লাগিলেন এবং গর্ভানুষ্ঠান-বিধি সকল অনুষ্ঠিত হইল।

মহারাণী মায়াদেবী পূর্ণগর্ভা। এমন সময়ে তাঁহার পিতৃগৃহ-বাসের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। রাজা শুদ্ধোদন মহিষীর মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতৃগৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মায়াদেবী, তদীয় সহোদরা "মহাপ্রজাপতী" ও বহু পরিচারিকা সহ পিতৃগৃহে যাইতে যাইতে রাজার "লুম্বিনী" নামক উপবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি রথ হইতে অবতরণ করিয়া লুম্বিনী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন—সহসা তাঁহার প্রসব-বেদনা আবির্ভূত হইল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। সহোদরা মহা প্রজাপতী ও পরিচারিকাগণ হঠাৎ মহারাণীর প্রসব-বেদনা অনুভব করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। মায়াদেবী প্রসব-বেদনায় কাতর হইয়া দক্ষিণ হস্ত সন্নিকটস্থ এক শাল বৃক্ষের শাখায় ও বাম হস্ত তাঁহার জীবনাধিকা মহাপ্রজাপতীর গলদেশে অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান হইতেই কুমার সিদ্ধার্থ মহারাণীর গর্ভের দক্ষিণাংশ হইতে বহির্গত হইলেন। সহসা ভগবান্ ব্রহ্মা ও ইন্দ্র সেইস্থানে সমাগত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণতন্তুময় বস্ত্রের উপর রাজকুমারকে ধারণ করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা কুমার সিদ্ধার্থকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মহারাণী মায়াদেবী, তদীয় সহোদরা মহাপ্রজাপতী ও অপরাপর পরিচারিকাগণ সকলেই মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রাজকুমার সহসা দেবরাজ ইন্দ্রের অঙ্কদেশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ধরণীতে পদার্পণ করিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, রাজকুমার এক এক পদ নিক্ষেপ করিবার সময়ে ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে এক একটি রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল। রাজকুমার সেই প্রস্ফুটিত পদ্মদলের উপর দিয়া সপ্তপদ গমন করিয়াছিলেন।

ভগবান ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্র বালকের অপূর্ব্ব লীলা



বুদ্ধের বিদ্যারম্ভ

ও লুম্বিনী উদ্যানে মহারাণীর কুমার-প্রসবের সংবাদ শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং যথোচিত সম্মানের সহিত মহিষীকে গ্রহণ করিলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন রাজকুমারের অলৌকিক রূপ-জ্যোতি দর্শনে জ্যোতিষিগণ-কথিত কোনো মহাপুরুষ অনুমান করিয়া পরম পুলকিত হইলেন।

রাজকুমার ক্রমে পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র নামক গুরুর নিকট প্রেরিত হন। এইরূপ কথিত আছে গুরু বিশ্বামিত্র যখন কুমার সিদ্ধার্থকে অক্ষর শিখাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেখিলেন, কুমার ইতি-পূর্ব্বে, সমস্ত অক্ষরই লিখিয়া রাখিয়াছেন অধিকন্তু প্রত্যেক অক্ষরের সঙ্গে এক একটী সংস্কৃত শ্লোকও লিখিত রহিয়াছে। গুরু এই ব্যাপার দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ফলতঃ অল্পদিনেই কুমার সিদ্ধার্থ নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং শাক্য-রাজবংশীয় রীতি অনুসারে রাজকুমারকে এক স্বর্ণময় পীঠের উপর দাঁড় করাইয়া স্বর্ণকলসে নাতিশীতোষ্ণ জল ভরিয়া তদ্বারা স্নান করাইলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সেইদিনই কপিলাবস্তু নগরে তাঁহার ভবিষ্য পত্নী 'যশোধরা', সারথি 'ছন্দক', অশ্ব 'কণ্টক' ও বিশ্বস্ত সচিব 'আনন্দ' জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রমে মহারাণীও তদীয় সহচরীগণের মোহ অপসারিত হইল। মহারাণী মায়াদেবী কুমারের প্রভাতকমলসদৃশ প্রফুল্ল মুখশ্রী দেখিয়া সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন এবং পিতৃগৃহ-গমনের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া রাজপুরীতে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় জানাইলেন। সমবেত জনমণ্ডলী বিপুল আড়ম্বরে স-কুমার মহারাণীকে রাজপুরী অভিমুখে লইয়া চলিল।

মহারাজ শুদ্ধোদন দূতের মুখে মহারাণীর প্রত্যাগমন

ক্রমে রাজকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি একদিন কুমারকে নিকটে ডাকিয়া আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থের হৃদয়ে বৈরাগ্যের যে তীব্র অনল জ্বলিতেছিল, পিতার এই কথায় তাহা প্রবলতররূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বৈরাগ্যের ভাবাবেশে তিনি প্রথমতঃ পিতাকে আপনার মনোবাসনা জানাইলেন। রাজা শুদ্ধোদন কুমারের মুখে সংসার-বিরক্তির কথা শুনিয়া সজল-নেত্রে পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কুমার সিদ্ধার্থ পিতার অশ্রুসজল করুণ মুখচ্ছবি দর্শনে

আপনার সঙ্কল্প বিস্মৃত হইয়া মৌন হইয়া রহিলেন। সংসার-বিরক্তির ভাব পিতার হৃদয়-বেদনার অশ্রু-প্রবাহে ভাসিয়া গেল।

মহারাজ শুদ্ধোদন তনয়কে মৌনাবস্থা দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে মহারাণী মায়াদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। এদিকে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিয়া বিবাহ করা উচিত কিনা এই বিষয় লইয়া ঘোর চিন্তামগ্ন হইলেন।



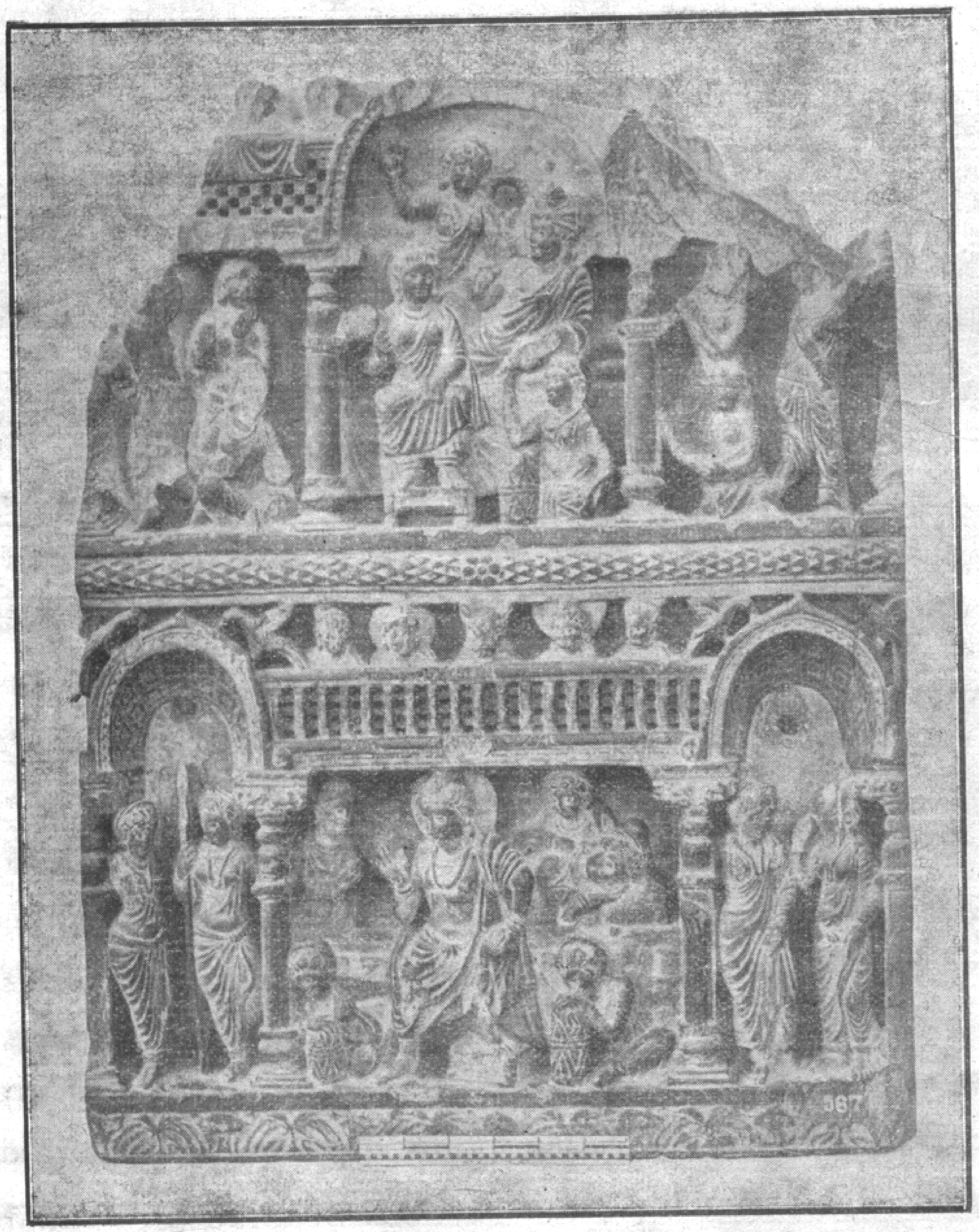
বুদ্ধকে দেখিবার জন্য ইন্দ্রের আগমন

অনেক চিন্তার পর পিতৃ-আজ্ঞা-পালনই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল।

রাজা শুদ্ধোদন রাজকুমারকে বিষয়াসক্ত করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এজন্য যৌবনোন্মেষের বহু পূর্ব্ব হইতেই পিতৃ-নিয়োজিত নানা বিলাসোপায় সিদ্ধার্থকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিত। তরুণ-বয়স্ক রাজকুমার সিদ্ধার্থ একদিন অন্তঃপুরে দানব্রতের আয়োজন করিলেন। প্রিয়বন্ধু 'আনন্দ' দান করিবার দ্রব্যসম্ভার লইয়া সিদ্ধার্থের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। রহস্য-প্রিয়া কিশোরীগণ কুমারবিনিন্দিত রাজকুমারের হস্ত হইতে মূল্যবান বেশ ভূষাদি প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিল। কুমারের দান কার্য্য একপ্রকার শেষ হইয়া গিয়াছে—সখীরা নানাপ্রকার রহস্যালাপ করিতে করিতে কেহ কুমারকে চামর ব্যজন করিতেছে—কেহবা সৌরভময় গন্ধ দ্রব্য কুমারের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিতেছে—এমন সময়ে পল্লীবাসিনী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী যশোধরা 'আমায় কিছু দাও না রাজ-কুমার', বলিয়া রাজকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কুমার সিদ্ধার্থ দেখিলেন, আনন্দের করধৃত দানপত্র নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে! কি দান করিবেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। সহসা গলবিলম্বিত রত্ন-মাল্যেরই মধ্য-মণি তাঁহার হস্তস্পর্শ করিল। কুমার সেই মাল্য খুলিয়া যশোধরার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। পার্শ্বচারিণী সখীগণ হাসিয়া উঠিলেন। সখা "আনন্দ" আনন্দ-প্রফুল্ল হইয়া আত্মবিস্মৃত রাজকুমারকে রহস্যোক্তিতে অভিনন্দিত করিলেন। রাজকুমার 'আনন্দে'র রহস্যো-ক্তিতে আহত হইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিশোরী যশোধরারও কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি সেই সময়ে রাজকুমারের মুখের দিকে নিবদ্ধ হইল। জানি না, প্রজাপতির বিধানে কোন্ শুভক্ষণে চারি চক্ষু মিলিত হইল। কুমার সিদ্ধার্থ আত্ম-হারা হইলেন। অমনি রাজান্তঃপুরের কোন্ গুপ্ত কক্ষ হইতে বসন্তের কোকিল ডাকিয়া উঠিল। যশোধরার সুগভীর সৌন্দর্য্য-সমুদ্রে রাজকুমার নিমগ্ন হইলেন।

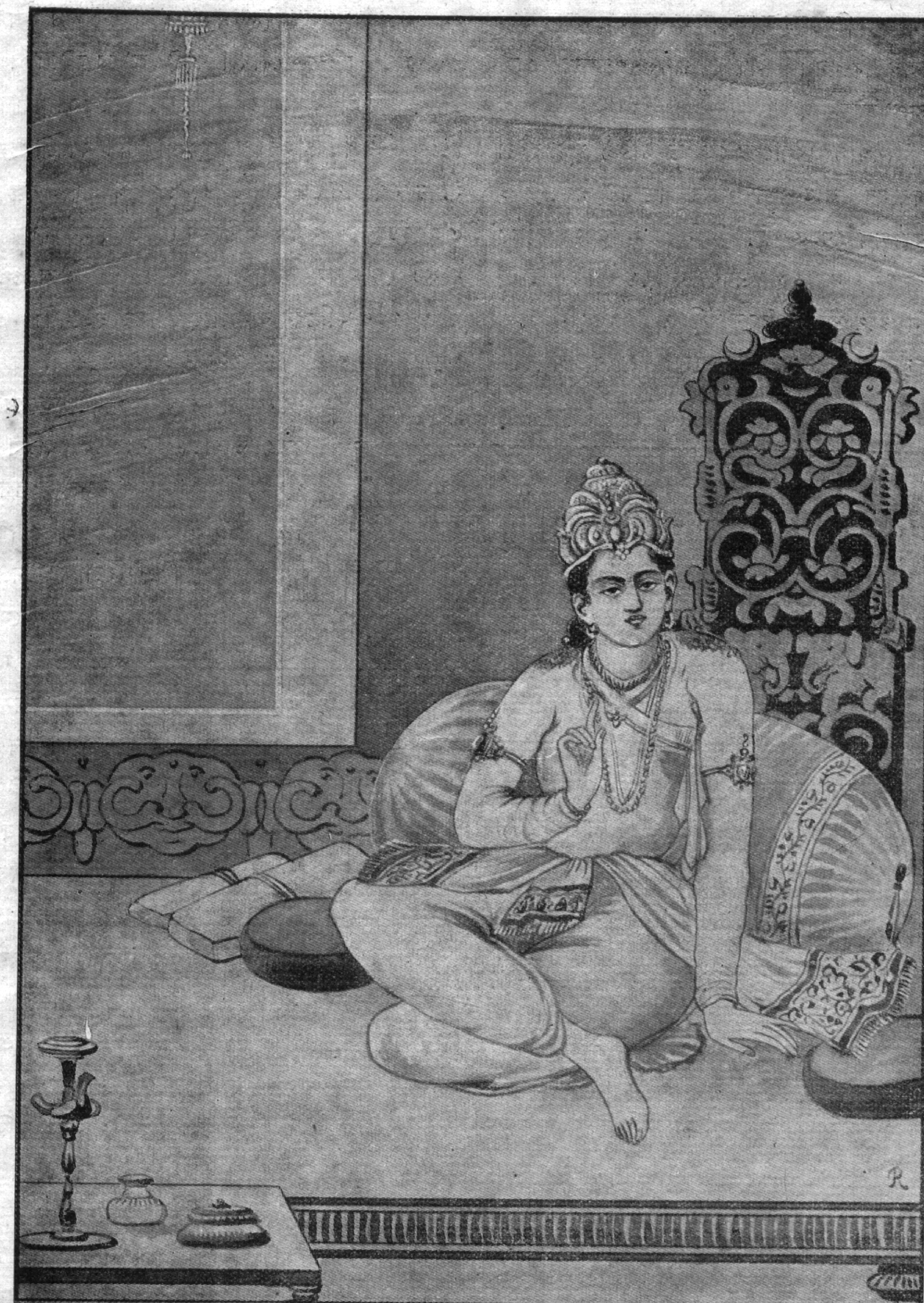
ক্রমে এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজা শুদ্ধোদন পরম পুলকিত হইয়া যশোধরার সহিত কুমার সিদ্ধার্থের বিবাহ দিলেন। সিদ্ধার্থ রূপগুণশালিনী পত্নী লাভ করিয়া সুখী হইলেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ বিলাসের স্রোতে আকণ্ঠ মুগ্ধ হইয়া আছেন। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করেন। এক একদিন তিনি বিশ্বস্ত ভৃত্য ছন্দকের সহিত রথারোহণে নগর পরিভ্রমণ করিতে বাহির হন। একদিন তিনি রথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৃদ্ধ মনুষ্য দেখিলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়াই তাঁহার প্রাণে ক্ষণস্থায়ী যৌবনের উচ্ছল আমোদের প্রতি ধিক্কার জন্মিল। তার পর রাজকুমার একদিন এক রুগ্ন ব্যক্তিকে ও অপর দিন এক মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন। তাঁহার প্রাণে আবার সংসার-বিরক্তির ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি এইরূপ বিচার-বিমর্ষে কালাতিপাত করিতেছেন—এমন সময়ে নগরোপান্তে এক উপবনের পার্শ্বে সদাপ্রফুল্ল সুস্থকায় এক ভিক্ষুকে দর্শন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়াই বুদ্ধের মোহজাল কাটিয়া গেল। তিনি অতঃপর ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। প্রাণাধিক পত্নীর যশোধরার প্রণয়-পাশ তাহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। ফুল্ল-কমল তরুণ কুমার রাহুলের মুখচ্ছবি আর তাঁহাকে সংসারে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিতে স্থিরসংকল্প হইলেন। বিশ্বের গান তাঁহার হৃদয়ের তারে বাজিয়া উঠিল। পত্নীর প্রেম-পাশ, স্নেহাস্পদ তনয়ের মোহ আর তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। রাজ-কুমার বিলাসের শত বেষ্টনের মধ্যে এক অপরিসীম যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন।



বুদ্ধের ভোগবিলাস

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাজ শুদ্ধোদন রাজকুমারকে সংসারাসক্ত রাখিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার যথোচিত বিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রমোদাগারে রূপযৌবনশালিনী সহচরীগণ তাঁহাকে চামর ব্যজন করিত, এবং তাহা-দের ললিত কণ্ঠের প্রাণোন্মাদকর সংগীত-সুধা-ধারায় তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু চকিতে বিশ্বের আহ্বানে আত্মভোলা যুবকের রূপের নেশা—যৌবনের মদির মোহ কাটিয়া গেল। রাজকুমার সিদ্ধার্থের বিবেকবিক্ষুব্ধ প্রাণপাখী আজ সংসারের মায়াপিঞ্জরে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।



বিচারমগ্ন কুমার সিদ্ধার্থ

শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা অঙ্কিত।

কুমারকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া যশোধরা নিদ্রিতা—সহচরীগণ সকলেই সুখসুপ্ত। সহসা সিদ্ধার্থের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি নিদ্রিতা পত্নীর প্রণয়-পাশ ছিন্ন করিয়া প্রমোদাগার হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার প্রমোদাগারের দ্বারদেশে যে-সকল ভল্লধারিণী নারী-প্রতিহারী ছিল, সিদ্ধার্থ তাহাদের একজনকে আদেশ করিলেন—"শীঘ্র সারথি ছন্দককে ডাকিয়া আন।"

অবিলম্বে সারথি আসিয়া প্রণিপাত করিলেন। সিদ্ধার্থ ছন্দককে অশ্ব প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পার্শ্বে বজ্রপাণি ইন্দ্র এবং সম্মুখে চারি লোকপাল। পুরোভাগে ধনুষ্পাণি 'মার' দণ্ডায়মান।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তু হইতে ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তখন পূর্ব্বদিকে উষার আলো দেখা দিয়াছে। সিদ্ধার্থের হৃদয়ে নবজীবনের যে আলোক পড়িয়াছে—তাহারই শুভ্র কিরণে সিদ্ধার্থের প্রাণ আজ নির্ম্মল, উদার। সিদ্ধার্থ অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "প্রিয়-সখে ছন্দক, তোমরা আর আমার অনুবর্ত্তন করিও না— রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হও।" প্রিয় অশ্ব কণ্টকের পৃষ্ঠে হস্তামর্ষণ করিয়া স্নেহভরে কহিলেন—"বৎস




ছন্দক ও কণ্টকের অন্তিম প্রণাম

সিদ্ধার্থ নগর-প্রান্তে আসিয়া দেখিলেন, নগরের প্রবেশ-দ্বার অর্গলাবদ্ধ রহিয়াছে। অবিলম্বে নগর-দেবতা আসিয়া তোরণ-দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া দিলেন। সিদ্ধার্থ তদীয় প্রিয় অশ্ব কণ্টকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিয়াছেন। পশ্চাতে প্রিয় ভক্ত ছন্দক ছত্র ধারণ করিয়া চলিতেছেন। পাছে অশ্বের পদধ্বনিতে নাগরিকদের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় দুই যক্ষ ছন্দকের পদধ্বনি নিবারণের জন্য পদ-নিক্ষেপ-স্থানে আপনাদের হাত পাতিয়া দিতেছে। ছন্দকের

কণ্টক, আমি তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি। আজ তোমাদের নিকট চির-বিদায় গ্রহণের সময়ে আমার সব কথা মনে পড়িতেছে। যাও রাজধানীতে ফিরিয়া যাও।" এই কথা বলিতেই কণ্টক সম্মুখের চরণদ্বয় অবনত করিয়া নতমুখে সিদ্ধার্থের পদ চুম্বন করিল। প্রিয় সারথি বিহ্বল নেত্রে সিদ্ধার্থের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজোচিত বেশভূষা ছন্দকের হস্তে

প্রদান করিয়া মস্তকের কেশরাশি কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন।

সিদ্ধার্থ গভীর বনে প্রবেশ করিয়া ঘোর তপস্যায় নিরত হইলেন। সাধারণ তপস্যায় তাদৃশ উন্নতির আশা নাই দেখিয়া সিদ্ধার্থ ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপ কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁহার দেহ কঙ্কালসার হইয়া পড়িল।



তপস্বী বুদ্ধ

ক্রমে বুদ্ধ দেখিলেন, ব্রত-উপবাসে শরীরকে ক্ষীণ করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয় না। এই বিবেচনা করিয়া বুদ্ধ পূর্ব্বের ন্যায় আহার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার সহচারী পাঁচ জন ভিক্ষু তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সারনাথে চলিয়া গেলেন। অতঃপর বুদ্ধ আধ্যাত্মিক উন্নতির অভিলাষে বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়া বোধিবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলন। পথিমধ্যে "স্বস্তিক" নামক এক ঘাসিয়াড়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। স্বস্তিক বুদ্ধদেবকে কতকগুলি ঘাস উপহার দিল। বুদ্ধদেব সেই ঘাসগুলি বোধিবৃক্ষের তলে বিছাইয়া তদুপরি উপবেশন করতঃ ঘোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন।

এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম-শত্রু 'মার' সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, যদি এই ভীষণ তপস্যার ফলে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধপদ লাভ করেন তাহা হইলে কেবল ইনিই মুক্ত হইবেন না—ইঁহার পবিত্র আদর্শে অন্য মানবগণেরও নির্ব্বাণ দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইবে তাহা হইলে আমার অধিকার কোথায় থাকিবে! এইরূপ চিন্তা করিয়া 'মার' নানা প্রকারে বুদ্ধের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মারের শত প্রলোভনেও বুদ্ধের তপস্যা ভঙ্গ হইল না। ইহা দেখিয়া 'মার' বুদ্ধকে বিনাশ করিবার জন্য আপনার সৈন্যগণকে আদেশ প্রদান করিল। মারের ভীমমূর্ত্তি সৈন্যগণ বুদ্ধদেবকে আক্রমণ করিলে তিনি ভূমি স্পর্শ করিয়া কহিলেন—"যদি পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতিবশতঃ এই আসনে উপবেশন করিবার তাঁহার অধিকার থাকে তবে ধরিত্রীদেবী তাহার সাক্ষ্য হউন।" বুদ্ধদেবের এই কথা শেষ হইতেই পৃথিবী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া করজোড়ে বুদ্ধের সমীপে আগমন করতঃ মারের সম্মুখে বুদ্ধের পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিবামাত্র মার ও তাহার ভীষণমূর্ত্তি সৈন্য সকল সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইল।

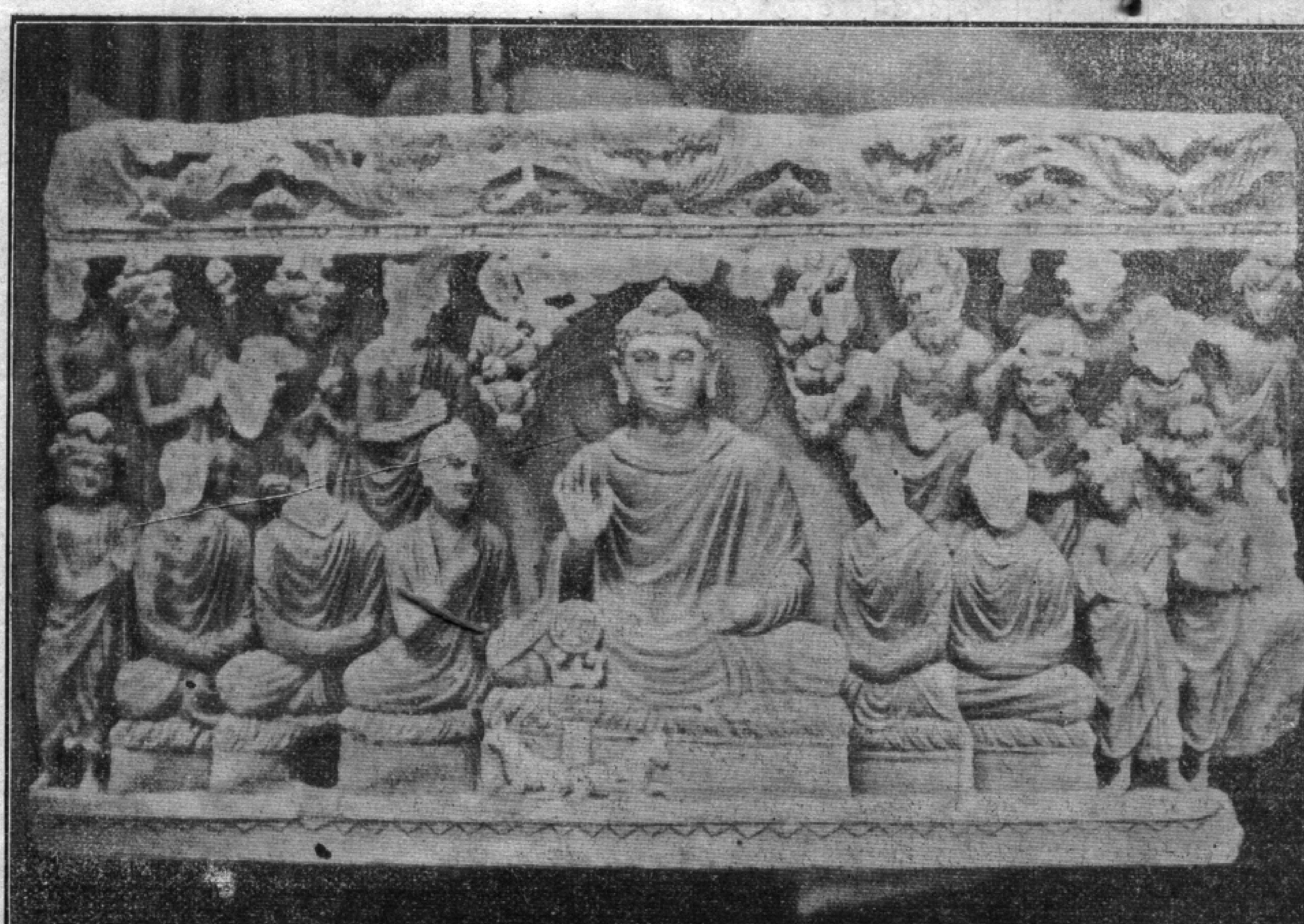
'সম্যক্‌সম্বুদ্ধ' এই পদ প্রাপ্তির পর বুদ্ধদেব তদায় ধর্ম্মোপদেশ প্রথমে কাহাকে দান করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন শিষ্যের



মারের আক্রমণ

কথা মনে পড়িল। বুদ্ধ ধ্যান-যোগে জানিতে পারিলেন, এক্ষণে তাঁহারা মৃগদাব ( সারনাথ ) নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে-ছেন। ইহা জানিয়াই তিনি সারনাথে গমন করিলেন এবং আপনার ধর্ম্মোপদেশ প্রথমে উক্ত পাঁচজনকে প্রদান্ করিলেন। বুদ্ধদেবের জীবনের এই ঘটনা "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন" নামে প্রসিদ্ধ।

কাশ্যপ নামধেয় এক তপস্বী বহু শিষ্যসহ উরুবিল্ব নামক এক গ্রামে বাস করিতেন। বুদ্ধদেব উক্ত উরুবিল্ব গ্রামে আগমন করিয়া কাশ্যপ ও তদীয় শিষ্যগণকে স্বীয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু কাশ্যপ



বুদ্ধের প্রথম উপদেশ

ও তদীয় শিষ্যগণ বুদ্ধদেবের প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া অগত্যা বুদ্ধদেবকে কতকগুলি সাধনা ও অলৌকিক দৃশ্য দেখাইতে হইয়াছিল। তপোবনের একপার্শ্বে একটি অগ্ন্যাগার ছিল। সেই গৃহে এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ সর্প থাকিত। কাশ্যপ ও তদীয় শিষ্যগণ সেই সর্পের ভয়ে ঐ গৃহে প্রবেশ করিতেন না। বুদ্ধদেব আপন শক্তির পরিচয় দিবার জন্য উক্ত অগ্নি-গৃহে বাসের জন্য কাশ্যপের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কাশ্যপ সেই ভয়ানক কৃষ্ণসর্পের কথা উল্লেখ করিয়া বুদ্ধদেবকে উক্ত গৃহে থাকিবার জন্য সম্মতি দিতে পরিলেন না। বুদ্ধ কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর অগত্যা কাশ্যপ সম্মতি দান করিলেন। তখন বুদ্ধ সেই গৃহ মধ্যে আসন বিস্তৃত করিয়া উপবেশন করিলেন। অমনি তাঁহার শরীর হইতে এরূপ জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল যে, সেই জ্যোতি দেখিয়া সর্প ভীত হইয়া পড়িল এবং বুদ্ধের পদানত হইয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্রের নিম্নদেশে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ বুদ্ধের দেহনির্গত এই অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতি দেখিয়া মনে করিলেন, হয়ত সেই গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা সেই আগুন নিবাইবার জন্য জলপূর্ণ কলসী লইয়া দৌড়িয়া আসিলেন। অবশেষে তাঁহারা যখন জানিতে পারিলেন ইহা অগ্নি নয়—বুদ্ধের দেহনির্গত জ্যোতি—তখন তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বুদ্ধের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

এইরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে বুদ্ধের জননীর কথা মনে হইল। বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন তাঁহার জননী এখন ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে রহিয়াছেন। মাতাকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বুদ্ধ উক্ত স্বর্গে গমন করিলেন এবং তিনমাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া মাতাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাদান করিলেন। যখন তাঁহার পৃথিবীতে অবতরণের সময় উপস্থিত হইল, তখন দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মাকে স্বর্ণময় সোপান নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত উক্ত তিনটি সোপান-শ্রেণী দিয়া বুদ্ধদেব এবং তৎসহ দেবরাজ ইন্দ্র ও প্রজাপতি ব্রহ্মা সংকাশ্য ( বর্ত্তমান সংকীসা—জেলা ফরাক্কাবাদ ) নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের খুল্লতাত ভ্রাতা দেবদত্ত বুদ্ধদেবের যশঃ ও সম্মান দর্শনে ঈর্ষানলে দগ্ধ হইত। দেবদত্ত তিন তিন বার বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হয় নাই। একবার, যখন বুদ্ধ রাজগৃহের রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দেবদত্ত বুদ্ধদেবের প্রাণবিনাশের জন্য "নালগিরি" নামক এক মত্ত হস্তীকে প্রেরণ করিল। নালগিরি নগরের তোরণদ্বারে প্রবেশ



বুদ্ধ ও হারিতী

করিবামাত্র বুদ্ধদেব ঐ হস্তীর মস্তকদেশে আপন হস্তামর্ষণ করিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

হারিতী নাম্নী এক যক্ষিণী প্রতিদিন রাজগৃহ হইতে এক-একটি শিশু চুরি করিয়া ভক্ষণ করিত এবং আপনার পাঁচশত সন্তানকেও খাওয়াইত। হারিতী নিজ সন্তানগণের প্রতি অতিশয় স্নেহপরায়ণা ছিল, কিন্তু অপরের সন্তানের প্রতি তাহার ব্যবহার ভাল ছিল না। রাজগৃহের অধিবাসিগণ বুদ্ধদেবকে এই ব্যাপার নিবেদন করিলে একদিন বুদ্ধদেব হারিতীর প্রিয়তম সন্তানটিকে লুকাইয়া রাখিলেন। হারিতী সাতদিন সাতরাত্রি আপনার সন্তানকে খুঁজিয়াও কোথাও দেখিতে পাইল না। তাহাদের সন্তানের জন্য কত কাতর হয়!" বুদ্ধদেবের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া হারিতীর নির্দ্দয় হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল এবং আপন দুষ্কার্য্যের জন্য নতজানু হইয়া সে বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে হারিতী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

বুদ্ধদেব যখন ইন্দ্রশৈল নামক পর্ব্বতের এক গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র একদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য স্বীয় অনুচরগণ সহ আগমন করিয়াছিলেন।

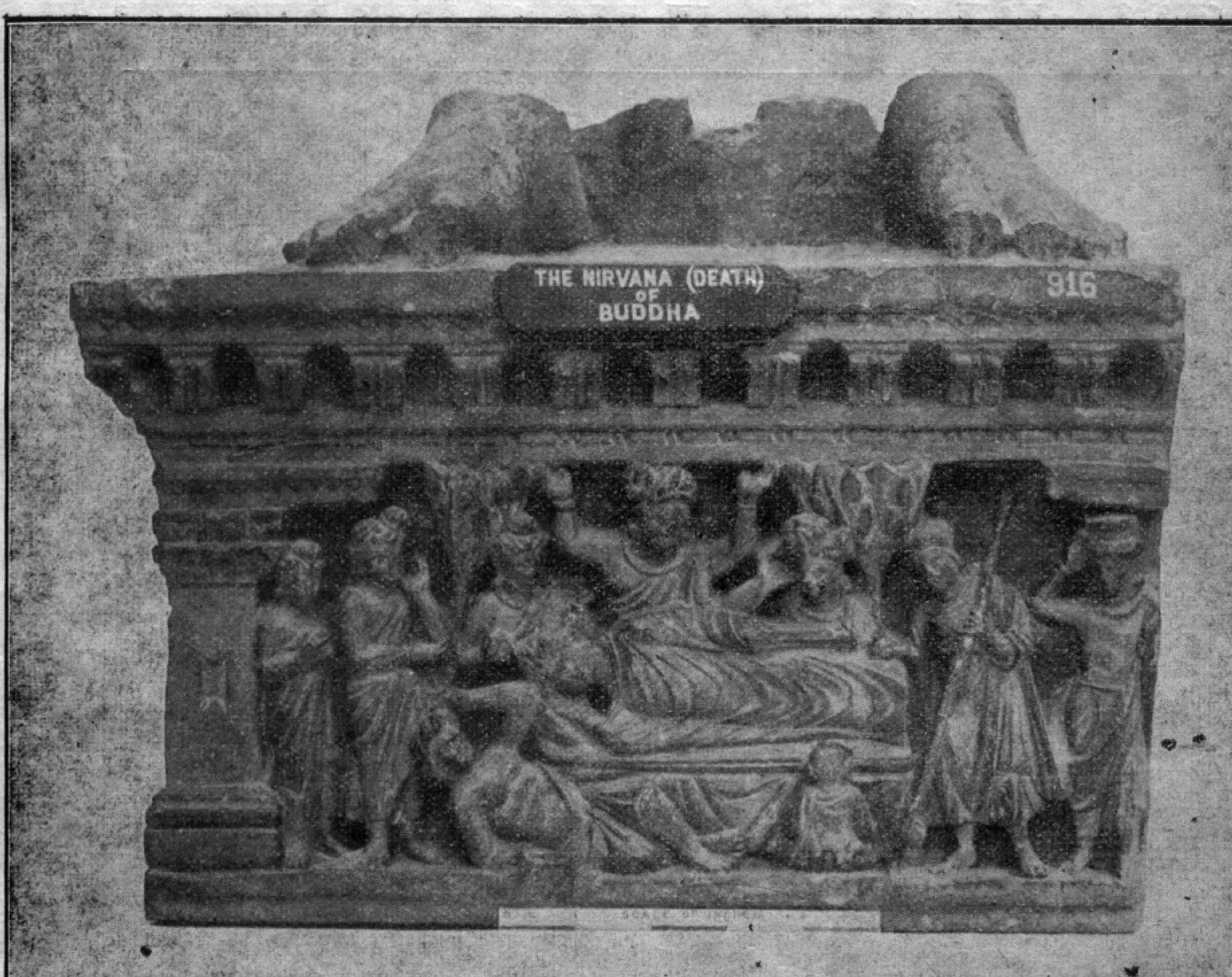
অতঃপর বুদ্ধদেব যখন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কুশীনগর অভিমুখে আসিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে 'পাওয়া' গ্রামে চুন্দ নামক এক কর্ম্মকার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করে। চুন্দ



বুদ্ধের শব

তখন হারিত বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাহার পুত্রের কথা জানাইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "তোমার পাঁচশত পুত্র—কিন্তু তুমি একটি পুত্রের জন্য এত কাতর হইয়াছ—মনে করিয়া দেখ, তুমি যাহাদের সন্তানকে ভক্ষণ কর তাহারা অন্ন ও শূকর মাংস আনিয়া উপস্থিত করিল। বুদ্ধদেব শূকর মাংস নিজে গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্ট ভোজ্যদ্রব্য স্বীয় শিষ্যগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। শূকর মাংস ভোজন করিয়া বুদ্ধদেবের উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে

লাগিল। অবশেষে তাঁহার ভয়ানক আমাশয় হইল। কুশীনগর পৌছিতে পৌছিতে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি চলচ্ছক্তিহীন হইয়া অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত একা উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। দুই শালবৃক্ষের তলদেশে বুদ্ধদেবের শয্যা বিস্তৃত হইল। বুদ্ধদেব ঐ শয্যায় উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু এই শয্যাই তাঁহার অন্তিম শয্যা হইল! বুদ্ধদেব সেই সময় আপনার প্রধান শিষ্য 'আনন্দ'কে ভবিষ্যতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ও সংগঠনের উপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব বলিলেন—"বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত আমি যে চারিটি স্থানের নাম করিতেছি, উত্তর কালে এই চারিটি স্থান বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইবে।" এই বলিয়া তিনি (১) লুম্বিনী (২) গয়া (৩) সারনাথ (৪) কুশীনগর (বর্ত্তমান কসিয়া নামক গ্রাম—জেলা গোরখপুর) এই চারি স্থানের কথা আনন্দ ও সমবেত শিষ্যগণকে বিজ্ঞাপিত করিলেন।



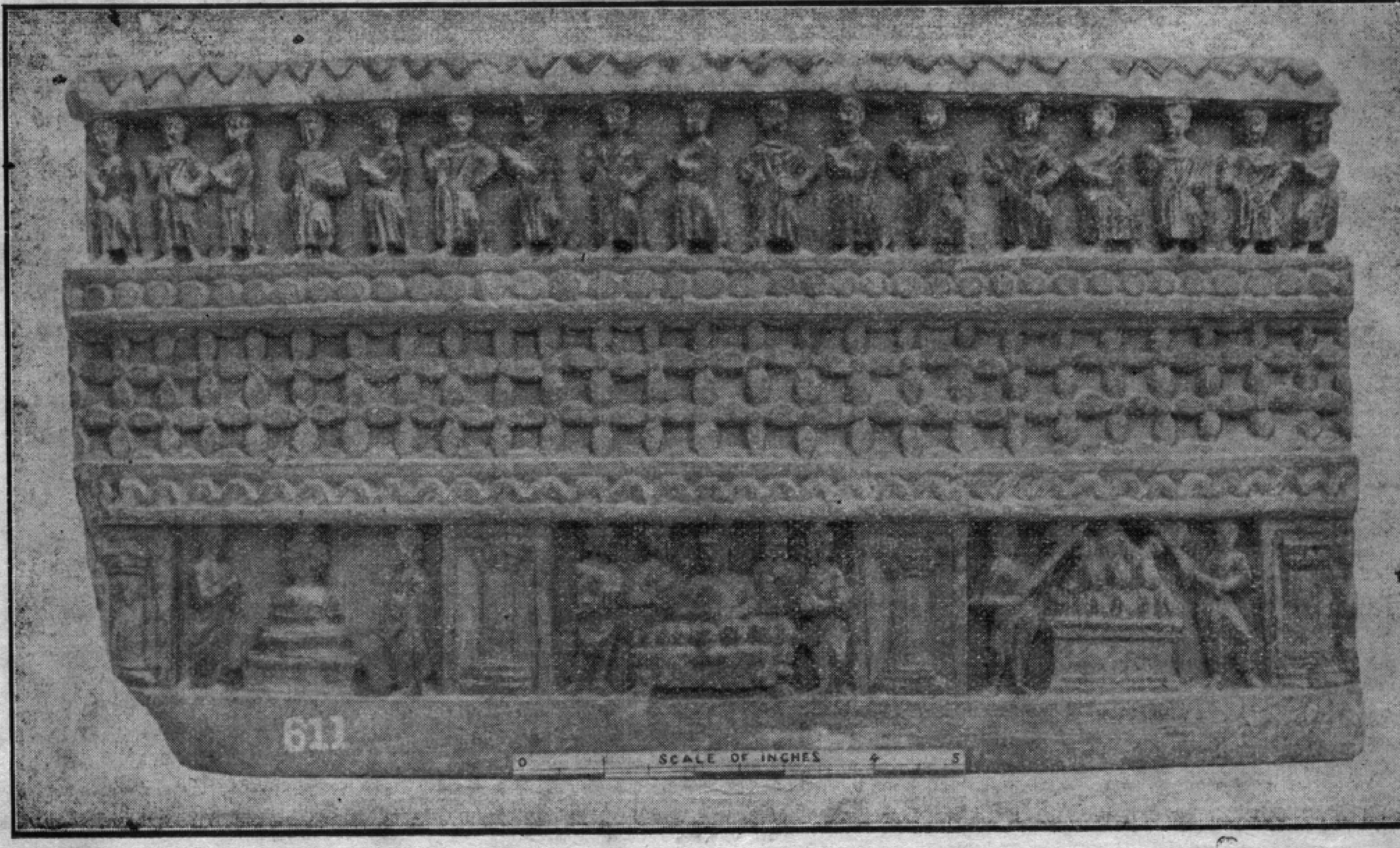
বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভ

বুদ্ধদেবের আর কথা কহিবার শক্তি নাই। একদিন তিনি শালবৃক্ষের তলদেশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন—আর আজ অশীতি বর্ষ পরে অন্য শালবৃক্ষের তলদেশেই তিনি নির্ব্বাণ পদ লাভ করিলেন।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে 'সমুদ্র' নামক এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত গ্রহণের আশায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সমুদ্রই তাঁহার অন্তিম শিষ্য।

মহাসমারোহে বুদ্ধদেবের অন্তিম সংস্কার সম্পাদিত হইল। বুদ্ধদেবের শব বহুমূল্য বস্ত্র দ্বারা ৫০০ পাঁচ শত বার জড়ানো হইয়াছিল। অতঃপর তাহা এক লৌহময় তৈল-দ্রোণিতে রক্ষিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে স্থাপিত হইল। এই তৈলদ্রোণির উভয় পার্শ্বে দুই মল্লবংশীয় সর্দ্দার দণ্ডায়মান থাকিয়া দুগ্ধধারায় অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন।

সর্ব্বগ্রাসী বৈশ্বানরের লেলিহান জিহ্বায় বুদ্ধদেবের ত্রিলোকপালন পবিত্র দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। অতঃপর সেই পবিত্র দেহের ভস্মাবশেষ লইয়া মল্লদেশবাসিগণের সহিত তাঁহার শিষ্যগণের ঘোর বিবাদের সূত্রপাত হইল। অবশেষে দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশানুসারে বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ অস্থিগুলি সমান অষ্টাংশে বিভক্ত হইয়া আট জাতির মধ্যে বিভক্ত হইল। ঐ অস্থিরাশির উপর প্রত্যেক জাতি এক এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। রাজগৃহ, বৈশালী,



বুদ্ধের শবদাহ ইত্যাদি

কপিলাবস্তু, অল্লকপ্প, রামগ্রাম, বেঠদীপ, পাওয়া ও কুশীনগর এই আট স্থানে উক্ত স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে—গত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ারের নিকটে কনিষ্ক স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের কিছু অস্থি পাওয়া গিয়াছিল। *

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

## প্রেম-ছুট্

আমি আজ বলবো হেথায়
ব্যথার কথা গানের সুরে—
শুনে ফুল মুগ্ধ হবে, স্তব্ধ হবে,
পড়বে ঝুরে!
দেখো, সব মৌন থেকো,
নয়নে নয়ন রেখো—
অধরের হাসিটিরে
ফুটিয়ে তুলো গানের সুরে!

জীবনে প্রথম যখন
প্রেমের হাওয়া উঠলো মেতে—
নয়নে পড়লো তখন
বাগানে কচুর ক্ষেতে—
ঘন কালো নয়ন-তারা
আমারে করলো সারা
চললো নিয়ে স্বপন-পুরে!

কিছুকাল নীরব হয়ে
কত কি ভাবি একা,
আকাশে থাকি চেয়ে
খাতা-ভরা কাব্য লেখা—
ঘুরে মরি কচুর ক্ষেতে
ভুলে যাই নাইতে খেতে,
পাই না সময় রাত দুপুরে!

* এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি লাহোর ও কলিকাতা মিউজিয়মস্থিত প্রস্তর মূর্ত্তি হইতে গৃহীত।

অবশেষে মিল্ল দেখা
বাগানে গভীর রাতে
নীরবে আছে একা
ভরা এক কলসী হাতে—
অমনি দিলাম পাড়ি
বাঁচি মরি কিম্বা পড়ি
ছিট্‌কে গিয়ে অনেক দূরে !

যতবার ডাকি তারে
মুখে তার নাইক কথা—
কাঁপে সে বারে বারে
ঝড়েতে পত্র যথা—
যেমনি সোহাগ-ভরে
ডেকেচি হাতটি ধরে
উচ্চরবে পড়লো ঘুরে !

বাগানের মালী গাধা
বাবা আর খুড়ো মশাই,
ও পাড়ার মদন দাদা—
তখনি এল সবাই—
প্রিয়ারে তুলে নিল,
আমারো কান ধরিল
চড় মারিল সবাই জোরে—
প্রণয়ের স্বপন আমার
ভাঙ্গলো সেবার এম্‌নি করে !

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

## ধিক্কার

সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়ছিলাম। কোথা থেকে গানের সুর কানে গেল।

সব-ছোটটীকে দোলায় ঝুলিয়ে, তার বড়টীকে পিঠে ঝুলিয়ে তাদের বড় একটীর হাত ধরে ও আরো দু-একটীকে সঙ্গে করে' যে-সব বেদের মেয়েরা বাড়ী-বাড়ী গান গেয়ে ভিক্ষা সেধে ফেরে, এ তাদেরই কারো গলা। শুধু গলা চেনা নয়, বুঝলাম, এর সুরও মুখস্থ।

মেয়ে মানুষের মিঠে গলায় বিধুর একটু সুর শুধু শুনলাম – গানের কথা সব ধর্‌তে পারলাম না। অনেকখানি স্পষ্ট বোঝা গেল, তার ধুয়োটা—যার সঙ্গে আরো একটা তীক্ষ্ণ মধুর আওয়াজ ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠছিল—জয়জয় সীতারাম।

কাছে থেকে দূরে আরো দূরে যেতে যেতে শেষে দিনের কোলাহলের মধ্যে সুর মিলিয়ে গেল। তবু যেন মনে হতে লাগল আকাশে বাতাসে তার ঝঙ্কার বাজচে। ধুয়োটা তখনো থেকে থেকে কানে আসছিল—সেই কচি গলার শাণিত সুরটুকু যেন বিজলী-রেখার মত চকিতে কানের কাছ দিয়ে চম্‌কে যাচ্ছিল।

কানে শুধু বাজছিল সেই তান আর মন আপনা-আপনি গেয়ে যাচ্ছিল তার আপনার গান। কত কালের যে! সেই অতি-দূর অতীতের অমর জীবন-নাট্যখানি সেই ব্যর্থ অভিষেক-উৎসব, সেই বনবাস, সেই বিরহ, সেই অগ্নি-পরীক্ষা, সেই নির্ব্বাসন, সেই পাতাল-প্রবেশ ধীরে ধীরে তার আপনার ভঙ্গীতে আপনার সঙ্গীতে অভিনীত হয়ে যাচ্ছিল! আমি শুনছিলাম সেই তরুণ তপস্বী লব-কুশ রাজ-সভায় দাঁড়িয়ে তাদের বীণা-নিন্দিত মিলিতকণ্ঠে যে ব্যাপ্ত বিষাদ-গাথা গেয়ে যাচ্ছিল, আর দেখছিলাম সিংহাসনে বসে সেই রাজার চোখ ক্ষণে ক্ষণে জলে ভরে' আস্‌চে—

—বলি, দাদা, তোমার হয়েচে কি! আপিস নেই নাকি? নিমেষের মধ্যে চমক ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, নটা বেজে ছত্রিশ মিনিট হয়ে গিয়েছে!

অতঃপর কোন রকমে মাথায় একঘটি জল ঢেলে দুটো ভাত নাকে-মুখে গুঁজে, জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। সারা পথ তার পর ভেবে বুঝতে পারলাম না, কি কাজে আমার না হল খবরের কাগজ পড়া, না হল দুটী খিদের ভাত খাওয়া আর কোন্ পাপেই বা ট্রামের পয়সা ক'টা আমায় দণ্ড দিতে হল এবং বড় বাবুর মিষ্ট সম্ভাষণই বা শুন্‌তে হবে কোন অপরাধে! ভাবতে ভাবতে আপনার মনে আপনি ধিক্কার জাগতে

# বিক্রমশীলার তিব্বতী পণ্ডিত

বাংলার বড় বড় বিদ্যার কেন্দ্রের মধ্যে বিক্রমশীলার মঠ খুব উল্লেখযোগ্য। বাংলার রাজা ধর্ম্মপাল এই মঠটীর স্থাপনা করেছিলেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। বিক্রমশীলার স্থান-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। অনেকের মতে এটী ভাগলপুর জেলায় পাথরঘাটা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। এ বিষয়ে ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও নন্দলাল দে মহাশয়ের মত উল্লেখযোগ্য।

এই বিক্রমশীলার মঠ থেকে নানান্ পণ্ডিত তিব্বত দেশে গিয়েছিলেন সদ্ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্যে। আবার তিব্বত থেকে, চীন থেকে নানান্ পণ্ডিত এসেছিলেন এখানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করবার জন্যে। তিব্বত থেকে যে সব ভিক্ষু ছাত্র-হিসাবে বিক্রমশীলার বিহারে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেবল একজনের কথা আজ আমরা বলব। তিনি হচ্ছেন—ভিক্ষু ধর্ম্মকীর্ত্তি।

ধর্ম্মকীর্ত্তি নামটী শুনতে ভারতবাসীর মত হলেও, আসলে ইনি ভারতীয় নন। তিনি তিব্বতীয়, কেন না আমরা জানি, তাঁর বাড়ী ছিল "খমস" প্রদেশে। এখন এ "খমস" প্রদেশটী কোথায়? রায় বাহাদুর ৺শরৎচন্দ্র দাস তাঁর তিব্বতী অভিধানে বলেন—এ প্রদেশটী তিব্বতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। যদি তাঁর বাড়ী তিব্বতে হয়, তবে আমরা তাঁকে ভারতবাসী বলে দাবী করতে পারি না, করলে ইতিহাসের অবমাননা হবে।

বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে আর একজন ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ আমরা পাই। তিনি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্নাগের শিষ্য ছিলেন; আর নিজেও খুব বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। কিন্তু আসলে বিক্রমশীলার বিহারের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না। তবে বোধ হয় নালন্দার মঠের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ ছিল, কারণ কিছুকাল তিনি ধর্ম্মপালের শিষ্য ছিলেন। এই ভিক্ষু ধর্ম্মপাল, শীলভদ্রের আগে নালন্দা বিহারের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। সুতরাং এই ধর্ম্মকীর্ত্তির বোধ হয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কিছু যোগ ছিল, কিন্তু বিক্রমশীলার সঙ্গে কিছুই ছিল না, কারণ যদি লামা তারানাথের কথা আমাদের মানতে হয় তবে বলতে হবে যে, এই ভারতীয় ধর্ম্মকীর্ত্তির জীবিতাবস্থায় (৭ম শতাব্দীতে) বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মই হয় নি (বিক্রমশীলার জন্ম ৮ম শতাব্দীতে)। তাহলে মানতে হয় যে ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত ধর্ম্মকীর্ত্তির সঙ্গে বিক্রমশীলার বিহারের কোন যোগ ছিল না।

তিব্বতী পণ্ডিত ধর্ম্মকীর্ত্তির বিক্রমশীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ফরাসী পণ্ডিত P. Cordier তিব্বতী ত্রিপিটকের যে তালিকা প্রকাশিত করেছেন, তাতে আমরা তিব্বতবাসী ধর্ম্মকীর্ত্তির কথা পাই। তাতে দেখি যে তিনি বিক্রমশীলার বিহার থেকে একখানি সংস্কৃত বই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এই বইটীর নাম—"সময়পঞ্চ"—সেখানির রচয়িতা আচার্য্য পদ্মসম্ভবপাদ। আরও দেখি, তাঁর এক উপাধি ছিল—"নোৎসব" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত তিব্বতী ভিক্ষু, অনেক সময় তিনি দোভাষীরও কাজ করতেন। সম্ভবতঃ ভিক্ষু ধর্ম্মকীর্ত্তি তিব্বত থেকে বিক্রমশীলার মঠে সংস্কৃত ভাষা শিখ্তে আসেন, আর পরে বিক্রমশীলার মঠে কিছুকাল অবস্থান করে সংস্কৃত বৌদ্ধ পুঁথি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদ কখন তিনি নিজেই করতেন, আবার কখন অন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাহায্য করতেন। আমরা দেখতে পাই যে তিনি যখন "কালচক্রাবতার নাম" পুঁথিটী অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন, তখন সেই পুঁথির রচয়িতা অভয়কর গুপ্ত তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। সেই অভয়কর গুপ্ত তাঁকে সাহায্য না করলে, তিনি বোধ হয় অনুবাদ-কার্য্যে অগ্রসর হতেন না। অভয়কর গুপ্ত সম্ভবতঃ ১১২৫ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁর তারিখ সম্বন্ধে J. A. S. B. 1882, p. 16 ও Cordier's Tibetan Catalogue (v. III, p. 314) দ্রষ্টব্য। যদি আমরা অভয়করকে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলে ধরি, তবে তিব্বতী ধর্ম্মকীর্ত্তিকেও আমরা সেই যুগের মানুষ বলতে পারি।

আর একখানি বই—"আর্য্য মঞ্জুশ্রী নাম-সংগীতি-বৃত্তি-অমৃত-বিন্দু-প্রত্যালোক নাম"—অনুবাদের সময় অনুবাদক

সুগতশ্রীকে তিনি সাহায্য করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কেবল দোভাষীর কাজ করেছিলেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তি এই বইগুলি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন, মূল সংস্কৃত বইগুলি ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা :—

(১) শ্রীবুদ্ধ কপাল মহাতন্ত্র-রাজটীকা অভয়পদ্ধতি নাম ( ২য়, পৃঃ ১০৭ )

(২) অষ্টাদশ পটল ব্যাখ্যান ( ২য়, পৃঃ ১৪৫ )

(৩) দশতত্ত্ব ( ২য়, পৃঃ ১৫৫ )

(৪) বাদিরাজ সাধন ( ৩য়, পৃঃ ৪-৫ )

(৫) মহারাজ ডীডামঞ্জুশ্রী সাধন ( ৩য়, পৃঃ ৫ )

(৬) বিদ্যাধর-পিটক-সংক্ষিপ্ত-মঞ্জুশ্রী-সাধন (৩য়, পৃঃ ৫)

(৭) মঞ্জুশ্রী প্রজ্ঞোপক্রম ( ৩য়, পৃঃ ৫ )

(৮) বজ্রানঙ্গ মঞ্জুঘোষ-সাধন ( ৩য়, পৃঃ ৬ )

(৯) ধর্ম্মধাতু বাগীশ্বর সাধন ( ৩য়, পৃঃ ৬ )

(১০) আর্য্য-মঞ্জু-বজ্র সিদ্ধৈ-কবীর-সাধন ( ৩য়, পৃঃ ৬ )

(১১) মঞ্জুশ্রী প্রজ্ঞাচক্র-সাধন ( ৩য়, পৃঃ ৬ )

(১২) সদ্যোঽনুভবার পচন সাধন ( ৩য়, পৃঃ ৭ )

(১৩) কৃষ্ণযম [ারি] সাধন ( ৩য়, পৃঃ ৭ )

(১৪) " " ( ৩য় পৃঃ ৭ )

এ অনুবাদ ছাড়া নীচের বইগুলি তিনি নিজে সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন বলে প্রকাশ, হয় ত এগুলি অন্য ধর্ম্মকীর্ত্তির লেখা :—

(১) বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ স্তোত্র ( ২য়, পৃঃ ১১ )

(২) শ্রীহেবজ্র মহাতন্ত্ররাজস্য পঞ্জিকা নেত্রবিভঙ্গ নাম ( ২য়, পৃঃ ৬৯ )

(৩) সূত্রবিধি ( ২য়, পৃঃ ২৫৯ )

(৪) নাম-সংগীতি-নাম-সাধন ( ২য়, পৃঃ ২৮১ )

এ বইগুলির লেখক—ধর্ম্মকীর্ত্তি, কিন্তু তাঁকে মহা পণ্ডিত ও আচার্য্য বলা হয়েছে। তাই মনে হয় এ চারখানি বই অন্য ধর্ম্মকীর্ত্তির লেখা, আমাদের তিব্বতী পণ্ডিতের নয়, তিনি কেবল সংস্কৃত বই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

---

# ঠেলা-গাড়ী

( Ella Wheeler Wilcox )

দীর্ঘ ক'টা বরষ গেল। একটি ছোট ফুলের কলি
জাগ্‌ল প্রথম পাপ্‌ড়ি মেলে, নাচ্‌ল দু-দিন চলি' চলি',--
তার পরে হায় শুকিয়ে গেল! স্মরণটা তার মনের-গায়
দুঃখ-সুখের স্বপ্ন মত ভাসে আবার তলিয়ে যায়।

খোকার চলে-যাওয়ার পরে তার বিয়োগে বিধুর হিয়া,
সুখের মুকুট পরনু কত কয় বছরের ভিতর দিয়া;
মুয়ে মুয়ে চুমু দিয়ে গেল সে সব হর্ষ যত,—
একটু তবু ব্যথার রেখা করে আমায় মর্ম্মাহত।

এখন যদি গোল-দীঘি বা পটল-ডাঙার পথের ভিতে
ঠেলা-গাড়ী-চড়া কোনো খোকায় দেখি আচম্বিতে,
রাজার মতন বসে হেসে, চল্‌ছে ঠেলা-গাড়ী চড়ে'—
ছাঁৎ ক'রে মোর মনের মাঝে একটু স্নেহ উথ্‌লে পড়ে।

বোধ হয়, যেন ফিরে গেছি সেই ফাগুনের সাঁঝের কোলে,
আর সে খোকন, এসে ধরায় হঠাৎ যে গো গেছে-চ'লে—
সেই যেন যায় হাওয়া খেতে! বেরিয়ে সুদূর পথের 'পরে
মর্‌চি কেন? মরেনি ত, জীবন্ত তায় দেখ্‌চি ওরে

স্মরণ করি হরির চরণ, যতই দূরে চলে গাড়ী—
ভাবনা আমার, আশীষ আমার, পিছে পিছে যায় যে তারি।
কারণ আমি জানি এটা—দৈবী কোন মায়ার ধোঁকা,
(নাম জানি বা নাই বা জানি) ঐ খোকা ও আমার খোকা!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

# সাঁওতাল

১

শেখরপুরের বুড়ো শিবতলায় সখের থিয়েটারে প্রবোধ সখী সাজিয়া নৃত্যকলা সাধন করিত এবং তাহাতেই তাহার দিনগুলা নিষ্কণ্টকে কাটিয়া যাইতেছিল। বয়স তাহার কুড়ি কিম্বা একুশ, বাইশও হইতে পারে। মুখ খানি সুন্দর গোলগাল। সদ্য-ঘুম-ভাঙা ভোরের মত গোঁফ-দাড়ি ঈষৎ দেখা দিতেছিল।

সংসারে সে ছিল একা। বাপ, মা, কেহই ছিলেন না; তাহাতে ব্যথিত বা ক্ষুণ্ণ না হইয়া পিতৃমাতৃহীন অবস্থাটাকেই সে ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। কারণ হাসি ছাড়া আর কিছুই সে জানিত না, প্রমোদ ছাড়া আর কিছু সে ভাল বাসিত না।

বাড়ীর পাশে এক জাঠতুতো ভাই থাকিতেন; তিনি মাঝে মাঝে তাহার খবরাখবর লইতেন। ইদানীং বছর তিনেক হইতে তিনিও দেশ-ছাড়া, কি একটা ব্যবসার বড় বাবু হইয়া ছোটনাগপুরের জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা শেখরপুরে থাকিলেও, প্রবোধের সহিত তাহাদের বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হইত না। বিশেষ, তাঁহার স্ত্রীর নিকট সে গা-ঢাকা দিয়া বেড়াইত, যেহেতু প্রবোধকে দেখিলেই তিনি একটা না একটা কিছু ফরমাস করিয়া বসিতেন।

একদিন প্রায় বেলা এগারোটার সময় আড্ডা বেজায় জমিয়া গিয়াছে, দশ-পনেরো জন বন্ধুর মহলা, সিগারেটের ধোঁয়ায় চারিদিক ধূমাচ্ছন্ন, কন্‌সার্ট বাজনা রণোৎফুল্ল অশ্ববৃন্দের ন্যায় অবাধে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং প্রবোধ নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে,

আমি পিয়াস নাশিতে জল উপাসিনু,
উঠিল কপালে গরলরাশি—

এমন সময় বাহিরে কে একজন আড্ডা-ঘরের অর্গলবদ্ধ দরজাটায় ঘন ঘন করাঘাত করিতে লাগিল। বিষম বিরক্ত হইয়া থিয়েটারের একজন দ্বার খুলিয়া দেখে, প্রবোধের দাদার চাকরটা নির্লজ্জের মত হাসিতেছে। হাসিয়াই যদি সে ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলেও বা একটা কথা ছিল। কিন্তু সে সোৎসাহে প্রচার করিল যে বাবু দাদাবাবুকে ডাকিতেছেন। 'দাদাবাবু' অর্থে প্রবোধ, এবং 'বাবু' অর্থে প্রবোধের সেই জাঠতুতো ভাইটী। আড্ডা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

দাদা ডাকিয়া খবর দিলেন যে প্রবোধের জন্য একটা চাকুরি জোগাড় করিয়া তিনি তাহাকে লইতে আসিয়াছেন। খবরটা এমন আকস্মিক যে আড্ডা ছাড়িয়া যাইতে প্রবোধের মন একেবারেই সরিতেছিল না। কিন্তু খামকা না-চাহিতে-পাওয়া একটা চাকুরি পায়ে ঠেলাও ত যায় না। প্রবোধকে যাইতে হইল।

২

প্রবোধ যে-দেশে গেল, সে দেশ তাহার চোখে একান্ত অভিনব। সে দেশ বনবাসী পশুপক্ষী এবং বনবাসী সাঁওতাল নর-নারীর সুখ-উচ্ছ্বাসে ও সরল হাসিতে প্রকৃতির বুকে উদাসীন সুখে বাঁধা, রেল-ষ্টেশন হইতে ১৫।২০ মাইল দূরে একটা ক্ষীণ-স্রোতা পাহাড়ে নদীর ধারে। পথের দু'পাশে অনেক বন-জঙ্গল পার হইয়া, অনেক বন্য পশুর হাত এড়াইয়া গো-যানে এই স্থানটিতে আসিতে হয়। পর্ব্বতমালা-পরিবৃত চারিদিকের দৃশ্যটা দূরে অতিদূরে নীল আকাশের গায় মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

প্রবোধের দাদার বাসা সেই নদীর কাছে। প্রবোধের কাজ হইল, সেখান হইতে ক্রোশ দুই দূরে একটা অভ্রের পাহাড়ে প্রত্যহ কুলি খাটানো এবং তাহাদের মজুরির হিসাব রাখা। প্রতিদিন সকালে আটটার সময় ভাত খাইয়া নদীর দু'ধারের বালি ভাঙিয়া নদী পার হইয়া, মহুয়া, শাল ও আমলকী বনের ছায়ায় ছায়ায় প্রবোধকে কর্ম্মস্থানে যাইতে হয়; গিয়া হাজিরা লিখিয়া লইয়া, একটা বড় বটগাছের নীচে একখানা বড় লম্বা পাথরের উপর আড়ভাবে শুইয়া পড়িয়া কখনো সে একটা বাঙলা বই পড়ে, কখনো বা কার্য্য-নিরতা বন্য কুলি-রমণীদের নিঃসঙ্কোচ সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে দ্বিপ্রহরের কোলে অর্দ্ধনিদ্রিত হইয়া পড়ে। বেলা

পাঁচটা বাজিতেই আবার একবার হাজিরা লিখিয়া লইয়া সে দাদার বাসায় ফিরিয়া যায়। আশে-পাশে আরও দুই-চারিজন বাবু থাকিতেন; তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয়, গল্প-গুজব করিয়া সন্ধ্যা কাটে। এই নূতন জীবন-ধারা দিন-কতক মধুর ঠেকিল; কিন্তু বেশী দিন নয়। কারণ এটা এতই একঘেয়ে যে প্রবোধের সখের থিয়েটারী মন উচাটন হইয়া ছোটনাগপুরের বিস্তৃত বন-ভূমির নির্ম্মুক্ত সৌন্দর্য্যের পাশ কাটাইয়া, জাগ্রত স্বপ্নের ছিদ্র দিয়া বুড়ো শিবতলার আড্ডার সেই ঘরটীতে ঘন ঘন গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

এমনই একটা দিনে বাড়ীমুখো প্রবোধ যে পথে রোজ বাড়ী ফিরিত সে পথে না গিয়া এক আঁকা-বাঁকা পথে নদীর আর এক জায়গায় গিয়া উঠিল। সেখানে নদীর বুকে সাদা ও কালো পাথরের মেলা, নানান রঙের ছোট ছোট পাহাড়ও নদীর বুক চিরিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে শীতল স্রোতে নিরন্তর গা ধুইতেছে। সেখানে এই পাহাড়ে নদীর পাড় ও উপকূল পর্য্যন্ত পাহাড়ে ও শিলাময়। অল্প খানিকটা ব্যবধানে যেন কালো-পাথরে-কোঁদা একটী সাঁওতাল যুবক একমনে নদীর প্রস্তরময় পাড় কাটিতেছিল। কিন্তু পাথর কি কোদালের কাছে সহজে পরাস্ত হইতে চায়? প্রত্যেক আঘাত রূঢ় আক্রোশে প্রতিক্ষেপ করিয়া পাথর বিকট শব্দে নির্জ্জন বনভূমি কম্পিত করিতেছিল।

সাঁওতালটীও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই তার উৎসাহ কমিবার নয়। সেইজন্যই একদিকে ছিল বালির ও কুচি-পাথরের একটি ক্ষুদ্র স্তূপ। অবাক হইয়া প্রবোধ তাহার খুব কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাঝি তুমি কি করছ?" সাঁওতাল জবাব দিল না; একবারমাত্র চোখের কোণে চাহিয়া দেখিল। সে দৃষ্টিতে বিরক্তি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত ঠিকরিয়া পড়িল। কন্দর্পবাণ-জর্জ্জরিত যোগভঙ্গ নীলকণ্ঠের নয়ন হইতে বোধ হয় এইরূপই ক্রোধের অগ্নি স্ফুরিত হইয়াছিল। প্রবোধ আর পীড়াপীড়ি করিল না, তার অদ্ভুত কার্য্য ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া সে চলিয়া গেল।

৩

এখানে আসিবার পূর্ব্বে ট্রাঙ্কের এক নিভৃত কোণে প্রবোধ একটী বাঁশী লইয়া ছিল। নূতন জীবনের নূতন জগতে আসিয়া তার কথা সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল; আজ বাসায় ফিরিয়া মুখ-হাত ধুইয়া সে বাঁশীটী লইয়া গেল সেখানে, যেখানে সে সাঁওতালটীকে দেখিয়াছিল। তখন সন্ধ্যার আবছায়ায় সব অস্পষ্ট, শুক্ল অষ্টমীর পিঙ্গলবর্ণ চাঁদ সবে মাত্র আকাশের গায়ে ভাসিয়া উঠিতেছিল, চারি দিক নিস্তব্ধ, সাঁওতাল যুবকও তিরোহিত। প্রবোধ গিয়া বসিল নদীবক্ষ-সংলগ্ন একটা পাথরের উপর। তাহার রুদ্ধ হৃদয়ের আকুল আবেগ মূক প্রকৃতির সভায় ঢালিয়া দিয়া সে গান গাহিল।

বাঁশী ধীরে ধীরে পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া নামিয়া শেষে আকাশের নবীন জ্যোৎস্নায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। প্রবোধ নিজে তন্ময়—বোধ হয় চাঁদনি রাত্রিটাও তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ গানের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, কারণ কোথা হইতে কে আসিয়া দাঁড়াইল একেবারে প্রবোধের সম্মুখে। এ ছায়া না মানুষ? প্রথমে সে ভয় পাইল,—পর-মুহূর্ত্তেই প্রবোধ বুঝিল, না, এ উপদেবতা নয়, বনদেবী! সাঁওতাল-বালিকা পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যে বিমল যৌবনের সদ্য বিকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে! জ্যোৎস্নালিপ্ত আঁখি-তারা দুটী বসন্তের স্বপ্নময় হাসিতে স্নিগ্ধ মধুর! প্রবোধ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; কিন্তু বালিকা কহিল, "বাজা, বাজা, আবার বাজা—" বাঁশী আবার বাজিল।

৪

পরদিন ভোর না হইতেই বালিকা বনফুলের মালা লইয়া প্রবোধের বাড়ীর আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রবোধের সবে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। চোখ মুছিতে মুছিতে সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে বালিকা হাসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় প্রবোধের দাদাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোনিয়া থ' হইয়া দাঁড়াইল। প্রবোধের দাদা কহিলেন, "কিরে সোনিয়া, এত ভোরে যে! মালা কোথায়?" সোনিয়া কহিল, "মালা ক্ষেতকে গেছে।"

সোনিয়া কেন যে এত ভোরে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে প্রবোধের দাদার কোন কৌতূহল দেখা গেল না, বোধ হয় বন-চারিণী বালিকার পক্ষে এমন সময় আসা নূতন নহে। প্রবোধের দাদা মুখ-হাত ধুইতে চলিয়া গেলেন। তখন সোনিয়া প্রবোধের কাছে গিয়া কহিল, "বাবু ফুল নিবি ?"

এই আচম্কা উপহারে প্রবোধ বিস্মিত হইল, এবং সে একটা কিছু বলিবার আগেই সোনিয়া আবার কহিল, "বাবু এ মালা নে।" বাবু কিন্তু হাতে মালা না লইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহা রাখিতে বলিল। আসন্ন-যৌবনা বনবাসিনী বোধ হয় ইহার বেশী সমাদর প্রত্যাশা করিয়াছিল, তাই ব্যথিত ক্ষুণ্ণ মুখে মালা রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

দাদা আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোনিয়া চলে গেল ? তাকে দুটো ফাউল দিয়ে যেতে বললিনে ? অনেক দিন মাংস খাই নি যে।" আনমনা প্রবোধ উত্তর দিবার আগেই দাদা কহিলেন, "এ মেয়েটী হল মালা মাঝির মেয়ে। সাঁওতালেদের ভেতর মালা বড় গেরস্ত, দশ-পনেরো বিঘে তার ধান ক্ষেত। লোকটীও ভাল। এ মেয়েটী আবার সাঁওতালেদের ভেতর মস্ত সুন্দরী !" বলিয়া আবার হাসিয়া কহিতে লাগিলেন, "এখন একে বে' করতে চায় এক গরীব সাঁওতাল, নাম তার সুদাম, না আছে তার ঘর-বাড়ী, না আছে তার চাল-চুলো, না আছে তার বাপ-মা। কিন্তু সাঁওতালের বাছা অত-শত বোঝে না, সোনিয়াকে তার বে' করতেই হবে—একেবারে নাছোড়বান্দা। মালা দেবে কেন ? অথচ সুদামও ছাড়ে না ! শেষে আর পাঁচজন মাতব্বর সাঁওতালের সঙ্গে পরামর্শ করে সুদামকে বলেছে যে নদীর স্রোতের ধারাটা ঘুরিয়ে যদি সুদাম মালার ক্ষেতের পাশ দিয়ে চালিয়ে দিতে পারে, তবেই সোনিয়ার সঙ্গে তার বে' দেবে, নইলে নয়। সে তাতেই রাজি ! রোজ নদীর পাড় কাটছে ! বর্ষা নেই, বাদল নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই—বছর দুয়েক থেকে ওই পাড় কাটা নিয়েই আছে। মানুষ এমন পাগলও থাকে ? বুনোর আর কত বুদ্ধি হবে !" বলিয়া তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন।

সেই দিনই বাড়ী ফিরিবার মুখে প্রবোধ আবার গেল যেখানে সেই অবোধ সাঁওতাল তাহার প্রেমের সাধনা সফল করিবার জন্য নদীর এক পাড়ে ব্যর্থতার উপর ব্যর্থতা স্তূপীকৃত করিতেছিল। নির্জ্জন নদী-বক্ষ, নির্জ্জন উপকূল, নিরালা সমাগত সন্ধ্যা-প্রকৃতি. তাহার মাঝে প্রেম-যোগ-নিমগ্ন সাঁওতাল যুবক। আজও প্রবোধের আসায় সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। নূতন পাখী দেখিলে আমরা যেমন অবাক হইয়া চাহিয়া থাকি, নূতন জীব-জন্তু দেখিলে আমরা যেমন বিস্ময়ে দিশে-হারা হই, এই বনবাসীরাও সভ্য জগতের একটী মানুষ দেখিলে সেইরূপ অবাক হইয়া যায়, সব ভুলিয়া তাহাদের দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। কিন্তু এ লোকটী সে সকলের দল-ছাড়া। তাহার বাহির ও অন্তর এক করিয়া একটা ছায়ার পিছনে সে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ যেন বুঝিয়াও বুঝিবে না যে এই নিষ্ঠুর নদী, এই পাষাণময়ী নদীর উপকূল ক্ষুদ্র একটা মনুষ্য-শক্তির নিকট পরাস্ত হইবার জিনিস নয় ! যুবক যদি একটা জীবনের বদলে একশত মনুষ্য-জীবন পাইত, তবেও বা কোন দিন বিজয়ী বীরের মত প্রেমের পুষ্পটীকে বুকে তুলিয়া ধরিবার সম্ভাবনা ছিল ! কিন্তু মানুষের জীবন একটা বইতো নয়, এই সহায়হীন সাঁওতালের সাধনা একার সাধনা বইতো নয়—এই জীবনের আশা-স্বপ্ন আবার এই জীবনেই সাফল্য লাভ করিতে চাহে ! কি হইবে ? যৌবন মোটে কয়টা বৎসর পরে বার্দ্ধক্যের পদতলে সমাহিত হইবে ! যে-বালিকা আজ হরিণ-শিশুর ন্যায় চঞ্চল পদবিক্ষেপে এই মুগ্ধ বনভূমি হাসির উচ্ছ্বাসে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে, আর কয়টা বৎসর পরেই লোল-চর্ম্ম বৃদ্ধার সাজে, জীবনের হাসি-অশ্রু স্মৃতির সোহাগারে চাবি দিয়া, অন্তিম শয়ানের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে ; তখন কোথায় থাকিবে এই প্রেমের পিপাসা আর কোথায় থাকিবে ওই বালিকা-মুখের অপরূপ ললিত ছন্দ ? এই সাঁওতাল কি তাহার কিছুই বোঝে না, তবে এমন জীবনটা কেন মিছা এক কুহকিনী আশার পদতলে সে বলি দিতেছে ?

কিন্তু প্রেম অন্ধ !

সুদামের খুব কাছে গিয়া বড় সকরুণ কণ্ঠে প্রবোধ

কহিল, "এ কি পারবি? নদীর স্রোত কি ফেরাতে পারবি?" আজও সে প্রবোধের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। প্রবোধ নিরস্ত না হইয়া আবার কহিল, "আমি জানি, তুই সোনিয়াকে বে করবি বলে নদী কাটছিস্! নদীর স্রোত কি ফিরুতে পারবি রে?" কাজের মাঝে অযথা ব্যাঘাত পাইয়া সুদাম কহিল, "তুহার কি?"

প্রবোধ। তোর কথা সব শুনেছি, শুনে আমার বড় কষ্ট হয়েছে।

সুদাম। তুই সরে যা।

প্রবোধ। আমি সরে যাব না, এ করলে কি কথনো বে করতে পারবি রে পাগল? কত জন্ম কেটে যাবে, তবুও নদীর বাঁক ফেরাতে পারবি নে।

হঠাৎ যেন সাঁওতালের বাহু-বল শিথিল হইয়া গেল, যেন তাহার শ্রম-ক্লান্তি-হীন বুকথানা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল; কোদালথানা হাত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। প্রবোধের মুখে ক্ষণিক করুণ-আঁখিতে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে সে কহিল, "কি হবে?"

প্রবোধ। আমি তোর বিয়ে দিয়ে দেব। এ পাগলামী তুই ছেড়ে দে।

সুদাম। মাঝি শুনবেক না।

প্রবোধ। একবার জিজ্ঞেসা করে দেখিস, কত টাকা পেলে মাঝি বে' দেবে।

সুদাম। কে টাকা দিবেক?

প্রবোধ। আমি দেব, শীগ্গির না হলেও ছমাসে এক বছরে দেব।

সুদাম। তুই দিবি?

প্রবোধ। হাঁ দেব।

কৃতজ্ঞতায় সাঁওতাল ক্ষণেক কথা কহিতে পারিল না।

প্রবোধ। কি বলিস?

সুদাম। আমি মাঝিকে শুধাব।

সন্ধ্যার পর প্রবোধ আবার নদীর মাঝে সেই পাথরটার উপর গিয়া বাঁশী বাজাইল; আবার সুদামের বদলে সোনিয়া আসিয়া দেখা দিল। বাঁশী থামিতেই সে বলিয়া কহিল, "কেন রে সোনিয়া?" তাহাতে আরো জ্বলিয়া উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে সে কহিল, "আমি কথনো বিয়া করবেক না।" এবং মুহূর্ত্তেই বনের মাঝে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৫

মহুয়া ও আমলকী গাছের রন্ধ্র দিয়া ভোরের আলো প্রভাত-বায়ুর সঞ্চালনে কাঁপিতেছিল। সোনিয়া ও সুদামের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রবোধ তথন কার্য্য-স্থলে যাইতেছিল। পথের মাঝে এক-গা ফুলের গহনা পরিয়া সোনিয়া প্রবোধের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল; তাহার চোখে চোখ রাখিয়া হাসিয়া কহিল, "আমি সুদামকে বিয়া করবেক না।" মহুয়া ফুলের গন্ধে তথন বন মাতোয়ারা। এই খবরটা দ্বিতীয়বার দিবার জন্য কেন যে সে এত আয়োজন করিয়া আসিয়াছিল বলা যায় না। কিন্তু উন্মেষিত-যৌবনা অনার্য্য-বালিকার প্রাত-সমুজ্জ্বল অপরূপ লাবণ্যে প্রবোধ এমন একটী দীপ্তি দেখিতে পাইল, যাহাতে তার নিজের হৃদয়েও কি একটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বনের মেয়েও বনে মিলাইয়া গেল।

বিকালে বাড়ী ফিরিবার পথে নদীর ধারে সুদামের সঙ্গে প্রবোধের দেখা,—তাহাকে দেখিয়া সুদাম কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "মাঝি দু'শ টাকা নিবেক, তবে বিয়া দিবেক।"

প্রবোধ। বেশ, দুশো টাকাই আমি দেব।

সুদাম। কেমনে দিবি বাবু? সে যে অনেক টাকা, সে যে পাঁচ ছ' কুড়ির চেয়েও বেশী টাকা।

প্রবোধ। যতই হোক—আমি বলছি দেব, ছমাসে না পারি এক বছরে দেব।

"বাবু তুই বড় ভাল" বলিয়া সুদাম প্রবোধের পা জড়াইয়া ধরিল। নিস্তব্ধ বৈকালিক প্রকৃতি তথন বোধ হয় অঞ্চলে মুখ চাপিয়া হাসিতেছিল।

সেদিন প্রবোধ নদীতে গিয়া আর বাঁশী বাজাইল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। ব্যাকুল সোনিয়া প্রবোধের প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া হতাশ হৃদয়ে

রাত্রি গভীর হইয়াছে অথচ সোনিয়া বাড়ী আসেনা দেখিয়া মালা সুদামকে পাঠাইয়া ছিল। বালিকাকে একাকিনী পাইয়া সুদামের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সে তাহার কাছে গিয়া সুখ-ব্যথিত কণ্ঠে মাধুর্য্য মিশাইয়া ডাকিল, "সোনিয়া—" বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় পিছাইয়া গিয়া সোনিয়া গর্জ্জিল, "চলে যা, আমি তোকে বিয়া করবেক্ না।" আশা-উন্মুখ হৃদয়ের সমস্ত আশা নিষ্পেষিত করিয়া সুদামের আকণ্ঠ সুখের স্বপ্ন এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। নিস্তব্ধ বনানী মর্ম্মর করিতে লাগিল।

৬

দুই শত টাকা—তাহা আর এমনই বেশী কি! প্রবোধ কি তাহা দিতে পারে না? একটা পেট বইত নয়!—দু-বেলা দু-মুঠা বইত নয়?—সুদামের জন্য দু'শ টাকা খরচ করিলে তাহা কি প্রবোধের জুটিবে না? নিজের উপার্জ্জনে একটা ক্লিষ্ট মুখের কালিমা যদি মুছিয়া লওয়া যায়,—সে যে মস্ত তৃপ্তি। প্রেম-মুগ্ধ যুবকের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সফল করা—সে যে অসীম সুখ। প্রবোধ সুদামের বিবাহ দিয়া দিবে; দিবেই দিবে।

কিন্তু সোনিয়া কি অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে? তাহার বালিকা-খেয়ালে কি সে সব মাটি করিয়া দিবে? সোনিয়াকে বুঝানো দরকার। গরীব সুদামের হইয়া তাহাকে দশটা কথা বলা প্রয়োজন। সুদামের জন্য তাহার বালিকা-হৃদয়টীকে জয় না করিলেই নয়! সেইজন্য দু'দিন পরে প্রবোধ পুনরায় বাঁশী লইয়া বাহির হইল। জ্যোৎস্না-প্লাবিত নদীর বুকে স্বপ্নময়ী মূর্ত্তির মত সোনিয়া আবার ফুটিয়া উঠিল। বাঁশী আলাপে, বিলাপে, সোহাগে, আদরে আবেগে, উচ্ছ্বাসে অপরিসীম হইয়া উথলিত চাঁদিনীর বুকের উপর বনবাসিনীকে আবার বাঁধিয়া ফেলিল। জাল-বদ্ধ কুরঙ্গিনীর নয়নে দু-ফোঁটা অশ্রু আবার চিক চিক করিয়া উঠিল। তখন প্রবোধ ডাকিল, "সোনিয়া—"

সোনিয়া কথা কহিল না। প্রবোধ কহিল, "সোনিয়া রাগ করেছিস?" এই অভিনব সুপারিস-পদ্ধতির ফলে বালিকা কাছে সরিয়া গিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মূক বনানীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন যেন বনবাসিনীর নয়ন দিয়া প্রবাহের মত ছুটিয়া বাহির হইল। সুদামের ব্যথায় ব্যথিত অসভ্য সাঁওতালের সভ্য পৃষ্ঠপোষক তাহা দেখিয়া সব ভুলিয়া গেল। সুদামের জন্য সোনিয়ার হৃদয়টী জয় করিবার পূর্ব্বে বালিকার কোমল হাতের কোমল বন্ধন মুক্ত করিয়া নিজেই সে পলাইয়া গেল।

সুদাম কোথায় ছিল, কে জানে! হঠাৎ সে হতবুদ্ধি সোনিয়ার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত; তখনও উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল বালিকার গণ্ডদেশ বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। সুদাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে সোনিয়া?"

সোনিয়া কথা কহিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্যাকুল সুদাম ঈষৎ তপ্ত কণ্ঠে কহিল, "বাবু কি করেছে? শীগ্গির বল্।" সোনিয়ার কান্না থামিয়া গেল; সে কহিল, "বাবু আবার কি করবেক্! তুই কেন মরতে এখানে এসেছিস্? তোকে কে ডেকে ছিল?"

সুদাম অবাক হইয়া গেল। এই না সোনিয়া কাঁদিতেছিল—!

ক্ষুব্ধ সুদাম বিস্মিত হইয়াই চাহিয়া রহিল। "তুই চলে যা, তুই কেনে এসেছিস?" বলিতে বলিতে সোনিয়া নিজেই চলিয়া গেল। নির্জ্জন নদীবক্ষে পাথরের মূর্ত্তির মত প্রণয়াহত সাঁওতাল পড়িয়া রহিল। সে নড়ে না, চড়ে না! আকাশের চাঁদ এই মূঢ় অনার্য্যের সহিত রক্ষা করিয়া চুপি চুপি পশ্চিম আকাশের দিকে নামিয়া পড়িতেছিল, ক্রমশ তরল অন্ধকার গাছের জটায় জটায়, বনের বুকে বুকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, নদীটাও যেন অন্ধকারে ভরাট হইয়া গেল। সুদামের ব্যর্থ অশ্রুজলের ঢিপি, নিষ্ফল প্রণয়ের মূর্ত্তিমতী মর্ম্ম-যাতনা সেই যে বালি ও পাথরের স্তূপটা—যাহা বোধ হয় ও ভাঙাচোরা বুকখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও নয়ন হইতে মুছিয়া গেল। এই বিশ্বভরা দিশে-হারা আঁধারের মাঝে মসীবর্ণ সাঁওতাল এক হইয়া গেল। পর দিন কেহ আর তাহার সন্ধানও পাইল না।

৭

প্রবোধের ভাব-গতিক হঠাৎ বদলাইয়া গেল। সর্ব্বক্ষণ

সে ম্রিয়মান থাকে, ভাল করিয়া কথা কহে না; দাদা ইহার কারণই নির্ণয় করিতে পারেন না। সে নদীতে বাঁশী বাজাইতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে; নিকটে কোথাও গিয়া একা বসিয়া থাকে, আকাশ-পাতাল কত কি ভাবে। প্রত্যহ রাত্রে যখন শুইতে যায়, সে বিছানার উপর এক গাছি ফুলের মালা দেখিতে পায়। ইহা কাহার পূজা-উপহার, সে বুঝিয়াও যেন বোঝে না, দেখিয়াও যেন দেখে না!

একদিন প্রবোধের দাদা সন্ধ্যা-ভ্রমণ করিয়া একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়াছেন, সঙ্গে ছিল তাঁহার এক বন্ধু। দুজনেই হঠাৎ দেখিলেন, স্ত্রীলোকের মত কে একজন প্রবোধের ঘর হইতে চকিতা হরিণীর মত বাহির হইয়া নিমেষে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। দাদার বন্ধু দাদার দিকে চাহিয়া হাসিলেন। রাগে দিশেহারা হইয়া দাদা 'প্রবোধ' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। প্রবোধ গৃহে ছিল না,—কে জবাব দিবে? তা হইলে কি হয়? মনুষ্য-সমাজ তো তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার করিবে না; কারণ মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, দোষী ধরিয়া লইয়াই মানুষ মানুষের বিচার করে—নির্দ্দোষিতার প্রমাণই তলব করে, দোষের প্রমাণ চাহে না।

বাড়ী ফিরিলে প্রবোধ দেখিল, তাহার ঘাড়ে নিদারুণ অপযশের বোঝা; এবং দাদার গৃহে তাহার স্থান নাই। ভাইয়ের কষ্টের চেয়েও দাদার নিজের অপমানের জ্বালাটা বেশী অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রবোধকে রাত্রেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। হাঁ, না—কিছুই না বলিয়া অন্ধকারে প্রবোধ বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। দাদার বন্ধুটী পিছনে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কোন ফল হইল না।

এদেশে বড় সাপ-বিছার ভয়। সেদিকে প্রবোধের ভ্রূক্ষেপও নাই, পথে-অপথে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রবোধ গেল যেখানে সে বাঁশী বাজাইত। হঠাৎ বাপ-মায়ের কথা মনে পড়িল, শৈশবের ছোট একটী মৃতা ভগ্নীর কথা ভাবিয়া খুব কাঁদিল, প্রমোদ-পাগল যুবক এক মুহূর্ত্তে দেখিতে পাইল, তাহার হাসির নীচে কতখানি অশ্রুজল চাপা আছে; তাহার বাঁশীর অন্তরালে স্নেহ-আশাহীন জীবনটা কত কুৎসিত! প্রবোধ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিতে লাগিল, কোথায় সে একবিন্দু সহানুভূতি পাইবে? কে তাহার ভিখারী মনের মুখে এক কণা স্নেহ দিবে? এমন সময়ে সোনিয়া ডাকিল, "বাবু—"

বিস্মিত প্রবোধ কহিল, "সোনিয়া! তুই কখন এলি রে?"

সোনিয়া কহিল, "বাবু আমি সুদামকে বিয়া করবেক না।" বলিয়া প্রবোধের উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া ঝড়ের মত একেবারে সে প্রবোধের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল! বাহু-বন্ধনে প্রবোধকে বন্দী করিয়া সে কহিল, "আমি তুহার"।

অর্দ্ধ-নগ্ন সাঁওতালনীর বক্ষের স্পন্দনে প্রবোধ তখনই মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিল যে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে বালিকা বনবাসিনীর হিল্লোলিত এই কালো বুকখানিই তাহার একমাত্র আশ্রয়; তাহার নবীন পল্লবিত কৈশোরের উথলিত অশ্রুজলই স্নেহের মন্দাকিনী-ধারা, তাহার কালো কচি মুখখানিই সমবেদনার একমাত্র অসীম আধার! সোনিয়ার মুখের পানে সে চাহিল, কি এ আবেশে ঢলঢল কোমল মুখখানি! আর ঐ চোখে বিশ্বের প্রার্থনা যেন বাহুর মেলানি মাগিয়া চাহিয়া আছে! কাঙাল প্রবোধ ক্ষণিকের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইল, কিন্তু না, না—এ কি মোহ! চকিতে সোনিয়াকে ছুড়িয়া ফেলিয়া সে দূরে গিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "ছি সোনিয়া! এই কি তোর সুদামের ভালবাসার প্রতিদান?"

প্রবোধের বক্ষচ্যুত সোনিয়ার মাথা অতর্কিতে পাথরের গায় আঘাত পাইল। সে অচেতন হইয়া নদীর বুকে লুটাইয়া পড়িল।

তখন আকাশ-চন্দ্রাতপ-তলে, তরু-পল্লব-খচিত প্রসারের মাঝে, নদীবক্ষ-বাহিনী ক্ষীণ স্রোতের একধারে মূক বিশ্বসৃষ্টিখানা অনন্ত বিক্ষিপ্ত ঐশ্বর্য্যের উপহার লইয়া বালিকার এই অভিনব প্রেমের বাসরে দাঁড়াইয়া রহস্য দেখিতেছিল। ওদিকে হঠাৎ কোথা হইতে নিরুদ্দিষ্ট সুদাম ছুটিয়া আসিয়া সোনিয়ার নিশ্চল দেহ আপনার

বলিষ্ঠ হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তারকামালার ক্ষীণ জ্যোতিতে তাহার মুখখানি ব্যাকুল হইয়া নিরীক্ষণ করিল। তারপর ধীরে ধীরে বিহ্বল প্রবোধের চরণ-তলে যৌবনোচ্ছল নিস্পন্দ তরুণীর শরীরখানি স্থাপিত করিয়া সে কাঁদিয়া কহিল, "বাবু, এ কি করলি!"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

---

# মরণের স্বাধীনতা

নরকের শত বিভীষিকা, সমাজের বহু লাঞ্ছনা ও রাষ্ট্রের কঠোর শাস্তি সত্ত্বেও প্রতি বৎসর জন কয়েক লোক আত্মহত্যা করে থাকে—নানাবিধ গোপন ও প্রকাশ্য কারণে। জন-সমাজ কখনও সাধুবাদে কখনও বা পরিবাদে হত্যা ও হত্যাকারীকে প্রশংসনীয় বা ঘৃণ্য করে তোলে; কিন্তু যে মরে, সে একেবারে মরে যায়—এই বিশ্বাস প্রচলিত থাকায় সংখ্যায় কম-বেশী হলেও আত্মঘাতীর অভাব হয়নি।

Sir Oliver Lodge প্রমুখ একদল বৈজ্ঞানিক ও প্রেতবাদী এবার তাদের সে সাধে বাদ সাধবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাঁরা খবর পেয়েছেন যে মরে গেলেও নিস্তার নেই—পরলোকে একটা reformatory বা শোধনাগার আছে, প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সেখানে কিছুকাল থেকে শাসনে দুরস্ত হয়ে আত্মঘাতীরা আবার গোড়া থেকে জীবন সুরু করে! সম্প্রতি এক ছোক্‌রা বৈজ্ঞানিক এই reformatory শিক্ষা সম্পূর্ণ করে এ সংবাদটী দিয়ে গেছেন!

কথাটা বিশ্বাস-যোগ্য কিনা, সে তর্ক নিষ্প্রয়োজন; কারণ মরার পরের অবস্থা জানতে হলে মরা দরকার। তবে বিশ্বাস করা যাদের স্বভাব তাদের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। এর চেয়ে অনেক অনেক অদ্ভুত জিনিষ তাঁরা নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিকার চিত্তে বহুকাল ধরে মেনে আসছেন—কৃষ্ণ যদি কখনও মেলে ত ঐ বিশ্বাসেই মিলবে, এই হলো শাস্ত্রের বচন! আমার একমাত্র বক্তব্য যে উক্ত বৈজ্ঞানিকদের আর যাই থাক্ imaginationএর অভাব যথেষ্ট। স্বর্গের শত শোভা ও বিলাস আর নরকের বীভৎস বিভীষিকায় প্রাচীনদের কল্পনার বহর দেখে বেশ খুসী হওয়া যায়। বিজলী বাতি, জলের কল, জেল, হাসপাতাল, reformatory, garden city প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্য-জগতের সমস্ত অনুষ্ঠানে দেবতারা আমাদের অনুকরণ করেছেন, এ কথা মনে হলে এত দিনের প্রাচীন দেবতাদের উপর অভক্তি হয়ে যায়—বেচারীদের অনেক সম্মান থেকে মানুষ বঞ্চিত করেছে—আর কেন? অপিচ মানুষ এখানে স্বর্গের হুবহু নকল চালাচ্ছে, এ কথা স্বীকার করতে হলে মানুষের প্রতিভায় আস্থা রাখা দায় হয়ে ওঠে।

বৈজ্ঞানিকদের এই আবিষ্কার অনেকে অনাস্থা করে হেসে উড়িয়ে দেবেন নিতান্ত ভিত্তিহীন বলে, কেউ বা ভয়ে আত্মহত্যা থেকে বিরত হবেন—ঢেলে সাজবার দায় থেকে পরিত্রাণের আশায়। একটু তলিয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, মৃত্যুর উপর মানুষের যে একটা সহজ বিরাগ আছে, এ সেই বিরাগের একটা অনাবশ্যক পুনরুক্তি, একটা শস্তা বিভীষিকা।

এই নিষেধের মূলে একটা সত্য লুকানো আছে। বার বার নিষেধ করা তখনই দরকার হয়ে ওঠে যখন নিষিদ্ধ বস্তুটি সমাজ-বিরুদ্ধ বলে মনে হয় এবং সেই নিষিদ্ধ বস্তুটির প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আসক্তি থাকে। Incestএর বিরুদ্ধে নিষেধ ও শাস্তির অন্ত নেই, তার একমাত্র কারণ যে, মানুষের ওদিকে একটা প্রচণ্ড ঝোঁক আছে। সমাজ ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে আদিকাল থেকে মানুষ নরকের সমস্ত ভয় ও সমাজের শাস্তি উপেক্ষা করেও কার্য্য থেকে বিরত হয়নি এবং আমার বিশ্বাস যতকাল মানুষ বাঁচবে, ততকাল এ কাজটি চলবে, তা শাস্তির কঠোরতা যতই ভীষণ হোক্ না কেন!

মুখে যাই বলুক বাঁচবার মত মরার দিকেও মানুষের একটা সহজ প্রবণতা আছে এবং সে প্রবণতাকে খামকা সমাজ-বিরুদ্ধ মনে করায় এই নিষেধ, নিন্দা ও শাস্তির জঞ্জাল পর্ব্বত-প্রমাণ হয়ে উঠেছে।

এ প্রবণতা কেন? বাঁচবার জন্যে মানুষ না করছে এমন অন্যায় ত খুঁজে পাওয়া যায় না—তবে অসময়ে মরবার এ ঝোঁক কেন? করোনারের তদন্ত-খাতায় বিশেষ সন্তোষজনক কোন উত্তর মিলবে, এ বিশ্বাস আমার নেই। কারণ মৃতের জবানবন্দী নেবার কোন সুবিধাই তখন থাকে না এবং নিতান্ত কেতা-দুরস্ত লোক ছাড়া আর কেউ কিছু হিসেব-নিকেশ রেখে যায় না, কাজেই কারণ খুঁজতে গিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছোড়া আদৌ সঙ্গত মনে হয় না।

অনেকের ধারণা যে অধিকাংশ লোক আত্মহত্যা করে হয় সুখের আশায় চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়ে, নয় পরলোকে অক্ষয় সুখের আশায় উৎফুল্ল হয়ে। মানুষ সাধারণত অলস ও বিলাসী, line of least resistance সে ভালবাসে তাই এ জীবনের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে পেনসন পাবার আশায় বসে থাকা সমীচীন মনে করে না—আত্মহত্যা করে সময় সংক্ষেপের চেষ্টা করে। এর জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, এ বুদ্ধি যে একেবারে মানুষের স্বভাবগত। মানুষ সুখ চায়, স্বস্তি চায় এবং মনের মত করেই তা পেতে চায়। তার বাসনা যে অন্যায়, তা বৈরাগ্য-শতকের চন্দন-প্রলেপ থেকে আরম্ভ করে মোহ-মুদ্গরের প্রচণ্ড তাড়না পর্য্যন্ত বহুতর নিষেধ-বাণী যুগে যুগে প্রচারিত করেছে, তবুও এ আশার নির্ব্বাণ ঘটে নি। নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতর যার কথা যত দামীই হোক্, সাধারণ মানুষের কাছে তা দৈহিক ও মানসিক নির্ব্বেদ বা মৃত্যু বলেই মনে হয়। সুতরাং তার বদলে যদি কেউ আশা-নিবৃত্তির সহজ পথ খুঁজে নেয়, তবে তার ওপর এত চোখ রাঙাবার কারণ কি? জীবনের সমস্ত পথেই ত এই নীতি নিত্য অনুসৃত হচ্ছে।

জীবনের স্থিতি বৃদ্ধি ও প্রসারের জন্যে অনেকগুলো জিনিষ বিশেষ প্রয়োজনীয়—তার একটির বা বহুর অভাব জীবনের সহজ সঙ্গতি নষ্ট করে। ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়ার মত জীবনটাকে কোন গতিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যারা চরম লাভ মনে করে না, তারাই মাঝ পথে 'দুত্তোর' বলে চলে যায় এবং সমাজ আর যাই ক্ষমা করুক এটা ক্ষমা করতে পারে না! কবি Richard Middleton তার কারণ নির্দ্দেশ করেছেন। তিনি বলেন:—"Suicide does more than attack our persons or our pockets; he injures our self-complacency and murders our vanity. We can forgive a man for booing or creating a disturbance in the theatre of life, but we cannot forgive him for going out with a yawn before the play is over. In effect he says—I find your society dull and your follies do not amuse me, you are a lot of tiresome fellows!" Middletonও একদিন উনত্রিশ বছর বয়সে বোধ হয় এই কথা বলেই আত্মহত্যা করেছিলেন।

স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে আত্মহত্যা যে প্রশংসার্হ ইতিহাসে তার যথেষ্ট নজির আছে। আত্মঘাতী যে স্বার্থানুসন্ধিৎসার অথবা ঘোরতর কাপুরুষতার ফলেই ও দুষ্কার্য্য করে থাকে, এমন কথা অনেক গুণী জ্ঞানীর মুখে শুনেছি। কিন্তু সহমরণ, হারাকিরি বা প্রায়োপবেশন বা ইচ্ছা-মৃত্যুতে সমাজের সমূহ কল্যাণ সাধিত হয়েছে, কিম্বা অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে, এমন প্রমাণ ত ইতিহাস পুরাণে মেলে না। অথচ সতীর সহমরণ, সামুরায়ের হারাকিরি, দ্রোণের প্রায়োপবেশন ও ভীষ্মের ইচ্ছা-মৃত্যু আলোচনায় কোনদিনই সাধুদের অভাব হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন বুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে মানুষ এবম্বিধ আত্মহত্যা করে, এমনও ত মনে হয় না।

এই প্রশংসার মূলে একটা তথ্য আছে। আড়ম্বরের উপর মানুষের একটু শ্রদ্ধা আছে। ধনীর বিলাস-আড়ম্বরের অভাব সাধারণ মানুষের পীড়া দেয়, কারণ সে অপব্যয় আঢ্যতারই একটা অঙ্গ। Mac Swincyর প্রায়োপবেশনের মধ্যে বীরত্ব আছে, আড়ম্বরেরও অভাব নেই। কিন্তু একই কারণে রাম শ্যাম যখন মরে, তখন হয় ত তার মধ্যে কোন

রকম আড়ম্বরের অবকাশ থাকে না। সাধারণ লোকের আত্মহত্যায়, অভিভূত হবার উপকরণের অভাব অনেককেই ক্ষুণ্ণ করে এবং সে ক্ষোভ প্রকাশ পায় পরিবাদের প্রাচুর্য্যে। সংসারের এই বিচিত্র রঙ্গালয়ে মানুষ নটও বটে, দর্শকও বটে। দর্শকরূপে সে চায় আড়ম্বরের আতিশয্যে অভিভূত হতে, কিন্তু জীবনের মহত্তম আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে পেটের, মানের বা প্রাণের দায়ে যখন রাম শ্যাম আত্মহত্যা করে, তখন ঘটা করবার না থাকে সুযোগ, না থাকে অবসর—বাসনা ত দূরের কথা। সে কথা বোঝে কে?

একদল আছে যারা আত্মহত্যা করে প্রাণের আতিশয্যে অর্থাৎ খেয়ালে। হাতে টাকা হলে নানা খেয়াল মাথায় সময়ে সময়ে চাপা কিছু বিচিত্র নয়—এ দলেরও সেই অবস্থা। এই সূত্রে আবার একদলের কথা অবান্তর হবে না। জীবনের পাত্রটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে পরিতৃপ্ত হয়েও একদল আত্মঘাতী হয়। জীবন দিয়ে তারা করবে কি—শূন্য ভাণ্ড বা রসহীন ফলের খোসা কার কোন্ কাজে লাগে? ডাক্তারের পকেট-বই খুঁজলে এমন খবর পাওয়া শক্ত হবে না। এই সব আত্মঘাতীর জীবন-কথা কোন দিনই আমাদের গোচরে আসে না, মনে হয় যদি আসত...না, ক্ষমা আমরা কোন মতেই কর্‌তুম না, কারণ,—আর কারণের প্রয়োজন কি!

আত্মহত্যা সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। মহামতি ক্লাইবের মত কৃতকর্ম্মা পুরুষ তিনবার চেষ্টা করেও ও-কার্য্য করতে পারেন নি! ইতিহাসে হয়ত আরও অনেক নাম মিলবে—পুলিশ-রিপোর্টে ত বহুতর উদাহরণ নিত্যই পাওয়া যায়। চেষ্টায় কৃতকার্য্য হলে নরকে এদের কি শাস্তি হোত তা বলতে পারি না, কিন্তু রাষ্ট্রের শাস্তির খবর সংবাদ-পত্রে মেলে। কিন্তু নিজেদের অবহেলায়, অচিকিৎসায় যখন লাখ লাখ লোক মারা যায় তখন তাদের শাস্তি দেবার কোন চেষ্টা ত দেখি না। তাই, জীবনের কাছ থেকে সমস্ত বঞ্চনা লাভ করে কত বড় ধিক্কার থেকে পরিত্রাণের জন্যে মানুষ জীবন পণ করে, সে কথা জেনে ধর্ম্মাধিকরণ যখন শাস্তি দিতে বসে, তখন বর্ত্তমান সভ্যতায় বিশ্বাস রাখা দায় হয়ে ওঠে। আত্মঘাতীর পক্ষ নিয়ে ওকালতি করবার স্পর্দ্ধা রাখি না—তার দরকারও কিছু নেই। মানুষ নিজের নিয়মে নিজেকে কি রকম অন্যায় ভাবে বেঁধেছে, এই কথাটাই বাজে বেশী। বাস্তবের চেয়ে মন-গড়া আইন বড় হেয়ে গেছে—এ ত একটা tragedy।

মানুষ আজ জীবনের সমস্ত বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্যে প্রাণপণ করছে। সভা-সমিতিতে আন্দোলনে বিদ্রোহে সকল দেশ ত সরগরম। মরবার স্বাধীনতার জন্যে কি একটা প্রাণও জেগে উঠবে না, একটা বক্তৃতা-মঞ্চও কি কোন কণ্ঠের ভেরীতে ধ্বনিত হবে না! Convention কিছু চিরস্থায়ী নয়, তাই আশা হয়, মানুষ একদিন বহু কালের এই জীর্ণ আইনের নিগড় ভাঙবে এবং বাঁচবার মত মরবার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে মানুষ লজ্জিত হবে। উপযুক্ত লোকের হাতে আন্দোলনের ভার দিয়ে আমরা সেদিনের আশায় রইলুম।

আনন্দসুন্দর ঠাকুর।

# চিরন্তনী *

এই তো জীবন-নাট্যশালা—দীপ্তিভরা, লাস্য-ভরা,
উর্দ্ধে দোলে যবনিকা—নৃত্য-গীতি-হাস্য-হরা!
ফাগুন-হাওয়ার কাল ব'য়ে যায়, আয় তরুণী, আয় ছুটে আয়—
উড়িয়ে দে তোর মাথার কাপড়,—মিথ্যা লাজের দাস্য-করা!

জীবন? সে তো তারার আভা! রাত ফুরুলেই মিলিয়ে যাবে!
তাইতো সখি, থাক্‌বে যেটুক্ কেবল আলো বিলিয়ে যাবে!
কাঁদ্‌চে যারা কাঁদুক্ তারা, দীর্ঘশ্বাসে বুকের চারা
ব্যর্থ হয়ে নেতিয়ে প'ড়ে ধরার ধুলায় মিশিয়ে যাবে!

* মানব-হৃদয়ে যে চিরন্তন হাহাকার লুকিয়ে আছে, ইরাণের কাব্য-কুঞ্জে একাধিক কবির বাঁশীতে তার প্রতিধ্বনি জেগে উঠেচে। "চিরন্তনী"র স্থানে স্থানে তারই অনুরণন আছে,—কিন্তু এ অনুরণন অনুকরণ নয়—এটা এসেচে আপনা-আপনি, স্বাভাবিক ভাবে,—কারণ এ হাহাকার কোন স্থান-কালে আবদ্ধ নয়, এ হচ্ছে চিরন্তন। জেনে-শুনেও তাই সেই শ্লোকগুলি বাদ দেওয়া হোলো না।

প্রহরগুলো যাচ্চে চ'লে, শোন্ দ্রুত ঐ চরণ-ধ্বনি !
মুখ তুলে চা' হিসেব ফেলে, শিয়রে তোর মরণ-শনি !
এক-মিনিটের হের-ফেরেতে,   পড়্‌বি গিয়ে কোন্ টেরেতে—
এই ক্ষণিকের খেলাঘরে প্রেমই কেবল পরশ-মণি ।

ঝড় যদি ঝড় বহুক্ সখি, তার মাঝেতেই বাস্‌ব ভালো,
উঠ্‌লে আঁধি, তোমার আঁখির কিরণে তার নাশ্‌ব কালো ।
ফুল-ফোটানোর দিনটি এলে,   বাসন্তিকার ছন্দ ফেলে,
অশ্রু-ধারা সৃষ্টি ক'রে বৃষ্টিতে তার ভাস্‌বনা লো !

হইনি, হইনি, হইনি বুড়ো, ডাক্‌ব কেন ভগবানে ?
থামাও পথিক, থামাও তোমার রামপ্রসাদী ভক্তি-গানে ।
অন্ধ যারা চক্ষু-বোঁজা,   ঈশ্বরেরি তারাই প্রজা,
যৌবন যার বুকের তলে, সে কেবলি প্রেমকে জানে !

কে জানো গো প্রেমের গাথা, শুনাও মোরে,শুনাও মোরে !
ইহকালের সুখের কথায় পরকালে ভুলাও ওরে !
কে কাহারে বাস্‌বে ভালো,   শুন্‌লে প্রাণে হাস্‌বে আলো,
স্বর্গ-স্মৃতি মর্ত্ত্যে এলে বিস্মৃতি নেয় হরণ ক'রে !

হে পরমেশ, রাজ্যে তোমার পায়না সাধু ছিদ্রটি গো !
আমি কিন্তু যা দেখেচি চিত্ত তাতেই বিদ্রোহী গো !
মৌরসী নেয় কণ্টকী ফুল,   ফুটেই ঝরে বস্‌রাই গুল,
স্বেচ্ছাচারের বিচার এ যে, নাচার হয়ে ঠিক্ কহি গো !

পঙ্গু কাঁদে, কাঙাল কাঁদে, খঞ্জ মুটে বইচে ঝাঁকা,
পাঁজ্‌রা তাদের গুঁড়িয়ে ভেঙে ছুট্‌চে ধনীর গাড়ীর চাকা !
কেউ হাসে ঐ সিংহাসনে,   চিতার দাহ কারুর মনে,
ধনীর 'পরেই খুসি প্রভু, আছে যে তার ঘুসের টাকা !

ঈশ্বর যদি থাকেন তবে স্বর্গধামেই থাকুন তিনি !
খাজ্‌না তাঁরে কেন দেব, তাঁর কাছে তো নইকো ঋণী !
দুঃখ যখন দন্ত ফোটায়,   তখন প্রভু নন্‌তো সহায়,
দাবি-দাওয়া কর্‌তে আসেন মাত্র কেবল সুখের দিনই ।

কেউ তোমাকে মান্‌তনা গো,মানে কেবল গুঁতোর ঠেলায়—
জাত্-পাপীও তপস্বী হয় জীবনের সেই সন্ধ্যে-বেলায় !
যম সে পাছে করে জবাই,   সেই ভয়েতেই ভক্ত সবাই,
দায়ে প'ড়ে বলে 'হরি', সাপ নিয়ে আর কেই বা খেলায় ?

কি ফল হোলো বিশ্বে ক'রে দুঃখ-শোকের ভবন হেন,
সুখের বাসা ধরায় পেতে করলেনাকো সৃজন কেন ?
যৌবনেরি গৌরবেতে   মেতে প্রেমের সৌরভেতে,
আস্‌ত-যেত মানুষগুলি—শরৎ-হাওয়ায় স্বপন যেন !

কাঙাল-ধনী, অবল-সবল শূদ্র-বামুন থাক্‌তনা হে !
আলোয়-ধোয়া নীলেতে কেউ কালোর কাঁদন আঁক্‌তনা হে !
বুকে-বাঁধা মুখখানি মোর   হঠাৎ কখন্ ছিঁড়্‌তনা ডোর,
'সব-পেয়েচি'র সেই দুনিয়ায় বেসুরে কেউ হাঁক্‌তনা হে !

বিশ্ব-চিতার ভস্ম-ধূমে ভাগ্যে তুমি আছ নারী !
তাইত মরণ-কামড়েতেও বিষের জ্বালা সইতে পারি !
যখন পোড়া মন উপসী,   এসে তখন হে রূপসী,
বুকের দহন দাও জুড়িয়ে উপুড় ক'রে প্রেমের ঝারি !

ভগবানের নিঠুর হাতে তৈরি তুমি নওগো আলি !
তাইত তোমার ঐ প্রতিমা হয়নি আমার চোখের বালি ।
মলয়-বায়ে কবির স্বপন,   করেচে তোর তনু গঠন—
ফুলের মধু, চাঁদের সুধায় ভরিয়ে দেছে রূপের ডালি ।

তোমার পানে তাকিয়ে সখি, ভগবানেও ভুলতে পারি,
তোমার নামের জয়-রাগিণী স্বর্গ-প'রেও তুলতে পারি ।
তোমার চোখের চাউনিতে হায়,আমিত্ব মোর হারিয়ে যে যায়,
তোমার বুকের পরশ পেলে সকল বাঁধন খুল্‌তে পারি ।

এখান থেকে যাও হে জ্ঞানী, নিয়ে তোমার জ্ঞানের পুঁথি,
কেতাবে হায় লুকিয়ে আছে থুথ্‌ড়ে ঐ জরা-দূতী ।
প্রেমের রসে রসিয়ে কারে,   তোমার পুঁথি দিতে পারে ?
মনের বাগে ফোটায় কি সে শিউলি,গোলাপ,বকুল,যুথী ?

কুঞ্জে আমার গুরুমশাই দ্যান্‌না দ্যাখা কোনদিনই,
হেথায় সুধু ফুলেল হাওয়া বাজায় বনে রিনিঝিনি ;
হেথায় সুধু সবুজ প্রীতি,   চাঁদের আলো, প্রাণের গীতি,
হেথায় সুধু প্রিয়ার সনে চল্‌চে আমার বিকিকিনি ।

যাও গো সাধু, যাও গো জ্ঞানী, নিজের-গড়া জেলখানাতে,
শূন্যতারি হও-গে সেবক, গড্ডলিকার একটানাতে ।
হৃদয়ে মোর সাকার প্রিয়া,   জ্যান্ত দেবীর আকার নিয়া,
চাইনে যেতে মন্দিরেতে নিরাকারে মন জানাতে ।

মধুর দুটি কপোল-কূপে যৌবন মোর ডুবিয়ে দিছি,
আমার কাণে ঢুক্‌বে কেন পরকালের খিচিমিচি।
ফুল ধরেচে প্রেমের লতায়,     রাখিনে খোঁজ নরক কোথায়,
শুন্‌বনাকো যতই মোরে বানিয়ে পাপী কর ছিছি!

"বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে?" কাজ কি রে তোর মাথাব্যথায়?
দিন কেটে যায়, আস্‌চে জরা, কে ব'সে আর ও-সব খতায়?
আজ্‌কে যখন আছিস্ বেঁচে,     জীবন-সায়র দ্যাখ্‌রে সেচে,
শীতের আগে ফুল তুলে নে যৌবনেরি তনু-লতায়!

কেই বা পাপী, কেই বা সাধু—সবাই সমান মরণ-পারে,
স্বর্গ-নরক কে দেখেচে, সাক্ষ্য দিতে কেউ তো নারে!
ভীরুরা সব কল্পনাতে,     অম্‌নি হাজার গল্প গাঁথে—
কিন্তু আমি হেল্‌বনাকো মিথ্যা ভয়ের তুচ্ছ ভারে!

যতই আঘাত কর আমায়, মচ্‌কে তবু পড়্‌বনা গো!
দুখের মাঝে, শোকের মাঝেও তোমায় স্বীকার কর্‌বনা গো!
মরণ-সাঁঝে যখন বিভু,     জীবন-রবি নিভু-নিভু,
তখন নরক স্মরণ ক'রে চরণ তোমার ধর্‌বনা গো!

যৌবন, তুই মুখ তুলে চা' নতুন ফুলের রেণু মেখে,
চাইনে আমি কর্‌তে দোহন সোনার কল্পধেনু থেকে।
ভুল্‌ব জীবন বিষাদ-করুণ,     বাঁচ্‌ব যদিন থাক্‌ব তরুণ—
অন্তরেরি ছন্দে উঠুক্ চঞ্চলতার বেণু ডেকে!

এ মোর প্রাণের বিপুল তোড়ে ভাসিয়ে দেব দুষ্ট জরা,
চিত্ত-দোলা নিত্য র'বে পুষ্পমাসের নৃত্য-ভরা!
চুল পাকিয়ে বিত্ত খুঁজে,     যার খুসি সে মরুক্ যুঝে,
আমি সুধুই ঝরিয়ে যাব জম্‌বে যত জীর্ণ-মরা।

আনন্দেতে রহ রে ভাই, কল্পরসে মগ্ন হয়ে,
কে জানে রে কখন্ যাবে সুখের শুভলগ্ন বয়ে!
রাখ্‌বি হৃদয়-কুম্ভ পেতে,     ভর্‌বি গো তা চুম্বনেতে,
আজ বাদে কাল মর্‌বি ব'লে হোস্-নে কভু ভগ্ন ভয়ে!

মনের মানুষ নে খুঁজে মন, মনোভবের রঙ্গশালায়,
প্রেমের চাবি খুল্‌বে রে তোর মর্চ্চে-পড়া মর্ম্ম-তালায়!
প্রেম বিনা যে জীবন রাখে,     পশুর অধম বল্‌ব তাকে,
কুণ্ঠিত নরক সে যে, সঙ্গ তাহার অঙ্গ জ্বালায়।

হে ভগবান, চেষ্টা ক'রে বস্‌তে গেছি জপাসনে—
সাধ হয়েছে ধর্‌ব তোমায় ধ্যানের টানে প্রাণের কোণে!
কিন্তু মানস-নয়ন দিয়ে     তোমায় প্রভু দেখ্‌তে গিয়ে,
কেবল দেখি সখীর আঁখি ছড়িয়ে আছে বিভোর মনে!

সত্য যাহা সাম্‌নে জেগে, কেমন ক'রে ভুল্‌ব তাহা?
নেইকো তুমি, কিন্তু আছে মরুর দাহ, ঝড়ের হা-হা!
উর্দ্ধে, অধে যেদিকে চাই,     শূন্য ছাড়া কিছু না পাই—
বেতার হ'লে হৃদয়-বীণা নামটি তোমার যায় কি গাহা?

তবু যদি থাকোই তুমি—চাইনে আমি তোমার ক্ষমা!
পূর্ণিমাকে যখন পাব, তখন কেন ভাব্‌ব অমা?
হে অজানা বিরাট ভীতি!     ভয় না-পাওয়া আমার রীতি,
যা হবার তা হবেই পরে না-হয় পাপের খাতায় জমা!

নিন্দুকেরা ব্যস্ত যখন নিয়ে আমার পাপের কথা,
সেই ফাঁকেতে পালিয়ে যাব মানসী মোর লুকিয়ে যথা।
বাজ্‌বে সুরে মন-বেয়ালা,     ধর্‌ব পেতে প্রাণ পেয়ালা,
শব্দ-পরশ-গন্ধ-রসে ভুল্‌ব যত ধরার ব্যথা।

বক্ষে প্রিয়ার স্বর্গ আছে, স্বর্গ আবার উর্দ্ধে কোথায়?
শূন্যে আছে শূন্য রে ভাই, ভুলনা মন, মিথ্যেকথায়।
প্রিয়ার হিয়ার কমল-বনে,     আয় পিয়াসী, অমল মনে,
শ্যামের বাঁশীর না-শোনা তান গুঞ্জরিছে আজও তথায়।

ডাগর চোখের ভাব-গীতিকার অর্থ যে সই বুঝ্‌তে পারে,
বাউল হয়ে দেয় সে সাঁতার তোমার হৃদয়-পারাবারে।
জিরায় যে এই জীবন-চারা—     এ মোর হিয়ার শোণিত-ধারা,
পদ্ম-পায়ের অলক্তকই রক্ত-রঙে রাঙায় তারে।

মর্ম্ম-তালে বদ্ধ হয়ে কাব্য শত—ছন্দ শত,
প্রশ্বাসের ঐ অন্দরেতে চন্দনেরি গন্ধ কত!
ঈশ্বরেরি শিষ্য যে হায়,     তোমায় ছেড়ে বনে সে যায়,
নন্দনে তার নেই আনন্দ, অন্তরে তার চন্দ গত।

আমার গেহে নেই দেবতা কঠিন-বোবা পাথর-গড়া,
ভক্তি-নদী রুদ্ধ বুকে, শুষ্ক সেথায় শুষ্ক চড়া!
প্রস্তরের ঐ চরণ ধ'রে,     শান্তি কি পাস্ বন্দনা-জোরে,
অশ্রু নিয়ে নেত্র-কোণে, মিথ্যা তোদের মন্ত্র-পড়া!

সৃষ্টি যে তোর ইষ্টদেবী হত্যাকারীর কল্পনাতে—
রক্ত-ধারার আল্পনাতে—জল্লাদেরি জল্পনাতে!
কান্না নিয়ে আপন প্রাণে, পরকে মারিস্ মারণ-বাণে,
দেব্‌তা যেমন পূজাও তেমন, ধর্ম্ম আছে অল্প তাতে!

বেশ আছি ভাই! রূপের পূজায় দিন চ'লে যায় নাচের তালে,
আমার দেবী হন্ গো খুসি চুমো পেলেই রঙিন্ গালে!
তোমরা শিলায় লুটিয়ে মাথা, গাইছ পরকালের গাথা,
আমি আছি বিভোল সুখে জড়িয়ে ধ'রে ইহকালে!

আয় পালিয়ে, আয় পালিয়ে,—শ্মশানে ঐ উড়্‌চে ধোঁয়া!
মরণ-স্বপন জাগ্‌লে ও তোর শিউরে গায়ে উঠ্‌বে রোঁয়া!
দেখ্‌ব প্রিয়ার আনন-বিধু, কর্‌ব গো পান অধর-শীধু,
অনেক মধু বধূর ঠোঁটে—মধুর কম্‌লালেবুর কোয়া!

সাজুক্ শ্যামে উপত্যকা—ঝরুক্ বুকে ঝর্‌ণাটি ওর,
হে প্রকৃতি জননী গো, আজ্‌কে আমি ধর্‌না দি তোর!
বাজুক্ তোমার আলোর-বাঁশী, সাঁঝ-সকালে পাখীর হাসি,
তোমার কোলেই বসত্ আমার, কর্‌ব যে ঘর-কন্নাটি মোর!

ঈশ্বরী যে নওগো তুমি, তাই হয়েছ জীবের ধাতা!
জন্মদুখীর তরেও তোমার আছে স্নেহের আঁচল পাতা।
কষ্টে হাসি, তেষ্টাতে জল, শয়নে বাস, ক্ষুধাতে ফল,
অবসরে কাব্য শোনাও খুলে তোমার সবুজ খাতা।

দখিন হাওয়া, দখিন হাওয়া, আয়না অলখ্ পাখ্‌না মেলে,
কানন-বীণার শ্যামল তারে সুরের লীলা যাক্‌না খেলে!
নদীর কূলে মনের ভুলে, গাঁথ্‌ব মালা বনের ফুলে,
স্বর্গে আমি যাবনা তোর দোদুল-দোলার থাল্‌না ফেলে!

পূর্ণিমার হে পূর্ণশশী, চূর্ণ কর অন্ধকারে,
কাতর আমি ধরার শিশু, কর্‌চি তোমায় বন্দনা রে!
অতীত্ কথা দাও ডুবিয়ে, জোছ্‌নাতে মন নাও ছুপিয়ে,
আমার হিয়ার নীল-আকাশে যেওনা চাঁদ, অস্ত-পারে!

তুমিও এস নিরুপমা, কোল ঘেঁসে মোর স'য়ে এস,
শ্রান্ত প্রাণের রন্ধ্‌ গুলি ছন্দে তোমায় ভ'রে এস।
কান্না আমি শুন্‌তে না চাই, চিন্তা-জাল আর বুন্‌তে না চাই,—
'আমি তোমার, তুমি আমার'—অন্য কথা হ'রে এস!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# আলোচনা

## কাব্যে ভাব-তান্ত্রিকতার স্বরূপ

কাব্যের কথা বলিতে যাইয়া এমার্সন বলিয়াছেন,—

In poetry we require the miracle The bee flies among the flowers and gets mint and marjoram, and generates a new product, which is not mint and morjoram, but honey. The chemist mixes hydrogen and oxygen to yeild a new product, which is not these, but water, and the poet listens to conversation, and beholds all objects in nature, to give back, not them, but a new and transcendent whole.

অর্থাৎ কাব্যে যে জিনিষটা চাই, সে হইতেছে অতি-প্রাকৃত। মধুকর ফুলে ফলে উড়িয়া মিণ্ট ও ম্যারজোরাম্ আহরণ করিয়া একটা নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে যাহা এ দুয়ের কোনটাই নয়—মধু। রাসায়নিক হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেনের মিশ্রণে একটা তৃতীয় পদার্থ উৎপন্ন করেন যাহা উভয়ের কোনটাই নয়—জল। কবিও তেমনি প্রকৃতির আলাপ শুনিয়া ও সকল দৃশ্য দেখিয়া যাহা ফিরাইয়া দেন, তাহা তাঁহার দেখা শুনা হইতে স্বতন্ত্র এক অভিনব অতীন্দ্রিয় অখণ্ড বস্তু।

রূপে-রসে-স্পর্শে-গন্ধে চারিদিক হইতে অবিরল বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্রতা আসিয়া কবির মনের উপর সঞ্চিত হইতে হইতে সেখানে নব নব রূপের সৃষ্টি করে। এই নব সৌন্দর্য্য, অভিনব আবিষ্কার যখন কবি আমাদের চোখের কাছে ছন্দোবদ্ধ করিয়া তুলিয়া ধরেন, তখন তাহা কাব্য। সুতরাং কাব্যের মূলে হইতেছে সৃষ্টি বা আবিষ্কার।

সৌন্দর্য্য নীড় বাঁধিয়া থাকে বস্তুর অন্তরে। দৃশ্যমান বাস্তব তাহার অন্তরের বা মনের বাহিরে কেবল একটা নির্জীব আবরণ, একটা খোসা মাত্র। এমার্সন বলেন—There is no beauty of forms in our philosophy. অর্থাৎ দর্শনের মতে বাহ্য-দৃশ্যের সৌন্দর্য্য নাই। এমার্সনের ধারণায় বাহিরের রূপকে সৌন্দর্য্য বলিয়া মানিয়া লওয়া

is a proof of the shallowness of the doctrine of beauty. —সৌন্দর্য্যের সে ধারণা অতি অপকৃষ্ট। সুতরাং সৌন্দর্য্যের উপাসক কবিকে হইতে হইবে মনের সন্ধানী, যাইতে হইবে নূতন-কিছুর দিকে।

মানুষ তিন রকমে এই বিশ্বকে দেখে। পাহাড়ে উঠিয়া এক ব্যক্তি বড় বড় গাছগুলি দেখিয়া ভাবে ঘরের খুঁটি তক্তার কথা; আর একজন দেখে গাছে গাছে নূতন নূতন ফুলের সৌন্দর্য্য, গাছের শাখায় শাখায় রং-বেরংয়ের পাখীর আনন্দ-লীলা ইত্যাদি। সেই গাছ ফুল পাখী দেখিয়া দেখিয়া আর একজনের দৃষ্টি ভরিয়া ওঠে বিচিত্র স্বপ্নতরঙ্গে। মনের রসানে, প্রাণের রংয়ে রঙিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য জল্ জল্ করিতে থাকে তাহার নয়ন ভরিয়া। প্রথম ব্যক্তির দৃষ্টি ষোলআনা প্রয়োজনীয়তায় অন্ধ। দৈনন্দিন স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতিমাত্র সেবায় সে হারাইয়া ফেলিয়াছে অন্তর্দৃষ্টি। স্থূলত্বের গভীরতা ভেদ করিয়া পৌঁছিতে পরিতেছে না তাহার দ্বারে সূক্ষ্মের আভাসটুকু, ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই সে প্রাণীজীবনের অতি সাধারণ স্তরকে—যেখানে মানুষ কেবলই খাওয়া পরার মানুষ, অবয়বের হিসাবে মানুষ। দ্বিতীয় দেখিতেছে নিত্যকার প্রয়োজনীয়তা হইতে, লাভালাভের হিসাব-নিকাশ হইতে একটু আলাদা হইয়া কল্পনা-হীন সহজ সরল সাদা দৃষ্টিতে। সে-ও আত্মার সন্ধান পায় নাই; দৃষ্টি তাহার স্থূলত্ব হইতে একটু স্বতন্ত্র হইলেও পৌঁছিতে পারে নাই সূক্ষ্মের রাজ্যে, যেখানে গেলে সে হইয়া উঠিতে আত্মার মানুষ। তৃতীয় ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনযুক্ত সাদা মনের মাঝে রচিয়া লইয়াছে কল্পনার কুসুমোদ্যান, ভরপুর হইয়া উঠিতেছে তাহার বুকের পরতে পরতে কত না স্বপ্নের ছবি; ঢেউয়ে আসিতেছে তাহার চারিদিকে কতনা সৌন্দর্য্যের নব নব লীলা। এই স্বপ্নই হইল নিছক সৌন্দর্য্য। ভাব-তান্ত্রিকের কাব্য এই তৃতীয়ের দৃষ্টি লইয়া।

কবি আঁকিয়া দিবেন বস্তুর প্রাণ, ধরাইয়া দিবেন মনটীকে। কবির লীলা-খেলা প্রাণকে নিয়া, প্রাণহীনকে নিয়া নয়। কবি revealer of the soul of things, বাহ্য-প্রকৃতির যদি কিছু দরকার হয় সে কেবল বস্তুর প্রাণেরই প্রয়োজনের হিসাবে। বিশ্ব যে চিরদিন তোমার আমার চোখের কাছে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাকে তেমনি আঁকিবার চেষ্টায় কি লাভ? তাহার অতলস্পর্শ গভীরতার মাঝে যে বৈচিত্র্য, যে প্রাচুর্য্য, যে তরঙ্গলীলা, যে জীবনোল্লাস তাহার সন্ধান দিয়াই তো তুমি কবি, তোমার বিশেষত্ব। কবি হইতেছেন দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। তিনি আপনার প্রাণ দিয়া বস্তুর প্রাণ ধরিয়া নূতনের উদ্ভব করিবেন। বিশ্বপ্রকৃতির আত্মার সহিত আত্মার মিলনে হয় সৃষ্টি। It is the expression caught from a glimpse of the soul of nature by the soul of man. কবির প্রশংসা হইবে প্রকৃতি বা বস্তুর মনোবিহারী তাঁহার অন্তরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয়ে।

সুতরাং ভাবাত্মক কাব্যে হইতেছে ইন্দ্রিয়াতীত এক নব রসের সৃষ্টি। যেখানে বিশ্বের সহিত সকলের যোগ, সেই নিগূঢ় গোপন রাজ্য হইতে কবির কাব্য রসপুষ্ট হইয়া এক নূতন পুরাতনের আনন্দ-খেলা জমাইয়া তোলে। উহাতেই কবির সফলতা, চরম সাধনা, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কবি ধীরে ধীরে বাস্তবতা বা বাহিরের westureকে ছাড়াইয়া সত্য সাধনার আলো-পথে চলিতে চলিতে স্বতঃই গাহিয়া উঠিল—

"যে গান কানে যায়না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা-মাঝে।"

বাহিরে ভাঙ্গন ধরিয়া ধরিয়া এমনি অন্তরের কূল তাঁহার গড়িয়া চলে। কবি অন্তর্জগতের রস-সমুদ্রে ক্রীড়ামত্ত মীন। সেখানে খেলা—কেবলই খেলা—অন্তহীন অপার অকূলের মাঝে খেলা। সে খেলার সৃষ্টি কেবলই অস্পষ্টতার বেদনায় গুমরিয়া ওঠে। কবির কাব্যে সে খেলার এতটুকুই প্রকাশ পায়, অথবা কাব্যে প্রস্ফুটিত কবির মনটীতে রস-সন্ধানী মরমীই সে খেলার আনন্দটাকে পুরাপুরি চিনিয়া লন; একমাত্র ভাব-রসিকেরই নয়ন ঝলসিয়া ওঠে কাব্যের এই আধ-বুলির মাঝে পূর্ণতার পরিচয়ে।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

---

## নারীর প্রতি অবিচার

বর্ত্তমান বৎসরের গত শ্রাবণের ভারতীতে শ্রীযুক্তা উমাললতা বসু কর্ত্তৃক লিখিত "নারীর অতি অবিচারে"র প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্তা তরলাবালা দেবী অগ্রহায়ণের ভারতীতে উহার আপত্তি সকল খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অভিলাষ রাখি।

১। নারীর চলাচলের অধিকাংশই যে পুরুষের হস্তগত তাহা অস্বীকার করিবার পথ কি প্রকারে পাওয়া যায়? শাস্ত্রখানি "স্ত্রীলোকের স্পর্শ নিষেধ" প্রচার যে কোনও স্ত্রীলোক দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা ধারণা করা বাতুলতা। এই শাস্ত্রের বচন লইয়াই সমাজের গঠন। শাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থার প্রতিকারের পথগুলি যে অতি চতুরতার সহিত রক্ষা করা হইয়াছে তাহা কাহার অবিদিত? ন্যায় নাই কেহ তবে জোর করিয়া মুলুক কাড়িয়া লইলে বিপক্ষের নিষ্ফল ক্রন্দনও অনিবার্য্যই। খাঁচার দরজায় তালা লাগাইয়া বসিয়া থাকিলে পক্ষীর উড়িবার অক্ষমতা কাহার উপর নির্ভর করে? তখন কুলুপ-ধারী ভিন্ন আর কাহার নাম করা যায়?

২। সকল দোষ পুরুষের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া যে সঙ্গত নয় তাহা ঠিক—কিন্তু পরামর্শ-দাত্রীরা জানেন যে, কর্ম্ম-কর্ত্তাকে—মাত্র পরামর্শ দিতেই তাহারা, ক্ষমতা, আক্রোশ ও শত্রুতা সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই

সেই স্ত্রার স্বামীকে হাত করা প্রয়োজন, তাহা পরামর্শ-দাত্রীরা খুব ভাল রকমই জানেন। কুপরামর্শ ও কুশিক্ষা মাত্র অশিক্ষারই ফল ও সুশিক্ষারই অভাব—তাহারও পথ পুরুষের জন্য উন্মুক্ত এবং মেয়ের জন্য অধুনা আংশিক পরিমাণে মুক্ত থাকিলেও শতকরা কয়টী পুরুষ শিক্ষিত ও কয়টী স্ত্রী শিক্ষিতা তাহার তালিকা দেখিলেই মীমাংসা হইয়া যায়।

৩। মাতা ও ভগ্নীর প্ররোচনায় স্ত্রী ত্যাগ ও প্রহার করার দৃষ্টান্ত বহু—কিন্তু স্বামীকে যদি নির্ভরশীল পত্নীর সমর্থন করিতে তাঁহারা দেখিতে পান তাহা হইলে কেহই দুর্ব্যবহার করিতে সাহস পান না। বিবাহের উপযুক্ত হইয়া ও স্ত্রীর রক্ষণে সমর্থ হইয়া বিবাহ করিলেই মাতা ভগ্নীর দুর্ব্যবহার ঘটিতে পারে না।

৪। নারীর নিজের দোষে জীবন ব্যর্থ হয় ইহা মাত্র আংশিক পরিমাণে সত্য—উহা অজ্ঞতা ও অজ্ঞ শাসনের ফল। নিজেকে উপযুক্ত করিবার ভার নিজের হস্তে এক কণাও নাই এবং থাকিলেও তাহা লক্ষে একটী মাত্র।

৫। বিদ্যাবতী, গুণবতী ও রূপবতী নারীও যে পাশ্চাত্য দেশে অনেক স্বামী হইতে প্রাপ্ত দুর্ব্যবহার নীরবে হজম করিয়া থাকেন তাহা খুবই সত্য—কিন্তু সেখানে পত্নীর উপদ্রবও বহু পরিমাণে হজম করিতে হয়। গৃহই তাহার নাম—যথায় আনন্দের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত সহনীয়তা বহু পরিমাণে বর্ত্তমান, যেথানে জোর-জবরদস্তি নাই—কিন্তু এদেশে সামাজিক আইন বল-প্রচারের জন্য কতটা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত ও কতটা যে জোর-জবরদস্তি করে তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই।

৬। শাশুড়ী ননদ যদি পত্নীকে সর্ব্বাবস্থায় স্বামীর রক্ষক জানেন এবং নিজেরাও ঐ ভরসা পাইতে থাকেন তাহা হইলেও কাহারও সূচ ফুটাইতেও সাহস হইবে না।

৭। পরাধীনতা যেরূপ বাঙালী জাতিকে সত্য, ধর্ম্ম, সাহস ও ন্যায় হরণ করিয়া নীচতা কাপুরুষতা ও শঠতার পথে নিয়ত চালিত করিতেছে—স্ত্রী-সম্বন্ধেও তাই। বিশাল উন্নত বৃক্ষও আবরণের নিম্নে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ইহা বিশ্বজনীন সত্য।

৮। বাহির হওয়ার নূতনত্ব ঘুচিলে যে কেহ আর ঐরূপে তাকাইবে না তাহা সত্য, কিন্তু স্ত্রীলোকের বাহিরে যাইবার পথ যে কত সঙ্কীর্ণ—তাহা প্রতিগৃহেই লক্ষিত হয়।

৯। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের বিপক্ষতা লইয়াই জগতের সর্ব্ব চলাচল—ভাল ও মন্দের বিপক্ষতা—ও সত্য মিথ্যার তারতম্য লইয়াই সকল জাগতিক কর্ম্ম নৈতিক ধারায় সম্পাদিত হয়, সুতরাং পাপ আছে বলিয়াই পুণ্যকে তফাৎ হইতে হইবে না, ঐ পাপ ভেদ করিয়া পুণ্যকে প্রকাশ করাতেই মনুষ্যত্বের পরিচয়। বনের সিংহ বাঘ ইত্যাদি হইতে কোনও মানব অধিক বলশালী নহে, প্রশ্নও ঐখানেই—হিংস্র জন্তুপূর্ণ বন যেরূপ লোকে সভয়ে ত্যাগ করে সেরূপ মনুষ্যকেও যদি পশুত্ব-পূর্ণ মানবের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে সেখানে শ্রদ্ধার পথ কোথায়? আগা থেকে গোড়াতেই ভয়, আর আতঙ্ক।

১০। সাধু, চোর, ভদ্র, অভদ্র তো আছেই, মাতার মাতৃত্বের বিকাশেই সন্তানের পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা—মাতার শিক্ষা হইলেই সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয়, কিন্তু মাতার শিক্ষার পথ বন্ধ ও পুত্রের খোলা—কাজেই মূর্খ মাতার বিদ্বান পুত্রই দাম্ভিক মাতৃশাসক হইয়া বসে।

১১। পুরুষ সৎকর্ম্মে অগ্রসর হইলে মাতা ভগ্নী স্ত্রী কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া করিতে গেলেও তাহাকে কেহই দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন না—কিন্তু স্ত্রী মাতা ও ভগ্নী যদি পুরুষের অমতে কোনও সৎকর্ম্মে অগ্রসর হন, তাহার ফল হয়, তাহাকে নানা প্রকার লাঞ্ছনা ও গৃহ বহিষ্করণের ভয় প্রদর্শন করা এবং তদুপরি তাহার চরিত্রে দোষারোপ করা!

১২। প্রলয়ঙ্করী স্ত্রী-বুদ্ধির যে কতটা এ সংসারে প্রয়োজন তাহা মানবমাত্রেই অবগত আছেন; অথচ আত্মপ্রাধান্য খর্ব্ব হইবার আশঙ্কাতেই এরূপ একটা বচনের সৃষ্টি করিয়া আত্মগরিমা বজায়ের চেষ্টা হইয়াছে। ঐ বচনটীও যে কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা রচিত নহে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। সমগ্র মানব জাতি যে স্ত্রীবুদ্ধি ও ক্ষমতার দ্বারাই সৃজিত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য; মাত্র শিক্ষার অভাবে নীচতা ও হীনতার আশ্রয় লইতেছে—যেরূপ অফিসের পদপ্রার্থী বাবুরা অপরের অনিষ্টের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নিজের ইষ্ট সাধনে যত্নবান থাকেন। অমনোনীত কন্যার প্রতি কুব্যবহার যে একমাত্র শাশুড়ী ও ননদই করেন তাহা স্বীকার করি না। পুত্র সক্ষম হইলেই মাতা ও ভগ্নীর অমনোনীত কন্যা গ্রহণ করিতে বহু বহু দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়, তাহাতে মাতা ও ভগ্নীরা কিছুই করিতে সমর্থ নন।

১৩। পুরুষেরা এই সকল অভিযোগ পাঠ করেন না তাহা বিশ্বাস করি না—তবে তাঁহারা শিক্ষার প্রসারতা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই দৃষ্টিরও প্রসারতা লাভ করিয়াছেন এবং সামাজিক নিত্য সত্য উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়াই ইচ্ছামত উত্তর দিতে অপারগ, ইহা স্মরণ রাখিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে শ্রীযুক্তা তরলাবালা দেবী যে শ্রীযুক্তা তমাললতা বসুর অদূর-দর্শিতার অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার সমর্থন করিতে পারিলাম না এবং শ্রীযুক্তা তরলাবালা দেবীর নিকট বিনীত নিবেদন যে, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বাঙ্গালার (পরদানশীন) গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে ও সহরবাসী বঙ্গগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিগৃহের চলাচল, ধ্যান-ধারণার আলোচনা জানিয়া ও সামাজিক নিত্য সত্য উপলব্ধি করিয়া তবে পুনরায় ঐ সকল বিষয়ের আন্দোলন করিবেন। একটী গৃহ ও মাত্র নিজ আত্মীয়-কয়টীই জাতির সমষ্টি নহে, ইহা স্মরণ রাখিবেন। পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্র সকলেরই ভক্তি, স্নেহ, প্রেম ও বাৎসল্যের স্থান অধিকার করিয়া আছেন, ইহা সকলেই জানেন।

শ্রীস্বর্ণলতা সরস্বতী।

## নারীর কথা

### আড্ডায়

কলেজের ছুটীর পর মেসে আড্ডা বসিয়া গিয়াছে। ছুটী নিকটবর্ত্তী, সুতরাং আড্ডা জমিয়াছে বেশ—হাসি, তামাসা, চীৎকার তর্ক-বিতর্ক কিছুই বাদ যাইতেছে না। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা হইতেছে অর্থাৎ আড্ডাতে জীবন্ত Cyclopœdia বিরাজমান। কথায় কথায় স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা উঠিয়া পড়িল। রসিক অঙ্গভঙ্গী সহ বলিয়া উঠিল—"এখন দেখা যাক্, আমি ত ঠাঁই নেড়ে বসি।"

অবলাকান্ত। হতভাগা, এটা যেন একটা ঠাট্টার জিনিষ! Female emancipation—যার জন্যে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই প্রাণপাত করা উচিত—তা নিয়ে ঠাট্টা! আচ্ছা, মহিলাদের কথায় ঠাট্টা করতে তোমাদের একটু লজ্জাও হয় না? বাস্তবিক যখন জাতিটা পড়ে যায় তখন তার সব দিক থেকেই পতন হয়। আমাদের দেশের মহিলাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য কোথায় আমরা অনুতপ্ত হব—ত না, আবার আমরা তাই নিয়ে বড়াই করি। মরণ আর কাকে বলে?

হরিপ্রসাদ। কেন ভায়া মরণের definitoinএর জন্যে এত ব্যস্ত কেন? লম্বা Lecture দেওয়াটা বেশ মানায়। কিন্তু আমরা যে কিসের জন্যে অনুতপ্ত হব তা'ত কিছু বল্লে না? আমি ত দেখছি মেয়েরা দিব্যি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে তাস খেলে—মজা করেই দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছেন। পথে রৌদ্র বৃষ্টিতে কষ্ট পেতে হয় না—আপিসে সাহেবের কাছে বকুনি খেতে হয় না। আমি ত দেখছি তাঁদের অবস্থাই পুরুষদের বাঞ্ছনীয়, তবে অমন উল্টো সুর ভাঁজ কেন দাদা!

অবলা। Pig's happiness। মানুষ মানুষের মত মতই থাকবে, তার আত্মা আছে……

রসিক। দাদা, Pig এরও ত আত্মা আছে—আব্রহ্মাণ্ড……

অবলা। একটু চুপ কর না হে! Pig আর Manএ যে তফাৎ আছে তা আমরা ভুলে গেছি। আমরা ভুলে গেছি যে শুধু খাওয়া থাকা ঘুমানোতেই মানুষের আত্মার তৃপ্তি হয় না—তার আরও কিছু চাই—সেটা হচ্ছে মুক্তি। সব দিক থেকেই তার বন্ধন কেটে দিতে হবে, সে প্রাণ খুলে যেন বল্‌তে পারে—আমি মুক্ত। আমরা নিজেরা মুক্তির মূল্য বুঝি না—সুতরাং যাঁরা মুক্তি কামনা করেন তাঁদের উপহাস করি। আজ নারীর মনে মুক্তির কামনা জেগেছে বলে তাঁকে আমরা চেপে ধরেছি—নিশ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলবার জোগাড় করছি। আমরা নারীদের সম্মান করতে জানি না—তাই আজ আমরা নিজেরাও সম্মান-হারা। আমাদের বাঁচ্‌বার জন্যেও অন্ততঃ নারীদের স্বাধীনতা চাই—চাই Female emancipation.

রসিক। কি বল্লে ভায়া, ফিমেল ইমানসিপেসন—ফিমেল ইমান-সিপেসন,—হাঁ এটা মুখস্থ করতে হবে—বক্তৃতার সময় কাজে লাগবে।

সুধীর একপাশে বসিয়া তর্ক-বিতর্ক শুনিতেছিল। সে এইবার ধীরে ধীরে বলিল—ঐ কথাটা আমার কাণে বড় বিসদৃশ ঠেকে, ঐ Female emancipation……

অবলা। হুঁ—তবে তুমিও ঐ দলে? It is all damned.

সুধীর। অত উত্তেজিত হও কেন হে? কোন দলাদলির কথা নয়, দল পাকিয়ে কোন কাজ হয় না—ফলে শুধু গালাগালিই চলে—এ কথাটা যদি আমরা এখনও বুঝতে না পারি, তবে……

রসিক। তবে বুঝব যেদিন অক্কা পাব। তাতে আমার আপত্তি নেই এখন ত মনের সুখে গালাগাল দিয়ে যাই।

সুধীর। আমি বল্‌ছিলাম Female emancipation কথাটা আমি বড়ই ঘৃণা করি। কারণ কথা দ্বারা নারীদের যতটুকু অপমান হয় তত আর কিছুতে হয় কিনা জানি না। Emancipated হয় কে? Slave (ক্রীতদাস)। কিন্তু মহিলাদিগকে আমি ক্রীতদাস মনে করি না—আর সত্যিকার ক্রীতদাসের অবস্থাও তাঁদের নয়, তবে এমন অপমানজনক ভাষা প্রয়োগ করতে যাই কেন? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহিলারা নিজেরা এই সব কথা ব্যবহার করে নিজেদের অপমানের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে কুণ্ঠিত নন।

অবলা। তবে কি আপনি বলতে চান যে, মহিলাদের অভিযোগের কিছুই নেই?

সুধীর। হাজার বার স্বীকার করি তাঁদের অভিযোগ করবার যথেষ্ট কারণ আছে—বিশেষত বাঙ্গালী মহিলাদের। অবস্থার পরিবর্ত্তন যে কর্ত্তে হবেই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—আর আমরা ইচ্ছায় না করি ত অনিচ্ছায় কর্ত্তে বাধ্য হব। কিন্তু কি ভাবে কি কর্ত্তে হবে তা স্থিরভাবে চিন্তা করে দেখা ভাল। চোখ বুঁজে পরের অনুকরণ কর্ত্তে গেলে বিপথে যাবার আশঙ্কা আছে।

হরিপ্রসাদ। বিপথে যাবার আশঙ্কা যে আছে শুধু তাই নয়—আপনারা সে পথে যাত্রা সুরু করেছেন। মেয়েদের অবস্থা দেখে শিয়াল কুকুরে কাঁদে—তাঁদের উদ্ধার কর বলে যারা চীৎকার করছেন, তাঁরা কি বুঝতে পারেন যে মেয়েরা কি চান—তাঁদের কি অভাব আছে? আমি ত মেয়েদের অভিযোগের কোন কারণ দেখি না। আর সত্যি সত্যি মেয়েরা কিন্তু নাকি সুরে কাঁদছেন না, কাঁদছেন নব্য বাবুর দল আর বিলাতী মেমদের অনুকরণ করে দু-এক জন কাব্য-বিলাসিনী মেয়ে। এ হচ্ছে যেন 'সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়।' যদি সত্যিকার দুঃখ-কষ্ট কারও থাকে ত সে পুরুষের। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি তারপর সংসার প্রতিপালনের দুশ্চিন্তা ও কষ্ট। কিন্তু মেয়েরা কি করছেন? যাঁরা আমাদের খুব অনুগ্রহ করেন তাঁরা হয়ত জলখাবারটুকু তৈরী করেছেন—নয়ত পায়ের উপর পা দিয়ে বসা আর নভেল পড়া ও খেলা। এই ত!

রসিক। বেশ ত দাদা! অন্দরমহলে ঢুকে পড় না—মেয়েরা একা মজা লুটবেন কেন? অদল বদল করে নাও।

অবলা। কথাটা মন্দ নয়। যাঁরা বলেন যে মেয়েদের কোন অভাব-অভিযোগ নেই তাঁরা সেই অন্ধকূপে অর্থাৎ যাকে আমরা পবিত্র অন্দরমহল বলি সেই অন্ধকূপে গিয়ে ঢুকুন না! যে পরকে অন্ধকারে রাখতে চায় সে যে অন্ধকারের ধ্যান করে নিজেই অন্ধ হয়ে যায়। একবার সভ্যতার লীলাভূমি উন্নতির বিচরণ-ক্ষেত্র পাশ্চাত্য জগতের দিকে চেয়ে দেখ তারা কি করছে—আর আমরা কি করছি। জ্ঞানে গরিমায় দীপ্ত তারা, আর আমরা দীনহীন পর-পদানত কাঙ্গাল। হবে না—? শত শত বৎসর ধরে আমরা নারী-রক্ত পান করে আসছি। অন্ধকূপে বন্ধ করে তাঁদের বাহিরে-ভিতরে অন্ধ আর পঙ্গু করে রেখেছি। তাঁদের ছোট ভেবে আমরা নিজেরাই ছোট হয়ে গেছি। আমাদের পতনের কারণ নারীশক্তির অভাব—হাজার হাজার বছর ধরে নারী অন্ধকূপে অসহ্য যাতনা সয়ে আসছেন……

রসিক। আর যাই হোক দাদা, একটা কথা সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল—খুব বৈজ্ঞানিক সত্য, অস্বীকার কর্‌বার যো নাই!

অবলা। সেটা কি?

রসিক। সেটা এই যে আমাদের নারীর শক্তি অসীম—না দাদা তা মানতেই হবে Darwin সাহেব বলে গেছেন।

হরিপ্রসাদ। কি বলে গেছেন?

রসিক। ডারুইন সাহেব বলে গেছেন "Survival of the fittest" এ-ই বড় বুক, জোয়ান মদ্দা ইংরেজ সিপাহীগুলো কিনা অন্ধকূপে থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে মরে গেল, যদিও হলওয়েল ভায়া মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন! আর এই হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েরা অন্ধকূপে বাস করছেন অথচ তাঁদের মরণের কোন চিহ্ন নাই-ই, বরং জনমের জ্বালায়ই অস্থির। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আমাদের মেয়েরা Fittest. Q. E D.

হরিপ্রসাদ। কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু অবলা, তুর্কীরা নাকি ঘোর পর্দ্দানশীন। তাঁরা ত প্রায় সমস্ত ইউরোপের মালিক ছিলেন আর এখনও দেখা যাচ্ছে যে তাঁদের ধড়ে প্রাণ আছে। তাঁদের পতন যে কারণেই হউক তা পর্দ্দায় নয়, কারণ নারী-স্বাধীনতার দেশগুলি তাঁদের পদানত ছিল। আবার পৃথিবীতে অসংখ্য জাতি আছে যাদের মধ্যে নারীরই প্রাধান্য, কিন্তু তাদের অবস্থার সঙ্গে তোমাদের অবস্থার বদল করতে রাজী আছ কি?

সুধীর। এরূপ উদাহরণ দিয়ে তর্ক করার কোন সার্থকতা নাই। কারণ নারীর স্বাধীনতা বা অধীনতাই কোন জাতির উত্থান বা পতনের একমাত্র কারণ নয়। আর শুধু তর্ক না করে বাস্তব-জগতের দিকে দৃষ্টি রেখেকাজ করাই ভাল। অন্ধভাবে কিছুর পেছনে যাওয়া মঙ্গল-কর নয়।

অবলা। হরিপ্রসাদের কথাই ধরা যাক্ না। ওটা ত ভুয়ো তর্ক,—ঐ অসভ্যদের স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা। স্বাধীনতা আছে, সম্মান নাই। আমাদের কিছুই নাই, আছে ঐ মরা শাস্ত্রের বুলি, তাও আবার কি মহত্ত্ব-পূর্ণ! ও-গুলিকে শাস্ত্র বলে না মেনে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেই ভাল কাজ হয়,যাতে··

রসিক। আরে দাদা, শাস্ত্র যে মানতেই হবে। একবার মাঘোৎসবের সময় পিক্‌নিক্ কর্ত্তে গিয়াছিলাম এক পাহাড়ে জায়গায়। সেখানে গিয়ে দেখি সাড়ে পাঁচ হাত উঁচু কাল পর্দ্দা আসরকে দুভাগ করে দিয়েছে। আমার বিস্ফারিত চক্ষু দেখে সম্পাদক মহাশয় বল্লেন—"বুঝলেন না?" শাস্ত্রের কথা সত্য, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।"

হরিপ্রসাদ। সম্পাদক মহাশয় ভালই করেছিলেন—সকল সমাজের সম্পাদকরা এরূপ করলে···

অবলা। অতি চমৎকার হয়, না?

হরিপ্রসাদ। "আমি যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।" কিন্তু এটা অতি সহজেই বোঝা যায় যে, পুরুষ যদি নারীকে অন্তপুরে রাখে, সেটা তার ভালরই জন্যে। নারীর পবিত্রতা রক্ষার জন্য অন্দরের সৃষ্টি। ভারতবাসী নারীকে মূল্যবান রত্নের মতই রক্ষা করবার ব্যবস্থা করেছে এবং এ ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন কিছুতেই উচিত নয়।

রসিক। ঠিক বলেছ দাদা, ঠিক কথা। দেখনা তার প্রমাণ। বাজার থেকে যখন আমরা চুনোপুটী প্রভৃতি গুঁড়ো মাছ নিয়ে আসি, তখনকি করি! প্রথমতঃ একটা ঠোঙ্গার মধ্যে তা রাখি, দ্বিতীয়তঃ তার উপর আর একটা ঠোঙ্গা দিয়ে ঢাকি, আর তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে—পাছে কাক চিলে ছোঁ মারে—তাই তৃতীয়তঃ একটা লাঠী নিয়ে তার উপর ঘোরাতে থাকি! মূল্যবান জিনিষ কিনা!

অবলা। মহিলাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা ত ঐ ধরণেরই!

হরিপ্রসাদ। এমন ধারণা তোমার থাকতে পারে, আমাদের নেই। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, বাবুরা আজকাল আর একা থাকতে রাজী নন, তাদের মধ্যে মেয়েদের না আনলে আর 'মজলিশ'টা জমেনা, সুতরাং Female emancipatoin বলে চীৎকার তুলেছেন। আর তার ফল যা হচ্ছে তা ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, নারীত্ব বলে চীৎকার করছেন, কিন্তু তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে, আর...

অবলা (উত্তেজিত ভাবে) চুপ কর, আর না। শীলতা ও ভদ্রতা বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা ভুলে গেছ বুঝি? তবে তুমি বলতে চাও যে ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি যে সমস্ত সমাজে নারীর স্বাধীনতা আছে, সেই সব সমাজের নারী...আমি তা উচ্চারণ করে নিজেকে অপমানিত করবো না। হাঁ, এইত তোমাদের নারী-পূজা, না? আর তা হবেই না বা কেন? ভক্তি-গদগদচিত্তে যাঁদের ঋষি বলে থাকি এইত সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুদের শিক্ষাই।

হরিপ্রসাদ। হাজার বার এ কথা বলবো যে নারীর স্থান অন্তঃপুরে,

বাইরে নয়। আর ঋষিদের দোষ দিচ্ছ, কিন্তু ভাই তোমার ঐ পাশ্চাত্য মহাপ্রভুরা কি বলেছেন নারীদের সম্বন্ধে, তা ভুলে গেলে কেন? ঐ কে না এক Saint পর্য্যন্ত নারীদের সম্বন্ধ যা বলেছেন তা আমার মুখে আর আসবে না। আর পাশ্চাত্য দেশে নারীর ভুয়ো যে ঝুটো মান তার বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছা হয়!

সুধীর। তোমরা প্রকৃত কথা ছেড়ে দিয়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ওকালতি কর্ত্তে লেগে গেছ দেখছি। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন কিছুই সম্পূর্ণ দোষযুক্ত বা নির্দ্দোষ নয়। আর তা নিয়ে দ্বন্দ্ব করে লাভ ত নাই-ই, বরং গোঁড়ামো এসে পড়ে। অন্ধভাবে কারও প্রশংসা বা নিন্দা করা ঠিক নয়। মূল কথা হচ্ছে, অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করে নারীদের পর্দ্দার বাইরে এনে তাঁদের কর্ম্মশক্তিকে পবিত্রতাকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা কর্ব্বার শক্তিকে জাগাতে হবে। তাঁরা যাতে নিজেদের সামলে চলতে পারেন, তা কি ভাল নয়?

হরিপ্রসাদ। তুমি বলছো কর্ম্মশক্তি জাগানো। যা জাগ্‌ছে তা ত দেখতেই পাচ্ছি—তা কর্ম্মে অপটুতা। লাভের মধ্যে বিলাসিতা আর চটুলতা, Libertyর নামে Licence স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা আর পবিত্রতা…

অবলা। আরে রেখে দাও তোমার ঐ ঝুটো পবিত্রতা! স্বাধীন ভাবে ভুল করাও পরাধীনভাবে "ভালমানুষ" হওয়ার চেয়ে ভাল। কারণ ঐ স্বাধীন ভুলই সত্যের পথ দেখিয়ে দেবে। আর পবিত্রতা? যত দোষ নন্দঘোষ! মহিলাদের গলা চেপে ধরি আমরা, কিন্তু নিজেদের বেলায়? এই একচোখো মহাপুরুষদের মাথাগুলো…

রসিক। Non-violence দাদা, Non-violence, গা ঘেঁসাঘেসি থেকে যে ঘুসোঘুসির সূত্রপাত হলো! এটা অহিংসার যুগ বলে জোর গলায় প্রচার করা সত্ত্বেও নারীরা পর্য্যন্ত Violence আরম্ভ করেছেন—অবশ্য শুধু মনসা আর বাচা।

অবলা। নারীরা যদি সত্য সত্যই Violence আরম্ভ কর্ত্তেন ত খুবই ভালো হতো। ঐ যেমন সাফ্রিজেট মহিলারা অত্যাচারকারী পুরুষদের ঘাড়ে ধরে নিজেদের পাওনা আদায় করে নিয়েছেন। উন্নতি উন্নতি করে চীৎকার করছি, কিন্তু নারী-স্বাধীনতা না হলে মুক্তির কোনই আশা নেই। সে-ই একমাত্র শক্তি, যা মুক্তি দিতে পারে।

রসিক। দাদা, সত্যি সত্যি যদি নারীরা উন্নতির জন্য আমার ঘাড়ে ধরতে আসেন তবে ত মুস্কিল! আমি কিন্তু আগে থেকেই আমার নিজের ঘাড়ে নিয়ে পালাচ্ছি দাদা।

হরিপ্রসাদ। পালালে কি হবে দাদা, ঘাড় ভাঙ্গবেই। কিন্তু আমি বলি—"বাপু, ভারতকো পোষ্য বাঙ্গারাম, তুমি ধরিয়াছ পায়ে আর তিনি ধরিয়াছেন হাতে, এতেই ভারত অর্দ্ধপথে উঠিয়াছে, এখন মধ্যপথে বিশ্রাম করিয়া একটু মনুষ্যত্ব সঞ্চয় করিয়া লও।"

সুধীর। তোমরা তর্ক ছেড়ে ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়েছ। আমাদের মতের সঙ্গে কারও মতের মিল না হলেই আমরা তাকে তেড়ে মারতে যাই। তোমরা যে স্বাধীনতার কথা বলছো এটা কি তারই লক্ষণ? তোমরা শারীরিক স্বাধীনতা নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু তার উপরেও যে আর একটা জিনিষ আছে, মানসিক স্বাধীনতা—তা দেখ্‌ছো না। সেইটাই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় জিনিষ—আর সেদিক থেকে দেখলে এই বলা যায় যে, নরনারী সকলেরই নিজ নিজ মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, আর তা নিয়ে অন্যের ঝগড়া করা উচিত নয়। যাক্‌, এখন যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হবে, সত্য-নির্দ্ধারণ। আমার যা ধারণা তা আমি বলছি, নারী-স্বাধীনতার অর্থ যদি এই হয় যে, নারীতে ও পুরুষে কোথাও কোন বৈষম্য থাকবেনা, তা হলে আমি বলি তা অসঙ্গত অর্থ। ওর অর্থ এ নয় যে, নারী বড় বা ছোট। নিজ নিজ সীমানার ভিতর পুরুষ ও নারী প্রত্যেকেই স্বাধীন ও বড়। অবলা কি নারী বা পুরুষকে অসীম স্বাধীনতা দিতে চাও? তুমি কি বলতে চাও যে, নারী বা পুরুষের গতি কোথাও প্রতিহত হবে না? তা যদি মনে কর, তবে আমার মতে ভুল বুঝেছ। তুমি যে পাশ্চাত্য জাতির কথা বলেছ, সেখানে কি পর্দ্দা-প্রথা নাই? অবশ্য আমাদের দেশের পর্দ্দার মধ্যে যে যথেষ্ট দোষ আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। হয়ত ওর মধ্যে কিছু গুণও আছে, কিন্তু বর্ত্তমান গোঁড়ামীর জন্যে তা দোষের আকর হয়েছে। একটা কথা সর্ব্বত্র সর্ব্বসময় আমাদের মনে রাখা চাই যে, দেশ-কাল-অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। বিলাতে কোন প্রথা ভাল বলেই তা যে আমাদের পক্ষেও ভাল হবে এমন কোন কথা নেই। আবার কাল সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে—অবস্থা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। সুতরাং কোন ব্যবস্থা করতে যাবার পূর্ব্বে চারিদিক ভাল রূপে বিবেচনা করে দেখা উচিত। নারী-স্বাধীনতার কথা আলোচনা করবার সময় আমাদের প্রধানভাবে দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে—প্রথম—বর্ত্তমান নারীদের অবস্থা—দ্বিতীয়—সমাজের সাধারণ অবস্থা। এই দুটোর কোনটাই সন্তোষজনক অবস্থা নয়। নারীদের পর্দ্দার বাইরে এসে তাঁদের শক্তিকে জাগাতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও পবিত্র হতে হবে। এ দুটোই পরস্পর সহায়ক। নারী ও পুরুষের একত্র মেলা-মেশায় Sex-consciousnes অনেকটা নষ্ট হবে আশা করি। কিন্তু আসল কথা এই, শুধু তর্ক নয়, বক্তৃতা নয়, হাতে-কলমে কাজ করতে হবে। আমাদের সমাজে এইটের বড়ই অভাব। আমার মত কারও ঘাড়ে চাপাতে ইচ্ছা করি না, তবে হরিপ্রসাদকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, "না জাগিলে সব ভারত ললনা" কবির এই গান নিরর্থক নয়, আর এই জাগার অর্থও যে বর্ত্তমান অবস্থা নয়, তাও বোধ হয় আর বলতে হবে না। নারীর

স্বাধীনতা, অধিকার, সমাজে স্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে শুধু তর্ক করলে চলবে না, চিন্তা করতে হবে ও সেই অনুসারে কাজ করতেও হবে। আচ্ছা, আগামী মজলিসে—তোমরা মহিলাদের মতামত তাঁদের নিজেদের মুখেই শুনতে পাবে। শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

## নিয়তিবাদ

যিনি ঈশ্বর মানেন তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, মানুষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ, তিনি অনন্তকাল হইতে জানেন আমি কখন্ কিরূপ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিব, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে আমার ব্যক্তিত্ব (individuality) কিরূপ গঠিত হইবে এবং তাহার ফলে আমি কিরূপ কার্য্য করিব। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পারে না। "His knowledge cannot be falsified, it must be verified," যদি ব্যর্থ হয়, তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকিলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ব্যর্থ হইতে পারিত। "His will is Supreme" তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কি কিছু করিতে পারি? তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহারই ইচ্ছায় আমি ইচ্ছান্বিত হইয়া কার্য্য করি, আমার ইচ্ছা তাঁহারই ইচ্ছার কণা মাত্র, সুতরাং আমার ইচ্ছার স্বাধীন সত্তা নাই। পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে স্বাধীন ইচ্ছাজনিত দায়িত্ব থাকিতে পারে না। একটী শিশু আমাদের তুলনায় যেরূপ অজ্ঞ ও অসহায়, ঈশ্বরের নিকট আমরা ততোধিক অজ্ঞ ও অসহায় শিশু। অনীশ্বরবাদী এক অজ্ঞাত শক্তিকে সমুদয় কার্য্য-কারণের মূল বলিয়া স্বীকার করেন, অনীশ্বরবাদী Herbert Spencer বলেন, "There is an eternal and infinite energy from which everything flows."

নিয়তি বা নির্ব্বন্ধবাদ (Determinism or necessitarianism) সংক্ষেপে ও সরল করিয়া বুঝাইবার জন্য "প্রবাসী" (১৩২৫, জ্যৈষ্ঠ) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—"এই বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ কার্য্য-কারণের সকল সম্বন্ধকে অঙ্কের হিসাবে মিলাইয়া দেখায় যে প্রত্যেক কার্য্য প্রকারে ও পরিমাণে উপযুক্ত কারণ হইতে প্রসূত। প্রত্যেক কারণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কার্য্যফল প্রসব করে। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট cause নির্দ্দিষ্ট effect উৎপন্ন করে, কোথায়ও তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এই মুহূর্ত্তে জড় জগতের যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই অকাট্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেরই কারণ-সমষ্টি যাহা এই মুহূর্ত্তের কার্য্য-সমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও তৎপূর্ব্ব সময় হইতেই অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইরূপে এই শৃঙ্খল-পরম্পরায় সুদূরতম অতীত হইতে সুদূরতম ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত এক অমোঘ শাসনে আবদ্ধ রহিয়াছে, কোথাও চুল প্রমাণ ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। প্রত্যেক জড় কণার প্রত্যেক পরমাণু কখন কোন্ পথে কেমন ভাবে চলিবে, শাশ্বত কাল হইতে তাহা অকাট্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। বিশ্ব-সংসারের এই মুহূর্ত্তে যাহা-কিছু যেমন ভাবে আছে, তাহার পরিপূর্ণ হিসাব যদি পাওয়া যাইত, তবে অতীত ও ভবিষ্যতের ইতিহাসকে অভ্রান্ত ভাবে তাহারই মধ্যে নিহিত দেখিতাম।" বিনা কারণে কিছুই ঘটিতে পারে না "Ex-nihilo nihil fit" ইহাই সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। এইরূপে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা (universal law of causation) জগতের ঘটনাসমূহ (phenomena, physical and mental) নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—নিয়তিবাদ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। "I see in atom the promise and potency of all terrestrial life"—Tyndal.

নিয়তিবাদমতে অপরাধী ব্যক্তি বলিবে নিয়তির বশে সে অপরাধ করিয়াছে, বিচারকও বলিবেন যে নিয়তির বশেই তিনি তাহাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন ও নিয়তির বশেই অপরাধীর চরিত্র সংশোধিত হইবে। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা-কিছু কার্য্য-কারণ-রূপে ঘটিতেছে (phenomena) তাহাই নিয়তি। পুরুষকার-প্রভাবে কেহ যদি প্রতিকূল অবস্থায় কৃতকার্য্যতা লাভ করে, তাহাও নিয়তি দ্বারাই সাধিত হইবে, কারণ পুরুষকার নিয়তিরই ফল। একটা অপরাধ সাধিত হইতে বহুবিধ ঘটনার সমাবেশ প্রয়োজন, অপরাধীর মনোগত ভাব, তাহার শক্তি, বুদ্ধি, দক্ষতা, সুযোগ, স্থান, কাল ও যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হইল তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণ সমষ্টির (antecedents) সমাবেশে একটা অপরাধ সাধিত হয়, একটা কারণের অভাব হইলেই অপরাধ সাধিত হইতে পারে না। এই সকল কারণ সমাবেশের জন্য অপরাধী ব্যক্তি দায়ী হইতে পারে না। A man is a product of heredity and environment" জন্মগত আকৃতি ও প্রকৃতি heredity, আজীবন যে ঘটনাবলী শরীর ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহা environment, শরীর ও মনের কোন অবস্থা বা গুণের বিকাশ বা অ-বিকাশ পারিপার্শ্বিক অবস্থার (environment) উপর নির্ভর করে। আমি স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা এই heredity ও environment নির্ব্বাচন করি নাই, ইহা আমি পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। "Man is a physiological and psychological omnibus carrying his ancestors forward on his back"—Holmes.

চিন্তা কার্য্যের বীজ মাত্র। আমার চিন্তা ও ইচ্ছা আমার মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী ও শিক্ষা অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, আমার মস্তিষ্কের গঠনের জন্য আমি পূর্ব্ব-পুরুষের নিকট ঋণী। মস্তিষ্কের পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন কম্পনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিন্তার উদয় হয়। আমাদের জীবনের গতি আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, জড়

অসম্ভবনীয়, অচিন্তনীয় ঘটনার এভাবে আমরা চালিত হইতেছি, কত সময় মনে হয়, হায়, যদি পূর্ব্বে ইহা জানিতাম, কোথা হইতে কত প্রলোভন ও সুযোগ আপনা হইতে উপস্থিত হয়, মনে হয় যেন সমস্ত ঘটনা পরামর্শ করিয়া আমার অধঃপতনের ও দুরদৃষ্টের জন্য একত্রিত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় যথেষ্ট চরিত্রবল থাকিলে আমার অধঃপতন হইত না, কিন্তু এই চরিত্রবল আমার স্বভাব ও শিক্ষায় ফল মাত্র (product of heredity and environment)। নিয়তির গতি অতি কুটিল, বর্ত্তমানে যাহা মঙ্গল ও সুখের কারণ, পরিণামে তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে। মধ্যযুগে (medieval age) স্বাধীন-ইচ্ছা মতবাদের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে, এই বিজ্ঞানের যুগে এই মত আর টিঁকিতে পারিতেছে না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগে ও দর্শনে নিয়তিবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানবিৎ Prof. Tyndal "Essay on Science and Man" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "My physical and intellectual textures were woven for me, not by me. Processes in the conduct or regulation of which I had no share have made me what I am." জীব-বিজ্ঞানবিৎ Karl Pearson বলেন, "No person is responsible for his being and the nature and nurture over which he has no control has made him the being he is, good or evil." বিখ্যাত দার্শনিক Spinoza, John Stuart Mill ও Herbert Spencer মানবের "স্বাধীন ইচ্ছা" স্বীকার করেন না। ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ এই মতবাদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইহা দ্বারা নিয়তিবাদ প্রচারিত হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রেও নিয়তিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। বাইবেল সোজাসুজি ইহা স্বীকার না করিলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করে, "Thy will be done", "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। আদাম ও ঈভের পাপের ফলে মানব পাপী হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে নিয়তিবাদ মানিতেই হইবে। অনেকে মনে করেন, নিয়তিবাদ আলস্যের ও পাপের সহায়তা করে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অবশ্য নিয়তিবাদ পারমার্থিক ভাবে পাপীকে ঘৃণা করিতে বা পুণ্যবান্‌কে প্রশংসা করিতে বলে না। নিয়তিবাদী পাপের মূল কারণ নির্দ্দেশ করে ও সমাজ-রক্ষার জন্য পাপীর দণ্ড বিধান করে।

পুরুষ-সিংহ কর্ম্মবীর নেপোলিয়ন নিয়তিবাদী ছিলেন, তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি নিয়তিবাদী হইয়া সর্ব্বদা এত চেষ্টা-উদ্যোগ করেন কেন?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "নিয়তিই আমাকে ঐরূপ করায়।" He answered "Because it is still 'Fate' who wills that I should plan." ইহাই নিয়তিবাদীর প্রকৃত উত্তর। একই বিষয় দুই ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্নরূপে ক্রিয়া করে। বীর নিয়তিবাদী হইলে অধিক নির্ভীকতা ও বীরত্ব প্রকাশ করে, অলস ব্যক্তি নিয়তি বিশ্বাস করিয়া অধিক অলস ও ভীরু হইতে পারে। কেহ কেহ মায়াবাদের (Metaphysics) সাহায্যে "স্বাধীন-ইচ্ছা" মতবাদের সমর্থন করেন, তাঁহাদের যুক্তির অধিকাংশই দুর্ব্বোধ্য "transcendental nonsense." তাঁহারা বলেন, "It is our Ego that objects itself as phenomena." তাঁহাদের মতে জগতের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, "The universe is not in matter but in thought." জগৎ কল্পনা-প্রসূত, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশ-কালের অতীত পারমার্থিক সত্ত্বা তাঁহারা উপলব্ধি করেন মাত্র। যাঁহারা phenomena অসত্য বলেন, তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে না, তবে উত্তরে তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, জীব যখন মায়ামুগ্ধ, মায়ান্ধ, মায়া দ্বারা চালিত, তখন তাহার "স্বাধীন-ইচ্ছা" রহিল কোথায়?

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## প্রেম-স্বপ্ন

ভালোবাসা, ফিরে চাওয়া, আমি-তুমি-তোমারি,
ভাসা ভাসা কত আশা ঠোঁটে ঠোঁটে চুমারি ;
বঁধুয়ার বুকভরা সোহাগের নাচনা,—
তুলতুল্ ফুল্ হাতে ঝুল্‌নাতে রচনা।

ঘনঘোর মেঘ ঘেরা ঘনঘটা নিশিতে,
আধফোটা বউলেতে কত সাধ মিশিতে ;
ঢুলঢুল্ আঁখিদুটি ওঠে যবে উজলি,
ক্ষণতরে ঘর্‌মায় খেলে যায় বিজলী।

চঞ্চল অঞ্চল বনবায়ু দোলনে,
লালে লাল দুটি গাল আবীরের রঙনে ;
খুস্ খুস্ আঁচলের ঝম্‌ঝম্ নূপুরে,
ভরপুর কত সুর রুণুঝুনু ঘুঙুরে।

ঘুম্-চোখে চুম্ দিয়ে ঘুম্ তার ভাঙানো,
ভাঙা ভাঙা বুলি বলে রাঙা মুখ রাঙানো ;
বাঁধা চুল খুলে দিয়ে রাগ তার বাড়ানো,
ঝুমুঝুম্ চুমু দিয়ে অভিমান ছাড়ানো।

চুম্ দিয়ে চুম্ চাওয়া সাধিাস্ সাধনা,
প্রতিদান করে নাক পূর্ ছেড়ে আধ না ;
পায়ে ধরে কত সাধি এই ফুল-কুঁড়িকে,
ফুটেও লো ফোটে কই—এত চাপা ছুঁড়ি কে!

শ্রীমনোরমা দেবী।

# নারী

জানালার খুব কাছে, বাইরের দিকে ফিরে সে শুয়ে ছিল,— একইভাবে, অনেকক্ষণ।

আকাশের আলো তখন একেবারে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু ঘরের আলো তখনও জ্বালা হয় নি।—সময়টা ছিল সন্ধ্যা আর রাত্রির মাঝামাঝি।

বিছানা থেকে কিছু দূরে, একটা চেয়ারে আর একজন কে বসেছিল,—ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে, ছায়ারই মত নিঃশব্দে···সে উঠে বিছানার কাছে এসে, কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে, নিজের মাথার চুলগুলি একবার শক্ত করে চেপে ধরে যেন তার লুপ্তপ্রায় শক্তি, মুহ্যমান মনকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে নিল। তারপর সেই হাতখানি নামিয়ে এনে, অতি-সন্তর্পণে তার কপালের ওপর রাখ্‌ল···

খুব জোরে আরামের নিশ্বাস ফেলে সে বলে উঠ্‌ল—আঃ, মাগো—

দূর পাহাড়ের গায়ে ঘরগুলিতে একটি একটি করে আলো জ্বলে উঠ্‌ছে—তারার মত···অন্ধকারের সঙ্গে স্তব্ধতাও যেন আরো নিবিড় হয়ে নেমে এল...

হঠাৎ সে কেঁপে উঠে বল্‌ল—না, থাক্—

ব্যথাতুরের মাথার চুলের মধ্যে আঙুল আর চল্‌ল না—থেমে গেল···কিন্তু তার মুখের ওপর ঝুঁকে সে বল্‌ল—কেন? ভাল লাগ্‌ছে না, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি?

খুব ভাল লাগ্‌ছে···

তবে—?

না, থাক্। আমি আর চাই না।—তুমি কখন এলে?

অনেকক্ষণ। তুমি ঘুমোচ্ছিলে, তাই আর জাগাইনি।

না, ঘুমোইনি। আজ ক'দিন থেকে রোজ সন্ধ্যা বেলা বড় মাথা ধরছে, ঠিক এই সময়টাতে যেন জ্বরের মত বোধ করি।—আলোটা জ্বালো।

একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তার কপাল থেকে হাত তুলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটি নিমেষে ঘরের ভিতরকার সমস্ত সঞ্চিত অন্ধকার আর স্তব্ধতা, আলোর হাসিতে ভ'রে গেল···বিছানার কাছে সরে এসে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠ্‌ল—ওঃ! তোমার চোখদুটো কি ভয়ানক ফোলা দেখাচ্ছে!—

হাঁ, কেঁদেছি।

কেন?···

না—না, এখানে নয়···তুমি ঐ চেয়ারটাতেই বসো।—ও ঘরে কেউ আছে কি?

না। আমি যখন এলাম, ওঁরা সকলে তখন কোথায় বেরিয়ে গেলেন, বাড়ীতে কেউ নেই।—কেন কেঁদেছ?

কান্না পেল,—তাই—

কেন?...

'কেন,' তা শুন্‌তে হবে?—ধর, যদি আমার কান্নার কারণটা অত্যন্ত গোপনীয় হয়?—

তাহলে থাক্, শুন্‌তে চাই না। কিন্তু সমস্ত রাত তোমার এই কান্নার কথা ভাব্‌ব।—আর ভাব্‌ব, তোমার সামান্য একটা দুঃখের কারণ জান্‌বার অধিকারও আমার নেই—

না। ঠিক তা ভেবো না, অধিকার তোমার আছে। কিন্তু শোনবার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে?—

আছে।

অত জোর করে বলাটা কি ঠিক হলো?—একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল না কি?

আমি না-ভেবে বলিনি—বল্‌বার মত শক্তি আমার আছে, তাই বলেছি।

আচ্ছা, 'ভাল লাগে' আর 'ভাল বাসি', এ-দুটোর তফাৎ কোথায় জান?—

জানি। অনেক তফাৎ—কিচ্ছু মেলে না। 'ভাল লাগে'টা—'উদার'; 'ভালবাসি'টা—'স্বার্থ-মেশানো।' 'অনেক-কে' ভাল লাগে,—তারা আমায় সুখ দেয়। কিন্তু 'একজনকে' ভালবাসি,—সে আমায় কাঁদায়।

এটা তুমি সত্যি বিশ্বাস কর?—

কারি বলেই ত বল্‌ছি।

আমিও ঐ কথাটা ভেবে কাঁদ্‌ছিলাম।—একজনকে ভালবাসি—ঐ দেখ! আমি ত আগেই বলেছিলাম, শোন্‌বার অধিকার থাক্‌লেও শোন্‌বার ক্ষমতা থাকে না।—চেয়ারটাকে কি শক্ত করে চেপে ধরে ছিলে তুমি···

না-না, অন্ত কিছু ভেবো না। তোমার কথাটা আমার ভাব্‌নার সঙ্গে আশ্চর্য্য রকম মিলে গেল কি না, তাই।—তুমি বল।

যে একজনকে ভালবাসি, তাকে এমন করে চাই, যে— ওটা তুমি বুঝে নাও, আমি ঠিক বল্‌তে পারছিনা··· বুঝ্‌তে পেরেছ, আমি কি বল্‌তে চাই?—

পেরেছি। যেমন আমি 'অনেকের' হাত এড়িয়ে, 'একজনের' মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি···

তা হবে। সেই একজন, আমাকে মস্ত বড় একটা আঘাত দিতে চলেছে···তার এই আঘাত থেকে নিজেকে যে কি করে বাঁচাব তা ভেবে পাচ্ছিনা!—ঐ দেখ! তুমি আবার কি রকম হয়ে গেছ!···

তা মোটেই নয়। আমি ভাবছিলাম, কি ক'রে তোমাকে একটু সাহায্য করতে পারি।—আচ্ছা, সে কি অনেক দূরে আছে?—

না, তবে খুব কাছেও না। এখান থেকে প্রায় দু'শ ফুট ওপরে। অনেকটা ঘুরে উঠ্‌তে হয়। রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানে, খাদের ঠিক ওপরেই—একেবারে শেষের বাড়ীটা—

আর বল্‌তে হবেনা, বুঝতে পেরেছি।—যে বাড়ীতে খুব সুন্দর ম্যাজেষ্ট্রীমিয়া ফোটে—

হাঁ, তুমি কি করে জান্‌লে?

পথ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে তোমাকে একদিন ওখানে দেখেছিলাম। একজন তোমায় ফুল পেড়ে দিচ্ছিলেন—

হাঁ, সে-ই।

তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও?

চাই। কিন্তু সে আস্‌বে না, চিঠি লেখ্‌বারও সময় নেই।—সে কাল ভোরেই চলে যাচ্ছে···

আছে, খুব সময় আছে, এই ত মাত্র সাতটা বাজ্‌ল—তুমি লেখ।

কি করে তা হবে?—ডাকে ত পৌঁছবে না···

চিঠি পৌঁছোনো নিয়ে ত কথা!—তুমি লেখ।—আমি তোমায় কাগজ এনে দিই।

ভিজে চোখদুটি তার প্রশান্ত মুখের ওপর তুলে সে বল্‌ল—না, তা হলে আমায় উঠ্‌তে দাও, বারণ করো না। আমি আমার টেবিলে বসে লিখ্‌তে চাই···

* * *

লেখা শেষ হ'ল···

উঠে এসে চিঠিখানি তার হাতে দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াতেই, একটু ইতস্তত করে সে বল্‌ল—কিন্তু এটা বন্ধ করলে না যে?···

তার দরকার নেই।—কিন্তু তুমি এতটা পথ—

তার জন্যে ভেবো না, খুব সম্ভবত সাড়ে ন'টা কি দশটার মধ্যে তোমায় এর উত্তর এনে দেবো—আমি আসি?—

এক ঝলক জল তার চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল···হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—বন্ধু—

না-না, আমাকে কিছু বল্‌তে হবে না—কিছু না—

* * *

পাহাড়ের গা বেয়ে, সাপের মত এঁকে বেঁকে পথটি ওপরের দিকে গিয়েছে। একলা পথিক সে···দুখানি হাত তার শক্ত করে বুকের ওপর জোড়া···তারই নীচে আছে,—একখানি চিঠি···

সে চলেছে, সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে···পিছনের মাটি যেন তাকে টেনে নামিয়ে আন্‌তে চায়···পা তার যেন আর টান্‌তে পারে না তার দেহটিকে···

মাঝ-পথে এসে, মন তার ভীষণ বিদ্রোহীর মত রুখে দাঁড়াল···কোথা যা ?—কেন?—

খাদের ধারের রেলিং ধরে সে একবার দাঁড়াল···অনেক দূরে নীচে একটি ঘরের আলোর দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠ্‌ল—যাব না—

শ্রাবণের মেঘ, সাগরের কাছ থেকে শান্তি-বারি বুকে

নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, পৃথিবীর ক্লান্তি ঘোচাবার জন্যে। কিন্তু তার ক্লান্তির কান্না নিষ্ফল আক্রোশে শুধু নিজেরই বুকে গুমরে ওঠে···তার তৃষ্ণা মেটে না···

যাব না' বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনের সমস্ত বিদ্রোহ-ভাব্‌টা যেন কেটে গেল!...মুখের ওপর বিষাদ ও অবসাদের হাসি দেখা দিল। বল্‌ল—অনেককে ভাল লাগে, আর একজনকে ভালবাসি···কি কঠোর সত্যি কথা···নাঃ, আমাকে যেতেই হবে

* * *

ঘরের ভিতর চারিদিকে সব জিনিসপত্র ছড়ানো; প্রকাণ্ড দুটি ট্রাঙ্ক পাশে নিয়ে সে কাপড়-জামাগুলি তাতে ভরে রাখ্‌ছিল; এমন সময় কা'র পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বলে উঠ্‌ল—ওঃ, আপনি!...

সে হেসে উত্তর দিল—হাঁ, আমি।—কিন্তু আপনি আমায় চিন্‌লেন কি করে?

দু-একবার দেখেছি,—তাছাড়া আপনার কথাও অনেক শুনেছি।

আমার কথা?...

হাঁ।

তা হবে। আমি একটু বিশেষ দরকারে আপনার কাছে এসেছি—একটা চিঠি আছে, আপনার নামে।

আমার চিঠি···কে লিখেছে?

দেখুন।

চিঠিখানি নেবার সময় তার হাত যতখানি কাঁপল, তার চেয়ে বেশী কাঁপ্‌ল, যে দিল তার হাতখানি···

ধন্যবাদ।—কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে—

থাক্‌, ব্যস্ত হবেন না। আমি বেশ আছি। আপনি চিঠিটা পড়ে একটু তাড়াতাড়ি জবাব দিন।—সাড়ে ন'টার মধ্যেই আমায় আবার ফির্‌তে হবে।—তবে নাম্‌বার সময় বেশী কষ্ট হবে না বোধ হয়—

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, ঐ চিঠিখানি যখন লেখা হয়, তখন সে যেমন করে লেখিকার পাশে দাঁড়িয়েছিল, এখনও ঠিক তেম্‌নি করেই সে দাঁড়িয়ে রইল...ঠোঁট দুটি তার শক্ত করে বন্ধ...নিশ্বাস নেবার সময় বুকখানি যত বেশী ফুলে উঠ্‌ছে, ফেল্‌বার সময় ঠিক তত বেশীই নেমে যাচ্ছে...

চিঠি পড়া শেষ হল···

ঘরের ছড়ানো জিনিসগুলির দিকে তাকিয়ে কতকটা যেন আপনার মনেই সে বল্‌ল—এগুলোকে আবার সব ঠিক করে রাখ্‌তে হবে।—কাল আর যাওয়া হল না—

তৃপ্তির হাসি তার মুখে ছাপিয়ে উঠ্‌ল···

তা'হলে একটু তাড়াতাড়ি এর জবাব আমায় লিখে দিন—অনেকটা পথ যেতে হবে—

ও—হাঁ।—কিন্তু আপনাকে বড় কষ্ট দিলাম যে?

ও কিছু মনে করবেন না। বাঁচ্‌তে হলে, হয় কষ্ট দেওয়া, নয় কষ্ট পাওয়া বরাতে আছেই।

* * *

আবার সে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। পায়ের নীচের মাটির টান, চলার সঙ্গে ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে···এত তাড়াতাড়ি সে চল্‌ছিল, যে কত সময় পড়্‌তে গিয়ে অতি কষ্টে সাম্‌লে নিচ্ছিল···আস্‌তে গিয়েও তার আস্‌বার যেন শক্তি ছিল না।···

সে যখন উঠ্‌ছিল, তখন তার চোখে ছিল আগুন... এখন বেরিয়ে এল জল...বাড়ীর ফটকের কাছে একটা পাথরের ওপর বসে, অত্যন্ত ছেলে-মানুষের মত সে কেঁদে ফেল্‌ল...

* * *

কাঁকর-বিছানো পথে, পাত্‌লা চটি জুতোর শব্দ শুনে চোখ মুছে সে উঠে দাঁড়াল···

শব্দ ক্রমেই এগিয়ে তার কাছে আস্‌ছে···সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,—যেন—তার জীবনের সমস্ত আনন্দের বিসর্জ্জনেরই প্রতীক্ষায়···

তারপর কান্নায় ভেজা গলার কথা শোনা গেল—জান্‌তে পেরেছি, তুমি আস্‌ছ—

হাঁ, এই নাও তার চিঠি।—আমি তবে এখন আসি?—

না।

না!...

তোমাকে দরকার আছে—এখন যেতে দেব না—

দরকার আছে ?—ও বুঝেছি।—যখন লিখেছিলে তাকে,—দেখেছি। সে যখন পড়্‌ল,—দেখেছি। সে যখন লিখ্‌ল,—দেখেছি।—এবার তুমি পড়্‌বে, তাই দেখ্‌তে হবে, এই ত ?—আচ্ছা চল, এখানে ত আলো নেই, চল, ঘরে যাই—

না।

তবে ?···

চাই না পড়্‌তে···

চাই না পড়্‌তে !···তার মানে ?

চাই না—চাই না—চাই না। আর কি করে বোঝাব তোমায় ?

আশ্চর্য্য !···

আশ্চর্য্য ? তা হবে। কিন্তু এমন করে আর সংশয়ের দোলায় দুল্‌তে পারি না।—আমায় নাও—

ওঃ···

কি হলো ?

না থাক্‌, ছাড়ো। মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল, তাই। ছাড়ো, আমি এখন দাঁড়াতে পারব।

না—আর একটু ধরে থাকি। তোমার—কেন এমন হল ?···

কেন···তুমি যে আমার সঙ্গে এমন করে পরিহাস কর্‌তে পারো, তা জান্‌তাম না···অন্য সমস্তই সহ্য করেছি—শুধু এটা সহ্য হল না—

পরিহাস করি নি···

না ?

না গো, না—না—

আশ্চর্য্য !···কিন্তু আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না। এই-খানটায় বসি।—ও কি ? তুমি আমার পায়ের কাছে বস্‌লে যে !—সরে বসো,—পা ছাড়ো···

না।

কেন এমন করে কষ্ট দাও আমায় ?—ভালবাসি, এই আমার অপরাধ ?···

ক্ষমা কর···কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পারিনি এতদিন, তাই—, আচ্ছা, থাক্‌, আজই ক্ষমা করো না। আমার সমস্ত জীবন ধরে তোমার কাছে ক্ষমা চাইব। আজ নাই বা পার্‌লে ক্ষমা কর্‌তে, একদিন নিশ্চয়ই পার্‌বে—

কি করে সম্ভব হল ?···

খুব সহজে গো খুব সহজে···এত সহজে হল, যে আমিই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।—তুমি চিঠিখানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মনে হল—এ কি কর্‌লাম !···এত বড় লজ্জা তোমার মাথায় চাপানোটা কি করে সম্ভব হলো ! ···কিসের জন্যে তুমি পুরুষত্বের অভিমান ভুলে, এত বড় একটা অপমানের বোঝা বইতে ছুটেচ···চাকরকে ডেকে তোমায় ফিরিয়ে আন্‌তে বল্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে সে একা ফিরে এল !···বল্‌ল—তাঁকে পেলাম না··· আমি কিন্তু আশা ছাড়তে পারি নি। তাই সেই অবধি ঐ অন্ধকার কোণটায় বসেছিলাম।—জান্‌তাম, তুমি আস্‌বেই,—তোমাকে ফিরে আস্‌তেই হবে—

আর হয় না বন্ধু—

হয় না ?···

না।

কেন ?···

তাকে চিঠি দিয়ে এলাম যে—সে কাল যাওয়া বন্ধ করেছে—

তার যাওয়া না যাওয়ার সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ ?···

আছে।—তুমিই ত তাকে আশা দিয়ে ফেরালে···

আমি ?—না—না, সে কক্‌খনো আমি নই—

তবে ?···

সে আমার মধ্যেকার অত্যন্ত নির্ব্বোধ একটা মেয়ে !··· পদে পদে সত্যকে অস্বীকার করে ভুল পথে চলাই যার ধর্ম্ম। আপনার হাতে চার পাশে ভুলের বেড়া বেঁধে, তার মধ্যে কেঁদে মরাই যার স্বভাব—শুধু অজেয়কে জয় কর্‌বার গর্ব্বেই সে তোমায় অপমান করেছে।—তাকে—

কিন্তু—

না—না, সত্যি বল্‌ছি, বিশ্বাস কর আমায়—

কিন্তু কি করে জান্‌লে তখনই ভুল করেছিলে, আর এখন—?

না, আর কোন সংশয় নেই আমার মনে। আমায়

তুমি ঠেলে রাখতে পারবে না—ছাড়্‌ব না, তোমায় আমি চিনেচি…

এই রাত্রের অন্ধকারে?—কিন্তু কাল দিনের আলোতে হয়ত অন্য কথা মনে হতে পারে তোমার—

না, আর সে কথা ভাব্‌বনা। কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষাও কর্‌বনা। আজ রাত্রের অন্ধকার আমার জীবনের পূর্ণতাকে এনে দেখিয়েছে। তাকে আর আলোর সহস্র সংশয়ের মধ্যে হারাতে দেবোনা…আমাকে তুলে নাও তোমার বুকে…আর পারিনা একা একা এমন করে বইতে—আমাকে বাঁচাও—

সে যখন কাল তোমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে, তখন কি বল্‌বে তাকে?…শরীর কি বড় খারাপ বোধ করছে?

হাঁ।

ও কি! মাটিতে শুলে যে?—ওদের ডাক্‌ব?—

না, থাক্।

চল, তোমাকে ঘরে নিয়ে যাই।

কোথায় আমার ঘর?—ও ঘর আমার নয়—তুমি আমায় নিয়ে চল—

না। চুরি করে নয়। দিনের আলোতে সকলের আশীর্ব্বাদী ফুলের মত তোমায় এসে নিয়ে যাব। আজ আমায় বিদায় দাও।

আর একটু দাঁড়াও। শুধু বলে যাও, আমার সকল সংশয় ঘুচিয়ে তুমি আবার আস্‌বে?—আমায় নেবে—পাব তোমায়—?

পাবে।—যদি চাও—

*        *        *

মাথার বালিশটা প্রায় ভিজে উঠেছে, তবু চোখের জল থামে না।…মাঝে মাঝে সে গুম্‌রে উঠ্‌ছে—তোমায় চিনেছি…তোমায় চিনেছি…তুমি আমার—

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

---

## যাত্রা

দখিন হাওয়ার ঘূর্ণি-পাকে,
মুখ থেকে সই, ঘোম্‌টা যদি খ'সেই থাকে,
খস্থক্ না!
দিন ভেবে ঐ পূর্ণিমাকে—
একটি অলি মুখে যদি ব'সেই থাকে,
বস্থক্ না!
আমার চোখে তোমার চোখে,
মিল্‌লে কি আর বল্‌বে লোকে?
প্রেম-মধুতে চিত্ত যদি র'সেই থাকে,
রস্থক্ না!
ঘোম্‌টা যদি খ'সেই থাকে খস্থক্ না!

নীল আকাশের রঙ্গালয়ে,
মেঘ-নিঝরে ঝর্‌চে যেন চন্দ্রালোকের
বিন্দুরা;
যায় গো উতল গঙ্গা ব'য়ে—
জোর-জোয়ারে তটের তলে ভাঙ্‌চে কত
ইন্দুরা!

চল্‌ল তরী আপনি ভেসে,
স্বপ্নে-দেখা অচিন দেশে,
তীরের পথিক গাইচে কোথায় তন্দ্রা-লোকের
সিন্ধুড়া,
ঝর্‌চে মেঘে চন্দ্রালোকের বিন্দুরা!

বজ্র যদি খড়্গ হানে,
জাগিয়ে তোলে ঝড়-তুফানে,—ভেসেই তরী
চলুক্ গো!
যাচ্চি প্রেমের স্বর্গ-পানে,—
হৃদয় আজি বাচাল হয়ে, যা-খুসি তার
বলুক্ গো!
তুমি যখন বুকের কাছে,
আর কি আমার ভাবনা আছে!
তোমার দুটি নয়ন-তারা সাম্‌নে আমার
জ্বলুক্ গো!
ভাস্‌ল যদি, ভেসেই তরী চলুক্ গো!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# প্রিন্স্ অফ্ দি প্রিম্রোজ্ গে

## মেয়ে চাই

কাহন-কড়ির কড়া শাস্ত্রে এম, এ পাশ, আইনে ফার্ষ্ট ক্লাস একটী ছেলের জন্য—মেয়ে চাই। এই শতাব্দীর পুরান্দরের সভ্য ছেলে—সচ্চরিত্র,—ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্রশ্রেণী, শ্রোত্রীয়, কাশ্যপ গোত্র। বয়স চব্বিশ বছর। মুখের রঙ্ টুকটুকেই ছিল—তবে বে-থা করেন নি বলেই একটুখানি কাল্চে ছোপ নিয়েছে। মোটা নন্—কিন্তু রোগাও তাঁকে বল্বার যো নেই। বুকখানা বেশ চওড়া। মুখখানি ঈষৎ চেপ্টা ধরণের—নাকের দু-পাশে কোণা-কুণি দুটী আঁচিল আছে—বাঁ পাশেরটী বড়। রোজগার করেন ঢের। মেয়েটীর তরুণী হওয়া চাই। দুধে আলতার ঢল-ভাঙা ঢেউ গা বয়ে গড়িয়ে না পড়লেই যে মেয়ে অপছন্দ হবে, তা নয়—নেহাৎ শ্যাম কি শামলা, ছর্‌রা বা গোবরার মত বর্ণ না হলেই চল্বে। নাক-বাঁশী হলেও চলে—একটু-আধটু চাপা-চোপা চলন-সই হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু চোখ-জোড়াটী চাই ডব্‌গা, ডাগর, কাজল-কালো। ফুলিয়ে তোলা ভরা গালের ঠিক ওপরটাতে ডান ধারে একটী তিল থাক্‌বে। এস্রাজ কি সেতার যা'হয় একটা বাজাতে জান্‌লে ভাল হয়। সূচের সৌখীন কাজ জান্‌বেন। লেখাপড়া—তেমন আর কি—মাসিক কাগজে ছোট গল্প লিখ্‌তে পারেন—এই রকম যৎকিঞ্চিৎ কিছু জান্‌লেই চল্‌বে। দরকার হলে গোত্র, শ্রেণী, সবর্ণ, অসবর্ণ এ সব কথা অবান্তর বলে ধর্‌বো। নীচের ঠিকানায় চিঠি লিখে কিম্বা নিজে এসে খোঁজ করুন।

"প্রিন্স্ অফ্ দি প্রিম্‌রোজ্ গে"
C/o এডিটার, দীপালি।

পূজার সংখ্যা "দীপালির" মুখপাতে এই পাঁচ-রঙা বিয়ের বিজ্ঞাপনটী বেরুল; কিন্তু গল্পটা সুরু হয়েছিল তার আগের বছরে ভাদ্রমাসের শেষাশেষি।

কাশবনের নিদ্মহলে, মরাল-ডানার টানায় বোনা সফেদ ওড়নায় বুক আবরু করে, হাওয়ার দোলায় দুলিয়ে-ওঠা শ্বেত পরীদের স্বপন টুটে, খিল-খোলা শ্যাম তোরণ-দ্বারে অরুণ বঁধু শরৎ এসে অরুণ আলোর বরণ-ডালা হাতে নিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু হিমাদ্রি যে তার মোটা, দুপাট, বিছানার বোম্বাই চাদরখানা আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে, ঘণ্টা দুই চিৎ হয়ে পড়ে—"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর"—এম্‌নি সব ভাল ভাল সরস কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখবে—তা আর বেচারীর ঘটল না। বছরটাই সেবার গেল সাহেব আর স্যুট, কোট্ আর বুট নিয়ে। টাই-এর গাঁট এঁটে বাঁধা আবার টেনে তাই খোলা—এই করে প্রাণান্ত! তারপর আবার বাবার চিঠির ওপর চিঠি—পাহাড়ে গিয়ে সাহেবের কাছে তদ্বির কর।

শেষ চিঠি সে পেলে বেস্পতিবারে। হুকুম হয়েছে, চিঠি পেয়েই ছাড়তে হবে। কি আর করে বেচারী—বেণীর মত দুরন্ত ছেলে তো নয়—কাজেই বার-বেলাতেই একখানা একশো এগার নম্বর মানে থার্ডক্লাশের টিকে গাড়ী নিয়ে সে শেয়ালদায় এল। মনে মনে ঠিক করে এল যে—এই তার শেষবার দার্জ্জিলিং যাওয়া—চাকরি হলো তো ভালই, নয় সাহেবের সবুট শ্রীচরণে বিদায়-দণ্ডবৎ রেখে, চাকরির মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে চিরদিনের জন্য পট্টু হয়ে এসে বস্‌বে।

গাড়ী ছাড়বার তখনো মিনিট কতক দেরী ছিল। প্লাটফর্ম্মের ওপর বার-কয়েক এ পাশ ও পাশ পায়চারি করে এসে হাতলটা টেনে দরজা খুল্‌তে যেতেই আবেশে-জড়ানো পাত্‌লা দু'খানি পাতার নীচে কার ও দুটী টানা চোখে ঈষৎ চপল দৃষ্টি—!

ট্রেণ ছাড়বার শেষ ঘণ্টা নির্ম্মমের মত বেজে উঠলো—হিমাদ্রি গাড়ীর ভেতরে উঠে বেঞ্চের ওপর বস্‌তেই এ কি! সেই চোখের তুলির টানে বেঁকিয়ে তোলা ভঙ্গিমাটী চোখের ওপর ছবির মত ফুটে উঠল! চাউনিটী তার মনের পাতায় এক নিমেষের ঝাঁকেই গভীর দাগে লেখা হয়ে গিয়েছে। কাঁচের স্ফটিকের মত

স্বচ্ছ মর্ম্মের আবডাল দেওয়া বিজ্‌লী আলোটার দিকে অনেকক্ষণ একমনে তাকিয়ে থেকে তার মাথায় হঠাৎ কি একটা খেয়াল এল, হাতব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে ভেবে ভেবে প্ল্যানটা তার ম্যাচিউর কর্‌তে সুরু কর্‌লে। তারপর কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়লে সেই চোখের তারারই মত দেওয়ালি ফুল-ঝুরির কুঁড়ি-ঝরা কুচি কুচি স্বপ্ন হয়ে এসে তার চারিধারে স্বর্গের সৃষ্টি করে দিয়েছিল তা আর সে টের পায় নি। তারপর খড়্‌রর্‌র্‌-খটাৎ শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে দেখে, গাড়ী হু-হু আওয়াজ তুলে সান্তাহার ষ্টেশনের ডিস্‌টান্ট্‌ সিগ্‌নাল পার হচ্ছে।

২

বাবু আর বাবা-লোগস্‌ কি রকম হুড়োহুড়ি করে গাড়ী বদল কচ্ছেন তা দেখবার আর হিমাদ্রির অবসর হলো না। সে একরকম ছুটোছুটি করে এসে শিলিগুড়ির গাড়ীর একেবারে পেছন দিকে একটা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পোজিট কামরায় উঠে পড়লো। দুখানা বেঞ্চের মাঝখানে প্রকাণ্ড হাঁ-টার ভেতর রাজ্যের বিছানা বালিস গিলে পিণ্ডাকার এক দৈত্যের মত হোল্ড-অল্‌টা মুখ-বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইল। দুটো সুটকেস রাখলো তার পাশে—সুটকেসের উপর পুরোপুরি বোঝাই হাত-ব্যাগটা। তারপর খানতিনেক বাঁধানো ইংরিজি বই উপরো-উপরি সাজিয়ে, পাশের বেঞ্চখানার ওপর হিমাদ্রি কাৎ হয়ে সেই বই মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লো।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরেই নীচ থেকে সরু মিঠে গলায় কে যেন কাকে বল্লে,—এই তো, এই গাড়ী। হিমাদ্রির বুকের ভেতরটা একবার দপ্‌ করে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে একটী মাঝারি বয়সের হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ গাড়ীতে উঠে চেঁচিয়ে বল্‌লে—আরে ইতো বহুৎ মাল্‌ বা—কিস্‌কো হো ?

হিমাদ্রি ও-পাশ ফিরে শুল। এর মধ্যে একটী তরুণী সেই হিন্দুস্থানী জমাদারণীর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লেন,—কে একজন যে শুয়ে রয়েছেন।

মোট্‌কী হিন্দুস্থানীর এতক্ষণে জ্ঞান হল। সে বেঞ্চের ওপর তাকিয়ে দেখে বল্লে,—আরে হাঁ-হো এ দাদা! এ কেয়া তাজ্জবকা বাৎ!

হিন্দুস্থানীটী হিমাদ্রির কাপ্তেনী ঢংএ ছাঁটা চুল, তার মাঝখান দিয়ে টেনে কাটা সিঁথি দেখে ভাবলে, এ বুঝি কারো ছোকরা-টোক্‌রা হবে। এ রকম ভাববার আরো কারণও যে না ছিল, তা নয়। সরু লাল পেড়ে কাপড়ের কোঁচার দিকটা ছিল হিমাদ্রির কোমরে জড়িয়ে বাঁধা, গায়ে অবশ্য একটা সিল্কের পাঞ্জাবীই ছিল কিন্তু তার পিঠের ডান ধারে ঘাড় থেকে খানিকটা নীচে চওড়ার দিকে আঙুল আষ্টেক ছিঁড়ে গিয়ে ভেতরের আধ-ময়লা ধুলোয় ধুলোয় কালোটা বেরিয়ে পড়েছিল। পায়ের দিকে বেঞ্চের পাশে, মেঝের ওপর হিলের কাছে বেঁকিয়ে দুম্‌ড়ে-যাওয়া ছেঁড়া সেলিম সু জোড়াটী খুলে রেখেছিল।

হিন্দুস্থান-ওয়ালী তো দেখেই মনে মনে চটে লাল হয়ে উঠলো—পেছনে তরুণী একটুখানি অবাক-মতনই হয়ে গেলেন, কেবল হিমাদ্রি দিব্যি বে-পরোয়া নির্ব্বিকার।

হিন্দুস্থানী তার হেঁড়ে গলায় ঝগড়াটে ঝঙ্কার তুলে হাঁক্‌লে—এইও হিঁয়া কোন্‌ শুতোল হায়? উঠো, উঠো উতার যাও।

হিমাদ্রি চুপ! তরুণীও কিছু কথা বল্‌ছেন না। তাঁর ছাপরাওয়ালী সঙ্গিনী এবার তর্জ্জনী-ঘোরানো তর্জ্জনে গর্জ্জে উঠলো,—ই কাঁহা-কা বে-অকুব্‌! উঠো হো, মাল উত্‌রাও।

এবার হিমাদ্রি আওয়াজ-ভারি গলায় উত্তর কর্‌লে,—কাঁহা উতরাই তো—এ দাদি?

অপমানটা আয়ার গলায় জ্বলে উঠে ফেটে পড়লো। সে বল্‌লে,—তেরা মাতোয়ালকা কেয়া বোলি? তোম্‌ মাল হঠায়েগা কি নেই? বোলাও তোমারা সাহেবকো—উ কিধার গিয়া?

উত্তরে হিমাদ্রি চট্‌ করে উঠে বসে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে তরুণীকে দেখিয়ে বল্‌লে,—বড়ি সাহেব খাড়ি হ্যায়?

এ অভদ্র উত্তরে তরুণীর রীতিমত চটে যাবারই কথা—কিন্তু তখনি বিদ্যুতের এক রাশ উছল আলো হিমাদ্রির

মুখের ওপর পড়্‌তেই তরুণী বুঝ্‌লেন, এ মুখ কোনো সাহেবের বয়ের নয়—একজন ভদ্রলোকেরই এই সুন্দর মুখখানি। এই কুৎসিত গোলমালের হাত এড়াবার জন্য তিনি বুদ্ধিমতীর মত বল্‌লেন,—ওকে ক্ষমা করুন, সাধারণ মেয়েমানুষ ও, আপনাকে চিন্‌তে পারে নি।

হিমাদ্রি নমস্কার করে—না আমি কিছু মনে করিনি—বলে তরুণীর মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, সেই কমনীয় চোখের বিলোল চাউনিটি! তার বুকের ভেতর মর্ম্ম-গ্রন্থির ওপর একটা স্পন্দন সুরের মত শিউরে উঠ্‌লো।

তরুণী প্রতি-নমস্কার জানিয়ে টোল তুলে বেড়ে ওঠা বুকখানার ওপরে হাত দুখানা যোড় ক'রে তুল্‌তেই হিমাদ্রি দেখ্‌লে, ফুলের মত সে হাতের সুডোল গড়ন, ব্লাউজের হাতার ঝুলে দোল খাওয়া ফুল-কাটা লেশের নীচে কব্জোনীটি যেন তুলির টানে বেঁকিয়ে টানা, নিটোল। কল্পনার জমির ওপর সাতরঙা রামধনু আঁকা, রূপ-কথার ঘুমন্ত রাজকন্যার ছবিখানির মত রূপ তার না হলেও গোছ-বাঁধা চুলের রাশ মেঘ-বরণই সত্যি। জামা-কাপড়ের কাঠ-গোলাপী রঙ্‌ মুখের রঙ্‌টাকে মোহন করে ফলিয়ে ধরেছে।

হিমাদ্রির চোখে সে রূপ চমৎকার লাগ্‌লো। তরুণী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন,—এ ক্ষমার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ—কিন্তু গাড়ীখানা, মানে, এই কম্পার্টমেন্টটা আমার রিজার্ভ।

হিমাদ্রি থ' করে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে জবাব দিলে,—আপনার রিজার্ভ! না, ভুল হয়েছে বোধ হয়। এতো আমারি রিজার্ভ।

তরুণী হঠাৎ কিন্তু-মতন হয়ে বল্‌লেন,—না, আমি তো ঠিক দেখে উঠেছি। আপনি প্ল্যাকার্ড পড়ে উঠেছিলেন ত?

—হ্যাঁ আমি স্পষ্ট পড়ে উঠেছি।

তরুণী এবার স্বরে বেশ জোর দিয়ে বল্‌লেন,—প্ল্যাকার্ডে পরিষ্কার নাম লেখা রয়েছে, হিমাদ্রি রায়।

হিমাদ্রি জবাব দিলে,—হ্যাঁ, হিমাদ্রি রায়ই তো লেখা আছে। আমার নামই হিমাদ্রি রায়।

—আপনার নাম হিমাদ্রি রায়? বল্‌তেই তরুণীর মণিবন্ধে আল্‌গা করে জড়ানো ঝোলানো থলেটী দেহের অন্যমনস্ক উত্তেজিত ঝোঁক লেগে দুলে উঠ্‌লো।—হ্যাঁ, এই দেখুন—বলে হিমাদ্রি মাথার দিকে সাজানো বই কখানার ওপর থেকে সালোমেখানা টেনে এনে খুলে দেখিয়ে সুন্দরীর হাতের থলেটার পানে আবার তাকালে;—মখমলের উপর জর্দ্দা সুতোয় বোনা একটা টুক্‌রো ডালের দুদিক দিয়ে চিরচির গোল পাতা নিয়ে লতিয়ে যাওয়া ডগায় গায়ে গায়ে সবুজ কাঁটাগুলো বেশ স্পষ্ট বুটি তুলে বোনা—তার আবডাল থেকে কুঁড়ি নিয়ে উঁকি মেরে উঠেছে একটী কাঠ-গোলাপ, আর সেই কুঁড়িটাকে বুক দিয়ে ঘিরে নিয়ে ফুটে রয়েছে, ঋতুর প্রথম সকাল-বেলাকার সকল যাদু-মাখা সোনার মুকুট মাথায় পরা প্রথম গোলাপটী—ফিকে লাল রঙের রেশমী সুতোর সূক্ষ্ম ফোঁড় গুণে গুণে তুলে গোলাপের পাপড়িগুলি গড়া। হিমাদ্রি ভাব্‌লে, কার আঙুলের এ নিপুণ কাজ অপরূপ হয়ে ফুটেছে! ঐ তরুণীর মানান-সই ছোট বড় পাঁচটী আঙুলের কি?

রূপসী যাত্রীটী সালোমের প্রথম পাতার ওপর চেয়ে দেখলে, বাঁকা করে লেখা রয়েছে—"হিমাদ্রি রায়—এম-এ, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল।" তারপর ফিক করে ঝিকিক-কোটানো হাসির সরু রেখাটী অধরের পাশে ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন,—এ তা হলে একটা comedy of errors—আমার দোষ ক্ষমা করবেন। আমারও নাম, হিমাদ্রি-লতিকা রায়। তবে পুরোপুরি নামটা আমি কোনোদিনই লিখিনে—লতিকাটি বাদ দি।

হিমাদ্রি হেসে বল্‌লে—কোমল লতাটীকে বাদ দিয়ে পুরুষালি—এ নাম যে বজ্রাদপি কাঠোর হয়ে উঠেছে। তা—আপনি বসুন—এইখানেই। আমি দেখে আসি, আর কোনো গাড়ী দিয়েছে কিনা!

তরুণী এবার 'মৃদুনি কুসুমাদপি' মোলায়েম গলায় বল্‌লেন,—আপনিই যাবেন কষ্ট করে! হয়তো এইখানাই আপনার গাড়ী।

—No matter. কষ্টেরই এ যাত্রা আমার—বলে ফরাসী গ্যালাণ্টের মতই হিমাদ্রি চট করে নেমে গেল।

হিন্দুস্থানী সঙ্গিনীটী তরুণীর আগেই ফাঁকে-ফোঁকে জিনিষ গুলো নামিয়ে গুছিয়ে রেখেছিল, এইবার তরুণীর জন্যে বেঞ্চের ওপর বিছানা পেতে দিতেই হিমাদ্রি ফিরে এসে বল্‌লে,—না, আর কোনো গাড়ী তো দেয় নি! আচ্ছা, আমি নামিয়ে নিচ্ছি আমার জিনিষগুলো। আপনাকে কষ্ট দিলাম—দোষ নেবেন না।

সুন্দরী বল্‌লেন,—দোষ নেবার অধিকারটা যে কার, তাই বোঝা গেল না। সুতরাং আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে একটা অনুরোধ কর্‌তে চাই।

—আপনার বিশেষ সৌজন্য—বলে হিমাদ্রি দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরে সে সুন্দর মুখখানির দিকে তাকালে।

তরুণী বল্‌লেন,—দরকার কি আর টানাটানির? ঐ তো আর-একখানা বেঞ্চ রয়েছেই—আপনি এইখানেই থাকুন না!

হিমাদ্রি একটু ইতস্তত করে বল্‌লে,—কিন্তু এক সঙ্গে—

—তাতে কি হয়েছে! আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক—আপনার সঙ্গে যেতে তো আমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ আস্‌তে পারে না। কারণ, আমি জানি, পথে একলাটী আমরা যাই যখন, দরকার হলে তখন আপনারাই লজ্জা আর অসম্ভ্রমের হাত থেকে আমাদের বাঁচাবেন। আপনি বসুন।

বহু ধন্যবাদ দিয়ে দিয়ে হিমাদ্রি যে বেঞ্চে শুয়েছিল সেইখানেই গিয়ে আবার বস্‌লো। তরুণী বস্‌লেন তার সামনের বেঞ্চে, আর সেই চাউস হিন্দুস্থানীটী বস্‌ল তরুণীর পাশে—পাহারওয়ালা-মাই! সে আর হিমাদ্রির পানে মুখ তুলে তাকালে না।

হিমাদ্রি প্ল্যান পাকা ক'রে বসলেও অপরিচিতা এক সুন্দরীর সাম্‌না-সাম্‌নি ট্রেণের ভেতর এমন অবস্থায় কেমন যেন মিইয়ে গেল। ভাবটা বুঝতে পেয়ে সুন্দরী প্রচুর খুসী দিয়ে খোলা প্রাণের সরল কথা আর কুণ্ঠাহীন নিবেদনের স্বরে ছন্দে তার সঙ্কোচের সকল গ্লানি নিঃশেষে ভেঙ্গে দিলেন। আস্তে আস্তে গল্প হীরের ঝুরি-জমানো মিহিদানায় বেঁধে উঠ্‌লো। চেষ্টায়। ক্রমাগত ব্যর্থ হয়ে হয়ে চাকরির ওপর তার ধিক্কার জন্মে গিয়েছে, এবারও বিফল হতে হবে জেনেও সে চলেছে—কারণ বাবার বার-বার আদেশ আর উপেক্ষা করা গেল না। হিমাদ্রিলতিকা তার প্রথম-পরিচিত এই তরুণ যাত্রীর সাফল্যের জন্য ভগবানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানালে—দূর পথের বরাবর যাত্রী এদুটী পথিকের তরুণ অন্তরাত্মা কি এক তৃপ্তিতে সার্থক হয়ে ওঠবার ভবিষ্যৎ কল্পনা একটু-আধটু নাই কর্‌লে!

হিমাদ্রি-লতিকা বল্লে, দার্জ্জিলিংএ তাদের বাড়ী আছে। তার কাকা সেখানে থাকেন। ছোট ভাই মিণ্টু ভারি 'দুষ্টু'—কিন্তু খুব ভাল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোমে চিক্‌চিকে কালো কুকুরটী চমৎকার দেখতে। সে কাউকে কিছু বলে না।

এমনি সব নানা আলাপে পরিচয় পাকা হয়ে গেল। সারা রাস্তা গল্প আর হাসি-পরিহাসে দুজনের ভালই কাটলো। দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে নেমে পাহারওয়ালা-মাই হিমাদ্রিকে সেলাম করে কসুরের জন্য মাপ চাইলে। হিমাদ্রি হেসে তাকে ক্ষমা করে নতুন চেনা তার তরুণী বন্ধুকে নমস্কার জানিয়ে স্যানিটেরিয়মের রাস্তায় চলে গেল, সুন্দরী সেই মিঠে হাসি আর একবার হেসে প্রতি-নমস্কার করে বলে দিলে—যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়ী, আজ বিকেলেই।

হিমাদ্রি ঘাড় ফিরিয়ে 'আচ্ছা, ধন্যবাদ' বলে আর একবার দেখে গেল সেই চোখ-দুটির মিষ্ট চাউনিটুকু!

৩

বার্চ্চ হিলে একখানা বেঞ্চের ওপর বসে হিমাদ্রি অনেক রকম কথার মধ্যে সব চেয়ে বেশী করে ভাবছিল তার কথা, চোখ দুটী যার কালো।

হঠাৎ কে যেন ঠিক পেছনটীতে এসে ঘাড়ের ওপর কোমল দু-খানি হাত রেখে বল্লে—আশ্চর্য্য লোক যাহোক্ আপনি! আমাকে এড়াবার জন্য স্যানিটেরিয়ম ছেড়ে একেবারে সহরের সীমানায় এসে পড়েছেন!

হিমাদ্রি মাথা তুলে তাকিয়েই নমস্কার করে উঠে

সর্ব্বাঙ্গে তরতরে কি একটা ঝিম্‌ঝিম্ ভাব কাঁপিয়ে তুলছিল —গলায় সেই কাঁপুনিরই আধ দোল-দোলানো তরঙ্গ-ভঙ্গ নিয়ে বল্‌লে—ক্ষমা করবেন আমাকে। বড্ড অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

—সে কথা পরে হবে। আগে আসুন বসা যাক, ব'লে দুজনে পাশাপাশি বেঞ্চখানার ওপর বসলো। তরুণী শাড়ীর কুঁচকে যাওয়া আঁচলখানা সেরে নিয়ে বল্‌লেন,—তারপর বলুন, আপনার চাকরির কি হল?

হিমাদ্রি বল্‌লে—যা বরাবর হচ্ছে তাই হল। সাহেব আমাকে প্রাকটিস করতে বল্‌লেন—advice gratis. যাক,—এবারে ঠিক করেছি, চাকরি আর করবো না। সাহেবের পায়ে ধরা এই শেষ।

হিমাদ্রি-লতিকা মিনিট দুই চুপ করে থেকে বল্‌লেন—হিমাদ্রি বাবু, আমি সত্যি করেই আপনার জন্য দুঃখিত—যারা deserving, সরকারী চাকরি পায় না তারা, এই হচ্ছে দিনের দস্তুর।

—আপনাকে ধন্যবাদ। সেজন্য আমার এতটুকুও ক্ষোভ নেই—বলে হিমাদ্রি আর একবার তাকিয়ে দেখলে, সেই ডাগর কালো চোখ দুটী।

তরুণী বল্‌লেন,—একটা কথা জিগ্‌গেস করবো হিমাদ্রি বাবু?

—আপনার দয়া।

—আশ্বিনের শেফালিকায় "কালো বউ" গল্পের লেখকটীকে আপনি চেনেন?

হিমাদ্রি মৃদু হেসে বল্‌লে,—তার নাম তো লেখার তলাতেই ছাপা আছে।

—হ্যাঁ আছে। ছাপা আছে হিমাদ্রি রায়। তাঁকে কি আপনি চেনেন? বলে সুন্দরী আবার সেই সুন্দর হাসি হাসলে।

হিমাদ্রি বল্‌লে,—তাকে আপনি চেনেন।

—তাহলে আমি ঠিকই ধরেছিলুম। কিন্তু কালো বউটী কি তাঁরই?—বলে তরুণী মুচকে হেসেই হিমাদ্রির মুখের দিকে চাইলে বটে কিন্তু তার পাশে একটা জানবার আগ্রহ আর কি এক আশঙ্কা একসঙ্গে যেন বিষ-নিশ্বাস ফেলে সবখানি স্বচ্ছতা তার নীল করে দিচ্ছিল।

হিমাদ্রি বল্‌লে, বউটি তার বন্ধু অমলের। তাঁর কালো বা গোরা কোনো রকমেরই বউ আজও ভাগ্যে জোটেনি।

হিমাদ্রি-লতিকা চুপ করে একটা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—আমার অনুরোধ রাখবেন?

—বলুন।

—একখানা মাসিক কাগজের এডিটারি নিন্ না। কাগজখানা push করার লোক না থাকায় চল্‌ছে না—আপনি যদি এই ভারটা নেন।

—আপনিই তা হলে দীপালির এডিটার হিমাদ্রি রায়? বলে সপ্রশ্ন একটা দৃষ্টি, হিমাদ্রি সুন্দরীর মুখের ওপর তুলে ধর্‌লে।

—হ্যাঁ, কাগজখানা আমার অন্তরের অন্তরতম সাধনার ধন। অনেক করে তাকে ভাল কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি—রাত-দিন খেটেছি কিন্তু ছাপা যা হয় তার অর্দ্ধেক ফিরে আসে। বল্‌তে বল্‌তে যে দুটী চোখের সেই বাঁধা বিলোল চাউনীটী আলোর মত মুখখানাকে ছবির রঙে উজ্জ্বল করে তুলেছে—তারই পাশ দিয়ে মুক্তার মত দু-ফোঁটা জল টলটল করে এল।

হিমাদ্রি কাজ নিতে রাজী হল।

হিমাদ্রি-লতিকা চকিতে পুলকিত হয়ে উঠে বল্‌লে—কি আনন্দই যে আমার হচ্ছে, তা বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। চলুন এইবার আমাদের বাড়ী। আজ আর ছাড়ছিনে।

—চলুন। বলে হিমাদ্রি উঠে দাঁড়ালো। তারপর তরুণী তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়ে বিজলী আলোয় উজ্জ্বল ড্রইং রুমের ভেতর সোফার ওপর বসিয়ে তরুণ অতিথির অভিনন্দন করলেন। গল্পে গুজবে প্রাণের তন্ত্রীতে একটা নূতন রাগিণীর সুর-গুঞ্জরণ নিয়ে হিমাদ্রি স্যানিটেরিয়মে ফিরে এল। ঠিক হল, দুজনে একসঙ্গেই আবার কল্‌কাতা ফিরে যাবে। হিমাদ্রি আসছে-মাসের প্রথম থেকেই কাগজের কাজ আরম্ভ করবে।

৪

নতুন সম্পাদকের পাকা হাতে দীপালির দর আর কদর মাসের পর মাস বেড়ে যেতে লাগ্‌লো।

হিমাদ্রির ফাইনাল বি-এল দেওয়া হয়ে গিয়েছে। দীপালির দীপ-শিখাটী গন্ধে কিরণে চমকিয়ে তোলাই এখন হিমাদ্রির একমাত্র কাজ হ'য়ে দাঁড়ালো। কাগজের তরুণী স্বত্বাধিকারিণী তরুণ বন্ধুর হাতে কাগজের সকল ভার সম্পূর্ণ রকম ছেড়ে দিয়েছেন। ছ-মাসে দীপালির তিন হাজার গ্রাহক হলো।

হিমাদ্রি-লতিকা এখন শিলং, রাঁচি করে বেড়ান। কল্‌কাতায় থাকেন যখন, তখন দুপুরটা কাটে দীপালি আপিসে। বিকেলে কারে বেড়াতে বেরোন্, হিমাদ্রিও এক-একদিন সঙ্গে যায়।

হিমাদ্রি যখন দরবার-সেলিম পরে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবীর ওপর দামী পাড়দার শাল গায়ে দিয়ে নিজে ড্রাইভ করে বেরোয়, তখন একজন ধনী ঘরের সৌখীন ছেলে বলেই সত্যি তাকে মনে হয়। হিমাদ্রিলতিকা পেছন থেকে তাকিয়ে দেখে। বুকের ওপর একটা স্পন্দন কেঁপে উঠে কি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দে তার সমস্ত অন্তর তখন ভরে তোলে। পাহারওয়ালা-মাইও আর এখন তাকে "বয়" ব'লে ভুল করে না।

হিমাদ্রি সত্যই ধনী ঘরেরই ছেলে। তার বাবা বেহারে কালেক্টর। ছেলের পাশের খবর তিনি ঠিক সময়েই পেয়ে বাড়ী যাবার জন্য লিখে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু "কাজের চেষ্টা কর্‌ছি" বলে জবাব লিখে দিয়ে হিমাদ্রি কল্‌কাতাতেই রয়ে গেল। "দীপালি" আর তার তরুণী প্রোপাইটার রাজধানীর বুকে তরুণকে শক্ত রকমে বেঁধে ফেলেছিল!

হঠাৎ বাবার চিঠি এল—হিমাদ্রির ছোট বোন লীলার বিয়ে। কল্‌কাতাতেই বিয়ে হবে—তারই সব গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিক কর্‌বার ভার তার উপর।

বিয়ে বাড়ীতে হিমাদ্রি-লতিকার নেমন্তন্ন হল—আলাপে আপ্যায়িতে মেয়েদের সঙ্গে তার খুব চেনা-জানা হয়ে গেল—কিন্তু হিমাদ্রির সঙ্গে যে তার কি রকম করে পরিচয় কতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল—তা কেউ কিছুই জান্‌তে পার্‌লে না। হিমাদ্রি বল্‌লে, এ মেয়েটী তার ক্লাসফ্রেণ্ড, এম-এ ক্লাসে এক সঙ্গে পড়্‌তো। ধনী-ঘরের দুলালী, এখনও বিয়ে হয় নি—তার বাবা যুদ্ধের বড় ডাক্তার।

বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেল—বর নতুন বউকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। এখানে সব বোনেরা হিমাদ্রিকে ধরে পড়্‌লো তারা সিনেমায় ছবি দেখ্‌তে যাবে।

এদিকে সেদিন বাঙলা মাসের আটাশ তারিখ। হিমাদ্রির আর নিশ্বাস ফেল্‌বার অবসর নেই। সম্পাদকীয় টিপ্পনী লেখা হয় হয় নি—দেশের কথার প্রুফ্‌সিট্ দেখে দিতে হবে ইত্যাদি। সারাটী রাত্তির না জাগ্‌লে কাগজ তারিখ-মত বেরোবেই না।

সে বল্‌লে—আচ্ছা বাবার সঙ্গে তোরা যা। আমি ফোনে Picture Palaceএ ওপরে দশখানা seat রিজার্ভ রাখব'খন। আর সেই যে মেয়েটী সেদিন এসেছিলেন, তিনি কার নিয়ে আস্‌বেন—বাবা জিগ্‌গেস কর্‌লে বলিস্—আমার চেনা, তোদের সঙ্গেও বিয়ের দিন আলাপ হয়ে গেছে। উনি দীপালির এডিটার।

মেজ বোন্ কমলা বল্‌লে,—দীপালির এডিটার উনি না কি! ওঁরই নাম হিমাদ্রি রায়!

—হ্যাঁ, তোর্ দাদার নামে নাম! বলে হেসে হিমাদ্রি বেরিয়ে গেল। ঘণ্টা কয়েক পরে ফিরে এল যখন—তখন দেখে, দরজায় হিমাদ্রি-লতিকার উল্‌স্‌লী কার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওপরে উঠে গিয়ে হাঁক্‌লে,—এই কম্‌লি—২৩ থেকে ৩২ নম্বর সিট্ আমাদের—মনে রাখিস্।

কমলা এগিয়ে এসে বল্‌লে—তোমার এডিটারকে নম্বর বলে দাও, উনি সঙ্গে থাক্‌বেন।

কথা না ফুরোতেই কর্ত্তা ঘরে ঢুকে বল্‌লেন,—কিরে তোরা যাবি নাকি বায়োস্কোপে? তৈরি হচ্ছিস?

—হ্যাঁ বাবা। বলে কমলা বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো। এতক্ষণে হিমাদ্রির ওপর চোখ পড়্‌তেই তিনি বল্‌লেন,—কি হে, তুমি নাকি যাচ্ছ না, আমাদের সঙ্গে—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ, আমার একটু কাজ আছে। বলে হিমাদ্রি পাশের দিকে একটুখানি সরে আস্‌তেই হিমাদ্রি-লতিকার মুখখানি বুড়ো দেখ্‌তে পেলেন। হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন

যেন এই রকম করে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—এ মেয়েটী ?—

হিমাদ্রি বল্লে—ইনি দীপালির এডিটার! উনি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।

বুড়োর সন্দিগ্ধ মনে কথাটা যেন কেমন ঠেক্‌লো! তিনি জিগ্‌গেস করলেন—তোর সঙ্গে আলাপ— ?

—আমি আজকাল দীপালির এডিটোরিয়াল ষ্টাফে কাজ কচ্ছি। উনি আমায় মাসিক আড়াইশ টাকা মাইনে দেন।

বল্‌তেই হিমাদ্রি-লতিকা কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে গলায় আঁচল দিয়ে দুহাতে বুড়োর দু পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলেন। বুড়ো তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

Picture Palace এ সেদিন ছিল নতুন ফিল্‌ম্ তিন হাজার ফিট লম্বা Prince of the Primrose Gay. সিনেমার পরদার ওপর নানা বৈচিত্র্যের ছবিগুলো ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌লো পর-পর—আর কমলা জেরার ওপর জেরা করে করে হিমাদ্রি-লতিকার কাছ থেকে তার বড়্‌দার গল্পটা একটু একটু করে সব জেনে নিলে। নেহাৎ অন্যমনস্কে ভাবের ঝোঁকে হিমাদ্রিলতিকা সব কথাই বলে ফেল্‌লে। কমলা ভাব্‌লে—বড়দা মন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে মন হারিয়ে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে লতিকারও হৃদয় চুরি গিয়েছে নিশ্চয়।

বাড়ী ফিরে এসে কমলা পাকা চুল তুলতে তুলতে বাবার কাছে চুপি চুপি সব কথা বলে দিলে—আর সেই দিনই বুড়ো বিকেলে চায়ের বাটিটা মুখের কাছে তুলে গিন্নিকে পরিষ্কার বলে ফেল্‌লেন যে,—তাঁর বড় ছেলে বিয়ে-টিয়েও করবে না। বল্‌লে বলে, বিয়ে করে খাওয়াব কি ? কিন্তু ওর চরিত্র খারাপ হবার—

গিন্নী বললেন,—তেমন ছেলে আমি পেটে ধরিনে—বলে মা মায়ের মতই জবাব দিয়ে সন্দেশের থালাখানা স্বামীর হাতের কাছে এগিয়ে দিলেন।

বুড়ো বল্‌লেন,—দেখা যাবে।

ওদিকে ঠিক সেই সময় হিমাদ্রি-লতিকা দীপালি আপিসে এসে সম্পাদকের ঘরে গিয়ে তাঁকে বল্লেন, তিনি মাস খানেকের জন্য গিরিডি যাচ্ছেন। Picture Palace থেকে এসে অবধি তরুণীর সঙ্গে হিমাদ্রির আর এমন মুখোমুখি একা দেখা হয় নি। সে বল্‌লে,—সেদিন কেমন দেখে এলেন, তাতো বল্লেন না।

তরুণীর কথায় কথায় হাসি যে!—আর হিমাদ্রির বুকের ভেতর গিয়ে সে হাসি যখন-তখনই যা তা সব কথা গোলাপ-পাপড়ি সাজিয়ে তোলে। এবারও লতিকা হেসে বল্লে—সেদিন দেখেছিলাম, Prince of the Primrose Gay.

—দেখি আপনার থলেটা। বলে হিমাদ্রি হাত বাড়ালে সুন্দরী তার ঝুলোনো থলেটী খুলে হাত-নাড়ার ছন্দে যেন রূপের মাণিক টুক্‌রো করে ভেঙে আলো ফুটিয়ে তুলে জিগ্‌গেস কল্লেন,—কবির আবার এ কি খেয়াল!

হিমাদ্রি থলেটী নিয়ে ওপরের কাজটা দেখিয়ে বল্লে—এ বুঝি সেই ফিল্‌মের সিনপ্‌সিস্ ?

—এতও আপনার চোখে পড়ে

—সেদিন সান্ধ্যাহারে গাড়ীর ভেতরেই এটা চোখে পড়েছিল, ভেবেছিলাম, কার আঙ্‌ুলের এ মিহি কাজ!

—তারপর কিছু ঠিক করতে পেরেছিলেন ? বলে তরুণী হিমাদ্রির দিকে তাকালে।

হিমাদ্রি বল্‌লে,—তখনি। যে হাতে এটী ঝোলানো ছিল, সেই হাতেরই কোমল আঙুলকটী খেটে খেটে ছবিখানি লিখে তুলেছে। এই যে Primrose এর কুঁড়িটী peeping beneath the thorns.

সুন্দরী বল্‌লেন,—আর ঐ বড়টী বুঝি—Prince of the primrose ? কিন্তু সেটী gay কে বল্লে ? কেবল যে কুঁড়ি!

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে হিমাদ্রি বল্‌লে,—আজ ফুটেছে সবগুলি তার দল নিয়ে।

—কোন্‌খানে ?

—বলার সাহস নেই। বল্‌তেই হিমাদ্রির চোখের তারা দীপ্ত বড় হয়ে উঠলো।

তরুণী চকিতে উঠে এসে হিমাদ্রির হাতখানা তার

নিজের হাত দুখানার মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে—বলুন স্পষ্ট করে।

হিমাদ্রি তরুণীর হাতের মণিবন্ধে থলেটী জড়িয়ে বেঁধে দিয়ে বল্‌লে—এত সাহস পেলে সে কথা ফুঠে ওঠা দুখানি পাপড়ির মাঝখানে বুক-ছেঁচা ফুলের লাল দিয়ে লিখে দিতাম।

তরুণীর মুখখানি অনাহত তরুণের মুখের ওপর ঝুঁকে এলো। হিমাদ্রি কিছু বুঝতে পাল্লে না, কিন্তু তরুণীর গালের ওপরটা চোখের পলকে ফাগের মত লাল হয়ে গেল। হাতখানি আপনি এক সময় সুন্দরীর ঘাড়ের ওপর দিয়ে লতিয়ে জড়িয়ে উঠেছিল। হিমাদ্রিলতিকা জোর করেই একরকম ঘাড় ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল—সেইদিন থেকে হিমাদ্রি হলো, Prince of the primrose gay.

৬

তার দুমাস পরে দীপালিতে বিজ্ঞাপন বেরুল, "মেয়ে চাই"। পড়েই কামনা ছুটে গিয়ে বাবাকে বল্‌লে,—নিশ্চয়, বড়দা।

বুড়ো বল্‌লেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো আগেই বলেছি, গিন্নি বিশ্বাস কর্‌বেন না! এই দেখ, পেটে ধরেছ যাঁকে, তাঁর কীর্ত্তি।

গিন্নি পড়ে বল্‌লেন—কে বল্লে যে এ হিমাদ্রি?

—ঐ আঁচিল ছুটোয় বল্‌লে, আর বল্‌লে, ঐ যে গালের ওপর তিল থাকা চাই! সে মেয়েরও তাই আছে! জাত বাবার গতিক করে তুলেছে—বলে বুড়ো মাথা নাড়তে লাগলেন।

কমলা বল্লে,—বাবা, হোক্ না ওদের বিয়ে।

—হ্যাঁ, হোক না লক্ষীছাড়ী! কি না কি শ্রেণী—বামুন কি না তারই বা ঠিক্ কি!

কমলা বল্‌লে,—কিন্তু মেয়েটা—

বুড়ো বল্‌লেন—তা বেশ। বৌমাটীরই মত আমায় প্রণাম কল্লে—আস্‌বার দিন কত কথা যে কইলে, ওর ঢের জানা-শোনা।

—জান্‌বে না? খবরের কাগজের এডিটার যে।

—তা সে যাই হোক, বিয়ে কিন্তু হতে পারবে না। আমি আজই যাচ্ছি। ফিরিয়ে নিয়ে আসছি ছোকরাকে। গাড়ী জোতাই। বলে বুড়ো কোচম্যানকে গাড়ী জুততে বল্‌লেন, তার আধ ঘণ্টা পরেই কল্‌কাতার গাড়ী ছাড়বে।

বুড়ো এসে দীপালি আপিসে এডিটারের ঘরে ঢুক্‌লেন, যখন, তখন হিমাদ্রি ফোন্ ধরে উত্তর করছিল,—হ্যাঁ হিমাদ্রি বাবু একলাই আছেন।—আবার বল্লে, দেখা হবে। আপনারা কোথ্‌থেকে কথা কইছেন?

উত্তর শুনে—আচ্ছা বলে ফিরে তাকাতেই দেখে, সাম্‌নে বাবা। তাড়াতাড়ি এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লে,—কৈ, আস্‌বার কথা আগে তো লেখেন নি। আমি ষ্টেশনে যেতাম।

—তোমরা কি সেই রকম ছেলে হে—বাপের কথা তোমাদের আমলেই আসে না।

এর মধ্যে সাঁ করে একখানা মোটর এসে একটা আওয়াজ করে আপিসের সাম্‌নে দাঁড়ালো। একটী তরুণী কার্ থেকে নেমে এসে ঘরে ঢুকেই বুড়োকে দেখে হঠাৎ থম্‌কে গেল। হিমাদ্রি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বস্‌তে বললেন। তরুণী একখানা চেয়ার হিমাদ্রির কাছে টেনে এনে বসে বললে—আপনিই হিমাদ্রি বাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমিই এখনি ফোন্ ধরেছিলাম—তা আপনার অবসর হলে—তরুণী বুড়োর দিকে তাকালে। হিমাদ্রি বল্‌লে—আপনার কি সম্বন্ধে কথা?

—আপনাদের বিয়ের বিজ্ঞাপনটী নিয়ে।

—তা আপনি কথাবার্ত্তা বলতে পারেন ওঁর সাম্‌নে—কিছু ভাবনা বা ভয়ের কারণ নেই। কথা বেরোবে না। উনি আমার বাবা।

—ওঃ নমস্কার! বলে তরুণী বুড়োকে আপ্যায়িত করে হিমাদ্রিকে বল্‌লে,—আমাদের একটী মেয়ে আছে। আপনারা যেমনটী চান—তেমনি ঠিক, শুধু একটা কথা—

—কি, বলুন।

—মেয়েটীর বাবা রাঢ়ী শ্রেণী, আর তিনি বিলেত-ফেরৎ।

—তাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি হবে না।

তরুণী বল্‌লেন,—বাঁচালেন, বিশেষ ধন্যবাদ! আর ভদ্রলোক একটু ব্রাহ্ম ধরণের।

—তাতে কি?

বুড়ো বাধা দিয়ে বল্লেন,—কিন্তু ছেলেটী কে?

হিমাদ্রি মাথাটা একটু নীচু কর্‌লে। বুড়ো বল্‌লেন—তা কি করে হবে? অন্য শ্রেণী ব্রাহ্মণ—

তরুণী বল্‌লেন,—ছেলের যদি আপত্তি না থাকে, তবে আপনাদেরই কি এতে আপত্তি করা উচিত? এখন social reformএর ভার আপনাদেরই মত শিক্ষিত লোকের হাতে যে। আসুন তা হলে দয়া করে দুজনেই, মেয়ে দেখুন, মেয়ে আমার সঙ্গেই এসেছে।

—আচ্ছা, চল দেখি, কিন্তু বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ঠিক ঠিক চেহারার মিল হওয়া চাই। বলে বুড়ো আগে উঠলেন।

বাইরে এসে দেখেন, মেয়েটী ল্যাণ্ডোলেট কারের ভেতর বসে আছে। গুণ্ঠন দিয়ে মুখ ঢাকা। তরুণী গাড়ীতে উঠে গিয়ে ঘোমটাখানা খুলে ফেল্‌তেই—এ কি! হিমাদ্রিও এ কথা একবারও ভাবেনি। এ যে হিমাদ্রিলতিকা!—দুজনের চোখে চোখে পড়ে চোখে চোখেই হাসি বদল হলো। হিমাদ্রিলতিকা তাড়াতাড়ি নেমে এসে বুড়োকে প্রণাম কর্‌লে।—বেঁচে থাক মা, চিরায়ুষ্মতী হও। বলে বুড়ো ছেলের হাতে তরুণীর হাতখানি তুলে দিলেন, বল্লেন—আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। খুসী হয়ে আমি মত দিচ্ছি।

হিমাদ্রিলতিকা বল্লেন—বাবা আসুন বাড়ীতে, বাবার কাছে সব কথা—

—আর আসুন হিমাদ্রি বাবু। আমার ছেলেবেলার বন্ধু হিমাদ্রি আপনি, আপনাকে চেয়েও আপনার হতে যাচ্ছেন, সেই আনন্দের গান একখানা আপনাকে আজ গ্রে শোনাব, হিমাদ্রিরই পড়ার ঘরে বসে। বলে তরুণীর হাত ধরে হিমাদ্রিকে গাড়ীতে হিমাদ্রিলতিকার পাশে বসিয়ে দিলেন। তারপর বুড়োকে ধরে নিয়ে নিজে গিয়ে গাড়ীতে উঠতেই বাড়ীর বুড়ো সোফার সাঁ করে মোটর চালিয়ে দিলে।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

# ফ্যাশন

শোনা গেল মেয়েদের পায়ের জুতা স্বাভাবিক অবস্থায় বড় আকারের প্রয়োজন হয় বলিয়া সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে খেলনার মত সৌখীন জুতা পরিয়া মহিলা-জনোচিত (lady-like) দেখাইবার লোভে ছোট জুতা পরিয়া কোড়ে আঙুলটীকে একেবারে কড়ামাত্রসার করিয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। এখন তাই কথা হইতেছে শৈশব হইতে আরও চাপিতে পারিলে পরে কোড়ে আঙুলটীকে অস্ত্র করিয়া বাদ দিলেই ল্যাঠা চুকিয়া যাইবে। ইহার সহিত আর চীনা ব্যবস্থার পার্থক্য কি? সভ্যতার আর একটু নিম্নস্তরে যাহা নিরবচ্ছিন্ন জোর করিয়া করা হয়, "সভ্যতা"য় তাহাই "ইচ্ছা করিয়া" করা হইতেছে। ইহাতে সকলেই মেয়েদের মূঢ়তা ও কৃত্রিমতায় (silliness and artificiality) বিশেষ কৌতুক অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত অবস্থাই ইহাতে প্রকাশ পায় না কি? আপনাদের স্বরূপ প্রকাশ করিবার উপায় নাই, তাই চাপিতে চাপিতে মনের দিক ত চাপা পড়িয়াছেই; শরীরকেও চাপা ও অস্ত্র করা প্রয়োজন হইয়া ওঠে। "মহিলাজনোচিত" অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে পুতুল হওয়াই যেখানে বাজারের একমাত্র দাবী, কাজেই তাহার জন্যই যে তাহারা প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি! আমাদের দেশেও "সতীত্ব" ও "পাতিব্রত্য" মাত্র তাহাদের জীবনের মূল্য হইয়া দাঁড়ানোয় তাহার জন্য তাহারা কি না করিয়াছে ও করিতেছে! আর তাহাদের "মূর্খ" ও "কৃত্রিম" করিয়া তৈয়ার করিয়া তার পর আবার তাঁহার জন্যই

গালি দেওয়া—কৌতুক মন্দ নয়! মেয়েদের সম্বন্ধে সকল রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, গালাগালির মূলেই এই,—তাঁহারা তাঁহাদেরই যে ব্যবস্থার ফল তাহার জন্যই আবার তাঁহাদের ঐ সকল পুরস্কার অধিকন্তু লাভ হইয়া থাকে। মেয়েদের "উচ্চতর শিক্ষা" ( greater learning for women ) নামে জাপানের একখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ প্রাচীন পুস্তকে মেয়েদের মূঢ়তাই তাহাদের সকল রকম দোষ ও হীনতার কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া স্বামী ও তাঁহার পিতামাতার দাসত্বই তাহার সম্বন্ধে চরম ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহার জন্য ( অর্থাৎ তাহাদের মূর্খতা ) এত শ্রম অবশ্য তাহা যাহাতে দূর না হইতে পারে, সেদিকেও বিশেষ সতর্ক দৃষ্টিই রাখা হইয়াছিল। অতদূরে যাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাদের গাঁথুনি আরও পাকা আরও চাপিয়াও উপর চকচকে করার চেষ্টা আছে। ইহাতে তাঁহাদের বুদ্ধির উপর বাস্তবিকই শ্রদ্ধা হয়। সকল দেশের সাহিত্য এমন কি ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহার পরিচয় মণ-করা হিসাবে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যেখানে ও সকল কথার কোনই প্রয়োজন নাই, সেখানেও এই জাতীয় উদাহরণ ও উপমার সাহায্যে বিষয়গুলিকে সরস করিয়া তোলা হইয়াছে।

মেয়েদের ফ্যাশনের দাসত্ব ও পাগলামির মধ্যেও কাহার হাত কাজ করিতেছে? প্রথমতঃ ইহাও দাসত্ব; সুতরাং ইহার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতা ও মুক্তি নাই। ইহার প্রায় সবই তাঁহাদের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর পাশ্চাত্য দেশে তাঁহাদের চেহারা ও বেশভূষার যে রকম সমালোচনা হয়, তাহাতে কাহারই নিজের ইচ্ছা ও রুচিমত খোলাখুলিভাবে সে বিষয়ে কিছু করা সহজ নয়। সকল বিষয়েই পরের মুখের দিকে চাহিয়া অন্যে কি বলিবে,—কেমন করিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট করা যাইবে, এই সকলের উপরই একান্ত নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। Rousseau ত পরিষ্কারই বলিয়া গিয়াছেন মেয়েদের কাজ সন্তুষ্ট করা। আজকাল ও কথাটী একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া charm করা ইত্যাদি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় মাত্র। তাই নিজের সুবিধা, অসুবিধা, ভালমন্দ কোনদিকে না চাহিয়া তাঁহারা স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া থাকেন। একরূপ নিজের রুচি

বন্ধ করিয়া কিছু করিতে গেলে তাহার মধ্যে পাগলামি ও নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি আসিতে পারে? পরের কথা শুনিয়া ও পরের মুখে ঝাল খাইয়া চলিলে "অতএব লও গাধা মাথায় করিয়া" অবস্থা ত দাঁড়াইবেই!

তার পর মেয়েদের ছেলেবেলা হইতেই যে সরলতা ও স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তে কৃত্রিমতা ও আপনার সম্বন্ধে একরকম আত্মসচেতনত্বের ( self-consciousness ) কথা বলা হয় তাহার মূলেও কি দেখিতে পাওয়া যায়? তাহার প্রত্যেক চলন ধরণ পরণ এত ভয়ানক সমালোচনার সহিত বিশেষ একটী প্রণালী ও ব্যবস্থাপত্রের নিয়মে মিলাইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয় যে স্বাভাবিক ভাব ও মুক্ত গতি এককালে লোপ পাইয়া সে পুতুলই বনিতে থাকে। পোষাক, পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাহাদের এত উপদেশ, সমালোচনা এমন কি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া সর্ব্বদা চলিতে হয় যে তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, আপনার সুবিধা, অসুবিধা এমন কি আপনার রুচি ও উপযোগিতা—কোনো বিষয়েই তাহারা মুক্তদৃষ্টিতে ভাবিতে সাহসও পায় না, তাহার সে শক্তিও থাকে না। তার পর চরম অবস্থা,—যখন ক্রমে উহা ভুলিবারও শক্তি লোপ পায়। মন উহার মধ্যেই পাক খাইতে থাকে। পুরুষরা মেয়েদের পরিচ্ছদে সহজ শোভনতা পছন্দ করেন বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের কোন বিষয়ে "সহজে"র স্থান রাখা হয় কি? সুতরাং ক্রমে যে তাহা অনেক সময়ে শোভনও থাকে না,—সে আর আশ্চর্য্য কি!

"পররুচি পরনা" কথাটীর সত্যতায় সন্দেহ করিবার আছে। তাহাতে অনেক সময়েই আমাদের সং সাজাইয়া তুলিবার বিশেষ আশঙ্কা। সহজ গতিতে চলিতে দিলে ( অবশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা ভিন্ন ) সকল বিষয়ই অবশেষে ঠিক পথই ধরিয়া থাকে। পাশ্চাত্য নারীদের এ বিষয়ে সহস্র প্রকার বন্ধন ও নির্যাতনের মধ্যেও যে তাঁহারা আপনাদের পরিচ্ছদের ক্রমেই উন্নতি করিতেছেন, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহা আমাদের কানে পৌঁছায় না। তাঁহারা কোথায় কে কি পাগলামি করিতেছেন, তাহার বর্ণনা [illegible] কানে [illegible] আসিয়া যায়।

বাস্তবিক Mrs. Grundy (মূর্ত্তিমতী প্রচলিত ব্যবস্থা) নামধেয় অক্ষমাশীল দুর্দ্দান্ত নারীটী সত্যই এরূপ দুরন্ত কি না,—এবং তাঁহার স্বতন্ত্র কোন সত্ত্বা আছে কিনা, বিশেষ সন্দেহের বিষয়। তাঁহার জন্য দুঃখই হয়। তিনি কি সত্যই নারী,—না, অপর পক্ষের প্রতিধ্বনি মাত্র? * আমাদের দেশেও যে এই Mrs. Grundyর অখণ্ড প্রতাপ, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তিনি সব দেশে একই।

অনেকে বলিতে পারেন, কেন, মেয়েদের ফ্যাশন তাঁহারা ত ইচ্ছা করিয়াই করেন! কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ফ্যাশনের ইতিহাসের খবর লইলে সত্য কথা জানা যায়। সেখানকার বস্ত্রব্যবসায়ীরা আপনাদের লাভের জন্য নিত্য নূতন ফ্যাশন প্রবর্ত্তন করিয়া মেয়েদের সম্মুখে উপস্থিত করে। ঐ সকল ব্যবসায়ী, ফ্যাশন-প্রস্তুতকারী, (designer) দর্জ্জি, সমস্তই পুরুষ। নিতান্ত আজকাল ব্যতীত মেয়েরা দুই-চারিজন তাহার মধ্যে ভৃত্যের কাজ মাত্র করিতেন। মেয়েদের জন্য কাগজে যে সকল ফ্যাশনের বিবরণ ও ছবি থাকে, তাহাও এতদিন পুরুষের দ্বারাই চালিত এবং অনেকস্থলে লিখিতও হইত। এদিকে সমাজের রীতি-অনুসারে মেয়েরা ঐ সকল কিনিতে বাধ্য হন; এবং তা ছাড়া অন্যরকম পোষাক তাঁহাদের পাওয়াও সহজ হয় না। আগে তাঁহাদের স্বামীরাও ফ্যাশন-মত পোষাক না পরিলে বিরক্ত হইতেন ও তাহা পরিতে বাধ্যও করিতেন। এমনও শোনা যায় আগে কাগজে কোন নূতন ফ্যাশনের ছবি দেখিলে অনেক মহিলা বিপদ গণিতেন ও ভয় পাইয়া বলিতেন, "এ'ত আমাকে মানাইবে না।"—সম্প্রতিমাত্র তাঁহারা আপনারা ইহাতে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা পাইতেছেন;—এবং আপনাদের ইচ্ছা ও উপযোগিতা বুঝিয়া পোষাকের পরিকল্পনা করিতেছেন। কিন্তু সংখ্যা-হিসাবে তাঁহারা এখনও মুষ্টিমেয়। এই সেদিন শোনা গেল, মেয়েদের ফ্যাশন কিছুদিন হইতে বড়ই সাদাসিধা হইয়া পড়ায় পোষাক সাজাইবার উপকরণ (trimmings) অনেক জমিয়া গিয়াছে। ইহাতে বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের লোকসান হইতে থাকায় আবার সজ্জা-বহুল পোষাকের আমদানী হইবে। অপরদিকে আবার স্ত্রীর প্রাণধারণোপযোগী অন্ন-বস্ত্র ব্যতীত স্বামী আর কিছুই দিতে বাধ্য নহেন জজেরা বিচারে ইহাই সাব্যস্ত করিতেছেন!

তার পর পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের বেশভূষার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগের এত যে সমালোচনা হয়, তাহা সাধারণতঃ কাহাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়?—তাঁহাদের ধনী-সম্প্রদায়ের মধ্যেই কি নয়?—ধনীদের মেয়েদের সময় যথেষ্টই থাকে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত ব্যবহারের মত শিক্ষাও তাঁহারা তেমন পান না, সত্য-কাজ করার ক্ষেত্রও প্রায় বন্ধ। সবেমাত্র ভোটের অধিকার পাইয়া পার্লামেণ্টের সভ্য ইত্যাদি হওয়ার কিছু সুযোগ তাঁহারা পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। নতুবা সামাজিক ভোজ, আমোদ-প্রমোদ পরিচালনই তাঁহাদের একমাত্র কাজ এতদিন পর্য্যন্ত ছিল। এখনও প্রধানতঃ তাহাই রহিয়াছে। ইহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদব-কায়দা বজায় রাখিতে সময় ও শক্তি কম ব্যয় করিতে হয় না। কিন্তু সে সমস্তই প্রায় বাজে খরচ,—আড়ম্বর-প্রিয়তা ভিন্ন অন্য কোন সদ্‌গুণের চর্চ্চার অবসর তাহাতে অল্পই থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তাঁহারা তাঁহাদের অবস্থার ফলমাত্র নন কি? তাঁহাদের প্রতি সমাজের অদ্ভুত খুঁটি-নাটির দাবী গিয়া যদি তাঁহারা রীতিমত শিক্ষা-লাভ করিয়া কাজে তাহা প্রয়োগ করিবার সুবিধা পান, তাহা হইলে এ সকলই পরিবর্ত্তিত হয় না কি? নহিলে ভাল পথে শক্তি-চালনার ক্ষেত্র বন্ধ করিয়া মানুষের কোন একটী দুর্ব্বলতার দিকে মাত্র তাহা খোলা রাখিলে ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?—মানুষ একেবারে কিছু না করিয়া,—কিছুতে মন না দিয়া থাকিতে পারে না,—তার পর আবার যদি কোন একটী দুর্ব্বলতার দিকেই সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা তাহাকে চালাইতে থাকে তাহা হইলে আর কি হইবে! আমাদের দেশের ধনীদের মধ্যেও ইহা প্রবেশ লাভ করিতেছে। সময় ও অর্থের সুবিধা থাকিলেও যদি জ্ঞান ও কর্ম্মের জগৎ

* সম্প্রতি কাগজে দেখা গেল, Mrs. Grundy আমেরিকার কোন প্রেসিডেণ্টের পত্নী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। কিন্তু তিনি যিনিই হোন, তাঁহার বিশেষণ বদলাইবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

হইতে মানুষকে বঞ্চিত রাখা যায়—তাহা হইলে ইহা তো হইবেই। এই শ্রেণীর পুরুষেরা শিক্ষা ও কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র, সমাজের প্রশ্রয় পাইয়া সকল রকমে পাপস্রোত বৃদ্ধি করিয়া চলিতেছেন। মেয়েরা সেজন্য ভালবাসার ক্ষেত্রেও বঞ্চিত হইয়া—অর্থ তাঁহাদের যেটুকু সুবিধা দিয়াছে, অর্থাৎ বেশভূষার বাহুল্য,—তাহাতেই প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছেন। এই সকল পুরুষদের মধ্যেও অবশ্য বস্ত্র-প্রিয়তা বা তাহার আড়ম্বরও কম নয়।

আর মেয়েদের এত সাজের ঘটা কিসের জন্য? অপরপক্ষের সু-নজরে পড়া ও সেই সু-নজরটী বজায় রাখিবার চেষ্টাই কি সকলের মূলে নয়? নর-নারী উভয়েরই পরস্পরের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা ও তাহার জন্য আপনাদের বেশভূষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি কতকদূর পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত। পুরুষেরাও যখন ভালবাসায় পড়িয়া থাকেন, তখন তাঁহাদেরও এদিকে বেশ দৃষ্টি দিতে দেখা যায়। তার পর অধিকৃত বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া তাঁহাদের আর ততটা প্রয়োজন বোধ হয় না বলিয়া তাহা শিথিল হইয়া পড়ে। ইহার সবটুকুই যে দোষের, তাহাও নয়। প্রথমে যে বাহিরের পদার্থের দ্বারা মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা হয়, পরে আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়তা ও আপনার ভাব আসিয়া পড়িলে সেগুলি অসার বলিয়াই বোধ হয়। তেমনি চিরদিনই উহার মধ্যে পরস্পরকে একটু সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টাও অপরাধ নয়। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ইহাকে যেরকম বিরাট ও অস্বাভাবিক ব্যাপার করিয়া তোলা হইয়াছে, সেইটাই অন্যায়। পুরুষের ভালবাসায় শরীরই প্রধান হওয়া এবং নারীর উহা আকর্ষণ করা ও ধরিয়া রাখাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া ওঠা ইহার কারণ। ইহাতে তাহার রোগ, শোক, আকস্মিক বিপদ, বা বয়সের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন কিছুরই স্থান নাই। মাংসপিণ্ডের রক্তীনত্বের উপরই তাহার জীবনের মূল্য নির্ভর করে। নামজাদা সাহিত্যিকেরা পর্য্যন্ত ইহা প্রকাশ্যভাবে লিখিতেও সঙ্কুচিত হন্ না! ইহা অবশ্য প্রধানতঃ পাশ্চাত্য সমাজের সম্বন্ধেই খাটে, এবং এইজন্যই কতকগুলি বিষয়ে কতক পরিমাণে সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেখানকার মেয়েদের অবস্থা শোচনীয়ই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে ইহা এতটা নির্লজ্জ নয়,—তবু অন্তমূর্ত্তিতে যে দেখা যায় না এমনও নয়; এবং সেগুলিতেও গৌরব করিবার কিছু নাই।

এ বিষয়ে আমাদেরও পাশ্চাত্য সমাজের তুলনা করিলে দেখা যায়, নারী সেখানে সামাজিক জীব, সমাজের মন যোগানো সমাজকে সন্তুষ্ট করা ও আমোদ দেওয়াই তাঁহার কাজ। তাই তাঁহার সাজ-সজ্জা প্রধানতঃ সমাজের জন্যই। কিন্তু আমাদের দেশে তাঁহার সমস্ত জীবন কেবল একজনের জন্য,—তিনি স্বামী। শৈশব হইতে তাহার আয়োজন চলিতে থাকে। "স্বামীর কোলে, পুত্র দোলে"—ভাল করিয়া কথা ফুটিবার আগেই শিক্ষা হইয়া যায়। বিবাহের সময় চুল আবশ্যক, তাই তাহার আগে নেড়া-বোঁচা করিয়া তাহার জন্য তৈরী করা হয়। বিবাহের আগেই কয়েকটা বৎসর সকল বিষয়েই শিক্ষানবিশী (preparatory stage) মাত্র। তাহা যত সংক্ষেপে সারা যায়, শেষ করিয়া তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া, তার পর অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দিতে পারিলেই সকলে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। তার পর স্বামীর জন্য যত দিন আবশ্যক, তাঁহার খাওয়া-পরা ও সজ্জা,—সিঁদুর, শাঁখা, সাড়ী, আল্‌তা ইত্যাদির প্রয়োজন। তাঁহার অভাবে তাঁর কিছুতেই আর অধিকার ও আবশ্যক নাই। প্রাণ-ধারণেরই প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন নাই। সতীদাহে তাহার পুরাপুরি ব্যবস্থা ছিল,—এখন তাহা দয়ার দান হিসাবে দেওয়া হয় মাত্র।

বাস্তবিক নারীর ক্ষেত্রে তাঁহার অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য প্রত্যেক স্বাভাবিক জিনিষই কৃত্রিমতা ও অস্বাভিকতায় পরিণত হইয়া বন্ধনের কারণ হইয়াছে। তাঁহার দুর্ব্বলতর শরীরের উপর আবার পরিচ্ছদের অত্যাচার যুক্ত হইয়া তাহা সহজ গতি হারাইয়াছে। ইহাতে যদি কেহ শালীনতার উল্লেখ করেন, তাহা হইলেও পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে শালীনতা সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে (যথা সান্ধ্য, নাচ ও থিয়েটারের পোষাক) রক্ষিত হয় না,—কিন্তু সহজ গতির দিকে গেলেই (যথা shorter skirts ইত্যাদি) নিন্দার কারণ হইয়া পড়ে। নাচ

ইত্যাদির সময় একেবারে বস্ত্র সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেও দোষ হয় না, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িতে breeches ব্যবহার করিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়! কারণ ইহাতে "পুরুষ হওয়া" হইল! সকল বিষয়েই এই কথা ওঠে,—ইহাতে ত কথাই নাই। কিন্তু ইহা কেন হয় তাহা কি কেহ দেখিবার চেষ্টা করেন? কেবল "ঘরের কাজ" ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষেত্রই অপর পক্ষ অধিকার করায় মেয়েরা যাহাই করিতে যান, তাহাই "পুরুষের কাজ" বলিয়া গণ্য হয়। তাঁহাদের পোষাক, পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত এমন করা হইয়াছে, যাহাতে তাহা কাজ ও গতির ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। কাজেই তাঁহাদের ঐ সকল করিতে গেলে যাহাতে তাহার সুবিধা হয় প্রথমতঃ তাহাই করিতে বাধ্য হইতে হয়। তার পর অভ্যস্ত হইলে ক্রমে আপনাদের সুবিধা বুঝিয়া সব ঠিক করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং আগে হইতে তাহার জন্য অত চীৎকার করার কোন অর্থ নাই। আগেকার বিদুষীদের যে-রকম পুরুষালী হইতে হইত, এখনকার মেয়েরা কাজে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী "পুরুষালী" করিয়াও "মেয়েলি" থাকিয়া যান। পৃথিবীর জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষেত্র যতই তাঁহাদের হাতে আসিবে, ততই তাহাতে তাঁহাদের বিশেষত্ব রাখিবার ও প্রকাশ করিবার সুবিধা আপনিই হইবে।

নারীর মুক্তি-প্রচেষ্টার এই পরিচ্ছদের দাসত্ব-ত্যাগও একটী অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদের প্রতি যেটুকু দৃষ্টি স্বাভাবিক ও সঙ্গত, তাহার প্রতি অবশ্য তাঁহার মনোযোগ থাকিবে; কিন্তু গতি ও কর্ম্মচেষ্টার তাহা অন্তরায় হইতে পাইবে না। সকল কাজে বা সকল সময়েই এক রকম পরিচ্ছদও চলিতে পারে না। আপনার ভগবদ্দত্ত শরীরের অভাব ও পরিবর্ত্তন তিনি গোপন করিবেন না। ইহাতে অনেকে বলিবেন, কেন, পুরুষেরাই ত তাঁহাদের ঐরূপ চেষ্টায় বিরক্ত হন ও উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁহার মাংস-খণ্ডের মাত্র মূল্য স্বীকার করিয়া ওরূপ করা কেবল নিষ্ঠুরতা ও বেয়াদপির চূড়ান্ত মাত্র। আর বয়স্কাদের নবীনা হওয়ার চেষ্টায় এত যে হাস্য-পরিহাস,—গরজের সময় অপর পক্ষেও ইহা কিছু কম হইতে দেখা যায় না! আমাদের দেশের দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি বিচিত্র পক্ষধারীদের রগড়টা এইখানে সকলে একবার মনে করিবার চেষ্টা করুন! মেয়েদের যতই হউক, গরজ এত নয়, সুতরাং তাঁহাদের সাধারণতঃ ততদূর গড়ায় না। আর মেয়েদের বেলা তাহা তাঁহাদের উপর মানুষের অন্যায়ের ফল। কিন্তু তাঁহাদের তাহা স্বকৃত পাপ ও ব্যাধিমাত্র। বয়স হইলেই তাহার মধ্যে যেটুকু ভাল দেখানো সম্ভব, তাহা করা অবশ্য কাহারও পক্ষেই অন্যায় হইতে পারে না।

এখন তাঁহারা আপনাদের স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা চান। তাঁহাদের যাহার যেরূপ শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা আছে, তাহার সব দিয়াই তাঁহাদের বিচার হইবে। শরীর তাহার একটী অংশ মাত্র;—তাহা প্রধানও নয়। সুতরাং তাহাকেই তাঁহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বস্ব করিয়া তোলার ভাবটী একেবারেই দূর করিতে হইবে। তাহা হইলে শারীরিক সৌন্দর্য্যও যথাস্থান অধিকার করিতে পারিবে। আর ভালবাসা মানুষের একটী সর্ব্বাপেক্ষা কাম্যবস্তু হইলেও পুরুষের সু-নজর ভিক্ষামাত্র তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য থাকিবে না। নারীকে আজন্ম, আমরণ কলের চাপে রাখিয়া তার পর কৃত্রিমতার জন্য গালি না দিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরের সৃষ্টিরূপেই দেখিতে ও পাইতে হইবে। রূপের হীন, বর্ব্বরোচিত সংস্কারের দাবী হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে যেমন পরিচ্ছদের দাসত্ব দূর করিতে হইবে, অন্য দিকে অপর পক্ষের ইহাতে যে অসঙ্গত প্রশ্রয় চলিয়া আসিতেছে, তাহার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি দেওয়া তেমনি আবশ্যক হইয়াছে। কৌপীন ও shorts তিনি মানিবেন না। কৌপীনকে তো একেবারেই অদৃশ্য হইতে হইবে, অপরটীও স্থানে অস্থানে একচ্ছত্র রাজত্ব করিতে পাইবে না। আমাদের দেশেও এটী কেমন দেখিতে দেখিতে ছাইয়া যাইতেছে! যাহার জয়পতাকা লইয়া ইহার আস্ফালন,—সেই রক্তের নেশার বিষ-দাঁতও তাঁহাকেই ভাঙ্গিতে হইবে। পুরুষকে সভ্য করা তাঁহারই কাজ, এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা করিয়াও আসিতেছেন, সন্দেহ নাই; তবে আপনারাই অধিকৃত বস্তুমাত্র হইয়া থাকায় বর্ব্বরতার মূলে হাত পড়িতে পারে নাই।

বঙ্গনারী।

# উপেক্ষিত

জানি যে সে একা নাই
সে যাদের যাচে
নিশিদিন তার তারা রহে কাছে কাছে
সে যাদের দরশ-পিয়াসী ;
দুটিদিন দেখা নাই
তবু মনে হয়
দুই যুগ যাতনায় ছিঁড়িচে হৃদয়
কল্পকাল আঁখি উপবাসী !

দিয়েছিলে খুব প্রাণ
হায় ভগবান !
এ আঘাতে টুটে নাই আজো সে পাষাণ,—
বার বার আজো করে আশা
সরবস্ব করি দান
যাবে না বিফলে
দিন তার, ঠাঁই পাবে চরণের তলে
ভালোবেসে পাবে ভালোবাসা ।

কোনমতে নাহি মানে
এই আঁখিজল
স্থজি সিন্ধু করে যদি বসুধা সজল
তার হিয়া ভিজিবেনা তায়,
একেবারে নাহি জানে
এই ভাঙা বুক
করিবে না ক্ষয় তার নিমেষের সুখ
তিল ব্যথা দিবেনা তাহায় !

বন্ধু মোর নিত্য আসি
কহে রূপকথা
আমার অভাবে তার কত ব্যাকুলতা
কি বেদনা দলে হিয়া তার—
শুনে মন ভাবে হাসি,
আমি কি উন্মাদ ?
প্রাণ যারে প্রেমে করে দেখিবার সাধ
বসি শুধু গৃহের মাঝার

সে করে না হায় হায় ;
আমি কি না জানি ?
পাঠাইয়া দূতমুখে মন-রাখা বাণী
রহে না সে বসি প্রতীক্ষায় ;
রসোল্লাসে কক্ষছায়
"নিজে যাবো" —বলি
রহে না সে তিন দিন মানসেরে ছলি
মিলনের সে জানে উপায় ।

তুমি যাহে ভালোবাসো
ভুলে ভেবেচ কি
হেন কিছু নেই মোর জানিনা তা, সখি ?
পলে পলে বুঝি না লাঞ্ছিত
তুমি যাহে কাছে আসো
পরাণ আমার
কোথা পাবে হেন মধু, বঁধু ! অনিবার
তোমার যা স্বপেয়, বাঞ্ছিত ;

তবু তুমি হৃদি মম
পলকে পলকে
ভরিবে অমর প্রেমে, অতুল পুলকে
মধুময়ী স্মৃতির সৌরভে
ওগো তুমি নিধি মম
তোমার আঘাত
জড়াইয়া থাক্ মোর জীবনের সাথ
প্রেম মোর, সবে তা' গৌরবে ।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু ।

# ব্যায়াম-চর্চ্চার ফল

শ্রীমান দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বয়স মাত্র তেইশ বৎসর। নিজস্ব প্রণালীতে ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া তিনি দেহের অসাধারণ উন্নতি বিধান করিয়াছেন।

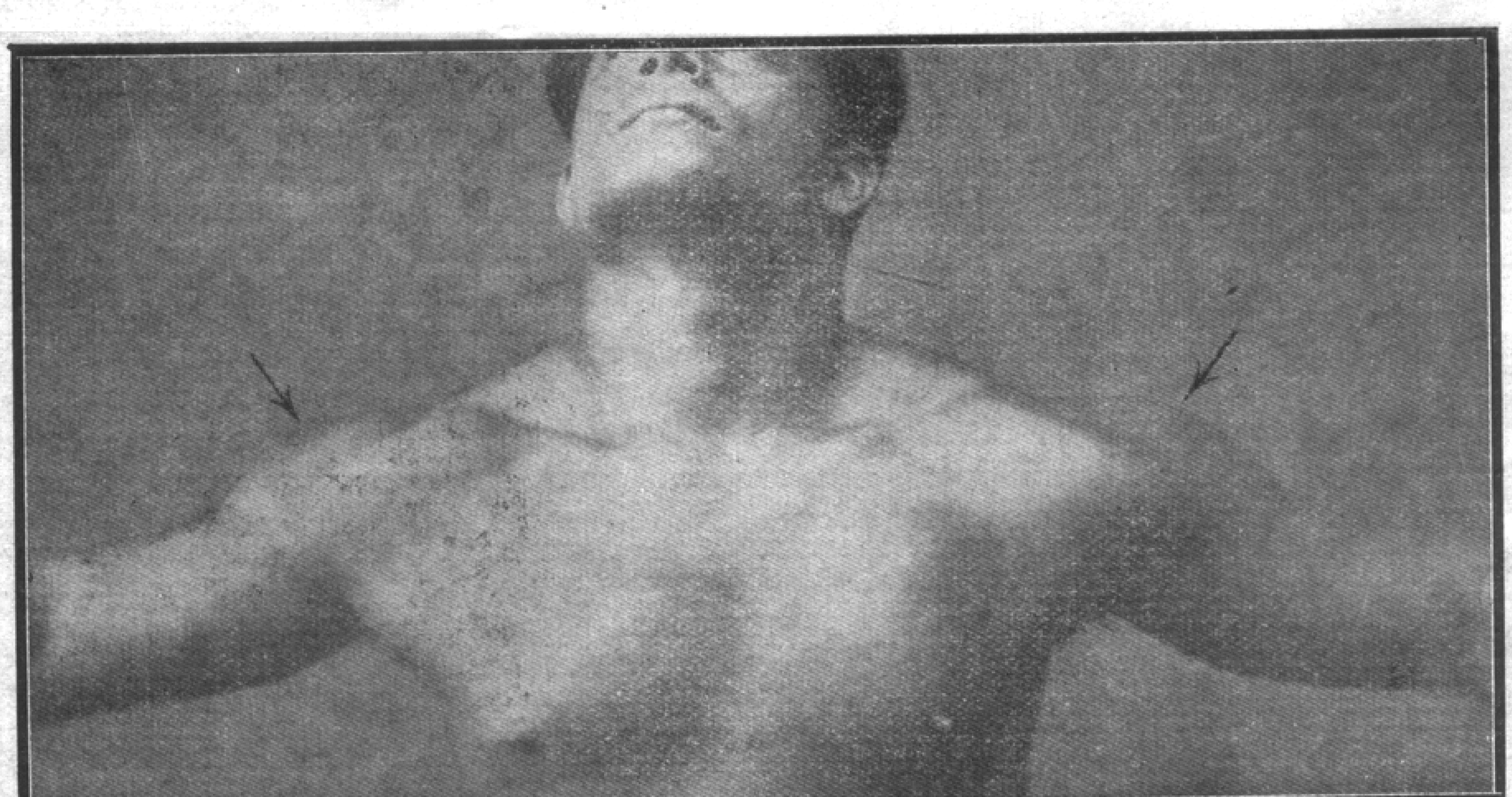


শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী



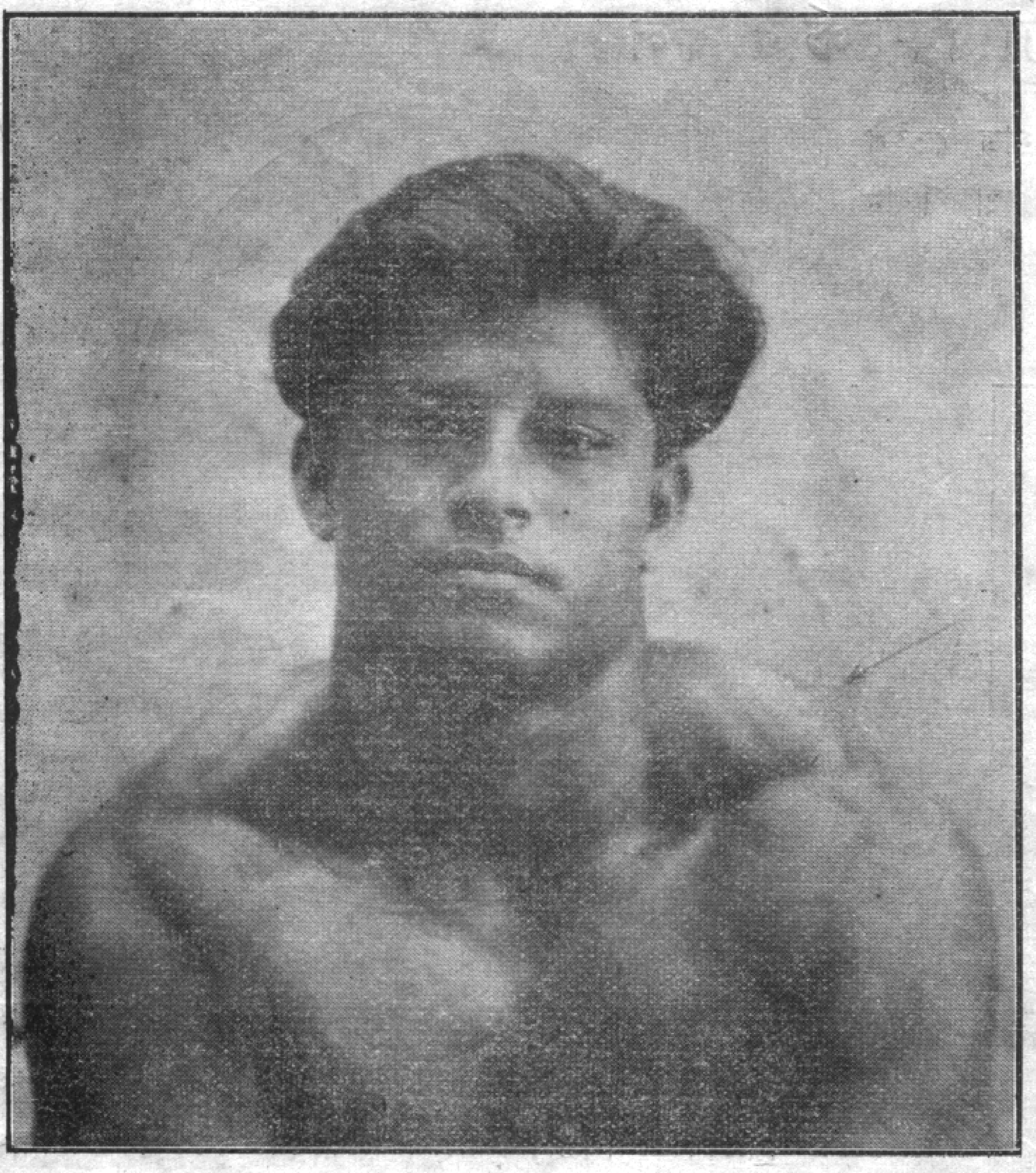
পেটের পেশী পুষ্ট করিবার ব্যায়াম

আমাদের দেশে যুবকদের মধ্যে সুদৃঢ় সুগঠিত সুন্দর দেহ সাধারণত চোখে পড়ে না। তার কারণ প্রধানত আমাদের আলস্য; শরীরের উন্নতির জন্য যে পরিমাণ সাধনা আবশ্যক আমরা তা করি না। দেবীপ্রসাদ এই সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁর পেশীপুষ্ট বীরমূর্ত্তি তার নিদর্শন।



বুক প্রশস্ত ও দৃঢ় করিবার ব্যায়াম

দেবীপ্রসাদের কেবল দেহের সৌষ্ঠব নয়, মনের সৌষ্ঠবও অসামান্য। তিনি এইঅল্প বয়সেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় প্রচুর দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। 'ভারতী' 'মডার্ণ রিভিউ', 'প্রবাসী','মৌচাক' প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাঁর অঙ্কিত অনেক ছবি ও তাঁর তৈরি মূর্ত্তির প্রতিলিপি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আলেখ্য রচনাতেও তাঁর হাত খুব পাকা। গতবারের কলিকাতার ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে



কাঁধ ও গলা পুষ্ট করিবার ব্যায়াম

তাঁর অঙ্কিত কয়েকখানি আলেখ্য (portrait) রসিক-সমাজে প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

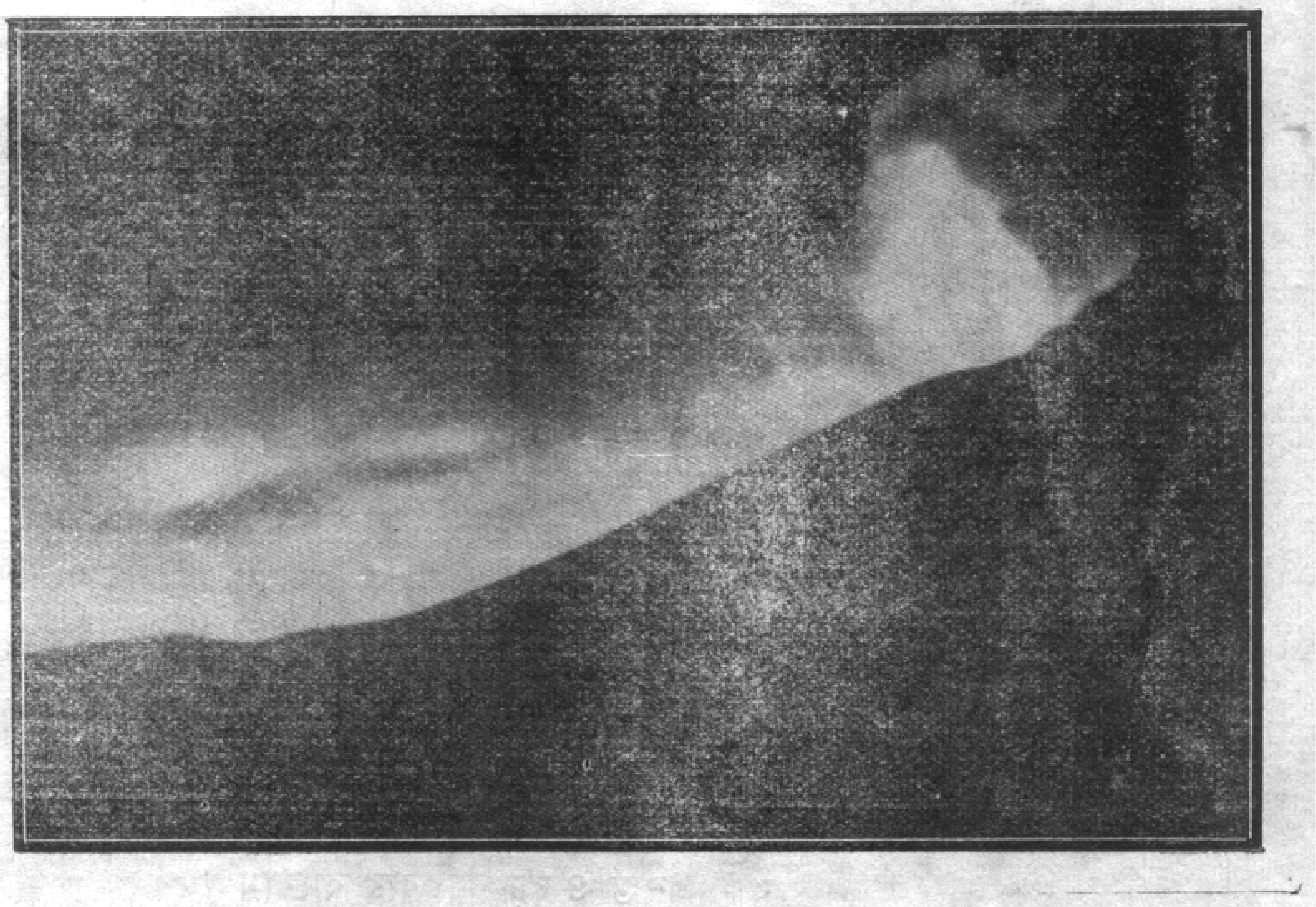
দেবীপ্রসাদ সুকণ্ঠ। বেণুবাদনে তিনি দক্ষ। অধুনা তিনি লেখনী চালনাও সুরু করিয়াছেন। 'ভারতী' ও 'মৌচাকে' প্রকাশিত তাঁর রচনা হইতে বুঝা যায়, অদূর ভবিষ্যতে তিনি সাহিত্য-সাধনাতেও যশস্বী হইবেন। এত অল্প বয়সে শরীর ও মনের এমন উৎকর্ষ প্রায়ই দেখা যায় না।

পরিশেষে বক্তব্য, স্বপ্নবিলাসীর দেহ স্বপ্নেরই মত অপদার্থ হয়, এই প্রচলিত ধারণা দেবীপ্রসাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তাঁর দৃষ্টান্তে বঙ্গীয় যুবক-সমাজ উদ্বুদ্ধ হইবে, আশা করি।



কাঁধ ও গলা পুষ্ট করিবার ব্যায়াম



হাতের পেশী

# রিক্তা

১

বৈকাল বেলা। অপরাহ্নের রাঙা আলো দিগন্তের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত গাছপালার শ্যামল চূড়ায় সোনার কিরীট পরাইয়া খেলা করিতেছিল। সবিতা গা ধুইয়া আসিয়া খোকা পুলককে কাপড়-জামা পরাইয়া দিতেছিল। রুক্ষ চুলের হাতে জড়ানো খোঁপায় ও একখানি আধ-ময়লা কাপড়েও তার যৌবনপুষ্ট লাবণ্য যেন পাতায় ঢাকা ফুলের মত দেখাইতেছিল।

শিশু পুলক এখন হাঁটিতে শিখিয়াছে। সে দুধ খাইতে জামা পরিতে গোলমাল বাধাইয়া সবিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

একটা টুলের উপর বসাইয়া সবিতা তাকে জুতা মোজা পরাইয়া দিতেছিল, সহসা শুভেন্দু আসিয়া পুলককে কোলে তুলিয়া লইল। শুভেন্দুর কোলে গিয়া পুলক অবাক হইয়া তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সবিতাকে প্রণাম করিয়া, পুলককে কোলে লইয়াই শুভেন্দু মায়ের ঘরে চলিয়া গেল।

মাথার কাপড় টানিয়া সবিতা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল; এবারে সেও বারান্দা হইতে উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিল।

শুভেন্দু এইমাত্র কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। সবিতার বুকের রক্তে কি একটা তুফান ফেনাইয়া উঠিল। কোন্ এক মূঢ় আশায় সে বাহিরের দিক্‌কার জানালা দিয়া অকারণ ব্যগ্র চক্ষে শুধু বাগানটাই একবার দেখিল,—শুভেন্দু কি একাই আসিয়াছে?

শুভেন্দুকে দেখিয়াই মেনকা বলিলেন,—হ্যাঁ রে তুই একা এলি যে! সে আবার কোথায় রইল?

শুভেন্দু বলিল,—দাদা একেবারে দারজিলিং চলে গেল, বল্‌লে পরে বাড়ী আসবে।

মেনকা ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন,—কেন, একবার বাড়ী এসে তারপরও তো দারজিলিং যেতে পারতো! দারজিলিং তো পালিয়ে যাচ্ছিল না! কতদিন বাড়ী আসেনি, আমি যে তার পথ চেয়ে রয়েছি।

শুভেন্দু বলিল,—তা আমি কি করবো! আমি তো বলেছিলাম, তা সে কথা সে শুনলে না! তার দু-জন বন্ধু গেল দারজিলিং, সেও তাদের সঙ্গে গেল। আমি যেতে চাইলাম, তা আমায় বল্‌লে, না, তুই বাড়ী যা, নইলে মা যে রাগ কর্‌বেন!

—হুঁঃ, মা রাগ করবেন, এ ভাবনা তো তার কত! সে ভাবনা থাকলে সে নিজেই আসতো। এখন বড় হয়ে সে বদ্‌লে গেছে—এখন বাইরে বাইরে বেড়াতেই ভালবাসে, মায়ের ওপর আর টান নেই!

শুভেন্দু হাসিয়া বলিল,—আমিও বেড়াতে ভালবাসি মা, কেবল বাবার ভয়ে কোথাও যেতে পারিনে, পাছে রাগ-টাগ করেন!

—কৈ উনি রাগ করেন? তা করলেও তো বাঁচতাম। এই যে অরুণ এমন ক'রে বেড়ায়, কই কিছুই ত বলেন না তাকে।

—কেন, আমরা বকুনি খেলেই বুঝি তুমি খুব খুসি হও মা?—বেশ কথা তো!

মেনকাও একটু হাসিলেন হাসিয়া বলিলেন,—বকুনি খাওয়ার কাজ করলে বকুনি খাওয়াই তো ঠিক—নইলে তোমাদের যে সব ডানা উঠছে!

—সে তো আমার নয় মা, সে দাদার,—তাকে যত পারো বলো।

সবিতা শুভেন্দুর জলখাবার আনিয়া মেনকার কাছে রাখিয়া গেল। খাবারের লোভে ও মেনকার ডাকে পুলক খুসি হইয়া শুভেন্দুর সঙ্গে খাইতে বসিল। খাবার খাইয়া শুভেন্দুই সেদিন পুলককে কোলে করিয়া বেড়াইতে লইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর প্রতিদিনকার মত সবিতা বসিয়া মেনকার পায়ে তেল দিয়া দিতেছিল। সবিতা এ বাড়ীতে আসিবার আগে এ কাজটি দাসীরাই করিত, এখন সবিতা করে। অদৃষ্টের দোষে সে শাশুড়ীকে কিছুতেই প্রসন্ন করিতে পারে নাই। এখনো তিনি দিন দিন তার উপর বেশী রকম নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছেন।

অরুণ না আসায় মেনকার মন সেদিন ভাল ছিলনা। যে অরুণ তাঁর অনুমতি না লইয়া কখনো কোনোখানে যায় নাই, সেই অরুণ যে আজ ছুটী পাইয়াও বাড়ী আসিল না, এর কারণ ওই সবিতা ছাড়া আর তো কিছুই নয়! মুখে কিছু না বলিয়া মেনকা গুম্ হইয়া ছিলেন। সবিতাও মাথা হেঁট করিয়া তাঁর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মেনকা বলিলেন,—থাক, আজ আর দিতে হবেনা,—হয়েছে।

সবিতা হাত উঠাইয়া লইল। মেনকা বলিলেন,—আঃ, তোমার হাতে এত কাঁটা কিসের গা? ঝাঁটার বুঝি? আঃ কপাল!

সবিতা একবার আড়ভাবে নিজের হাতখানার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। মেনকা বলিলেন,—আইবড় মেয়েকে দিয়ে কি লোকে ঘুঁটে-কুড়ুনির কাজও করায় নাকি? এমন কথাও তো কোথাও শুনিনি!

সবিতা চুপ করিয়াই রহিল; বলিল না যে এ অভিযোগ মিথ্যা! মা, বাপ বা দাদামহাশয়ের ঘরে সে আদরিণী কন্যাই ছিল, দাসী ছিল না। সেখানে বেশী ঝাঁটা ধরিবার দরকার তার কোনোদিন হয় নাই, যার জন্য তার হাতে কাঁটা পড়িতে পারে।

শাশুড়ীর পা মুছাইয়া দিয়া আসিয়া সে স্পিরিট ল্যাম্পে পুলকের জন্য দুধ গরম করিতে বসিল। তার বিক্ষুব্ধ মনটাকে এতটুকুও বিরাম দিবার সময় এখন নাই। অনেক কাজ পড়িয়া আছে। দুধ গরম করিয়া সে পুলককে খুঁজিল, শুনিল, তখনো সে শুভেন্দুর কাছে আছে। তাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিয়া সবিতা দুধটুকু ফিডিং বোতলে ভরিয়া লইল।

ঘুমন্ত পুলককে বুকে করিয়া ও একটা বৃহৎ ফুলের তোড়া হাতে করিয়া শুভেন্দু আসিয়া ডাকিল,—বৌদি

সবিতা চট্ করিয়া উঠিয়া পুলকের বিছানাটা ঠিক করিয়া দিল। শুভেন্দু পুলককে শোয়াইয়া দিয়া বলিল,···ঘরে কিছু নেই বৌদি? এটা রাখবো কিসে? দাদার তো ঢের ফুলদানী ছিল, কি হল সেগুলো?

সবিতার ইচ্ছা হইল বলে, ও ফুলের তোড়ায় তার কোনো দরকারই নাই, কিন্তু পাছে কথা বলিলে শাশুড়ী রাগ করেন, তাই ভয়ে সে কোনো কথা বলিল না। একটা ফুলদানী বাহির করিয়া দেরাজের উপর রাখিয়া দিল।

তোড়াটা ফুলদানীতে রাখিতে রাখিতে একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া শুভেন্দু বলিল,—আমার সঙ্গেও কথা বলবেন না বৌদি? আমার সঙ্গে কথা বলতে তো দোষ নেই!

তবু সবিতা কথা বলিল না, পাছে শাশুড়ী আরো বেশী অপ্রসন্ন হন।

সবিতার ঘরে শুভেন্দুর সাড়া পাইয়া মেনকা বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন—কে, পট্‌লা নাকি? বলিয়া তিনি ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। শুভেন্দু রাগ দেখাইয়া বলিল—দেখ মা, আমার ঐ চমৎকার নামটী আর তুমি সবাইকে জানিয়ে দিও না তো!

সবিতা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ভাবিল, না জানি, সে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে! সবিতার ঘরে শাশুড়ীর পদার্পণ কখনো হইত না।

সেই যে এক অশুভ মুহূর্ত্তে ঘর সাজাইবার জন্য তিনি এ-ঘরে আসিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই এ ঘরে আসা তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এতদিন পরে সবিতার সেই শাশুড়ী সে ঘরে ঢুকিয়া একখানি চৌকি টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। শুভেন্দু বলিল,—তুমি বৌদিকে বল মা, আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে,—তাহলেই বলবেন।

মেনকা বলিলেন,—বল গো বৌমা, এঁদের সঙ্গে কথা-টথা বললেও একটু সভ্যতা শিখ্‌তে পারবে।

সবিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তপ্ত রক্তের ঝাঁজে তার কাণ অবধি আগুন হইয়া উঠিল। ইহাকেই বলে, সভ্যতা ও ভদ্রতা? সে হেঁট হইয়া দুধের বোতলটার দিকে চাহিয়া রহিল।

মেনকা ফুলের তোড়াটার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—এটা কে আন্‌লে! পটলা বুঝি?

—হ্যাঁ। কিন্তু বৌদির উচিত আমাকে এ জন্যে একটা ধন্যবাদ দেওয়া।

মেনকা বলিলেন,—তা এ ঘরে এ ফুল কেন? তোর ঘরে রাখ্‌গে যা, এ ঘরে পড়ে পড়ে শুকিয়ে যাবে বই ত নয়!

—আর আমার ঘর হলেই বুঝি চিরকাল অম্‌নি টাটকা থাকবে ?

সবিতা কোনো কথাই বলিল না। এই কিশোর ছেলেটীর ব্যবহারে উদারতায় তার মনেও একটু আনন্দভাব জাগিতেছিল ; অর্দ্ধ পথে সেটাকে সে তাড়া দিয়া থামাইল। আপনা-আপনি ভাবিল, মিথ্যা ! মিথ্যা ! এদের সবই বুঝি মিথ্যা ! এরা নির্ম্মম, এরা পাষাণ! তা নহিলে তার স্বামীর মুখের অমন যে প্রভাতের আলোর মত সহাস সুন্দর হাসি, সে হাসিই বা তার ভাগ্যে এমন করিয়া শুকাইয়া গেল কেন ? তার আত্মগত জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারে সে অদৃষ্টেরই দোষ দিল। আর কাহাকেই বা দোষ দিবে ?

ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া সবিতা দক্ষিণ দিকের সরু ফালির মত বারান্দাটীতে মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। অদূরে চণ্ডীমণ্ডপের সদ্য চুণকাম করা সাদা রং অন্ধকারের গায়েও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পূজা আসন্ন।

সবিতা গত বছরকার এই দিনের কথা ভাবিতেছিল। তখন তার বিবাহ হয় নাই—হাজার রকম ফরমাস করিয়া দাদামশায়কে ব্যস্ত বিব্রত করিত—ইদানীং সে একটু সঙ্কুচিত হইত বলিয়া তিনি কত আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—বল্‌ দিদি, তোর কি চাই ?

একটা ঝী আসিয়া বলিল,—বৌদি, খোকার দুধের কি হবে ?

সবিতা আশ্চর্য্যভাবে বলিল,—কেন, কি হল ? দুধ ছিল তা !

—ছিল, কিন্তু বেরালে খেয়ে গেল যে ! ও দুধ তো আর খোকাকে খাওয়ানো চল্‌বে না !

ঝীয়ের কথা সবিতা বিশ্বাস করিল না। বলিল—দুধ তো ঢাকা ছিল, বেরালে কি করে খেলে ?

ঝী থমকিয়া গেল, ঢোক গিলিয়া বলিল,—ঢাক্‌তে ভুলে গিয়েছিনু বৌদি।

সবিতা বিরক্ত হইল ; বলিল,—তবে যাও, মাকে বলো গে !

—মাকে ! মা যে ভয়ানক রাগ করবেন !

—তা বলে আর কি হবে ! খোকা খাবে কি ? যাও, বল গে, রাগ করেন, করবেন !

ঝী চলিয়া গেল।

কর্ত্তা তখন খাইতে বসিয়াছেন। তিনি তাঁর বাড়ীর ভিতরকার খবর খুব কমই রাখিতেন। যখন যেটুকু তাঁর চক্ষে পড়িত, তখন সেইটুকু সংশোধন করিয়া দিতেন মাত্র।

এই উৎপীড়িতা লাঞ্ছিতা গরীবের মেয়েটীকে তিনি উদারতা দেখাইয়া ঘরে আনিয়াছিলেন, ইহাকে স্নেহও করিতেন, কিন্তু এর আদর-যত্নের যে-ভার গিন্নির উপর ছিল, তার যে কতখানি কি হইতেছে, তার তিনি কিছুই জানিতে পারিতেন না।

দুধ নষ্ট হওয়ার খবর মেনকার কানে যাইবামাত্র তিনি রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। কর্ত্তা শান্তভাবে বলিলেন,—তা নষ্ট হয়ে গেছেই যখন, তখন আর বকাবকি করে কি হবে ?

মেনকা তীব্রস্বরে বলিলেন,—হ্যাঁ নষ্ট হয়ে গেছে বই কি ! দুধের বাটী চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলেও তো বলা যায় যে, নষ্ট হয়ে গেছে !—কি বিয়েই দিয়েছ ছেলের !

কর্ত্তা উগ্র-কঠোর চোখের চাহনির ধমকে মেনকাকে থামাইয়া দিয়া নিজের দুধের বাটিটা সরাইয়া দিলেন, বলিলেন,—নিয়ে যাও এ দুধ। আমার দুধের দরকার নেই !

রাঁধুনী দাঁড়াইয়াছিল। মনিবের পাতের কাছ হইতে দুধের বাটী লইতে তার হাত সরিতেছিল না। সে বেচারা বিপন্নভাবে মেনকার মুখের পানে চাহিল। তিনি বলিলেন,—না থাক, ও দুধ দিতে হবে না, ঘরে আরও দুধ আছে।

উগ্র হুকুমের স্বরে কর্ত্তা বলিলেন,—না, এই দুধই নিয়ে যাও, আমি দুধ খেতে চাইনে।

অতঃপর গিন্নির মিনতিতে, কর্ত্তার গর্জ্জনে সন্ত্রস্ত চাকর-দাসীদের দলেও একটা স্তম্ভিত ভাব আসিল। এই ধরণের অশান্তির ঝড় এ বাড়ীতে সবিতা আসিবার পূর্ব্বে বড়

একটা উঠিত না। সকলেই সবিতাকে অশান্তির মূল ধরিয়া লইল।

ঘরের ভিতরে থাকিয়া সবিতার চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। দিন দিন তুচ্ছ এক একটা ঘটনার সংঘাতে বাড়ীর দাস দাসীদের অবধি সে আপদ হইয়া উঠিতেছে—এ কি তার গ্রহের ফের!

হায়, কেমন করিয়া কি উপায়ে সে এই বিমুখ ভাগ্য-দেবতাকে প্রসন্ন করিয়া জীবন-যাত্রার এ দুর্গম পথকে সুগম করিয়া লইবে? কোন্‌ পূজা তাঁর প্রিয়?

ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টায় সে একটু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দূর হউক এই দুর্ভাবনা! কপালে যখন যা আসে, অনর্থক দুঃখ করার চেয়ে হাসি-মুখে তা সওয়াই ভালো!

৮

ভোরের আলোর অস্পষ্ট রেখা জানালার সরু ফাঁক দিয়া আসিয়া সবিতার চোখে পড়ায় তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া সে আপন মনে বলিল, যাঃ, এত বেলা হয়ে গেছে! পরক্ষণেই চাহিয়া দেখিল, হাত পা ছড়াইয়া পুলক শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তারা ঝীয়ের বিপুল দেহখানি ঘর জুড়িয়া এলানো।

বাহিরে পাখীর দলের প্রভাতী ঝঙ্কারে তার দীর্ঘ নিশ্বাসের একটুও ব্যাঘাত হইতেছে না। অন্য দিন পুলকই সকলের আগে জাগে।

সবিতা বুঝিল, যত বেশী বেলা সে ভাবিয়াছিল, তত বেশী বেলা হয় নাই।

প্রথমেই পূর্ব্বদিকে নবোদিত সূর্য্যের দিকে চাহিয়া সে তেত্রিশ কোটী দেবতার পায়ে প্রার্থনা জানাইল, যেন তার জন্য বাড়ীতে আজ আবার কোনো বিপ্লব না বাধে! আর যদি তা অনিবার্য্য হয় তো তার সহ্যশক্তি যেন অটুট থাকে! তারপর পুলকের ঘুম ভাঙ্গার ভয়ে সে সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাঁড়ার ঘরের এক কোণে একটা ষ্টোভ ময়লা আবর্জ্জনার মধ্যে লুকাইয়াছিল। শুভেন্দু সেটাকে তারি উপর চা তৈরী করিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। সামনে সদ্যস্নাতা সবিতাকে দেখিয়া বলিল,—"বৌদি, তুমি চট করে আমাদের চা'টা তৈরী করে দাও না,—একটু তাড়াতাড়ি করো, নইলে বাবার আবার দেরী হয়ে যাবে!

সবিতা জল-ভরা পাত্রটা ষ্টোভে জ্বালে বসাইয়া দিল। একটা ছোট টুলের উপর বসিয়া শুভেন্দু দেখিতে লাগিল, জলটা কতক্ষণে ফোটে!

একটুখানি শুধু হাতে বসিয়া থাকিয়া, শুভেন্দু খেলাচ্ছলে দেশলাইয়ের কাটি এক-একটা ষ্টোভের আগুনে পোড়াইতে আরম্ভ করিল। যখন কাটিগুলি শেষ হইল, তখন পকেট হইতে একখানি পুরানো চিঠি বাহির করিয়া আগুনে ধরিল।

চিঠিখানির অর্দ্ধেক পুড়িয়া গেলে সবিতা বলিল,—ওটা কি পুড়ছে? দরকারি নয় তো?

—না, না, দরকারি নয়, পুরানো চিঠি একখানা!

—কার লেখা ওটা? তোমার?

শুভেন্দু হাসিয়া বলিল,—আমার লেখা বুঝি তুমি চেনো না বৌদি! ওটা যে দাদার লেখা—দেখছো না?

সবিতার মুখে আর কথা ফুটিল না। সত্যই যে ও লেখা দেখার সৌভাগ্য এখনো তার হয় নাই। মানুষটীকেই সে কতটুকু কয়বারই বা দেখিয়াছে!

মাথা হেঁট করিয়া হাতের কাজে বেশী রকম মন দিবার ভাণ করিয়া তার ব্যগ্র দৃষ্টি শুভেন্দুর চোখ এড়াইয়া ঐ লেখাটুকু ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

শুভেন্দু চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—কৈ পুলক ওঠেনি এখনো?

—না। এই ওঠবার সময় হল,—উঠ্‌বে এখনি!

—সে কোথায় থাকে? তোমার কাছেই বুঝি? বেশ সঙ্গীটি হয়েছে তো!

সবিতা বলিল,—তবু তো সময় কাটে!

—সময় কাটাবার আর কিছু জোটে না বুঝি? বইটই পড়লেই তো হয়!

—আচ্ছা, আমি বাইরের লাইব্রেরী থেকে এনে দেব, তোমার একলার বেশ সঙ্গী হবে।

সবিতা একটু হাসিয়া বলিল,—তোমার কাছে তো আমি একটী সজীব সঙ্গী পাবার আশা রাখি।

শুভেন্দুর বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছিল, সে তাই একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, ওই লাইব্রেরীর বইগুলো আগে শেষ করুন তো।

দশ-বারো দিন পরেই পূজার ষষ্ঠী আসিয়া পড়িল। মেনকা বসিয়া তরকারী কুটিয়া দিতেছিলেন। কাছে আর একখানা বঁটি পাড়িয়া সবিতা আলু ছাড়াইয়া দিতেছিল। শুভেন্দু চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া বলিল,—মা,দেখলে দাদার কাণ্ডখানা!

মেনকা সোৎসুকে বলিলেন,—কেন, কি হয়েছে রে?

—লিখেছে যে, একেবারে কলকাতা চলে যাবে, বাড়ী আর আসবে না এবারে।

মেনকা বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সবিতার পানে একবার অগ্নি দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন,—তা হবে না। যা, তুই এখনি ওঁর নাম দিয়ে টেলিগ্রাম করে দিগে যা,—তাকে বাড়ী আসতেই হবে! আমি তো মরি নি এখনো,—আমি মলে তখন যেন সে বাড়ী-ঘর ছেড়ে যায়!

সবিতা মাথা হেঁট করিয়া বসিল। গভীর ব্যথায় তার মুখখানি কালো হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের বেদনা-লাঞ্ছিত মুখখানাকে আড়াল করিবার জন্যই সে মাথার কাপড়টা আরো একটু টানিয়া নামাইয়া দিল।

তারও ইচ্ছা করিতেছিল, সমস্ত ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া ঘরে গিয়া ঢোকে। কিন্তু তা করিতে গেলে তার অপরাধের মাত্রা বাড়াবে বই কমিবে না!

শুভেন্দু কিছুক্ষণ অরুণের তুলনায় নিজেকে ভালো ছেলে বলিয়া জানাইয়া তার পর বকিতে বকিতে বাহিরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, শোনো মা, দাদা যদি বাড়ী না আসে, তা হলে আমিও দার্জ্জিলিং চলে যাব। বা রে, তিনি মজা করে বেড়িয়ে বেড়াবেন, আর আমি বুঝি পাব না! তুমি বাবাকে বলে রেখো কিন্তু!

মেনকা বলিলেন,—যাস, যাবি,—তার জন্যে আমি কেন ওঁকে বলে রাখতে গেলাম!

—না হলে ছাই যেতে দেবেন! আচ্ছা, দারজিলিং না হয়, কটকে যাব, তাই বলো,—বলবে তো?

মেনকার মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তিনি বলিলেন, —আচ্ছা, সে যখন যাবি, তখন দেখা যাবে।

সবিতারও সারাদিন কেবল মনে হইতেছিল, দাদা মশায় যদি আর-একটীবার তাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন তো সে দুদিন তাঁদের কাছে গিয়া এই উত্তপ্ত মনটাকে জুড়াইয়া আসিতে পারিত! কিন্তু শাশুড়ী তাকে হয় তো পাঠাইবেন না, তাঁর অনেক আপত্তি আছে। তাছাড়া পুলক!

সবিতা হয়তো যাইতে পারিলেই একটু মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে, কিন্তু তার মনে তো কর্ত্তব্যের মিল একটুও নাই। পুলকের উপর তার স্নেহের অধিকার যতটুকুই থাক্, কর্ত্তব্যের দায়িত্ব যে তার চেয়ে ঢের বেশী। এখানে নিজের মনের স্বার্থকে বলি দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই!

এ সংসারে পাওনা তার যত কমই থাক্, দিবার অধিকার যতখানি আছে তা সে দিবে না কেন? এ বিষয়ে তো সংসারের মানুষ এতটুকু ত্রুটি সহ্য করিতে পারে না। তাদের প্রসারিত হাত ভরাইয়া দেওয়া চাইই। তারা জানিতে চায় না, ভাণ্ডারে তোমার জমা কতটুকু! কতটুকু তুমি দিবার ক্ষমতা রাখ!

দুপুরবেলা পুলককে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া সবিতা একটা সেলাই হাতে করিয়া বসিল। হঠাৎ মেনকা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সবিতা আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মেনকা বলিলেন,—বৌমা, খাম পোষ্ট-কার্ড কিছু কি আনানো আছে?

সবিতা বলিল,—আছে তো মা। চাই কি এখন?

মেনকা দেওয়ালের দিকে চাহিয়া একমনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ বাদে বলিলেন,—না আমার লাগবে না। তুমি এক কাজ কর তো! অরুণকে বেশ ভালো করে একখানি চিঠি লিখে দাও তো!

ক্ষোভে, লজ্জায় সবিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে ঘাড় হেঁট করিয়া সেলাইয়ে মন দিতে গেল, কিন্তু সেলাই তার মনটাকে গ্রহণ করিল না।

মেনকা তার লজ্জা-বিপন্ন মুখের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া বলিলেন,—বেশ নরম করে লিখে দিয়ো,—বুঝলে? তুমি ভাল করে চিঠি লিখলে সে আস্‌তেও পারে।

মেনকার বারংবারের হুকুমে সবিতা যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু এই চিঠি লেখা ব্যাপারটা তার দুঃসহ অপমানকর মনে হইল। চিঠি সে কাহাকে লিখিবে? কেনই বা লিখিবে? সাঁঝের আলোমাখা ইন্দীবরের মত চোখদুটী তুলিয়া সে বলিল,—আমি পারবো না মা।

মেনকা যেন অসম্ভব কোনো কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন,—না, পারবে না বই কি! দাও, লিখে দাও একখানা চিঠি।

সবিতা এবারও বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—আমি পারবো না।

মেনকা গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—কেন পারবে না, শুনি? অহঙ্কার! ভারী অহঙ্কার হয়েছে! না পারবে তো তোমাকে নিয়ে আমি কি করবো, শুনি!

সবিতা চুপ করিয়া রহিল। মেনকা বকিতে লাগিলেন,— এত বড় সম্মানী মেয়ে নিয়ে কি আমার সংসার চলে? মরোগে, যা খুসি কর,—ঐ গুণের জন্যেই তো অমন কপালের জোর!

তীব্র তিরস্কারে আগুনের হল্‌কা ছড়াইতে ছড়াইতে দুম্‌দাম্ করিয়া মেনকা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই নিজের হাতে ছড়ানো আগুনের খর আঁচ কিছু কিছু তাঁরও লাগিয়াছিল। সবিতার উপর রাগ একটু কমিলে নিজেই তিনি অরুণকে চিঠি লিখিতে বসিলেন।

মেনকা খুব বেশীরকম স্নেহ-পরায়ণা মা। সন্তানদের প্রতি অন্ধ স্নেহের টানে তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইতেন। নিজের যে-কোনো একটী সন্তানের ম্লান মুখে একটু হাসি দেখিবার লোভে তিনি যেমন স্বচ্ছন্দে অন্যের সন্তানের বুকে পা দিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন, তেমনি নিজেরও অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে পারিতেন। ইহাতে তাঁর ন্যায়, অন্যায় বা কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-বোধ একেবারে ছিল না। অতি-স্নেহ হইলেও এই অন্ধতার জন্যই ছেলেরা বড় হইয়া কেহ নির্ব্বিচারে মাতৃবৎসল হইতে পারে নাই। তারা মায়ের কথাকে বিচার করিয়া গ্রহণ করিত। বাড়ীতে এক কালে যদি মাষ্টারে তাড়না করিত, ছেলেদের গায়ে হাত তুলিত, তা হইলে মেনকা সেদিন রাগ করিয়া উপবাস দিতেন। বাড়ীর কর্ত্তা বিপরীত মেজাজের লোক ছিলেন বলিয়াই এ সব ব্যাপারে কুফল ফলিতে পারে নাই। ছেলেরাই অনেক সময় মাকে বুঝাইয়া থামাইত। নানা রকমে প্রমাণ দিত যে মাষ্টারের মারে তাদের একটুও লাগে নাই, তবে মেনকা শান্ত হইতেন।

মোটের উপর বুদ্ধির চেয়ে তাঁর স্নেহই বেশী ছিল। সুতরাং বন্ধুর উপর রাগ করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজেই অরুণকে চিঠি লিখিয়া বাড়ী আসিতে বলিলেন। কিন্তু সদ্য সদ্য সবিতার উপর রাগে তাঁর মন তখনো গরম ছিল, তাই তাঁর মন স্নেহ-বিগলিত থাকা সত্ত্বেও চিঠিখানি নরম না হইয়া কড়া দাঁড়াইল। কোমল অনুরোধই কঠিনতম আদেশের মত হইয়া গেল। কিন্তু সে ঝোঁকের মাথায়। মেনকা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। চিঠি ডাকে পাঠাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন। তাঁর চিঠি পাওয়ার পরও কি অরুণ না আসিয়া থাকিতে পারিবে?

৯

শুভেন্দুর বিবাহের দিন ঠিক হইয়া গিয়াছে। এবারে আর অরুণ এড়াইতে পারে নাই, সেও আসিয়াছে—বিশেষ তার পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, আর কোন্ ছুতায় সে মাকে ফাঁকি দিবে?

তবে বাড়ী আসিয়া অবধি সে বলিতেছে যে সাক্‌চাতে একটা কাজের চেষ্টায় যাইবে, কিন্তু এখনো কর্ত্তাকে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। সম্প্রতি কর্ত্তার শরীর খারাপ হওয়ায় তাঁকে কোনো রকমে উত্তেজিত করিতে চিকিৎসকেরা একেবারেই বারণ করিয়া দিয়াছেন।

বাড়ীতেও অরুণ আসার পর হইতে অপেক্ষাকৃত শান্তি ঠাঁই পাইয়াছে। তবে সবিতার পক্ষে অন্ধের কিবা রাত্র কিবা দিন—সব সমান!

এই কয়দিন সে দূরে থাকিয়াই স্বামীকে যেটুকু দেখিতে-ছিল, তাহাতে তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা বদ্‌লাইয়া গেল।

সে প্রথমে ভাবিয়াছিল যে, তিনি বুঝি স্বভাবতই অল্পবাক্ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ! এখন দেখিল, ঠিক তা নয়, সে মুখ সর্ব্বদাই হাসিমাখা, কথাবার্ত্তাও কাহারো সঙ্গেই কম বলেন না। এ-বাড়ীর সকলেরই স্নেহ-প্রীতির স্নিগ্ধ ধারা শুকাইয়া যায় কেবল একা সবিতার বেলায়!

শান্ত সহিষ্ণু সবিতা এ সব আঘাত, সব ব্যথা চাপিয়া শুষ্কমুখেও হাসি টানিয়া ছদ্মবেশেই বেড়ায়! সে কাহাকেও জানিতে দিত না যে, কি গভীর ব্যথায় তার বুক ভরা!

তবে ক্রমশঃ এ বাড়ীর নিয়ম আচার তার জানা হইয়া গিয়াছিল। এমন সে সদাই সতর্ক থাকে। কাজের ছলে তাকে পীড়ন করিবার সুযোগ মেনকাও আর বড় একটা পাইতেন না। তবে অন্য খুঁত ধরিয়া সামান্য কথাকে অনেকখানি বাড়াইয়া কারণে অকারণে অনেক সময়েই তিনি যে ঝঙ্কার তুলিতেন, অরুণকে দেখিয়া তাঁর সে ঝঙ্কারের তীব্রতাও অনেকটা নরম হইয়া আসিয়াছিল। ইহাও সবিতার পক্ষে অনেকখানি বাঁচিয়া যাওয়া। ইহার জন্য সে মনে মনে অরুণকে কৃতজ্ঞতা জানাইত। এতদিন পরে সে সাহস করিয়া মাকে আর দাদামশায়কে চিঠি লিখিল। লিখিল, সে ভালই আছে।

ভাল যে কত আছে তা তার অন্তর্য্যামী যিনি তিনিই দিবারাত্র টের পাইতেছিলেন। তবু যাঁরা এর কিছুই জানেন না, তাঁদের আর সে দহন করে কেন?

দুদিন পরেই মায়ের চিঠির জবাব আসিল, বিবাহের পর এই প্রথম তার মায়ের চিঠি। কত আগ্রহের, কত যে আনন্দের, তা এ বাড়ীতে কে বুঝিবে? মা লিখিয়াছেন,—

"মা আমার, তোমার চিঠি পাইলাম। যদি ভাল আছ, তবে এতদিন চিঠি না দিয়া আমাকে এমন করিয়া ভাবাইলে কেন? তোমার চিঠি পাই নাই বলিয়া সাহস করিয়া চিঠি দিতেও পারি নাই। বাবা ৺কাশীধামে যাইবেন বলিতেছেন, আমিও সঙ্গে যাইব।

বহুদিন তোমাকে দেখি নাই, কাশী যাইবার পথে তোমাকে একবারটী দেখিয়া যাইব ভাবিতেছি। বাড়ীতে কালী পূজাটী সারিয়াই আমরা কাশী যাইব। অরুণ বাবাজী ততদিন ওখানে থাকিবেন কি না জানাইও। এ বাড়ীতে জামাই আনার দুরাশা না করি, ওখানে গিয়াও তাঁকে দেখিতে না পাইলে বড় ক্ষুব্ধ হইব। যদি দুদিন পরে যাত্রা করিলে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ না হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে না হয় আমরা দুদিন আগেই যাত্রা করিব। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ লইও। মাননীয় বৈবাহিক মহাশয় ও বেয়ান ঠাকুরাণীকে প্রণাম জানাইও। পত্রের উত্তর দিতে দেরী করিও না মা। আমি পথ চাহিয়া রহিলাম। তোমার পত্র পাইলে আমরা যাত্রার দিনস্থির করিব। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার মা।"

মায়ের চিঠি পড়িয়া সবিতা ভাবনায় পড়িল। সে এ সব কথার কি উত্তর দিবে? উনি কতদিন থাকিবেন, বা কবে যাইবেন, সে কথা সে কি করিয়া জানিবে যে মাকে জানাইতে বসিবে? তা ছাড়া এ বাড়ীতে আসিলে হয় তো কিছুই তাঁদের অজানা থাকিবে না!

এখানকার এঁরাই বা কি মনে করিবেন? যখন তাঁরা আসিয়া দেখিবেন যে, এ রাজপুরীতে যেখানে যা কিছু থাকার দরকার সবই আছে, কেবল একটু জীবন-কাঠির স্পর্শের অভাবে তাঁদের মেয়ের ভাগ্যে সব ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে,—এ কি তাঁরা সহ্য করিতে পারিবেন?

তার চেয়ে এ কথার সে কোনো উত্তর দিবে না—সেই ভাল।

সবিতা শ্বশুরের জন্য দুধ ঘন করিতেছিল; চিঠিখানা তখনি আসিল। উঠিতে গেলে দুধটা নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া চিঠি হাতে করিয়াই সে দুধ জ্বাল দিতে লাগিল।

মেনকা আসিয়া বলিলেন,—তোমার হাতে ও কার চিঠি বৌমা, দেখি ?

সবিতা বলিল,—আমার মায়ের চিঠি মা।

—ওমা, তাই নাকি ! দেখি, দেখি, কি লিখলেন তোমার মা ! এতকাল পরে মায়ের আদর উথ্‌লে উঠলো যে হঠাৎ ?

সবিতা চিঠিখানি মেনকার হাতে তুলিয়া দিল। সে চিঠি পড়িয়া মেনকার মুখ অবজ্ঞার হাসিতে ভরিয়া গেল। তিনি বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন,—তবে আর কি ! কাশী-যাত্রার পথে আমাকেও একটু কৃতার্থ করা হয়ে যাবে এখন !

সবিতার মুখ প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। সে তবু শান্তভাবেই বলিল,—না, আমি লিখে দেব, তাঁরা আসবেন না !

মেনকা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—তা দেবে বই কি ! মাকে মাতাম'কে বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়া মেয়ে তুমি ! আমাদের বাড়ীর নিন্দে কুযশ না রটালে তোমার চলছেনা কি না !

সবিতা চুপ করিয়া রহিল। অরুণ ছাড়া বাড়ীর আর সকলকে মেনকা বলিয়া বেড়াইলেন যে, সবিতার মা ও দাদামশায় এ বাড়ীতেই আসিতেছেন। কেন যে আসিতেছেন, বা কতক্ষণের জন্য আসিতেছেন, সে কথা অপ্রকাশ রহিয়া গেল। হতবুদ্ধি সবিতা এ কথার প্রতিবাদ করিয়া শাশুড়ীর রাগ আর বাড়াইল না।

শুভেন্দুর বিবাহে বরযাত্রীদের সঙ্গে অরুণও যেদিন চলিয়া গেল, সেদিন বাহিরের একজন চাকর আসিয়া খবর দিল যে সবিতার দাদামশায় আসিয়াছেন।

মেনকা একমুখ হাসিয়া বলিলেন,—এসেছেন ! তবে নাকি ভারি সম্মানী মানুষ—আসবেন না ! কে গিয়েছিল খোসামোদ করতে ?

সবিতার সারা বুক রোদনোচ্ছ্বাসে ফুলিতেছিল। হায়, তার নীরব ইঙ্গিত মা কি দাদামশায় কেহই কি বুঝিতে পারেন নাই ? অথবা তাকে একবার দেখিবার লোভে তাহা বুঝিয়াও বোঝেন নাই ? জ্বালা তিনি কি সহ্য করিতে পারিবেন ? তিনি যে সত্যই বড় আত্মাভিমানী মানুষ !

মেনকা চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁরে উনি কি কিছু বলে-টলে দিলেন ?

সে বলিল,—কিছু না ! আজ একাদশী, যিনি এসেছেন, তিনি একাদশীতে কিছু খাননা, বললেন !

সবিতা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যাক্, তার দাদামশায়ের জন্য এঁদের কিছু আয়োজনই তো করিতে হইবে না !

বাহিরে জগৎবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সবিতার দাদামশায় একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন,—আর তো আমার বেশী সময় নেই। এখন সবিতার সঙ্গে একটু দেখা করেই উঠতে চাই।

জগৎবাবু প্রশ্ন করিলেন,—আপনার সময় এত কম কেন বলছেন ?

—আমি যে বেনারসে যাচ্চি, ট্রেণ ধরতে হবে।

—আমাদের বেয়ান কি বাড়ীতেই রইলেন ?

—না। কার কাছে থাকবে সেখানে ? সেও আমার সঙ্গে আছে, ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে তাকে বসিয়ে রেখে এসেছি। সেই জন্যে আরও একটু শীগ্‌গির করে ফিরতে চাই। বড্ড হতাশ হয়ে গেলাম যে অরুণের সঙ্গে দেখা হলো না ! সেই বিয়ের সময় যা দেখেছিলাম,—সে কতটুকুই বা !

বেয়ানকে ষ্টেশনে বসাইয়া রাখিয়া আসায় জগৎবাবু দু-চারিটা কথা বলিলেন, উত্তরে সবিতার দাদামশায় বলিলেন,—কি করব ! সে যে কিছুতেই রাজি হলোনা। তার ওপর আজ একাদশীর দিন বলে আমিও আর বেশী জেদ করি নি।

নীচেকার বিস্তীর্ণ দালানে জগৎবাবু সবিতার দাদামশায়কে আনিয়া বসাইলেন। ঝী গিয়া সবিতাকে ডাকিয়া আনিল। সবিতার কোলে ছিল পুলক। সে পুলককে নামাইয়া দিয়া শ্বশুরকে ও দাদামশায়কে প্রণাম করিল। তিনি তার দিকে তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—কেমন আছ দিদি, ভাল তো ?

ছাপাইয়া তখন জল আসিয়াছিল, মুখ নামাইয়া সে সেই অশ্রু গোপন করিল।

সবিতার দাদামশায় তাঁর ধরা গলা পরিষ্কার করিয়া সবিতাকে একবার লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। জগৎবাবু বলিলেন,—তাতে আমার তো বড় আপত্তি নেই, তবে ঐ যে একটী জীবকে উনি বাঁচিয়ে রেখেছেন, ওরই জন্যে বৌমার যাওয়া অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই সামনেই একটা বিয়ের গোলমালও চল্‌ছে, আর দিনকতক পরে নিয়ে যাবেন!

এর পর খুব সংক্ষেপে আর দু'চারটী কথা বলিয়া সবিতার দাদামশায় চলিয়া গেলেন। অরুণের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় যথার্থই তিনি বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেন। সবিতাকেও যে একটুখানি দেখিলেন, তাতে বুঝিতে পারিলেন না যে, এই সুখের ঘরে আসিয়া সে যথার্থই সুখী হইয়াছে কি না! মনের সংশয়েরও ঘোর কাটিল না।

কিন্তু এই সব সন্দেহ মিটিয়া যায়, যখন দীপ্ত অরুণেরই মত মনোহর অরুণকে মনে পড়ে! সবিতাকে যে তিনি তারই হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন—তবে সবিতা সুখী হইবে না কেন?

পরের দিন শুভেন্দু নববধূ লইয়া গৃহে ফিরিল। শরীর ভাল ছিলনা, তাই জগৎবাবু নিজে যান্ নাই, অরুণই বরকর্ত্তা হইয়া গিয়াছিল। এ দিনে কিন্তু তার উৎসাহের বড় অভাব দেখা গেল না।

সারা দিনের উৎসব-আয়োজনের মাঝে মেনকা সবিতাকে ডাকেন নাই। তার একটা গোপন কারণ ছিল যে, সবিতা "পতিপ্রিয়া" নয়। যে নারী স্বামীর প্রিয়া নহে, তাকে ডাকা তিনি উচিত মনে করেন নাই।

সবিতা পুলককে লইয়া ঘরের কোণেই ছিল। মেনকার এই বৃহৎ অবজ্ঞা অবহেলার মাঝেও সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইতে তার প্রবৃত্তি হইল না। শাশুড়ীর অনুমতি ছাড়া কাপড় বদ্‌লাইবার সাহসও হইল না।

বর-কনের গাড়ী ও বাজ্‌না যখন বাড়ীর উঠানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন মেনকা তাকেও ডাকিলেন। এ ডাকের জন্য সবিতা প্রস্তুত ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, অত লোকজনের মাঝে বুঝি তাকে আর যাইতে হইবে না। কিন্তু যেমন বেশে ছিল, তেমনি বেশেই গিয়া দাঁড়াইতে হইল।

গাড়ী হইতে শুভেন্দুর পর অরুণও নামিয়া পড়িল। আত্মীয়া-কুটুম্বদের নানারকম বস্ত্র-অলঙ্কারের জাঁক-জমকের মাঝে একটী মাত্র নারীর আড়ম্বর-হীন সহজ সাদা কাপড়ে ও সোনা বা হীরার অভাবের মাঝেও গৌরব-দীপ্ত সঙ্কোচ-হীন মুখের উপর সকলের সসম্ভ্রম বিস্ময়-দৃষ্টি পড়িতেছিল, অরুণেরও পড়িল।

সবিতা একবার চাহিয়া দেখিল যে, একটা মোটা থামের গায়ে হেলিয়া দাঁড়াইয়া নিলাজ চোখে অরুণ তারই দিকে চাহিয়া আছে! একখানি পা জুতা হইতে বাহির করিয়া সেই খোলা পা অন্য পায়ের উপর রাখিয়া দুই হাতে পিঠের দিকের থামটা জড়াইয়া ধরিয়া সে দাঁড়াইল। এক-জোড়া শ্বেত শতদলের মত স্বামীর পায়ের উপর পলকমাত্র চোখ পড়িতেই লজ্জায় মুখ লাল করিয়া সবিতা সেখান হইতে সরিয়া গেল।

হায় দুর্ভাগ্য! ইচ্ছা করিয়া সে চাহে নাই। তবু ওই একটী পলক চাওয়ার লজ্জাতেই সে মরিয়া যাইতেছিল, পাছে কেহ তার দৃষ্টিকে লুব্ধ দৃষ্টি মনে করিয়া থাকে!

মেনকা বধূ-বরণ করিতেছিলেন। তিনি সৌভাগ্যবতী বলিয়া লোকে নববধূকে শাশুড়ীর মত সৌভাগ্যবতী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

এদিকে কেহ কেহ অখণ্ড মনোযোগ দিয়া সবিতার সমালোচনা করিতেছিল। সে যেন কোনো একটা আশ্চর্য্য জিনিষের মত আবির্ভূত হইয়া তাদের অবাক্ করিয়া দিয়াছিল।

অন্য ঘরে পুলকের চীৎকার শুনিয়া সবিতা ছুটিয়া গেল। একটা উঁচু চেয়ারে বসিয়া খেলা করিতে করিতে সে গড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে। মুখের সুমুখের নূতন দাঁত দুটীর ঘা লাগিয়া ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। যে-চাকরটা তাকে খেলা দিতেছিল, সে ছুটিয়া বউ

দেখিতে গিয়াছে। পুলককে লইয়া যায় নাই বলিয়া সবিতা একটু বিরক্ত হইল। সে পুলককে কোলে করিয়া ঘরের ভিতরেই থাকিয়া গেল। এখনি যে একপাল লোক আসিয়া তার অনাদৃত দেহখানাকে বিদ্রূপ-ভরা দৃষ্টির খোঁচায় বিঁধিবে, সে তার ভাল লাগিল না বলিয়াই সে সরিয়া রহিল।

তার সৌভাগ্য যে মেনকা আর তাকে ডাকিলেন না।

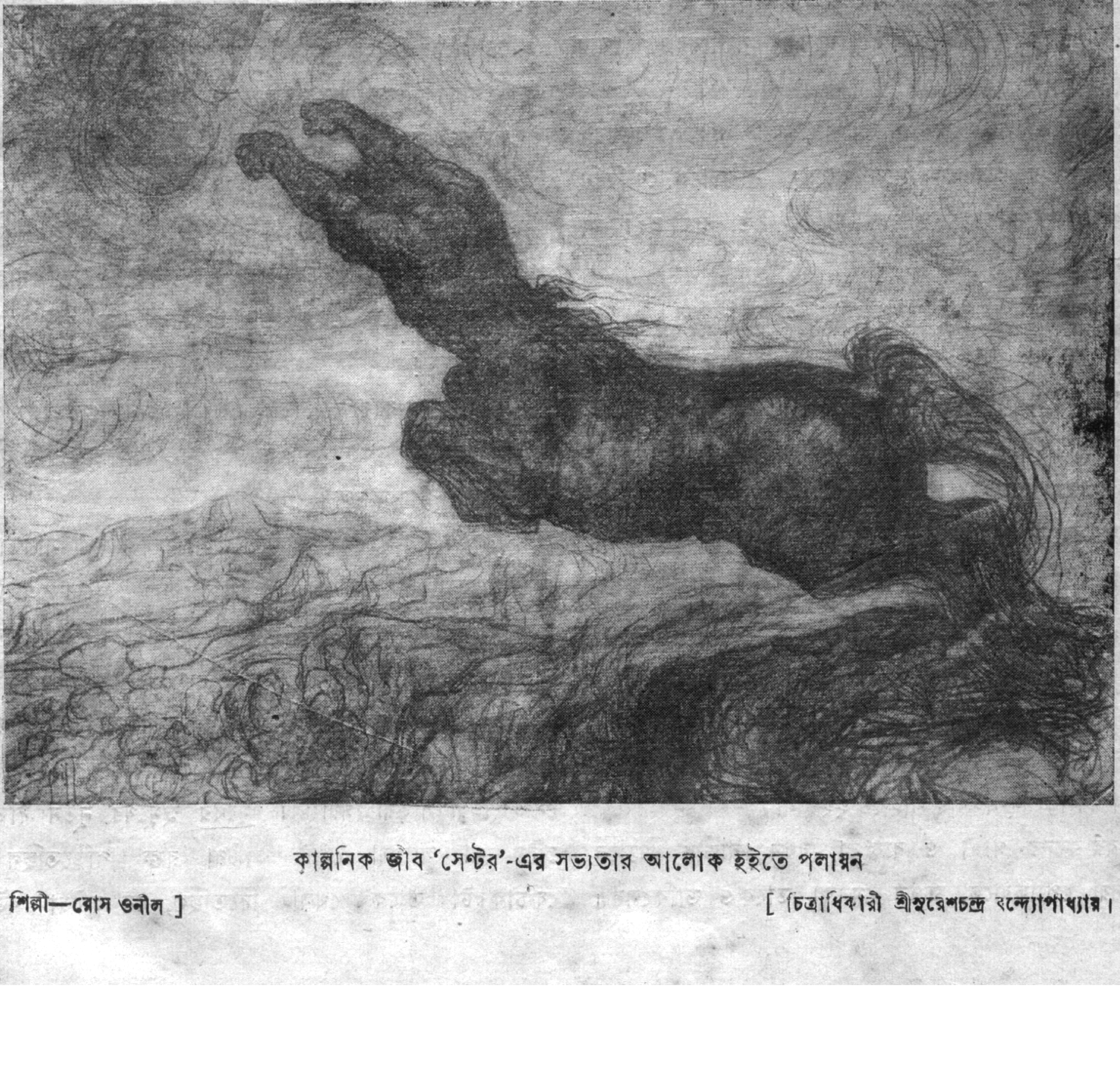
ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

---

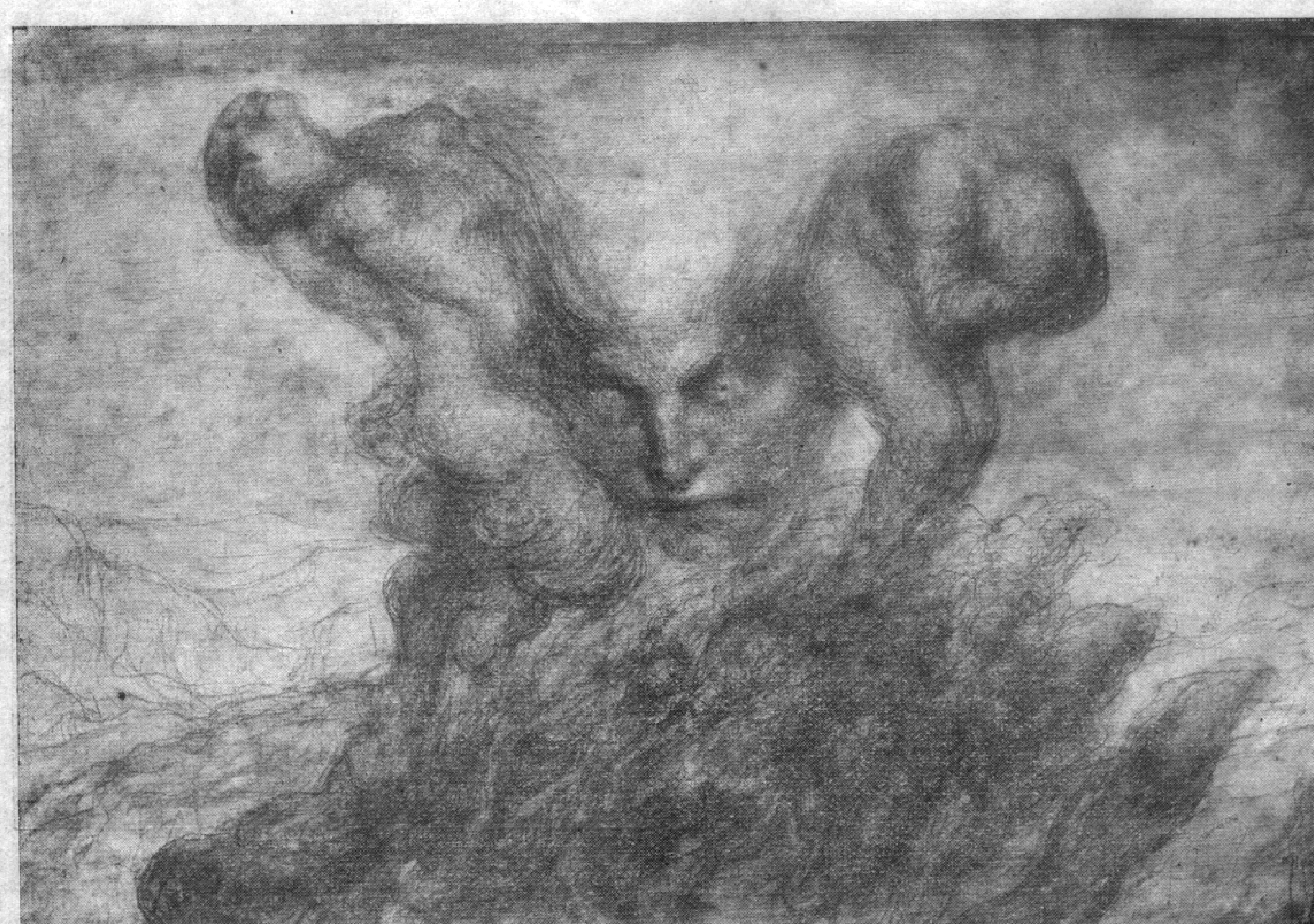
# মার্কিন চিত্রশিল্পী রোস ওনীল

মাত্র কিছুদিন হোল মার্কিন জন-সাধারণ কুমারী রোজ ওনীলের ( Rose O'Neill ) প্রকৃত প্রতিভার খবর পেয়েছে কিন্তু আজ কয়েক বছর ধরে শিল্পীরা তাঁর অঙ্কন-কৌশল, তাঁর পারিপ্রেক্ষিক জ্ঞান ও কলা সৌন্দর্য্যের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কোরে এসেছেন। তাঁর কয়েকটি চিত্র মার্কিন ও য়ুরোপীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চক্ষুগোচর ও প্রশংসার্হ হলেও তাঁর শক্তি ও মাধুর্য্যময়ী কল্পনা ও সৃষ্টিকুশলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি কেবল তাঁরই স্নেহরস-আওতায় গোপনে রক্ষিত ছিল, অথচ সেগুলি সৃষ্টি কোরে জগতের যে কোন শিল্পাচার্য্য পরম গৌরব



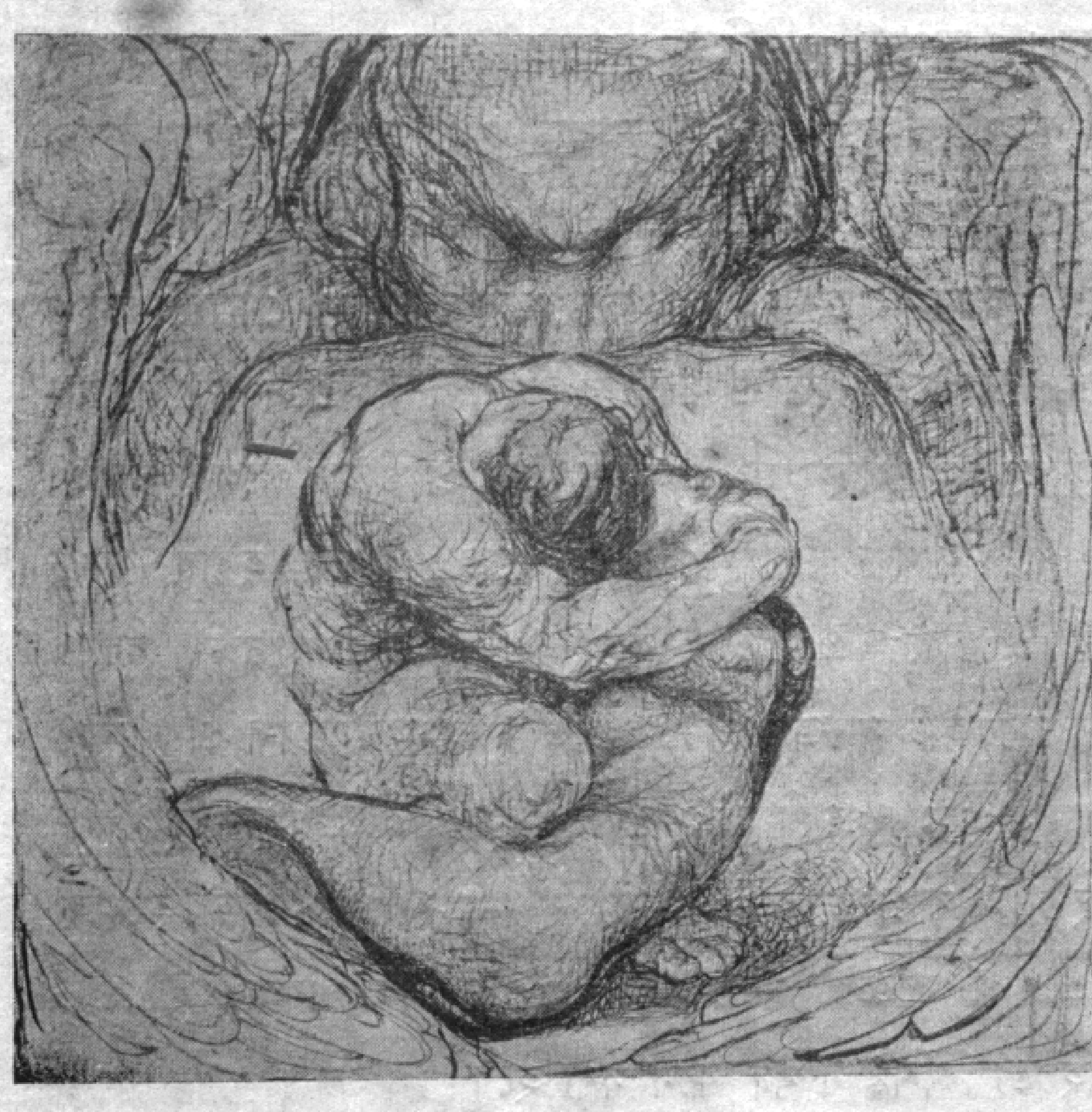
কাল্পনিক জীব 'সেণ্টর'-এর সভ্যতার আলোক হইতে পলায়ন

শিল্পী—রোস ওনীল ] [ চিত্রাধিকারী শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।



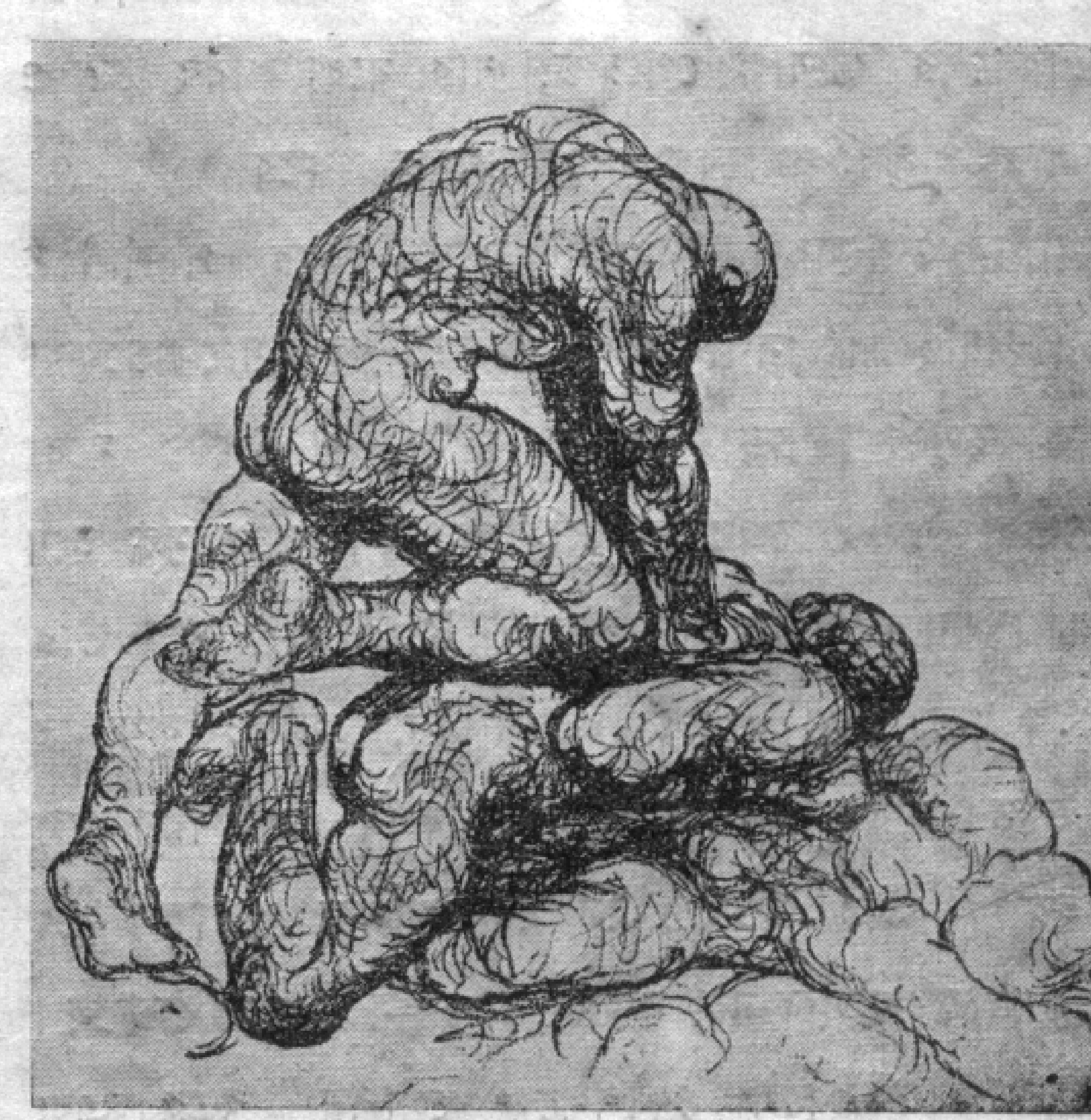
জ্ঞানের উন্মেষ—জ্ঞানের উন্মেষে যুগপৎ উল্লাস ও বেদনার আবির্ভাব

শিল্পী—রোস্ ওনীল ]    [ চিত্রাধিকারী শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।



অন্ধ নিয়তির আবেষ্টনে প্রেমিক ও প্রেমিকা

শিল্পী—রোস ওনীল ]    [ চিত্রাধিকারী শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।



সংগ্রাম

শিল্পী—রোস ওনীল



অতৃপ্ত

শিল্পী—রোস ওনীল



যৌবন—যুবকের চোখে স্বপ্নাবেশ ও অন্বেষণের ভাব

শিল্পী—রোস ওনীল

বোধ করতে পারেন। এতদিন পরে আমরা কয়েকখানি চিত্র প্রকাশের সুযোগ পেয়েছি, যার মধ্যে কবিত্ব চিত্র ও শিল্প-কলার অপূর্ব্ব সমাবেশ মনকে চমৎকৃত করে।

কুমারী ওনীলের ছবিগুলি পারী শহরে প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। সেখানকার বিখ্যাত শিল্প-সমালোচকেরা তাঁর কবিত্বপূর্ণ বিচিত্র কল্পনা ও তুলির টানের মধ্যে প্রাণ-চেতনা ও তেজের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে ফ্রান্সের বিখ্যাত ভাস্কর রোদাঁর ( Rodin ) সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি, অপিচ কুমারীর চিত্রে ভাস্কর-সুলভ কলাকৌশলের নিদর্শন এর কারণ বলে মনে হয়। তাঁর চিত্র মনে যে আনন্দ সঞ্চার করে তা স্থির শান্ত আনন্দ নয়, মনকে তা চঞ্চল কোরে তোলে। তাঁর চিত্র এককালে কৌশলকে গোপন করে এবং সেই সঙ্গে ভাবকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে, মনকে উন্নত করে, অথচ শক্তির প্রাচুর্য্যে ভয় ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করে। অপূর্ব্ব বিচিত্র ভাবের রহস্যকে রূপ দেবার কৌশল তিনি সুন্দর আয়ত্ত করেছেন। এর জন্যে তিনি বিশেষ কোরে কারো কাছে ঋণী নন, কারণ যদিও তাঁর রচনায় গ্রীক কাল্‌চারের কিছু চিহ্ন মেলে, তবুও তাঁর শিক্ষিত বুদ্ধি ও কল্পনার অপূর্ব্ব মিশ্রনে তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তা একমাত্র তাঁর প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

এই সার্থক শিল্পী যে কবি এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী। গত কয়েক বছরে তাঁর কয়েকটি সচিত্র ছোট গল্প ও দুখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদের চিত্র-সম্পদ কুমারীর মোহন তুলিকা-প্রসূত। সম্প্রতি তাঁর একখানি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞের মতে তা শুধু মার্কিন কেন, ইংরেজী সাহিত্যে বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হবে।

# সঙ্কলন

## জরাথুষ্ট্র

পার্শীদের সাবেক নিবাস ইরাণ দেশে ছিল। পারস্য দেশকে লোকে ইরাণ বলিত এবং ইরাণের অধিবাসীরা ইরাণী বলিয়া পরিচিত ছিল। ইরাণীরা আর্য্যদেরই এক শাখাবিশেষ। আর্য্যদের পিতা-পিতামহ মধ্য-এসিয়ায় বাস করিতেন। তাঁহাদের সন্তানাদি দ্বারা যখন বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাঁহারা সে জায়গা ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর নানা-স্থানে চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

তাঁহাদেরই এক দল ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং অন্য দল পারস্য দেশে রহিলেন। ভারতের অধিবাসীরা হিন্দু ও পারস্যের বা ইরাণের অধিবাসীরা ইরাণী।

পূর্ব্বে ইরাণীরা হিন্দুদেরই মত পূজা-অর্চ্চনা প্রভৃতি করিত ; কিন্তু কালক্রমে তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার অধর্ম্ম আচরণ দেখা দিল। তাহারা একেশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া ভোজবাজি, ভেল্কিবাজীর চর্চ্চায় মন দিল। মায়াজাল, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিল। দেশের মধ্যে একটা ভয়ানক অনাচার আরম্ভ হইয়া গেল।

এই সময় মেদিয়ার অন্তর্গত রে নামক স্থানে এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার নাম পৌরুসস্প। তাঁহারই পুত্রের নাম "জরাথুষ্ট্র"; ইরাণী ভাষায় উহার অর্থ, "সত্যাচারী"। জরাথুষ্ট্র খৃষ্টের জন্মের ৬০৩ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন।

জরাথুষ্ট্রের বাল্য-ইতিহাস সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। শৈশব হইতেই জরাথুষ্ট্র অসাধারণ প্রতিভা দেখাইতে লাগিলেন। বারো বৎসর বয়সের সময় হইতেই তিনি অনেক বিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোককে তর্ক-যুদ্ধে হারাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিচার-শক্তির অপূর্ব্ব ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন।

ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার পৈতা হয়। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মত পার্শীরাও পৈতা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সময় হইতেই সংসারের ভোগবিলাসের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে। জীব-জন্তুর দুঃখ কষ্ট দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল এবং একদিন এক ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের দুর্দ্দশা ও কষ্ট দেখিয়া তিনি সংসার-ত্যাগ মনস্থ করিলেন।

বিশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সত্যান্বেষণে উদাসীন হইয়া চলিয়া গেলেন। দশ বৎসর নানা পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল ও মরুভূমিতে কাটাইয়া দিলেন। সে সময়ে একমাত্র দুগ্ধ ও পনির ব্যতীত অন্য কিছু আহার করিতেন না। দশ বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন।

এখন তিনি ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি স্থানে নিজের ধর্ম্ম-মত ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু কেহই উহা গ্রহণ করিল না। ইহাতে তাঁহার মনে নৈরাশ্যের উদয় হইল না, অধিকন্তু নূতন উৎসাহপূর্ণ উদ্যমে প্রচার-কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। যাহা হউক, পরিশ্রম বৃথা গেল না। তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় একব্যক্তি নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহার দুই বৎসর পরে ইরাণের রাজা ভিসতাস্প জরাথুষ্ট্রকে গুরুপদে বরণ করেন।

দেখিতে দেখিতে প্রজাবৃন্দ সকলেই নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে ইরাণ দেশে আর্য্যদের উন্নত একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল।

জরাথুষ্ট্র একে একে তিন বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের গর্ভে অনেক সন্তান-সন্ততি হয়। অবশেষে খৃষ্টের জন্মের ৬০১ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাহা আঠারো বৎসর ব্যাপিয়া চলিতে থাকে। ফলে অনেক বিধর্ম্মী রাজা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এইরূপে ভগবান অহুরা মজদার উপাসনা দেশে প্রচারিত হইল—সত্যনিষ্ঠা, সদাচারে দেশের কলুষিত হাওয়া পবিত্র হইল। জরাথুষ্ট্র নাশ আদারের মন্দিরে ভগবানের আরাধনায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি মালাজপ করিতেছেন, এমন সময় তুরবারাতার নামক একজন তুর্কী অতর্কিতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তরবারির এক আঘাতে জরাথুষ্ট্রের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলে—জরাথুষ্ট্রও তাঁহার হাতের মালা তুর্কীর শরীরে নিক্ষেপ করেন। দেখিতে দখিতে তুর্কীর সমস্ত দেহ জ্বলিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সাতাত্তর বৎসর বয়সে এইরূপ শত্রুর তরবারির আঘাতে জরাথুষ্ট্র নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

জরাথুষ্ট্র তাঁহার শিষ্যদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন :—

(১) জীবের প্রতি দয়া করিবে।

(২) অবিবাহিত জীবন যাপন করিবে না।

(৩) সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে—সত্যবাক্, সত্য আচরণ ও সত্যনিষ্ঠা মানুষের জীবন-পথের পুঁজিস্বরূপ।

(৪) নিষ্ঠুর ব্যবহার সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

(৫) আত্মার ধ্বংস নাই—সৎকাজ করিলে স্বর্গবাস, অসৎ কাজে চির নরক।

(৬) জীবন একবার বই দু'বার পাওয়া যায় না—সুতরাং বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে জীবনের সদ্ব্যবহার করিবে।

(৭) অগ্নি প্রাণ-স্বরূপ, সুতরাং পবিত্র,—অগ্নি রক্ষা ও অগ্নির উপাসনা করিবে।

(৮) দেহ অপবিত্র, সুতরাং মানুষ মরিলে দেহ দাহ কিম্বা কবর দিয়া মৃত্তিকা অপবিত্র করিও না, কোন উচ্চ স্থানে রাখিয়া দিও।

(৯) ভগবান অহুরামজদা সমস্ত জগতের স্রষ্টা। তিনি ভিন্ন অন্য ভগবান আর নাই—সুতরাং তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখিবে এবং তাঁহাকে আকুলভাবে ডাকিবে।

ইরাণ বা পারস্য বর্ত্তমানে মুসলমানদের অধীন, পার্শীর সংখ্যা খুবই কম। তাহারা মুসলমান কর্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া ইরাণ দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষে বোম্বাই প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের উপকূলে পার্শীরা জরাথুষ্ট্র-প্রবর্ত্তিত ভগবান অহুরামজদার উপাসক।

সনাতন, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। শ্রীমণীন্দ্রকুমার চৌধুরী।

---

## নৈতিক শিক্ষা

শিক্ষাসাধনার প্রথম ও প্রধান কথা নৈতিক শিক্ষা। একটা জাতির নৈতিক অবস্থা অর্থাৎ কিরূপে তারা ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাই দেখে ঠিক করে বলা যায় জাতিটা সভ্যতার কোন্ স্তরে উন্নীত। এই নৈতিক অবস্থার উপরই জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির হ্রাস ও বৃদ্ধি নির্ভর করে। যখন একটা জাতির রীতিনীতি ধ্বংসাভিমুখে চলে, তখন বোঝা যায় যে সেই জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন আসন্ন মৃত্যুগ্রস্ত হয়েছে।

নৈতিক শিক্ষা কখনও পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না শিক্ষক মহাশয় ছাত্র-ছাত্রীর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা নিয়ে পদে পদে প্রমাণ করে' দেবেন—পাপ কি, পুণ্য কি—যতক্ষণ না বালক-বালিকাদের এইরূপে দেখে করে দৃঢ় সংস্কার হয়ে যাবে যে এইটা অসৎ ও এইটা সৎ। বিভিন্ন অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তা যতক্ষণ না ছাত্রদের চরিত্রগত হয়ে পড়ছে ততক্ষণ নৈতিক শিক্ষার পরিপূর্ণতা কোথায়?

কিন্তু কোন্ উপায়ে এইটা করতে পারা যায় সেইটাই আমাদের দেখতে হবে। এটা কি নীতিশাস্ত্র মুখস্থ করে' হবে, অথবা লম্বা-চওড়া নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে হবে? মানুষ বালক-মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ না হ'লে কখনো ভাবে না, যে এইরূপে শাস্ত্র মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের চরিত্র গঠিত অথবা সংশোধিত করতে পারা যায়!

ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষার বিষয়গুলো তাদের দৈনন্দিন ও পারিপার্শ্বিক জীবন থেকেই গ্রহণ করতে হবে। দেখে, ঠেকে ও তুলনা করেই মানুষে শেখে। ছাত্রদের শিক্ষারও এই একই ধারা। একটা কর্ম্ম করবা মাত্র বিদ্যালয়সুদ্ধ লোকে যখন তার উপর খড়্গহস্ত হয়, এবং অপর একটা কর্ম্ম করামাত্র যখন সকলে তার প্রশংসা করে, তখন ছাত্র অতি সহজে ও সত্যভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, ভাল কি, মন্দ কি। যদি বিদ্যালয়ে, ছাত্রের প্রত্যেক সৎকর্ম্মটী পুরস্কৃত হয় এবং প্রতি অসৎ কর্ম্ম অথবা ক্ষতি ও অপচয়ের জন্য যদি তাকে দণ্ডভোগ অথবা ক্ষতিপূরণ করতে হয়, তা হলে ছাত্র আপন অভিজ্ঞতা থেকে, বিনা-শিক্ষক-সহায়েই বুঝতে পারে, ভাল পথে চলায় লাভ কি, এবং মন্দ পথে চলায় ক্ষতি কি, এবং সকলের মধ্যে থাকতে হলে কিরূপে আপনাকে সংযত করা আবশ্যক তা'ও তার বুঝতে বিলম্ব হয় না। বিদ্যালয়টা এই রকম ভাবে চালাতে হবে যা'তে ছাত্র আপনা হতেই বুঝতে পারে যে পরিশ্রমী হলে, মিতব্যয়ী হলে, সংযত ও সত্যবাদী হলে বাইরে তার যেমন লাভ, অন্তরেও তার তেমনি সুখ। শিক্ষকের তারপর কাজ, ছাত্র এইরূপে আপনা হতে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছে, সেগুলিকে আরও ভাল করে' হৃদয়ে "আলোচনা"চ্ছলে বেঁধে দেওয়া।

নৈতিক শিক্ষা তখনই সমাপ্ত হবে যখন ছাত্র স্বভাব-বশতঃই 'ভাল' করবে এবং 'মন্দকে' ত্যাগ করবে। যখন এরূপ হবে তখন বলা যেতে পারে ছাত্রের চরিত্র গঠিত হয়েছে। "আমি এত প্রলোভনের সঙ্গে বহুকাল যুদ্ধ করে আত্মরক্ষা করে এসেছি"—লোকে ঔপন্যাসিক পুরুষদের মত এই বলে গর্ব্ব করে। কিন্তু যদি প্রলোভনে সে একেবারে না পড়ত তাহলে বোধ হয় তার আরও ভাল হত। তাই নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, ছেলেদের এমনি করে' তৈয়ার করা, যাতে তারা প্রলোভনে পড়ে শেষে উদ্ধার হতে পারে,—পরন্তু নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছেলেদের চরিত্রে এমন করে' গঠিত করা, যাতে তারা কখনও একেবারে প্রলোভনে না পড়ে বা পড়ার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত না থাকে। রিপুর সহিত যুদ্ধ করবার শক্তি লাভ নৈতিক সাধনার উদ্দেশ্য নয়, রিপুকে চিরতরে বশে আনাই নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথম—আত্ম-দমন শক্তিলাভ। দ্বিতীয়—কর্ত্তব্যের প্রতি অচল নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই নিষ্ঠা ও আত্মদমন (সংযম), স্বাভাবিক বা সংস্কারগত হওয়া দরকার। যে মানুষ ঘটনার সম্মুখে পড়ে ভাবে কি করবে, তার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য উভয় পথে যাওয়াই সমভাবে সম্ভব। এমন কি অর্ব্বাচীন যুগে পাপের প্রাবল্য-হেতু এইরূপ ব্যক্তির মন্দ পথে গমনই অধিকতর সম্ভব। যে মানুষ কর্ত্তব্যের জন্য বহুবার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে নাই, তার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার প্রতি কখনও নির্ভর করা যায় না।

আত্মদমন ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এই গুণ অর্জ্জন করানোকে ইংরাজেরা শিক্ষাসাধনার একমাত্র লক্ষ্য বলে' নির্দ্দেশ করেছেন, এবং সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এঁর এই লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। ইংরাজ শিক্ষকরা কেবল খোঁজেন কেমন করে' ছেলে আপনা আপনি ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করতে শিখবে, কেমন করে' আপনার কর্ত্তব্য আপনি বেছে নিতে পারবে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষকদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, ছাত্র তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করুক, আর তাঁরা তাকে যন্ত্রবৎ

যদৃচ্ছা পরিচালিত করুন।* কিন্তু যদি কখনও কেহ এক বয়সের একজন ফরাসী ও একজন ইংরাজ বালককে একই বিপদ-মুখে কর্ম্ম করতে দেখে থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, ইংরাজ বালক কেমন নিশ্চিন্তভাবে যথাকর্ত্তব্য করে এবং ফরাসী বালক ইতস্ততঃ করতে করতে ভাবে, "হায় গুরুদেব, তুমি এখন কোথায়?" এই একটা দৃষ্টান্ত থেকেই দুটী দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির ভাল-মন্দ বিচার করা যেতে পারে। গুরুদেবের পক্ষে যখন সারাজীবন যন্ত্রীর মত ছাত্র-ছাত্রীর পশ্চাতে ফিরে তাদের সুনিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব, তখন ছাত্র-ছাত্রীর চরিত্রটা আপন-পায়ে ভর দিয়ে ঠিক পথে চলবার মত গঠিত করে' দেবার দিকেই তাঁর সমস্ত লক্ষ্যটা দেওয়া উচিত। তিনিই প্রকৃত গুরু যিনি চান না ছাত্রের আজীবন আত্মসমর্পণ—কিন্তু যিনি শিষ্যকে যত শীঘ্র পারেন আত্মপ্রতিষ্ঠ করে তুলতে।

নৈতিক শিক্ষার একটা মস্ত বড় সহায়—সঙ্গ। পারিপার্শ্বিক কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার ও suggestion বালকের নৈতিক শিক্ষা-কালে ভয়ানক বাধা বা সহায় হয়। বালক-বালিকারা স্বভাবতঃই অত্যন্ত অনুকরণ-প্রিয়। সঙ্গের মানুষেরা যেমন করে' চলে, তেমনি করে' আপনা হতেই ছাত্ররা আপন জীবনের চলা-ফেরার আইন (অবচেতনার ভিতর দিয়েই) প্রস্তুত করে' নেয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাদের হৃদয়ে একটা আদর্শ গড়ে ওঠে। "চোরের সঙ্গে চোর, এবং সাধের সঙ্গে সাধ" এটা আমাদের দেশের একটা অতিপ্রাচীন এবং জ্ঞানগর্ভ প্রবাদ। ছেলেরা তার চারধারের লোকে (বিশেষতঃ সে যাদের ভক্তি করে, ভয় করে বা ভালবাসে তারা) যা পছন্দ করে, তারাও তাই ভালবাসে—সকলে যাকে খারাপ বলে, তারাও তাকে ঘৃণা করে। একবার যদি ছাত্র এই suggestionগুলো হৃদয় পেতে নেয়, তাহলে অতি অল্পকাল মধ্যে সেগুলো সংস্কারে পরিণত হয় এবং পরিশেষে এই সংস্কার তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই কারণেই শিক্ষক ও পিতামাতার চরিত্র ছাত্রের জীবনে প্রায়ই হুবহু গ্রথিত হয়ে যেতে দেখা যায়। শিক্ষক ও পিতামাতার প্রতি কর্ম্ম ও ভাব-ভঙ্গী পর্য্যন্ত সুসংযত হওয়া তাই একান্ত দরকার।

প্রবর্ত্তক, অগ্রহায়ণ ১৩২৯। শ্রীহারাধন বক্সী।

* মঃ দেব্রেক্ লিখেছেন—"ইংরাজ বালকদের অতি অল্প বয়স হতে লেখাপড়া ক্রীড়া কৌতুক ও ভ্রমণাদিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তারা কখনও এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে তাহলে তাদের কড়ায়-গণ্ডায় সেই কর্ম্মের ফলাফল গ্রহণ করতে হয়। এইরূপে তাদের আত্মদমন শক্তি ও দায়িত্ব-জ্ঞান ফুটে ওঠে।"

আমাদের দেশের লোকেরা সাধারণতঃ পরনির্ভরশীল। এই দেশের ছেলেদের একেবারে হঠাৎ সর্ব্ব-স্বাধীনতা দিলে, পড়াশুনা ও চরিত্রের ক্ষতি হবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এদেরও সর্ব্বস্বাধীনতা দান করে' আত্মনির্ভরশীল করে' তুলতে হবে। পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা আসে না। তাই গোড়া থেকে ছাত্রদের কোন কোন বিষয়ে অন্ততঃ স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। সেজন্য আমাদের দেশের শিক্ষকদের সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার, স্বাধীন ও আত্মপ্রতিষ্ঠ মানুষ তৈয়ার করাই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। কারণ উপর-স্থিত ব্যক্তির কথা শোনা, অর্থাৎ বাধ্যতা যেমন সামাজিক জীবনে একান্ত দরকার, তার চাইতে বেশী দরকার, উপর-স্থিত ব্যক্তির অভাবেও যাতে মানুষ চলতে পারে, এরূপ চরিত্র গঠন। এটা তখনই সম্ভব হয় যখন উপরওলা বা শাস্ত্রটা অন্তরে গিয়ে দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার হয়ে বসে। তখন আর শাস্ত্র বা গুরুর দরকার করে না। ইতি—

অনুবাদক

---

## ঐতিহাসিক ভীমসেন

সম্রাট আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালের (১৬৫৭—১৭০৭ খৃঃ) একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস আছে, তাহা মুহম্মদ সাকী মুস্তাদ খাঁর লেখা। সম্রাটের মৃত্যুর মাত্র তিন বৎসর পরে সরকারী কাগজ-পত্র ও নিজের স্মৃতির সাহায্যে মুস্তাদ খাঁ এখানি লেখেন। ঘটনার পরম্পরা, কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন ও শাসনের নিয়মাবলী, লোক ও যায়গার নাম ও তারিখ প্রভৃতির হিসাবে বইখানি অমূল্য। কিন্তু বইখানি খুব ছোট, প্রতি বৎসরের ইতিহাস মাত্র দশ পৃষ্ঠার মধ্যেই শেষ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রতি পরিচ্ছেদ এখনকার সরকারী গেজেটের মত কর্ম্মচারী বিনিয়োগ ও পরিবর্ত্তনের তালিকা ও ঘটনার চুম্বকে পূর্ণ। কি করিয়া এবং কেন ঐ সকল ঘটনা ঘটিল, তখনকার দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোনও পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায় না।

এই সব বিষয়ে ভীমসেনের লেখা বিবরণ নুসখা-ই-দিলকশা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, বিলাতের ব্রিটিস্ মিউজিয়মে একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি আছে। ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথিখানি তেমন নির্ভুল নয় এবং এই অসম্পূর্ণ বইখানি গোলকুণ্ডা বিজয়ের (১৬৮৭ খৃঃ) ইতিহাস দিয়া হঠাৎ থামিয়াছে। প্যারীর জাতীয় পুস্তকালয়ের (Bibliotheque Nationale) তেই একখানি সম্পূর্ণ নির্ভুল পুঁথি আছে, আর কোনও হস্তলিখিত গ্রন্থের সন্ধান জানা যায় নাই। জোনাথন স্কটের ইংরাজী দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে (১৭৯৪ খৃঃ) ইহার একটী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। কিন্তু অনুবাদটী বহু ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ।

ভীমসেনের পিতার নাম রঘুনন্দন দাস। রঘুনন্দন দাসেরা ছিলেন ছ' ভাই। অন্যান্য ভাইদের নাম ছিল ভগবান দাস, শ্যামদাস, গোকুল-দাস, হরিদাস ও ধর্ম্মদাস। জাতিতে ইঁহারা শাক্সেনা শ্রেণীস্থ কায়স্থ ছিলেন। ভগবান দাস তখনকার দিনের হিন্দুদের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ-সম্ভব

চাকুরী পাইয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মুঘল রাজস্বের দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং ১৬৫৭ খৃঃ 'দিয়ানৎরায়' এই উপাধি পান। ভ্রাতৃ-বিরোধের সময়ে দিল্লীশ্বর ও সিংহাসন লাভ পর্য্যন্ত তিনি আওরংজীবের সঙ্গে ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন ( ১৬৬৪ খৃঃ ) পর্য্যন্ত দিল্লীতে সম্রাট-সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁর আশা ছিল আওরংজীব তাঁকে সাম্রাজ্যের প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন ; কিন্তু ১৬৫৮ খৃঃ জুন মাসে যখন আওরংজীব পিতাকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করিলেন, তখন সম্রাট শাহ্‌জহানের সহকারী দেওয়ান রায়-ই-রায়ান রঘুনাথ রায় ( ইনি সহকারী হইলেও প্রধান দেওয়ানের একৃটিনি কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন ) শাহ্‌জহানের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই বিশ্বাস-ঘাতকতার পুরস্কার-স্বরূপ রঘুনাথ রায়কে প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত করা হইল, যদিও তাঁকে ঐ পদের উপাধি দেওয়া হইল না। দিয়ানৎ-রায়ের উচ্চাশা নির্ম্মূল হইল।

রঘুনন্দন দাক্ষিণাত্যের গোলন্দাজ বিভাগের মুশরিফ ( হিসাব লেখক ) ছিলেন। শেষ জীবন সুখ শান্তিতে কাটাইবার জন্য ১৬৭০ খৃ ইনি সরকারী কাজ ছাড়িয়া দেন। ১৬৭৪ খৃঃ তিনি আওরঙ্গাবাদে মারা যান।

১৭০৫ সম্বৎ ( ১৬৪৯ খৃঃ ) এ তাপ্তি নদীতীরস্থ খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুরে ভীমসেন জন্ম গ্রহণ করেন। আট বৎসর বয়সে তিনি বুরহানপুর ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট আওরঙ্গাবাদে আসেন। সেই বৎসর ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটী বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। তখন পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য সম্রাট পুত্রদের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছিল। এই সংগ্রামের যে সকল সংবাদ ও গুজব সুদূর আওরঙ্গাবাদে পৌঁছিত তাহার একটা স্পষ্ট স্মৃতি ভীমসেনের মনে জাগরূক ছিল। দশ বৎসর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে নাসিকের গিরিগুহা ও ত্র্যম্বক দুর্গ দেখিয়া আসেন। দিল্লীতে দিয়ানৎ রায়ের ( ১৬৬৪ খৃঃ ) মৃত্যুতে পরিবারের সকলের উচ্চ রাজপদ পাইবার আশা লোপ পাইল। দিয়ানৎ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগরামকে সম্রাট হাতীশালার মুশরিফ নিযুক্ত করিলেন। হাতীশালার মুশরিফ কোনও বড় চাকুরী নয়। কিন্তু এই চাকুরীও তিনি বেশী দিন করিতে পারিলেন না, কএক বৎসর পরেই তিনি মারা যান। তারপর দিয়ানৎ রায়ের অপর পুত্র সুখরাজ রাজকীয় 'পানীয়' ও তাম্বূল বিভাগের মুশরিফ নিযুক্ত হন।

আওরঙ্গাবাদে থাকা কালীন ( ৯—১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ) ভীমসেন পিতার নিকট ফার্শী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। তারপর সাত বৎসর পিতার প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন। রঘুনন্দন বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, সব সময় রাজসভায় ও গোলন্দাজ বিভাগের কার্য্যে যাইতে পারিতেন না। সেইজন্য সম্রাট যদি শোনেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে মাত্র ২১ বৎসর বয়স্ক তাঁহার পুত্র কার্য্য পরিচালনা করিতেছে, তাহা হইলে সম্রাটের রোষে পড়িতে হইবে, এই আশঙ্কায় ১৬৭০ খৃঃ তিনি কার্য্যে ইস্তফা দেন।

ভীমসেনকে এইবার কাজের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। অনেক মুরুব্বিকে তিনি ধরিলেন, কিন্তু কোন কাজই হইল না, অবশেষে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ দাউদ খাঁর অধীনে যুদ্ধাশ্ব পরীক্ষা ও দাগানের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁর ঠিক উপরিতন কর্ম্মচারী ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষের বখ্‌শী আব্দুল মামুদ। এই কার্য্য প্রাপ্তির জন্য ঘুষ দিতে ও কার্য্যের উপযুক্ত সম্মান বজায় রাখিবার জন্য সাজ-সরঞ্জাম কিনিতে ও লোকজন রাখিতে তাঁহার বহু ঋণ হইল। তিনি দাউদ খাঁর সহিত দেখা করিতে জুন্নারে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে জুন্নারে যাইতে হইল না, পথেই দাউদ খাঁর সহিত দেখা হয়। দাউদ খাঁর সঙ্গে আওরঙ্গাবাদে যুবরাজ মুয়াজ্জমের দরবারে ফিরিলেন। মুয়াজ্জম তখন দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা। এই সময় মুয়াজ্জমের সঙ্গে সৈন্যাধ্যক্ষ দিলির খাঁর ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত হইল। দাউদ খাঁ দিলির খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিলেন সুতরাং যুদ্ধ স্থগিত হইল, ভীমসেনের চাকুরী গেল। কিন্তু মহারাজ যশোবন্ত সিংহ অনুগ্রহ করিয়া একটা চাকুরী দিলেন। মহারাজের সঙ্গে ভীমসেন তাপ্তির দিকে দিলির খাঁকে ধরিবার উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। এই সুযোগে ভীমসেন জন্মভূমি বুরহানপুর দেখিলেন। ১৬৭০ খৃঃ তাঁরা আওরঙ্গাবাদে ফিরিয়া আসেন।

এই সময় শিবাজী সুরাট দ্বিতীয়বার লুঠ করিয়া ফিরিতেছিলেন। কুমার দাউদ খাঁকে শিবাজীকে ধরিতে পাঠাইলেন। পূর্ব্ব চাকুরীর সহিত বখ্‌শীর কেরাণীগিরি চাকুরী এবার ভীমসেনের জুটিল। ভীমসেন দাউদ খাঁর সহিত রণক্ষেত্রে ছুটিলেন। বানীদিন্দোরীর যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে মুঘলবাহিনী শিবাজীর নিকট পরাজিত হইয়াছিল। তারপর ভীমসেন দাউদখাঁর সৈন্য-সামন্তের সহিত নাসিক ও আহ্‌মদনগরে যান।

চান্দোর পর্ব্বত শ্রেণীস্থ ধোড়প দুর্গে মারাঠারা তখন ভারী উৎপাত লাগাইয়াছিল। মারাঠাদের উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য দাউদখাঁ আনকাই টঙ্কাইএ গমন করিলেন। তারপর সালের দুর্গ অবরোধের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য বগলনায় যান। এই যাত্রায় ভীমসেন সৈন্যসামন্ত সঙ্গ ছাড়া হইয়া পড়িয়া ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হন, কিন্তু নুরখাঁ নামক মারাঠা সৈন্যদলের একজন বেতনভুক কর্ম্মচারী তাঁহাকে রক্ষা করেন। নুরখাঁ আওরঙ্গাবাদে থাকা কালীন ভীমসেনের পিতার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু দাউদ খাঁ ঠিক সময় আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। শিবাজী সালের দুর্গ দখল করিয়া লইলেন। দাউদখাঁ তবুও চান্দোরের নিকট যুদ্ধ করিয়া অতি কষ্টে অহিবন্ত দুর্গ অধিকার করেন।

এই সময় সম্রাটের নিকট হইতে একখানা চিঠি আসিল। [illegible]

সম্রাট কুমারের অনুরোধে ভীমসেনকে যুদ্ধাশ্ব পরীক্ষা ও দাগানের কার্য্য দিতে হুকুম দিয়াছিলেন। যশোবন্ত সিংহ ভীমসেনকে চাকুরী দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাতেই কুমার সম্রাটকে এই অনুরোধ করেন। কিন্তু তখন দাক্ষিণাত্যে নূতন সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবত খাঁ আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ হিন্দু মোসাহেবদের প্ররোচনায় দারার দেওয়ানের পুত্র বৃন্দাবনকে এই কাজ দেন। মুখের গ্রাস এইরূপে অপরে কাড়িয়া লইল। ভীমসেন বহুদিন কোনও কাজ না পাইয়া অতি দুঃখে কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁর অবস্থাপন্ন উচ্চপদস্থ বন্ধুরা তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিল।

কিছুদিন পর বাহাদুর খাঁ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন ( ১৬৭২ খৃঃ )। তিনি ভীমসেনকে এই চাকুরী দেন।

১৬৭২ খৃঃ নবেম্বর মাসে মারাঠা রামগীর ( হায়দ্রাবাদের ১১০ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ) লুঠ করে। এই সময় ভীমসেনের সহিত একজন দরবেশের সাক্ষাৎ হয় ও ভারী কৌতূহলোদ্দীপক এক ঘটনা ঘটে। পরের দুই বৎসর ভীমসেন বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখে কালাতিপাত করেন। এত সমারোহে তিনি থাকিতেন যে, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, অত সমারোহে বড় বড় ওমরাহগণও থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। এই সময়ে তাঁহার অনেক আত্মীয় মারা যান, খুল্লতাত গোকুলদাস, ভ্রাতা শীতলদাস, পিতা রঘুনন্দন এবং পরে হররায় ও হররায়ের পিতা শ্যামদাস একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বহুদিন ধরিয়া ভীমসেন নিঃসন্তান ছিলেন। সেইজন্য ভ্রাতা শীতলদাসের এক পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ছেলেটী ১৬৭১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করে। দৈবজ্ঞেরা ছেলেটীর নাম উমীচাঁদ রাখেন, কিন্তু ভীমসেন রাখেন ব্রজভূষণ। ১৬৭৮ খৃঃ ছেলেটীর বিবাহ হয়।

১৬৮৬ খৃঃ পরিশ্রান্ত হইয়া ভীমসেন গোমস্তাদের উপর কাজের ভার দিয়া নিরিবিলিতে থাকিবার জন্য নলদুর্গে অবস্থান করেন। নলদুর্গ সোলাপুরের ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে। এইখানে ১৬৮৮ খৃঃ তাঁর এক পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এই পুত্রের নাম শম্ভুনাথ। এই পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিলেও তিনি ব্রজভূষণকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায়ই দেখিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পর ভীমসেন নলদুর্গ ত্যাগ করিয়া সোলাপুরে আসিয়া মুঘলবাহিনীর সহিত যোগ দেন। এইখানে তিনি আওরংজীবের অপর এক সেনাপতি, দাতিয়ার বুন্দেলা রাজা দলপৎ রাওএর নিজ কার্য্য-কারক নিযুক্ত হন। বুন্দেলখণ্ডে ১২,০০০ হাজার টাকা আয়ের জায়গীর মাহিয়ানা স্বরূপ তাঁকে দেওয়া হয়। দলপৎ রাও ইহার পর ১৮ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। সে অবধি ভীমসেন দলপতের সংশ্রব ত্যাগ করেন নাই।

দলপৎ রাও বাদশার উজীর আসদ খাঁর পুত্র জুলফকর খাঁ বাহাদুর নসরৎ জঙ্গের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৬৯১ খৃঃ দক্ষিণ আরকট জেলায় জিঞ্জি দুর্গ পর্য্যন্ত ... আসিয়া ভীমসেনকে দলপৎ রাওএর

সহিত যাইতে হইয়াছিল। মুঘলবাহিনীকে এই দুর্গ অবরোধ কিছু-দিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হয়, এই সুযোগে দলপৎ ভীমসেনকে সঙ্গে করিয়া বিখ্যাত ইয়োরোপীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইবার জন্য প্রথম বন্দীবাসে এবং পরে মাদ্রাজে যান। রাওএর অসুখ ভাল হইল না কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল।

দলপৎরাওএর কার্য্যোপলক্ষে ভীমসেনকে ব্রহ্মপুরীতে বাদশাহী শিবিরে আসিতে হইল। ব্রহ্মপুরী ভীমানদীর তীরে এবং পংঢারপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এই কাজ শেষ করিয়া তিনি জিঞ্জিতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু জিঞ্জিতে বেশীদিন থাকা হইল না ; পুত্র শম্ভুনাথের বিবাহোপলক্ষে নলদুর্গে ফিরিতে হইল। বিবাহ হায়দ্রাবাদে সম্পন্ন হয়। ইহার কএকদিন পরেই দলপৎরাওএর আর একটী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে আগ্রায় যাইতে হইল। আগ্রা হইতে ফিরিয়া পুনরায় তিনি নলদুর্গে আসেন। জিঞ্জির পতনের পর ( ১৬৯৮ খৃঃ ) দলপৎরাও নলদুর্গে আসেন। ভীমসেন এইখানে প্রভুর সহিত মিলিত হন। এই আট বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীমসেন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক বিখ্যাত তীর্থ ও মন্দির দর্শন করেন। তিনি এই সব স্থানের সংক্ষিপ্ত মূল্যবান বর্ণনা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

১৬৯৮ খৃঃ মাঝামাঝি সময়ে পন্হালা দুর্গ অবরোধের জন্য একদল মুঘলবাহিনী প্রেরিত হয়। এই দুর্গ কোলাপুরের দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। দুর্গ অবরুদ্ধ, হাতেও কোন কাজ নাই, ভীমসেন কি করিয়া সময় কাটাইবেন ? এই দুর্গ-পাদমূলে শিবিরে বসিয়া তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসখানি লিখিতে সুরু করেন। আওরংজীবের দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধের ফলে দাক্ষিণাত্য জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। চারিদিকেই দুর্ভিক্ষ—শাসন সংরক্ষণলোপ পাইয়াছিল বলিলেই চলে। এই ভীষণ অরাজকতার মধ্যে বাস করা কোন ক্রমেই নিরাপদ নহে। সুতরাং ভীমসেন পরিবার পরিজন সকলকে নলদুর্গ হইতে প্রথমে আওরঙ্গাবাদে ও পরে দলপৎ রাওএর রাজধানী দাতিয়ায় পাঠাইয়া দেন। (১৭০৬ খৃঃ)

পর বৎসর সম্রাটের মৃত্যু হয়। তাঁহার তৃতীয় পুত্র আজম দাক্ষিণাত্যে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকারে রওনা হন। আগ্রা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে জাজাউতে আজম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম বাহাদুর শাহের নিকট পরাজিত ও হত হইলেন। জাজাউএর যুদ্ধক্ষেত্রে একটা গোলা আসিয়া দলপৎরাওকে উড়াইয়া লইল, ভীমসেনের হাতও আহত করিল। ভীমসেন প্রভু দলপৎ রাওএর সহিত একই হস্তীপৃষ্ঠে ছিলেন। আহত হইয়াও অত যন্ত্রণার মধ্যেও ভীমসেন প্রভুর শেষ কার্য্য করিতে বিরত হন নাই। আগ্রা হইতে ১৬ মাইল দূরে ধামসীতে দলপৎরাওএর দেহ সৎকার করিয়া, উন্নতির সমস্ত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, দাতিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। ভীমসেনের দুরবস্থা আরও বাড়িল। দলপৎরাওএর দুই

পুত্রের মধ্যে গদী লইয়া যুদ্ধ বাধিল। ভীমসেন বিপদ বুঝিয়া ও বিরক্ত হইয়া সপরিবারে দাতিয়া ত্যাগ করিয়া গোয়ালিয়রে চলিয়া আসিলেন। ভীমসেন দলপৎ রাওএর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, দলপৎ আজম শাহের দরবারে এক অতিশয় প্রতিপত্তিশালী সেনানী ছিলেন; সেইজন্য আজম শাহ ভীমসেনকে প'াচশ' মনসবদারীর পদ দেন। এবং জাজাউর যুদ্ধক্ষেত্রে আজম নিহত না হইলে হয়ত ভীমসেনের আরও উন্নতি হইতে পারিত।

দাতিয়া হইতে চলিয়া আসিয়া ভীমসেন ভয়ানক বিপদে পড়িলেন। উপার্জ্জনের কোনও উপায় নাই—সংসার চলে কি করিয়া? প্রথম বাহাদুর শাহের অধীনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোন চাকুরী সুবিধা করিতে পারিলেন না। তবে রায়-ই-রায়াণ গুজর মলের সাহায্যে খুজিস্তা আখ্‌তর-জহান-শাহের অধীনে দুই পুত্র ব্রজভূষণ ও শম্ভুনাথের জন্য সাধারণ কেরাণীগিরি যোগাড় করিতে পারিলেন। তিনি নিজে গোয়ালিয়রে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মে কর্ম্মে জীবন কাটাইতে সঙ্কল্প করিলেন। এর পরের আর কোনও সংবাদ, এমন কি তাঁহার মৃত্যুর কোন খবরও জানা যায় না।

ভীমসেনের বইখানি দুই কারণে মূল্যবান। প্রথমতঃ তিনি স্বচক্ষে এই সব ঘটনা দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে তাঁহার এই সব দেখিবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল, মুঘলবাহিনীর কেরাণী থাকায় এবং কএকজন বড় সৈন্যাধ্যক্ষ্যের সহিত মেলামেশার ফলে সরকার সংক্রান্ত অনেক গুপ্ত খবরেরও সঠিক বৃত্তান্ত ও কাগজ পত্র দেখিবার সুযোগ তাঁর ঘটিয়াছিল। তা ছাড়া তাঁহার ইতিহাসখানি সম্রাটের জন্য ও সম্রাটের তত্ত্বাবধানে রচিত হয় নাই। সেইজন্য সম্রাটের কিম্বা সম্রাটের সভাসদগণের দোষগুণ ঢাকিয়া লেখা হয় নাই। মুঘল সম্রাটদের অন্যান্য ইতিহাসের যে সর্ব্ব প্রধান দোষ আছে, তাঁহার বইখানি সে দোষ শূন্য। ভীমসেন সত্য অবগত ছিলেন এবং বলিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। ঐতিহাসিক বহু ব্যক্তির তিনি সঠিক পরিচয় দিয়াছেন এবং দোষ দেখাইতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। তারপর তিনি হিন্দু ছিলেন, প্রকৃতিও অনেকটা চিন্তাশীল ছিল; সেই জন্য আওরংজীবের রাজত্বের ঘটনাবলীর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ-নির্ণয়ে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের মুঘল যুদ্ধ সম্বন্ধে, বলিতে গেলে, তাঁর প্রদত্ত বর্ণনাই একমাত্র সঠিক চাক্ষুশ বর্ণনা।

আজকালকার ঢক্কানিনাদী বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যে সকল কথা লিখিতে দ্বিধা বোধ করেন—যেমন সমসাময়িক লোকের আমোদ-প্রমোদ, রাস্তাঘাটের অবস্থা, সরকারী কর্ম্মচারীদের জীবন-যাপন-প্রণালী—এই সব তিনি লিখিয়া ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের ১৭শ শতাব্দীর ইতিহাস হিসাবে তাঁহার বইখানি মহামূল্যবান।

তাঁহার এই জীবন-স্মৃতি পড়িলেই তিনি যে কি চরিত্রের লোক ছিলেন তাহা বোঝা যায়। তাঁর দুর্ব্বলতা, প্রভুভক্তি, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী পুত্রগণের প্রতি মমতা বোধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি গভীর আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি খুব আমোদ ভালবাসিতেন, কিন্তু দুঃখে অতিশয় ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেন। তিনি ছিলেন অতিশয় সরল, অনাড়ম্বর-প্রিয় কোমল প্রকৃতির লোক। তাঁর লেখার মধ্যেও কোনরূপ ঘোর-প্যাঁচ নাই—সব কথা সরল সুন্দর ভাবে লেখা। ফার্সী লেখকদের এইটীরই প্রধান অভাব। যদি লেখা দেখিয়া লোককে বুঝিতে হয় তবে এই সরল অনাড়ম্বর প্রকৃতি লেখক যে কি প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতে পারে।

প্রভাতী, পৌষ, ১৩২৯। শ্রীযদুনাথ সরকার।

---

# বাণী-বিদায়

এবার হলো না, সখি, প্রাণ ভ'রে গান-গাওয়া—
দিন-ভোর মেঘল-আলোকে,
বুকে লাগে বার-বার বাদলের ভিজা-হাওয়া,
রূপ তোর লাগিল না চোখে!

এ দিবসে নাহি তাপ, শুকাল না পাতায় শিশির,
পথে পথে পঙ্কিল পল্বল,
স্তম্ভিত-বর্ষণ মেঘে দিকে দিকে ঘনায় তিমির,
দিবা-দেহে নিশার বল্কল!

তোমার ও রূপসুধা পান করি যতবার—

তোমার ও নীলাম্বরী—মুক্তাবলী মেখলার—
তারা যেন নিশীথ-আকাশে!

মর্ত্ত্য-পারিজাত ওই দু' অধর শোণিত-বরণ,
কামনার মৃত-সঞ্জীবনী,
নিবিড় চুম্বন যার মুমূর্ষুর সূচিকাভরণ,
নেচে ওঠে সকল ধমনী—

তা'ও আজ ম্লান, সখি, নাহি তায় জ্বালা উন্মাদন,
এ হৃদয়—মধুখ-বর্ত্তিকা—
গলিল না, জ্বলিল না প্রাণবক্ষে সম্বৃত-ইন্ধন,

কোথা বর্ণ, কোথা আলো, কোথা তোর ফুল্ল তনু
পরশ-হরষ-মোহকর ?
ইন্দ্রনীল-ইন্দীবরে মদনের ফুলধনু-
আরোপিত কটাক্ষ সুন্দর ?
নখমণি-বিখচিত—হেম-পাত্রে সুরা হেন—
করপুটে আরক্তিম ছায়া—
উরসের অগ্নিগিরি তুষারমণ্ডিত যেন ?
কামনার কল্পতরু কায়া—
যে-রূপ নেহারি আমি রৌদ্রদীপ্ত নীলাম্বরে
ফুকারিব সৃজনের গান,
সর্ব্বদেহে সঞ্চরিবে আদিম আহ্লাদভরে
বিধাতার প্রয়াস মহান্ !
ছায়া যত কায়া হ'য়ে বিহরিবে ধরণীতে,
—চেতনার পূর্ণ অবতার,
মানস-নিখিলে কোথা' অনালোক সরণিতে
করিবে না বিদেহ-বিহার।
স্পর্শে দর্শে শ্রুতিহর্ষে হাস্য-অশ্রু-বেপথাকুল,
জীবনে জীবন্ত পরিচয়—
কোথা সেই আত্মাসৃষ্টি ব্রহ্ম-স্বপ্ন-সমতুল,
দ্রষ্টা যার ঋষিঋভুচয় ?

সেই রূপ ধ্যান করি' অঙ্গে মোর জাগিল যে
স্ফুরৎ-কদম্ব-শিহরণ !
দেহ হতে দেহান্তরে বাঁধিলাম কি সহজে
প্রীতি-প্রেম-সেতুর বন্ধন !
পাপ-মোহ-লালসার লাল-নীল রশ্মিমালা
বরতনু ঘেরিয়া তোমারি,
লাবণ্যের ইন্দ্রধনু-শোভা ধরে—নাই জ্বালা,
মুগ্ধ হ'নু আনন্দে নেহারি' !
তারপর যতবার হেরিয়াছি, সখি, তোর
নগ্ন-তনু, শুভ্র অশোচন,
মানস-কলঙ্ক-মসী, লোকশিক্ষা সুকঠোর
[illegible] করেছি মোচন !

হৃদয়ে হৃদয় রাখি', ওষ্ঠে শুষি' সব রস,
—কণ্ঠ সিক্ত গীত-রসায়নে,
ও রূপ-দীপক-রাগে দাহ করি' অপযশ
দেহ-দীপ জ্বালানু যতনে।
প্রেম আর পরমায়ু—এর লাগি যত ব্যথা,
মানবের তৃষা চিরন্তন ;
দেবতা-দোসর বীর, তারি পরাজয়-কথা—
সে হৃদয়-সাগর-মন্থন ;
নীলাকাশে উষাসম গরলে অমৃত-রাগ,
মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-কাহিনী—
যুগান্তের নিশিভোরে নিকষে সোনার দাগ
কষি' দিল, হে মনোমোহিনি !

প্রাণভরা সেই গানে লেগেছে হিমেল হাওয়া,
আজি এ দিনান্ত-বরষায়,
নেমেছে অকাল সন্ধ্যা, বৃথা মুখপানে চাওয়া—
ছন্দ নাই, ভাষা না জুয়ায় !
আমার প্রাণের কূলে উদিয়াছে সন্ধ্যাতারা,
মধ্যাহ্নের রবি অস্তমান,
আলোক-বিহীন দিবা হইয়াছে রূপহারা,
তুমি সখি স্বপন-সমান !
নিদ্রাহারা দীর্ঘরাত্রি কেমনে হইব পার
দুস্তর তিমির-তরঙ্গিনী ?
বন-পথে-পথে শিবাদের অশিব চীৎকার,
তৃণদলে ঝিল্লীর শিঞ্জিনী !
কভু বা করিবে নৃত্য শব্দহীন অর্দ্ধরাতে
নিশাচরী বিজন অঙ্গনে,
ঝঙ্কারিবে অলঙ্কার মালিনী কি প্রস্থরাতে,
কঙ্কালের কেয়ূরে কঙ্কণে !
তার মাঝে কোথা তুমি ? হা অভাগ্য পুরোহিত !
কোথা আশা, কোথা সে পিপাসা ?
প্রাণযজ্ঞে দেহ কোথা ? কোথা রক্ত সুলোহিত ?
সঞ্জীবন শক্তি-মন্ত্র-ভাষা !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

# চয়ন

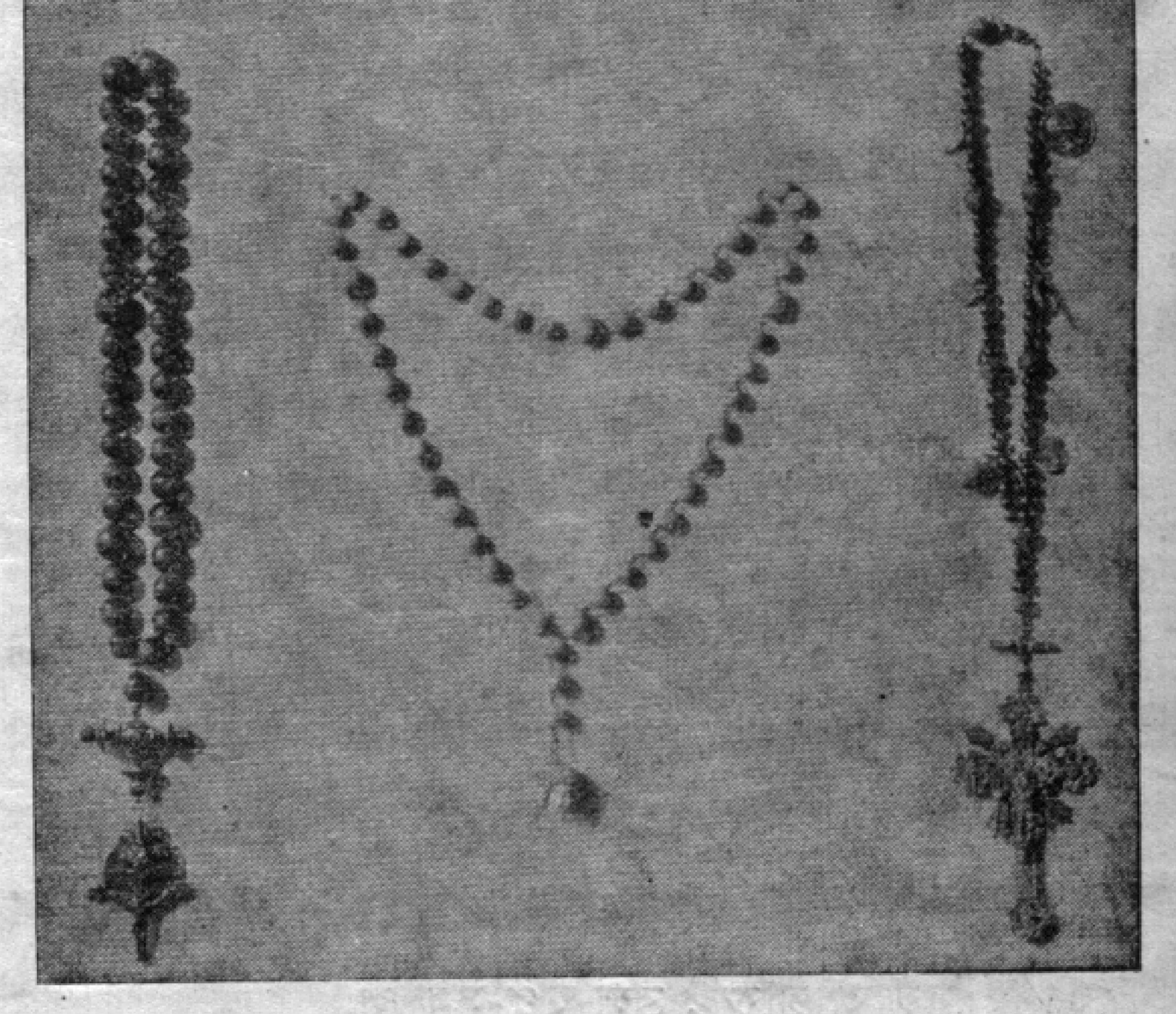
## জপের মালা

মালা জপ , সাধন-ভজনের একটি অঙ্গ। পৃথিবীর প্রায় বারো আনা লোকেই মালা জপ করে। মালা জপায় মনের তন্ময়তা আসে। কেহ কেহ বলেন, মালা জপের প্রথম আমদানী করেন পারস্যের জরুসথ্রীয়েরা ; কিন্তু সে অনুমান ঠিক নয়। কেন না, আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকালে মালা জপের প্রচলন ছিল। ভারতই জপের মালার প্রবর্ত্তক, এ সম্বন্ধে আর মতভেদ থাকিতেই পারে না। কারণ জরুসথ্রীয় ধর্ম্ম বৈদিক কালের বহু পরে প্রচারিত হয়। জরুসথ্রসের আবির্ভাব-কাল অপেক্ষাকৃত আধুনিক, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে।



ভারতের সন্ন্যাসীর মালা

ইংলণ্ডে নিওলিথিক যুগেও মালা জপের প্রচলন ছিল— ড্রুইড পুরোহিতের প্রাধান্যের যুগের ত কথাই নাই। রাজ্ঞী বোডিসিয়ার কাহিনীতে তার পরিচয়ও আমরা পাই! তারপর চসারের Canterbury Talesএ আমরা এই মালা কিসে তৈয়ারা হইত, সে কথাও জানতে পারি।



রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানের মালা

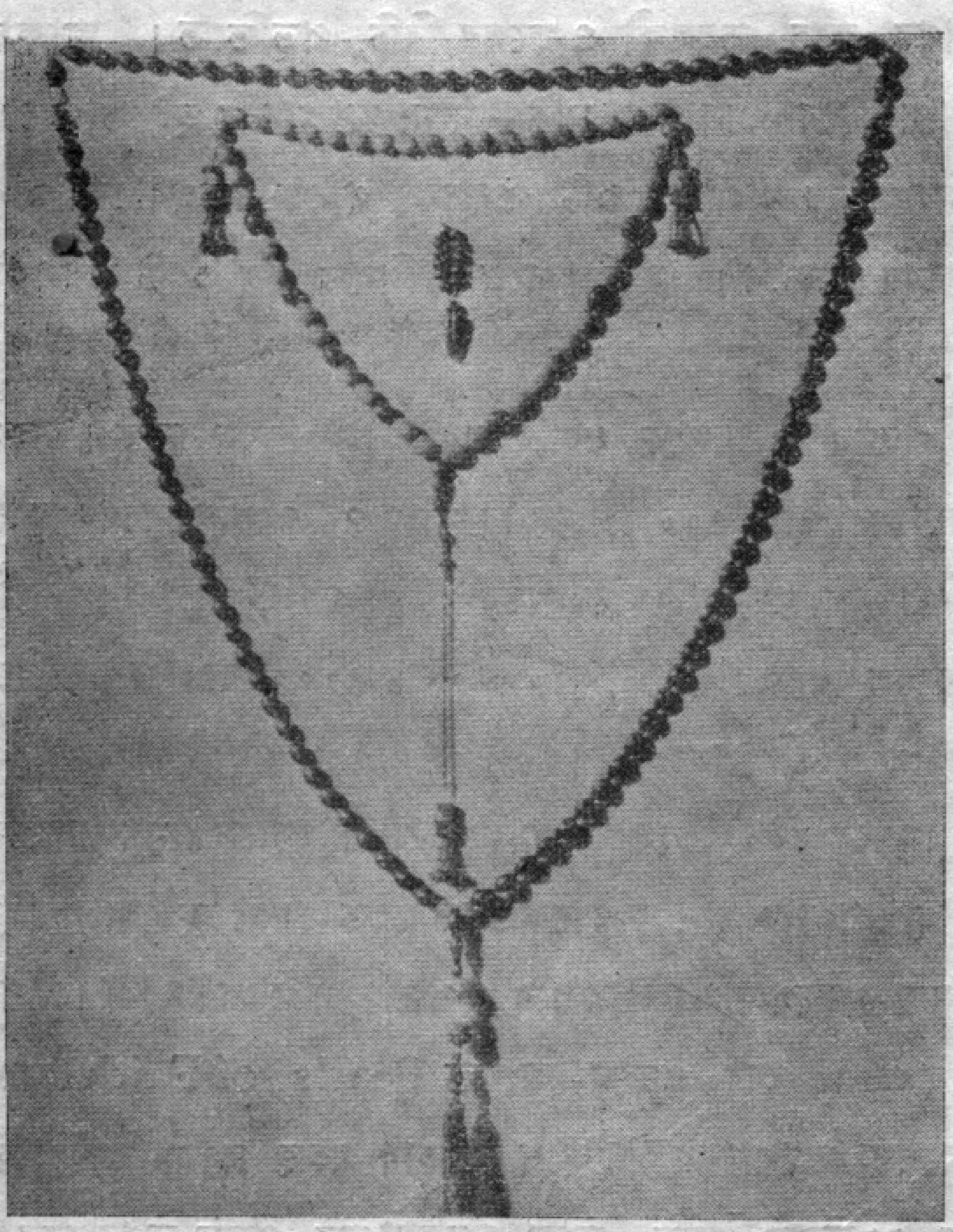
Of small coral aboute hir arme she bore,

A peire of bedes, gauded al with grene,

ইত্যাদি।

তার পর প্রথম এডোয়ার্ডের রাজত্বকালের পূর্ব্বেও একদল সাধু পুরোহিত ছিলেন, যাঁরা যজমানদের কল্যাণার্থে তাহাদের কথামত উপবাস ও মালা জপ করিতেন। ক্রমে এই প্রথার সঙ্গে মালার ব্যবসায়ও রীতিমত জাঁকিয়া ওঠে। এই সব পুরোহিতের নাম ছিল Paternoster ; তাঁহাদের একটা পল্লীই ক্রমে গড়িয়া ওঠে। সে পল্লীর নামে রাস্তা আছে, Paternoster Row—ইহা হইতে প্রাচীন ইংলণ্ডে মালা জপের প্রথার প্রসারের কথা আমরা জানিতে পারি।

ওয়াশিংটনের অধ্যাপক কাসানুইজ্ মালার পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, হিন্দুদের মালার ধরণেই সকল মালার সৃষ্টি হয় ; তবে হিন্দুদের কাছেই যে পৃথিবীর অপর



প্রাচ্য দেশের মুসলমানের মালা

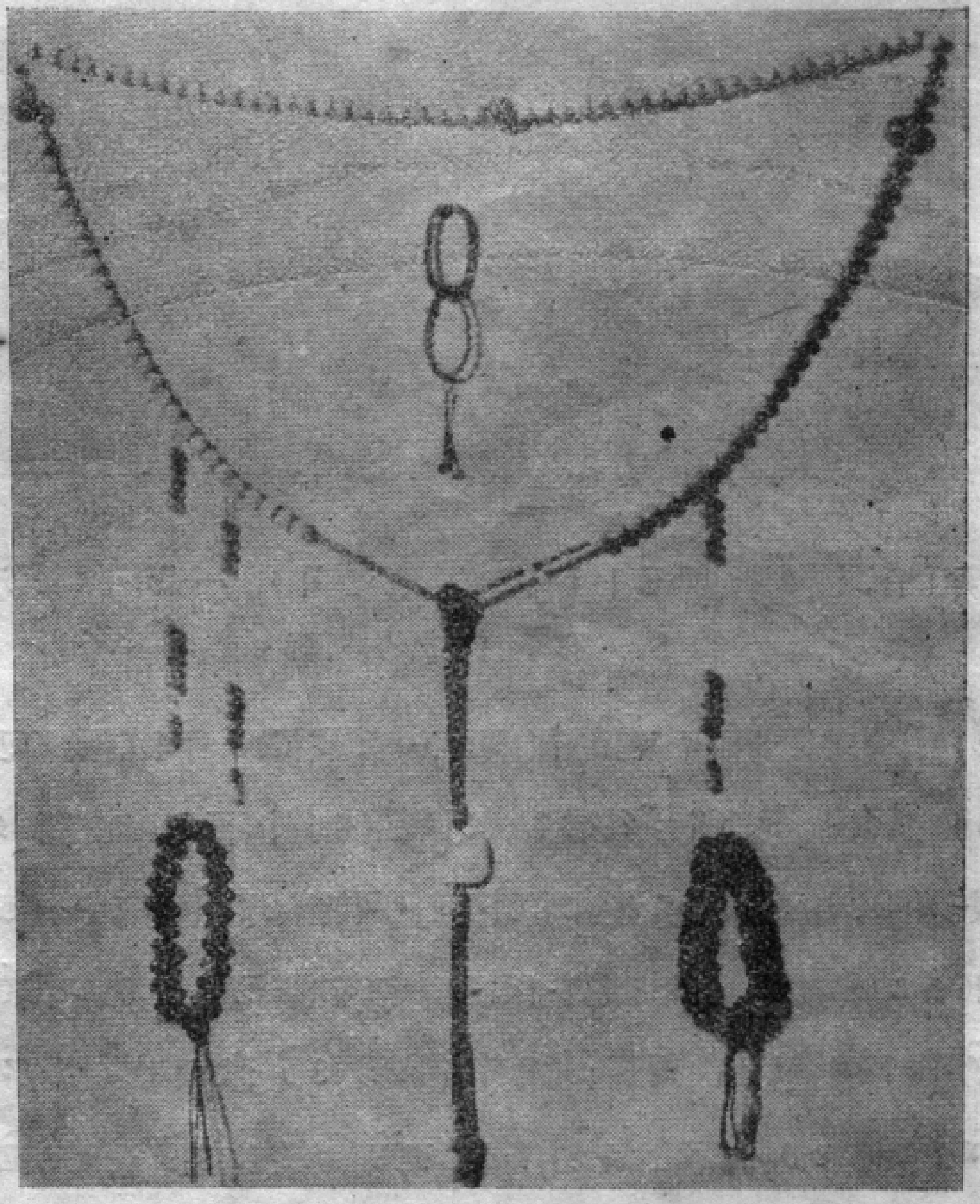
জাতিরা মালার ব্যবহার-প্রবর্ত্তনের জন্য ঋণী, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। ঠাকুর-দেবতার বিগ্রহে মালা দেওয়া হইতেই এ রীতির উদ্ভব। ভারতের কাছ হইতে আরব ও মিশর এই মালার ব্যবহার শেখে।

ভারতের এই মালা জপার প্রথা সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম সকলেই অনুকরণ করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মালার আদর তিব্বত, চীন ও জাপান অবধি প্রসার লাভ করে।

ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমান মালার কদর শেখে—না হয় তো মিশর, প্যালেস্টাইন বা সিরিয়ার কাছে এজন্য তাহারা ঋণী। তার পর প্রাচীন খৃষ্টানেরা মালার প্রথা মানিয়া লয়। ক্রুশেডের সময় তাহারা মালা জপা শেখে, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। আবার কেহ কেহ বলেন, এ প্রথার প্রবর্ত্তনের মূলে অনুকরণ-চেষ্টা নাই; আপনা-আপনিই বিভিন্ন জগতের মাথায় মালার ভাব সাড়া দেয়।

মালার রূপান্তর দেখা যায় কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে। এদেশে জপের মালা দুই রকমের—শৈবের রুদ্রাক্ষ মালা, আর বৈষ্ণবের তুলসী মালা। তার পর শ্রীরামচন্দ্রের উপাসকদলের মধ্যে আটাশগাছি তবলকীর মালাও দেখা যায়। এদেশে মালা কেহ বা গলায় পরে, কেহ হাতে জড়ায়, আবার কেহ বা মাথায় ধারণ করে।

মালার সাহায্যে জপের কাজ অনেকটা কলের ব্যাপারের মত হাল্‌কা হইয়া পড়ে। গণিয়া গণিয়া কতবার মন্ত্র জপা যায়? তাই এই মালার ব্যবস্থা। এটা আরো কলের মত হইয়াছে তিব্বতে। তিব্বতীরা এই মালা সর্ব্বদাই অলঙ্কারের মত ধারণ করে এবং তাছাড়া তাদের সঙ্গে থাকে জপের চক্র। অনেকের মালার আবার রীতিমত মূল্য আছে জহুরিদের কাছে।



চীনা ও জাপানী মালা ( বৌদ্ধ )

জপের মালায় রুদ্রাক্ষ বা তুলসীর গুলি সংখ্যায় প্রায়ই ১০৮টি দেওয়া হয়। বড় মালায় ২৮টি গুলি থাকে। ১০৮ বার জপের নিয়ম বলিয়া গুলিও থাকে ১০৮টি। ১০৮ বার জপ করিলে প্রত্যেকটি একবার করিয়া হাতে ফিরাইয়া লইতে হয়। তিব্বতে লামারা সাধারণতঃ একাসনে বসিয়া ৫৪০ বার জপ করে। জপের মালায় নানা দেবতার প্রীতির জন্য বিচিত্র আসবাবও থাকে—যেমন

ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য মালায় ছোট করিয়া একটি ঘণ্টা—তার নাম বজ্র। বৌদ্ধদিগের মধ্যে তিব্বতে এই ১০৮ বার জপের নিয়ম কেন হইল, তাহাতে বেশ রহস্য আছে। কেহ কেহ বলেন, ১০৮ রকমের পাপ-বন্ধন আছে, তাহা কাটিবার জন্যই ১০৮ বার জপের নিয়ম; আবার কেহ বলেন, বুদ্ধের জন্মদিনে ১০৮ জন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করা হয়



জাপানের পুরোহিত। হাতে জড়ানো মালা,—ডান হাতে চক্র ও বাঁ হাতে শঙ্খ

তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য,—তাঁহাদের সম্মানের জন্যই ১০৮ বার জপের প্রথার প্রবর্ত্তন। কিন্তু পিকিঙ্‌এর হু-কেও মন্দিরে এক প্রাচীন দলিল পাওয়া গিয়াছে—তার মতে ১টি মালা শিয়া-চিয়া-সো-নি বুদ্ধের জন্য—৮টি আটজন শিন্‌কাঙ্‌ বুদ্ধের জন্য; পুশার জন্য ৪টি; ছজন পো-লো-মির জন্য ৬টি; স্বর্গের চারিজন রাজার জন্য ৪টি; তেত্রিশ স্বর্গের জন্য ৩৩টি; আঠারো নরকের জন্য ১৮টি; আট রকম সঙ্কটের জন্য ৮টি; ৮টি এই আট রকম সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য; দশজন প্রধান সাধুদিগের জন্য ১০টি; জীবাত্মার জন্য ১টি; পিতামাতার জন্য ২টি; আর ৫টি জু-লাই বুদ্ধের জন্য।

মালা জপিবার পূর্ব্বে হাত ভালো করিয়া ধুইতে হয়, তার পর মনে মনে মন্ত্র স্মরণ করিয়া বাঁ হইতে ডান দিকে মালা ঘুরাইতে হইবে। চীনে-জাপানে মালা জপিবার ইহাই প্রথা।

মালা তৈয়ারী হয় স্ফটিকে, হস্তিদন্তে, দামী কাঠে, ঝিনুক, পাথর, কাচ, তবলকী ও ফলের বিচি, প্রভৃতিতে। আকার গোল হইবে এমন কথা নাই—নানা আকারের হইতে পারে। মুসলমানের মালার ৯৯টি তবলকী থাকে, ভগবানের ৯৯টি নামের উদ্দেশে। সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিবার জন্য ৩৩টি তবলকীর মালারই প্রচলন দেখা যায়।

তবে এ সম্বন্ধে ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নাই। কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লে ৫০০ তবলকীর মালাও এক দরবেশের কাছে দেখা গিয়াছে। এত তবলকী কেন,—তাহার উত্তরে দরবেশ বলিয়াছিলেন, ১০০০০ বা ২০০০০বার জপ করিতে সুবিধা হইবে বলিয়া।

মিশরে ১০০০তবলকীর মালাও দেখা গিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে প্রথা আছে, কাহাকেও কবরিত করা হইলে তাহার আত্মার সদ্গতির জন্য কবরের পাশে দরবেশ মালা জপিয়া থাকেন। স্যর এডুইন আর্ণল্ড Pearls of Faith কাব্যে বিশ্বের ভগবানের উদ্দেশে তাঁহার মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন যে ৯৯টি কবিতায়, তাহা মুসলমানের প্রদত্ত ভগবানের ঐ ৯৯টি নামের উদ্দেশে জপের অনুকরণে।

প্রাচীন খ্রীষ্টানদের মধ্যে ১৫০ তবলকীতে মালারচনা



পারস্যের মোল্লা

করা হয়—তাছাড়া আরো ১৫টি বড় তবলকী তাহাতে থাকে। এই ১৬৫ কে সংক্ষেপে করিয়া ৫৫টি মাত্র তবলকীতেও মালা রচিত হইয়া থাকে।

এই মালার আদর ও কদরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীরা



তিব্বতী পুরোহিত

মালা, যাদু-কৌটা ও ডম্বরু হাতে



চীনের বৌদ্ধ পুরোহিত

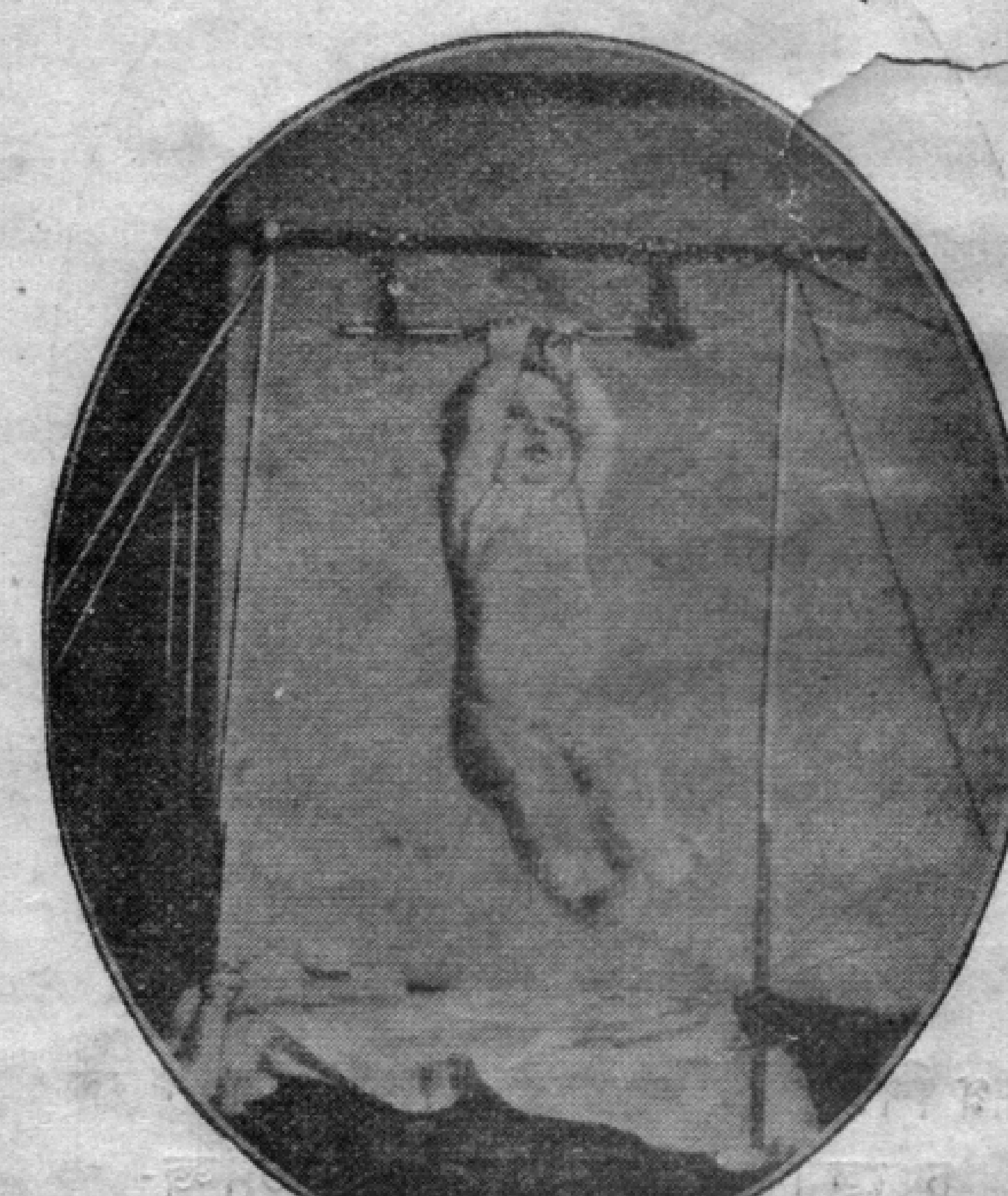
মৃতের আত্মার কল্যাণার্থে মালা জপিতেছেন

মালা রচনায় কারিগরি দেখাইবারও বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছে চিরদিন সকল দেশে। এই প্রবন্ধে নানান্ দেশের নানান্ রকমের মালার ছবি দেওয়া হইল। তাহা দেখিয়া সকলে বুঝিবেন, শিল্পকলার হিসাবে মালায় কারিগরি এককালে কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

---

## শিশু পালোয়ান

শিশুর মুখে কথা ফোটবার আগে সে সাঁতার দিতে পারে, এমন কথা কখনো শুনেছেন কি? এ রূপকথা নয়,—সত্যই এ ব্যাপার আজ সম্ভব হয়েছে। নিউইয়র্কের একটি শিশু, নাম মাথু জিউয়েট, পাঁচ মাস মাত্র বয়সে ট্রাপেজে দোল খেতে পারে। মান হাতানের (নিউইয়র্ক) এক শিশু, জিমি সাইরাকিউজ, দেড় বছর মাত্র বয়সে গাছে চড়তে পারে। বসনভূষণহীন নগ্ন শিশুর গাছে চড়ায় সে ভারী সুন্দর দৃশ্য ফোটে! স্পেনের মাদ্রিদ্ সহরে আড়াই বছর বয়সেই শিশু আন্তনিও সাঁরোমা



পাঁচ মাসের শিশু মাথু জিউয়েট প্রত্যহ ট্রাপেজে এক্সার সাইজ করে। সাত হপ্তা বয়স হতে মাথুর বাপ-মা তাকে ব্যায়ামে অভ্যস্ত করিয়েছেন।

চমৎকার বাইসিক্ল চড়তে পারে ; পানামা ক্যানাল সীমানার ভার্জ্জিনিয়া ষ্টামির বয়স পাঁচ বৎসর ; কিন্তু এই পাঁচ বৎসর বয়সেই



পাঁচমাসের শিশু মাথু জিউয়েট প্রত্যহ ট্রাপেজে এক্সারসাইজ করে। সাত হপ্তা বয়স থেকে মাথুর বাপ-মা তাকে ব্যায়ামে অভ্যস্ত করিয়েছেন।



নগ্ন শিশু জিমি আঠারো মাস বয়সে গাছে চড়ছে। পাঁচ বৎসরের শিশু ভার্জ্জি-নিয়া ষ্টাম ডুব-সাঁতারে বেশ পার-দর্শিতা দেখিয়েছে।

সে ডুব-সাঁতার দিতে পারে ; আর রিঙের খেলায় যা কেরামতি দেখিয়েছে, তা অপূর্ব্ব। মিয়ামির জাকি অট্ পেশী ফুলিয়ে তুলতে পারে অনেকখানি, এমন তার শক্তি। তার বুকখানা ফুলিয়ে আড়াই ইঞ্চি বাড়াতে পারে—অথচ তার বয়স এখনো পাঁচ বৎসর পোরেনি! নিউইয়র্কের লেষ্টার স্নিজার পারালেল্ বারে ( parallel bar ) অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাতে পারে ; তার বয়স এখন তিন বছর মাত্র।

এ সব আজগুবি ব্যাপার নয় বা এর মধ্যে মন্ত্র-মাদুলি কি ঝাড়-ফুঁকের কারসাজি নেই। কি করে এ সম্ভব হয়েছে তাও বলি।

এই সব শিশু-পালোয়ানদের মা-বাপ এক রকম আঁতুড় থেকেই তাদের ব্যায়ামের দিকে ঝোঁক দিতে সুরু করেন। শিশু দু'হপ্তার হলেই প্রথমে তাকে দেওয়া হয় একটা পেন্সিল বা আঙুল ধরতে। আঁকড়ে ধরায় ক্লান্তি



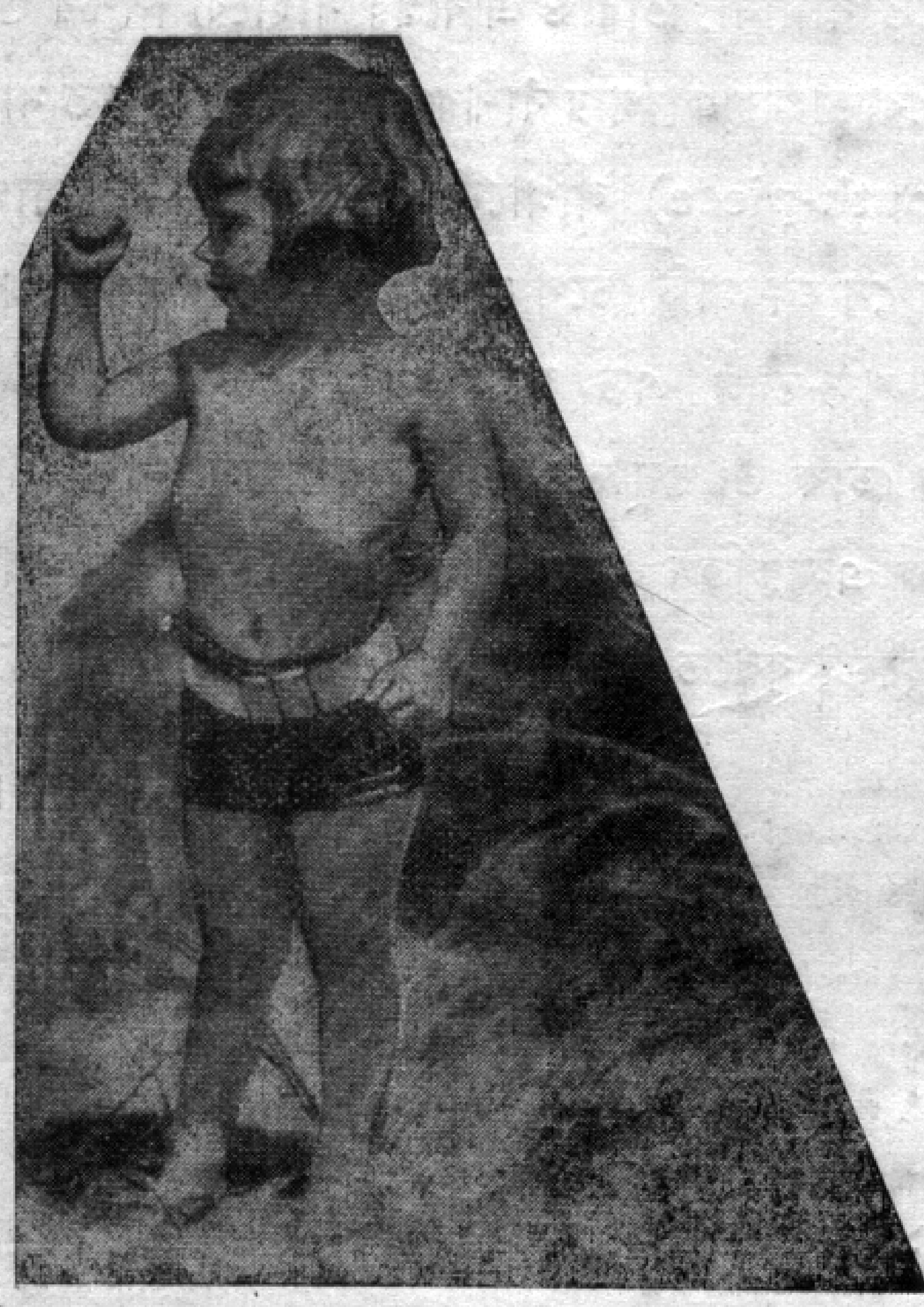
আড়াই বছর বয়সে আন্তনিও সাঁরোমা বাইসিক্ল চড়তে কেমন দক্ষ! ছেলেদের সাইকল্ রেসে সে কাপ জিতেছে।

হলেও তার সামনে পেন্সিল এগিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করা—সে মোটেই হবার যো নেই। এতে ফল হয় এই যে শিশুর হাতের আর কাঁধের পেশী সবল হয় খুব শীঘ্র, আর তার বাড়ও হয় এমন চমৎকার যে দেড় মাস বয়সের সময় লাঠি বা ডাণ্ডা সে বেশ জোরেই আঁকড়ে ধরতে পারে।



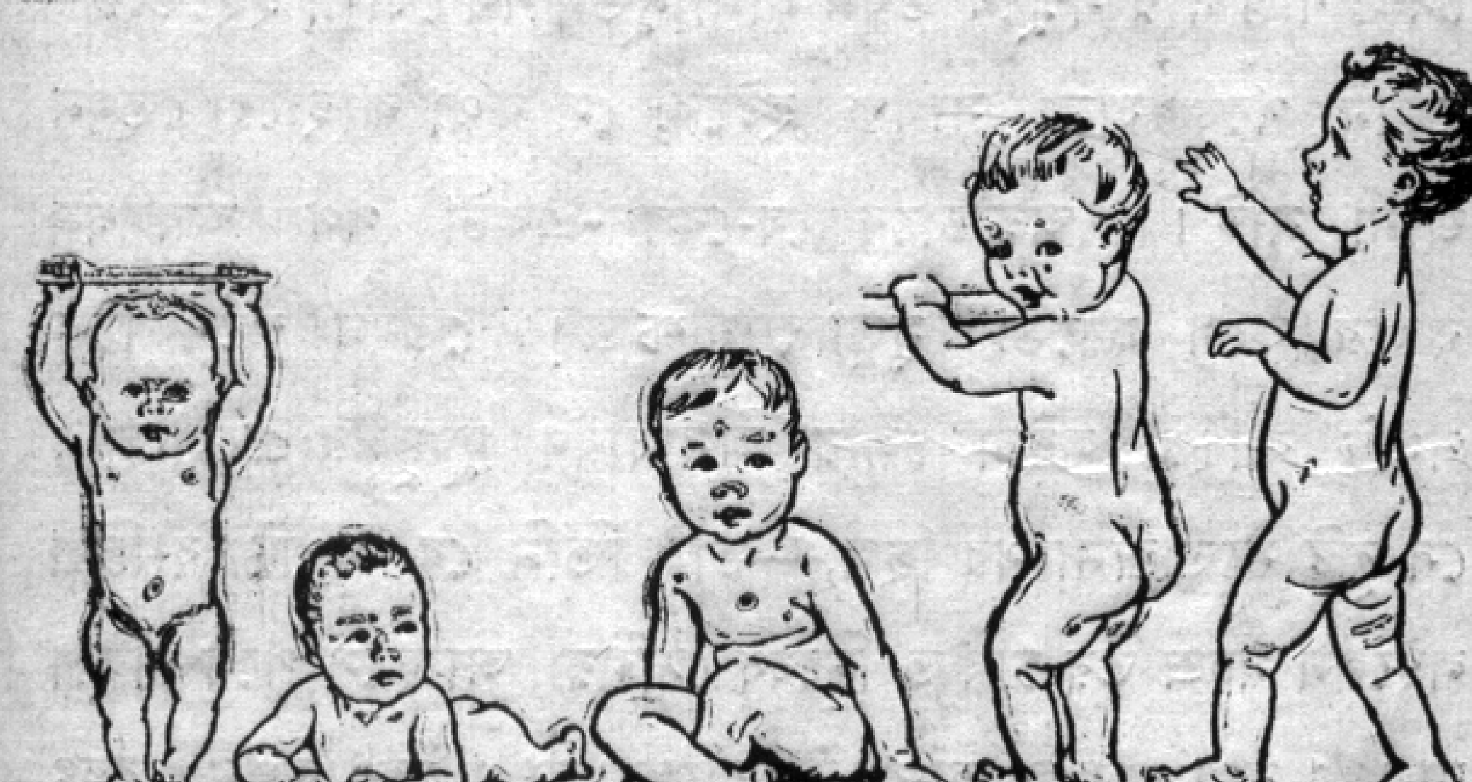
তিন বছরের চেষ্টায় স্নিজার পারালেল্ বারে খেলছে। স্বাস্থ্য ও পেশীর পড়নে এ শিশু হার্কুলিসের দোসর!

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ডাক্তার আর্নেষ্ট হোল্ট—শিশুর শরীর-তত্ত্বে একজন নিপুণ আচার্য্য বলে তাঁর খ্যাতি আছে। তিনি শিশুর শরীর-গঠন আর দেহ-চর্চ্চার জন্য কটি নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন—এতে শিশুর শরীরে মঙ্গল হবে প্রচুর—ক্ষতির আশঙ্কা মোটেই নেই। ডাক্তার হোল্টের শিশুর ব্যায়াম-চর্চ্চার চার্ট এইখানে দেওয়া হল।



এখনো পাঁচ বছর বয়স পোরে নি, এরি মধ্যে জ্যাকি অট্ আড়াই ইঞ্চি বুক ফুলোতে পারে।

শিশুর প্রথম ব্যায়াম



| তিন মাস বয়সে হাত ধরিয়া ঝুলাইয়া দাও। | তিন মাস বয়সে মাথা সোজা করাইয়া দাও। | আট মাসে শিশু বসিবে। | দশ মাসে শিশু দাঁড়াইবে। | পনেরো মাসে শিশু হাঁটিবে। |
|---|---|---|---|---|

আমাদের দেশের মা-বাপেরা একটু সচেষ্ট হোন্, আঙুরের বাক্সয় তুলো চাপা দিয়ে বাঙালীর ছেলেদের আর ননীর পুতুল নন্দদুলাল করবেন না—'বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা' এ কথাটি মনে রাখবেন।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

## কালার শ্রবণ-শক্তি

যাঁরা বদ্ধ কালা, তাঁরা আশ্বস্ত হোন্। তাঁরা গান শুনতে পাবেন, প্রিয়ার ললিত কণ্ঠে প্রণয়-গদ্‌গদ ভাষাও অনায়াসে শুনতে পাবেন,—কোন বাধা থাকবে না!

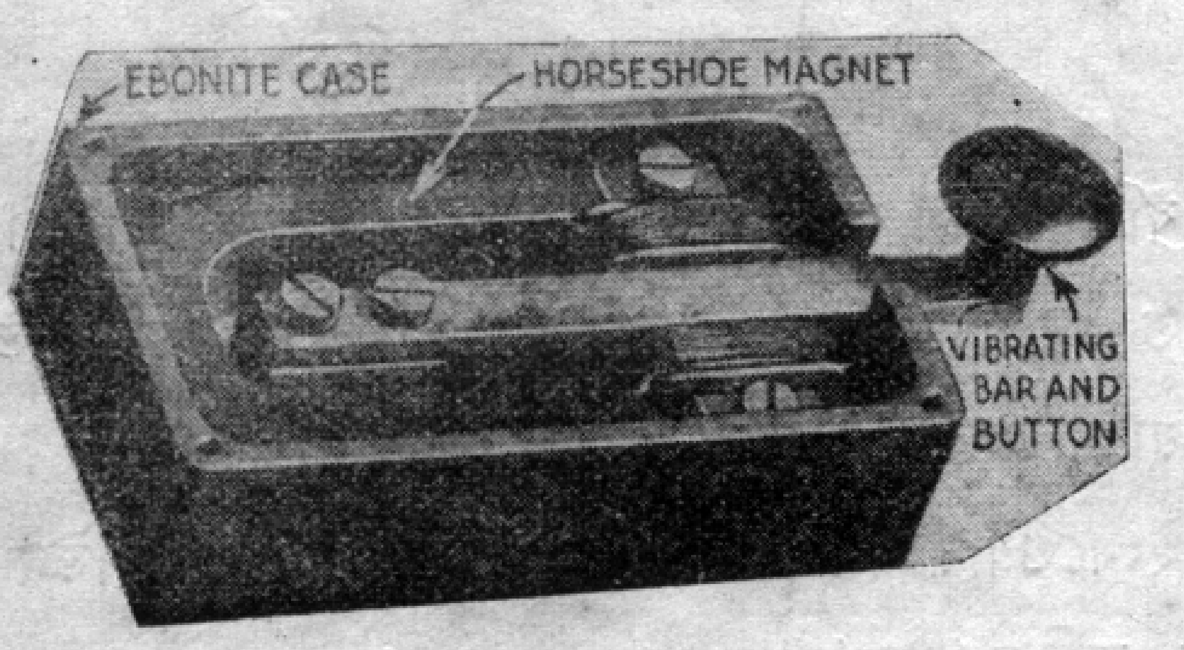
ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটির সদস্য এস, জে, ব্রাউন এক-রকম কৃত্রিম 'কাণ' তৈরী করেছেন—এই কাণ ধারণ করলে বদ্ধ কালারাও কথা শুনতে পাবেন, আর তা শুনতে পাবেন দাঁত দিয়ে, মাথার খুলি দিয়ে, হাতের কব্জীর হাড় দিয়ে। ব্রাউন সাহেব প্রমাণ করেছেন, আমরা শব্দ শুধুই যে শুনি তা নয়—শব্দ অনুভব করি—যেমন দূরে কামানের আওয়াজ হলে আমরা সেটা অনুভব করি শোনার অনুপাতেই।



দেত্রয়ের মিশ্ কাথরিন ষ্ট্রীফেন্স্ হাতের কোড়ে আঙলে যন্ত্র লাগাইয়া টেলিফোনে কথা শুনিতেছেন।

তবে শিরায় আঘাত লেগে যাঁরা কালা হয়েছেন, তাঁরা এ 'কৃত্রিম কাণে' কোন উপকার পাবেন না।

এখন এ কৃত্রিম কাণটি কি রকম, বলি। ছোট একটি কাঁচ-কড়ার 'কেশে' ঘোড়ার ক্ষুরের আকারের একটি ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্‌নেট লাগানো আছে—ব্যাটারির যোগে তাতে তাড়িতের প্রবাহ ছুটচে। ঐ ম্যাগনেটের দুই




শ্রবণ-যন্ত্র

সীমানার মধ্যে ছোট একটি লোহার বার্‌ বা 'ভাইব্রেটর' আছে—সেটি খানিকটা পিতলের সঙ্গে স্ক্রুপের মত আঁটা এবং একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তার একটা সীমা বাহিরে এক বাঁকানো বোতামের সঙ্গে লাগানো থাকে। এই যন্ত্র ব্যবহার করবার সময় মাথার খুলির সঙ্গে বা হাতের হাড়ের সঙ্গে চেপে বসাতে হয়। শব্দের তরঙ্গ অমনি প্রচুর হয়ে হাড়ের মধ্য দিয়ে কাণের শিরায় এসে লাগে—তা থেকে ক্রমে মস্তিষ্কে পৌঁছয়, তৎক্ষণাৎ, চট্‌পট্‌। সাধারণ মাইক্রোফোনে যাঁরা শুন্‌তে পান না, তাঁরাও এ যন্ত্রের সাহায্যে নিশ্চয় শুন্‌তে পাবেন। বোতামের জায়গায় বাঁশীর চ্যাপ্‌টা মুখের মত মাউথ-পীস্‌ (mouth-piece) লাগানো যেতে পারে—তা লাগালে দাঁত দিয়ে সে জায়গাটি চেপে ধরলেও শব্দ বেশ শোনা যায়।

এতে শব্দ-তরঙ্গ এত স্পষ্ট হয় যে কোন কথা—যত সূক্ষ্মই সে হোক তা শুন্‌তেও এতটুকু বাধবে না। পাশের ছবি থেকে এই কৃত্রিম কানের গড়ন আর ব্যবহার-প্রণালী সকলে সহজেই বুঝতে পারবেন।

শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী।

---

# ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আজ আর ইহলোকে নাই। তিনি বাঙ্‌লার সাহিত্যে ও সমাজে কে ছিলেন বা কি ছিলেন, তা' যেদিন বাঙ্‌লার খাঁটী ইতিহাস লেখা হইবে, সেদিন অনেকে সঠিক বুঝিবেন। তবে বাঙ্‌লার যে শ্রী আজ দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাল্‌চারের প্রভাবে বাঙ্‌লার জীবনে জাগরণীর এই যে জোয়ার, বাঙলার পথে-ঘাটে সংস্কারের আলো-হাওয়ার এই যে চপল হিল্লোল, অন্ধ কুসংস্কারের তমিস্রা ঘুচাইয়া এই যে রবির কিরণ-স্ফুরণ, ইহার মূলে সত্যেন্দ্রনাথের শক্তি আর প্রতিভা। বাঙ্‌লার নারী-সমাজে এই যে প্রাণ-স্পন্দন আজ দেখা দিয়াছে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সভা-ক্ষেত্রে নারী যে আজ লক্ষ লোকের অবজ্ঞা কাটাইয়া অকুতোভয়ে নামিয়া নিজের মতে বিচরণ করিতেছেন, এ প্রাণ-স্পন্দন বাঙ্‌লায় প্রথম জাগাইয়া তোলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

সত্যেন্দ্রনাথ মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার সংস্কার কার্য্যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার ডান হাত।

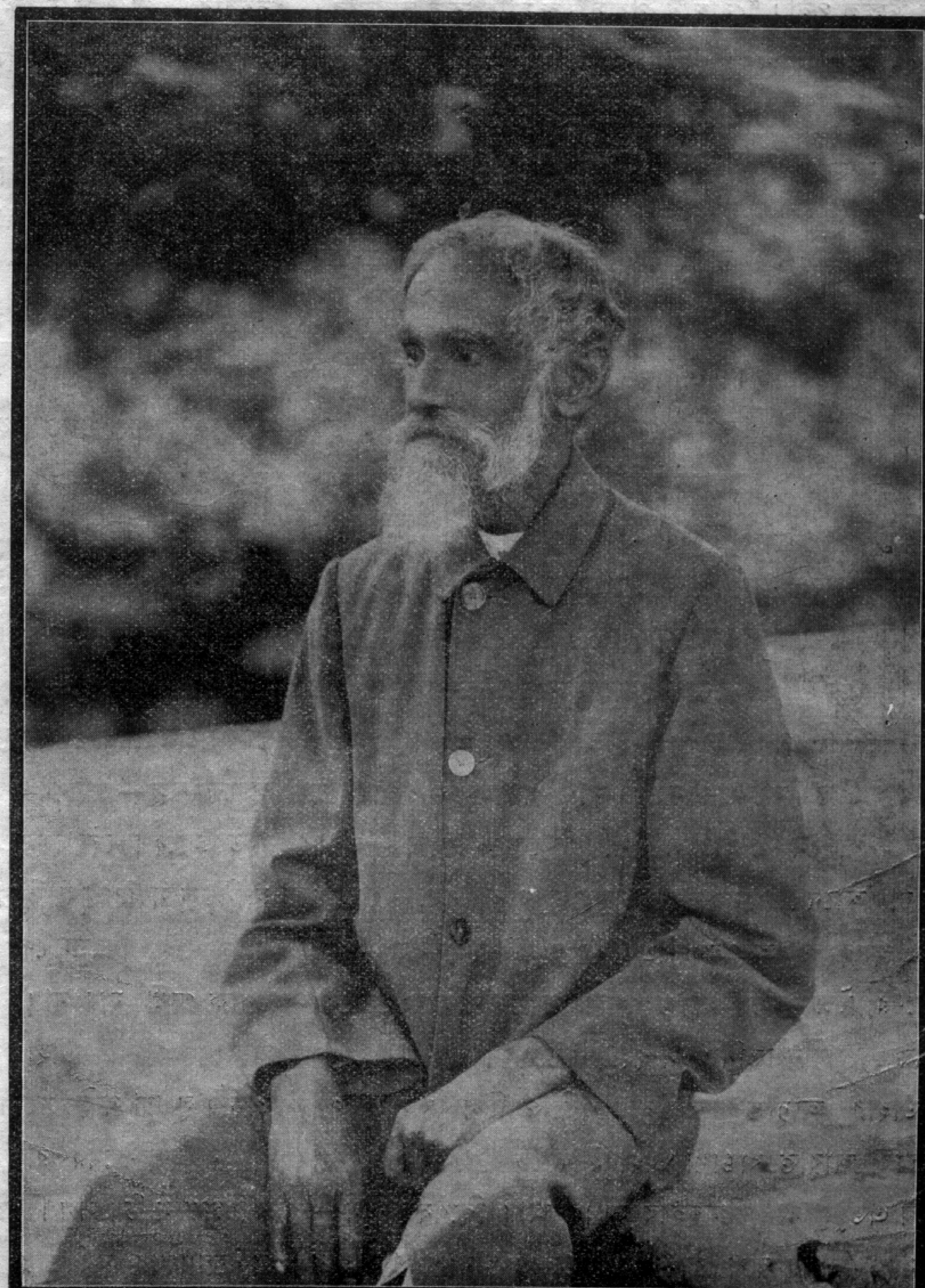
সত্যেন্দ্রনাথ যখন বলাক, বাঙ্‌লার চারিদিক দিয়া তখন সংস্কারের হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে—গতি-চঞ্চল বাঙ্‌লার সম্মুখে তখন নানা নূতন পথ খোলা হইতেছে—কোন্‌ পথে যাত্রা সার্থক হইবে, সে কথা কাহারো তেমন জানা নাই। অন্ধভাবে যে-কোন-একটা পথ অবলম্বন করার ফলে হয়তো মৃত্যু সুনিশ্চিত! তেমন ক্ষণে ঠিক পথটি বাছিয়া লইয়া চলায় অসাধারণ দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। সে দৃষ্টি সত্যেন্দ্রনাথের ছিল,—তাই তিনি যে পথটি বাছিয়া লইলেন সহস্র ভয়-চকিত নিষেধ ঠেলিয়া, আজ সে পথে চলিয়া বাঙ্‌লা নব্য বাঙ্‌লা হইয়া উঠিয়াছে। সারা দেশ তখন সুবৃহৎ প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কূপমণ্ডুকটি হইয়া বসিয়া ছিল, প্রাণের স্পন্দন তার থামো-থামো হইয়া পড়িয়াছে—সত্যেন্দ্রনাথের পথে নূতন আলো চপল হাওয়ার পরশ

পাইয়া তার স্বাস্থ্য ফিরিয়া গেল, মুখে-চোখে কাল্‌চারের দীপ্ত আলো পড়িয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিল।

সে যুগে বিলাত-যাত্রা বা 'কালাপানি' পার হওয়া এক বিষম ব্যাপার ছিল। যে কেহ বিলাতে যায়, সে আর দেশে ফেরে না—এম্‌নি ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল। এই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে বালক সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু ৺মনোমোহন ঘোষের সহিত বিলাত-যাত্রা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান। বোম্বাইয়ে দীর্ঘকাল ম্যাজিষ্ট্রেটী, কালেক্টরী করিয়া পরে সেশন জজ্‌ হইয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে।

কিন্তু এইটুকুই তাঁহার পরিচয় নয়। সাহেবিয়ানার সেই প্রথম যুগে যখন বাঙ্‌লা বলিতে বাঙ্‌লা লিখিতে শিক্ষিত বাঙালী লজ্জায় মরিয়া যাইত, বেশে-ভূষায় আদবে-কায়দায় সাহেব বনিতে বাঙালী যখন আত্মহারা উন্মাদ, সেই সাহেবিয়ানার বিরাট ধূম-ধামের মাঝে বিলাত-ফেরত সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ সে মোহের আবর্ত্তে পড়েন নাই। আচারে বিচারে সর্ব্ববিষয়ে তিনি বাঙালী ছিলেন, স্বদেশী ছিলেন। তাঁর অন্তরে বিলাত তার রাংতার ছোপ লাগাইতে পারে নাই। মনে-প্রাণে তিনি বাঙালীই ছিলেন, চিরকাল। হ্যাট বুট আর কোটের মায়ায় আবদ্ধ তাঁহাকে কখনো দেখি নাই। বাঙ্‌লা রচনায় তিনি নিজের প্রতিভা নিয়োজিত করিলেন। তখনকার দিনে যদি তাঁহার গ্রন্থ "বোম্বাই চিত্র" ইংরেজী ভাষায় তিনি লিখিয়া প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে খ্যাতির সঙ্গে অর্থও হুড় হুড় করিয়া আদায় করিতে পারিতেন। কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রতিষ্ঠানে দেশের প্রতি টানে তিনি তা করেন নাই। বাঙ্‌লায় সেই প্রথম যুগের অমর জাতীয় সঙ্গীত—

"মিলে সবে ভারত-সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতেরি যশোগান।"



সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ তাঁহারই লেখা। তাঁহার গীতার কাব্যানুবাদ যেমন সরল, ছন্দের কারিগরিও তাহাতে তেমনি। তাঁহার রচিত "আমার বাল্যকথা" বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে এক অতি-উজ্জ্বল পৃষ্ঠা। "বোম্বাই প্রবাস" বঙ্গ সাহিত্যের অলঙ্কার।

এই সঙ্গে বিদেশের যেটুকু ভাল, দেশের মঙ্গলের জন্য সেটুকু গ্রহণ করিতেও তিনি কাহারো নিষেধ গ্রাহ্য করেন নাই। সত্যের প্রতি অচপল নিষ্ঠা, ন্যায়ের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহার বুকে দুর্জ্জয় শক্তি জাগাইয়া রাখিয়াছিল। আজ এই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কিছুও যে আমরা বাঙলায় দেখিতেছি, ইহার মূলে সত্যেন্দ্রনাথের শক্তি, চেষ্টা আর উৎসাহ। এ সম্বন্ধে বহু বৎসর পূর্ব্বে 'প্রদীপে' পূজনীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছিলেন "স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন আমার পূজনীয় মেজদাদা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।...আশৈশব ইনি মহিলা-বন্ধু; স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী।...তখন অন্তঃপুরে অবরোধ-প্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখন মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এবাড়ী হইতে ওবাড়ী যাইতে হইলে ঘেরাটোপ-মোড়া পাল্‌কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখন নিতান্ত অনুনয়-বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্‌কী-শুদ্ধ তাঁহাকে জলে ডুবাইয়া আনে।...মেজদাদার কাছে যদি বল,—বুদ্ধিতে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদি বল—পুরুষের ন্যায় তাহাদের উচ্চশিক্ষা অনাবশ্যক, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা পুরুষের অসমকক্ষ, অমনি তিনি গরম হইয়া উঠিবেন।"

তাঁহার আবৃত্তি করিবার শক্তিও ছিল অসাধারণ। কবিতার আবৃত্তি বাঙালী তাঁহারই কাছে শিখিল, এ কথা বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হইবে না। আর বিশেষত্ব ছিল—ধনে মানে বিদ্যায় যশে সুপ্রতিষ্ঠ হইলেও অসাধারণ তাঁহার চরিত্রের সারল্য আর অমায়িকতা। এমন মিশুক লোক দেখা যায় না। অধ্যয়ন ছিল তাঁর তপস্যা। মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাঁহাকে দেখিয়াছি গ্রন্থপাঠে তন্ময়। অমায়িকতার কথা বলিতে গিয়া একটা কথা বিশেষ করিয়াই মনে পড়িতেছে। আমরা তখন কলেজের ছাত্র। কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া ভবানীপুরে ছোট-খাট একটি সাহিত্য-সমিতি খুলিয়াছি, সভ্য-সংখ্যা দশ-বারো জন মাত্র। বার্ষিক অধিবেশনের কল্পনা মনে জাগিয়া উঠিল—জাঁকাইয়া সভা করিব। কিন্তু সভাপতি হইবার জন্য কাহাকে ধরি! কাছেই বালিগঞ্জ। দুই বন্ধুতে মিলিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারে আসিলাম। ফটকে পা দিতে গা কাঁপিয়া উঠিল! সিভিলিয়ান মানুষ—তাহার উপর ধনে মানে খ্যাতিতে কোথায় সত্যেন্দ্রনাথ, আর কোথায় আমরা কলেজের দু'জন নগণ্য ছোকরা! কিন্তু যখন আসিয়া পড়িয়াছি, ফেরা যায় না—গাড়োয়ান কি ভাবিবে, আর সে বাড়ীর দরোয়ানই বা কি মনে করিবে! কোনমতে সত্যেন্দ্রনাথের সম্মুখে হাজির হওয়া গেল। ভয়ে ভয়ে কথাটা তুলিলাম, বলিলাম,—আপনাদের উৎসাহ ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, -বেশ, যাব। একজন এসে নিয়ে যেয়ো। কি শ্রদ্ধাই যে জাগিল এ কথায়, আজও মনে পড়ে! সভায় আসিয়া প্রাণ খুলিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে মিশিলেন,—কাল্‌চারের সম্বন্ধে কত কথা বলিলেন—কোথায় ভাসিয়া গেল আমাদের পরস্পরের ব্যবধান—এ যেন হৃদয়ের বন্ধু—প্রাণের কত অন্তরঙ্গ স্বজন! তারপর কতদিন কত উপদেশ দিয়াছেন, কত কথা বলিয়াছেন। মুখে মৃদু হাসিটুকু সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। কখনো তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখি নাই, বিরক্ত দেখি নাই। এমন সদা-প্রফুল্ল উদারচিত্ত লোক দেখা যায় না! এমন নিরহঙ্কার নীরব কর্ম্মী—যিনি জীবনে একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার চিত্তই শ্রদ্ধায় লুটিয়া পড়িয়াছে।

সাহিত্য-রসের রসিক তিনি চিরদিন, গুণের আদরও করিয়াছেন চিরকাল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসে তিনি একেবারে বিভোর ও মশ্‌গুল ছিলেন।

আজ তাঁহার জীবন-কথা বা চরিতকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। তাঁহার তিরোধানে তাঁহারই কথা মনে করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে এ আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি-দান।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

# সমালোচনা

**মর্ম্মবাণী**।—শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল প্রণীত। শান্তিপুর প্রেম-নিকেতন হইতে শ্রীচিদানন্দ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত। বীরভূম, শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি কবিতার বই। কয়েকটি খণ্ড-কবিতা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলি বিচিত্র রসের—ছন্দে, ভাষায় উপভোগ্য; ভাব উচ্চ। লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় বহু কবিতাতেই পাওয়া যায়। বইখানির ছাপা কাগজ বেশ ভালো।

**ভজার বাঁশী**।—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই,সি, এস প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ইউ রায় এণ্ড সন্স্ কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা। ছেলেমেয়েদের খেলার কুঞ্জে এ বইখানি একেবারে আলোর সুরের ঝর্ণা ঝরাইয়া দিবে। পাতায়-পাতায় বিচিত্র ছবিতে আর গানের ছড়ার অপূর্ব্বতায় এ বইখানি বাংলার শিশু সাহিত্যে নুতন জিনিষ হইয়াছে। ছড়াগুলি বিদেশী ছড়ার অনুকরণে রচিত; বিদেশী ছন্দ ও সুর দেশী ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। কয়েক জায়গায় পঙ্গু ছন্দ ও বদ্ মিল থাকা সত্ত্বেও বলিব, ছড়াগুলিতে বৈচিত্র্য আছে, রস আছে—হাল্কা লঘু গতিতে লেখক সুরের দোলা দুলাইয়া দিয়াছেন। ইহার নুতন আবহাওয়ায় বাঙালী ছেলেমেয়েদের ক্রীড়া-কুঞ্জ চঞ্চল প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। বহিখানিতে অসংখ্য ছবি আছে—ছবিগুলি বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও অর্দ্ধেন্দু প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা। যে-সব ছেলেমেয়ে পড়িতে শিখে নাই, শুধু ছবিগুলি দেখিয়া তাহারাও মজা পাইবে খুব। বইয়ের বাঁধাই ছাপা কাগজ খুব ভালো।

**পল্লী-মঙ্গল**।—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে ও কটন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা, বাঁধাই পাঁচ সিকা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় এ গ্রন্থের চমৎকার পরিচয় দিয়াছেন। পল্লীর লক্ষ্মী-শ্রী আজ অন্তর্হিত। বিবাদ-বিসম্বাদ ও রোগের জ্বালায় পল্লী সন্ত্রস্ত। প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন—ইহার 'প্রতিকার-কল্পে গ্রন্থকার যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রায়ই আমাদের নিজ ক্ষমতায়ত্ত'—'বৃহত্তর যুবক সমাজের করিবার কাজ।' গ্রন্থকারের মতে 'দেশের মঙ্গলে'র অর্থ 'প্রতি পল্লীর প্রতি গৃহস্থেরই মঙ্গল।' এই মঙ্গল পাইতে হইলে চাই উপযুক্ত লোক এবং উপযুক্ত টাকা। কাজেই প্রয়োজন একতা। এই প্রসঙ্গে তিনি আয়ের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, ব্যয়ের সীমাও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে চলিতে পারা কঠিন নয়, চলিলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও মিলিবে। সমস্তই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পল্লীধ্বংসের কারণ কি, তাহাও তিনি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন—এবং সেই সঙ্গে পল্লী-সুলভ আধিব্যাধির প্রতিকার কিসে হইবে, তাহাও খুলিয়া বলিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাষা খুব সরল ও সতেজ, তাঁহার উপায়গুলি মোটেই কঠিন নয়। এমন প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বাঙলায় পূর্ব্বে আর-একখানি পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এ গ্রন্থ পঞ্জিকার মত গৃহে গৃহে রক্ষিত হোক, পঠিত হোক—দেশের হাওয়া ফিরিয়া যাইবে, প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

**কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়**। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক, অল ইণ্ডিয়া পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড, ৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাত্যায়নী প্রেসে মুদ্রিত। কিংস্টন্ প্রণীত। Adventures in Africa নামক ইংরাজী গ্রন্থ হইতে এ বইখানি সঙ্কলিত। ছেলেমেয়েদের জন্য বইখানি লেখা—ভাষা বেশ হাল্কা ও সহজ। রোমাঞ্চকর প্লটটুকু ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে। উটপাখী শিকার, জলহস্তী শিকার, সিংহের বিক্রম, জিরাফের কথা—এসব কাহিনী এদেশের ছেলেমেয়েদের কাছে নূতন, তাহাদের কল্পনাকে বিচিত্র খোরাক জোগাইবে। বইখানিতে এগারোখানি ছবি আছে। ছেলেমেয়েরা এ বই পাইয়া আমোদে মাতিয়া উঠিবে।

**রণডঙ্কা**।—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, এম,সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড কলিকাতা। কাত্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। এখানি ছেলেমেয়েদের বই—জান্ কবুল, চাঁদ বিবি, মনিবের মানরক্ষা, জালিম সিংহের মাঠ,—এই চারিটি গল্প আছে। গল্প গুলির বিশেষত্ব এই যে সেগুলি রূপকথা নয়, ইতিহাসের গল্প। বেশ মন-ভোলানো ভঙ্গীতে লেখা না হইলেও ইতিহাসে সত্য কাহিনী বলিয়া ছেলেরা এ বইয়ের কদর করিবে নিশ্চয়। কয়েকখানি ছবিও আছে; মলাটের উপরকার রঙীন ছবিখানি খুব চমৎকার।

**বুনো গপ্প**।—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। কলিকাতা নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। Ho-folklore অবলম্বনে এ বইখানি লেখা হইয়াছে, ছেলেমেয়েদের জন্য। ছাগলের চালাকি, শেয়ালের চালাকি, খরগোসের ভাঁওতা প্রভৃতি কুড়িটি গল্প এ বইয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলিতে ওস্তাদী হাতের পরিচয় ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট—আগাগোড়া বিচিত্র রসে ভরপুর। ছেলেমেয়েরা এ বই বার বার পড়িয়াও ছাড়িতে চাহিবে না—এমনি মনোরম ভঙ্গীতে লেখা।

বাংলা বইয়ে এমন ছবি বড় দেখা যায় না। শিশু-সাহিত্যে এ বইখানি অলঙ্কার।

টুল্ টুল্।—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমথুরানাথ সেনগুপ্ত, ফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড কোম্পানি, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানিও ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা গল্পের বই। তিন কামনা, একটুখানি টুনী, লালিমা, সোনার বিষ, বড় বোন আর ছোট বোন, প্রতিধ্বনির গল্প,—এই কয়টি গল্প এবং হবুচন্দ্র রাজা ও তাঁর গবুচন্দ্র মন্ত্রী কবিতা আছে। গল্পগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে আদর পাইবে। মাঝে মাঝে ভাষায় প্রাদেশিকতা আছে—তা থাক্, লেখা বেশ ঝর-ঝরে। ছবি আছে বিস্তর—ছবিগুলি ভাল।

পল্লীচিত্র।—তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়, রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, ২৪নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মিত্র প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। বাংলা পল্লীর এই নিখুঁত ফটো-এ্যালবামখানির সঙ্গে আমাদের যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমরা বালক। তখনই ভারতীর পৃষ্ঠায় এই ছবিগুলি মাসের পর মাস ধরিয়া বাহির হইত, আর আমরা উদ্‌গ্রীব থাকিতাম, এগুলিকে দেখিবার জন্য। এ-সব ছবি আমাদের মনে এমন গাঁথিয়া গিয়াছিল যে এ বইয়ের অভাব আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতাম। সেকালের পাঠশালা, ভগবতী যাত্রা, দশহরা গঙ্গাপূজা, স্নানযাত্রার মেলা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, নন্দোৎসব, দুর্গোৎসব, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা—পল্লীর সহজ সরল জীবনধারার সঙ্গে এই সব আনন্দের গান, উৎসবের হাসি এমন হৃদয়গ্রাহী সুরে লেখক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে বাঙলা আজ সে উৎসব-আনন্দহারা হইলেও এই বইখানির কল্যাণে তার রেশ আজও কানে বাজে, প্রাণে তৃপ্তির অমৃতধারা ছিটাইয়া দেয়। এ বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৩১১ সালে—তারপর আর ছাপা হয় নাই—এজন্য লেখকের উপর বিরক্তিও ধরিত। কিন্তু আজ ধন্যবাদ দিতেছি প্রকাশক রায় এণ্ড রায় চৌধুরীকে—তাঁরা এতদিন পরে এ বহিখানির তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিয়াছেন বলিয়া। আমাদের ছেলেবেলায় এই সহরের বুকে বসিয়া আমরাও নন্দোৎসবের গান শুনিয়াছি,—

"শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।"

গায়কদের কি সে মাতোয়ারা ভাব! আমাদের সরল শিশু-চিত্তে জন্মাষ্টমীর সুর সাড়া দিয়া উঠিত। তারপর কোথায় গেল সেই গায়কের দল, সেই সরল সুর, সেই সহজ আনন্দের মাতোয়ারা ভাব! সহরের কঠিন চাপে সে সব গুঁড়াইয়া ধুলা হইয়া গেল! বাঙলার নিজস্ব আমোদ-উৎসব, বাঙলার এই প্রাণের সুর বাঙলা হইতে আজ অন্তর্হিত-প্রায়ই। লেখক সেই হারানো সুর তাঁর বাঁশীতে বাজাইয়া তুলিয়াছেন আশ্চর্য্য ওস্তাদী ঢঙে অপরূপ লীলাভঙ্গীতে—প্রাচীন বাঙলাকে জীবন্ত ফটোর মতই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এই চিত্রগুলিতে। এ বই যিনি না পড়িবেন, বাঙলা দেশের সহিত তাঁর পরিচয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, বাঙলা দেশে বাস করিয়াও তিনি বাঙলার কিছুই জানিবেন না, বিশেষ করিয়া বাঙলার পল্লী তাঁর কল্পনার সামগ্রীই থাকিয়া যাইবে। এ গ্রন্থে বাঙলার পল্লীর কথা, তার নর-নারীর পরিচয়, তার সুখ-দুঃখের ছবি, তার আশা-আনন্দের কাহিনী যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—মনোরম ছন্দে। বাঙলার প্রাচীন রাজা-রাজড়ার কাহিনীর চেয়েও মনোজ্ঞ আর উপভোগ্য হইয়াছে গ্রন্থখানি। বাঙলার ইতিহাসে, বাঙলার সামাজিক ইতিবৃত্তে, বাঙলার রস-সাহিত্যে এ গ্রন্থ বহুমূল্য সম্পদ।

সৌন্দরনন্দ কাব্য।—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম-এ বি-এল কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। কালিকা প্রেসে মুদ্রিত। মহাকবি অশ্বঘোষ-রচিত 'সৌন্দরনন্দ' মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে একখানি সুন্দর কাব্য—এ কাব্যের বঙ্গানুবাদ-চেষ্টা এই প্রথম। অনুবাদক নিজেই বলিয়াছেন, 'মূলের অস্পষ্টতার জন্য স্থানে স্থানে অনুবাদ প্রাঞ্জল করিতে পারা যায় নাই, দুর্ব্বোধ্যই থাকিয়া গিয়াছে।' অনুবাদ সত্যই খুব প্রাঞ্জল হয় নাই, সাধারণে কতটা উপভোগ করিবে বলা যায় না। তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মুখপাতে গ্রন্থের ভূমিকায় মূল কাব্যের যে আলোচনা করিয়াছেন, কাব্যের যে গল্পটুকু বিবৃত করিয়াছেন, তাহা যেমন সরস, তেমনি কৌতূহলে ভরা। সেটুকু গিল্ট ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখিবার মত। এইটুকু পড়িয়া অনেকেরই প্রচুর লোভ জন্মিবে, কাব্যের সৌন্দর্য্য বুঝিতে, কাব্যের রস অনুবাদের ধারা দিয়া গ্রহণ করিতে। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন,—'অশ্বঘোষ বলিয়াছেন দর্শনের বই আমি অনেক লিখিয়াছি। তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। তাই আমি কাব্যের ছলে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতে বসিয়াছি।' অনুবাদের ভাষা স্থানে স্থানে কটমট হইলেও তাহারি ফাঁক্ দিয়া কবি অশ্বঘোষের কবিত্বের পরিচয় মাঝে মাঝেই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

তুলসী-প্রতিভা বা ভক্ত কবি তুলসীদাস। শ্রীযুক্ত প্রসাদ-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা। ফাইন প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি নাটক। রচনা বিশেষত্বহীন, তা কি গানে, কি ভাবে, কি নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



অনন্ত প্রেম

ভারতী

৪৬শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩২৯ {একাদশ সংখ্যা

# বিদেশী কবিতা

## ভবের ভাবনা

বিরাট রথের নিকটে যেয়ো না, ধুলায় ভরিবে দেহ,
ভবের ভাবনা বহিতে যেয়ো না, বহিতে পারেনা কেহ।
বিপুল রথের নিকটে যেয়ো না, চক্ষে পড়িবে ধুলি,—
ভাবনা অশেষ;—ভাবিলে কাণার দৃষ্টি কি যাবে খুলি?

'শী-কিং' হইতে

—

## প্রেমনিষ্ঠ

সারা পথ তার পিছে পিছে গিয়ে ধরিনু উত্তরীয়;
কহিলাম, "ঘৃণা করোনা, করোনা, আমি চির সাথী, প্রিয়।"
সারা রাত তার পিছে পিছে ফিরে শেষে ধরিলাম কর;
কহিনু, "ফেলিয়া যেয়োনা,—তোমার প্রেম মম নির্ভর।"

'শী-কিং' হইতে

—

## মিলন-গীতি

দখিণ দেশের সরল তরু
অঙ্গে লতা লতিয়ে যায়!
ভাগ্য দেবীর আশীষ-রাশি
কন্যা-বরের সঙ্গে ধায়।

দখিণ দেশের নম্র তরু
ভুঞ্জে লতার সোহাগ-সুখ;
কন্যা-বরের হর্ষে জাগে
ভাগ্য দেবীর সহাস-মুখ।

দখিণ দেশের ফুল্ল তরু
ভুঞ্জে লতার আলিঙ্গন!
ভাগ্য দেবীর প্রসাদ লভি'
কন্যা-বরের হরিষ মন!

'শী-কিং' হইতে

—

## মনের কল

এক পড়নে হাজার সুতা নড়ে
এধার হতে ওধারে যায় মাকু
সংখ্যাতীত সুতার আঁকু বাঁকু
অলক্ষিতে হাজার বাঁধন পড়ে।

Goethe

—

## বসন্ত পূজা

পল্লবের উদ্ভিন্ন গৌরব, পুলকিত ফুলের সৌরভ,
চাতকের মূর্চ্ছনা মধুর, কোকিলের কুহু কুহু সুর,
ভুবন ভুলানো সমীরণ, তপনের আতপ্ত কিরণ,—
আজ তোরা সারাদিনমান, ইহাদেরি গা'রে জয়গান,
আর কিছু নাই প্রয়োজন, কাজ নাই কোনো আয়োজন,
আর কিছু হবেনা খুঁজিতে, ঋতুরাজ বসন্তে পূজিতে।

Uhland

—

## সন্ধ্যায়

দিনের আলোয় আমরা যাদের হারিয়ে ফেলি, হায় ;
সন্ধ্যারাণী তাদের আনি মিলায় পুনরায় ।
ফিরায় ঘরে বৎস ধেনু মন্ত্রেরি সুরে,
ফিরায়গো সুখে মায়ের বুকে শ্রান্ত শিশুরে ।

Sappho

—

## বার্দ্ধক্যে

চটুল শশক সহজে দিতনা ধরা,
বনের কপোত কদাচ পড়িত জালে,
চিন্তা ছিলনা, ছিলনা এমন জরা,
এ দুর্ভাবনা ছিল না কিশোর-কালে ;
এবে বিফলতা সহিতে কেবল আছি,
মৃত্যুর কোলে ঘুমাতে পারিলে বাঁচি ।

চঞ্চল মৃগ সহজে দিতনা ধরা,
টোপের লালসে বঁড়শী গিলিত মীন,
রাজ্য তখন শঙ্কটে নহে ভরা,
শান্তিতে কেটে গেছে যৌবন-দিন ;
বৃদ্ধ বয়সে যত জঞ্জাল জুটে,
আসুক সে ঘুম, আহা, যাহা নাহি টুটে ।,

শশক হরিণ পলায়ে ফিরিত খালি,
তখন ও মনে ছিলনাক ভাবনাই,
তখন ফিরেছি হাতে হাতে দিয়ে তালি,
এখন যুদ্ধ—এখনি শক্তি নাই !
বয়সের শেষ—শান্তির শেষ নাহি,
চেতনা-হরণ মরণেরে ডাকি—'ত্রাহি' ।

— 'শী-কিং' হইতে

## তেহিরাণ গান

### Teheran Song.

বুক পেতে দিছি সুন্দরী,
মার তুমি মার ছুরি !
তোমার চুলের কাঁটা খুলে,
লাগাও জোরে আমার চুলে,
বর্শা বিঁধে দাও ললাটে
হে সুন্দরী ! যাদুকরী !
মাথা পেতে দিছি পায়ে
সুন্দরী গো যাও মাড়ায়ে
গলা পেতে দিছি—ওগো
হান তোমার তরবারি !

—

## অভঙ্গ

কনে যখন শ্বশুর-ঘরে যায়,
বারে বারে ফিরে সে তাকায় ;
হিয়া আমার তেমনি করে, হায়,
প্রভু দেখা দিবে কি আমায় ?

কোলের বাছা হারিয়ে জননী,
কেঁদে কেঁদে তিতায় অবনী,
বন বিজনে ব্যাকুল হরিণী,
হারা নিধি খুঁজিয়ে বেড়ায় ;
ডাঙার 'পরে মৎস্যেরি প্রায়,
তুকা বুঝি মরে যাতনায় ।

তুকারাম

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

# পরের ছেলে

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাসখানেক না যাইতেই উভয় পরিবারের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতাটা গভীর সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হইয়া পড়িল। এতই আন্তরিক আগ্রহে স্নেহের আদান-প্রদান চালাইতে-ছিলেন যে বাহিরের কোন লোক হঠাৎ আসিলে তাঁহাকে মোহিনীবাবুদের কোন নিকটতমা আত্মীয়া বলিয়াই মনে

শিশু ভ্রাতা-ভগ্নীরা তো তাহাদের মাসিমার স্নেহে ও আদরে একেবারে অভিভূত হইয়াই পড়িয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই এখন মাসিমাকে নহিলে চলে না। মাসিমাও তাহাদের ছাড়িয়া নিতান্ত আহার-নিদ্রার সময়টুকু ছাড়া একা আর তিষ্ঠিতেই পারিতেন না। খাইয়া উঠিয়া হয় ত কেবল মুখে মশলা দিয়া একটু গড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, অমনি বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিতেই বুঝিলেন, হয় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে কেহ আসিতেছে, কোথাও হয় ত তাঁহাকে এখনি তাহাদের অভিভাবিকা সাজিয়া বাহির হইতে হইবে,—নয় ত তাঁহার ঘর-দ্বার তছ্‌নচ্‌ করিয়া মধুর কলহাস্যে ও সঙ্গীতে গৃহটি পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য দস্যুদলের আবির্ভাব হইতেছে। বলা বাহুল্য যে এই সুমিষ্ট উপদ্রবটুকু ভোগ করিবার জন্য অত্যাচারিত ব্যক্তিটিরও আগ্রহের সীমা থাকিত না। ঝর্ণার মা যখন-তখন রাজেশ্বরীকে অনুযোগ করিতেন, "দিদিকে একটু যদি পাবার জো আছে! ওদেরই একেবারে এমন এক-চেটে হয়ে পড়্‌লেন যে আমার দুটো কথা কবারও সাবকাশ মেলে না! দেখুন তো এতে রাগ ধরে না?"

রাজেশ্বরী কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার অনুরক্ত-দলেরাই তখনি মাসিমার স্বত্ব-সাব্যস্তের মকর্দ্দমা আনিয়া মায়ের সঙ্গে এমন কোঁদল জুড়িয়া দিত যে মা বেচারী তখন নীরবে হারিয়া পলাইবার পথ পাইতেন না। মাতার এই অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতায় কিশোরকেও ক্রমে তাহার স্বভাব-জাত সঙ্কোচকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল—কিন্তু এক জায়গায় সেটী সমান অটলই থাকিয়া গেল। সকলের সহিতই তাহার ব্যবহার সহজ হইয়া আসিয়াছিল কেবল ঝর্ণার সঙ্গে সে এখনো পর্য্যন্ত কিছুতেই মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিত না। এবং তাহার সঙ্কোচেই বোধ হয় বাধা পাইয়া ঝর্ণাও তাহাদের মধ্যকার ব্যবধান রাখিয়াই চলিত। উভয় পক্ষেরই অবশ্য এ বিষয়ে যে লক্ষ্য ছিলনা তা নয়, কিন্তু তাহারাও এটুকু ভাঙ্গিয়া দিবার কোন উৎসাহ দেখাইত না, বরং এটুকুকে যেন তাহারা পরম উপভোগ্যের বিষয়ই মনে করিত। কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে যদিও জানিতে বাকি ছিল না যে সে দিনের আর বেশী দেরী নাই! সকলকে ভালবাসিয়া রাজেশ্বরী যে ঝর্ণার দিকে সে স্নেহের একটু বিশিষ্টতা বহন করিতেন, তাহাও বুঝিতে কাহারো বাকি ছিল না এবং সেজন্য ঝর্ণার ভাই-বোন্‌দের মধ্যে আনন্দ-হিংসার ধাক্কাও তাঁহার স্কন্ধে বড় কম পড়িত না।

রাজেশ্বরীর জীবনে এ আনন্দের স্বাদ কখনো অনুভবের মধ্যে ছিল না, তাই তিনি ইহাতে একেবারে বিভোর হইয়া যাইতেন। সুন্দর সুন্দর খেলনা ও কাপড়-জামা কিনিবার এবং তাহা দিয়া ছেলে-মেয়েদের সাজাইবার তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। নিজের সন্তান বলিয়া যাহাকে পাইয়াছিলেন তাহাকে দিয়া যথাসাধ্য এ-সব সাধ মিটাইলেও রাজেশ্বরী তাহাতে যেন এমন্‌ সুখ পান্‌ নাই। যাহাকে সাজাইতেন সে তো কখনো এমন আদর-আব্‌দার করিয়া কাহারো সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা বাধাইয়া তাঁহার নিকট হইতে যেন জোর করিয়া কাড়িয়া লইত না, তাই সেই পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে তাহার কোন সাড়াই রাজেশ্বরীর বুকে আসিয়া পৌঁছায় নাই। সে যেন কাঠের পুতুলকেই সাজানো হইয়াছিল। আর ইহারা এই যে ঝর্ণার দিকে তাঁহার একটু পক্ষপাত লইয়া সকল বিষয়েই তাঁহাকে খোঁটা দিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে ডবল আদর আদায় করিতেছে ইহাতে রাজেশ্বরী যেন তাঁহার মানস-কল্পিত আগত জীবনের অপরিসীম সুখেরই আস্বাদ অনুভব করিতেছিলেন।

সে দিন কলেজের ফেরত্‌ বাড়ী যাইবার পথে ঝর্ণাকে তাঁহার নিকটে নামিতে দেখিয়া রাজেশ্বরী আদর করিয়া কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের কথার পূর্ব্বেই চোখের আদরের উত্তর-স্বরূপে ঝর্ণাই আগে কথা কহিয়া উঠিল, "কাল্‌কে হবে না মাসিমা—সেই কথাই বলতে এলাম তাড়াতাড়ি।"

"কি হবে না কাল্‌কে? আমার কাছে সকলকে তোমাদের রেঁধে খাওয়ানো?—কেন?"

"কাল্‌কে আমাদের কাকাবাবু আস্‌ছেন মাসিমা, কলেজ আসবার সময় চিঠি পেয়েছি।" বলার সঙ্গে সঙ্গে

পুস্তকখানির মধ্যে কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাজেশ্বরী বলিলেন, "বাঃ, হবে না বল্‌লেই হল আর কি! কল্যাণী, নলি, জিতু ওরা নিজেরা রাঁধবে বলেছে—তুমি না পার নেই পার্‌বে বাপু, তা বলে ওদের ভোজে কেন বাধা দেবে? ওরা যার কত উৎসাহ ক'রে বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে বেড়াচ্ছে, এ কি আর বন্ধ করা যায় পাগ্‌লি?"

"নেমন্তন্ন করা হয়নি মাসিমা—চিঠিটা দিদিকে দেখিয়ে বারণ করে গেছি!"

রাজেশ্বরী একটু ভাবিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তোমাদের দিক্ না হয় সাফ্ রেখেছ আমি যে কিশোরকে—যাক্, সে না হয় আমিই তার বন্ধুকটিকে খাইয়ে দেব। আর সে যে ছেলে হয় ত কাউকে বলেইনি, তোমাদের কাছে তার যে লজ্জা! কিন্তু বল্‌ছিলাম এই যে, এলেনই বা তোমার কাকা! তাঁকে সুদ্ধ কিশোর গিয়ে তখুনি নিমন্ত্রণ ক'রে আস্‌বে, তিনি একটু বেহালা শুনিয়ে দেবেন সকলকে না হয়—"

ঝর্‌ণা বাধা দিয়া বলিল, "না মাসিমা কাল নয়। এর পরে এক দিন করলেই চলবে। তিনি দেড় মাস দু' মাস ঘুরে বাড়ী ফির্‌ছেন, কাল আমরা অন্য কিছুতে ব্যস্ত থাকতে পারব না। তিনি তাতে কি ভাববেন! এই দেখুন তাঁর চিঠি।" বলিয়া ঝর্‌ণা একটুক্‌রা চিঠি রাজেশ্বরীর হাতে দিল। ঝর্‌ণার আগ্রহাতিশয়ে রাজেশ্বরী অগত্যা কাগজ-টুকুর ভাঁজ খুলিয়া পড়িলেন—

"মা আমার ঝর্‌ণা, তোদের কাকা আবার তোদের কাছে ফিরে যাচ্ছে মা। তোরা জানিস্ না, সে তো বেড়াতে বেরোয়নি! আজ দু' বৎসর তোরা তার গলায় যে ফাঁস আস্তে আস্তে এ টে দিয়েছিস্ সেইটে একটু আল্‌গা করার চেষ্টাতেই সে এ দুদিন পালিয়ে দেখ্‌ছিলো। কিন্তু কিছু হলোনা মা, তাই আবার তোদের কাছেই ফিরে সে চলেছে! আমার কলি মা, জিতু, নলি, বুলা তাদেরও এই কথা বলো। আমায় যেন তোরা বকিস্ নে! এই প্রায় দুমাস তোদের হাতের দেওয়া খাবার খেতে না পেয়ে সেই জন্যে ভাল করে রেঁধে রাখে, আর তুই আমার স্বপ্নের স্নেহ-নির্ঝরিণি—আমার কল্পনা-স্বর্গের মন্দাকিনী, মাগো—তুই জানিস না জানিস্ না।"

রবিবারে পৌঁছুবো। ইতি তোদের কাকা।"

রাজেশ্বরী পত্রটুকু পড়িয়া ঝর্‌ণার পানে চাহিয়া দেখিলেন,—সে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। বোধ হয় তাহার কাকার পত্র-সম্বন্ধে তিনি কি মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহারই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাজেশ্বরী একটু হাসিয়া সাদরে ঝর্‌ণার চিবুকে হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তবে যে জিতু কলি ওরা আমাকেই একা দোষ দেয়? এ যে দেখচি সবাই এক-দোষে দোষী! তোমার কাকাও যে একটু এক-চোখো দেখ্‌ছি গো। এ মুখখানিকে সব্বাই যে একটু বেশী ভাল না বেসে থাকতেই পারে না—"বলিতে বলিতে রাজেশ্বরী অগ্রসর হইয়া সাদরে সেই মুখখানির প্রতিভা-উজ্জ্বল শুভ্র সুন্দর ললাটে একটি স্নেহ-চুম্বন স্পর্শ করাইয়া দিলেন।

ঝরণা লজ্জিত মুখে হাসিয়া বলিল, "কাকাই বুঝি এর থেকে নিস্তার পান? তাঁকেও রাতদিন আমাদের এ ঝগড়া সইতে হয়। এইবার যাই মাসিমা,—নলির এখনো ক্লাশ চল্‌ছে। আমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে 'কার্' আবার তাকে আন্‌তে যাবে। আপনাকে এই খপরটা শীগ্‌গির দেওয়া দরকার বলে আমার ক্লাশ হয়ে যেতেই চলে এসেছি আজ।"

রাজেশ্বরী বলিলেন,"আচ্ছা, তিনি কাল কখন্ আসবেন, তাতো কৈ লেখেননি—"

চলিতে চলিতে ঝর্‌ণা উত্তর করিল, "তাঁর কি অত হিসেব করা স্বভাব? তাঁকে দেখলে তবে বুঝতে পারবেন তিনি কি রকমের মানুষ। খেতে বসে খেতে ভুলে যান; ঠিক যেন ছোট ছেলে কি পাগলের মতই অন্যমনস্ক! গায়ে একটা গেঞ্জি কি সার্ট দিয়ে কিম্বা কখনো তাও না দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েন, জামার বোতাম দিতে কখনো তাঁকে দেখ্‌তে পাইনা।—যখন তিনি প্রথম আমাদের বাড়ী আসেন—তখন যেন তিনি কথা কইতেই পারতেন

তখনি ঘাড় তুলে বসতেন আর স্বাভাবিক মানুষের মত কথা কইতেন। বেহালা হাতে নিতেন যখন, তখনি তাঁকে ঠিক্ চেনা যেত যে কতখানি ক্ষমতা তাঁর। কিন্তু প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে কথা কইতেন, আমায় ভাল বাসতেন। সময় সময় এমন ভাবেন যেন বাহ্যজ্ঞানই থাকে না! যেন খুব দুঃখ পেয়েছেন জগতে, এম্‌নি মনে হয়। তাঁকে আমরা কি করে যে খেতে শিখিয়ে—কত করে তবে তাঁর শরীর সারিয়ে একটু ভাল করেছি মাসিমা—তাঁকে আমাদের বড্ড ভাল লাগে, সবাই তাঁকে ভালবাসে—"

"তা তোমার কাকার চিঠিতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে গো! মা'টিকে দুমাস ছেড়ে গিয়ে ব্যাচারা ধড়ফড় করছেন। আচ্ছা, আজ এসো তুমি, আমারও তোমার কাকাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে—কাল সন্ধ্যা-আন্দাজ খবর নেব একবার। চল, গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি তোমায়—"

"না না, আমি এটুকু যেতে পারব। বাইরে কেউই নেই, আপনাকে নাম্‌তে হবে না, মিছি-মিছি এতখানি—ঝী আছে ত নীচে, তাকেই নাহয় ডেকে নিচ্ছি। শুন্ আপনি—"বলিতে বলিতে একটু দ্রুতপদে ঝর্ণা সোপান-শ্রেণীর কয়েকটা অতিক্রম করিল দেখিয়া রাজেশ্বরী আর তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন না; শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

ঝর্ণার কিন্তু একটা কথা মনে ছিলনা যে সেদিন ঐ সময়ে কিশোরও কলেজ ফেরত্ বাড়ী আসিতে পারে। ত্রিতলের সিঁড়িটার নির্জ্জন পথ সে কতকটা সেই বাল্যকালের গতিতেই নিরাপদে পার হইয়া আসিয়া দ্বিতলের সিঁড়িতে পা দিতেই দেখিল, একখানা বই হাতে কিশোরও ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতেছে। উভয়ের সহিত উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র মুহূর্ত্তে ঝর্ণার সেই নির্ঝরিণী-গতি ভঙ্গ হইয়া গেল। সহজেই সে কিশোরের সম্মুখে পড়িতে চাহে না—তাহাতে এই দ্রুত ধাবনের মধ্যে আজ একেবারে সম্পূর্ণ একা সেই কিশোরেরই সম্মুখে পড়িয়া ঝর্ণা এতটাই চম্‌কাইয়া উঠিল—যে পরক্ষণে সে [illegible] এই অস্বাভাবিক লজ্জায় লজ্জিত হইয়া সিঁড়ির দেওয়াল ধরিয়া একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং যতক্ষণ না কিশোর সমস্ত সিঁড়িটি অতিক্রম করিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিয়া গেল ততক্ষণ সেখান হইতে এক পাও নড়িতে পারিল না।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে ঝর্ণা চোরের মত নিঃশব্দ পদে যখন গিয়া তাহাদের 'কারে' উঠিল—তখন তাহার অবনত দৃষ্টি চকিতে একবার উধাও হইয়া উপরের পানে ছুটিতেই মুহূর্ত্তে সেখানেও সে আবার ধরা পড়িয়া গেল। ত্রিতলস্থ পাঠ-গৃহের জানালার সুমুখেই কিশোর 'কারে'র পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঝর্ণার পাশ দিয়া যখন সে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া যায় তখন উভয়ের মুখের সেই আরক্তচ্ছটার আলো—কেহ কাহারো প্রতি দৃষ্টি না করিলেও তাহা যে কোথা দিয়া উভয়েরই অন্তর্চক্ষুর সামনে পড়িয়াছিল সে কথা বলা দুরূহ। কিন্তু এখন ঝর্ণার চকিত দৃষ্টি সহসা যেখানে ধরা পড়িয়া আবার নিঃশব্দে নিজস্থানে ফিরিয়া আসিল, সেখানে তো আলোর কোন রেখার আভাসমাত্র সে আর পাইল না। কেমন একটা বিবর্ণ শুষ্কতার,—ব্যথার পাণ্ডুর রাগই সেখানে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে! ঝর্ণা নত দৃষ্টিতে আসনে বসার পর কার সশব্দে ছুটিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এইখানে বলা আবশ্যক যে রাজেশ্বরী একদিন ঝরণার মার কানে কানে ছেলের অদ্ভুত 'মুখচোরাত্বে'র প্রমাণার্থে গোড়ার কথাটা একটু বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। ছেলে যে দু'বৎসর আগে হইতেই নামটুকু দেখিয়া ঝরণাকে চিনিতে পারিয়াছিল—তথাপি একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে তাহার ক্ষমতা হয় নাই, এটুকু তিনি হাসিয়া বলিলেও গোপনে ঝরণার মার কানে বলাতেই তাহার সারাংশটুকু ঝরণার মার বোধগম্য হইতে বিলম্ব ঘটে নাই। তিনিও এ প্রার্থিত আনন্দের অংশ হইতে স্বামী এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীকে বঞ্চিত করেন নাই। কল্যাণী মেয়েটি মায়ের যথেষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও এ[illegible] লইয়া ঝরণাকে দু-একটি সুমিষ্ট পরিহাস করার প্রলোভন[illegible] যে সম্বরণ করিতে পারিয়াছে ইহা মনে করাই একার[illegible]

কারণও ছিল। দিদি যতটা না বলিয়াছে বা না জানে সেটুকুও ঝরণার অবিদিত ছিলনা। তাই সহসা কিশোরের এই নূতন ভাবান্তরে সে একটু বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহারা কেহই কাহারো দিকে তো চাহেই না,—তবে আজিকার মত দৈবাৎ যদি কখনো এ কাণ্ড ঘটিয়াই থাকে তাহাতে তো কোনদিন এমন বোধ হয় নাই। আজ এমন কেন লাগিল! ঝর্‌ণা এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে কার বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলে সোফারের 'দিদিমণি' আহ্বানে তবে তার সে বিষয়ে হুঁস হইল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজেশ্বরী সেই শনিবারের দ্বিপ্রহর হইতে রবিবারের বৈকাল পর্য্যন্ত একা কাটাইয়া প্রায় হাঁফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের মনের মধ্যেও একটা তাগিদ আসিয়াছিল যে আর অনর্থক বিলম্ব না করিয়া এইবার কথাটা পাড়িয়া ফেলা যাক্। কন্যাপক্ষের দিক্ হইতেও যে ইহার প্রতীক্ষা চলিতেছে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন—তবে এ ক্ষেত্রে যে হিন্দু সমাজের চিরাগত প্রথামত কন্যার মা-বাপই প্রথমে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবেন—সে নিয়মটুকু যে এখানে খাটিবে না, তাহাও তিনি বুঝিতেছিলেন। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা চায় যে তোমরাই আগে আমাদের মেয়েকে চাহিবে! আমাদের হাজার প্রার্থনীয় হইলেও সাদর প্রার্থনা না পাইলে আমরা তো সেখানে যাচিয়া গছাইতে পারিব না। তাই রাজেশ্বরী এইবার স্পষ্ট কথা বলিয়া সাম্‌নের অগ্রহায়ণ মাসের জন্য প্রস্তুত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

কোন বিষয়ে সংকল্প স্থির করিবার পর তাঁহার ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইত। বরাবরই তাঁহার স্বভাবে এই অধীরতাটি বর্ত্তমান ছিল। সেদিনও কিশোরকে লইয়া তিনি বৈকালে খানিক বেড়াইয়া শেষে রিচি রোডের দিকে ট্যাক্সি চালাইতে আদেশ করিলে কিশোর একটু হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিল।

ছেলের এই নীরব হাসির পরিহাসটুকু তাঁহার খুবই ভাল লাগিল। এতদিনে এইবার তাঁর ছেলেও যে তার অসঙ্গত লাজুক স্বভাবকে কাটাইয়া সাধারণ ছেলের পদে দাঁড়াইয়াছে, এবিষয়ে তিনি আজ যেন অনেক নিশ্চিন্ত হইলেন। এইবার সহজেই তিনি তাঁহার প্রস্তাবটা পাড়িতে পারেন বলিয়া মনে হইল। আর কোন বাধাই যেন সম্মুখে নাই! কিশোরের সম্বন্ধে তাঁহার মন এত'র পরেও সময়ে সময়ে কেমন শঙ্কিত হইয়া উঠিত। যাহা বুঝিয়াছি তাহা ঠিক্ তো?—এ আশঙ্কা অনেকবারই তাঁহার মনে হইয়াছে। ছেলেটি তাঁর চিরদিনই যে অনেকখানি দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু আজ মনে হইল তিনি ঠিক্ই বুঝিয়াছেন।

ছেলের হাসিতে যেন লজ্জিত হইয়াই অস্বীকারের সুরে রাজেশ্বরী বলিলেন, "ওদের কাকা এসেছেন যে,—নিমন্ত্রণ করতে হবেনা তাঁকে একদিন? হাস্‌লেই হল আর কি!"

"আমি কি কিছু বলেচি মা তোমায়?"

"হাস্‌লি কেন তবে? কাজ আছে বলেই যাচ্ছি আজ, শুধু গল্প করবার জন্যে নয়।"

কিশোর মাতার এই প্রতিবাদে এইবার মনে মনে একটু বেশী পরিমাণে হাসিয়া লইয়া বাহিরে মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া বলিল, "আজকেই কি নিমন্ত্রণ করতে হবে?"

"তাও কি হয়? মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি, কবে সুবিধে হয়।"

মোহিনী বাবুর দ্বারে গাড়ী দাঁড়াইলে রাজেশ্বরী বলিলেন, "বেশী দেরী হবেনা আজ,—ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েই থাক্। মোহিনী বাবু এখন তো বাড়ী আছেন, যাবি না তাঁর কাছে?"

"যাব" বলিয়া মাতার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর নামিয়া পড়িল। রাজেশ্বরী একটু অন্য পথে এবং কিশোর সম্মুখের প্রথম বড় হলটার পথ ধরিতেই একটি বালিকা মোটরের শব্দে বাহিরে আসিয়া রাজেশ্বরীর সঙ্গে চলিল। রাজেশ্বরী বাড়ীর ভিতরের দিকে চলিয়া গেলে কিশোর হলের পর্দ্দা সরাইতেই দেখিল হলে তখন কতকটা পারিবারিক অধিবেশনই বসিয়াছে। মোহিনী বাবু এবং আর একজন অপরিচিত

আর তাঁহার কন্যা-পুত্রগুলি প্রায় সকলেই সেখানে উপস্থিত আছে। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে ঝরণা ও কল্যাণীর দীপ্ত কান্তি সর্ব্বপ্রথম কিশোরে চোখে পড়িল। তাহারা একজন একখানা কৌচে বসিয়া আছে এবং একজন একখানা কৌচের পিছন ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া হাসিয়া সানন্দে আবদারের সুরে যেন কাহাকে কি বলিতেছে। তাহাদের মধ্যে মধ্য-বয়সী শীর্ণকান্তি এক ব্যক্তি একখানা কৌচে বসিয়া আছে। কিশোর পর্দ্দা সরাইয়া একটু অপ্রতিভ ভাবে থমকিয়া দাঁড়াইতেই যুগপৎ একসঙ্গে অনেকগুলা দৃষ্টিই তাহার উপরে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সাগ্রহ আহ্বানের অস্পষ্ট সুর ও সানন্দ দৃষ্টি কিশোরের দিকে ছুটিয়া আসিল। মোহিনী বাবুর কণ্ঠই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ভাষা দ্বারা অভিনন্দিত করিল, "এই যে, এস বাবা এস! তোমাদেরই কথা হচ্ছিল এখনি! আমার বিনয় ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দি, এস! বিনয় আজ এই সবে ট্রেণ থেকে নেমেছে; কিন্তু এখনি আমরা একদিন একটা ভাল রকম গান-বাজনার বৈঠক বসাবার পরামর্শ আঁট্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, কিশোর? এই দিকে এসে বসো।" বলিয়া মোহিনী বাবু নিজেরই দীর্ঘ আসনখানার একদিক নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আবার মহোৎসাহে কন্যাদের পানে চাহিয়া নিজের অসমাপ্ত কথা পুনরারম্ভ করিলেন, "না বাপু সেটি তোমরা এখনো পাচ্ছনা। এই ঝাড়া দুটি মাস আমি একা একা মুখটি বুজে আছি—বিনয় আস্‌তেই যে তোমরা তাকে এখনি দখল করে বস্‌বে সেটি হচ্চে না। আগে আমাদের বুড়োদের দুটো-চারটে বৈঠক আর আড্ডা দেওয়া শেষ হয়ে যাবে—তারপরে তোমাদের দখলে আমি বিনয়কে ছেড়ে দেব। কি বল ভায়া?" বলিয়া নিজের উৎসাহে তিনি নিজেই হাস্য করিতে লাগিলেন। কিশোর যে এখনো দ্বারের নিকট হইতে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না, সেবিষয়ে তখনো তাঁহার মনোযোগ আকর্ষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি সমান উৎসাহে সে স্থানটা কিশোরকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন নিজের আসনের সেই বাহুল্য স্থানটিকে পুনঃ পুনঃ চাপড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে পুত্র কন্যা এবং কিশোরকে অভয় দিবার জন্য পুনরায় হাসির সহিত বলিলেন, "অবশ্য তাতে তোমাদের ভয়ের বিষয়ও নেই, সে বুড়োদের আসরেও তোমাদের তো অবারিত দ্বার। কেবল তোমাদের স্পেশাল বৈঠক—অর্থাৎ বন্ধুবান্ধব এনে নিজেদের ঘরের কোণে মজলিস সেইটি তোমরা এখন দিন কতক পাচ্ছ না, বুঝ্‌লে বাপু? বিনয়ের শরীরও আবার যা হয়েছে! তোমরা তো আমাদের মত অল্পে সন্তুষ্ট হতে জাননা;—বেচারাকে এখন তোমাদের হাতে দেওয়াই অবিধি। হয়ত এতই ফরমাস্ বাড়্‌বে—"

বাপের অসংযত বাক্য-স্রোতে বাধা দিয়া কল্যাণী সোদ্বেগে বলিয়া উঠিল, "ও কি কিশোর অমন করে দাঁড়িয়েই রইলে যে! এদিকে এস—এসে বসো।"

কল্যাণীর উচ্চ সম্বোধনে সচকিত হইয়া কিশোর চাহিয়া দেখিল—আবার অনেকগুলা চক্ষু যুগপৎ তাহার উপর পতিত হইয়াছে। আশ্রয়ের জন্য সে এতক্ষণ পর্দ্দার কাপড়টা এক হাতে মুঠা করিয়া ধরিয়াই দাঁড়াইয়াছিল। এইবার সেটা ছাড়িয়া দিয়া সে দুই-চারি পা পিছু হঠিতেই গৃহমধ্য হইতে কয়টা ব্যগ্র আহ্বান ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"ও কি, যাও কোথায়? কিশোর—কিশোর—" সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের যেন বোধ হইল অজিত ও আরও কে কে তাহার দিকে উঠিয়াও আসিতেছে। অমনি ত্রস্তে কিশোর কম্পিত স্বরে "আজ নয় কাল—কাল আস্‌ব—আজ মাকে পৌঁছুতে মাত্র এসেছিলাম—বড্ড দরকার" বলিতে বলিতে দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ-ক্ষেপে একটা তীব্র অস্থিরতার সঙ্গেই একেবারে গিয়া ট্যাক্‌সিতে উঠিয়া বসিল। মাতাকে যে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া চালককে "চলো "বলিয়া আদেশ করিতেই সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে লাগিল। ইতি মধ্যে সম্মুখের বারান্দায় বিস্ময়-বিমূঢ় কয়েক-জোড়া চোখই যে জমিয়া গিয়াছিল, সেদিকে কিশোর আর একেবারেই চাহিল না। একবার কানে গেল, "কিশোরবাবু, বাবা ডাকৃচেন যে—শুন্‌চেন না?" কিশোর ইহার আর কোন

নিবারণ করিল না। মুহূর্ত্তেই ধুলা উড়াইয়া সে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

অজিত হলে ফিরিয়া গিয়া দেখিল, পিতা যেন অবাক্ হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া আছেন,—কল্যাণী ঝরণাও যেন রুদ্ধশ্বাসে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অজিতকে একা ফিরিতে দেখিয়া মোহিনী বাবু সাশ্চর্য্যে বলিলেন, "এলো না?"

"না, চলে গেল।"

তিনি তখন যেন আরও খানিক অবাক্ হইয়া প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এমন তো সে কখনো করে না! অতি শিষ্ট ছেলে, অতি ভদ্র, সে আজ হঠাৎ—কোন অসুখই কি কর্‌লো। কি রকম তোর মনে হয়—জিতু?"

"কিছু তো বুঝতে পারলাম না" বলিয়া জিতুও চিন্তিতভাবে রহিল। সকলেই সমান আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিল। কল্যাণী তখন বলিল, "যাই হোক্, মাসিমাকে কথাটা জানাই, যদি হঠাৎ কোন অসুখই বোধ করে থাকে, তিনিও শুন্‌লেই নিশ্চয় এখনি চলে যাবেন।"

কল্যাণী উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলে গৃহ-মধ্যে যেন একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। একটু আগে যে গৃহে এত হাস্যালাপ চলিতেছিল কয়েক মুহূর্ত্তেই সে ভাব একেবারে যেন উল্টাইয়া গিয়াছে! কেবল তাহার মধ্যে সেই শীর্ণকায় নবাগত ব্যক্তি, ঝরণাদের সেই কাকাটি, একই রকম স্তব্ধ গম্ভীরতার সঙ্গে অমন ভাবে জানালার বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার-মাখা অঞ্চলের পানে চাহিয়া ছিলেন। সে জগৎ ঢাকিয়াছে বটে কিন্তু মানুষকে লুকাইবার তাহার ক্ষমতা কোথায়! এই যে কোণের মধ্যে তাহার অতন্দ্র দীপ্ত চক্ষু জ্বলিতেছে! এ আলো এ আঁধার, দুইই যেন তাঁহার আঁচলের এ পিঠ্ ও পিঠ্।

তখনি ঘরের কার বা গাড়ী যাহা হোক শীঘ্র প্রস্তুত এবং অবিলম্বে জিতুবাবুও তাহাদের মাসিমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

এই সহসা আগত দুশ্চিন্তা ও অপ্রসন্নতার ভারকে মন হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টায় তখন মোহিনীবাবু তাঁহার কথার ছিন্ন সূত্রকে জোড়া দিবার উদ্যোগ করিলেন। "হ্যাঁ, তারপরে পুরী থেকে কোন্‌দিকে গেলে? মান্দ্রাজটা নিশ্চয়ই ছেড়ে আসনি, কি বল? যখন ওয়াল্‌টেয়ার—"

"আজ একটু সকাল সকাল শুই দাদা—কি বলেন?" বলিয়া ঝরণার কাকা চেয়ার ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই তাঁহার মস্তকের রুক্ষ চুলের মধ্যে এতক্ষণ যে একখানি কোমল হস্ত মৃদুভাবে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দরুণ স্তব্ধ হইয়া একস্থানেই কিছুক্ষণ আবদ্ধ হইয়া থাকিতেছিল সেখানি সহসা স্খলিত হইয়া তাঁহার স্কন্ধ বাহিয়া যেন নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িল। তখনি সচকিতে দেহখানি নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মা—"

ঝরণা চমকিয়া তাঁহার পানে চাহিল। এই 'মা' শব্দটী আজ কি করুণ কি আর্ত্ত ভাবে ভরা! এমন সুর যেন তাঁহার কণ্ঠে ঝরণা আর কখনো শোনে নাই! সে ব্যথিত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল—ইতিমধ্যে মোহিনী বাবু ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ ঠিক্ আজ যে তুমি ক্লান্ত আছ—সে কথা ভুলেই গেছি। তাতে যে শরীর হয়েছে তোমার! ঝরণা, তোর কাকাকে আর বকাস্‌নি, খাবারের কত দেরী দ্যাখো দেখি। সকাল সকাল খাইয়ে ওঁকে শুতে দে, আর বেশী বিরক্ত করিস্‌নে।"

এইবার ঝরণার মুখে একটু হাসি আসিল। সেইই যেন এতক্ষণ যত যা করিবার সমস্ত করিয়াছে এবং করিতেছে! কিন্তু সেটুকু প্রকাশ না করিয়া কেবল সাদরে কাকার দিকে চাহিয়া বলিল, "এই তো সবে জল খেয়েছেন। এর মধ্যে খেতে পারবেন কেন,—তার চেয়ে—"

"হ্যাঁ, বড্ডই তো জল খাইয়েছিস্, না চা খাওয়া, না কিছু। বিনয়, আমি এখনো তোমায় বল্‌ছি তুমি এখনো

"যান্ তো কাকা, আপনি গিয়ে একটু শুন্ তো, নইলে নিজেই ঐ রকম করতে থাকবেন আর বল্‌বার বেলায় আমাদের বলবেন, বকাস্‌নে বেশী। ঐ দিদি আসছেন আবার, ওঁর সঙ্গে তো কেউই আমরা পেরে উঠ্‌ব না! পালান্ আপনি এই বেলা।"

"বটেরে বেটী? একা আমারই দোষ? তবে আবার পালাতে বলা হচ্চে কেন কাকাকে, শুনি? এবার ভূতেদের মুখেও রাম নাম বেরিয়েছে—শুনচো হে বিনয়? কিন্তু তুমিও ওদের দলে পড়, এই আমার বড় দুঃখ। আমার দলে তোমার কেউই নও, কেবল—"

"কাকা আপনি টল্‌ছেন—দাঁড়াতে পারছেন না যে, শুতে যান। একটু ঘুমিয়ে নিলে ক্লান্তি যাবে, তারপরে একটু বেশী রাত্রে আপনাকে খেতে ডাকবো। কেমন? একটু শুতে যান এখন।"

আবার যেন কোন্ অতি-দূর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে কে বলিল, "যাই মা—তবে এখন আসি।" ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

---

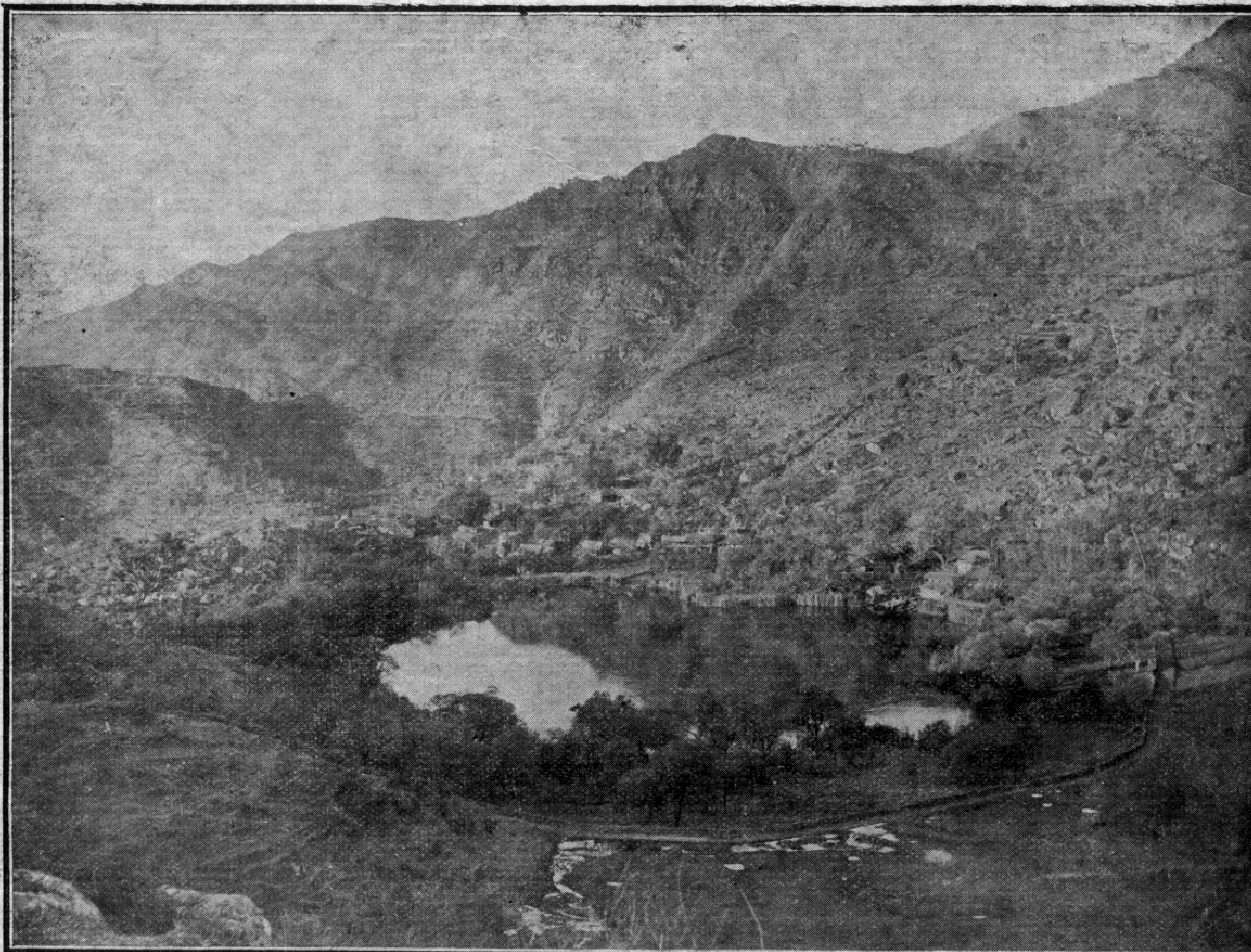
# ব্যাসকুণ্ড

বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্য নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে পঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানকার পার্ব্বত্য দৃশ্য অতীব রমণীয়। ইচ্ছা হইল, হোঁসিয়ারপুর হইতে কুলু হইয়া ব্যাস নদীর উৎপত্তি স্থান দর্শন করিয়া আসি। এইরূপ সংকল্প স্থির করিয়া আমি গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে লাহোর হইতে বহির্গত হইয়া ৬ই তারিখে হোঁসিয়ারপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হোঁসিয়ার পুরে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি যাত্রা সুরু করিলাম।

প্রথম দিন মাত্র ৭ মাইল হাঁটিয়া আমি "সাদ্ কা চক" নামক স্থানে পৌঁছিলাম। তাহার পরদিন আরও ৭ মাইল অতিক্রম করিয়া 'পড়োগা' নামক এক সমতল ভূমি দৃষ্টি-গোচর হইল। সেদিন সেই খানেই বিশ্রাম করিলাম। উক্ত "সাদ্ কা চক্" নামক স্থান হইতেই শিবালিক পর্ব্বতমালার পর্ব্বতরাজি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এই 'পড়োগা' ঐ শিবালিক পর্ব্বতমালার প্রথম পার্ব্বত্য প্রদেশ। এই স্থানে পৌঁছিতেই বর্ষা আরম্ভ হইল। কয়েকদিন কয়েক রাত্রি অনবরত বর্ষণের পর আকাশ একটু পরিষ্কার হইলেই আবার আমার যাত্রা আরম্ভ হইল। পড়োগা হইতে ছয় মাইল দূরে 'সুওঁা' নামক এক পাহাড়ী নদী পাওয়া গেল। সুওঁা শতদ্রু নদীর শাখা। গ্রীষ্মকালে ইহাতে একটুও জল থাকে না। কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হইলে ইহা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ইহা প্রায় ২ মাইল প্রশস্ত। নদীগর্ভে অসংখ্য বালুচর পারগামী পথিককে নানা প্রকারে কষ্ট দান করে। আমি যে স্থানে এই নদী পার হইলাম সেই স্থান হইতে এই নদীর উৎপত্তি স্থান 'চিন্তাপুর্ণী পর্ব্বত' প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই চিন্তাপুর্ণী পর্ব্বত-শৃঙ্গে প্রায়ই বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য সময়ে অসময়ে সহসা এই নদীর জলবৃদ্ধি হইয়া অনেক মানুষ ও পশুকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই নদীতে কখন্ জল বাড়িবে, কখন্‌ই বা কমিবে কিছুই ঠিক করিয়া বলা যায় না। এজন্য সহসা এই নদী পার হইবার উপায় নাই। ২।৩ দিন নদীর ও আকাশের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে ভয়ে এই নদী পার হইতে হয়। এজন্য আমাকেও নদীতীরে ২ দিন অপেক্ষা করিতে হইল। যাহা হউক আমি তৃতীয় দিনে ১২ টার পর বাহির হইয়া সুওঁা নদীর পরপারবর্ত্তী 'উনা' নগর অতিক্রম করিয়া রাত্রি প্রায় ৭ টার সময় 'নগাহা' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে আমি নগাহা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নগাহা হইতে প্রায় ১৪ মাইল পথ শিলাকঙ্করময় ও বন্ধুর। কিন্তু তার পর 'বমলু' পর্য্যন্ত এই পথ বেশ পরিষ্কার ও সমতল। বমলু হইতে সামান্য দূরে 'শুক্র' নামক এক নিম্ন উপত্যকা। অত্যধিক বর্ষা নিবন্ধন এই উপত্যকা জলপ্লাবিত হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক অতিকষ্টে এই জলময় উপত্যকা পার হইয়া আমি 'দিলসৌড়'

নামক স্থানে পৌঁছিলাম। সেদিন এখানে এক মেলা ছিল। নূতন এবং নানা-বর্ণ-বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া বহুদূরবর্ত্তী গ্রাম নগর হইতে অসংখ্য নরনারী মেলা দেখিবার জন্য এই স্থানে আসিতেছে। পাহাড়ী স্ত্রীলোক-দিগের পর্দ্দার কুপ্রথা নাই। সকলেই অসঙ্কোচে খোলামুখে চলিয়াছে দেখিয়া আমাদের দেশের সদাশঙ্কিতা অবগুণ্ঠনবতী

জন্য ভাল রাস্তা নাই। সামান্য পায়ে-চলার পথ মাত্র আছে। দারুণ বর্ষার জন্য এই পথও সুগম নহে। জলস্রোতে স্থানে স্থানে এই রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তার উপর আজ প্রাতঃকাল হইতে অবিরাম বর্ষণে রাস্তা ভয়ানক খারাপ হইয়া গিয়াছে। দুই তিন স্থানে পার্শ্বস্থ উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে শিলাকঙ্কর পতিত হইয়া পথটিকে দুরতিক্রম্য



রুয়াল সর

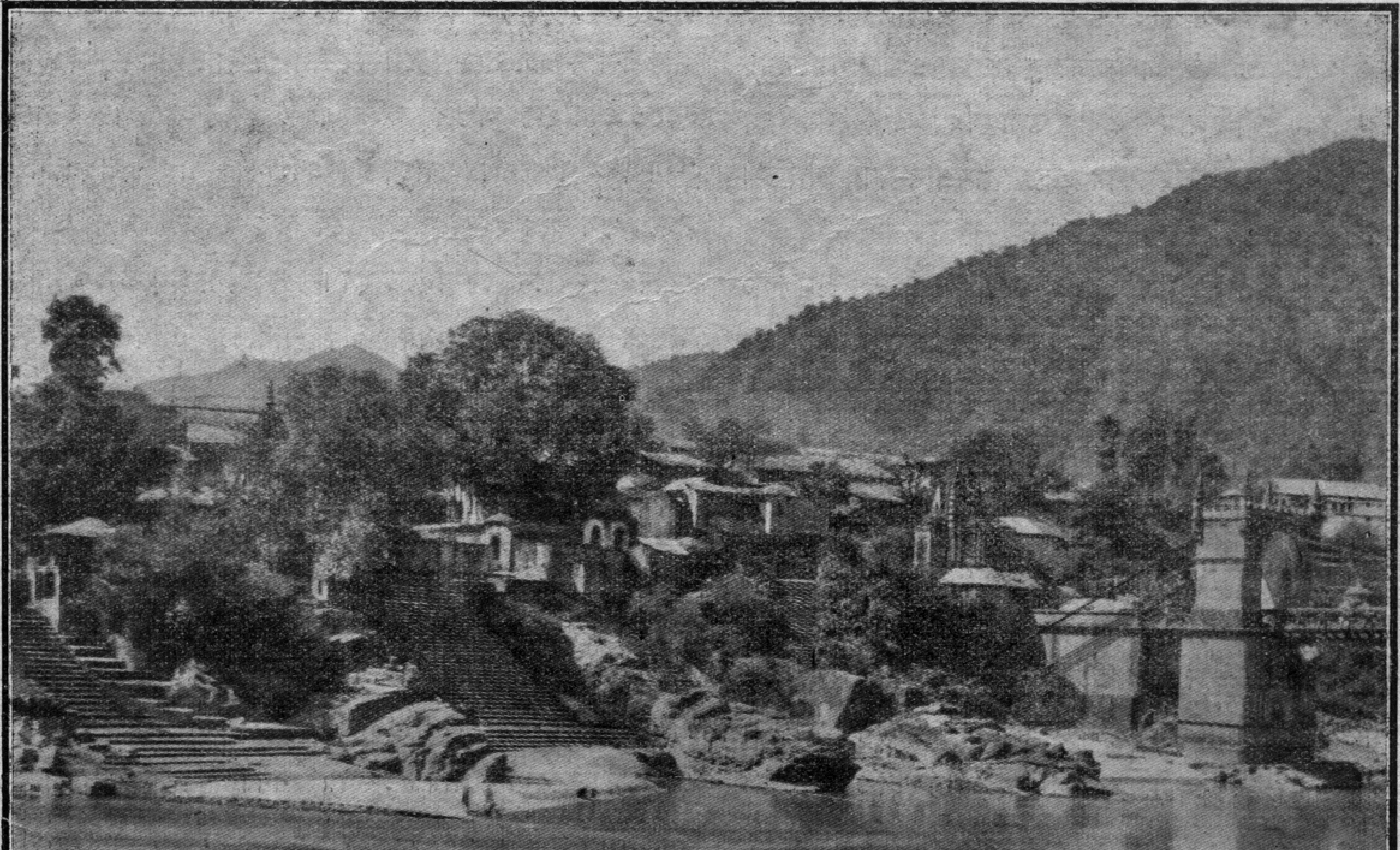
অন্তঃপুরিকাদের জন্য সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। প্রায় ২১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমি সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই 'জাহু' নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে একদিন বিশ্রাম করিয়া আমি ১৮ সেপ্টেম্বর 'রুয়ালসর' দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। জাহু হইতে রুয়ালসর প্রায় ১০ মাইল ব্যবধান। এখানে যাইবার

করিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ পথের এক পার্শ্বে সুগভীর নিম্ন ভূমি। ভূরিবর্ষণে সেই নিম্ন ভূমি দিয়া ভীম বেগে জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে—দেখিলেই ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে সুউচ্চ পর্ব্বত-গাত্র হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্খলিত হইয়া নিম্নস্থ জলস্রোতের উপর ভীমনাদে পতিত হইতেছে। দূরে পর্ব্বত-গাত্রস্থ ঢালে ধানের ক্ষেত দেখা

যাইতেছে। বর্ষাশীকরস্নাত বায়ু-প্রবাহে লীলায়িত সেই শস্পতরঙ্গ আমার পর্য্যটনক্লান্ত মনপ্রাণকে আজ নবীন সুরে সাড়া দিল। বর্ষণমুখরিতা প্রকৃতির ভীমকান্ত মঞ্জুশ্রী আমার কৌতূহলী প্রাণকে আজ নবীন ছন্দে অভিনন্দিত করিল।

প্রায় ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ণ দুইটার সময় আমি 'রুয়ালসর' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। অবিলম্বে আমার নিকট কতকগুলি পাণ্ডা উপস্থিত হইল। এই পাণ্ডাগণ মণ্ডী রাজ্য হইতে জায়গীর পাইয়াছে। বংশবৃদ্ধি ও অন্যান্য নানা কারণে ইহারা এখন সংখ্যায় অনেক হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহাদের অবস্থাও তেমন সচ্ছল নহে। ইহাদের আচরণও তাদৃশ পবিত্র বলিয়া মনে হয় না।

'রুয়ালসর' রাস্তার পাশেই একটি বৃহৎ হ্রদ। প্রবাদ এই যে, এই স্থানে লোমশ ঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন। কয়েকটি ভাসমান প্রস্তরস্তূপ দেখিয়া এই সরোবরের মাহাত্ম্য অনুমান করা যায়। প্রথমে এই সরোবরে ৭টি ভাসমান প্রস্তরস্তূপ দেখা যাইত। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি প্রস্তরস্তূপ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। এখনও ছয়টি ভাসমান প্রস্তরস্তূপ এই সরোবরকে মহিমাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রস্তরস্তূপ সকলকে কখনও কখনও সরোবরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। সরোবরের পার্শ্বেই মন্দির ও স্নানের জন্য প্রস্তরময় ঘাট।



ব্যাসনদী

এই রুয়ালসর হইতে মণ্ডী নগর যাইবার জন্য দুইটি পথ আছে। ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে রিড়্কু নামক এক পথপ্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া আমি মণ্ডীনগর অভিমুখে রওনা হইলাম। ৮ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর 'গঁভর' নামক এক নিম্ন উপত্যকায় আসিয়া পড়িলাম। এই উপত্যকায়

প্রায় এক হাঁটু জল। অতি কষ্টে আমি জলময় উপত্যকা পার হইয়া প্রস্তরময় রাস্তায় আসিয়া উঠিলাম। এই রাস্তার উপরে এক স্থানে 'লাহুলী' অক্ষরে লিখিত এক শিলা-লেখ দেখিতে পাওয়া গেল। প্রবাদ এই যে, এই শিলা-লেখে বৌদ্ধ মহাবাক্য আলিখিত আছে। এই স্থান হইতে দুই মাইল অন্তরে 'রত্তি' নামক আর এক নিম্ন উপত্যকা আছে। এই উপত্যকা গঁভর উপত্যকা হইতেও অধিকতর জলময়—এবং যাত্রাপথ চিক্কণ প্রস্তরখণ্ডে বড়ই কষ্টদায়ক। যাহা-হউক অতিকষ্টে আমি অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় মণ্ডী নগরে পৌছিলাম এবং তথাকার এক সরকারী সরাইয়ে আমার সেদিনকার মত বিশ্রাম-শয্যা পাতিয়া ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলাম।

মণ্ডী নগর ব্যাস নদীর বাম তটে অবস্থিত। নগরটি বেশ পরিষ্কার এবং সুন্দর। বিশেষতঃ চারিদিকেই অতিদূরে অন্যান্য নগর অবস্থিত বলিয়া এই নগরের মনোহারিতা আরো বাড়িয়া গিয়াছে। স্থানীয় বাজারটি বেশ প্রশস্ত স্থানে অবস্থিত। এখানকার প্রধান বাজারটির নাম 'চৌহাটা'। এই নগরে অনেকগুলি মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরের মধ্যে ভূতনাথের মন্দির ও ভগবতীর মন্দির বিশেষ দর্শনীয় স্থান। মণ্ডী নগরে একটি হাই স্কুল, হাঁসপাতাল, পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। জলের কল এবং বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও সম্প্রতি হইয়াছে। ব্যাস নদী ও এক নিম্ন উপত্যকার সঙ্গম-স্থলে সরকারী পান্থাবাস অবস্থিত। এই পান্থাবাস হইতে ব্যাস নদীর দৃশ্য বড় সুন্দর।

মণ্ডীর অধিবাসিবর্গের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। মুসলমান অতি সামান্যই আছে। গ্রাম সকলে মুসলমানের একান্ত অভাব। মণ্ডী-নগরের স্ত্রী-পুরুষ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে। স্ত্রীলোকেরা এক বিশেষ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে—তাহার নাম 'তিলক'। এই পরিচ্ছদের উপরের অংশ অনেকটা সার্টের অনুরূপ, নিম্নাংশ ঘাগ্‌রার মত। এই ঘাগ্‌রা সাধারণতঃ হাঁটুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত লম্বিত থাকে। নগরবাসিনী রমণীগণের মধ্যেই এই যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলেই এই 'তিলক' পরিধান করিয়া থাকে।

মণ্ডী নগরে ব্যাস নদীর উপরে এক পুল আছে। এই পুলের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে হইলে কর দিতে হয়। পুলের অপর প্রান্ত হইতে দুইটি রাস্তা বাহির হইয়াছে। একটি 'দরঙ্গ' এবং 'ঘট্ট' যাইবার পথ, অন্যটি 'কটৌলা' হইয়া 'কুলু' পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান হইতে কটৌলা প্রায় ১৩ মাইল। কিন্তু আমি দরঙ্গ হইয়া প্রায় ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সায়ংকালে কটৌলা পৌছিলাম। কটৌলা হইতে ৪ মাইল অন্তরে আর একটি পুল আছে। ইহাকে 'কমান্দ' পুল বলে। এখানে দুধ এবং ক্ষীর পাওয়া যায়। মণ্ডী নগরে পুল পার হইবার জন্য যে কর দেওয়া যায় তাহার রসীদ এইখানে দেখাইতে হয়। কটৌলা হইতে ১৬ মাইল অন্তরে 'বজৌরা' নামক এক পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে। কটৌলা হইতে ১৪ মাইল বেশ সুগম রাস্তা। কিন্তু বাকি দুই মাইল রাস্তা বড় খারাপ। অতিকষ্টে এই পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া আমরা বজৌরা আসিয়া পৌছিলাম। এবং গুরু পরিশ্রমে কাতর হইয়া আমি সেইদিন সেইখানেই রাত্রি যাপন করিলাম।

বজৌরা পার হইয়া আমি বেশ পরিষ্কার এবং সমতল রাস্তা পাইলাম। আমি ৯ মাইল পথ চলিয়া ২৩শে সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ১২টার সময় কুলু পৌছিলাম। কুলু ব্যাস নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এখানে শর্ব্বরী নাম্নী এক প্রচণ্ড বেগবতী স্রোতস্বিনী ব্যাস নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কুলু সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চ। এখান হইতে হিমাচ্ছাদিত পর্ব্বতশৃঙ্গের মনোহর দৃশ্য হৃদয়-মন বিমোহিত করে। ব্যাস নদীর জল অতীব স্বচ্ছ-শীতল, কিন্তু কূলের নিকটবর্ত্তী অংশ পঙ্কিল এবং নানা প্রকার তৃণগুল্মে অপরিচ্ছন্ন।

কুলুর অধিবাসিগণের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে আসিলে মনে হয় যেন সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত প্রদেশে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে। এখানকার লোকের কথাবার্ত্তা সহসা বোঝা যায় না। এখানকার অধিবাসিগণের অধিকাংশই

কুলগুরু ইহাদের বিবাহের দিন নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বরের পিতা বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে কতকগুলি বরযাত্রীর সহিত কন্যার পিতার ভবনে উপস্থিত হন। কন্যার পিতাকে পাঁঠা কাটিয়া বরপক্ষীয় লোকদিগকে ভোজ দিতে হয়। ভোজনান্তে বরপক্ষীয় লোকগণের মধ্যে একজন বেশ বলিষ্ঠ ব্যক্তি কন্যাকে পিঠের উপর চড়াইয়া বরের বাড়ীতে

কাপড় শাদারঙের। ইহারা জুতা পরে না। এই পার্ব্বত্য জাতীয়েরা ফুল বড় ভালবাসে। ইহারা ফুল দেখিতে পাইলেই তাহা ছিঁড়িয়া আপনাদের টুপিতে লাগাইয়া দেয়। স্ত্রীলোকদিগের গহনার বড় সখ। যদি অবস্থায় না কুলায় তবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিবর্ত্তে সীসার গহনাই তাহারা আনন্দের সহিত পরিধান করিয়া থাকে। মেলা



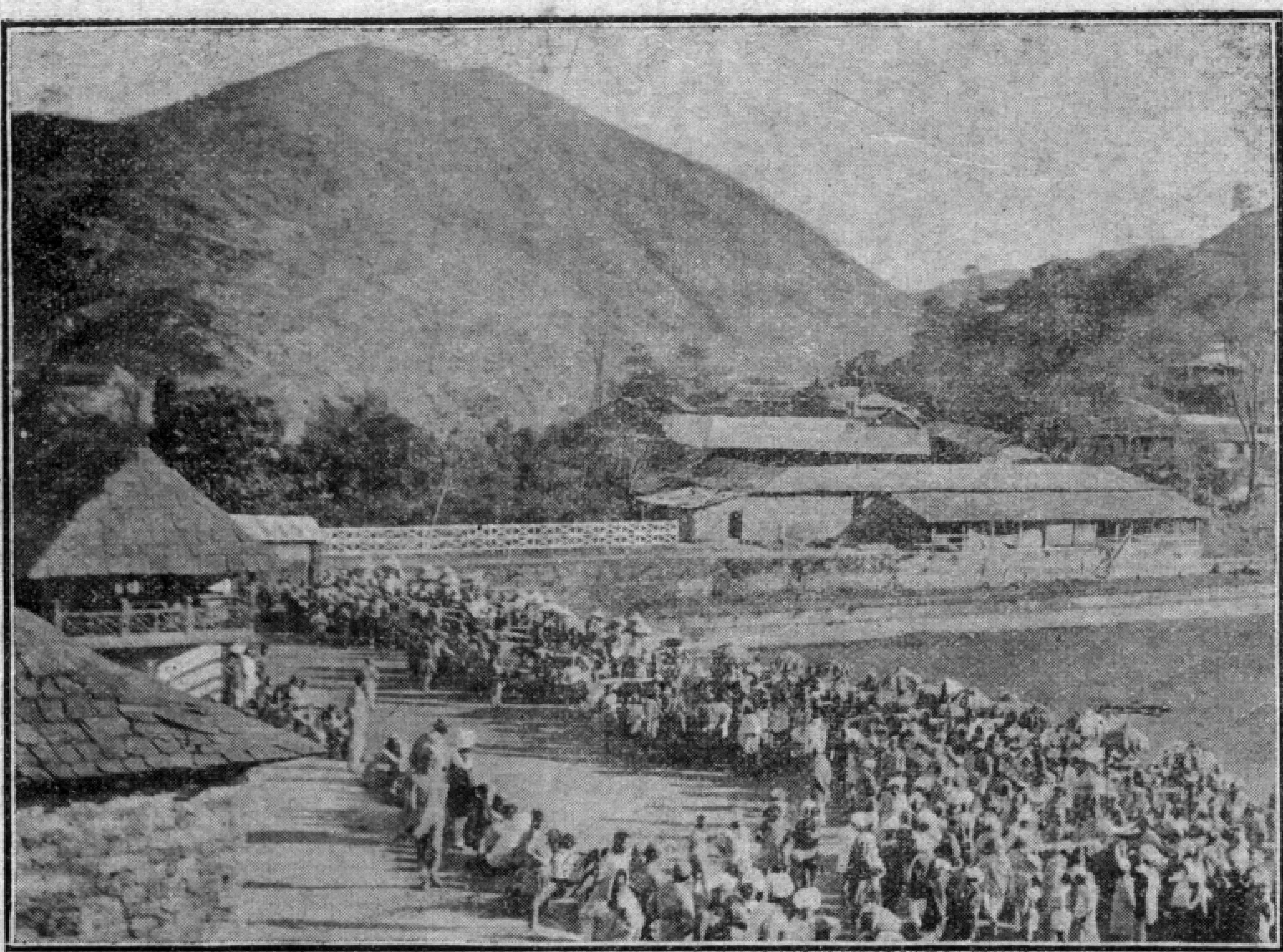
মণ্ডীরাজ্যের পাহাড়ী গ্রাম্য নারীগণ

লইয়া যায়। একখানি কম্বল এবং অপর সামান্য কিছু উপহার বরকে দিতে হয়। এই সামান্য দানেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এখানকার স্ত্রীলোকগণের পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ বিচিত্র। অবিবাহিতা কন্যাদের মস্তক অনাবৃত থাকে। বিবাহিতা যুবতীদের মস্তকে এক ছোট রঙিন কাপড় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই বস্ত্রখণ্ডকে 'টাঠু' বলে। বিধবাদের মাথার

অথবা অন্যান্য কোন উৎসবে স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গে নাচিয়া থাকে। মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ প্রথা নাই। এখানকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পর্দ্দা একেবারেই নাই। ইহারা ঘাগ্‌রার পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় রমণীগণের আদর্শে পট্টু বা কম্বল-নির্ম্মিত গাউন পরিধান করিয়া থাকে। মণ্ডীবাসিনী রমণীগণ অপেক্ষা কুল্লু-অধিবাসিনী রমণীগণের আকৃতি এবং মুখ-মণ্ডলের কমনীয়তা অধিকতর সুন্দর।

সাধারণতঃ হিন্দুদের মধ্যে জাতিবৈষম্য একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়, কিন্তু কাঙ্গাড়ার পার্ব্বত্য জেলা সকলের অধিবাসিগণের মধ্যে উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, জাতি-অজাতির যতটা বিচার পাঞ্জাবে আর কোথাও ততটা দেখা যায় না। কিন্তু এতটা বাঁধাবাঁধি থাকাতেও সামাজিক রীতি-পদ্ধতি এত শিথিল হইয়া গিয়াছে যে, এখানকার মত সামাজিক ব্যভিচার অন্যত্র প্রায় লক্ষিত হইবে না। কতকগুলি ইংরেজ এতদঞ্চলে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহারা আপেল ও নাসপাতির বাগান করিয়া ঐ আপেল ও নাসপাতি শিমলা ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিয়া



মণ্ডী নগরের একটি মেলার দৃশ্য

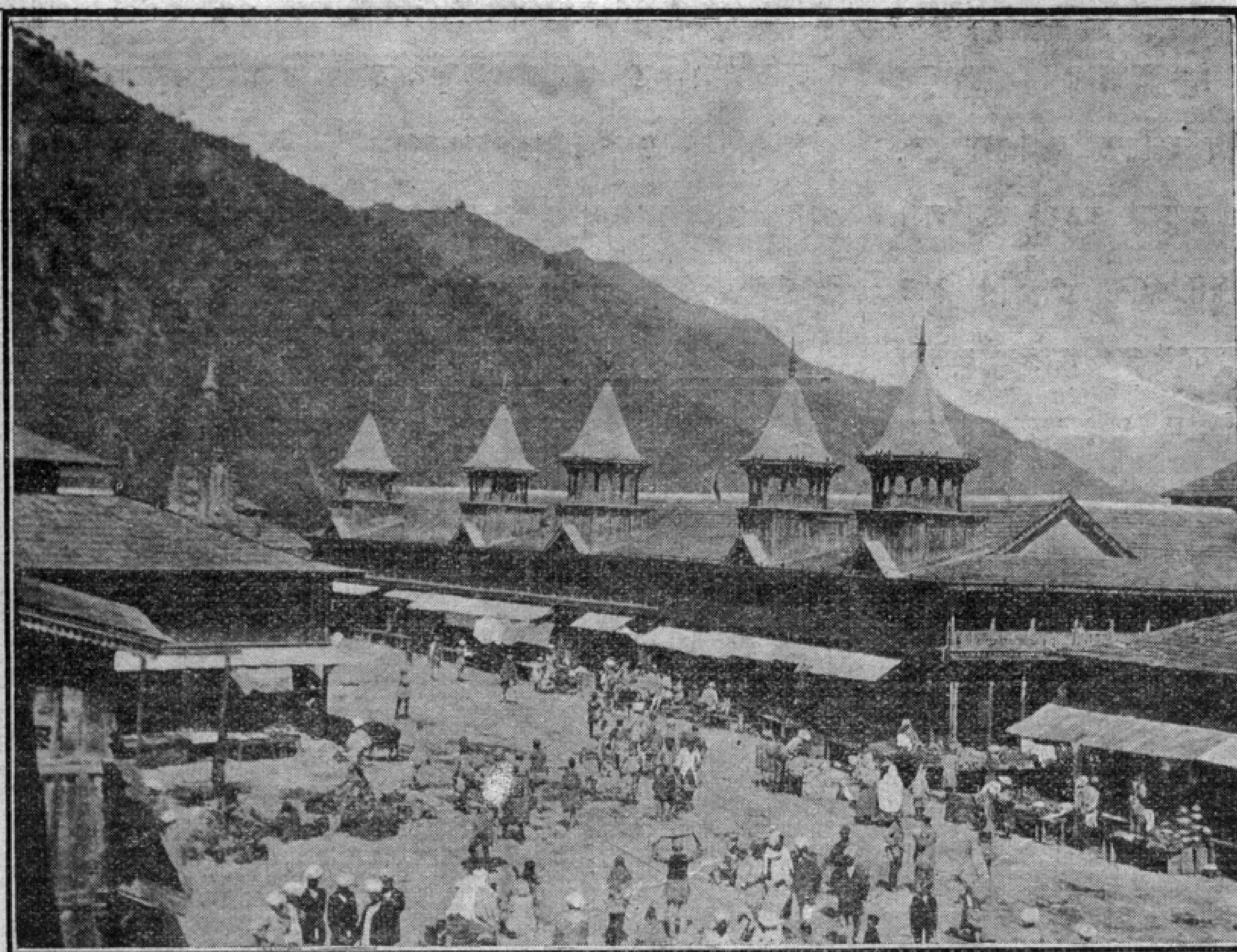
থাকেন। ঐ সকল ইংরেজদের মধ্যে কেহ কেহ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ যুবতীকেও বিবাহ করিয়াছেন।

কুল্লু দুইটি বৃহত্তর প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত। এক, ব্যাসনদীতীরস্থ ৬ মাইল প্রশস্ত চরভূমি। এখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা এবং সমতল। বৃক্ষবাটিকাগুলি নানাপ্রকার ফলবান বৃক্ষে শোভিত। ব্যাসনদীর জলে তীরভূমি শস্য-শ্যামল। দুই প্রান্তে সু-উচ্চ পাহাড়। এখানে দেবদারু কলা আখরোট ইত্যাদি নানাপ্রকার বৃক্ষ দেখা যায়। ধান গম যব জনার এবং পোস্তাদানা এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। অন্য ভাগ সম্পূর্ণ পার্ব্বত্য। এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে নানা প্রকার ভেষজ দ্রব্য ও বনভাগে কুত্রাপি কস্তুরী মৃগ পাওয়া যায়।

বিজয়া দশমীর সময় কুল্লুতে এক বড় মেলা হইয়া থাকে। এই মেলা প্রায় ৮।১০ দিন স্থায়ী হয়। বহু দূর দেশ হইতে ব্যবসায়ীরা আপনাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে। আমি যে-সময় কুল্লুতে আসিয়াছিলাম সেই সময়টা প্রায় বিজয়া দশমীর নিকটবর্ত্তী। এজন্য দেখিলাম ঐ মেলায় অনেক লোক নানাপ্রকার পশমী দ্রব্য লইয়া কুল্লুতে আসিতেছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, এই সময়ে কুল্লুতে প্রায় ৩৬০টির দেবতার সমাগম হইয়া থাকে। ঐ সকল দেবতা কাষ্ঠ বা প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি। লোক সকল নানাপ্রকার বাদ্যভাণ্ড সহকারে নানাপ্রকার ধুমধাম করিয়া ঐ সকল দেবতাকে উৎসব স্থানে লইয়া আইসে। কুল্লু কম্বল ও পট্টুর প্রধান বাণিজ্যস্থান।

২৪ সেপ্টেম্বর আমি প্রাতঃকালে ব্যাসকুণ্ড দর্শন করিবার জন্য রওনা হইলাম। কুল্লুর পর ২২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমি 'খট্‌রাই' নামক এক উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখান হইতে ৮ মাইল দূরে এক প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। এখানকার রাস্তার নিকটেই নদীতীরস্থ 'কলাত' নামক স্থানে এক উষ্ণপ্রস্রবণ আছে—ইহা 'কপিলকুণ্ড' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার জলে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায়। ফিরিবার সময় আমি এই জলে স্নান করিয়াছিলাম।

কুল্লু হইতে আমি 'দানা' গিয়াছিলাম। তথা হইতে 'রাহলা' যাইতে হয়। দানা হইতে রাহলা ক্রমোচ্চ চড়াই। কিন্তু রাহলার পর ভয়ানক উঁচু চড়াই। বড় কষ্টে এই



চৌহাটা বাজার

সর্পকে পূজা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, ব্যাসমুনি এই সকল সর্পকে এইখানেই আটক করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার উপরে আর সাপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাহলা হইতে প্রায় সাড়ে চার মাইল উপরে গেলে রাস্তার মধ্যে একটি পার্ব্বত্য নদী পাওয়া যায়। উহা বরফে ঢাকা। একটি প্রকাণ্ড বরফস্তূপের নিম্নদেশ হইতে জলধারা বিগলিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে। আমি এই বরফস্তূপের উপর দিয়া একটু অগ্রসর হইলাম। কিন্তু দেখিলাম ঐ বরফস্তূপ ক্রমেই

চড়াই পার হইতে হয়। রাহলা হইতে ব্যাস নদীর উৎপত্তি-স্থান ৫ মাইল। এই পথ বড়ই বাঁকা। কিন্তু ডাক্ বাংলার নিকট হইতে একটি সোজা সঙ্কীর্ণ পথ আছে। আমি ঐ পথেই যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন; রাস্তায় প্রস্তরময় প্রাকৃতিক সিঁড়ি বিন্যস্ত আছে। এই সকল সিঁড়ির উপর দিয়া যাইতে পায়ে বেদনার সঞ্চার হয়—সময়ে সময়ে শ্বাসরোধ হইয়া বড় কষ্ট হইতে থাকে। ডাক বাংলা হইতে পার্ব্বত্য পথের প্রায় সিকি মাইল উপরে এই পথের মধ্যে এক শিলাখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, এই শিলাখণ্ডের নীচে অনেক সর্প বাস করে। এই সর্পগুলি মানুষকে দংশন করে না। কোন কোন সময়ে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বহির্গত হয় এবং কুণ্ডলী পাকাইয়া ঐ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া থাকে। যাত্রিগণ ঐ সর্প সকলকে দুধ ও ঘি খাওয়াইয়া চলিয়া যায়। আমি যে সময় ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলাম তখন মাত্র দুইটি সাপকে ঐ শিলাখণ্ডের নীচে দেখিয়া গিয়াছিলাম। এ সকল সর্পের রঙ্ অনেকটা রক্তাভ। পাহাড়ী লোকেরা এই সকল

ঢালু হইয়া গিয়াছে আর অধিক দূর অগ্রসর হইলে পিছলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা, এজন্য সে প্রয়াস হইতে নিরস্ত হইলাম।

এই তুষার-নালা হইতে প্রায় ১৩০০ ফুট উপরে উঠিলে চড়াই প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে দেখিলাম। আমি এখন এক সমতল ভূমিতে পৌছিয়াছি। এই পাঁচ মাইল রাস্তা চলিয়া আমি রাহলা হইতে প্রায় ৮০০০ ফুট উচ্চে উঠিয়াছি! এই স্থানের নাম 'রোটাঙ্গ পাস'। এই সমতল ভূমিতে ব্যাসনদীর উৎপত্তি স্থান ব্যাসকুণ্ড। ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৩,৪০০ ফুট উচ্চ। এইরূপ প্রাকৃতিক নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়া প্রকৃতির নানা ভীমকান্ত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি গত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রায় ৩টার সময় আমার সংকল্পিত ব্যাসকুণ্ড দর্শন করিয়া সকল কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। কুল্লু হইতে ৩৮ মাইল দূরবর্ত্তী এক ঝরণা হইতে ব্যাস নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। লোকে ঐ নির্ঝরের জল এক প্রস্তরময় কুণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়াছে। ঐ কুণ্ডের জল এত শীতল যে, কুণ্ড মধ্যে অঙ্গুলি ডুবাইলে তাহা যেন অসাড় হইয়া যায়।

এই সমতল ভূমিতে পৌছিয়া দশ মিনিট যাইতে না

যাইতে অতিশয় শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। চারিদিক কুহেলিকাবৃত হইয়া গেল। সূর্য্যদেব মেঘাবৃত হইয়া গেলেন। সহসা এত ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল যে, সেস্থানে মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। লোকে বলে এখানে সময়ে সময়ে এমন এক প্রকার ঝড় বহে যে, সেই ঝড়ে অনেক সময়ে মানুষকেও উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহাতে যাত্রীদিগকে এরূপ বিপদে পড়িতে না হয় এজন্য সেই স্থানে এক অট্টালিকা নির্ম্মিত আছে। সেইরূপ বায়ু বহিতে থাকিলেই যাত্রিগণ সেই অট্টালিকার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই স্থানের পর ক্রমশঃ ওৎরাই। এই পথে পাঁচ মাইল অতিক্রম করিলে 'চন্দ্র নদী' দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ঝেলমের উপনদী। এই নদী পার হইলেই লাহুল প্রদেশ। ইহা অত্যন্ত শীতল প্রদেশ। ইহার হিমাচ্ছন্ন রজতকান্তি পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল সম্মুখেই দৃষ্টিগোচর হয়। শীতাধিক্য বশতঃ আমি সত্বরেই ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেড় ঘণ্টার মধ্যেই রাহলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

২৬শে সেপ্টেম্বর আমি প্রাতে উঠিয়াই কুলু অভিমুখে রওনা হইলাম। রাত্রে খট্রাইতে বিশ্রাম করিলাম। রাস্তায় অনেক ভেড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা ছাগ ও মেষ প্রতিপালন করিয়া আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ঋতুতে ইহারা স্থানান্তর হইতে খাদ্য শস্য আনয়ন করে। বর্ষার শেষে যখন ঐ স্থানে শীতের প্রাদুর্ভাব হয় তখন তাহারা ঐ উচ্চ তুষারাচ্ছাদিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নীচে চলিয়া আসে। ইহারা অত্যন্ত বিশ্বাসী ও অতিথিপরায়ণ। ইহারা কোনো ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার সময় মিত্র শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকে।

২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমি খট্রাই হইতে কুলু আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে আহারাদি সমাধা করিয়া সায়ংকালে 'ভুঁইতরে' আসিয়া সেদিনকার মত বিশ্রাম করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি 'মণিকরণ' দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

মণিকরণে পাঁচ ছয়টি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষাও অধিক ছিল কিন্তু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পের পর ইহাদের অনেকগুলিই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উচ্চভূমিবাহিত জলধারা একত্র করিয়া তথাকার লোকেরা কয়েকটি কুণ্ড রচনা করিয়াছে। ঐ কুণ্ড সকলের নাম রামকুণ্ড, হনুমানকুণ্ড, লক্ষ্মীনারায়ণকুণ্ড ইত্যাদি। অন্যান্য কুণ্ডের মধ্যে রামকুণ্ড অধিকতর পরিষ্কার ও সুগঠিত।

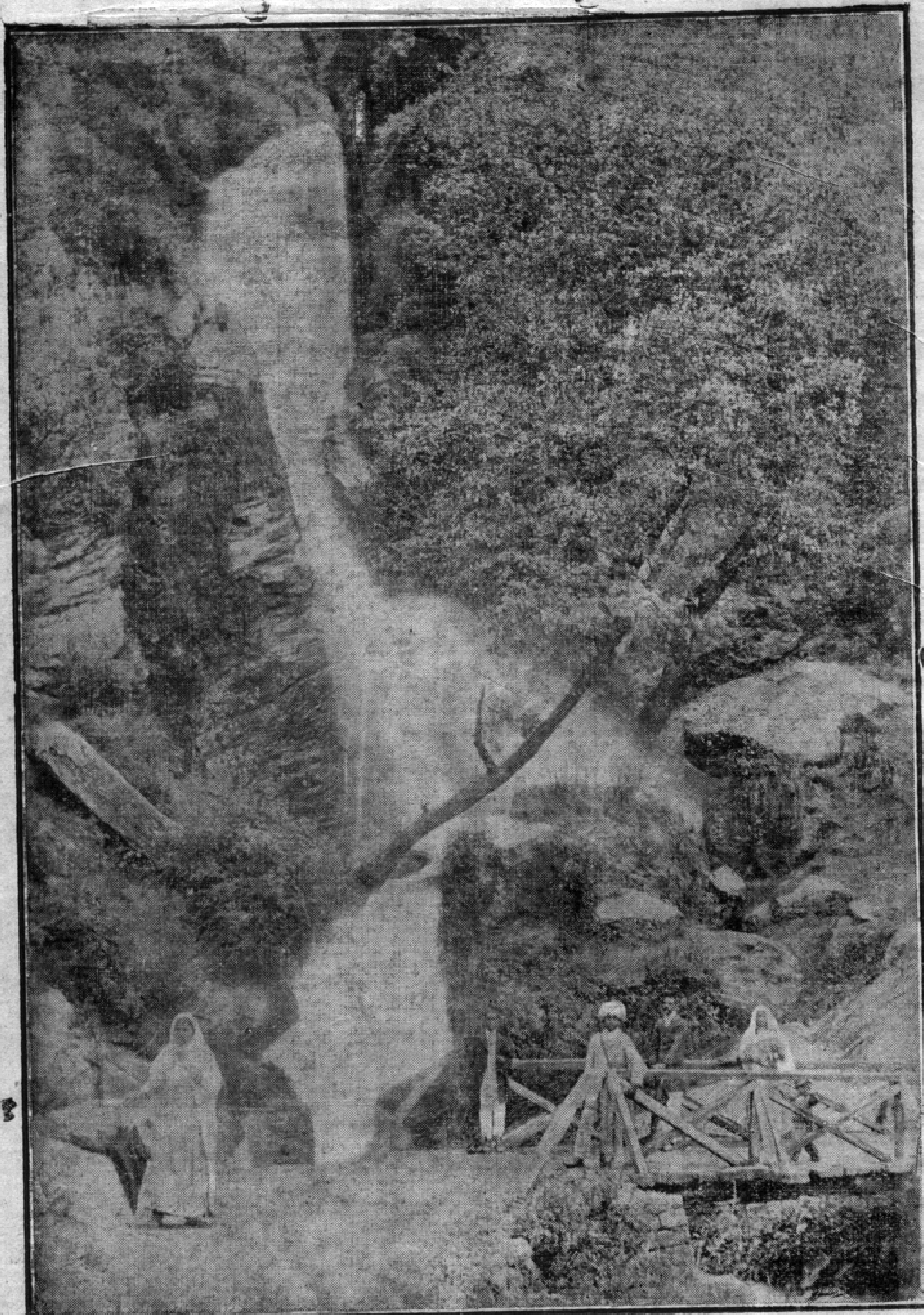


কুল্লুবাসিনী দুইটি রমণী

এই কুণ্ডের গভীরতা ৩ ফিটেরও অধিক। লোকে এই কুণ্ডেই স্নান করে। ঐ কুণ্ড সকলের প্রায় ১০।১২ গজ উপরে দুই তিন স্থান হইতে উষ্ণ জলের ধারা নিঃসৃত হইতেছে। ঐ জলধারাই একত্র হইয়া এই সকল কুণ্ডে নিপতিত হইতেছে। এখানে একটি প্রসিদ্ধ উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। ইহার জল অত্যন্ত উষ্ণ। প্রায় ১৬ বৎসর পূর্ব্বে ঐ উষ্ণপ্রস্রবণের উৎস প্রায় ৮।১০ ফুট উচ্চে উঠিত। কিন্তু এখন তাহা ২।৩ ইঞ্চির বেশি উঠে না। ঐ উৎসমুখ

তিনি আমার আহারের জন্য ঐ কুণ্ডের জলে একটি পাকপাত্রে চাল ও ডাল একত্র করিয়া ভাসাইয়া রাখিয়া ছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আমি তুলিয়া দেখিলাম অতি উপাদেয় খিচুড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। এই খিচুড়ী খাইয়া আমার যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। খিচুড়ী খাইয়া আমি এত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম যে, রুটি তৈরি করিতে পারা যায় কি না জন্য কৌতূহলী হইয়া তাহাতে আটার রুটি তৈয়ার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম। দেখিলাম রুটিখানি প্রথমে ডুবিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখি তাহা লুচির মত ফুলিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিল! কিন্তু দেখিলাম তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই। এখানকার অনেক লোকেই খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ করিবার জন্য ঐ কুণ্ডের জলে ফেলিয়া রাখিয়া যায়; নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর আসিয়া তাহা তুলিয়া লয়। এই কুণ্ডের জলে যে সব খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ করিবার জন্য রাখা হয় তাহা পুড়িয়া যাইবার বা সিদ্ধ হইয়া গলিয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। কেননা জলের উত্তাপ এক ভাবেই থাকে।

এই সকল ঝরণা ব্যতীত আর একটু নীচে 'পার্ব্বতী' নদীর উপকূলে আরো ৭।৮টি



কুল্লুপ্রান্তস্থ রাবগী নালার জলপ্রপাত

এখন এক শিলাদ্বারা আবৃত আছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্ব্বে এই ঝরণা হইতে মধ্যে মধ্যে দুই একটি বহুমূল্য মণি উৎক্ষিপ্ত হইত। এই জন্যই এই স্থানের নাম মণিকরণ্ হইয়াছে।

রামকুণ্ডের নিকটেই এক পাণ্ডার বাসা। তাহার গৃহাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা আছে। লোকে এই চৌবাচ্চাকে 'গোরখ ডিব্বি' বলে। ইহার জল ৯৩° সেন্টিগ্রেডের অধিক উষ্ণ। এই জলে চাল বা ডাল ফেলিয়া দিলে অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধ হইয়া যায়। আমি মণিকরণে যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম

উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। ইহাদের জল 'গোরখ ডিব্বি'র জল অপেক্ষা উষ্ণতর—ইহার উত্তাপ প্রায় ৯৪° সেন্টিগ্রেড। নিম্নে ২।৩ হাতের মধ্যে পার্ব্বতী নদীর জল প্রায় ১০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণ; ভগবানের কি বিচিত্র রচনা কৌশল! একই স্থানে উষ্ণ ও শীতল জলস্রোতের কি আশ্চর্য্য সন্নিবেশ! নদীর জলের নীচে ৭।৮টি পাকপাত্রে খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ হইতেছে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

উচ্চপ্রস্রবণ আগ্নেয়গিরিরই রূপান্তর। এখানে উষ্ণ প্রস্রবণ সকল প্রায়ই নদীর উপকূলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থূলদৃষ্টিতে মনে হয় এই সকল উষ্ণপ্রস্রবণের জলে গন্ধক মিশ্রিত আছে। কিন্তু কাঙ্গাড়ার সিভিলসার্জ্জন ডাঃ মেলারাম লিখিয়াছেন,—রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এই সকল উষ্ণপ্রস্রবণের জলে গন্ধক বা লোহের সংস্পর্শ মাত্র পাওয়া যায় না।" অনেক বিজ্ঞানবিৎ অনুমান করেন, এই সকল উষ্ণপ্রস্রবণের জলে রেডিয়ো অ্যাকৃটিভিটি ( Radio activity ) হয়। কিন্তু রেডিয়ো-স্কোপ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ইহার পরীক্ষা করা অসম্ভব। মনিকরণের কয়েক মাইল উপরে 'ব্রহ্মগঙ্গা' নামক এক উপনদী প্রবাহিত হইতেছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমি মণিকরণ ছাড়িয়া সায়ংকালে ভুঁইতরে প্রত্যাগমন করিলাম। সেইদিন সেখানে বিশ্রাম করিয়া পর দিন ১লা অক্টোবর প্রাতেই সিমলা অভিমুখে রওনা হইলাম। ভুঁইতর হইতে কটৌলা, কটৌলা হইতে মণ্ডী, মণ্ডী হইতে নাগচল্‌হা পৌঁছিলাম। নাগচল্‌হাও মণ্ডী নগরের মধ্যে ৬ মাইল ব্যবধান। এখানে একটি খুব বিস্তৃত চল্‌হা অর্থাৎ সরোবর আছে। এখান হইতে রুয়ালসর ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। সেখানকার লোকে বলে, উক্ত রুয়ালসর হইতেই এখানকার এই সরোবরে জল আসিতেছে। এই নাগচল্‌হাও মণ্ডী রাজ্যের মধ্যে। যে প্রদেশে এই নাগচল্‌হা অবস্থিত সেই প্রদেশেরও নাম চল্‌হা। ইহা এক সুপ্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র। আমি নাগচল্‌হা হইতে রাত্রি প্রায় ৩টার সময় উঠিয়া যাত্রা করিলাম। কেননা ঐ সময়ে গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ দিবাভাগে পথাতিক্রম করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রায় ৭টার সময় আমি 'তেজপুরে' পৌঁছিলাম। এখানকার একটি রাস্তা তৃণাবৃত ও কর্দ্দমময় ছিল। অন্ধকারময়ী রজনীতে ঐ পথ অতিক্রম করা বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল। তেজপুর ঐ প্রদেশের নূতন রাজধানী। রাজধানীকে সেখানকার লোকেরা 'সুকেত' বলে। এজন্য তেজপুরের নাম 'নয়া সুকেত'। এখানে একটি সুদৃশ্য বাজার আছে। তেজপুর সহর হইতে প্রায় দুই মাইল অন্তরে রাজপ্রাসাদ। তেজপুর সহর হইতে রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বার পর্য্যন্ত এক সুপ্রশস্ত রাস্তা আছে। লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ 'ঠণ্ডীসড়ক' যেমন বিদ্যুতালোকে



রূপবতী পার্ব্বত্য রমণী

সুশোভিত এবং উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজির জন্য ছায়াশীতল এই রাস্তাও তদ্রূপ মনোহর ও সুগম। এই রাস্তার উপরেই তেজপুরের হাঁসপাতাল, অনাথ-আলয় ও আদালত সংস্থাপিত। প্রসিদ্ধি আছে, ভূতপূর্ব্ব রাজা ভীমসেনের রাস্তা ও বড় বড় ইমারত প্রস্তুত করিবার বড় সখ ছিল। তিনিই এই রাস্তা ও সৌধাবলী নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

তেজপুর ত্যাগ করিয়া আমি সেই দিনই সন্ধ্যার সময় 'ডিহর' নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থান তেজপুর হইতে ১১ মাইল দূরে। রাত্রি-যাপনের জন্য স্থান না পাইয়া সেদিন আমাকে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচেই থাকিতে হইয়াছিল। ৪ঠা অক্টোবর আমি রাত্রি ১২টার পর এই স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া সূর্য্যোদয়ের প্রথমেই 'বিলাসপুরে' পৌঁছিলাম। ইহার পার্শ্ব দিয়া শতদ্রু নদী বহিয়া যাইতেছে।

শতদ্রু পার হইলেই চড়াই আরম্ভ। প্রায় ৬ মাইল চড়াই অতিক্রম করিয়া আমি 'সকুরেটী' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। গুরুপরিশ্রমে কাতর হইয়া সেদিন সেইখানেই কাটাইলাম।

৫ই অক্টোবর তারিখে আমি খুব ভোরে উঠিয়া 'নম্‌হোল' অভিমুখে রওনা হইলাম। নম্‌হোল সকুরেটী হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে। এখান হইতে এক মাইল পথ অতিক্রম করিলে 'বাঘল' রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হওয়া যায়। আমি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নম্‌হোলে আসিয়া পৌঁছিলাম। নম্‌হোল হইতে ৬ মাইল অন্তরে বাঘল রাজ্যের অন্তর্গত ধুন্নন্ উপত্যকা। এখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম সব দোকান-পাট বন্ধ। কয়েকদিন পূর্ব্বে বাঘলরাজ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এজন্য মৃত রাজার প্রতি সম্মান ও শোক প্রকাশের জন্য দোকানপাট বন্ধ আছে জানিলাম। এই স্থান হইতে তিন মাইল দূরে পিপ্‌লী ঘাট। এই পিপ্‌লী ঘাট হইতে ৭ মাইল দূরে বাঘল রাজ্যের রাজধানী 'আরকি'। আমি ৬ই অক্টোবর প্রাতেই আরকি সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেদিন দেখিলাম সেখানকারও সব দোকানপাট বন্ধ। এখানে এক বিচিত্র প্রথা দেখিলাম। রাজার মৃত্যু হইলে এখানকার সব বালবৃদ্ধযুবাকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। রাজার জ্ঞাতিগণকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া মস্তকে একটি সাদা কাপড়ের টুকরা বাঁধিতে হয়। সাধারণ ব্যক্তিগণ হইতে জ্ঞাতিগণের এইমাত্র প্রভেদ। যে সকল লোক কোনো কার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছে—অথবা নাগরিক বধূ সকল—যাঁহারা পিত্রালয়ে গিয়াছেন—রাজার মৃত্যু হইলে শোক প্রকাশার্থ তাঁহাদিগকে সেই সময়ে রাজধানীতে আসিতে হয়। যাঁহারা মস্তক মুণ্ডন না করেন বা যাঁহাদের বধূগণ পিত্রালয় হইতে আনীত না হন তাঁহারা দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। আমার এই ভ্রমণ পথের মধ্যে আমি অনেক চড়াই এবং ওৎরাই পথ অতিক্রম করিয়াছি কিন্তু আরকি নগর ত্যাগ করিয়া আমাকে যেরূপ দুরতিক্রম্য পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল এরূপ বিপৎসঙ্কুল পথ আমি এ পর্য্যন্ত আর প্রাপ্ত হই নাই এই পথ কখনও পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর দিয়া গিয়াছে—কখনও বা পর্ব্বতের পাদমূলস্থ সঙ্কীর্ণ উপত্যকা দিয়া চলিয়াছে। আরকি হইতে ১০ মাইল অন্তরে 'কালীহাট' নামক এক স্থান আছে। এই স্থান পাটিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত। আমি অতিকষ্টে এই পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া পরদিন ধামী-রাজ্যের অন্তর্গত 'সকরাহ' নামক স্থানে পৌঁছিলাম।

৭ই অক্টোবর আমি প্রাতঃকালে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করত 'পৈনী' চড়াইএর নিম্নে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে 'ঘনা' নামক উপত্যকা। এখান হইতে ৪ মাইল দূরে ভারত গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস "শিমলা শৈলের" সৈন্যাবাস 'জতোগ'। ইহা হইতে ৫ মাইল দূরে শিমলা সহর। এখানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রচুর বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। যেন ধরিত্রীদেবী তাঁহার শৈলবিহারী সন্তানকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আমি কয়েকদিন শিমলা শৈলে যাপন করিলাম। এবং তথাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুভব করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে আবার জন্মভূমির দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

---

# অন্দর মহল

প্রভুকিশোর লেনে আমাদের একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় উঠিয়া আসিয়াছিলেন। বাড়ীতে বিবাহ,—নিমন্ত্রণ করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে আমি একদিন প্রভুকিশোর লেনে গিয়াছিলাম। বাড়ীর বড় নয়। তাই সেখানে খুঁজিয়া লওয়া অসম্ভব হইবে না ভাবিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার ভার আমি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি নাই। কিন্তু প্রভুকিশোর লেনে যখন ঢুকিলাম, তখন একটু হতাশ হইয়া পড়িলাম;

অন্যায় সুখ উপভোগ করিতেছে। ফিরিয়া যাওয়া নেহাৎ অপৌরুষের ভাবিয়া দুস্তর অনুসন্ধান-সমুদ্র পার হইতে বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইলাম। দু'পাশের বাড়ী দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম—কিন্তু কেমন করিয়া যে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইব, ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। তবুও আশায় বুক বাঁধিতে ছিলাম।

একটা বাড়ীর দরজা খোলা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁরা সুবোধকুমার বসুকে চেনেন কি না। আত্মীয়টির নাম সুবোধকুমার বসু। তাঁরা বলিলেন—জানেন না। আর একটি বাড়ীতে দেখি, একটি ছোট খোকা বাহিরের রোয়াকে বসিয়া পা দোলাইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—খোকা, তোমার দাদা কই? মনে করিলাম, দাদা কি কাকা কেহ আমার কথা শুনিয়া বাহিরে আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু সুশীল ছেলেটি, আমার কথা শুনিয়াই হউক, অথবা আমার মনোহর চেহারা দেখিয়াই হউক, এমন ভ্যাঁ করিয়া ভৈরবী রাগিণীতে আলাপ জুড়িয়া দিল যে আমি হিতে বিপরীত ভাবিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস হইল না।

এমনি করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে দেখি, একখানা দোতলা বাড়ীর গায়ে লেখা রহিয়াছে—এস, সি, বোস্। অনেকে কুমার বানান করিতে ইংরাজীতে 'সি' ব্যবহার করিয়া থাকেন, মনে আশার সঞ্চার হইল—এই বাড়ীই আত্মীয়প্রবরের!

বাড়ীর সামনে হাতখানেক উঁচু লোহার রেলিং ঘেরা সামান্য একটু ঘাসে ঢাকা জমি। মাঝখানেও প্রায় দু'হাত লম্বা একটু জমি। তার পরে বাড়ী আরম্ভ। প্রথমে সামান্য একটু রোয়াক। তারপর বাড়ীর দরজা এবং জান্‌লা খুব ভাল করিয়াই বন্ধ। দোতলায় একটা জানলা খোলা দেখিয়া বিশ্বাস হইল, বাড়ীতে লোক বাস করে।

সেখানে গিয়া আমার প্রথম সমস্যা হইল, কি করিয়া সেই স্বপ্নপুরীকে সজাগ করি! সোনার কাঠির সন্ধান ত জানা ছিল না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে বাড়ীর সুমুখের রোয়াকে উঠিয়া সশব্দে পায়চারি করিতে লাগিলাম। নাড়িবার উপযুক্ত কড়া দরজায় ছিল না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া জুতার তলা ক্ষয় করিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া যখন প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন খট্ করিয়া একটা জানলা খুলিয়া গেল এবং আট-ন' বৎসর বয়সের একটি খুকী তাহার বৃদ্ধজন-সুলভ মুখখানা এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে আলোর ক্ষীণ রশ্মি—আশার উদয় হইল! দরজার দিকে চাহিয়া আছি খুলিবার আশায়—হঠাৎ সেই খোলা জানলায় সাদা কাপড়ের আবির্ভাব দেখিয়া চোখ ফিরাইয়া দেখি, একটি অত্যন্ত মোটা বৃদ্ধা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আমি চোখ ফিরাইতেই তিনি সসঙ্কোচে সরিয়া গেলেন এবং পর-মুহূর্ত্তেই সশব্দে জানলা বন্ধ হইয়া গেল। তার পর ভিতর হইতে অত্যন্ত কর্কশ গলায় প্রশ্ন হইল—কে তুমি? কি চাই?

আমি বলিলাম—এটা কি সুবোধ বাবুর বাড়ী?

কর্কশতর গলায় উত্তর হইল—সুবোধ বাবুর বাড়ী! যার বাড়ীই হোক্ না! পুরুষ মানুষ, একেবারে অন্দর মহলে ঢুকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে—সুবোধ বাবুর বাড়ী!

তার পরে যা আরম্ভ হইল, আপনাদের আর তাহা শুনিয়া কাজ নাই! আমি অতি দ্রুতপদে বাড়ী পলাইয়া আসিয়াছি! তবে সেদিন কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই, কি করিয়া আমি অন্দরমহলে ঢুকিয়া পড়িলাম।

বুঝিবার জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করিতেও হয় নাই।

ইহার কিছুদিন পরে প্রভুকিশোর লেন দিয়া যাইতে ছিলাম। দূর হইতে দেখি, সেই বাড়ীটার সামনে ভয়ানক ভিড়। মনে হইল, আমারি মত কোন পুরুষ বোধ হয় আবার সেই অন্দরমহলে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে! কাছে গিয়া দেখিলাম, আমার সেই পূর্ব্ব-পরিচিতা বৃদ্ধা আর-একটি বৃদ্ধার সহিত সম্মার্জ্জনীর বল পরীক্ষা করিতেছে—সেই রোয়াকের উপর!

সেদিন বুঝিলাম, রোয়াকটিও অন্দর-মহলই বটে! রাস্তায় অমন দু'হাজার লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

শ্রীসোমনাথ সাহা

# জন্মান্তরে

আবার ত' দেখা হ'ল ! ওগো এতদিন
কোথা একা সহিয়াছ অদৃষ্ট-লাঞ্ছনা !
বারে-বারে খরস্রোতা মৃত্যু-তটিনীর
পারাপার করিতে কি টলেনি চরণ ?
প্রেম তব ধ্রুবজ্যোতিঃ, অন্ধকার তীরে
হৃদয়ের প্রিয় পথ দিল কি চিনায়ে ?
মৃত্যু পারিল না চোখে ধূলামুঠি দিতে ?

এস সখি, আরো কাছে এস, দেখি তোমা—
সজল নয়নযুগ দিব কি মুছায়ে ?
না না থাক্, স্মৃতির ও অশ্রু-মুক্তা-মালা
বাঁধিয়াছে দুইখানি পদ্মরাগ যেন—
দুই জীবনের দুই হাসির আলোক !
কহ প্রিয়ে, গত-জনমের যত কথা—
মনে পড়ে কিছু ? যদি মনে নাহি পড়ে,
বসি' হেথা অলিন্দের পরে, চাও দেখি
ওই দূর দিগন্ত-সীমায় ! শুনিছ না
ঝিল্লীর ঝঙ্কার ? নীলিম গগন-তলে
কি স্বচ্ছ তরল ওই কনক-জ্যোৎস্নার !
মুঞ্জরিত ফুল-বীথিকার পশিছে না
সুরভি নিশ্বাস ? ওই দূর তটিনীর
মৃদু কলগীতি ?—আরো কত অভিজ্ঞান !
এইবার চাও দেখি নয়নে-নয়নে—
আকুলি' ওঠে না বক্ষ ? আঁখির উপরে
কাঁপিছে না কবেকার ছবি একখানি ?
প্রাণ-কর্ণে বাজিছে না কোনো গীতরব—
প্রতিধ্বনি তার ?

সে যে হায় সে দিনের !
নহে স্বপ্ন, সে যে স্মৃতি—সে যে ইতিহাস।
এমনি কোন্ সে দেশে, কোন গৃহে মোরা
আছিনু দম্পতী। আসন্ধ্যা-প্রভাত তুমি
ফিরিয়াছ সুগৃহিণী গৃহকর্ম মাঝে,
( ভিখারী অতিথি আর পরিজন-সেবা )
মুছি' অশ্রু করুণার দিনগুলি কাটে ;
যবে সন্ধ্যা হয়, দীর্ঘায়ত তরুচ্ছায়া,
তুমি রহ বসি', শুনিবারে একমনে
কার পদধ্বনি ? ক্রমে আরতির বেলা
মহেশ-মন্দিরে, একে একে জ্বলি' ওঠে
তারকা-প্রদীপ ; অঙ্গনে শেফালি-গন্ধ,
তরল আঁধারে যেন রক্তমণিহার—
চেয়ে থাকে সদ্যস্ফুট রাঙা কৃষ্ণকলি !
হেনকালে ফিরে আসে কর্ম্মক্লান্ত জন,
অঞ্চলে মুছায়ে তার ধৌত পা দু'খানি,
বীজনিয়া শীতলিয়া সর্ব্ব অঙ্গ তার,
উৎসুক আগ্রহ-ভরা আঁখিদুটি তব
উজলিয়া উঠিত কি প্রসন্নতা-ভরে !

চেয়ে দেখ, কি সুন্দর শারদী যামিনী !
মৃদু বায়ুভরে মর্ম্মরিছে কাননের
তরুশাখাগুলি, অন্ধকার শিহরিছে
লতাকুঞ্জে, ঘন-গুল্মপত্র-অন্তরালে !
দ্রৌপদীর শাড়ী সম ঊর্দ্ধে প্রসারিত
অন্তহীন অফুরন্ত আলোক-নীলিমা !
নিস্পন্দ নয়ান—একবিন্দু অশ্রু তবু
গড়াইতে চাহে ! মুক্ত প্রান্তরের দূর
প্রান্তসীমা হ'তে—অস্ফুট কুহেলি সম
বনশ্রেণী যথা—কি যেন ভাসিয়া আসে
মৃদুল গুঞ্জনভরা কিসের বারতা ?—
পরলোক-বেলাভূমি হ'তে আসে যেন
কার পরিচয় ! মগ্ন যবে চরাচর
সোনার স্বপনে, কি বেদনা জেগে থাকে
অন্তর-অন্তরে ! প্রাণ যবে ভরি' ওঠে
পরিপূর্ণ সুখে—নিমীলিত দুই আঁখি
পুলক-রভসে, কেন পক্ষ্ম সিক্ত তবু

অজানিত আশঙ্কার নয়ন-আসারে ?
শ্যামল বিটপি-শাখে বিহঙ্গের মত
মোরা দু'টি প্রাণী ; একটু আলোক-স্নান
বসন্তের দিনে, কুহরিতে দু'টি গান
একটি প্রভাত ধরি' ! তার পর কোথা ?
কর্ণে পশে সাগরের বিরাট উল্লাস
বহুদূর হ'তে, নয়নে জড়ায়ে থাকে
নন্দনের আনন্দ-স্বপন ! দুই জনে
কল্পনার নিভৃত নিলয়ে রচি মোরা
অমৃতের গান—সে ত' নহে অসম্ভব !
একদিন হিমক্লিষ্ট শিশির-সন্ধ্যায়
পাখা দুটি ধীরে ধীরে মুদি' বক্ষ 'পরে
সেই যে ঘুমাব দোঁহে শেষ গান গাহি'—
আর নাহি জাগরণ ! সেই ত' মরণ !
কিন্তু প্রেম ! সে যে এই মর্ত্ত্য-শতদলে
অমৃত-পরাগ, এক-ধর্ম্ম ধরণীর,
সৃজন-সাধন-মন্ত্র ধ্যানী বিধাতার !
কেন চাই অতীতের পানে ?—আছে স্মৃতি ?
সে ত' প্রেম হ'তে ! ভবিষ্যের অন্ধকারে
চেয়ে থাকি—কম্প্রবক্ষে সজল নয়নে
কার তরে ? কোথা হতে এ আশঙ্কা জাগে ?
সেও প্রেম হ'তে ! প্রেম আছে, তাই আছে
ভূত-ভবিষ্যৎ, আছে মূর্ত্ত মহাকাল !
প্রেম যে আত্মার আয়ু,—ক্ষয় নাই তার,
কল্পে কল্পে তাই মোরা অজর অমর !

মৃত্যু আসি' আর বার ডাকিবে যখন,
'সন্ধ্যা হ'য়ে আসিয়াছে এ-পারের কূলে.
কে আসিবে পরপারে, এস মোর না'য়ে,
নিয়ে যাই শীত হ'তে বসন্তের দেশে'—
তখন তোমার বাহু ধরিব সবলে,
নিঃশঙ্কে দাঁড়াব আসি বৈতরণী-তীরে ;
পড়িবে দু'খানি ছায়া নদী-বালুকায়
চন্দ্রাতপতলে ; শিহরিয়া শীতবাতে
ঢাকিব দোঁহারে দোঁহে, গ্রন্থি বাঁধি' দিব
চঞ্চল অঞ্চল আর উত্তরীয়-বাসে।
এ-পারের যত জ্যোৎস্না যত রবিকর
নিশিশেষে শয্যাতলে পুষ্পমালা সম
রহিবে পড়িয়া, শুধু যাবে সাথে-সাথে
একখানি অশ্রু-মেঘ প্রেমধনু-আঁকা !—
তারি ছায়া নিরখিবে তুমি স্মৃতিময়ী
কৃষ্ণ স্বচ্ছ নদীনীরে, আনত আননে
হেলিয়া তরণী হ'তে। জল-কলকলে
ঘুমায়ে পড়িব আমি, তুমি র'বে জাগি'—
স্থিরদীপ্ত ধ্রুবতারা অকূল আঁধারে !
তার পর কি আলোকে কোথা জাগরণ !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

---

# তিব্বতী জানা ভারতীয় পণ্ডিত

## ( বৈরোচন রক্ষিত )

১৮৯৩ অব্দে ৺রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস Indian Pandits in the land of Snow নামে একখানি সুন্দর বই লেখেন। সে বইয়ে তিনি প্রথম দেখান যে বাংলা দেশ থেকে কত পণ্ডিত তিব্বতে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করতে গেছলেন। কিন্তু তাতে তিনি কেবল দীপকর শ্রীজ্ঞানের খুব বিস্তৃত জীবনী লেখেন, অন্য পণ্ডিতদের কেবল নাম উল্লেখ করেন। এ প্রবন্ধে আমরা একজন পণ্ডিতের কথা বলব—যিনি তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন।

তিব্বতীদের কাছে তিনি "মহাপণ্ডিত শ্রীবৈরোচন

রক্ষিত" বলে পরিচিত। শুধু "মহাপণ্ডিত" তাঁর উপাধি ছিল না, আরও একটা উপাধি তাঁর ছিল, সেটা হচ্ছে—"মহাচার্য্য"। তিনি সংস্কৃত আর তিব্বতী ভাষাতেও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উপর সংস্কৃতে অনেক বই লিখেছিলেন, আবার তার মধ্যে দু'খানা তিনি নিজে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। সে বইগুলা হচ্ছে এই ঃ—

(১) শ্রী-বজ্র-ভৈরব-সাধন-বজ্র-প্রকাশ-নাম (Cordier's Catalogue ২য়, পৃঃ ১৭৫)

(২) শ্রী-বজ্র-ভৈরব-মণ্ডল-বিধি-প্রকাশ-নাম (ঐ)

Cordierএর তিব্বতী বই-এর তালিকা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে বৈরোচন রক্ষিত—স্পাগোর বা পাগোর-নিবাসী—"হে হদোদের" পুত্র। দুঃখের বিষয় তাঁর পিতার সম্বন্ধে বা তাঁর জন্মস্থান বিষয়ে আমরা কিছু জানি না। তবে তাঁর নাম থেকে তাঁকে ভারতবাসী বলে মনে হয়, আরও তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেককাল ছিলেন এবং তাঁর সব বই-ই তিনি বিক্রমশিলার মঠে বসে রচনা বা অনুবাদ করেছিলেন।

আরও আমরা জানি যে তিনি পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের শিষ্য এবং তিব্বতের রাজা খু-স্রোং-দে-বৎসলের সমসাময়িক লোক ছিলেন (Cordier's Catalogne III পৃঃ ৫২১)। তিব্বতের ইতিহাস পড়লে আমরা জানি যে ইনি একজন খুব বড় বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি ৭২৮ খৃঃ অব্দে জন্মান আর ৮৬৪ অব্দে মারা যান। ভগবান তথাগতের ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তিনি ভারত থেকে অনেক পণ্ডিতদের আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে শান্তরক্ষিত (৭৪৯ অব্দে) পদ্মসম্ভব ও আর আর বৌদ্ধ ভিক্ষু তিব্বতে বাংলা দেশের ওদন্তপুরীর বিহারের অনুকরণে একটা মঠ নির্ম্মাণ করেন *। যদি বৈরোচন ভিক্ষু উক্ত তিব্বতী রাজার সমসাময়িক হন, তবে আমাদের বলতে হবে যে তিনি ৭২৮-৮৬৪ অব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গুরু পদ্মসম্ভব ৭৪৯ অব্দে তিব্বতে যান, তাহলে তার আগে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

মহাচার্য্য বৈরোচন রক্ষিত তিব্বতে বোধ হয় গিয়েছিলেন। তাঁর দুখানা বই—(১) মন্ত্র-বিবৃত-প্রজ্ঞা-হৃদয়-বৃত্তি, আর (২) রত্ন-বাদ-চক্র—উক্ত তিব্বতী রাজার জন্য রচিত হয়। এই দুটী বইএর বিষয় তিনি উক্ত বৌদ্ধ রাজার কাছে ব্যাখ্যা করেন।

ভিক্ষু বৈরোচন রক্ষিত নীচের বইগুলা সংস্কৃতে রচনা করেন ঃ—

(১) রক্ত-যমারি-সাধন (২য় ভাগ, পৃঃ ১৭৯)
(২) বোধিসত্ত্ব-চর্য্যাবতার-পঞ্জিকা (৩য়, পৃঃ ৩০৮)
(৩) শিক্ষা-কুসুম-মঞ্জরী-নাম (" পৃঃ ৩২৬)
(৪) শিষ্য লেখ-টিপ্পনী (৩য়, পৃঃ ৪৩০)
(৫) মূলতন্ত্র-টীকা (" পৃঃ ৫২১)
(৬) মন্ত্র-বিবৃত-প্রজ্ঞা-হৃদয় বৃত্তি (" ৪৮৯)
(৭) রত্ন-বাদ-চক্র (" পৃঃ ৪৯০)

এই বৌদ্ধ-সংস্কৃত বইগুলা ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষুদ্বারা তিব্বতীতে অনূদিত হয়েছিল। তিনি নিজেও তিব্বতী ভাষা জানতেন তাই তিনি নীচের সংস্কৃত বইগুলি তিব্বতীতে অনুবাদ করেছিলেন ঃ—

(১) মহা-গণপতি-ধাতু-ত্রিকর-রক্ত-বশীকর-সাধন (৩য়, পৃঃ ২২১)
(২) গণপতি-সময়-গুহ্য-সাধন-নাম (")
(৩) হেরুক-পঞ্চ-সাধন-নাম (" পৃঃ ২২৯)
(৪) ফল-জ্ঞানেক-ভূমি-ধর্ম-ধাতু (" ২৩৭)
(৫) পারমিতা-সমাস-নাম (" ৩২৬)
(৬) বিনয়-সংগ্রহ (" পৃঃ ৪০১—এ অনুবাদ তিনি সংশোধন করেন)
(৭) শুক্ল-বজ্র-যোগিনী সাধন (২য়, পৃঃ ৫৫-৬)
(৮) কল্প-সপ্তক-বৃত্তি (" পৃঃ ১৬৯)
(৯) মহেসাননসয়-সাধন (")
(১০) প্রজ্ঞা-পারমিতা-হৃদয়-সাধন (" ২৮৬)

---

* সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—Indian Logic : Mediaeval

পণ্ডিতের নামের মিল আছে। একজন হচ্ছেন—শুধু বৈরোচন, তিনি ভিক্ষু ছিলেন এবং দোভাষীর কাজ করতেন। তিনি তিব্বতী ভাষায় "ন্যায়ালোকসিদ্ধি" অনুবাদ করেন †। আর একজনের নাম হচ্ছে—শ্রীবৈরোচন বজ্র। ইনি কোশল দেশের লোক আর তিব্বতীতে "দোহাকোষ" অনুবাদ করেছিলেন! আমরা যেন বৈরোচন রক্ষিতের সঙ্গে এই দুই ভিক্ষুর গোলমাল না করি।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

# ভুলের খেলা

কাল রাত্রে ওঁকে বেশ করে জানিয়ে দিয়েছি যে...

* * * *

কেন নয়? তুমি যদি চল্‌তে পার একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র পথ ধরে, তা'হলে আমিই বা স্বেচ্ছায় নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারি না কোন্ হিসাবে?...

শিক্ষা-দীক্ষার দোষ দিতে চাও, স্বচ্ছন্দে দিতে পার, কিন্তু বলি কি, এই দেখেই ত এতদিন ভুলেছিলে...

উপরের আবরণটাই তোমার নজরে বেশী পড়েছিল, তলিয়ে দেখার সুবিধা হয়নি?

সে দোষ কার?—শুনে বড্ড হাসি পাচ্ছে আমার... কেন, হাস্‌তে বাধাটা কি, শুনি?—আমাকেও ত কিছু কম ঠক্‌তে হয়নি......

কথার ধারা যে একেবারে বদ্‌লে গেল! রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে, না?

—সত্যি কথা শুন্‌তে চাইলে অমন একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়......

নীড় কেন বেঁধেছিলুম, সেই কথা তুল্‌ছো? একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে? তা বটে। জীবনটা তোমার কাছে কেমন যেন ছন্নছাড়া, বেসুরো বলে মনে হচ্ছে!...আমারও কি তা' হয়নি বল্‌তে চাও?......

* * * *

খুব মনে আছে! পরিচয়ের সেই প্রথম দিনটা ত? বাবার বন্ধু মিঃ রায়ের বাড়ী টী-পার্টিতেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। সেদিন আমার গান শুনে হাজার বার প্রশংসা করবার জন্যে আমার কাছে ছুটে এসেছিলে!... ফুলের ভিতর যে কীট বাস কর্‌তে পারে, আগে তা' জান্‌তে না।—আমিও কি ছাই জানতুম যে, তোমার সেই তখনকার অকপট সরলতার পিছনে কুটিলতার কত বড় একটা অনলকুণ্ড লুকোনো আছে......

আজ ভাব্‌চ যে আমার সঙ্গে তোমার অদৃষ্টকে জড়িয়ে ফেলে কি অন্যায়ই করেছ!...অনেক ভাল মেয়েই, ইচ্ছা করলে, তুমি পেতে পার্‌তে! কিন্তু সেই সঙ্গে আমার কথাটাও যে একেবারে ভুলে যাচ্ছো...আমিও কি তাহলে সুখী হতে পারতুম না, মনে কর?...শুধু তুমিই একটা অমঙ্গলের শিখা-রূপে আমার সব শুভকে ভস্ম করে দিলে......

আশ্চর্য্য হয়ে গেলে যে? আমি কিন্তু এর মধ্যে চম্‌কে ওঠার মতো কিছুই দেখ্‌চি না...সোনার হরিণ সেজে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলে...তোমায় ধর্‌তে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলুম। এখন বুঝ্‌চি......

কি, আমি হলুম স্বপ্ন পরী! আমার চারপাশে যে মোহের জাল ছড়ানো ছিল, তারি মধ্যে তুমি আট্‌কা পড়েছিলে! ঠিক যেন একটা মিথ্যা মায়া!

আর...আর ( অস্ফুটস্বরে ) তুমিও আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মতো......

মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ! এত ঘৃণা, এত লজ্জা তোমার...

আমিও আর দাঁড়াতে পারচি না—সমস্ত শরীর আমার বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌চে...চল্লুম।

হায়, এই দুটি জীবনের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির অবসান কি আর হয় না!......

শ্রীবিনয় চক্রবর্ত্তী।

† ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—Indian Logic : Mediaeval School, পৃঃ ১২৩।

# নাতির প্রেম

আজকে তিথি লগন ভালো,
ঠান্‌দি এসো তোমায় নিয়ে
বেরিয়ে-পড়ি শ্রীবৃন্দাবন,
যা বলে লোক বলুক গিয়ে;
পর-পুরুষের সঙ্গে যেতে
আপত্তি হয়? কাজ কি এতে?
ডাকিয়ে পুরুত আজকে রেতে
আমায় করে ফেল বিয়ে,
বেরিয়ে পড়ি ঠান্‌দি এসো শ্রীবৃন্দাবন তোমায় নিয়ে।

সারা হলেম ঠান্‌দি ওলো
অরসিকের গুলতানিতে,
রসের মর্ম্ম কেউ বোঝেনা,
আগুন রাখে ফুলদানিতে;
পরিহাসের চামেলি ফুল
হাসির দখিণ হাওয়ায় দোদুল
ঠান্‌দি আমায় করে আকুল
ফুটে তোমার মুখখানিতে!
সারা হলেম ঠান্‌দি ওলো অরসিকের গুল্‌তানিতে!

ছুটি পেলেই ছুট্‌ দিয়ে তাই
দৌড়ে আসি তোমার কাছে,
আজকে মঘা ত্র্যহস্পর্শ
এমন কথা বল্‌তে আছে?
ফুলের কানে গান শুনিয়ে
মৌমাছি ধায় গুন্‌গুনিয়ে,
কোকিল সুরের জাল বুনিয়ে
শুনচো না কি ডাকচে গাছে?
আজকে বিয়ের দিন ভাল নয়, এমন কথা বল্‌তে আছে?

মনের যত খপরা-খপর

বিনা-তারে চলেছে আজ
প্রাণে-প্রাণে আসা-যাওয়া;
এমন শুভ দিন ও লগন
ঠান্‌দি খুঁজে পাবে কখন?
নাগর এমন মনের মতন
যায়না পথে কুড়িয়ে পাওয়া!
ঠান্‌দি দ্যাখো ঘোমটা তোমার উড়িয়ে দিলে ফাজিল হাওয়া।

বাঁধ্‌বো বাসা, থাক্‌বো খাসা,
করবো তোমার তাঁবেদারি,
চালিয়ো তুমি আমার উপর
যা ইচ্ছে তাই হুকুম জারি;
হেথায় হট্টগোলের হাটে
কাজের-মানুষ কাজ নে খাটে,
আমার বেকার বসেই কাটে,
টিট্‌কিরি দ্যায় সবাই ভারি!
ঠান্‌দিদি গো চাকরি দিয়ো করবো তোমার তাঁবেদারি।

একটা বিয়ে থাকতে যদি
আর একটাতে খট্‌কা লাগে,
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
প্রেম আগে না ধর্ম্ম আগে!
ঠান্‌দি আমি বলচি, শোনো—
দোষ এতে নেই নেইক কোনো,
প্রণয়ে পাপ হয় কখনো?
হয়নাকো পাপ অনুরাগে;
সমজে দ্যাখো ঠান্‌দিদি গো মনে যদি খট্‌কা লাগে।

ঠাকুরদাদা কাঁদে নেহাত
নাতবউয়েরে বদলি দিয়ে,
তিন মাসেরি কড়ারেতে

বল্‌চো তুমি শাস্ত্রে বাধা ?
শাস্ত্র মেনে চলে গাধা !
থাক্‌তে পারে মানুষ বাঁধা
যাবজ্জীবন একটা নিয়ে ?
তিন মাসেরি কড়ারেতে ঠান্‌দি আমায় কর বিয়ে।

মেয়াদ যেদিন ফুরিয়ে যাবে,
ঠাকুরদাদার কোলে তুলে
দেবো তোমায় দেবো দেবো
সাজিয়ে বকুল গোলাপ ফুলে ;
ঠাকুরদাদা বল্‌বে—এ কি !
আজকে আমি কারে দেখি !
ফিরে এলো আমার সে কি
নবীন বেশে এলো চুলে ?
ঠাউরে দ্যাখো ঠান্‌দিদি গো রাখবে শ্যাম না রাখবে কুলে !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

# একটি যুদ্ধের গল্প

( Maupassantর ফরাসী হইতে )

জার্মান সৈন্য যখন যুদ্ধে অগ্রসর হতে হতে ফ্রান্সের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাদের ভিতর ছিল আমাদের গল্পের নায়ক ওয়ালটার স্নাফ্‌জ্‌। ফ্রান্সে প্রবেশ করবার মুহূর্ত্ত থেকে বেচারা আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বাঁচত না। অতি স্থূল দেহ নিয়ে মার্চ্চ করতে তার প্রাণান্ত হত, হাঁপিয়ে, হাঁপিয়ে তার গলদ্‌ঘর্ম্ম হত, গোদা গোদা পা দু'টো টানতে তার জিব বের হয়ে যেত। শত্রু মেরে নাম করবার কথা সে মনেও আনত না। সে ছিল একদম শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ, প্রাণ দিয়ে তার চারটি ছেলেমেয়েকে সে ভাল বাসত, অনুক্ষণ তার যুবতী সুন্দরী স্ত্রী আর তার আদর-যত্নের কথা মনে করে দুঃখ করত। তার অভ্যাস ছিল খুব সকাল সকাল শয্যা গ্রহণ করা আর যত বেলা করে পারে শয্যা ত্যাগ করা, ভাল ভাল খাবার রসাস্বাদ করে' ধীরে-সুস্থে আহার আর দোকানে দোকানে ঘুরে বিয়ার পরখ করা। সে বেশ জানত যে জীবনে মিষ্ট ও সুন্দর যা কিছু সব, ম'লেই ফুরিয়ে যায় ; কাজেই কামান, বন্দুক, তলোয়ার ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের প্রতি তার বিদ্বেষ, ঘৃণা আর ভয়ের সীমা ছিল না। বিশেষ করে সে দু-চক্ষে দেখতে পারত না "বেওনেট" অস্ত্রটাকে, কারণ, নিজের হাঁদা পেটটা রক্ষার জন্যেও সেটাকে চট্‌পট্‌ নাড়াচাড়া করা যে তার সাধ্যের

রাত্রে সে যখন পোষাক-টোষাক পরেই মাটিতে শুয়ে পড়ত, তার আশপাশের সঙ্গীরা তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। জেগে জেগে সে কেবল তার ছেলে-মেয়ে ক'টির কথা ভাবত, পথের বিপদের কথা চিন্তা করত। আচ্ছা, যদি সে মারা যায়—তাহলে ঐ ক'টির অবস্থা কি হবে ? কে ওদের আহার জোটাবে, কেই বা লেখাপড়া শেখাবে ? আসবার সময় ধার করে কিছু টাকা সে তাদের দিয়ে এসেছে, কিন্তু তাতে আর ক'দিন চলবে ? তাই থেকে থেকে ওয়ালটার স্নাফ্‌জ্‌ কাঁদ্‌ত।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় তার পা দু'টোর অবস্থা এমনি হয়েছিল যে, সমস্ত পল্টনটা তাকে মাড়িয়ে যাবে এই জ্ঞান ছিল বলেই সে পিছনে পড়ে থাকেনি।

কামানের শব্দ শুনলে তার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠত।

কয়েক মাস এমনি ভয়ে-ভাবনায় কেটে গেল।

তারপর তার সৈন্যদল "নরমাণ্ডি"র উদ্দেশে অগ্রসর হল। একদিন অল্প জন-কয়েক সৈন্য নিয়ে তাকে এগিয়ে পথের অবস্থা দেখাবার জন্য পাঠানো হল। চারদিক নিঃশব্দ, বাধা দেবার জন্য শত্রু প্রস্তুত হয়ে আছে—কেউ মনেও করল না।

বেয়ে নেমে এল। কিছুদূর আসতেই আচম্‌কা কতকগুলো বন্দুকের আওয়াজ তাদের থামিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে দলের প্রায় জন-কুড়ি মাটিতে পড়ে গেল। তারপর অতিক্ষুদ্র একটা ঝোপের আড়াল থেকে একদল "সার্প-শুটার" বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে একেবারে লাফিয়ে বেরিয়ে এল।

ওয়ালটার স্নাফ্‌জ্‌ এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে ভড়কে গিয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল, পালাবার কথা তার মনেই এল না। একটু স্থির হতেই সে ভাবল উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দেবে, কিন্তু তখনই মনে হল ক্ষীণকায় ফরাসীদের তুলনায় তার দৌড় শশ-কচ্ছপের দৌড়ের অনুরূপই হবে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই লড়ায়ে-মেড়ার মত লাফাতে লাফাতে ফরাসীরা একেবারে কাছে এসে পড়ল। স্নাফ্‌জ্‌ তখন হাত পাঁচ-ছয় দূরে কাঁটা গাছ ও শুকনো পাতায় ভরা একটা নালার মত দেখতে পেয়ে, লোকে সাঁকোর উপর থেকে নদীতে যেমন লাফ মারে, তেমনি করে জোড়-পায়ে এক লাফ মারল—একটু ভাবল না যে সেটা কত গভীর হতে পারে।

কাঁটা গাছ ও লতা-পাতার ভিতর দিয়ে একটানা তীরের মত গিয়ে সে নীচের পাথরের উপর পড়ল—হাত মুখ ছড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। পড়ে থেকেই চোখ মেলে চাইল। পড়বার সময় তার দেহের চাপে লতা-পাতার আচ্ছাদন ভেঙ্গে যে ফুটো হয়ে গিয়েছিল, সেইখানে তার চোখ পড়ল। দেখতে পেল মাথার উপর নীল আকাশ।

ঐ ফাঁকটাই তাকে ধরিয়ে দিতে পারে এই ভেবে সে ঐ গর্ত্তের ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে, লতাপাতার নীচে, যুদ্ধের জায়গা থেকে সরে গেল। খানিকটে গিয়ে লম্বা গাছ-গাছড়ার নীচে, তাড়া-খাওয়া খরগোসের মত গুড়ি মেরে বসে রইল।

খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত হৈ-চৈ সাড়া-শব্দ তার কাণে এল, তার পর লড়াইয়ের সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে একেবারে থেমে গেল। সমস্ত আবার আগের মত নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করলে।

হঠাৎ তার গায়ের কাছে কি যেন নড়ে উঠতে সে ভয়ানক আঁৎকে উঠল।

অতি-ক্ষুদ্র একটা পাখী একটা ডালের উপর এসে বসাতে তার শুকনো পাতাগুলো নড়ে উঠছিল।

ঘণ্টা-খানেক সময় ধরে ওয়ালটার স্নাফ্‌জের বুকের ভিতরে ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ শব্দ হতে লাগল।

তারপর সেই গর্ত্তটাকে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাত্রি এল। তখন সে ভাবতে সুরু করল,—এখন কি কর্ত্তব্য? তার কি উপায় হবে? তার দলের সঙ্গে যোগ দেবে কি? কি করে সেটা হয়? কোথায় গিয়ে যোগ দেবে? যোগ দিলেই আবার ত সেই কষ্ট, উদ্বেগ, পরিশ্রম, অবসাদ—যা যুদ্ধের আরম্ভ থেকে সে সহ্য করে আসছে! না, না! অতখানি সাহস তার মোটেই নেই! আবার মার্চ্চ করবার, সর্ব্বক্ষণ বিপদের মুখে বুক এগিয়ে দেবার শক্তি আর উদ্যম তার একেবারেই নেই।

তাহলে উপায়? এই গর্ত্তের ভিতর যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত লুকিয়ে থাকা ত সম্ভব নয়। তা আর কি করে হয়? যদি সে উপোস করে থাকতে পারত, তাহলে সে একটা কথা হত বটে, কিন্তু খাওয়াটি যে প্রতিদিনই চাই।

এই রকম একা একা, হাতিয়ার-পাতি সঙ্গে, সেপায়ের পোষাক নিয়ে, শত্রুর ঘরের মধ্যে, সহায়-সঙ্গী থেকে বহুদূরে সে আটকে পড়ে গেছে—কথাটা ভাবতেই তার গায়ে কাঁটা দিল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, যদি আমি যুদ্ধে বন্দী হতেম! সে অতি আগ্রহে চিন্তা করতে লাগল—কি করে ফরাসীদের হাতে বন্দী হওয়া যায়। বন্দী! আঃ! তাহলে তার প্রাণ বেঁচে যায়,—খেতে পাবে, আশ্রয় পাবে, গোলা-গুলি, তলোয়ার কিছুই তাকে ছুঁতে পারবে না,—নিঃশঙ্কায় সুরক্ষিত কয়েদখানায় বাস করতে পারবে। বন্দী! আহা, এ আশা কি সফল হয় না!

সেই মুহূর্ত্তে সে দৃঢ়-সংকল্প হল,—এখনই গিয়ে ধরা দেব।

সঙ্কল্প তখনই কাজে পরিণত করবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আর এক পা না এগিয়ে সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—নানা রকম দুশ্চিন্তা আর ভয় আবার তাকে চেপে ধরল।

কোথায় সে ধরা দিতে যাবে? কেমন করে? কোন্ দিকে? মানুষের মৃত্যুর নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার মনে উদয় হতে লাগল।

বাইরে এই বেশে বার হওয়ার অর্থ, নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিপদের মুখে আত্ম-সমর্পণ করা।

পথে যদি সে চাষাদের সাম্‌নে পড়ে যায়? তারা দল-ছাড়া অসহায় একজন প্রুসীয়ানকে পেয়ে খ্যাপা কুকুরের মত তাকে হত্যা করবে। দা, কুড়ুল, কাস্তে, খোন্তা দিয়ে তাকে পিটিয়ে, থেঁৎলে, মেরে, পরাজয়ের প্রতিহিংসা নেবে।

যদি সার্প স্যুটারদের পাল্লায় পড়ে যায়? তারা যুদ্ধের নিয়ম-কানুনে অনভিজ্ঞ, হিংস্র পশু-প্রকৃতি,—মজা দেখবার জন্য তাকে আগে একটু খেলাবে, তারপর তার মাথাটা কেটে নিয়ে খানিকটে হাসি-তামাসা করবে। তার মনে হলো যে, দেওয়ালের সাথে তাকে ঠেসে ধরে এক ডজন বন্দুক তার নাকের গোড়ায় ধরা হয়েছে, তাদের নলের গোল গোল, কালো কালো ফুটোগুলো যেন তার দিকে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে আছে!

আর যদি সে ফরাসী সৈন্যদলের সাম্‌নেই পড়ে যায়? অগ্রবর্ত্তী সৈন্যেরা ভাববে যে, সে একজন শত্রু, দুঃসাহসী সৈন্য, একাই পথ পরীক্ষা করতে বেরিয়েছে, এবং তখনই গুলি ছুঁড়বে। তার মনে হল, যেন সে এদিকে-ওদিকে ঝোপের মধ্যে লুকোনো সৈন্যদের গুলির শব্দ শুনছে, মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে শতচ্ছিদ্র হয়ে ঘুরে পড়ে যাচ্ছে! গুলি তার দেহের ভিতর ঢুকছে এই রকম তার বোধ হল।

হতাশ হয়ে সে আবার বসে পড়ল। এই অবস্থা থেকে সে বুঝি উদ্ধার পাবে না।

তখন ঘোর অন্ধকার, নিস্তব্ধ রাত্রি। সেখানেই সে চুপ করে বসে রইল। অন্ধকারে একটু শব্দ হয় আর সে আঁৎকে ওঠে। গর্ত্তের মধ্যে একটা খরগোস নড়ে উঠতেই ওয়ালাটার স্নাফ্‌জের মূর্চ্ছার ভাব হয়। একটা পেঁচা ডাকে আর সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। আচমকা নানা ভয়ে তার হাত-পা অসাড় হয়ে যায়, সাংঘাতিক আঘাত লাগলে করে,—প্রতি মুহূর্ত্তেই তার মনে হয়, যেন সে কাছেই সৈন্যদের মার্চ্চ করে যাবার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

এই রকমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবার পর শেষে ডাল-পালার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। তখন সে মস্ত বড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। হাত-পায়ের খিল ধর ছেড়ে গেল, মন নিশ্চিন্ত হল, চোখ দুটো আপনা হতেই বুজে এল। দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম যখন ভেঙ্গে গেল, তখন সূর্য্য মাথার উপর, বেলা দুপুর। চারিদিক নিস্তব্ধ। ওয়ালটার স্নাফ্‌জ খিদেয় কাতর হয়ে উঠল।

বসে বসে সে হাই তুল্‌তে লাগল। সৈন্যদের প্রাপ্য পেট-ভরা মাংসর ভাগের কথা মনে করতেই তার রসনা সজল হয়ে উঠল, পেটের ভিতরটা কামড়াতে লাগল।

উঠে দাঁড়িয়ে দু-এক পা এগোতেই নিজেকে অতি দুর্ব্বল বোধ করে, আবার সে বসে পড়ল। বসে ভাবতে লাগল। দু-তিন ঘণ্টা ধরে সে বসে বসে ভাবতেই থাকল—এটা করি কি ওটা করি, এটা ভাল কি ওটা ভাল। দু দিকের যুক্তিগুলোই ভিড় করে তাকে চেপে ধরে—একটা সদ্‌যুক্তিও দাঁড়াতে না পেরে বেচারা না-হক্ হয়রাণ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

অবশেষে সে সদুপায় দেখতে পেল। সেটা হচ্ছে এই যে, সে পথের উপর চোখ রেখে চুপ করে বসে থাকবে—যতক্ষণ না একজন মানুষ বিনা সঙ্গীতে, বিনা অস্ত্র-শস্ত্রে বা দা-কুড়ুল হাতে সেখান দিয়ে না যায়। ঐ রকম একটা লোক দেখলেই সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে, তার হাতে ধরা দিয়ে হাব-ভাবে বুঝিয়ে দেবে, সে কি চায়।

এই ঠিক করে সে মাথার টুপিটা খুল্‌ল, কারণ তার চূড়াটা কারো নজরে পড়তে পারে। তারপর আস্তে আস্তে অতি সাবধানে, তার পতনে সেই ঝোপের বুকে যে ফাঁক হয়েছিল, সেই ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে দিল।

যতদূর চোখ যায় জন-মানব নেই। দূরে, ডান দিকে ছোট একটা গাঁ,—তার রান্নাঘরগুলোর ছাদ থেকে ধোঁয়ার

বাঁ দিকে লম্বা দু-সার গাছের ও-ধারে, চোখে পড়ে গম্বুজওয়ালা প্রকাণ্ড একটা "স্যাটো।"

ক্ষিদের কষ্ট সয়ে সন্ধ্যা অবধি সে অম্‌নি চুপ করে রইল—একটা মানুষই আসুক। সারা বেলার মধ্যে সে দেখল কেবল দু'চারটে কাকের উড়ে যাওয়া, আর সাড়া-শব্দের মধ্যে শুন্‌ল কেবল তার পেটের গুড়গুড় আওয়াজ।

আবার রাত্রি হল।

আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল—কিন্তু পেটে যার আগুন জ্বলছে সে শান্তিতে ঘুমোবে কি ক'রে?—সমস্ত রাত্রি সে কেবল ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখল।

পরদিন ভোরে উঠে আবার সে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল। যতদূর চোখ যায় কালকের মত জন-প্রাণী-শূন্য প্রান্তর। ওয়াল্টার স্নাফ্‌জের মনে এবার এক নূতন ভয়ের উদয় হল, সে দেখল যে অনাহারেই সে মারা পড়বে। সে যেন দেখতে পেল সে চিৎ হয়ে চোখ বুজে মাটিতে পড়ে রয়েছে; নানা রকম পোকা-মাকড়, জীব-জানোয়ার আস্তে আস্তে তার গায়ের উপর এসে সবাই মিলে তাকে খেতে আরম্ভ করেছে, তার পোষাকের ভিতর কিলবিল করে ঢুকে তাকে কামড়াতে সুরু করেছে—আর মস্ত-বড় একটা কাক এসে তার ধারালো সরু ঠোঁট দিয়ে স্নাফ্‌জের চোখ ঠোকরাচ্ছে।

এই ভাবতে ভাবতে সে পাগলের মত হয়ে উঠল। তার মনে হল যে দুর্ব্বলতায় সে এখনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাবে, আর হাঁটতে পারবে না। এই মনে করে, যাক্-প্রাণ, থাক্-প্রাণ সঙ্কল্পে সে গাঁ-মুখো বেরিয়ে পড়তেই সামনে দেখল যে, তিন জন চাষা কোদাল ঘাড়ে করে ক্ষেতে যাচ্ছে,—ঝুপ করে সে গর্ত্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিক যখন ঘোর হয়ে এল, সে আস্তে আস্তে গর্ত্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, মাথা গুঁজে, শঙ্কিত,ত্রস্ত প্রাণে বাঁয়ের সেই 'স্যাটো'র উদ্দেশে চলল, ডান দিকের সেই গাঁ-টাকে ঠিক ব্যাঘ্র-সঙ্কুল অরণ্যের

'স্যাটো'র নীচের তলার জানলাগুলো দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। একটা জানলা খোলা। সেটা দিয়ে রান্না করা খাদ্য-বস্তুর সুগন্ধ আস্‌ছিল। ঐ গন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে সোজা ওয়ালটার স্নাফজের "মরমে" অর্থাৎ পেটের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাকে উত্তেজিত, বিক্ষোভিত করে তুলল—তার মনে দুর্দ্দমনীয় সাহস এনে দিল।

কোন দিকে দৃকপাত না করে আচমকা সে চূড়াওয়ালা টুপীশুদ্ধ জানলার গোড়ায় উদয় হল।

ঘরের মধ্যে একটা বড় টেবিলের চারদিকে বসে জন সাত-আট ঝি-চাকর খাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন ঝি দু চোখ বিস্ফারিত করে হাঁ করে রইল, তার হাত থেকে গেলাস পড়ে গেল। বাকী সকলে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ ফেরাল,—কাছে শত্রু!

সর্ব্বনাশ! প্রুসীয়ানরা "স্যাৎও" আক্রমণ করেছে!

তার পরেই আট জনের আট রকম গলা মিলে ভয়চকিত এক মহা চীৎকার-ধ্বনি,—ছুটপাট, হুড়োহুড়ি, গোলমাল, দরজার দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। চেয়ারগুলো ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল, বেটাছেলেরা স্ত্রীলোকদের ঠেলে ফেলে দিয়ে আগে পালাল। দুই সেকেণ্ডের মধ্যে ঘর একেবারে খালি,—কেবল টেবিলের উপর নানা খাদ্যবস্তু; বিস্ময়-বিমূঢ় ওয়ালটার স্নাফ্‌জের চোখের সম্মুখে সাজানো পড়ে রইল। সে তখন পর্য্যন্ত সেইখানে নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে দু এক মিনিট ইতস্তত করে জানলার ভিতর গলে ঘরে ঢুকে সে প্লেটগুলোর দিকে অগ্রসর হল। জ্বরো রোগীর মত সে ক্ষিদেয় কাঁপ্‌ছিল—কিন্তু অজানা শঙ্কায় এগোতে না পেরে অবশভাবে দাঁড়িয়েই রইল। খানিকক্ষণ কান পেতে শুন্‌ল। দরজাগুলো দুম্ দাম্ করে বন্ধ হওয়ার শব্দে, উপর-তলার তক্তার মেজের উপর দৌড়দৌড়ির শব্দে সারা বাড়ীখানা কাঁপছিল। সে চুপ করে এই সব অস্পষ্ট গোলমাল শুনতে লাগ্‌ল, একটু বাদে উপর থেকে লাফিয়ে নীচের নরম মাটির উপর মানুষের পড়বার আওয়াজ তার কাণে এল।

তারপর সব চুপ, অত-বড় প্রকাণ্ড বাড়ীটে গোরস্থানের

ওয়ালটার স্নাফ্‌জ্‌ একটা অস্পৃষ্ট প্লেটের সাম্‌নে বসে খেতে সুরু কর্‌ল।

আরম্ভ করেই সে একেবারে গোগ্রাসে গিলতে লাগল, এখনই বুঝি কেউ এসে তার খাওয়া বন্ধ করে দেবে, তার পেট বুঝি ভরবে না! প্রকাণ্ড হাঁ করে ছ'হাতে সে মুখে খাবার ফেলতে লাগল, সেগুলো টপাটপ একেবারে পেটের মধ্যে গিয়ে পড়তে লাগল। আস্ত সব খাবার গিলে খাওয়াতে তার গলাটা ফুলে ডবল মোটা দেখাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে গলায় খাবার বেধে যাওয়াতে মনে হল সেটা একটা থলির মত ফেটে যায় বুঝি! তখন 'সিডারে'র বোতল মুখে ঢেলে পথ খোলসা করে নিচ্ছিল,—যেমন জল ঢেলে লোকে বদ্ধ নালা সাফ্‌ করে।

যত প্লেট, ডিস, বোতল সব খালি হয়ে গেল। রাশীকৃত খাদ্য ও বোতল-বোতল মদ পেটে বোঝাই করে সে দম্‌ আটকাবার মত জড়ভরত অবস্থা প্রাপ্ত হল—হাঁস-ফাঁস করতে লাগল, তার বার বার হিক্কা উঠতে লাগল, মাথা গুলিয়ে গেল। নিশ্বাস ফেলবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি কোটের বোতাম খুলে দিল—কিন্তু উঠে দাঁড়াবার মত শক্তি তখন আর নেই। আপনা-আপনি তার দুই চোখ বন্ধ হয়ে গেল; হাত দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়ে মাথাটা তার উপর রাখতেই আস্তে আস্তে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সে গভীর তন্দ্রামগ্ন হয়ে গেল।

দূরে আকাশ-প্রান্তে অর্দ্ধচন্দ্র পাশের গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে নিষ্প্রভ আলো বর্ষণ করছিল। চারিদিক স্তব্ধ,—ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে বইছিল। প্রভাত হতে আর বড় দেরী নেই।

কতকগুলো নির্ব্বাক্‌ ছায়ামূর্ত্তি কাছেই একটা ঝোপের ভিতর নড়ছিল। মাঝে মাঝে চাঁদের আলো পড়ে দু' একটা অস্ত্রমুখ অন্ধকারে চক্‌চক্‌ করছিল।

সেই ঘোলাটে অন্ধকারে নিস্তব্ধ "স্যাটো"ও মাথা উঁচু করে প্রকাণ্ড কালো "ছায়া-গৃহের" মত দাঁড়িয়ে। নীচের তলার দুটো জানলাতে তখনো আলো জ্বলছিল।

হঠাৎ কে একজন বজ্রধ্বনিতে চীৎকার করে উঠল—

অগ্রসর হও! ভগবানের নাম নিয়ে সকলে অগ্রসর হও!

এক মুহূর্ত্ত মধ্যে গৃহের দরজা, জানলা, সার্শি—মানুষের চাপে যেন ভেঙে পড়্‌ল—তারা লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে সব ভেঙ্গে চুরে একাকার করে দিয়ে, বাড়ী ভরে ফেল্‌ল। তারপর নিমেষ-মধ্যে আপাদ-মস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পঞ্চাশ জন সৈন্য এক লাফে রান্নাঘরে ঢুকে পড়্‌ল, যেখানে শান্তিতে ওয়ালটার স্নাফ্‌জ্‌ নিদ্রামগ্ন ছিল। পঞ্চাশটা গুলিভরা বন্দুক তার বুকের উপর উঁচিয়ে ধরে তাকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেলা হল।

বেচারার ঘুমের ঘোর তখনো কাটেনি, কি ব্যাপার হল পরিষ্কার বুঝতে না পেরে সে হতভম্ব হয়ে রইল, ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠছিল।

জরির কাজ করা পোষাকে ভারি মোটা রকমের একজন সৈনিক হঠাৎ তার পেটের উপর নিজের পা তুলে দিয়ে বলে উঠল,—তুমি আমার বন্দী, স্বীকার কর।

প্রুসীয়ান খালি বন্দী কথাটি বুঝতে পারল। সে গোঙিয়ে বললে,—হাঁ, হাঁ, হাঁ।

তারপর তাকে তুলে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে সকলে সকৌতুহলে খানাতল্লাসী করতে লাগল। তাদের অনেকে তিমি মাছের মত ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করে নিশ্বাস ফেলছিল। কেউ কেউ পরিশ্রম আর আনন্দের আধিক্যে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়্‌ল।

বন্দী ব্যক্তিটি তখন মনের আনন্দে নিজে নিজে হাসছিল, এইবার সে সত্যই বন্দী হয়েছে!

একজন অফিসার প্রবেশ করে বলল,—কর্ণেল মশায়, শত্রুরা পলায়ন করেছে, অনেকে বোধ হয় আহত হয়েছে। এ জায়গা এখন আমাদের অধিকারে।

স্থূলাকার সৈনিক পুরুষটি হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে বলে উঠল,—আমাদের জয়!

তারপর পকেট থেকে ছোট একখানা নোট-বই বের করে তাতে লিখ্‌ল—ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর প্রুসীয়ানরা পিছু হঠ্‌তে বাধ্য হয়েছে। হত-আহত সমস্ত তারা সঙ্গে নিয়ে পলায়ন করেছে। অনুমানে তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ,—এই পঞ্চাশজন লোক অকর্ম্মণ্য হয়ে গিয়েছে। আরও কয়েকজনকে আমরা বন্দী করেছি

যুবক অফিসারটি বলল,—কর্ণেল মশায়, এখন আমাকে কি করতে হবে ?

কর্ণেল বললেন,—বেশী সৈন্য নিয়ে শক্ররা প্রতি-আক্রমণ করবে। সুতরাং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লওয়া উচিত।

ফেরবার হুকুম জারি হয়ে গেল।

'স্যাটো'র বাইরে এসে ব্যূহ রচনা করে মার্চ্চ আরম্ভ হল। মাঝখানে পিঠ-মোড়া করে বাঁধা ওয়াল্‌টার স্নাফ্‌জ্‌—ছ'জন সৈন্য রিভলভার হাতে তার পাশে পাশে চল্‌ল।

কয়েকজন সৈন্য পথ পরীক্ষা করবার জন্য আগে গেল। বাকী সকলে সতর্কভাবে থেমে থেমে চলতে লাগল।

সূর্য্যোদয়ের সময় সকলে "লা-রচ্‌-অয়সে" পৌছোল। "লা-রচ্‌-আয়সের" ন্যাশন্যাল গার্ডই এই বীরত্ব প্রকাশ করেছিল।

স্থানীয় লোকজন মহা উদ্‌গ্রীব ও উত্তেজিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। বন্দীর মাথার টুপী দেখা যেতেই বিরাট চীৎকার ধ্বনি উঠল। স্ত্রীলোকেরা উত্তেজনায় দু'হাত ওঠালে, বুড়োবুড়ীরা উত্তেজনায় চোখের জল ফেলতে লাগল। একটা কাণা তার হাতের লাঠিখানা ছুড়ে ফেলে একজন ফরাসী সৈন্যের নাক জখম করে দিল।

কর্ণেল মহোদয় গম্ভীরনাদে বললেন,—বন্দীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও।

সকলে টাউনহলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। জেলখানা খোলা হল। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে ওয়ালটার স্নাফ্‌জকে তার মধ্যে বন্দী করা হল।

দু'শ সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জেলখানার চারদিকে পাহারা দিতে লাগল।

তখন গুরুতর আহারের ফলে অজীর্ণের লক্ষণ দেখা দিলেও প্রুসীয়ান বীর আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করতে লাগল,—ফিক্ ফিক্ করে হাসতে হাসতে হাত-পা ছুড়ে পাগলের মত সে নাচতেই লাগল—যতক্ষণ না অবসন্ন হয়ে দেওয়ালের গোড়ায় মেজের উপর ধুপ্ করে পড়ে গেল।

সে বন্দী হয়েছে! বেঁচে গেছে, বাপ্!

এই রকমে স্যাটো সাঁপিনে ছ' ঘণ্টা শত্রুর দখলে থেকে পুনরধিকৃত হয়।

এই বীরত্ব প্রকাশ করায় কাপড়ের ব্যবসায়ী কর্ণেল রাতিয়ে "লা-রচ্‌-অয়সে"র ন্যাশন্যাল গার্ডের সেনাপতি মনোনীত এবং পারিতোষিক-ক্রস্ প্রাপ্ত হন।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

---

# রাজপুতানায়

## পুষ্কর

ছেলেবেলা থেকে সাধ ছিল, একবার রাণা প্রতাপের সাধের চিতোর—রাজপুতানায় রাজপুতের কীর্ত্তি মন্দির দেখ্‌তেই হবে। সেবার পূজার সময় সুযোগ ঘটতেই বেরিয়ে পড়া গেল। পথে কাশীতে জিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীর মন্দির ঘুরে তীর্থ-দর্শনের ফল-লাভে নিজেদের বঞ্চিত করলুম না। তারপর কাশী ছেড়ে সুদূর উত্তর লক্ষ্য করে বেরিয়ে পড়লুম।

বিন্ধ্যাচল অবধি এক রকম আরামে আসা গেল,—কিন্তু সেখানে গোরখপুরের কতকগুলি মেয়ে-পুরুষ প্রয়াগে গঙ্গাস্নান করতে যাবার জন্য গাড়ীতে উঠেই এক সুরে গান ধরে দিলে, আর আমাদের গল্প বিশ্রাম ঘুম সব কোথায় যে পালাল! কিন্তু তীর্থের ফল অচিরে পেলুম, বিশ্বেশ্বর কৃপা-নেত্র মেলে চাইলেন—এই গায়কের দল নৈনীতে নেমে গেল; আমরাও তখন ভাঙ্গা কাঁচা-ঘুম জোড়া দিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। পরদিন বেলা দশটায় টুণ্ডুলায় পৌছলুম; সেখানেই আগ্রা যাবার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, তাতে উঠে বেলা প্রায় বারোটার সময় আগ্রায় এলুম। আগ্রার প্রায় সাত মাইল আগে থেকেই প্রেমের সেই বিশ্ব-বিখ্যাত সমাধি, ধ্যানের মন্দির

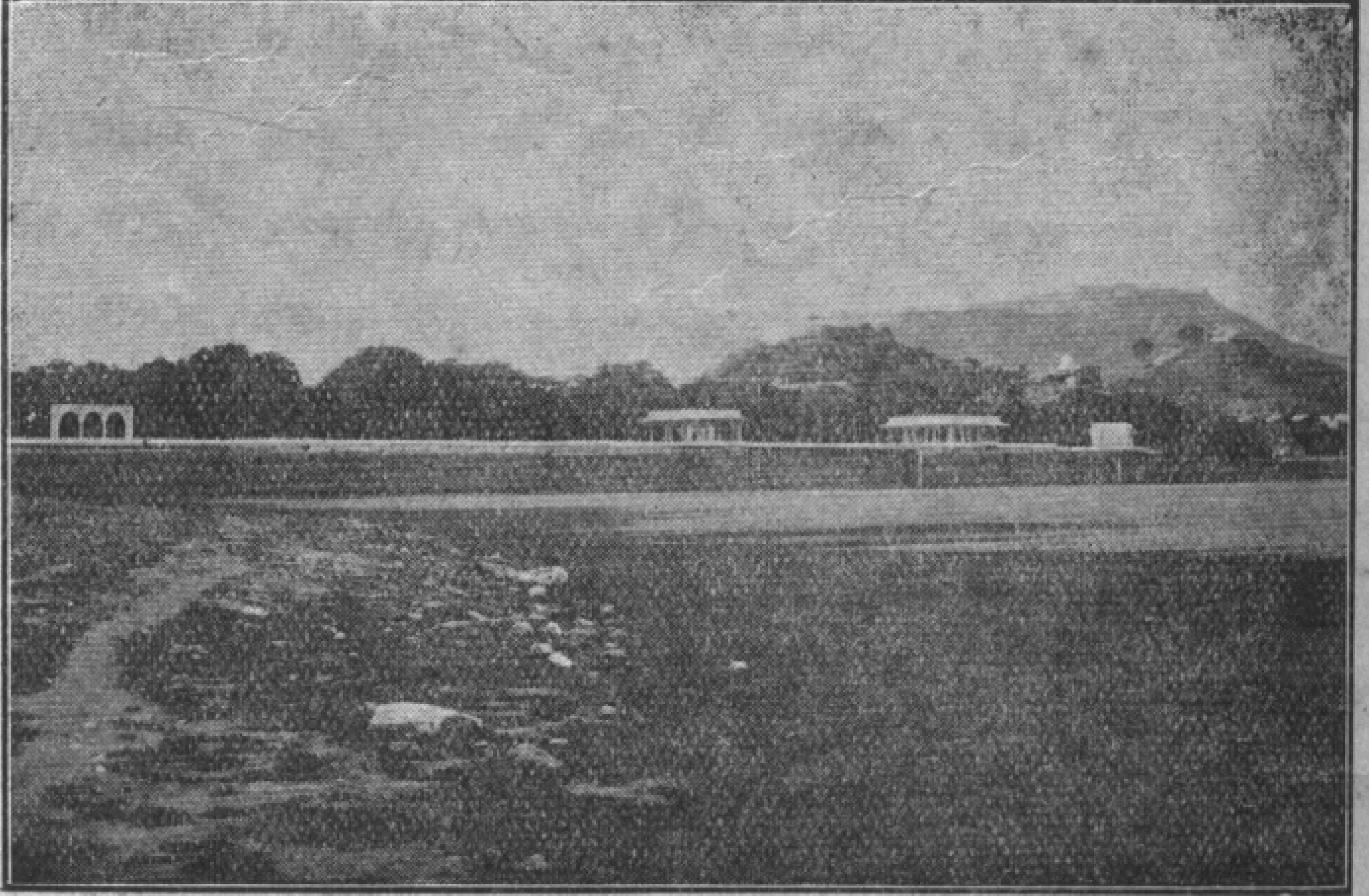
তাজমহল দেখ্‌তে পেলুম। শ্বেত-পাথরের সৌধ, যেন সাজাহানের প্রেমাশ্রু জমিয়েই তৈরী হয়েছে !

পথে আসতে আস্‌তে মোগলসরাইএর আগে থেকেই লাইনের দু'দিকে আম, পেয়ারা আর কুল গাছের বাগান বিস্তর দেখা যেতে লাগ্‌ল। এই ল্যাংড়া আম ও পেয়ারাই কল্‌কাতার বাবুদের রসনার তৃপ্তি সাধন করে। মাঝে মাঝে ধানের ভুঁইও আছে; তবে এধারে ভুট্টার চাষই বেশী। এদেশের চাষারা একেবারে নেহাৎ আমাদের দেশের চাষা নয়। আমাদের দেশের চাষারা সামান্য একটা নেংটি প'রেই চাষ করে—এরা কিন্তু মোটেই তেমন নয়। এরা ভদ্রলোক সেজে মাঠে আসে; জামা গায়ে দিয়ে, মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে লাঙ্গল ধরে। সময় সময় মাঠে এক-একখানা খাটিয়াও আনে, তাতে গা মেলে দরকার-মত একটু বিশ্রামও করে নেয়। ক্ষেতের মাঝে ইঁদারা থেকে জল তুলে ফসলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

মাঝে মাঝে এক এক ঝাঁক পাখী দেখ্‌লুম, তারা যেন সমুদ্রের ঢেউএর মত ওড়ে,—কখনও ২৫০।৩০০ ফুট উপরে উঠে গেল আবার ঠিক পরেই একেবারে যেন মাটির উপর দিয়ে যেতে লাগ্‌ল, সব একসঙ্গে একভাবে। দু-চারটে বুনো ময়ুর আর হরিণও চোখে পড়ল। এদেশের পাড়াগাঁগুলোও আমাদের দেশের মত নয়। খোড়ো ঘর যে একেবারে নেই তা নয় তবে বেশীর ভাগই মাটির। আমরা প্রথমে মাটির ঘরগুলোকে দূর থেকে দেখে মনে ভেবেছিলুম, বুঝি, ভেঙ্গে চুরে গেছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে বুঝ্‌লুম যে এদের ছাদও মাটির। কোন কোন ঘর আবার দোতলা—ছাদে আল্‌সে দেওয়া, উপরে ওঠ্‌বার সিঁড়িও আছে। এ-রকম ঘেঁষাঘেষি পঁচিশ ত্রিশ খানা ঘর নিয়ে এক-একখানা গাঁ। গাঁগুলি বেশ পরিষ্কার।

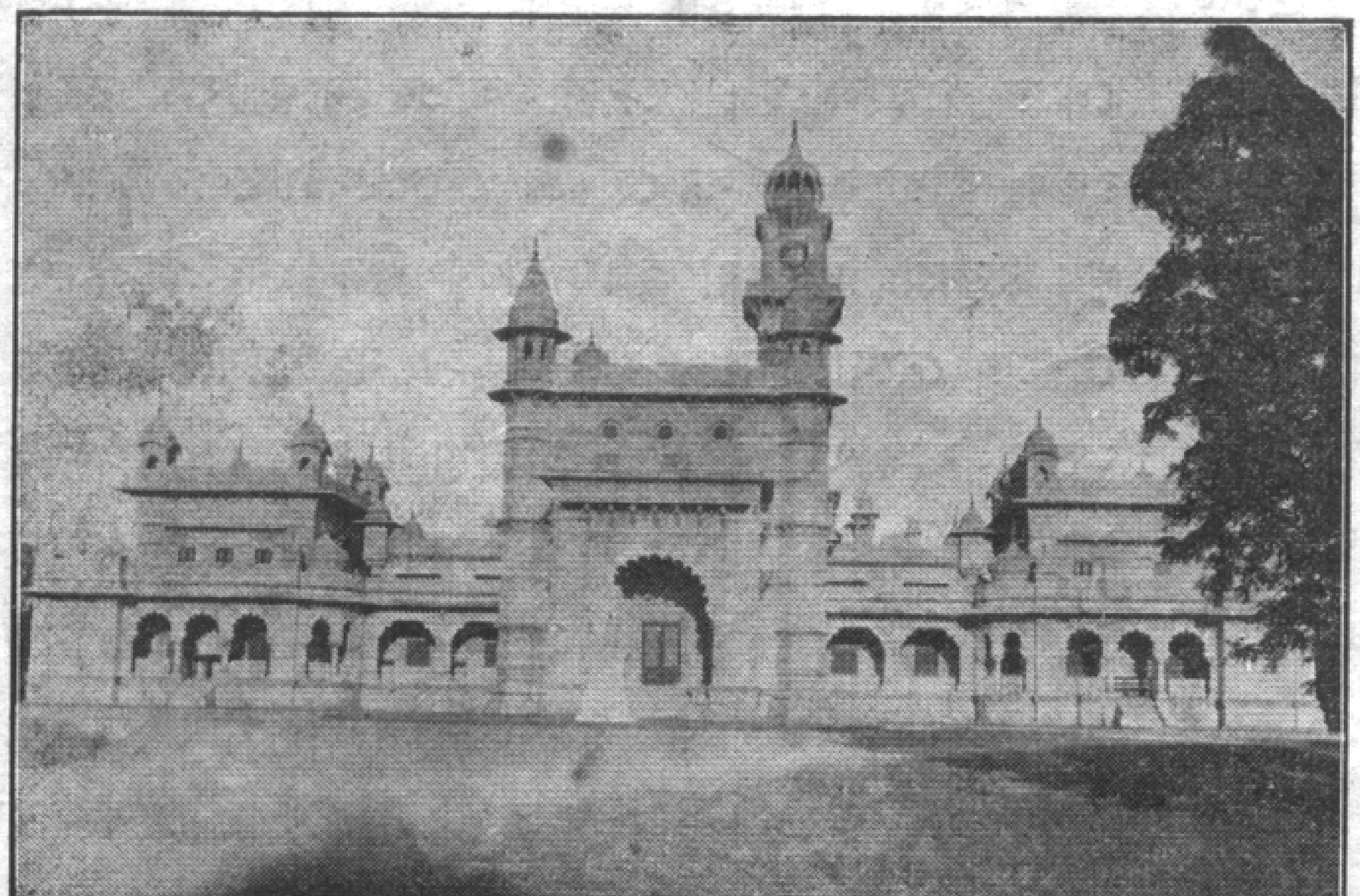
আগ্রায় ওয়েটিংরুমে স্নান করে নিয়ে সহরটা একটু দেখব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোথাও একটু জল মিল্‌ল না। অগত্যা তখনই একখানা মথুরার গাড়ী পাওয়ায় তাতে করে গোটা তিনেক ষ্টেশন পরে আফ্‌নারার ওয়েটিং রুমে স্নানাদি সেরে সন্ধ্যার কিছু আগে আজমীরগামী গাড়ীতে উঠে বসলুম। রেলের দুধারে সমানে ভুট্টার বন, তার মাঝে মাঝে দুটো-চারটে হরিণ আর ময়ুর। খাবারের মধ্যে এখানে মেলে দুধ, চিনি, মোটা মোটা পুরি আর মিঠাই—সে এক অপূর্ব্ব পদার্থ। উপায় নেই, বিপুল ক্ষুধা—তাতেই উদর পূর্ত্তি করা গেল। ভোর বেলা জয়পুর পার হওয়ার কিছু পরেই দেখি, রেলের দুদিকে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়। এ-সব আরাবল্লী পর্ব্বতের শাখা। সহরে ঢোক্‌বার মুখে খানিকটা পাহাড় ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে তবে রেল পাতা হয়েছে। ট্রেণ থেকেই আজমীর সহরটী বেশ দেখাচ্ছিল, চারিদিকে পাহাড়—আর তার নীচেই সহর। বেলা প্রায় বারোটার সময় আজমীর পৌছলুম। সেখানে এক আত্মীয়ের বাসায় উঠ্‌লুম।

বৈকালে সহর দেখ্‌তে বেরুনো গেল। বাসার একটু দূরেই পাহাড়ের নীচে এক প্রকাণ্ড জলহীন কৃত্রিম হ্রদ, নাম আনা সাগর। রাজা আনা একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নদীর স্রোত বন্ধ করে এই সাগর তৈরী করিয়ে ছিলেন। এ সাগরের পূর্ব্বদিকের পারের উপর সম্রাট সাজাহান-নির্ম্মিত শ্বেতপাথরের সুন্দর তিনটি হল। তাতে হ্রদটির ভারী শোভা হয়েছে। যেবার একটু বেশী বর্ষা হয়, সেবার



আজমীর—আনা সাগর

এতে বেশ জল জমে। কিন্তু এবার এদিকে বর্ষা হয়নি, জলও জমেনি। শুনলুম, হ্রদের তল শাণ বাঁধানো আর এ যে কতখানি গভীর, তা জানা যায় না। আপাততঃ যে হ্রদ আছে সেটা পনেরো ফিট গভীর। পাহাড় থেকে বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে এসে এখন বেশ চড়া পড়ে গেছে। চাষারা লাঙ্গল চষ্‌ছে, তাতে ফসল বুন্‌বে বলে। হ্রদের পূর্ব্বদিকে খানিকটা-বাদ সব পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পূর্ব্ব দিকের এক ধারের পাহাড়ের উপর আজমীরের চীফ কমিশনার থাকেন; আর একটীর উপর একটী সুন্দর অট্টালিকা, সেটি লাভচাঁদ মতিচাঁদের অংশীদার



আজমীর—মেও কলেজ, কলেজ বিভাগ

মূলচাঁদ নামে এক জৈনীর। চীফ কমিশনারের বাড়ীর ঠিক নীচেই একটা বড় ড্রেণ, বর্ষা বেশী হলে এই নালা দিয়ে জল বার হয়ে যায়। আনা সাগর থেকে আমরা কৈজার পার্কের দিকে এলুম। এধারের রাস্তা অতি সুন্দর,—যেন ছবির রাস্তা। কল্‌কাতার যত-সব পার্ক এর কাছে কিছুই নয়। একটু দূরে এক জায়গায় ব্যাণ্ড বাজ্‌ছে, পাশেই একখানা বাড়ী, ইলেক্‌ট্রিক ফিটিং করা—সেটা সাহেবদের ক্লাব, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এখানে ব্যাণ্ড বাজে। সেখান থেকে একটু দূরেই বি, বি, সি, আই রেলের দেশীয় কর্ম্মচারীদের ক্লাব। এটা একটা মস্ত বাড়ী। একটা হলে ষ্টেজ খাটানো রয়েছে, সেখানে থিয়েটার হয়। পাশের একটা ঘরে বিলিয়ার্ড টেবিল, ক্যারম বোর্ড, কার্ড টেবিল আছে। আর তার পাশেরই একটা ঘরে মস্ত একটা বড় টেবিলের উপর বিস্তর খবরের কাগজ। বাড়ী থেকে বেরুবার পর পত্রিকার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। ক্লাবের সঙ্গে একটা লাইব্রেরীও আছে, লাইব্রেরীটি নিতান্ত ছোট নয়, ইংরিজি বাংলা অনেক বই আছে। উঠানে টেনিস আর ফুটবলের নির্দ্দিষ্ট জায়গা রয়েছে, মাঝে মাঝে গাছতলায় দু'চারখানা বেঞ্চও আছে। মোটের উপর জায়গাটি মন্দ নয়।

পরদিন বি, বি, সি, আই রেলের কারখানা দেখ্‌তে গেলুম। কারখানা প্রকাণ্ড, প্রায় ই, বি, আর-এর কাঁচড়াপাড়ার ওয়ার্কশপের মত। পরে যাই মেও কলেজে। এটি লর্ড ডফারিনের ১৮৭৫ সালের কীর্ত্তি। এই কলেজে রাজপুত রাজকুমারেরা শিক্ষা পান্। কলেজের সামনেই লর্ড মেওর প্রস্তর মূর্ত্তি। কলেজটায় দু'ভাগ, একটীতে স্কুল, অপরটীতে কলেজ। মাঝখানে একটী টাওয়ার ক্লক আছে। বাড়ীর সামনের চেয়ে পিছনটা দেখ্‌তে ভাল। কলেজের কাছেই

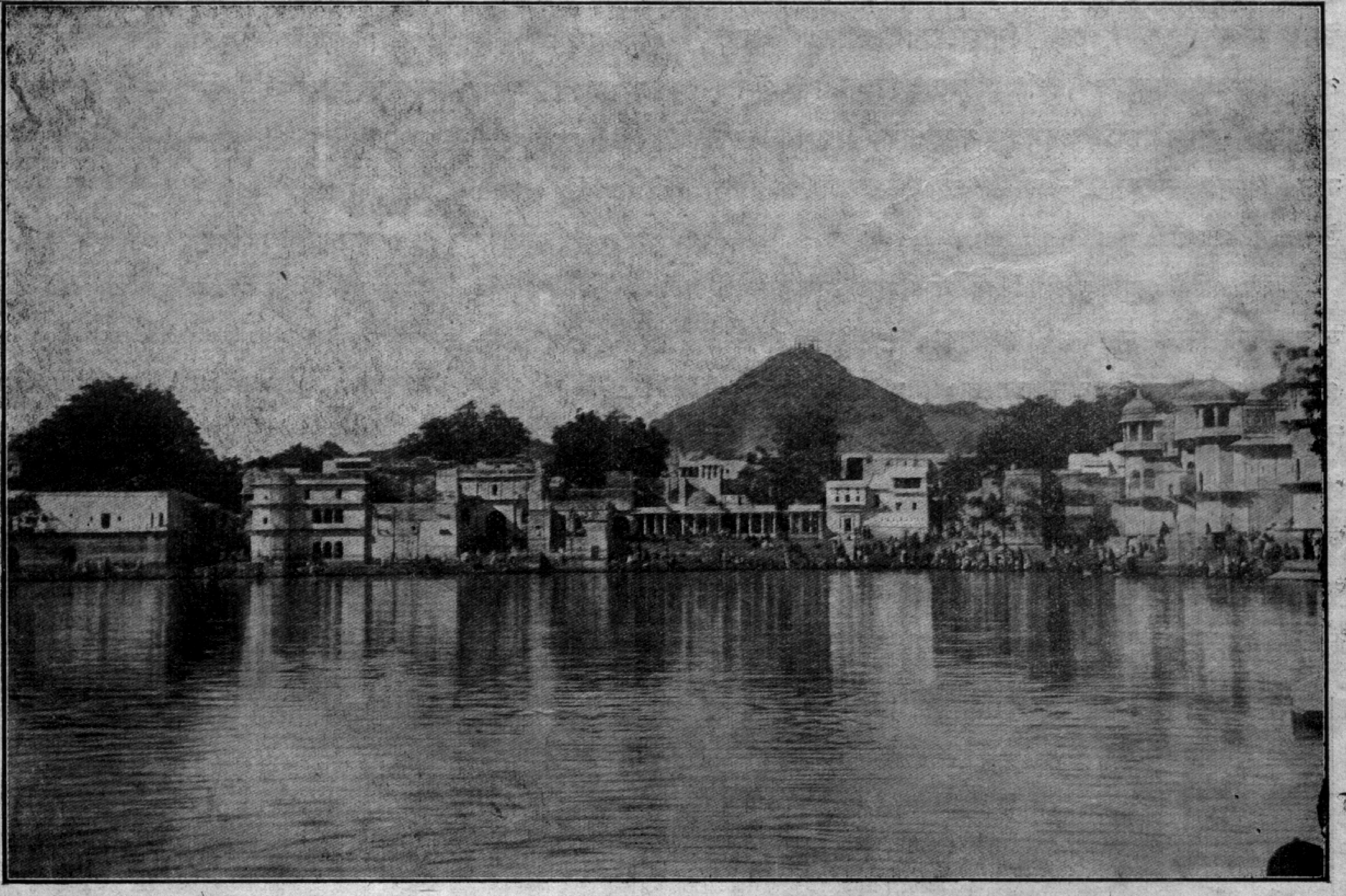


আজমীর—মেও কলেজ, স্কুল বিভাগ

সেখানকার চীফ মেডিকেল অফিসার রায় বৃন্দাবনচন্দ্র শূর বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর বাড়ী বালিতে। একটু পরিচয়ের পরই তিনি আমাদের সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করতে লাগ্‌লেন; তাঁর ছেলেকে আমাদের সব দেখিয়ে দিতে বল্‌লেন। কলেজের দরজায় তখন চাবি বন্ধ। আমরা উপর-উপর দেখেই ফিরে আস্‌ছিলুম তখন বৃন্দাবন বাবু নিজে চাবি নিয়ে আমাদের সব দেখিয়ে দিলেন। কলেজের মাঝখানে একটা মস্ত বড় হল-ঘর। এক পাশে একটা উঁচু বেদী। এখানে দরবার প্রভৃতি হয়। ছেলেদের পরীক্ষাও এইখানে নেওয়া হয়। দেওয়ালের চারিদিকে সব দেশীয় রাজাদের প্রমাণ অয়েল পেণ্টিং ছবি। বৃন্দাবন বাবু কে কোন দেশের রাজা সব বলে বলে দিলেন। ছাদের খিলানের উপর একটী নকল সূর্য্য আর চন্দ্র তৈরী রয়েছে। আলো ফেল্‌লে ঠিক সূর্য্য আর চন্দ্রের মত দেখায়। ক্লাসগুলোর মেঝেয় গালিচা পাতা; ছাত্রদের বস্‌বার স্থান সব পৃথক পৃথক, এক একটা ছোট ছোট কদাকার চেয়ার আর এক একটা ডেস্ক। ছেলেদের প্যারিস প্লাষ্টারের মডেলিংও একটু একটু শেখানো হয়। ছাত্রদের কলেজেই থাকতে হয়। প্রত্যেক প্রিন্সেরই কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটা একটা বাড়ী আছে। এখন পূজার ছুটী বলে সেখানে কেউ নেই। কম্পাউণ্ডের মধ্যেই পোলো গ্রাউণ্ড, ফুটবল গ্রাউণ্ড সব রয়েছে। কলেজের ঠিক পিছনেই রাস্তার দু'ধারে শ্বেত পাথরের বস্‌বার আসন,—যে সব রাজা বা কুমার অর্থ সাহায্য করেছেন, তাঁদের নাম পাথরে লেখা। একটু দূরেই খুব খাড়াই একটা পাহাড়। আজ পূর্ণিমা, চাঁদ উঠ্‌ছে, ঠিক যেন পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি মার্চ্ছে। জায়গাটা অনেকটা স্যানেটেরিয়মের মত—সহর থেকে অনেক দূরে, বেশ নির্জ্জন। শুন্‌লুম বাঙালী যে-কেউ ঐ কলেজ দেখতে যান, বৃন্দাবন বাবু তাঁকেই বিশেষ যত্নের সহিত নিজে সব দেখিয়ে দেন। তাঁর ব্যবহারের সরলতা আর অমায়িকতা আমাদের বাস্তবিকই মুগ্ধ করেছিল। সন্ধ্যার একটু পরেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে

পরদিন সকালে ক্যামেরা আর কাপড় গামছা নিয়ে পুষ্কর তীর্থে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লুম। পুষ্কর আজমীর থেকে সাড়ে সাত মাইল পশ্চিমে। এক্কা আর টোঙ্গা এখানে খুব শস্তা; তবে আমরা পাহাড়ে দেশে এসেছি বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পাহাড়ে উঠিনি। কেউ কেউ বল্‌লেন যে আমরা কিছুতেই এতদূর পাহাড়ে রাস্তা ভেঙ্গে যেতে পারব না, তাই পায়দলেই বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের আত্মীয় ভদ্রলোকটি প্রায় মাইল দুই আমাদের সঙ্গে এসে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে নিজের অফিসে কাজ থাকায় ফিরে গেলেন।

পথের মোড়ে মোড়ে সব পাণ্ডারা আস্তানা পেতে বসে আছে। তাদের আশ্রয় নিলে যাত্রীদের কি রকম আরামে যে সব দেখিয়ে দেবে সেটা বোঝাবার জন্য খুব বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিন যেই গাড়ী থেকে ষ্টেশনে নেমেছিলুম তখনই এই মহাপুরুষদের দু'চার জনের সাক্ষাৎ লাভ হয়েছিল। আমাদের আত্মীয় ভদ্রলোকটি তাঁর বাড়ীর পাণ্ডার নাম বলে দিয়েছিলেন, তাঁরই নাম করে আমরা যেতে লাগলুম। তিন মাইল পরে একটা মস্ত বড় পাহাড়, সেটা পার হয়ে যেতে হয়। পাহাড়ের উপর দিয়ে দুটো পথ গেছে—একটা সোজা খাড়াই সরু হাঁটা পথ; আর একটা চওড়া, গাড়ীর জন্য। এটা পাহাড়ের উপর দিয়ে বেঁকে বেঁকে গিয়েছে। গাড়ীর রাস্তার এক ধারে খাড়াই পাহাড়, আর এক ধারে পাথরের তৈরী পাঁচিল। পাহাড়ে পৌঁছুবার একটু আগেই পথে দুজন পাহাড়ীর সঙ্গে দেখা হলো। তাদের কাছে একটা লাঠি ছিল, আমি সেটা চেয়ে নিয়ে তার উপর ভর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। আমাদের উঠতে বেশ একটু কষ্ট হচ্ছিল বটে, তারা কিন্তু অতি-সহজেই যেতে লাগল। রাস্তায় অনেক বাঙালী বাবুকে দেখলুম, মহিলাদের নিয়ে পুষ্কর তীর্থে চলেছেন। ক্রমশঃ আমরা পথের পাণ্ডাদের হাত এড়িয়ে পুষ্কর সহরে গিয়ে উঠলুম। সেখানে দলে দলে পাণ্ডা। আমাদের পাণ্ডার নাম করায় সে বল্‌লে, 'সে ত এখানে নেই,



পুষ্কর হ্রদ

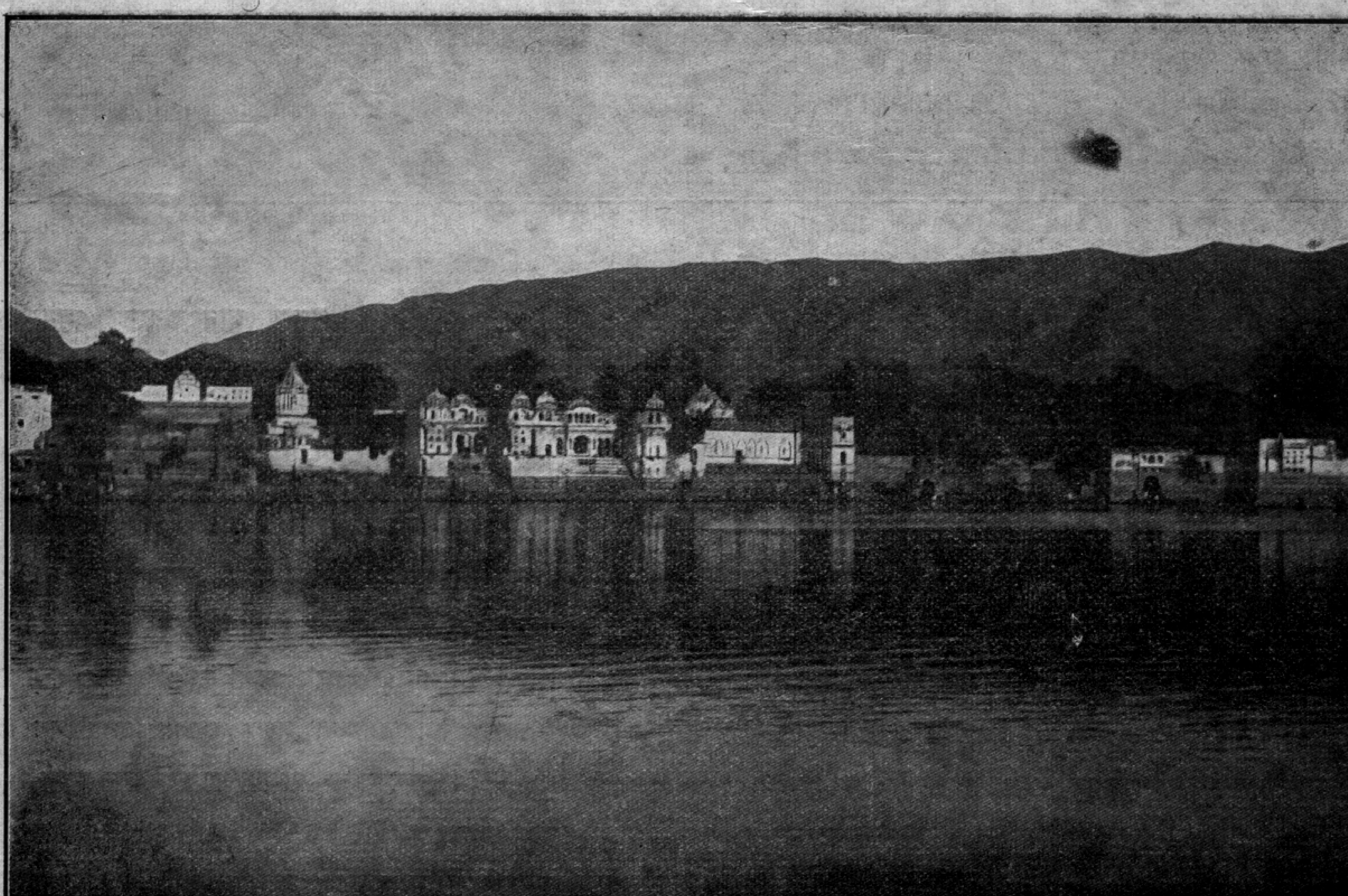
সঙ্গে আসুন, আমি আপনাদের সব দেখিয়ে দেব, ক্রিয়া-কলাপ করিয়ে দেব।' তার সঙ্গে চললুম, কিন্তু একটু এগুতেই আমাদের পাণ্ডার দেখা পেলুম। তার সঙ্গে বরাবর তার বাড়ী গিয়ে উঠলুম। কাপড়-চোপড় ছাড়চি এমন সময় দলে দলে পাণ্ডা মোটা মোটা খাতা বগলে এসে আমাদের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগল। তারা এমন সুন্দর বাঙলায় কথা বল্‌তে লাগল যে এটা বাংলা দেশ কি রাজপুতানা, তা বুঝে ওঠা কঠিন। আমরা কিছুতেই তাদের কথার জবাব দেব না, তারাও ছাড়বে না। শেষে একজন শান্তিপুরের নাম বল্‌তেই তারা জিজ্ঞাসা করলে, শান্তিপুরের কোন পাড়া? তখন সে শান্তিপুরের যত লোকের নাম খাতা দেখে দেখে বল্‌তে লাগল; তার মধ্যে আমাদের চেনা অনেক লোকের নামও পেলুম। তখনও আমাদের পাণ্ডা নাম বল্‌তে বারণ করায় আমি নাম বল্‌লুম না। পুষ্করে স্নান করতে এলুম, সেখানে পর্য্যন্ত পাণ্ডারা ধাওয়া করে এল। তখন আর কি করি, নাম বল্‌লুম; কিন্তু ওরা তখন আরও অনেক লোকের নাম বার করলে—তবে আমার বংশের জানা নামের মধ্যে একটীও পেলুম না। এ-সব খাতা এরা পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে পিতার অবর্ত্তমানে পেয়ে থাকে। কোন কোন খাতা অমন দু'তিন পুরুষ থেকে চলে আস্‌ছে।

পুষ্করের জল দেখে একেবারে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেল! এমন নোঙরা জল যে বল্‌বার কথা নয়! জলের ওপর সব শ্যাওলা ভাস্‌ছে—ঠিক যেন সিদ্ধি গোলা। যেখানে স্নান করব, সেখানে দুজন ব্রাহ্মণ দুটো বড় বড় লাঠি নিয়ে জলের শ্যাওলা সাফ করছে আর সঙ্গে সঙ্গে কুমীর তাড়াচ্ছে। পুষ্করে বড় কুমীরের ভয়, কিছুদিন আগে নাকি একটী স্ত্রীলোককে ঘাট থেকে কুমীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

হ্রদের মাঝে দেখলুম, চার-পাঁচটা বড় বড় কুমীর জলের উপর মাথা তুলে রোদ পোহাচ্ছে। স্নানের আগে পাণ্ডা-ঠাকুর আমাদের তর্পণ করিয়ে দিলেন। কুমীর-তাড়ানো বামুন দুটি তাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ একটী মাত্র পয়সা নিলে। তারা এই উপায়েই জীবিকা উপার্জ্জন করে।

পুষ্কর একটি ছোট হ্রদ। তার একদিকে বড় পাহাড়, আর তিন দিকে সব বাড়ী। পুষ্করে গো-ঘাট, ব্রহ্মঘাট প্রভৃতি অনেকগুলি ঘাট আছে। ঘাটগুলি বাঁধানো, সিঁড়ি জলের মধ্যে নেমে গিয়েছে। রাজপুতানায় আসার পর এই প্রথম একটি বড় জলাশয় দেখলুম। পুষ্করে অসংখ্য মাছ, ছোলা ভাজা দিলে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসে। আর যেখানেই ছোলা দেওয়া যায়, সেইখানেই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ। তবে মাছের সঙ্গে সঙ্গে কুমীরও নাকি আসে। এখানে ভিখিরীর উৎপাতও কম নয়, দলে-দলে ছোঁড়ারা এসে বিরক্ত করে আর বলে, 'চারটে পয়সা হলেই আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেব।' কেউ কেউ আবার তার মধ্যে একটু জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধে উপদেশও দেয়। বছর দশেকের একটা ছোট ছেলে বল্‌ছে, 'দেখুন বাবু, প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মা আছে, আর এই জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। আপনি আজ এই জীবাত্মাকে কিছু দিলে সেই পরমাত্মার কাছেই তা পৌঁছুবে।'

পুষ্কর হ্রদের পাশেই আজকাল বেশ জমকালো সহর বসেছে; তবে হ্রদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে যাচ্ছে। অন্য কোথাও হলে ও-জল কেউ ছোঁয়ও না, তবে পুষ্কর নাকি হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান, তাই অনেকে চোখ-কাণ বুজে একটা ডুব দিয়ে নেয়। অনেকেই যে বিশেষ

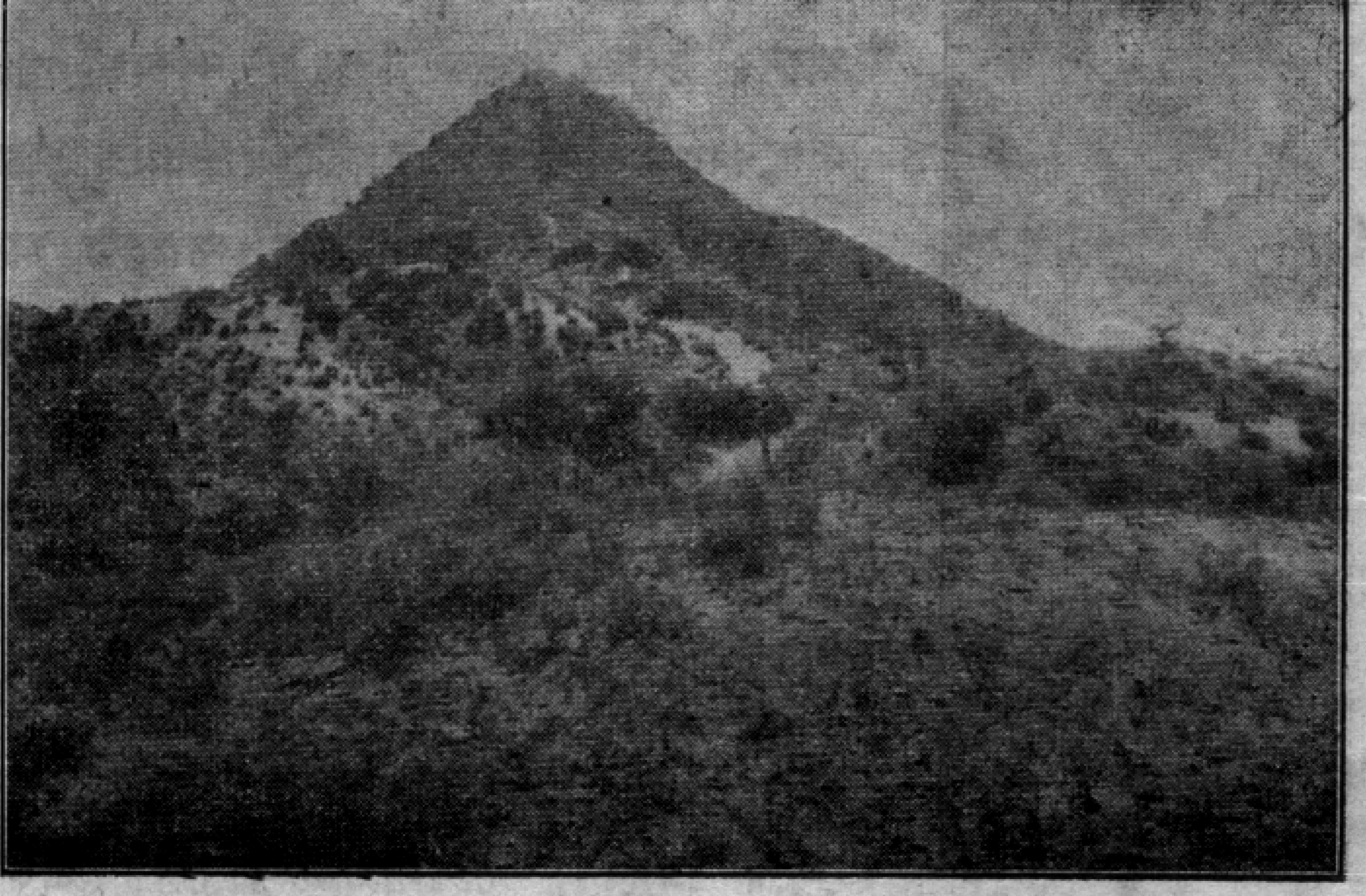


পুষ্কর হ্রদ

ভক্তির সহিত সেটা করেন, এমন বোধ হয় না। সেকালে পুষ্কর নিশ্চয়ই খুব সুন্দর, সুদৃশ্য হ্রদ ছিল। জায়গাটা লোকালয়ের অনেক দূরে, বেশ নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। সাধুরা এখানে ভজন-সাধন করে সিদ্ধিলাভ করতেন। হোমের ধোঁয়ায় আর ভগবানের নাম-গানে এস্থান একদিন অতি পবিত্র হয়েছিল। কিন্তু এখন এটা ব্যবসার বস্তু হয়ে দিনে দিনে এর মাহাত্ম্য ঘুচে তালগাছহীন তাল-পুকুরে দাঁড়িয়েছে! এত বড় একটা সিদ্ধস্থান, আশে-পাশে তথা-কথিত স্বাধীন রাজা-রাজড়ারও অভাব নেই—তাঁরা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কাছে নাম বাঁচাবার জন্য সাধ্যাতীত খরচ করতে সদাই অগ্রসর কিন্তু সামান্য কিছু খরচ করে হ্রদটার শ্যাওলাগুলো সাফ করিয়ে জলটুকু একটু ব্যবহারোপযোগী করে দিতেই কি যত মহাপাতক! সমস্ত পুষ্কর সহরের লোকের পানীয় হচ্ছে এই হ্রদের জল। তারাও ইচ্ছা করলে সমবেত চেষ্টায় হ্রদের সংস্কার সাধন করতে পারে। কিন্তু করে কে?

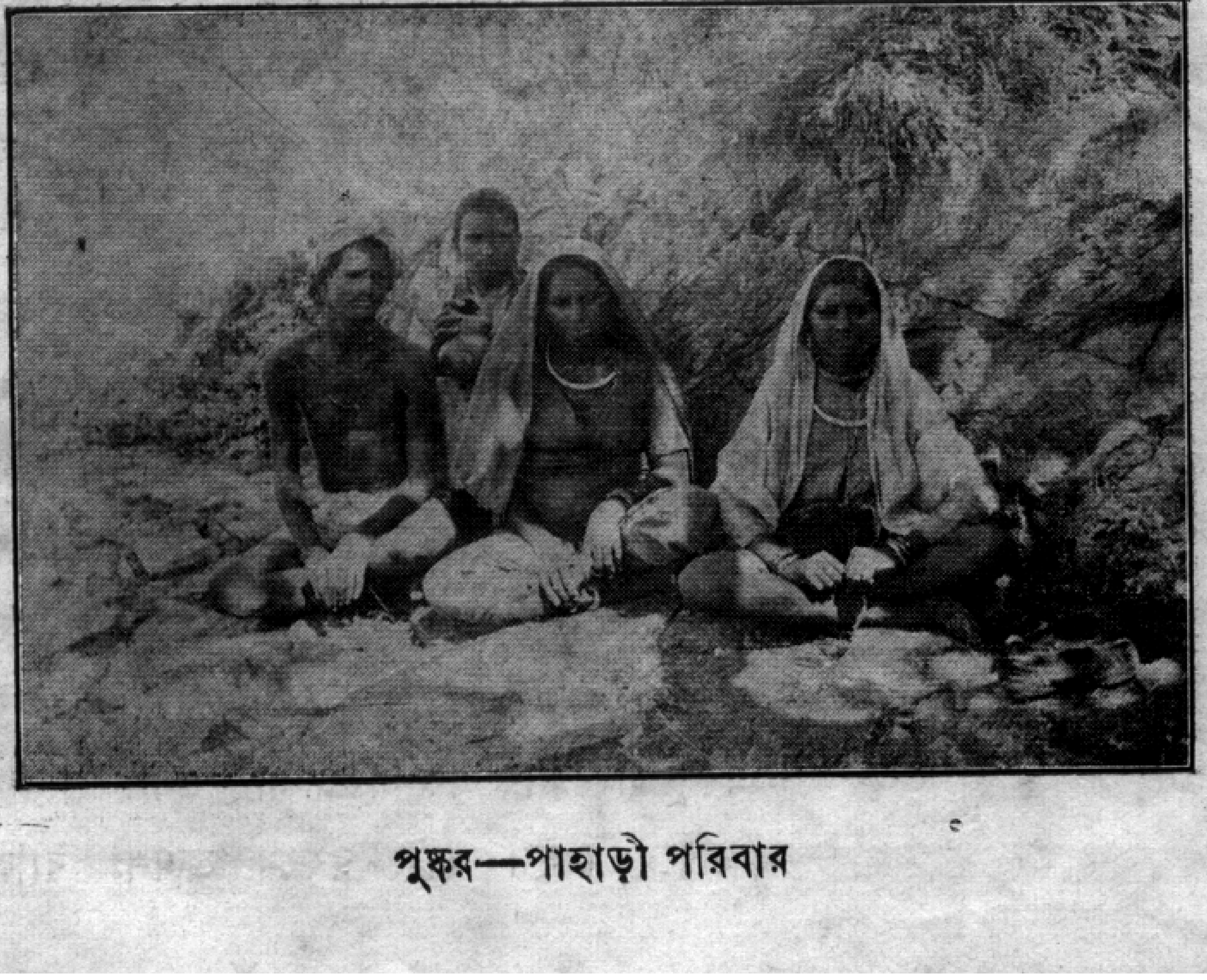
স্নান সেরে, পুষ্করের একটা ছবি নিয়ে বাজার থেকে খাবার কিনে জলযোগ করে নিলুম। এখানে এখনও বুনো আম পাওয়া যায়। তার অতি সুন্দর চাটনি তৈরী হয়। জল খেয়ে আমরা সাবিত্রী পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করলুম। পথে ব্রহ্মার মন্দির পেলুম। মন্দিরটী বেশ বড়। সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা ওপরে উঠে তবে মন্দিরের সীমানার দরজা। আমাদের পাণ্ডা-নিযুক্ত সঙ্গীর কাছে সব জিনিসপত্র রেখে মন্দিরের মধ্যে ঢুকলুম। শুনলুম ব্রহ্মাঠাকুর দেবতাদের পিতামহ হলে কি হয়, এ বয়সেও তাঁর রাগ বড় কম নয়। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সাবিত্রীর কবে কোন্ যজ্ঞে আসতে একটু দেরী হয়েছিল বলে তাঁকে ত্যাগ করে দ্বিতীয় পক্ষে তিনি গায়ত্রীকে বিয়ে করে এখানে সুখের সংসার পেতেছেন। দেবতারাও দেখচি একটি সুন্দরী মেয়ে পেলে অন্য স্ত্রী-সত্বেও ছুতোয়-নাতায় আবার বিয়ে করতে কিছুমাত্র পিছপাও নন্! সাবিত্রীও ব্রহ্মার যোগ্যা স্ত্রী। তিনিও ব্রহ্মার এ অন্যায় আব্দার নীরবে হজম করলেন না। তিনি তাঁদের এই শাপ দিলেন যে তাঁরা তাঁর পা-ধোয়া জল মাথা পেতে নেবেন; এই বলে একেবারে তিন মাইল দূরে এক পাহাড়ের উপর সখী সরস্বতীকে নিয়ে কোন রকমে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে লাগলেন।

ব্রহ্মার মন্দির থেকে বালির উপর দিয়ে সাবিত্রী পাহাড়ের দিকে চললুম। বেলা এগারোটা বেজে গিয়েছে। প্রচণ্ড রৌদ্র; সঙ্গে একটা বৈ ছাতি নেই। কোন রকমে তার মধ্যে মাথাটা গুঁজে চলতে লাগলুম। আমাদের সঙ্গীটির কিন্তু মাথায় ছাতি নেই, পায়ে জুতাও নেই। প্রায় দু'মাইল এই কাঁকর-মেশানো ঢালু বালির রাস্তা দিয়ে ওপরে উঠতে হবে। আর সে বালি কি ভয়ঙ্কর তেতেছে! তাতে কিন্তু সঙ্গীটির যে কিছু কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারলুম না, সে অনায়াসে যেতে লাগল, কিন্তু আমাদের পক্ষে সেই বালি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম! ঠিক যাকে বলে প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত! যতই বালি পার হয়ে ওপরে উঠতে লাগলুম, ততই সহরটা বেশী সুন্দর হয়ে উঠছিল। এই বালির উপর রাস্তার দুধারে হাত পঞ্চাশ-ষাট অন্তর এক একটা বট গাছ বা অন্য গাছ আছে। আমরা একটু একটু যাই আর এক একটা গাছ-তলায় খানিক জিরিয়ে নিই। এই রকমে ক্রমশঃ বালি



পুষ্কর—সাবিত্রী পাহাড়

পার হয়ে পাহাড়ের নীচে প্রায় আধ-মরা অবস্থায় ক্রমে পৌঁছুলুম। এখনও মন্দিরে পৌঁছুতে প্রায় এক মাইল পাহাড়ে রাস্তা। অনেক বাঙালী মেয়েকে দেখলুম ভেজিটেবুল্ সু পায়ে দিয়ে এই বালি পার হচ্ছেন। আমাদের এখানে এমন দুরন্ত পিপাসা পেল যে আর এক পা ওঠাও অসম্ভব বলে বোধ হলো। একটু উঠতেই দেখি, আমাদের পথের উপরেই একটা গাছতলায় বসে দুটি পাহাড়ী মেয়ে আর একটা পাহাড়ী পুরুষ—কাছেই একটা কলসীতে খানিক জল রেখে ঘাসের দড়ি পাকাচ্ছে। এই দুর্গম পাহাড়ের উপর দুপুরবেলা নিজেদের জন্য জল বয়ে এনেছে, সে জল নিতান্ত অপরিচিত আমাদের দিয়ে নিজেরা কষ্ট করবে,—প্রথমটা আমাদের বিশ্বাস হলো না। কিন্তু জল চাইতেই তারা আনন্দে আমাদের তা পান করতে দিলে। জল দেখ্‌লুম পুষ্করের, কারণ তাতে শ্যাওলা ভাস্‌ছে। কোন রকমে রুমাল দিয়ে ছেঁকে নিয়ে আমরা প্রাণ ভরে জল খেয়ে বাঁচ্‌লুম। আমাদের সঙ্গীটি কিন্তু খেলে না। জল খাওয়ার পর আমরা তাদের পয়সা দিতে গেলুম, তারা নিলে না। কি রকম নিঃস্বার্থপর! এত কষ্ট করে জীবন যাপন করে, আর আমরা এত পিপাসায় সেই জলটুকুর জন্য আমাদের কাছে যা ছিল সব দিতে পারতুম। এটা কি রাজা-মহারাজাদের নাম কেন্‌বার জন্য লাখ লাখ টাকা দানের বেশী নয়! সেখানে একটু বিশ্রাম করে তারপর সহজেই মন্দিরে উঠ্‌লুম। পথে ছোট ছোট শিলাখণ্ডে সিঁদুর মাখানো রয়েছে। মন্দিরটি একটী ছোট-খাট বাড়ী-বিশেষ। প্রকাণ্ড দরজা। বাড়ীর মাঝখানে একটী ছোট ঘর, তাতে শ্বেত পাথরের সাবিত্রী আর সরস্বতী মূর্ত্তি। মন্দিরের দুদিকে কতকগুলি ঘর। সেখানে যাত্রীরা বিশ্রাম করে। একটু দূরে সেই পাহাড়ের উপরেই একটা ইঁদারা। তার জল খুব ঠাণ্ডা। ইঁদারার মধ্যে একটা সাপ ভেসে বেড়াচ্ছে দেখলুম। পাহাড়টি প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু। সেখান থেকে আশপাশের দৃশ্য ভারী সুন্দর। শুন্‌লুম, এখানে যাত্রীদের উপর খুব জুলুম হয়। সধবা স্ত্রীলোকেরা এখানে সাবিত্রী দেবীকে লোহা আর সিঁদুর পরান্; তার মজুরি স্বরূপ পূজারীরা জোর করে বেশী টাকা আদায় করে। তবে আমরা সে রকম কোন ঘটনা দেখ্‌লুম না। অনেক যাত্রীদের পাহাড়ীরা ডুলিতে করে নামিয়ে নিয়ে গেল। ডুলি করে নামা অপেক্ষা নিজে নামা আমার সোজা বলে বোধ হলো। আমরাও একটু পরে নেমে এলুম, তবে নামবার সময় জুতা পায়ে দিয়ে নামা একটু বিপদজনক, কারণ তাতে পা পিছলে যাবার খুবই আশঙ্কা আছে। তাই আমরা জুতা হাতে করেই নাম্‌তে লাগলুম। কিছু পরেই আমাদের সঙ্গী দূরে একটা ঘাসের বোঝা মাথায় করা লোককে দেখিয়ে বল্‌লে, 'ঐ যে লোকটি আপনাদের জল দিয়েছিল সে।' তাকে ডাক্‌বামাত্র সে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে এমন তাড়াতাড়ি হরিণের মত লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ে উঠে এল যে আমরা তা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তখন তারা যে গাছ-তলায় আমাদের জল দিয়েছিল সেখানে সেই মা, মেয়ে ও ছেলেদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীটিকে বসিয়ে একখানি ছবি নিলুম। তাদেরও একখানি পাঠিয়ে দেব বলে এলুম। মেয়েটির বয়স বছর চৌদ্দ-পনেরো, তার মুখে সদাই হাসি লেগে আছে। ছেলেটি তার চেয়ে একটু বড় আর বেশ সুস্থকায়। তাদের কাছ



পুষ্কর—পাহাড়ী পরিবার

থেকে বিদায় নিয়ে একটু পরেই বালির উপর এসে পড়লুম; কিন্তু এবার নাম্‌ছি বলে আগের মত কষ্ট হলো না। তবে এবার বালি আরও তেতেছিল, তাতে আমাদের সঙ্গীর যে একটু কষ্ট হচ্ছে, তা বোঝা গেল। আমাদের হলে পায়ে যে কত বড় ফোস্কা হত, তাই ভাবতে ভাবতে একটা গাছতলায় এলুম। এ সময় তিন জন লোক ছুটো ডুলি নিয়ে বালি পার হয়ে পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগল, মাঝের লোকের কাঁধে ছুদিকের ডুলির ছুটো হাতল। তারা ঐ আগুন-তাতা বালির উপর একবারও কোথাও একটুও না দাঁড়িয়ে বরাবর উপরে উঠে গেল। এতে তাদের তুলনায় আমাদের ননীর পুতুল বলে বোধ হল। সেখান থেকে পাণ্ডার বাসায় ফিরে সঙ্গীটিকে তার চুক্তির অতিরিক্ত কিছু দিয়ে বিদায় করছি দেখে পাণ্ডা-নন্দন কিছু বিস্মিত হলেন।

তারপর বৈকাল চারটের সময় আজমীর রওনা হওয়া গেল। পথে আস্‌তে আস্‌তে আর একবার মাছ দেখবার লোভ সাম্‌লাতে না পেরে কিছু ছোলা কিনে ঘাটে নামা গেল। একজন লোক জুতো পায়ে দিয়ে ঘাটের কাছে যেতে নিষেধ করলে। আমরা ছোলা ভাজা দিচ্ছি আর দলে দলে মাছ আস্‌তে লাগ্‌ল। একটু পরেই দেখা গেল মাছগুলো যেন ভয় পেয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল। একটী দেশী স্ত্রীলোক কলসীতে খাবার জল ভরছিল—সে বললে যে ঘাটে মকর এসেছে। আমরা ব্যাপার কি দেখবার জন্য একটু অপেক্ষা করতেই দেখি, প্রায় পৈঠার কাছেই এক মস্ত বড় কুমীর।

পুষ্করে বছরে একটী করে মেলা হয়। রাজপুতানায় হিন্দুদের এইটিই শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব। মেলার সময় আশ-পাশের গাঁ আর বিকানীরের মরু থেকে ঘোড়া, গরু, উট প্রভৃতি জন্তু লোকে বিক্রীর জন্য আনে আর সমস্ত ভারতবর্ষ থেকেই তার ক্রেতা জোটে। মেলার সময় অনেক লোক-সমাগম হয়—তাঁরা এই পুষ্করে স্নান করে নিজেদের ধন্য মনে করেন। পুষ্কর হিন্দুদের একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

এই সাড়ে সাত মাইল পাহাড়ে রাস্তা আস্‌তে একটা টোঙ্গা ভাড়া নেওয়া গেল, ভাড়া হলো মোট দশ আনা। এত শস্তা টোঙ্গা দেখে আমরা একেবারে অবাক। রাস্তায় এক ছত্রের দরোয়ান বল্‌লে যে এখানে অনেক বানর,—খাবার দিলেই সব আসে; আমরা ইচ্ছা করি ত তাদের ফটোও নিতে পারি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আর প্লেট না থাকায় ছবি নেওয়া ঘটে উঠলো না।

পরদিন সকালে আমরা জৈনদের মন্দির দেখতে গেলুম। দেবালয় ছু-মহল। একধারে ঠাকুর থাকেন আর একধারে প্রোসেশনের জিনিসপত্র থাকে। নীচের ঘরে সব ধাতু-নির্ম্মিত হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি রয়েছে। উপর তলায় একটা সোনার পরেশনাথ পাহাড় রয়েছে। ঘরটি ভারী সুন্দর সাজানো। দরজায় সব বড় বড় কাঁচ বসানো। সেই কাঁচের বাইরে থেকে সব দেখ্‌তে হয়। কার্ত্তিক মাসে জৈনদের উৎসব হয়। সে সময় এ সমস্ত দিয়ে মস্ত প্রোসেশন বার হয়।

বৈকালে পীরের দরগা দেখ্‌তে গেলুম। এটী মুসলমানদের মক্কার নীচেই বড় তীর্থ। দরগা হচ্ছে খজা মৈনুদ্দিন চিস্তির কবর। ইনিই সব প্রথম ভারতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করতে আসেন। বাদশা আকবর প্রতি বৎসর এ মস্‌জিদে একবার করে আস্‌তেন।

এখানেও পাণ্ডার দৌরাত্ম্য কম নয়। চেহারা কালো কালো যণ্ডা, যেন এক-একটা যমদূত! দেখ্‌লেই ভয় হয়। প্রথম দরজার উপরেই নহবৎখানা; সেখানে কতকগুলো নাকাড়া রয়েছে। ছুটো খুব বড়। শুনলুম, আলাউদ্দিন যখন চিতোর জয় করে, তখন এই নাকাড়া ছুটো, একটা বড় পিতলের বাতির ঝাড়, একজোড়া রূপো দিয়ে মোড়া চন্দনের কপাট আনে। আর জয়ের চিহ্নস্বরূপ এখানে সেগুলো প্রকাশ্যভাবেই রাখেন। মহারাণাও প্রতিজ্ঞা করেন যে যতদিন না এগুলি উদ্ধার করতে পারেন ততদিন আজমীরে আস্‌বেন না। আজও সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়নি! একবার নাকি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাধ্য হয়ে মহারাণাকে আজমীরে আস্‌তে হয়েছিল, কিন্তু তিনি নগরের মধ্যে ঢোকেন্‌নি।

মাঝের দোরের ছুধারে ছুটি প্রকাণ্ড কড়াই। সে ছুটোকে কড়াই না বলে ছুটো ছোট-খাট পুকুর বললে

অত্যুক্তি হয় না। উনোন দুটো ইটের তৈরী। মেলার সময় এতে খিচুড়ি পাক হয়। বড়টাতে প্রায় দেড় হাজার আর ছোটটাতে হাজার টাকার চাল, ডাল প্রভৃতি লাগে। খাবার তৈরী হবার পর আটটা বড় বড় পাত্রে বিদেশী যাত্রীদের জন্য আলাদা তুলে রেখে, তারপর ইন্দ্রকোটের লোকেরা আর দরগার চাকর-বাকররা কম্বল মুড়ি দিয়ে কড়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে কুড়ে খায়। কবে আর কেন যে এই প্রথা চলিত হয়েছে তা জানা গেল না।

একদিকে দেওয়ানি খাস, দেওয়ানি আম রয়েছে। এখন এ সব দালানে ছোট ছোট পাঠশালা বসেছে। ছেলেরা সব উর্দ্দূ আর ফার্শি পড়ে। সবশুদ্ধ প্রায় দেড়শো ছেলে হবে। দালানে অনেক কাঁচের ঝাড় ঝুলোনো রয়েছে। উঠানের অপর কোণে একটা পাথর বাঁধানো পুকুর। এক ধারে দুটো বড় বড় বকুল গাছ। মাঝখানে ফকিরের কবর। সেটা একটা চতুষ্কোণ শ্বেতপাথরের ঘর। কবরের চারদিকে রূপার রেলিং। দরজাও রূপা-মোড়া বোধ হল। কাছে ফকিরের মেয়ের আর সাজাহানের নকল কবর। আমরা ঘরের ভেতর কবরের পাশে গেলুম। ঘরটিতে বেশ সুগন্ধ। কবরটা একটি ভেলভেট্ দিয়ে মোড়া। আমাদের বসিয়ে হাতে দুটো দুটো ফুল দিয়ে সেই ভেলভেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বল্‌লে 'এর মধ্যেই আল্লা আছেন। তোমাদের যা প্রার্থনা আছে, কর, আল্লা তা পূর্ণ কর্‌বেন।' তাদের সব গুণ্ডার মত চেহারা দেখেই ভয় লাগে। শুন্‌লুম না কি হাতে আংটি থাক্‌লে ভেলভেটের মধ্যে যখন হাত ঢুকিয়ে দেয় তখন জোর করে কেড়ে নেয়। আমাদের কাছ থেকে জুলুম করে কিছু আদায় করেও নিলে। আমরা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। কবরের কাছে খৃষ্টানদের আসতে মানা। কবরের একটু দূরেই সাজাহান-কৃত এক মস্‌জিদ। মস্‌জিদের দরজাগুলো সব ঘোড়ার নাল দিয়ে ছাওয়া। দরগার মধ্যে অনেক ভদ্র মুসলমানও থাকেন। যাত্রীদের উপর অত্যাচার হলে তাঁরা যাত্রীদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের অনেক বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন। শোনা যায় সমস্তটা আগে এক শিবমন্দির ছিল। বাড়ীটাও তার কতক সাক্ষ্য দেয়।

দরগার একটু পাশেই আড়াই দিন্‌কা ঝোপ্‌রা। সেটা আগে জৈন মন্দির ছিল। মহম্মদ ঘোরীর খেয়াল হলো যে তিনি ঐ মন্দিরেই জুম্মার নমাজ পড়্‌বেন। কিন্তু তার আর মোট আড়াই দিন বাকি। এই অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য লোক লাগিয়ে মন্দির ভেঙে কতকটা মস্‌জিদে পরিণত করা হলো। তাই থেকেই এই নাম। পাশেই পাহাড়ের উপর সেই প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুত-বীর পৃথীরাজের তারাগড় তিন হাজার ফুট উঁচু। পৃথ্বীরাজ কতবার ঘোরীকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে কত বীরত্ব আর উদারতাই না দেখিয়ে ছিলেন! কিন্তু এই তারাগড়েই তাঁকে অন্ধ করে রেখে শেষে বধ করা হয়েছিল। তারাগড় এখন নীরবে মহম্মদ ঘোরীর এ সব অত্যাচারের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারাগড়ে এখন ইংরেজ সৈন্যেরা ডেরা বসিয়েছে। কালের কুটিল চক্র।

রাত্রে মেওয়ার কন্‌ফারেন্স দেখতে গেলুম। মহাত্মা গান্ধীর স্ত্রী তার সভাপতি ছিলেন।

পুরানো আজমীর সহর একটা বড় পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ঠিক তারাগড়ের নীচেই। সহরের চারদিকে চারটে দরজা। এই দরজাগুলো রাত বারেটার পর বন্ধ হয়ে যায়। এখন অবশ্য পুরনো সহরের বাইরেও অনেক বাড়ী ঘর হয়েছে। পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, ষ্টেশন, সিভিল ষ্টেশন সব সহরের বাইরে। আজমীর সহর ১৪৫ খৃঃ অঃ তৈরী। সহরের ভিতর থেকে সূর্য্যোদয় দেখা যায় না। সকালে যখন সূর্য্য দেখা যায় তখন আর তার পানে তাকানো যায় না। এখানে বড় মাছি আর চড়ূই পাখী। খাবার মধ্যে আমাদের দেশী এক জিলিপি ছাড়া কিছুই মেলে না। আর জিলিপিই এ দেশের প্রধান মিষ্টান্ন। ছানা এদেশে হয় না। লোকে দুবেলা রুটি খায়। একটু ভাল চালের মণ ২০৲ কুড়ি টাকা। এখানকার মেয়েদের পরণে একটা করে জামা, ঘাগরা ও ওড়না। ঘাগরাটা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ না হয়ে যতদূর সম্ভব নাইয়ের নীচে নামানো যায়, ততদূর নামানো হয়। তাতে পেট দিব্য গোলগাল নধর হয়ে ওঠে। জামা এমনই ছোট যে

বুকের মাঝখানে একটু ফাঁক থাকে আর বোতামগুলো তার গহ্বর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার জন্য যেন ব্যস্ত! বুক-চাপ টাইট জামা। বুকের হাড়-পাঁজরা বুঝি ভেঙ্গে যাবে, এমনি! জামার দৌলতে শরীরে একটু বাঁধনের দাগ যে না পড়ে এমন নয়। ছোট বড় সকল মেয়েরই চব্বিশ ঘণ্টা এই পোষাক। তবে মুসলমান মেয়েরা পায়জামা পর্য্যন্ত পরেন; পুরুষদেরও সকলের মাথায় পাগ্‌ড়ী। এক এক জাতের এক এক রকম পাগ্‌ড়ী দেখে জাত ঠিক হয়। কে কি জাত কাউকে বল্‌তে হয় না। এমন কি বাঙালী প্রবাসী যাঁরা তাঁদেরও জাত-হিসাবে পৃথক পৃথক পাগ্‌ড়ীর ব্যবস্থা আছে। আমাদেরও একজায়গায় পাগ্‌ড়ী না থাকায় একটু কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। জয়পুর আর উদয়পুরের যাদুঘরে এ সব পাগ্‌ড়ীর নমুনা আছে। এখানে জলের ব্যবহার কড় নেই। এঁটো বাসন সব ছাই দিয়ে মাজলেই শুদ্ধ।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

শ্রীঅমরনাথ প্রামাণিক।

---

# শিখিবার কলা-কৌশল *

( ফরাসী অ্যাক্যাডেমির সদস্য Marcel Privostএর ফরাসী হইতে )

## প্রথম ভাগ

### শেখা ?

( ১ )

শোনা যায়, Berthelot বের্ত্‌লো স্বকীয় দীর্ঘ ও শ্রম-বহুল জীবনের শেষভাগে নিম্নলিখিত বাক্যটী পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতেন; "আমি নিশ্চয়ই শেষ ব্যক্তি যাহার মনোমধ্যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট আছে।"

ইহা কি গর্ব্বের কথা ? পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্য ? না, কখনই না!...প্রথমত, এইরূপ বলিবার তাঁহার অধিকার ছিল; যে সময়ের কথা তিনি বলিয়াছেন, সেই সময় যাহা কিছু জানিবার ছিল, বস্তুত সে সমস্তই তাঁহার মস্তিস্কে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই বাক্যের অন্তস্তল হইতে সমুত্থিত একটা অকপট বিষাদের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। বের্ত্তলোর বলিবার অভিপ্রায় ছিল; "আমি একটু বেশী শীঘ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছি। একদিন লোকে এমন সব জিনিস জানিতে পারিবে, যাহা আমি জানি নাই...।" এবং শেষে তিনি এই কথাটি বলিয়া আশ্বস্ত হইলেন;—"কেবল, সমস্ত এককালে জানিবার পক্ষে কোনও মানব-মস্তকেই আর স্থান সংকুলান হইবে না!"

তাই বটে। এমন সুপণ্ডিত ব্যক্তির সাক্ষ্য-অনুসারে, মনের রাজত্ব ইহারই মধ্যে এই বিংশতি শতাব্দীতে এত শীঘ্র ও এতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্তিষ্কও উহার সংক্ষিপ্ত ও সরলীকৃত প্রতিবিম্বও ধারণ করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর; মনোরাজ্যের দিগন্ত দেশ একবার পার হইবার চেষ্টা কর। অস্মৎযুগে আবিষ্কৃত ভৌতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে গণনার মধ্যে না আনিলেও, ইতিহাসের জ্ঞানভাণ্ডার কত না বৃদ্ধি পাইয়াছে, দলিল-দস্তাবেজের ভারে ইতিহাস কত-না ভারাক্রান্ত হইয়াছে; বিভিন্ন ভাষার কৃপায় মানব-চিন্তার পরস্পর বিনিময়ে সাহিত্যরাজ্যে জানিবার যোগ্য গ্রন্থের কত না সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, গার্হস্থ্য আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা-প্রণালী পর্য্যন্ত, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পর্য্যন্ত, ক্রীড়াকলাপ পর্য্যন্ত—যাহা-কিছু মানব-চিত্তকে অধিকার করিতে পারে—সেই সমস্ত বিষয়-সম্বন্ধেই এই একই কথা বলা যাইতে পারে। এই বিংশতি শতাব্দীতে যাহা-কিছু জানিবার আছে সমস্ত জানিতে হইলে, Pic de la Mirandoleএর পর-পর দুইটা জীবনেও কুলাইবে না।

---

* Geovauni Pico count della Mirandola ইটালি দেশীয় আধুনিক-তত্ত্ববাদী ( Humanist ) ও দার্শনিক ( খৃ শঃ ১৪৬৩ ৯৪ ), ইনি প্লেটো ও এরিষ্টটেলের দর্শনের মধ্যে সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৪৮৬ অব্দে রোম নগরে তাঁহার প্রসিদ্ধ ৯০০ প্রবন্ধ পেরেক মারিয়া বাক্স-বন্ধ করা হয়।

এক্ষণে, আধুনিক যুগের মনুষ্য জ্ঞানার্জ্জনের জন্য, জীবনের একটা নির্দ্দিষ্ট কাল মাত্র নিয়োগ করিতে পারে। এ কথা সত্য যে, Pic de Mirandoleএর সময় হইতে, এমন কি Bertholetএর সময় হইতে, আমাদের আয়ুষ্কাল গড়পড়্‌তায় একটু বর্দ্ধিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে Pic de la Mirandole ও বের্তোলে যে সময় পরমাশ্চর্য্য জ্ঞানরাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তাহার পর আমরা কত বিষয়ে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি!···বিশেষত এই ১৪ বৎসরের মধ্যে কি পুরুষ কি রমণী আমরা সকলেই কি বেশ অনুভব করিতেছি না যে, জীবনের ক্রম-বর্দ্ধমান চেষ্টা-আন্দোলন, কাজ-কর্ম্মের জটিলতা, স্থান-পরিবর্ত্তনের বিপুলতা ও বহুলতা, ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে? তাছাড়া আমাদের অবসর সময়ের উপরেও কোন এক নির্ব্বাচিত বিশেষ কাজের জন্য অপরিহার্য্য শ্রম—যথা—একটা বিশেষ ব্যবসায়, কিংবা মনের মত কোন একটা বিশেষ বিদ্যার অনুশীলন—এই সমস্ত আমাদের সমস্ত সময়কে কি গ্রাস করিতেছে না?·· Von Goetheর জীবন বিচিত্র ও পরিপূর্ণ ছিল—তিনি একাধারে রাষ্ট্রমন্ত্রী, মহাপণ্ডিত, গীতিকাব্যের কবি, নাট্য-রচয়িতা এবং ···সংসারী লোক; Wertherএর গ্রন্থকার এই গর্ত্তে আমাদের দিনে, আর সে-রকম অবিচলিত শান্তির সহিত জীবন যাপন করিতে পারেন কি? আর কিছু নহে, কেবল পত্র-ব্যবহারের প্রাচুর্য্যই তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত অবসর হইতে, একটু শান্তিময় বিজনতা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবে।

*
* *

তাই বলিতেছি,—যেমন একদিকে বিশ্বকোষিক জ্ঞান-ভাণ্ডার বাড়িয়া গিয়াছে, তেমনি আর এক দিকে আমাদের আয়ত্তাধীন জ্ঞানার্জ্জনের সময় কমিয়া গিয়াছে।

তাহলে উপায়?

তাহা হইলে, আমার মনে হয়—আমাদের সমসাময়িক-হাতে আত্মসমর্পণ করুন এবং এই কথা বলুন—"আচ্ছা, তাই হোক্! আমাদের অবলম্বিত কোন বিশেষ অনুশীলনের সহিত যাহার কোন সংস্রব নাই, সেরূপ জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ করা যাক। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষেতটিতে গমের চাষই করা যাক্। পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রে যে যবের চাষ হইতেছে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।"

কিন্তু ইহার উল্টাটাই ঘটিয়া থাকে। কোন বিষয়ে অধ্যবসায় যতই বিপুল ও গুরুতর হোক্ না কেন, আয়ত্তাধীন সময় যতই সংক্ষিপ্ত হোক্ না কেন, আজকালের শিক্ষার্থীরা "ধারাবাহিক লেক্‌চার" শুনিতে পশ্চাৎপদ হয় না;—উক্ত বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহারা নব নব জ্ঞানার্জ্জনে বিরত হয় তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে। আজিকার দিনে যেরূপ জ্ঞান-স্পৃহার বিস্তার হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষা বিনা-ব্যতিক্রমে সকলের নিকটেই জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এমন কি গ্রাম্য পাঠশালার স্বল্পায়োজন মিতভোজেও ছাত্রেরা বিজ্ঞান-বৃক্ষ-প্রসূত ফলের আস্বাদ পাইয়া থাকে। সমাজের যে সকল শ্রেণীর মধ্যে এতদিন অজ্ঞতা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহারাও এখন শিক্ষা করিবার অধিকার দাবী করিতেছে, নূতন নূতন জ্ঞানলাভের বিষম তৃষা ও কৌতুহল তাহাদের অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। এ ব্যাপারটা নিতান্তই আধুনিক; রমণীরা পুরুষদিগকে অতিক্রম না করুক, তাহারা পুরুষদিগের সহিত সমান পাল্লা দিতেছে। অবশ্য নব ব্রতীদের বৃথা প্রত্যাশা অনেক সময় এই কৌতুহল নষ্ট করিয়া দেয়; এই প্রত্যাশা হইতে কতকগুলা মিথ্যা ধারণা উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে, এই প্রত্যাশা বৈধ ও উদ্যম-উদ্দীপক।

আর, প্রাথমিক শিক্ষা-যোগে যাহাদের চিত্ত-ক্ষেত্র বেশ প্রস্তুত হইয়াছে,—তাহাদের শিক্ষা-স্পৃহার যদি কোন প্রমাণ চাও, তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশে বিশেষত এই শতাব্দীর আরম্ভে যে সকল শিক্ষা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রচারের উদ্যম-উদ্যোগ হইয়াছে তাহা একবার গণনা করিয়া দেখ, পরিমাণ করিয়া দেখ। জন-সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান

করিবার জন্য কত গ্রন্থই না রচিত হইয়াছে! কতই ধারাবাহিক ব্যাখ্যান, কতই কথোপকথনের সভা-সম্মিলন, কতই পুরাকালের নাট্যাভিনয়, কতই প্রাচীন সঙ্গীতের বৈঠক! উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির এত সুলভ সংস্করণ পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। জ্ঞানকে আরও সহজসাধ্য করিবার জন্য কত উদ্যোগই না হইতেছে! এবং এই সকল উদ্যম উদ্যোগ সফলও হইতেছে, প্রতিযোগিতায় উহাদের উন্নতির হ্রাস হইতেছে না। অতএব শিক্ষার জন্য যে একটা অভাব অনুভূত হইতেছে, একটা তাগিদ আসিয়াছে, এই উদ্যমগুলিই তাহার সাক্ষ্যস্থল;—এই উদ্যমের কার্য্যগুলি বহুসংখ্যক হইলেও তবু লোকের আশ মিটিতেছে না—ইহাকে কি "ইতর ব্যক্তির ভদ্রানুকরণ" (snobbism) অথবা মানসিক "ফোতো নবাবী" বলিবে? খুব যাহারা গরিব, তাহারা আপনা হইতে যদি কিছু উন্নতির চেষ্টা করে, আর সেই জন্য যদি আমরা তাহাদিগকে উপহাস করি—তাহা যেরূপ ঘোরতর অন্যায় ও রূঢ়তাব্যঞ্জক, ইহাও সেইরূপ।

তবে একটা কথা;—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে এই সমস্ত বুদ্‌বুদ্‌বৎ ফেনিল উচ্ছ্বাসে একটা বিষম গোলযোগ উৎপন্ন হইতেও পারে। শিক্ষা-উপদেশের বহুল উদ্যম, এবং এই উদ্যম হইতে উপকার পাইবার জন্য অনেকের সাধু ইচ্ছা সত্ত্বেও, আমাদের জন-সমাজে মানসিক অনুশীলন ও জ্ঞানের সাধনা এখনো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, ও নিতান্ত পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়। যাই হোক, শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিষয়ের অভিবৃদ্ধি ও সময়ের সংক্ষিপ্ততা—এই নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, এই সকল নবশিক্ষার্থীরা উত্তরোত্তর শিক্ষার শৃঙ্খলে অধিকতররূপে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।

*

* *

আমাদের সমসাময়িকদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা যাক্; আমরা দেখিব, মানসিক অবস্থার দৃষ্টিভূমি হইতে—উহাদিগকে প্রায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ (পূর্ব্বেই বলিয়াছি) সকল কালেই যেমন—এখনও তেমনি কতকগুলি কৃতসঙ্কল্প অজ্ঞ লোক বিদ্যমান আছে; বরং তাহার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষাও বেশী। এবং স্বকীয় যুগের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে না পারিলেও, আধুনিক অজ্ঞজনের বিশেষত্বই এই যে, সে যুক্তির দ্বারা আপন অজ্ঞতাকে সমর্থন করে। হয় বিজ্ঞানের দেউলিয়া অবস্থা, নয় বিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে মানসশক্তির দেউলিয়া অবস্থা সে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ এই আধুনিক অজ্ঞ লোকটি হইতেছেন যুক্তি-আশ্রয়ী অজ্ঞলোক।

কিন্তু "আজিকার দিনে এত অধিক শিখিবার আছে যে কেহই সব শিখিতে পারে না"—এই বিশ্বাসটি অবশ্যম্ভাবীরূপে কি এই সিদ্ধান্তে পরিণত হয় যে, কিছুই শেখা যায় না? ইহা হইতে এই কথাটিও মনে আসিতে পারে যে,—যে সকল বিষয় জানিবার আছে, তাহার মধ্য হইতে একটা কিছু বাছিয়া লওয়া যাক্, তাহাতেই লাগিয়া থাকা যাক্, তাহা তলাইয়া দেখা যাক্, সমস্ত সময় সমস্ত মন তাহাতেই নিয়োগ করা যাক্। ইহাই বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত:—এইটি আধুনিক যুগের আদর্শ এবং ইহার সংখ্যাও অধিক। "স্বল্পজ্ঞ লোকের" সমাজে যাতায়াত করিলেই দেখা যায় ও দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—আমাদের পণ্ডিতেরা যে সকল বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেন, সেই সকল বিভাগের মধ্যে কিরূপ নিরেট দেওয়াল সকল মাথা তুলিয়া আছে। এইরূপ রুদ্ধবায়ু বিভাগ সকল আমাদের অ্যাকাডেমিতেও দেখা যায়,—এই কথাটি আমি এখানে কবুল করিব কি? অমুক জ্যামিতিবেত্তা সাহিত্যিক আন্দোলন সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞ; অমুক নাট্যকবি প্রয়োগাত্মক বিজ্ঞানের একটি গ্রন্থও খুলিয়া দেখেন নাই; সমাজতত্ত্ববেত্তা আপন পাঠাগারেই বদ্ধ থাকেন, কলাবিৎ আপন কর্ম্ম-শালাতেই অবস্থিতি করেন।

"শিখিবার বিষয় বড় বেশী"—এই তথ্যের সম্মুখে মানব-মনের দেউলিয়া অবস্থাকে অপরিহার্য্য বলিয়া ইহারাও মানিয়া লইয়াছেন। অজ্ঞ লোকের ন্যায় জ্ঞানানুশীলনে একেবারে বিরত হইবার সঙ্কল্প না করিয়া, ইহারা অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন একটা বিশেষ বিষয় লইয়া

ব্যাপৃত থাকাই স্থির করিয়াছেন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই ভাবটি অপেক্ষাকৃত শ্রদ্ধার যোগ্য।

আধুনিক কালের তৃতীয় আদর্শটি প্রায়ই সর্ব্বত্র দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে:—যে ব্যক্তির মিথ্যা শিক্ষাসাধনা—এমন কি যাহাকে অর্দ্ধ-পণ্ডিতও বলা যায় না, যে ব্যক্তি পণ্ডিতের ভগ্নাংশ মাত্র এইরূপ ব্যক্তিও সেই প্রসিদ্ধ স্ববিরোধী বাক্যটিকে শিক্ষার অন্তরায় মনে করে:—অর্থাৎ "যতই শিখিবার বিষয় বাড়ে, ততই শিখিবার সময়ের অভাব হয়।" কিন্তু ইনি প্রকারান্তরে কথাটা এড়াইয়া যান।

"বল কি! এতগুলা লেক্‌চার!" এতগুলা কথোপ-কথন সভা!" বস্তুত তাঁহার কিছুই অজানা নাই; তাঁহার কাছে কিছুই নূতন নাই। তিনি সেই একই বাচালতা সহকারে সহজভাবে Bergsonএর কথা বলেন, Bernard Shawর কথা বলেন। নভশ্চরণ বিদ্যায় খুব হালে যে সব উন্নতি হইয়াছে তিনি তৎসমস্তই অবগত আছেন। সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ, আধুনিক সঙ্গীত ও চিত্রকলা সম্বন্ধেও তাঁর কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মতামত আছে। এই ক্ষুদে পণ্ডিতকে প্রধানতঃ সাংসারিক লোকদের মধ্যে এবং যাহাদিগকে অবজ্ঞার ভাবে, অযথা ভাবে "প্রাথমিক" বলা হয়—তাহাদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়! আসলে প্রাথমিকেরা প্রকৃত পণ্ডিতদিগের চোখে খুবই শ্রদ্ধার পাত্র,—যদি তাহারা স্বকীয় প্রাথমিক জ্ঞানের সীমাটা ঠিক্ বুঝিতে পারে। প্রাথমিকদিগের মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে। কতকগুলি নির্ব্বোধ শিক্ষকের অযথা পাণ্ডিত্যাভিমান হইতে এবং সংবাদ-পত্রাদির পঠন হইতেই এই মন্দ প্রাথমিকদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের আবির্ভাবের জন্য দায়ী কে? সাধারণ লোকোপযোগী করিয়া তাড়াতাড়ি গ্রন্থপ্রকাশ ও কতকগুলা রুদ্ধ-দ্বার কথোপকথন সমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থাই ইহার জন্য বিশেষরূপে দায়ী। এই সকল লোক চোখে-ঠুলি দেওয়া বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা অথবা যুক্তি-প্রয়োগী অনভিজ্ঞদিগের অপেক্ষাও আরও খারাপ।

উহারা স্বকীয় নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ নিজের যে ক্ষতি করে, সে ক্ষতি উহাদের কপট সারস্বত-ভক্তি কথনই পূরণ করিতে পারে না।

*

* *

এই তিন সনাতন আদর্শ—যথা, অনভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, ও অলীক-পণ্ডিত—আমাদের দিনে ইহারা আর এক নূতন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে; এই মূর্ত্তিটি সেই প্রসিদ্ধ স্ববিরোধী বাক্যটির পরিণাম-চিহ্নে চিহ্নিত। "শিখিবার বিষয় অধিক, শিখিবার সময় কম"—এই কথাটি আধুনিক অনভিজ্ঞজনকে যুক্তি-আশ্রয়ী করিয়া তুলিয়াছে, আধুনিক বিশেষজ্ঞের নেত্র-ঠুলির আয়তন আরও বর্দ্ধিত ও সুদৃঢ় করিয়াছে এবং আধুনিক অলীক পণ্ডিতের জ্ঞান ও জ্ঞানের অভিমান—এই উভয়ের মধ্যে একটা পরিমাণ-বৈষম্য খুব ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

বর্ত্তমান কালের এই তিন সনাতন আদর্শের অস্তিত্ব ততটা ক্ষতিজনক হইত না, যদি আর একটি আদর্শ আমাদের কালে একেবারে অন্তর্হিত না হইত। সে আদর্শটি সপ্তদশ, অষ্টাদশ এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও প্রায়ই দেখা যাইত। Littre (লিত্রে) * বলেন:—সেই শিষ্ট সজ্জন" যিনি সমাজের প্রিয় হইবার মতো সর্ব্বগুণে ভূষিত ছিলেন।" এই সব গুণের মধ্যে, সেই গুণটি সব-চেয়ে সমাজোপযোগী যাহার বিদ্যমানে কোনও ব্যক্তি কোন উপস্থাপিত প্রসঙ্গসম্বন্ধে বেশ সঙ্গতভাবে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারেন;—সাধারণ চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত না হইলে ইহা সম্ভব হয় না।

"শিষ্ট সজ্জন!" যাঁহারা জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও গুরুতার জন্য প্রখ্যাত হইয়াছেন তাঁহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-স্মৃতির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এমন-সব ফরাসী আদর্শের মেজিষ্ট্রেট্, রাজস্ব-সচিব, কাপ্তেন কিংবা রাজ-দরবারীর উল্লেখ দেখিতে পাই, যাঁহারা শুধু প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন এরূপ নহে, পরন্তু তাঁহাদের কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান

* প্রখ্যাত ফরাসী কোষকার, দার্শনিক ও লেখক।

ও শিল্পকলার সম্বন্ধে তাঁহারা সবিশেষ খবর রাখিতেন ও কৌতূহলী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান এই "শিষ্ট সজ্জন"দিগের কতকগুলি বংশধরের কথা আমাদের সমসাময়িকগণও অবগত আছেন। প্রদেশের ক্ষুদ্রতম নগরও কোনও একটি ক্ষুদ্র জনমণ্ডলীকে প্রায়ই নিজ বক্ষে আশ্রয় দিত—তাহারা সাদাসিধা ভূম্যধিকারী অথবা অবসর-প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী। তাঁহাদের বিলাস সামগ্রী-বিরহিত সুখাবাস আরামপ্রদ গৃহে একটি জিনিষ তাঁহারা রাখিতেন—যাহা আধুনিক আবাস-গৃহে প্রায় দেখা যায় না :—একটি পুস্তকাগার। পুস্তকের ভাল বাঁধাই, পুস্তকের দামী রাজ-সংস্করণ জাঁক দেখাইবার জন্য তাঁহারা রাখিতেন না। এই পুস্তকাগারে ভাল ভাল সাহিত্যের রচনা ও কেজো দলিল-দস্তাবেজের সংগ্রহ থাকিত। এই পুস্তকাগারের সহিত তাঁদের মনের গতিবিধি ছিল, ঐ সকল গ্রন্থের সহিত তাঁরা সুপরিচিত ছিলেন। এই পুস্তকাগারে গিয়া তাঁহারা "মোতেস্কিউর" ন্যায় স্বীয় অবসরের কিয়দংশ অতিবাহিত করিতেন এবং মানব-চিন্তার বলদায়িনী অমৃত-ধারায় তাঁদের চিত্তকে পরিস্নাত করিতেন। অঞ্চল-বিশেষের স্থানিক অ্যাকাডেমি—যাহার সেই সময় প্রভূত গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি ছিল—সেই অ্যাকাডেমিতে এই সব ভাল-ভাল কর্ষিতচিত্ত ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মেলা-মেশায় ও সংস্রবে, তাঁরা আরো উন্নতিলাভ করিতেন। প্রত্যেকের অনাড়ম্বর কোন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান সাধারণের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিত, সকলের চিত্তোৎকর্ষের পূর্ণতা বিধান করিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহই আপনাকে দ্বিতীয় Hugo, Littre বা Bertrand* মনে করিতেন না, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে হুগো, লিত্রে ও বের্ত্রাঁর রচনা পাঠ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত না। যে ধাতুবিজ্ঞান-বেত্তা, সে Horace † এর পত্র পড়িয়া আত্মবিনোদন করিত; যে প্রাদেশিক লোক সংযত বিশুদ্ধ গ্রীসীয় কলার পক্ষপাতী, সে Madame Bovaryর পক্ষে বা বিপক্ষে আগ্রহের সহিত মতামত পোষণ করিত এবং (Chevreul) * শেভরলের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সকল আয়ত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ, সেকালের "শিষ্ট সজ্জন" বাস্তবিকই সর্ব্বতোভাবে শিষ্ট সজ্জন ছিলেন; কেননা মনোরাজ্যের এমন কোন বিভাগ ছিল না, যাহার সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল না।

তবে কি বলিব যে, ফরাসীর ঐ উৎকৃষ্ট আদর্শটি একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে? পূর্ব্ব হইতেই নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না; আমি শুধু বলিতেছি ঐ আদর্শটি রাহুগ্রস্ত হইয়াছে মাত্র। সেকালের "শিষ্ট সজ্জনের" প্রভূত অবসর ছিল, এখন আদৌ নাই। ১৮৬০ অব্দে জ্ঞান ভাণ্ডারের যে পরিমাণ ছিল এখনও যদি তাহাই থাকিত, তথাপি ১৯২০ অব্দের লোকেরা তাদের পিতামহদিগের মতো অত সহজে কখনই উহা অর্জ্জন করিতে পারিত না। কেন না, এখন উহাদের অনেক ভাবনার বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে—ধন-ঐশ্বর্য্য, সামাজিক সুবিধা-অসুবিধা, ভোগ-বিলাস—যাহা হইতে উহাদের পিতামহেরা অপেক্ষাকৃত বিনির্ম্মুক্ত ছিলেন। আমাদের এখন যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, ও আমাদের সমসাময়িকেরা যেমনটি ঠিক্ তাহাই ধরিয়া লওয়া যাক্; নূতন রীতিনীতি পথকে আবার উল্টাদিকে ফিরাইতে পারে না সত্য। কিন্তু এই বিত্তলোলুপ, জ্ঞানলোলুপ বর্ত্তমান সমাজে, বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া এই "শিষ্ট সজ্জনকে" কি আধুনিক মূর্ত্তিতে পুনরানয়ন করা যায় না? অন্তত সে পক্ষে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না কি? এই উৎকৃষ্ট আদর্শটি যে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার কারণ, আমাদের সমসাময়িকদিগের সাধু ইচ্ছার অভাব। জ্ঞানের বিষয়-বাহুল্য ও শিক্ষার সময়-সংক্ষেপ—এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া, উহারা আপনাকে নিতান্ত অসহায় ও অকর্ম্মণ্য মনে করিতেছে; তাই শিখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও উহারা আর শিখিতে পারে না। ইহাই কি তবে শিখিবার প্রতিবন্ধক?

* Bertrand নেপোলিয়ানের এক সেনা-নায়ক ও তাঁহার স্মৃতি-কথার লেখক ও অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের লেখক।

† Horace গ্রীসীয় কবি। তিনি মর্ম্ম-ভেদী বিদ্রূপে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

* Chevreul ফরাসী রসায়ন-বেত্তা (১৭৮৬-১৮৮৯)।

ইহাই যদি শিখিবার প্রতিবন্ধক হয়, তবে কিরূপভাবে আক্রমণ করিলে জ্ঞান-রাজ্যের উপর জয়লাভ করা যাইতে পারে?

অন্য কথায় বলিতে গেলে,—সময়ের কঠিন বাধা সত্ত্বেও কি শিক্ষালাভ করিতে হইবে? তাহা যদি হয় তবে কেমন করিয়া তাহা করিতে হইবে?

( ক্রমশঃ )

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# আলোচনা

## বৈধব্য

গত পোষ মাসের "ভারতী"তে আমার "বৈধব্য" প্রবন্ধটীর যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কিছু উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল :—

১। প্রথমতঃ, লেখক বিধবাদের যে "স্বাবলম্বনের" কথা বলিয়াছেন, তাহার আবশ্যকতা আমার প্রবন্ধেও ত অস্বীকৃত হয় নাই। তবে মেয়েদের অর্থোপার্জ্জনের বিষয় আমার অন্য অনেক লেখাতেই আছে এজন্য উহাতে আর সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয় নাই। উত্তরাধিকার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্রও নয়,—কেবল "স্বাবলম্বন"ও নয়, উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধা ও ন্যায় বিচারের দ্বারা তাঁহাদের আর্থিক দুর্দ্দশা অনেকটা দূর হওয়া সম্ভব। কিন্তু যেখানে তাঁহার উত্তরাধিকার কিছু নাই,—অথচ তিনি শিশু-সন্তান লইয়া বিব্রত,—সেখানে রাষ্ট্রেরও তাঁহাকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক মেয়েদের অর্থোপার্জ্জন-শক্তি ও তাহার সকল রকম সুবিধা থাকা বিশেষ আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত তাঁহাদের কেহ দয়া করিয়া খাইতে দেন না। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কাজ সন্তান-জন্ম ও পালনের ভার যাঁহাদের লইতে হয়,—তাঁহারা ত তাহা দ্বারাই অতি মূল্যবান কাজ করিতেছেন। ইহার উপর আবার তাঁহারা গৃহকর্ম্ম বা তাহার পরিদর্শন করিয়া থাকেন,—তাহাও যে কোন চাকুরী বা ব্যবসায়ের তুল্য। তবে ঐ দুটী কাজেরই উন্নতির জন্য,—মেয়েদের শক্তি, প্রকৃতির বৈচিত্র্যবশতঃ বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের আবশ্যকতার জন্য, এবং পৃথিবীর জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের যোগদান বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠায় তাঁহাদের অবশ্য এখনকার মত বদ্ধভাবে কেবল ঐ দুটী কাজ মাত্র লইয়া থাকায় চলিতে পারে না। কিন্তু কাজের প্রকৃত মূল্য তাঁহাদের দিতে হইবে।

২। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত বিধবার "বিবাহ দিয়াই" যে কেবল তাঁহাদের "বৈধব্য যন্ত্রণার লাঘব" করিতে হইবে, ইহা আমার প্রবন্ধে তিনি কোথায় পাইলেন? কুমারী, বিধবা কাহারও যে "বিবাহ দেওয়া"র আবশ্যকতা নাই, তাহা ত বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। তাহার প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই তিনিও বিধবাদের সকলেরই "বিবাহ দেওয়া"ই আমার প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় যে ইতরতাটী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইতে পারিতেন। আরও অনেকগুলি কথাও অনর্থক বলিতে হইত না।

৩। তার পর পৃথিবীতে নর-নারীর সংখ্যার তারতম্যের কথা উল্লেখ করিয়া বিধবা বিবাহের বাধা দূর হইলেই কুমারীরা বিবাহে বঞ্চিত হইবেন আশঙ্কায় তাঁহাকে অস্থির হইয়া পড়িতে দেখা যায়। ইহাতে বলিতে হয় আমাদের দেশে মোট সংখ্যা পুরুষই বেশী বলিয়া বোধ হয়, তবে অন্ততম সেন্সস রিপোর্ট হাতে না লইয়া এ বিষয়ে জোর করিয়া বলিতে ইচ্ছা নাই।*—আর উহা বর্ত্তমান বিষয়ে প্রধান

---

* এ বিষয়ে গত পৌষ মাসের প্রবাসী দ্রষ্টব্য। তাহাতে দেখা যায়, হিন্দুদের মধ্যে কুমারী একরূপ না থাকা সত্ত্বেও অবিবাহিত পুরুষ ও বিধবার সংখ্যা কত বেশী। ইহার উপর বিপত্নীক আছে। সুতরাং বিধবা বিবাহের বাধা দূর হইলেই কুমারীরা অনূঢ়া থাকিয়া যাওয়ার আতঙ্কে নিদ্রা না হইবার কারণ নাই। বিলাতে নর-নারীর সংখ্যার গুরুতর তারতম্য সত্ত্বেও সেখানে এরকম জবরদস্তি নিয়ম প্রচলিত নাই। আমাদের দেশে ওরূপ হইলে অধিকন্তু হারেমের আমদানী হইত বোধ হয়! বাস্তবিক স্বাধীনতায় আমাদের এই আতঙ্ক সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ দেখিয়া দমিয়া যাইতে হয়। সন্দেহ হয়, আমাদের মাতা, স্ত্রী, কন্যা ভগিনীদের মানুষের একান্ত প্রাথমিক অধিকারগুলি দিতেই যখন আমাদের এত কুণ্ঠা, তখন আমরা জাতি হিসাবেও সত্যই কি তাহার যোগ্য? বিলাতী সকল জিনিষই অবশ্য ইহাতে আদর্শ বলা হইতেছে না, সেখানেও উপরওয়ালাদের একগুঁয়েমি, স্বার্থপরতা ইত্যাদি নানা কারণে ও বিগত যুদ্ধের ফলে সহস্র প্রকার পাপ-তাপের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার প্রতিকারের উপায়ও ঠিকমত হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তবু তাহার জন্য চেষ্টাও যে না হইতেছে এমন নয়। এইমাত্র জানুয়ারী সংখ্যা Welfareএ Mrs. Cousins লিখিত একটী প্রবন্ধে দেখা গেল, আমাদের দেশে পুরুষ-সংখ্যা নারী অপেক্ষা ৩০ লক্ষ (Million) বেশী।

কথাও নয়। বিধবাদের সকলকেই যে তাঁহার এত যোগ্য পাত্রী বলিয়া মনে যইয়াছে যে কুমারীদের পরাস্ত করিয়া তাঁহারাই বিবাহ-বাজার একচেটিয়া করিয়া বসিবেন আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়াছেন, ইহা কৌতুককর বটে! কুমারীদেরও অবশ্য কেবল কোনরূপে বিবাহ মাত্র আমরা তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি না। আজকাল যেভাবে তাঁহাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি পক্ষবহুলদের সহিত পর্য্যন্ত চাপিয়া, জুড়িয়া "বিবাহ দেওয়া" হয়, তাঁহারা সে বিবাহগুলি বিধবাদের ছাড়িয়া দিতে পারিলে উদ্ধারই পাইতে পারেন। ইহার জন্য চিরকুমারী থাকিতে হইলেও তাঁহাদের মনুষ্য-জন্ম বৃথা হইবে না। আর তাঁহাদের বিবাহের সম্ভাবনাও চিরদিনই থাকিবে। তবে ঐ সকল "বিবাহ" নর-নারী যে পক্ষেই হউক, তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব পূর্ব্বে অনেক স্থলেই প্রকাশ করা গিয়াছে।

৪। বিবাহের বাধা দূর হইলেই কি সমস্ত বিধবা বিবাহ করিতে লাগিয়া যাইবেন? ইহাতে যে মনোভাবের পরিচয় আছে তাহার উল্লেখ না করাই ভাল। যাঁহাদের বিবাহ করা বাঞ্ছনীয় নহে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি তাহা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে তাহাই ভাল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ তাহা না হইলে হয়ত অধিকতর মন্দও কিছু ঘটিতে পারিত,—এখনও যে তাহা হয় না এমন নয়। ইহা দ্বারা বরং তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল পথে যাওয়ারই সম্ভাবনা। আর উহার শাস্তি (যাহার জন্য তাঁহাকে এত সতর্ক করার চেষ্টা পাইতে হইয়াছে) যখন তাঁহাদেরই পাইতে হইবে, তাহার জন্য অন্যের ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। স্বাধীনতার কোথাও কোথাও অপব্যবহার হইতে পারে বলিয়া তাহা লোপ করিবার বস্তু নয়,—বিশেষতঃ একপক্ষে নির্লজ্জ প্রশ্রয় দিয়া অন্য পক্ষে চাপিতে গেলে কেবল ঘোর অন্যায় ও অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি মাত্র হইতে পারে;—যাহার কথা তিনিও অস্বীকার করেন নাই। নির্দ্দোষ ও দুর্ব্বল জন যাহাতে অত্যাচারিত ও বঞ্চিত না হয় বা কেহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কিছু করিতে ও সহিতে বাধ্য না হয় ইহার দিকেই প্রধানতঃ রাষ্ট্র আর সমাজের দৃষ্টি থাকা উচিত। স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার-শিক্ষা উদার ও উন্নত লোকমত এবং শিক্ষার মধ্য দিয়া হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য স্বাধীনতা ও শিক্ষা একত্র গ্রথিত। দাম্পত্য সম্বন্ধের উচ্চাদর্শ রক্ষা কেবল বিধবা বিবাহ প্রতিরোধের দ্বারা মাত্র হইতে পারে না। বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কি তাই হইতেছে? ইহা যখন নরনারী উভয়ের সম্বন্ধ, তখন উভয়ের ক্ষেত্রেই ইহার একটী উদার ও উন্নততর আদর্শের প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। সর্ব্ব দেশে পুরুষের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে শৈথিল্যের জন্যই প্রধানতঃ দাম্পত্য সম্বন্ধের উচ্চাদর্শ কলঙ্কিত হইয়া থাকে না কি? সুতরাং বিধবাবিবাহ বন্ধ রাখিতে চেষ্টা না পাইয়া এই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িতে পারিলে ভাল হইত। কুমারী, সধবা বা বিধবাই হোন নর-নারীর নৈতিক সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের দ্বারাই মেয়েরা প্রধানতঃ কষ্ট পাইয়া থাকেন,—তাহা দূর না হইলে কেবল কোনমতে বিধবারা কিছু অর্থোপার্জ্জন মাত্র করিতে পারিলেই তাহার প্রতিকার হইতে পারে না। তবে তাহাও যে আবশ্যক সে কথা আগেই বলা হইয়াছে।

৫। "হিন্দু শাস্ত্রকারে"র উল্লেখটী না থাকিলেই ভাল হইত। কারণ কোন অপ্রিয় সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে হইলেই সাধারণতঃ তাঁহাদের শরণ লইতে ও ডাক পড়িতে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে মূল প্রবন্ধেই যথেষ্ট বলা হইয়াছে। "বিবাহের প্রেম-বন্ধন অচ্ছেদ্য,—স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতে এই বন্ধন খসিয়া বা ভাঙ্গিয়া যায় না"—ইহাই যদি হয়, তবে কেবল "স্ত্রীর কর্ত্তব্য" মাত্র দেখাইবার এত প্রয়াস কেন? স্বামীর কর্ত্তব্যের দিকেও সমানভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কিন্তু বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্যই পুত্রলাভ,—তাহাও পুরুষের সম্বন্ধে মাত্র। শিক্ষা ও লোকমতের দ্বারা প্রেমই মুখ্য বলিয়া পরে স্বীকৃত হইয়াছে। এদিকে আবার নর-নারীর নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের জন্য কি শাস্ত্র, কি উন্নততর লোকমত, কোন আদর্শই পুরুষের ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় না। "প্রেমের" কথা ত বলিতে যাওয়াই বৃথা—শাস্ত্রাদর্শ অনুসারে পুত্রলাভ মাত্র উদ্দেশ্য ধরিলেও যাঁহাদের তাহার জন্য পুনরায় বিবাহ করার কোনই আবশ্যকতা নাই,—তাঁহারাও সর্ব্বদাই তাহা করিয়া থাকেন। তবে উন্নততর লোকমতের প্রভাবও যে একেবারে কাজ করে না এমন নয়,—স্ত্রী-বর্ত্তমানেও পুত্রের অছিলায় আবার বিবাহ করার জঘন্যতা ইহার জন্যই অনেকটা নিবারিত হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র, সমাজে মেয়েদের তুল্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত শিক্ষা ও লোকমতের উদার ও বিশুদ্ধতর হাওয়া প্রবাহিত রাখিতে পারিলেই দাম্পত্য সম্বন্ধের উচ্চাদর্শ অধিকতর বিকাশ লাভ করিতে পারে। মেয়েদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক হীনাবস্থার জন্য শিক্ষা ও লোকমতও এতদিন প্রধানত তাঁহাদের প্রতিকূল ও পক্ষপাতদুষ্ট রহিয়া গিয়াছে। নরনারীর সাম্য, স্বাধীনতা যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে যে মৈত্রীর উদয়ও অবশ্যম্ভাবী,—তাহা দ্বারা ইহাও ক্রমেই সংশোধিত হওয়ার আশা করা যায়।

৬। "বৈধব্য-যন্ত্রণা" বলিতে আমরা প্রধানতঃ যাহা বলিতে চাহিয়াছি ও যাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছি, লেখক সে বিষয়ে খোলাখুলি কিছু বলিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার মধ্যে সংস্কার এবং যুক্তি ও ন্যায়বোধের বিরোধ ঘটিয়া তাঁহার মতামত অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে। সমাজ বিধবার "চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাঁহাকে নাগপাশের বন্ধনে পরাধীন" করা যদি তিনি উচিত মনে না করেন, তবে তাঁহার অধিকতর স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে

তাহা বলা উচিত ছিল। তাহার সহিত প্রচলিত আদর্শ জড়াইতে গিয়া তাঁহার ঐ কথাটী দুর্ব্বল ও অসত্য হইয়া পড়িয়াছে।

বাস্তবিক জীর্ণ পুরাতন ব্যবস্থামত কতকগুলি শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করাই যে "স্বামীর ভালবাসা" দেখাইবার চরম উপায়, "স্ত্রীর ভালবাসা" দেখাইবারও অন্ততঃ সেই ব্যবস্থা না করিতে পারিলে আজকালকার দিনে তাহা অচল। এখন মানুষের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র ক্রমেই সূক্ষ্ম, বিচিত্র ও বিস্তৃততর হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে মান্ধাতার আমলের গণ্ডীর মধ্যে পুরিয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা। তবে তিনিও যেমন "শীঘ্রই প্রকৃতি সমাজের সকল আবিলতা ও আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার সুখ ও সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন" আশা করেন, আমরাও তাহারই জন্য চেষ্টা ও যত্ন করা কর্ত্তব্য মনে করি।

বঙ্গনারী।

## তর্ক-সভার আলোচনা

আজকাল মাসিক পত্রিকায় "নারীর স্থান" "নারীর অধিকার" ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। সে দিন আমাদের তর্ক-সভায় যে বিষয়টীর আলোচনা হইয়াছিল তাহা শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন সভ্য বলিলেন, "ধরুন আমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে। আমি হিন্দু সন্তান, হিন্দুর আচার, নীতি ও সংস্কারের মধ্যে আমি প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত, সমাজ ও বেষ্টনীর প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। I have received my individuality from society and parents" আমি সাধারণ মানুষ, ঈর্ষা ও স্বভাবজাত প্রবৃত্তির বশীভূত। হিন্দুর বিশ্বাস যে তাহার স্ত্রীর চরিত্র কলুষিত হইলে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ নরকগামী হইবেন, তাহার বংশ অপবিত্র হইবে। ইহা নিশ্চিত যে তিনি সমাজে অচল হইবেন। নানা প্রকার সন্দেহ বশতঃ তিনি নিজের সন্তানের প্রতিও মমতাহীন হইবেন। হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক দুরদৃষ্ট কল্পনাতীত। সকল সভ্য দেশের ধর্ম্মে ও সমাজে সতীত্বের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশেও সীতা-সাবিত্রী আদর্শ নারীরূপে পুজিত হন। ইহা সত্য যে স্বার্থপর পুরুষেরাই আইন ও সমাজ বিধির প্রবর্ত্তক। প্রবল জয়ী হয়, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, বৈষম্য ও সাম্য পরস্পর বিপরীত, একত্র থাকিতে পারে না। রাজা লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ বিনাশ করিয়াও হত্যাপরাধে অপরাধী হন না, দুর্ব্বলতাই পাপ। যোগ্য ব্যক্তিই পুরস্কৃত হয়, যোগ্যতা আর শক্তি একই কথা। নীতির গোড়াতেই স্বার্থ রহিয়াছে "morality is enlightened self-interest." উপেন বাবু ত ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার, অবাধ স্ত্রী স্বাধীনতার ও স্বাধীন প্রেমের ভারি পক্ষপাতী, আপনিই বলুন না, হিন্দু স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইলে তাহার স্বামী কি ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা করিবে?"

উপেন বাবু নব্য-তন্ত্রের লোক, এখনও অবিবাহিত, কিছুক্ষণ ভাবিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "যদি স্বামী নিজে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন তবে তিনি স্ত্রীকে ক্ষমা করিতে না পারিলে, ত্যাগ করিতে পারেন; আর যদি নিজে পাপী হইয়া থাকেন তবে স্ত্রীকে ঘৃণা বা ত্যাগ করিবার অধিকার তাঁহার নাই, mutual breach of marriage contract" অপর একজন সভ্য ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আপনি যে নীতি-উপদেশ দিলেন, যদি বাস্তবিক সেই উপদেশানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠিত করিয়া থাকেন তবে তাহা অবশ্য গ্রহণীয়, নচেৎ আমার উপর একটা মহৎ ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খাড়া করিবার অভিলাষ হইয়া থাকিলে আপনার উপদেশ অগ্রাহ্য; এই উপদেশ দিবার অধিকার আপনার নাই; "নিজে নিষ্পাপ হইয়া পরের পাপের দণ্ড বিধান করিবে, নতুবা নয়" এরূপ ব্যবস্থা হইলে অভিভাবক, শিক্ষক, বিচারক ও প্রচারক কেহই স্বীয় কর্ত্তব্য করিতে পারে না।" অপর একজন সভ্য বলিলেন, "এ-সব বিষয় চেপে যাওয়াই ভাল, নচেৎ নিজেরই বিপদ।" ইহা শুনিয়া একজন নব-বিবাহিত যুবক সভ্য উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এরূপ ভ্রষ্টা স্ত্রীর মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, গালে চূণ কালি মাখাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।" ইহার পর সভায় ঠাট্টা-তামাসা চলিতে লাগিল, গোলমাল উপস্থিত হইল ও সভা ভঙ্গ হইল।

আমি এ বিষয়ে স্ত্রীর মত জানিতে চাহিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "যদি স্বামীর চরিত্র-দোষে, তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ বা অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে স্ত্রী বিপথ-গামিনী হয় তবে সে পাপের জন্য স্বামীই দায়ী। সমাজ ও ধর্ম্মশাস্ত্র কেহ অমান্য করিতে পারে না; এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করিতে স্বামী ন্যায়তঃ বাধ্য। অবশ্য এ স্থলে স্ত্রীকে ত্যাগ করাও স্বামীর অন্যায়। কিন্তু যদি কোন হতভাগিনী স্বভাব-দোষে, স্বেচ্ছায় বিপথে যায়—প্রায়ই তাহা যায় না—তবে স্বামীর উচিত সে স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা। কে শত্রু ঘরে পুষিবে? অসতী স্ত্রী কি না করিতে পারে?"

আমার স্ত্রীর নীতি-জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম সত্য, কিন্তু তিনি যে হিন্দু নারী, পতিকে দেবতা জ্ঞান করেন,—তিনি ত এরূপ বলিবেন-ই। স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী-দল ইহার কি মীমাংসা করিবেন? পাশ্চাত্য দেশের নাটক-উপন্যাসে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিণতি কি দেখিতে পাই?

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

# আমার দেখা লোক

## রো সাহেব এবং ৺লালবিহারী দে

রো সাহেব হুগলী কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন; ক্লাসে কথাবার্ত্তায় দেখাইতে চাহিতেন যে কিছু বাঙ্গালা জানেন—'শশিমুখী' শব্দটাই অধিক ব্যবহৃত হইত। শুনিয়াছিলাম কৃষ্ণনগরে থাকার সময় সাহেব ধুতি পরিয়া সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইতেন। সাহেব অনতিদীর্ঘকায় বলবান ব্যক্তি ছিলেন এবং ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিতেন। একদিন বলিলেন, "দেখ, আমার ঘোড়া টমটমেও চলে, আবার আমিও উহাতে চড়ি। তোমরাও দু-পিঠে ঘোড়ার ন্যায় হইও।" চন্দ্রমোহনের গাড়ী-ঘোড়া ছিল। সে-ই এ কথায় মুখ ফুটিয়া উত্তর দিল; বলিল, "চড়িবার ঘোড়া টমটমে জুতিলে খারাপ হইয়া যায়, উর্দ্ধশ্বাসে ভাল দৌড়িতে পারে না—হয় টক্কর খায়, নয় ঢিমে চাল হয়।" সাহেব বলিলেন, "যদি আমার ন্যায় উহার পিঠে অধিক চড় (রাইড) আর কম হাঁকাও (ড্রাইভ্), তবে খারাপ হইবে কেন? গ্লাডষ্টোন অধিক সময়টা লেখাপড়ার কাজ করেন—কম সময় কাঠ কাটেন, দুই কাজই ভাল করিতে পারেন। তোমাদেরও সেইরূপ হওয়া উচিত। পড়াশুনাও করিবে; শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যও করিবে।" কথাটা ভাল লাগিয়াছিল। অনেককে বলিয়াছি; নিজের জীবনেও উহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি।

দু-পিঠে ঘোড়ার সহিত উপমা চন্দ্রমোহনের ন্যায় আমাদের সকলেরই অপছন্দ হইয়াছিল; গ্লাডষ্টোনের সহিত তুলনা অবশ্য সকলেরই বেশ ভাল লাগিল!

সাহেবের ভিতর কতক ছেব্লামি, কতক দেশীয়-বিদ্বেষ, আবার কতকটা সরলতা ও মধুরতা ছিল। রো সাহেবের "হিন্ট্স্" পুস্তকে 'বাবু-ইংলিশের' উপর বিদ্রূপ বড়ই অপ্রীতিকর হয়। হরিদাস বলে, "কতটা পরিশ্রমে বিদেশীয় ভাষা শিখিতেছি, ভুল সংশোধন করিয়া দাও—তাহার কারণ দেখাইয়া বল যে বাঙ্গালার অনুবাদ করার অভ্যাসের জন্যই এইরূপ ভুলগুলি অনেক বাঙ্গালীর ঘটিয়া থাকে, এজন্য এইগুলিতে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। চলিতে শিখিবার সময় ছেলেরা সর্ব্বদা পড়িয়া যায়; হাত ধরিয়া চলানোর পরিবর্ত্তে ঠাট্টা-হাসি বড়ই বিসদৃশ।" আমাদের মধ্যেই একজন বলিয়াছিল, "ওহে, 'খোকা সাজিয়া' কৃপার ভিখারী হইয়া কাজ নাই। ইংরাজের ঘৃণায় এখন হইতেই তাচ্ছল্য করিতে অভ্যাস করিয়া লও, যেখানে 'সহানুভূতি' নাই, সেখানে 'অভিমান' কেন? আমরা চীনাবাজারের ইংরাজী বলিয়াও ত 'কাজ' চালাইতেছি।" আমি অমরকোষের একটা গল্প জানিতাম, সেটা বলিয়া আমাদের ঘোরালো ইংরাজী লেখার চেষ্টার উপর ভীতি উৎপাদন করিলাম। গল্পটা এই:—একজন 'কবি-যশঃপ্রার্থী' লিখিয়াছিল, "ছোটে পিচ নাদে বজ্র!" তাহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, "পিচ—কিহে?" উত্তর—"ভাই, কথাটা তেমন প্রচলিত নয় বলিয়াই বুঝিতে পারিলে না; ঐ পর্য্যায়ের অপর সকল শব্দগুলিই সুপ্রচলিত —তড়িৎ-সৌদামিনী--বিদ্যুৎ--চপলা--চঞ্চলা'পিচ'।—জাঁকাল লিখিতে গেলেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।"

যখন অপর অধ্যাপক ৺লালবিহারী দে মহাশয় রো সাহেবের 'হিন্ট্স্' মধ্যে ব্যাকরণের ভুল সম্বাদ-পত্রে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই সকল সম্বাদপত্র আমরা আনন্দের সহিত পড়িতাম! রো সাহেবের নিকট আমরা যে উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে সাধারণ ইংরাজের ধরণ অপ্রীতিকর বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

৺লালবিহারী দের 'গোবিন্দ সামন্তের' বিলাতে প্রশংসা হওয়ায় আমরা বড়ই গৌরব বোধ করিতাম। তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, "ভাল ইংরাজী গদ্য সযত্নে সর্ব্বদা পাঠ করিও। যেটা বেশ ভাল লাগে সেটা বরাবর পাঠ করিলে দেখিবে যে নিজের লেখা ব্যাকরণ শুদ্ধ হইতেছে কি না, 'কানেই' ধরা পড়িবে। কোন্‌টী অশুদ্ধ তাহা বুঝিলেই হইল—সূত্র মনে না পড়িলেও ভুল হইবে না।" ঐ উপদেশ-মত অনেকেই চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ৺লালবিহারী দের ইতিহাস-পাঠনাও বড় সুন্দর ছিল। 'টেলার্স হিষ্টরী' ফার্ষ্ট আর্টসের পাঠ্য ছিল। তিনি বলিলেন, "বইটা নিজেরা বাড়ীতে পড়িয়া

পরীক্ষা দিও। তবে বড় নীরসভাবে লেখা। ঐ পাঠ্য বিষয়ে যাহাতে মন পড়ে, তাহা আমি করিয়া দিব; গ্রীক-রোমীয়দিগকে তোমাদের সাক্ষাতে আনিয়া দিব"—ইহা বলিয়া বড়ই সুমিষ্ট ধরণে হাসিলেন। আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু দুই বৎসরে বহুসংখ্যক গ্রীক ও রোমীয় নাটক এবং কাব্য পড়াইয়া আমাদের যে কতটা উপকার করিলেন তাহা বলা যায় না। মাসে মাসে ইতিহাসের পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন যে বাড়ীতে পাঠ্য পুস্তক আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে পড়িতেছি কিনা।

একদিন আমাদের পড়িতে বলিয়া, ক্লাসে বসিয়া 'এক্সারসাইজ' (তাঁহার প্রশ্নের উত্তর আমরা যাহা লিখিয়া ছিলাম) সংশোধন করিতেছিলেন। ওরূপ অবস্থায় প্রায়ই পাশাপাশি ছাত্রেরা একটু কথাবার্ত্তা কয়। চন্দ্রমোহনের দিকে চাহিতে সে চুপ করিল; আবার কথা কহিতে আরম্ভ করিলে বলিলেন—"কোল্ থাওজাণ্ড টাইম্‌স্ ওয়াশ্‌ড্ ইজ ষ্টিল্ ব্ল্যাক" (কয়লা হাজার বার ধুইলেও কালোই থাকে)। চন্দ্রমোহন বলিল—"সার (মহাশয়), অঙ্গার শত-ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। শত কিন্তু 'থাওজাণ্ড' নয়; আর তা ছাড়া 'ধুইয়া' কয়লা সাফ করার চেষ্টা সফল হইবে কেন? তাহার প্রোসেস্ (প্রক্রিয়া) অন্যরূপ। 'সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ। তব কোয়লা কি ময়লা ছুটে যব আগ্ করে পরবেশ'।" এই উত্তরে ৺লালবিহারী দে হাসিয়া ফেলিলেন এবং বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "উদ্ধৃত কবিতাটী ঠিক মানাইয়াছে (এ ভেরি অ্যাপ্‌ট্ কোটেশন)।" ওদিকে চন্দ্রমোহনের ধপ্‌ধপে রং এবং অধ্যাপকের কয়লার মতনই পাকা রং আমাদের চক্ষের উপর থাকায় আমাদের মুচ্‌কি হাসি আর এক দিক দিয়াও আসিতেছিল। অধ্যাপকের মনেও তাহা আসিয়া থাকিবে; তিনি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হাসি-তামাসা গল্প গুজব কমাইয়া পড়াশুনা করাই ভাল।" চন্দ্রমোহনকে বলিলাম, "এটা অবশ্য জ্ঞানের উপদেশ। এতে ত্রুটি ধরা চলিবে না।" ক্লাসের ছুটির পর চন্দ্রমোহনের মন পরিষ্কার করার জন্য কলেজের ঘাটে জলে ধুইবার প্রস্তাব হইল"। চন্দ্রমোহনের দল হইয়া দুই-একজন অপর সকলকে 'আগ প্রবেশ করা'র—ছেঁকা-পোড়া দিবার—প্রস্তাব করিল।

বিদ্রূপ জিনিসটী ঠিক জায়গায় প্রযুক্ত হইলে বড়ই উপকারী। ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় উত্তরের কাগজে মজরুলের অনেকটা কালি পড়িয়া গিয়াছিল। সে কাগজটায় বেশী লেখা ছিল না। কাগজটা বদলাইয়া দেওয়াই উচিত ছিল; আলস্য-বশতঃই তাহা করে নাই। রো সাহেব সেইখানটায় একটা জানোয়ারের মূর্ত্তি আঁকিয়া দিয়াছিলেন! মজরুলের রাগ হইল—কিন্তু সেই অবধি খুব সাবধানও হইল। আমার একটা বর্ণাশুদ্ধি ছিল—কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে বর্ণাশুদ্ধি প্রকৃতপক্ষেই অমার্জ্জনীয়। সাহেব সেইখানটায় বাঙ্গালা অক্ষরে 'ছি!' লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। "যাকে বল্লে 'ছি' তার রৈল কি?" বাঙ্গালীর এই চলিত বাক্যটী—দোষের জন্য লোক-লজ্জার কথা—বড়ই সুস্পষ্টভাবে তখন মনে পড়িয়াছিল এবং সেই 'ছি' লেখাটীর স্মৃতি আমাকে অসাবধানতা হইতে বরাবরই রক্ষায় সাহায্য করিয়াছে। একদিন রো সাহেব বলিলেন, "রাইস এবং রায়ত পত্রে 'আই শেম' (চক্ষুলজ্জা) কথার ব্যবহার করিয়াছে। কথাটী বেশ; চক্ষে চক্ষে মিলাইয়া রূঢ়ভাবে কোন কথার প্রত্যাখ্যান করায় কখন কখন একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা উহা কমই অনুভব করি; এজন্য ঐ কথাটী ইংরাজিতে ছিল না।" এরূপ সরলতার জন্য সকলকেই রো সাহেবকে কতকটা ভাল বাসিতে হইত। রো সাহেব পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তখন উঁহার পার্শিভ্যাল সাহেবের সহিত বিশেষ ঝগড়া হয়; কিন্তু সেজন্য ডিরেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক পার্শিভ্যালের ঢাকায় বদলীর হুকুম হইলে তিনি নাকি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"যদি পার্শিভ্যালের বদলী হয়, তাহা হইলে প্রেসিডেন্সী কলেজকেও তথায় পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। পার্শিভ্যাল গেলে ইহাতে থাকিবে কি?"—এরূপ মহত্ত্বের কথা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তি হইয়াছিল। ভাল লোকের নিকট পড়াশুনা করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিতেই সকলে চায়।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

# আনা পাভলোভা

রুশিয়ার মরম-কমল
শঙ্খশুভ্র শ্বেত সমুজ্জ্বল !
উর্ব্বশী কি তুমি ? সুরসভা ছাড়ি'
ঘননীল শূন্যপথে দিয়া পাড়ি
মনোভুলে
উত্তরিলে বাঙ্গালার শ্যাম উপকূলে ?
তনু তব নমনীয় বেণুর মতন
চপল চরণ তব—কুরঙ্গ নয়ন !
যুথিকার শুভ্র কোমলতা !
অজানিত স্বপ্নলোকে
ম্লানালোকে
জোছনা-সায়রে তুমি ভ্রমিতে কি তথা ?



আনা পাভলোভা

মানবীর রূপে মরালী কি তুমি ?
কোন্ সুখে কোন্ দুখে বরিলে এ মৃত্তিকার ভূমি ?
অধরে কি উষারুণ রক্তরাগ রাখিয়াছ ধরি ?
হৃদি তব রাখিয়াছ ভরি'
বসন্তের কুহকী মায়ায় ?
কেবা জানে হায় !
আকাশে কি ফিরেছ ঘুরিয়া
তারাদলে পায়ে মাড়াইয়া ?
চরণভঙ্গেতে তাই শত তারা পড়ে ছড়াইয়া !
মানবের যত তৃষা আশা—
মানবের মৌন ভালোবাসা—
নৃত্যে তব পায় তারা ভাষা !
ধরিত্রীর নিত্য নব রূপ
অতি অপরূপ
তব যাদুমন্ত্রে পেয়ে কায়া
দর্শকের মুগ্ধ চিতে ফেলে তার ছায়া !
বহ্নিমুখী পতঙ্গের প্রেম—
বর্ণ যার নিকষিত হেম—
রূপ দিলে তুমি মোহে তার
দুরন্ত দুর্ব্বার !
হে অদ্ভুত ! হে নর্ত্তকী কবি !
নিত্য রচ কত স্বপ্নছবি
অপরূপ নর্ত্তনে তোমার !
পরীরাজ্য হতে তুমি আসিলে কি জীবন্ত পুতুল
হে মনোমোহিনী নটী ভুবনে অতুল ?
বিশ্ব মত্ত তোমা তরে ওগো মনোলোভা
অনুপমা রমণীয়া আনা পাভলোভা। *

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* শ্রীমতী আনা পাভ্লোভা সম্প্রতি কলিকাতায় তাঁর অপূর্ব্ব নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

১০

বিবাহের অন্যান্য উৎসবের মধ্যে একদল যাত্রা আসিয়াছিল। এই দলটাই জমিদার বাড়ীর সকল উৎসব-ব্যাপারে আসিয়া গান শুনাইয়া যায়। অরুণের বিবাহেও আসিয়াছিল, এবারও আসিয়াছে।

বাহিরে বাঁশ পুঁতিয়া সামিয়ানা টাঙ্গানো হইতেছিল। যারা সব এই কাজ করিতেছিল, তাদের পরিশ্রমের তুলনায় হাঁক-ডাক বড় বেশী হইতেছিল। কিন্তু চেঁচাইয়াও খানিক স্ফূর্ত্তি পাইবার জন্ম আরো বেশী করিয়া চেঁচাইতেছিল।

সেদিন পাকস্পর্শ। রাত্রে এই সামিয়ানার নীচে যাত্রা গান হইবে। বাড়ীর ভিতরে-বাহিরে চারিদিকেই নিমন্ত্রিত অভ্যাগত লোকজনে পরিপূর্ণ। মেনকার কথা-মত সবিতা পুলককে ভাল করিয়া সাজাইয়া দিবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতেছিল। পুলক মহা-আপত্তিতে হাত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিতেছিল, সে জামা পরিবে না।

সবিতা অনেক চেষ্টা করিয়াও তার কান্না বাড়ানো ছাড়া কমাইতে পারিল না। তার কপট কান্নার ভঙ্গী দেখিয়া শেষে সে হাসিয়া ফেলিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মেনকা ঘরে ঢুকিয়া তিক্ত স্বরে বলিলেন, "কি সুখে যে মুখে হাসি আসে, তাও বুঝি নে! ছেলেটাকে থামাতে যদি না পারো তো মেরে ধরে কাঁদিয়ে উৎপাত কর কেন?" তার পর সবিতার দিকে একটু চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আ মরি! নিজের চেহারাখানা যা ক'রে রেখেছেন,—ঝীয়েদেরও অধম! কুকুর রাজা হলেও আড়চোখে জুতো-পানেই চায় কিনা!"

বসন্তের ফুল-বাগানে বাজ পড়ার মত সবিতার মুখের ফুটন্ত স্নিগ্ধ হাসি শুকাইয়া গেল! সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি ওকে মারিনি মা।"

"না মারোনি!" মেনকা চেঁচাইয়া উঠিলেন। "মারোনি তো ও কি শুধু শুধু কাঁদচে নাকি? অমন কাঁদুনে ছেলে ত ও নয়!"

সবিতা চোখের জল চাপিলেও কি এক অসহ্য উত্তাপে তার ঠোঁট অবধি জ্বালা করিতে লাগিল! এই যে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, এ তো তার নিজের কোন অপরাধের শাস্তি নয়! কিন্তু তাকে লইয়াই শাশুড়ী তাঁর মনের ঝাল ঝাড়িয়া লইতেছেন!

কিন্তু ওই তীব্র, তীক্ষ্ণ কথাগুলি যে বলে তার পক্ষে বলা সহজ, যে শোনে তার পক্ষে শোনা তো তত সহজ নয়! তা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টাই হীনতা-নীচতার, ঘৃণা-বিদ্রূপের ঘর-কন্নার মধ্যে শান্তির এতটুকু আভাসও সে এ সংসারে আসিয়া পায় নাই! প্রাণপণ বলে আত্ম-সংযম করিয়া নিজের ক্ষীণ কৈফিয়ৎটুকুও সে সামলাইয়া লইল। পুলককে ভুলাইয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিল। তার পোষাক পরা হইয়া গিয়াছিল। সবিতার মাথাটা জ্বালা করিতেছিল তাই সে খানিক জল মাথায় দিয়া মুখ মুছিতে আসিয়া দেখিল, জ্ঞানদা ঝী একতাড়া পাণ লইয়া ধুইতে চলিয়াছে। সে বলিল,"ও পাণগুলি আমায় দিও, মায়ের জন্মে পাণ লাগবে।"

জ্ঞানদা সে কথা গ্রাহ্য করিল না, বলিল, "আজ মায়ের পাণ আমরাই সেজে দেব এখন!"

সবিতা ধীরভাবে বলিল, "মা কি তোমাদের তাই বলেছেন নাকি?"

ঝীটা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "নাই বা বললেন মা,—মায়ের তো পাণ নিয়ে কথা, আমরাই সে পাণ দেব, তা হলেই হল!"

সবিতা জানিত যে এই বেয়াদব ঝীটা গিন্নির কাছে অতিরিক্ত আদর পাইয়া আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিতে চাহে না। কিন্তু তা বলিয়া ঝীয়ের এই অনুচিত ঔদ্ধত্য তার ভাল লাগিল না, সে কঠিন স্বরে বলিল, "না, তা হবে না। এ পাণ আমিই সাজবো। তুমি যাও, পাণগুলো সব আমারই ঘরে দিয়ে এস!"

ঝীটা রাগিয়া গিয়া বলিল, "ওই বুদ্ধির জন্তেই তো মায়ের গায়ে জ্বালা ধরে! কথা বল্লে শুনবেন না—"

সবিতা মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি কথা বলতে জানো না ঝী,—তোমার কথা শুনলে

আমি বাধ্য নই। এখন তুমি আমার কথা শোনো, পাণটা আমার ঘরেই রাখ গিয়ে—"

আর একটুও না দাঁড়াইয়া সবিতা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। পাণ খাওয়াটা মেনকার মস্ত এক নেশা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সুদৃশ্য নক্সা-করা রূপার দোক্তার কৌটাও থাকিত। এর আগে তিনি নিজের পাণ নিজে সাজিয়া খাইতেন, ঝীয়েদের সাজা পাণ তিনি পছন্দ করিতেন না। এখন সবিতা সাজিয়া দেয়। না দিলে তিনি বিরক্ত হইবেন, তাই সবিতার অত আগ্রহ!

কিন্তু এই ঝীটার ব্যবহার অবধি সবিতাকে পাগল করিয়া তুলিতে চায়! ঝীটা আপন মনে বকিতে বকিতে পাণ সাজিবার সাজ-সরঞ্জাম আনিয়া সবিতার ঘরে বারান্দায় ছড়াইয়া দিয়া গেল।

পাণ সাজিয়া হাত ধুইয়া সবিতা একবার ছাতে গিয়া দাঁড়াইল। আকাশ নির্মেঘ, নীল, নির্ম্মল। জলে ভাসা ননীর মত এক একটুকরা শুভ্র মেঘ হ্রদের বুকে মরালের মত সাঁতরাইয়া বেড়াইতেছিল। রৌদ্র-ঝলক যেন শ্যামল ধরিত্রীর গায়ে রূপার তারে বোনা ওড়নাখানির মত বিচিত্র বর্ণে দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাগানের একদিকে অনেকগুলি গাছে স্থলপদ্ম ফুটিয়া রংয়ের চটকে গোলাপের রংকেও পরাস্ত করিয়া দিয়াছিল। যতটুকুর জন্তই হোক্, বর্ণের কাছে গন্ধ হারে! উদার অম্বর-তলে দাঁড়াইয়া তার মন-অম্বরের ঘনায়িত মেঘ-ভারও যেন কতকটা হাল্‌কা হইয়া গেল। সে নিজের কাপড় বদ্‌লাইয়া গেল। তা না বদ্‌লাইলেও শাশুড়ী বকিবেন। বারো-মেসে কাপড় ছাড়িয়া একখানা চওড়া লাল পেড়ে ফরসা কাপড় পরিয়া সে শাশুড়ীর মান রক্ষা করিল। মাথার চুলের রাশিতে জট বাঁধিতেছিল, সেগুলি আর ছাড়াইবার চেষ্টা সে করিল না। আর তা একটুখানি সময়ের কাজও নয়! অনেক দিনকার অবহেলার ফলে চুলগুলির যে দশা হইয়াছিল, নিজের হাতে সেগুলির সংস্কার করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সন্ধ্যার একটু আগে মেনকা ডাকিয়া বলিলেন, "চল, নীচে যাত্রা গান হচ্ছে, সেইখানে গিয়ে বসি গে।"

সবিতা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এখুনি? পুলককে দুধটা খাইয়ে নেব না?"

"না, না, সে আজ তারাই দেবে এখন খাইয়ে। তুমি চল এখন।"

সবিতা আর দ্বিরুক্তি করিল না। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে মেনকা একবার সবিতার পা হইতে মাথা অবধি চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "সেখানে পাঁচজন এসেছে, লজ্জা করবে না তোমার এই বেশে যেতে? এক কথা তোমাকে কতবার করে শেখাব বল দেখি?"

সবিতা মাথা হেঁট করিয়া চলিল। নিজের হাতে প্রসাধন করা যে তার কোনো কালেই অভ্যাস নাই; বরং সাজিয়া-গুজিয়া লোকের কাছে বাহির হইতেই তার লজ্জা করিত। তাই মেনকার কথাতেও তার বেশী লজ্জা বোধ হয় না। সেই বেশেই সে গিয়া চিকের আড়ালে পাতা আসনের উপর বসিয়া চিকের ওধারের সাজ-সজ্জা দেখিতে লাগিল। জমিদার-বাড়ীর কাজ, অনুষ্ঠানের ক্রটি কোথাও কিছু নাই!

প্রকাণ্ড ফরাসের মাঝের যায়গা ছাড়িয়া দিয়া চারিদিকে লোক বসিয়া গিয়াছে। সামিয়ানার থামের গায়ে রঙীন কাগজ জড়ানো। দেবদারু গাছের পাতার মাঝে বড় বড় আলো জ্বলিতেছে! অরুণ নিজেই তার সুমিষ্ট হাসিতে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতেছে।

গান আরম্ভ হইবার আগে চিকের আড়ালের মেয়েরা পরস্পর আলাপ শেষ করিয়া লইতেছিল।

একটি মেয়ে আসিয়া বলিল, "ওগো, আমাকে তোমরা এই দিকে একটু জায়গা ক'রে দিতে পারো ভাই? ওদিক থেকে কিছু দেখতে পাইনে।"

একটী বউ নিজে সরিয়া বসিয়া বলিল, "এইটুকুর মধ্যে যদি পারো, বসো!"

"তা পারবো একরকম ক'রে—"বলিয়া মেয়েটী বসিয়া বলিল, "তোমরা এই বাড়ীর কাছেই থাকো, এ বাড়ীর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমাদের? কেমন লোক ভাই?"

"চমৎকার।"

"সত্যি ?"

"পাগল তুমি! বাড়ীর ছেলে যার বাড়ী ছাড়া হয়ে বেড়ায় বৌয়ের গুণে,—আমরা পাব সেখানে যেঁসতে!"

একসঙ্গে চার-পাঁচ জন বলিয়া উঠিল, "চুপ, চুপ, চুপ!" অর্থাৎ যার কথা লইয়া এ আলোচনা, সেই সবিতা যে এখানেই আছে!

সবিতা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, এদের কাহাকেও সে চেনে না। কিন্তু তার সম্বন্ধে আলোচনা কতদূর ওঠে, তা সে টের পাইয়া গেল। সে এমন কি করিয়াছে, যে বাড়ীর ছেলে তার জন্য বাড়ী-ছাড়া হইবেন? নারী-জীবনে সে সত্যও অসহনীয়,—আর সেই মিথ্যা সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে? তার ভাগ্যে যাই কেন হোক্ না, তিনি সুখী হোন, এ প্রার্থনা কি সেও কায়মনোবাক্যে করে না? তাকে লইয়া আলোচনা কিন্তু থামিল না, সুর নামিল মাত্র। গান শেষ হইবার কিছু আগেই মেনকা উঠিলেন; সবিতাও উঠিল।

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিমিরাচ্ছন্ন নিম গাছের মাথায় খুব বড় একটা নক্ষত্র দপদপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘন কালো শিব-লিঙ্গের মাথায় মাণিকের চক্ষু দিলে যেমন দেখায়, তেমনি অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাইতেছিল। তীক্ষ্ণ শীতল শীতের হাওয়ায় জড়-সড় হইয়া নিজের ঘরে যাইতে যাইতে সবিতা শুনিল, তখনো রাত্রির স্তব্ধতা মন্থিত করিয়া যাত্রাদলের ছেলেরা গাহিতেছে,—

সখা, আসিও, আসিও, আসিও,
যে সে বেশে এসে, দেখা দিয়া সখা,
বিরহ-বেদনা নাশিও।
বরিষা গগনে জলদের গায়ে
চপলার ছলে হাসিও—

১১

কন্‌কনে শীতের উপর সারারাত্রি অশ্রান্ত বর্ষণের পর বেলা দশটা অবধি সূর্য্যদেব মেঘের আড়ালেই ছিলেন। এতক্ষণের পর একটু একটু উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। অকাল-বর্ষা-সমাগমে শীতের শিহরণ আরো দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। দীন-দুঃখী যাদের শীতবস্ত্রের অভাবে আগুনের উত্তাপই ভরসা, এমন দিনে তাদের যে কি দুর্দ্দিন, তা তারাই বোঝে, আর বোঝেন হয় তো তিনি, দুঃখের আঘাতে দুঃখহারীকে মনে পড়িবে বলিয়া দুঃখের যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন!

এমন মেঘাচ্ছন্ন মলিন দিনেও দম দেওয়া কলের মত মানুষের জীবন-যাত্রার গতিটুকু ঠিক সমান চলিলেও হাতে কাজে প্রায়ই শিথিলতা আসে! এই আলস্যের আরো একটা গুণ আছে, হাত-পা-কে জড় করিয়া রাখিয়া, মনটি চাবুক-খাওয়া তুরঙ্গ গতিতে কোন্ কল্পলোকে উধাও হইয়া যায়! অতীতের হারানো ভুলানো দৃশ্যপট কালো মন আলো করিয়া জাগিয়া ওঠে! পুরানো বন্ধু-বান্ধবকে, হারানো শৈশবকে এই দিনে বেশী করিয়া মনে পড়ে!

ধরিত্রীর পোড়া বুক জুড়াইয়া দিয়া একটা স্নিগ্ধ সুরভি শ্বাস বহিয়া যাইতেছিল। ধূসর রংয়ের শালে পা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া বসিয়া অরুণ একখানি বই পড়িতেছিল।

গত রাত্রের বৃষ্টিতে কোনো বই ভিজিয়াছে কি না দেখিবার জন্যই ঘরটা সে খুলিয়াছিল, কিন্তু পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে সে একখানা বইয়ে আটকাইয়া পড়িল। শুভেন্দু আসিয়া বলিল, "দাদা, এদিকের এই আল্‌মারির চাবিটা আমাকে একবার দাও তো!"

"কেন, কি হবে?"

"আমি খানকতক বই বের ক'রে নেব।"

"কি হবে এখন বই দিয়ে?"

"আঃ, বই দিয়ে আবার কি হয়? তুমি দাওনা চাবিটা—"অরুণ টেবিলের দেরাজ টানিয়া চাবি বাহির করিয়া দিল। শুভেন্দু আল্‌মারি খুলিয়া বই বাছিতে লাগিল।

ঘরের বাহিরে বারান্দার নীচে দোতলার একটা নল বহিয়া জল পড়িত বলিয়া সেখানকার মাটী নীচু হইয়া গিয়াছিল, সেখানে জল বাধিয়া থাকিত।

ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনিয়া অরুণ বলিল, "কে ওখানে?"

উত্তর আসিল, "আমি, আমি।"

"কে তুমি?"

"আমি পুলক বাবু।"

অরুণ হাসিতে হাসিতে শুভেন্দুকে ডাকিয়া বলিল, "পট্‌লা, বেরিয়ে দ্যাখ্,—বাবু কি বাবুগিরি করছেন!" ততক্ষণে জুতা-মোজাশুদ্ধ পা জলে ডুবাইয়া পরম উল্লাসে পুলক ছপ্‌ছপ্ করিতেছিল। শুভেন্দুকে দেখিয়া কলোচ্ছ্বাসে হাসিয়া উঠিল।

শুভেন্দু বলিল, "এই বুঝি তোমার বাবুগিরি হচ্ছে বাঁদর! উঠে আয় শীগ্‌গির।"

পুলক হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি উঠবো না তো!"

অরুণ বলিল, "না উঠলে মার খাবে কিন্তু!"

পুলক ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "ইস্! তাহলে আমি মাকে বলে দেব।"

পুলকের বিশ্বাস এর চেয়ে বড় শাসন আর ছিল না, কিন্তু এ শাসন এখানে টিঁকিল না। শুভেন্দু তাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া মায়ের কাছে লইয়া গিয়া ডাকিল, "মা, দেখে যাও তোমার পুলকের কীর্ত্তি!"

মেনকা তখন পূজা করিতেছিলেন। সবিতা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "মা পুজো করছেন।"

"এই ত্যাখো বৌদি, তোমার পুলক বাবুর কীর্ত্তি ত্যাখো, জুতোমোজা সব ভিজিয়ে ফেলেছেন। মস্ত বাবু উনি!"

সবিতা পুলকের ভিজা জুতা-মোজা খুলিয়া দিতে দিতে বলিল, "এমন দুষ্টু ছেলের সঙ্গে আমরা কেউ আর কথা কবো না তো!"

পুলক সবিতার কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "তুমি? বৌমা তুমি কথা বলবে না?"

সবিতা বলিল, "না—"

সবিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পুলক কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "আর দুষ্টুমি করবো না বৌমা, কোনো দিনও না।"

শুভেন্দুর নব বধূ আশা সাতদিন থাকিয়া আবার তার পিত্রালয়ে ফিরিয়া গিয়াছে। মেনকা বলিলেন, এ তো আর সবিতার মত ধাড়ী মাগী নয়, এ কেন বাপের বাড়ী যাইবে না! বিশেষ, আশা ঐ কয়দিনেই কান্নাকাটি করিয়া সকলকে ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু সে একটু ভাল থাকিত সবিতার কাছে। সবিতা বিবাহের পর আর বাপের বাড়ী যায় নাই শুনিয়া সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত, পাছে এঁরা তাকেও না পাঠান।

আশাকে লইতে লোক আসিলে মেনকা তাকে আরও দু'চার দিন রাখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু অরুণ বলিল, "সে আবার কি! ছেলেমানুষ, নতুন বৌ, ওঁকে রেখে লাভ কি! নিতে এসেছেন, পাঠিয়ে দাও।"

মেনকা আর কোনো কথা বলিলেন না। আশাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সবিতা মনে মনে হাসিল! শুধু তার বেলাতেই বিধি-ব্যবস্থা অন্য রকম। সে শুধু এঁদের দয়ার দানে কেনা দাসী মাত্র! তার পাওনার কি আর কড়া-ক্রান্তিও বাকী নাই? সে সবই তার বিবাহের সময় মিটিয়া গিয়াছে!

শুভেন্দু আশাকে রাখিয়া শ্বশুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সবিতা বলিল, "আমাকে যে বই দিতে চেয়েছিলে ঠাকুরপো,—দিলে না?"

শুভেন্দু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি সেদিন বই বের করছিলুম বৌদি, পুলকটা গোল করে দিলে! আচ্ছা, এনে দিচ্ছি—"

লজ্জিত শুভেন্দু এক-একটা লাফে দু-তিন ধাপ সিঁড়ি পার হইয়া নামিয়া গেল। তার আগ্রহ দেখিয়া সবিতা হাসিল।

খানকতক বই বাহির করিয়া শুভেন্দু আলমারির চাবি অরুণের হাতে দিতে গেল। সে হাসিয়া বলিল, "অতগুলো বই কি হবে রে,—বাড়ীর ভেতরে বল্‌লে নাকি?"

শুভেন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, "হ্যাঁ।"

অরুণ তাচ্ছল্য-ভরা হাসি হাসিল, কিছু বলিল না, ভাবিল,এটা শুভেন্দুর পাগলামি!

বই দেখিয়া সবিতা বলিল, "উঃ! এ যে অনেক হয়ে গেল। এতগুলো একসঙ্গে আমাকে দিলে আমি যে ভাবনায় পড়্‌বো,—আমার পুলকটা তো মোটেই ভদ্রলোক নন।"

শুভেন্দু বলিল, "তা যাই হোক্, আমি ঋণমুক্ত হলুম তো!"

"হ্যাঁ, হলে। কিন্তু এই বইগুলির মালিক কি তুমিই? তা হলে বরং কিছু ভরসা পাই।"

"মালিক যেই হোক না,—আপনার তো পড়া নিয়ে কথা!"

"তা নয়,—তবু নির্ভয় হতে পারি। যদিই দৈবাৎ কোনখানাতে কিছু হয়ে যায়!"

শুভেন্দু হাসিয়া বলিল, "অন্তত পরের বই নয়, নির্ভয়েই পড়তে বা ছিঁড়তে পারবেন,—দণ্ড দিতে হবে না।"

"তা হলেই হলো!"

"না, সেজন্যে ভয় নেই!" বলিয়া শুভেন্দু চলিয়া গেল।

অবসর-সময়ে পড়িবে বলিয়া সবিতা বই কয়খানা তুলিয়া রাখিতে গিয়া দেখিল, প্রত্যেক বইএর উপরে অরুণের নাম লেখা। তার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বই ক'খানি রাখিয়া দিল।

দিন কতক পরে একদিন যোগেশ বাবুর শরীর খারাপ হওয়ায় তিনি বাড়ীর ভিতর শুইয়া ছিলেন। কর্ত্তার চেহারা দেখিয়া তাঁর শরীর ঠিক বুঝিতে পারা যাইত না। হৃদ্‌রোগে তাঁকে মধ্যে মধ্যে শয্যাশায়ী হইতে হইত। সেদিনও তিনি বুকের যন্ত্রণায় নিঝুম হইয়া শুইয়াছিলেন। কাছে বসিয়া মেনকা তাঁর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন।

একখানি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া অরুণ ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে চিন্তিত মনে বারান্দায় দাঁড়াইল। টেলিগ্রামখানি কটক হইতে আসিয়াছে! সেখানে মেনকার মায়ের খুব ব্যারাম। তাঁর যে বয়স, তাতে আরোগ্যের আশা করা যায় না। মেনকার সঙ্গে শেষ দেখা করিবার জন্য তিনি বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, এই কথা অরুণের মামা সংক্ষেপে জানাইয়াছেন।

কিন্তু এই খবর এখন মেনকাকে জানানো যায় কি না তাই সে ভাবিতেছিল।

এই দালানের অন্য এক কোণে সবিতা বসিয়া খালি বিস্কুটের টিনে কতকগুলি শুকনো বড়ি ভরিতেছিল। সেখানে দাঁড়াইয়া সবিতাকে সঙ্কুচিত করার চেয়ে অরুণ নিজেই বেশী সঙ্কুচিত হইতেছিল।

এই মেয়েটীর বিবাহ হইয়াছিল কৈশোরের সীমায় আসিয়া, এখন এর যৌবনের তীব্রোজ্জ্বল দীপ্তি চোখে লাগে, তা ভালই লাগুক বা মন্দই লাগুক। এর উপর অরুণের নিজের যে কোনো কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব আছে, তা সে কোনোদিনই স্বীকার করিত না। তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে, তা মনে করিতেও সে জ্বলিয়া উঠিত। নিজের দারুণ অনিচ্ছার এই বিবাহটাকে সে বিগত একটা দুঃস্বপ্নের মত উড়াইয়া দিতে চাহিত। উপেক্ষায়, অবজ্ঞায় সে সবিতার সঙ্গে একটা মুখের কথাও কোনোদিন বলিত না।

অরুণ ভাবিত, যার কাছে সে নিজে কিছুই চাহে না, সেই বা তার কাছে প্রত্যাশা করিবে কোন্ অধিকারে?

সবিতা মাথা হেঁট করিয়া কাজ করিতেছিল; অরুণকে দেখিয়াও দেখে নাই, এমনি ভাবে কাজ করিতে লাগিল। কোন রকম আগ্রহও দেখাইল না, সঙ্কোচও দেখাইল না।

পুলক অরুণকে দেখিয়া বলিল, "ওই ত্তাখো বৌমা,—বড় মামা!"

অরুণ ডাকিল, "শোন্ পুলক,—শুনে যা!"

সবিতার দিকে আগাইয়া যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, "কি?"

"এদিকে আয়, বল্‌চি!"

পুলক বিজ্ঞের মত বলিল, "অত করে চেঁচিও না,—দাদাবাবুর অসুখ করেচে।"

"আচ্ছা, আর চেঁচাব না, তুমি এস।"

সবিতার বড়ি তোলা শেষ হইলে সে উঠিয়া গেল।

মেনকা আসিয়া বলিলেন, "এখানে বসে তুই কি কর্‌ছিস্?"

"কিছুই করছিনে। একটু কাজ আছে। বাবা কি ঘুমিয়ে আছেন?"

"না, তিনি তো জেগেই আছেন।"

"কেমন আছেন?"

"বল্‌চেন তো একটু ভাল,—তুই যা না দেখে আয়!"

অরুণ পিতার ঘরে ঢুকিয়া টেলিগ্রাম পড়িয়া কর্ত্তাকে

শুনাইল। তিনি নিজে সেখানি আর একবার পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন,—তাহলে তো ওঁকে যেতেই হয়।

অরুণ বলিল,—আপনার শরীর খারাপ, মা কি এখন যেতে পারবেন ?

—তা কেন পারবেন না ? আমার শরীর তেমন কিছু খারাপ নয়,—পটুলা ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাক্, আবার দুদিন সেখানে থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বে,—তুই ডাক্ ওঁকে, বলি।

অরুণ বলিল,—পটুলার চেয়ে আমি গেলেই সুবিধে হয়, পথ-ঘাট আমার জানা আছে—

কর্ত্তা কঠোর স্বরে বলিলেন,—না, তোমায় আর সেখানে যেতে হবে না।

অরুণের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, কর্ত্তা এ কোন্ ইঙ্গিত করিলেন! সে যেন নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত, উৎপীড়িত মনে করিল। মেনকাকে ডাকিয়া, তাঁকে সব কথা শুনাইয়া তারপর যাওয়ার ব্যবস্থার জন্য শুভেন্দুকে ডাকিয়া দিয়া সে সরিয়া পড়িল। ঠিক হইল, সবিতা বাড়ীতে থাকিয়া সংসার দেখিবে, মেনকা কটকে যাইবেন।

মায়ের ব্যারামের কথা শুনিয়া অবধি মেনকা তাঁর চোখ মুছিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁর আর একটুও মন টিঁকিতেছিল না। সবিতাকে সংসার-ধর্ম্মের পাঁচ রকম উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

যখন তিনি গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, সেই সময়ে সবিতা হেঁট হইয়া তাঁকে প্রণাম করিতেই তিনি সবিতাকে কোলের কাছে জড়াইয়া ধরিয়া তার মাথায় হাত রাখিলেন।

শাশুড়ীর কাছে এমন কোমল ব্যবহার সবিতা কল্পনাতেও আনিতে পারিত না, তাই সে কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একটু বিপন্নও হইল, বুঝিল না, এর মানে কি ?

ধরা গলা পরিষ্কার করিয়া মেনকা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, —শোনো বৌমা, তুমি সকল দিকে সমান বুঝতে পার না। একা থাকলে এখন, একটু চেষ্টা করো, যাতে জন্মটা একেবারেই বৃথা না হয়ে যায়! এমন ঘরে এসেও যে সুখী হতে পারলে না, এতে আমাদেরও কি কম আক্ষেপ! একটু যদি চালাক হও—

মেনকা আরো কিছু বলিতেন, কিন্তু শুভেন্দুর তাগাদায় থামিতে বাধ্য হইলেন। সে অনবরত তাগাদা দিতেছিল,—আর সময় নেই, শীগ্‌গির এস, নইলে ট্রেণ পাবে না!

সবিতা কিছুই বুঝিতে পারিল না। একেবারে অকস্মাৎ শাশুড়ীর এত দয়া, এত সহানুভূতির কল্লোল কোথা হইতে বহিয়া আসিল? সে স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ীখানা গেটের বাহির হইয়া গেলে সে অন্যমনস্ক ভাবে আসিয়া দালানে উঠিতেছিল, কর্ত্তা ডাকিলেন,—বৌমা!

সবিতা শ্বশুরের সামনে বড় একটা বাহির হইত না, কথাও বলিত না। শ্বশুরের ডাক শুনিয়া সসঙ্কোচে ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা বলিলেন,—বসো।

সবিতা বসিল। কিন্তু নিষ্কর্ম্মা হইয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকা যায়? শীতের দিনে বাতাসেরও দরকার হয় না যে পাখা হাতে করিয়া বসিবে! বিশেষ দিন কয়েক হইতে শীতও বিপর্য্যয় বেশী রকম পড়িয়া এমনিই মানুষকে জমাইয়া তুলিতেছিল।

সূর্য্যদেব নিশ্চিন্তরূপে পাটে বসিবার আগেই শীত-সায়াহ্নের ধূসর আবরণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সবিতা জানালা বন্ধ করিয়া বাহির হইতেছিল, কর্ত্তা এতক্ষণ পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিলেন, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—কোথায় যাচ্ছ মা?

তাঁর কথা থামিতে না থামিতে অরুণ আসিয়া বলিল,—বাবা, ডাক্তারবাবু এসেছেন। আসতে বল্‌বো তাঁকে?

কর্ত্তা বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন,—ভালই তো আছি। আচ্ছা, ডাকো তাঁকে।

সবিতা বাহির হইয়া পড়িল। চাকরকে ডাকিয়া আলো ও ধুনা পাঠাইয়া দিয়া সে পুলকের খোঁজ করিল।

পুলক বাড়ী মাতাইয়া গান করিতে করিতে বেড়াইয়া

ফিরিয়া আসিল। এদিক ওদিক দেখিয়া বলিল,—বৌমা, মা কোথায় গেল?

সবিতা তাকে খাবার খাওয়াইতে বসিয়া বলিল,—মা বেড়াতে গিয়েছেন, বাবা!

—বেড়াতে গিয়েছেন? কোথায় বৌমা? আমি যাব।

খাবার ফেলিয়া পুলক লাফাইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে তাকে খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া সবিতা কর্ত্তার রাত্রের খাবার গুছাইয়া লইয়া গেল। সবিতা জানিত যে ব্যারামে পড়িলে তিনি সামান্য কিছু ফল ও দুধ ছাড়া রাত্রে আর কিছুই খাইতেন না। থালা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া সবিতা দেখিল, টেবিলের আলোর কাছে হেলিয়া অরুণ কি একখানা বই পড়িতেছে! কর্ত্তা আরাম-চেয়ারে চুপ করিয়া শুইয়াই আছেন। সমস্ত ঘরখানা ব্যাপিয়া সে নীরব স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল ব্র্যাকেটের উপরকার টাইমপিস্ ঘড়িটী তার অশ্রান্ত টিক্‌টিক্ শব্দে!

খাটের কাছে ছোট একখানি টুলের উপর সবিতা খাবারের থালাখানি নামাইয়া রাখিল। থালের উপর গরম দুধের বাটী হইতে ধোঁয়া উঠিতেছিল। কর্ত্তা বলিলেন,—এখুনি? আট্‌টা বেজেছে কি?

অরুণ সোজা হইয়া বসিল, হাতের বইখানি মুড়িয়া কোলের উপর রাখিয়া, ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল,—হ্যাঁ। আটটা বেজে গিয়েছে।

কর্ত্তা দু-একটুক্‌রা ফল মুখে দিয়া বলিলেন,—তোমার পুলক কি ঘুমিয়ে পড়েছে, মা?

সবিতা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

—এই ক'টা দিন,—একা তোমার ভারি কষ্ট হবে হয় তো! পুলককে তারার কাছেই বেশী করে রেখো!

সবিতা একবার ভাবিল বলে, না, না, কোনো কষ্টই আমার হবে না; কিন্তু কিছুতেই মুখে কথা ফুটাইতে পারিল না। তার ছলছল চক্ষে গভীর কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। কষ্ট? তারও আবার কষ্ট বলিয়া কিছু আছে নাকি?

কর্ত্তার আহার শেষ হইয়া গেলে সে মশলার ডিপাটি আগাইয়া দিয়া, খালি থালা-বাটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল; লক্ষ্যও করিল না যে ঘরের মাঝে আরো একজন লোক বসিয়া আছে!

১২

এক একজন মানুষ আছে, যারা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান দয়াবৃত্তিটাকেও প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করে, পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে। মেনকাও এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। যদি কখনো তাঁর এতটুকুও করুণা কোনো ছিদ্র-পথে প্রকাশ হইয়া পড়িত, তখনি তিনি আরো কঠিন হইয়া উঠিতেন, পাছে কেহ দুর্ব্বল বলিয়া ধরিয়া ফেলে!

এইজন্যই তাঁর হাতে গিন্নিপনাও খুব নিপুণভাবে চলিত না। তাঁর নিজের মনের উদারতা ছিল না, তাই আর কারো মনেরও কোনো খবর তিনি তাঁর নিজের বুদ্ধির প্রেরণায় বুঝিতে পারিতেন না; তাই অজস্র মাতৃস্নেহের বন্যায় সন্তানদের সকল ব্যথা, সকল দুঃখ-গ্লানি ধুইয়া দিতেও পারিতেন না!

কর্ত্তার শরীর এখানে ভাল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মেনকার মা তখনো সারেন নাই, তাই মেনকা আজও ফিরিতে পারেন নাই। সংসারের সমস্ত ভারই সবিতার হাতে পড়িয়াছে। কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে শ্বশুরের কাছেও আর সে তত সঙ্কোচ করিত না। কেবল একটুও ভাবান্তর হয় নাই অরুণের সঙ্গে। যতদূর পারে, সে তার চোখের দৃষ্টিটাকেও এড়াইয়া চলে! ইদানীং আর অরুণ কোনো দিনই সবিতার ছায়াও দেখিতে পাইত না, অবশ্য দেখিতে চাহিতও না।

নিজের বাঁধনের উপকরণ দেখিয়া যেমন কোনো মানুষই সুখী হয় না, তেমনি সবিতাকে দেখিয়া অবধি অরুণ খুসী হইতে পারে নাই। আগে ভাবিত যে, পিতামাতার ইচ্ছা তো পূর্ণ করিয়াছে সে, তবেই তার সকল কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। কিন্তু তবু সবিতার উপর বিতৃষ্ণা তার ঘুচিত না! তার বুকের সেই ফুলের ঘা আজিও শুকায় নাই। যৌবন-মদের এই ফেনিলোচ্ছ্বাসে

ভাঁটা না পড়িলে বুঝি বা কমিবে না। যদি অপর কোনো কল্লোল এই উচ্ছ্বাসকে ছাপাইয়া না ওঠে!

জগৎ বাবু তাঁর নিয়মিত কাজ-কর্ম্ম করিয়া যাইতে-ছিলেন। চিরদিন যেমন নির্লিপ্ত নির্ব্বাক, এখনো প্রায় তেমনি। তবে আজকাল খাইবার সময় সবিতার সঙ্গে এক-আধটী কথা বলিতেন। হয় তো বা সে অনাবশ্যক অবান্তর কথা, তবু তাঁর মনের প্রচ্ছন্ন স্নেহের পরিচায়ক।

সেদিন দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন, কোলের কাছে শুইয়া পুলক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সবিতাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। সবিতা আসিয়া বলিল,—পুলককে কি তুলে নিয়ে যাব?

কর্ত্তা বলিলেন,—না, ও থাক্, তুল্‌তে হবে না।…ভাল কথা, ওরে, অরুণকে ডেকে দে তো!

সবিতা মাথা হেঁট করিয়া ফিরিতেছিল, কর্ত্তার চোখ পড়িবামাত্র তিনি বলিলেন,—বৌমা, তুমি একটু বসো; কাজ আছে।

সবিতা একটা চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল। কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গ উঠিবার ভয়ে তার হৃদ্‌যন্ত্রের সহজ গতি দ্রুত হইয়া উঠিল। চিন্তাকুল মনে সে অপেক্ষা করিতে লাগিল, কি হয়!

অরুণ তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া দুই দিন আগে পাওয়া কনকের চিঠির জবাব দিতেছিল। মেনকার মুখে সব কথা শুনিয়া কনক অরুণকে অনেকগুলি শক্ত শক্ত কথা লিখিয়া ছিল। সে চিঠি পড়িয়া অরুণ আবার সেই বেদনাভরা, অবহেলার হাসি হাসিয়াছিল। উত্তর লিখিতে বসিয়া সে ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া ঠিক জবাবটা এড়াইয়াও সে কনককে জানাইয়া দিবে যে সে খেলার পুতুল নয়! তার ইচ্ছার উপর, রুচির উপর কারো যে জোর চলে না, এটা সে ভাল করিয়া দেখাইতে চায়! যখন মুখের কথায়, সহজ ভাবে বুঝাইতে গিয়াছিল, তখন তো এঁরা কেহ তা বোঝেন নাই, তার জন্য শিকল গড়িতেই ব্যস্ত ছিলেন। তেমনি এখন সকলে বুঝুন যে, এ শিকল তাকে বাঁধিতে পারে নাই। সে একজন স্বাধীন মানুষ; তার আলাদা ইচ্ছারও একটা জোর আছে! এই কথাগুলিই ঠিক করিয়া সে কনককে লিখিতে বসিয়াছিল, এমন সময় কর্ত্তার ডাক পাইয়া কলম রাখিয়া উঠিয়া পড়িল। মনের এই অবস্থায় পিতার কাছে আসিয়া সবিতাকে দেখিয়া অরুণের বিতৃষ্ণ বিরূপ মন আরো গরম হইয়া উঠিল। চোখ ফিরাইয়া সে বলিল,—আমাকে ডাকছেন বাবা?

কর্ত্তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ। তোমার সে কারখানা থেকে কোন জবাব-টবাব এসেছে কি?

অরুণ সম্প্রতি সাকচীর কারখানার কাজের জন্য একখানি চিঠি লিখিয়াছিল। জগৎবাবু তাকে বিষয়ের কাজ দেখিতে বলায় সে বলিয়াছিল, আগে কিছুদিন এই কাজটা তো করে দেখি। কিন্তু এখনো সে চিঠির কোনো উত্তর না আসায় সে ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল; পিতার কথার উত্তরে বলিল—না, এখনো তো জবাব আসে নি।

—তুমি এর মধ্যে একবার কাশী ঘুরে আস্‌তে পারবে কি?

—কাশী?

—হ্যাঁ, কাশী। বৌমার দাদামশায়ের শরীর খারাপ হয়েছে, তাই তিনি তোমাকে আর বৌমাকে দেখতে চেয়েছেন। এ সময় তোমাদের যাওয়া উচিত বইকি!

অরুণ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। কর্ত্তা বলিলেন,—তা হলে শুভেন্দুকে লিখে দাও, ওঁকে নিয়ে সে চলে আসুক,—দেরী যেন না করে!

সবিতার বুকের রক্তে তুফান খেলিয়া গেল। প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে তার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। দাদা-মশায়ের শরীর খারাপ,—বুড়ো মানুষ,—হয়তো অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি তো আসল কথা কিছুই জানেন না, তাই ও কথা লিখিয়াছেন। কি অপাত্রেই তিনি দয়ার প্রত্যাশা করেন!

অরুণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—তা শুভেন্দু এসেই তো কাশী যেতে পারে।

—তা কেন পারবে না,—পারে। কিন্তু তুমিই বা

পারবে না কেন? তোমাকেই যে তিনি দেখতে চেয়েছেন!

কথাটা অরুণের কাছে বড় প্রীতিকর মনে হইল না। কিন্তু বাপের কাছে অনর্থক বাক্-বিতণ্ডা না করিয়া সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় তার উগ্র-গম্ভীর মুখপানে চাহিয়া সবিতারও ছলছল চোখ শুকাইয়া আগুন হইয়া উঠিল।

কর্ত্তা কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন,—তুমিও যাও বৌমা, কটকে একখানা চিঠি লিখে দাও, যেন তাঁরা চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসেন! অরুণের সময় থাক্‌তে থাক্‌তে তোমাকে কাশী থেকে ঘুরিয়ে আন্‌তে পারবে।

সবিতা মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করিলেন যে দাদামশায়ের পীড়ার খবর পাইয়াই বুঝি সে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! তাই স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন,—তোমার কোনো ভয় নেই মা, আমি তোমাকে পাঠাবই, ওর কোনো আপত্তি আমি শুন্‌ছিনে—

সবিতা বেশ শান্তভাবে বলিল—না বাবা, আমি এখন গেলে চলবে না। থাক্, এর পরই না হয় যাব—

কর্ত্তা একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বুঝিতে পারিলেন না যে সবিতার এ কথার অর্থ কি! তবু বলিলেন,—না, না, তুমি যাবে বই কি! তিনি কটক থেকে এলেই তুমি যাবে! দাদামশায়ের অসুখ, তাঁকে দেখতে যেতে হবে বই কি!

সবিতা মলিন মুখেও হাসিয়া বলিল,—সারলে তিনি নিজে এসেই নিয়ে যাবেন। এখন গেলে পুলকের কষ্ট হবে।

—না, কষ্ট কেন হবে! শিথিল কণ্ঠে এই কথা বলিয়াই তিনি কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তাঁর প্রশান্ত কপাল কুঞ্চিত রেখায় রেখায় কালো হইয়া উঠিল।

শ্বশুরের ঘর হইতে নিজের ঘরে আসিয়া সবিতা তার মনের বেদনাটা ভাল করিয়া বুঝিল। বিক্ষুব্ধ মনটায় বারবার জাগিতে লাগিল, দাদামশায়ের কথা। হয়তো তিনি চলিয়া যাইবেন, এ জন্মেই আর দেখা হইবে না!·· তবু সে যাইতে পারিবে না! এভাবে যাওয়া তার দ্বারা হইবে না!

এক,--শুভেন্দু আসিয়া যদি লইয়া যায় তো সে বরং হইতে পারে! তা যদি না হয় তো দাদামশায়ের শেষ আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ তার অদৃষ্টে নাই! তা বলিয়া কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়া নিজের তৃপ্তি সে চায় না!

নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্য সে যত চেষ্টা করিল ততই তার দুচোখ ছাপাইয়া অশ্রুর বাণ ডাকিয়া আসিল। নির্জ্জনে নীরব কান্নায় যে সুখ আছে, সে তাই উপভোগ করিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে শান্তভাবে চোখ মুছিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল যে, চৌকাঠের উপর অরুণ দাঁড়াইয়া আছে। তার পায়ের বর্ম্মা চটি জুতার শব্দ সবিতা শুনিতে পায় নাই।

চট্ করিয়া এক ঝলক রক্ত মুখে আসিয়া সবিতার ম্লান মুখে যেন আলো জ্বালিয়া দিল। মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; বুঝিতে পারিল না যে, তার ঘরে স্বামীর কি দরকার? তিনি এখানে আসিয়াছেন কেন?

অরুণ ঘরে ঢুকিয়া দুয়ারের কাছেই একটা সোফা ছিল, সেইটাতে বসিয়া ঘরখানির চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। তারপর নতমুখী সবিতার দিকে চাহিয়া বলিল,—তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই।

সবিতা আরক্ত মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। বাতাস-লাগা শতদলের মত, তার হৃদয়-পদ্মের সমস্ত দলগুলি থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। স্পন্দিত বুকে স্বামীর সব কয়টা কথা শুনিবার জন্য সে উৎসুক হইয়া রহিল।

অরুণ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—আমরা যে ঠিক আর সকলকার মত নই, অর্থাৎ আমি যে সাধারণের একটু বাইরের মানুষ, এ বোধ হয় তোমার বুঝতে বাকী নেই, কেমন?

এইটুকু বলিয়াই অরুণ একবার সবিতার মুখপানে চাহিল; কিন্তু কোনো ভাবান্তর দেখিল না। সে

যেমন মাথা হেঁট করিয়া ছিল তেমনি আছে। তখন আবার বলিল—দেখ, তোমার কোনো-কিছুতেই আমি হাত দিতে চাই না, দিইও না, এ-দিকে তুমি স্বাধীন, তেমনি আমার দিক থেকেও আমার সঙ্গে কাশী যাওয়ার সাধ থেকে আমাকে অব্যাহতি দাও তুমি।...ওটা আমার উচিত হবে না। বাবার কাছে ওই আব্‌দারটি তুমি কোরো না!

সবিতা সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া চাহিল, বলিল,—আচ্ছা, তাই হবে।

অরুণ সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; একটু হাসির ভঙ্গীতে বলিল,—এই যদি আগে হতো তা হলে আমার বলতে আসবার কোনো দরকারই হতো না।

এইবারে সবিতা কথা বলিল। প্রথম স্বামীর সঙ্গে কথা,—কিন্তু প্রণয়-ভীতা নববধূর সঙ্কোচে নয়।—বলিল,—বাবাকে বল্‌লেও তো চল্‌তো!

—তা যে চল্‌লো না! আমার চেয়ে তোমার কথাই যে বাবা বেশী শোনেন!

অরুণ চলিয়া গেল। সবিতা খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অনেকক্ষণকার রুদ্ধ একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বসিল। স্বামীর মুখের উপর সে বলিল না যে তিনি যা বলিতে আসিয়াছিলেন, তা একেবারেই অনর্থক। কোনো দরকার ছিল না তাঁর এজন্য আসার। আর তিনি যে সাধারণ নন, বরং অসাধারণ, তা কি সে জানে না? তাঁর কাছে তার প্রার্থনীয় কিছু নাই, কিছু পাইবার আশাও সে কোন দিন করে না। কিন্তু এই সংসারে সে যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া সার্থক হইবে, তাতেই বা ব্যাঘাত আসে কেন?... কিছু না পাইয়াও দেওয়া তো যায়! জীবন যতক্ষণ আছে ততক্ষণই দেওয়া চলে! ফুল গন্ধ দেয়, প্রদীপ আলো দেয়, না দিতে পারিলেই অসার্থক হইয়া যায়!

অনেকক্ষণ বসিয়া সবিতা কত কথাই ভাবিল। কেবল সব চিন্তার মাঝে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল, বুঝি, দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা আর হইল না! যদি তিনি এবারে আর আরোগ্য না হন!

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

---

# সঙ্কলন

## ভবভূতি

### ( Sylvain Levi-র ফরাসী হইতে )

ভবভূতির সৃষ্টি করিবার প্রতিভা নাই। তাঁহার রোমাণ্টিক নাটকগুলি সম্ভবতঃ অনুকরণমাত্র। ভবভূতি কনৌজরাজ যশোবর্ম্মনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কাশ্মীরের ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মনকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। এই পরাভব হইতেই তাঁহার রাজত্বকাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ললিতাদিত্য ৬৯৫ অব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন; এবং এই ঘটনা হইতে যশোবর্ম্মনের উপর বিজয়লাভ একটু দূরবর্ত্তী; পক্ষান্তরে যশোবর্ম্মন এই পরাজয়ের পূর্ব্বে গৌড়রাজের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন। এবং যশোবর্ম্মনের রাজসভার এক কবি, বাক্‌পতিরাজ 'গৌড়বহো' নামক এক প্রাকৃত মহাকাব্যে এই বিজয়ের জয়কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই কাব্যে তিনি আত্মগরিমাচ্ছলে বলিয়াছেন "ভবভূতির অমৃতসাগর হইতে তিনি কয়েক ফোঁটা অমৃত অপহরণ করিয়াছেন।" অতএব ভবভূতির উৎকৃষ্ট রচনাগুলি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের একটু পরে বিরচিত হয়। হর্ষবর্দ্ধনের কুলকীর্ত্তি ও কুলপ্রথা যশোবর্ম্মন সগৌরবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কবিদিগকে উৎসাহিত করিতেন এবং তাহাদের সহিত পাল্লা দিতেন। অলঙ্কারশাস্ত্রাদিতে তাঁহার নামে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হয়, সেই শ্লোকগুলিতে বেশ একটু লালিত্য ও রসিকতা আছে। এমন কি, তিনি "রামাভ্যুদয়" নামক একটি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাহার নায়ক। ভবভূতির প্রস্তাবনাদি হইতে ভবভূতির বংশ ও শাস্ত্রাধ্যয়নের কথা অনেকটা জানা যায়। তিনি উদুম্বর-উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ বংশ হইতে সমুদ্ভূত। এই ব্রাহ্মণবংশ বিদর্ভের (বেরার) অন্তঃপাতী পদ্মপুরে বাস করিতেন। তাঁহারা তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী, ও কাশ্যপ-গোত্রীয়। ভবভূতির পিতার নাম নীলকণ্ঠ, মাতার নাম জাতুকর্ণী, পিতামহের নাম গোপালভট্ট, তাঁহার চতুর্থ পুরুষস্থ পূর্ব্বপুরুষ একজন মহাকবি ছিলেন; "প্রকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার" জ্ঞাননিধি নামক এক

মহাপণ্ডিতের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞাননিধি বেদ, উপনিষদ, বিবিধ দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র, মহাকাব্য, নাটক ও নাট্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

কালিদাসের ন্যায় ভবভূতি তিনখানি নাটক রাখিয়া গিয়াছেন। দুইটি নাটক রাম-কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত—মহাবীর-চরিত, ও উত্তর-চরিত। অন্যটি মালতীমাধব—এটি স্বকপোলকল্পিত নাটক অন্ততঃ অলঙ্কারশাস্ত্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর কবির এই মৌলিক কল্পনা অতীব সংযত। বৃহৎ কথা ( =XIII কথা-সরিৎ-সাগর ) হইতে তিনি এই নাটকের আখ্যানবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এক ব্রাহ্মণ যখন বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে মদিরাবতী তাঁহার এক সহাধ্যায়ীর ভগিনীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন। তরুণীও সেই বিদ্যার্থীকে দেখিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে একটী মালা গাঁথিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। উহাদের বিবাহের কথা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় এক বড়-ঘরের পাত্র মদিরাবতীর পাণিপ্রার্থী হইলেন। মদিরাবতীর পিতা এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে সাহস পাইলেন না এবং প্রায়-বাগ্দত্ত সেই বিদ্যার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। বিদ্যার্থী হতাশ হইয়া নগর হইতে বাহির হইল, এবং উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইল। তাহার নৈরাশ্য প্রশমনার্থ আর এক যুবক সেই সময়ে ঐ স্থানে আসিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইল। এই যুবকটী পথে বেড়াইতে বেড়াইতে এক তরুণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং পূর্ব্বোক্ত বিদ্যার্থীর ন্যায় সেও প্রেমে পড়ে; এই যুবকটী ঐ তরুণীকে পলাতক এক মত্ত হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে; পরে সে তাহার দৃষ্টিবহির্ভূত হওয়ায় বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। এই দুই যুবক-বন্ধু পরস্পরকে সাহস দিয়া, মাতৃকাদের মন্দিরে যাত্রা করিল। উহারা যে সময়ে সেখানে উপনীত হইল, মদিরাবতীও সেই সময় বাগ্দত্তার সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কামদেবকে পূজা দিবার জন্য উপস্থিত হইল। আসলে আত্মহত্যা করাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। মদিরাবতী হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণ যুবককে দেখিতে পাইল। এই যুবকের বন্ধু উহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য, উহাদিগকে সুখী করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিল। ঐ বাগ্দত্তা তরুণীর সহিত আপন বেশভূষা বদল করিল; তারপর যখন প্রেমিকযুগল পলায়ন করিল, তখন সেই যুবকবন্ধু মদিরাবতীর সহচরীদিগের সহিত মদিরাবতীর গৃহে প্রবেশ করিল। সেই সময় মদিরাবতীর এক সখী বিবাহের পূর্ব্বে বিদায় সম্ভাষণ করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছিল। এই তরুণীটিই সেই হস্তীর আক্রমণ ব্যাপারে ঐ যুবকের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়াছিল এবং বহুকাল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে তরুণী দুইজনে একসঙ্গে পলায়ন করিবার প্রস্তাব যুবকের নিকট করিল। যুবক সম্মত হইল; এবং তাহার পর দুজনে পূর্ব্ব প্রেমিক-যুগলের সহিত পুনর্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিল।

ভবভূতি উক্ত ঘটনাগুলি যথাযথরূপে রক্ষা করিয়াছেন; এমন কি, এই নাটকে যে মালাগাছটী একটা বিশেষ দরকারী জিনিস, তারও খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে ছাড়েন নাই। দুই বন্ধুকে সহপাঠী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাদের বন্ধুত্ব আখ্যানের গোড়া হইতেই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এইরূপ দেখাইয়াছেন। পলাতক হস্তীর পরিবর্ত্তে ভবভূতি আর এক জন্তুর অবতারণা করিয়াছেন—অর্থাৎ ব্যাঘ্র। বস্তুতঃ ভবভূতি, নায়িকার নির্দ্ধারিত স্বামীর ভগিনীকেও সখীরূপে নায়িকাকে প্রদান করিয়া আখ্যানবস্তুকে আরও জমাট করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি দুই প্রেমিক-যুগলকে অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত কতকগুলি বাঁধাবাধি ধরণের শাস্ত্রের যোগান দিয়াছেন। যথা:—বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকী এবং তাঁহার দুই শিষ্যা অবলোকিতা ও সৌদামিনী। বন্ধুদ্বয়ের প্রত্যেকেরই একজন প্রাণের গুপ্ত কথা বলিবার আপ্তজন আছে:—মালতীর ধাত্রীকন্যা লবঙ্গিকা এবং বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকার সহচরী। নায়ক-মাধবের কলহংস নামে একজন বিশ্বস্ত পরিচারক; কাপালিক অঘোরঘণ্ট এবং তাঁহার একজন শিষ্যা কপালকুণ্ডলা নাটকের আকস্মিক ঘটনাবিপর্য্যয় সাধনে সহায়তা করিয়াছে। নাট্যশালায় বিশেষতঃ স্বকপোলকল্পিত নাট্য-রচনায়, মালতীমাধব নাটকে বৌদ্ধধর্ম্মের গতানুগতিক সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঘোর নিষ্ঠাবান ধর্ম্মিষ্ঠবংশ হইতে উদ্ভূত ব্রাহ্মণ ভবভূতি, একজন বৌদ্ধ তাপসীকে দূতীর ভূমিকায় বরণ করিয়াছেন। এমন লোকের বিচার-সিদ্ধান্ত অবশ্য অপরিহার্য্য। নাম যাহাই হউক এই বৌদ্ধ তাপসীর অন্তরে কোন কু-ভাব আমরা দেখিতে পাই না। এই পাত্রটী নাটকের একজন প্রধান ব্যক্তি। স্বার্থসংসৃষ্ট দুই পরিবারের প্রার্থনায় রাজাকে সন্তুষ্ট না করিয়া ইনিই প্রেমিকদিগের বিবাহ-সংঘটনার্থ বিবিধ উপায়ের যোজনা করিয়াছেন। রাজার ইচ্ছা, তাঁহার পূর্ব্বসখা মদয়ন্তিকার ভ্রাতা নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহ হয়। এই বৌদ্ধ পরিব্রাজিকারই এক শিষ্যা অবলোকিতা একটা চাল চালিয়াছিলেন। এবং যখন মালতীর প্রাণরক্ষার কোন আশা ছিল না তখন সৌদামিনী তাহাকে রক্ষা করেন। স্পষ্টতঃ ব্রাহ্মণ্য-পক্ষপাতী ও পাষণ্ডদিগের বৈরী চারিত্রিক উপন্যাস "দশকুমার"ও ধর্ম্মরক্ষিতাকে দিয়া ( শাক্য-ভিক্ষুকী ) বারবনিতা কামমঞ্জরীর দূতীর কাজ করাইয়াছেন। ( পৃ ৫৮, ৪ ); রূপসী ললনা রত্নাবলী স্বীয় পতির অবজ্ঞার শাস্তি দিবার জন্য আর এক ভিক্ষুকী নিযুক্ত করেন ( VI ); নিতম্ববতীর মন হরণ করিবার জন্য একজন শূদ্র আরও এক ভিক্ষুকীকে এই কাজে লাগাইয়াছে ।

দেখা যায়। Wilson কৃত অনুবাদে, নাট্যগত বিষয়টার নিম্নলিখিত নাম দেওয়া হইয়াছে—A Stolen Marriage অর্থাৎ গুপ্ত বিবাহ—ইহাতে দশ অঙ্ক নাই। স্বীয় নাটককে দশ অঙ্কে বিভক্ত করিবার মানসে ভবভূতি কতকগুলা অতিরিক্ত ঘটনা একত্র জমা করিয়াছেন, মূল বিষয়টাও প্রচলিত আখ্যানাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কটা প্রায় সমস্তই ঘটনা-বিবৃতি মাত্র। এই অঙ্কে কামন্দকী আপন মৎলব আঁটিতেছে এবং এই মৎলব তাঁহার সহপাঠীদিগকে বলিতেছেন। মালতী কর্ত্তৃক বিচিত্র এক চিত্রপট লইয়া কলহংস প্রবেশ করে, কলহংসের প্রণয়িনীর ও মালতীর সহচরী মন্দারিকা উহা গ্রহণ করে এবং দৈবক্রমে উহা মাধবের হাতে আসিয়া পড়ে। মাধবও মালতীর একটা ছবি আঁকিয়া তাহার নীচে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়া একটা শ্লোক রচনা করিয়া দেয়। মন্দারিকা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া ঐ চিত্রখানি লইয়া গেল। দ্বিতীয় অঙ্কে বৌদ্ধ ভিক্ষুকী মালতীর বিবাহের বন্দোবস্ত করে। তৃতীয় অঙ্কে প্রেমিগণ শিবের মন্দির-সংলগ্ন উদ্যানে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে। একটা বাঘ পলায়ন করিয়া মদয়ন্তিকাকে আক্রমণ করে ও গ্রাস করিতে উদ্যত



সিলভ্যাঁ লেভি
( কলিকাতা রিভিউএর সৌজন্যে )

হয়। মকরন্দ নিজ প্রাণকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নন্দনের ভগিনীকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু হঠাৎ ( চতুর্থ অঙ্ক ) রাজা তাঁহার নর্ম্মসখার সহিত মালতীর বিবাহ শীঘ্র সুসম্পন্ন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মাধব হতাশ হইয়া, কামন্দকীর কার্য্য-কৌশলের উপর আর বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, ভূত-প্রেতদিগের নিকট সাহায্য-গ্রহণার্থ, তাহাদিগকে মহামাংস দিবার জন্য মহা-শ্মশানে গেলেন। রাত্রে সেখানে উপনীত ( পঞ্চম অঙ্ক ) হইয়া প্রেতগণকে আহ্বান করিলেন, তাহাদের চীৎকার-কোলাহল শুনিতে পাইলেন, তার পর পার্শ্ববর্ত্তী মন্দির হইতে বিলাপ-ক্রন্দন শুনিয়া, তাড়াতাড়ি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; এবং সেখানে ভীষণ করালা দেবীর পুরোহিত অঘোরঘণ্টকে দেখিতে পাইলেন। অঘোরঘণ্ট মন্ত্রতন্ত্র-প্রভাবে মালতীকে হরণ করিয়া আনিয়া কপালকুণ্ডলার সাহায্যে তাহাকে বলি দিবার আয়োজন করিয়াছেন। মাধব পুরোহিতকে বধ করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীকে উদ্ধার করিলেন। পুরোহিতের সহকারিণী গুরু-হত্যার প্রতিশোধ লইবে বলিয়া শপথ করিল ( ৬ অঙ্ক )। তরুণীদ্বয় মন্দিরে উপনীত হইল, যুবকদ্বয়কে কামন্দকী পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মকরন্দ

মালতীর বিবাহ-পরিচ্ছদ পরিধান করিল ; এবং মালতী মাধবের সহিত পলায়ন করিল। ইত্যবসরে কন্যার সাজে সজ্জিত মকরন্দকে কন্যার গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। নন্দন ( ৭ অঙ্ক ) জ্বলন্ত-বাসনা-ভরে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। ছদ্মবেশী মালতী রূঢ়ভাবে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। উহাকে প্রশমিত করিবার জন্য নন্দন মদয়ন্তিকাকে পাঠাইয়া দিল। প্রণয়ীদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল ও তাহারা একসঙ্গে পলায়ন করিল। সৈনিকেরা উহাদের অনুসরণ করিল ( ৮ অঙ্ক ); মকরন্দ খুব সাহসের সহিত উহাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিল ; মাধব সখার বিপদ দেখিয়া, তাহার সাহায্যার্থে দৌড়িয়া আসিল। মালতী একলা রহিল। কপালকুণ্ডলা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। মাধব মালতী-অন্তর্ধানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল ( ৯ অঙ্ক ); মাধব পাগলের মত হইয়া পর্ব্বতে, অরণ্যে, বন্ধুর সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং তাহার প্রণয়িনীকে আনিয়া দিবার জন্য প্রাকৃতিক সমস্ত পদার্থের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার পর আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে, কামন্দকীর শিষ্যা সৌদামিনী আসিয়া তাহাকে জানাইলেন যে মালতী জীবিত। এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ, তাহার পূর্ব্বেকার স্বহস্ত-রচিত মালাগাছি তাহাকে দিলেন। কামন্দকী মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা তাহাদের আন্তরিক দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে ( ১০ অঙ্ক ) এমন সময় হঠাৎ মাধব মালতীকে লইয়া আবার আসিল। রাজা তাহাদের বিবাহ দিয়া দিলেন এবং মদয়ন্তিকাকে মকরন্দের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আখ্যানবস্তুতে ভবভূতির যাহা নূতন যোজনা তাহা এই :—মাধবের উন্মাদ (৯ অঙ্ক) এবং ভূতপ্রেতদিগকে আহ্বান করা ( ৫ অঙ্ক )। পঞ্চম অঙ্কে সম্ভবতঃ আর কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কবির অনুকরণ করা হইয়াছে ; ঐরূপ ঘটনা-সংস্থান প্রচলিত আখ্যানাদিতে প্রায়ই দেখা যায়। যথা :—বৃহৎকথায় ( ১৮ তরঙ্গ ) এক বৌদ্ধ ভিক্ষু এক ঘুমন্ত রাজকুমারীকে হরণ করিয়া মহাশ্মশানে লইয়া যায় এবং সেখানে তাহাকে বলি দিতে উদ্যত হইলে, ব্রাহ্মণ বিদূষক তাহার বিলাপ-ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই হতভাগা ভিক্ষুকে বধ করে ; আরও পরে, ( ১২১ তরঙ্গ ) এক কাপালিক স্বীয় মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবে, রূপসী মদনমঞ্জরীকে বলিদানের জন্য মহাশ্মশানে আনয়ন করে। অন্যত্র ( ২৫ তরঙ্গ ) যাহাতে মন্ত্রতন্ত্রের যোগাযোগ দরকার এরূপ একটা ভীষণ দুঃসাহসিক সকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অশোক-দত্ত মহাশ্মশানে গিয়া রাক্ষসদিগের নিকট টাটকা মহামাংস বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল ; দাগিনেয়ও ঐরূপ করিয়াছিল ( ১২১ তরঙ্গ ) ইহারই অনুরূপ গল্প দশকুমারেও বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—মন্ত্রগুপ্ত রাজকুমারী কনক-লেখার প্রাণরক্ষা করে। বলি দিবার জন্য এক ঐন্দ্রজালিক তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে আখ্যান-বস্তুর রচনায় কবির কৃতিত্ব খুবই কম। তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগুলিতে না আছে ব্যক্তি-বিশিষ্টতা, না আছে মৌলিকতা, না আছে দৃষ্টি-আকর্ষক অনন্য-সাধারণতা—ইহার কিছুই নাই। পাত্রদিগের জীবনে অনুরাগের ভাব ( sentiment ) ছাড়া আর কিছুই নাই। মনে হয়, প্রেমিকগুলি এবং তাহাদের সহায় ও তাহাদের বৈরিগণ একটা জড়ভাবাপন্ন নিদ্রামগ্ন নগরীতে বিচরণ করিতেছে, বহির্জগতের সহিত তাহাদের যেন কোন সম্বন্ধ নাই। উহারা তাহাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ, মানব-সমাজ হইতে যেন একেবারেই বিচ্ছিন্ন। নাটকের অবান্তর ভূমিকাগুলি, যাহা মৃচ্ছকটিকার দিক্‌-মণ্ডলকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, সেই পথ-চলা পথিকের ন্যায় ক্ষণিক পাত্রগুলি যাহা দর্শকের অজ্ঞাতসারে নাটকের মধ্যে যাতায়াত করে, এবং ঘটনার গ্রন্থিবন্ধনে ও গ্রন্থিমোচনে অলক্ষিতে সহায়তা করে, এবং নায়ক-নায়িকার জীবনকে জনমণ্ডলীর সমগ্র জীবনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়, তাহা মালতী-মাধবে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রেমের ঘটনা-বিপর্য্যয়ে নায়কগণ যে-বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয় সেই সব অবস্থাতেই ভবভূতি স্বকীয় কবিত্বের শক্তিসম্বল দেখাইবার উপলক্ষ্য অন্বেষণ করেন। এই দৃষ্টিভূমি হইতে দেখিতে গেলে, শ্রীকণ্ঠ উপাধিধারী নাটকগুলি নিশ্চয়ই ওস্তাদি হাতের উৎকৃষ্ট রচনা। তাঁহার ন্যায় আর কেহই অত পূর্ণ মাত্রায় অফুরন্ত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের অধিকারী হইতে পারেন নাই। ওরূপ জটিল ছন্দসমূহকে অমন অক্লেশে আর কেহ আয়ত্তে আনিতে পারে নাই। চিত্তের প্রচণ্ড আবেগ, বিশ্বপ্রকৃতির মহান দৃশ্যসমূহ, তীব্র ও ভীষণ মনোগত সংস্কার—এই সমস্তের চিত্রকর বা ব্যাখ্যাতা ভারতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। ভারতীয় সমালোচকেরা ভবভূতি ও কালিদাসের কাব্য-রচনার ধরণটা খুব ঠিক্ বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস ভাবের সূচনামাত্র করেন, ভবভূতি ভাবের ব্যাখ্যা করেন। অপ্রচলিত ও ঝঙ্কারকারী শব্দের প্রতি তাঁহার যে অভিরুচি আছে, তাহার সহিত গভীর পাণ্ডিত্য সংযোজিত হওয়ায় তিনি অনেক সময় দুর্ব্বোধ শব্দ-প্রয়োগ অথবা অপ্রচলিত আর্ষ প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। খুব বিরাট গম্ভীর ভাব প্রকাশের চেষ্টায়, তিনি দীর্ঘ সমাসবহুল শব্দ-ঝঙ্কারী বাক্য প্রয়োগের অপব্যবহার করিয়াছেন। শূদ্রকের ন্যায় না আছে তাঁর রসিকতার জ্বলন্ত স্ফূর্ত্তি, কালিদাসের ন্যায় না আছে তাঁর সুকুমার কল্পনা ; কিন্তু লেখকসুলভ, চিত্রকরসুলভ ও কবিসুলভ তাঁহার যে সকল মৌলিক গুণ আছে, তাহাতে করিয়া তিনি নাট্যসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩২৯।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# যৌবনের স্বারাজ্য

যৌবনের একটা স্বারাজ্য আছে। স্বারাজ্য অর্থই এই যে যারা শাসিত হইবে তারাই নিজের সার্থকতা লাভের লোভে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা করিয়া লইয়া সেই ব্যবস্থার অধীন হইয়া চলিবে, অপরে বাহির হইতে বা উপর হইতে তাহাদের উপরে কোনও আইন-কানুন চাপাইবে না। যৌবনের স্বারাজ্যের অর্থ এই যে যৌবনের নিজের সার্থকতা লাভের জন্য যৌবন আপনি আপনার বিধিনিষেধ গড়িয়া তুলিবে।

যৌবনের প্রধান লক্ষণ নবজাগ্রত ইন্দ্রিয়গ্রামের চাঞ্চল্য। যৌবনের ইঙ্গিতে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাম নূতনপ্রাণতাতে স্ফুরিত হইয়া উঠে। এই ইন্দ্রিয়গ্রামের লক্ষ্য বিষয় ভোগ করা। যৌবনের সতেজ ইন্দ্রিয়সকল এই ভোগের লোভেই চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। এই ভোগটা কিছু নয় বলিলে সে শুনিবে না; কেননা তাহার ইন্দ্রিয়সকল ভোগে যে আনন্দ আছে তাহার সন্ধান পাইয়াছে। ভোগ্য বিষয়ের সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই নিজের ভিতরে সেই ভোগের আনন্দের ইঙ্গিত পাইয়াছে। সুতরাং যৌবন যাহা আপনার অনুভবে ধরিয়াছে, বাহিরের আদেশে বা উপদেশে সে সহজে ও স্বেচ্ছায় তাহা ছাড়িবে না, ছাড়িতে পারিবে না। যৌবনকে নিবৃত্তির পথে চালান সহজও নয়, ভালও নয়। প্রবৃত্তির পথে চালাইয়াই তাহাকে যতটা প্রয়োজন প্রবৃত্তির সার্থকতার জন্যই ততটা নিবৃত্তির সাধনে নিয়োগ করিতে হইবে। যৌবন চাহে ভোগ। কিন্তু ভোগের যে একটা আইনকানুন আছে; ইহা জানে না। এই আইন-কানুনটা যে কি, যৌবনের শিক্ষার ভার যাঁহারা হাতে লইবেন, তাঁহাদিগকে সকলের আগে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

ভোগের আইনের প্রথম ধারা, অসংযত ভোগে ভোগ হয় না, আনন্দ খুঁজিতে যাইয়া অসংযত ভোগী সর্ব্বদাই বিষাদ আহরণ করে। সংযম ব্যতিরেকে ভোগ আনন্দ দান করিতে পারে না, আনন্দের মরীচিকার প্রকাশ করিয়া ভোগ্য বস্তু কেবল তৃষ্ণাই বাড়াইয়া দেয়।

ভোগের এই আইনের দ্বিতীয় ধারা এই, ভোগের জন্য বীর্য্যের প্রয়োজন। বীর্য্য অর্থ ইন্দ্রিয়ের তেজ ও শক্তি। ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতিরেকে এই তেজ ও শক্তি রক্ষা হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ভোগের প্রয়োজনেই ইন্দ্রিয়ের সংযমসাধন প্রয়োজনীয়।

ভোগের আইনের তৃতীয় ধারা এই, ইন্দ্রিয় সকল যদিও পরিমিত বিষয়ের প্রতিই সর্ব্বদা ছুটিয়া যায়, কিন্তু এই সকল বিষয় ভোগের লালসামাত্রই বাড়াইয়া দেয়, এই লালসার সম্যক্ পরিতৃপ্তিদান করিতে পারে না। ভোগের লক্ষ্য আনন্দ। কিন্তু মন যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্য বস্তুকে গ্রহণ করিয়া যুগপৎ তাহাকে ছাড়াইয়া যাইয়া বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত যে ভাবরাজ্য তাহাতে না পৌঁছায় ততক্ষণ ইন্দ্রিয়-ভোগে জীব ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই নিয়ত যে আনন্দ অন্বেষণ করে সে আনন্দ পায় না। ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া বিষয়কে গ্রহণ করিয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে পৌঁছিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় ভোগের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

যৌবন চায় শরীরের শক্তি। যৌবন চায় শরীরের স্বাস্থ্য। আর যৌবন চাহে শরীরের সৌন্দর্য্য। যৌবন নিজের মধ্যে এগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য লালায়িত। যৌবনের এই স্বাভাবিকী লালসাকে নষ্ট করিলে চলিবে না, উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। সয়তানের ছলাকলা বলিয়া যৌবনের এই সহজ প্রবৃত্তিকে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিলেও চলিবে না। এখানে যৌবনকে সেই পথ দেখাইয়া দিতে হইবে, যে পথে তাহার শক্তি, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য লাভ সম্ভব হইবে। সে পথই মোটের উপরে ব্রহ্মচর্য্যের পথ।

ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম দুই ভাগে পরিপূর্ণ হয়। এক শারীরিক এক মানসিক। শারীরিক ব্রহ্মচর্য্য সাধন প্রথমে। ইহারই উপরে মানুষের শৌর্য্য এবং সংযমের প্রতিষ্ঠা হয়। সংযম কেবল মনের ধর্ম্ম নহে, শরীরেরও ধর্ম্ম বটে। শরীরের 'ধাতু'র প্রসন্নতা না হইলে মনের সংযমলাভ সম্ভব হয় না। আবার দেহের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুসকল স্থির এবং স্নিগ্ধ না থাকিলে অকারণে বা অতি সামান্য কারণে যখন তখন স্নায়ুসকল চঞ্চল হইয়া উঠিলে মনের সংযমলাভ অসাধ্য হয়। সুতরাং স্নায়ুমণ্ডলের স্থৈর্য্য এবং স্নিগ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সাধনায় অবলম্বন করিতে হয়। স্নায়ুমণ্ডলের স্থৈর্য্য ও স্নিগ্ধতা নষ্ট হয়, এক শারীরিক উত্তেজনায় আর মানসিক উত্তেজনায়। শারীরিক উত্তেজনা আসে আহার বিহারের, শয্যাসনভোজনাদির অনাচার বা যথেচ্ছাচার হইতে। আহার বিহারাদি সম্বন্ধে, এমন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার ফলে স্নায়ুমণ্ডল স্নিগ্ধ থাকে, শরীর প্রকৃতিস্থ রহে, স্বাস্থ্য এবং শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং সকলে মিলিয়া মানুষের আয়ুষ্কালকে বাড়াইয়া দেয়। ইহাই মোটামুটি ব্রহ্মচর্য্যের শারীর সাধন।

ব্রহ্মচর্য্যের মানস সাধনও ঐ এক লক্ষ্যই ধরিয়া চলে। শরীরের উপরে যেমন মনের অবস্থা নির্ভর করে, সেইরূপ মনের অবস্থার দ্বারাও শরীরের অবস্থা স্বল্পবিস্তর পরিবর্তিত হইয়া থাকে। মনের প্রধান ধর্ম্ম চিন্তা এবং ধ্যান। যে সকল বিষয়ের চিন্তাতে এবং ধ্যানেতে স্নায়বীয় উত্তেজনার আশঙ্কা থাকে, শরীরকে অপটু করিয়া তুলে যৌবনসুলভ ভোগ এবং আনন্দ লাভের জন্যই সে সকল চিন্তা ও ধ্যানকে বর্জ্জন করা আবশ্যক। এই শরীর সাধনই যৌবন সাধনের প্রথম কথা। ইহার উপরেই যৌবনের অন্যান্য সাধন প্রতিষ্ঠিত হয়।

যৌবনের শারীরী সাধনার সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা ও সকলের গোড়ায় এই কথা যে, যে যুবক নিজের যৌবনের সফলতা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে নিজের দেহের প্রতি অচলা ভক্তি সাধন করিতে হইবে।

এই দেহটাকে ক্ষণভঙ্গুর রক্তমাংসের পিণ্ড বলিয়া ভাবিলে চলিবে না। শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্ বলিয়া ইহাকে একটা আপদ-বালাইয়ের মতন ভাবিলেও চলিবে না। এই দেহ দেবতার মন্দির। এই দেহপুরের পুরস্বামী বিশ্বের উপাস্য নারায়ণ। এইভাবে প্রতিদিন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য নিজের দেহেরই ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যানের ফলে এই দেহেতে দেবতা-বুদ্ধি জন্মিলে এই দেহকে উপেক্ষা বা কোনও প্রকারে অপবিত্র করা অসম্ভব হইবে। তখন স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম তাঁহার উপাসনার অঙ্গ হইয়া যাইবে। দেহের প্রসাধন করিতে যাইয়া তিনি ভোগবিলাসের প্রেরণা অনুভব করিবেন না, কিন্তু সত্য এবং পবিত্র ভক্তি দ্বারাই প্রেরিত হইবেন। ভোজন তখন তাঁহার ভজনেই পরিণত হইবে। শরীরের শক্তি, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যসাধন ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত হইয়া উঠিবে। নিজ দেহের প্রতি এই যে ভক্তিভাব, ইহারই উপরে যৌবনের শারীরী সাধনা ব্রহ্মচর্য্যাদিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই যে শরীরের প্রতি ভক্তিলাভ করা, ইহার প্রথম সাধনা, শরীরের জ্ঞানলাভ। এই শারীর যন্ত্র কি অপূর্ব্ব কৌশলে রচিত হইয়াছে, ইহাই প্রথমে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এই জন্য শরীরের অস্থি, পেশী, শিরা ফুসফুসাদি যন্ত্র, অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডল, মস্তিষ্কের গঠন, এসকলের জ্ঞান-লাভ করা আবশ্যক। যৌবনের প্রথমেই এ শারীর বিদ্যা বা দেহতত্ত্ব Anatomy এবং Physiology অধ্যয়ন করিতে হইবে। যাঁহারা ডাক্তারি করিবেন, তাঁহাদেরই যে কেবল এই বিদ্যা অর্জ্জন করা প্রয়োজন এমন নহে, যৌবনের সম্যক্ সফলতা লাভ করিবার জন্য যে সমুদয় শারীরী সাধনা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক সেই সাধনার প্রয়োজনে ও মোটামুটি শরীর-যন্ত্রের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। শারীর-বিদ্যার সাহায্যে দেহের মাহাত্ম্যের জ্ঞানলাভ করিয়া দেহের প্রতি অচলা ভক্তিলাভ করিতে হয়। দেহের প্রতি এই যে ভক্তি তাহার উপরই যৌবনের শারীরীসাধন, ব্রহ্মচর্য্যাদিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। নতুবা শরীরের শক্তি স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যলাভের জন্য যাহাই কিছু করি না কেন, সকলই বিফলে যাইবে।

নব্যভারত, মাঘ ১৩২৯। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

---

## আল্প্স্ পর্ব্বত

ইউরোপের নানা ভাষায় আল্পস সম্বন্ধে পত্রিকা আছে। আল্পস লইয়া ইয়োরোপ আমেরিকার নামজাদা চিত্র-শিল্পীরা বহুবিধ ছবি আঁকিতেছেন। আল্পস-ভ্রমণ-ঘটিত নানা প্রকার তথ্য ও তত্ত্ব জানিবার জন্য ও জানাইবার জন্য পশ্চিমারা দেশে-দেশে নানা ক্লাব বা পরিষৎ কায়েম করিয়াছেন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সবই পাহাড়গুলাকে নর-নারীর ঘরের কোণে আনিয়া ধরিতেছে।

ফটোগ্রাফের ত' অন্তই নাই। যতবার পাহাড়ে পাহাড়ে অভিযান গিয়াছে, ততবারই শত-শত ফটো লওয়া হইয়াছে। ফটোগুলোর প্রকৃতির অসীম রূপ-গরিমা হাতে-হাতে পাকড়াও করিতে পারি। অপর দিকে পর্য্যটকদের সাহস, অধ্যবসায়, শারীরিক শক্তি, মরণাভিযানের ভাবুকতা এবং অসাধ্য সাধনের সংস্পর্শে আসিয়া চিত্ত বিস্ফারিত হয়।

ইয়োরোমেরিকার লোকেরা হিমালয়ে অভিযান পাঠাইতেছে। ভারত সন্তান চুপ করিয়া বসিয়া আছে কেন? ভারতবাসী বর্ত্তমান জগতের নয়া-নয়া বিজ্ঞানে নয়া-নয়া খেয়ালে একে-একে কিছু হাত দেখাইতেছে।

হিমালয়-বিন্ধ্যের নানা নিভৃত অঞ্চলে ভারতীয় সাহস, শক্তি ও পরিশ্রমের যাচাই হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা যুবক ভারতের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়া-নয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্র ঢুঁড়িতেছেন, তাঁহারা ভারতীয় শৈল-শ্রেণীর চূড়ায়, উপত্যকায় ভারতীয় নরনারীর নয়া-নয়া কর্ত্তব্য পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হউন।

মান্ধাতার আমলে বাল্মীকি কালিদাস "হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ" সম্বন্ধে যে কাব্য রচিয়া গিয়াছেন, একমাত্র সেইগুলা আওড়াইলে ভারত-সন্তানের এখন আর ইজ্জত রক্ষা হইতে পারে না। তাহাতে আমাদের দারিদ্র্য, অকর্ম্মণ্য, আলস্য ও দেউলিয়া অবস্থাই প্রমাণিত হইবে।

বর্ত্তমান ভারতের নর-নারীকে বিন্ধ্য-হিমালয়ের প্রস্তর-স্তূপে, বরফ-স্তূপে "লাভা-স্তূপে" দিন-রাত কাটাইতে অভ্যস্ত হইতে হইবে;—খন্তা হাতে, শাবল হাতে, বোমা হাতে, গাছ-পাথর চুরমার করিবার জন্য লুকানো ঐশ্বর্য্য খুলিয়া দিবার জন্য, উপনিবেশ গড়িবার জন্য, মানুষের ঐশী সৃষ্টি-শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য। এই মূর্ত্তিতেই মধুচ্ছন্দা অগস্ত্য বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অমর ঋষি-কাব্য গড়িয়াছিলেন।

আর আজও,—এইরূপ পাহাড়ী-জীবনেই যে অভিজ্ঞতা পয়দা হইবে, সেই অভিজ্ঞতার চিত্র-শিল্প, সেই অভিজ্ঞতার স্থাপত্য, সেই অভিজ্ঞতার কাব্য বিশ্ব-জাতির হাটে-বাজারে জাহির করিতে পারিলেই যুবক-ভারত দুনিয়ার আসরে পান, সুপারী ও কল্কে পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে। পাহাড়ের ডাক যুবক-ভারতের সাড়া অপেক্ষা করিতেছে।

ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৯। শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

---

## শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষা

আদি শাস্ত্র বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বৈদিককালে স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষরূপ অনুমোদিত ছিল। অথর্ব্ববেদে আছে "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং" কন্যা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই যুবা পতি প্রাপ্ত হয়েন। এই ব্রহ্মচর্য্য-অর্থে যে ইন্দ্রিয়-সংযমের

সহিত বিদ্যাভ্যাস, বিশেষতঃ বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস, তাহা শ্রুতিস্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ করিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে আছে "সমানং ব্রহ্মচর্য্যং ( পট ৪, কং ১৫ ) স্ত্রী ও পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য একই প্রকার হইবে। ঋগ্বেদেও দেখা যায় যে পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষে মিলিত ভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। কেবল তাহাই নহে, বিশ্ববারা প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি ছিলেন এবং ঋত্বিকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গোভিল গৃহ্যসূত্রে যে মন্ত্র আছে যে "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে পত্নী গৃহ্য অগ্নিতে ইচ্ছা করিলে হোম করিবে," সেই মন্ত্রের টীকাকার লিখিতেছেন যে "পত্নীকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে, কারণ পত্নী হোম করিবে এই বচনের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পত্নী বেদ অধ্যয়ন না করিয়া হোম করিতে সক্ষম হয় না।" গোভিল দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ বিষয়ে মানতন্তব্য নামক আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সে মতটী এই যে গৃহকর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে গৃহে অবস্থিত গৃহকর্ত্রীর দ্বারাও উক্ত যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে পারিবে—এই যজ্ঞের পূর্ব্ব দিবসে উপবাস থাকিতে হয়, ( নির্জ্জলা উপবাস বিশেষরূপে নিষিদ্ধ ), এবং সেই উপবাস দিবসের রাত্রিকালে বৈদিক ইতিবৃত্ত ( যথা, ব্রহ্ম হ বা ইদমেকমগ্রআসীৎ ইত্যাদি ) আলোচনা করিয়া অথবা সাধারণতঃ ধর্ম্মালোচনায় যাপন করিতে হয়। বিবাহের প্রারম্ভভাগেও কন্যাকে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়; গৃহ্যসূত্রাদির অনেক স্থলেই দেখা যায় যে নানা কার্য্যোপলক্ষেই স্ত্রীলোকদিগের বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। কেবল গৃহকর্ত্রীই যে বেদমন্ত্র পড়িয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে; গৃহের নাপিতানী পরিচারিকা প্রভৃতিকেও অবস্থা-বিশেষে বেদমন্ত্র পড়িতে হইত। এখনও হিন্দু-সমাজে যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি আছে, তৎসমুদায় বিশেষতঃ বিবাহবিধি আলোচনা করিলেই দেখা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আজ পর্য্যন্ত কেহই বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। তবে অধুনা উপযুক্ত পুরোহিত এবং স্ত্রী-শিক্ষার অভাবে সেগুলি প্রায়ই কন্যাকে উচ্চারণ করিতে হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দিই—শ্রৌতসূত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, "বেদ পত্নীকে প্রদান করিয়া তাহা পাঠ করাইবে।" আজও সেই অনুশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবাহ-কালে কন্যার হস্তে সচরাচর চণ্ডীগ্রন্থ রক্ষিত হয়।

বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নে যেমন সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগকে তাহার উপযুক্ত পাত্র করিতেও বিরত হন নাই। তখন বাল্যকালে উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করা যেমন পুরুষের অধিকার ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন একটী গুরুতর অধিকার ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। গোভিল তাঁহার গৃহ্যসূত্রে বলিতেছেন যে বিবাহের প্রারম্ভেই "বস্ত্রাচ্ছাতদি, যজ্ঞোপবীতযুক্ত কন্যাকে ( ভাবীপতি ) নিজাভিমুখ করত সমীপে আনাইয়া 'প্রমে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে।" ইহা হইতেই আমরা বুঝিতেছি যে তখন স্ত্রীলোকের যজ্ঞোপবীত ধারণ এবং কুমারী অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা অসামাজিক ছিল না, প্রত্যুত এ সম্বন্ধে সামাজিক বিধিই ছিল। এই মতের সপক্ষে গোভিল যে একরথী ছিলেন তাহা নহে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও উপনীত ও অনুপনীত স্ত্রীলোকের স্পষ্টই উল্লেখ আছে "স্ত্রিয় উপনীতা অনুপনীতাশ্চ।" এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া পরাশর-স্মৃতির মাধব্যভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের দুই প্রকার শ্রেণী-বিভাগ ছিল, ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদিগের রীতিমত উপনয়ন, অগ্ন্যাধান, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষা প্রভৃতি অবলম্বনীয় এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী না হইয়া গৃহলক্ষ্মী হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের যে-সে রকমে নামে মাত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। ভাষ্যকার শাস্ত্র হইতে স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার প্রথা পাইয়াছেন, কিন্তু দেশাচার বশতঃ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের বিবাহ-কালে যে-সে রকমে উপনয়ন দিবার কথা নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি যে বৈদিক কালে স্ত্রীলোকের উপনয়ন ধারণ এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা একটী নিয়মিত প্রথা ছিল। এরূপ নিয়মিত প্রথা বৈদিক কালের শেষ ভাগেও প্রচলিত ছিল, তাহার ফলে বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী এবং যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদ! পুরাণের মধ্যে দেখি যে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী কোন কথাই নাই। পুরাণের মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া সর্ব্ববাদীসম্মত। ইহাতে মহামতি ব্যাসদেব দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি অতিশয় বিদুষী ছিলেন। দ্রৌপদী একাধিক স্থলে পণ্ডিতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বনপর্ব্বের একস্থানে আছে, "অত্র শর্ব্বা শিবা নাম ব্রাহ্মণী বেদপারগা" ইত্যাদি। শান্তিপর্ব্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে জনক রাজাকে সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে তাঁহার পত্নীর নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা নিবৃত্ত করিবার কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতের সময় যে কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা সমগ্র ভারতের স্ত্রীচরিত্র আলোচনা না করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না।

তত্ত্ববোধনী পত্রিকা, পৌষ ১৩২৯। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"সারাদিন সারারাতি বাজালে রে মাদ্দাড়িও,
এখোন বোলে যাব—যাব"
(সাঁওতালী গান)

আজ সারা-খণ বাজিয়ে মাদল, নাচিয়ে বাদল,
এখন বুঝি পালিয়ে যাবে?
কয়লা-কালো মেঘের মতন, আমারো মন,
হায়গো সখা, কালিয়ে যাবে?
মাদল বাজে তোমার হাতে,
আমার পায়ে ঘুঙুর মাতে,
ড্রিমিকি-ড্রিমির ঝিনিকি-ঝিনির শব্দে নিশির,
হৃদয় ওগো—হৃদয় দোলে!
এখন তুমি ঘর যেতে চাও, মনকে কাঁদাও,
—এতই কি ভাই নিদয় হ'লে?

কোন্ মহুয়া-বনের মাথায়, পাতায় পাতায়,
দেয়ার কাঁপন লাগ্‌লে পরে,
এই যে আমার মন উদাসী, যায় উছাসি,—
রাখ্‌বে কে তায় আগ্‌লে ঘরে!
ময়ূর যখন তুল্‌বে কেকা,
জলদ-তালের আড়াঠেকা,—
একটুখানি দিনের আলো, মেখে কালো,
মিলিয়ে যাবে সন্ধ্যা-তলে,
রইব আমি একলা ঘরে, কেমন ক'রে,
বুকের গীতি বন্ধ্যা হ'লে?

মুছ্‌বে যখন মেঘের ছবি, উঠ্‌বে রবি
শরৎ-হাওয়ার মিষ্টি ভোরে;—
রাতের চুলে তারার ফুলে, লহর তুলে
পড়্‌বে আলোর বিষ্টি ঝ'রে;
তখন তোমার মাদল গো হায়,
আমায় ভুলে বাজ্‌বে কোথায়,
চুপটি-করা ঘুঙুরগুলি, বাঁধন খুলি,
নীরব শোকে শুন্‌বে সে বোল,—
আস্‌বে কখন্ আমার আঁধার, মন গো আমার
তখন সে-দিন গুণ্‌বে কেবল!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# চারা

## ক

চারিদিকে বাড়ীর পর বাড়ী,—ধোঁয়ায় কালো, ধুলোয় কটা, মরুর মতন নিষ্ঠুর!... ... ...

আকাশের নীলিমাও এমন বেরঙা যে সেদিকে চাইলেও মনের ভিতর গুমোট ঘনিয়ে আসে।

জান্‌লার ধারে একটি ছোট টেবিলের সাম্‌নে ব'সে রোজ আমি লেখাপড়া করি। মুখ তুলে কোনদিকে চেয়ে দেখি না—চেয়ে দেখবার আগ্রহও হয় না। এই শুক্‌নো, কর্কশ ইট-কাঠ-পাথরের একঘেয়ে অটলতা জন্মাবধি দেখে আসছি, এর মধ্যে নূতনত্বের মধু কোথায়!

একদিন হাতে কিছু করবার নেই। চুপচাপ ব'সে আছি। একবার সাম্‌নের দিকে চাইলুম। সাম্‌নে আমাদেরই একটি দোতলা ছাদ। ছাদের আল্‌সেতে হঠাৎ দেখ্‌লুম, সবুজের একটুখানি আমেজ! চোখ অম্‌নি সচকিত হয়ে উঠ্‌ল! তৃষার্ত্ত সাহারায় করুণার ঝর্ঝরানি দেখ্‌লে কে না আশ্চর্য্য হয়?

ভালো ক'রে চেয়ে দেখি, আল্‌সের ফাটলে একরত্তি একটি অশথের চারা তার দুলদুলে মাথা তুলেচে! কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে দূরান্তরের দখিন বাতাস আনমনে বয়ে যেতে যেতে অশথের এই বীজটি হয়ত এখানে ফেলে দিয়ে গেছে! ... ... ... দখিন বাতাস, তোমাকে ধন্যবাদ!

## খ

অশথ-চারা ধীরে ধীরে বাড়্‌তে লাগ্‌ল। চারিদিকে শুষ্কতা, কাঠিন্য আর নির্দ্দয়তা;—কোন ধাত্রীর দরদ-ভরা

দৃষ্টি একদিনও তার ওপরে পড়্‌ল না,—তবু সে আপনা-আপনি ডাগর হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

সকালের সোনালি রোদের কচি আভা লেগে সবুজ রংটি তার ঝল্‌মল্‌ কর্‌তে থাকে, দুপুরের উত্তাপে নিজের পদতলের এতটুকু ছায়ার দিকে সে নেতিয়ে পড়ে, সন্ধ্যায় আবার চাঙ্গা হয়ে হাওয়ার তালে তালে সর্ব্বাঙ্গে নাচের ছন্দ জাগিয়ে তোলে! পূর্ণিমার রাত্রি তাকে ছোট ব'লে অবহেলা কর্‌ত না,—জ্যোৎস্না এসে নিজের রূপোর ঝারি উপুড় ক'রে তার গায়েও রূপের ধারা ঢেলে দিত। চাঁদের আলোতে মনে হোতো, সে যেন স্বপন-পরীর শৈশব-খেলার দোল্‌না।

লিখ্‌তে লিখ্‌তে যখনি মুখ তুল্‌তুম—তখনি আমার নয়ন-মন যেন অপূর্ব্ব পুলকে ভ'রে উঠ্‌ত। আমি এই সবুজ চারাটির পানে অপলক চোখে চেয়ে থাক্‌তুম। এ অশথ্‌ বয়সে শিশু, এর কোন বিপুলতা নেই, বাহুল্য নেই, পূর্ণতা নেই। পাপিয়া এসে এর পাতার আড়ালে ব'সে সুরের আলাপ জমায় না, মাঠের পথিক এসে এর ছায়ার তলায় আশ্রয় খোঁজে না, কবির দৃষ্টিও এর মধ্যে সৌন্দর্য্যের সমারোহ পায় না। কিন্তু তবু, সবুজের এই বিন্দুটিকে দেখ্‌লেই, আমার মনের ভিতরে সুদূর বনভূমির হারানো শ্যামল স্মৃতিটুকু যেন পরিপূর্ণ মহিমায় জেগে উঠ্‌ত! একে আশ্রয় ক'রেই আমার মন যেন ইটের কোটর ছেড়ে, কোথাকার কোন্‌ বনে-বনান্তরে, মাঠে-তেপান্তরে, ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে স্রোতস্বিনীর কূলে কূলে পথহারা পথিকের মতন হেসে-গেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

গ

সেদিন রেণু এসে হঠাৎ আমার ছোট ঘরখানিকে আক্রমণ কর্‌লে। চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বল্‌লে, —"মাগো, ঘরময় খালি ধূলো—কেতাবে ধূলো, কাগজে ধূলো, টেবিলে ধূলো! এই ধূলোতে আছ কি ক'রে,—তুমি মানুষ, না জন্তু?"

আমি বল্‌লুম, "প্রিয়তমে, যখন তোমার স্বামীত্ব লাভ করেচি, তখন আমি যে কি তা তুমি ভালো রকমই জানো! অতএব আমাকে জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য মাত্র!"

—"কিন্তু এই ধূলোর দিকে কি তোমার চোখও পড়ে না গা?"

—"সখী, আমার নজর এত ছোট নয় যে, বীণাপাণির কমলকুঞ্জ ছেড়ে সে এই তুচ্ছ ধূলো-জঞ্জাল নিয়েই মেতে থাক্‌বে।"

—"থামো কথার ভট্টাচায্যি, থামো! কথা বেচে যে খায়, তার সঙ্গে দু'টো কথা কয়েও সুখ নেই! এখন স'রে বসো দেখি, ধূলোগুলোকে ঝেঁটিয়ে চুলোয় পাঠিয়ে দি!"

এই ব'লে রেণু হাতের চুড়ি রুণু-রুণু বাজিয়ে, চট্‌পট ঝাড়ন চালিয়ে ঘরখানাকে সাফ্‌ ক'রে ফেল্‌লে। তারপর জঞ্জালগুলো জান্‌লা গলিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়েই ব'লে উঠ্‌ল—"ওকি!"

—"অমন কর্‌লে কেন?"

—"ছাতের ওপরে অশথ্‌ গাছ গজিয়েচে!"

—"তা গজিয়েচে বৈকি!"

—"আর তুমি চুপচাপ ব'সে আছ?"

—"ছাতের ওপরে অশথ্‌ গজালে চুপচাপ না থেকে চেঁচিয়ে বাড়ী মাৎ কর্‌তে হয় নাকি?"

—"যাও, যাও—"

—"যাব আবার কোথায়?"

—"একখানা কাটারি নিয়ে এস!"

—"কাটারি!"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! এইবেলা শীগ্‌গির ওটাকে কেটে ফেল, নইলে ভালো ক'রে শেকড় গেড়ে বস্‌লে, কাট্‌লেও আবার ও গজাবে!"

—"আহা, ও কাটাকাটিতে আর কাজ কি! একটা ছোট গাছ—"

—"আহা, কি বুদ্ধি তোমার, বলিহারি যাই! খালি বই লিখেই বাহাদুরি নেবার ফিকিরে আছ,—আর এটুকু বুঝচ না যে, ঐ অশথ্‌ যদি একবার শেকড় গেড়ে বসে, তাহ'লে বাড়ীর ভিত্‌ নড়বোড়ে হয়ে পড়বে?"

—"হুঁ, হুঁ,—ঠিক! আচ্ছা, আনো তবে কাটারি!"

ছয়

কাটারি নিয়ে ছাদে গেলুম।

নতুন বর্ষার জল পেয়ে তরুণ অশথ দিব্যি তাজা হয়ে উঠেচে। নিজের ছোট ছোট পর্ণপুট বাড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল—আকাশের নবীন মেঘের কাছ থেকে যেন আরো তৃষার জল পাবার আশায়।

মনে মনে বল্লুম—'ওরে দুষ্ট, ভিতে ফাট্ ধরাবার ফিকিরে এখানে তুমি জাঁকিয়ে বসেচ? রও, দেখ্চি তোমাকে!"

মাথার ওপরে কাটারি তুল্লুম।

—আচম্বিতে একটা দম্‌কা হাওয়া এল—সঙ্গে সঙ্গে অশথের চারা থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল!

মনের ভেতর থেকে যেন কে ব'লে উঠ্‌ল—'আহা, আহা,—কর কি! তোমার এই ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপে ও যে বনলক্ষ্মীর শ্যামল বার্ত্তা বহন ক'রে এসেচে - তোমাদের শুক্‌নো, তৃষিত প্রাণকে স্নিগ্ধ-সরস কর্‌বে ব'লে। কোন্ প্রাণে একে তুমি কাট্‌বে? দেখ, তোমার মত এরও জীবন আছে! রোদে এও এলিয়ে পড়ে, আলোতে এও খুসি হয়, দখিনায় এও নাচে-গায়, তেষ্টায় এও জল চায়,—একে মেরো না, একে মেরো না!'

কাটারিখানা নামিয়ে, অশথের চারার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখনো তার কাঁপুনি থামে-নি! ছোট ছোট পাতায় অতি-মৃদু মর্ম্মরানি শুনলুম—যেন ভয়ের আর্ত্ত-বাণী!

জান্‌লা থেকে রেণু ডেকে বল্‌লে, "হ্যাঁগা, অবাক হয়ে ভাব্‌চ কি? ও আপদ চুকিয়ে দাও না!"

নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেরই হাসি এল। সামান্য একটা অশথের চারা, তাও কাটতে আবার এত ইতস্তত! ... ... তুল্‌লুম কাটারি, মার্‌লুম তার গোড়া ঘেঁসে এক কোপ্!

অশথের ছোট চারাটি ছিট্‌কে আমার পায়ের ওপরে এসে লটুকে পড়ল!... ... পা ভিজে গেল তার কাটা দেহের রসে... ... ... না, সে তো রস নয়, আমার মনে হোলো, পায়ের ওপর দিয়ে যেন কোন্ হত্যা-করা জীবের রক্তধারা গড়াচ্ছে!

আঁৎটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল! কোনদিকে না চেয়ে তাড়াতাড়ি আমি পালিয়ে এলুম—দোষীর মত, খুনীর মত!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# চয়ন

## পীয়ের লোটি

গল্প-সাহিত্যের নিপুণ ওস্তাদ যাদুকর পীয়ের লোটি আর ইহলোকে নাই। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ফ্রান্সের নয়, সারা বিশ্বের সাহিত্যের দারুণ ক্ষতি হইল বলিয়া একটা সংবাদ বিলাতী কাগজে বাহির হইয়াছিল। পরে জানা গেল, সে সংবাদ সত্য নয়! ভগবান পীয়ের লোটিকে দীর্ঘজীবী করুন!

তাঁর প্রথম উপন্যাস, An Iceland Fisherman (আইস্‌ল্যাণ্ডের ধীবর)। এ গ্রন্থ পড়িয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল, সমাজের এই-সব উপেক্ষিত অবহেলিত জীবের মনের এত খপর তিনি জানিলেন কি করিয়া! গরীবদের উপর মমতায় সহানুভূতিতে তাঁর লেখনী যেন গলিয়া পড়িয়াছে। পরের গ্রন্থগুলিতে,—Oriental Phantoms, Jerusalem এবং Romace of a Spahi—তিনি প্রাচ্য দেশের নর-নারীর যে মনস্তত্ত্বের ছবি ফুটাইয়া ধরিয়াছেন, তাহার সূক্ষ্ম কারিগরি দেখিয়া প্রাচ্য দেশের পাঠক-পাঠিকাও চমৎকৃত।

পীয়ের লোটি লেখকের ছদ্ম নাম;—আসল নাম জুলিয়াঁ বিয়ো (Julien Viaud)। সম্প্রতি বুধাপেস্তের "জর্ম্মান-হাঙ্গারিয়ান ডেলি" পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে একটি আলোচনা বাহির হইয়াছে। এই পত্রিকার লেখক বলিয়াছেন, পীয়ের লোটির মানব-চরিত্রে জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি

আর ব্যঞ্জনার নিপুণ কারিগরি এতই অসাধারণ যে তাঁর সমসাময়িক আর কোন লেখকে তেমন দেখা যায় না। জাপানের কথা তিনি যেমন করিয়া বলিয়াছেন, লাফ্‌কাডিয়ো হার্ণও তেমন পারেন নাই! তাঁহার অঙ্কিত মোস্‌লেম চিত্রের পাশে জেরার্ড দ্য নার্ভাল ও থিয়োফিল গতিয়ের আঁকা ছবিও ম্লান, নির্জ্জীব বলিয়া মনে হয়। প্রচুর সহানুভূতি ও সহমর্ম্মিতায় তাঁর প্রাণ পরিপূর্ণ। এমন দরদী বলিয়াই বিদেশ বিজাতির সব ব্যবধান ঘুচাইয়া মানুষের মনে যেখানে সব ভেদের মায়া কাটাইয়া চিরন্তন সত্য এক হইয়া ফুটিয়াছে, তাহারই মধ্যে এমন অবাধে তিনি প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন! শুধুই কি তাই? বিজাতির বিদেশীর বাহিরের আচার-সংস্কারের আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যকার অন্তরটিকে দেখিবার শক্তি তাঁর একেবারে অমানুষিক—এমনি অসাধারণ দৃষ্টি যে যখন যে-দেশের যে-জাতির ছবি তিনি আঁকিয়াছেন, তখন সে দেশের সে জাতির লোকে সে ছবি দেখিয়া তাঁহাকে ভাই বলিয়া মানিয়া লইয়াছে! তাঁর বারাণসী হিন্দুর চোখে নির্ম্মল, শান্ত শ্রীতে সমুজ্জ্বল। যদি কেহ পরিচয় চান, তাঁহাকে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ' পড়িতে বলি। এখানি পীয়ের লোটির মূল ফরাসীগ্রন্থের চমৎকার অনুবাদ।

The Disenchanted উপন্যাসে তিনি তুরস্কের একটি সুললিত ছবি আঁকিয়াছেন। এ গ্রন্থের নায়ক একজন ফরাসী নভেলিষ্ট—কনস্তান্তিনোপ্‌লে থাকেন। এক তুর্কী রাজকন্যা তাঁহাকে হৃদয় দান করিয়াছেন,—এবং এই নায়কের নির্ম্মল ও গোপন প্রেমের জন্য তিনি প্রাণ দিলেন। তুরস্কের পুরু পর্দ্দার আড়ালে অবরোধবাসিনী তুর্কী রাজকন্যা—যিনি বাহিরের বিশ্বের কোন খপরই জানেন না, হারেমের বন্দিনী হইয়াই যাঁর জীবনের দিন গড়াইয়া চলিয়াছে—সেই রাজকন্যার ছবি এমন কোমল মিহি তুলির টানে সহানুভূতির স্নিগ্ধ ধারায় এমন করুণ করিয়া তিনি আঁকিয়াছেন, যে সে ছবি দেখিবামাত্র চক্ষু সজল হইয়া ওঠে! বন্দীগৃহ ছাড়িয়া বাহিরে মুক্ত বাতাসে যাইবার জন্য তুর্কী রমণীর কি দারুণ আগ্রহ! অথচ মুসলমানের আচার বা আদব-কায়দার বিরুদ্ধে কোথাও একটি বক্র কটাক্ষ নাই, এতটুকু অসম্ভ্রম নাই!

এই উপন্যাসেরই এক জায়গায় আছে, একদল তুর্কী রমণী এই নায়ক ফরাসী ঔপন্যাসিকের সঙ্গে গল্পগুজব করিতেছে। মেয়েদের মধ্যে একজন বলিল, "শুনচি, আপনি নাকি একখানি উপন্যাস লিখবেন, এই বিংশ শতাব্দীর তুর্কী নারীর পক্ষ নিয়ে?" আর একটি মেয়ে বলিল, "বইয়ের নাম কি রাখবেন?" নায়ক বলিলেন, "সেটা এখনো ঠিক করিনি—তবে এখন মনে হচ্ছে, নাম রাখবো, The Disenchanted বা মোহ-ভঙ্গ।" এ কথার উত্তরে প্রথম মেয়েটি কতক আত্মগতভাবেই বলিলেন, "মোহ-ভঙ্গ! মোহ ভাঙ্গে কার? যার মোহ ছিল কোন দিন জীবনে,—যে-জীবন সে বহন করেছে! আমরা তুরস্কের নারী, আমরা এখন প্রথমে বাঁচতে চাই যে! আমরা জীবন নিয়ে বাঁচলুম কবে যে জীবনের মোহ ভঙ্গ হবে! আমরা ত কারাগারে বাস করচি, বদ্ধ আলো-হাওয়ার দূষিত দুর্গন্ধ নরকে!"

প্রাচ্য জাতির জীবনের কাব্যের দিকটা মনোরম ছন্দে লোটির রচনায় বাজিয়া উঠিয়াছে! গভীর নিশীথে নিদ্রামগ্ন কনস্তান্তিনোপ্‌লের তিনি বর্ণনা করিয়াছেন,—'চাঁদের স্নিগ্ধ শীতল আলো গায়ে মেখে শুয়ে আছে ইস্তাম্বুল। প্রকাণ্ড হ্রদের জলে চাঁদ তার ছায়া ফেলেছে—ছবিখানির মত। এই জলে এই পরিচিত ছবি চাঁদ তো নিত্যই ফুটিয়ে তুলচে, তবু যখনই দেখ, এ নতুন লাগে, অপরূপ আভায়। চারিদিককার স্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে শুধু একটি শব্দে—এ শব্দ প্রতিরাত্রেই, সে অমন কত কত শতাব্দী ধরে জেগে আসচে ইস্তাম্বুলের বুকে—সে শব্দ, ট্যাক্‌, ট্যাক্‌, ট্যাক্‌—জনহীন পথগুলোর মধ্যে এর প্রতিধ্বনি এক রহস্যের মতই বেজে উঠল! প্রহরী তার ভারী লাঠি পথের পাষাণ বুকে ঠক্‌ ঠক্‌ করতে করতে চলেছে। গভীর নিদ্রার মধ্যে এই একটি মূর্ত্তি শুধু সজাগ! দিকে দিকে প্রহরীর লাঠির ঘায়ে রহস্যের ফুল ফুটে চলেছে! কনস্তান্তিনোপল্‌ ভরে, বস্‌ফরাস্‌ আর মর্ম্মর সাগরের নির্ম্মল বুকের উপর দিয়ে এই সুর বেজে চলেছে—যেন সে সকলকে বলচে, 'ঘুমাও গো, নিশ্চিন্ত মনে পরম শান্তিতে ঘুমাও সকলে। আমরা জেগে পাহারা দিচ্ছি—ভয় নেই, কারো ভয় নেই!'

তুরস্কের দোষের ইঙ্গিত দিলেও মোসলেমকে তিনি হৃদয়হীনের মত অবজ্ঞার কালি ছিটাইয়া কোথাও কালো করিয়া আঁকেন নাই! তুরস্ক নারীর দুঃখে গলিয়া তাঁহাদের শুভ ও উন্নতি কামনায় তিনি উৎসাহ দিয়াছেন চিরদিন,—উন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তিনি সম্মান করিয়াছেন। ঋষির দিব্য দৃষ্টিতে তিনি তুরস্কের ভবিষ্যতের ছবি দেখিয়া তাহারও আদ্‌রা আঁকিয়া দিয়াছেন—ইস্তাম্বুল কি করিয়া একদিন দিব্যরূপে জাগিয়া উঠিবে। তুরস্কের জয়োল্লাসে তিনিও উৎসব-আনন্দ করিয়া ছিলেন। সমস্ত পৃথিবী যখন কনস্তান্তিনোপ্‌লের পতনের লক্ষণ দেখিয়াও তাহা আসন্ন বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়াছিলেন, তুরস্কের সে দুর্দ্দিনেও তিনি আশা ছাড়েন নাই। তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে—তাঁহার তুরস্ক-স্বপ্ন সফল হইয়াছে! তুরস্ক তাঁহার অঙ্কিত ছবির মতই আবার গৌরবের মহিমায় উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিবার সূচনা দেখাইয়াছে।

শ্রীশিশিরকুমার রা।

—

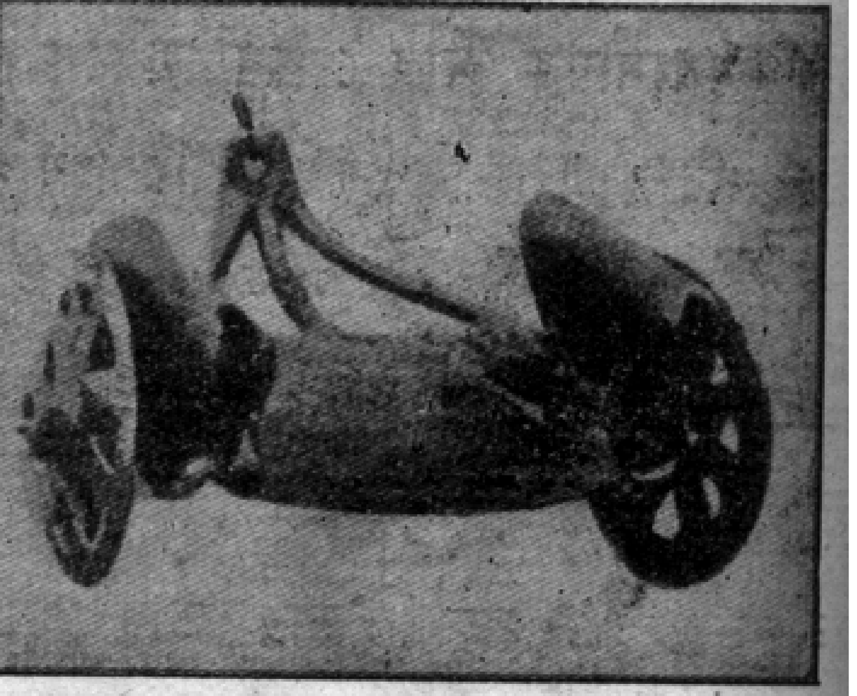
## প্রাচীন তক্ষশীলা

দুই হাজার বৎসর ভূগর্ভ-বাসের পর সম্প্রতি তক্ষশীলায় এক প্রাচীন গ্রীক মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দিরটি রাওল পিণ্ডি হইতে বিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।



প্রথম তক্ষশীলা ভীরমণ্ড। সেকন্দর এইখানে আসিয়াছিলেন।

সেখানে একটি ফুলদানীতে সেকন্দরের মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই তক্ষশীলা মহামানবের মিলন-তীর্থ। নানা জাতির মিলন আর সংঘর্ষে তক্ষশীলা ভারত-সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরাট স্মৃতিমন্দির। এই নবাবিষ্কার স্যর জন মার্শালের (Director-General of Archeology in India) প্রভৃত অধ্যবসায়ের ফল। স্যর জন্ মার্শাল বলেন, তক্ষশীলার নাম গ্রীক সৈন্যের মুখে 'ট্যাক্সিলায়' রূপান্তরিত হয়। এইখানে দারায়ুস আসিয়া একদিন অবতীর্ণ হন,—পুরুর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হয় এইখান হইতেই; এইখানেই মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসকে পরাস্ত করেন; তারপর আণ্টিওকাসের জামাতা দেমেত্রিয়াস আসিয়া তক্ষশীলা অধিকার করেন; দেমেত্রিয়াসের পর প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া তক্ষশীলা গ্রীক রাজার অধীনে ছিল। তারপর সাইথিয়ান ও পার্থিয়ানেরা আসিয়া তক্ষশীলার বক্ষ অসির ঝঞ্ঝনায় চকিত বিধ্বস্ত করিয়া তোলে; তারপর প্রথম শতাব্দীতে (খৃষ্টাব্দ) চীনের প্রান্ত হইতে আসে কুশাণেরা। তারপর কণিষ্ক আসিয়া তাঁহার বিজয়-নিশান এখানেই প্রথম উড়াইয়া দেন। কণিষ্কের পর বর্ব্বর হূনেরা যথেচ্ছাচারে তক্ষশীলাকে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত করে।



খেলার গাড়ী

আসল প্রাচীন সহর ভীরমণ্ডের নীচে এখনো ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। তার উপর যে তক্ষশীলা গড়িয়া ওঠে, সে তক্ষশীলাও সেকন্দরের ভারত-আক্রমণের পূর্ব্বে ভূগর্ভে চলিয়া যায়। সেকন্দর তার উপরকার তক্ষশীলায় আসিয়া উপস্থিত হন। সে সময়ের ঐতিহাসিকেরা এই তৃতীয়



সেকন্দরের মূর্ত্তি

তক্ষশীলার কথাই ইতিহাসে লিখিয়া যান্—এবং আজ প্রায় দু' হাজার বৎসর পরে এই তৃতীয় তক্ষশীলাই ভূ-গর্ভ-বাস ত্যাগ করিয়া লোকচক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাটীর তৈয়ারী নানা দ্রব্য সেখানে পাওয়া গিয়াছে—এবং সেই সঙ্গে ভগ্ন ফুলদানী পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর সেকন্দরের মূর্ত্তি খোদা। তাছাড়া মাটীর ভাঁড়, সরা, মূর্ত্তি, মুদ্রা এবং মণি-মাণিক্যও অট্টালিকা-সমূহের ভগ্ন-স্তূপের মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে বিস্তর।

এই তৃতীয় তক্ষশীলার উপর যে নগর এখন বর্ত্তমান সে নগরের নাম সিরকাপ্ বলিয়া পরিচিত। এ নগর গঠন করে বাক্ট্রিয়ান্ গ্রীকেরা—প্রাচীন তক্ষশীলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তাম্রা নদীর ধারে। এ নগর পরে সাইথিয়ানেরা ধ্বংস করে এবং তাহার পুনর্গঠন করে পার্থিয়ানেরা। তাহার ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে পার্থিয়ান শাসনকর্ত্তার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এ প্রাসাদের গঠন খোর্সাবাদের আসীরিয় পদ্ধতির। তাছাড়া জৈন ও বৌদ্ধদের বহু গৃহের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। খুব মজবুত তার গড়ন—আর তাহাতে নানা কলাকৌশলও বর্ত্তমান। প্রতি গৃহেই প্রায় তাহ্খানা বা হাওয়া-ঘরের বন্দোবস্ত আছে। তাছাড়া প্রকাণ্ড এক অট্টালিকার চিহ্ন দেখা গিয়াছে, বৃহৎ তার কক্ষ। যে প্রান্তে অবস্থিত তাহা হইতে এবং কক্ষগুলির পরিমাপ দেখিয়া অনুমান হয়, এইটিই তক্ষশীলার অতি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ।

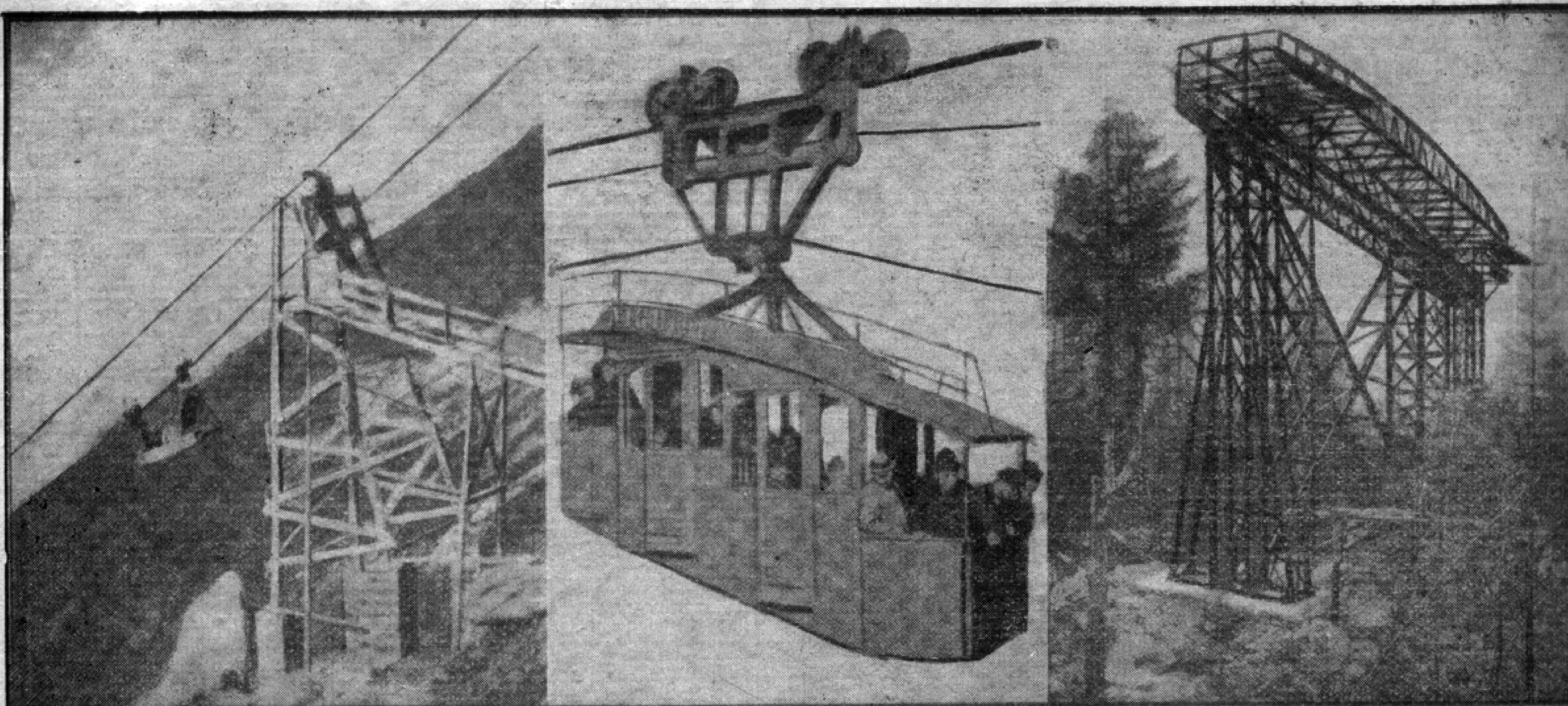
তাছাড়া গ্রীক আদর্শে গড়া বহু মন্দির ও বহু বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৌদ্ধ স্তূপের উপর পঙ্খের কাজ এমন চমৎকার যে ধূলা ঝাড়িতেই তার ঔজ্জ্বল্যে চোখ ঝলসিয়া ওঠে। মোহ্রা-মোরাদু ও জওলীয়ানের স্মৃতি-স্তূপের ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্য আরও বেশী। এগুলি খৃঃ অব্দ পঞ্চম শতাব্দীতে গঠিত। গায়ে নানা মূর্ত্তি-খোদিত অসংখ্য প্রাচীর-পরিখা গুপ্ত রাজগণের আধিপত্য-কালের শিল্পকলার উৎকর্ষেরই পরিচয় দেয়। কালের প্রভাব আর বিদেশী বর্ব্বরের অত্যাচারের হাত এড়াইয়া মাটীতে গড়া এই সব মূর্ত্তি আর প্রাচীর এখনো যে এমন অটুট্ রহিয়াছে, ইহা সৌভাগ্যের কথা, সন্দেহ নাই। মাটীর খোদা মূর্ত্তিগুলি এমন পরিষ্কার আর সুস্পষ্ট যে নিতান্ত সাধারণ মূর্খ লোকও সেগুলি বেশ বুঝিতে পারে। বহু মূর্ত্তিই কাব্যকলার ছাঁচে গড়া—সেকালের সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়ও ইহা হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীপৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়।

---

## মেঘ-লোকের খাঁচা-রেল

ঠাকুমার গল্প নয়, মেঘ-লোকে যাবার জন্য অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক কায়দায় খাঁচা-রেল তৈরী হচ্ছে। সুইজার-লণ্ডে ব্লাঙ্ক পাহাড় খুব উঁচু, বছরের মধ্যে দশ মাস তুষারে ঢাকা থাকে। সেই ব্লাঙ্ক পাহাড়ের উঁচু শিখরে রেল-পথ তৈরী হচ্ছিল, এমন সময় মহাসমর বাধার দরুণ সে কাজ বন্ধ হয়। এখন আবার সেদিকে বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়েছে। এ রেলপথ যেমন অপূর্ব্ব, তেমনি অপূর্ব্ব এ পথের গাড়ী; আর আরো অপূর্ব্ব উপভোগ্য হবে এ পথের যাত্রীদের চোখে চারিদিককার দৃশ্যাবলী। আপাততঃ স্থির হয়েছে,—মণ্ট ব্লাঙ্কে ১১৬৪৭ ফুট উপরে 'কোল স্থ মিদি' শিখরে একটি হোটেল থাকবে—অগষ্ট মাসে সেখানে লোকজন গিয়ে বাস করবে, আমোদ-আহ্লাদ করবে। সেখানে তার বন্দোবস্তও প্রচুর থাকবে। দেশের গ্রীষ্ম-তপ্ত সমতল ভূমি ছেড়ে এই মেঘলোকের পথে যাত্রীরা



মণ্ট ব্লাঙ্কের খাঁচা-রেল। বামে পিরী-পৈঁইতু ষ্টেশন; মাঝে কুড়িজন আরোহী-বোঝাই গাড়ী; ডাহিনে আশ্রয়-স্তম্ভ।

রেলে চড়ে দেড় ঘণ্টার মধ্যে একেবারে মরুর মত তুষার-শীতল পাহাড়ের শৃঙ্গে এসে পৌঁছবে। গড়ানে তুষার-স্তূপের (avalanche) চাপে মারা পড়বার কোন ভয় নেই—কারণ ঝুলো লাইনে গাড়ী চলবে।

কয়েকটা শৃঙ্গে তার (cable) লাগানো হবে। বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানা ( electric power station ) বসবে ৫৪৭৮ উঁচু পাহাড়ের বুকে পিরী পৌঁইতুতে। ৮২ থেকে ৪৭৫ ফুট অন্তরে থামের মাথায়-মাথায় তার লট্‌কানো থাকবে। নীচে থেকে এই তারে ঝোলানো গাড়ী করে যাত্রীরা ওপরে উঠবে। প্রথম দফায় যাত্রা শেষ হবে ৬৫৬০ ফুট উঠে। এই অবধি যে গাড়ী আসবে, তাতে কুড়িজন লোক একসঙ্গে বসতে পারবে। এ যাত্রা সুরু হবে নীচে লি বুসোঁ ষ্টেশন থেকে; আর গাড়ী এসে থামবে পিরী পৌঁইতুতে। তার পর এখান থেকে দ্বিতীয় যাত্রা সুরু করে যাত্রীরা এসে পৌঁছবে আরো ৪৫৯২ ফুট উঁচুতে এগিল্ ছুড়ু সিডিতে। এখান থেকে চারিদিককার দৃশ্য দেখ্‌লে যাত্রীরা মুগ্ধ তন্ময় হয়ে যাবে। তুষার-ধবল গিরিমালা—কোথাও সীমাহীন প্রান্তর, কোথাও উঁচু-নীচু শৃঙ্গের রাশি—আর তুষারের নানা বর্ণে চারিধারে কি বিচিত্র বাহার!

এই জায়গায় এসে যাত্রীকে কয়েকদিন থাকতে হবে, এখানকার খুব ঠাণ্ডা জল-হাওয়া সহ্য করে নেবার জন্য। কেন না, এর ওপর থেকে বায়ু এত ঘন আর শীত এমন প্রচণ্ড যে চট্ করে যাত্রীরা তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে মারা যেতে পারে। এখান থেকে সর্ব্বোচ্চ শিখরে যেতে যে গাড়ী চড়তে হবে তা অনেকটা ঝুড়ির মত দেখতে, আকারে ছোট। এ গাড়ীতে সবশুদ্ধ ষোল জন লোক ধরবে। এখান থেকে ২১৩০ ফুট পথ টানা গিয়ে ৫০০ ফুট glacierএর উপর দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে গাড়ী চলবে। এ পথটুকু খুবই বিপদ-সঙ্কুল। চতুর্থ ষ্টেশন ৯৩৮১ ফুট উঁচুতে—এইখানে এসে যাত্রী বুঝবে আল্পস্ পর্ব্বতে চড়া ব্যাপারখানা কি! এখান থেকে ১১৬৪৭ ফুট উঁচুতে কোল দ্যু মিডি। একটি দোলে চতুর্থ ষ্টেশন থেকে কোল্ দ্যু মিডির হোটেলে পৌঁছুনো শক্ত বলে মাঝ-পথে অর্থাৎ ঠিক আধাআধি জায়গায় একটি থামের প্রয়োজন তাকে আশ্রয় দেবার জন্য। এই আশ্রয় লোহার থামে কড়ি জয়েষ্ট লাগিয়ে নীচেকার পাহাড়ের গা থেকে তুলে দাঁড় করানো হবে। ওপরের হোটেলে ত্রিশজন লোকের থাকবার ব্যবস্থা হচ্ছে—রাত্রিবাসের ইচ্ছা করলে যাত্রীরা অনায়াসে সেখানে থাকতে পারবে—খাবার-দাবার নীচে থেকে আনানো হবে।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য যে খুবই চমৎকার তা সহজেই অনুমান করা যায়। দক্ষিণে প্রকাণ্ড তুষার-ক্ষেত্র। এই তুষার গলে বিস্তীর্ণ গিয়ান্টের গ্লেসিয়ারের সৃষ্টি করেছে—এই গ্লেসিয়ারই বিশ্ববিখ্যাত ম্যর দি গ্লেস। অগষ্ট মাসে শীতোপযোগী সকল রকম আমোদ-আহ্লাদ খেলাধূলার ব্যবস্থাও হোটেলে থাকবে। যাত্রীরা এখান থেকে গাইডের সাহায্যে আরো এক হাজার ফুট উপরে অবধি ঘুরে আসতে পারবে।

এই রেল-পথ বা গাড়ী সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে বলে কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দিচ্ছেন—কোনরকম বিপদের আশঙ্কা নেই। তার যদি ছিঁড়েও যায়—তাহলে সংলগ্ন দ্বিতীয় তারে গাড়ী আটকে পড়ে তখনি থেমে যাবে। এবং মুহূর্ত্তে পাওয়ার-হাউসে সুইচ্ টিপে দিলে পাকানো তারের থাম থেকে নতুন তার এসে গাড়ীকে ঝুলিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। এরই নাম জীবন! আমরা সত্যই মরে আছি!—এই ত হিমালয়, আমরা তার কোনোদিক দেখবার চেষ্টাও করেছি কি? সে সাহস বা উদ্যম আমাদের কোথায়!

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

---

## চোখ রগড়ানো

চোখে কিছু পড়লে বা চোখ শ্রান্ত হলে অনেক সময়ই আমরা চোখের উপর আঙুল টিপে খুব নির্দ্দয়ভাবেই চোখ রগড়াই। তার ফল হয় এই, কিছুক্ষণ চোখে সব ঝাপ্‌সা দেখি,—অনেক সময় চোখ রগড়ানোর ফলে দৃষ্টিও ক্ষীণ বোধ হয় আর চোখে ব্যথা হয়, চোখ লাল হয়ে ওঠে। এর কারণ, আমাদের চোখের শিরা খুব পাৎলা; চোখ টিপে জোরে রগড়ালে চক্ষু-গোলককে তার ঠিক জায়গাটিতে ধরে দিতে শিরাগুলির কিছু সময় লাগে। হাতের পায়ের বা অন্য অঙ্গের শিরার মত চোখের শিরা খুব জোরালো নয়—বেশী ঘাঁটাঘাঁটিতে বা দলনে এ সব শিরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। এদের শক্তি বাড়াবার সুযোগ নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই চোখের উপর বেশী চাপাচাপি করলে এই শিরাগুলি শীঘ্রই নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হয়। প্রথম বার চোখ ঐ রকম রগড়ালে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা ভাব কাটিয়ে শীঘ্রই স্বচ্ছ হয় কিন্তু দ্বিতীয়বার রগড়ালে পূর্ব্ব দৃষ্টি ফিরে পেতে একটু দেরী লাগে। এই রকম বার বার রগড়ালে শেষে চোখ জ্বালা করে। এর ফলে চোখ খারাপ হয়। ঠিক ভাবে চোখ রগড়ালে চোখের শিরায় আঘাত লাগে না—চোখও খারাপ হয় না। এইখানে দু'খানি ছবি দেওয়া গেল। চোখ যেভাবে আমরা রগড়াই সেটা চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। সে ধারা ত্যাগ করে ঠিক কিভাবে চোখ রগড়ানো উচিত, পাশে তার ছবি দেখে সকলে সতর্ক হোন্।



ভুল চোখ রগড়ানো



ঠিক চোখ রগড়ানো

শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী।

---

## বিচিত্র কর্ণাভরণ

আমাদের বাংলা দেশে সেকালে মেয়েদের কাণে পাঁচ-ছটা ফোঁড় ফুঁড়ে মাকড়ি পরার রেওয়াজ খুবই ছিল। সৌভাগ্যের বিষয় একালে ওরকম নিষ্ঠুর প্রথায় গহনা পরা উঠে যাচ্ছে। অঙ্গ বিদারণ করে অলঙ্কার পরার রীতি অসভ্য দেশেই খুব দেখা যায়। নাক ফুঁড়ে গহনা পরা, কাণ ফুঁড়ে মোটা সোলার ছিপির মত কর্ণাভরণ পরা আফ্রিকা-অষ্ট্রেলিয়ার বুনো জাতদের মধ্যে এখনো জোর ফ্যাশনে চলছে। এদেশের মাড়োয়ারী বা বেহারী মেয়েদের মধ্যে কাণে ভীমমূর্ত্তি কর্ণাভরণ পরা এখনো চলিত দেখা যায়। এই গহনা পরার চোটে অনেকের কাণের ডগা ছিঁড়ে যায়, এ দৃশ্যও আমাদের মধ্যে অনেকেরই চোখে পড়েছে। তারপর দৈব দুর্ঘটনায় যদি ঐ মাকড়ি কি নতের সঙ্গে কিছু আটকে টান্ পড়ে, তাহলে—ভীষণ ব্যাপার! বোর্ণিও দ্বীপের মেয়েরা কাণে একেবারে অসংখ্য



বোর্ণিও-নারীর কাণের অলঙ্কার

খুরি-ঝোলানো-গোছ ভূষণ ব্যবহার করে। এ ভূষণটি সেখানকার রমণীদের অত্যন্ত প্রিয়। চলবার সময় দুই কাণে এমনিভাবে বোঝা ঝুলোলে চলায় আমোদ হয় কতখানি, আর বাহারও খোলে কেমন, সোনার শীল-নোড়া গলায় ঝোলাতে প্রস্তুত, সৌখীন নারী-সমাজ ( যদি এখনো বাংলা দেশে তা থাকে ) একবার সেটা ভেবে দেখুন।

পরী।

---

## জাপানের কেরামতি

এই যে জাপান আজ আমাদের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে,—ছুঁচ সুতা দিয়াশলাই হইতে খদ্দর বস্ত্র অবধি জোগান্ দিতেছে, ইহার মুলে বাক্যবাগীশতার গন্ধও নাই! জাপানীর মত পরিশ্রমী জাত্ পৃথিবীতে আর নাই, তার মত উদ্যোগীও কেহ নয়,—শুধু এই জন্যই গত যুদ্ধের সময় হইতে জাপান পৃথিবীর বাজারে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য চালাইতে পারিয়াছে। চিম্‌নি চাই,—জাপান দিবে। কাপড় চাই,—জাপান আছে। খেলানা চাই,—চাও জাপানের কাছে। এক কথায় প্রয়োজনীয় যত জিনিষ, সখের জিনিষ জাপান আজ সবই সরবরাহ করিতেছে। অদ্ভুত জাপানের কেরামতি! পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দাঁতের খোড়কেটুকু হইতে সব জিনিষের জন্য আজ আমরা জাপানের মুখ চাহিয়া আছি। আমরা যখন 'খদ্দর বোনো' বলিয়া বক্তৃতা সুরু করিলাম—কথার আগুনে বিশ্ব পোড়াইতে উদ্যত,—জাপান তখন সুযোগ বুঝিয়া খদ্দর বোনা সুরু করিয়া দিল—এবং জাহাজ-জাহাজ খদ্দর-বস্ত্র আসিয়া ভারতের বাজার ভর্ত্তি করিয়া ফেলিল। জাপান বিদেশের কাছে জিনিষ লয় অল্পই—অপরকে সে জোগায় মাল, আর তার বিনিময়ে লয় টাকা। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে জাপান আজ আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়াছে।

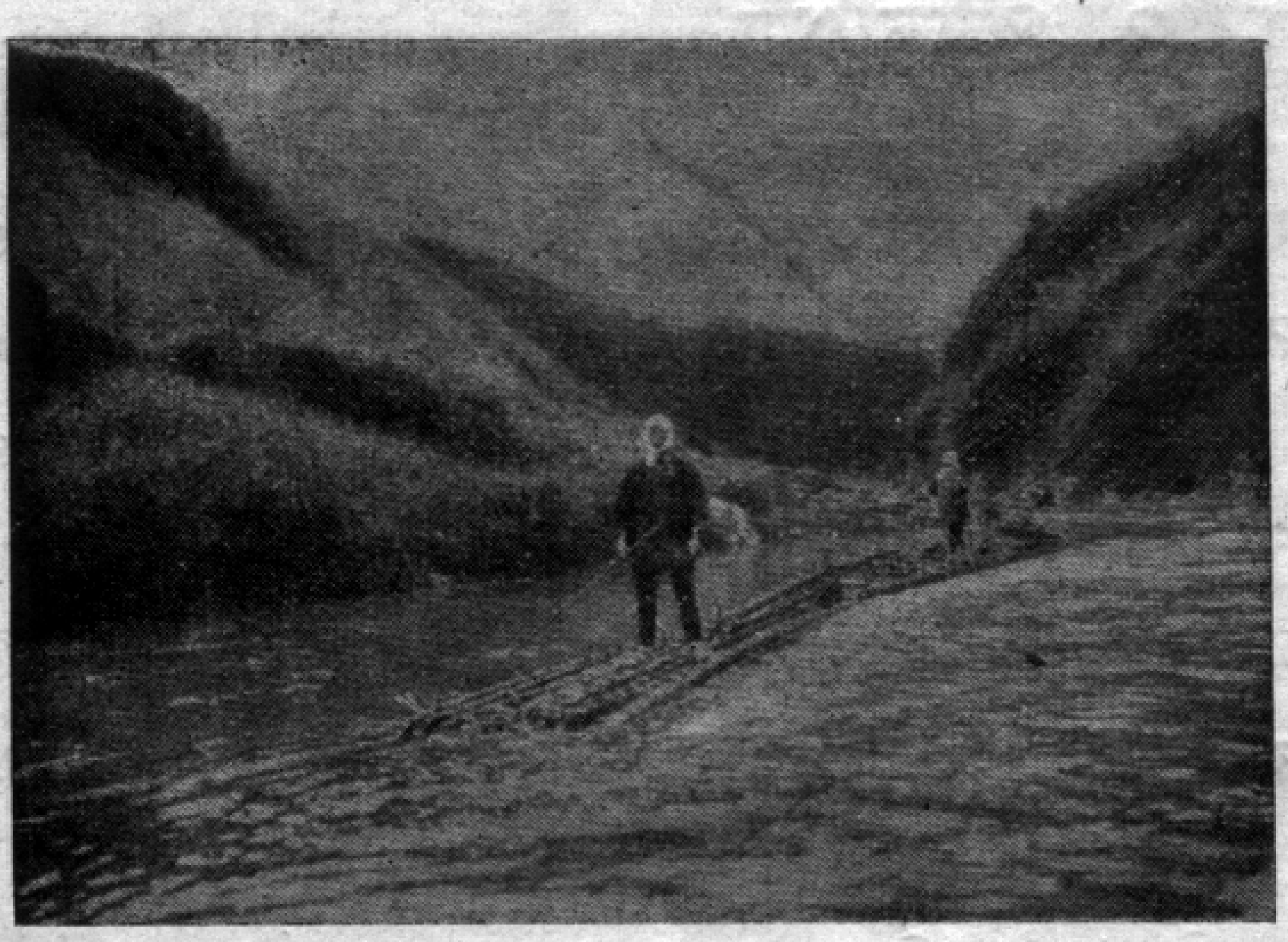
জাপানে পশম ছিল না—সেজন্য জাপান পরের দোকানে পয়সা ছড়াইতে যায় নাই। বিনা পশমেই সে দিন কাটাইতেছিল; তারপর যখন সে দেখিল, পশম চাই-ই, তখন পশম তৈয়ার করিতে মন দিল।

আসল কথা জাপানীর অভাব অল্প। অল্প আহারে সে তুষ্ট। সে ভাত খায়, চাল নিজের দেশে জন্মায়—আর খায় মাছ,—সে মাছ সমুদ্রে ধরে। দেশে চাল এত হয় যে জাপান অবাধে চাল রপ্তানি করিতে পারে এবং সময় সময় তা করিয়াও থাকে।

জাপানে কয়লার খনি অল্পই আছে। জাপান জঙ্গলের



জাপান জগতের অর্দ্ধেক সিল্ক জোগায়



জলধারার শক্তি-রোধী নির্ভীক জাপানী

কাঠ পুড়াইয়া কয়লা আনে,—আর কল চালাইবার শক্তির জন্য সে কয়লার প্রত্যাশায় বিদেশের জাহাজের দিকে হাঁ করিয়া থাকে না—পাহাড় কাটিয়া জল আনিয়া, সাগর সেঁচিয়া জল তুলিয়া সেই জলের শক্তির সাহায্যে জাপানী কল চালায়।

সারা পৃথিবীর কোথায় কে কি চায়, তাই দেখিয়া জাপান জিনিষ তো সরবরাহ করিতেছেই; তাছাড়া আর একটি দিকে জাপানীর প্রচণ্ড চেষ্টা চলিয়াছে। অনেক দেশে এমন অনেক জিনিষ আছে, যা' পয়সা আর মস্তিষ্কের অভাবে পড়িয়াই থাকে, তাকে লইয়া ব্যবসা ফাঁদিতে কেহ অগ্রসর হয় নাই। জাপানী এখন সেখন সেই সব জায়গায় মূলধন দিয়া কাঁচা মাল (raw materials) সংগ্রহে মন লাগাইয়াছে। জাতটা এক মুহূর্ত্ত অলস বসিয়া থাকে না।



মাছের বাজার

এইটাই জাপানীর প্রধান বিশেষত্ব। তারপর বিলাসিতা সে জানে না, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দেশে তার আছে প্রচুর চাল, প্রচুর মাছ, প্রকাণ্ড বন, জঙ্গল, প্রচুর কাঠ-কয়লা—আর বিপুল জল-শক্তি (water power)। তারপর তার প্রধান ব্যবসায় রেশম। পৃথিবীর অর্দ্ধেক শিল্কের জোগান দেয় জাপান—জানেন? চীন হইতে জাপান লোহা আর ইস্পাত লয়। বাহিরে গিয়া জাপানী লোহার কারখানা খুলিয়াছে। জাপানের অল্প পরিবার। বাহিরে যেখানে সে জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে, সেই-খানেই ব্যবসা ফাঁদিয়াছে। জাপানীর অধ্যবসায় অসাধারণ,



খেল্‌না-ওয়ালী

সাহসেরও সীমা নাই। জাপানী যে-দেশে ব্যবসা ফাঁদিতে যায় সে-ব্যবসার সুবিধার জন্য যদি চিরদিন ধরিয়া সে দেশে তাহাকে দেশ-ছাড়া হইয়াই বাস করিতে হয়, তাহাতেও সে কাতর হয় না—তার মন পড়িয়া থাকে দেশের দিকে—নিজের ঘর-বাড়ী বা পরিবার, পরিজনের দিকে নয়—দেশের লোকের দিকে, জাপানের দিকে। ব্যবসার প্রসার জমাইতে সর্ব্বক্ষণ সে তৎপর থাকে। জাপানী একেবারে up-to date খপর রাখে। কোথায় কোন্ দেশ কি চায়, সে দিকে তার সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণদৃষ্টি—তার উপর সে কি তৎপরতার সহিত কাজ চালাইয়া যায়। পাঁজি-পুঁথি দেখা বা জল্পনায় তার ফুরসৎ নাই। এই দূরদর্শিতার সঙ্গে মিশিয়াছে, উদ্যোগ আর অধ্যবসায়। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ—কাজেই জাপান আজ বাণিজ্যের দ্বারা লক্ষ্মীকে করায়ত্ত করিয়া বসিয়াছে।

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

# বিশ্ববিদ্যার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান

পরের শ্রীবৃদ্ধিতে বেদনা অনুভব করা প্রাকৃতজনের এক স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। জার্ম্মানের সমৃদ্ধিতে ফরাসীর বা ফরাসীর উন্নতিতে ইংরাজের চিত্তবিকার বেশ বুঝিতে পারা যায়, কেন না আপন আর পরে প্রভেদ অনেক। পরশ্রী-কাতরতা এক নিতান্ত-পরিচিত সাধারণ ব্যাধি।

আমাদের দেশে আর একটি মানস-ব্যাধির সংবাদ পাওয়া যায়—সেটি কিন্তু অসাধারণ। আপনার জিনিষকে বা আপনার জনকে ছোট করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করার পরিচয় শুধু সেই দেশের লোকের পক্ষেই সম্ভব, যে দেশ বহুকাল হইতে দাস-সুলভ মনোবৃত্তির চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে।

"এই ত বাঙ্গালী, সেই বাঙ্গালীর আবার শিক্ষা!" কেহ বলিল, "ছেলেরা যেখানে ভুল ইংরাজি শেখে, সেই দেশের আবার ইউনিভার্সিটি!" "ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার!" এমনি করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া সকলে প্রমাণ করিতে বসিল, দেশের কিছু নাই! যা আছে সবই বিদেশের—"কোন গুণ নাই, তার কপালে আগুন!"

দেশের কোন কিছু যদি বিদেশের প্রশংসা অর্জ্জন করে, তাহা বিদেশের কৃপা, দেশের কৃতিত্ব তাহাতে কিছু নাই—এই মনোভাবের অধিকারী এখনো দু-একজনকে পাওয়া যায়। এই সব ভীরু-স্বভাব ব্যক্তি হয়ত ক্ষমার যোগ্য। ভালোকে মন্দ বলিয়া প্রমাণিত করিতে যাহারা বদ্ধপরিকর তাহাদের অপরাধ কিন্তু অমার্জ্জনীয়। দেশের মুখে আগুন যোগাইয়া নিজের মুখখানি উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি প্রাকৃত জনের থাকিলে তত দোষের হইত না; এই প্রবৃত্তি এমন কতকগুলি লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, যাঁহারা নিজেদের উচ্চতর শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করেন!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গৌরবের বস্তু। ইহা তো বুক ফুলাইয়া বলিবারই কথা। এ কথায় কিন্তু যদি কাহারও বুক ফাটিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটিতেছে। বড়কে ছোট করিতে গিয়া আমরা যে আপনাদের ক্ষুদ্রত্বকেই বড় করিয়া তুলি; মহতের মহত্ত্ব তাহাতে আহতও হইতে পারে না, অবনতও হয় না।

সকল জিনিষেরই একটা সার্থকতা আছে। সমালোচনারও যে একটা মূল্য আছে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? তাই বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া আলোচনা করিতে বসিলেই যে ব্যক্তিবিশেষের উপর উষ্মা প্রকাশ করিতে হইবে কেন, ইহার অর্থ তো এতদিনেও বুঝিতে পারিলাম না।

শিক্ষাসতী যদি আজ আশুতোষের কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করিয়া থাকে, তাহাতে ক্ষোভেরও কিছু নাই, ঈর্ষারও কিছু নাই। সাধনা সিদ্ধিলাভ করে। পুরাণে বলে রুদ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে তখনকার কোন কোন ঋষির চিত্তদাহ উপস্থিত হইত। এমনি করিয়া শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন দক্ষযজ্ঞে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছিল। আমাদের শিক্ষার অনুষ্ঠানটিকে দক্ষযজ্ঞে পরিণত করিতে আমরা একান্তরূপেই অসম্মত। অতএব এ কথা যদি কাহারো কাছে এখনো পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকে ত তাহার জানিয়া রাখা ভাল যে দেশের লোক কাহাকেও উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নয়—সতীকেও নয়, শিবকেও নয়, শিক্ষাকেও নয়, শিক্ষাধ্যক্ষকেও নয়।

ক্রমাগত আঘাত খাইয়া আত্মরক্ষার জন্য অবশেষে ইউনিভার্সিটিকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছে। বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ রোধ করা কঠিন নহে; ভয় গৃহ-শত্রুর গোপন চেষ্টাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কুৎসা-রটনাকেই যাহারা জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছে, তাহাদের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়, কিন্তু দীনতা অনুকম্পার যোগ্য। দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠানটিকে আমলা-তন্ত্রের হাতে তুলিয়া দিবার অগ্রে তাহাদের বিবেচনা করা উচিত, শিক্ষাবিষয়ে সরকার কি সত্যই আমাদের হিতৈষী।

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত খরচ করিতে সরকারের অর্থাভাব ঘটিয়াছে, এমন কথা কখনো শোনা যায় নাই। বিস্তৃতভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলনের জন্য টাকা চাহিলেই কিন্তু সরকারের অকুলান পড়ে। উচ্চশিক্ষার

কথা না হয় নাই তুলিলাম। আমাদের ছেলেদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য অমলাতন্ত্র যে বিশেষ ব্যগ্র, ইহা তাহাদের ব্যবহারে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া তো আমাদের কোনদিন মনে হয় নাই। উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দিয়া এক ইউনিভার্সিটিই দেশের শিক্ষা-বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে।

বেশী ছেলে পাশ করে বলিয়াই না কি কতকগুলি বিনয়ী ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। শ্রদ্ধা জিনিষটার এমন অপূর্ব্ব পরিণতি দেখিয়া বিদেশের কেহ কেহ নাকি মুখ ফিরাইয়া হাসে, কিন্তু আমাদের চোখে জল আসে! এ দেশ শিক্ষাহীনের দেশ। শতকরা চুরানব্বই জন এ দেশে নিরক্ষর। বাকি ছয়জনের মধ্যে কয়জন সত্যকারের লেখাপড়া জানে, তা কে বলিয়া দিবে? প্রতি শতে একজন শিক্ষিত লোক থাকিলে ত আমরা আজ, ইংরাজ দূরে থাক, মার্কিন জার্ম্মানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিতাম। শতকরার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, হাজারের মধ্যে একটি প্রকৃত শিক্ষিত লোক পাইলে দেশ আজ সার্থক হইয়া উঠিত। দুঃখ এই এ দেশের সমালোচক দেশের চেয়ে নিজেকেই বড় করিয়া দেখে। তাই এরণ্ডের মধ্যে দ্রুম হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে কোন কালে ছাড়ে না। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে উচ্চ শিক্ষালাভে অধিকারী হইতে পারে, এমনি সুযোগ আনিয়া দিবার ইচ্ছায় অন্য দেশের লোক যেখানে আপনাদের পূর্ণ উদ্যম প্রয়োগ করিতে দ্বিধা মাত্র করিত না, আমরা সেখানে তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছি, "সাবধান! সাবধান! ডিগ্রীর মূল্য কমিয়া গেল! এই অমূল্য নিধি আঁকড়িয়া পড়িয়া থাক। দেখিও, কাহারও হস্তস্পর্শে ইহা যেন কলুসিত না হয়।"

উচ্চ শিক্ষার গণ্ডীকে সঙ্কীর্ণতর করিয়া তুলিবার গোপন পরামর্শে বাতাস ভারি হইয়া উঠিল। আজ পোষ্টগ্র্যাজুয়েট অধ্যাপনার প্রবর্ত্তনের দিনে নূতন গবেষণার আগ্রহে উৎসাহী যুবকমণ্ডলী বরং কিছু করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জিজ্ঞাসা করি, পুরাতন দিনের বই মুখস্থ করার আমলে কয়জন ছেলে কতটুকু বিজ্ঞান, ইতিহাস বা সাহিত্যের তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে বসিত!

অনেক সময় দেখা যায় প্রশ্ন করিয়া ছাত্রদের নিকট জবাব না পাইলে, অনেক গুরুমহাশয় তর্জ্জন ও বেত্রাস্ফালনের অবসর পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া ওঠেন। তাঁহার নিভৃত অন্তরে লুক্কায়িত হিংস্র স্বভাব ছাত্রদের এই অসহায় অবস্থা উপভোগ করে। পাশের মূল্য মহার্ঘ্য করিবার যাঁহাদের একান্ত আগ্রহ, তাঁহাদের মনোভাবের মধ্যে এইরূপ কিছু লুকানো আছে কি না, কে বলিবে? পরীক্ষা জিনিষটার হিংস্র মাধুর্য্য আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে, তাই বিদ্যালয়ের দশ বৎসরের শিক্ষার অপেক্ষা দুইদিনের পরীক্ষার মূল্য বেশী করিয়া ধরিতে আমাদের কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হয় না।

ডিগ্রী আক্রা হইলেই কি নিরেনব্বই জন অশিক্ষিতের শিক্ষার উপায় শস্তা হইয়া যাইবে? শিক্ষাহীনতার মধ্যে একটা নির্জ্জীব সন্তোষ আছে, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু উচ্চশিক্ষার পথে কাঁটা পুঁতিয়া আমাদের ছাত্রদের মধ্যে সেই সন্তোষ সঞ্চার করিবার চেষ্টাকে আমরা দেশের নব জাগরণে বাধা দিবার প্রয়াস বলিয়া মনে করি! দৈব অসন্তোষকে সরকার অথবা সরকারী ভৃত্যেরা ভয় করেন বলিয়া আমাদের ভয় করিবার কোন কারণ নাই। শিক্ষার আঘাতে যে-জীবনে জ্বালাময় উজ্জ্বল সুন্দর অশান্তির স্ফুলিঙ্গ উঠিল না, সে জীবন জাতি-গঠনের উপাদান নহে। কেবল পাণ্ডিত্যের অভিমান সৃষ্টি করিবার জন্য অথবা গবেষণার মান বাড়াইবার জন্যই যে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন তাহা নহে, উচ্চশিক্ষার অন্য প্রয়োজনও আছে।

দেশ হইতে উচ্চশিক্ষার উচ্ছেদের অভিপ্রায়ে যে ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টাও সেই ষড়যন্ত্রের অঙ্গীভূত। চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিলেও খাঁটী সোনা পিতল হইয়া পড়ে না; কিন্তু সোনাকে পিতল প্রমাণ করিবার অদ্ভুত কসরৎগুলি অনেক সময় হাস্যকর হইয়া ওঠে। এমনি সব কারদানির ফলস্বরূপ দু একটি বিচিত্র বার্ত্তা লইয়া আমরা মাঝে মাঝে আনন্দ অনুভব করি। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুখে চুণ-কালি

মাখাইয়া আমাদের বৃদ্ধ বিজ্ঞেরা বিদেশের যে সব বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন, সেই অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজও নাকি ডিগ্রীর সাজানো-গোছানো মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিয়াছে! বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিদারুণ হিতৈষী কোন ইংরাজী মাসিকে এই খবর পাইয়াছি, অবিশ্বাসের কারণ নাই। বিলাত-প্রবাসী প্রচ্ছন্ন-নামা কোন সাহসী এবং সুবোধ ছাত্র লিখিতেছে যে কেম্ব্রিজের Ph. D. পাইবার দারুণ প্রলোভনে পতিত হওয়ায় তাহার এক বিলাতী প্রফেসর উত্তর দিয়াছে, "রামচন্দ্র, ফিলসফির ডাক্তার হইয়া লাভটা হইবে কি? ঐ যে বড় বড় ডিগ্রীগুলো দেখিতেছ, ও সব মার্কিন ছোকরাদের মন-ভোলানো জিনিষ—শস্তার মাল। কিনিও না, ঠকিবে।" ভূতের মুখে রামনাম শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। বিলাতের পুরাতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতেও তাহা হইলে ডিগ্রীর বেসাতি বসিয়াছে! হারে হতভাগ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়! কোনদিক দিয়াই বেচারী এতটুকু গৌরব পাইবার অধিকারী নয়! সন্তান বিদেশ হইতে সম্মান আহরণ করিয়া আনিলে শ্রদ্ধাস্পদ লেখক ও সম্পাদকবর্গ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমলে নামাইয়া বলিলেন, "কেলেঙ্কারী!" দেশে বসিয়া গবেষণা করিলে সুরটাকে কড়িতে তুলিয়া বলিবে, "সাফ চুরি!" বেচারীর আগাইয়া লাভ নাই, পিছাইয়াও ফল নাই। লাল-পাগড়ী না হউক রক্ত-চক্ষুর হাত হইতে নিস্তার পাইবার কোন উপায় নাই,—বই ছাপাইয়াও নয়, বিলাতী সম্মান পাইয়াও নয়। আগেকার মত ইংরাজী ভালো করিয়া না শেখার দরুণ দেশটা উচ্চশিক্ষারও অধিকার পাইল না, পাণ্ডিত্যের আঘাতে অনুষ্ঠান-বিশেষকে পণ্ড করিবার যোগ্যতাও লাভ করিতে পারিল না! ইহাই বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সমস্যা। অন্য কিছু ভাবিয়া দেখিবার সময় বুঝি আর নাই!

আজ ইউনিভার্সিটির অকুলানের দিনে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া 'দেউলিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়' বড় হরফে ছাপাইয়া বিলাতী কাগজ ও সরকারী সাহেবের গালাগালি সযত্নে উদ্ধার করিয়া কাকমুখনিঃসৃত কুৎসা-কাহিনী পরমাদরে পত্রে স্থান দিয়া, এবং মাঝে মাঝে সহসা অত্যন্ত অকরুণ সুরে নিরপেক্ষতার আস্ফালন করিয়া আমাদের দেশের বিজ্ঞ বৃদ্ধেরা যে ট্রাজি-কমেডির অভিনয় করেন, তাহা দেখিয়া স্বর্গের দেবদূতেরা পর্য্যন্ত ঠোঁটের হাসি অথবা চোখের জল কোনটাই চাপিতে পারিবে না।

এক এক সময় এক একটা ধুয়া উঠে। রাজধানীর ধুয়া ধরিয়া সরকার দিল্লীর সমাধি-ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা কবর দিল। এফিসিয়েন্সির ধুয়া ধরিয়া সিবিল সার্বিসের ঝানু শ্বেতাঙ্গেরা বেতনের সঙ্গে সাগর ডিঙ্গাইবার বৃত্তিটাও আশাতিরিক্তরূপে বাড়াইয়া লইল। বল্‌শেভিক্‌দের ধুয়া ধরিয়া জঙ্গীলাট বাষট্টি কোটি টাকা ব্যয়ের বজেট্ হাসিমুখে পাশ করাইয়া লইল। এমনি করিয়া কত দিক দিয়া কত লোক কত প্রয়োজন-সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় কত রকমের ধুয়া ধরিতেছে, তাহার কি আর সংখ্যা আছে! এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কারের ধুয়া ধরিয়া একদল লোক কে জানে কোন্ অভিপ্রায়-সিদ্ধির আশায় এমনি বিষম ঐক্যতান সুরু করিয়া দিয়াছে যে তাহার আর বিরাম নাই! এই অশ্রান্ত গুন্‌গুন্ শব্দ হয় ত শুনিতে সুখকর হইত, যদি সেই অবিরাম গুঞ্জনের পিছনে হুল এবং হুলে বিষ না থাকিত!

এই সংস্কারের সুর তুলিয়া, ষষ্ঠীর কৃপায় তিনখানি সরকারী ও বে-সরকারী বিল ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে। তিনখানির উদ্দেশ্য একই—দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে আমলাতন্ত্রের খাস-দখলে আনিয়া দেওয়া। এই উদ্দেশে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। "শিক্ষা-বিষয়ক অতিরিক্ত সংখ্যা"য় লিখিত টাইম্‌সের বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং তাহার প্রচারের কাহিনী দেশবাসী ইহার মধ্যেই বিস্মৃত হয় নাই। একটা বদনাম দিয়া কুকুরটাকে ফাঁসি-কাঠে আটকাইয়া দিবার বিলাতী পদ্ধতিটি দেখিতেছি, সরকার এবং সরকারী অনুচরেরা ক্রমে স্বদেশী করিয়া লইল! শাসনতন্ত্রের সহিত পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত থাকিলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু বিষয়েই স্বতন্ত্র ছিল। এতটা স্বাতন্ত্র্য সরকারের কাছে ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে, তাই কোন কোন অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দার আর অন্ত নাই। অনুচরবর্গ

পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে, বলির জীবটাকে বধ্যভূমিতে লইয়া আসিলেই হয়!

সকল দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আভ্যন্তরিক ব্যাপারে স্বাধীন। আইন করিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্র করিবার চেষ্টা বিলাতী পার্লামেন্টও করে নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা দেখিতেছি বিলাতকেও হার মানাইল! না মানাইবে কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপদের সময় আড়াই-লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিতে যে বাঙ্গালী শিক্ষা-সচিব করদাতাদিগের নিকট আপনার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া শিহরিয়া ওঠেন, কার্সিয়াঙ্-এর শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে তিনশ' দশ জন মাত্র ছাত্রের জন্য সাধারণ-কোষ হইতে বছরে বছরে দুই লক্ষের অধিক টাকা দান করিতে সেই বাঙ্গালী মন্ত্রীরই বিবেকে এতটুকু কুণ্ঠার ছায়া পড়ে না!

অনাহারে শীর্ণ ইউনিভার্সিটি অন্নের পরিবর্ত্তে সংস্কারের উপলখণ্ড উপঢৌকন পাইয়া নিশ্চয়ই আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিবে। উপবাস হইতে যে রোগ জন্মিয়াছে স্লিষ্টার প্রয়োগ করিয়া তাহা সারাইতে এক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার চিকিৎসকেরাই সমর্থ। শ্বেতাঙ্গ-পাহারাওয়ালাদের পরিবার লইয়া থাকিবার প্রাসাদ তাঁহারাই নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বিলাতে প্রদর্শনী খুলিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাঁহারাই মঞ্জুর করেন। সেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাই যে শাসন-তন্ত্রের সহিত শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

বিশ্ববিদ্যালয় একটা যান্ত্রিক বস্তু নহে। বাহির হইতে ইহার বিধি-বিধান গড়িয়া দেওয়া চলে না। সকল জীবন্ত জিনিষের মতই ইউনিভার্সিটি আপনার নিয়ম আপনিই রচনা করিয়া লইবে, ইহাতে ব্যবস্থা-মজলিসের মাথাব্যথার কোন প্রয়োজন নাই। প্রাণবান বলিয়াই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বাড়িয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধি ও বিকাশে বাধা দিলেই ইহার সর্ব্বনাশ সাধন করা হইবে, সাহায্য করিলে নহে। কাপড়-অনুযায়ী কোর্ত্তা কাটিবার যুক্তি যাঁহারা কালে-অকালে প্রয়োগ করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান, বিকাশ ও পুষ্টিই জীবনের নিয়ম। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের কিশোরের জন্য পাঁচ বছরের ছেলের জামার কাপড় যেমন করিয়া কাটা যাক না কেন, কোন ক্রমেই যে আঁটে না, এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি কি অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে?

আইন-কানুনের খোঁচা সহিয়া অনাহারে শীর্ণ ইউনিভার্সিটির টিঁকিয়া থাকাটা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িতেছে। অধিক মার্জ্জন ও মর্দ্দনে দুর্ব্বল শরীর কেবল ক্লিষ্ট হইয়া উঠিবে। রীতিমত আহার না দিয়া কেবল মার্জ্জন ও মর্দ্দন দ্বারা ইউনিভার্সিটিকে সুশ্রী ও সবল করিয়া তোলা অসাধ্য বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বিশ্ববিদ্যালয় এক বিরাট যজ্ঞশালা। ইহার অনুষ্ঠানে আয়োজন চাই বিপুল। আয়োজনে কার্পণ্য করিয়া অনুষ্ঠানে সফলতা লাভ করা সম্ভবপর হইবে কি? জ্ঞান ও শক্তি এই যজ্ঞশালা হইতেই আমরা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি। অতএব বিশ্ববিদ্যার এই প্রতিষ্ঠানকে চিরস্থায়ী করিতে আমরা যেন আমাদের সকল শক্তি প্রয়োগ করি।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

## ধরায় কেন

ধরায় কেন বাস্‌চে ভালো লোক?
এই যে তারে দেখ্‌চি সুখে, এই যে আঁধার চোখ!
এই যে মিলন, বাহুর বাঁধন, এই যে কাঁদন সজল শোক!

ধরায় কেন চাইচে সবাই সুখ?
স্বর্ণমৃগ পালিয়ে যাবে, শূন্য হবে বুক!
দুঃখ-আশা কর্‌লে বরং হবে না তোর হতাশ মুখ!

ধরায় কেন জাগাও যৌবনে?
জন্ম থেকেই বরং জরার বিষের কৌটো নে!
ক্ষণেক-তরে কি লাভ নিয়ে বসন্তেরি মৌ মনে!

ধরায় কেন ফুটছে গোলাপফুল?
কালোর পটে রঙের আলো, হায় রে বিধির ভুল!
একটু থাকে বধূর বুকে, একটু পরেই মাখ্‌বে ধূল!

ধরায় কেন উঠ্‌চে হাসির সুর?
ওগো পথিক, থামাও গীতি, সাম্‌নে শ্মশানপুর!
অন্ধকারের রাজ্য দিয়ে চল্‌তে হবে অনেকদূর!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# পতিতা

## এক

আমি ব্রহ্মচারী, গুরুদেব আমাদের সম্যক ব্রহ্মচর্য্য পালন ও শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য একটী মনোরম স্থান ঠিক করিয়াছিলেন। জন-মানবের বস-বাস সেখানে বড় বিরল। নিকটেই পর্ব্বতমালা। তরুপল্লবের সখ্য ও বিহগ-বিহগীদের সমাবেশ সেখানে বেশী।

আশ্রমের কাছে একটী সুন্দর বাগান ছিল এবং তাহাতে ছিল দিব্য একখানি গৃহ; মহিম বাবু নামক কোন ভাবুক ব্যক্তির সম্পত্তি। ভাবুক না হইলে এমন স্থান তিনি নির্ব্বাচন করিতেন না।

ওই বাগান-বাড়ীতে কখনো কখনো মহিম বাবুরা নিজেরা আসিয়া থাকিতেন, কখনো কখনো সেটি ভাড়া দেওয়া হইত। আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা প্রতিদিন প্রত্যুষে সেই বাগানে ফুল তুলিতে যাইতেন; বারণ ছিল না। আমিও যাইতাম।

## দুই

সে বৎসর এক বৃদ্ধ ভাড়াটিয়া মহিম বাবুর বাগান বাড়ীটা অধিকার করিয়াছিল। সঙ্গে ছিল তাঁর এক যুবতী, একটী ভৃত্য ও একটী বালিকা চাকরাণী। যুবতীটি ছিল সুন্দরী ও বড় চপলা। যুবতীকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ প্রত্যহ বেড়াইতে বাহির হইতেন; আমাদের আশ্রমের সম্মুখ দিয়াই যাইতেন। অন্যান্য ব্রহ্মচারীরা যুবতীর চঞ্চল চপল দৃষ্টি দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিত। আমি তৎপূর্ব্বে সংসারের কিছুই দেখি নাই; কাজেই চপলতা ছাড়া সে দৃষ্টিতে কি যে ঠিক ছিল ধরিতে পারিতাম না। যাহা ছিল তাহাতে কিন্তু আমার হৃদয় হু-হু করিয়া উঠিত।

## তিন

ক্রমশ শুনিতে পাওয়া গেল যে, মহিম বাবুর বৃদ্ধ ভাড়াটীয়া যাহাকে আনিয়াছেন সে শুধু চপলা নহে, সে মূর্ত্তিমতী পাপ। কারণ সে এক পথ-ভ্রষ্টা নারী। জন-সমাজের চক্ষে ধুলা দিতে না পারিয়া এ বন-সমাজের চক্ষে ধুলা দিতে বৃদ্ধ তাহাকে এখানে কুলবধূ সাজাইয়া আনিয়াছেন!

ইহাতে গুরুদেবের প্রশান্ত হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। গুরুদেবের অসাক্ষাতে আমার সহতীর্থেরা এ লইয়া অনেক প্রকার হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলাম না। আমি ছাড়া সকলে সে বাগানে যাওয়া ছাড়িয়া দিল।

গুরুদেব আমাকেও সেখানে যাইতে নিষেধ করিলেন। গুরুদেবকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতাম, কিন্তু আমার স্বভাব ছিল এক-রোখা ধরণের। আমি কহিলাম, "গুরুপদে যদি আমার তিলার্দ্ধ ভক্তি থাকে, অমন সহস্র নারী এলেও আমার অঙ্গে উত্তাপ মাত্র লাগবে না।"

গুরুদেব হাসিলেন। বাগানে যেমন যাইতাম তেমনই যাইতে লাগলাম।

## চার

তখন বৃদ্ধ কোথায় ছিলেন, জানি না। ভোরের বেলায় ফুল তুলিতে তুলিতে গৃহটীর দিকে চাহিতেই দেখিলাম, যুবতী নির্নিমেষ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। দৃষ্টি বিনিময় হইতে সলজ্জ চরণে তিনি একটা ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেখান হইতে তিনি জানলার ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলেন।

তরুণ সূর্য্য তখনও আকাশে দেখা দেয় নাই। কেবল মাত্র অরুণ-বর্ণ মেঘের রাশি ধরণীর বুকে লাল আভা ঢালিয়া দিয়াছিল। শিশির-ভারাবনত ফুলের দল ও গাছের পাতা আঁখি নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পাহাড়-গুলিও তখনো চক্ষু মেলে নাই। বিশাল নির্জ্জন প্রকৃতির বুকের মাঝে আমি ও আমার সংসার-অনভিজ্ঞ ব্রহ্মচারীর হৃদয়। সে হৃদয় আমার যুবতীর নয়নের আঘাতে কম্পিত হইয়া উঠিল। ফুলের সাজি পাশে রাখিয়া বিহ্বল হইয়া আমি বসিয়া পড়িলাম।

ক্ষণপরে যুবতীর বালিকা চাকরাণী একটি সুচারু পাত্রে

এক-রাশ ফুল আনিয়া আমার সাজিতে ঢালিয়া দিল। আমার চমক ভাঙ্গিল। রাগিয়া সাজি শুদ্ধ উল্টাইয়া ফেলিয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

### পাঁচ

সেদিন হইতে বাগান-মুখো আর হই নাই। কিন্তু আমার স্বচ্ছ হৃদয়ের স্বচ্ছন্দতা আর ফিরিয়া আসিল না। কাতর হইয়া গুরুদেবের চরণ ধরিয়া কহিলাম, "প্রভু, আমি দিন-কয়েকের ছুটি চাই। দেশান্তরে যাব।"

গুরুদেব ছুটি দিলেন না; তিনি যাহা বলিলেন তাহা আমি আশা করি নাই। কহিলেন, "ব্যায়াম না করলে শরীর শক্ত হয় না। মন শক্ত করতে হলে মনের ব্যায়াম চাই, বৎস। তুমি এইখানেই থাক।" আজ কিন্তু গুরুদেবের কথার উপর 'না' বলিতে পারিলাম না।

আমি রহিলাম; কিন্তু গুরুদেব সশিষ্য আমাকে একা রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

হায় গুরুদেব! এ কি প্রতিশোধ?

হৃদয়ের মধ্যে অসহ্য নরক, প্রাণের ভিতর অতুল সংগ্রাম —মনের অশান্তিতে আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল; রোগ বাড়িয়া গেল, তার পর কি হইল, জানি না।

### ছয়

যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম, আমার মাথা যুবতীর কোলে এবং বৃদ্ধ পাশে বসিয়া। সে যে কি সেবা, কি যত্ন, তা বর্ণনা করা যায় না। আমি ঐশ্বর্য্যের মুখ কখনও দেখি নাই কিন্তু ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তিও বোধ হয় এমন শুশ্রূষা পায় না।

আমি যত আরোগ্য হইতে লাগিলাম, বৃদ্ধের আসা তত হ্রাস পাইতে লাগিল; কিন্তু যুবতী থাকিতেন দিন-রাত কাছে-কাছে। যখন অসমর্থ ছিলাম তখন তাঁহার সেবা-যত্নে হৃদয় মুগ্ধ ছিল। শরীরে যত বল পাইতে লাগিলাম, যুবতীর রূপে নয়ন তত মুগ্ধ হইতে লাগিল।

আমার ব্রহ্মচারী মনটা বিকল হইয়া গেল। হাতে খাবার বা ঔষধ লইতে গেলে দেহ কাঁপিয়া ওঠে। সুবাসিত কেশের অকস্মাৎ দু-গাছা মুখের উপর আসিয়া পড়িলে এক প্রকার জ্ঞান হারাই। পাখা হাতে করিয়া যুবতী গল্প করিতে বসিলে, তাঁর রক্তিম কপোল, প্রবালের মত অধরোষ্ঠ, মুক্তাপাঁতির মত দন্ত, কুঞ্চিত কেশরাশির নীচে অপরূপ কপালখানি—দেখিতে দেখিতে আমি আপন-হারা হইয়া যাই! তিনি কি তাহা লক্ষ্য করিতেন না? কি জানি!

সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম, আর সেবার প্রয়োজন নাই। তথাপি যুবতী আসেন এবং আসিয়া সেবা-নিপুণ হাতে আমার স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করেন।

সেদিন আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া ছিলাম। অত রূপ, অত গুণ, বনবাসী সন্ন্যাসী আমি চক্ষে কখনো দেখি নাই। সরস বাক্যে, সরল মিষ্ট হাসিতে আমার আপাদ-মস্তক সিঞ্চিত করিয়া সুষমা-বিনিন্দিত অঙ্গে হিল্লোল তুলিয়া যখন তিনি চলিয়া যাইতে ছিলেন, আমি আর থাকিতে পারিলাম না! ছুটিয়া গিয়া তাঁহার একখানি হাত ধরিয়া থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

নিমেষে চপলার চপলতা অন্তর্হিত হইল। প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "পতিতা হলেও আমি অবিশ্বাসিনী নই।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

---

# অর্থবিজ্ঞানে শ্রমের মূল্য

মিরাবোঁ বলিয়াছেন যে তস্কর ও ভিক্ষুক ছাড়া পৃথিবীতে সকলেই শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ভুক্ত। কথাটী খুবই খাঁটী। শ্রমের সাধারণ ও সোজা অর্থ ধরিলে এই কর্ম্ম-কোলাহলময় জগতে শ্রমিক এই আখ্যা হইতে কেহ বাদ পড়ে কিনা সন্দেহ। মানুষ, সমাজ ও জাতি এই শ্রমলব্ধ অর্থের জোরেই পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে বরাবর বাঁচিয়া আছে।

ব্যক্তিগতভাবে মনুষ্য-জীবনের যাহা স্বাভাবিক নিয়ামক, সমাজ ও জাতির জীবনের পরিপুষ্টিও সাধারণতঃ তাহার উপরই নির্ভর করে।

অর্থ-বিজ্ঞান কিন্তু শ্রমের এই সাধারণ ও সোজা অর্থ লইতে মোটেই রাজী নয়। তাহার অভিধানে এক বিশেষ প্রকারের কায়িক শ্রমকেই শুধু 'শ্রম' এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রমের তারতম্য-অনুসারে শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনকে কোথাও ফি, কোথাও পারিশ্রমিক, কোথাও বা বেতন বলা হইয়া থাকে। এই প্রকার শ্রম সাধারণতঃ একটু উচ্চ অঙ্গের এবং এই শ্রেণীর শ্রমজীবিরা সংখ্যায় অল্প ও সমাজে বিভিন্ন নামে পরিচিত। অর্থ-বিজ্ঞানে এই শ্রেণীর কোনও স্থান নাই। অর্থ-বিজ্ঞান যে-শ্রেণীর শ্রম লইয়া আবহমান কাল হইতে আলোচনা করিয়া আসিতেছে, তাহা সাধারণতঃ কায়িক শ্রম বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই; এবং এই শ্রেণীর লোক সর্ব্বত্রই শ্রমজীবি বা মজুর বলিয়া পরিচিত এবং তাহাদের শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনকে চলিত ভাষায় 'মজুরি' বলে। কারখানায়, গৃহশিল্পে, পুকুর খনন, খাল খনন, বাড়ী ঘর প্রস্তুত করা প্রভৃতি ব্যাপারেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কারখানা আবার অন্য সকলকে হার মানাইয়াছে। অনেক স্থলে শ্রমজীবি বা মজুর বলিলে কারখানায় যাহারা কাজ করে শুধু তাহাদেরই বুঝায়। শ্রমটীকে যদি কোনও বস্তু বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে শ্রমজীবি তাহার বিক্রেতা এবং তাহাকে যিনি খাটাইবেন তিনি তাহার ক্রেতা—এই হিসাবে সাধারণতঃ তাহার একটা মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এই নির্দ্দিষ্ট মূল্যই মজুরি।

'শ্রম'কে শ্রমজীবি হইতে পৃথক করা যায় না। কোনও বস্তু যেমন বিক্রয় করিলে বিক্রেতার আর তাহার উপর কোন অধিকার থাকে না এবং তাহা ক্রেতার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে চলিয়া যায়, 'শ্রম'কে বস্তু-হিসাবে বিক্রয় করিলেও ঠিক সে কথা এখানে খাটে না। শ্রমকে বিক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবিকেও ক্রেতার কাছে চলিয়া যাইতে হয়। ক্রীত জিনিষ কিন্তু সর্ব্বদাই বিক্রেতার কাছে থাকিয়া

ক্রেতা বোধ হয় আদৌ এ রকম কোনও অপূর্ব্ব আব্দার পছন্দ করিবে না। ইহাতে কিন্তু শ্রমজীবির অসুবিধা ছাড়া কোনই সুবিধা নাই। তাহার কার্য্য এবং কার্য্যক্ষেত্রের নির্ব্বাচনের উপর অনেক সময়ই তাহার কোন হাত থাকে না। অবস্থার তাড়নায় ভাল-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যায়। শ্রম বিক্রী করিয়া তাহার শ্রমের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকা চলে না। সর্ব্বদাই তাহার নিজেকে জিনিষটা আগলাইয়া রাখিতে হইবে। ইষ্টক বিক্রয় করিয়া বিক্রেতার তাহা দ্বারা নর্দ্দামা তৈয়ারী হইল কিম্বা প্রাসাদ তৈয়ারী হইল ইহাতে যেমন কিছুই আসে যায় না, শ্রম ও শ্রমজীবির পক্ষে তেমনি একথা মোটেই খাটে না। তাহার কার্য্য এবং কার্য্যক্ষেত্রের এই প্রকার তারতম্যে হয়ত তাহার জীবন-মরণ-প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। মনিবের মেজাজ, সঙ্গীদের চরিত্র এবং কার্য্যের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির ভাল-মন্দে অনেক সময়ই তাহার জীবনের ধারা চিরদিনের জন্য বদলাইয়া যায়। তারপর এ জিনিষটীকে বেশীদিন পুঁজি করিয়া তুলিয়া রাখাও চলে না। বাজার-দর বুঝিয়া জিনিষটীকে না চালাইলে হয়ত একেবারেই সব নষ্ট হইয়া গেল। তাহার উপর অভাবের তাড়না ত শ্রমজীবির নিত্য সঙ্গী। আবার কোন বিশেষ প্রকারে শ্রমের আদর বাড়িলে তাহার অভাব সহসা পূরণ হওয়াও শক্ত। শিক্ষানবিশী করিয়া তাহার অভাব পূরণ করিতে যত সময়ের দরকার, তাহার পুরস্কার হাতে হাতে পাইতে তদপেক্ষা আরও বেশী সময়ের প্রয়োজন। এই প্রকার একটু আলোচনা করিলেই বাজারের অন্যান্য দশ প্রকারের জিনিষ হইতে ইহার পার্থক্য সহজেই অনুমিত হইবে।

এখন 'শ্রমের' 'মূল্য কি হিসাবে সাব্যস্ত হওয়া উচিত তাহার একটু আলোচনা করা যাক। কব্‌ডেন অতি অল্প কথায় এই প্রসঙ্গে একটী সাধারণ সত্য অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যখনই দুইজন মজুর একজন মনিবের পিছু পিছু

তাহাকে কাজে লাগাইবার জন্য ঘুরিতে থাকে তখনই তাহার মজুরি বাড়িয়া যায়। কথাটী আর কিছুই নয় শুধু জিনিষের বেশী কম অভাব ও আদরের দ্বারা বাজারে তাহার মূল্য নির্ণয় হওয়ার একটী পন্থার উল্লেখমাত্র। কোন জিনিষের অভাব হইলেই সাধারণতঃ তাহার আদর বাড়ে কিন্তু সেই জিনিষের সেই অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা আছে কিনা ক্রেতার সেই দিকে বরাবরই লক্ষ্য থাকে। শ্রমিকের যখন অভাব পড়ে তখনও তাহার দ্বারা ঠিক-মত কাজ হইবে কিনা এবং হইলে কতটুকু হইবে, কি দরের হইবে ইত্যাদি ভাল রকম বিবেচনা করিয়া তবে তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। অভাবের জন্য হয়ত তাহার শ্রমের মূল্য বাড়িয়া যায় কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল বিবেচনার উপরই শ্রমিকের আদর নির্ভর করে।

আবার শ্রমজীবিদের ভিড় অনেকটা তাহাদের সংখ্যা, কার্য্যদক্ষতা, সামাজিক আচার, রীতি-নীতি, স্থানীয় জল-বায়ুর অবস্থা, কার্য্যের সুবিধা ও অসুবিধা এবং তাহাদের আর্থিক সচ্ছলতা অসচ্ছলতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অর্থ-নীতিবিদেরা কিন্তু সকলের চেয়েও তাহাদের জীবন-ধারণের মত উপযুক্ত ব্যবস্থা ও থাকিবার ধরণ-ধারণের উপরই তাহাদের মজুরির হার নির্ভর করে, এই প্রকার বলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি দেখা যাক।

সাধারণ জিনিষ তৈয়ারী করিতে যাহা খরচ পড়ে অন্যান্য ন্যায্য লাভের কথা ছাড়িয়া দিয়াও ক্রেতা বিক্রয়ের উপর অন্ততঃ সেই দাম উঠাইবার চেষ্টা করে। তাহা না পাইলে সেই জিনিষ তৈয়ার করিতে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে এবং সে বাধ্য হইয়াই তাহার উৎপাদন ছাড়িয়া দিবে। তাঁহারা বলেন যে 'শ্রম' সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। খাইয়া পরিয়া কর্ম্মী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে শ্রমজীবিকে যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহা তাহার মজুরি দ্বারা পোষাইতেই হইবে। তারপর বৃদ্ধ বয়সে তাহারা সক্ষম হইলে তাহাদের স্থান পূরণ করিতে যাহাদের দরকার তাহাদের প্রজনন ও জন্য যতটুকু আয়ের একান্ত প্রয়োজন শ্রমের বিনিময়ে তাহাকে ততটুকু যোগাড় করিতেই হইবে। এবং তাহার পক্ষে তাহার এই সাংসারিক দেনা-পাওনার হিসাবই তাহার মজুরির হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে। অর্থনীতিতে ইহাকে মজুরি নির্দ্দেশের অলঙ্ঘনীয় বিধি বা নিয়ম ( Iron low of wages ) বলে। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে এই অলঙ্ঘনীয় বিধিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণীর মানুষের অভাবই দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, শ্রমজীবিও বাদ পড়ে নাই। আজ যাহা বিলাস বলিয়া গণ্য, কাল তাহা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে দাঁড়াইতেছে। এইভাবে আবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের আচার, রীতি, নীতি ও সভ্যতার গতি অনুসারে এই মজুরির মাত্রার প্রায়ই পরিবর্ত্তন হইতেছে। 'যাহা না হইলে নয়' এর গণ্ডী প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রকার অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে মজুরির হারের এই স্বাভাবিক গতি প্রতিরোধ করিতে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষ নানাভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন।

মজুরি নির্দ্দেশের এই বিধানকে অলঙ্ঘনীয় বলিয়া ধরিয়া অর্থনীতিবিদেরা নানা সুব্যবস্থা দ্বারা মজুরদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাহাদের জীবন ধারণের আদর্শ যাহাতে ক্রমশঃ উন্নত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে কর্ম্মপ্রবণতা আসে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মানুষের দ্বারাই এই-সব অলঙ্ঘনীয় নিয়ম আবিষ্কার হইয়াছে এবং তাহারাই আবার সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র যাহাতে এই নিয়ম অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে সে বিষয়ে সচেষ্ট। অর্থনীতিও জিনিষ হিসাবে কষাকষি করিয়া শ্রমের একটা মূল্য ধরিয়া দিয়া সীমানা টানিয়া দিয়া গিয়াছে। প্রয়োজন বুঝিয়া বাড়াও, ভালই— কিন্তু কমাইতে গেলেই শ্রমিকের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া খাতাপত্র লইয়া অমনি অর্থনীতিবিদেরা ইহাকে দেশের ও দশের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়কর বলিয়া বুঝাইয়া দিবে। গোড়ায় যে কোথায় গলদ তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এ

জগতে বহাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য কার্ল মার্কস্ প্রভৃতি অন্যান্য প্রসিদ্ধ সমাজ-বিপ্লববাদী মনীষিগণ তাঁহার বহুপূর্ব্বে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ইহা লইয়া প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনের সূত্রপাত প্রকৃতপক্ষে টলষ্টয়ের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। মজুরের দল পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যায় কেন? পল্লীগ্রাম হইতে সহরে খরচ অত্যন্ত বেশী, স্বচ্ছন্দে থাকিবারও কোন সুযোগ নাই, দুর্নীতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া থাকিতে হইবে, ইত্যাদি ভাল রকম জানিয়া শুনিয়াও শ্রমজীবির দল সেখানে চলিয়া আসে কেন? একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে ইহার মধ্যে শতকরা নব্বইজনের মুখশ্রী দৈন্য-ম্লান। ইহারা যে স্বেচ্ছায় চলিয়া আসেনা, তাহা ইহাতেই বুঝা যায়। কাহারো জমিটুকু হারাইয়াছে, কেহ বা দেনার দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কাহারো বা জমি-জমা আছে কিন্তু ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া দেশে থাকার চেয়ে অন্যত্র যাইয়া যা হোক কিছু উপার্জ্জন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করে। এই সবের প্রতিকার করিতে পারিলে বোধ হয় শ্রমের মূল্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোন বিশেষ নিয়ম আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না।

পরিত্যক্ত পল্লীগ্রামের অবস্থা শ্মশানের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে হয়ত যে সকল সুবিধা আছে তাহা স্থানীয় শ্রমজীবির অন্ন-সংস্থানের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সমাজের কঠোর অত্যাচারে তাহাদের প্রাপ্য মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া লইতেছে, আর তাহাদের অন্ন জুটিতেছে না। অন্যত্র চলিয়া গেলে সাধারণতঃই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের খরচ বাড়িয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার বাড়িতে আরম্ভ করিবে। সহরের ত কথাই নাই, সেখানে থাকিবার ও থাইবার আদর্শ ত বাড়িয়া যাইবেই। পল্লীগ্রাম যখন এই ভাবে শূন্য হইতে চলিল, সহর ও সমৃদ্ধিশালী স্থানসমূহ তখন শ্রমজীবিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুর ও মজুরির হার প্রভৃতি লইয়া নানাবিধ অশান্তির সূত্রপাত আরম্ভ হইল। অবস্থা যখন এতদূর আসিয়া বসিয়া গেল, যেখানে ভুলের আরম্ভ সেখানকে বাদ দিয়া এই প্রকাণ্ড ভুলের ভিত্তির উপর যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা তাহার সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা করিল! শ্রমজীবিদের থাকিবার খাইবার ও বাঁচিবার এক আদর্শ উপস্থিত করিয়া ইহা দ্বারাই তাহাদের মূল্য নির্দ্দেশ হইবে বলিয়া এক অদ্ভুত অলঙ্ঘনীয় বিধান আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তারপর কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, কই এ অশান্তির ত কোনই প্রতিকার হইল না! বরং অশান্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এইত সেদিন ইংলণ্ডে আশীহাজার বেকার শ্রমজীবি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য লোকসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বা দক্ষতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবিদের ইতস্ততঃ চলিয়া গিয়া উপার্জ্জন করাই শ্রেয়স্কর, তথাপি খোঁজ করিলে দেখা যাইবে যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে যথাসম্ভব পল্লীসংস্কারের দিকে সকলের লক্ষ্য গেলে বোধ হয় শতকরা নব্বইজন শ্রমজীবিকে একমুঠা অন্নের জন্য ঐ সকল স্থানে যাইয়া বিলাসিতা ও দুর্নীতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া থাকিতে হয় না। এবং তাহাদের জীবন-ধারণের আদর্শও বাড়িয়া যায় না।

"গ্রামে ফিরিয়া যাও" বলিয়া যে সর্ব্বত্রই একটা নূতন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে,—মনে হয় ইহার মধ্যে অনেকটা গূঢ় সত্য নিহিত আছে এবং অর্থনীতির অনেক সমস্যার সমাধানও ইহার মধ্যেই পাওয়া যাইবে। এ পর্য্যন্ত অর্থ-বিজ্ঞান ইহার কোন বিশেষ আলোচনা করে নাই। ভাবিয়া দেখিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে যে সকল বিষয়েই জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ পল্লীজীবনের শ্রীও এর উপরই নির্ভর করে। অর্থনীতির দিক দিয়া ইহা যেমন সহজে চোখে পড়ে, এমন বোধ হয় আর কোন দিক দিয়াই নহে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের গৃহশিল্প সমূহ আজ ধ্বংসোন্মুখ। পূর্ব্বে কৃষি ও গৃহশিল্প যে সকল শ্রেণীর লোকের অন্নসংস্থান করিত, আজ তাহাদের অনেকেই মুটে মজুর। কৃষককুল জমিশূন্য, যাহার বা জমি আছে সে দেনার দায়ে পরের জন্যই আজীবন বেগার খাটিয়া যাইতেছে। গৃহশিল্পী তাহার ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ

কাটতি নাই। গ্রাম্য জমিদার বা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক যাহারা এই সব কৃষককুলের এবং গৃহশিল্পীদের সম্পদে বিপদে একমাত্র উপদেষ্টা ও অবলম্বন ছিল, তাহারা একে একে প্রায় সকলেই নানা অজুহাতে সহরে চলিয়া গিয়াছে। যে গ্রাম্য আমোদ-উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নশ্রেণীর বহু লোকে নানাপ্রকার কায়িক শ্রমের বিনিময়ে আপনাদের দুই বেলার অন্ন সংগ্রহ করিত, সঙ্গে সঙ্গে সে-সকলও বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই ভাবে বৈচিত্র্যময় সরল পল্লীজীবনের যখন আর কোনই আকর্ষণ রহিলনা, তখন অভিশপ্ত গ্রাম্য শ্রমজীবির দল কল-কারখানার ভিতরে আপনাদের বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র পন্থা আবিষ্কার করিল। পল্লীর যাহা গৌরবের, সহর তাহা নিঃশেষে শুষিয়া লইয়া গেল। গ্রামে থাকিতে তাহারা যে আয় করিত তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ আয় করিয়াও তাহাদের অভাবের কোন কিনারা হইল না; নানা প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া অনবরত ঘুরপাক খাইয়া মরিতে লাগিল। কেননা জীবন-ধারণের আদর্শ এখন ফিরিয়া গিয়াছে! গ্রামের বল, বুদ্ধি, চাতুর্য্য সম্পদ এই প্রকারে অপহরণ করিয়া সহর আজ উন্নত। কিন্তু শ্রীহারা পল্লীর শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দীর্ঘনিশ্বাসের ফলে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেন অশান্তিও দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বত্রই আতঙ্কের চিহ্ন বিদ্যমান। শ্রম ও শ্রমজীবি সম্বন্ধে নিত্য নূতন অধ্যায় লিখিত হইতে লাগিল। পল্লীর কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরুত্থান দ্বারা পল্লীসমাজ সংস্কার করিয়া এ সমস্যা পূরণের দিকে বড় কাহারও দৃষ্টি গেল না। শ্রমজীবিদের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য নানাবিধ আইন-কানুন উদ্ভাবন করিয়া ইহার মীমাংসার বন্দোবস্ত হইল। তাহাতে হতভাগ্যদের পরলোকের কোন রকম পাথেয় সংগ্রহ হওয়া তো দূরের কথা, ইহলোকের পাথেয়েরও কোনও সুবন্দোবস্ত হইল না। সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাই মনে হয় যে 'শ্রম ও শ্রমজীবি' বিষয়ক গবেষণায় "গ্রামে ফিরিয়া যাও" এই সারবান কথাটীর আলোচনায় অনেক সুফল ফলিবে; এবং অর্থবিজ্ঞানের শ্রমের মূল্য নির্দ্দেশ করিবার পক্ষে অনেক সহায়তা হইবে। অর্থবিজ্ঞানে ভাঙ্গা-গড়া এখনও চলিতেছে, তাই সাহস করিয়া এই সব কথা বলিলাম।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

---

# দিবাশেষে

আজি দিবাশেষে
বিশ্বের রহস্যময় পরিপূর্ণ বেশে
কি কথা কহিলে কাণে কাণে;
বিশ্ব তার সবটুকু জানে কি গো জানে?
ক্লান্তিপাশে মানি পরাভব,
জানে কি লভিতে তব অতুল বৈভব?
নবীনের জয়-যাত্রা আরম্ভিতে পরাজয়মাঝে,
গুমরি ওঠেনি ধরা লাজে?
বাড়ে সারা দিবসের ক্ষুধা;—
কোথায় সঞ্চিত তব সঞ্জীবনী সুধা,
সে খবর কাণে কাণে বলিলে কি তুমি চুপে চুপে,
বিশ্বের রহস্য-কথা ব্যক্ত আজি কোন মায়ারূপে?...

দীর্ঘ সারা দিনমান খেটে
অপূর্ণ রহিল কাজ, বেলা যায় কেটে
বাড়ে সুধু নিরাশার দুর্বিসহ গ্লানি;
ব্যর্থতার উপহাস ঘরে তুলে আনি
লজ্জানত আঁখি
অতীত কলঙ্কভরা পিছনের পথে চেয়ে থাকি
বারে বারে ভরি ওঠে তপ্ত আঁখি-জলে;
কি বলে বোঝাই তারে,—সান্ত্বনার কোন্ কথা বলে!
অগৌরব গাঢ় চারি পাশে,
তবু দিবা-অবসানে শান্ত মন কি পূর্ণ বিশ্বাসে!
ফিরে ফিরে চাষা তার অপূর্ণ কাজের পানে চাহি,

ব্যর্থ কৃতকার্য্যতার লজ্জাপথ বাহি,
ফেরে জীর্ণ বাসে আপনার ;
অপূর্ণতা-মাঝে পায় কি করে সে পূর্ণতা অপার ?···

দিবসের খুঁটীনাটী কাজ
সাঙ্গ করিল যেই দিবাশেষে আজ
লভি পরিপূর্ণতার নিরমল শুভ আলিঙ্গন,
তৃপ্ত আজি বুভুক্ষিত ক্লান্ত দেহ মন !—
সে ত নহে মিছে,
গৌরবের ইতিহাস ধ্বনিয়া উঠিছে তার পিছে।
তাহার অতীত এক পরিপূর্ণ সফলতাময়।
পরিতৃপ্ত দেহে মনে—সে তো মোটে অসম্ভব নয় !

কিন্তু আজি দিবা-অবসানে,
কেহই বঞ্চিত নহে তব শুভ দানে।
মিছে যার কেটে গেল দিন,
জীবন-ভাণ্ডার যার শূন্য পুঁজিহীন ;
ব্যর্থ মিছে খাটুনির শেষে,
সেও তৃপ্ত তব দান লভিয়া নিঃশেষে !
ভাবি তাই মনে,—
বর্ত্তমান সে কি বাঁধা ভবিষ্যৎ-শৃঙ্খল-বাঁধনে ?
বর্ত্তমান যার ব্যর্থ লজ্জাভার গুরু,
সেও তৃপ্ত ভবিষ্যতে সফলের জয়যাত্রা করিবারে সুরু।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

---

# পারিবারিক নারী-সমস্যা

১

ইব্‌সেনের Doll's House এর নায়িকা 'নোরা'র এই কথা ক'টিতে নারী-সমস্যার মূল সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে,—"সর্ব্বপ্রথমে আমি মানুষ, তার পরে পত্নী ও জননী।"

নারী সম্বন্ধে অসংখ্য সমস্যার ভিতরের কথা এইটি,—নারী আর নিজেকে পুরুষের চোখ দিয়ে দেখ্‌তে চায় না, পুরুষের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ-সূত্রে নিজের কথা ভাবতে সে অসম্মত। তাই বাংলার 'শুভা'ও বলে, "কেন, পুরুষের আশ্রয় ছাড়া কি স্ত্রীলোকের চলেনা ?" তাইত ! কেন নারী বল্‌তে বোঝাবে পত্নী ও জননী ? পুরুষ বল্‌তে যেমন পুরুষই বুঝায়, স্বামী ও পিতা বুঝায় না, তেমনি নারী বল্‌তে শুধু নারীই বোঝাবে না ? নারীর কথায় পুরুষের কথা এসে পড়ে, কই পুরুষের প্রসঙ্গে ত নারীর কথা ওঠে না ! শিক্ষার আলোকে যতই তার চোখ ফুটচে, ততই তার মনে জাগ্‌ছে এই-সব প্রশ্ন, আর নারী সমস্যা ততই জটিল হয়ে উঠ্‌ছে দেশে-বিদেশে।

পরিবারকেই তার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মক্ষেত্র বলে নির্দ্দেশ করা গেছে, কিন্তু পরিবারে কোথায় তার স্থান ? পত্নীরূপে সে পতির দাসী, মাতারূপে সে"সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র।" সতীত্বের গৌরব, মাতৃত্বের মহিমা সব ফাঁকি, তাকে বেঁধে রাখ্‌বার ফাঁদ ! কারণ, সে হাজার সুখেও দাসী, স্বামীর সোহাগ পেলেও তাঁর Doll wife ছাড়া আর কিছু নয়। স্বামীর মন জুগিয়ে যাকে চল্‌তে হয়, সে দাসী নয় ত কি ? বিদ্রোহিনী 'নোরা' স্বামীকে সত্যই কথাই বলেছিল, "I live by performing tricks for you." কিন্তু কেন এমন হয় ?

২

স্ত্রী-পুরুষই যখন পরিবার গঠন করে,—তখন স্বামীর উপরে থাকে অর্থ-সংগ্রহের ভার, স্ত্রীর উপরে অর্থব্যয়ের। তাই নারীকে কোনো কালে স্বাবলম্বন শিক্ষা করতে হয় না, স্বামীর অভাবে পরিবার চালাবার সামর্থ্যও অর্জ্জন করতে হয় না, এইটেই তার যত দুঃখের কারণ। সে চায় পুরুষের আশ্রয়, তাই তাকে দাম দিতে হয় আত্মমর্য্যাদা। পুরুষের আশ্রয়ের বিনিময়ে সে আত্মবিক্রয় করে, পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হয়, তাই অধিকার দাবী করার অধিকার তার নাই। পুরুষের মন জুগিয়ে তাকে চল্‌তে হয়, নানা ছলা-কলার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে হাতে রাখ্‌তে হয়, পাছে কাণ্ডারীর অভাবে কোনো দিন অকূল সমুদ্রে ডুবে মরি !

তাই সব দেশেই নারীর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য স্বামীর সেবা, তাই সতীত্বের অর্থ পাতিব্রত্য, যদিও সৎ-ত্বের অর্থ পত্নী-ব্রততার কাছ দিয়েও যায় না।

স্বামীর কাছে সে যে ভালবাসা পায় সে ত কামুকের ভালবাসা, বড় জোর ছেলের মা বলে কিম্বা ভালো গৃহিণী বলে ভালবাসা। নোরা যথার্থই বলেছিল, পুরুষে ভালবাসে ভালবাসায় আমোদ পাওয়া যায় বলে, আমোদটুকু গেলেই তার ভালবাসার নেশা ছুটে যায়। ভালবাসার এই ছলনায় তবু নারী সন্তুষ্ট থাকে কেন? দু-চারটা সোহাগের বাণীতে সে স্বর্গ-সুখ পায় কেন? কারণ এ তার আশার অতীত, এ যেন 'ফাও'! এ ভালবাসা না পেলেও তাকে স্বামীর মন জুগিয়ে চল্‌তেই হবে, অন্য উপায় নাই, স্বামীর অভাবে সে যে নিরুপায়, তার সন্তানগুলি অনাথ। সেও তার স্বামীকে যে ভালবাসা দেয় তার কতখানি [illegible]ের ও নিজের সন্তানদের স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত, কতখানি লোক-নিন্দার খাতিরে দেওয়া, আর কতখানিই বা খাঁটি, তা কে জানে? ভালবাসার ছলনা নিয়ে কারবার কর্‌তে হয়, এ হীনতা সে স্বীকার করে কেন? কারণ সে নিজে অক্ষম, পরনির্ভর, পঙ্গু; আর তার সন্তানের বোঝাও তাকে অবনত করে রাখে। কোনোদিন স্বাধীন হতে চাইলেও সে হতে পারে না, যতখানি তার নিজের জন্যে না, ততখানি তার সন্তানদের জন্যে। তাই স্বামীর অত্যাচার মুখ বুজে তাকে সহ্য কর্‌তে হয়, অন্ততঃ এ দেশে, যেখানে লক্ষহীরার উপাখ্যানের এত আদর!

৩

যে পরিবারে একটুতেই স্ত্রী-পুরুষে পরস্পরকে সন্দেহ করে, ভালবাসা না থাক্‌লেও তার অভিনয় কর্‌তে হয়, যেখানে একজনের প্রভুত্ব ও অন্যের দাসত্বের দ্বারা মনুষ্য-মর্য্যাদা পরিহার কর্‌তে হয়, তাতে জগতের কি কল্যাণ? অতএব নারী সমস্যার যেটুকু তার অক্ষমতা ও পারিবারিক অধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত তার মীমাংসা করতে হলে প্রথমেই পরিবার সংস্কার করতে হবে। পরিবারে যদি পুরুষ ও নারী অনন্যনির্ভর স্বাবলম্বী হয় [illegible]

নিতে হয়, প্রেমের মিথ্যা অভিনয় কর্‌তে হয়, তা থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। দুটি সর্ব্বথা-স্বাধীন যুবক-যুবতী যাদের মধ্যে একমাত্র বাঁধন প্রেমের একনিষ্ঠতা তারাই যেন পরিবার সৃষ্টি করে; যখনি তাদের প্রেমের অবসান হবে তখনি যেন পরিবার-বন্ধন হতে উভয়েই মুক্ত হয়, কোনোরকম বাধ্য-বাধকতা যেন তাদের বাধা না হয়। যেখানে প্রেমের বন্ধন নাই, সেখানে বিধি-নিষেধের বন্ধন কৃত্রিমতার সৃষ্টি করে, হীনতার প্রশ্রয় দেয়। সেখানে সহবাসের অর্থ পাপাচরণ। যে বিবাহ প্রণয়াত্মক নয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ বা অন্ধ কুসংস্কারে যার জন্ম, নর-নারী উভয়েরই তাতে অকল্যাণ, সন্তানেরও অপমান, অবহেলা ও অহিত। প্রণয় ভঙ্গ হলেই বিবাহচ্ছেদ করতে হবে, আর সেজন্য প্রস্তুত থাকাও চাই।

প্রশ্ন উঠ্‌বে, পরিবার যদি পতি-পত্নীর এতখানি স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রণয়ের মত অস্থির ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে এবং প্রণয়ের অন্ত হলেই পরিবারেরও ইতি হয়, তবে সন্তানের ভারটা কার উপরে ন্যস্ত হবে? পিতামাতা উভয়েরই উপরে, না, কোনো একজনের? এর দুটি উত্তর সম্ভব। প্রথম, উভয়েই সন্তানের ভার ভাগ করে নেবে, যেমন ইউরোপে হয়। কিন্তু এর উপরে নির্ভর করা যায় না। কারণ পুরুষের উপরে নির্ভর করলে নারীর স্বাধীনতা খর্ব্ব হবে। আইনও কোনোকালে তাকে স্বাধীন কর্‌তে পার্‌বে না, সে যদি নিজে সেজন্য প্রস্তুত না হয়। সন্তানের জন্মদানে পিতামাতা উভয়েরই দায়িত্ব সমান হলেও মায়ের সঙ্গে সন্তানের নিকটতর সম্বন্ধ। মা'ই তাদের বেশী ভালবাসে। পশুপক্ষীদের মধ্যেও দেখি, মাতার উপরে শিশুর ভার। প্রকৃতির যেন উদ্দেশ্যই এই যে—জন্মদাত্রীই সন্তানের পালিকা হবে; তারই যেন গরজ বেশী। তাই পুরুষের উপর নির্ভর না করে এ বিষয়ে নিজেরই প্রস্তুত থাকা উচিত। এ বিষয়েও যদি পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়, তবে মাতৃত্ব স্বীকার না করাই ভাল, কারণ মাতৃত্ব স্বীকার করতে গিয়ে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়ার চেয়ে স্বাধীনতার খাতিরে মাতৃত্ব বলি দেওয়া শ্রেয়ঃ। কিন্তু মাতৃত্ব স্বীকার করেও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত।

সুতরাং দ্বিতীয় উত্তর অর্থাৎ নারীর উপরেই সন্তানের ভার ন্যস্ত হবে, এইটাই অধিকতর সঙ্গত। তা হলে নারীকে কেবল যে আত্মপোষণের যোগ্যতা লাভ কর্‌তে হবে তা নয়, সন্তান-প্রতিপালনের ক্ষমতাও অর্জ্জন কর্‌তে হবে। তবেই পরিবারে নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। স্বামীর সঙ্গে থাক্‌বে কেবল প্রেমের সম্পর্ক, তিনি আর স্বামী থাক্‌বেন না, হবেন সখা। এ সম্পর্ক যেদিন মিথ্যা হয়ে যাবে, সেদিন যেন সে একাই পরিবারের ভার নিতে পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত থাকে।

৪

বল্‌তে পারা যায়, নারীর পক্ষে নিজের ভারই দুর্ব্বহ হবে, সন্তানের ভার বইতে হলে সে ত মাতৃত্ব স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু এটা কি আমরা ইতর প্রাণীদের মধ্যেও দেখি না? মানুষের মাঝেও এর দৃষ্টান্ত আছে বর্ম্মায় ও অসভ্য জাতিদের মধ্যে। মাতৃত্বের প্রতি যদি নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে তবে মাতৃত্বের কষ্ট তাদের বাধা দেবে না। অধিকন্তু মাতৃত্ব বহুমূল্য হলে তাতে নারীর গৌরবই প্রতিষ্ঠিত হবে, মাতৃত্বের যথার্থ মহিমাই ফুটে উঠবে। শুধু সন্তানের জন্ম দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া, পালনের জন্যে স্বামীর মুখ চেয়ে স্বামীর নীচত্ব স্বীকার করে ভালবাসার হীন অভিনয় করা—একে অমূল্য মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করে শস্তায় মাতৃত্ব অর্জ্জন করা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? নিজের চেষ্টায় সন্তানকে মানুষ করার যে সুখ সেই ত মাতৃত্বের মহিমাময় গৌরব।

পুরুষের সাহায্য যে পরিমাণ উপেক্ষা কর্‌তে বল্‌লাম, তা হয়ত প্রয়োজন হবে না; সমাজও হয়ত শিশুর সুরক্ষণে নিজের লাভ মনে করে এ কাজে নারীর সাহায্য কর্‌তে পারে। (বোল্‌শেভিক রাষ্ট্র যেমন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে); সমাজের সাহায্য পেলে নারী হয়ত মাতৃত্ব স্বীকার কর্‌তে কুণ্ঠিত হবে না; তবু এতটা ভরসা করা আপাততঃ অসঙ্গত। তাতে মাতৃগৌরবের কিছু হানিও হয়। মনে রাখতে হবে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আদর ও শান্তি স্বাধীনতার বিনিময়ে পাওয়া যায় তার চেয়ে ঢের ভালো

সাহায্য প্রত্যাখ্যান। নারীর আত্মমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা তার স্বাতন্ত্র্যে, আর এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য চাই আর্থিক স্বাবলম্বন।

এক আর্থিক স্বাবলম্বন দিয়ে বিরাট নারী-সমস্যার মীমাংসা হতে পারে। যে দেশে নারীর আর্থিক স্বাধীনতা আছে সেদেশে পুরুষের আইন তাকে বাঁধ্‌তে পারেনি। নারীর অধীনতা, দাসীত্ব ও হীনতা সেইখানেই বেশী যেখানে সে আর্থিক স্বাধীনতা না পেয়ে পুরুষের গলগ্রহ হয়েছে। সেইখানে পুরুষকে মুগ্ধ করবার জন্যে যত ছলাকলা, যত বিচিত্র বেশভুষা, যত মোহিনী বিদ্যা, যত মিথ্যাচার! সেইখানে বরপণ প্রথার সৃষ্টি, husband-huntingএর উদ্ভব। সেইখানেই নারী কৃত্রিম সতী হয়ে নাম কেনে, সুলভ মাতৃত্বের জন্য সম্মান পায়। বরপণের প্রচলন কেন হলো? কারণ, নারীর বোঝা বহন করতে, সাধু ভাষায় তাকে বিবাহ করতে যে সম্মত হবে, তার চেয়ে নারীরই গরজ বেশী, পরের গলগ্রহ না হলে তার চলে না। পুরুষ বিয়ে না করে থাকৃতে পারে, নারী বিয়ে না করে পারে না, ঠিক এই কারণে। আরো একটি কারণ আছে। পুরুষ শত কুকার্য্য কর্‌লেও মার্জ্জনা পায়, ভালো হতে পারে, স্ত্রীপুত্র পালন কর্‌বার যোগ্যতা থাক্‌লে তার বিয়েও আটকায় না; কিন্তু নারীর একবার পদস্খলন হলেই সর্ব্বনাশ! কেউ তাকে বিয়ে কর্‌বে না; তার ও তার সন্তানের ভার নেবে না, তার নিজেরও সে ক্ষমতা নাই। কন্যাদায়ের জন্য বরপণ দিতে হয়, কিন্তু আসল দায় ত কন্যা নয়, আসল দায় হচ্ছে যৌবনোদ্‌গমে কন্যার চরিত্র ঠিক্ থাকবে কিনা সেই আশঙ্কা। বরপণ প্রথা নারীর অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে জন্মলাভ করেছে, যেমন এককালে কৌলীন্য প্রথা করেছিল।

৫

বাস্তবিক নারীর অক্ষমতার উপর নির্ভর করে কত কুপ্রথার যে সৃষ্টি হয়েছে, বলে শেষ করা যায় না বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বিধবার পুনর্ব্বিবাহে বাধা, বরপণ, কন্যা বিক্রয়, স্ত্রী বিক্রয়, স্ত্রী বিনিময়, সহমরণ, অবরোধ,

'স্বামীসেবা' 'বিবাহ' 'স্বামী' প্রভৃতি অপমান কর শব্দের উৎপত্তি,—আর কত বল্‌ব? নারীকে সহধার্ম্মিণী বলা গেছে, কিন্তু পুরুষকে সহধর্ম্মী বলা হয় না কেন? ইউরোপে বিবাহের পরে নারী স্বামীর কৌলিক উপাধি নিতে বাধ্য হয় কেন? এ সমস্তই তার হীনতা সূচনা কর্‌ছে। বিয়ে কর্‌লেই এ সব হীনতা তাকে স্বীকার কর্‌তে হবে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিয়ে না করে সন্তানের জন্ম দিলে ত পুরুষের বিশেষ কিছু হয় না, নারীর লাঞ্ছনার চরম হয় কেন? দু'চারটা মন্ত্র পড়ে থাক্‌লে ত তাকেই লোকে সতী বল্‌ত, মাতার সম্মান দিত। বিবাহ ত যৌন মিলনের নির্লজ্জতা ঢাকা দেবার একট ভাবের আবরণ। মন্ত্র কতগুলো আওড়ালে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মাতায় essentially কোনো পার্থক্য হয়? বিবাহ প্রথার আশ্রয় না নিলে নারীর মাতৃসম্মান কোথায় যায়? কেন যায়? আসল কারণ, নারীর সামর্থ্য নাই সন্তান পালন কর্‌বার, এ বিষয়ে সে সন্তানের জন্ম-দাতার মুখাপেক্ষী। বিবাহে তার সন্তানের সেই পালকের উপর তার দাবী হয় অন্যথা দাবী থাকে না। বিবাহের obligation না থাক্‌লে তার সন্তানের পিতা তাকে ও তার সন্তানকে পালন কর্‌বার জন্যে বাধ্য থাকে না। তখন নারী হয় সমাজের গলগ্রহ। সমাজ অবশ্য এটা চায় না। নারী যদি আত্ম-নির্ভরশীল হত, সন্তানকেও পালন কর্‌তে পার্‌ত, তবে হয়ত সমাজ তাকে নিন্দা কর্‌ত না, বর্ম্মায় যেমন করে না। বর্ম্মায় কয়েক দিন একত্র থাক্‌লেই পতিপত্নী হতে পারা যায়, নারী সেদেশে নিজেকে ও নিজের সন্তানকে, অনেক স্থলে, স্বামীকেও পালন করে। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে বিবাহ-প্রথা নাই, সহবাস কর্‌লেই পতিপত্নী, এবং ইচ্ছা কর্‌লেই বিচ্ছেদ।

৬

পরিবার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ প্রথারও পরিবর্ত্তন কর্‌তে হবে। সব দেশেই নারী বিবাহ কর্‌লেই পুরুষের চেয়ে নিম্নতর স্থান পায়, তার অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের দেশে বিবাহ ত স্ত্রীভোগের অধিকার; স্ত্রী একটা ভোগ-সামগ্রী, পাঁজি দেখে ভোগ করতে হয়; দরকার হলে আবার বিয়ে কর্‌তে পার! স্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে অস্থাবর সম্পত্তি লাভ হবে। বিবাহকে নারীর পক্ষে সুবিধার কর্‌তে হবে; বিবাহ-ভঙ্গ প্রথাটাকেও সুপ্রচলিত ও সুলভ করা চাই।

এক সময় হয়ত বিবাহ প্রথাটাকেই তুলে দিতে হবে অবশ্য আধ্যাত্মিক কারণে। বিবাহে দম্পতীর পরস্পরের উপরে যে অধিকার বোধ জন্মায়, কতগুলো obligation কল্পনা করতে হয় তা যথার্থ প্রণয়ের পরিপন্থী। অধিকার বোধ জন্মালে প্রণয়ের জোর কমে যায়। বিবাহ প্রথাটীতেও স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি একটা সন্দেহ অন্তর্নিহিত। বিবাহ করলে যেন একটা আস্থা হয়, কেউ কাউকে ত্যাগ কর্‌বে না, একটা বাঁধন অনুভব কর্‌বে। প্রণয়ের দাবীই যদি চূড়ান্ত হত তবে বিবাহ অনাবশ্যক হত। প্রণয় ছাড়া অন্য কিছু দরকার হয় বলেই বিবাহে কতগুলা মন্ত্র-তন্ত্র দরকার হয়, আইনের জোর বাঞ্ছনীয় হয়। তারপর, যাকে দেবী বলে মনে কর্‌বে, যে তাকে সঙ্গ-দানে বাধিত কর্‌ছে বলে মনে কর্‌বে, তাকে যদি পুরুষ একান্ত আপনারই বলে ভাবে তবে ভালবাসার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়, শ্রদ্ধা চলে যায়। তাই যেদিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠ নারীর সহিত আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষের স্বেচ্ছামিলন হবে, সে মিলনে আত্মবিকাশ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য থাক্‌বে না, স্থূল স্বার্থের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম স্বার্থই প্রবল হবে, সেদিন হয় ত বিবাহ-বন্ধন অনাবশ্যক হবে। সেদিন স্বাধীনতার চরম বিকাশের দিন। দায়িত্ব-বোধেরও পূর্ণ পরিণতির দিন।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।

# কোকিল ডাকে

কোকিল ডাকে ভোরের ফাঁকে আম্র শাখে !
ভোরের হৃদয় যায় যে চিরে ব্যথার তীরে
হঠাৎ-ধীরে !
যে বউ ঘুমায় সবার বুকে
জেগে ওঠে বিধুর সুখে
মধুর দুখে—
যায় সে ভেসে নয়ন-নীরে !
কি ঘুম ভাঙায় এই সকালে—জাগায় কাকে ?
কোকিল ডাকে !

মনে পড়ে চাইত কি মন কিশোর যখন—
সে কোন্ স্বপন !
সে যে কি সাধ, কিসের আশা
তরুণ বুকে বাঁধল বাসা
সর্ব্বনাশা—
জাগায় শুধু নিবিড় বেদন !
মনে পড়ায় ভুলে-যাওয়া সেই কথাকে !
কোকিল ডাকে !

মনে পড়ে ছেলেবেলার বন্ধু খেলার
মিলন-মেলার !
নবীন জাগা ভালবাসা
প্রথম প্রেমের আঁখির-ভাষা
আবেগ-আশা—
তরুণ-জীবন হেলা-ফেলার !
প্রাণের প্রিয় ভুলেছি যায় জানায় তাকে—
কোকিল ডাকে !

হায়রে হায়—মন যে কি চায় তাই কি জানায়
কোকিল আমায় ?
ভুলেই আছি মন যে কি চায়
দিবানিশি ছুটছি মিছায়
ভুলের পিছায়—
মনের কাজে সময় কোথায় !
কোকিল কি তাই ধরছে খুলে হৃদয়টাকে !

সারাজীবন নিদ্রাগত তন্দ্রাহত
মড়ার মত !
সোনার কাঠির পরশ পেলে
হিয়াকমল কোরক মেলে
স্বপন ঠেলে—
সুধার রসে মুগ্ধ-মত !
পরশ মণি দেখতে খুঁজে তাই কি হাঁকে ?
কোকিল ডাকে !

ঐ যে পাখী জীবন-ব্যাপী তুচ্ছতা কি
জানায় নাকি ?
কাট্‌ছে জীবন ভীড়ের মাঝে
বাজে কথায় ব্যর্থ কাজে
সকাল সাঁঝে—
সবই বাকি—আসল ফাঁকি
কোকিল বলে, জড়িয়ে কেন মিথ্যা-পাকে ?
কোকিল ডাকে !
ভ্রান্ত পথিক ! ফেরো দাঁড়াও পথের বাঁকে—
কোকিল ডাকে !

অন্তরেতে দেখ খুঁজে
চাও কি তুমি নাওনা বুঝে—
সত্য সুঝে—
যাত্রা কর গোলের ফাঁকে !
নিজেই বাধা হচ্ছ—ভাঙ সেই বাধাকে !
কোকিল ডাকে !

বরণ কর সত্য যে ঐ অন্তরেতে
আসন পেতে !
বিকাশে তার ভাঙ বাঁধন
প্রকাশে তার কর সাধন—
স্ব-আরাধন !
অন্তরেরই নন্দনেতে !
পূর্ণ-বিকচ ফোটাও জীবন-পদ্মটাকে !
কোকিল ডাকে !

# সমালোচনা

**পায়ের ধূলো।** শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি সামাজিক উপন্যাস; আন্‌কোরা নূতন—কোন সাময়িক পত্রে পূর্ব্বে বাহির হয় নাই। এই উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন,—"আমি যা দেখেছি, শুনেছি আর সম্ভব বলে মনে করেছি, তারই উপরে এই উপন্যাসের কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে। সামাজিক অন্যায়কে তুচ্ছ গোঁড়ামির মোহে আর বাক্-চাতুরীর আড়ালে গোপন না রেখে আমি তা প্রকাশ করে দিতে চাই। কাপড়-চাপা দিলে লুকানো থাক্‌লেও ফোড়া সারে না, সেজন্য চিকিৎসার দরকার...দেশের সাম্‌নে যে সমস্যাকে আজ এগিয়ে দিলুম, সে সমস্যা যাঁরা পূরণ কর্‌তে ভীত নন, তাঁরাও অগ্রসর হোন্, পদস্পৃষ্ট ঘৃণাক্লিষ্ট মানবতা তাঁদেরই পথ চেয়ে এতদিন অপেক্ষা করে আছে।" এই ভূমিকাটুকু এ উপন্যাসের key-note. উপন্যাসের নায়ক আলোকনাথ একালের ছেলে, নির্ভীক, সত্যপরায়ণ—প্রাণে তার যৌবনের সবুজ হিল্লোল বহিতেছে সর্ব্বক্ষণ। যাহা সত্য, যাহা ন্যায়—তাহারই সেবক সে; মিথ্যা বা ভণ্ডামির সে শত্রু। বলচর্চ্চা তার ধ্যান-জ্ঞান। গায়েও যেমন জোর, মনেও তেমনি জোর—এ যুগের 'হীরো' বলিতে আমরা এমনি মানুষই বুঝি। কোন রূপ মিথ্যা বা কুসংস্কারের জালে তার চিত্ত এতটুকু বাঁধা পড়ে নাই—মুক্ত স্বচ্ছ চিত্ত, আদর্শ তরুণ যুবা। এক দুর্য্যোগের রাত্রে সে বাড়ী ফিরিতেছিল যে-পল্লীর মধ্য দিয়া—সে পল্লীটির বর্ণনা লেখকের একটি ছত্রে পরিপূর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। লেখক বলিয়াছেন,—'এখানে কোন ভদ্রলোক থাকেন না, যারা থাকে, তারা সবাই বারবনিতা। বাসিন্দাদের মত সে পথটিরও জাত গিয়েছে।' এ পথ দিয়া আলোকনাথ বাড়ী ফিরিতেছিল কেন—না, "সে রাস্তা দিয়ে শীঘ্র বাড়ী পৌঁছানো যায়।' এ পথে ফিরিবার সময় হঠাৎ এক বিপন্না রমণীর আর্ত্তনাদে চমকিয়া সে একটা গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া মুকুলমালাকে দুর্বৃত্তদের হাত হইতে রক্ষা করে। মুকুল তরুণী, গৃহস্থের বৌ—রোজ বৈকালে কাজকর্ম্মের অবসরে ছাদের উপর গিয়া একটু হাঁফ ছাড়িত, আর সামনের বাড়ীর নূতন ভাড়াটিয়া জমিদার যুগলকিশোরও সেই সময় ছাদে উঠিত এবং 'অসভ্য ইঙ্গিতপূর্ণ খর দৃষ্টি' মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া থাকিত; মুকুল অগত্যা বিরক্ত হইয়া ছাদে ওঠা বন্ধ করিল। তার পর হঠাৎ একদিন একটা ঝী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল যে মুকুলের বাপ মোটর চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে; সে আসিয়াছে গাড়ী সঙ্গে মুকুলকে লইতে। মুকুলের বাপের সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ীর মনোমালিন্য ছিল—পাছে শ্বশুর-শাশুড়ী বাধা দেন, আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী তাহাকে যুগলকিশোরের কবলে আনিয়া ফেলিল। অর্থাৎ ঝী এবং তাহার বানানো গল্প সবই যুগলকিশোরের ফন্দীবাজীর ফল। যুগলকিশোর মুকুলকে এক বিশ্রী পল্লীর গৃহে আনিয়া তুলিল,—সে গৃহে থাকিত এক পতিতা নারী, রাধারাণী। রাধারাণীই মুকুলের দুঃখে গলিয়া চীৎকার করিয়া আলোককে ডাকে এবং মুকুলের তবে উদ্ধার হয়। তারপর সমস্যা হইল, মুকুল কোথায় যায়! রাধারাণী বলিল, "আমাদের সমাজকে আমি চিনি—বড় নিষ্ঠুর একচোখো সে।...পুরুষ তার বুকের দুলাল, সয়তান হলেও সে সমাজের স্নেহ হারায় না। কিন্তু আমরা নারী, অজান্‌তে একবার যদি পা হড়কে পড়ে যাই, সমাজ তাহলে আর আমাদের ওঠবার দ্বিতীয় সুযোগও দেয় না।" মুকুলের শ্বশুর মুকুলকে ঘরে লইলেন না—সে নিষ্পাপ জানিয়াও না। তারপর এই মুকুল আর রাধারাণীর ভার ও এমনি অভাগীদের উদ্ধার-ব্রত গ্রহণ করিয়া আলোকনাথ দেখিল, শুধু হিন্দু সমাজেই নয়—একেশ্বর-বাদীর সমাজেও—যাঁরা উদার বলিয়া নিজেদের প্রচার করেন—তাদের ঠাঁই নাই। উদার-মতাবলম্বী ব্রাহ্ম সত্যানন্দ বাবুও তাহাকে বলিলেন,—"তুমি যে আত্মত্যাগ স্বার্থত্যাগ করে অভাগীদের উদ্ধার-ব্রত নিয়েচ, এজন্যে তোমাকে আমার মনের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। কিন্তু এর বেশী আর কিছু করবার সাধ্য নেই।" এমন কি, তিনি এমন কথাও বলিলেন,—"তোমার চরিত্রে আমি সন্দেহ করচি না।...তবু আমাকে বলতে হচ্ছে যে তোমার সঙ্গে মঞ্জুর বিবাহ দিতে পারি, এ সাহস আর আমার নেই।" মঞ্জু সত্যানন্দ বাবুর কন্যা। আলোক তাহাকে ভালবাসিত। তারপর নানা চক্রান্তের ফেরে জেল অবধি আলোকনাথ ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু এই অভাগীদের সে ত্যাগ করিল না। জেল হইতে ফিরিয়া সে রাধারাণী মুকুলকে লইয়া পশ্চিমে গেল—সেখানে মুকুলের স্বামী নীতিশের সঙ্গে দেখা। নীতিশ ডাক্তার—স্ত্রীর সেই দুর্ভাগ্যের পর সে বেচারা দেশত্যাগী হইয়া বিদেশে আসে এবং আবার বিবাহ করিয়া সংসার পাতে। এখন সে মুকুলকে বলিল, "একালে এক স্বামীর দুই স্ত্রী, এটা যে একটা মস্ত কলঙ্কের কথা... অথচ তোমাকে বিনাদোষে ত্যাগ করাও আমার পক্ষে মহাপাপ।" মুকুলকে সে গ্রহণ করিল—সমাজে আর ফিরিতে চাহিল না, আলোকনাথের আশ্রমের কাজে নিজেকে সঁপিয়া দিল। মুকুলের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া আলোকনাথের এখনো একটা ভাবনা রহিল—সে ভাবনা রাধারাণীকে লইয়া। রাধারাণী কি বরাবরই একলা থাকিবে? সে রাধারাণীকে ভালবাসিত—রাধারাণীকে সে কায়-মনে আপনার সহধর্ম্মিণীভাবে

দাগা পাইয়াছিল। সে বলিল, "দেহের যৌবন পেয়ে প্রেম কি কখনো সুখী হতে পারে?…দেহ আমাকে বড় দাগা দিয়েচে, মানুষের চোখে আমাকে বড় ছোট করে রেখেচে। আর পাঁচজনের মত আপনিও যদি নীচু হয়ে সেই দেহ নিয়েই ছেলেখেলা করতে চান, তবে দেবত্বের সে অপমান দেখবার আগেই আমি আত্মহত্যা করব।" এ কথায় আলোকের মোহ ঘুচিল। সে বলিল, সে আর কখনো রাধারাণীর দেহকে চাহিয়া মনুষ্যত্বকে খাটো করিবে না—তবে "প্রভাতের সূর্য্য সাক্ষী, আজ থেকে আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার জীবনের সহধর্ম্মিণী,—আমার প্রেমে তোমার অধিকার, তোমার প্রেমে আমার অধিকার!"

এ উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। ইহার ভাবে-সুরে 'পূর্ব্ব-তোরণের উদয়-সূর্য্যের' তরুণ রশ্মি ঝলমল করিতেছে—আশার উচ্ছ্বাসে, আলোর ঢেউয়ে আগাগোড়া ভরপুর। মানুষকে মানুষ বলিয়াই লেখক গ্রহণ করিয়াছেন, তা সে ছোট হোক, যত হীন হোক—মানুষকে কীট পতঙ্গের মত হেলার সামগ্রী করিয়া কোথাও আঁকেন নাই। এইটাই মস্ত বিশেষত্ব। রচনায় অপরূপ কৌশল—আর্টে এমনি লীলায়িত যে এত-বড় সমস্যা-ঘটিত ব্যাপারে Purposeটুকু কোথাও উপন্যাসের রসকে খর্ব্ব করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই। বর্ত্তমান সমাজের বহু জীবের নিখুঁত ছবি ফটোগ্রাফের মতই উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়াছে—যুগলকিশোর, হরিদাসী, মুকুন্দের শ্বশুর, মঞ্জরী, এমন কি সংবাদপত্রের সম্পাদকটি অবধি নেপথ্যের অন্তরালে গোটা জীবন্ত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। শুধু উপন্যাস-পাঠক নয়, এ যুগের সমাজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যাকার বা হিতৈষী মাত্রকেই এ উপন্যাস খানি পড়িতে আমরা অনুরোধ করি। লেখকের নির্ভীক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নব্য সমাজ-গঠনে প্রচুর সাহায্য করিবে। এ উপন্যাসখানিকে নব্য বঙ্গের মানবতার বিজয়-সঙ্গীত বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারি,—ভাবে ভাষায় সুরে ছন্দে একেবারে অপূর্ব্ব মনোরম।

**রসাল।** শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত। কলিকাতা ৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নিউ সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। দেশের সংস্কৃত ও প্রাদেশিক বহু প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে যে-সব সরস গল্প বা কাহিনীর ইঙ্গিত আছে, ইতিহাস আছে,—এ গ্রন্থে লেখক সেইগুলিকে সংগ্রহ করিয়াছেন। কাহিনীগুলি বেশ সরস এবং লেখকের সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় সেগুলি ফুটিয়াছে দীপ্ত কৌতূহলে।

**বন্দীর ডায়েরী।**—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক শ্রীফুলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। অসহযোগ-আন্দোলনের প্রথম ক্ষণে যাঁহারা দেশ-সেবায় অগ্রসর হইয়া স্বেচ্ছায় ছয়মাস তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। এই ছয়মাস জেলে বসিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, তাহাই ভাষায় লিখিয়াছেন। দেশের জাতীয় জাগরণের দিনে বাঙলার ইতিহাসের কয়েকটি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা এই বন্দীর ডায়েরিতে বিচিত্র বর্ণে ভারী সুন্দর ফুটিয়াছে। লেখক প্রাণ খুলিয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন, কোথাও লুকোচুরি করেন নাই। ফলে বইখানি খুব সরস, মনোরম ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে এ ডায়েরির পাতা কয়খানির মূল্য যথেষ্ট তো বটেই, তাছাড়া রস-সাহিত্য-হিসাবেও ইহার মূল্য অল্প নয়।

**মানসী।**—শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅখিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, অন্নদা বুকষ্টল, কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। 'মানসী' নামে একটি গল্প ও 'পুরীতে দিন কয়েক' একটি ভ্রমণ-কাহিনী এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। লেখকের ভাষা ভালো, গল্প বলিবার ভঙ্গীও তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। প্লটটি অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'পুরীতে দিন কয়েক' কাহিনীটির মধ্য দিয়া কৌতুকের যে স্বচ্ছ ধারা বহিয়া চলিয়াছে, তাহা নির্ম্মল এবং উপভোগ্য।

**ভাগ্য-নিরূপিতা।**—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু বি,এ প্রণীত। প্রকাশক, রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, ২৪ নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। বেঙ্গল প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি সামাজিক উপন্যাস। একমাত্র পুত্র মোহিতকে লইয়া তার বিধবা মা বিমলা কানপুরের ধনী ডাক্তার পিয়ারী বাবুর বাড়ী আশ্রয় লয়। পিয়ারী বাবুর পরিবারবর্গ মোহিত ও বিমলাকে বাড়ীর লোকের মতই সম্ভ্রমের চোখে দেখিত। পিয়ারী বাবুর দুই পুত্র,—অমর ও সমর এবং দুই কন্যা,—মমতা ও স্নেহ। মোহিত ভাল ছেলে; লেখাপড়া ও চরিত্রের গুণে সে সকলের বিশেষ প্রীতির পাত্র। মমতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; স্বামী দেবেন্দ্র অসচ্চরিত্র—অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীকে লাথি মারে এবং পরে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কই ছিল না। মমতা কাজেই পিতৃগৃহে থাকে। পাঁচ বৎসর পরে হঠাৎ দেবেন্দ্র একদিন শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া উপস্থিত—স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিতে। স্ত্রী মমতা তাহাকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করিতে পারিল না। দেবেন্দ্রর জ্যাঠা মহাশয় ইতিমধ্যে মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দেবেন্দ্রর স্ত্রীর নামে সম্পত্তি দান করিয়া যান। এই জন্যই দেবেন্দ্র আসিয়াছিল স্ত্রীকে লইতে। মমতা ঘৃণায় স্বামীর আদর প্রত্যাখ্যান করিল—কন্যা খুকীকে লইয়া সে বেশ থাকিবে, এমন কথাও স্পষ্ট খুলিয়া বলিল। দেবেন্দ্র তখন বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য কোনমতে একটা স্ত্রী সংগ্রহ করিবে ভাবিয়া পিয়ারী বাবুর ভগিনীপতি রাজা বাবুর আশ্রয় লইল। রাজা বাবু তাহার হাতে কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

বলিয়া পিয়ারী বাবুর নিষেধ ঠেলিয়াও কলিকাতায় আসিল। ঝড়ের ঘোরে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সে একেবারে সমাজ-পরিত্যক্তা সোণালীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। সোণালী ওদিকে দেবেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াই কুলত্যাগ করিয়াছিল এবং তাহারই আশ্রয়ে ছিল। সোণালী মোহিতকে ভাল বাসিয়া ফেলিল,—তখন দেবেন্দ্রও সরিয়া পড়িল। মোহিত কিন্তু তার ফাঁদে পা দিল না। গভীর ভালবাসার উপর তখন সোণালীর শ্রদ্ধা জাগিল তার উপর; এবং সে চিঠি লিখিয়া পিয়ারী বাবুর বাড়ী হইতে বিমলাদের কলিকাতায় আনাইয়া ফেলিল। স্নেহ মোহিতকে ভালবাসে; মোহিতও স্নেহকে ভাল বাসে—স্নেহ তাহাকে কানপুরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাহিল—এবং মোহিতের পায়ের ধূলা লইল। এইখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি। লেখকের এই প্রথম উদ্যম। কতকগুলি অবান্তর প্রসঙ্গ উপন্যাসে তিনি আনিয়া ফেলিয়াছেন, সেজন্য সবদিকে সমান মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তা সত্বেও বলিতেছি, উপন্যাস-রচনায় লেখকের বেশ হাত আছে। সোণালী, রাজাবাবু, মমতা, স্নেহ, ইন্দু—ইহাদের চরিত্র খুব ভালই আঁকা হইয়াছে। সোণালীর সঙ্গে মোহিতের মেশামেশিটা বেশী মাত্রায় গড়াইয়া মোহিতের চরিত্রে একটু অসঙ্গতির আভাষও যে জাগায় নাই, এমন বলিতে পারি না। তবে লেখক শেষ রক্ষা করিয়াছেন। লেখকের মনস্তত্বে অধিকার আছে—তার বিশ্লেষণে শক্তিও আছে। অবান্তর প্রসঙ্গ ছাঁটিয়া সংযত হইয়া লিখিলে তাঁর হাতে উপন্যাস খুলিবে ভাল। সোণালীর হৃদয়ের ছবিটুকু বেশ হইয়াছে—তবে সহসা মোহিতের দিকে অতখানি ঢলিয়া পড়িবার খুব সঙ্গত কারণও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিন্তু কথায় আছে, Love at first sight! ছোট-খাট কয়েকটা ত্রুটি মার্জ্জনীয়। মোটের উপর উপন্যাসখানি সরস, রচনা হৃদয়গ্রাহী। আমরা একাসনে বসিয়া বইখানি পড়িয়া ফেলিয়াছি।

**অনুরাগ**।—শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, ১৭নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ষ্টার প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। ৯৯ টি খণ্ড কবিতা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। বহিখানির একটি লম্বা রকমের 'বিজ্ঞপ্তি' বা ভূমিকা আছে। তাহাতে প্রকাশক মহাশয় আপনাকে জাহির করিয়াছেন, 'উকিল - হাইকোর্ট কলিকাতা' বলিয়া। হাইকোর্টে ওকালতির সঙ্গে সাহিত্যে ওকালতির কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই; তবে অবাক হইয়া গেলাম প্রকাশকের ধৃষ্টতা দেখিয়া। যে কবিতা 'ভগবৎ-নাম-গন্ধহীন,' তাহাকেই তিনি 'অসার কল্পনার কথা' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান্! তিনি লিখিয়াছেন, "সাধারণ স্ত্রীলোকের রচনার মত এই গ্রন্থ বাজে স্বভাবের শোভা বর্ণনা বা নর-নারীর সাংসারিক বিরহ ও প্রেমের কবিতা পুস্তক নহে," সাধারণ স্ত্রীলোক কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁদের সমস্ত রচনাই ফেল্না? বটে! উকিল হইয়া এ যুক্তি তিনি খাড়া করিলেন কি বলিয়া, ইহা ভাবিবার কথা। যাই হোক্, এ কবিতা-গ্রন্থখানি সম্বন্ধে এটুকু বলিতে পারি—রচনা চলন-সই। ছন্দে লেখিকার তেমন দখল না থাকিলেও ভাব নিতান্ত মামুলি নয়। অনেকগুলি কবিতার ভাব ভালো, ভাষা ভালো, আর সে ভাবের প্রকাশও স্পষ্ট। তবে এ গ্রন্থখানিকে প্রথম শ্রেণীর কাব্য কখনই বলিতে পারিব না।

**পঞ্চকন্যা**।—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায়, বি এ, ১৬নং শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে লেখক সীতা, ভগবতী দেবী, ভক্তিমতী রাবেয়া, পুণ্যবতী কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও ভগিনী ডোরা—এই চারটি আদর্শ নারী-চরিত্রের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ব বেশ দক্ষতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। ভাষা চমৎকার শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। বাঙালীর ঘরের প্রত্যেক বালিকাকে এ বইখানি পড়িতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। এ বই বালিকাদের চরিত্র-গঠনে প্রভূত সহায়তা করিবে।

**পথস্মৃতি**।—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ভাদুড়ী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম এ। ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্ ৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। ভাবের উচ্ছ্বাস, পদ্যে নয় গদ্যে। লেখকের ভাবুকতার পরিচয় কয়েক জায়গায় মন্দ প্রস্ফুট হয় নাই। নানা চিন্তার এক একটা উচ্ছ্বাস আমাদের মনে দোলা দিয়া যায় সময়ে সময়ে। এখানি ভাষার মালায় সেই সব ভাবের টুক্‌রার কয়েকটা উচ্ছ্বাস। স্থানে স্থানে কবিত্বও আছে। তবে রচনা একটু এলো-মেলো ঢিলা রকমের। লেখক আর একটু সংযমের চর্চ্চা করুন, ভাবে দানা বাঁধিবে, ব্যঞ্জনাও সরস হইবে।

**স্বরাজ কোন্ পথে?**—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীফুলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা। মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। 'মুখবন্ধে' লেখক বলিয়াছেন,—"অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গ শেষ হইয়াছে। সে তরঙ্গের আঘাত শাসনযন্ত্রের (administration) দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।…এইবার শোষন যন্ত্রের (Exploitation machinery) দিকে ইহার লক্ষ্য চালনা করিতে হইবে।" এই গ্রন্থে এই কয়টি নিবন্ধ আছে,—আমাদের সাধনা, সত্য প্রকাশ,' কো-অপারেটিভ ননকো-অপারেশন, সমবেতভাবে নিরুপদ্রব আইন-ভঙ্গ, কৃষিজীবি সমস্তা, শ্রমজীবি সমস্তা, জেলের ভয়, নারীজাতির কর্ত্তব্য, স্বরাজের সমস্তা, … ও সোশিয়ালিষ্ট আন্দোলন, কংগ্রেসের পুনর্গঠন

কাউন্সিলে যাওয়া, এবং কাউন্সিলে নন্‌-কো-অপারেশন। নিবন্ধগুলি সুচিন্তিত।

**রবীন্দ্র জন্মতিথি।**—রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা হইতে শ্রীমতী সুনীতি দেবী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ৩৩।১ সি ল্যান্সডাউন রোড কলিকাতা। আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা। এখানি ডায়েরির ধরণের বই; রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা হইতে নানা রসের নানা ভাবের পদাবলী তারিখে-তারিখে উদ্ধৃত হইয়াছে। য়ুরোপে আমেরিকায় বড় বড় লেখকদের পদাবলী তুলিয়া এমনি "Birth-day Present Book" উপহারের বই বিস্তর আছে, বাঙলায় ছিল না। সে অভাব-মোচনে আজ বাঙলা দেশের একটা কলঙ্কও ঘুচিল। বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জনের জন্মদিনে বা বাঙলা নববর্ষোৎসবে এ বইখানি উপহার দিবার মত; উপহার পাইয়া ঘরে রাখিবার মত বই রবীন্দ্রনাথের বাছা-বাছা ছত্র-সম্বলিত বইখানি রবীন্দ্র নাথের ভক্তদের পক্ষে যেমন আকাঙ্ক্ষিত, তেমনি চমৎকার হইয়াছে এ বইয়ের ছাপা আর বহিঃ-সৌষ্ঠব। গোলাপী কাগজে ঝরঝরে ছাপা। রবীন্দ্রনাথের একখানি চিত্রও ইহাতে আছে—বাঁধাইটুকু চমৎকার। আকার ছোট, বইখানি পকেটে বহিয়া বেড়াইতে কোন অসুবিধা হয় না। আশা করি রসজ্ঞ বাঙালী এ বইয়ের আদর করিবে।

**মায়া।**—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। সিদ্ধেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি সামাজিক উপন্যাস। তেজেশচন্দ্র জমিদারের ছেলে, বাপের পছন্দ-করা 'বাঙাল' দেশের মেয়ে বিবাহ করিবেন না বলিয়া যখন স্থির করিল, তখন বন্ধু নির্ম্মল তার বৌদির ভগ্নী মায়ার সঙ্গে তার বিবাহের কথা পাড়িল ও তার সামনেই তার বৌদি পাউডার মাখাইয়া নব্যা সাজাইয়া মায়াকে তেজেশের সামনে ধরিয়া দিল; তেজেশ মুগ্ধ। বিবাহও হইয়া গেল। তারপর ফুলশয্যার রাত্রে কালো কুৎসিত স্ত্রী দেখিয়া সে জ্বলিয়া উঠিল। জুয়াচুরি! স্ত্রীকে সে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। তারপর রাগের চোটে তেজেশ বিলাত গেল। তার হিন্দু বাপ উইল করিয়া বিষয়-সম্পত্তি তখন কালো কুৎসিত পুত্রবধূকেই দিয়া গেলেন, আর তেজেশ হইল, ত্যজ্যপুত্র। তেজেশ বিলাত হইতে ফিরিয়া সব শুনিয়া এক ইঙ্গ-বঙ্গের দলে মিশিল এবং মিসেস বোস নাম্নী এক অদ্ভুত চরিত্রের রমণীর বাড়ী খরচ-পত্র করিয়া পার্টি দিতে লাগিল, মিসেস বোসের কুমারী কন্যার রূপের মোহে পড়িয়া। তারপর সে মোটর কিনিল, জুয়েলারি কিনিয়া পুলিশকোর্টে আসামী হইল। স্ত্রী মায়ার সাক্ষ্যে মামলায় বাঁচিয়া গেল, কিন্তু শেষে বেচারী পাগল হইল। তখন স্ত্রী মায়ার সঙ্গে তার ভাব হইল। মায়া পাগলকে লইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। এ উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা অবাক হইয়াছি। যেমন আজগুবি প্লট, তেমনি আজগুবি চরিত্রও কি ইহাতে জড়ো হইয়াছে আগাগোড়া! এ-সব জীবকে সমাজের কোথা হইতে লেখক আমদানি করিলেন, জানি না! মিসেস বোস ব্যবহারে ভদ্র-মহিলা তো ননই, পতিতার সমাজেও এমন নির্লজ্জা নারী মেলে কি না জানিনা। তারপর নির্ম্মল আর তার বৌদির তরফে কোন সাফাই খাটিতে পারে না, অথচ লেখক জানাইতে চান, নির্ম্মল একটি আদর্শ চরিত্রের যুবা! যে-বন্ধু রূপসী বধূ বিবাহ করিতে চায়, জানিয়া শুনিয়া একটা কালো মেয়েকে পাউডারে ঢাকিয়া তার হাতে ধরিয়া দেওয়া শুধু বিশ্বাসঘাতকতা নয়, অতি নীচ, হীন জুয়াচুরির কাজ! জানিনা, লেখক কি উদ্দেশে এ উপন্যাস লিখিয়াছেন! সমাজ-হিতৈষা? না, আর কিছু? কিন্তু তিনি এটুকু জানিয়া রাখুন, রূপসী বধূর আকাঙ্ক্ষা করা কাহারও পক্ষে গর্হিত কাজ নয়, পাপও নয়। আর কত বলিব? উপন্যাসখানি আগাগোড়াই এলোমেলো। যে সমাজ আর যে সকল জীবের কার্য্যকলাপ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, আমাদের সৌভাগ্য যে তাদের দেখা আমাদের দেশে মেলে না —বোধ হয় কোন খানেই মেলে না। তাছাড়া লেখকের না আছে মানব-চরিত্রে জ্ঞান, না পারিয়াছেন তিনি চরিত্রাঙ্কন করিতে।

**আমার ফটো।**—শ্রীযুক্ত অবতারচন্দ্র লাহা প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। শাস্ত্র প্রচার প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস। লেখকের রচনার গুণে সেকালের সমাজের একটি করুণ কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায়, সরল অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে বেশ জোরালো বর্ণেই ফুটিয়াছে। গত যুগের বাঙলার ছবিও সেই সঙ্গে গোটা জীবন্ত কয়েকটি চরিত্রও স্বচ্ছন্দে হইয়া ফুটিয়াছে। রস রচনায় লেখকের হাত বেশ পাকা। পুষ্পদিদি, বিনোদিনী, লাট, ইহারা নিমেষেই প্রাণে এমন রেখা টানিয়া যায় যে, তাহা চট করিয়া মিলাইবার নয়। কাহিনীটি করুণ রসের হইলেও মাঝে মাঝে হাসির ফিনিক্ ফুটিয়াছেন। গল্পটি বেশ জমাট। গ্রন্থকারের উৎসর্গ-পত্রখানি খুব উপভোগ্য। লেখক বলিয়াছেন, "মণিমাণিক্য-খচিত দিব্যাভরণে বিভূষিত করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-শ্রী সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিবার জন্য যাঁহারা নিরন্তর প্রয়াসী, সেই নবীন সাহিত্যিকগণের করকমলে প্রবীণ লেখক এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিল। তাঁহাদের আর্ট টেলারিতে 'আমার ফটো' স্থান পাইলে রচনা সার্থক বিবেচনা করিব।" বয়সে প্রবীণ হইলেও লেখক রসজ্ঞ, তাই তাঁহার প্রাণে তারুণ্যের এই সজীব হিল্লোল, আর প্রাণটি তরুণ আছে বলিয়াই উপন্যাসখানিও সজীব সরস হইয়াছে। গোঁড়ামির কালি কোথাও ছিটাইয়া পড়ে নাই। তাজা প্রাণের কথায় বইখানিও ভরপুর।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ফকীরের ঘরে

ভারতী

৪৬শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩২৯ { দ্বাদশ সংখ্যা

# বাসন্তি পর্ব্ব

বাসন্তি পর্ব্বটি আরম্ভ করে দেবার ভার বিশ্ব-ভারতী সম্মিলনীর কর্ত্তারা আমাকে দিয়েছেন, এ যে ভারি বেসুরো রকম কাণ্ড হল, সুরের ওস্তাদ রইলো বসে একশো মাইল তফাতে এখানে বসে গেল কল্‌মি মানুষটা বসন্তের সুরে তোমাদের সুর মিশিয়ে দিতে, উৎসবটা যে একেবারে পুরোপুরি উৎসব হবেনা—খানিক কাযের কথা খানিক বাজে কথা নিয়ে আজকের সন্ধ্যাটা অন্য সব সন্ধ্যারই মতো বিশেষ একটা কিছু না হয়ে ওঠবারই সম্ভাবনা যে বেশী তা জানিয়ে রাখি। আমার উপরে কর্ত্তারা আজকের কটি ভার দিয়েছেন প্রথমতঃ গানের ভার,—সে ভার যাঁদের গলায় সুর আছে, বাঁশের বাঁশী যাঁদের হাতে বাজে এবং যন্ত্র হলেও সেটা যাঁদের হাতে সুরে বলে তাঁদের উপর নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত আছি। বাকি আর একটা ভার—সম্মিলনীর এবং বিশ্ব-ভারতীর কর্ত্তারা একটা গান শেখাবার ছোট-খাটো বন্দোবস্ত করতে প্রস্তুত হয়েছেন—সেই খবরটা আপনাদের জানিয়ে দিতে হবে, অবশ্য এই গান কোথায় শেখানো হবে এবং কবে কবে বোলপুর থেকে কে এসে সে সব গান শেখাবে—এ সমস্তই হিসাব মতো ছাপা হয়ে আপনাদের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব পৌছবে আমি শুধু এই গান শেখানো কেন দরকার তারি সম্বন্ধে দু-এক কথায় কিছু বলে নেবো—বিশ্ব-ভারতী সেখানে কি ভাবে কি উপায়ে দেশ-বিদেশের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে তা আপনারা জানেন এবং এই সহরের মধ্যে যে বিশ্ব-ভারতী সম্মিলনী এটিও কি ভাবে বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে চলেছে তারও হিসেব অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে—এই কয় মাসে—কিন্তু এই দুই বড় অনুষ্ঠানের খুঁটি-নাটি হিসেব আমাদের সামনে ধরা থাকলেও আমি সেখানে গিয়ে যা দেখলেম এবং এখানে এসে যা দেখেছি তাতে করে আমি বুঝেছি যে বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিশ্ব-ভারতী-সম্মিলনীর সম্পূর্ণ যোগ এখনো ঘটে নি ; তাই আমি বিশ্ব-ভারতীর যে রূপটি সেদিন স্বচক্ষে দেখে এসেছি তার একটা পরিষ্কার ছবি ধরতে চাই আপনাদের সামনে তবেই বোঝা যাবে ছাপানো স্বরলিপির কৃত্রিম রাস্তা ধরে না গিয়ে সেখানকার গুণীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে সেখানকার সুরের আর গানের সঙ্গে এখানকার যাদের গলায় এবং মনের সুর আছে তাঁদের মিলিয়ে দেবার চেষ্টার মধ্যে কতকটা সার্থকতা আছে। সেখানকার যে অনুষ্ঠান তার মধ্যে আমি তিনটে সুস্পষ্ট ভাগ দেখলেম ! যে তিনটে ভাগ মিলে সমস্ত ব্যাপারটা এক তা এই—বিশ্ব-ভারতী, সুরুল গ্রাম এবং শান্তিনিকেতন। আমি দেখলেম বিশ্ব-ভারতী বলে অংশটা মানুষের জ্ঞানের নূতন ও পুরাতনের দুইদিকটাতেই আপনাকে প্রসারিত করে চলেছে—তারপর সুরুলের কর্ম্মক্ষেত্র সেদিক দিয়ে কর্ম্মিরা দেশের পল্লী-সমাজের দিকে অনুষ্ঠানটির প্রসার দিচ্ছে ধীরে ধীরে সব শেষে

শান্তিনিকেতন। সেটি মানুষের আর্টকে দোলা দিচ্ছে মায়ের মতো নিজের কোলে, অতি চমৎকার অতি গভীর অনুষ্ঠান সমস্ত এই শান্তিনিকেতনে চলেছে দিনরাত,—নিত্য উৎসবের সুরে ছন্দে মানুষ হয়ে উঠেছে এখানে মানুষ! এই জায়গাটির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মেলবার রাস্তা আমরা খুলে নিতে চাই গান শেখাবার যে বন্দোবস্তটি করবো—সেটি দিয়ে! হাতের শিল্পের দিক দিয়ে সেখানকার সঙ্গে এখানকার আমাদের যোগাযোগ আমাদের মধ্যে থেকে জন-কতক শিল্পী সেখানে গিয়ে সেখানের কায ও এখানকার কায এক করে নিয়ে যতটা পারা যায় সমাধান করে তুলছেন এবং এই সম্মিলনীও ঋতুতে ঋতুতে সেখানকার উৎসব এখানে টেনে এনে এ অনুষ্ঠানে সে অনুষ্ঠানে এখানের আমাদের এবং সেখানের তাঁদের এক হয়ে মেলার পথ করে দিচ্ছে—কিন্তু এটা কিছুতেই আমরা অস্বীকার করতে পারবোনা। সে সেখানকার ঠিক সুরটির সঙ্গে আমরা সুর মেলাতে এখনও পারছিলে। আমি দেখেছি উৎসবে তারা আসে এখানে এবং উৎসব করে যায়, আমরা শুধু দর্শক নয় শ্রোতা হয়েই যাই উৎসব ক্ষেত্রে! এখানে এসে তারা দেখে—উৎসবে যোগদানে অপ্রস্তুত হয়েই বসে আছি আমরা, আমাদের হাতের বাঁশী অনভ্যস্ত সুর নিয়ে এগিয়ে যায়, স্বরলিপি দেখে শেখা গলার সুর পদে পদে ঠেকে যায়, ঠকে যায় তাদের সুরে সুর মেলাতে গিয়ে! এ একবার নয় প্রত্যেক বারে ঘটছে! এই বেসুরটুকু দোরস্ত করে নিতে চায় এখানকার সম্মিলনী এবং তার একমাত্র উপায় সেখান থেকে তাদের কেউ এসে নিয়মিত এখানে আমাদের মাঝে বসে সেখানকার গানের সুর ধরে যদি। আমি দেখে এলেম সেখানে গান রচনা হয়েই চলেছে, স্বরলিপি ছাপার কল সেই রচনার স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না, এখানে আসতে হবে তাদের সেখানে যেতে হবে আমাদের সুর ধরতে, তবেই উৎসবের দিক দিয়ে সেখানে এখানে মিলন হবে সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে। গান রচনা হচ্ছে সেখানে যে আনন্দ আর আলোর পরশে,—সে পরশ স্বরলিপির কৃত্রিমতার মধ্যে দিয়ে কেমন করে আসে মিলবেনা যতদিন এভাবে আমরা সুর ধরতে চেষ্টা করবো।

বিশ্ব-ভারতীর কাজের সঙ্গে, সুরুলের কাযের সঙ্গে, শুধু কাযের দিক দিয়ে মেলবারই পথ এখানকার সম্মিলনী খুলে দেবে আর শান্তি-নিকেতনের সুরের পথ উৎসবের পথ আনন্দের পথ মুক্ত করে দেবেনা,—কিম্বা সরকারি জলকর বিভাগ যে ভাবে নদীর মুখে আগল লাগিয়ে ইচ্ছা মতো জলদান করে আমাদের গ্রামবাসীদের সেইভাবে সম্মিলনীর কখন কখন সুবিধা মতো উৎসবের ব্যবস্থা করবে খুব হিসেব করে— এ হতেই পারে না! সম্মিলনী এখানকার কিছুতে সম্পূর্ণ ভাবে মিলতে পারবে না সেখানকার সঙ্গে যদি না এই সুরের পথ অকাতরে খুলে দেয়! বিশ্ব-ভারতীর এবং সুরুল কৃষি বিভাগের কাযের দিক দিয়ে সেখানকার বৃহৎ অনুষ্ঠানটির সঙ্গে মেলা সম্মিলনীর সবার পক্ষে উপযোগী হবেনা, সে কাযের কাযি যারা তারাই কেবল মিলতে পারে ঐ দুই পথে সেখানে সঙ্গে, কায জিনিষটার ধর্ম্মই এই যে উপযোগী অনুপযোগী পাত্র বেছে সেখানে চলা চাই না হলে অনেক রাঁধুনীতে একসঙ্গে মিলতে গেলে রান্নাটা নষ্ট না হয়ে যায় না। বিশ্বের জনকতকের মিলন হতে পারে বিশ্ব-ভারতীর কায দিয়ে তেমনি কৃষিক্ষেত্রের কায সেও সবার মিলন ক্ষেত্র হতে পারে না কিন্তু গান বাজনা উৎসব নাট্যকলা চিত্রকলা—রংএর উৎসব সুরের উৎসব—এ সবাইকে এনে মেলাতে পারে এক জায়গায়। অনেককে না হলে উৎসব করা চলে না কিন্তু কায করা চলে নিরবিলি। কায নিজেকে গুড়িয়ে নিয়ে সম্পন্ন হতে চায়, উৎসব সুর সার সমস্তই আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে সার্থকতা পায়, এইখানে তফাৎ সুরের পথে আর কাযের পথে। গুটির মধ্যে নিরবিলি থাকে পোকা কাযের সময়, তখন বিশ্বের কিছুর সঙ্গে তার দেখা শোনা পরিচয় নেই বল্লেও চলে, আপনাকে আপনি নিয়ে বসে আছে সে একলা কিন্তু রঙীন সাজে যে দিন সে উৎসবে বার হল সেদিন আলোর সঙ্গে ফুলের সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে আকাশের সঙ্গে সে এক হয়ে গেল। উৎসবের দিক দিয়ে,

তবেই তো সম্মিলনী বলাতে পারবো আমাদের এখানকার ব্যাপারটিকে না হলে এটা আরো দশটা কাযের আফিস হয়েই থাকবে। আমি দেখে এলেম সেখানে বসে থেকেও বিশ্ব-ভারতী এবং স্কুলের অনেকেই শান্তিনিকেতনের যথার্থ সুরে সুর মেলাতে পারছেনা—নদীর ধারে বসে তারা পিপাসায় মরছে; সুতরাং কাযের সঙ্গে উৎসব ও সুরকে জুড়ে দেওয়া যে কতখানি কঠিন তা আমি বেশ বুঝেছি এবং এতটা শক্ত কাজ বলেই এটাতে সেখানকার গুণীদের সাহায্য চাচ্ছি আমরা—এখানে আমাদের সুর বেঁধে তোলবার জন্যে। এখন গুণী এলো কিন্তু আমরা যেমন উদাসীন তেমনি রইলেম—দর্শক নয় শ্রোতার এ হলে চলবেনা-সেটা যে একটা মস্ত প্রহসন হবে, কিছু না হওয়ার চেয়ে প্রহসন ও ভাল তাই আমি তো মনে করেছি কেউ তোমরা যদি গান শিখতে না চাও তো আমি এবং আমার ভাঙ্গা এস্‌রাজ নিয়ে গুণীর সামনে গিয়ে বলবো এস আমি রাজি ধর সুর ধর। এই তো আজকের কাযের কথা শেষ করলেম এইবার দুএকটা বাজে কথা দিয়ে আমার যেটুকু বলবার আছে সম্মিলনীর কাছে তা বলে নিই।

বিশ্ব-ভারতীর একদল কমিটি যে এখানে বোলপুরে কে যাচ্ছে আসছে এবং সেখানে গিয়ে কারা কি করলে কেবা কি নিয়ে এল সেখান থেকে—বসে বসে হিসেব নিচ্ছে এটা আমার মনেই ছিল না। দিন কতক হল যখন বোলপুরে যাই তখন ঠিক গাড়ীতে ওঠার পূর্ব্বে একটা চিঠি পেয়েছিলেম তাতে রবিবারে বোলপুরে ডাঁকালো একটা কমিটি হবে লেখা ছিল, সে রবিবারটা যে সাতদিন পরের রবিবার তা দেখিনি, কমিটির একটা দুঃস্বপ্ন যাবার সময় লেগেছিল আমার সঙ্গে, তারপর রেলের চলা চলিতে যেটুকু সুর বাঁধা ছিল নিজের সেটা ঢিলে হয়ে গেল একেবারে। এমনি অসাড় অবস্থায় গিয়ে তো পৌছলেম, সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে বোলপুর ষ্টেশনটার স্থাপত্য দেশী কি বিলাতি মোগল অথবা বুদ্ধিস্ত সেটা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মন সব প্রথম গিয়ে চোখ মেল্লে

পালাবার এটা বুঝে মনটা আশ্বস্ত হল—সেন্টিমেণ্টালিটি, ইন্‌টালেকচুয়ালিটি, স্পিরিচুয়ালিটি' ন্যেসালালিটি ইত্যাদি তথাকথিত জিনিষকে আমি বরাবরএড়িয়ে চলেছি—সুতরাং শান্তিনিকেতন থেকে এমনি সব সামগ্রীর একটি ও নিয়ে আসিনি আমি। আমি গিয়েছিলেম সেখানে কায করতে খেলা আর কায দুইকে এক করে সেখানে যে পুব পশ্চিম জোড়া রাস্তার মাঝে ছোট একটি সেতু গড়া হয়ে গেছে সেটাতে একটা খিল হাল্কা হয়েছিল তাতে করে খেলার দিকে রইতে চাই ছিলো খেলা, কাযের দিকে হেলে পড়ছিল কায, এই সে নতুন সেতুর একটু কসুর সেটা দোরস্ত করে দিয়ে এসেছি আমি এবং তারা সবাই মিলে। আমি ঠিক হিসেব করে গিয়েছিলেম একদিন থাকবো কায মিটিয়ে দিয়ে চলে আসবো,—আমার কথায় বিশ্বাস না হয় সেখানকার তাদের শুধিও মেরামতের কাযে আমাদের মোটে হয়তো পাঁচমিনিট সময় লেগেছিল, তারপর পাঁচদিন কেন যে সেখানে বসে রইলেম তা আমি ও জানিনে তারাও জানেনা। কে কি করলে কে কতটুকু দিলে এবং তার বদলে কতখানি পেয়ে গেল তার হিসেব কেউ রাখেনা সেখানে, ভারি বেহিসেবি জায়গা সেটা, যত বেখবরই লোক বাস করছে সেখানে। দেখলেম বড় বড় পাকা রাস্তা তার এক একটা প্রস্তুত করতে কত অর্থ কত খাটুনি, এমনি এক একটা রাস্তা ধরে চলি ভাবি নিশ্চয় এটা ধরে গেলে একটা বড় গোছের মন্দির নয় লাইব্রেরী নয় সঙ্গীত কি নাট্যশালায় পৌছে যাবো, চলতে আরম্ভ করি শেষে গিয়ে দেখি কোন রাস্তা মিলিয়ে গেল গিয়ে একটা আম বাগানে যেখানে আলোছায়া আল্‌পনা টেনে খেলা করছে আবার কোনটা নিয়ে গিয়ে আমাকে ছেড়ে দিলে তেপান্তর মাঠের ধারে একটা রাঙ্গা মাটির ঢেউ খেলানো পথ হারানো রাস্তায়! সব রাস্তা গুলোই দেখি আমাকে বলে চলো, কোথায় চলবো এবং কোথায় গিয়ে যে পৌছবো সে কথা একেবারেই বলে না, তার পর ঘর বাড়িগুলোর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়—আমি বলি তোরা ঝড়ে উড়ে যাস্ জলে ধ্বসে পড়িস

রকম বিশ্ববিদ্যালয়, নালন্দা অথবা গ্র্যাণ্ড হোটেলে পরিণত করে দিয়ে চলে যায় আর কিছু কালের মতো বাজে খরচও বন্ধ হয়। খড়ের চালে চড়াই আর কাঠবেরালীগুলো কিচ্ মিচ্ করে এর উত্তর দেয়, কি যে বলে তার মাথা মুণ্ডু হিসেব পাইনে! আর সেখানকার মানুষগুলো কার কাছে কি যে পেলে তার হিসেব মোটেই রাখে না, দেয় ঢেলে যতটা পারে—দেবার বেলায়! দাঁড়ি পাল্লার দেখা পেলেম না কোথাও সব দিক দিয়ে জীবনটাকে অপচয় করার অভ্যাস আমারো একটু একটু আছে—কিন্তু ওখানকার কাণ্ডকারখানা দেখে আমিও ভাবতেম যদি এরা সরকারি কোন খাতাঞ্চির হাতে পড়তো তবে এই পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ জোড়া একটা বিশ্ব-ভারতীর পত্তন দিচ্ছে, যারা এতখানি বেহিসেবি এলো মেলো ভাবে তাদের হাতে হাতে শাস্তি এবং ফাটক দুইই হয়ে যেতো। ওখানে যারা রয়েছেন তাঁরা অনেকে ইউরোপ আমেরিকা থেকে এসেছেন এবং সবাই কাযের মানুষ, এই বেহিসেবি ঢিলে ঢালা কারখানা দেখে তারা কিভাবে জানতে আমার ভারি কৌতুহল হল—তাদের এক এক জনকে শুধোলেম—সমস্ত কারখানাটা কেমন বোধ হচ্ছে! যাকেই শুধোই উত্তর শুনি-বেশ চলছে,—এ অতি চমৎকার ব্যাপার হয়ে উঠছে এমনটি কোথাও নেই! যারা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ, এমনি সব বড় বড় ব্যাপার দেখে এসেছে তারা এতে কেন খুসি হয় বুঝতে আমার একটু দেরী হল,—তার পর কথায় কথায় টের পেলেম ব্যাপাটার আরম্ভটাই তাদের মাতিয়ে তুলেছে এই যে আরম্ভ অথচ যার শেষ হবার দিকে কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, এই যে অফুরন্ত বিরাট আরম্ভ যা একটা মাত্র জীবন নিয়ে মানুষ আরম্ভ করে দিয়েছে শেষ করতে পারবে না এটা জেনেও এটি বড় চমৎকার বড় অদ্ভুদ বড় নূতন ঠেকলো, বেশ শেষ হয়ে সে দ্বিতীয় নালন্দা বা দ্বিতীয় কেম্ব্রিজ বা আর কিছুর ছায়া হয়ে উঠতে চাইছে না ব্যাপারটা এই নতুন রূপ কাণ্ডটা আমার কাছে ভারি একটা সান্ত্বনার বিষয় বলে ঠেকেছে। প্রত্যেক ঋতুর প্রথম পদক্ষেপে সেখানে উৎসব হচ্ছে, সেই একই ঋত যেখানে অন্ত আরম্ভে নতুন উৎসব সৃষ্টি হচ্ছে, পুরোণোর রেশ লাগছে গিয়ে নতুন আরম্ভের আয়োজনে, পুরোণোর সঙ্গে নতুনের বিচ্ছেদ হতে পাচ্ছেনা দুই মিলে একটা প্রকাণ্ড আরম্ভের টাটকা পরশ সৃজন করছে। আমি ভেবেছিলেম মাঠের মাঝে এক একা দিন গুলো বুঝি কাটতেই চাইবে না, কিন্তু দেখি সূর্য্যোদয় থেকে চন্দ্রোদয় এবং তার পরেও সময় কিছু না কিছু কর্‌তে কেটে যাচ্ছে অথচ কেউ ডেকে বলে না—এটা কর ওটা কর, কিছু না করতে চাও তারও আয়োজন কিছু করতে চাও তারও আয়োজন চারিদিকে ধরা রয়েছে প্রচুর; এমন চমৎকার অতিথিশালা যেখানে আমি যে কারু অতিথি এটা বোধ করে না মন, মনে হয় যেন এ সবই আমারি এই ছেলে মেয়েরা—যাদের নামও জানিনে ধামও এমন কত-শত ছেলেমেয়ে, এই যে মরুভূমির বুকের তলা থেকে শীতল ধারা এ আমারি, এই যে শুকনো নদী তার কতকালের বসে বসে গড়া ফটিকের খেলনা গুলো মাঠের এক পাশে স্তুপাকার করে সাজিয়ে রেখেছে এ সবই আমারি। সহরে ঘুরি চারিদিকে দেখি—এটা অমুকের রাস্তা, ওটা অমুকের বাড়ি, সেটা অমুকের আফিস, এমন কি যে বাড়িটায় জন্মেছি ও মরতে চলেছি সেটাও আমার নয় মিউনিসি-পালিটির! এই প্রকাণ্ড মিউনিসিপাল মার্কেট—কাজ-কর্ম্ম শিক্ষা-দীক্ষা কোন কিছুতে হিসেবে ভুল একটু যেখানে হবার উপায় নেই এখানে নিজেকে নিজে, নিজের মধ্যেটাকে নিজের বলে ধরাই যায় না, আর সেখানে সবই নিজের নিজেও নিজের জেনে মনটা ভারি, আরাম পায়। দেখলেম কচি কচি ছেলেরা আমাকে ডাকে তাদের গল্প বলে ঘুম পাড়াতে আমার ভয় হয় ছেলেদের খেলা ঘরে বুড়ো হয়ে কেমন করে যাই খেলতে-দুহাত দুটো ছেলেতে ধরে নিয়ে চলে শুকনো পাতায় ছাওয়া শালবনের মাঝ দিয়ে, যেতে যেতে দেখি বার্দ্ধক্যটা খসে যাচ্ছে মন থেকে, ডাইনে বাঁয়ে উড়ে যাচ্ছে বাতাস পেয়ে! খেলাঘরে পৌঁছে দেখি বাধা কিছু নেই ছেলেতে বুড়োতে মিলে বাজে গল্প করতে। ছেলেবেলায় বেজান্ সহরের গল্প শিখেছিলেম সেখানে মানুষ পাষাণ হয়ে গেছে গাছ পালা হাতি ঘোড়া, পাথর

এলেম জিন্দীবাদের গল্প-যেখানে পাথর হয়ে উঠছে জীবন্ত এবং মানুষের ভাবনা একটার পর আর একটা মূর্ত্তি ধরে চলচে বলছে! এই মায়াপুরি তার প্রতিষ্ঠা কিসের উপর মানুষের জ্ঞান পিপাসার উপর না তার সংসারে বৈরাগ্যের উপর না দেশ হিতৈষীর উপর বা আর কিছুর উপর এ প্রশ্নের উত্তর চেয়ে আমার মন কেবলি ফিরেছে সেখানে আমের বনে বাঁধের ধারে মাঠের উপরে! তারপর দেখলেম সেখানকার পূর্ণিমার উৎসব কিন্তু কই সেখানেও শুধুই তো আলো আর আনন্দের তারে ঘা পড়লো না সে রাতে, বসন্তের আরম্ভের চাঁদনীর রাত শুধুতো আনন্দই জানালে না সে যে বেদনা জানালে বাঁশীতে—বড় আনন্দের মতো বড় বেদনা, বেদনার কথা দিয়ে সে আরম্ভ করলে শীতের সঙ্গে নতুন বসন্তের মিলন গান! সে গানের সুর আমার গলায় তো ধরিনি কেবল কথা গুলো মনে নিয়ে এসেছি বেদনায় ভরা! এখানকার বাসন্তি পর্ব্বের আরম্ভটাতে সেই বেদনা আমি তোমাদের জানাচ্ছি যাদের সুর আছে গলায় আর মনে—

"পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি
ভাবনা আমার পথ ভোলে
যেন সিন্ধু পারের পাখি তারা
যায় যায় যায় চলে।
আলো ছায়ার সুরে
অনেক কালের সে কোন্ দূরে
ডাকে আয় আয় আয় বলে
যেথায় চলে গেছে আমার
হারা ফাগুন রাতি—
সেথায় তারা ফিরে ফিরে
খোঁজে আপন সাথী।
আলো ছায়ায় যেথা
অনেক দিনের সে কোন বাথা
কাঁদে হায় হায় হায় বলে।"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# পরের ছেলে

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে দেখা,—তখনকার দশ বৎসরের বালক কিশোর এখন বিংশতি বর্ষীয় যুবা, তবু চিনিতে তো ভুল হইল না! পূর্ব্ব শ্রীর কণামাত্র এখন সেই শীর্ণ রুক্ষ অকাল জরায় আচ্ছন্ন শরীরে নাই—তবুও কি করিয়া যে ইহা সম্ভব হইল, তাহা কিশোর ভাবিয়া পাইতেছিল না! সমস্ত রাত্রি সে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতেছিল, ইহা তাহার কল্পনামাত্রই নয় তো? যাঁহার স্মৃতি এই দশ বৎসরে প্রাণপণে সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, নিজের আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার সম্বন্ধে একটা দারুণ লজ্জা ক্রমে বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষের আকারে তাহার কিশোর জীবনকে জর্জ্জরিত করিয়া শেষে আঘাত করিয়া নিজের জীবন-পথ হইতে—বুঝি সংসারের পথ হইতেই—সরাইয়া দিয়াছে, এই দশ বৎসরে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত সে যে আর মনে আনিতে চাহে নাই—তবু সেই নাম কানে আসিবামাত্র কি করিয়া অন্তর মুহূর্ত্তের মধ্যে বলিয়া দিল, এই সেই ব্যক্তি! দশ বৎসরের দীর্ঘ অদর্শন, আকৃতির প্রভূত পরিবর্ত্তন, সর্ব্বশেষে দশ বৎসরের অনিচ্ছুক বালকের অন্তরস্থ বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণায় জড়িত অপ্রিয় স্মৃতি, তাহার এতখানি প্রভাব দেখিয়া যুবক কিশোর আজ স্তম্ভিত হইতেছিল। বার বার সে ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিল, এই শীর্ণ জরাগ্রস্ত কুদর্শন প্রৌঢ়ত্ব কি সেই উজ্জ্বল-কান্তি সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবকের পরিণাম? না, না—এ বুঝি সে নয়! রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এ তাহার একটা

দুর্ব্বলতাই তাহাকে বুঝি এই অকারণ ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে।

মন কিন্তু এই সান্ত্বনা লইবার বেশীক্ষণ অবকাশ পাইতেছিল না। অন্তরে ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হওয়ার স্মৃতিতে যে শিশুকে 'মাণিক' বলিয়া তাহার অন্তশ্চক্ষুর সাম্‌নে আনিয়া দাঁড় করাইতেছিল, সেই পিতৃ-সর্ব্বস্ব পিতৃমাত্র-জীবিত বালক 'মাণিক' হইতে সেই পিতার উপরে ঘোর বিতৃষ্ণ বিদ্বিষ্ট কিশোর কিশোর একবাক্যে একসুরে যে তাহাকে আজ বুঝাইয়া দিতেছে, এই সেই,—সেই এই! যুবক কিশোরের তো আজ সেই শিশু মাণিক ও সেই কিশোরের কথা ঠেলিবার কোন উপায় নাই! যে ব্যক্তির সহিত তাহার আজ কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তাহার ধারণা, তাহার সহিত কিশোরের অন্তর-বাসী ঐ দুই বালকের যে সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ—তাহারা যাহাকে "এই সেই" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, যুবক কিশোরের সাধ্যও নাই যে তাহাদের সে নির্দ্দেশকে সে অন্যথা করিতে পারে! তাহাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির অস্তিত্ব যে একেবারে অভিন্ন। না—সেইই বটে, ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

সমস্ত রাত্রি কিশোরের একটা তন্দ্রার জড়তার মধ্যে কাটিল। যেন কতকগুলা অতি অস্পষ্ট মোছা মোছা ধোঁয়া ধোঁয়া স্বপ্নের সমষ্টি! যেন সেই তিন বছরের মাণিক কাহার গলা ধরিয়া বুকে জড়াইয়া বলিতেছে, "বাবা—আমি তোমায় বুকে 'মেথে' শোব!" কাহার উপরে অত্যন্ত আব্‌দার করিয়া দামালি করিয়া হাত পা ছুড়িতেছে, বায়না ধরিতেছে—কাঁদিতেছে, আবার কোলে উঠিয়া অপরিসীম সুখের হাসি হাসিতেছে! কাহাকে একদণ্ড দেখিতে না পাইয়া সঙ্গ না পাইয়া বুক ফাটাইয়া চেঁচাইতেছে—অভিমানে ফুলিতেছে—আবার কি অপরিসীম আদরে সে ক্ষোভ জুড়াইয়া যাইতেছে! কিশোরের অন্তশ্চক্ষুর উপরে এমনি করিয়া তন্দ্রা জাল বুনিয়া চলিতেছিল, দেহ যেন কেমন এলাইয়া রহিয়াছে—ইন্দ্রিয় সব সমান সজাগ—কিন্তু তবু তাহাদের সাধ্য নাই, সে চেতনের কে যেন অনবরত ডাকিতেছে 'মাণিক—মাণিক!' আর তাহার উত্তর অতি শিশুকণ্ঠে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইতেছে, 'বাবা—বাবা—' সে কণ্ঠ যে কিশোরের অত্যন্ত পরিচিত!

"কিশোর!" জোরে যেন মেঘ ডাকিয়া উঠিল—যে মেঘে বাজ পড়ে ঠিক্ তেমনি তাহার শব্দ! সচকিতে কিশোরের অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু একেবারে খুলিয়া গেল—জাগ্রত স্বপ্ন সরিয়া গেল। "এমন করে ঘুমুচ্ছিস্ কেন? ভাল করে শো—সুস্থ হয়ে ঘুমো!" রাজেশ্বরীর এই আদেশে সে পালঙ্কের অন্যদিকে পাশ ফিরিল। তিনি চলিয়া গেলেন; তাঁহার কণ্ঠস্বরের রেশ্‌টুকু আবার কিশোরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া সেখানে বায়স্কোপ্ রচনা করিয়া চলিল।

স্মৃতির দুয়ারে তেমনি করিয়া কে যেন আবার বলিতেছে, "কিশোর—কিশোর—" কিন্তু কি এ ছবি? এ যে ঘোর অস্পষ্ট! মাণিকের মত তেমনি উজ্জ্বল পরিষ্কার তো নয়! চিন্তার ঘন কুয়াশা—লজ্জার বিদ্যুৎ চমক,—আর ব্যথা—ব্যথা—ব্যথা,—অপরিসীম বেদনায় সে ছবি একেবারে বিবর্ণ! ক্রমে সেই ব্যর্থ ব্যথার অব্যক্ত লজ্জার আরক্ত ক্ষোভের ঘন-ঘোর মেঘোদয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল ক্রোধ যেন কাহাকে ধ্বংস করিবার জন্যই একেবারে বদ্ধ-পরিকর হইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে! কাণে যাইতেছে তাহার মাঝে হইতে যেন রুদ্ধ রোষ সাপের মত গর্জ্জাইয়া উঠিতেছে, "চাইনা ওঁকে আমি, উনি কেন—কেন আমার কাছে কাছে থাক্‌বেন? সরে যান্ উনি আমার সুমুখ থেকে; কিসের সম্বন্ধ আর আমার ওঁর সঙ্গে?' তারপরে বাজের মত সেই কথা কয়টি নিজের কাণের কাছে আবার ডাকিয়া উঠিল, "বিনয়বাবু গেলে আমি যাব না।"

স্বপ্নের বাজের শব্দে দেহে মনে চমকিয়া কিশোর এইবার একেবারে জাগিয়া উঠিল; জাগিয়া দেখিল, ঘামে দেহ ভিজিয়া গিয়াছে, বুক ধড়্‌ধড়্ করিতেছে—মুখ শুষ্ক! বাহিরে চাহিয়া দেখিল, চারিদিক্ আলো—বজ্রাঘাতের নয়—প্রভাতের! নবসূর্য্যের রক্তিম কিরণ সাশি ভেদ করিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে।

বৈকালে রাজেশ্বরী ধীরে ধীরে কিশোরের কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানা আসন টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথাই কহেন না দেখিয়া কিশোর সঙ্কুচিত ভাবে একবার তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিতেই দেখিল, তিনিও নির্ব্বাক ভাবে কিশোরের মুখের পানেই চাহিয়া আছেন। এ ভাব রাজেশ্বরীর পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। তিনি কিছু বলিতে বা সন্ধান লইতে আসিলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করা তাঁহার স্বভাবের একেবারেই বহির্ভূত বিষয়, তাই কিশোর অন্তরে অন্তরে সহসা অনেকখানিই কুণ্ঠিত হইয়া মাথা নামাইল। মনে পড়িল, প্রভাতে মাতার সঙ্গে সাক্ষাতের ভয়ে সকালেই ক্লাশ আছে বলিয়া সে বাড়ী হইতে পলাইয়া ছিল এবং দুপুরেও এক বন্ধুর নিকটে যাচিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এই সাদর নিমন্ত্রণের সংবাদটীও বাড়ীতে পাঠাইয়াছিল; তার পর দুপুরে নিঃশব্দে বাড়ী গিয়া নিজ কক্ষে শুইয়া পড়িয়াছিল। বুঝিতেছিল, এমন করিয়া রাজেশ্বরীর নিকট হইতে কতক্ষণ সে পলাইয়া বাঁচিবে! নিশ্চয়ই কল্যকার জবাব-দিহিতে তাহাকে এইবার পড়িতেই হইবে। কিন্তু এখন তাঁহার মুখ দেখিয়া সে যেন দ্বিগুণ ভীত হইয়া পড়িল। তিনিও যে জানিতে পারিয়াছেন তাহাতে তো সন্দেহ মাত্রই নাই, এ ছাড়া আরও কিছু যেন তাঁহার মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু আর কি হইতে পারে, তাহাই কিশোর আন্দাজ করিতে পারিতেছিল না,—তাই সে মাথা নামাইয়া নিঃশব্দে মাতার বাক্যস্ফূর্ত্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আর কিছুক্ষণ পরে রাজেশ্বরী কথা কহিলেন। কেবল ভূমিকামাত্র না করিয়া গম্ভীর মুখে ধরা গলায় বলিলেন, "তাহলে সত্যি? সত্যিই তাহলে?"

কিশোর তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়াও তিনি যে কি প্রশ্ন করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছিল; তাই চোখ তুলিতে না পারিয়া একভাবে মাথা নামাইয়াই রহিল। উত্তর না পাইয়া এইবারে রাজেশ্বরীর ধৈর্য্য বেন খানিকটা ভাঙিয়া গেল, ঈষৎ আর্দ্র কণ্ঠে একটু চেঁচাইয়াই পুনর্ব্বার আমাদের সেই? সন্দেহমাত্র আর নেই? এ চিঠি তাহলে তারই চিঠি? তারই লেখা এ?"

এইবার কিশোর মাথা তুলিয়া চাহিল। চিঠি! কে কাহাকে লিখিয়াছে? রাজেশ্বরী কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া হস্তস্থিত একখানা কাগজকে হাতের মধ্যে সজোরে নিষ্পেষণ করিতে করিতে যেন নিজেকে কতকটা সাম্‌লাইয়া লইতে লাগিলেন। কিশোর বারকতক তাঁহার হাতের দিকে চাহিয়া আবার মাথা নামাইল। কৌতূহলের বা কিছু জানিবার কি অধিকার আছে তার!

কিছুক্ষণ পরে রাজেশ্বরী পুনর্ব্বার ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তুমি তাহ'লে এই জন্যেই তাকে চিন্‌তে পেরেই পালিয়ে এসেছিলে? না?" কিশোর তখনো হাঁ না কিছুই বলিতে পারিল না।

"বুঝলুম, কিন্তু রাত্রে আমায় একবার জানালে হতো না কি?"

কিশোর তখন মাথা তুলিয়া সজোরে যেন কণ্ঠকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া শুষ্ক শান্ত স্বরে বলিল, "কেন?"

"কেন?—আমার কর্ত্তব্য তাহলে খানিকটা করবার অবকাশ পেতুম।"

একই ভাবে কিশোর আবার উত্তরের প্রত্যাশায় পুনঃ প্রশ্ন করিল, "কি তোমার কর্ত্তব্য?"

পুত্রের শুষ্ক স্বরে কঠিন হইয়া উঠিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "সে তোমায় এখন বলা নিরর্থক। কিন্তু ওদের কি এতে সন্দেহ কর্‌তে বাকি থাক্‌ল, ভেবেচ?"

"কিসের সন্দেহ?"

"সেও তোমায় ব'লে বুঝোতে হবে? ওরা কি সন্দেহ করছে না যে নিশ্চয় এই বিনয় বাবুর সঙ্গে আমাদের কোন গূঢ়—"

"সন্দেহ মাত্র? তাও কি আজ নতুন করে মা? ঝরণা বা ওঁরা কি জানেন না যে আমি কি, কি আমার পরিচয়—আমি কে?"

দ্বিগুণ কঠোরভাবে রাজেশ্বরী বলিলেন, "তোমার এ পরিচয় এ তো বেশী অস্বাভাবিক নয় কিশোর। জগতে

আছে। কিন্তু যা কাল তুমি তাদের বুঝিয়ে এসেছ,—এই ঘটনাটাই জগতে খুব বিরল।"

রাজেশ্বরীর এ কথায় উত্তেজিত না হইয়া কিশোর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি মিছে লজ্জা বোধ করছ মা! আমাদের কথা তো ওঁরা জানেনই! যদি তাঁকে ওঁরা এখন চিন্‌তেই পেরে থাকেন—তাতেই বা নতুন ক'রে কি এমন লজ্জার বিষয় হয়েছে—"

"তোমার পক্ষে না হতে পারে, আমার পক্ষে হয়েছে। যদি ওরা সবটা না বুঝ্‌তে পেরে থাকে, তাহলে এইটেই সব আগে তাদের মনে হবে না কি, এমন রাক্ষসী আমি যে তার ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে তাকে এমন পথের ভিখারী ক'রে বাড়ী থেকে পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছি?"

কিশোর এবার আর কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে একখানা পুস্তক টানিয়া লইয়া দৃষ্টিকে সেই দিকে নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া রাজেশ্বরী আবার যেন অসংযত হইয়া কান্না-ভরা গলায় বলিয়া উঠিলেন, "এ আমি সহ্য কর্‌তে পারব না। এখনো ভাল করে খোঁজ করলে ধর্‌তে পারা যায়, বোধ হয়। ওরাও এখনো ঠিক্ ধর্‌তে পারেনি। কি করেই বা পারবে? এ কি কখনো জগতে কেউ দেখেছে যে—"

কিশোর বাধা দিয়া বলিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ মা, ঝরণার তাঁর সঙ্গে খুব পরিচয় ছিল, আর তিনিও ঝরণাকে—"

"কি যে বলিস্! ঝরণা তখন সাত-আট বছরের মেয়ে মাত্র, আর সেই বা কতটুকুর পরিচয়? ওরা তাকে কখনই চিন্‌তো না। ঝরণার মামার সঙ্গে মামার বাড়ীর লোকের সঙ্গে যেটুকু তার আলাপ হয়, সেও কারো মনে রাখার মত ঘটনা নয়। ঝরণার বাবা তো দেখেনইনি। তবে এ হতে পারে যে সে ঝরণার মায়াতে পড়েই ওদের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, এটা দৈবাতের ঘটনা নয়! এই ভাখো না তার চিঠি—"বলিয়া রাজেশ্বরী হাতের কাগজটুকু তার সাম্‌নে ফেলিয়া দিলেন। কিশোর যন্ত্র-চালিতের মত সেটুকু তুলিয়া লইয়া চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল। মোহিনী বাবর নামে শিরোনামা দিয়া পত্রটুকর

"দাদা! তোমার অকৃতজ্ঞ ভাইকে আর না দেখতে পেলে তোমরা আর দুঃখ বোধ করো না—খুঁজোও না! তার আর তোমাদের কাছে, তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার স্বর্গে স্থান পাবার উপায় নেই, তাই সে অভিশপ্ত ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে দূরে সরে গেল। এ জীবনে আর দেখা হবে না। আমার কল্পনার লতায় ফুল ধরা আমি নিজের চোখে দেখ্‌তে পাব না, এমনি আমি হতভাগ্য! ঝরণাকে, আমার নির্ঝরিণীকে আমার অজস্র আশীর্ব্বাদ দিও আর তোমরা আমার প্রণাম নিও। এর বেশী আজ আর কিছু জানাবার অধিকারী আমি নই। ইতি

তোমার বিনয় ভাই।"

কিশোর পত্রটুকু পড়িয়াও নিস্পন্দভাবে রহিয়াছে দেখিয়া রাজেশ্বরী উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এখনো তুই চুপ্ করে আছিস্? কি পাষাণ, ওরে কিশোর কি পাষাণ তুই!"

"কি আমায় করতে বল মা তুমি?"

ছেলের চোখের কোণে এমন একটী তীব্র বিদ্যুতের ঝলক্, মুখে এমন একটি বজ্রগর্ভ মেঘের কৃষ্ণকান্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল যে তাহা দেখিয়া রাজেশ্বরী ধীরে ধীরে যেন নিভিয়া আসিলেন। তাঁহার উদ্দাম অধীরতা ক্রমে যেন কিসের এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। কিশোরকে আর বেশী কিছু বলিতে তাঁহার যেন সাহস হইল না, কেবল একবার শেষ চেষ্টার মত মৃদু বিষাদপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তবে কি তাকে খুঁজে পেয়েও এমনি করে আবার যেতে দিতে হবে? তার এত থাকৃতেও সে এমনি করে পরের দুয়ারে ভিক্ষা করে নিরাশ্রয় হয়ে দিন কাটাবে?"

"দশ বৎসর তো কেটেছে,—বাকিগুলোও কাট্‌বে।"

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজেশ্বরী মনের সঙ্গে দৃঢ় পণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এত বড় নিষ্ঠুর অমানুষ হৃদয়হীন ছেলের সম্বন্ধে আর তিনি কোন আশা-ভরসাই পোষণ করিবেন

তিনি আর তাহার কোন কথারই মধ্যে থাকিবেন না। কোন রকমে আর দিন কতক কাটাইয়া লইয়া তাহার একটা বিবাহ দিয়া কাশী বাস করিবেন। কিন্তু কিশোরের এই বিবাহ দেওয়ার কথাটা যে তাঁহার মনে উঠিতেছে, ইহা লইয়াও তাঁহার কপালে কোন কষ্ট ভোগ আছে কি না, তাই বা কে জানে! এই যে ভদ্র পরিবারের সঙ্গে তিনি এতটা মাখামাখি করিয়াছেন, ইহাতে আসল কথা বুঝিতে কি তাহাদের বাকি আছে! তাঁহার মনোগত আকাঙ্ক্ষার আভাষ তিনি নিজ মুখেও তাহাদের জানাইতে তো বাকি রাখেন নাই! এখন এই দুর্দ্দান্ত ছেলে যদি বলিয়া বসে, আমি তার কি জানি! আমি কি তোমায় একদিনও এমন কথা বলিয়াছিলাম যে তুমি এতখানি করিয়া বসিয়াছ? তোমার ইচ্ছা বা সাধের দায়ে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এতখানি বাঁধা পড়িতে পার না! এ ছেলের দ্বারা যে সবই সম্ভব, তাহা রাজেশ্বরী যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন। আজ দশ বৎসর বিনয়ের জন্ত যে ব্যথা তিনি সহিয়া আসিতেছেন, সম্প্রতি তাহা নূতন হইয়া সঙ্গে আরও কতকগুলা জিনিষ লইয়া অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিলেও তথাপি এ যেন বহুদিনের সহনীয় পুরাতন ব্যথা, পুরানো কথা! আর এই যে স্বামী-বিয়োগের পর হইতে এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ যে আশায় লুব্ধ হইয়া আত্মীয়ের বুক ভাঙিয়া দিয়া তাহার ক্রোড় হইতে তাহার বুকের নিধিকে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দেশান্তরী পথের ভিক্ষুক করিবার কারণ-স্বরূপ হইয়াছেন, সে আশাতেও কি কিশোর বাদ সাধিবে? তাঁহাকে কি সংসার সাজাইতে দিবে না? পরের ছেলেকে আপন করিতে এই পনেরো বৎসর সুখ-দুঃখের ভাগ সমানভাবেই তাঁহার ভাগ্যে উঠিয়াছে, কিন্তু এখন এই বৃদ্ধ বয়সে সে ছেলে হইতে তাঁহার কি মূল আশার নির্ব্বাণ হইবে? তাঁহার কি বধূ নাতি-নাতিনীর মুখ দেখা ভাগ্যে নাই? তাঁহার স্বামীর নিজের শ্বশুর-বংশের জল-পিণ্ডপ্রাপ্তিরও কি এই অকৃতজ্ঞ সন্তান হইতে সম্ভাবনা নাই? ইহার স্বভাব দেখিয়া এখন রাজেশ্বরীর যেন সবই সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল। এতখানি কাণ্ড ঘটাইলেন? কিসের জন্ত বিনয়কে এমন করিয়া নির্য্যাতিত করিলেন? তাঁহার সেই পাপেই কি কিশোর এমন নৃশংস-স্বভাব হইয়া উঠিল? হুতাশে রাজেশ্বরীর বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া উঠিতেছিল।

ইতিমধ্যে ঝরণাদের বাড়ী হইতে দুই তিনবার গাড়ী আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। নলি বুলা আসিয়া বলিয়া গিয়াছে, তাহাদের কাকার আবার চলিয়া যাওয়াতে বাড়ীশুদ্ধ সকলে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ! মেজদিদি বড়দিদি তো কাঁদিয়া সারা হইতেছেন; মাসিমাকে যাইতে হইবে মা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে ইত্যাদি। শরীর খারাপের অছিলা করিয়া রাজেশ্বরী তাহাদের ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার শুষ্ক মুখ ও প্রায় শয্যাগত অবস্থা দেখিয়া বালক-বালিকারা তাহা সম্ভব বলিয়াও মনে করিয়া গিয়াছে; তথাপি রাজেশ্বরী বুঝিতেছিলেন, মোহিনী বাবুর স্ত্রী ও ঝরণারা নিশ্চয়ই কিছু একটা মনে করিয়া লইয়াছে, নহিলে এতক্ষণ নিশ্চয় কল্যাণী বা ঝরণা বা জিতু কেহ না কেহ আসিয়া পড়িত! মাত্র ঐ বালক-বালিকা দুটিকে পাঠাইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন না! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে,—কিশোর তাঁহাকে আজ দশ বৎসরই তো এ লজ্জার এ বেদনার কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখন এই ভদ্র পরিবারের নিকটেও আবার তাঁহাকে কোন্ লজ্জায় না জানি পড়িতে হইবে! সাধ যাহা জন্মিয়াছিল—স্নেহ-মায়ার যে আদান-প্রদান হইয়া গিয়াছিল তাহার কথা দূরে থাক্—রাজেশ্বরীর মত যাহাদের পরের নিকট হইতে জীবনের প্রত্যেক বস্তুকে ভিক্ষা করিয়া আদায় করিতে হয়—ভাগ্য যাহাদের জগতে কোন বিধি-দত্ত অধিকারের দাবী করিতে দেয় নাই, তাহাদের এ সব সাধ বা আশা করাই বিড়ম্বনা! রাজেশ্বরী এখন কোনরূপে তাহাদের নিকটে আর মুখ না দেখাইয়া পলাইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিশোরকে জানাইলেন, তিনি বাড়ী যাইতে চান্; কিশোর যেন শীঘ্র তাহার উদ্যোগ করিয়া দেয়।

কিন্তু কিশোর যখন বিনা-বাধাদানে তাঁহার এই আদেশ

ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন! তবে সত্যই কিশোর ঝরণাকে পাইবার জন্য উৎসুক নয়? কি ভুলই তবে তিনি করিতে বসিয়াছিলেন? নিজের মজ্জাগত সংস্কার-গত ধারণাকে দূরে ঠেলিয়া আত্মীয়-স্বজনের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া এই যে বয়ঃপ্রাপ্তা শিক্ষিতা কুমারীকে তাঁহার মত পল্লী-সমাজের অন্তর্ভূতা বর্ষীয়সী রমণী সাদরে নিজ অঙ্কে বরণ করিয়া লইয়া আপনার সর্ব্ব অধিকার ও অগাধ স্নেহের আসনে বসাইতেছিলেন, সে কাহার জন্য? এই কন্যা কাহার ঈপ্সিতা মনে করিয়া?—এতখানি ভুল তাঁহাকে যে করাইল, সেই দুরবগাহ-চরিত্র যুবক না জানি তাঁহাকে তাঁহার এই শেষ জীবনে আরও কতই অপদস্থ না করিবে! না, আর না!—সময় থাকিতে এইবেলা তাঁহার সতর্ক হওয়ার দরকার হইতেছে।

দুই-তিন দিনে সমস্ত ঠিক্ হইল। পরদিন তাঁহারা দেশে যাইবেন। রাজেশ্বরী দুর্ম্মনাভাবে জানালার নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। দুয়ারে মোটরের হর্ণ বাজিতেই চাহিয়া দেখিলেন, মোহিনী বাবুর বাড়ীর কার,—নলিকে সঙ্গে লইয়া ঝরণার মা নামিতেছেন। দুর্নিবার লজ্জায় কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া রাজেশ্বরী শয্যায় আশ্রয় লইয়া একটা গাত্রবস্ত্র টানিয়া লইলেন।

ঝরণার মা আসিয়া নিকটে বসিয়া বলিলেন, "শরীর কি এখনো খারাপ দিদি?"

"হাঁ ভাই," বলিয়া রাজেশ্বরী উঠিয়া বসিয়া নলিনীকে নিকটে টানিয়া লইলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া ঝরণার মাতা বলিলেন, "শুন্‌লাম দিদি তুমি দেশে যাচ্ছ! আবার কতদিনে আস্‌বে—কে কোথায় থাক্‌ব, তখন আর দেখা হয় কি না হয়,—তাই একবার দেখা কর্‌তে এলাম ভাই।"

রাজেশ্বরী প্রায় রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এইবার না জানি তিনি কোন্ কথা বলেন! কিন্তু যখন কয়েক মিনিট ধরিয়া অতি সরলকণ্ঠে মাত্র তাঁহাদের নিরাময় প্রশ্ন করিয়া এবং আশ্‌পাশ্ আরও দুই চারিটী কথা কহিয়া জজ-গৃহিণী বিদায় লইবার আভ্যন্তরিক সৌজন্যের নিকটে মনে মনে মাথা হেঁট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, তাঁহাদের দিক্ হইতে কি অভদ্রভাবেই এই পরিচয়ের শেষ হইতেছিল! কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলের চক্ষের নিকটে কেমন সরল সুন্দরভাবে ইহার সমাধান করিয়া দিল। এতক্ষণে রাজেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, "কল্যাণীরা কেমন আছে?" ঝরণার নাম তাঁহার মুখে তখনো আসিতেছিল না। "ভাল আছে, তবে খোকাটার একটু জ্বর হয়ে ধ্যাঁৎ-খেঁতে হয়েছে, তাই তোমায় প্রণাম কর্‌তে আস্‌তে পেলে না। দেখ্‌বে, কালও যদি একবার আস্‌তে পারে।"

তাঁহার সঙ্গে চলিতে চলিতে ঈষৎ জড়িত স্বরে রাজেশ্বরী বলিলেন, "আর ঝরণা?"

"তাকে তো জানই দিদি, পড়া নিয়ে ব্যস্ত! ক'দিন 'মাথা ধরা' 'মাথা ধরা' ক'রে ক্লাশ পর্য্যন্ত কর্‌তে পারেনি। সেও কাল পারে যদি 'কলি'র সঙ্গে—থাক্ দিদি, তোমার শরীর খারাপ, নীচে আর নেমো না। আসি ভাই তবে।" বলিয়া নত হইয়া তিনি রাজেশ্বরীর পদধূলি গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেই রাজেশ্বরী তাঁহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া অন্তর্গূঢ় বাষ্পে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বলিলেন, "চল, আমিও যাব—তাকে একবার দেখ্‌তে!"

"তুমি? এই অসুস্থ শরীরে? রোদের ঝাঁজ রয়েছে এখনো—!"

"তা হোক্।" জজ-গৃহিণী কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, "কিশোর কি বল্‌বে—থাক্ দিদি, আমি তাদের গিয়ে তোমার আশীর্ব্বাদ দেবো—তোমার কথা বল্‌ব—।"

"না না ভাই—আমায় নিয়ে চ' একবার—তোর হাত ধর্‌ছি—।" রাজেশ্বরীর আর্ত্ত আগ্রহের উত্তরে তাঁহার হাতখানি সশ্রদ্ধ সম্মানের সহিত হাতে লইলেন; ঝরণার মা তাঁহাকে 'কারে' উঠাইয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া লইলেন।

সন্ধ্যার পরে জিতু যখন তাঁহাকে তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া পায়ের ধূলা লইয়া হাসিমুখে "আসি এবার মাসিমা"

অশ্রুজল আর রোধ করিবার তাঁহার শক্তি রহিল না। পরিত্যক্ত শয্যার উপরে আবার দেহ-ভার ঢালিয়া দিয়া তিনি অশ্রুরুদ্ধ নয়নে মনে মনে ঝর্‌ণার শান্ত সুন্দর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, সত্যই কি মাথা ধরার জন্যই মুখখানা আজ অমন দেখালো?—'কলি' 'নলি' এরা তো আগের মত ভালো কথা কইলো—প্রণাম করলো—চ'লে যাওয়ার জন্য দুঃখ করলো, কিন্তু সে তো একটাও কথা কইলো না! একবার প্রণাম ক'রে সেই যে ক' মিনিট সামনে ছিল, মুখখানা যেন একেবারে সাদা সাদা!—কেন?—শুধু কি সেই জন্যই? বাড়ীর সবাই তো তাদের কাকার জন্য একরকম দুঃখ ভাব নিয়েই আছে, কিন্তু তার কেন সব-চেয়ে বেশী নিঝুম ভাব! সে কি—"

কিশোর ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "মা, গাড়ী রিজার্ভ হয়েছে। কাল বেলা এগারোটার মধ্যেই বেরুতে হবে।" রাজেশ্বরী কোন উত্তর দিলেন না, অথবা উত্তর দিতেই পারিতেছিলেন না। কিশোর তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আবার বলিল "আবার কি মাথা ধরলো মা?"

"হুঁ।"

"আর একটু বেড়িয়ে এলে না কেন ফাঁকার দিকে?—খোলা বাতাসে মাথাটা ছাড়তো।"

"আমায় কি ঠাট্টা করতেও চাস্ কিশোর?"

কিশোর একটু চকিতভাবে বিস্মিত দৃষ্টিতে মাতার পানে চাহিল। এমন ভাবের কথা তাঁহার মুখে সে আর কখনো শোনে নাই। কিশোরের দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া রাজেশ্বরী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "কাদের সৌজন্যের দায়ে ভদ্রতা রক্ষা করতে আবার আমি তাদের কাছে মুখ দেখাতে পারলাম, তা কি জানিস্? জিতুর মা নিজে এসেছিলেন; নিজে তারা আমায় বিদায় দেবার জন্য—"

"শুনলাম। কিন্তু তুমি আবার কেন তোমার এই শরীরে এ কষ্ট করতে গেলে?"

"কেন গেলাম? এ কথা মাত্র তুই-ই বলতে পারিস! তুই বুঝি ভাব্‌চিস্, তোর কাণ্ড নিয়ে সমালোচনা করবার করে মরছে? তোর মন্দ অদৃষ্ট বলেই কিশোর তুই এত-দিনের আলাপেও তাদের চিনলিনে। ছোট ছেলেমেয়ে ক'টা পর্য্যন্ত এমন একটা কথা তুললে না, যাতে লজ্জা পাই, কি কষ্ট পাই! সেই তার চলে যাওয়ার পরের দিন—সে দিন সমস্ত দিন তোর দেখা না পেয়ে রাত্রে ওদের বাড়ী থেকে ঐ রকম ক'রে আচম্‌কা চলে কেন এলি বুঝতে ওদের কাছে গিয়াছিলাম। রাত্রে তোর ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছিল, বুঝি—বুঝি, ঝর্‌ণার বিষয়েই কিছু ভেবে তুই অমন করেছিলি, কিন্তু ওদের কাছে ঐ চিঠি আর ঐ রকম কথাবার্ত্তা শুনে যখন আমার দুঃখে সন্দেহে পৃথিবী ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছিল, তখনো তারা এমন একটা প্রশ্ন করেনি যাতে আমি লজ্জা পাই বা বিব্রত হয়ে পড়ি! কেবল একটু যেন প্রতীক্ষা করছিল, যদি আমি কিছু বলে তাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই। আজ আর তাও করলে না—কিছু একটু ভেবে নিয়েছে হয়ত মনে মনে! কিন্তু—" এইখানে কিশোর "মা" বলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাতে বাধা দিয়া রাজেশ্বরী উগ্র উত্তেজনার সহিত বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "জিতু হঠাৎ একখানা চিঠি হাতে ক'রে 'মা, রমেশ লিখেছে, কাকাকে সে মোগলসরাইয়ে কৌশলে'—এইটুকু চেঁচিয়ে বলতে বলতে এসে প'ড়ে এমন লজ্জা পেয়ে গেল! আর সকলে চুপ ক'রে রইল যে নিজেরই আমার আর সেখানে দাঁড়াতে সাধ্য হচ্ছিল না!"

"তাই তো বলছি মা, তুমি কেন আবার কষ্ট পেতে গেলে সেখানে?"

"তোর নিতান্ত মন্দ বরাত কিশোর, তাই তুই এমন মেয়ে পায়ে ঠেলছিস্! ভাবিস্‌নে যে আমি নিজে মায়ায় পড়েছি বলে এ কথা তোকে বলছি। আমার অদৃষ্টে এমন বৌ নিয়ে কুটুম্ব নিয়ে ঘর করা ঘটলো না বলেই আমার বেশী দুঃখ হচ্ছে—আমি আর সে প্রত্যাশা মনেও রাখি না, জানিস্! আমি বাড়ী গিয়েই কাশীবাসের আয়োজন করব—কিন্তু তুই নিজের যা ক্ষতি করলি, কিশোর—"

এইবার এতক্ষণ পরে রুদ্ধ রক্তের আভায় আরক্ত মুখ তুলিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কিশোর বলিল, "মা কেন এত বকে

তার আবার নতুন করে ক্ষতি কর্‌লাম? তুমি কি ভেবেছ, চাইলেই সব জিনিষ পাওয়া যায়? তুমি কি ভেবেছ মোহিনী-বাবুরা আমরা চাইলেই অমনি—"

বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "কি বল্‌তে চাস্ তুই? তুই কি ভেবে রেখেছিলি, ঝর্‌ণাকে যদি আমরা চাইতাম, তাহলে পেতাম না? তাহ'লে তোর ঘটে বুদ্ধি ব'লে কোন জিনিষের বিন্দুও ছিল না! তুই কি দেখিস্‌নি বুঝিস্‌নি—তারা—"

"না, না, না, আমি দেখ্‌তে চাইনে—বুঝ্‌তে চাইনা। তুমি জান না, জান না মা, হয়ত ওঁরা রাজী ছিলেন, হয়ত ওঁরা তোমার ইচ্ছায় সায় দিতেন—কিন্তু তা যে হবার নয়, তা তোমরা কেউ জানো না!"

"কি আমরা জানিনা? তুই কি ঝর্‌ণার কথা বলছিস্? তার মতামত কি তুই জেনেছিলি?" দ্বিগুণ বিস্ময়ে পুত্রের আনত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রাজেশ্বরী যেন অন্য মনে বলিলেন, "কই তোরা তো কখনো একা একা একটা কথাও কস্‌নি। যেমন শুন্‌তে পাওয়া যায়, সে তো তেমন মেয়ে ছিলনা! এত লেখা-পড়া শিখলেও তাদের বাড়ীর চাল্ যে আমাদের মতই। ঝর্‌ণা কি তোকে কখনো—"

বাধা দিয়া সবেগে কিশোর বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌ছ মা, এ কি আজকের কথা! সেই রাঁচিতে তখনি আমার পরিচয় শুনে দেখোনি কি, কি ঘৃণায় আর আমার সঙ্গে কথা কয়নি? আর আলাপ করেনি? তাঁর কাছ থেকে আমার পরিচয় সে ভাল করেই নিয়েছিল তো! সেই দিনই যে—"

"কিশোর, কিশোর, তুই কি পাষাণ! কতটুকু মেয়ে সে তখন? ঘেন্নারই বা কি এমন প্রমাণ পেয়েছিলি তাতে? হ্যাঁ, আমিও একটু দুঃখ পেয়েছিলাম তার ব্যবহারে—তখন তো জানি না—আরও কতখানি দুঃখ তাকে নিয়ে, আমার ভাগ্যে পাওনা আছে, কিন্তু সে এমনই কি? ছেলেমানুষ একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিল হয়ত, একটু সঙ্কোচ এসেছিল বোধ হয়। সেইটুকু এখনো মনে করে আছিস্? আর দেখতে পাসনি, তারা আমার মনের স্পষ্ট করে আমিও বলিনি, তাই তারাও বলেনি, নৈলে আমি যেদিন তোর সেই ছোট্টো ঝর্‌ণাকে এই দশ বৎসর চিনে রাখার গল্প ঝরণার মার কাছে করেছিলাম, সেদিন—"

"হয় তো তার বাপ-মা রাজী ছিলেন, কিন্তু সে কখনই সম্ভব হতো না—"

"ঝরণা রাজী হতো না? সে যে কেমন মেয়ে, তা তো তুই জানিস্ না! বল তুই, আমি এখনি তোকে দেখাচ্ছি—"

"থামো মা, রক্ষা কর! তুমি যখন বল্‌ছ, হয়ত তাও সম্ভব হতে পারে, তাঁদের বাড়ীতে—কিন্তু আমি কি জানি না যে—"

"কি জানিস্ তুই? সে তোকে ঘৃণা করে? আচ্ছা, আমি কলিকে দিয়ে তোর এ সন্দেহেরও—"

"না মা—" আর্ত্তকণ্ঠে কিশোর ফুকারিয়া উঠিল, "তুমি মনের রঙে জগৎকে রাঙিয়ে চলো না আর! তারা হয়ত দয়া ক'রে মায়া ক'রে সবই করতে পারে, কিন্তু আমি কি নিজেকে ভুল্‌তে পারি? আমি কি ভুল্‌তে পারি আমি জগতের চোখে কত ঘৃণ্য? কি আমি—কি আমি? আমায় কি কেউ শ্রদ্ধা কর্‌তে পারে? দয়া দিতে পারে, মায়া দিতে পারে, কিন্তু আর-কিছুর কি আমি যোগ্য? তবে কেন আমি তাদের কাছে যে জিনিষে জগতে আমার অধিকার নেই, তারই ভিক্ষুক হয়ে দাঁড়াব? তা দাঁড়াব না!"

কিশোরের আরক্ত মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া পরস্পর-বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্বে রাজেশ্বরীর অন্তরও আর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার প্রকৃত সহানুভূতিশীল উচ্চ হৃদয়ে কিশোরের দুঃখের ভারও গভীরভাবে ধ্বনিত হইতেছিল, আবার নিজের এতদিনের মাতৃ-অভিমানে আপনার গভীর স্নেহময় প্রকৃতির মাতৃ-হৃদয়েও কিশোরের এই অকৃতজ্ঞতার নিদারুণ ব্যথা বাজিতেছিল, তাই গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কিশোর পরের ছেলে বলেই তুই আজ আমার মুখের ওপরে এমন সব কথা বলতে পার্‌লি! জগতে তোর মত কি আর কারো

পর আপনার হয় না,—পরের ছেলে আপনার হয় না। তুই যদি—"

উন্মাদের ন্যায় কিশোর চেঁচাইয়া উঠিল, "ঠিক, একেবারে ঠিক্ এ কথা! কিন্তু কে আমার জগতের সকলের কাছে এমন 'পর' করেছে, মা? সে তুমিই তো! কার আমি আপনার? তোমারও না—কারুরই না! নিজের জীবন নিজের অস্তিত্বই যে আমার নিজের কাছেও পরের—নিজের নয়! তবে কোন্ মুখে আমি সকলের মত দাবী কর্‌ব? তুমি বলেছিলে না যে আমার মত কি কারু হয়নি? না, না, হয়নি, হয়নি! তুমি তো জাননা—জাননা সব! আমার ছোট বেলার কথা, তখনকার জীবনের যত যা। সেই জায়গা থেকে 'পর' হয়ে যাওয়া যে কত-বড় আঘাত, আর তারপরে সেই 'পর' হয়েও কাছে কাছে চোখের সুমুখে থাকা যে কত বড় যন্ত্রণার, কতখানি লজ্জার, তা কি তুমি অনুভব কর্‌তে পার্‌বে? পারবে না, তাই এমন কথা বল্‌তে পেরেছ! মনে ভেবো না যে তোমার দুঃখও আমি বুঝ্‌চি না—কিন্তু কেন এমন ভুল করেছিলে মা? 'পর'কে কেন জোর করে আপনার করতে গিয়েছিলে? যা হয় না, তাই করতে যাওয়ার ফলেই তিনটে জীবন এমন হয়ে গেল। এ দেখেও এই জালে আবার একটা প্রাণীকেও জড়াতে ইচ্ছে করে? আর না—এ ভুল আর করব না—"

রাজেশ্বরীর যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, চোখের উপর সব ঝাপসা হইয়া উঠিতেছিল। কিশোরের তীব্র স্বরের আঘাতে মনে হইতেছিল, তিনি এখনি অজ্ঞান হইয়া যাইবেন, তবু তিনি প্রাণপণ বলে খাটের পাশটা চাপিয়া ধরিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন, "তাহলে—তাহলে তুমি বিয়েও করবে না? তাঁদের জল-পিণ্ডের কথা—তাঁদের কথা—"

"নিশ্চয়—নিশ্চয় মা, কোথায় আমি ভুলেছি মনে করেছ! নিজের জীবনকে কি কেউ ভুলতে পারে? এত বড় 'প্রাণ-যজ্ঞ' কি মিথ্যা যেতে পারে? তোমাদের বংশে তোমার এত বড় ক্ষতি কি আমি করতে পারি? কিজন্যে তবে তিনি আমায় উৎসর্গ করেছেন? বিয়ে আমায় করতে হবে বৈকি—নৈলে যে তোমাদের বংশলোপ হবে, সে কি আমি সর্ব্বদাই মনে রাখি না? কিন্তু এর মধ্যে আর ঝরণাকে টেনো না মা, এই মিনতি তোমায়। যা হয়েছে, এর ওপর দিয়েই যাক্,—আর না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

---

# রাজপুতানায়

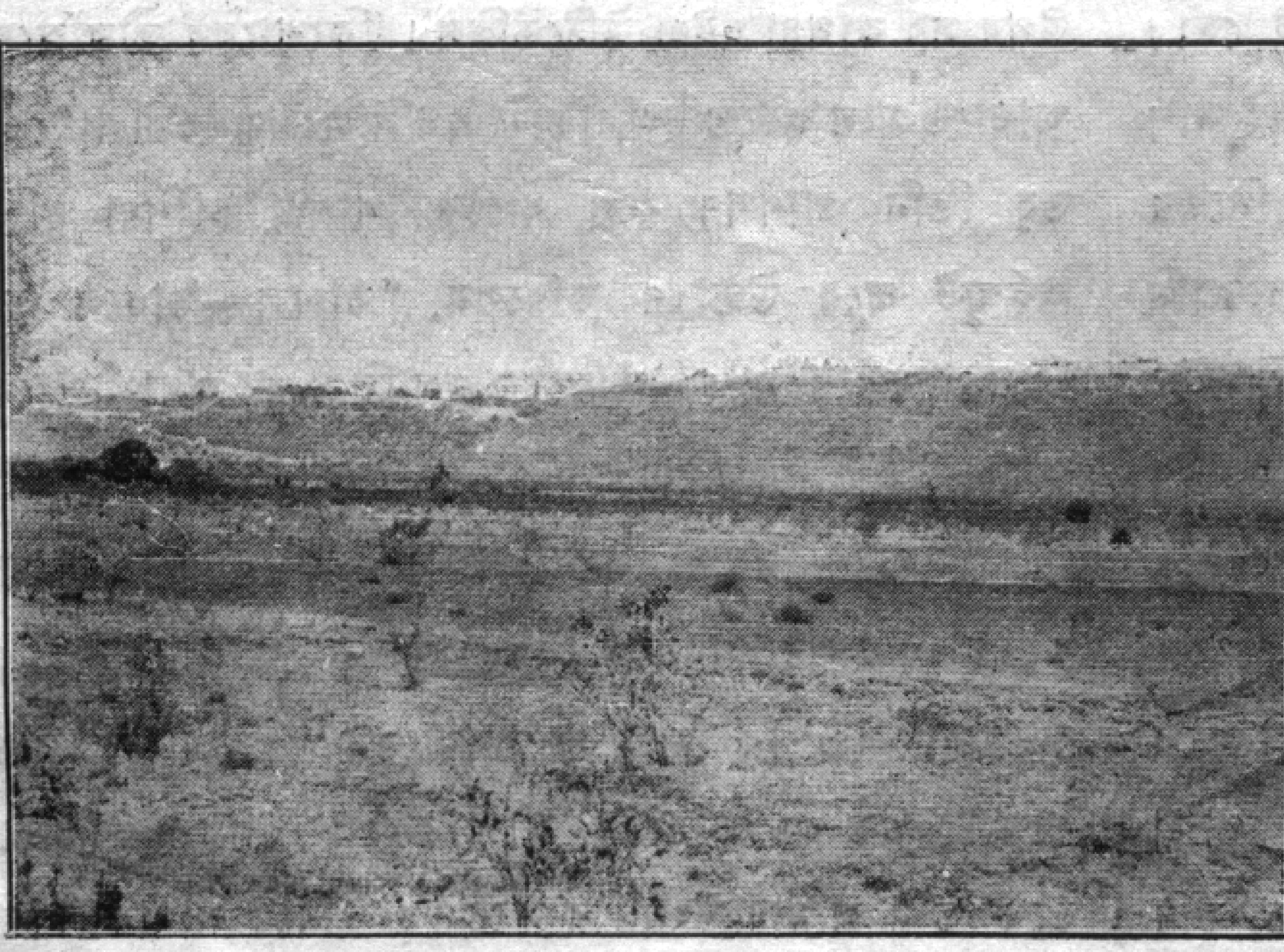
## চিতোর

এখান থেকে আমরা চিতোর যাই। চিতোর আজমীরের প্রায় ২০০ মাইল দক্ষিণে। চিতোর নগর আরাবল্লী পর্ব্বতের একটী শাখার উপর অবস্থিত। চিতোর নাম মনে হবামাত্র আমাদের মনে একসঙ্গে হর্ষ, বিষাদ, আর গর্ব্বের উদয় হয়। বহুদিনের আশা, একবার মহাত্মা প্রতাপসিংহের বড় আদরের চিতোর দেখব! বাপ্পা, প্রতাপের বীরত্ব-কাহিনী পড়ে ছেলে-বেলা থেকেই চিতোরের কি সুন্দর ছবিই না মনে আছে! চিতোর আমার কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ।

ভোর ছটায় ষ্টেশনে নাম্‌লুম। সেখানে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে কোন রকম যান-বাহন না পাওয়ায় হেঁটেই যাত্রা করলুম। ষ্টেশন থেকে দুর্গের দরজা প্রায় তিন মাইল। আমরা মাঠের উপর দিয়ে, মাঝে একটা ছোট পাহাড়ে নদী পার হয়ে রাস্তা জিজ্ঞাসা কর্‌তে কর্‌তে সহরের ভিতর দিয়ে দুর্গ-দ্বারে এসে দেখলুম, এক রাজপুত বীর বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে দরজা পাহারা দিচ্ছে। আমরা ভিতরে যাব বলায় সে আমাদের কাছে পাশ দেখতে চাইলে।

ভাবলুম, সর্ব্বনাশ! দেখ্‌চি শেষটা এতদূরে এসে বুঝি আমাদের বড় সাধের চিতোর

কিন্তু তখনই সেই সিপাহীই আমাদের বলে দিলে যে বাইরে কাছারীতে গেলেই পাশ পাওয়া যাবে। আমরা ছিলুম তিন জন, সেখানে একটা ছোট বালির কাগজে কি লিখে আমাদের ছেড়ে দিলে। আমরাও সেটা দারোয়ানকে



চিতোর-গড় দুর্গ

দিয়ে দুর্গে ঢুক্‌লুম। উপরে ওঠ্‌বার রাস্তা বেশ প্রশস্ত ও সুন্দর। এই ঢালু রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠ্‌তে হয়। রাস্তার এক পাশে পাহাড় আর একপাশে পাথরের তৈরী পাঁচিল। পাঁচিলের লাগাও অল্প প্রশস্ত রক্‌ মত। সমস্ত পাঁচিলে হাত-তিনেক অন্তর খুপরি খুপ্‌রি। পাহাড়ের গায়ে বাব্‌লা গাছের বন আর মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড এক-একটা শিলা। বোধ হয় যুদ্ধের সময় এই ধরণের শিলাই শত্রুর উপর গড়িয়ে দেওয়া হতো। পাহাড়ের উপর উঠ্‌তে অনেকগুলো দরজা পার হয়ে যেতে হয়। দরজাগুলোর এক একটা নামও আছে যথা হনুমান দ্বার, পদ্ম দ্বার প্রভৃতি। দুর্গের মধ্যে বেশ গাঁ বসেছে। কত ক্ষেত, খামার,—চালায় চালায় কুমড়ো ঝুলছে। রাস্তার মোড়ে সিঙ্গারের সেলাই-কলে জামা সেলাই হচ্ছে; তাও দেখ্‌লুম। আমাদের পরিদর্শকটি ছিল একজন মাড়োয়ারী; সে একটু-আধটু হিন্দিও জানে, সেজন্যে আমাদের একরকম করে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

চিতোর আজ একটি মহাশ্মশান। চারিদিকেই পুরানো ভাঙা বাড়ীর স্তূপ। কোথাও এমন কোন রকম চিহ্ন নেই যাতে লোকে বুঝ্‌তে পারে, এটা এই, ওটা সেই। সে আজ স্মৃতির শ্মশান বুকে ক'রে নীরব নিস্তব্ধ। যে চিতোর প্রতাপ সিংহের এত আদরের ছিল, যে চিতোরের কথা আমাদের মত ভীরুর মনেও একটা উদ্দীপনা জাগিয়ে দেয়, তার স্মৃতি রক্ষার জন্য বর্ত্তমান রাজারা একটুও যত্ন করেননি! এটা যদি ইংরাজের হতো, তাহলে আমরা এর অন্য-রূপ দেখ্‌তুম।

প্রথমেই আমরা গোমুখীতে যাই। কি সে স্থান, যেন শান্তি বিছনো রয়েছে! পাহাড়ের নীচেই একটা মস্ত জলাশয়। একধারে একটি বড় ঘর। আমরা নেমে ঘরের ছাদ থেকে দেখ্‌তে লাগলুম। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দেখি, ঠিক পাহাড়ের গায়েই একটা ছোট ঘর। পাহাড়ের গায়ে ভিতর থেকে জল আস্‌বার দুটো মুখ রয়েছে; একটা এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আর একটা দিয়ে অনবরত ঝির-ঝির করে জল পড়ছে। জলের ধারার নীচেই শ্বেতপাথরের দুই মহাদেব মূর্ত্তি। আমার সেদিন একটু শরীর খারাপ ছিল, কিন্তু এ জল দেখে স্নান করবার লোভ আর সামলাতে পারলুম না। সুন্দর জল! প্রথমে ঘরের বাইরে স্নান করে তারপর ঘরের ভিতর গেলুম। আঁজলা পুরে জল খেয়ে নিলুম, জল ভারি মিঠে। এই জলই নালা দিয়ে গিয়ে সারা সহরে জল জোগায়। সেই শিব-ঘরের লাগাও একটা পথ চলে গিয়েছে। এটা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একেবারে রাজপুরীতে উঠেছে। সেই পথ দিয়ে মহিষীরা গোমুখীতে স্নান করতে আস্তেন ও একলিঙ্গের পূজা করতেন। আমাদের পরিদর্শক বল্লে, এই সেই পথ, যে পথ দিয়ে এসে বীর রাজপুত-নারীরা পর্ব্বতমধ্যস্থিত ঘরে নিজেদের সতীত্ব আর সম্মান বাঁচাবার জন্য জোহর ব্রত করে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। এ এক মহা-তীর্থ! ভক্তিতে আমাদের মন একেবারে নুয়ে পড়ল, ভাব্‌লুম, এ দৃশ্য দেখে জীবন আজ সার্থক হলো। এই যে এত-বড় গৌরব, তার একটা স্মৃতি রক্ষার কোন রকম ব্যবস্থা নেই! ইংরাজ কত কল্পিত, বাস্তব ঘটনার

স্মৃতি রক্ষার জন্য কি না কর্‌ছে! আর আমরা? প্রতাপসিংহ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর প্রত্যেক রাজপুতকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন কোন রকম বিলাসিতা করবেন না, বেশ-ভূষা কর্ব্বেন না, তৃণশয্যায় শোবেন, ভূর্জ্জপত্রে খাবেন ইত্যাদি। এখনও নাকি শোনা যায়, তাঁরা পালঙ্কের বিছানার নীচে আর সোনার থালার নীচে এক গাছা করে ঘাস রেখে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছেন। কেবল পূর্ব্ব-পুরুষদের, শুধু তাই কেন, সমস্ত জগতের গৌরবের বস্তুর গৌরব রক্ষা কর্‌লেই যত মহাপাতক হবে, মনে করেন! এদের পতন হবে না তো হবে কার?

তারপর আমরা মীরা বাইএর মন্দির দেখি। এখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। মন্দিরের একটু দূরেই কুম্ভ রাণার স্তম্ভ! কুম্ভ বার বার শত্রু নিপাত করে এই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করেছিলেন। সেখান থেকে আমরা চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে যাই। মন্দিরের মধ্যে একটী প্রদীপ জ্বল্‌ছে, এটা ২৪ ঘণ্টা জ্বলে এবং আবহমান কাল জ্বলে আস্‌ছে। চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বলি হয়।

তারপর পদ্মিনী দেবীর প্রাসাদ দেখ্‌তে যাই। বাড়ীগুলি আধুনিক বলে বোধ হল। জিজ্ঞাসা করায় জান্‌লুম, যে এ সমস্তই ভেঙ্গে গিয়েছিল। রাজা সজ্জনসিংহ এ সব নতুন করে তৈরী করিয়েছেন। সমস্ত মহলটি ঘুরে দেখলুম। এ প্রাসাদ এখন মহারাণা চিতোরে এলে তাঁর বাসের জন্য ব্যবহার হয়। অবশ্য এখন আবার একটা নতুন প্রাসাদ দুর্গের ঠিক মাঝখানেই তৈরী হচ্ছে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে দেখি, শিখরে সূর্য্যের আলোয় স্ফটিক জ্বল্‌ছে। সামনেই একটা জলাশয় তার মাঝখানে একটী সুন্দর বাড়ী। সেটী পদ্মিনী দেবীর ক্রীড়া-গৃহ। কি মহিমাময় স্থান! যে পদ্মিনীর মুখ কেবল আয়নায় দেখে আলাউদ্দিন পাগল হয়ে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছিল, যাঁর জন্য কত মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণ জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন —তাঁদের পৈতার ওজনই ৭৪॥০ মণ হয়েছিল—এই যখন লোকে আত্মসম্মান-রক্ষার জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে জীবন বিসর্জ্জন দিত! মনে একসঙ্গে হাসি কান্নার উদয় হয়। আজ সেই এত বড় জাতির কি দশা!

সমস্ত চিতোরের মধ্যে কেবল এই একটী স্থান দেখলুম যার স্মৃতি রক্ষার জন্য সামান্য একটু যত্ন নেওয়া হয়েছে। শুন্‌লুম সজ্জনসিংহ মারা যাওয়ার পর তাঁর বংশধরেরা এই অপব্যয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

বেলা প্রায় দেড়টা। ক্ষিধে পেয়েছে আর হাঁটাও বড় কম হয়নি। এখানে খুব বড় বড় শসা পাওয়া যায়, আর খুব শস্তা। একটা মস্ত বড় শসা আর একটা ছোট সরদা দিয়ে দাম নিলে এক পয়সা। আমরা ত দেখে একেবারে অবাক! সে দুটো জিনিষের দাম এখানে পাঁচ আনার এক পয়সা কম নয়। শসাকে এরা কাঁকড়ি বলে। ফিরে আসবার সময় এক জায়গায় কতকগুলো সেকেলে তোপ একেলে রং মেখে রয়েছে। ফোর্টের ভেতরকার গাঁয়ের মধ্যে একটা ময়রার দোকানে কিছু ক্ষীর আর ক্ষীরের সন্দেশ পেলুম; তাতেই জঠর-জ্বালার নিবৃত্তি করা গেল।

শুন্‌লুম চিতোরে টাকায় কুড়ি সের দুধ আর দেড় সের ঘী; আর সব খাঁটি জিনিস। চিতোর পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে প্রায় তিন মাইল লম্বা। মাঝখানটা দুই ধারের চেয়ে কিছু নীচু। পাহাড়ের উপর এত বড় বড় পাথরে বাঁধান জলাশয় আর তাতে এত সুন্দর জল যে রাজপুতানা যে মরুভূমি এটা সহজে বিশ্বাসই হয় না। এক একটা পুকুরের এক একটা নাম। একটার নাম শুন্‌লুম ভীম সাগর। ভীম নাকি এক কিলে এই সাগর তৈরী করেছিলেন। আর এক মন্দিরে গিয়ে শুন্‌লুম যে সেখানে এক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তাঁর মাথা কাটা পড়ার পরও তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। এ রকম আরও কত অসম্ভব গল্প শোনা গেল। চিতোর দুর্গের মধ্যে এখন সব চাষীরা বাস করে। পাহাড়ের নীচে সহর যত মাড়োয়ারিতে ভর্ত্তি।

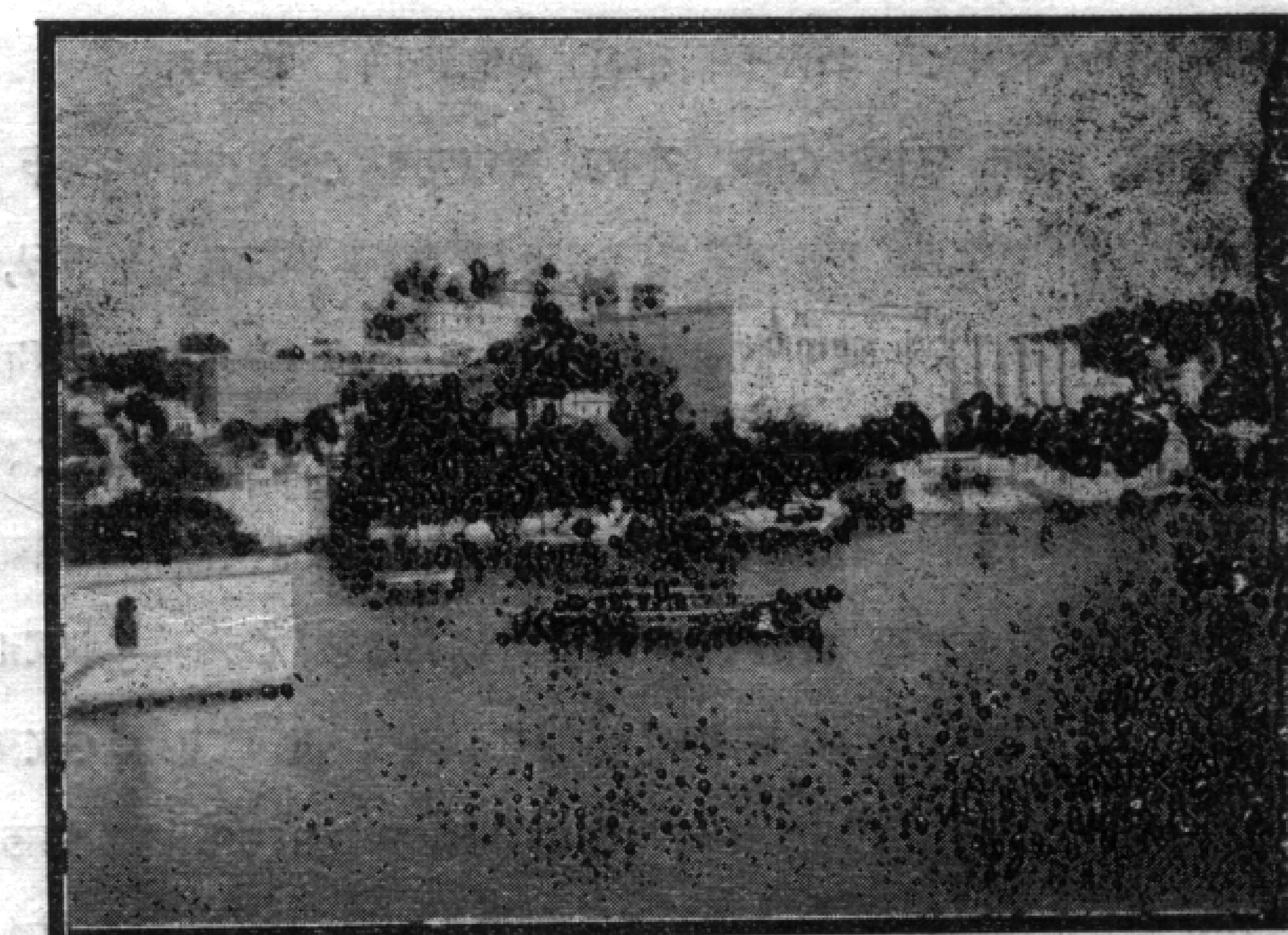
আমরা দুর্গদ্বার থেকে বীর পুরুষদের উদ্দেশ্যে আর একবার প্রণাম করে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করলুম। বেলা

এখনও দু ঘণ্টার উপর দেরী। বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছিলুম, ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে একটা টেবিলের উপর শুয়ে পড়লুম।

## উদয়পুর

চিতোর থেকে উদয়পুর ৬৯ মাইল। একটা মিটার-গজ রেল আছে, সেটা ষ্টেটের। আমরা রাত দশটার সময় উদয়পুর পৌছুলুম। আমরা আমাদের আজমীরের আত্মীয়টির কাছে থেকে তাঁর এক বন্ধুর নামে এক চিঠি নিয়ে এসেছিলুম। ষ্টেশনে এক টোঙ্গাওয়ালাকে ভদ্রলোকের নাম বল্‌তেই চিন্‌তে পারলে, সে তাঁর বাসায় পৌছে দেবে বল্‌লে। ষ্টেশন থেকে সহর অনেক দূর। টোঙ্গাওয়ালা আমাদের এক গলির মুখে নামিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "এই গলির মধ্যেই তাঁর বাড়ী। আপনারা একটু ভিতরে গেলেই পাবেন।" এ গলিটি এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমরা ক্রমশঃ প্রায় তেতলা সমান উঠে গেলুম। মেঘলা রাত ছিল। পাড়াটি নিশুতি। মাঝে মাঝে দু'একজন লোক দেখা যাচ্ছিল, তাঁরা আমাদের ভাষা বোঝেন না, আমরাও তাঁদের ভাষা বুঝিনে। যা'হোক্ খুঁজে খুঁজে দু'জন পান্নালাল পেলুম। কিন্তু তাঁরা কেউ আমাদের পান্নালাল নন্। তখন গলির আর একধারে প্রায় তেতলা সমান নেমে গিয়ে একটা ছোট মন্দিরের কাছে এক ভদ্র লোককে পেলুম। তাঁকে মাতাল বলে বোধ হল। তাহ'লেও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি কিছু হিন্দি জানেন। তিনি আমাদের জন্য কিছুক্ষণ খুঁজে পান্নালালকে বার করলেন। পান্নালাল পাশের কোন্ বাড়ীতে রামায়ণ-কথা হচ্ছিল, সেখানে ছিলেন। তিনি জান্‌তেও পেরেছিলেন যে ঐ লোক্‌টি তাঁকে খুজছে তবে লোক্‌টি মাতাল বলে প্রথমে উত্তর দেন্‌নি। উদয়পুরে মাতালদের সব বড় ঘৃণা করে। কিন্তু লোকটি মাতাল হলেও বড় কম অতিথি-বৎসল নন্ তিনি যখন পান্নালালকে প্রথমটা পাননি, তখন আমাদের জন্য তাঁরই বাসায় থাবার আর শোবার বন্দোবস্ত কর্‌ছিলেন। এখানে আমাদের জাতের পরিচয় দিতে গিয়ে গোত্রের কথাও বল্‌তে হয়েছিল। শাণ্ডিল্য গোত্র শুনে এক ভদ্র লোক বল্‌লেন,—তাহ'লে চন্দ্রবংশীয় হবে।

পান্নালাল বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি যথেষ্ট আদর-যত্ন করেই বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এরা জলের ব্যবহার বড় জানেন না। একটু পরেই আমাদের একবারে খাবার ব্যবস্থা। অগত্যা জল চেয়ে নিতে হল। খেতে



উদয়পুরের রাজবাড়ী ও হ্রদের দৃশ্য।

গিয়ে দেখি, রুটি একখানা এক পোয়া ময়দার কম নয়। তাই তিনখানা করে প্রত্যেককে দিয়েছিলেন; এবং এত রাত্রে অন্য উপায় না থাকায় আমাদের হয় ত পেট ভরবে না, এই আশঙ্কা করে ছিলেন। আমরা কিন্তু কেউ এক খানার বেশী খেতে পার্‌লুম না। আমাদের খাওয়া দেখে তাঁরা হেসে আকুল। পান্নালাল বাবু সুন্দর ইংরিজি জানেন। সেজন্য আমাদের কথা-বার্ত্তার বেশ সুবিধা হচ্ছিল। তিনি বল্‌লেন যে আপনাদের দুজনকে যা খাবার দেওয়া হয়েছে, আমি একা তার চেয়ে ঢের বেশী খেতে পারি। আপনারা কিছু খেতে পারেন না তাই এত দুর্ব্বল! বাস্তবিক কি সব চেহারা, গায়ে ভীষণ শক্তি! সমস্ত উদয়পুরে আমি একটি রোগা লোক দেখিনি।

সকাল বেলা, সমস্ত দিনের জন্য একটা টোঙ্গা ভাড়া করে সহর দেখ্‌তে বেরুনো গেল। রাস্তায় এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে পান্নালাল বাবু বল্‌লেন যে ঐ ভদ্রলোকটি বাঙ্গালী।

কিন্তু তাঁর মধ্যে কিছুই বাঙ্গালীত্ব দেখলুম না, তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ পরবার কায়দা সমস্তই ঐ দেশীয়।

আমরা প্রথমে একটা খুব বড় বাগানের মধ্যে যাদুঘর দেখ্‌তে যাই। যাদুঘরে মাড়বারের উৎপন্ন সমস্ত জিনিষ সযত্নে রাখা হয়েছে। একটা ছোট যমজ ছাগল দেখলুম, তার দুটো মুখ, আটটা পা, কিন্তু একটা পেট! ঐ রকম একটা গরুও রয়েছে। ঐ দেশীয় বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন পাগড়ি রাখা হয়েছে। মিউজিয়মের সাম্‌নেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটী মূর্ত্তি রয়েছে। কিন্তু কোথাও প্রতাপ সিংহের মূর্ত্তি, বা এমন একখানা ছবিও দেখ্‌লুম না।

সেই বাগানের এক পাশেই চিড়িয়াখানা। তাতে অনেক হরিণ, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি জন্তু রয়েছে। সে সময় বাঘেদের মাংস দেওয়া হচ্ছে। আমরা কিছুক্ষণ তাদের খাওয়া দেখ্‌লুম।

তার পর আমরা 'পাছোলা' হ্রদ দেখতে যাই। ১৫৬৮ সালে আকবর চিতোর অধিকার করলে রাণা উদয় সিংহ উদয়পুরে পালিয়ে আসেন। হ্রদটি প্রায় দু'মাইল লম্বা আর এক মাইলের উপর চওড়া। হ্রদের দু দিকে পাহাড়, একদিকে রাস্তা আর একদিকে রাজবাড়ী। আমরা ঐ রাস্তা দিয়ে বরাবর হ্রদের অপর পাশে গেলুম। রাস্তার ধারেই পাহাড়ে সব সন্ন্যাসীরা ডেরা নিয়েছে। হ্রদটি চার দিকে গাছ-পালা দিয়ে ঘেরা, অতি সুন্দর দেখ্‌তে। হ্রদের মধ্যে দুটো শ্বেত পাথরের প্রাসাদ। সূর্য্যোদয়ের সময় এই প্রাসাদের উপর কিরণ পড়ে, নীচে কালো জল আর দূরে উঁচু কালো পাহাড় দৃশ্যটি উপভোগ কর্ব্বার জিনিষ। এই পর্ব্বতের দৃশ্যের সঙ্গে লোকে কাশ্মীরের তুলনা করে।

আমরা আবার সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরে এসে ৺ জগন্নাথ দেবের মন্দির দিয়ে রাজ-প্রাসাদের কাছের ঘাটে এলুম। এখানে একটা নৌকা ভাড়া করে হ্রদের জলে বেড়ান গেল। হ্রদের মাঝখানে দুটি শ্বেত পাথরের প্রাসাদ। একটীর নাম জগমন্দির, অপরটির নাম যজ্ঞবাস। এ দুটি ১৭ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাণা জগৎ সিংহের তৈরী। যজ্ঞবাস মাঝে মাঝে সুন্দর পাথরের কাজ করা। ভিতরে ফুলের বাগান, মাঝে মাঝে ফোয়ারা। সেখানে আম, লেবু, তাল কলাগাছ রয়েছে। দেওয়ালে ঐতিহাসিক ছবি আঁকা। এখানে রাজকার্য্য পরিচালিত হয়। ঢুকেই আমাদের প্রত্যেককে প্রথমে একটী করে পাই দর্শনী দিতে হলো; তখন একটী লোক আমাদের নিয়ে প্রাসাদের সমস্ত দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়ালে।

সাজাহান যুবরাজ অবস্থায় যখন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তখন তাঁকে এই জগমন্দিরে আট্‌কে রাখা হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাণা স্বরূপ সিংহ এই প্রাসাদে অনেক ইংরাজ-পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে তাঁদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। এই হ্রদের উপর জল-বিহারে আমরা মনে অপরিসীম আনন্দ পেয়েছিলুম। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর নৌকা রয়েছে, তাতে করে রাণা আর অন্য সভাসদেরা জলবিহার করেন।

সেখান থেকে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে দেখি কতক-গুলি কয়েদীকে আগে পিছে বন্দুকধারী রক্ষী সঙ্গে নিয়ে আমাদের সাম্‌নে দিয়ে চলে গেল। বন্দীদের পরণে কাপড়, তবে পায়ের গোছের কাছে দুটো আংটা পরানো, আর ঐ আংটায় আট্‌কানো দুটো লোহার ডাণ্ডা উরু অবধি উঠে, সেখানে এক আংটা শুদ্ধ শেকলে আট্‌কানো। এতে তারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে, তবে দৌড়ে পালাতে পারে না। একটু পরেই সব এক এক রিম কাগজ মাথায় করে ফির্‌ল দেখলুম। বন্দীদের দিয়ে এখানকার রাজবাড়ীর সব কাজ এই রকমে করিয়ে নেওয়া হয়।

তার পর বাসায় এসে একটা সিঁড়ি দিয়ে ইঁদারায় নেমে স্নান কর্‌লুম। এখানে সব ইঁদারায় নাম্‌বার এই রকম সিঁড়ি আছে। ভাতও আমাদের জন্য যোগাড় হয়েছিল, দেখ্‌লুম; তবে এখানে ভাত কেউ খায় না। চাল পাওয়া যায় বটে তবে খুব দাম, এক মণ ২৫৲ টাকা।

বৈকালে আবার আমরা একটা বাগানে গেলুম। বাগানের মাঝখানে একটা বাড়ী। তার চার পাশে ফুল

অশুভি। রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা গাছ, আরও কত কি! কত সুন্দর সুন্দর মখ্‌মল পাতার গাছ। যেন একটী নন্দন-কানন। ফোয়ারার উপর এক একটা গম্বুজ, তাতে এক একটা কৃত্রিম চাতক পাখী জলের জন্য আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। রাস্তার ধারে আমরা যেমন কাঁটা গাছের বেড়া দি, এখানে তেমনি গোলাপ গাছ। বাড়ীর পাশে চারিদিক ঘেরা একটা মস্ত বড় দালান। দালানের মাঝে একটা কৃত্রিম হ্রদ। তার চার কোণে চারটি কালো পাথরের সুন্দর কাজ করা কুটীর।

সেখান থেকে আমরা ফতে সাগর দেখতে যাই। এটা রাণা ফতে সিং তৈরী করেছেন। এখন সাগরে জল কিছু বেশী হওয়ায় একধার দিয়ে ছাপিয়ে বেয়ে পড়ছে। এই জল সহরের মাঝ দিয়ে একটা ছোট পার্ব্বত্য নদীর মত বয়ে যাচ্ছে। ঐ সাগরে অনেক লোক স্নানও করে। সাগরের চারদিকে পাহাড়। এর একটির উপর একটা পুরানো জীর্ণ বাড়ী দেখা গেল, সেখানে শুন্‌লুম, প্রতাপসিংহ যুদ্ধের সময় কিছু দিন ছিলেন। তারপর আমরা উদয়পুরের বাইরে উদয় সাগর দেখলুম।

উদয়পুর খুব সুদৃশ্য স্থানে অবস্থিত। সহর বড় পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। রেল-লাইনের উপর একটা মস্ত বড় দরজা,—সেটা রাত্রে বন্ধ করে দেওয়া হয়। নগরটি খুব সুরক্ষিত। রাত্রি বারোটার পর সহরের মধ্যে প্রবেশ নিষেধ। উদয়পুরের তিন মাইল পূর্ব্বে অহর গ্রামে মহাসত্তি বা শ্মশান। সেখানে যতদিন এই অধিত্যকা রাণাদের বাস-স্থান হয়েছে, তত দিনের সমস্ত রাজপুত সর্দ্দার আর রাণাদের স্মৃতিস্তম্ভ আছে। রাণা অমর সিংহের স্তম্ভটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। চিতোরের মত উদয়পুরও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এর উপরেও শত্রুর অত্যাচার বড় কম হয় নি। ১৫৭৭ সালে মহারাণা প্রতাপসিংহের সময়ে আক্‌বর খাঁর মোগল সৈন্যেরা মহাবত্‌ খাঁর অধীনে একবার উদয়পুর অধিকার করে। কিন্তু প্রতাপই বছর নয় পরে আবার স্বীয় শক্তিতে উদয়পুর ফিরে পান। আর মাধোজী সিন্ধিয়ার অধীনে মহারাষ্ট্রের দ্বারা ১৭৬৯ সালে উদয়পুর একবার আক্রান্ত হয় কিন্তু সেবার কাছে যুদ্ধে হেরে এখন উদয়পুর নামে মাত্র স্বাধীন। এখানে যদিও সকলে তলোয়ার রাখতে পারে, তবু এরা অস্ত্রের ব্যবহার এক রকম ভুলে গিয়েছে বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

এখানে গোখ্‌রো সাপও আছে দেখলুম, কারণ পথে একটা লোক্‌কে দুটো সাপ ধর্‌তে দেখলুম। একটা সাপের পেটে দুটো ব্যাঙ্‌ ছিল, লোকটা টিপে টিপে সাপের মুখ থেকে ব্যাঙ্‌টাকে বার করে ফেল্‌লে।

সন্ধ্যার ট্রেনে উদয়পুর থেকে ফির্‌লুম। নগর থেকে বার হবার সময় একটা ছোট টনেলের মধ্য দিয়ে গাড়ী যায়। উদয়পুর থেকে প্রথম ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তেই পাশের গাড়ীর এক ভদ্রলোক পাহাড়ের কটা বানরকে একখানা রুটি দেখিয়ে ডাক্‌লেন। আর অমনি রাজ্যের বানর এসে গাড়ীর ছাদে, জানলার উপরে নীচে জড়ো হলো। এক একটা আবার জানলা গলিয়ে ভদ্রলোকটির হাত থেকে রুটি নিয়ে চলে গেল। গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার পরও দু'চারটে বানর গাড়ীর ছাদের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

## জয়পুর

আজমীর হয়ে তার পরদিন সকালে আমরা জয়পুর যাই। জয়পুরে আগে খবর দিয়ে পাঠিয়ে ছিলুম। আমরা মানসিংহের রাজধানীকে অম্বর বলেই জানি, এদেশের লোকে আবার একে আমির বলে। দুপুর বেলা একখানা টোঙ্গা করে একটী পরিদর্শক নিয়ে সহর দেখতে বেরুনো গেল। লোকটি আমাদের ৺কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺সংসারচন্দ্র সেন, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বড় বড় বাঙালীর বাড়ী দেখালে। কান্তি বাবু ও সংসার বাবু সামান্য স্কুল-মাষ্টার থেকে নিজের প্রতিভা-বলে মন্ত্রী হয়ে ছিলেন।

পথে জয়পুরের শিল্প-শিক্ষালয় দেখ্‌তে যাই। এটী মহারাজা রামসিংহের কীর্ত্তি। এখানে ছেলেদের চিত্রবিদ্যা, প্ল্যাষ্টার ও পাথরের মূর্ত্তি তৈরী করা, পিতলের ও সোনা-রূপার জিনিস করার নিয়ম, হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া

দেখিয়ে দিচ্ছেন। দুটো বড় বড় Show Room রয়েছে। তাতে সব পেতলের, শ্বেত পাথরের, ও লোহার জিনিস সাজানো রয়েছে! প্রত্যেকটাতেই এক একটা দাম লেখা আছে,—বিক্রীর জন্য।

সেখান থেকে আমরা রামবাগে যাই। এটা একটি চমৎকার বাগান। এর কাছেই মেও হাঁসপাতাল, বাইরে লর্ড মেয়োর প্রস্তর মূর্ত্তি। বাগানের মধ্যেই যাদুঘর। বাড়ীটি দোতলা; মাঝখানে একটা বড় হল, তার তিন দিকে সারি সারি ঘর। তারপর আবার চারপাশে ঘর। ঘরগুলো নানা বর্ণে চিত্রিত। হলের উপরের জানালার কাঁচে কৃষ্ণলীলার বিচিত্র চিত্র আঁকা। বাড়ীর দেওয়ালে রামায়ণ মহাভারতের নানা ঘটনার ছবি আঁকা। এই যাদুঘরে ভারতীয় শিল্পের প্রায় সমস্ত জিনিষই সযত্নে রাখা হয়েছে। শারীর তত্ত্বের অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় মাটী দিয়ে তৈরী করে এখানে রাখা হয়েছে। একটা ঘরে আলমারির মধ্যে মানসিংহের সময়ের celestial globe প্রভৃতি অনেকগুলি জ্যোতির্বিগ্তার যন্ত্রপাতি রয়েছে। মিশরের মমির নমুনাও দু'চারটে আছে। নীচে একটা প্রশস্ত বারান্দার দেওয়ালের গায়ে জয়পুর-অধিপতিদের প্রমাণ তৈল-চিত্র টাঙ্গানো রয়েছে। জয়সিংহ, ভগবান দাস, মানসিংহ প্রভৃতি সকলেরই ছবি দেখলুম। বাড়ীর সামনেই ফোয়ারা। চারদিকে গ্যাসের আলো। অতি-সুন্দর স্থান। বাগানের মধ্যে সিংহ, বাঘ প্রভৃতি অনেক জানোয়ার নিয়ে চিড়িয়াখানাও আছে।

বর্ত্তমান রাজবাড়ীর এক কোণে ৺গোবিন্দজীর মন্দির। গোবিন্দজীর মন্দির আমাদের দেশের মন্দিরের মত চূড়াওয়ালা নয়; নাটমন্দিরের মত। মূর্ত্তি কালো পাথরের, বৃন্দাবন থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পূজারী বাঙ্গালী। তাঁর বাড়ী বর্দ্ধমান। আমরা আরতির সময় গেছলুম। স্থানটা খুব শান্তিময়। কোন রকম আড়ম্বর নেই। জয়পুরে রাস্তা ঘাটে সর্ব্বত্র গ্যাসের আলো, মন্দিরে কিন্তু বেশ সেকেলে প্রদীপ। আরতির পরই কীর্ত্তন আরম্ভ হলো। খোল বাজাচ্ছে একজন বাঙ্গালী, কিন্তু গান গাচ্ছে সব ঐ-দেশীয় লোক। তবে কীর্ত্তন সম্পূর্ণ বাংলা

রাজবাড়ীর আর এক পাশে মান-মন্দির; সেটা এখন অকেজো পড়ে আছে। শুনলুম বিদ্যাধর নামে হুগলী জেলার এক বাঙ্গালী জ্যোতিষীই এই মান-মন্দিরের সৃষ্টি-কর্ত্তা। বর্ত্তমান জয়পুর সহর আর রাজবাড়ীও তাঁর প্ল্যানে তৈরী।

বর্ত্তমান রাজধানীর ক' মাইল দূরে মানসিংহের সেই প্রসিদ্ধ অম্বর এখন জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে।

মানসিংহ যখন বাংলার গৌরব যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে বন্দী করে আনেন, সেই সঙ্গে যশোরেশ্বরী কালীকেও এনেছিলেন। কালীর সামনে এখনো এখানে রোজ একটী করে ছাগ বলি হয়। এক জায়গায় রাজবংশের গুপ্ত ধন নিহিত আছে শুন্‌লুম। রাজবংশ যদি কখনও কপর্দ্দক-শূন্য হয়ে পড়ে, কেবল তখনই এই গুপ্ত ধনে তার অধিকার হবে।

জয়পুর বেশ সুন্দর নগর। লোকে একে দ্বিতীয় প্যারী বলে। রাজপথগুলি ১০০ ফুটের চেয়েও চওড়া আর সরল। দু ধারে ফুটপাথ আছে। রাস্তার দুই ধারের বাড়ী ঠিক একই ভাবের আর একই গোলাপী রঙের। কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়েছে! রাস্তায় গ্যাসের আলো, সেগুলো খুব ঘন ঘন। বড় রাস্তাগুলি সহরকে ছটা চতুষ্কোণ খণ্ডে ভাগ করেছে। প্রত্যেক চৌমাথার উপরই একটী করে বাজার। সহরটি দু' মাইল লম্বা, এক মাইল চওড়া। এটা একটা বড় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, মাঝে মাঝে এক একটা দরজা। দরজার উপর বড় বড় গম্বুজ। মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিং এই নগর ১৭২৮ সালে স্থাপিত করেন। জয়পুরের জুয়েলারি, পিতলের কাজও খুব প্রসিদ্ধ এনামেলের কাজের খ্যাতিও খুব। জয়পুরকে বাংলার দেশ বল্‌লেও চলে। এখানে বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি কিছু বেশী। জয়পুরের মহারাজা অল্প দিন হলো মারা গিয়েছেন। এখন যিনি রাজা তিনি ছেলে মানুষ।

## মথুরা

জয়পুর থেকে বেরিয়ে আমরা মথুরা আর বৃন্দাবন যাই।

শব্দ পেয়ে কি উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভয় পেয়ে ছুটে পালাল না। সকাল বেলা আমরা মথুরায় এলুম। গাড়ীতেই দু'চার জন পাণ্ডার দর্শন পেলুম, তার মধ্যে থেকেই একজনকে আমাদের সমস্ত দেখিয়ে দেবার জন্য নিযুক্ত করলুম। পাণ্ডা আমাদের অনেকগুলি ঠাকুর-বাড়ী দেখিয়ে এক-একটাকে জন্মভূমি, রঙ্গভূমি, এই সব বল্লে। কোথাও শ্রীকৃষ্ণের ননী-চুরির দৃশ্য, কোথাও কংস বধের দৃশ্য, কোথাও বা রাসলীলার দৃশ্য ইত্যাদি। এ সমস্ত ঠাকুর বাড়ী ঘোরার পর আমাদের যমুনায় স্নানের জন্য বিশ্রাম ঘাটে নিয়ে গেল। বল্লে, এখানে স্নান কর্‌তে হলে পাঁচ সিকে খরচ লাগ্‌বে। আমরা সেখানে স্নান না করে পাশের ঘাটে গেলুম। শুনলুম বিশ্রাম ঘাটে স্নান করলে মোক্ষলাভ হয়, তা আমরা যখন ঠিক তার পাশের ঘাটেই স্নান করছি, তখন মোক্ষ না হয় নিদেন তার কাছাকাছি কিছু লাভ হবেই। জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কচ্ছপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনটা বা একটু দূরে চড়ার উপর রোদ পোহাচ্ছে। এদের দেখলে জলে নাম্‌তে ভয় হয়। পাণ্ডা কাছিম তাড়াতে লাগ্‌ল আর আমরা বীরপুরুষের মত স্নান সেরে নিলুম। স্নান করে উঠ্‌তেই কোথা থেকে এক গেঁজেল বামুন এসে আমাদের তাকে গুটি দুই পয়সা দিয়ে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে নেবার পরামর্শ দিলে। লোকটির দিব্য গোলগাল চেহারা, কিন্তু বাঙ্গালী যাত্রাদের পয়সাটা যখন এমনই নিছক পাচ্ছে এখন খাটার কষ্ট স্বীকার করতে সে নারাজ! ঘাটের উপরেই রাজ্যের বানর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

স্নান সেরে সহরের দিকে ফির্‌তেই আমাদের পাণ্ডা তার জন পাঁচ-সাত জাত-ভাইকে পেয়ে বল্লে, নগদ ৪৲ টাকা ভোজন দক্ষিণা না পেলে আর আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী নয়। বুঝ্‌লুম লোকটা আমাদের সঙ্গে বেইমানি কর্‌ছে, আর মেলা পাণ্ডা আমাদের ঘিরছেও, এখন পাছে আমাদের অবস্থা স্বর্ণলতার নীলকমলের মত হয়, তাই তাকে কিছু দিয়ে বিদায় করলুম। তখন গাড়োয়ানকে সহর দেখাতে বললুম। সে আমাদের নিয়ে বাজারের চকের মধ্য গেল। এটা ১৬৬২ সালের তৈরী। সেখান থেকে আরঙ্গজীবের মস্‌জিদ দেখ্‌তে যাই। মস্‌জিদটি লাল পাথরের। এখন অনেকটা কাহিল অবস্থা। মস্‌জিদটির কাছে আগে হিন্দু দেবালয় ছিল। সে সব ভেঙ্গে ফেলে মসজিদ নির্ম্মাণ হয়েছিল। মস্‌জিদের পিছনে এখনও সেই পুরনো দেবালয়ের ভিত রয়েছে। এক জায়গায় দেখলুম খানিকটা গর্ত্ত খুঁড়ে একটা ঘরের দেওয়াল বার করা হয়েছে। মস্‌জিদের পিছনেই শুনলুম শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান; আর এই জায়গাটাই আগে কংসের রাজবাড়ী ছিল। আমাদের পাণ্ডা আগে আর একটা জায়গা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান বলে দেখিয়েছিল। কিন্তু শেষে বৃন্দাবনের এক গোঁসাইয়ের কাছে জান্‌তে পারলুম যে মস্‌জিদের পিছনেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। এখান থেকে একটু দূরে বড় একটা জলাশয় আছে, তার নাম পুতনা কুণ্ড।

Archaeological museum মথুরার আর একটী উল্লেখ-যোগ্য জিনিস। এখানে স্থানীয় সমস্ত শিল্পই সযত্নে রাখা হয়েছে। অনেক পুরানো মূর্ত্তি ও শিলালিপি এখানে আছে। অনেক মূর্ত্তিই ২০০০ বৎসর আগেকার। কুশন বংশীয় রাজাদের প্রমাণ মূর্ত্তি এখানে আছে। এঁরা ২০০০ থেকে ১৮০০ বৎসর আগে রাজত্ব করে গেছেন।

মথুরায় অনেক মন্দির। তার মধ্যে বিজয়গোবিন্দ, দ্বারকাধীশ ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরই প্রধান। মথুরা সহর যেমন পুরাতন, তেমনই বড়। তবে এখন যে সব মন্দির আছে তা তিন-চার শ' বছরের বেশী নয়। ১০১৭ সালে মামুদ গাজ্‌নি মথুরার অনেক মন্দির ও প্রতিমা নষ্ট করেন, পরে যা কিছু ছিল তা ১৫০০ সালে সেকেন্দর লোদি শেষ করেন—ইতিহাস থেকে আমরা ত এই জানতে পাই। মথুরার কথা খৃঃ পূঃ ৪০০ বছর আগে চৈনিক পরিব্রাজক ফ্রাসিয়ান উল্লেখ করেছেন; এর নাম গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ টলেমির (Ptolemy) বইএতেও পাওয়া যায়।

মথুরায় মিউনিসিপালিটির কোন ট্যাক্স নেই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে চুঙ্গি অফিস (octroi post)।

আর তার মধ্যে যদি কোন নতুন জিনিস বিক্রয়ার্থ থাকে তার জন্য কিছু ট্যাক্স আদায় করে নেয়। রাস্তায় আমাদের একবার চুঙ্গির লোকে ধরেছিল। তারা আমাদের সমস্ত ব্যাগ খুলে জিনিষপত্র দেখতে লাগ্‌লো। কিন্তু সমস্তই পুরনো, এক ক্যামেরাটা চক্‌চক্ কর্‌ছিল দেখে সেটাকে নতুন বলে বস্‌ল। তখন তাদের বুঝিয়ে দি যে এটা নতুন নয়, আমরা ছবি তোলবার জন্য এনেছি— তবে রেহাই পাই।

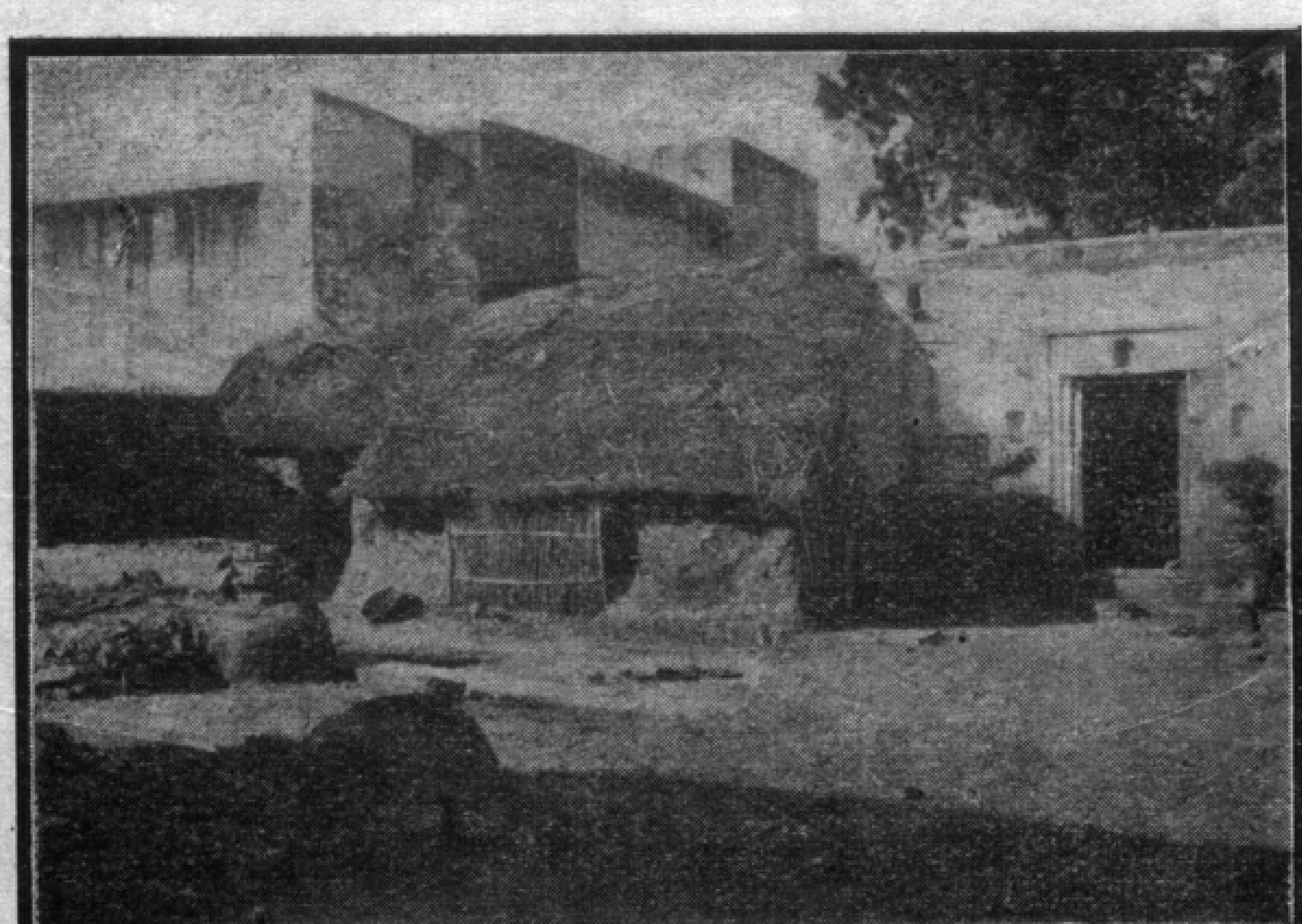


শ্রীধাম বৃন্দাবন
কালীদহ

## বৃন্দাবন

এরপর আমরা বৃন্দাবন যাই। বৃন্দাবনে গোপীনাথবাগে স্বামী সচ্চিদানন্দের আশ্রমে উঠি। স্বামীজী আমাদের দেশীয় লোক। প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে থাকতেন।

প্রথমেই আমরা শেঠেদের রঙ্গজীর মন্দির দেখি। মন্দিরটী যেন এক কেল্লা। তার পর-পর দশটা দরজা। প্রাচীরগুলি খুব উঁচু। এই মন্দির তৈরী করতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। মন্দিরটি সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট। মন্দিরের সামনেই সোনার একটা থামের মত রয়েছে। সাধারণ লোকে একে সোনার তাল গাছ বলে। আসলে কিন্তু এটি অরুণ দেবতার মূর্ত্তি। এখানে যথাযথ পূজা ও ভোগ হয়। ফাল্গুনের শেষে কি চৈত্রের প্রথমে এখানে একটা খুব জাঁকালো উৎসব হয়, তখন খুব ধুমধাম হয়। মন্দিরের বাইরে একটা লম্বা ঘরে একখানা রথ আছে; প্রত্যেক বছর রথের সময় এই ঘরের সামনেটা ভেঙ্গে রথ বার করা হয়। বৃন্দাবনের আধখানাই প্রায় শেঠেদের। এখানে শেঠেদের সাতটা বাগান আছে। একটা মস্ত-বড় মাঠ পড়ে' রয়েছে, সেখানে উৎসবের সময় বাজি পোড়ানো হয়, তখন উৎসব ও বাজি পোড়ানো দেখতে আশ-পাশ থেকে প্রায় দশ-বারো লক্ষ লোক বৃন্দাবনে জমায়েৎ হয়।



শ্রীধাম বৃন্দাবন
প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বাসবাটীর বর্ত্তমান দৃশ্য

বৃন্দাবনে অসংখ্য বিগ্রহ। প্রত্যেক গৃহেই প্রায় রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। গোপীনাথ, মদনমোহন, গোবিন্দজী প্রভৃতি ক'টিই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

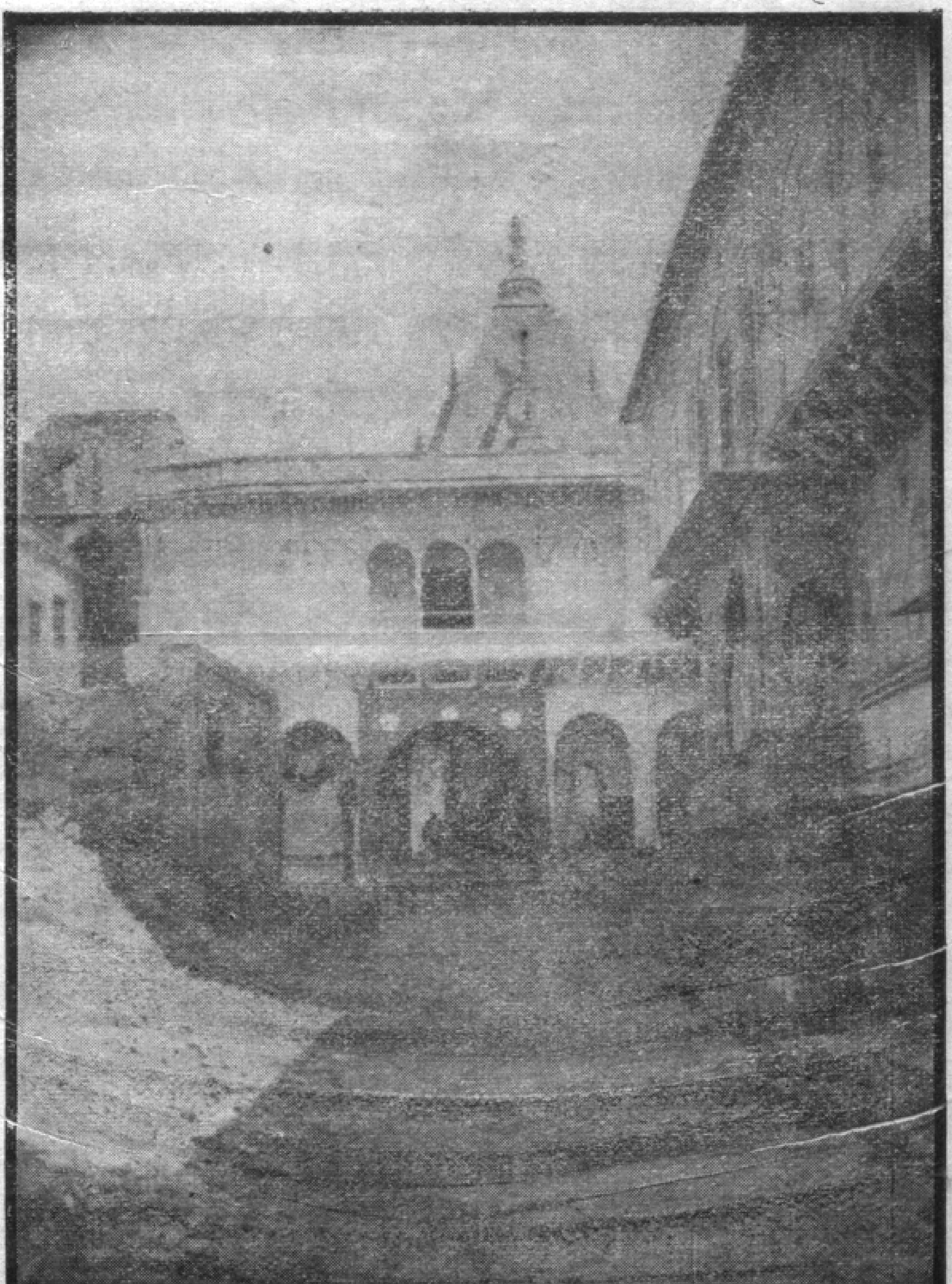
গোপীনাথজির মন্দির বহু প্রাচীন। এখানে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিছুদিন সাধনা করেছিলেন। গোস্বামীপ্রভু বৃন্দাবনে প্রধানতঃ দাউজির মন্দিরে থাকৃতেন। বৃন্দাবনে তিনটি দাউজির মন্দির আছে। যেখানে গোস্বামী-প্রভু ছিলেন সে ঘর আজকাল আর নেই। তবে বাড়ীটা এখনও কোন রকমে টিঁকে আছে। গোস্বামী প্রভুর স্ত্রী ঐ বাড়ীতেই থাকৃতেন আর ঐখানেই তিনি মারা যান। তাঁর একটা ছোট সমাধি দাউজির সেবকেরা করিয়েছেন। তবে তাঁদের নিতান্ত হীন অবস্থা, সেজন্য সমাধির উপর একটা

সামান্য আচ্ছাদনও তুল্‌তে পারেন নি। দেশ-বিদেশে—গোস্বামী প্রভুর ধনী শিষ্যের সংখ্যা বড় কম নয়। তাঁরা ইচ্ছা করলেই এর একটা ব্যবস্থা করতে পারেন। দাউজির মন্দিরের পুরোহিত দামোদর ঠাকুর গোস্বামী-প্রভুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন; তিনি মারা গিয়েছেন, তবে তাঁর স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান। তিনি ৺দাউজির সেবা করেন আর সকালে সন্ধ্যায় সমাধির কাছে কোন রকমে ধূপধুনা দেন।

গোপীনাথের মন্দিরের একটু দূরেই বংশীবট। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিয়ে বাঁশি বাজিয়েছেন। এখানে প্রত্যহ সকালে রাসলীলার অভিনয় হয়। একজন শ্রীকৃষ্ণ, একজন রাধা আর জনচারেক সখী সাজে। প্রথমে কিছুক্ষণ ভজন গাওয়ার পর কল্পিত রাধাকৃষ্ণের আরতি হয়, তারপর রাধা ও সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণ নাচ্‌তে থাকে। এ নাচ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ঠেক্‌ল। আজকালকার থিয়েটারের ফিরিঙ্গি নাচ থেকে কিছু তফাৎ বলেই বোধ হ'ল। যাত্রার সময় যত ব্রজবাসী উপস্থিত থাকেন। একজন ৬০।৭০ বছরের ব্রজবাসী এসেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, রাধাকৃষ্ণের পায়ের ধূলি নিয়ে নিজে সর্ব্বাঙ্গে মাখ্‌তে লাগ্‌লেন। এদের এ রকম ব্যবস্থা আমাদের চোখে একটু যেন বাড়াবাড়ি বলেই মনে হল।

বংশী-বটের কিছু দূরে গোপেশ্বরের মন্দির। এখানে মহাদেবের একটী মূর্ত্তি আছে। দরজায় সব মেয়েরা ফুল ও ফুলের মালা বিক্রয় কর্চ্ছে। মন্দিরটি বেশ সুন্দর। বৃন্দাবনে সব ঠাকুর বাড়ীতে আড়ম্বরটা বেশী বলেই ঠেক্‌ল। জয়পুরে গোবিন্দজীর মন্দিরে সব সাদাসিধে ধরণ।

গোপেশ্বরের মন্দির থেকে বেরিয়ে একটু দূরে আমরা যমুনার ধার দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লুম। কেশী ঘাটটি দেখ্‌তে বেশ। এখানে দেখ্‌লুম কতকগুলা বানর জলে সাঁতার কাট্‌ছে। একটু দূরে একটা কদম গাছ—তাতে কতকগুলো ছোট ছোট লাল কাপড়ের ফালি ঝুল্‌ছে, সেটাকে আমাদের পরিদর্শক বল্লে, বস্ত্রহরণের গাছ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করে এই গাছের উপর উঠেছিলেন। যাত্রীরা সব এই কাপড়ের টুক্‌রো গোপীদের উদ্দেশ্যে দেয়। তার একটু দূরেই একটা বড় বটগাছ-সমেত ঠাকুর বাড়ী। সেটাকে শৃঙ্গার বট বলে। ভিতরে নিতাই গৌর ঠাকুর। একটা অন্ধকার সিঁড়ির কাছে আমাদের জুতা রেখে ভিতরে গেলুম। ঠাকুর বাড়ীর উঠানে ছুটো খুব মোটা বকুল গাছ। বকুল গাছের একটাকে রাজা ও একটাকে রাণী বলে।



শ্রীধাম বৃন্দাবন
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জিউর মন্দির

বংশীবটের একটু দূরেই কালীয়-দমনের ঘাট। সেখানে একটা বড় গাছ রয়েছে। এটি সেই কেলিকদম্ব গাছ। এই গাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন করবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। গাছটিতে সব রাম রাম ও রাধাকৃষ্ণ রাধাশ্যাম লেখা। লোকে বলে যে ঐ নামগুলি আপনিই গাছের শিরাতে লেখা! কিন্তু আমাদের বোধ হলো ধূর্ত্ত পাণ্ডারা লোক ঠকাবার জন্য নিজেরাই ছুরি দিয়ে লিখেছে।

কতকগুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ছুরি গিয়ে কেটে লেখা; তবে কতকগুলো অক্ষর গাছের শিরাতে লেখার মতই দেখাচ্ছিল, কিন্তু গাছের উপর ছুরি দিয়ে কেটে কিছু লিখ্‌লে কিছুদিন পরে এই রকমই হয়। তবে জানিনা, জগতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই!

এরপর আমরা নিধুবনে যাই। এখানে দরজায় একটি করে পয়সা নিয়ে তবে যাত্রীদের ভেতরে যেতে দেয়। বনটি মস্ত বড়। এখানে অনেক বড় বড় পুরানো লতানে গাছ আছে। শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে এখানে লুকোচুরি খেলতেন। এখানে যবন হরিদাসের একটী সমাধি আছে। সেখানে হরিদাস সাধনা কর্‌তেন। দেওয়ালে হরিদাসের এক খানি চিত্রও আছে।

নিধুবনের কিছু দূরে সেবা-কুঞ্জ। সেবা-কুঞ্জে বানরের উৎপাত খুবই। সেবা-কুঞ্জে যাবার সময় 'রাধে' 'রাধে' বলে যেতে হয়; নতুবা বানর কাম্‌ড়ে দেয়। এ ব্যাপারটা আর আমাদের পরীক্ষা করতে সাহসে কুলালো না। সেখানে একটা গাছের ফোকরে একটু জল রয়েছে আর গাছটা গায়ে হাত ঘষার ফলে চক্ চক্ কর্চ্ছে। সঙ্গীটি আমাদের বল্‌লে যে শ্রীকৃষ্ণ ননী খেয়ে এই গাছে হাত মুচেছিলেন আর এই জলে হাত ধুয়েছিলেন।

সমস্ত মন্দিরের মধ্যে গোবিন্দজীর মন্দিরটিই বেশ দেখ্‌তে। এটি একটী লাল পাথরের বাড়ী, ভিতরে বেশ কারুকার্য্য করা। আগে এটা সাততলার সমান ছিল। আগ্রা থেকে নাকি এর চূড়া দেখা যেত, তাই আরঙ্গীবের তা অসহ্য হওয়ায় এটা ভেঙ্গে তিন তলা করিয়ে দিয়েছিলেন। মন্দির অনেক ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছিল, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের Archaeological Depertment তার কিছু কিছু সংস্কার করেছে।

মথুরার তুলনায় বৃন্দাবন আয়তনে খুব ছোট। এটাকে মানুষের দেশ না বলে মর্কটের রাজ্য বল্‌লেই হয়! ঘরের দরজা, জানালা কোথাও একটু খোলা রাখ্‌বার জো নেই। রাখ্‌লেই মর্কটে কিছু না কিছু জিনিস নষ্ট করে দেবে। বাড়ীর জানালাগুলিতে খুব ঘেঁষাঘেঁষি শিক লাগানো। বাড়ীর ভিতরে খোলা জায়গার উপর জাল দিয়ে ঘেরা। শুধু হাতে রাস্তা চল্‌বার উপায় নেই; তা হ'লেই মর্কটের কামড় খেতে হবে। যে কোন জিনিস তারা পাবে,হাতে মুখে করে নিয়ে পালিয়ে যাবে আর ভেঙ্গে,ছিঁড়ে নষ্ট করে দেবে। তবে দুটো ভাঁড়ে কিছু ছোলা ভাজা দিলে, দুহাতে সে দুটো নিয়ে সেটা ফেলে দিয়ে যায়। ব্রজবাসীরা মর্কটের এই সমস্ত উৎপাত নীরবে সহ্য করে, এর কোন রকম প্রতিকারের ব্যবস্থা করে না। দৈনিক যে কত লোককে মর্কটের কামড়ের জন্য হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়, তার ঠিকানা নাই।

এখানেও মিউনিসিপালিটির কোন রকম ট্যাক্স নেই, মথুরার মত চুঙ্গীর ব্যবস্থা। এখানে বাড়ী-ভাড়া খুব শস্তা। তবে ফলমূলের দাম বড় বেশী। তার প্রধান কারণ বানরের উপদ্রব। এখানকার দই খুব ভাল ও শস্তা। এটা বাঙ্গালীদের একটা উপনিবেশ বল্‌লেও চলে। এখানকার ভাষা বাংলা, হিন্দি না জান্‌লে এখানে কোন রকম অসুবিধা হয় না। বরং বাংলা না জান্‌লে বেশ একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। লোকে এখন ৫০ বৎসর পরে বনে আর না গিয়ে সাধারণতঃ এইখানেই আসেন। অনেক গরীব বৃদ্ধা বৈকালে ঠাকুর বাড়ীর সাম্‌নে এক একটা ছোট ছোট কাপড় পেতে বসে থাকেন, তাঁরা সামান্য এক একটা পাই পেলেই সন্তুষ্ট। এখানকার বাসিন্দাদের ব্রজবাসী বলে। আর বাড়ীগুলোর নাম কুঞ্জ। তবে যেখানে বাঙ্গালী সেখানেই দলাদলি; তাই এখানেও দলাদলি খুব। এখানে সখের থিয়েটারও এসে দেখা দিয়েছে।

যাত্রীদের জন্য এখানে অনেক ধর্ম্মশালা আছে। সেখানে একেবারে তিন দিনের জন্য যাত্রীদের বিনা-ভাড়ায় থাক্‌তে দেওয়া হয়। প্রত্যেককেই এক একটী ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়। যাত্রীরা তাতে স্বচ্ছন্দে জিনিসপত্র রেখে সহর দেখ্‌তে পারে। গরীব লোকদের জন্য অনেক আশ্রমও আছে। গোয়ালিয়র, জয়পুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি সমস্ত রাজাদেরই এখানে একটা না একটা ঠাকুর বাড়ী আছে আর সেই ঠাকুর বাড়ীর সংলগ্ন একটী করে ধর্ম্মশালাও আছে।

# সঙ্কলন

## চন্দননগরের যুদ্ধ

চন্দননগর-আক্রমণের সূচনা করিয়াই, ফরাসিগণ যাহাতে নবাবের সহায়তা না পান, তাহার ব্যবস্থা ইংরাজ করিলেন। প্রথমতঃ, নবাবের অনুমতির জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া নবাবকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহার অনুমতির জন্য চন্দননগরের নিকট অপেক্ষা করিবেন—এই মর্ম্মে ক্লাইভ নবাবকে পত্র দিলেন। নবাবের দরবারে দল পাকাইয়া যাহাতে নবাব ফরাসির প্রতি অনুকূল না হন তাহার ব্যবস্থা ধূর্ত্ত ওয়াট্‌স্ করিতে লাগিলেন। তৃতীয়তঃ, নবাব হুকুম না দিলেও পাছে তাঁহার সামন্তগণের মধ্যে কেহ গুপ্তভাবে উৎকোচে প্রলুব্ধ হইয়া ফরাসির সহায়তা করেন, তাহা নিবারণ করিবার জন্য প্রধান কর্ম্মচারীবর্গকে ব্যক্তিগতভাবে ধন অথবা ধমক দিয়া বশীভূত করিলেন।

নবাব-দরবারে ফরাসির পক্ষে মোহনলাল, খোজা বাজিদ ও রায় দুর্লভরাম—আর সকলেই ইংরাজের পক্ষে। ফরাসির দুর্ভাগ্যবশতঃ মোহনলাল তখন পীড়িত এবং খোজা বাজিদ ও রায় দুর্লভরাম ভীরু, স্বার্থান্ধ। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের তখন তরল স্থিতিস্থাপক অবস্থা; ইংরাজের বিক্রম ও বুদ্ধিচাতুর্য্য সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে, সিরাজের শত্রুকুল স্বতঃই ইংরাজের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, চক্রী জগৎ শেঠের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক ইংরাজ নবাবের সর্ব্বনাশ-সাধনে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার সঙ্কল্পে স্থির-প্রতিজ্ঞ; ফরাসির এক ভরসা ছিল যে দেশের লোকের কাছে অর্থাৎ দেশীয় বণিকগণের কাছে তাঁহাদের সুনাম ছিল এবং ঋণও ছিল, ফরাসির পতন হইলে দেশীয় বণিকগণ প্রধানতঃ জগৎ শেঠ স্বয়ং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন—অতএব ফরাসি যাহাতে উৎসন্ন না যায় তজ্জন্য ফরাসির উত্তমর্ণগণ নবাব দরবারে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

ফরাসি জগৎ শেঠের নিকট ৭ লক্ষ টাকার ঋণে বদ্ধ, ক্লাইভ এই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ফরাসির যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া জগৎ শেঠের হস্তে সমর্পণ করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করিবেন, ক্লাইভ জগৎ শেঠকে এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন।

ফরাসি ডিরেক্টর রেনোর অবস্থা শোচনীয়, নবাবের দরবারে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার বিরোধী, দেশের লোক উদাসীন; তিনি নিজে অর্থহীন, বলহীন। তাঁহার একমাত্র অবলম্বন তাঁহার শৌর্য্য, তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি, স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান-জ্ঞান; তিনি এই সম্বল লইয়া অসাধ্য সাধন করিলেন। চন্দননগর ছিল সমগ্র প্রাচ্য খণ্ডে ফরাসির ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের মেরুদণ্ড-স্বরূপ; চন্দননগরকে রক্ষা করিতে পারিলে ভারতে ফরাসির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষা পাইত।

ইংরাজ সৈন্য ৮ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার পরপারে ছাউনি উঠাইয়া চন্দননগর অভিমুখে যাত্রা করিল, কামানসকল নৌকাযোগে পাঠান হইল।

এখন চন্দননগরের বল ফোর্ট দ'আলেয়ঁা। প্রায় ৬০০ ফুট দীর্ঘ প্রাচীর বেষ্টিত একটী মৃত্তিকা ও ইষ্টকনির্ম্মিত সম-চতুষ্কোণ, চারিকোণে চারিটী করিয়া ১৬টি কামান-স্থাপনোযোগী bastion, rampart glawfis নাই। চতুঃপার্শ্বস্থিত গৃহসকল হইতে দুর্গের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত লক্ষ্য হয় ও উত্তরের প্রাচীর ১৷০ ফুট চওড়া ও ৮ হইতে ১০ ফুট উচ্চ। পূর্ব্বদিকের অর্থাৎ ভাগীরথীর দিকে প্রাচীরের গায়ে পণ্যশালা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, পূর্ব্বদিকে পরিখা ছিল না, আর তিনদিকের পরিখা শুষ্ক, মাত্র ৪ ফুট গভীর, তাহাও আবার আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। দুর্গের পশ্চিমে লালদিঘি, সুতরাং সেইদিকই সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত। পশ্চিমের পরিখা হইতে পুষ্করিণীর তীর ভাগ মাত্র ১২ ফুট দূরে অবস্থিত।

সমগ্র সহরটি তিন দিকে খোলা—দুই দিকে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে একটা খাত ছিল কিন্তু তাহা অগভীর এবং সমগ্র খাতটাকে রক্ষা করিবার মত লোকেরও অভাব।

ইংরাজের সহিত সন্ধির ব্যবস্থা করা না ঘটিয়া উঠিলে যুদ্ধ করিতে হইবে এই ভাবিয়া পূর্ব্বাহ্নে রেনো দুর্গ-সংস্কারের আয়োজন করিয়াছিলেন; দুর্গের নিকটবর্ত্তী উচ্চ অট্টালিকাসমূহ, উত্তরদিকে জেস্যুইট-গণের গির্জ্জা ও আবাসগৃহ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কেবল দক্ষিণ দিকের গৃহসকল সময়াভাবে ও লোকাভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বদিকে নদী, কিন্তু পূর্ব্বদিকেই দুর্গপ্রাচীর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ এবং পূর্ব্ব প্রাচীরতলে পরিখার অভাব, এই কারণে এদিক রক্ষা করিবার জন্য রেনো দুর্গের বাহিরে তিনটা কামান স্থাপনোপযোগী স্থান (battery) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ দিকের গৃহাদি ভাঙ্গা না হওয়ায় সে দিকও রক্ষা করা সহজ ছিল না। নদী বহিয়া ইংরাজের জাহাজ আসিতে পারিবে না, এই ভরসায় রেনো সে দিকের রক্ষাকল্পে অধিক যত্নবান হইলেন না—কিন্তু সেইদিক দিয়াই শত্রু আসিয়া তাঁহার দুর্গ ছারখার করিয়া ছিল, একচক্ষু হরিণ ডাঙ্গার দিকে তাহার দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া শষ্পাহার করিতেছিল—সে জানিত না যে নদীবক্ষে নৌকা বহিয়া ব্যাধ আসিয়া তাহার প্রাণসংহার করিবে।

দুর্গপ্রাচীরে স্থাপিত কামানগুলির অবস্থা শোচনীয় ছিল, একটিরও চাকা ঠিক ছিল না; ছোট কামানের একটিরও গাড়ী ছিল না, রেনো



আর্লেয়া দুর্গ, চন্দননগর

১৭৫৭ খৃঃ, ২৩শে মার্চ্চ অপরাহ্ন-কালে এই দুর্গের পাদমূলে, চন্দননগরের তথা সমগ্র বাঙ্গালার ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছিল।
১৮০১ খৃঃ Capt. Hunter কর্ত্তৃক অঙ্কিত।
( প্রবর্ত্তকের সৌজন্যে )

দুর্গের বাহিরে সহরের ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রেনো redout নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একটি দুর্গের উত্তর তোরণের সম্মুখে, তাহাতে ৩টি কামান স্থাপিত ছিল। দ্বিতীয়টি উক্ত তোরণের সম্মুখ দিয়া যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রশস্ত পথ গিয়াছে সেই পথের পশ্চিম মুখে। দুর্গের দক্ষিণ ভাগে ৪টী battery নির্ম্মিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে তিনটী দুর্গাভিমুখী প্রধান রাজপথের উপর, এবং চতুর্থটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নদীর কিনারার উপর দুর্গ হইতে ৯০০ গজ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে নদী অতি অল্প-পরিসর—১৪ই মার্চ্চ তারিখে এই সঙ্কীর্ণ স্থানে পাঁচখানি জাহাজ জলমগ্ন করিয়া নদীপথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়।

রেনোর অধীনে সৈন্য-সংখ্যা কত ছিল তৎসম্বন্ধে বিশ্বাস-যোগ্য অঙ্ক পাওয়া দুষ্কর। ১৭৫৬ সালে ৮৫ জন গোরা সৈনিক দুর্গে ছিল এবং রেনো অনেক সাধ্য-সাধনার পর পণ্ডিচারী হইতে ১৬৭ জন সিপাহী ও ৬১ জন গোরা সৈনিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে রেনোর অধীনে

২৩৭ জন গোরা; তন্মধ্যে ৪৫ জন
পেনসেনভোগী বৃদ্ধ, ২ জন রোগী

১২৩ জন নাবিক

৭০ জন দোআঁশলা ইউরোপীয় ও বেসরকারী
ইউরোপীয়

১০০ জন কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও জাহাজের
কর্ম্মচারী

১৬৭ জন সিপাহী

১০০ জন তোপা অর্থাৎ মিশ্র পোর্ত্তুগীজ
গোলন্দাজ—

---

মোট ৭৯৭ জন

এতদ্ব্যতিরেকে ইংরাজ-পক্ষ হইতে পলায়িত কতকগুলি লোক রেনোর নিকট আশ্রয় লাভ করে। ইহাদিগকে লইয়া রেনো ১ দল grenadier ৫০

১ দল গোলন্দাজ ৩৩

১ দল নৌসেনা ৬০

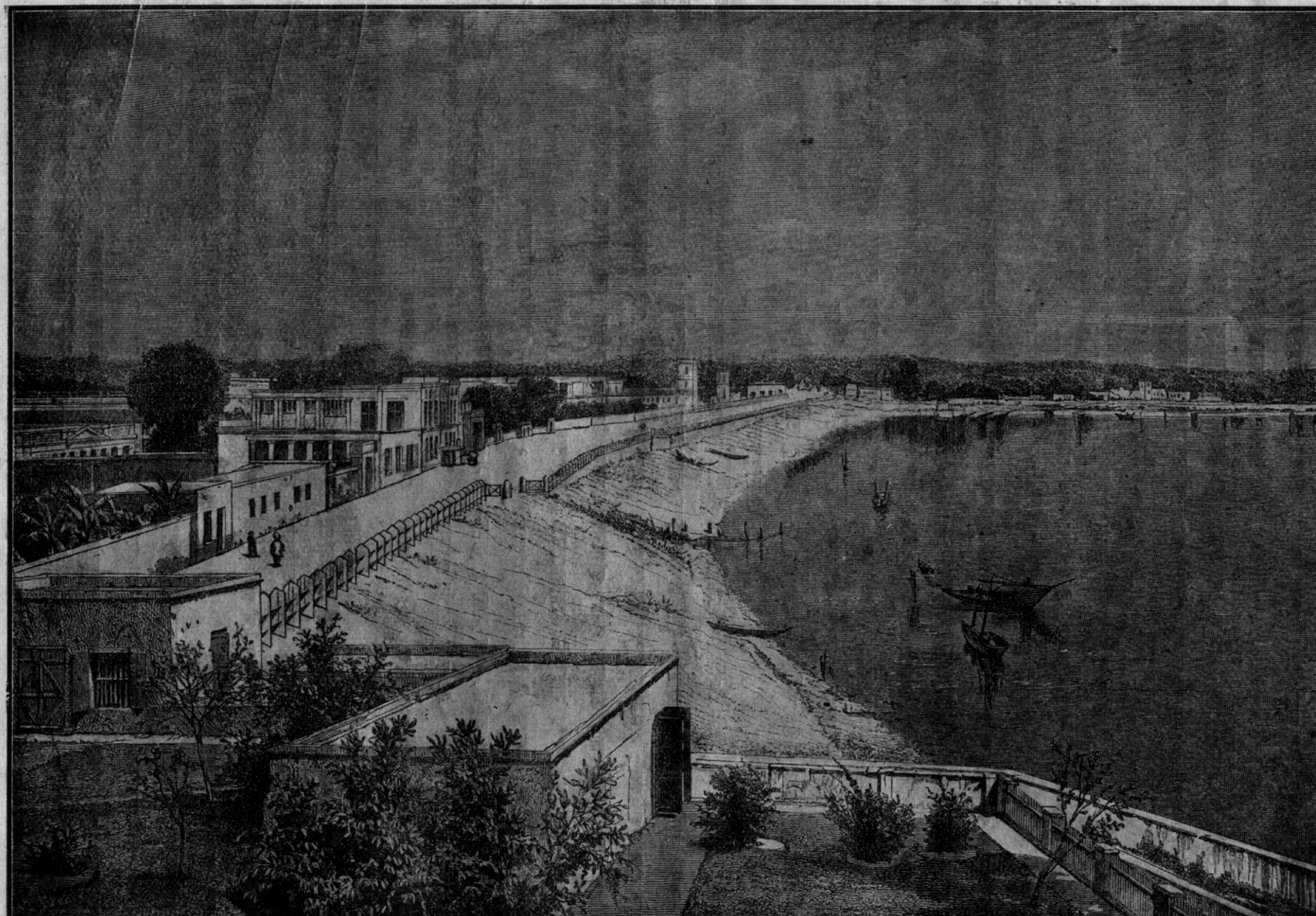
আর ১ দল ফরাসী কোম্পানীর ভৃত্যগণ লইয়া স্বেচ্ছাসেবক গঠিত করেন, তাহার সংখ্যা যদি ১০০জনও ধরা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বসমেত সৈন্য-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক এক সহস্র মাত্র হয়।

সংখ্যায় অল্প এবং নানাজাতীয় সৈন্য লইয়া রেনো অত্যন্ত বিপন্নই হইয়াছিলেন। তাহার উপরে কোন যুদ্ধ-বিষয়ক Engineer না থাকায় সমগ্র সহরটাকে রক্ষা করিবার সংকল্প করিয়া দুর্গের সহিত বাহিরে নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থানা স্থাপন করিয়া সৈন্যসংখ্যার অল্পতা আরও অনুভব করিতে লাগিলেন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়া একমাত্র দুর্গটাকে রক্ষা করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহারই আয়োজন করিতে তাঁহার সকল শক্তি নিয়োজিত করা রেনোর উচিত ছিল, তাহা না করিয়া সমগ্র সহরটাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি অনর্থক সময় ও বলক্ষয় করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া, নবাবী সৈন্যও ফরাসিগণের সাহায্যার্থ প্রস্তুত ছিল। পলাশীতে রায়দুর্লভের অধিনায়কত্বে ১০,০০০; পলাশীর দক্ষিণে মাণিকচাঁদের অধিনায়কত্বে ৪ হইতে ৫ হাজার; হুগলীতে নন্দকুমারের অধীনে একটা বড় রকম ফৌজ ছিল, তাহার মধ্যে ২০০০ সিপাহী ফরাসীগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধের প্রথম দিন তাহারা চন্দননগরে অবস্থিত ছিল। এ সুবৃহৎ ফৌজ কিন্তু ফরাসির সাহায্য-কল্পে যথাসময়ে চন্দননগরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই।

সমস্ত ফরাসি সৈন্য দুর্গ আশ্রয় লওয়ায় সহরটি সম্পূর্ণভাবে ইংরাজ সৈন্যের করায়ত্ত হইল। কিন্তু দুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী গৃহসমূহ তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হইলেও সেদিন আর দুর্গাক্রমণের কোন চেষ্টা হইল না; তাহার অন্যতম কারণ এই যে অধিকৃত গৃহ সকলের মধ্য হইতে লুণ্ঠিত মদিরার পিপে শূন্য করিয়া সৈন্যগণ দারুণ মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল।

ফরাসী সৈন্যগণের দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ বিকৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে পৌঁছিল, নন্দকুমার লিখিয়া পাঠাইলেন যে ফরাসিগণ ইংরাজের প্রতিরোধ করিতে অক্ষম। অতি কষ্টে Law নবাবকে বুঝাইয়া ফরাসিগণের সাহায্যকল্পে ১৫০০০ সৈন্য প্রেরণের পরওয়ানা বাহির করাইয়া লইলেন। ঠিক সেই সময়ে ক্লাইভের এক পত্র নবাবের নিকট পৌঁছিল, সে পত্রে ক্লাইভ নবাবকে লিখিতেছেন, যেহেতু ফরাসিগণের সহিত যুদ্ধ করা ইংরাজের অভিপ্রেত নহে, তিনি সসৈন্যে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। পরক্ষণেই নবাবের পরওয়ানা প্রত্যাহৃত হইল। তবে ক্লাইভ দুর্গ আক্রমণের তাদৃশ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলেন না—Watsonএর জাহাজ সকল আসিয়া না পৌঁছানো পর্য্যন্ত তিনি শুধু ফরাসি সেনাকে ব্যস্ত ও উত্যক্ত করিতে নিযুক্ত ছিলেন—এবং, যাহাতে বাহির হইতে ফরাসিগণ সাহায্য লাভ না করেন তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ২০০০ মুসলমান সেনা সেই দিন ফরাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, ইহার মধ্যে ইংরাজগণের তথা ইংরাজের বৃত্তিভোগী নন্দকুমারের কৃতিত্ব ছিল কি না কে জানে! কেহ কেহ বলেন, দুর্গমধ্যে স্থান না পাইয়া তাহারা স্বতঃই চলিয়া যায়—কেহ বলেন, রেনো তাহাদের কাপুরুষোচিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন।



পুরাতন চন্দননগর
( প্রবর্ত্তকের সৌজন্যে )

সেনার এক অংশ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া চন্দননগনরের সীমান্তে সংলগ্ন প্রুশিয় বণিকগণের অবস্থানমধ্যে ছাউনি করিল, আর এক অংশ উত্তরাংশেই অবস্থিত হইয়া দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল।

১৬ই মার্চ্চ-ক্লাইভের সেনা মুসলমান সেনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গৃহগুলি সমস্ত অধিকার করিয়া বসিল এবং দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ চলিতে লাগিল।

১৭ই মার্চ্চ—তারিখে ইংরাজ সেনা দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে নদীতীরে একটি Batteryতে ৩টী কামান স্থাপন করিয়া ঐ দিকের bastionএর উপর গোলা বর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু ফরাসিগণ অতি স্বল্পকালের মধ্যে ইংরাজ সেনাকে স্থানচ্যুত করে।

ঐ দিন দুর্গের মধ্যে কতকগুলি তীর আসিয়া পড়ে, তাহার ফলক-সংলগ্ন কাগজ-খণ্ডে লিখিত ছিল,—Pardon to deserters who will rejoin their colours and rewards to officers who will come over to us."—দুর্গমধ্যস্থিত উপরিতম সৈনিকগণ এই সকল তীর কুড়াইয়া লইয়া কাগজখণ্ড সকল নষ্ট করিয়া ফেলে, পাছে সৈনিকগণ তাহা দেখিয়া বিচলিত হইয়া উঠে।

১৮ই মার্চ্চ—ক্লাইভের সেনা এই দিনে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের bastionএর সম্মুখস্থ একটা বাড়ীতে পাঁচটা কামান বসাইয়া একটি battery প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত দেখা গেল ; গঙ্গাতীরে পূর্ব্ব দিন যে স্থানে battery নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছিল, তাহার পুনঃ স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। যখন ফরাসিগণ দুর্গের সন্নিকটে ইংরাজ সেনার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে ব্যস্ত, সেই অবসরে Admiral Watson এর জাহাজগুলি কাউগাছি হইতে অগ্রসর হইয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় গোন্দলপাড়ার বাঁকের মাথায় দেখা দিল। ঐ স্থান দুর্গের গোলার বাহিরে ; সেখানে জাহাজ ডুবাইয়া নদী-পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল তথা হইতে আধ মাইল দূরে।

১৯শে মার্চ্চ Watson রেনোকে দুর্গ পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন। Lt. Hey সেই আজ্ঞাপত্র বহন করিয়া দুর্গে আসিবার কালে দেখিলেন যে নদী-পথ অব্যাহত, কেন না তাঁহার নৌকা সহজেই দুইটি মাস্তুলের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া চলিয়া আসিল।

দুর্গ পরিত্যাগের আমন্ত্রণ পাইয়া রেনো এক সামরিক সভার আহ্বান করিলেন—তথায় অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে জাহাজের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার যখন উপায় নাই তখন আত্মসমর্পণ করাই সুযুক্তি। এই উদ্দেশ্যে Watsonএর নিকট

রাত্রে Lt. Colville নৌ-বহরের ছোট ছোট নৌকা লইয়া অন্ধকারে দুর্গের উত্তরে যে সকল ফরাসি জাহাজ অরক্ষিত অবস্থায় চন্দননগরের বন্দরে ৪ খানি বড় জাহাজ আর অনেকগুলি ক্ষুদ্র জাহাজ ছিল তন্মধ্যে তিনখানি মাত্র ভাসমান ছিল আর সকলই ফরাসিগণ জলমগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া Cossard de Terraneau নামে জনৈক গোলন্দাজ অধিনায়ক (Sub-lieutenant) ফরাসি দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্লাইভের সহিত যোগদান করিল। তেরানোর স্বপক্ষ পরিত্যাগের অন্যতম কারণ তাহার সহিত রেনোর ব্যক্তিগত বিরোধ। তেরানো দক্ষিণ ভারতে দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং সমর-ক্ষেত্রে তাহার একটী বাহু নষ্ট হইয়াছিল। গোলাম হসেন প্রণীত Seir Mutakherin পুস্তকের অনুবাদক M, Raymond ওরফে হাজি মুস্তাফা তেরানো সম্বন্ধে একটী গল্প বলিয়াছেন—তিনি বলেন যে তেরানোই Admiral Watsonকে নদী-পথের গুপ্ত সন্ধান প্রদান করিয়াছিল। এবং কয়েক বৎসর পরে তাহার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারের কিয়দংশ ফ্রান্সে তাহার পিতার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। সে ঘৃণিত অর্থ প্রতিগ্রহ করিতে অনিচ্ছুক পিতা পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া তেরানো আত্মহত্যা করে।

যাহা হউক তেরানোর স্বজাতিদ্রোহিতার ফলে ফরাসিগণের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সন্ধ্যার সময় তেরানো শত্রু-শিবিরে পলাইয়া যায় এবং সেই রাত্রেই শত্রুর গোলা-বর্ষণের লক্ষ্য স্থান সকল উপলব্ধি করিয়া বুঝা যায় যে তেরানোর উপদেশ-মতই কার্য্য হইতেছে।

২০শে মার্চ্চ—এই দিন রাত্রিযোগে John de la Motte ফরাসিগণের অজস্র গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও নদীর জল মাপিয়া বয়া ভাসাইয়া জাহাজের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ডাঙ্গায় ক্লাইভের সেনা সেদিন অধিকতর উদ্যমে ফরাসী দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ করিয়া শত্রুকে ব্যস্ত রাখিলেন। সেই দিন মাদ্রাজ হইতে ২০০ সিপাহী আসিয়া ক্লাইভের দল পুষ্ট করিল। এবং ক্লাইভ দুর্গের পশ্চিম-দক্ষিণ bastionএর যথাক্রমে ১২০ ও ১৫০ গজ দূরে দুইটী battery স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

২২শে মার্চ্চ—ক্লাইভের শনৈঃ শনৈঃ দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সমান ভাবে আক্রমণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তিনি এখন দুর্গ আক্রমণে Admiral Watsonকে সহায়তা করিতে সমর্থ।

এই দিন রাত্রিতে নিমজ্জিত নৌকাগুলির উপর আলো দেওয়া হইল—দুর্গের দিকে আবরণ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল যাহাতে ফরাসিগণ জানিতে না পারে।

২৩শে মার্চ্চ—তখনও রাত্রির অন্ধকার দিগন্ত ছাইয়া আছে—৫টার

batteryকে ধ্বংস করিল—নদীপথ রক্ষা করিবার জন্য এই battery নিযুক্ত ছিল—সে পথ এখন মুক্ত। Watsonএর জাহাজ নিরঙ্কুশভাবে অনুকূল বাতাসে জোয়ারের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল—নিমজ্জিত জাহাজগুলি অতিক্রম করিয়া দুর্গের সম্মুখে ৬টার সময় উপস্থিত হইল—দুর্গের দক্ষিণে অবস্থিত ক্লাইভের battery হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গের দক্ষিণপূর্ব্ব bastionকে বিধ্বস্ত করিল;

এই সমস্ত সময় দুর্গের পূর্ব্বদিকের bastion দ্বয় হইতে ক্রমান্বয়ে জাহাজগুলির উপর গোলাবর্ষণ হইতে ছিল কিন্তু জাহাজগুলি আপনাপন স্থান অধিকার করিতে ব্যস্ত থাকায় কোনরূপ প্রতি-উত্তর দেয় নাই। স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিবার পর—দুইখানি জাহাজের এক পার্শ্বের সমস্ত কামান এক সময়ে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া অগ্নিবর্ষণ পূর্ব্বক দুর্গ-প্রাচীর-সংলগ্ন নদীতীরস্থিত batteryটাকে মুছিয়া দিল। তারপর ৫॥০ ঘণ্টা-ব্যাপী শতাধিক কামান হইতে ঘোরতর গোলাবৃষ্টির পর আর দুর্গরক্ষা অসম্ভব-বোধে রেনো শুভ্র পতাকা উড্ডীন করিয়া শত্রুকে জানাইলেন যে তিনি যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইলেন—দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, "শান্তি, শান্তি"।

ভাঁটা পড়িয়াছিল—জল নামিয়া যাইতেছিল, আর অর্দ্ধঘণ্টা কালও জাহাজগুলি পূর্ণবেগে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, কেননা জাহাজগুলির প্রথম তোলার কামান সকল শীঘ্রই অব্যবহার্য্য হইয়া যাইত। এবং সে-অবস্থায় জাহাজগুলিকে ধ্বংস করা কিছুতেই কষ্ট-সাধ্য হইত না। আর অর্দ্ধঘণ্টা কাল যুঝিতে পারিলে সে কার্য্য সাধিত হইত—কিন্তু তাহা হইল না, কেননা ফরাসীর অদৃষ্টস্রোতেও ভাঁটা পড়িয়াছিল, ভারতবর্ষে আর সে অদৃষ্ট ফিরিবার কোন উপায় ছিল না।

শুভ্র পতাকা প্রদর্শিত হইবার অব্যবহিত পরেই Captiain Eyre Coote ফরাসী অধিনায়ক সমীপে প্রেরিত হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যে রেনোর পুত্র চন্দননগর ইংরাজকে প্রদান সম্বন্ধে এক পত্র লইয়া তাঁহার সহিত ইংরাজ-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। চন্দননগর সমর্পণ-সম্বন্ধে সর্ত্ত সকল স্থিরীকৃত হইলে ৪টার সময় Captain Coote একদল গোলন্দাজ ও দুইদল Grenadier-সহ আগমন করিলেন এবং দুর্গ অধিকার করিলেন। সন্ধির ৯টি সর্ত্ত ছিল।

১ম ধারা

ফরাসীগণের দাবী। স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অপর পক্ষে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে না।

ইংরাজের উত্তর। উক্তপ্রকার ব্যক্তিগণকে সমর্পণ করিতে হইবে।

২য় ধারা

দাবী। দুর্গের সেনানী (officers) বন্দী হইলেও প্রতিশ্রুতি (parole) দিয়া স্ব স্ব সম্পত্তিসহ যথা-ইচ্ছা যাইতে পারিবেন; কিন্তু

উত্তর। তথাস্তু।

৩য় ধারা

দাবী। দুর্গের সৈনিকগণ যতদিন বর্ত্তমান যুদ্ধ (ইংলণ্ড-ফ্রান্সের মধ্যে) চলিবে, ততদিন বন্দী থাকিবে এবং ইংরাজ কোম্পানি তাঁহাদের ভরণ-পোষণ করিবেন; যুদ্ধাবসানে শান্তি পুনঃ-স্থাপিত হইলে তাহারা পণ্ডিচারী প্রেরিত হইবে।

উত্তর। বটে, কিন্তু নৌসেনাপতির ইচ্ছানুসারে তাহারা মান্দ্রাজ বা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবে। সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা ফরাসি, তাহারা ইচ্ছা করিলে ইংরাজের সৈন্যদলভুক্ত হইতে পারিবে।

৪র্থ ধারা

দাবী। সিপাহীগণ বন্দী হইবে না, তাহারা করোমাণ্ডাল উপকূলে তাহাদের গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

উত্তর। তথাস্তু।

৫ম ধারা

দাবী। স্যাঁ-কন্তেন্ত নামক জাহাজের কর্ম্মচারী ও নাবিকগণ দক্ষিণোপকূলগামী প্রথম জাহাজে পণ্ডিচারী প্রেরিত হইবে।

উত্তর। তাহাদিগকে সৈনিকগণের ন্যায় মান্দ্রাজে বা ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইবে।

৬ষ্ঠ ধারা

দাবী। জেসুইট পাদ্রীগণ স্ব স্ব গৃহে যাজনা করিতে পারিবে; গির্জ্জার তৈজস-পত্র ও তাহাদের অন্য সম্পত্তি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে।

উত্তর। নৌসেনাপতি কোন ইউরোপীকে চন্দননগরে থাকিতে দিতে প্রস্তুত নহেন; তবে জেসুইট পাদ্রীগণ তাঁহাদের গির্জ্জার তৈজসপত্র লইয়া পণ্ডিচারী চলিয়া যাইতে পারেন।

৭ম ধারা

দাবী। সহরবাসী যে কোন অবস্থাপন্ন বা যে কোন জাতীয় হউক, আপনাপন বাসগৃহ ও সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।

উত্তর। এ বিষয়ে নৌসেনাপতিকে ভার দেওয়া হইল তিনি ন্যায় বিচার করিবেন।

৮ম ধারা

দাবী। কাশিমবাজার, ঢাকা, পাটনা বালেশ্বর ও জুগদিয়াস্থিত ফরাসী কুঠি বর্ত্তমানে ফরাসি কুঠিয়ালের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

উত্তর। এ বিষয় নৌসেনাপতি নবাবের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন।

৯ম ধারা

এবং চন্দননগরের কোম্পানির কর্ম্মচারীবর্গ যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইবার স্বাধীনতা পাইবেন।

উত্তর। তথাস্তু।

আলে র্ঁা দুর্গ—২৩শে মার্চ্চ ১৭৫৭

যখন উপরিউক্ত সন্ধির আলোচনা চলিতেছে, তখন দুর্গ হইতে ১৫০ জন লোক দুর্গ ত্যাগ করিয়া উত্তর দ্বার দিয়া পলায়ন করে; দুর্গবাসী সৈনিকের পক্ষে এ ব্যবহার সভ্য রণনীতির বহির্ভূত হইয়াছিল—ফরাসির প্রতি ইংরাজ অতি ক্রুদ্ধ হন। পলায়িত লোক-সংখ্যার মধ্যে প্রায় ৫ জন অতিকষ্টে কাশিমবাজারে Lawর সহিত যোগদান করেন বলিয়া আরও রুষ্ট হন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ইংরাজ আলে র্ঁা দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। সমগ্র সহরে ইংরাজ সৈন্য লুণ্ঠন করিতে নিরত হইল; গির্জ্জার তৈজস-পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থের সামান্ত সকল পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বেই সহর জন-শূন্য হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তথাপি চন্দননগর লুঠ করিয়া ইংরাজ পর্য্যাপ্ত অর্থলাভ করিলেন। কোম্পানির পণ্যশালায় যে দ্রব্য-সম্ভার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া ২,৮৬০,০০০ পাউণ্ড ইংরাজ পাইয়াছিলেন; তারপর সাধারণ প্রজার সম্পত্তি লুঠ করিয়া কত পাইয়াছিলেন তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। লুণ্ঠিত সম্পত্তি Watson ও Cliveএর সমান-ভাগে ভাগ করিয়া লইলেন। ফলতঃ অবস্থান-কালেই উভয় পক্ষে এই প্রকার বিভাগ করিবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীচারুচন্দ্র রায়।

প্রবর্ত্তক পৌষ ১৩২৯,

---

# বিদেশী কবিতা

## তিব্বতের গান

উঁচু দরের মানুষ যাঁরা থাকেন তাঁরা উঁচুতে।
পাখীর রাজা ভিন্ন বল আকাশ পারে কে ছুঁতে?
বসন্তের এই তিনটি মাসে যে ফুল ফোটে ফুটল সে;
বসন্ত ফুরাল যদি ফুলেরও পাঠ উঠল রে!
এই জীবন না যায় যতদিন ততদিন(ই) মা'র ছেলে,
এই জীবনে সুখের 'সোয়াদ' যে পেয়েছে সেই পেলে।
একটা মাত্র জীবন মোদের, একটা বই আর নাই রে,
যেমন খুসী তেমনি ক'রে ভোগ কর তায় ভাই রে॥

তোমার পানে চেয়ে নয়ন
ফিরল না হে আর,
তোমার পায়ে আপনি মাথা
লুটায় অনিবার।
( চরণ তোমার করেছি হে সার! )
সিন্ধুজলে লবণ মিলে
হয় সে যেমন একাকার!
এই চরণে সব দিয়েছি
জীবন সে কোন্ ছার।
( অভয় চরণ করেছি হে সার! )

অন্ধ ভাবিছে জগৎ অন্ধ,
চক্ষু কেমন দেখেনি চোখে!
পায়সে ভাবিছে তিক্ত মন্দ
বিরস-রসনা রুগ্ন লোকে!
আপনি যে খল নহেক সরল
ত্রিভুবনে সেই কুটিল দেখে,
তুকা অভাজন সাধু দুর্জ্জন
আগে চিনিত না, চিনেছে ঠেকে॥

তুকারাম

---

## তামিল ছড়া

কোঁকোর কোঁ!—হোথা কে গো?
রাম চিড়িয়া!—এখানে কেন?
ডিম পাড়ব!—কেমন ডিম?
ডিডিম্ ডিম!—ডিম কি হবে?
বাচ্ছা হবে!—বাচ্ছা কেন?
ঘাড় মটকাবে।

---

## প্রেম ও স্বাধীনতা

প্রেম, স্বাধীনতা,—ভুবনের সার, তার কাছে ছার হেম;
প্রেমের লাগিয়া প্রাণ দেওয়া যায়, স্বাধীনতা লাগি প্রেম।

## মেক্টৌ গান

সূর্য্য ডুবিল, ছায়া জমে এল আকাশের কোলে কোলে,
রাখাল ছেলের বাঁশী শোনা যায় মৃদু বায়ু-হিল্লোলে ;
ওরে তুই কেন বনেতে, এখনো তুই যে দুধের বাছা,
দলের সঙ্গে ঘরে ফিরে আয় মায়ের পরাণ বাঁচা।
বনে যে অনেক বিঘ্ন বিপদ পথে যে অনেক ভয়,
এ কাঁচা বয়সে ছেড়ে যাওয়া বাছা কিছু বিচিত্র নয়।

Ziya—Turkey.

## প্রেমাধিষ্ঠাত্রীর প্রতি

হে অমরী ! হে অপ্সরী ! মায়াবিনী অয়ি !
সুন্দরী মদন-বধূ ! ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী !
ব্যথিত এ চিত্ত মোর বিড়ম্বিত করো না গো আর,
দেবী মোরে করো না সংহার।

করুণার মূর্ত্তি ধরি এস মর্ত্ত্য-লোকে,
দয়া যদি হয়ে থাকে অশ্রু হেরি চোখে,
এস তবে স্বর্ণ রথে স্বর্গ ত্যজি পূর্ব্বের মতন ;
কর মোরে সফল সাধন।

এস উড়াইয়া তব যুগল কপোত
এস তরঙ্গিত করি বাতাসের স্রোত,
গভীর গম্ভীর নীল নভস্তল দ্রুত হ'য়ে পার,
এস তুমি দেবতা আমার।

অমর অধর চোখে অমরার হাসি
ফুটিয়া উঠুক মর্ত্ত্যে পারিজাত-রাশি
তেমনি সুধাও মোরে কেন ফিরে ডাকো গো আমায়
চিত্ত কাঁদে কোন্ বেদনায় ?

এস গো সহাস মুখে সুধাও আমায়
ক্ষেপা কেন ক্ষেপেছে রে আজি পুনরায় ?
কে করিল প্রত্যাখ্যান ? এ অন্যায় কে করিল, হায় ?
দীর্ঘশ্বাস কি ব্যথা জানায় ?

হেলায় ঠেলেছে কেবা ? ফিরিবে সে পায়।
লয়নি যে ফুলহার—আমার আজ্ঞায়
সে জন জোগাবে নিত্য ফুলহার উপহার শত ;
যত হেলা হবে প্রেম তত !

এ মিনতি রাখ, তবে, দেবতা আমার!
পূর্ণ কর মনস্কাম নাশি দুখ-ভার।
মরম ব্যথায় ডাকি, এস দেবী হয়েছি বিহ্বল,
কর মোর কামনা সফল।

Sappho.
৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

# আমার দেখা লোক

## ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি তখন মডেল স্কুলের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার শ্রেণীতে পড়ি। এডুকেশন গেজেট আমাদের বাড়ীতে আসিবার (ডিসেম্বর ১৮৬৮) কিছুদিন পরেই আমার মধ্যম ভগিনীপতি ৺বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের (জষ্টিস্ প্রমথাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সহিত ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম ইনি হাইকোর্টের উকিল এবং চিন্তা-তরঙ্গিণীর কবি। স্কুলের এবং নিজেদের বাড়ীর বাংলা পুস্তক সেই বয়সেই আমি অনেকগুলি পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম ; সেই লাগিয়াছিল, তাহার পর—সম্ভবতঃ তখন বেশ বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই—ভাল লাগে নাই।

হেমবাবুর 'হতাশের আক্ষেপ' এডুকেশন গেজেটে (২৯।১।১৮৬৮) বাহির হয় এবং তাহার পর-পর অন্যান্য অনেক কবিতাই বাহির হইতে লাগিল। সুমিষ্ট কবিতাগুলি সকলেরই ভাল লাগিত। বাড়্তী কাগজ হইতে কাটিয়া আমি একখানি ছোট খাতায় ঐগুলি আঁটিয়া রাখিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে আমি ঐ খাতাটী বই ছাপিবার সুবিধার জন্য দেওয়ায় কবিতাবলীর প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইলে এক খণ্ড পুস্তক আমি উপহার পাই।

হেমবাবু যে পদ্মিনী উপাখ্যানের লেখক অপেক্ষাও বড় কবি হইয়া দাঁড়াইলেন তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। হেমবাবুর 'ইন্দ্রের সুধাপান' যে কয়েকটী শিক্ষিত সাহিত্যিক-মজলিসে মদ্যপান-কালে উচ্চৈঃস্বরে মহা-উৎসাহে পঠিত হইত, তাহার সংবাদ আমাদের 'বারিকের মাঠে' ছাত্র সম্প্রদায়ের সান্ধ্য মজলিসে আসিয়া পৌছিয়াছিল। ঐ সময়ে ইংরেজী-শিক্ষিত প্রবীণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেরই পান-দোষ ছিল।

'ইন্দ্রের সুধাপান' বঙ্গদর্শনে ছাপা হইয়াছিল, তখন আমাদের ইংরাজী পড়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ড্রাইডেনের 'আলেকজাণ্ডার্স্ ফীষ্ট' সেই বারিকের মাঠে আনিয়া তাহার সহিত তুলনা করিয়া বাঙ্গালী কবিরই প্রাধান্য এণ্ট্রান্স ক্লাসের দলপতি ছাত্রেরা আমাদের নিকট জ্ঞাপন করায় আমাদের জাতীয় গৌরব তৃপ্ত হইয়াছিল।

হেমবাবুকে আমাদের বাড়ীতে অনেক বারই দেখিয়াছিলাম; ভক্ত জানিয়া একটু স্নেহের সহিত কথা কহিতেন। একদিন শুনিলাম জোড়া-ঘাটের ঠিক উপরের বাড়ীতে বঙ্কিমবাবুর বাসায় আসিয়াছেন। দুজনকেই ডাকিয়া লইয়া যাইতে পূজ্যপাদ-পিতৃদেবের আদেশ হইল। গিয়া দেখিলাম, হেমবাবু দাঁড়াইয়া একটা বোতল মুখে ধরিয়া সুরাপান করিতেছেন। আসিয়া পড়িয়া অপ্রতিভের একশেষ হইয়া কি করিব ভাবিতেছি—ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবু বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-মহাশয়ের কাণ্ড দেখ!"

হেমবাবু মুখ হইতে বোতল নামাইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের অতিথি-সৎকারটাও দেখে যাও। গেষ্টস্ ক্যান্ নট কি চুজ়াস (অতিথিরা ইচ্ছামত খাইতে পায় না)।"

তাঁহারা দুজনে খুব হাসিলেন, এবং বলিলেন, "একটু পরে আমরা যাইব।"

তখন ইহাঁদের পান-ভোজনের দোষ ছিল এবং সেটা সকলেরই জানা কথা—সেই জন্য এই বিষয়ের উল্লেখে সঙ্কোচ করিলাম না। কিন্তু উহাঁদের দুজনের 'ভারত-সঙ্গীত' এবং বন্দে মাতরম্' যে বাঙ্গালীকে এবং সমগ্র ভারতকে

হেমবাবুর সহিত আমার অনেক বারই দেখা হইয়াছে। অন্যান্য বারের কথায় তেমন বিশেষত্ব না থাকায় মনে ছাপ দেয় নাই। শেষ দেখা হয় ৺কাশীতে, তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার পূর্ণবাবুর বাটীতে। তখন হেমবাবু অন্ধ; মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া থাকেন, খুবই যে ক্ষুব্ধ, এরূপ দেখিলাম না। পিতৃদেবের কথাই হইয়াছিল। কথায় কথায় হেমবাবু বলেন, "তোমার বাবাই আমার জীবনের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে ও সংসর্গে এবং তাঁহার ফরমাইসেই ভারত সঙ্গীত ও ভারত বিলাপের সৃষ্টি—সে সবই ত তুমি জান! যোগেন্দ্র ঘোষের সহিত কোম্‌টীর দর্শন সম্বন্ধে তোমার পিতার চিঠি-পত্র আমি দেখিতাম এবং দশ-মহাবিদ্যা সম্বন্ধে আমার সহিত চিঠি-পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। পিতৃতুল্য তাঁহার কথা শুনিয়া যদি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতাম! যতবার দেখা হইয়াছে, ততবারই বলিয়াছেন, কত জমাইলে? ওকালতীর পেন্‌সন নাই এবং এদেশে পঞ্চান্ন বৎসরের পর পুরা খাটুনিও করিতে নাই।"

হেমবাবুর নিকট বিদায় লওয়ার পর পূর্ণবাবু একটু সঙ্কুচিতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কি বলিলেন?"

আমি সব কথাই মোটামুটি বলিলাম। পূর্ণবাবু বলিলেন, "কাগজওয়ালারা গোলমাল করিয়া উহাঁর জন্য পঞ্চাশ টাকা পেন্‌সন ব্যবস্থা করিল—আমার কিন্তু মনে বড়ই কষ্ট হয়। উনি বড় ভাই; আমার অবস্থাও ত মন্দ নয়। আমি ত সুখেই রাখিতেছি এবং সেজন্য আমায় কোন অসুবিধায় পড়িতেও হইতেছে না। ওটা বে-ইজ্জতী; যেন ওঁর আপন লোক কেহই নাই! ওটা প্রত্যাখ্যান করিলেই ভাল হইত।"

আমি বলিলাম, "ও ভাবে দেখিবেন না। বাঙ্গালী কবির জাতীয় ভাষার সেবাকেও যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এখন দেশের সেবা মনে করিয়া সেবকের সম্মানার্থ কিছু পেন্‌সন দিতেছেন, তাহাতে একটা জাতীয় তৃপ্তি আছে। আমাদের এই জাতীয় অধিকারের অণুমাত্র বৃদ্ধিতে সকলেরই আনন্দ ও গৌরব বোধ করা চাই।" কিন্তু পূর্ণবাবু তথাপি ক্ষুব্ধভাবেই কহিলেন, "সহোদর ভাই কখনও ওভাবে

১৩

মেনকা লিখিয়াছিলেন যে, তিনি দুই-এক দিনের মধ্যেই ফিরিবেন। সেদিন তাঁর ফিরিবার দিন। সবিতা ব্যস্ত ভাবে বাড়ীর সব দিকের বিধি-ব্যবস্থা ঠিক্‌ঠাক্ আছে কি না তদারক করিয়া বেড়াইতেছিল; বাড়ার গিন্নী বাড়ী আসিয়া বকাবকি করিবার ছল যাতে না খুঁজিয়া পান। কর্ত্তাও বাড়ী ছিলেন না, জমিদারি-কাজে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। বাহিরের ঘরে বসিয়া অরুণ গ্রামোফোনের সাহায্যে পুলকের হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিল। নিজেও তার শিক্ষিত সাধা গলায় ফাল্গুনের সন্ধ্যা মাতাইয়া গাহিতেছিল,—

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে!

মেনকার বাড়ী আসিয়া পৌছিবার তখনো দেরী ছিল। সবিতা পাশের ঘরে কি একটা কাজে আসিয়া গান শুনিয়া বিমুগ্ধ মনে থমকিয়া পড়িল। তখনো তার হাতে অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু তবু সে মুহূর্ত্তের আগ্রহটুকু দমন করিতে পারিল না।

সত্যই তখন ফাল্গুনের পুষ্প-পরাগ-মাখা নব-জাগ্রত বসন্ত, অসীম প্রজাপতির মত, শ্যামল প্রকৃতির বুকে তার বিচিত্র রঙীন পাখা দুখানি ছড়াইয়া বসিয়াছে! পাতা-ঝরা পলাশ গাছের আগাগোড়া ফুলে-ফুলে লাল হইয়া গিয়াছে। লাল ফুলের আড়ালে লুকাইয়া কোকিলেরা বসন্তের স্তব গান গাহিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে রান্না-ঘরের কাছেই মুকুলিত সজিনা গাছটীতে অশ্রান্ত মধুপ-গুঞ্জনের আর বিরাম নাই। মানুষের মনোরাজ্যেও ফাল্গুনের আগুন-কণা বাদ দিয়া যায় না, তা নহিলে তরুণ বসন্তের বিজয়-মুকুট তার মাথায় তুলিয়া দিবে কারা?

একটা ঝী আসিয়া সবিতাকে বলিল,—বৌমা, বাগান থেকে মালী যে একরাশ মুটর-সুঁটী দিয়ে গেল, সেগুলো কোথায় রাখ্‌বো?

সবিতা সন্ত্রস্ত হইয়া সরিয়া আসিল। সে যে চুরি করিয়া গান শুনিতেছিল।

সরিয়া আসিয়া আবার সে সংসারের কাজে হাতে দিল। কিছুক্ষণ পরে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে অরুণ স্তব্ধ গম্ভীর মুখে তেতলায় তার নিজের ঘরে চলিয়া গেল। দিনের বেলায় সে ঘরে বড় একটা সে যায় না, অসময়ে শুইবার ঘরে তাকে যাইতে দেখিয়া সকলেই কিছু আশ্চর্য্য হইল। আর তার মুখই বা এইটুকু সময়ের মধ্যে অমন গম্ভীর কেন?

বাড়ীতে এমন কেহ নাই যে জিজ্ঞাসা করিবে, কি হইয়াছে?

কিছুক্ষণ পরেই মেনকার পৌছিবার কথা ছিল। কিন্তু এইমাত্র শুভেন্দু টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছে যে, দুই ঘণ্টার কলেরায় মেনকা সেই দেশে চলিয়া গিয়াছেন,—যেখান হইতে আর মানুষে ফেরে না!

ব্যথা-ভরা বুকে অরুণ ভাবিতেছিল যে, তার পিতার দুর্ব্বল হৃদ্‌যন্ত্র এই শোকের আঘাত সহ্য করিতে পারিবে কি?

মোটা একটা বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া সে মায়ের জন্য কাঁদিতেছিল। কতদিন কত ছোট-খাট ব্যাপারে সে মাকে ব্যথা দিয়াছে, সেইগুলিই আজ তার মনের সামনে বড় হইয়া ফুটিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, এমনি হতভাগ্য সে যে মায়ের শেষ সময়ে তাঁর কাছে থাকিয়া জীবনের ছোট-বড় সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া লইতে পারে নাই। আশ-পাশের জন-কয়েক আত্মীয় ভদ্রলোক খবর পাইয়া অরুণকে সান্ত্বনা দিতে সেই তেতলার ঘরে উঠিয়া গেলেন।

পাঁচজনের মুখে মুখে এ সংবাদ সবিতাও শুনিল। প্রথমটা, শুনিবামাত্র তড়িৎস্পর্শে ঘা খাওয়ার মত সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল; মনে করিয়াছিল, মিথ্যা গুজব। কিন্তু কয়জনকেই বা অবিশ্বাস করিবে? সকলের মুখেই যে ঐ এক কথা!

সবিতার মনে পড়িল, মেনকার যাত্রাকালের সেই অতি-অকস্মাৎ স্নেহের উচ্ছ্বাস। কথাগুলি তাঁর শেষ কথা বলিয়াই কি তখন তাঁর কণ্ঠে অমন করুণার ধারা নামিয়াছিল? একা এক কোণে হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজিয়া সে বসিয়া

পড়িল। সন্ধ্যার মলিন অঞ্চল যখন গোধূলির ধূসর আলোও ঢাকিয়া আনিয়াছে, সেই সময়ে কর্ত্তার মোটর তাঁকে বাড়ীতে আনিয়া পৌঁছাইল।

শোকাচ্ছন্ন নিঝুম বাড়ী দেখিয়া জগৎবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—আজ বাড়ী এমন চুপ্‌চাপ্ কেন রে? পুলক কোথায়? বৌমা কোথায়?

শ্বশুরের গলার সাড়া পাইয়া সবিতা তাঁর সুমুখে গিয়া দাঁড়াইল। পরিশ্রান্ত শ্বশুর যতক্ষণ এ দুঃসংবাদটা না শোনেন, ততক্ষণ তাঁকে যেটুকু শান্তি দিতে পারা যায়, সবিতা সেই চেষ্টা করিতেছিল।

তিনি হাত-পা ধুইয়া জল খাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এতক্ষণ সবিতা তাঁর কাছে-কাছেই ছিল, দু-একটী চাকরকে ম্লান মুখে যাওয়া-আসা করিতে দেখিয়া সে সরিয়া পড়িতেছিল; কর্ত্তা বলিলেন,—কৈ,—তাঁর যে আজ আসবার কথা ছিল, তা এলেন না তো! পট্‌লা কোনো খবর-টবর দ্যায় নি কি?

সবিতা মুখ নামাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—আমি তো তা বলতে পারি নে।

কর্ত্তা অরুণকে ডাকাইলেন। আরক্ত চোখের জল কোনো রকমে সামলাইতে সামলাইতে অরুণ আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যা হইয়াছিল বলিয়া তার মুখ দেখা গেল না। কর্ত্তা বলিলেন,—কটকের কোন খবর এসেছে কি? পট্‌লা কোনো খবর দ্যায় নি কি যে, কেন এলো না?

অত্যন্ত ভগ্ন দীন কণ্ঠে অরুণ বলিল,—দিয়েছে।

ছেলের ভগ্ন সজল কণ্ঠে চমকিয়া কর্ত্তা সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন—কি খবর? কৈ, দেখি সে চিঠি।

—চিঠি নয়, টেলিগ্রাম। খবর ভাল নয় বাবা, আপনি—

অরুণের গলার স্বর আর ফুটিল না। কর্ত্তা বলিলেন,—কৈ দেখি—ও, না, না, তুমিই পড়ে শোনাও, আমি তো চশমা আনি নি।

অরুণ পকেট হইতে কাগজটা নিয়া হাতে করিল; তখন ঘরে বেশ অন্ধকার, অক্ষর দেখা যায় না, কিন্তু এ কাগজখানা অরুণ এতবার পড়িয়াছে যে কথাগুলি তার মুখস্থ

কর্ত্তা বসিয়া ছিলেন; একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িলেন। নিঃশব্দে চক্ষু মুদিয়া বত্রিশ বৎসর আগেকার একটী দশ বৎসরের বালিকা হইতে এই অচ্ছেদ্য মিলনের দীর্ঘ সময়টা এক মুহূর্ত্তে স্বপ্নের মতই বুঝি দেখিয়া লইলেন! জীবন-যাত্রার এতখানি পথ যে সঙ্গী ছিল,—আজ পথ চলার এই প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ যখন বাকী, এমন অসময়ে সে কোথায় গেল?

কর্ত্তার কোন ব্যবহারেই ব্যাকুলতার কোনো অধীর চিহ্ন দেখা গেল না; বরং ধীরতা গম্ভীরতা আরো বেশী বাড়িয়া গেল।

সে রাত্রে সবিতা স্বামী ও শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গে সাবধানে কাটাইল। তার স্থির বুদ্ধিতে সে ভোলে নাই যে, বাহিরে কর্ত্তা যতই অবিচল থাকুন, তাঁর বিকল হৃদ্‌যন্ত্রে এ অবস্থায় কোনো সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটা কিছুই বিচিত্র নয়! অরুণও সে রাত্রিটা পিতার পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিয়া কাটাইল।

পরের দিন নিতান্ত ভাগ্যহীনেরই বেশে রুক্ষ মাথায় খালি পায়ে শুভেন্দু আসিয়া দাঁড়াইল। দিন কয়েক পরে শ্রাদ্ধও চুকিয়া গেল।

শ্রাদ্ধের সময় পুলকের বাপ প্রভাত আসিয়া ছিলেন। শ্রাদ্ধের পরদিন তিনি যাইবার সময় পুলককে লইয়া যাইবেন, ভাবিতেছিলেন। এ বাড়ীতে যদি পুলক ছাড়া অপর একটি কোনো ছেলে থাকিত তা হইলে হয় তো তিনি কোন্‌টী নিজের সন্তান তা চিনিতেই পারিতেন না! পুলকও এই নূতন মানুষটীকে অষ্টপ্রহর মামাদের কাছে থাকিতে দেখিয়া মামাদের কাছে অবধি যাইতে পারিত না, পিতা-পুত্রে এমনি পরিচয় ছিল!

প্রভাত অরুণকে বলিল,—আমার মা বলছিলেন যে, আপনারা তো এখন খোকাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়বেন,—তাই তাঁর ইচ্ছে, ও তাঁরই কাছে থাকে!

অরুণ বলিল,—তা যাওনা নিয়ে,—তোমার ছেলে—

বাধা দিয়া প্রভাত বলিল,—না, না, সে কথা আমি বলছিনে,—ও কি আপনাদেরই কেউ নয়?

নেই। তবে বৌমা ওকে নিয়েই আছেন, উনিই ওকে এত বড় করে তুলেছেন,—ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যেয়ো—

অরুণ সে ভার শুভেন্দুর উপর দিতেছিল। কিন্তু সর্দ্দি-কাশীর উপর একটু জ্বর হইয়া সেদিন শুভেন্দুর শরীর খারাপ ছিল, সে অরুণের কথার উত্তরে বলিল,—তাঁর কাছ থেকে পুলককে কেড়ে আনা! সে ঠিক তোমারি উপযুক্ত কাজ হবে দাদা,—ও কাজটা মাও পারেন নি,—আমিও পারবো না। ও তুমিই যাও, বেশ পারবে এখন!

অরুণ ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া একটা তীব্র উত্তর দমন করিল।

সবিতা তখন অনেকদিন পরে অবসর পাইয়া পুলকের গায়ের একটা পাৎলা বেনিয়ান সেলাই করিতেছিল; কাছে বসিয়া পুলক আবোল্-তাবোল্ বকিয়া যাইতেছিল। বেশীর ভাগই তার দিদিমার কথা। দিদিমা কোথায় গেল, কেন আসিবে না, এই-সব কথার উত্তর দিতে দিতে সবিতা আর কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

সহসা অরুণকে দেখিয়া সবিতা হাতের সেলাইটা ঠেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অরুণ বলিল,—প্রভাত পুলককে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

পুলক চেঁচাইয়া উঠিল,—আমি যাবো না, কক্ষনো যাবো না।

অরুণ আবার বলিল,—বাবা বললেন যে, তুমি যদি আপত্তি না কর,—তা হলে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।

সবিতার মুখের স্বাভাবিক রং একেবারে পাংশু হইয়া গেল; সে পুলককে কোলে তুলিয়া বলিল,—আর কিছুদিন রাখবেন না কি?

—অনর্থক কেন মায়া বাড়ানো? প্রভাত নিতে এসেছে, দিয়ে দিলেই সম্পর্ক চুকে যায়! ওর ছেলে রেখে আমাদের কি হবে?

—মা থাকতে তবে নিয়ে যান নি কেন?

—আমি ছেড়ে দিতে পারবো না।

—বেশ,—যা ইচ্ছে তোমার!

অরুণ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। তার মুখ দেখিয়া সে যে বেশী বিরক্ত হইয়াছে এমন বোঝা গেল না।

সবিতা হাঁফ ছাড়িয়া পুলককে চুমু খাইয়া মনে মনে ভাবিল, কথা না শুনিয়া অপরাধ করিলাম না তো!

কিন্তু এই মাতৃহীন শিশুর কল্যাণে এ অপরাধ করা চলে। সে না হয় স্নেহের টানটা শিথিলই করিত, যদি জানিত যে পুলক ভাল থাকিবে। কিন্তু এখানকার চেয়ে কি তার বিমাতা তাকে ভাল করিয়া রাখিতে পারিবে? হয়তো বা এখন হইতেই এই শিশুর কপালে অশান্তি ভোগ আরম্ভ হইবে। এর জন্য যদি স্বামী রাগই করেন তো সেও তার অদৃষ্টের দোষ ছাড়া আর কিছু নয়!

অরুণ কিন্তু রাগ করে নাই। সে একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল, সবিতার মতের দৃঢ়তা দেখিয়া। সবিতা যে তাদের সকলের মতের বিপক্ষে মত চালাইতে পারে, এমন কথা সে মনে করে নাই।

প্রভাত অগত্যা পুলককে না লইয়াই ফিরিয়া গেল; বলিয়া গেল,—তবে আরও কিছুদিন যাক্!

দিন কতক কাটিয়া গেল। বাস্তবিক বাহিরে কর্ত্তার কোনো ভাবান্তর না দেখা গেলেও তাঁর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিত্য নূতন উপসর্গ জুটিয়া তাঁকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে লাগিল। ডাক্তারেরা তাঁকে স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিলেন।

তিনি প্রথমে হাসিয়া বলিলেন,—তা ঠাঁই পরিবর্ত্তনেই তো চলেছি,—এই বা মন্দ কি? দেখাই যাক্, নিয়তি কোথায় নিয়ে যায়!

কিন্তু প্রবীণ ডাক্তারটী কর্ত্তার অনেকদিনকার বন্ধু। কথার উপর কথা বলিয়া জোর দেখাইবার অধিকার তাঁর ছিল। তিনি জেদ্ করিয়া বলিলেন,—আপাততঃ দিন কতক দারজিলিঙেই হাওয়া খেয়ে ঘুরে ফিরে আসুন!

জন্যেই যাওয়া দরকার। ও বিষয়ে এ সময়টা দারজিলিং চমৎকার।

—কেন, বেনারসে গেলে মন্দ কি হয় ? মরি যদি তো কাশী-প্রাপ্তি ঘটবে, ছেলেরাও থাকবে, বৌমারাও থাকবেন, সেই বোধ হয় বেশ সুবিধে হয়!

ডাক্তার মত দিলেন না, বলিলেন,—না, না, তা হয় না, বেনারসে আজকাল বড্ড কলেরা হচ্ছে, তার চেয়ে সোজাসুজি ঐ পাহাড়েই চলে যান, শরীরের পক্ষে সেইটেই ভাল হবে।

হতাশভাবে কর্ত্তা চুপ করিলেন। যাওয়ার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা আর বলিলেন না। অরুণ কিন্তু খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

দারজিলিঙে যে তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব অনেক আছে, গেলে কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না, এই কথাই সে জগৎ বাবুকে বার বার করিয়া বুঝাইতে লাগিল। কেন না, সহযাত্রী অরুণ একা! শুভেন্দুর মেডিকেল কলেজের পরীক্ষার বেশী দেরী নাই, সে আর কতদিন কলেজ কামাই করিবে!

১৪

অনেকদিন বাপের বাড়ীর কোন চিঠিপত্র না পাইয়া সবিতা মনে মনে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিল। তার দাদামশায়ের সেই ব্যায়রামের খবর আসার পর আর কোন চিঠিপত্র আসে নাই। তারপর যে তিনি কেমন আছেন, এইটুকু খবর দিয়া মাও তাকে একটু নিশ্চিন্ত করেন নাই বলিয়া সে মনে মনে মায়ের উপরেও অভিমান করিতেছিল।

সেই যে দাদা মশায় তাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন,—না, না, শুধু তো তাকেই নয়, তাঁদের ইচ্ছা যে আরো অনেক বেশী আগাইয়া গিয়াছিল,—তার পরই এ বাড়ীতে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

এই শোকার্ত্ত পরিবারে সবিতা আর নিজের কথা ভাবিবার অবসর তো বড় বেশী পায় নাই! সকলকারই শোকের কালি সে যে নিজের আঁচলে মুছাইয়াছে,—তার নিজের দাদমশায়ের কথা সে কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা

এই ভাবনার উপর আবার সেদিন সে ডাক্তারের মুখেই শুনিল যে, কাশীতে খুব কলেরা হইতেছে।

তিলকে তাল করিয়া তার চিন্তার জাল সে বুনিয়া চলিল। হয় তো তাঁরা আর কেহই বাঁচিয়া নাই! সেই তো দুটী মাত্র মানুষ! সবিতার বুকটা সজোরে আছড়া-পিছড়া করিতে লাগিল। হায় রে! একটী কথা বলিবার তার কেহ নাই! যার কাছে দুটী কথা বলিয়া সে বুকটাকে হাল্কা করিয়া লইতে পারে। এও তার ভাগ্য! তা নইলে শ্বশুর তো কাশী যাইতেই চাহিয়াছিলেন!

দুপুর বেলার দীর্ঘ অবসরে নিজের ঘরে বসিয়া সবিতা এই কথাই ভাবিতেছিল। ইচ্ছা করিয়া হয়তো সে ভাবে নাই, কোন্ এক ফাঁকে ভাবনাটাই তাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

আর একটা ঘরে আশা পুলককে লইয়া খেলা দিতেছিল; আব্দারে, কান্নায় পুলক তাকে বিব্রত বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পুলকের ঝী তারা তাকে বলিল,—আপনি কি আর এই দস্যি ছেলেকে সামলাতে পারবেন, ওকে বড় বৌদিদির কাছে রেখে আসুন, আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যাবেখন!

আশা এ বাড়ীতে নূতন মানুষ। সে ভয়ে ভয়ে বলিল,—দিদি যে ঘরে ঢুকে পড়েছেন, কেমন করে যাই?

—ওমা! কেমন করে যাবেন কেন গো? ঝীটা হাসিল।

আশা সসঙ্কোচে বলিল,—বড় ঠাকুরের সুমুখে গিয়ে পড়্‌বো যে!

—আ কপাল! তিনি কি কোনো কালে ও ঘর মাড়ান না কি? তিনি ওঁর নামে জ্বলে যান, তা বুঝি ছোট দাদাবাবুর মুখে শোনেন নি?

আশা অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল; কিছুই বলিল না। কি ভয়ানক! দিনরাত যার হাসিমুখের মধুর আলোয় বাড়ী আলো হইয়া থাকে, এ আলো কি তবে তার আনন্দের দীপ্তি নয়! প্রাণের ধোঁয়া?

আশা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

ছোট দাদাবাবু সব জানেন,—তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই সব শুনবেন। আমাদের মা-ঠাকরুণ ছিলেন, তিনিও ওঁকে এতটুকুনি ভাল বাসতেন না, উনি আসার পর থেকেই তাঁর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিল।

আশা একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—কেন, উনি কি ভাল লোক নন?

—কি জানি! তা কি করে জানবো মা,—তবে ও-সব বড় লোকের খেয়াল।

—থাক্‌গে ও-সব কথা ঝী, ও শুনতে ভাল লাগে না আমার! বলিয়া আশা পুলককে কোলে করিয়া সবিতার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। সবিতা চোখ মুছিয়া মুখ ফিরাইল, হাসিয়া বলিল,—কি আশা,—মন কেমন করছে নাকি?

লজ্জিতা আশা মুখ লাল করিয়া বলিল,—না ভাই, আমার মন কেমন করছে না।

—তবে? ঘুম পাচ্ছে? এসো, ঘুম পাড়াই।

পুলক চেঁচাইয়া বলিল,—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে যে বৌমা!

হাসিয়া সবিতা বলিল,—তোমার! তোমার তো এখনও ঘুমোবার সময় হয়নি, ওটা কেবল আশার হিংসে!

—না বৌমা, এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বো,—শুই?

সবিতা পুলককে বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া বলিল,—আচ্ছা, তবে এখন লক্ষ্মী ছেলে হয়ে ঘুমোও।

আশা বলিল,—দিদি, ঝী বলছিল যে আমাদের নাকি দারজিলিং যাওয়া হবে। সত্যি?

সবিতা বলিল,—আমিও শুনছি। সত্যি মিথ্যে বাবাকে এখনো কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, ঠিক বলতেও পারি নে!

আশা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আমরাও যাব নাকি? যদি যাওয়া হয়?

—যদি নিয়ে যান, যেতে পারি। কেন বল তো?

—নিয়ে গেলেই বেশ হয় দিদি। আমি কখনো পাহাড় দেখিনি, একবার দেখা হতো! তুমি একবার কেন বড়-ঠাকুরকেই—

কথাগুলি সে ঝীয়ের মুখে শুনিয়া আসিয়াছে, তারপর আর সবিতাকে কোনো কথা বলিতে তার মুখ যেন ফুটিতে চাহিল না। না হইলে সে বলিত যে সবিতা যেন দারজিলিং যাওয়ার কথা অরুণকেই জিজ্ঞাসা করে।

আশার অসম্পূর্ণ কথাতেই সবিতার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল; সে তবু হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, তা আমি বাবাকে বলবো'খন, তুমি যেতে চেয়েছো বললেই তিনি নিয়ে যেতে রাজী হবেন!

আশা ব্যস্ত হইয়া বলিল,—না, না দিদি, সে কাজ নেই। এমনিই তো তাঁর শরীর-মন কিছু ভাল নেই,—তার ওপর আমরা বিরক্ত করলে হয়তো রাগ করবেন!

—নাঃ,—রাগ কেন করবেন! বলিয়া সবিতা ঘরের মেঝেয় পাতা মাদুরের উপরে শুইয়া পড়িল। আলস্যের ভঙ্গীতেই সে শুইয়াছিল, তার ক্লান্ত ম্লান মুখখানি আরো বেশী ম্লান দেখাইতেছিল, হাসি চাপা দেওয়া কান্নার রাশি ঝড়ো হাওয়ার মত বুকের মাঝে হা-হা করিয়া উঠিতেছিল, সে যেন আর রুদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না!

বেলা পড়িয়া আসিল। একটা নিশ্বাসে শ্রান্তি ক্লান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া সবিতা উঠিয়া পড়িল। মনের পাওনার সঙ্গে কর্ত্তব্যের ওজন ধরিতে গেলে যে মানুষের মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিতে হয়!

সে শ্বশুরের এ-বেলার ঔষধ-পত্র সব গুছাইয়া তাঁর ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সে-ঘরময় তখন জমিদারির কাগজ-পত্র ছড়ানো। কর্ত্তার শরীর ভাল নয় বলিয়া তাঁর কথামত অরুণ সব লিখিয়া দিতেছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে দেখিয়া ঠিক করিয়া দিতেছিলেন। এই কাগজগুলি বিশেষ তাগাদার। এগুলি ঠিক করিয়া না দিয়া কর্ত্তার কোথাও যাইবার উপায় ছিল না, তাই এগুলির জন্য এত তাড়াতাড়ি!

অরুণ এই হলদে রংয়ের লম্বা লম্বা খাতাগুলিকে মনে প্রাণে ভয় করিত,—কিন্তু এখন বাপের কথায় ও দারজিলিং যাইবার আগ্রহে কোনো রকমে কাজ সারিতেছিল। তাড়াতাড়ির কাজে প্রায় ভুলও করিতেছিল আর কর্ত্তা

সবিতা মাথা হেঁট করিয়া ঘরে ঢুকিল। কাজের সময় মিথ্যা সঙ্কোচ তার স্বভাবও ছিল না, জগৎবাবু নিজেও তা পছন্দ করিতেন না। তিনি হাতের কাগজখানি নামাইয়া বলিলেন,—ওষুধ নিয়ে এসেচো বুঝি? এস, নিয়ে এস এদিকে! খলে কবিরাজী ঔষধ মাড়া ছিল, সেটুকু খাইয়া তিনি বলিলেন,—বৌমা, খানিক পরে আর একবার এস তো, একটু কাজ আছে।

এই সময়ে অরুণ একবার কি ভাবিয়া মুখ তুলিয়া সবিতার দিকে চাহিল; সবিতা সহসা লজ্জিতভাবে মাথা আরো নামাইয়া ফেলিল, অরুণও তখনি আবার অন্ত কাগজে ঝুঁকিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে কর্তার অনুমতি-মত সবিতা আবার যখন সেই ঘরের দিকে যাইতেছিল, তখনো ঘরে অরুণের সাড়া পাইয়া সে আর ঘরে ঢুকিল না; দালানেই দাঁড়াইল; ভাবিল, অরুণের কথা শেষ হইলে ঘরে ঢুকিবে।

লম্বা দালানের নীচেই তিন ঝাড় হাস্‌না-হানা ফুলের গাছ। আসন্ন সন্ধ্যায় অজস্র ফুল ফুটিয়া সারা বাড়ী মদির গন্ধে ভরাইয়া তুলিয়াছিল। একটা চাকর লণ্ঠন জ্বালিয়া কর্তার ঘরে দিতে যাইতেছিল, তাকে দেখিয়া সবিতা রেলিংএর পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তখনো কর্তার ঘরে অরুণ কথা বলিতেছিল।

ওদিকে পুলক আশাকে জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল। সবিতা ঘরে গিয়া পুলককে লইয়া আসিল, কর্তার ঘরের দিকে যাইতে যাইতে সে পুলককে বলিল,—তুমি যেন ও ঘরে গিয়ে দুষ্টুমি করে গোলমাল করো না।

পুলক বলিল,—কেন? দাদাবাবুর অসুখ করেছে বলে?

—হ্যাঁ। তা হলে তিনি রাগ করবেন, তোমাকে বকবেন।

—ইস্! দাদামণি ভালো, দাদামণি বকে না। বড় মামাবাবু ভাল নয়, বকে।

—সে বিষয়ে দেখচি কারো কোনো সন্দেহই নেই,—নয়? পিছনে অরুণের কথা শুনিয়া সবিতা একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। অরুণ হাসিতে হাসিতে আবার বলিল,—কি বলছিলি রে পুলক তোরা? আমার নিন্দে করছিলি?

সবিতার মুখখানা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু না বলিয়া পাশ কাটাইয়া যাইবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। অরুণ তাকে বলিল,—তোমাকে বাবা ডাকছেন, যাও।

—যাই। বলিয়া সবিতা ঘরে যাইতেছিল, পুলক আবদার ধরিল,—আমাকে ওই ফুল তুলে দাও না, বৌমা।

—ও ফুল তুললে খারাপ হয়ে যায়! কি হবে ও ফুল তুলে?

—না, খারাপ হয় হয় না! ঐ যে বড় মামা তুলছেন। আমিও নেব।

সবিতা দেখিল, সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ফুল গাছের ডালগুলি নাড়িতে নাড়িতে অরুণ স্মিতমুখে বলিতেছে,—বাঃ! বেশ সুন্দর গন্ধ আসছে তো!

—তবে যাও, তুমি ফুল নাও গে। বলিয়া পুলককে রাখিয়া সে কর্তার ঘরে গেল। তিনি তখন বালিশে ঠেশ দিয়া বসিয়া দারজিলিং হইতে আসা চিঠি-পত্র নাড়া-চাড়া করিতেছিলেন; সবিতাকে দেখিয়া বলিলেন,—এই যে মা, দারজিলিংএ যাওয়াই তো ঠিক করা গেল। এখন কে কে যাবে, বল দেখি?

সবিতা নীরবে রহিল; হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না। তিনি বলিলেন,—তুমি তো যাবেই,—ছোট বৌমা যাবেন?

সবিতা বলিল,—আশা তো খুব যেতে চাইছে, ও কখনো পাহাড় দেখে নি, বলে।

—তা বেশ তো! তবে পটলার যাওয়া নিয়েই হচ্ছে কথা! তার এগ্‌জামিন এগিয়ে এসেছে।

সবিতার মন সেদিন ভারাকুল ছিল। তাই সে সাহস করিয়া কোনো কথা বলিল না। কর্তা নিজেই কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন,—তবে এখন যাত্রার দিন ঠিক করা যাক্।

সবিতা মৃদু কণ্ঠে বলিল,—কবে হলে সুবিধে হয়?

—কবে হলে? এ মাসটা তো গেলই, আজ বুঝি ২৭এ?

—হ্যাঁ।

—তা হলে বোশেখের দোসরা-তেসরা রওনা হলেই হবে। আচ্ছা, আমি একবার ওদেরও জিজ্ঞাসা করে দেখি।

শ্বশুরের সঙ্গে আরো দু-একটা কথার পর সবিতা বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, অরুণ তখনো পুলককে একটা একটা ফুল তুলিয়া ভুলাইতেছে।

লবঙ্গর মত ছোট ছোট ফুল এক-একটা পাইয়া বালক খুসি না হইয়া রাগে লাফাইতেছে, তার রাগ দেখিয়া অরুণ তাকে আরো রাগাইয়া হাসিতেছিল!

পলকমাত্র তাদের দিকে চাহিয়া সবিতা অন্ত ঘরে গিয়া ঢুকিল।

১৫

একটা অনতিশীর্ণ ঝর্ণার কাছে লাল মাটীর উপর আকিম ফুলের ঘের দেওয়া ফুল-বাগানের বুকে নিপুণ চিত্রকরের হাতে আঁকা রং-ফলানো ছবির মত বাড়ীখানি। কাছেই সারি সারি পাহাড়ী ঝাউ গাছের মন্দিরের মত উঁচু চূড়া। ঝর্ণার কাছে কতকগুলি বিলাতী ফুলের বন। গাঢ় সবুজ পাতার নিবিড়তার ফাঁকে ফাঁকে গাছ আলো করিয়া এক একটা ঘন লাল বা সাদা ফুল ফুটিয়াছিল। বিদেশী ফুলের অধিকাংশই গন্ধহীন, কেবল রূপের, রংয়ের চটকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুলক পুলকের হিল্লোল তুলিয়া ফুলের বনে আর-একটা সজীব ফুলের মত ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছিল।

এক সপ্তাহ হইল অরুণ, আশা, সবিতা ও পুলককে লইয়া কর্ত্তা দারজিলিংএ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন সবিতা এখনো কাশী হইতে তার মা বা দাদামশায়ের কোন খবর পায় নাই, সেজন্ত সে মনে মনে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া আছে। মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অনুসারে অশুভ চিন্তাটাই বেশী করিয়া জাগিতেছিল।

এখানে আসিয়া প্রথম কয়দিন নূতন জায়গায় কাজ-কর্ম্মের চাপে ভাবনা-চিন্তার অবসর সে বড় একটা পায় নাই। সম্প্রতি সংসার গুছাইয়া পাতিয়া কাজ-কর্ম্মের এখন কেবল ভাবিতেছিল যে, এই এতখানি সময় সে কেমন করিয়া কাটাইবে?

নূতন জায়গাটা ভাল লাগিলেও তার তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। আশাও যতখানি উৎসাহ করিয়া এখানে আসিয়াছিল, এখানে আসিয়াই তার অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। এই মাসেই তার বোনের বিবাহ হইবে শুনিয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

সবিতা আশার গায়ের একটা লেশ বুনিতেছিল, আশা বসিয়া বসিয়া এক-মনে তাই দেখিতেছিল, কিছুক্ষণ পরে বলিল,—অনেকগুলো চিঠি এসেছে, যাই, জবাব লিখে দিই গে—

সবিতা বলিল,—তা যাও।

—তুমি এখনো বসে বসে বুনবে?

—তা ছাড়া আর অন্ত কাজ কই? বলিয়া সবিতা হাসিল।

—তা কর, তুমি তোমার তপস্যা কর, আমি যাই—

—কি বললে?

আশা হাসিয়া বলিল,—শুনতে পেলেনা বুঝি? তোমার বুঝি আজকাল মন ভাল নেই দিদি?

সবিতা চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল,—সে কি কথা! মন ভাল থাকবে না কেন? বালাই!

—সত্যি,—কতকাল বাপের বাড়ী যাওনি তুমি,—আমরা হলে তো মরেই যেতুম, মাগো!

—হুঁ,—মরবার হলে আমিও মরেই যেতুম, বাঁচতুম না। তা তুমি কি কাজে যাচ্ছিলে, তাই যাওনা, না হ'ক আমার ওপর নজর দিতে এলে কেন, বল দেখি?

—আচ্ছা, আর নজর দেব না, যাচ্ছি,—আমি তো দেবতা নই, তাই নজর পড়ে যায়!

আশা উঠিয়া গেল। সবিতা হাতের কাজে মন দিবার চেষ্টা করিল। এই সব কথায় তার মনে যেন ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া উঠিত। তাই সে যথাসাধ্য চাপা দিবার চেষ্টাই করিত। কিন্তু প্রকৃতির সন্তান জীব-প্রকৃতিরই বিরুদ্ধে কতক্ষণ যুঝিতে পারে!

একটা বার চোখের দেখাও একদিন ঘটিয়া উঠে না, অথবা উঠিলেও সে নিজেই সে সুযোগ উপেক্ষা করে। বৃথা কাঙাল চেষ্টা করা তার প্রবৃত্তিতে কুলাইত না।

তবু তাঁর গায়ের হাওয়ায়, পায়ের শব্দে, হাসির সাড়ায়, নিমেষের জন্যও কি তার নারী-প্রাণের সুধা-পাত্রখানি অনির্ব্বচনীয় গোপন আনন্দে উজ্জ্বল রাগে ভরিয়া উঠিত না? স্বামীর কাছে স্ত্রীর যা-কিছু ন্যায্য প্রাপ্য, তার কিছুই সে তার স্বামীর কাছে পায় নাই, চাহেও নাই। দয়া চাহিতেও তার মুখ রাঙা হইয়া ওঠে, তবু যে অজানা ঐশ্বর্য্যে মন ভরিয়া যায়, এ কি তার পাওনা নয়? সে বুঝিতে পারিত না যে, তার জীবন-নদীর শুষ্ক চরে এই জল-তরঙ্গের সুর ধরিল কবে হইতে? জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনাতেও মমতা জন্মিল কবে হইতে?

হাতের কাজ হাতে করিয়াই সে বসিয়াছিল, হঠাৎ পুলকের সাড়া পাইয়া মুখ তুলিয়া দেখে, সুমুখেই স্বামী!

পুলকের হাত ধরিয়া অরুণ আসিয়াছে। তার হাতে সদ্য-আগত কয়েকখানি ডাকের চিঠি ও খবরের কাগজ।

অপরাহ্নের সিঁদুরে আলোর রশ্মি সবিতার দীপ্ত মুখে যেন প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছিল। বড় বড় রুক্ষ, ভিজা চুলগুলি পিঠ ছাইয়া ঘরের মেঝেতেও লুটাইতেছিল, অরুণকে দেখিয়া সে সসঙ্কোচে মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; অরুণের হাতের চিঠিগুলির দিকে কেবল একবার দৃষ্টি দিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল। কোনো কথা বলিল না।

অরুণ বলিল,—তুমি না কি চিঠির জন্যে ভারী ভাবছিলে! এই নাও, তোমার একখানা চিঠি এসেছে—

সবিতার ম্লান মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে স্বামীর হাত হইতে চিঠি লইবার জন্য আগাইয়া গেল না, ব্যগ্রভাবে চাহিয়া রহিল।

অরুণ বলিল,—চিঠির জন্যে বড্ড ভাবছিলে, তা নাও না চিঠি!

—কে বললে আমি ভাবছিলুম?

—যেই বলুক, তাতে দোষ কি?

—দোষ? না, না, ভাবনা-চিন্তারও হিসেব-নিকেশ যে

অরুণ স্বাভাবিকভাবেই একটু হাসিল। তাতে অবজ্ঞার তীব্র বিষ ছিল না। সে কি ভাবিয়া নিজেই চিঠি হাতে করিয়া সবিতার দিকে আগাইয়া ধরিল।

সবিতা কিছু বলিবার আগেই পুলক এক লাফে চিঠি লইয়া সবিতার হাতে তুলিয়া দিল। অরুণের সুন্দর মুখখানি একটু লাল হইয়া উঠিল।

সবিতা চিঠিখানা মুঠার মধ্যে চাপিয়া লইল। কতদিনের কত দুর্ভাবনার পর এই চিঠি! মায়ের হাতে লেখা শিরোনামাটুকু দেখিয়াই সে অনেকখানি সান্ত্বনা পাইল; কিন্তু অরুণের সামনে চিঠি খুলিল না।

অরুণ ঘরের ভিতরকার এটা ওটা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতেছিল। বিছানার উপর একখানি বই ছিল। কতটা পড়া হইয়াছে তাই ঠিক রাখিবার জন্য একটা মাথার কাঁটা দেওয়া ছিল। অরুণ বইখানি দেখিতে দেখিতে বলিল,—এখানা তুমি পড়ছিলে?

সবিতা বলিল,—না। আশা পড়ছিল।

—তুমিও তো খুব বই পড়,—নয়?

—একটু, আধটু!

—ছোট্ট বেলা থেকেই পড়ো নাকি?

সবিতা ভিতরে ভিতরে চিঠি পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। তবু নম্রস্বরে বলিল,—না, তখন পড়ার বই না, তাই পড়তুম।

—কি সে বই—বোধোদয়?

সবিতার মুখ কালো হইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, ইনি কি এই এক-আধবার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেই আসেন নাকি!

সে নতমুখে হাতের চিঠি খুঁটিতে লাগিল। দেখিল, চিঠি একখানি নয়, দুখানা। একখানি তার, অন্যখানি অরুণেরই নাম লেখা কার্ড। সেখানি সে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল,—এখানা আমার নয়।

—তোমার নয়? তবে বুঝি ভুল করেছি! বলিয়া সে চিঠি হাতে করিয়া বলিল,—এখানা তো কমলের চিঠি, দেখ্‌ছি, সেও এখানে আসছে বেড়াতে লিখেছে। পরশু-

সবিতা আবার অন্যমনস্ক হইয়া চিঠি খুঁটিতেছিল; সে কিছু বলিল না। অরুণ আবার বলিল,—তুমি বোধ হয় কনককে চেনো না?

—চিনি,—কটকের তো?

—হ্যাঁ, কটক থেকেই সে আসবে। সে—

এই সময়ে আশা সেই ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে জিভ্ কাটিয়া সরিয়া গেল।

এমন সময়ে, বিশেষ সবিতার ঘরে, সে ভাসুরকে কোনোদিনই দেখে নাই, তাই নির্ভয়েই আসিতেছিল। অরুণও আশাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল। ব্যস্ততায় তার সে কনকের চিঠিখানি সবিতার ঘরেই থাকিয়া গেল।

সবিতা দূরের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। দু চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিতেছিল! স্তূপীকৃত অবসাদের বোঝায় মনটা অবসন্ন পীড়িত হইয়া উঠিল, সে কি লোভাতুরা? সবিতার চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। এই নিষ্ঠুর অভিনয় তবে কিসের জন্য? কেন সে অমৃত মনে করিয়া সহ্য করে এইটুকুকে? এর পরই কি নিজের দুর্ব্বলতায় হারিয়া সে ক্ষণিকের খেল্না হইয়া দাঁড়াইবে? চোখের জল মুছিতে গিয়া তার হুঁস্ হইল, হাতে মায়ের চিঠি রহিয়াছে, খোলাও হয় নাই।

সে তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া পড়িল। মা লিখিয়াছেন যে তাঁরা পিতাপুত্রী দুই জনেই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই সময়-মত চিঠি দিতে পারেন নাই। সম্প্রতি সারিয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু তাঁর পিতার শরীর এখনো বড় দুর্ব্বল তিনি হাঁটিতে পারেন না।

অনেকদিন সবিতাকে দেখেন নাই বলিয়া মা অনেক কথাই লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন যে যদি তাঁরা সবিতাকে লইয়া যাইতে চান তো কর্ত্তা তাকে পাঠাইবেন কি না?

হঠাৎ পুলকের চীৎকারে তার চিঠি পড়া বন্ধ হইয়া গেল। সে সবিতার আঁচল টানিয়া ডাকিল,—বৌমা, ও বৌমা!

সবিতা তার কপালে চুম খাইয়া বলিল,—কেন বাবা

সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল,—ছোট মামীমা আমাকে লিখতে দিচ্ছে না, তুমি তাকে বকে দেবে চলো।

—আচ্ছা, তা দেব। কিন্তু তুমি এ কি করেছ? এমন ক'রে কালী মাখলে কোথায়? পাগল ছেলে কোথাকার!

পুলকের ছোট ছোট হাত দুখানি কালি মাখামাখি ছিল; সে সেই হাতে চোখ-মুখ ঘষিয়া আরো কালি মাখিয়া বলিল,—কই, কালি তো মাখিনি বৌমা, মুছে ফেলেছি।

—মুছে ফেলেচ বৈ কি! চল, ধুইয়ে দিই গে!

আশা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—নালিশ হচ্ছে, বুঝি? শোনো দিদি, উনি ঘরময় কালি মাখালেন, গা-ময় মাখ্লেন, তবু হল না! দোয়াতটা ভাঙ্গা হয়নি, এই আমার ওপর রাগ!

পুলক ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল,—তুমি ভালো না,—তুমি ছাই ছেলে, দুষ্টু ছেলে!

—আচ্ছা, আচ্ছা! তুমি তো ভারী ভালো! বলিয়া আশা তার মাথাটী নাড়িয়া দিল। পুলক তার কচি মুখখানি ভার করিয়া এক ঝাঁকানি দিয়া আশার হাত ঠেলিয়া দিল। আশা হাসিয়া বলিল,—ভাখো দিদি, ভাখো,—বাবুর ভয়ানক রাগ হয়েছে আমার ওপর! এখন চল, মুখখানা আগে ধুইয়ে দিই!

পুলক বলিল,—না, আমি তোমার কাছে মুখ ধোব না। যাও—

সবিতা পুলককে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া তার হাতে-মুখে সাবান ঘষিয়া কালির দাগ পরিষ্কার করিয়া আনিল।

আশা বলিল,—কি খবর দিদি? দাদামশায় ভালো আছেন তো?

সবিতা চিঠিখানি আশার হাতে দিয়া বলিল,—পড়ে ভাখো।

আশা চিঠি পড়িতে লাগিল। সবিতা পুলককে খাওয়াইতে লইয়া গেল। পুলকের খাওয়ার পরই কর্ত্তাকে ঔষধ-পত্র দিবার সময় হইল। তাঁকে এখন খুব বেশী

একটী দোষ ছিল যে, নিজের শরীরের প্রতি একটুও সতর্কতা ছিল না। মধ্যে মধ্যে তিনি বলিতেন, এ যে তোমরা আমাকে একেবারে ছ' মাসের খোকা করে তুলছ,—এর পরে আর হয় তো হাঁটতেই পারবো না!

কিন্তু তিনি নিজেকে একেবারে এদের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; কোনো কথাতেই প্রায় প্রতিবাদ করিতেন না। তিনি চিরদিনই গম্ভীর মানুষ; কিছুতেই বেশী কথা বলিতেন না। এই নির্ব্বাক সেবা-পরায়ণা সহিষ্ণু-প্রকৃতির সবিতাকে তিনি দিন দিন বেশী করিয়া স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধাও করিতেন। প্রচুর অর্থ বা সম্ভ্রমের দিকে না চাহিয়া যে-সব গুণের প্রশংসা শুনিয়া তিনি এই মেয়েটিকে ঘরে আনিয়াছিলেন, আজ যদি তা বাস্তবিক না হইত, যদি সবিতা হীন-প্রকৃতির হইত, তা হইলে যে এই অশোভন বিবাহের জন্য তাঁর আর ক্ষোভের অন্ত থাকিত না। এ বিবাহে তিনিই যে সর্ব্বাংশে দায়ী!

কিন্তু এখন তিনি সবিতাকে তাঁর গর্ব্বের বস্তু মনে করেন। পুলকের নিটোল সৌন্দর্য্য নীরোগ দেহ দেখিয়া তাঁর মনে হইত, কমলের এই একমাত্র চিহ্ন, এ পুলকের হিল্লোল কি তাঁর ঘরে টিঁকিত, যদি সবিতার স্নেহাঞ্চল সাত রাজার ধন মাণিকের মত করিয়া তাকে ঢাকিয়া না রাখিত! সবিতাই যে এই মা-হারা শিশুকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীহারবালা দেবী।

---

# কৈশোরক

ছেলেমেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি, পরিণতির সময় ও নিয়মের যে আকাশ-পাতাল প্রভেদের কথা এতদিন শোনা যাইত, তাহার সত্যতা ক্রমেই প্রমাণিত হইতেছে। ছেলেমেয়ে উভয়েরই বয়োধর্ম্ম-প্রাপ্তি (puberty) প্রায় এক সময়েই হইয়া থাকে। কিন্তু মেয়েদের বেলায় তাহাদের উপর তখনই একটা পূর্ণ-নারীর সমস্ত কর্ত্তব্যভার চাপাইয়া দেওয়া হয়। তখনই বিবাহ দিয়া বাঁধা-ধরার মধ্যে আনিতে না পারিলে কি প্রলয় উপস্থিত হইবে ভাবিয়া সকলে শঙ্কিত থাকেন, তাই নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে অবশ্য বিবাহ দেওয়ার জন্য এত শাসন। ছেলেদের ক্ষেত্রেও তাহা প্রায় ঐ সময়েই হইলেও তখনই বিবাহের কথা কেহ মনেও করিতে পারেন না। কিন্তু তাহাদের বেলা কোন শাসন ও দৃষ্টি না রাখিয়া যেরূপ ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাতে কত পাপ, অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয় ও কি বিষম কুফল ঘটিয়া থাকে, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিতে চাহেন না; বরং "sowing wild oats" ইত্যাদি বলিয়া তাহার সমর্থন করা

জলন্ত দৃষ্টান্ত। মনুষ্যজাতির উন্নতি যে ইহা দ্বারা পিছাইয়া রহিয়াছে ও সংসারে কত পাপতাপের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা বলিতে গেলে বাহুল্য হইয়া পড়ে। যে সময়ে চরিত্র-গঠনের সময়, দেহ-মন সবই অপূর্ণ থাকে, তখনই এ রকম প্রশ্রয় দিয়া শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক যে ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা আর পূর্ণ হইবার নয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কথা ছাড়িয়া দিলেও আগে যেমন মনে করা হইত এ সময়ের উচ্ছৃঙ্খলতাতে কিছু আসিয়া যায় না, পরে ভাল হইয়া থাকিলেই হইল; যাহা হইতে ঐ মারাত্মক মতটীর সৃষ্টি, তাহার কুফল দিন দিনই মানুষের চোখে পড়িতেছে।

ছেলেদেরও ঐ বয়সে বিবাহ দেওয়া কিম্বা মেয়েদের সম্বন্ধেও ঐরকম অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া কেহ উচিত বলে না। কিন্তু ছেলে-মেয়ে উভয়েরই বয়ঃসন্ধি যে প্রায় সমান বয়সেই হইয়া থাকে, এবং তাহা হইলেই যে তাহারা পূর্ণ নরনারীর সকল দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হয়

ছেলেদের ঐ সময়ে অন্যায় প্রশ্রয় দেওয়ার ফল যে কি বিষময়,—তাহাকে, এমন কি তাহার স্ত্রী-পুত্রকে চিরদিনের মত কত কলুষিত ও কুৎসিত রোগগ্রস্ত পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, তাহার বিষয় ভালরূপে চিন্তা করিয়া ছেলেমেয়ে উভয়কেই যে সে সময়ে বিশেষ যত্ন, সাবধানতার সহিত রাখা উচিত, ইহাই বুঝিতে হইবে। কুযোগ না হইলেই যে কিছু হইল না, তাহাও অবশ্য নয়। আমাদের শরীর, মন দেবতার দান,—আমাদের উপর তাঁহার এই বিশ্বাসের উপযুক্ত হইয়া যতই চলিতে পারা যায়, মনুষ্যজীবনের ততই সার্থকতা। একটা অসংযম ভবিষ্যতে সংযমকে কঠিন করিয়াই তোলে,—সাহায্য করে না; তাহার পর ভবিষ্য সন্তানদের নিরপরাধে তাহা প্রথম হইতেই কঠিনতর করিয়া রাখে। প্রত্যেক নৈতিক স্খলন, নৈতিক চৈতন্যকে যেমন অলক্ষ্যে অস্পষ্ট করিয়া দেয়, ভবিষ্য মানবের নৈতিক সম্ভাবনাকেও তেমনি দুর্ব্বলতর করিয়া ফেলে। আর মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু, প্রথম বিশুদ্ধ ভালবাসার পরিপূর্ণ নবীনতা, তাহার স্থান ইহাতে কোথায়?—সহস্র বিজ্ঞ মতবাদের দ্বারাও ত আর তাহা মিলিবার নয়। এ সকলই একান্ত প্রত্যক্ষ সত্য,—কিন্তু মানুষের স্বার্থান্ধতা ও দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার সীমা নাই;—তাহা আপনার প্রকৃত স্বার্থের দিকেও দেখিতে পারে না,—তাই সবই বলিতে হয়।

বাস্তবিক পুরুষের অল্পায়ুর সাধারণতঃ প্রধান কারণ কি? সহস্র রকমে প্রকৃতির মঙ্গলোদ্দেশ্যপূর্ণ নিয়ম-লঙ্ঘনেরই ফল নয় কি? কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে তাহার বোঝাও নারীর মস্তককেই গুরুতর করিয়াছে। তাঁহার প্রতি বিশ্বাস-লঙ্ঘনের ফলও তাঁহাকেই বহন করিতে হয়। নর-নারীর প্রকৃত স্বার্থ অভিন্ন বলিয়া পুরুষের পতন ও মৃত্যুতে তাঁহার অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ব্যতীত ও সমাজরাষ্ট্র ব্যবস্থায় জীবনের কোন প্রয়োজনীয়তা লাভের সুযোগ না থাকায় তাঁহার দীর্ঘায়ু ও পবিত্রতর জীবনের সুবিধা হইতে তিনি নিজেও যেমন বঞ্চিত,—মনুষ্যজাতিও তেমনি তাহার সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারিতেছে না।

বাস্তবিক ছেলেদের যে কেবল তাড়াতাড়ি ডানপিটে হইবার জন্য অরক্ষিতভাবে পৃথিবীর বিপদ-সঙ্কুলতার মধ্যে ছাড়িয়া দিলেই তাহারা "মানুষ" হয় না, এমন কি "পুরুষোচিত" (manlines) বলিয়া পরিচিত গুণগুলি অধিকার করিয়া শক্ত হইয়া উঠিলেও যে তাহারা প্রকৃত মানুষ না হইতে পারে, ইহা মনে রাখা উচিত। ছেলেদের "পুরুষোচিত" ও মেয়েদের "মহিলাজনোচিত" (lady-like) এই দুই রকমের বিশেষ গুণাবলীর উপরই অতিরিক্ত জোর দেওয়া ছাড়িয়া উভয়কেই প্রকৃত মানুষ হইবার বিষয় শিক্ষা দেওয়া বড়ই দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এ দু'য়ের একটার মধ্যেও মানুষের অনেক শ্রেষ্ঠগুণের বিকাশের অবসর অল্পই, সুতরাং উহার মোহ কাটাইতে হইবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্রের উপরেও উহার স্থান দিয়া বরং তাহা না থাকিলেই যেন একটু বেশী পুরুষোচিত হইল, এই ভাবও যে অনেক স্থলে ভিতরে ভিতরে না থাকে এমন নয়। ইহা অবশ্য পাশ্চাত্য দেশেই প্রবল। কিন্তু সেখানকার ঝুটা জিনিষগুলি কুড়াইতেই আমাদের প্রবণতা বেশী দেখিয়া সবই বলিবার দরকার হয়।

এখনকার ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাও নৈতিক চরিত্রের অনুকূল নয়। ইহাতে অন্যের সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া চলা, অনেকে মিলিয়া মিশিয়া থাকা ও কাজ করার অভ্যাস, স্বার্থপরতার সঙ্কোচ, স্বাবলম্বন ইত্যাদি কতকগুলি সদ্গুণ শিক্ষার সুযোগ আছে। কিন্তু তাহার সহিত নানা বয়সের নানা প্রকৃতির ছেলে একত্র থাকায় তাহাদের নৈতিক চরিত্র দূষিত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। সংযম, সম্ভ্রম, সৌজন্য, সুশীলতা ইত্যাদির স্থানও ইহার মধ্যে অল্পই আছে। ভিতরের দিকে না দেখিয়া একদিকে বাহিরের আলগা কড়া শাসন, যাহা অনেক সময়েই নিরর্থক ও অন্যায় —অন্যদিকে আবার তাহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে উচ্ছৃঙ্খলতা, অশিষ্টতা, ফাঁকি দিবার ইচ্ছা ইত্যাদিও ইহাতে আনিয়া থাকে। ছেলেদের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, অঙ্গচালনা ইত্যাদিতে অবশ্য বাধা দেওয়া ভাল নয়, কিন্তু তাই বলিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাও প্রশ্রয়ের বস্তু হইতে পারে না।

যে দিক দিয়াই দেখি, দেখা যায়, আমাদের বর্ত্তমান ব্যবস্থা কেবল আপাত সুবিধা দেখিয়া কোন মতে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা। কোন বিষয়ে সকল দিক বিবেচনা করিয়া

মনুষ্য জাতির যথার্থ উন্নতি ও হিতসাধনের লক্ষ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য যেদিকেই মানুষ মুক্ত দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার মধ্যেই আগাগোড়া গলদ বাহির হইয়া পড়িতেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর হীন অবস্থাও অবশ্য ইহার একটী প্রধান কারণ। তাই বাহিরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত সমৃদ্ধি সত্বেও মনুষ্য-সম্বন্ধ ও জীবন-যাত্রার মূলই দূষিত রহিয়া গিয়াছে, সভ্যতার সার সত্যগুলি সেখানে পৌছিতে পারিতেছে না।

তার পর বর্ত্তমান স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে ছেলেরা বুদ্ধিকেই সহৃদয়তার উপরে স্থান দিতে শিক্ষা পায়। চরিত্রের মাধুর্য্য, কোমলতা, শিষ্টতা ইত্যাদি তাহারা যেন কতকটা দুর্ব্বলতা বলিয়াই জ্ঞান করিতে শেখে। বলপ্রকাশ যে অনেক স্থলেই দুর্ব্বলতা,— এ জ্ঞানও তাহাদের জন্মে না। ছেলে-মেয়ে উভয়কে দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টাও ইহার মূলে। তাহারা দুই সম্পূর্ণ পৃথক জীবরূপে সৃষ্ট হইলেই হইল, কেহই মানুষ হইল কিনা তাহা আর দেখিবার দরকার বোধ হয় না। আর একটী কথা মনে হয়, মেয়েদের যে স্থানে-অস্থানে একমাত্র "আদর্শ মা ও স্ত্রী" হইবার জন্য এত উপদেশ দেওয়া হয়, ছেলেদেরও পতি ও পিতা হইবার কর্ত্তব্যে জ্ঞান জন্মানো উচিত। বাস্তবিক পতি ও পিতার যে অর্থসংগ্রহ ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্যও আছে, ইহা শিক্ষার হাওয়ায় জাগাইয়া তোলা বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে ইহা এক রকম লজ্জা ও হাসি-ঠাট্টার বিষয় হইয়াই আছে। তাহাদের কাহারও মধ্যে একটু পিতৃত্বের ভাব, অর্থাৎ বয়সে-ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি দেখিলেও কেমন যেন মেয়েলি মনে করিয়া তাহা কতকটা হীন চক্ষেই দেখা হয়। বিবাহও যেন কেবল একটী দুর্ব্বলতা ও কৌতুকের জিনিষ মাত্র। কিন্তু ইহার দায়িত্ব, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সবই বেশ ভালভাবে শেখানো দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ছেলেমেয়েদের শারীরতত্ব শিক্ষার উপদেশও এখন সকল পণ্ডিতেরাই দিতেছেন।

আর এই রকম সম্পূর্ণ মেয়েদের সংশ্রব-বর্জ্জিত কেবল

অভাব ও দোষ আসিয়া পড়ে। ছাত্র-নিবাসেরই যখন এই অবস্থা, তখন সৈন্যাবাসগুলির কথা বুঝিতেই পারা যাইবে। আমাদের দেশে এখন যে (military training) যুদ্ধশিক্ষার বন্দোবস্ত হইতেছে, এ সময়ে এ সকল কথা ভালরূপে মনে রাখা উচিত। দেশরক্ষার উপযোগী শিক্ষা, শারীরিক সামর্থ্য লাভ আবশ্যক, কিন্তু যুদ্ধ জিনিষটী মানুষের যে-সকল প্রবৃত্তির খোরাক যোগাইয়া থাকে, তাহা মানুষের শ্রেষ্ঠগুণ নয়। আনুসঙ্গিক যে-সকল সদ্‌গুণের চর্চ্চা ইহাতে বাহির হইতে দেখা যায়, ইহার বিরাট অমঙ্গল ও ধ্বংসের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য যে সকল পশুপ্রবৃত্তি ইহা দ্বারা জাগ্রত ও উত্তেজিত হয়, তাহার সহিতও তাহার তুলনাই হইতে পারে না। মানুষ প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার কেবল ভাল দিকটীরই গুণ কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। আর ঐ সকল পশুবৃত্তি তাহার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল বলিয়া বিবেকবুদ্ধির উদয়ের সহিত তাহাতে একটা ভাল রংও দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাও ধরা পড়িতেছে, যে সকল কবি ও ঐতিহাসিক ইহার গৌরব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই যুদ্ধ কখনও দেখেনও নাই। ইহাতে যে সকল সদ্‌গুণের চর্চ্চার অবসর আছে, এখন অন্য নানা ক্ষেত্রেও মানুষ তাহা করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেরু ও উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গাদি আবিষ্কার চেষ্টার উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহাতে তাহার প্রায় সকল গুণের উৎকর্ষের সহিত মনুষ্য-সভ্যতাকে অগ্রসর করিবার উপকরণও আছে; যুদ্ধের মত তাহা আরও পিছাইয়া দেয় না। এই বীভৎস জিনিষটী মানুষের সঙ্গে অপরিহার্য্যরূপে লাগিয়া থাকিয়া জগদ্দল পাথরের মত তাহাকে নীচের দিকেই নামাইয়া রাখিতেছে; নারীর দুর্দ্দশাও ইহাতেই সকল রকমে গভীরতর করিয়া আসিয়াছে এবং তাহা এ পর্য্যন্ত দূর না হওয়ায় ইহাও একটী প্রধান কারণ। ধ্বংসের মুখে পড়িয়া সম্প্রতিমাত্র এ সম্বন্ধে লোকের মোহ কাটিতে আরম্ভ করিতেছে। সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজের দুর্গ্রহগুলি আমাদের মধ্যে যাহাতে ঢুকিতে না পারে, তাহাতে প্রথম হইতেই সতর্ক

মারাত্মক তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। ইয়োরোপে ইহার কুফলে যে কত সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বলিতে গেলে একটা স্বতন্ত্র পুঁথি ভরিয়া যাইতে পারে। পরিচালন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার হইলেও অগঠিত-চরিত্র নবীন যুবককে উহাতে ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ নয়। বাস্তবিক যুদ্ধবিদ্যা কতদূর শেখা হইবে না হইবে ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু আপাততঃ ইহা যাহাতে আমাদের ছেলেদের নষ্ট করিবার একটা নূতন যন্ত্র হইয়া না উঠে, তাহা সকলেরই দেখা উচিত এবং তাহার জন্য সাবধানও হইতে হইবে। ইহাপেক্ষা boy-scout ও girl-guide এর ভাব ও শিক্ষা আমাদের দেশে আরও প্রচলিত করা ভাল। ইহা প্রাচ্য ভাবাদর্শের সাহায্যে আর একটু সংস্কৃত করিয়াও লওয়া যাইতে পারে। বোলপুরের আদর্শ হইতেও শিখিবার অনেক আছে।

ছাত্রাবাসে যে সদ্গুণগুলি শিক্ষার সুযোগ হয়, বাড়ীতেও যে তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না এমন নয়। অথচ তাহা হইলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের অপর কুফল হইতে ছেলেরা রক্ষা পায়। কিন্তু ইহার জন্য গৃহ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এখন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক (democratic) আদর্শ ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু গৃহ-ব্যবস্থাতেই যথেচ্ছাচারের মূল থাকিয়া যাওয়ায় তাহা বড় কাজে লাগিতেছে না। গৃহের মধ্যে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আজকালকার দিনে অবশ্য সকল ক্ষেত্রে ছেলেদের শিক্ষা বরাবর বাড়ীতে থাকিয়া হইতে পারে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শের গৃহ-ব্যবস্থাই যে তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে হয় ছাত্রাবাসের পরিচালন-ভার যদি শিক্ষিত মহৎচরিত্র বয়স্কা মহিলারা অন্ততঃ কতকটা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ছেলেরা তাঁহাদের মাতৃস্নেহের ছায়ায় স্নিগ্ধ, সংযত হইতে পারে। অবশ্য তাহার সহিত আমাদের এখনকার মায়েদের আদুরে প্রশ্রয় থাকিবে না,—তাঁহারা সকল কাজ ছেলেদের দ্বারাই করাইয়া লইবেন। তবে তাঁহাদের কাজে আর একটু হৃদয়ের যোগ

জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ঐ জ্ঞান তাঁহাদের সাহায্যকারী হইবে মাত্র ;—উহার নিয়ম হুবহু নকল করা বা চালাইবার চেষ্টা তাঁহাদের প্রয়াস হইবে না। তাঁহাদের জ্ঞান বিদ্যাকে অতিক্রম করিয়া থাকিবে। তাহার পর ছাত্রাবাস-সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সকলেরই সপরিবারে বাস করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ছেলেরা তাহাতে তাঁহাদের পরিবারে পরিচিত হইয়া গৃহের স্বাদে একেবারে বঞ্চিত হইবে না। ঐ সকল আচার্য্য-পত্নীরাও তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। এবং যাঁহারা ইহার ভার লইবেন, বিদ্যালয় হইতে তাঁহাদেরও যথোপযুক্ত সাহায্য পাইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা বেশ বাড়িয়া উঠে, এবং খুব দৌড়-ধাপ করিতে পারে বটে, কিন্তু এ সময়ে তাহাদের শরীর ও মন কিছুই পূর্ণ না হওয়ায় ভিতরে কতকগুলি দুর্ব্বলতাও থাকে। সেইজন্য এই সময়ে সাধারণতঃ তাহাদের উপর শারীরিক ও মানসিক সকল রকম পরিশ্রমের যে রকম চাপ দেওয়া হয়, তাহা তাহাদের পক্ষে অনেক সময়েই অহিতকর হইয়া পড়ে। ভাল করিয়া যাঁহারা এ বয়সের ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করিয়াছেন, এ সময়ে তাহাদের একটু আলস্য ও কাজে অনিচ্ছার ভাবও তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন। তাহাতে তাহাদের তাড়নাই সহ্য করিতে হয়। কিন্তু শারীরিক, মানসিক জড়ত্ব আসিয়া না পড়ে তাহাও যেমন দেখিতে হইবে, তেমনি তাহাদের স্বাভাবিক অবসাদের সময় জোর জবরদস্তি করাও অন্যায়। তাহার পর এ সময়ের নবজাগ্রত আত্মসম্মানে আঘাত দিয়া তিরস্কারাদি করা ত একেবারেই অনুচিত। বয়সের সম্মান রাখিতে হইলে নবীনত্বকেও সম্মান দিতে হইবে। মানুষের জীবনের মধ্যে এই সময়টাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ;—এ সময়ে সে যেমন হইয়া উঠে, তাহাতেই প্রায় তাহার ভবিষ্যৎ ঠিক হইয়া যায়। শরীর-মনের মধ্যে নানারকম পরিবর্ত্তন এ সময় চলিতে থাকে। আত্মোপলব্ধি নূতন জাগিয়া আপনার উপর বিশ্বাস যেমন প্রবল হইয়া উঠে, প্রকৃত জ্ঞান তেমন থাকে না। কখনও শরীরের তুলনায় মনের দুর্ব্বলতা, কখনও মনের তুলনায়

তাহার সহিত ব্যবহার ও তাহার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই বিশেষ সাবধানতা, ধৈর্য্য, বিবেচনা ও সহানুভূতির সহিত হওয়া উচিত। তাহার নিজের অবস্থাও এ সময়ে যেমন কঠিন হইয়া থাকে, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের কর্ত্তব্যও সেইজন্য অন্য সকল সময় অপেক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহাকে কতটা ছাড়িয়া দেওয়া ও কতটা সংযমের মধ্যে রাখা আবশ্যক—তাহা নির্ণয় করা অনেক সময়েই সহজ হয় না। কিন্তু প্রথম হইতে সুব্যবস্থিত গৃহের মধ্যে প্রতিপালিত হইলে কোন সমস্যাই তেমন কঠিন হইতে পারে না। সকল অবস্থাতেই সতর্ক দৃষ্টির সহিত অন্যায়-কিছুর প্রশ্রয় বা সুবিধা না দিয়া খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্পূর্ণ তাহার উপর ছাড়িয়া দিলে ও তাহার উপর সম্মান ও বিশ্বাসের ভাব রাখিয়া চলিতে পারিলেই ফল বেশী হইবার সম্ভাবনা। আর বাহিরে দৃঢ়ভাবে ঔদাসীন্য দেখাইলেও এ সময়ে ভিতরে ভালবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন যথেষ্টই থাকে। সুতরাং মাতা ও ভগিনীর স্নেহ তাহার পক্ষে আবশ্যক। তাহার পথ না রাখিয়া কেবল গুণ্ডামির মধ্যে ছাড়িয়া দিলে ছেলেদের চরিত্রের অনেক দুর্লভ, সুকুমার fine গুণগুলি ভোঁতা হইয়া গিয়া, তাহারা বাহিরে একরকম শক্ত হইয়া উঠিলেও ভিতরে দুর্ব্বলই থাকিয়া যায়। সুতরাং এ সময়ে তাহাদের মেয়েদের সংস্রবে থাকা দরকার। তাঁহাদের মাতৃত্বের অর্থও তাহা হইলেই সার্থক হইতে পারে। সমবয়স্কা মেয়েদের সহিত ভগিনীর মত ভাবে মেলামেশাও যতটা আশঙ্কাজনক মনে হয়,—ঠিকমত ভাবে করিয়া উঠিতে পারিলে তাহারও তেমন কারণ দেখা যায় না। ইহাও স্বাস্থ্যকর এবং বাঞ্ছনীয়। মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবও ইহাতেই সত্য হইয়া উঠিতে পারে।

মেয়েদেরও মুক্ত পৃথিবীর আলো, বাতাস হইতে বন্ধ করিয়া কৃত্রিমতার মধ্যে কাচের ঘরের লতাপাতা করিয়া রাখা ছাড়িতে হইবে। দেশী, বিলাতী কোন আদর্শেই তাহাদের পুতুল বানান হইবে না। শরীর-মনের যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাদেরও মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। অবশ্য ছেলেদের দিকেই যখন এতদূর দৃষ্টি দেওয়ার সেখানে ফেলিয়া দেওয়া হইবে না, একথা বলাই বাহুল্য। সতর্ক মনোযোগের সহিত তাহাদের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তোলা দরকার। বাস্তবিক না দেখিলেই চাপাচাপি করার প্রয়োজন বেশী হয়,—কারণ তাহাতে অনায়াসে কাজ চালান যায়। ছাড়িয়া দিলেই বেশী দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহাদের শিক্ষাও অবশ্য যতদূর সম্ভব ঐ রকম উন্নতিশীল গৃহে থাকিয়াই হওয়া বাঞ্ছনীয়।—তাহার অভাবে সুপরিচালিত ছাত্রীনিবাসের সাহায্য লইতেই হইবে। ছাত্রীনিবাসও কোনটিই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ভাবে চলে বোধ হয় না;—অধিকাংশই প্রাণহীন, যন্ত্রচালিত;—আছেই বা কয়টী! বিশেষতঃ আহারের ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীনিবাস উভয়েই শোচনীয়। যে সময় উপযুক্ত আহারের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন, সেই সময়েই তাহার প্রতি এইরকম অবহেলার জন্য ছেলেমেয়েদের শরীর যে চিরদিনের মত কত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। ছেলেরা তবু বাহির হইতে কিনিয়া তাহার অভাব অনেকটা পূর্ণ করে;—যদিও তাহা অনেক সময়েই স্বাস্থ্যকর হয় না,—আমাদের দেশের বাজারের অবস্থা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু মেয়েদের তাহারও সুবিধা না থাকায় তাহাদের আরও অনিষ্ট হয়। খাদ্যদ্রব্য কেবল যে অপ্রচুর হয় তাহাও নয়, তাহার বিশুদ্ধি, স্বাস্থ্যকারিতা, বৈচিত্র্য বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কিছুর উপরই তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় না। ইহার উপর খেলা, বেড়ান বা শারীরিক অন্য নানারকম ব্যায়ামের বন্দোবস্তও সর্ব্বত্র ঠিকমত থাকে না। ইহাতে মেয়েদের শরীর যে খারাপ হইয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু অপরাধ সমস্তই শিক্ষার উপর আসিয়া পড়ে। ছাত্র ও ছাত্রীনিবাস-গুলির ঘর-দ্বার, স্নান ও শৌচাগার ইত্যাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধেও তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। তবে এ সকল বিষয়েই আমাদের জাতীয় চরিত্র অনেক পরিমাণে দায়ী। আমরা কোন জিনিষেরই গুণের মূল্য দিতে সহজে প্রস্তুত হই না,—শস্তায় পাইলেই হইল। দারিদ্র্য ইহার প্রধান কারণ হইলেও অভ্যাসের শৈথিল্যও কম

উন্নতি হওয়া আবশ্যক। আচারের গণ্ডী ছাড়াইলেই আমরা আর তাহাকে আমল দিতে চাই না। তাহাতে বোঝা যায় ঐ জ্ঞানটী আমাদের আচার মাত্র,—মনের মধ্যে বসে নাই। এখন ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসের (যদিও ছাত্রীনিবাসের সম্বন্ধে কথাটী এখনও খাটে না) বড় বড় বাড়ী তৈয়ার হইতেছে;—বাড়ী ভাল হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়,—কিন্তু আহার ও বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা রক্ষিত না হইলে তাহাতেও বিশেষ লাভ হইতে পারে না। তাহার পর যেখানে বড় শয়নাগারের (dormitory) ব্যবস্থা নাই,—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরে ২।৪ জন করিয়া ছাত্র-ছাত্রী থাকার নিয়ম,—সেখানে তাহাদের বয়স ও চরিত্র বুঝিয়া গৃহসঙ্গী (room-mate) নির্ব্বাচন করা উচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থাটী যথাসম্ভব পরিহার করিতে পারিলেই ভাল হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের দুই-একজন শিক্ষক, বা শিক্ষয়িত্রীর সহিত একত্রে, এবং বড় হইলে পৃথক পৃথক ঘরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।—অসুখ হইলে কোন কোন স্থলে স্বতন্ত্র থাকিবার স্থান আছে বটে,—কিন্তু তাহা হাসপাতাল;—তাহাতে সত্যই তেমন চিকিৎসা, শুশ্রূষা ইত্যাদি হয় বলিয়া বোধ হয় না। এই রকম কত বিষয়েরই যে সংস্কারের কথা বলা যাইতে পারে, বলিতে গেলে শেষ করাই কঠিন। সুতরাং কেবল সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করা সম্ভব নয়। অনেক সময় মনে হয়, পরীক্ষায় যোগ্যতা দেখানো, বা কোন বিদ্যার চর্চ্চার জন্য ধনীলোকেরা পুরস্কার বৃত্তি ইত্যাদি দিয়া থাকেন, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীনিবাসের আহার্য্য, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য কোন সাহায্য কি তাঁহারা করিতে পারেন না? তাহার সুবিধা সকলে না লইলেও, যাহাদের অভাব আছে, তাহাদের সাহায্যের জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে।

আর সকল রকম ব্যয়ের মধ্যে সন্তানদের জন্য ব্যয়ই যখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, তখন সকল রকম ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া ইহার দিকেই সকলের বেশী মনোযোগ দেওয়া উচিত। সামাজিক নানা প্রথায় আমাদের যে অযথা অর্থ নষ্ট হয়, আজকালকার দিনে সেগুলি বন্ধ না করিলে আর কাহারও ছেলেমেয়ের প্রতি প্রকৃত কর্ত্তব্য করা সম্ভব হইতে পারে না। মেয়েদেরও কেবল বিবাহের জন্য অর্থ-সংগ্রহে ব্যস্ত না হইয়া তাহারা যাহাতে মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, আবশ্যক হইলে আপনি করিয়া খাইতে পারে, তাহারা সামর্থ্য জন্মানোই বেশী দরকার। তাহা হইলে বিবাহের জন্যও আর এতটা ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না।

এতদিন মেয়েরা গৃহের মধ্যে ব্যতীত যেখানে কাজও করিয়াছেন, সেখানে আপনাদের বিশেষত্ব ফুটাইয়া, স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ করিয়া, প্রাণ ঢালিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহাদের দাসমনোভাবের দোষগুলি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আসিয়া পড়িয়াছে। এখন তাঁহাদের মুক্ত হইয়া দেশের ও দশের কাজে ন্যায্য ও তাহার জন্য শিক্ষালাভ করা বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ভার প্রধানতঃ তাঁহাদেরই লইতে হইবে। নতুবা সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি হওয়ারও আশা নাই, তাঁহাদের তথাকথিত মাতৃত্বেরও বিশেষ অর্থ থাকে না।

বঙ্গনারী।

---

# প্রতিপদের চাঁদ

প্রতিপদের চঁ
আমার প্রিয়ার প্রথম সলাজ
　　মুচ্‌কে হাসার ছাঁদ!
শূন্য বুকের একটি আশা,
শিশুর মুখের প্রথম ভাষা,
একটু খানির রূপ-ইসারা
　　মন-ভুলানির ফাঁদ।

প্রতিপদের চাঁদ,
যৌবনেরই আসার সময়
　　প্রথম বুকের সাধ!
একটি আশীর্ব্বাদের লেখা,
নীলে শাদা-তুলির রেখা,
মুক হাসিতে রূপ নিয়েচে
　　কাহার পুলক-নাদ!

# শিখিবার কলা-কৌশল

২

পর্য্যবেক্ষণ-যোগে আলোচনা-পথে এখন ক্রমশ অগ্রসর হওয়া যাক্; আমাদের সেই-সব সমসাময়িক লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্, যাহারা শিখিবার জন্য কিছু কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে। একটু তলাইয়া দেখা যাক, কি জন্য তাহারা শিখিতে চাহে, তাহাদের শিখিবার উদ্দেশ্য কি ?

উহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক,—একদিন কাজে লাগিবে বলিয়া, উপজীবিকার উপায় হইবে বলিয়া,—কোন একটা কলা, কোন একটা বিজ্ঞান, কোন একটা ব্যবসায় শিক্ষা করে। যখন হইতে সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, কিংবা উহাদিগকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তখন হইতেই অধিকাংশ পিতামাতাই 'কেজো' উদ্দেশ্যের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকেন। তাঁরা চান যে তাঁদের সন্তানদিগের জন্য "সকল কর্ম্মক্ষেত্রই উন্মুক্ত থাকে।" এবং ছাত্রের মন যখন এতটা বিকশিত ও পরিপক্ক হয় যে তাহার অনুসৃত পথের প্রতি একটু ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে, তখন সেই ছাত্রও তাহার যাত্রা-পথের শেষে প্রায়ই 'কেজো' উদ্দেশ্যের সম্মুখে আসিয়া পড়ে; একটা উপাধি-পত্র অর্জ্জন করিতে হইবে; বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইবে; কোন ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

বিশেষত এমন একটা ব্যবসায় যাহার প্রতি একটা বাস্তবিক আকর্ষণ সে অনুভব করিতে পারে; যথা:— সেনা-নায়ক, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, কলাবিৎ কিংবা রাজস্বহিসাববেত্তা ( Financier )। কিন্তু অর্থ অর্জ্জন, খ্যাতি অর্জ্জন, পদবী অর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প যে মনোভাবের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত, তাহা হইতে নিঃস্বার্থ জ্ঞানানুশীলনের রুচি, চিত্তোৎকর্ষণের রুচি কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা কতকটা কেজো ধরণের শিক্ষা-নবীশী—যাহার ভিতর আগ্রহ-স্ফূর্ত্তি থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। প্রথম যৌবনে, কোন একটা তেমন উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার প্রমাণ, পিতা যে ব্যবসায়ে লিপ্ত তাঁহার পুত্রও সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হোক্,—এ ইচ্ছা পিতার প্রায় হয় না। সৈনিকের ব্যবসায় ও কলাসম্বন্ধীয় বিবিধ ব্যবসায় ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে কাহারও বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না।

তাহাতে কিছু আসিয়া-যায় না; অনুরাগের সহিতই হোক্, বা বিনা-অনুরাগেই হোক্, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হচ্চে—প্রয়োজনের হিসাবে শিক্ষা করা; আর এই শিক্ষার প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য আর প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। এই প্রয়োজনটা ঐ শিক্ষার বাহিরের জিনিস সত্য; কিন্তু যাহারা ততটা উচ্চাদর্শবাদী নহে তাহারা এই শিক্ষারই সমর্থন করিয়া থাকে।

এই কেজো শিক্ষানবিস্‌দের পাশাপাশি, আর কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাহারা শৈশবাবধি,—যে বয়সে মনের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য পূর্ণমাত্রায় থাকে,—সেই বয়স হইতেই, অর্থ-অর্জ্জন, পদবী-অর্জ্জন বা খ্যাতি-অর্জ্জনের স্পৃহা হইতে তাহারা শিক্ষা করিতে উত্তেজিত হয় না। পিতামাতার ইচ্ছায়, অবস্থায় ও ঘটনাচক্রে, তাহারা হয়ত একটা ব্যবসায় শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মনটা উহার ভিতর নাই। অমুক উকীলের মনে হয়ত গণিতশাস্ত্রের কৌতুহলানল দিবারাত্র জ্বলিতেছে, অমুক সওদাগর হয়ত কলাবিদ্যার জন্য একান্ত আগ্রহী; অমুক সেনাধ্যক্ষ হয়ত ইতিহাসে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছে। আবার কতকগুলি লোক জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়া, কাজের শেষে, সাধারণ কৌতুহলের উত্তেজনায়, মনোরাজ্যের সমস্ত বিভাগেই প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে;—দর্শন ও কলার তত্ত্বানুসন্ধান করে, কোন জীবনস্মৃতির গ্রন্থ অথবা কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা পাঠ করে, কলম বা তুলি ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হয়।

একটুও অর্থলালসা নাই; কোনরকম কেজো স্বার্থও নাই। যে সকল লোকে এইরূপ শিক্ষায় প্রবৃত্ত, তাহারা বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান অনুশীলন করে, কলার জন্যই কলাচর্চ্চা করে। সেইরূপ আবার যাহারা শিক্ষামোদী যাহারা শুধু আমোদের জন্য শিক্ষা করে যাহাদের কোন বিশেষ ব্যবসায় নাই, যাহাদের পরিণত বয়স, যাহাদের "দৌড়ধাপের" জীবন শেষ হইয়াছে, তাহারা এইরূপে আত্মবিনোদন করে, এইরূপ অনুশীলনে আমোদ পায়।

ইহারা কি ভুল করে? না, ইহারা ঠিক্ কাজ করে? আমাদের কোন-কোন সমসাময়িক 'নেতি'ভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর দেন। তাঁহারা বলেন :—

—জীবন স্বল্পকালস্থায়ী; আমাদের সমস্ত প্রযত্নই সেই একই অন্তিম নাস্তিত্বে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। যতটা সম্ভব, কম প্রযত্ন সহকারে জীবন যাপন করা যাক্। আমাদের ব্যবসায়িক কাজকর্ম্ম যথাসাধ্য সংসাধন করা যাক্। তাহার বাহিরে আর কিছুই নয়—কেবলই বিশ্রাম! যদি কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি বিজ্ঞানের সীমাবর্দ্ধনে, কিংবা কলাসম্বন্ধীয় কোন উৎকৃষ্ট নূতন রচনায় প্রবৃত্ত হন,—তাহাতে হয়ত কাজ হইতে পারে। কিন্তু, প্রতিভা নাই,—অথচ, যাহা পূর্ব্বেই মানবমণ্ডলীর মধ্যে জানা আছে এরূপ কতকগুলা জ্ঞানের কথা মনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া অথবা এমন কতকগুলা কলাসম্বন্ধীয় রচনা প্রস্তুত করা যাহা ছাত্রদিগেরও সুসাধ্য—তাহাতে লাভটা কি?...জীবনের কাছে এমন-সব সুখের প্রার্থনা করা যাক, যাহা জীবন সহজে দিতে পারে—যাহা কষ্টের মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না। তুমি বলিতেছ,—মূল ল্যাটিন ভাষায় কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়া কত সময় তোমার বেশ সুখে কাটে, আর আমি বলিতেছি—সংবাদপত্রের নিম্নস্থ লোক-প্রিয় সাহিত্যিক ক্রোড়-পত্র পড়িয়া আমি কত আনন্দ লাভ করিয়া থাকি; আমাদের উভয়ের সুখ তুল্যমূল্য; উপরন্তু ল্যাটিন শিখিবার জন্য আমার কখনো মাথা ঘামাইতে হয় নাই। সেইরূপ একজন বড় কবির গীতি-নাটিকা তোমার যেমন ভাল লাগে, তুমি বেহালায় Bachএর রচিত গৎ বাজাইয়া যে সুখানুভব কর, আমি আমার যৌবন ও প্রৌঢ়কালের খানিকটা সময় নিয়মিতরূপে ব্যয় না করিয়াও, আমার ফনোগ্রাফ যন্ত্রে, একটা থিয়েটারের হাল্‌কা সুর শুনিয়া তেমনি আনন্দ পাই।

ইহার উত্তর কি?

প্রাচীন ও আধুনিক নৈতিক গ্রন্থাদিতে ইহার অনুকূলে বা প্রতিকূলে যদি কোন মতামত থাকে এবং পাঠকের যদি তাহা ভাল লাগে—তাহা হইলে পাঠক তাহাদেরই শরণাপন্ন হোন। কিন্তু আমি, উহাদের কথা স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি নাই। এখন একটু সাহস করিয়া এই সমস্যাটার মুখামুখী হওয়া যাক। আমি এই কথা বলি যে, কতকগুলি মনুষ্য স্বকীয় মানসিক জড়তা ও অজ্ঞতাতেই সুখী হয়; এটা লোক-বিশেষের স্বভাবের কথা...আবার এমন লোকওআছে—যাহারা নিজ শরীরের হেয় ময়লার মধ্যে, নোংরা ও এলো-মেলো কাপড়ের মধ্যে, অপরিচ্ছন্ন আবাসের মধ্যে অবস্থিতি করে। তোমার যদি প্রচারকের বুদ্ধি থাকে তুমি তাহাদিগকে তোমার মতে আনিবার চেষ্টা কর। তাহা হইলে তুমি সমাজের বেশ একটা হিতজনক কাজ করিবে; কিন্তু তোমার দলভুক্ত নবদীক্ষিত ব্যক্তিদের যে তুমি সুখ বৃদ্ধি করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। পূর্ণ মহিমায় মণ্ডিত Goethe (গেতে) নেপল্‌স-নগরীর জাহাজ-ঘাটের উপর এক কুষ্ঠরোগী দেখিয়াছিলেন—সে তাহার ছিন্ন-মলিন বস্ত্রাদি রৌদ্রে শুকাইতেছিল। ঐ কবি ও কুষ্ঠরোগীর মধ্যে বেশী সুখী কে? তুমি ঠিক্ করিয়া কিছুই বলিতে পারিবে না। তুমি পাঠক—তুমি শুধু এইমাত্র বলিতে পার যে, গর্ত্তের তুমি সুখকেই বেশী পছন্দ কর। একথাও তুমি জোর করিয়া বলিতে পার যে, যে-শ্রেণীর লোকেরা গৃহ ও বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা ভালবাসে, তাহারা সাধারণতঃ অপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তথাপি এমন কতকগুলি বুদ্ধিমান লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বন্যপ্রকৃতি আদিম মানবের জীবনযাত্রা প্রণালীর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন এবং আমাদের অভাব ও অভাব পূরণ করিবার উপায়—এই উভয়ের মধ্যে একই সময়ে প্রতিকূলতার বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়া

থাকেন। যতদিন মনুষ্য থাকিবে, এই বিবাদও ততদিন থাকিবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উক্ত সমস্যার সমাধান না হইলেও, আমরা যে মতের পক্ষপাতী তাহা বুঝিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইবে না।

পাঠক! তুমি কি "যত্ন চেষ্টা যতটা কম করিতে হয় ততই ভাল",—এই মতের পক্ষপাতী? অথবা "সব-চেয়ে বিশ্রামেতেই বেশী সুখ"—এই মতের পক্ষপাতী? তোমার এই ধারণা সমর্থন-যোগ্য হইতেও পারে; ইহা লইয়া আমরা বিবাদ করিতে চাহি না। কিন্তু পাঠক, এই গ্রন্থ-পাঠ এইখানেই তবে বন্ধ করিয়া দেও; এই গ্রন্থ তোমার জন্য লিখিত হয় নাই। গ্রন্থকার আগে থাকিতেই কবুল করিতেছেন যে তোমাকে বুঝাইতে পারে, এরূপ নিছক ধরণের যুক্তি তাঁহার হাতে মজুত নাই।

গ্রন্থকার—পদ্ধতি পূর্ব্বক—সেই সব লোকের জন্যই লিখিয়াছেন, যাহারা স্বভাবতঃ বিশ্বাস করে যে জর্ম্মাণ কবি গস্তে, সেই কুষ্ঠরোগী অপেক্ষা সুখী;—অন্ততঃ কুষ্ঠরোগী অপেক্ষা গস্তের সুখের আদর্শটাই তাহাদের নিকট অধিক গ্রাহ্য। তাছাড়া বর্ত্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকার অঙ্গীকার করিতেছেন, এই গ্রন্থে তোমার এই আদর্শ-নির্ব্বাচন দৃঢ়রূপে সমর্থন করিয়া, তোমাকে আশ্বস্ত করিবেন। তোমার এই নির্ব্বাচন যে যুক্তি-সঙ্গত, উৎকৃষ্ট সুখায়োজনের অনুকূল, তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করাইবেন—নীতি-গ্রন্থ-কারদিগের ন্যায় শুধু কতকগুলা সুন্দর বাক্যবিন্যাস করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না।

বসিয়া থাকাই যাহার অভিরুচি, তাহার নিকট প্রমাণ করিতে বসা দাঁড়াইলে সে বেশী সুখী হইবে—আমি তাহা অসম্ভব মনে করি। কিন্তু আমি প্রমাণ করিব বলিয়া তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, দাঁড়াইলে বেশী সুখী হওয়া যায়; এবং আরও সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, আমাদের অঙ্গভঙ্গী, আমাদের চিন্তা-ধারা, আমাদের অনুভূতির সংযত সাধনা হইতে স্বভাবতই একটা সুখের উদ্ভব হইয়া থাকে। কেহ যেন মরীচিকার দ্বারা প্রবঞ্চিত না হয়; কেহ যেন উষালোকের জন্য নৈশ অন্ধকারের একটা ছায়াকে প্রতিষ্ঠিত—দুরাক্রমণীয়; "কিছু না করায়" যে স্বাধীনতা আছে আমার এই মতবাদ সেই স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা করে, কুষ্ঠরোগীর দিবা-নিদ্রায় ও রুসোর বন্য-সমাজকেও এই মতবাদ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে; কেবল, কাজ-কর্ম্মের অধিকারের ও কর্ম্মে যে সুখ আছে, এই মতবাদটি শুধু তাহারই দাবী করে।

সুখের এই ধারণাটি—এই ধারণা অনুযায়ী সুখসাধনটি কি জনসাধারণ, কি ব্যক্তি-বিশেষ সকলের পক্ষেই "একটা কিছু অধিকন্তু", যাহাতে করিয়া তাহাদের অধিকৃত স্থান, তাহাদের ক্ষেত্রভূমি, তাহাদের বনভূমি বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের ধন-ঐশ্বর্য্য প্রভাব-প্রতিপত্তি শক্তি-সামর্থ্য, কালের সীমা সমস্তই বর্দ্ধিত হয়। সচেষ্টতা ও প্রয়োজনীয়তার এই যে সূত্র-বচনটি, ইহা তিন কথায় ব্যক্ত হইতে পারে—স্বকীয় জীবনের পরিসর-বর্দ্ধন। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে শিখিবার প্রযত্নও ইহার অন্তর্ভুক্ত। অন্য শিক্ষার ন্যায় কোন ব্যবসা-কর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্যে নহে, জীবিকা অর্জ্জনের উদ্দেশে নহে,—যদি কেহ কিছু শেখে—তাহাও শিক্ষা; তবে শেখা কি? না, স্বকীয় জীবনের পরিসর বৃদ্ধি করা, স্বকীয় জ্ঞান-রাজ্যের বৃদ্ধি করা, ভাব রাজ্যের বৃদ্ধি করা, নূতন নূতন জিনিসের সম্ভাবনা আপনার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা, জন্মগত আভ্যন্তরিক শক্তি-সম্বলকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা।

ধন-ঐশ্বর্য্য, ভূসম্পত্তি, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে আত্মজীবনের যতটা বৃদ্ধি হয় শিক্ষাতেও ততটা হয়। বরং শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটা আরও খাটে; কেননা, ধনঐশ্বর্য্য প্রভৃতি আমরা ত প্রকৃত পক্ষে আত্মসাৎ করিতে পারি না; উহাতে করিয়া জীবনের যে বৃদ্ধি হয় তাহা আগন্তুক বৃদ্ধি মাত্র—শিক্ষাতেই জীবনের প্রকৃত বৃদ্ধি। 'কোন' উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত না হইলেও যদি জ্ঞানার্জ্জনের কোন মূল্য থাকে, তাহা হইলে শিক্ষা-সমস্যাটা এই সাধারণ প্রশ্নে পরিণত হয়:—

আত্মজীবন বর্দ্ধিত করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করার কি কোন স্বার্থকতা আছে? জীবনের পরিসর বৃদ্ধি হইলে

আমি আবার বলিতেছি, আমার মনে হয় এই প্রশ্নটির সমাধান অসাধ্য। তবে, শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি যাঁহারা নিজের প্রকৃতি অনুসারে, অভিজ্ঞতা অনুসারে, ইহার সমাধান সুসাধ্য মনে করেন, তাঁদের জন্যই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

*
**

এখন একটা রাস্তা পাওয়া গেল; প্রায় বিনা চেষ্টায় একটা সংজ্ঞায় (definiton) আসিয়া পৌছান গেল; অর্থাৎ শেখাটা যে কি জিনিস তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা হইল। শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকাংশ গ্রন্থে একটা জঘন্য প্রথা দেখা যায়, গ্রন্থের গোড়াতেই উহারা আলোচ্য বিষয়ের একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া বসে। আমি তাহা করি নাই। শিক্ষায় সংজ্ঞা নির্দ্দেশ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা জীবনের পরিসর বৃদ্ধির একটা উপায়, মুখ্য উপায়,—কেন না, এই বৃদ্ধিতে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের বৃদ্ধি হয়। ইতিপূর্ব্বে যাহা আপনার বাহিরে ছিল, একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল, সেই সব তথ্য, সেই সব সত্য, সেই সব অনুভূতি শিক্ষার দ্বারা স্বাত্মীকৃত হয়। শিক্ষা কি? না, বাহিরে গোড়ায় যাহা তোমার বাহিরে ছিল, তাহা তোমার মনোবস্তুর সহিত, হৃদয়-বস্তুর সহিত মিশিয়া গেল। একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিলে যে প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়, ইহা অনেকটা সেইরূপ। নবজাত শিশুর দেহের ওজন জন্মকালে খুব কমই থাকে; তাহার পর পরিবেষ্টিত ভৌতিক জগৎ হইতে একটু একটু করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, যখন সে পূর্ণ বয়সে উপনীত হয় তখন তাহার দেহের ওজন অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

এই তুলনা-সাদৃশ্যটি আমাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখা যাক্; কি কি উপায়ে শিক্ষা লাভ হইতে পারে যখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, সেই সময়ে এই তুলনা-সাদৃশ্যটি আমাদের কাজে লাগিবে। কিন্তু এইটি মনে রাখিবার সময়, এই উভয়ের মধ্যগত পার্থক্যটিও যেন আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি; যে বাহ্য উপকরণ দৈহিক ওজনের বৃদ্ধি করে, তাহা অপেক্ষা, জ্ঞানের উপকরণ মনকে আরও সিধাভাবে, আরও নিশ্চিতরূপে পরিপুষ্ট করে; দেহ রোগাক্রান্ত হইলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কখন কখন দেহের অর্দ্ধেক ওজন কমিয়া যায়। অতএব আমাদের অন্য সকল প্রকার অভিবৃদ্ধির সহিত আমাদের মানসিক অভিবৃদ্ধির তুলনা করা যাইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, ইহা আত্মবর্দ্ধনের একটা মুখ্য উপায়।

তাই খুব জোরের সহিত এ কথা বলা যাইতে পারে শিক্ষা কি?—না, স্বকীয় জীবনের পরিসর বর্দ্ধন।

( ক্রমশঃ )

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# বরণ

তোমায় যেদিন প্রথম দেখি হঠাৎ সকাল বেলা,
শিউলি-ঝরা বিজন পথে করতে গিয়ে খেলা;
হাসচে তখন উষার আলো শারদ আকাশ ছেয়ে,
সিক্ত-বসন কুঞ্জকানন নীহার-কণায় নেয়ে,
অরুণ-রাঙা তরুণ তোমার চারু চরণ-তল
স্পর্শে যেন রোমাঞ্চিত হচ্ছে তৃণের দল!
প্রভাত-বায়ু দুলিয়ে অলক উড়্ছে আশে-পাশে
চৌদিকে ফুল ছড়িয়ে সুবাস ঘোমটা খুলে হাসে,
ভোরের কূজন গাইছে তখন তোমার দিগ্বিজয়
সেই প্রভাতে আচম্বিতে প্রথম পরিচয়,—
কোন্ অজানা অচিন্ দেশের স্বপ্ন-পুরের রাণী
তোমার চোখে দেখ্তে পেলেম কী যে তা কি জানি!
হারিয়ে গেল যা-কিছু ওই মুখের পানে চেয়ে
সেই বিজনে পথের মাঝে তোমার দেখা পেয়ে!
এক নিমেষে তোমায় আমি নিলেম বরণ করি
আমার জীবন-পথের ওগো প্রথম সহচরী!

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

# প্রেমের ফাঁদ

( গল্প )

রবিবার। বেলা তখন একটা। উপরের ঘরে খাটের বিছানায় শুয়ে গজেন উস্‌খুস্‌ করছিল। তাকে দেখলেই মনে হয়, সে যেন এক মহা সমস্যায় পড়েছে! মাঝে মাঝে সন্তর্পণে বালিসের তলা থেকে একখানা চিঠি বার করে' তার উপর অধীর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। তু'একছত্র পড়া হতেই কার পদশব্দ আশঙ্কা করে চিঠিখানা পাকিয়ে বালিসের তলায় গুঁজে পাশের ইংলিশম্যানটা টেনে নিয়ে তার যেখানে-সেখানে চোখ মেলে দিচ্ছে!

গজেনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—দেখতে নিতান্ত সুপুরুষ না হলেও মন্দ নয়; তবে তার ধারণা, সে একজন সুপুরুষ। পৈত্রিক কারবার আছে—তাতে বিলক্ষণ তু'পয়সা উপার্জ্জন হয়। সে যে পদশব্দের আশঙ্কা করছিল, সে পদশব্দ তার স্ত্রীর। স্ত্রীর সঙ্গে তার খুবই মনের মিল। স্ত্রীকে নিয়ে প্রত্যহ মোটরে চড়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে বেরুনো, মাঝে মাঝে বায়োস্কোপে বা বনভোজন যাওয়া—এ সবে তার ঝোঁকও ছিল খুব প্রবল। আর এ-সব ব্যাপারে স্ত্রীর চেয়ে তার আগ্রহই আরো বেশী।

আশঙ্কার কারণ ঐ চিঠিখানা। চিঠিখানায় মজা ছিল ভারী অপূর্ব্ব রকমের। মেয়েলি হাতের লেখা—কটি ছত্র,—

"প্রিয়তম, শুধু চোখের দেখা দেখেই মনকে শান্ত করতে পারছি না। একবার প্রাণ খুলে তুটি কথা ক'বার সাধ হচ্ছে। আজ ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডায় এসে বসো, প্রাণের যা কথা আছে, খুলে বলবো। যদি না এসো, তাহলে জগৎ থেকে একজন নারী তার হতাশ-দগ্ধ প্রাণ নিয়ে সরে পড়বে, জেনো। ইতি—অপরিচিতা।"

গজেন ভাবছিল, তাইতো, কে এ চিঠি লিখলে? ধরণটা হুবহু উপন্যাসের মত! স্বপ্ন নয় তো, খেয়াল নয় তো এটা তার? না,—ঐ যে চিঠিখানা—আর এই যে মেয়েলি ছাঁদের অক্ষরগুলি মুক্তোর মত সাজানো রয়েছে!

যৌবনের সীমানায় সে এসে দাঁড়িয়েছে! আজ এমন অবেলায়, এ কোন্ বসন্তের কুঞ্জ থেকে কার এ আকুল আহ্বান এল! কে এ অপরিচিতা?

অনেক ভাবলে সে; জীবনের অতীত মুহূর্ত্তগুলো ডায়েরির মত পাতার পর পাতা খুলে ঝরে পড়তে লাগল তার চোখের সামনে, আর সে পরম-আগ্রহে তার প্রতি ছত্র পাঠ করতে লাগল—কবে ট্রেনে যেতে যেতে ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লে কোন্ ওয়েটিং রুমের আড়াল থেকে কে তরুণী অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে চোখ মেলে চাইতেই তার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হয়েছিল! দেওঘরে হাওয়া খেতে গিয়ে পথে কোথায় কার সঙ্গে দৈবাৎ চোখোচোখি হয়েছিল! কলকাতার পথে ভাড়া-গাড়ীর ঝিরকির ফাঁক দিয়ে কবে তুটি কালো চোখের বিলোল চাউনি বিদ্যুৎ হেনে গেছল—কোন্ স্বপ্নপুরীর অতল থেকে যেন সেগুলো আজ হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সে টেনে বার করে দেখতে লাগল।...তখনি আবার ভাবলে, ধেৎ! সে কোন্ সুদূর অতীতে কবেকার কথা—এতদিন পরে হঠাৎ এ চিঠি কেন আসবে সেজন্যে? তা ছাড়া এ যে লিখচে—

চিঠিখানা আস্তে আস্তে আবার হাতে তুলে নিয়ে সে পড়তে লাগল। চিঠিতে লিখেচে, "শুধু চোখের দেখা দেখেই মনকে শান্ত করতে পারছি না ত!" এ তাহলে এখনকার, এখানকার কথা! রোজ যে তাকে দেখে, এমন কেউ লিখেচে!...কে—এ?

...ঠিক! গঙ্গার ধারে তার মোটরের সঙ্গে এই যে আজ কদিনই দেখা হচ্ছে...একটা সাদা ঘোড়া-জোতা ল্যাণ্ডোলেটে ধানী রঙের মাদ্রাজী শাড়ী-পরা এক সুন্দরী তরুণী, গায়ে ধানী রঙের হাফ্-হাতা ব্লাউশ, তাতে টক্‌টকে লাল ফিতে পাড়ের কাফ্—তরুণীর চোখে বিভোর দৃষ্টি! চার-পাঁচ দিন চোখোচোখি হয়েছে! পাশে স্ত্রী বসে থাকা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি সব কুণ্ঠা বিসর্জ্জন দিয়ে সেই

ল্যাণ্ডোলেট গাড়ীখানার মধ্যে কি অধীর গতিতে ছুটে গেছে, আর ক'দিনই তার সঙ্গে চোখোচোখি হয়েছে! অথচ সে দৃষ্টিতে বিরক্তির আভাষ মাত্র জাগেনি বা সে দৃষ্টি সরমে সরে যায় নি!···এ তার, নিশ্চয় এ তারই চিঠি! কিন্তু—

...না, এ বোধ হয় সেই লাল সিল্কের শাড়ী-পড়া কিশোরীটি! সেই যে প্রিন্সেপস্ ঘাটের সামনে সেদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ উলস্‌লি কারের পেট্রল ফুরিয়ে যায়—কিশোরী একা মোটরে বসে সোফারকে ভর্ৎসনা করছিলেন,—পেট্রলের খপর রাখো না? ভর্ৎসনা হলেও সে সুরে যেন গানের ঝর্ণা ঝরে পড়ছিল! পেট্রলের উল্লেখ শুনে গজেন উপযাচক হয়ে নিজের গাড়ী থেকে পেট্রল নিয়ে দিলে—কিশোরী মৃদু হেসে ধন্যবাদ দিলেন! তারপর তিন-চারদিন সেই গাড়ীর সঙ্গে পথে দেখা·· কিশোরী মৃদু হাসির উচ্ছ্বাসে মাথা নেড়ে সেদিনকার সেই সাহায্যের দরুণ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন!

গজেন ভাবলে, এ তবে শুধুই কৃতজ্ঞতা নয়! তার পিছনে আরো কিছু—

কিন্তু গজেনের বয়স যে চল্লিশের কোটায় এসে পৌঁছুলো! চল্লিশ! এ বয়সে তরুণীর মন আটকে পড়তে পারে কখনো? সে একটা নিশ্বাস ফেললে।

এমন সময় স্ত্রী পরীরাণী এসে একেবারে বুকের উপর মুখ রেখেই বললে,—ইস্. কি ভাগ্যি আমার! ওপরের ঘরে এসে শুয়ে আছ! তাসের আড্ডায় যাও নি!

গজেন গম্ভীর মুখে বল্‌লে,—নাঃ!

পরী বললে,—কেন? এ যে একেবারে অবাক কাণ্ড! বন্ধু-মজলিশ যে আঁধার হয়ে থাকবে গো! সেখানে হাহাকার পড়ে যাবে যে!

গজেন গম্ভীর হয়ে রইল, কোন জবাব দিলে না।

পরী বললে,—কি ভাবচ গা? তারপর সে প্রশ্নের জবাবের জন্য তিলার্দ্ধ-কাল অপেক্ষা না করেই বললে,—আজ চলো না গা পিক্‌চার প্যালেসে,—নতুন ফিল্‌ম্ আছে—পার্ল অফ্ প্যারাডাইস্—দেখে আসি। কাল থেকে দেখাচ্ছে—ও বাড়ীর রেণুরা গেছল।

একটু দম নিয়ে নিয়ে গজেন বললে,—না। আজ একটু মুস্কিলে পড়েচি। এক বন্ধুর ভারী অসুখ, ভবানীপুরে; তাকে দেখতে যেতে হবে, সন্ধ্যার সময়।

পরী বললে,—অসুখ দেখতে যাবে, তা এখনি যাও না কেন! সন্ধ্যা-অবধি অপেক্ষা করবার দরকার কি?

গজেনের অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। সত্যিই ত! এখনই বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে কোন কৈফিয়ৎও নেই! একটা ঢোঁক গিলে সে বললে,—আরো-দুজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে কি না—গিরিজা, বুড়ো, এরা ধরে বসেছে, আমার গাড়ীতেই যাবে। তাই না হয়েছে মুস্কিল! নিজে একলা গেলে তো এখনি দেখে আসতুম। এদের জন্যে সমস্ত দিনটাই,—সেই রাত ন'টা-দশটা অবধি—দেখচি, মাটী হবে! তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুনোও হবে না।

হঠাৎ বাইরে ঝী চীৎকার করে উঠল,—দাঁড়াও তো, বল্‌চি মাকে—অ মা এই ত্থাখোসে খুকী জল ঘাঁটচে। মানা করচি, শুনচে না।

খুকী গজেনের মেয়ে—বছর পাঁচেক তার বয়স।

ঝীয়ের চীৎকার শুনে পরী দ্রুত ঘরের বাহিরে চলে গেল। মেয়েকে শাসন করে আবার যখন সে ঘরে ফিরল, গজেন তখন দুই চক্ষু মুদ্রিত করেছে।

পরী বললে,—ঘুমুচ্ছ না কি?

গজেন বললে,—বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

হেসে পরী বললে,—এ রোগ তো তোমার কখনো দেখিনি। দুপুর বেলায় ঘুম!

একটু রসিকতার চেষ্টা করে গজেন বললে,—বয়স হচ্ছে তো!···কিন্তু নিজের মুখের এই কথাটাই নিজের কাণে শুনে তার মনের ভিতরটা যেন ঝড়ের দোলানির মত কেঁপে উঠল! বয়স হচ্ছে কি? ওরে না, না—চিরশ্যামল সবুজের ছোপ তার অন্তরে এখনো স্পষ্ট লেগে আছে যে—নাহলে যৌবনের এ আহ্বান আজ আসতো কি!

গজেন বললে,—ঘুমোও তবে! আমি ও ঘরে ছেলে-মেয়েগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে মাংসর কচুরিগুলো ভেজে নি।

গজেন কোন জবাব দিলে না। পরী চলে গেল।

গজেন তখন আবার সেই চিঠিকে কেন্দ্র করে ভাবনায়

জাল বুনতে সুরু করে দিলে!···এটা কি ঠিক? স্ত্রী পরীর এই অগাধ অসীম বিশ্বাসের উপর—

কিন্তু দোষ কি এতে? সে তো আর জাহান্নমে যাচ্ছে না! অবিশ্বাসের কাজও কিছু করছে না। এ একটু মজা—একটা রহস্য আবিষ্কার করা বৈ তো নয়! নারীর মনের যে বিচিত্র রূপ, বিচিত্র বিকাশ নানা দেশের নানা উপন্যাসে নাট্যে কাব্যে পড়ে সে দিশাহারা হয়ে ভাবত, কৈ, কোথায় এ-সব নায়িকার দল! বাস্তব জীবনে এই যে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে সুর বেজে চলেছে, তার মধ্যে কোথায় তার সরস পরশ! লেখকের দল মিথ্যা কুহকের ফাঁদ রচে মনের মধ্যে শুধু মিথ্যা একটা অতৃপ্তি জাগিয়ে তোলেন বৈ ত না! এখানে বাস্তব জীবনে কিছুই নেই,—আছে শুধু হাট আর বাজার, লোক আর জন ভিড় আর ভিড়—এক কাজ, এক মুখ, এক কথা—জীবনটায় কোন সুখ নেই, বৈচিত্র্য নেই, রস নেই! কি এ?

দুম্ করে হঠাৎ পরী এসে বললে,—কৈ, ঘুমোও নি ত!

গজেন অপ্রতিভভাবে উঠে বসে বললে,—না, ঘুমোব না ঠিক করলুম।

পরী বললে,—তাস খেলতে চল্‌লে না কি?

—না। বলে গজেন আবার শুয়ে পড়ল।

পরী বললে,—তোমায় যেন কেমন উতলা দেখচি—একবার শুচ্ছ, একবার উঠচো,—শরীর ভালো নেই, না কি?

গজেন কাঁচু-মাচুভাবে বললে,—শরীর কেমন জুৎসই বোধ হচ্ছে না।

পরী বল্‌লে,—তবে ঘুমোও। সন্ধ্যা বেলায় আজ আর ভবানীপুরে না হয় নাই গেলে।

গজেন আবার উঠে বসল,—না, যেতেই হবে। অসুখ শুনলুম—

পরী আর কোন কথা না বলে চলে গেল। গজেনের মনে হল, পরীর ঠোঁটের কাছে যেন একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল!

গজেন আবার ভাবতে লাগল; ভেবে ঠিক করলে, যাবে না, ইডেন গার্ডেনে সে যাবে না। এ কার চিঠি আর-কাকেও হয়তো লিখেচে, ভুল করে তার কাছে এসে পৌঁছেচে!···কিন্তু না, খামখানা তুলে নিয়ে সে দেখলে,—এ যে তারই নাম, স্পষ্ট—তারেই ঠিকানা। ভুল চিঠি এ নয় তো তবে!

আবার মনে হল, না গেলে 'জগৎ থেকে একজন নারী...সরে পড়বে'— অর্থাৎ আত্মহত্যা করবে! আহা, বেচারী!

সে শিউরে উঠল, কি সর্ব্বনাশ! তারই অদর্শনে ব্যথিত জীবনের লীলা একজন শেষ করে দেবে! সে ভাবলে, না, যেতেই হবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্ততঃ যাওয়া দরকার। গিয়ে ভালো কথায় তাকে সৎ পরামর্শ দেবে,—এ আলেয়ার পিছনে ছোটা থেকে তাকে নিবৃত্ত করবে!

আবার মনে হলো, তাইতো, নারীর এ আহ্বান—এ মস্ত প্রলোভন। সকল দেশের শাস্ত্র-পুরাণ এ প্রলোভন থেকে দূরে থাকার জন্য কি রাশ-রাশ উপদেশ দিয়েছে! এ ফাঁদে পা দিয়ে কোথায় শেষে গিয়ে পড়বে? কোথায় থাকবে পরী, ছেলে-মেয়ে! তা ছাড়া এই সুনাম—যে সুনামটুকুকে এই চল্লিশ বৎসর পরম যত্নে রক্ষা করে এসেছে—!

বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল—চিঠিখানা আর একবার সাবধানে পড়ে নিয়ে জামার পকেটে রেখে দিলে; তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় বেশ করে ব্রশ চালিয়ে চেহারাখানা দেখে নিলে।···বয়স চল্লিশ··· তা হোক্—এখনো যৌবনের ছাপ মুখে-চোখে হাসিতে কেশের রাশিতে হিল্লোলিত রয়েছে!···যৌবনটা বৃথায় গেল! স্ত্রীর প্রেম, সে তো আছেই—সকলেই পায়—কিন্তু এই অপরিচিতার প্রেম···এ যে একেবারে দুর্লভ বস্তু! এ যে জন্ম-জন্ম সাধনার ধন! আর দু'চার বছর পরে ও বস্তু পাবার আশাও থাকবে না যে! এ সুযোগ, এ সৌভাগ্য জীবনে ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! এ সুযোগ মিলেছে যদি, জীবনের এই অবেলাতেও,—তো হেলায় তা হারাবে!··· একটা নিশ্বাস ঝড়ের বেগে তার বুকটাকে তোলপাড় করে জেগে উঠলো। হতাশভাবে সে ভাবলে, যাক্—কে জানে, এতে বিপদও হয়তো ঘটতে পারে!...যদি কোন শত্রুর ফন্দীই হয়?

...কিন্তু তার আবার শত্রু কে? মনে পড়ে না! শেষে সে স্থির করলে, থাক, যার জন্যে এত ভাবনা, কাজ কি? নাঃ, যাব না!

সে খপরের কাগজে মন নিবিষ্ট করলে! নজর পড়লো একটা প্রবন্ধের উপর। আঃ, খপরের কাগজেও আজ এই সুর! কি এ! চারিদিকে আজ বসন্ত জেগে উঠল যে! প্রবন্ধটায় লেখা আছে,—নারী ভালবাসে তরুণকে, না, প্রৌঢ়কে? একেবারে যে তরুণ, তাকে ভালবাসার নাম মোহ—তাতে নৈরাশ্যের ভয় থাকে, তা উবে যায়, মুছে যায়! কিন্তু প্রৌঢ়র সঙ্গে যে প্রেম, তাতে গভীরতা আছে, সে মুছে যাবার নয়!

আনন্দের উচ্ছ্বাসে গজেন এবার হেসে ফেললে। তবে তো তারও দাবী আছে নারীর প্রেমে! কিন্তু সে তরুণ নয়,—এ কথা ভাবতেও প্রাণটা হায়-হায় করে উঠল।

কোনমতে ছ'টা অবধি আই-ঢাই করে কাটিয়ে গজেন একটু সৌখীন রকমেই আজ সাজসজ্জা করলে, বাইরের ঘরে। ভিতরে সাজসজ্জা করতে ভরসা হলো না! কে জানে, পত্নী যদি কোনরকম সন্দেহ করে বসে? সে বলেছে, যাচ্ছে ভবানীপুরে, পীড়িত বন্ধুকে দেখতে। তার জন্যে সাজসজ্জার ঘটা কেন? সে ভাবলে, এ কথা না বলে যদি সে বলতো, কোনো বন্ধুর ভাইয়ের বিয়ের পাকাদেখা দেখতে চলেছে, তাহলে সাজসজ্জার এ ঘটাটুকু মানাতো! যাক্, যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই, অথচ যা-তা পোষাকেও যৌবনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বেরুনো যায় না তো! তাই সে একেবারে বাহিরের ঘরেই সাজসজ্জা-সমেত আশ্রয় নিয়েছিল।

মোটরে করে গঙ্গার ধারে কতবার ঘোরা হলো। ঘড়ি দেখারও বিরাম নেই—অথচ ঘড়ির কাঁটা সাতটার ওপর আজ যেন আর যেতেই চায় না! অন্যদিন এক চক্কর দিতে না দিতেই আটটা বেজে যায়! সময়টা আজ নেহাৎ সেই গল্পের কচ্ছপের মতই চলেছে যেন! হঠাৎ তার মনে হল, ঘড়িটা ঠিক যাচ্ছে ত?

সোফারকে সে বললে,—চলো এস্প্লানেড্।

গাড়ী চল্লো ধর্ম্মতলার দিকে। কার্জ্জন পার্কের পশ্চিম প্রান্ত থেকে হোয়াইটএ্যাওয়ে লেড্‌লর দোকানের চূড়ার প্রকাণ্ড ঘড়িটার পানে চেয়ে সে দেখে, সাতটা বাজতে দশ মিনিট। নিজের ওয়াচ খুলে দেখে, তাই তো, ঘড়ি ঠিকই যাচ্ছে, তবে—

সোফারকে বললে,—ঘুমায় লেও। চলো ইডেন্-গার্ডেন!

বাবুর খামখেয়ালি ভাব দেখে সোফার একবার মুহূর্ত্তের জন্য বাবুর পানে ফিরে চাইলে। তারপর গাড়ী ঘুরিয়ে একেবারে গঙ্গার ধারে এল। ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের পশ্চিমে গিয়ে হাজির হতেই বাবু বললেন,—রোখো!

গজেন তখন গাড়ী থেকে নেমে হন্-হন্ করে প্যাগোডার সামনে এসে দাঁড়াল। দূর থেকেই দৃষ্টি এক কিশোরীর সান্নিধ্য অনুভব করে অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়ছিল। কিন্তু কোথায় সে? অন্ধকারে ছায়ার মত প্যাগোডা দেখা যাচ্ছে,—তার ধারে জলের কোলের কাছে পাঁচ-ছটি প্রাণী বসে—তারা সাহেব-মেম! একটু বিরক্ত হয়ে গজেন এসে প্যাগোডার ধারে বসে পড়ল।

সামনে পুকুরের জলে সন্ধ্যা তার নিবিড় আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়েছিল—কালো জল নিথর স্তব্ধ। তীরে শুধু সাহেব-মেমদের হাসি আর গল্পের গুঞ্জন, পাপড়ি-মোদা ফুলের কাণে ভ্রমরের অলসগুঞ্জনের মতই তা বাজছিল! গজেনের বুকের মধ্যটা দুপ্ দুপ্ করছিল—এই কোলাহলের মধ্যে, ভিড়ের মধ্যে সে আসবে কি? হায় অপরিচিতা, এ কি স্থান বেছে নিয়েছ মনের গোপন কথা নিবেদনের জন্য! তার জন্য যোগ্য ঠাঁই হতো, কোন নিরালা কোণ, জনহীন পথ,—আলোর উগ্র হাসি যেখানকার শান্ত স্তব্ধতাকে চিরে দেয় না, লোকের কোলাহল যে স্তব্ধতার বুকে বাজের ঘা মারে না—!

এমনি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার ভাগ্য সদয় হলো। সাহেব-মেমের দল চলে গেল। অদূরে ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডে বেশ একটি মিঠে রাগিণী বেজে উঠল—। গজেন চেয়ে দেখলে, গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে আলোর রশ্মি জেগে রয়েছে—পথের মাঝে-মাঝে আলোর ক'টা টুক্‌রো হীরের কুচির

মত ঝক্‌ঝক্ করছে—বাকাটুকু আঁধারে ছায়ায় ঘেরা, অস্পষ্ট, স্বপ্নের মতই যেন তা বিচিত্র রমণীয়!

গজেন ঘড়ি খুলে দেখে,—সাতটা বাজতে তিন মিনিট বাকী।...আর বসে থাকা যায় না!

অধীর আগ্রহে সে উঠে দাঁড়াল, পায়চারি করতে লাগল,—উৎকর্ণ হয়ে অধীর দৃষ্টি নিয়ে! কোন্ দিক দিয়ে আসবে সে? ওগো তরুণী, ওগো সুন্দরী, ওগো অপরিচিতা, ওগো নায়িকা, ওগো যৌবন-বন-অভিসারিকা—

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ মৃদু কণ্ঠের গানের স্বর তার কাণে গেল। কে গাইছে,—

কথা ছিল তারে বলিতে!
চোখে চোখে দেখা পথ চলিতে!

গানের স্বর লক্ষ্য করে চেয়ে সে দেখে, প্যাগোডার অন্য ধারে একটি বাঙালী যুবা বসে গান গাচ্ছে; বসে আছে সে একটা প্রতিমূর্ত্তির মত! দু'তিনবার পায়চারি করে সে চেয়ে দেখে, গানের রসে-ভাবে লোকটা একেবারে মশ্‌গুল্! নড়বার-চড়বার কোন লক্ষণ নেই তার! আঃ!

গজেন ভারী বিরক্ত হলো। কে এ?...হয়তো এর জন্যেই বেচারী আসতে পারছে না! বেড়াতে বেড়াতে সে তার কাছে গেল—দূর থেকে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার পানে। তার গান থেমে গেল—যেন বেহালার তার ছিঁড়ে গেল হঠাৎ খট্ করে! সে-ও বক্র-দৃষ্টিতে গজেনের পানে চেয়ে দেখলে—দুজনে চোখোচোখি হলো। হতেই সে দাঁড়িয়ে উঠল, ডাকলে,—সেজ দা—

—কে—? নরেন?

নরেন গজেনের পিসতুতো ভাই। গজেনের বাড়ীতে থাকে। তার বাপ-মা থাকেন পশ্চিমে, আর নরেন কলকাতায় গজেনের বাড়ীতে থেকে কলেজে পড়চে,—এবার বি, এস্-সি দেবে। আর মাসখানেক বাদেই তার এগ্‌জামিন।

গজেন বললে,—এখানে ভূতের মত বসে আছিস যে?

নরেন একটা ঢোঁক গিলে বললে,—বেড়াতে এসেছি।

বেড়াগে যা'না। এখানে অন্ধকারের মধ্যে ঘুপ্‌টি মেরে বসে আছিস কেন?

নরেন বললে,—মাথা ধরেছে।

—মাথা ধরেছে ত' বাড়ী যা। না-হয় খোলা হাওয়ায় বেড়াগে—বসে থাকে না।

নরেন একটু ইতস্তত করে বললে,—এখানে বসে আছি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে engagement করেছি বলে। তার সঙ্গে একটু লেখাপড়ার কথা আছে।

গজেন বিষম বিরক্ত হলো। এখনো ছেলেটা কথা-কাটাকাটি করে! তার শাসন নেই, মেলামেশা সহজভাবে করে—তা করুক্,—তবু বয়সে ছোট ভাই তো! গজেন বললে,—যা, যা, এখানে লেখাপড়া করে না। বাড়ী গিয়ে ও-সব তর্কাতর্কি করিস। মাথা ধরেছে, বাড়ী যা। আমার গাড়ী আছে বাইরে, তাতে করেই নয় যা।

—আপনি কিসে যাবেন?

—আমি নয় ট্রামে যাব'খন। তোর মাথা ধরেছে—এগ্‌জামিনের আগে অসুখে পড়বি শেষে!

—অসুখ করবে না।

—না! করবে না! ভারী জানিস্! এই ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়—! শেষে অসুখে পড়ে একটা বছর মাটী কর!

—আর-একটু পরে যাচ্ছি।

রাগে গজেনের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। এত বড় বেয়াদব ছোকরা—তবু নড়তে চায় না! বিরক্ত হয়ে সে ফিরল।

ফিরতেই দেখে, অদূরে পুলটার উপর দিয়ে এক বাঙালী নারী—কিশোরী বলেই মনে হয়—দ্রুত চলে যাচ্ছেন!

তার বুকখানা দমে গেল। বুঝি সে-ই! এসে চলে গেল! গজেন হন্ হন্ করে এগিয়ে এল। সে যখন এধারে এসে পৌঁছুল, কিশোরী তখন ত্বরিত গতিতে এগিয়ে এক সঙ্গিনীর হাত ধরে বাগানের ফটক পার হচ্ছেন। গজেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাহিরে ফটকের সাম্‌নে একখানা মিনার্ভা কার—সঙ্গিনীর হাত ধরে কিশোরী কারে উঠলেন। কার তখনি চল্‌তে সুরু করলে। গ্যাসের আলো লেগে

গজেন বিমূঢ়ের মত কতকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল,—খানিক পরে তার চেতনা ফিরে আসতে সে ঘড়ি খুলে দেখে, সাতটা বেজে আটাশ মিনিট।

ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের উত্তর দিকে গাছতলায় একটা বেঞ্চে সে বসে রইল; মাঝে মাঝে হতাশভাবে প্যাগোডার পানে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। অন্ধকারের মধ্যে প্যাগোডা ভূতের মত দাঁড়িয়ে, আর তার পায়ের তলায় সাদা চুণকাম-করা প্রতিমূর্ত্তিগুলোয় আলো পড়ায় মনে হচ্ছিল, একটা কালো ভূত যেন প্রকাণ্ড দাঁত মেলে অট্টহাস্য জুড়ে দিয়েছে!

বাড়ী এসে নিঝুমভাবে কতক্ষণ সে বাহিরের ঘরেই পড়ে রইল। অন্দর থেকে খাবারের ডাক আসতে সে ভিতরে গিয়ে খেতে বসল।

পরী বললে,—বন্ধু কেমন আছেন গো?

গজেন সংক্ষেপে জবাব দিলে,—ভালো।

পরী বললে,—দেখা হয়েছিল ত?

গজেন বললে,—হয়েছিল।

হেসে পরী বললে,—অপরিচিতা কি বললে?

…এ্যাঁ! শপাৎ করে কে যেন গজেনের পিঠে চাবুক মারলে। গজেন মুখ তুলে পরীর পানে চেয়ে দেখে, সে মুখ হাসিতে ভরা—চোখে অবধি হাসির উচ্ছ্বাস! তবে কি চিঠিখানা? না, চিঠি তো তার কাছেই বরাবর! সে হাতছাড়া করেনি, মুহূর্ত্তের জন্য না!…অসম্ভব!…তবে—

পরী বললে,—তোমার গাড়ী তো ছিল ইডেন গার্ডেনে। ভবানীপুরে গেলে কি করে?

গজেন কচুরি হাতে হাঁ করে চেয়ে রইল পরীর মুখের পানে। পরী হেসে উঠলো, বললে,—অপরিচিতার চিঠি পেয়ে অধীর হয়ে ছুটে গেছলে, তা দেখা মিললো না? আহা!

গজেন স্তব্ধ, বিমূঢ়!

পরী বললে,—পুরুষ মানুষের অহঙ্কার সাজে না! ক লাইন চিঠি পড়ে দিগ্বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে ছুটেছিলে,—এখন শোনো ব্যাপারখানা। ও-বাড়ীর রেণু বেশ গাইতে পারে কি না, তা ওদের বাড়ী গান শোনার সুবিধে নেই, শ্বশুর-টশুর আছেন বাড়ীতে, কাজেই গাইতে পারে না। এখানে তার গান শুনবো বলে তাকে নেমন্তন্ন করেছিলুম। অথচ বাড়ীতেই বা শুনি কখন্! তুমি আছ, বেরুবে যদি তো আমায় না নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বেরুবে না, তাই, কি করে তোমার হাত এড়াব ঠিক করতে পারছিলুম না। মুস্কিল! তারপর ঐ ফন্দী আঁটলুম। জানি তোমাদের জাতের দুর্ব্বলতা। যতই বড় কথা কও না, নারীর একটু চটুল চাউনির ইসারায় না করতে পারো তোমরা, এমন কাজ নেই! তার জন্যে দুঃখ করছি না। কমল এসেছিল, তাকে দিয়ে ঐ চিঠি আমি লেখাই। তাতে তুমি ঘর ছেড়ে একলা বেরুবে, জানতুম। ওধারে নরেন-ঠাকুরপো, ও তো ঐ বইয়ের পোকা, একদণ্ড বই ছাড়ে না—তাকে নড়ানোও শক্ত। যত বলি, সন্ধ্যাবেলায় একটু বাইরে বেড়াওগে, তা শুনবে না, বলে, বোঝো না সেজবৌদি; ভারী keen competition! একদণ্ড বই ছাড়লেই সে ভাবে, ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হতে পারবে না! তাই ঐ চিঠিরই আর একটা নকল তাকে পাঠালুম।… তোমাকে ভেতরকার কথা খুলে বললুম, তাকেও এক রকম করে সব বলবো। ছেলে বিয়ের নামে লাফিয়ে ওঠেন, আর এদিকে প্রেমপত্র পেয়ে এগজামিনের পড়া চুলোয় দিয়ে ছুটলো কোথায়, না, ইডেন গার্ডেনে ট্রামের পয়সা খরচ করে!…এ কি কম ফাঁদ,—কি বল? যাই হোক, তোমায় হায়রাণ হয়েছে খুব, তার উপর অত বড় আশায় এতখানি নৈরাশ্য,—মাপ করো। পরী হাসতে লাগল; হাসতে হাসতেই বললে,—তোমরা গেছ কি না, পরখ করবার জন্যে ভোম্বোলের মিনার্ভা কার নিয়ে আমাতে আর রেণুতে গেছলুম ইডেন গার্ডেনে। ওঃ, ধরা পড়েছিলুম আর একটু হলেই! তুমি আমায় দেখে আমার দিকে যে রকম হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছিলে, ভাবলুম, ধরা পড়লুম বুঝি! শেষে ছুটতে হলো লজ্জার মাথা খেয়ে—পরী হাস্‌তে হাস্‌তে একেবারে গড়িয়ে পড়ল।

কোনমতে লজ্জার পাশ কাটিয়ে গজেন বললে,—যাক্, নরেনের কাছে যেন বলো না যে আমাকেও চিঠি লিখেছিলে, আর আমি ঐ চিঠি পেয়েই সেখানে গেছলুম।

হাজার হোক্ আমি বড় ভাই, আমার একটা ইজ্জত আছে তো ওর কাছে।...এইটুকু করুণা করো।

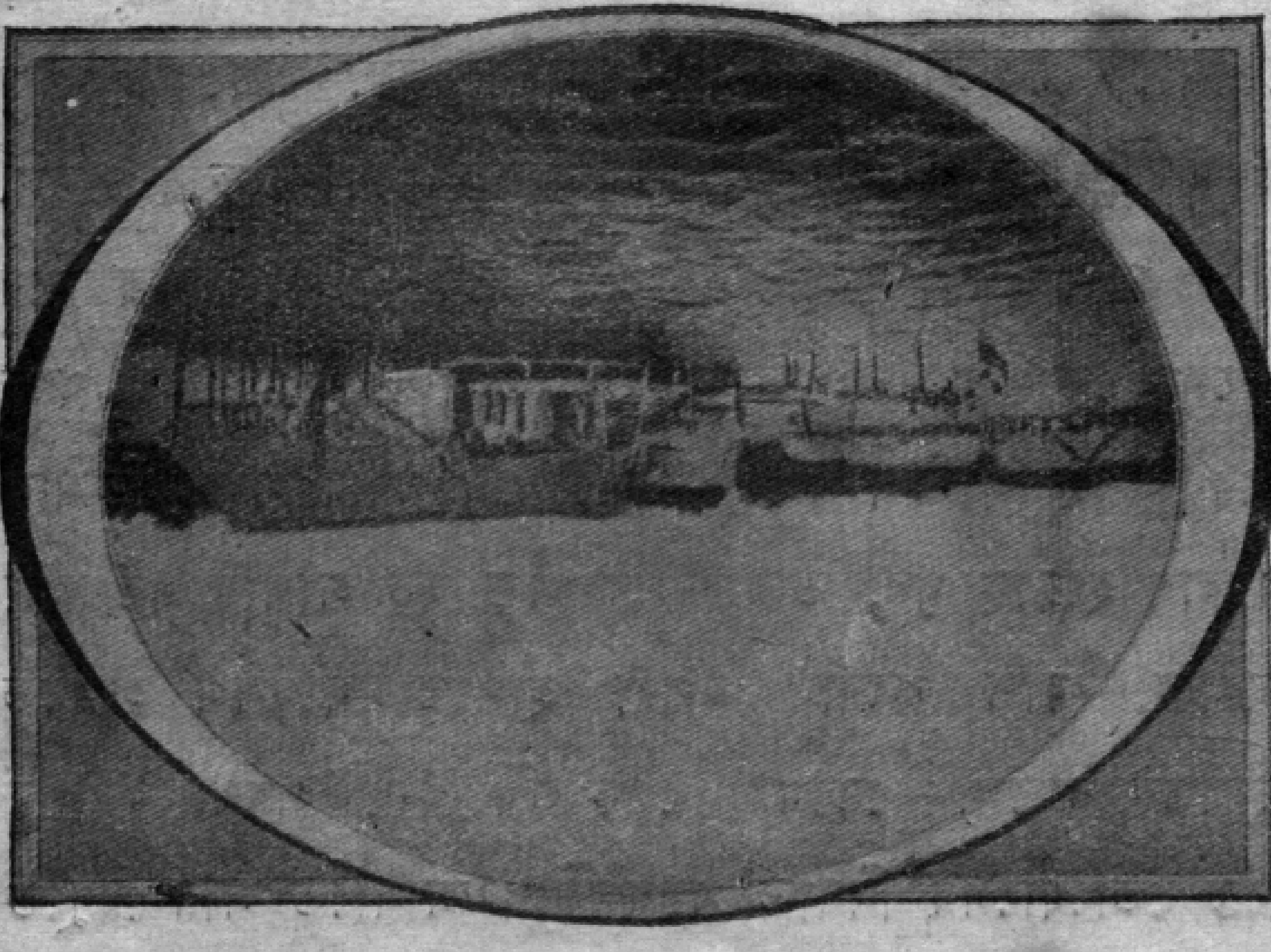
পরী বললে,—না গো, না। সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে। পরীর হাসি আর থামে না।

গজেন নিঃশব্দে ভোজন সমাধা করতে লাগল। তার মনে অত্যন্ত আপশোষ হচ্ছিল, এত বড় নৈরাশ্য সে অনায়াসে সহ্য করতে পারতো যদি ওটার মধ্যে কিছু সত্যও থাকতো, কিন্তু হায়রে তাও অদৃষ্টে ঘটলো না! চিঠিখানা একদম ভুয়ো!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

# অর্কিড না পারিজাত ?

গাছ-গাছড়ার আদর আছে সকল দেশে সকল জাতের মধ্যেই। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাব্যের যুগে রাজা-রাজড়ারা ফুলের কদর গাছের আদর খুবই যে করতেন, তার পরিচয় প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত কাব্যে-নাটকে আমরা প্রচুর ভাবেই পাই। মেঘদূতের যক্ষও ফুলের অঞ্জলিতে মেঘের স্তুতি-বন্দনা করেছিলেন। তাছাড়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমরা পাই নন্দন-কাননের বর্ণনা! মুসলমান ইংরেজ সকলেই ফুল ভালবাসে। ফুলের বাগান মুসলমানদের বিলাসের



প্যাসিফিকের জলায় গাছ-সন্ধানীর আস্তানা

বৈঠকখানার মতই আদরের ছিল; আর এ-যুগের বণিকের জাতও সখের খাতিরে ব্যবসার খাতিরে ফুলের তোয়াজ করে, বিচিত্র সজ্জায় বাগান সাজায়।

নন্দনকাননের মধ্যে আবার সব ফুলের সেরা ফুল পারিজাত। সে না কি দুর্লভ সামগ্রী! সত্যভামার মনোরঞ্জনের জন্য মর্ত্ত্যের শ্রীকৃষ্ণ এই পারিজাত আনতে নারদকে পাঠান,—তাই নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তুমুল সংগ্রাম বাধে। এ ব্যাপার নিয়ে কত কাব্য-নাটক যে সেকালে-একালে বিরচিত হয়েছে, এবং হচ্ছেও, তার আর লেখাজোখা নেই।



টবে জীয়ুনো পরগাছা

এই পারিজাত নিয়ে কিছুকাল পূর্ব্বে পণ্ডিতের দল একটা আলোচনার ঢেউ তুলেছিলেন। পারিজাত কি—? না, পর-জাত, অর্থাৎ পর-গাছা। অপর গাছকে আশ্রয় করেই যার জন্ম। কিন্তু তাই বলেই এ হেলাফেলার বস্তু নয়। এই পরগাছার এক-আধটায় এমন বিচিত্র সুন্দর ফুল ফোটে যে সে ফুল সৌখীনের বাজারে মণি-মুক্তার মত খুব চড়া দামেই বিকোয়। এই পরগাছাকে ইংরেজ বলে অর্কিড্। এই অর্কিডের আদর ইংরেজ যেমন করে, আধুনিক মুসলমান আর সৌখীন বাঙালী বাবুও ঠিক তেমনিই করে থাকেন। মধুপুরের এক নার্শারিতে সেদিন আমরা অপূর্ব্ব সুন্দর অর্কিডের ফুল দেখেছিলুম। এত রঙের ছিট্ তাতে—

ঠিক যেন কে নানা রঙে রামধনু এঁকে রেখেছে! দেখে আমরা তন্ময় মুগ্ধ হয়ে গেছলুম।

এই পরগাছার সন্ধানে বেরিয়ে কত লোক যে প্রাণ হারিয়েছে, তার আর সংখ্যা নেই। ঠিক মণিমুক্তার খোঁজে

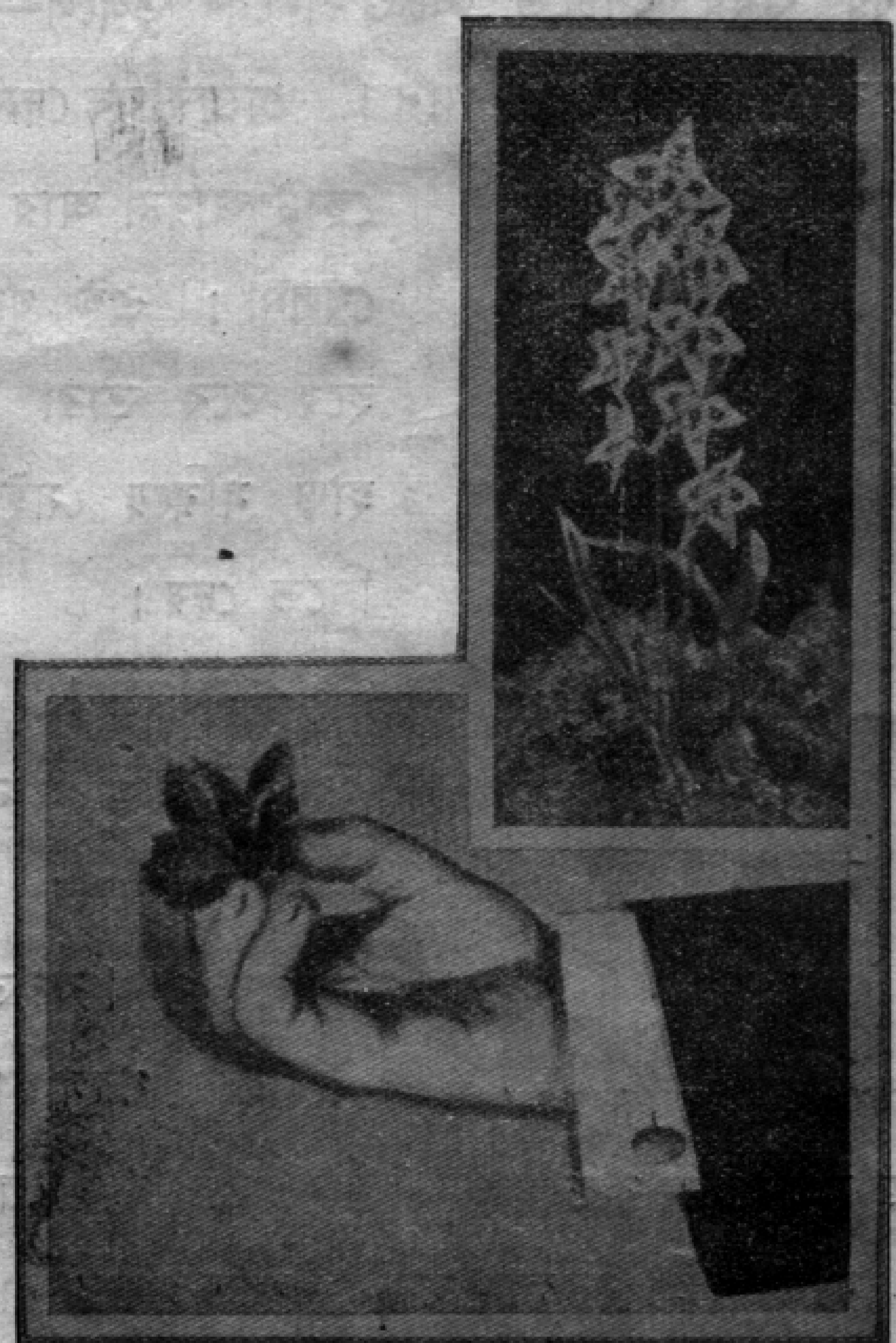


ইউলোফিলা এলিজাবেথিয়া

জহুরীরা যেমন লক্ষ বিপদ তুচ্ছ করে সাগর সেঁচে ঘুরে বেড়ায়, এই পরগাছার খোঁজে গাছ-সন্ধানীরাও তেমনি বাঘের মুখে, সাপের মুখে, কুমীরের মুখে যেতে এতটুকু পেছ-পা হয় না। কত লোক দুর্গম গিরিশিখরে এর সন্ধানে প্রাণ দিয়েছে, কত লোক সাগরের অতল তলে তলিয়ে গেছে, বাঘের মুখে চলে গিয়েছে, তবু সন্ধানীর সন্ধানের আর বিরাম নেই!

আমাদের পারিজাতের কাহিনী পড়ে আমরা জান্‌তে পারি, সে ফুল সংগ্রহ করা খুব কঠিন; সে ফুল-সংগ্রহে বিপদ পদে পদে। এর একটা কারণ এই মনে হয়—যে, পাহাড়ের দুর্গম শিখরে-শৃঙ্গে প্রপাতের ধারে অন্য গাছকে আশ্রয় করে যে পরগাছা গজিয়ে ওঠে, তাতে যে ফুল ধরে, সেগুলি শোভায় বর্ণে রূপে গন্ধে একেবারে অতুলনীয়! একালের এই সব গাছ-সন্ধানীরা যে বৃত্তান্ত দেন, তা থেকেও আমরা দেখি, তাঁদের মধ্যে গড়ে শতকরা প্রায় একজন গাছ নিয়ে দেশে ফেরেন, বাকীদের জীবনের কোন চিহ্নও থাকে না, পাত্তাও মেলে না।

সম্প্রতি আমেরিকার আমাজন নদীর ধারে-ধারে এই সব গাছ-সন্ধানীদের পরগাছার জন্য তুমুল সন্ধান চলেছে। কাটাসীটাম, কোরিয়াম্থাস প্রভৃতি বিখ্যাত অর্কিড এই অঞ্চলেই পাওয়া গেছে। হিমালয় থেকেও এমনি বহু অর্কিড পাওয়া গেছে। এই সব গাছ-সন্ধানীদের বৃত্তান্ত মানুষের কল্পনার রঙে রঙানো কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর। বিলাতের বিখ্যাত ফুলওয়ালা স্যাণ্ডার কোম্পানির তরফ থেকে একবার ক'জন বিশেষজ্ঞ গাছ-সন্ধানী অর্কিডের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন,—তাঁদের মধ্যে ছিলেন উদ্ভিদ-তত্ত্বজ্ঞ ফকেনবার্গ, ক্লুবাক্, এঁদ্রেশ, ব্রাউন, ওয়ালেস্, স্রোডার, আর আর্নল্ড। এঁরা কজনেই আর প্রাণ নিয়ে দেশে ফেরেন নি। ফকেনবার্গ মারা যান পানামা কেনালে, ক্লুবক মেক্সিকোয়, এঁদ্রেশ রায়ো হাকায়, ব্রাউন মাদাগাস্‌কারে, ওয়ালেস ইকোয়েডরে, স্রোডার সায়রা লিওঁতে, আর আর্নল্ড অরিনোকোয়। জানোয়ারের মুখেই যে এঁরা সকলে প্রাণ দিয়েছেন, তা নয়



বীজের চাষ

—জলার ধারে দীর্ঘ দিন দীর্ঘ মাস ধরে ঘুরে বেড়ানো আর থাকার দরুণ সেখানকার জ্বরে এবং আরো নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েই তাঁরা মৃত্যু-পথের পথিক হয়েছেন।

হামোঁলন বহু অর্কিড সংগ্রহ আর আবিষ্কার করেন, তার মধ্যে ইউলোফিলা এলিজাবেথিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মাদাগাস্কারের বনে-জঙ্গলে এর গাছ জন্মায়

—তাও খুব পরিমিত সংখ্যায়। এর বাড় অতি মন্থর। বসে থেকে থেকে বন্য জাতের আক্রমণ বাঁচিয়ে দলের মধ্যে বেঁচে ছিলেন শুধু তিনি একা এ গাছ নিয়ে দেশে ফিরতে। তিনি এক জানোয়ারের সামনে পড়েছিলেন— সে জানোয়ারটি দেখতে বিড়ালের মত ছোট হলেও বাঘের বিক্রমে তেড়ে আসে আক্রমণ করতে। একজন সঙ্গী এই জানোয়ারের আক্রমণে প্রাণ দেন। জানোয়ারটা তেড়ে একেবারে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে; তার পর হতাশভাবে গায়ের মুখের মাংস ধারালো নখে ছিঁড়ে টুকরো-টুক্রো করে ফেলে।

আর একজন সন্ধানী নিউ গিনিতে গোরস্থানের অস্থি-স্তূপের মধ্যে এক গাছ দেখেন; তার ফুল রঙের ছটায় একেবারে চারিধার আলো করে রেখেছিল। সেখানকার লোকেরা পূর্ব্বপুরুষের কবর ঘাঁটতে প্রচণ্ড নিষেধ তুল্‌লে—সন্ধানী তাদের ঘুষে ভোলাবার চেষ্টা পান। তাদের ঘুষ দেন, ছোট ছোট আয়না আর টিনের খেলনা। এই ঘুষে তুষ্ট হয়ে তবে তারা কবরের হাড় সরিয়ে সেই গাছ নিতে দেয়।

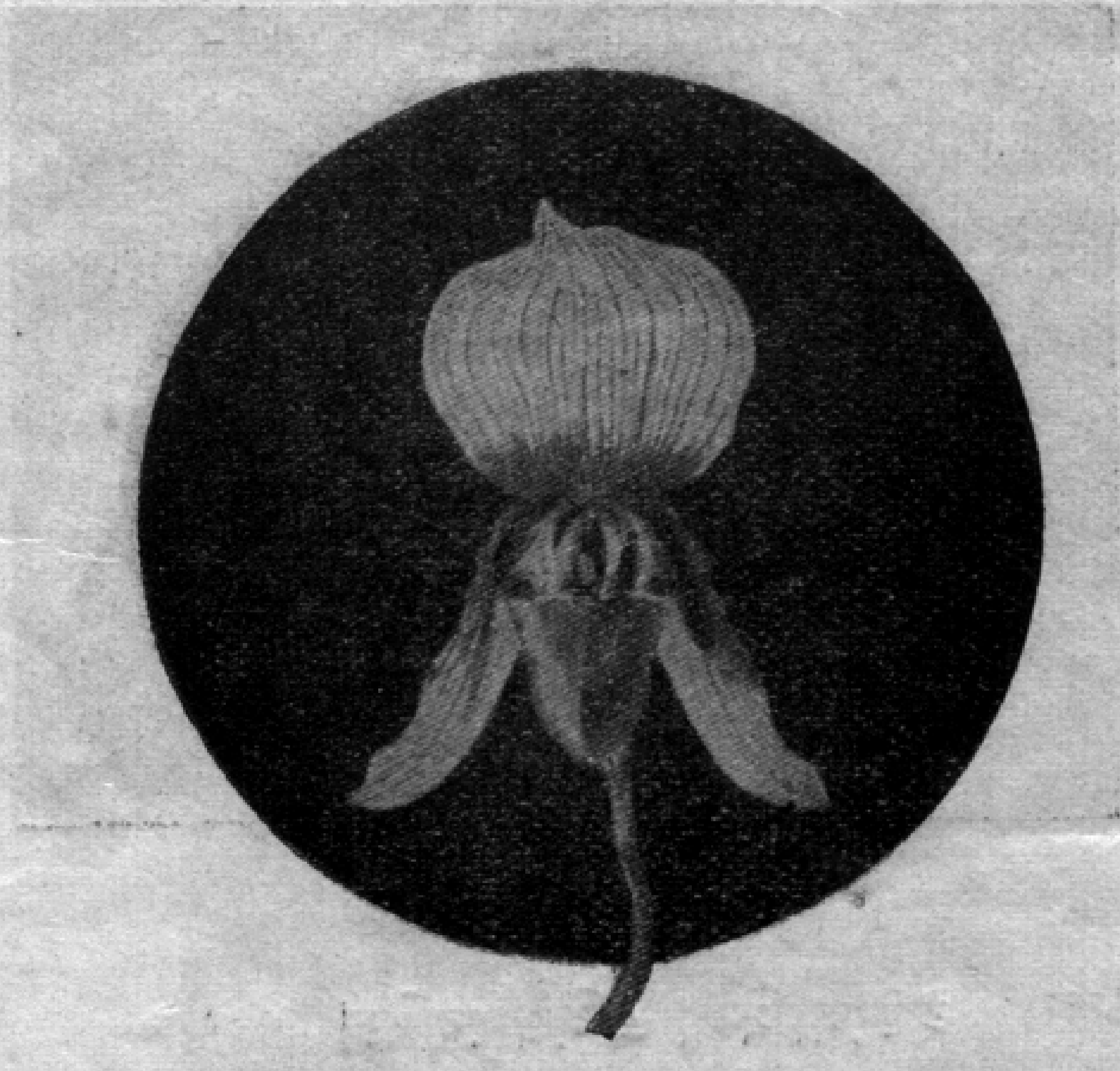


অস্থি-স্তূপের অর্কিড

মেক্‌সিকো থেকে একটি অর্কিড আনা হয়, —সে দেশের লোক সেটিকে পূজা করত।

এই পরগাছা যখন বিলাতের বাজারে এসে পৌছয় তখন তার শ্রী দেখলে কেউ বলতে পারে না, পরে এর কি দর দাঁড়াবে। নিলেমের বাজারে এ নিয়ে দর-হাঁকা-হাঁকি পড়ে যায়—তারপর 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র'—ঠিক speculationএর দশা! যার বরাত ভালো তার জোটে ভালো গাছ। স্যাণ্ডার কোম্পানি একবার দু' শিলিং ছ'পেন্সে যে অর্কিড বেচলে, তাতে ফুল ফুটলে তারি দাম শেষে পাঁচশো পাউণ্ড দাঁড়াল।

এই পরগাছা নিয়ে তার উপর বৈজ্ঞানিক প্রথায় নানা চর্চ্চা চলে। একবার ফুল ফুটলে তা থেকে বীজ নিয়ে নতুন গাছ জন্মানো হয়। চাষের মত সযত্নে তার তদ্বির-তদারক চলে। অর্কিডের বীজ ভারী মিহি আর হালকা—খুব সূক্ষ্ম, পাউডারের মত। একটু জোর-হাওয়া বইলেই সর্ব্বনাশ!



মেক্সিকোর অর্কিড। ইহার পূজা হয়

বীজের চাষ করতে হয় প্রথমে স্যাঁতানে জমির উপর—কিন্তু তারপর উচ্চতাপে (high temperature) তাকে রাখা হয়। তিনমাস পরে তা থেকে খুব ছোট চারা সবুজের বিন্দুর মত জমির উপর দেখা দেয়। বীজ যদি উল্টো বসানো হয়ে থাকে তাহলে গাছ চারা-অবস্থাতেই নষ্ট হয়। দেড় বছর গেলে গাছের শক্তি দস্তুরমত সজাগ হয়ে ওঠে; তাকে বাড়িয়ে তুলতে তখন আর তার কোনরকম তদ্বির বা হেফাজতের দরকার থাকে না।

বিলাতের বাজারে অর্কিডের এখন ভারী পশার। সব ফুলের সেরা ফুল, অর্কিড। এই অর্কিডকে লালন-পালন করবার জন্য গ্রীন্ হাউসের (green-house) একান্ত প্রয়োজন। এমন অর্কিডও আছে যা মৃদু রৌদ্রে বা মৃদু শাতে নষ্ট হয় না—বরং তাতে সে বেশ বেড়ে ওঠে।

অর্কিডের আর একটা মজা আছে। তা এই—বিস্তর অর্কিড আছে যাতে ঋতু-ক্রমে নানান্ রঙের ফুল ফোটে। গ্রীষ্মে একরকম, বর্ষায় আর এক রকম, শীতে আবার অন্য রকম। আর এ ফুল এত দীর্ঘকাল তাজা থাকে যে অনেক সময় তাজ্জব লাগে। এক মাস, দুমাসেও মলিন হয় না, বিশ্রী হয় না,—বেশ টাট্‌কা, তাজা, গোটা।

গাছ থেকে ছিঁড়ে ফুলদানীতে রাখলেও গাছের ফুলের মতই তার চমৎকার শ্রী থাকে—তেমনি টাটকা, তেমনি তাজা।

অর্কিডের ফুলে সাধারণতঃ রঙের বাহার যতখানি, গন্ধের বাহার তত নয়। যে ফুলে গন্ধ আর বর্ণ দুয়েরই তুল্য বাহার, তার দামের আর সীমা নেই। তাছাড়া অনেক রঙ-বাহার অর্কিডের ফুলের গন্ধ যেন পচা মাংসর মত। হায় রে!

কল-কারখানার ধোঁয়ার চাপে, চাকার ঘরঘরানিতেও ইংরেজ বা মার্কিণ জাতটার ফুলের সখ যে চাপা না পড়ে পিষে না গিয়ে বেড়ে উঠচে—এটা বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলে মনে হয়। না হলে রক্ষে ছিল! পৃথিবীর বুক থেকে সবুজের চিহ্ন, রঙের আভায় একেবারেই লোপ পেয়ে যেত,—তাহলে মানুষের সে কি কম দুর্ভাগ্য হতো!

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

# মানস-প্রিয়া

ও তার, চোখ-ভরা ঐ সবুজ রঙে ছড়াল মোর মন—
ওরে, ঘর-পালানো মন রে আমার মন!
দেখ, ঐ যে তৃণ, ঐ যে লতা, ঐ যে গহন-বন --
আহা, দোল-দোলানো ঘন-শ্যামল বন!
ও যে আমার প্রাণের লেহ,
কোন্ দরদীর বুকের স্নেহ!
জানি, ওর কাছেতে বিকিয়ে যাবে সাতটি রাজার ধন—
ও যে, ধরার ধূলায় স্বর্গ-খসা ধন!
ও রূপ, ছেঁড়া-কাঁথার ব্যথা ঘুচায়, দুখীর সুখ-স্বপন—
ওগো, আপন ভোলা কবির শ্যাম-স্বপন!

হোথা, সকাল-বেলায় সূর্য্য ছোড়ে আলোর কুস্কুমই—
দেখ, আর কিছু নয়—আলোর কুস্কুমই!
আবার, পূর্ণিমাতে জোছ্না বাজায় ঝিঁঝির ঝুম্ঝুমি—
মরি, ঝিম্‌কি-ঝিমি ঝিঁঝির ঝুম্ঝুমি!
তৃণ-লতার মঞ্জরীতে,
পুঞ্জ-ফুলের কুঞ্জটিতে,
কত, গুঞ্জরিছে ভৃঙ্গ-অলি গন্ধ-রঙ চুমি—
ও কোন্, রঙ্গময়ীর অঙ্গতল চুমি!
মধু, সঙ্গীতেরি ছন্দানন্দ-বন্দনের ভূমি—
এযে, সপ্তস্বরের নর্ত্তনের ভূমি!

শোনো, এইখানেতেই তোমার সাথে জমবে আমার গান—
সখি, তোমার সুরে সুর-মিলানো গান!
তোমার, শষ্প-বাঁশীর পুষ্পরাশির-দল-খোলানো তান—
সে যে, কুল-ভুলানো ভুল-ছুটানো তান!
এস আমার অচিন্ প্রিয়া,
আজ যে তোমায় চাইচে হিয়া,
সুখে, রংমহলের শ্যাম-সায়রে করব রূপ-স্নান!
সবুজ সুরের সুরায় সাঁতার দিয়ে স্নান!
তুমি, একটিবার আজ মূর্ত্তি ধরো,—চলবে না আর মান—
রাখো, ওগো অ-ধর, মিথ্যা অভিমান!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# সাহিত্যে নৈতিকতা

'ধ্রুবতারা'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা' নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে বাংলা সাহিত্যে একটী প্রবল দুর্নীতির স্রোত চলিয়া আসিতেছে বলিয়া আক্ষেপ করা হইয়াছে, এবং সেই জন্য নীতি ধর্ম্ম সমাজের পক্ষ হইতে বাংলার বর্ত্তমান ঔপন্যাসিকগণের বিরুদ্ধে লেখক তীব্র অভিযোগ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য যে সাধু তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিকই যদি বাংলার সাহিত্যিকগণ আপনাদের রচনার মধ্য দিয়া একটী অস্বাস্থ্যকর নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে থাকেন, তবে প্রত্যেক ন্যায়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরই তাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। কারণ সার্ব্বজনীন ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতিকূলতাচরণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; বিশেষতঃ আর্টের উদ্দেশ্য যখন সেই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, যাহার সহিত সত্য ও মঙ্গলের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তখন তাহার পক্ষে ইহা মার্জ্জনীয় হইতেই পারেনা।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখক এই পুস্তকে সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি, এবং নীতি ও ধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিষয়ে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা বাস্তবিকই অতিশয় বিস্ময়কর। নিজে একজন ঔপন্যাসিক হইয়া কেমন করিয়া যে তিনি এমন কথা বলিলেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহার আর এক নজীর আছেন টলষ্টয়। তাঁহার What is Art নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে আমাদের কেবলই মনে হয়—ইহার রচয়িতা যে টলষ্টয় তিনি ঔপন্যাসিক টলষ্টয় নহেন, তিনি সমাজ-সংস্কারক টলষ্টয়। টলষ্টয় শুধু য়ুরোপের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের রচনার প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তিনি নিজের অধিকাংশ রচনারও নিন্দা করিয়াছেন।

যতীন্দ্র বাবুর সকল কথার প্রতিবাদ করা আমার বিষয়ে তাঁহার ধারণা যে অতিশয় সংকীর্ণ এবং প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে যে তাহা অন্তরায়, সেই বিষয়ে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কখনই সম্পূর্ণ নৈতিকতা-বর্জ্জিত হইতে পারেনা ইহা আমরা স্বীকার করি। হইলে কখনই তাহা কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু সেইজন্য যে নীতি ও ধর্ম্মকেই সমজ্ঞান ভাবে আপনার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া সাহিত্য মনে করিবে, অথবা মুখ্যতঃ নীতি ও ধর্ম্মের দিক্ দিয়াই তাহাকে বিচার করিতে হইবে এমন কথা নহে। বিশেষতঃ নীতি ও ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ আমাদের যাহা মনে হয় তাহা দিয়া বিচার করিতে গেলে তাহার উপর ঘোর অন্যায় করা হইবে।

আর্টের মানদণ্ড হইতেছে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। বিশ্বের নর-নারীর বিচিত্র জীবন-কাহিনী লইয়াই মুখ্যতঃ সাহিত্যের কারবার। জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ সকলেই কোনো নীতি বা তত্ত্বের দ্বারা নহে—প্রধানতঃ মানব-জীবনের অপূর্ব্ব রসেই আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিরূপে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, নানা বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মানুষ সংসার-পথে চলিয়াছে অথবা চলিতে না পারিয়া পরাভূত হইয়া যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাহাই তাঁহারা আপনাদের রচনায় ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। মানুষের যাহা স্বাভাবিক, মানুষের জীবনে যাহা সত্য, মানুষের অদৃষ্টের সহিত যাহা বিজড়িত, বিশ্বমানবের এমন কোনো লীলাকেই তাঁহারা তুচ্ছ করেন নাই। ইহাকে সুন্দর করিয়া, মনোরম করিয়া সুসঙ্গতভাবে প্রকাশ করাই তাঁহারা আপনাদের আর্টিষ্ট-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন।

অবশ্য ইহা করিতে গিয়া মানব-জীবনের বিচিত্র সমস্যার তাঁহাদের যে মীমাংসা, তাহাও রচনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে; মানব-জীবনের একটী সমালোচনা, তাহার অর্থ

নিশ্চিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক বিচার করিবার সময় নৈতিক তত্ত্ব নহে—সৌন্দর্য্য তাহার মধ্যে কিরূপ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাই প্রথমে দেখিতে হয়। সৌন্দর্য্য বিচার করিবার পর ইহার নৈতিক মূল্যেরও বিচার করা যাইতে পারে—ইহার প্রচ্ছন্ন দার্শনিক তথ্যের মূল্য নির্ণয় হইতে পারে—কিন্তু এই বিচার ও এই মূল্য নির্দ্ধারণ যে সাহিত্য সমালোচনা নহে ইহা মনে রাখা উচিত। আবার এই বিচার করিবার সময়েও সমালোচককে বিশেষ সতর্ক ও উদার হইতে হইবে।

সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ দুইটী কারণে দুর্নীতির অভিযোগ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ, সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের বিগর্হিত কোনো মন্তব্য প্রকাশ বা বর্ণনা করা; দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যে মানব-জীবনের অন্ধকারময় অংশ অর্থাৎ পাপের চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান। আমরা একে একে ইহার আলোচনা করিতেছি।

সাধারণতঃ আর্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অপবাদ দেওয়া হয় তাহার মূলে সমাজ-বিরোধিতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কবি Shellyকে যে দুর্নীতি-পরায়ণ বলা হইয়াছিল তাহাতে অনেকেই বিস্মিত হইবেন না; কিন্তু বোধ হয় অধিকাংশ পাঠকই শুনিয়া আজ অবাক্ হইবেন যে সমালোচক একদিন Wordsworthকেও নৈতিকতা-বর্জ্জিত বলিয়া ছিলেন। কেননা ইঁহাদের প্রধান অপরাধ এই যে, ইহাঁরা প্রচলিত সামাজিক প্রথা বা conventionএর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। অথচ এমন নিরপেক্ষ সাহিত্য-রসিক আজ কে আছেন, যিনি বলিবেন না যে ইহাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা সত্য ন্যায় ও প্রেমের দিকে? কে না স্বীকার করিবেন যে, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, অতৃপ্তি ও চঞ্চলতার মধ্যেও Shellyর রচনার মধ্যে যে মহাপ্রাণতা, আন্তরিকতা, এবং ন্যায়, সত্য ও নিঃস্বার্থ প্রেমের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সাহিত্যে বিরল?

বস্তুতঃ সাহিত্যকে—অথবা শুধু সাহিত্য কেন—কোনো আর্টকেই সামাজিকতার তুলাদণ্ডে ওজন করিতে যাওয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং আর্টকে যদি সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হয় তবে তাহার অবাধ গতির পদে পদে বাধা জন্মে, তাহার সার্ব্বজনীন মূল্য নষ্ট হইয়া যায়। কোনো বিশেষ সমাজের পক্ষে কি অনুকূল বা প্রতিকূল তাহা বিবেচনা না করিয়া যাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বমানুষের জীবনে চিরন্তন সত্য তাহাকেই আর্টিষ্ট অঙ্কন করিবেন। ইমার্সন এই জন্যই কবিকে contemporary man না বলিয়া eternal man বলিয়াছেন। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট তিনি সেই জন্যই কোনো সাম্প্রদায়িক সত্যকে অবলম্বন করেন না; যুক্তি-তর্ক-নির্ব্বিশেষে কোনো বিশিষ্ট সমাজের বিধান অন্ধভাবে মানিয়া লন না। তাই সংকীর্ণ-দৃষ্টি সমালোচকগণ অনেক সময়ে তাঁহাকে নীতিজ্ঞানহীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

কারণ আমাদের অধিকাংশ লোকের যে নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান তাহা বিশিষ্ট সামাজিক বিধি-নিষেধকেই অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়; এই সকল বিধি-নিষেধের কি উদ্দেশ্য, কি তাহাদের মূল্য, কতদূর পর্য্যন্ত তাহারা অনুসরণীয়, ইহা সাধারণতঃ আমরা না ভাবিয়া নির্ব্বিচারে তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লওয়াকেই আমাদের নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করি।

কিন্তু গোঁড়ামি ছাড়িয়া দিয়া সত্যের উদার দৃষ্টি লইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই—আর্টিষ্ট যদি মানুষের স্বাভাবিক ও সনাতন হৃদয়-বৃত্তির বিরোধী বর্ণনা কিছু না করেন, তবে কেবলমাত্র প্রচলিত সামাজিক প্রথার বহির্ভূত কিছু বলিলে বা করিলেই তাঁহার আর্ট দূষণীয় হয় না। বরং অনেক সময় তাঁহার রচনার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মন্ত্র ক্রমবিকাশহীন সমাজকে ভাঙিয়া গড়িতেই সহায়তা করিয়া থাকে। আর তাহা না করিলেও সমাজ-বিগর্হিত চিত্রাঙ্কন করিবার অপরাধেই সাহিত্যিকের রচনাকে দুর্নীতিপূর্ণ বলা কোনক্রমে সঙ্গত নহে।

দুঃখের বিষয় যতীন্দ্রবাবু এবং তাঁহার ন্যায় অন্যান্য অনেক সমালোচক প্রধানতঃ এই অর্থেই বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যকে দুর্নীতিপূর্ণ বলিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দ-চরিত্র

দিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ চোখের বালিতে হিন্দু বিধবা বিনোদিনীকে পরপুরুষের প্রেমে তপস্বিনী সাজাইয়াছেন; শরৎচন্দ্র রমেশের প্রতি রমাকে অনুরাগিনী করিয়া হিন্দু-গৃহের বাল-বিধবাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়াছেন। এই জন্যই ইহাঁদের মতে এই সকল রচনাদ্বারা সাহিত্যের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে। অথচ কুন্দ, বিনোদিনী ও রমার মধ্য দিয়া ঔপন্যাসিক মানব-হৃদয়ের একটি চিরন্তন সত্যই পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং তাহা হিন্দু-সমাজের পক্ষে যতই নিন্দনীয় বলিয়া মনে হউক না কেন, অন্য কোথাও যে নিন্দনীয় হইবে—এমন আশঙ্কা করি না। দেশ-কালের কৃত্রিম গণ্ডী পার হইয়া বিশাল মানবতার দিক দিয়া দেখিলে ইহাদের দ্বারা যে মানুষের নৈতিক হাওয়া প্রকৃতপক্ষে কিরূপে বিষাক্ত হইবে তাহা বুঝি না!

সাহিত্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির দ্বিতীয় অভিযোগের কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—সাহিত্যে পাপের চিত্র-অঙ্কন। যে সকল সমালোচক এই অভিযোগ করেন তাঁহারা কেবলমাত্র যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত এবং পবিত্র তাহাই সাহিত্যে প্রদর্শন করিতে বলেন। পাপের চিত্র যদি বা কখনো উদ্ঘাটন করিতে হয়, তাহা হইলে যেন পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়ই স্পষ্ট করিয়া তাহাতে ব্যক্ত হয়। অর্থাৎ লেখক যেন তাঁহার রচনার চরিত্রগুলিকে নিজ নিজ পাপ ও পুণ্যানুসারে শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন ইহাই তাঁহাদের আদেশ।

পাপ, পুণ্য, ন্যায়, ধর্ম্ম বলিতে ইঁহারা কি বুঝেন তাহা সকল সময় স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন না। তবে অনেক ক্ষেত্রে ইঁহাদের পাপ-পুণ্যের জ্ঞান যে সামাজিক বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি। সেইজন্য পাপের চিত্র বলিতে তাঁহারা সাধারণতঃ সমাজ-বিদ্রোহের চিত্রই বুঝেন। কিন্তু কখন কখন আবার পাপের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া যাহা-কিছু মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের পরিপন্থী, আর্টে তাহারই চিত্র যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। চিত্রই সাহিত্যে উদ্ঘাটন করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ দাম্পত্য-প্রেম ভিন্ন অন্য প্রকার প্রেমের চিত্র এবং চরিত্রহীন ও পতিত বলিয়া যাহারা সমাজে অবজ্ঞাত তাহাদের কাহিনী সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যাজ্য। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে পুণ্যের প্রভাব প্রদর্শন করিবার জন্য যতটুকু দরকার কেবল তাহাই দেখান যাইতে পারে। যতীন্দ্রবাবুও তাঁহার পুস্তিকায় এই মত অবলম্বন করিয়াছেন। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তিনি দুর্নীতিপূর্ণ ও কলুষিত বলিয়াছেন। সধবা নারী অন্য পুরুষকে ভাল বাসিয়াছে বলিয়া 'নষ্টনীড়,' 'ঘরে বাইরে' ও 'দেবদাস'; বিধবার প্রেমের কাহিনী বলিয়া 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি' ও 'বড়দিদি'; এবং পতিতা রমণীর চিত্র বলিয়া 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি সমস্তই সৎসাহিত্যের বহির্ভূত, ইহাই তাঁহার গ্রন্থের সার মর্ম্ম। ইংরাজী সাহিত্যবিদ্‌গণ এই উপলক্ষে ডাক্তার জন্‌সন কর্ত্তৃক সেক্ষপীয়র সমালোচনা নিশ্চয়ই স্মরণ করিবেন। পাপের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন অথচ অনুরূপ শাস্তি বিধান করিয়া poetic justice অক্ষুণ্ণ রাখেন নাই বলিয়া জনসন সেক্ষপীয়রকে নীতিজ্ঞান-বর্জ্জিত বলিয়া কঠোর-ভাবে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

আমার বিশ্বাস ইঁহাদের এই মত ভ্রান্ত। আর্টকে নৈতিক হইতে হইবে বলিয়া যে তাহাকে সঙ্কীর্ণ হইতে হইবে এমন কথা নয়। মানুষের জীবনে যাহা-কিছু সত্য ও স্বাভাবিক, যাহা কিছু বর্ত্তমান ও সম্ভবপর, সাহিত্য তাহাকেই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে। বাহির হইতে নীতি, সমাজ অথবা লোক-শিক্ষার দোহাই দিয়া কোন্‌টী সাহিত্যে গ্রহণীয় বা কোন্‌টী বর্জ্জনীয় এরূপ ব্যবস্থা করিতে গেলে পরিণামে তাহার স্বাধীন বিকাশের বাধা জন্মে। কারণ বিধি-নিষেধের অন্ত নাই, একজনের মতে যাহা দুর্নীতিপূর্ণ, অন্যের মতে তাহা না হইতে পারে, একজনের মতে যে চিত্রে মানুষের চিত্ত বিকৃত হয় অন্যের মতে হয়তো তাহাই পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যতীন্দ্রবাবুর উল্লিখিত

বিনোদিনীর সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"একজন হিন্দু-বিধবাকে পরপুরুষের প্রেমে তপস্বিনী সাজাইয়া ও তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া লেখক সমাজের অনিষ্ট করিয়াছেন।" 'চন্দ্রশেখরের' সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—"শৈবলিনীর অনুকরণে পরপুরুষাসক্তি সমাজে চলিয়াছে।" 'পল্লীসমাজের' রমার চিত্র লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বক্তব্য এই যে, "এই অবৈধ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পল্লীগ্রামের দলাদলি ও কলহদূষিত বায়ু আরও দূষিত হইবে।" 'দেবদাসের' চন্দ্রমুখী-চরিত্র এবং 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী-চরিত্রও তাঁহার মতে "সমাজ-শরীরে বিষের কার্য্য করিবে।"

কিন্তু লেখকের এই মতের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের মতে 'বিনোদিনী', 'শৈবলিনী', 'রমা', 'চন্দ্রমুখী' অথবা 'সাবিত্রী'র চরিত্র দেখিয়া কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরই পাপের প্রতি আসক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কোনো "মেসে এই সকল চরিত্র লইয়া আলোচনা ও এমনকি চলিবে" কি না, সে গবেষণা তিনি করিতে থাকুন, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া কাহারও কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া আমরা প্রমাণ পাই নাই।

তবেই দেখা যাইতেছে, একই বিষয়ের নৈতিক প্রভাব সম্বন্ধে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত হওয়া সম্ভব। ফলে আর্টিষ্টকে যে প্রসঙ্গে কিছুমাত্র আপত্তির সম্ভাবনা থাকে তাহা পরিত্যাগ করিতে হয় এবং কতকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্ববাদীসম্মত যে ভাল মানুষের চিত্র তাহাই পুনঃপুনঃ আঁকিতে হয়। ইহাতে শীঘ্রই আর্ট কৃত্রিম ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে এবং জীবনের সরল ও স্বাভাবিক সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কোনো দেশেই এইজন্য আপনার বর্ণনীয় বিষয়ের কোনো সীমা মানিয়া চলে নাই। আপনার হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি লইয়া সাহিত্যবীরগণ চিরদিনই আপনাদের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছেন। সংকীর্ণ সমালোচকেরা জনসাধারণের নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজ রসাতলে গেল বলিয়া হতাশ হইয়াছেন, কিন্তু আর্টের গতি কিছুতেই বাধা মানে নাই; পাপ পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়, বৈধ অবৈধ—সর্ব্বপ্রকারের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া যাহা বিশ্বমানবের অন্তরের কথা, হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকেই সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়া আর্টিষ্ট আপনাকে অমর করিয়াছেন। অথচ নীতি সমাজ এবং ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রহিয়া, সমালোচকের সমস্ত আশঙ্কা ও ভবিষ্যৎ বাণীকেই বিফল করিতে করিতে উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই অগ্রসর হইয়াছে। কারণ আসল কথা এই, পাপীর চিত্র সহানুভূতির সঙ্গে প্রদর্শন করিলেই যে পাপ প্রশ্রয় পাইয়া দর্শকের চিত্তে কুৎসিত ভাব জাগায় তাহা প্রকৃত নহে। মানুষের মনের গতি এমনই বিচিত্র রহস্যপূর্ণ, এমনই জটিল তাহার কর্ম্মের নিয়ামক চিন্তা-সমষ্টি, যে কিসে তাহার মন কোন্ পথে প্রধাবিত হয় তাহা বলা যায় না। যে ঘটনায় এক জনের চিত্তে পাপ-চিন্তার উদয় হয়, হয়তো তাহাই আর এক জনের মনে ঘোর বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। যে দৃশ্য একজনকে সৎপথে আনিবার সহায়তা করে, হয়তো আর একজনকে তাহাই পাপের পিচ্ছিল পথে লইয়া যায়। আমরা অস্বীকার করিনা, এমন অনেক বিষয় আছে যাহার চিত্র অপরিণত মনের উপর অস্বাস্থ্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু আর্টিষ্টকে দর্শকের—বিশেষতঃ অপরিণত-বয়স্ক ব্যক্তির নৈতিক উন্নতির উপর—তাঁহার আর্টের কিরূপ প্রভাব হইবে এই কথা মনে করিয়া যদি কার্য্য করিতে হয়, তবে তাঁহার আর্ট কখনই স্বাভাবিক ও সুন্দর হইতে পারে না। সাহিত্যে শিশুশিক্ষা অথবা হিতোপদেশ এইরূপে রচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু যে সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা দেশ ও কালের নিত্য পরিবর্ত্তনকে অতিক্রম করিয়া আবহমান কাল মানুষের মনে আনন্দ দান করিবে, তাহা রচিত হয় না।

তাহা হইলে সাহিত্যে নৈতিকতা বলিয়া কি কিছু থাকিবে না? এই প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে। সাহিত্যিককে কি তাহা হইলে বাস্তব জীবনের যাহা-কিছু সমস্তই

আমরা পূর্ব্বেই এ কথার উত্তর দিয়াছি। সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়ের কোনো সীমা বাহির হইতে নির্দ্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে; কেবল এইমাত্র আমরা বলিতে পারি, যাহা সমুদয় সভ্যসমাজের প্রকৃতিস্থ মানুষই অশ্লীল বলিয়া থাকে, স্ত্রীপুরুষ-ঘটিত এমন সকল ব্যাপারের সুস্পষ্ট বর্ণনাই শুধু পরিবর্জ্জনীয়। যে সাহিত্য এই শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে তাহাকে আমরা অনায়াসেই অস্বাস্থ্যকর বলিতে পারি। নতুবা রচনার বস্তু বা বিষয় বিচার করিয়া সাহিত্যকে দুর্নীতি বা সুনীতিপূর্ণ বলা কোন মতে সমীচীন নহে।

বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যের নৈতিকতা তাহার বিষয়ের উপর নহে—বিষয়ের বিবৃতি-ভঙ্গীর উপরই নির্ভর করে। বৈধ অবৈধ, সামাজিক অসামাজিক, পবিত্র অপবিত্র, জীবনের যে লীলাই সাহিত্যে ব্যক্ত হোক্ না কেন—তাহাতে আপত্তি করা উচিত নহে,—কেবল ইহাই দেখিতে হইবে, যেন তাহাতে মানুষের সনাতন নীতি-সূত্রগুলি abiding laws of morality ) উপেক্ষিত না হয়, যেন সমগ্র রচনার প্রবণতা মানুষের উচ্চতর হৃদয়বৃত্তিগুলির দিকেই থাকে। কথাটী আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি।

মানুষের প্রবৃত্তিসমূহের বিষয় বিবেচনা করিলে তাহার মধ্যে কতকগুলি যে অন্যগুলি অপেক্ষা উচ্চতর, যেমন দয়া নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা, সংযম স্বেচ্ছাচার অপেক্ষা, স্বার্থত্যাগ স্বার্থপরতা অপেক্ষা, ইহা আমরা আমাদের সহজ ধর্ম্মবুদ্ধি হইতেই বুঝিতে পারি। Conscience এর কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্যাপকভাবে জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিলে 'অধিকতম মানুষের প্রভূততম হিতসাধনের' দিক দিয়াও এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। এই আপেক্ষিক মর্য্যাদাবোধের উপরেই আবহমানকাল ধরিয়া মানুষের নৈতিক চরিত্র প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং ইহার বিরোধী কোনো কার্য্যই মানুষের নীতির পক্ষ হইতে সমর্থন করা যায় না।

সাহিত্যিক যখন মানুষের মনোবৃত্তি লইয়া কারবার করিবেন তখন তাঁহাকে এই কথাটী সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে আসিয়াছে। পাপ বা অসৎ প্রবৃত্তির চিত্র তাহাতে অঙ্কিত হউক, কিন্তু সুপ্রবৃত্তিগুলি অপেক্ষা যে তাহা হীনতর, এমন একটী আভাষ যেন রচনার মধ্যে থাকিয়া যায়; পাঠকের মনে যেন ইহাদের আপেক্ষিক মূল্য বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ না থাকে। তাহা হইলেই তাহাকে আর দুর্নীতিপূর্ণ বলিয়া অপবাদ দেওয়া চলিবে না।

কেমন করিয়া যে চিত্রের মধ্যে, রচনার মধ্যে এই ভাবটী ফলাইয়া তুলিতে হইবে, সে বিষয়ে আর্টিষ্টকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। আপনার প্রতিভার দিব্যদৃষ্টির বলেই ইহা তিনি নির্ণয় করিবেন। এইখানেই তাঁহার আর্টের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। এ সম্বন্ধে সমালোচকের পক্ষে বাহির হইত তাঁহাকে কোনো নির্দ্দিষ্ট বিধান দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাতে রচনা কৃত্রিম ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবারই সম্ভাবনা।

দুঃখের বিষয় এই কথা না বুঝিয়া যতীন্দ্রবাবুর মত আরও কেহ কেহ সাহিত্যে পাপমাত্রকেই পরাজিত ও পুণ্যকে জয়যুক্ত করিয়া, পাপীর দণ্ড এবং পুণ্যবানের পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। ইহাকেই Poetic justice বলে। ইহা না হইলে ইহাদের মতে সাহিত্য দুর্নীতিপূর্ণ হয়।

আমার বিশ্বাস সাহিত্যিককে Poetic justiceএর এই বিধান সর্ব্বত্র মানিয়া চলিতে গেলে সাহিত্য সঙ্কীর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে। কারণ Poetic justiceএর কল্পনাই অতিশয় সঙ্কীর্ণতা-প্রসূত, বৃহত্তর জীবনের সহিত তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগ নাই। সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রহস্য হইতেছে দুষ্টের জয়, শিষ্টের পরাজয়: সকলের চেয়ে মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা হইতেছে এই যে, জীবনে দুর্ভাগ্যের ঝঞ্ঝা আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার প্রভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে পাপী ও পুণ্যবান, সৎ ও অসৎ একসঙ্গেই ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ তাহা জ্ঞাত আছেন বলিয়াই Poetic justice সর্ব্বদা অনুসরণ করেন না। Shakespeareএর সর্ব্বপ্রধান tragedy—

পাই, কবি পাপ ও পুণ্যকে একই শোকাবহ ঘটনার মধ্যে সমাপ্ত করিয়াছেন।

অথচ সাংসারিক হিসাবে জয়ী না হইলেও পুণ্যের যে মহত্ত্ব, তাহা তাঁহার রচনার মধ্য হইতেই ফুটিয়া বাহির হইতেছে। Desdemona ও Cordeliaর মৃত্যু হইল বটে—তাহাদের অসাধারণ প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা ও সত্যপ্রীতির জীবনে পুরস্কার লাভ হইল না বটে—কিন্তু Shakespeareএর অদ্ভুত রচনা-কৌশলে আমাদের হৃদয় তাহাদের অসীম দুঃখ ও আপাত পরাজয় দেখিয়াও পুণ্যের প্রতিই আকৃষ্ট হয়, পাপের প্রতি নহে।

সুতরাং সাহিত্যকে সৎ হইতে হইলেই যে সর্ব্বদা Poetic justice রচনার মধ্যে প্রকাশ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। আসল কথা হইতেছে যাহাতে অসৎ প্রবৃত্তির উপর অশ্রদ্ধা এবং সৎপ্রবৃত্তির উপর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, যাহাতে অন্যায় অপেক্ষা ন্যায় এবং পাপ অপেক্ষা পুণ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা হয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে তাহাই করিতে হইবে। সৌন্দর্য্যকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া, বাস্তব জীবন হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া, আর্টের নিয়ম মানিয়া চলিয়া যে উপায় অবলম্বন করিলে ইহা সম্ভবপর হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অবলম্বন করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার রচনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আর টিঁকিবে না। এজন্য কখনও হয়তো পাপকে সংসারে পরাজিত এবং পুণ্যকে জয়ী করিয়া বর্ণনা করিতে হইবে; কখনও হয়তো দুষ্কৃতির আপাত জয়ের মধ্যেও তীব্র অনুশোচনার বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণার চিত্র আঁকিতে হইবে; আবার কখনও সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির চিত্র পাশাপাশি আঁকিয়া সুকৌশলে তাহাদের আপেক্ষিক মূল্য প্রদর্শন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যিক কখনও বা পাপকে জয়ী ও পুণ্যকে পরাজিত করিয়াও পুণ্যের মহৎ দুঃখের মধ্য দিয়াই পাঠকের হৃদয়ে তাহার মহত্ত্বের প্রভাব বিস্তার করিবেন। আবার কখনও বা পুণ্যের চিত্র একেবারে না আঁকিয়া কেবলমাত্র পাপের চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাহার কি শোচনীয় ফল তাহা

উপায় অবলম্বনীয় তাহা তিনি নিজেই নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন। পাপ ও পুণ্যকে আমরা যে বিশিষ্ট সামাজিক বিধান মানা বা না-মানা অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, তাহা বোধ হয় এখানে আর পুনরায় বলিয়া দিতে হইবে না।

সাহিত্যে নৈতিকতাবিষয়ক এই সাধারণ সূত্রগুলি সুপরিচিত কয়েকখানি গ্রন্থের উপর প্রয়োগ করিলে কি ফল দাঁড়ায় তাহা এক্ষণে দেখা যাউক। 'চোখের বালি'কে আমরা দুর্নীতিপূর্ণ বলিতে পারি না, কারণ তাহার ঘটনা হিন্দু-সমাজের যতই বিরোধী হউক না কেন, তাহার মধ্যে প্রেম ও অন্যান্য উচ্চ হৃদয়বৃত্তির মহৎ প্রভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'চন্দ্রশেখরকে' আমরা অসৎ সাহিত্য বলি না, তাহার কারণ শৈবলিনীর কৃত প্রায়শ্চিত্ত নহে তাহার কারণ তাহাতে প্রতাপের নিঃস্বার্থ প্রেম এবং মহৎ আত্ম-ত্যাগের সুরই সকলের উপর ধ্বনিত হইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। বিবাহিতা স্ত্রী পার্ব্বতীর দেবদাসের প্রতি আকর্ষণের কথা এবং বেশ্যা চন্দ্রমুখীর চরিত্র আলোচিত হইলেও 'দেবদাসকে' দুর্নীতিপূর্ণ বলিতে পারি না; কেন না তাহার মধ্যে একদিকে যেমন অসংযমের শোচনীয় পরিণাম, অন্যদিকে আবার কামগন্ধহীন নিঃস্বার্থ আত্ম-বিলোপী প্রেমের চিত্রই লেখক প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ঘরে বাইরে'কে আমরা অপবিত্র বলি না—যে হেতু দুঃসহ অন্তর-বেদনার সঙ্গে লেখক বিমলার অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া নিখিলের প্রতি তাহার প্রেমকে যেমন বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি সন্দীপের আদর্শকে পরিণামে পরাজিত এবং নিখিলের আদর্শকে জয়ী করিয়া সুপ্রবৃত্তিকেই কুপ্রবৃত্তির উপর স্থান দিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' এবং 'গৃহদাহ' নামক পুস্তক দুইখানিই সমালোচকগণ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্নীতিপূর্ণ বলিয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহাও ঠিক নহে। 'চরিত্রহীনের' মধ্যে কিরণময়ী ও দিবাকর ঘটিত অনেকগুলি বিষয়ের বিশদ বর্ণনায় আমরা সমর্থন করি না, আর্টের দিক হইতেও তাহা অনাবশ্যক। কিন্তু এই পুস্তকের প্রধান সুর যাহা তাহা সুনীতির, দুর্নীতির নহে। পতিতা সাবিত্রীর মহৎ

করিয়া লেখক সত্য, ন্যায়, ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। 'গৃহদাহ' সম্বন্ধেও আমাদের ইহাই ব্যক্তব্য। 'অচলা' যে অপরাধ করিয়াছে তাহার মার্জ্জনা নাই; ন্যায়, ধর্ম্ম ও সমাজ কোনো দিক দিয়াই তাহার সমর্থন করিতে পারা যায় না। তবুও এই চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া লেখক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহা আমরা মনে করি না; কারণ তিনি গভীর সহানুভূতির সহিত অচলার দুঃখ-কাহিনী, তাহার পদস্খলনের ইতিহাস বর্ণনা করিলেও তাহাকে তীব্রতম অনুশোচনার প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। পাপের যে কি মহৎ দুঃখ, তাহা ছত্রে ছত্রে পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অচলার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা হয় না বরং তাহার অবলম্বিত পথ যে পাপ-পঙ্কিল, এই ধারণাই আমাদের মনে থাকিয়া যায়।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঙ্কতিলকে'র কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গ্রন্থকার তাঁহার নায়িকাকে সামাজিক হিসাবে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধিনী করিয়া সেই পতিতার চরিত্রে প্রেম ও ত্যাগের অসাধারণ মহত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু পতনের কাহিনী বলিয়াই ইহাকে দুর্নীতিপূর্ণ রচনা বলিতে আমরা রাজী নই; কারণ এক বিষয়ে যাহার অধঃপতন হইয়াছে, অন্যদিকে তাহার চরিত্রও মহৎ ও বরণীয় হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। তবে এই গ্রন্থখানি যে উচ্চশ্রেণীর হয় নাই তাহার কারণ গ্রন্থকারের আর্টের অভাব। নায়িকাকে মর্ত্ত্যে কলঙ্কিনী কিন্তু স্বর্গে সতী-শিরোমণি করিয়া যে লেখক বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। তাই গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে মহত্ত্বের একটী সুর আমাদের কাণে বাজিতে থাকে না।

বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যের নৈতিকতা-বিচারে এই যে সুর, অথবা মনের উপর রচনার এই যে শেষ ছাপ বা impression পড়িয়া যায়, তাহাই একমাত্র মানদণ্ড। গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে অশ্লীলতা থাকিতে পারে, স্থানে স্থানে পাপের কাহিনী অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ ও আপত্তিজনক হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর যদি তাহার মধ্যে মানুষের উচ্চতর হৃদয়-বৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয় এবং সার্ব্বজনীন ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের উপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ না পায়, তবে তাহার আখ্যায়িকা যাহাই হউক না কেন, প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধের যতই তাহা প্রতিকূল হউক না কেন, তাহাকে আমরা দুর্নীতিপূর্ণ বলিব না।

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী।

---

# তুক্

কোঁচানো-পাড় ধুতি পরা, আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে একটী আধাবয়সী ভদ্রলোক ফুট্-পাথে পায়চারি করছিলেন—বিকেল বেলার মিষ্টি হাওয়াটুকু তাঁর হাড়ভাঙ্গা দুপুরে খাটুনির তাপটুকুকে আস্তে আস্তে উড়িয়ে দিচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর চোখের সাম্‌নে গ্যাসের আলোগুলো এক-একটা ফুলের কুঁড়ির মত ফট্ ফট্ করে ফুটে উঠ্‌লো—আর সেই আলোর পরশে পুলকিত হয়ে যেন দুদিককার বড় বড় বাড়ীগুলো ঝকমক্ করে হেসে উঠ্‌তে লাগলো। কাজেই, তাঁর পা যদিও চল্‌ছিল ফুটপাথ দিয়ে, তাঁর চোখ বেড়াচ্ছিল সেই উর্দ্ধলোকে—যেখানে সার্সি, চম্‌কে উঠে পায়ের দিকে চেয়েই তিনি দেখেন, ছোট্ট একটী মুরগীর ছানা। আর একটু হলেই মাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর কি! কিন্তু এ কি! মুরগীর ছানার কপালে সিঁদুর আর চন্দনের ফোঁটা কেন? কেন, এই কথা যেমন ভাবা, অমনি তিনি 'ওরে বাপ্‌রে' বলে সাত হাত তফাতে লাফিয়ে পড়লেন।

"কি মশায়, কি মশায়?" বলে দু-তিনটি ভদ্রলোক ছুটে এলেন। কিন্তু তিনি উত্তর দেবেন কি, একদৃষ্টে সেই মুরগীর ছানার দিকেই চেয়ে। তাঁর বিস্ফারিত দৃষ্টির পশ্চাদ্ধাবন করে সকলেরই নজর পড়লো সেই মুরগীর ছানার উপর এবং সকলেই প্রায় একবাক্যে বলে উঠ্‌লো—'সর্ব্বনাশ!'

গেল। একজন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লেন—"ভাগ্যিস আপনি দেখালেন, নৈলে—! উঃ, সহরের মধ্যে এই কাণ্ড!" আর একজন আপাদ-মস্তক শিউরে উঠে বল্‌লেন—"হবেই ত। আজ যে অমাবস্যার নিশি।" আর-একজন ইতস্ততঃ ভয়াকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন—"ঐ, ঐ, ঐ দেখুন।"

সকলে নিকটস্থ চৌমাথার দিকে চেয়ে দেখেন, একটা কচুপাতার উপর ছুটো জবাফুল। "এই এখনই করে গেছে, সন্ধ্যার ঝোঁকে। যে মাড়াবে তারই—বুঝেচেন ত?" বলে এই দ্বিতীয় বিভীষিকার আবিষ্কর্তা বিজ্ঞের মত একটা চোখের সঙ্কেত করলেন। ইতিমধ্যে "কি হয়েচে, সাপ না কি?" বলে আরও তিন-চারজন ভদ্রলোক সেখানে এসে জড় হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সকলের অবিবেচনাকে ভর্ৎসনা করে বলে উঠ্‌লেন—"আগে খেয়াল করুন মুরগীর ছানাকে। যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে, একবার যদি গায়ের ওপর এসে পড়ে—" বলেই তিনি অর্থপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে চুপ্ করলেন। যাতে তিনি তাঁর অসমাপ্ত বাক্যকে সমাপ্ত করে ব্যাকরণের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তাই একজন স্নায়ু-দুর্ব্বল বৃদ্ধ প্রশ্ন করে ফেল্লেন, "তাহলে—?"

"তাহলে কি আর রক্ষে আছে? কচুপাত মাড়ালেও যা, এতেও তাই। যার জন্যে তুক্ করা, সে উঠবে চাঙ্গা হয়ে—আর আপনি—।" "থাক্ মশায়, আর বল্‌বেন না—একপাল কাচ্চা-বাচ্চা—ঠায় মারা যাবে। কোন্‌দিকে যাই? এদিকে আস্‌চে না ত? আমি যে আবার ভাল করে চোখে দেখি না। নাতনীটার জ্বর, যাচ্ছিলুম একটা বেদানা কিন্‌তে, তা,—ঐ আস্‌চে না?" বাস্তবিকই মুরগীর ছানাটা দিশেহারার মত এদিক-ওদিক ঘুরে আবার সেখানে ফিরে আসছিল—কেন না সে একবারে শিশু, বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে রাজপথ দর্শন করেনি। সকলে "আস্‌চে—তাড়া করেচে" বলে চেঁচিয়ে উঠে কোথায় আর যাচ্ছেন? পাশেই ছিল এক সিনেমা-হল্, তারই মধ্যে হুড়মুড় করে

"আরে আরে, কারা এ? কি হয়েছে? কে মশায়? কেমন ভদ্রলোক! মাড়িয়ে দিলে। উঃ কি আপদ! দেখ্‌তে দিলে না, বের করে দাও" ইত্যাদি ঘোর কলরবের সঙ্গে গ্যালারী-শুদ্ধ লোক হৈ-হৈ করে উঠে দাঁড়ালো। তাতে আগন্তুকেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁপাতে লাগ্‌লেন—কেন না তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন, আর মুরগীর ছানা তাঁদের চিনে বের করতে পারবে না!

এ বিষয়ে তাঁদের বিচার-শক্তিকে কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না, কেন না মুরগীর ছানা দূরে থাক্, মানুষের পক্ষেই অসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো তাঁদের সনাক্ত করে নেওয়া! ফলে যে যাকে দোষী মনে করলে সে তারই উপর নিজের আক্রোশ মেটাবার চেষ্টা করলে এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক-গ্যালারী লোকে ঠেলাঠেলি ঘুষো-ঘুষি এবং লাঠালাঠি করতে করতে 'পিটে'র উপর গিয়ে পড়লো। 'পিট'স্থ লোকেরা সে অসভ্য গ্যালারী-ওলাদের দুর্বোধ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য নানাবিধ সুশ্রাব্য ভাষা উচ্চারণ করতে করতে 'ষ্টলের' উপর গিয়ে চড়াও হলো এবং 'ষ্টলে'র লোকেরা মাতাল, সাপ, পুলিশ ও অগ্নিকাণ্ড এই চার ঘটনার কোন্‌টা ঘটেচে তা বুঝতে না পেরে, তবে যে কোন একটা ঘটনা ঘটেচে তড়িঘড়ি এই রকম একটা সিদ্ধান্ত করে নিয়ে, ক্ষিপ্রপদে ষ্টেজ, অর্কেষ্ট্রা প্রভৃতি-লণ্ড ভণ্ড করে পড়লো গিয়ে 'অপারেটারে'র ঘাড়ে; অম্‌নি চড়াৎ করে গেল কেটে 'রীলের ফিল্‌ম্' আর কটাস্ করে গেল ইলেক্‌ট্রিক্ আলো নিভে, আর সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অজানা বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে সকলেই একসঙ্গে দরজার দিকে ধাবিত হলো। তখন রাস্তা থেকে দেখা যেতে লাগলো দলে দলে লোক রুটীর মত চ্যাপ্‌টা হয়ে সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আস্‌চে—কারো পিঠের জামা আগাগোড়া লম্বালম্বি চেরা, কারো বা চোখের চশমা গুঁড়ো-গুঁড়ো, কারো বা ঘড়ি ঘড়ির চেন নেই—কারো কপাল দিয়ে দর-দর করে ঘাম ঝরচে, কারো বা মাথা ফেটে হু-হু করে রক্ত ছুটচে, কেউ কাঁদচে, কেউ হাসচে, কেউ বা

পড়েও নিস্তার নেই। সেখানে আর এক দৃশ্যের অভিনয় চলেছে। মুরগীর ছানা যেদিকে ছুট্‌চে, রাস্তার সমস্ত লোক হুড়মুড় করে ছুট্‌চে ঠিক তার উল্টো দিকে—মুরগীর ছানা ফুটপাথে উঠ্‌চে ত মানুষরা নাম্‌চে রাস্তায়, আর মুরগীর ছানা নাম্‌চে রাস্তায় ত মানুষরা উঠ্‌চে ফুট-পাথে। সিনেমার দর্শকবৃন্দ রাজপথের জনস্রোতকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে উচ্ছৃঙ্খল করে তুল্‌লে।

রাজপথের এই আকস্মিক শান্তিভঙ্গ যখন উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করছিল তখন পুলিস-প্রহরীরাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁরা ছুটোছুটি, চীৎকার এবং রেগুলেসনের অভাবে রুলের সাহায্যে সেই তুমুল অশান্তিকে আরও বিপর্য্যয় করে তুল্‌লেন। ঘোড়ার গাড়ী, মোটর, ট্রাম প্রভৃতি নরবাহক যানগুলি দূর থেকে নক্ষত্র-বেগে ছুটে এসে কখনো বা একেবারে থম্‌কে দাঁড়াতে লাগলো, কখনো বা অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে জনতা-ব্যূহ ভেদ করতে লাগ্‌লো। আরোহীরা কখনো বা দাঙ্গা হচ্চে ভেবে তাড়াতাড়ি দরজা জান্‌লা এঁটে দিতে লাগ্‌লেন, কখনো বা যা হোক্ কিছু অজানা বিপদ সম্মুখীন বুঝে হুড়মুড় করে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লেন। এতে করে কেউ কেউ বা হাত-পা ভাঙতে ভাঙতে ভাঙলেন না, কেউ কেউ বা চাপা পড়তে পড়তে পড়লেন না, আবার কেউ কেউ বা কার্য্য-কারণ জানবার পূর্ব্বেই কার্য্যকারণময় ইহলোক পরিত্যাগ করলেন।

একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী ছড়-ছড় শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া, অমনি মুরগীর ছানাটা ভড়কে গিয়ে সেই গাড়ীর ছাদের উপর উড়ে পড়লো—আর সঙ্গে সঙ্গে কোচ্‌ম্যান্ আল্লার নাম নিয়ে তড়াক্ করে দিলে এক লাফ। ঘোড়াদুটো তেমন শায়েস্তা ছিল না। হঠাৎ খাপ্পা হয়ে উঠে নক্ষত্র-বেগে গাড়ীটাকে নিয়ে ফেল্লে একখানা মোটর গাড়ীর উপর। মোটর গাড়ী পিছু হঠতে গিয়ে ধাক্কা লাগালে একখানা ট্রামের সঙ্গে। ট্রামের ড্রাইভারের মাথা ঘুরে যাওয়ায় সে উল্টে পড়ে গেল আর মোটর গাড়ীর মধ্যে যে দুটী স্ত্রীলোক ছিলেন, হয়ে গেলেন অজ্ঞান। সোফারেরও কম চোট্ লাগেনি; সে কাৎরাতে কাৎরাতে ভাঙা হাতে হুইল ঘুরিয়ে, ভাঙা মোটর নিয়ে মেডিকেল কলেজের দিকে ছুট্‌লো—এবং তার পিছনে পিছনে তিন-চারটে লাল-পাগ্‌ড়ি; "রোখ্‌খো শালে রোখ্‌খো—পাক্‌ড়ো সাম্‌নে-ওয়ালা পাক্‌ড়ো" বলে ভীম বিক্রমে ধাবিত হলো। এদিকে ঘোড়ার গাড়ীটাও গিয়েছিল চুরমার হয়ে—ঘোড়া দুটো বোম্ নিয়ে খুন জখম করতে করতে ছুট্ দিলে।

বেশ বোঝা যাচ্ছিল সমস্তই তুকের কাণ্ড—আর তুক্‌টাও নেহাৎ সাদাসিধে গোছের নয়—নইলে এত লোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে কেন!

ব্যাপার যখন এতদূর গড়িয়েচে এবং আরো কতদূর গড়াবে তার ঠিক-ঠিকানা ছিলনা—সেই সময় একজন গোরা খালাসী কারণ-সেবায় তর্ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে সেই দিকে আস্‌ছিল। ঘটনাক্ষেত্রে এসেই তার মনে হল একটা কোন জবর রকমের তামাসা হচ্চে—তাই সে উচ্চৈঃস্বরে 'হুর্‌রো হুর্‌রো হিপ্' দিয়ে তামাসা দেখতে দাঁড়িয়ে গেল। তার পর যখন সে দেখলে, একটা মুরগীর ছানা এপাশ ওপাশ ছুটে বেড়াচ্চে—আর সমস্ত লোক তার কাছ থেকে দৌড়ে পালাচ্চে, তখন সে চট্ করে বুঝে নিলে, ব্যাপারখানা কি। সে বুঝতে পারলে, শয়তান বেটা নরক থেকে বেরিয়ে ফেরার হয়েচে—আর ঈশ্বর ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়েচেন যে, যে তাকে ধরতে পারবে সে হাজার টাকা বখসিস্ পাবে। শয়তান বেটা মুরগীর ছানা সেজে ঘুরে বেড়াচ্চে, সব লোক তা টের পেয়েচে, কিন্তু কারো সাহসে কুলোচ্চে না যে তাকে গ্রেপ্তার করে! তখন সে "I'll bag the devil and eat him up-" বলে মুরগীর ছানাকে তাড়া করলে। তখন সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মুরগীর ছানা চোঁচা সাম্‌নের দিকে দৌড় দিলে—রাস্তার লোক দু'ভাগ হয়ে চিরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিতে লাগলো—কেউ বা উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে লাগ্‌লো—কেউ বা হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লো—কেউ বা নর্দ্দমায় গিয়ে গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু খালাসী মুরগীর ছানার পিছনে ছুটেচে তো ছুটেইচে।

গড়াতে গড়াতে ডিগবাজী খেয়েও ছুটেচে। সে মনে মনে ভাবছিল—"হোক্ না কেন শয়তান, এখন ত মুরগীর ছানা! একবার কেটে কুটে রেঁধে ফেল্‌তে পারলেই,—ব্যস্! লোকে ফাউলের ডেভিল খায়, এ ডেভিলের ফাউল!"

এদিকে মুরগীর ছানাটা হাঁপিয়ে পড়লো—সে আর কত ছুটতে পারে? প্রাণের দায়ে উপায় না দেখে সে তাড়াতাড়ি এক জঞ্জাল-ফেলা ডোলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তখন আর যায় কোথায়? খালাসী ছুটে গিয়ে তাকে ক্যাঁক্ করে ধরে ফেল্‌লে। তারপর তাকে বগলের মধ্যে পুরে বিকৃত স্বরে 'ও গড্, ও লর্ড' গাইতে গাইতে টল্‌তে টল্‌তে সে একটা হোটেলের দিকে চল্‌লো। রাস্তায় সমস্ত লোক অবাক্ হয়ে বলে উঠ্‌লো—"বেটা মরেচে!"

কিন্তু যতক্ষণ তাকে দেখা গেল, সে পড়লোও না, মলোও না। তখন সকলে একবাক্যে সিদ্ধান্ত করে ফেল্‌লে, "বেটা বাসায় গিয়েই মরবে!"

এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবশ্য আমাদের কিছুই বলবার নেই। কারণ এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে জোর গলায় বলা যায়, সে মরেনি! বরং সকলের যখন বিশ্বাস সে মরেচে, তখন ধরেই নেওয়া যেতে পারে, সে মরেচে। তবে এটা ঠিক্, তার মরবার মধ্যে একটু তারিফ আছে—কেন না, সে যদি না তখন মরবার জন্যে এসে পড়তো, তাহলে আরো কত লোককে যে মরতে হতো তা কে বল্‌তে পারে! সে নিজে মরে অনেককে বাঁচিয়ে দিয়েচে!

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

---

# প্রাচীন ভারতের ফল ফুল তরুলতা

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে উদ্ভিদ্-বিদ্যার কোন চর্চ্চা ছিল কি না জানিতে হইলে বেদ স্মৃতি রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে তরুলতার যে বর্ণনা আছে তাহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। ভারতবর্ষ চিরকাল সুফলা ও শস্যশ্যামলা। অধুনা অরণ্যে এবং উদ্যানে যে ফুল ফোটে ও ফল ধরে, প্রাচীন কালেও তাহার অনেকগুলি ফুটিত এবং ধরিত। তাহাদের কতকগুলি কালের করাল গতিতে লোপ পাইয়াছে, আর কতকগুলির নাম এমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে সেগুলি আধুনিক কি প্রাচীন বলা একটু কঠিন। ইহা ছাড়া অধুনা অনেক ফল ও ফুল বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইয়াছে। প্রাচীনকালের ফল ও ফুলগুলির নাম জানা থাকিলে কোন্‌টি দেশের ও কোন্‌টি বা বিদেশের তাহা অতি সহজেই ধরা যাইবে। এই জন্য সেকালের উদ্ভিদের আলোচনা হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া মনে করি।

মনু বলিয়াছেন, "উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ড-

সমস্ত স্থাবর উদ্ভিদ্। মনু উদ্ভিদ্‌কে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) ওষধি—ফল পাকিলে যাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; এবং বহু ফুল ও ফল ধারণ করে তাহারা ওষধি।

(২) বনস্পতি—ফুল ব্যতীত যাহারা ফল ধারণ করে তাহারা বনস্পতি।

(৩) বৃক্ষ—যাহাদের ফুলও হয়, ফলও হয়, তাহারা বৃক্ষ। (৪) লতা, গুল্ম ইত্যাদি।

মহাভারতে সমস্ত উদ্ভিদ্ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে—(১) অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ-জাতি; (২) কুশস্তম্ব প্রভৃতি গুল্ম-জাতি; (৩) বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যাহারা বর্দ্ধিত হয় যেমন পাটলী প্রভৃতি লতা-জাতি; (৪) ভূমি-তলে বিতত কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বল্লী-জাতি; (৫) বংশ প্রভৃতি ত্বক্‌সার-জাতি; ও (৬) উলল প্রভৃতি তৃণ-জাতি। (মহাভারত; অনুশাসন পর্ব্ব)

উদ্ভিদ্ পা (শিকড়) দিয়া ভূমি হইতে রস ও জল পান

হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে যে-সকল বৃক্ষ জন্মিত তাহাদের ভিতর শাল, তমাল, কর্ণিকার, ন্যগ্রোধ ( বটগাছ ) অশ্বত্থ শিরীষ, শিংশপা ( শিশুগাছ ), নিম্ব ( নিম ) দেবদারু, অর্জ্জুন ( ইহা অযোধ্যায় বাঙ্গালায়, মধ্য-ভারতে ও দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর জন্মে; দেখিতে অনেকটা পেয়ারা গাছের মত ), অগুরু, অসন ( পিয়াল গাছ ) আটরুষ ( বাসকগাছ ), কর্ণিকার, কালেয়ক ( দারু হরিদ্রা ); কাশ্মীরী ( গাম্ভিরী বৃক্ষ, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জন্মে, ইহার তক্তা অতি সুন্দর; নানারকম আস্‌বাব তৈয়ারি হয় ) কক্কোলস ( গোলমরিচ ), কুঙ্কুম ( জাফ্‌রান্‌ ), গুগ্‌গুল ( দেবধূপ, ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে জন্মে, ইহার নির্য্যাস হইতে ধূপ হয় ), খদির ( খয়ের ), নারঙ্গ ( গাজর ), চন্দন ( শ্বেত ও রক্ত ), কালেয়ক ( কৃষ্ণচন্দন ), ধাতকী-পিপ্পলী ( পিঁপুল গাছ ) ও উড়ুম্বর ( যজ্ঞডুমুড় ) গাছ উল্লেখ-যোগ্য।

সে কালে ভারত যে সকল ফল ফলিত, তন্মধ্যে আম্র, পানস ( কাঁঠাল ), বিল্ব, ( বেল ), অক্ষোট ( আখ্‌রোট্‌ ), খর্জ্জুর ( খেজুর ) তাল, নারিকেল, বদরী ( কুল ), দ্রাক্ষা, ( আঙুর ), দাড়িম, জম্বু ( জাম ) কদলী ( কলা ), পারাবত ( পেয়ারা ), আম্রাতক ( আমড়া ), কপিত্থ ( কৎবেল ), করমর্দ্দ ( করমচা ), জাতীফল ( জায়ফল ), জম্বীর ( নেবু, জামীর ), তিন্তিরীক ( তেঁতুল ), তিন্দুক ( গাব ), আমলক ( আমলকী ), হরীতক ( হোরতকী ), বিভীতক (বয়ড়া), এলা (এলাচী), পিয়াল ও ইঙ্গুদ এইগুলি প্রধান।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে তরুলতায় যে সকল ফুল ফুটিত, তাহার মধ্যে অশোক, কেতকী ( কেয়া ), বকুল, চম্পক ( চাঁপা ), মালতী, পারিজাত, কিংশুক ( পলাশ ), যূথিকা (যুঁই, শ্বেত ও পীত), মল্লিকা, নবমল্লিকা, করবী, কোবিদার ( রক্তকাঞ্চন ), কুন্দ, নীপ, ( কদম্ব ), কণ্টক ( বোধ হয় বাবলা প্রভৃতি কাঁটাগাছ ), করট ( কুসুম ফুল ), নিশুণ্ডী ( নীল শেফালিকা ), তগর (টগোর) লোধ্র, ধুস্তর ( ধুত্‌রা ) জবাকুসুম ( জবাফুল ), স্থলপদ্ম, কহ্লার ( সাঁপ্‌লা ), পদ্ম ( লাল ), রক্তোৎপল ( শ্বেত ), নীলোৎপল ( নীলপদ্ম ) এইগুলি শোভায় ও গন্ধে সকলের

লতার ভিতরে কুঞ্জ, মাধবী ও বেতস ( বেত ) প্রাচীন কবিদিগের বড়ই প্রিয় ছিল। এইগুলিকে তাঁহারা সহকার তরু এবং অন্যান্য আরও অনেক সুন্দর আখ্যায় রঞ্জিত করিয়াছেন। যে সব লতা বল্লী তৃণ ও গুল্মে ফল ফলিত এবং ঐগুলির ভিতর যাহা মানুষের প্রয়োজনে আসিত, তন্মধ্যে কুষ্মাণ্ড ( কুমড়ো ), অলাবু (লাউ), পটোল, কারবেল্লক ( করেলা, উচ্ছে ), চির্ভিট ( কাঁকুড় ), কিরাত ( চিরেতা ), ইক্ষু, ( আখ ) কসেরুক ( কেশুর ), রক্তালু ( রাঙ্গা আলু ), কীচক ( বাঁশ ) কর্পূর, কাসমর্দ্দ ( কালকাসন্দা নামক গুল্ম ), কাশ, কুশ ও দূর্ব্বা উল্লেখ-যোগ্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত তরুলতার ফল-ফুলগুলিই প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রয়োজনীয় ছিল। ঐ পাদপগুলির নামের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে। যে ফুলটি যত সুন্দর তাহার নামটিও তত সুন্দর হইয়াছে; যে ফলটি যত মধুর তাহার নামটিও তত মধুর হইয়াছে এবং যেটি যেমন তিক্ত নামকরণে সেটিকে তিক্ত করা হইয়াছে। বৃক্ষগুলিরও আকারের গুরু-লঘু-ভেদ অনুসারে নামেরও গুরুত্ব ও লঘুত্ব হইয়াছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতর ফল ও ফুলের শোভাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। আধুনিক সময়ের মত প্রাচীনকালেও সৌন্দর্য্য ভারতবাসী চিত্ত আকর্ষণ করিত। সে সময়ে পাহাড়ে পর্ব্বতে, বনে জঙ্গলে, বিলে ও সরোবরে যে সকল ফুল ফুটিত, তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া সেগুলির শোভা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক সময়ের মত প্রাচীন-যুগেও তাঁহারা সুচারুরূপে ফুল-ফলের উদ্যান এবং আরাম-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিতেন। ঐ উদ্যানে কত গাছ-পালা লতা-পাতা ফুল ও ফল থাকিল। তাহাতে কত রমণীয় পক্ষী মধুর কূজন করিত! হংস সারস মৃগ প্রভৃতি কত পশু-পক্ষী মনের সুখে খেলিয়া বেড়াইত। সকালে সন্ধ্যায় বালক-বালিকা বর-বধূ রাজবালারা আসিয়া রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিতেন। শরৎ ও ঋতুরাজ বসন্তের

শারদোৎসব, বসন্তকালে মদনোৎসব প্রভৃতি কত রমণীয় উৎসবে ঐ উদ্যানগুলি মুখরিত হইত, তাহার অতি সুন্দর বর্ণনা আমাদের প্রাচীন কাব্যে পাই। সেই সঙ্গে যে ঋতুতে যে উদ্যানে যে যে ফল ও ফুল ফুটিত তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। তখন পাহাড়ে পর্ব্বতে নদী ও সরোবরের তীরে মুনিঋষিদের আশ্রমগুলিও ফলে পুষ্পে তরুলতায় অতি সুন্দররূপে বিচিত্র হইত। প্রকৃতির ঐ শান্ত সুশোভন সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাপসেরা জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেন। ফুল দিয়া তাঁহারা দেবতার পূজা করিতেন, আর আশ্রম-তরুর ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহারা বানপ্রস্থ ও যতি অবলম্বন করিলে ফলই তাঁহাদের একমাত্র খাদ্য ছিল। সে সময় যাঁহারা এই ফুল ও তরুলতার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতেন তাঁহাদের বলা হইত ভিষক্। ভিষকেরা বৃক্ষ গুল্ম গাছ-গাছড়া ও শিকড় সংগ্রহ করিয়া যতপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতেন, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তাহার বর্ণনা আছে।

তরুলতার যে প্রাণ আছে আমাদের দেশে খৃষ্টের জন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। মনু বলিয়াছেন, "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ-সমন্বিতাঃ" (মনু ১।৪৯)। ইহাদের অন্তর্হৃদয়ে সংজ্ঞা বা চৈতন্য আছে, ইহারা সুখ-দুঃখ-বোধসমন্বিত। এই প্রমাণটি পরে মহাভারতের যুগে আরও সুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছিল। মহাভারতে ভৃগু ঋষি ভরদ্বাজকে বলিতেছেন—ইত্যেতৈঃ পঞ্চভির্ভূতৈর্যুক্তং স্থাবরজঙ্গমম্। শ্রোত্রং ঘ্রাণং রসঃ স্পর্শো দৃষ্টিশ্চেন্দ্রিয় সংজ্ঞিকাঃ ॥ ঘনানামপি বৃক্ষাণাং আকাশোঽস্তি নসংশয়ঃ। তেষাং পুষ্পফলব্যক্তির্নিত্যং সমুপপদ্যতে ॥ উষ্মতো ম্লায়তে পর্ণং ত্বক্ ফলং পুষ্পমেবচ। ম্লায়তে শীর্য্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে ॥ বায়্বগ্ন্যশনিনির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতে। শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দঃ তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ ॥ বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্ব্বতশ্চৈব গচ্ছতি। ন হ্যদৃষ্টশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎপশ্যন্তি পাদপাঃ ॥ পুণ্যাপুণ্যৈস্তথা গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি। অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তি অস্মাজ্জিঘ্রন্তি ব্যাধিপ্রতিক্রিয়াত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে। বক্ত্রেণোৎপলনালেন যথোর্দ্ধ্বং জলমাদদেৎ। তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ ॥ সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্যচ বিরোহণাৎ। জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণাং অচৈতন্যং ন বিদ্যতে ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৮৪ অধ্যায়।

অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেই ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্‌-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত আছে, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে এবং ইহাদের সংস্পর্শে সকল ভূতের শব্দ স্পর্শ রস রূপ ও গন্ধ বোধ হইয়া থাকে। বৃক্ষগণ নিবিড় সংযোগবিশিষ্ট হইলেও তাহাতে আকাশ আছে, কারণ সর্ব্বদাই বৃক্ষে ফল ও ফুল ফুটিতেছে। বৃক্ষের ভিতরে বোধ হয় অগ্নিও আছে, কারণ উষ্মাবশতঃ ইহাদের ছাল পাতা ফুল ও ফল ম্লান হইয়া যায়, পাদপ ম্লানিযুক্ত ও শীর্ণ হয় বলিয়া নিশ্চয় তাহাতে বাতাসও বিদ্যমান আছে। বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে বৃক্ষদিগের ফল ও ফুল বিশীর্ণ হয়; অতএব যখন শ্রোত্রদ্বারা শব্দজ্ঞান জন্মে তখন নিশ্চয়ই তাহারা শ্রবণ করে। লতা যখন বৃক্ষকে বেষ্টন করে এবং সর্ব্বদিকেই গমন করে তখন পাদপদিগের অবশ্য দর্শনশক্তি আছে, কারণ যাহাদের দর্শন-শক্তি নাই তাহারা গমন করিতে পারে না। পবিত্র এবং অপবিত্র নানাপ্রকার গন্ধ এবং ধূপ দ্বারা তরুলতা নীরোগ ও পুষ্পিত হয় সুতরাং তাহারা নিশ্চয়ই আঘ্রাণ করে। পাদপেরা মূল দিয়া জল আকর্ষণ করে; তাহাদের ভিতর ব্যাধি ও তাহার প্রতিক্রিয়াও হয় বলিয়া বৃক্ষের রসনাশক্তি আছে স্বীকার করিতে হইবে। বৃক্ষের সুখদুঃখের জ্ঞান আছে, ছিন্ন হইলে ইহাদের পুনরায় উৎপত্তি হয়; অতএব ইহাদের জীবন এবং চৈতন্য আছে। শিকড়দ্বারা যে জল আকর্ষণ করে, অগ্নি ও বায়ু তাহা জীর্ণ করিয়া থাকে এবং আহারের পরিমাণ অনুসারেই বৃক্ষের স্নিগ্ধতা ও বৃদ্ধি হয়।

ভৃগুর ঐ সুন্দর প্রমাণ কয়টি হইতে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে তরুলতা প্রভৃতি যাবতীয় উদ্ভিদে ক্ষিতি অপ তেজ ও মরুৎ ও ব্যোম্ এই পঞ্চভূত সন্নিবেশিত আছে; উহাদের চক্ষু ও কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ আছে

গন্ধ পাইয়া থাকে। বৃক্ষের প্রাণ এবং চৈতন্য-বোধ আছে। ভৃগু আরও বলিতেছেন, "ত্বক্ চ মাংসং তথাস্থীনি মজ্জা স্নায়ুশ্চ পঞ্চমম্। ইত্যেতেদিহ সংঘাতং শরীরে পৃথিবীময়ম্ ॥"

( মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৮৪ অঃ )

অর্থাৎ গাছপালার শরীরে ত্বক্ মাংস অস্থি মজ্জা ও স্নায়ু এই পাঁচটি পার্থিব পদার্থই বিদ্যমান আছে।

বৃক্ষের প্রাণ আছে বলিয়া পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মে ( তাঁহারা অহিংসা ধর্ম্মটিকে অতি উচ্চ স্থান দেন ) বৃক্ষ হইতে ফুল কিংবা ফল চয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যে সকল ফল পাকিয়া ভূমিতলে পতিত হয় অথবা যে ফুলগুলি আপনা হইতেই বৃন্তচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায় সেই ফল ভক্ষণ এবং ঐরূপ ফুল দিয়া দেবতার পূজার প্রথা তাঁহাদের ধর্ম্মে আছে। প্রাচীন ভারতবাসীরা ঘোর জন্মান্তরবাদী ছিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মানুষ যেমন স্বকীয় কর্ম্মফলে কখন নীচ কখন বা উচ্চ যোনি লাভ করে, সেইরূপ তরুলতাগুলিও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অধর্ম্মের ফলে এজন্মে লতা বা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের নিকট পাদপ অতিশয় প্রিয় ছিল। বৃক্ষের প্রাণ আছে বলিয়াই হউক্ কিংবা বৃক্ষ ও লতাগুলি অম্লান চিত্তে ফল ও পুষ্প দান করিয়া নীরবে নিঃশব্দে মানুষের সেবা করে বলিয়াই হউক পুরাকালে হিন্দুরা তরু-লতা বড়ই ভালবাসিতেন। দুগ্ধবতী গাভীকে তাঁহারা যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, ফলবতী তরু অথবা পুষ্পিতা লতাকেও তাঁহারা সেইরূপ স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে অবলোকন করিতেন। পাদপ রোপণ, বৃক্ষদান ফলদান, পুষ্পদান, ফলব্রত ও পুষ্পব্রত তাঁহারা অতিশয় পুণ্যজনক বলিয়া মনে করিতেন। পথিকদিগের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে সরোবর খনন করিয়া তাহার চারিপার্শ্বে ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিতেন। পথের দুই ধারেও গ্রীষ্মে ছায়া ও ক্ষুধায় ফলদান করিবার জন্য মানুষের সেবার নিমিত্ত নানারকম তরুলতা রোপণ করিতেন। পথিকেরা ঐরূপ সুশীতল ছায়া শীতল জল ও লাভ করিত। মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

এতা জাত্যস্তু বৃক্ষাণাং তেষাং রোপে গুণাস্তমে।
কীর্ত্তিশ্চ মানুষে লোকে প্রেত্য ফলং শুভম্ ॥
লভতে নাম লোকে চ পিতৃভিশ্চ মহীয়তে।
দেবলোকে গতস্যাপি নাম তস্য ন নশ্যতি।
পুষ্পৈঃ সুরগণান্ বৃক্ষা ফলৈশ্চাপি তথা পিতৃন্।
ছায়য়া চাতিথিং তাত পূজয়ন্তি মহীরুহাঃ ॥
কিন্নরোরগরক্ষাংসি দেবগন্ধর্ব্বমানবাঃ।
তথা ঋষিগণাশ্চৈব সংশ্রয়ন্তি মহীরুহান্ ॥
পুষ্পিতাঃ ফলবন্তশ্চ তর্পয়ন্তীহ মানবান্।
বৃক্ষদং পুত্রবদ্‌বৃক্ষাস্তারয়ন্তি পরত্র তু ॥
তস্মাত্তড়াগে সদ্‌বৃক্ষা রোপ্যাঃ শ্রেয়োর্থিনো সদা।
পুত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ পুত্রাস্তে ধর্ম্মতঃ স্মৃতাঃ ॥

( মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ৫৮ অধ্যায় )

বৃক্ষ রোপণ করিলে মানুষ গুণবান্ হয়, মনুষ্যলোকে কীর্ত্তি লাভ করে এবং পরলোকে শুভফল প্রাপ্ত হয়। যিনি বৃক্ষ রোপণ করেন তিনি পিতৃগণের সহিত একত্র বাস করেন, দেবলোকে গমন করিলেও তাঁহার নাম লুপ্ত হয় না। তাত, বৃক্ষ পুষ্পদ্বারা দেবতাদিগের, ফলদ্বারা পিতৃদিগের এবং ছায়া দ্বারা অতিথির পূজা করে। কিন্নর উরগ, দেব, গন্ধর্ব্ব, মানব ও ঋষি ইহারা সকলে বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকেন। পুষ্পিত ও ফলিত তরুলতা ইহলোকে সকল মানুষকে পরিতৃপ্ত করে এবং পরলোকে পুত্রের ন্যায় বৃক্ষদাতাকে পরিত্রাণ করে। অতএব কল্যাণকামী মানব তড়াগের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা সুন্দর তরু-লতা রোপণ করিবে এবং সেইগুলিকে পুত্রের ন্যায় পালন করিবে; কারণ ধর্ম্মতঃ তাহারা পুত্ররূপে স্মৃত হইয়াছে।

সেকালে নিজের পুত্রের জন্ম হইলে জাতকর্ম্ম, নামকরণ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রোক্ত আচার গৃহস্থ পালন করিতেন, পাদপ রোপণ এবং প্রতিষ্ঠা করিবার সময়েও তাঁহাদিগকে ঠিক্ সেইরূপ আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকাণ্ড পালন করিতে হইত। বৃক্ষ-রোপণ উপলক্ষে ঋত্বিক, মণ্ডপ, দ্রব্যসম্ভার ও

দিগকে পূজা করিতে হইত। তারপর রোপণ করিবার বৃক্ষগুলিকে জলে ধৌত করিয়া তাহার উপর রঞ্জিত তণ্ডুলচূর্ণ ছড়াইয়া যজমান মাল্য এবং বস্ত্রে ঐগুলি বেষ্টন করিতেন। সুবর্ণ সুচীদ্বারা বৃক্ষগুলির কর্ণবেধ করিয়া তাহাদের উপর অঞ্জন অর্পণ করিতেন। সাতটি কি আটটি সোনা বা রূপার ফল নির্ম্মাণ করিয়া বৃক্ষবেদীর উপরে রাখিতেন। সমস্ত বৃক্ষগুলির নীচে এক একটি করিয়া কুম্ভ স্থাপিত হইত। ঐ কুম্ভগুলি স্বর্ণ বস্ত্র ও গন্ধানুলেপন দ্বারা ভূষিত করা হইত। ব্রাহ্মণগণ লোকপাল ও বনস্পতিকে বলি নিবেদন করিয়া হোমকার্য্য সমাধা করিতেন। একটি দুগ্ধবতী গাভীকে শুক্লবসনা ও স্বর্ণভূষণা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তারপর ধূপ, দীপ, বাদ্য ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বে স্থাপিত কুম্ভ সমূহের জলে বৃক্ষগুলিকে স্নান করান হইত। এই মঙ্গলকর কার্য্যে যজমান, ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা দান দক্ষিণা ও ক্ষীরদ্বারা তৃপ্তির সহিত চারিদিন ভোজন করাইতেন, এইরূপে প্রাচীনকালে পাদপ প্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষোৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইত।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই তখন ভারতবর্ষে তরুলতার কত আদর ও যত্ন ছিল। যে সকল তরু দেখিতে সুন্দর এবং আকারেও মহান, ভারত-বাসীরা সেই তরুগুলিকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মূর্ত্তি ভাবিয়া পূজা করিতেন। ঐ বৃক্ষের পূজা সেকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে। এখনও হিন্দু গৃহস্থ বট এবং অন্যান্য কয়েকটি বিশাল বৃক্ষকে সিঁদুরে রঞ্জিত করিয়া পূজা করেন। প্রাচীন কালে ফলবান বৃক্ষ রোপণ যেমন পুণ্যজনক ছিল, শত্রুতা, হিংসা, ঈর্ষা কিম্বা অন্য কোন কারণে বলশালী বৃক্ষচ্ছেদন সেইরূপ পাপকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। গৃহস্থের উদ্যানের অথবা মুনিঋষিদের আশ্রমের তরু ছেদন করিলে তখন লোকে রাজবিচারে কঠোর দণ্ড পাইত। এমন কি যুদ্ধের সময়েও নরপতিগণ দেশ জয় করিয়া বিজিত দেশ বা জনপদের ফলিত ও পুষ্পিত তরুলতার উপর হস্তক্ষেপ করা অধর্ম্ম এবং নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন।

শ্রীক্ষীরোদমোহন চক্রবর্ত্তী।

---

# পতিতা

বেশ্যা আমি—ঘৃণ্য পেশা—দেহের ব্যবসায়,
জাত কুল মান ভাসিয়ে বেবাক্ দিলেম দরিয়ায় ;
লোক সমাজের আঁস্তাকুড়ে আমরা করি বাস,
একটানা ঘোর পাপের স্রোতে ভাসচি বারোমাস,
কোন্ ঠিকানায় ভিড়বো যে শেষ, নেই ঠিকানা তার,
আলোক-বিহীন কোন্ নরকে ভীষণ অন্ধকার !
কামড়াবে সাপ মারবে মুগুর ডাঙস অনুক্ষণ ;
জ্বলবে আগুন ধূ-ধূ-ধূ—শিউরে ওঠে মন !

কে যাবি রে অধঃপাতে ? কে যাবি রে ?—আয় !
পৌছে দেবো সটান্ সেথা দু-চার রুপেয়ায়,
আমরা মায়া-সোনার হরিণ ভুবন-কাননের,
পুরুষ-ধরা ফিকির জানি বিবিধ বরণের,
নিশ্বাসে মোর বিষিয়ে ওঠে বিশ্বে চারিধার,
সাম্‌লে চলো সাধু তুমি সামনে হুঁসিয়ার,
ওৎ পেতে ঠিক আগ্‌লে ঘাঁটি ডাকচি ইসারায়—
কে যাবি রে অধঃপাতে ? কে যাবিরে ?—আয় !

বাঘের চেয়ে হিংস্র মোরা—সাপের চেয়ে ক্রূর,
লজ্জা ঘৃণা নেই আমাদের, নেই মায়া—নিঠুর,
গুণ্ডা মাতাল—এরাই মোদের সঙ্গী সহচর,
আমীর মোরা ফকির করি—স্ত্রীকে স্বামীর পর,
দণ্ডবিধি আইন বইএর চোদ্দ আনা পাপ—
দেখবে তাতে মার্কা মারা মোদের হাতের ছাপ,
সুখের ঘরে লাগিয়ে আগুন হাত-তালি দিই তাই,
হোঃ হোঃ হোঃ এই আমাদের জাতের ব্যবসাই !

কেমন করে সব খোয়ালেম ?—জাত মান শীল কুল—
এক মিনিটের ভুল সে যে গো—এক মিনিটের ভুল !
গোপন ছিল পায়ের নীচে চোরা বালির চর,
না জেনে যেই পা দিয়েছি—মরবি ত ঠিক মর্ !
নেমে এলেম অধঃপাতের ক্রমে এক এক ধাপ,
বৃথা এখন বিলাপ-রোদন—বিফল অনুতাপ !
এক মিনিটের ভুল ওগো সেই—এক মিনিটের ভুল !
ভাসিয়ে দিল অকূল জলে জাত মান শীল কুল !

এমন ভরা ডুবি হবে—স্বপ্ন-অগোচর,
বিনা মেঘে বজ্রপতন—ভাবলে আসে জ্বর !
তখন আমার কাঁচা বয়েস কাণ্ডাকাণ্ড-হীন,
শাশ্‌ড়ি স্বামী ননদ নিয়ে কাটতেছিল দিন,
মা পাঠাতো তত্ত্ব কত ভাইরা নিত খোঁজ,
দুপুর বেলা সঙ্গী মিলে গল্প হতো রোজ,
করতো স্বামী কত আদর—তুলনা তার নাই,
মনে হতো মুঠোর ভেতর গোটা স্বর্গ টাই।

তাঁরেও আমি ভালো বাসতেম্—বাসতেম ভালো খুব,
এক গলা এই পাপের পাঁকে দিইনি তখন ডুব।
সে দিনের সেই প্রণয়লীলা মান-অভিমান-ছল
পড়লে মনে আজো চোখে গড়িয়ে আসে জল,
ইচ্ছে করে দৌড়ে গিয়ে লুটুই পায়ে তাঁর,
দণ্ড নিই তাঁর চরণ-আঘাত বক্ষে আপনার,
হায় কুলটা কলঙ্কিণী ! কেমন করে মুখ
করবি রে বার সম্মুখে তাঁর ?—জ্বলচে, জ্বলুক বুক !

দিয়েছিল বিধি আমায় রূপ—হোলো সেই কাল,
আজ বাজারে বেশ্যা আমি—নেই চুলো নেই চাল !
চলতে পথে ঘাটে আমায় দেখতো চেয়ে লোক,
পাড়ার যত নষ্ট ছোঁড়া হান্‌তো নজর চোখ,
জানলা দিয়ে ছুড়তো চিঠি, কেউ বা দিত ফুল,
ভাবতুম, তাদের এ কী রকম আহাম্মুকি ভুল !
শুনলে স্বামী হাসতেন শুধু টিপে টিপে মুখ,

সে দিন মোটে হয় নি মনে গরব করতে নাই
যে অবধি না নারীর দেহ পুড়বে হবে ছাই,
তাই বুঝি মোর সকল দর্প সকল অহঙ্কার
ভাঙলে বিধি ! সেলাম তাঁরে সেলাম শতেক বার !
সন্ধেবেলা আনতে গেছি দিঘির ঘাটে জল,
লোক-জন নেই বইচে হাওয়া ফুলের পরিমল,
এমন সময় দেখি চেয়ে হঠাৎ অকস্মাৎ,
গাঁয়ের জমিদারের ছেলে ধরলে এসে হাত !

পড়লো সোজা ঘাড় ঘেঁসে ঠিক ঝোপ্ বুঝে সেই চোপ্,
ছাঁৎ করে বুক উঠলো আমার—বাক্যি হলো লোপ,
বাধা দেবার শক্তি সাহস মনের যত জোর
মন্ত্রে যেন উবে গেল করলে চুরি চোর !
তয়ের গাড়ী আমায় নিয়ে লম্বা দিলে ছুট,
শয়তান আর শয়তানীরা পাড়লে হরির লুট !
এই সহরে—আজব সহর—ঘুরে কতই মোড়
হাজির হলুম তিনি আমি—দুটি মাণিক জোড় !

এরেই বলে হিপনটিসম্ ?—এরেই বলে ঠিক্,
রইল না জ্ঞান কোন-কিছুর—কোনটা দিগ্বিদিক,
আমার কথা তোমরা সবাই করবে অবিশ্বাস,
ভাববে এ এক তৈরী গড়া মিথ্যে ইতিহাস,
নিজের সাফাই গাইচি আমি ! নয় ওগো, তা নয়,
মিথ্যে আমি কইব কেন ? কিসের লজ্জা ভয় ?
গুপ্ত ছিল হয়তো আমার সুপ্ত চেতনায়
লালসার এই বিষের চারা ফোটায় অপেক্ষায় !

ওলোট্ পালোট্ হলো জীবন—ঘটলো বিপর্যায়,
আগাগোড়া বদলে গেলুম—সে আমি সে নয় !
লাল করে ঠোঁট ছাঁচি পানে গালে দিলুম রং,
শিখে নিলুম হাব ভাব সব কায়দা করণ ঢং,
গরম গরম চপ্ কাট্‌লেট হুইস্কি বিয়ার রাম—
দিনের পরে দিন চলে যায়, চল্লো অবিশ্রাম !
রাখলে বাবু মাইনে করে গাইয়ে এক ওস্তাদ,

আসবাব সব নতুন হলো—সজ্জা সরঞ্জাম,
সাড়ি সেমিজ ক্রচ ব্রেসলেট—অনেক টাকা দাম।
গা-ঢাকা-গোছ সন্ধে হলে মাঠের দিকে প্রায়
ট্যাক্সি চড়ে হাওয়া খেতে যেতেম দুজনায়,
ফুর্ ফুর্ ফুর্ লাগতো হাওয়া জমতো নেশা বেশ,
এলিয়ে পড়ে রাত দশটায় ফিরতেম আমি শেষ,
হঠাৎ তিনি ফেরার হলেন ভাগলেন নিজের গাঁয়,
দোস্‌রা বাবু রাখলে বাঁধা দোস্‌রা ঠিকানায়!

কি হবে আর খুঁটিয়ে কয়ে পাপের ইতিহাস?
তলিয়ে গিয়ে ক্রমেই দেখি শেষটা সর্ব্বনাশ,
জমিদারের ছাওয়াল যিনি করলেন আমায় বার,
আজকে তিনি সমাজ-নেতা কাউন্সিলে মেম্বার!
কন্যাদায়ে বন্যাদায়ে মুক্ত তাঁহার হাত,
বলিহারি সাবাস তাঁরে—ক্যাবাৎ! ক্যাবাৎ!
এক-যাত্রায় পুরুষ নারীর ফললো পৃথক ফল,
বেঁচে থাকো সমাজ তুমি—নাড়চো খাসা কল!

নরকের এই পিছিল পথে দৈবে যারা হায়,
পা দিয়েছে প্রলোভনের প্রবল তাড়নায়
ভুল করেছে অসাবধানে—সুযোগ অবসর
সমাজ কোথা দেবে তাদের, যাতে অতঃপর
আর না তারা করতে পারে তেমনতর ভুল—
তা নয় সমাজ তাদের বুকে হানচে বজ্রশূল!
বন্ধ করে দিচ্চে তাদের শুধরে নেবার পথ!
বেঁচে থাকো সমাজ তুমি, তোমায় দণ্ডবৎ!

* * * * *

আজ বাবুকে ফিরে যেতে বল্‌লো বেলা বল্,
ও চামেলি কোথায় গেলি—দেনা একটু জল,
বুকের ভিতর বড্ডো কেমন করচে আমার ভাই,
একটু দে ভাই স্রেফ শাদা জল—আমি যে তাই চাই;
দূর করে দে—আনলি ও কি?—সইচে না ওর ঝাঁজ,
কচ্চে পাঁজর কন্ কন্ কন্—পড়চে ছিঁড়ে আজ
শিরগুলো সব পট্ পট্ পট্—কর্‌লো পাখা কর্,
হ্যাখ্ হ্যাখ্ হ্যাখ্ হ্যাখ্‌লো চেয়ে দাঁড়িয়ে আমার বর!

ঐ যে শুচিশুভ্র তাঁহার অকলঙ্ক মুখ!
ঐ যে তাঁহার দিব্য কান্তি সুপ্রশস্ত বুক!
হ্যাখ্ হ্যাখ্ হ্যাখ্ হ্যাখ্ লো চেয়ে—পাস্‌নে তোরা ডর,
ঢের দিয়েচিস বরফ মাথায়—আস্তে বাতাস কর্;
ঐ বুঝি ঐ দেখতে পেলেন আমায় তিনি ঐ,
পালাই কোথা! পালাই কোথা! লুকিয়ে কোথা রই!
ঐ যা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!—দে ভাই একটু জল,
বাবুকে আজ ফিরে যেতে বল্‌লো বেলা বল্।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

---

# প্রজাপতি

মা,

এই চিঠি তুমি পড়বে কিনা জানি না। হয় ত ছিঁড়ে তোমার মখমলের জুতোর তলায় মাড়িয়ে আয়াকে হুকুম দেবে, এর ছেঁড়া পায়ে-দলা টুক্‌রোগুলোকে নর্দ্দামায় ফেলে দিতে! হয় ত পড়তেও পার! যতই মেম সাহেব হও না কেন মা, তোমার বুকের কোণে যে ছোট্ট মায়ের প্রাণটি লুকানো আছে, সে হয় ত মেয়ের কথা শোন্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব, তোমার বাইরের শত মেম-সাহেবী-আবরণ-সত্ত্বেও।

আমি যে কৌশিককে বরণ করেছি তোমাদের সকল বাধা সত্ত্বেও, সে কি ভয়ানক মনে হচ্ছে? সত্য কথা বল্‌তে কি, তোমার যে কি মনে হবে, সে কথা আমার একবারো মনে হয়নি। মেয়ে মায়ের কথা ভাবেনি—ভারি কেমন-কেমন নয় কি? তবু সেটা সত্যি! আর আমি যে

কেন তোমার কথা ভাবিনি, আর আজ যে কেন মনে হচ্ছে এক কৌশিক ছাড়া আমি আর সকলের কথা ভুলে যেতে চাই, এ দেখে একটুও আশ্চর্য্য হয়ো না। মেয়ের কাছে যে বাঙ্গালী-মায়ের মা হবার চেয়ে 'মমি' হবার সখ বেশী, তার মমি-হৃদয় এ কথা না বুঝলেও, যে সত্যিকারের মা, সে এ কথা বুঝ্‌বে।

আমার শিক্ষার জন্য, আমার বিলাসের জন্য; আমায় সামর্থ্য-হীন অপটু প্রজাপতি করে গড়ে তোলবার জন্য তোমরা যত টাকা খরচ করেছ, কৌশিককে বরণ করায় তোমাদের কাছে সেটা ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে! ভারী অকৃতজ্ঞ মনে করেছ আমাকে, মা? কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, আমার এই কুঁড়ে ঘরে তোমাদের পয়সার একটী কণাও প্রবেশ করেনি, তোমার দেওয়া কোন জিনিষই আমি সঙ্গে আনি নি। এনেছি শুধু অতীতের অতৃপ্ত উন্মত্ততার শেষ রেশের ছায়াটুকু—সে জন্যেও কি কৃতজ্ঞ হবার দরকার আছে?

আমার এই গরীব ঘরকন্নায় কৌশিক আমাকে সব দিয়েছে—আমার সকল অপূর্ণতাকে পূর্ণ করেছে। কি চাই আমি, জানো মা? আমার যে শৈশব তোমরা পুড়িয়ে খেয়েছ, সেই শৈশব চাই আমি, এমনি শান্তির আলয়ে। সম্ভব যদি হোত, কৌশিকের কাছে আমি তাও পেতাম! কিন্তু তা সম্ভব নয়।

শৈশবে সবাই মা পায়, কিন্তু 'মমি' আমার, আমি সত্যিকারের মাকে পাইনি। পোষাকে আর পাউডারে, হিন্দীতে আর অদ্ভুত ইংরাজীতে, সোসাইটিতে আর পার্টিতে তুমি ছিলে লাট সাহেবের চেয়েও দূরে; আর গভর্ণেসে আর আদব-কায়দায় আমাকেও তুমি যা গড়ে তুলেছিলে, সেই আমার সঙ্গে আর আমাদের এই গরীব-খানার চার পাশে যে স্ফূর্ত্তিমান শিশুর দল নেচে বেড়ায়, তাদের সঙ্গে যে কতখানি তফাৎ, তা' ফ্যাসানের ওই উঁচু আসনে বসে তুমি ধারণাও কর্‌তে পারবে না!

শৈশবের সেই আদব-কায়দায় গড়া পুতুলকে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যা শেখাচ্ছিলে, স্পষ্ট ভাষায় বল্‌লে হয় ত তা খারাপ শোনাবে,—শেখাচ্ছিলে মেয়ের নিজের কোন অস্তিত্ব নেই। তার যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা সব ওই টাকা-রোজগেরে পুরুষের মন হরণ কর্‌তে। তোমরা শেখাচ্ছিলে—মেয়ের একমাত্র কর্ত্তব্য কোন একজন অবস্থাপন্ন পুরুষকে জালে ফেলা, শেখাচ্ছিলে মেয়ে-জীবনের এই প্রধান যজ্ঞের জন্য পাউডার, রুজ, শিল্ক, সাটিন প্রভৃতি দিয়ে তাকে প্রজাপতি সাজাবার মন্ত্র!

প্রজাপতি মা আমার, আমার স্বর্গগত বাবাকে কি তুমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলে? না, বাবার অগাধ টাকা দেখে? সত্য করে বল্‌বার সাহস আছে? আমি বল্‌তে পারি। আমাদের জীবনের প্রতিটি দিন কি আমায় তোমাদের মধ্যকার প্রকৃত সম্বন্ধের সাক্ষ্য দেয়নি? আর সেই জন্যই সেদিন তুমি কৌশিককে বড় গলায় বল্‌তে পেরেছিলে—ভালবাসার অস্তিত্ব নেই। ওটা নাকি মোহ, চোখের একটা নেশা! অভাগী মা আমার, ভালবাসা কোন দিন অনুভবও করনি?

কৌশিককে পেতে আমি এই সব ফেলে এসেছি। তোমাকে ফেলে এসেছি, তোমার প্রজাপতির দলকে ছেড়ে এসেছি, তোমার রোল্‌স-রয় গাড়ী ফেলে এসেছি, তোমার ঘরের সিগারেটের ধোঁয়া ফেলে এসেছি। আর কি ফেলে এসেছি, জান? চম্‌কে উঠো না—তোমার circle এর ইংরাজী Flirting।

এই সব ফেলে আস্‌তে আমার কি কষ্ট হয়েছে? তা যদি মনে করে থাকো, তবে তুমি কৌশিককে চেনোনি। তুমি বুঝি ভাব্‌চো, এই ছেঁড়া কাপড় পরা কালো গরীব ছেলেটার মধ্যে এমন কি আছে, যা আমাকে আজ তোমাদের কাছে বিদ্রোহী করে তুলেছে? ও যেদিন আমাদের কাছে প্রথম এসেছিল, মনে আছে মা? আমাদের গাড়ী চাপা পড়ে এক মাসের ওপর হাঁসপাতালে ভুগে, তোমার কথা-মত তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিল। তুমি বুঝি ওকে চাকরি পেতে সাহায্য কর্‌বে, বলেছিলে। আমার মনে আছে, সেদিন তাকে কি দুর্ব্বলই দেখাচ্ছিল। তবুও তার চোখের সে দীপ্ত ভাব আমার কাছে ভারী সুন্দর মনে হয়েছিল। আমাদের circle এর কোনো ছেলে অমন সতেজে চাইতে পারে না—একজনও না!

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, মদটদ খাও না ত? ও শুধু উত্তর দিয়েছিল—না। কিন্তু বলেনি যে ও পানও খায় না। নিজের কথা বেশী স্পষ্ট করে ও কাউকে বলে না—আমাকেও না। জানো মা, কি জন্য ও কাজ করিতে এসেছিল? আমার তোমার কাছে অসম্ভব মনে হলেও ও চাকর হতে এসেছিল, ওর মা-ভাইকে খাওয়াবার জন্য। যেদিন সে কথা আমার কাছে বলেছিল, চাকরী করার ঘৃণায় ওর দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়েছিল, অথচ মাকে সুখে রাখ্‌তে পারছে, এ আনন্দে ও ভরপুর! মানুষ যে পরের জন্য নিজের আশা-ভরসা সম্মান সমস্ত জলাঞ্জলি দিতে পারে, সেদিন আমি তা প্রথম দেখলাম। মানুষ তার মাকে, তার ভাইকে যে কত গভীর ভালবাসতে পারে, কৌশিকের মুখে আমি তা প্রথম শুন্‌লাম। আর-একজনের হিতের জন্য নিজের স্বার্থকে কেমন করে বলি দিতে হয়, কৌশিকের কাছে তা প্রথম দেখ্‌লাম। বিশ্বাস করো মা, দেখে বিস্ময়ে আমার বুক ভরে উঠলো। সেই দিন থেকে ওকে আমি ভালবাসি—ওকে না ভালবেসে কি কেউ থাকতে পারে, মা?

তারপর একটু একটু করে আমি ওকে চিন্‌তে পেরেছি। ওর মধ্যে আমি দেখ্‌তে পেয়েছি এমন একটী সরল সুন্দর প্রাণ, যার অস্তিত্ব তোমরা কল্পনাও কর্‌তে পারো না।

এই কৌশিকের প্রাণ আমার ভেতরে কি পরিবর্ত্তন এনেছে, জানো মা? তোমার মেয়ের প্রজাপতির ডানা ঝরে গিয়েছে, বিলাসের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তোমাদের জীবন-যাত্রার ধারা আজ তার চোখে ঘৃণ্য পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। কৌশিককে আমি ভালবাসি।

তোমার কাছে যেদিন গিয়ে ও আমাকে চেয়েছিল—তুমি বলেছিলে, ভালবাসা একটা স্বপ্ন!

আজ মনে হচ্ছে, এই স্বপ্নও যদি কোন দিন দেখ্‌তে মা, প্রজাপতি হবার সখ তা হলে থাকৃত না। প্রজাপতি মা আমার, আজ আমার কি মনে হচ্ছে, জানো? কৌশিক যদি আমার স্বপ্ন হয়, তবু এই স্বপ্নের স্মৃতি আমায় আজীবন তোমার মত প্রজাপতি হবার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে। স্বপ্ন দিয়ে গড়া এই গরীবখানা একদিন দেখ্‌তেও কি তোমার সাধ হবে না, মা? পাউডার, সিল্ক, আর রোলস্‌-রয় ছেড়ে যদি কোন দিন আস্‌তে পার, মেয়ের ঘরে তোমার নেমন্তন্ন রইল।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

---

# চয়ন

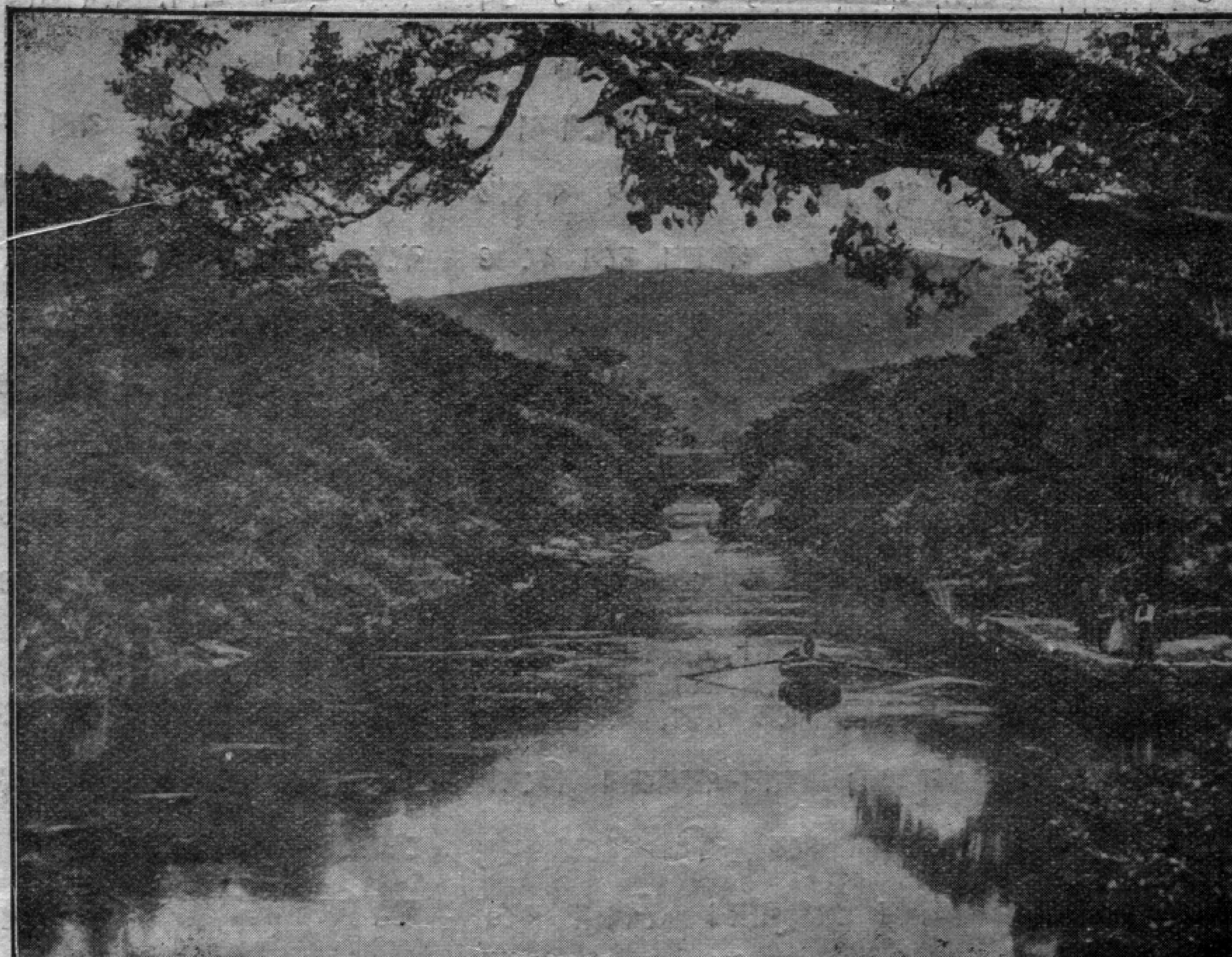
## মোটরে ভূ-প্রদক্ষিণ

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক মার্কিন সাহেব মোটরে করে ভূ-প্রদক্ষিণে বেরিয়েছিলেন, এই যাত্রায় তাঁর স্ত্রীও সঙ্গিনী ছিলেন। সাহেবের নাম গ্লীডেন। দশ বৎসরে তাঁর যাত্রা সম্পূর্ণ হয়। এই দশ বৎসরে তিনি ঘুরে ছিলেন পঞ্চাশ হাজার মাইল, আর পঞ্চাশটি দেশ তাঁরা দেখেছিলেন। সম্প্রতি মার্টিনেট পদব্রজে ভূ-প্রদক্ষিণে বেরিয়েছিলেন—কিন্তু যাত্রা-শেষের পূর্ব্বেই অপর লোকে তাঁর ডাক পড়লো। মার্টিনেট পথের কষ্ট যে পরিমাণে সহ্য করেছিলেন, এমন কষ্ট অবশ্য গ্লীডেনকে পেতে হয়নি।

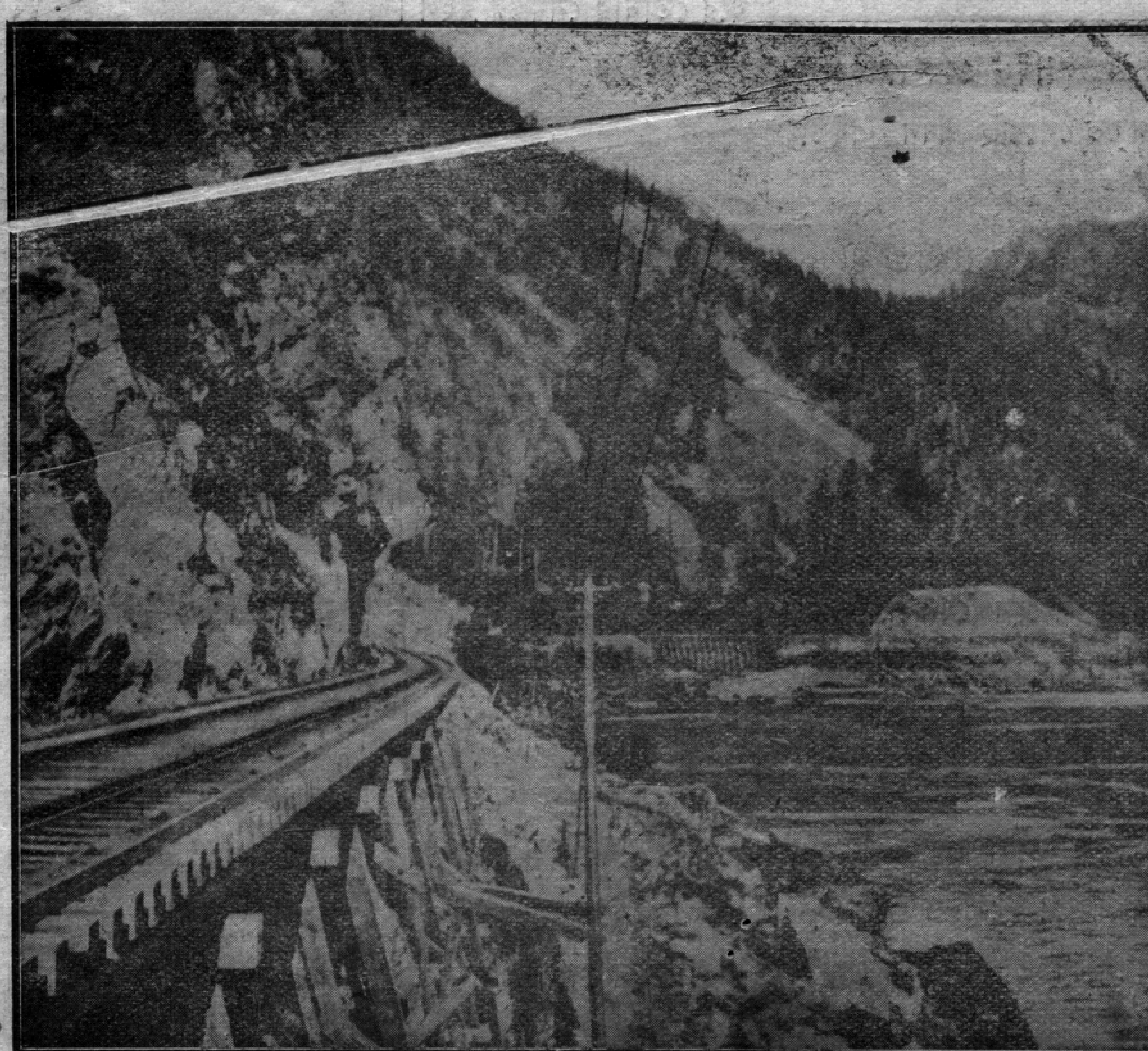
আমরা এ কথা শুনে শুধু বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকি! এই বেড়াবার সখ আমরা এখনো তেমন আয়ত্ত করতে পারিনি। মোটরে-বাইসিকেলে রাঁচি, হাজারিবাগ, চুণার এ অবধি বাঙালী যাত্রী পাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু ভারতের বাইরে বেরিয়ে পড়ার সখ কোন বাঙালী আজ পর্য্যন্ত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

গ্লীডেন মোটরে চড়ে যে ভূ-প্রদক্ষিণ করেন, এ যাত্রা

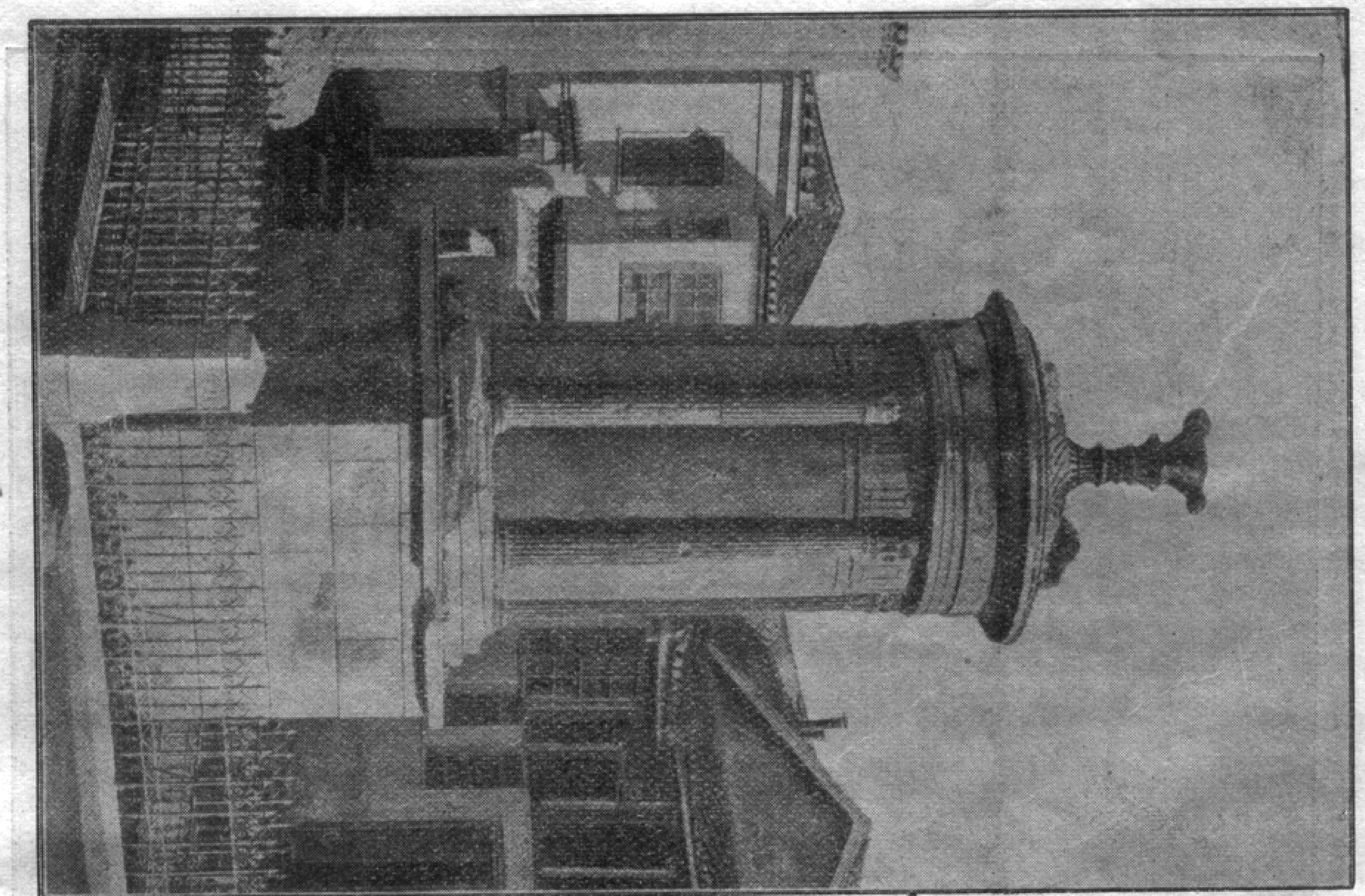
এক-পাড়িতে তিনি শেষ করেন নি। প্রথম বারে তিনি অষ্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনি, ইতালী, স্পেন আর স্ুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন; দ্বিতীয় দফায় পাহাড়, প্রপাত, তরাই এ সব দেখে বেড়ান; তৃতীয় দফায় বেলজিয়ম, বোহেমিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন ঘুরে প্রায় উত্তর-মেরুর কাছাকাছি গিয়েছিলেন। এই দীর্ঘ যাত্রায় তাঁকে কোন রকম বিপদ বা অসুবিধায় পড়তে হয়নি—একবার শুধু মোটরের কল



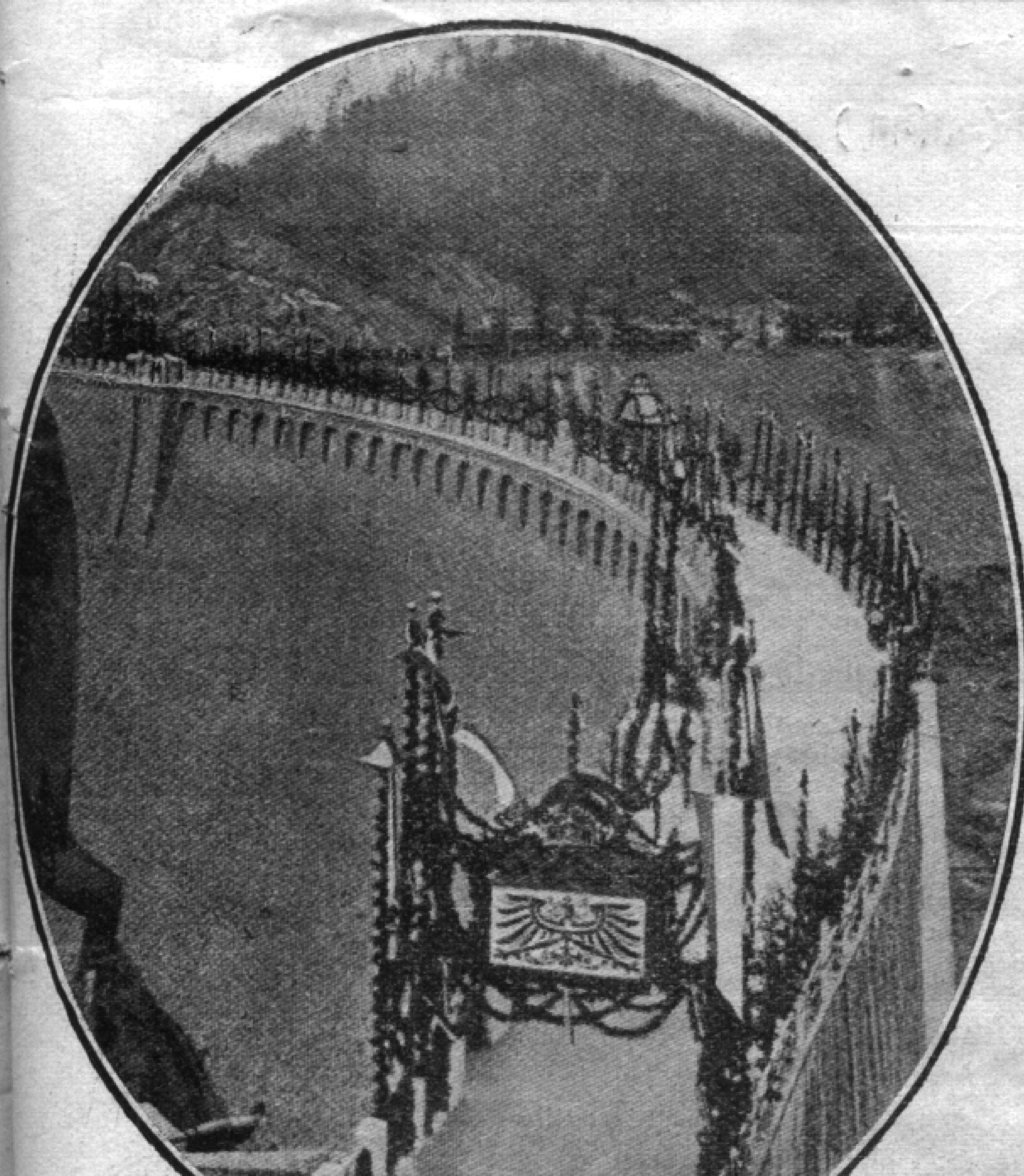
কিলৃনী স্কাটলেজ নদী



বেগড়ানোর দরুণ আধঘণ্টা বিশ্রাম করতে হয়েছিল। এ বড় সহজ কথা নয়। ১৯০৪-৫ সালে তিনি বোষ্টন সহর থেকে কানাডায় যান, সেখান থেকে ভানকুভারে। তার পর রেলে মোটর চালান্ করে হাওয়াই দ্বীপে যান্। সেখান থেকে ফিজি দ্বীপ, পরে নিউজিল্যাণ্ড, তাসমানিয়া, অষ্ট্রেলিয়া। তার পর মেলবোর্ণ, সীডন, —এই জায়গায় পথটা ছিল খুবই খারাপ। এখান থেকে যবদ্বীপ, মলয়দ্বীপ; এইখানে ২৫১০০ মাইল যাত্রা



অ্যাথেন্স—লিসিক্রেটিস স্তম্ভ
('কলিকাতা রিভিউ'-এর সৌজন্যে)



নদীর বাঁধ—জর্ম্মানি



সবচেয়ে উঁচু বাঁধ—আমেরিকা



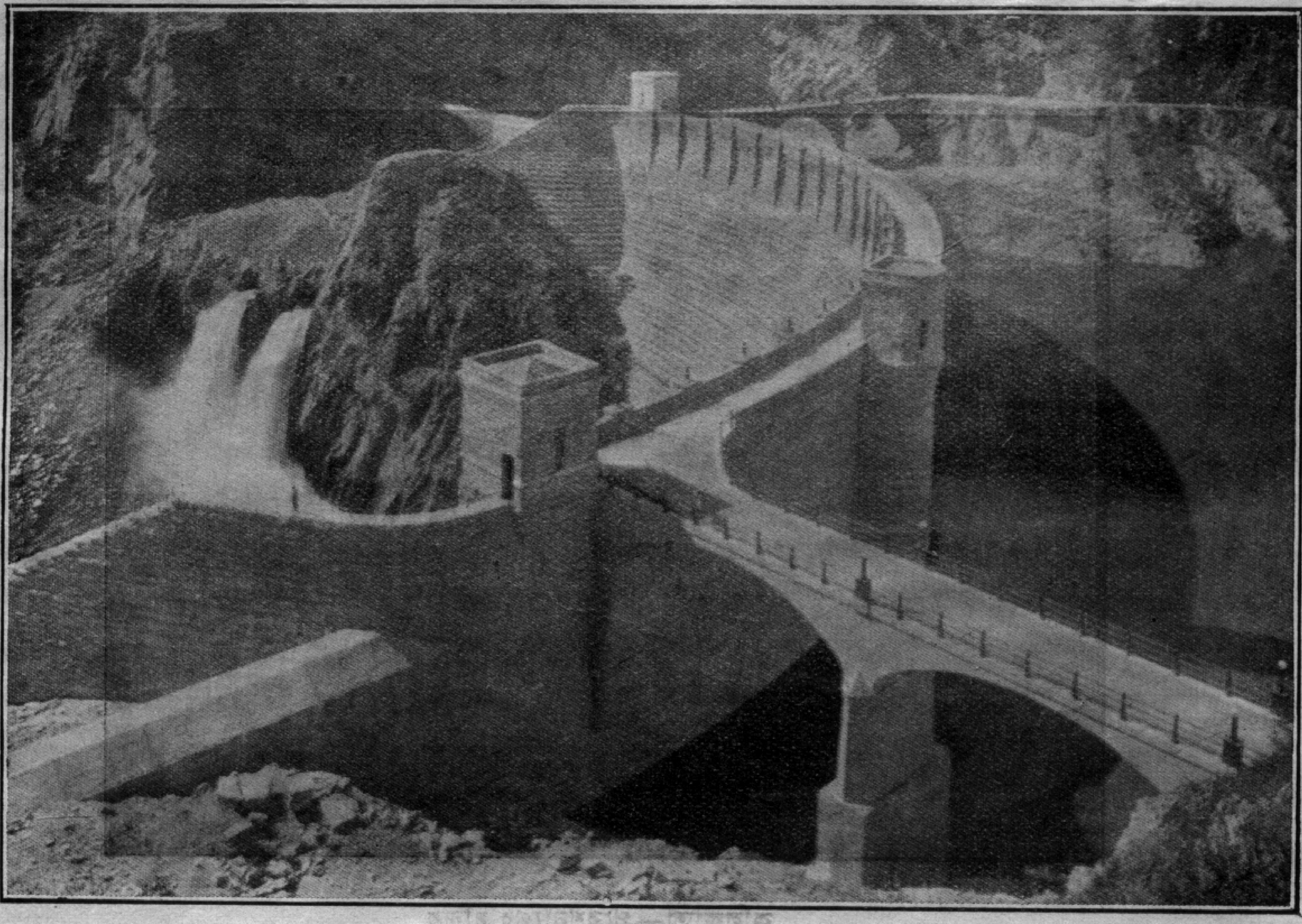
ব্রেডেনবার্গের তোরণ-দ্বার ( বার্লিন )



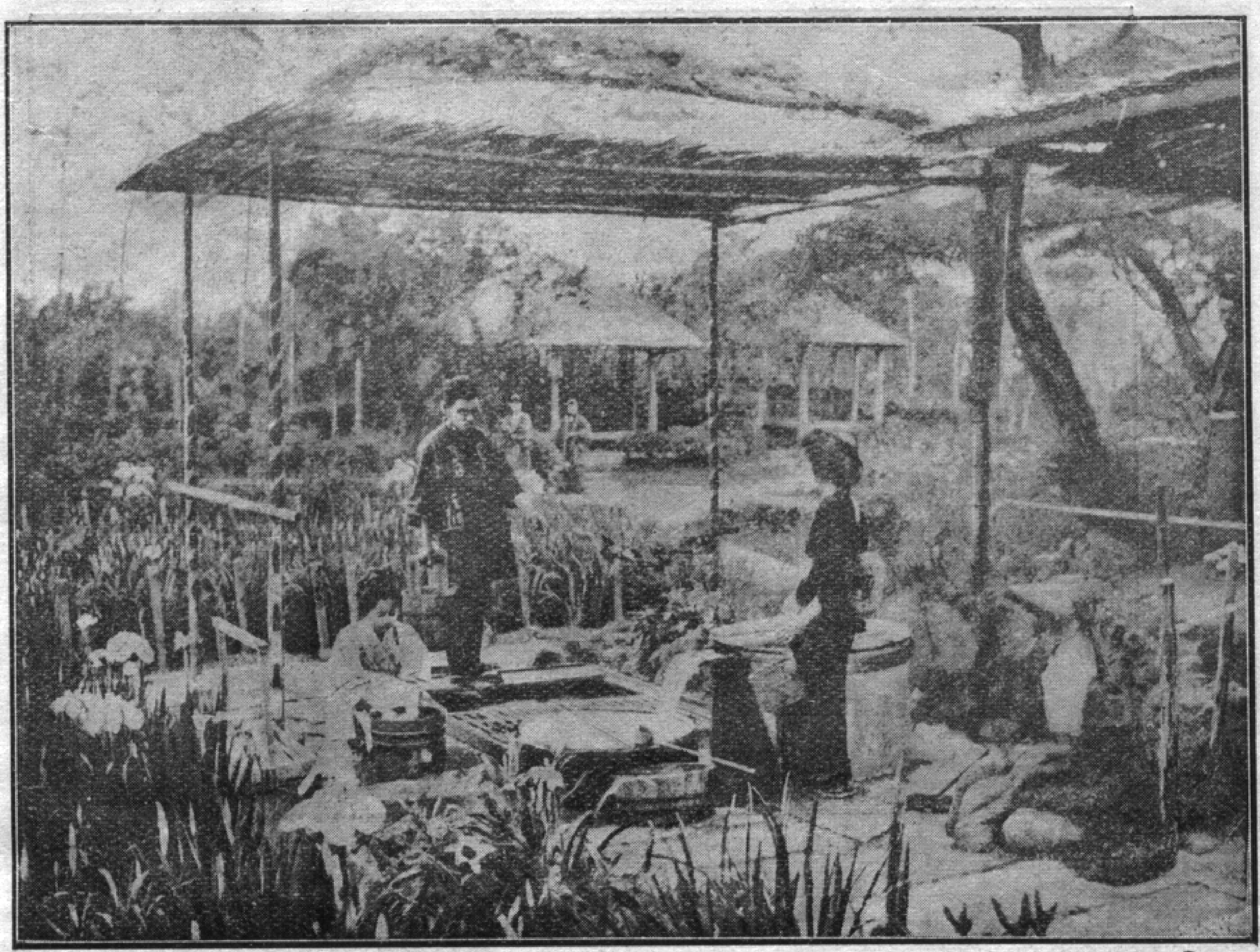
প্যারীর সীন্ নদী



যবদ্বীপ—বটবৃক্ষ



রুজভেণ্ট বাঁধ—আমেরিকা



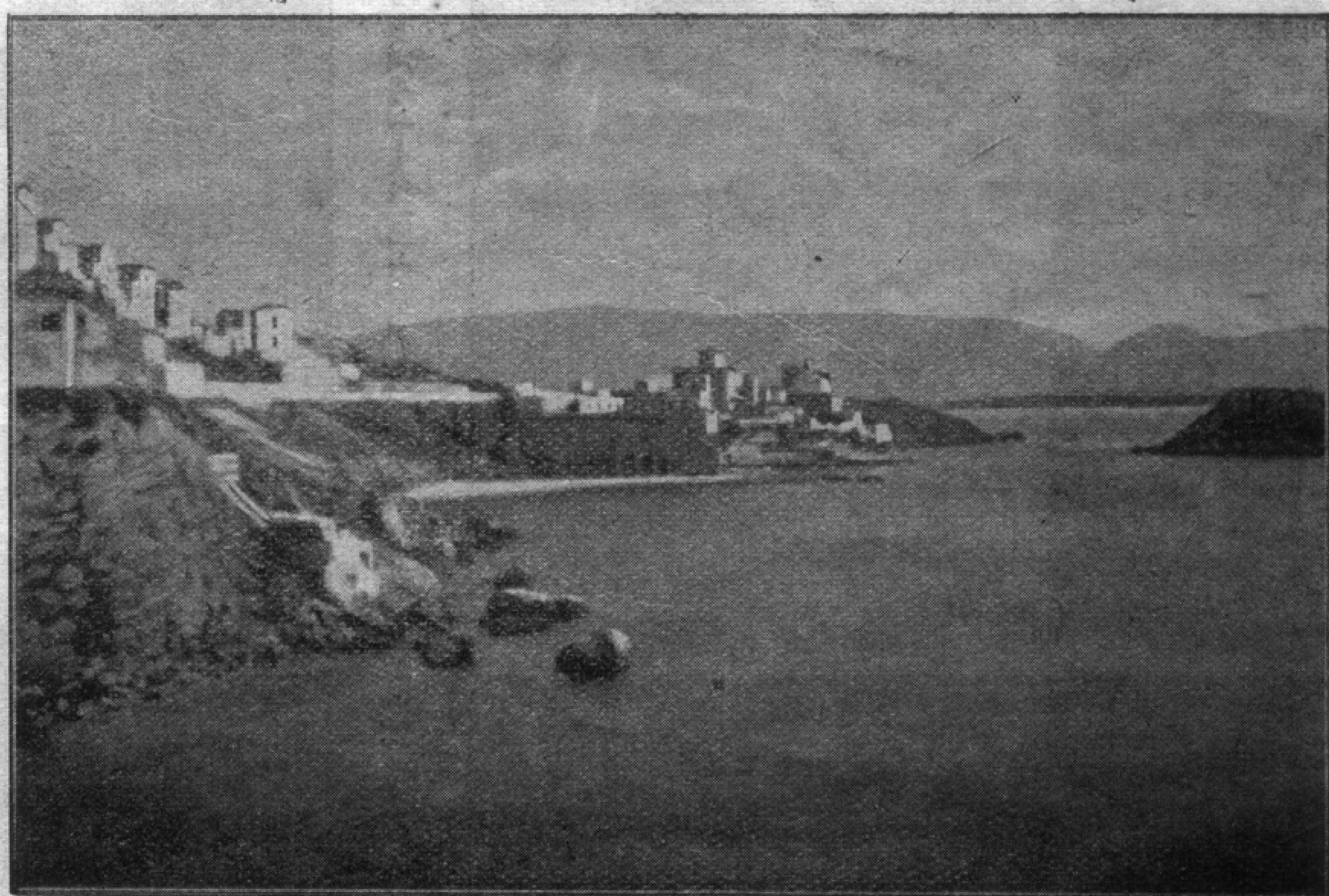
জাপানী বাগান



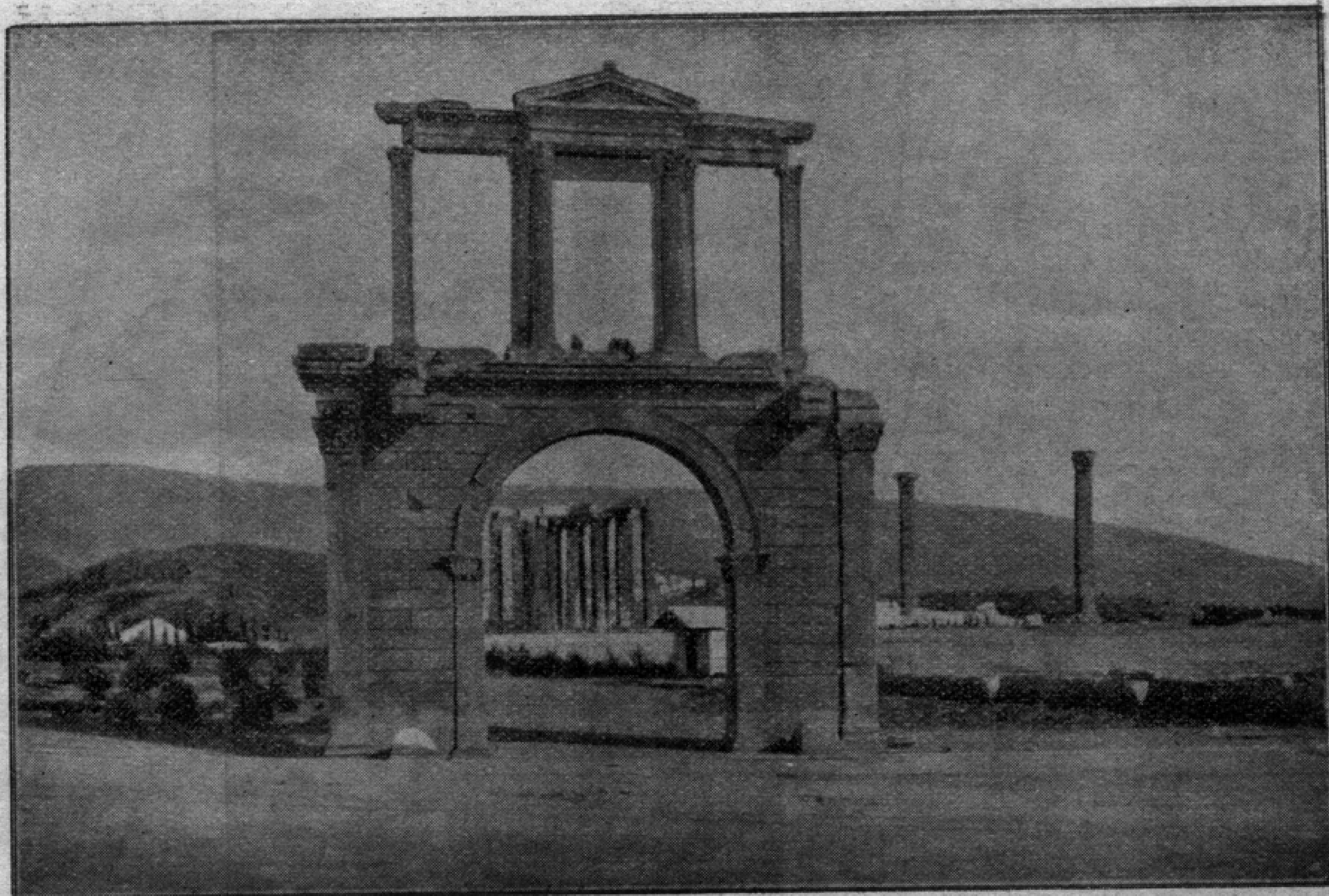
কলিকাতা—পরেশনাথের মন্দির



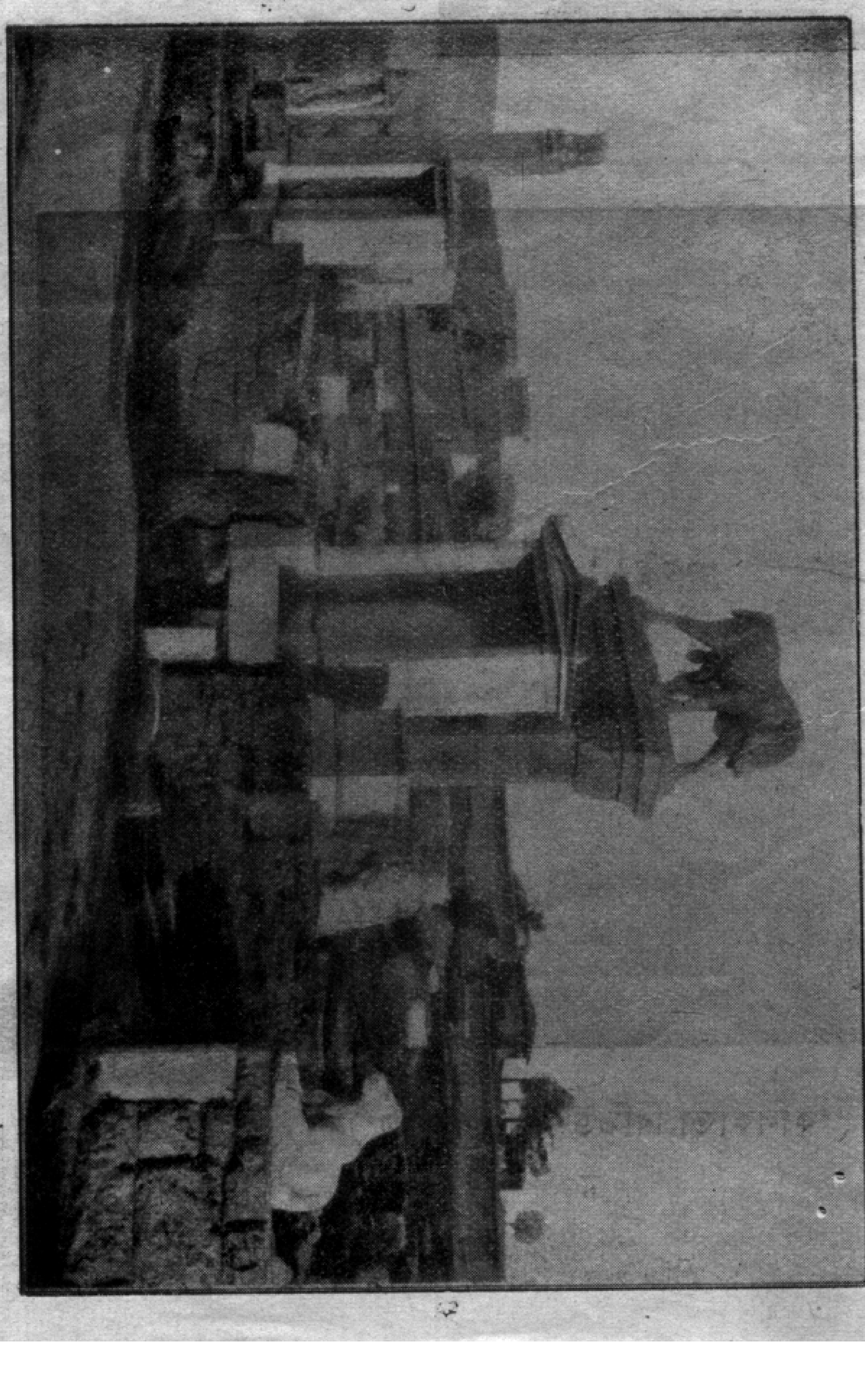
মেক্সিকোর গির্জ্জা



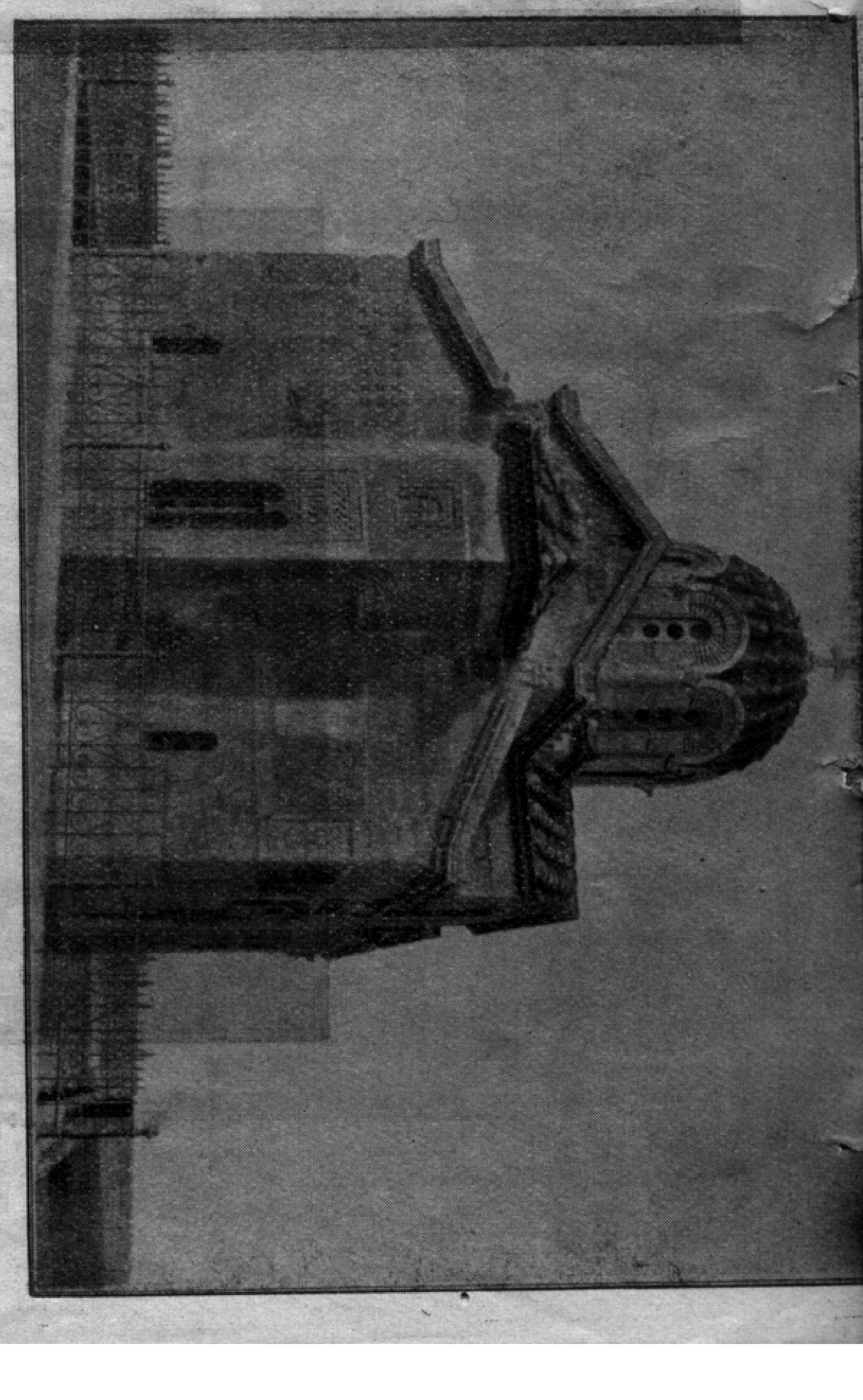
আথেন্স—সমুদ্রকুল ('কলিকাতা রিভিউ'-এর সৌজন্যে )



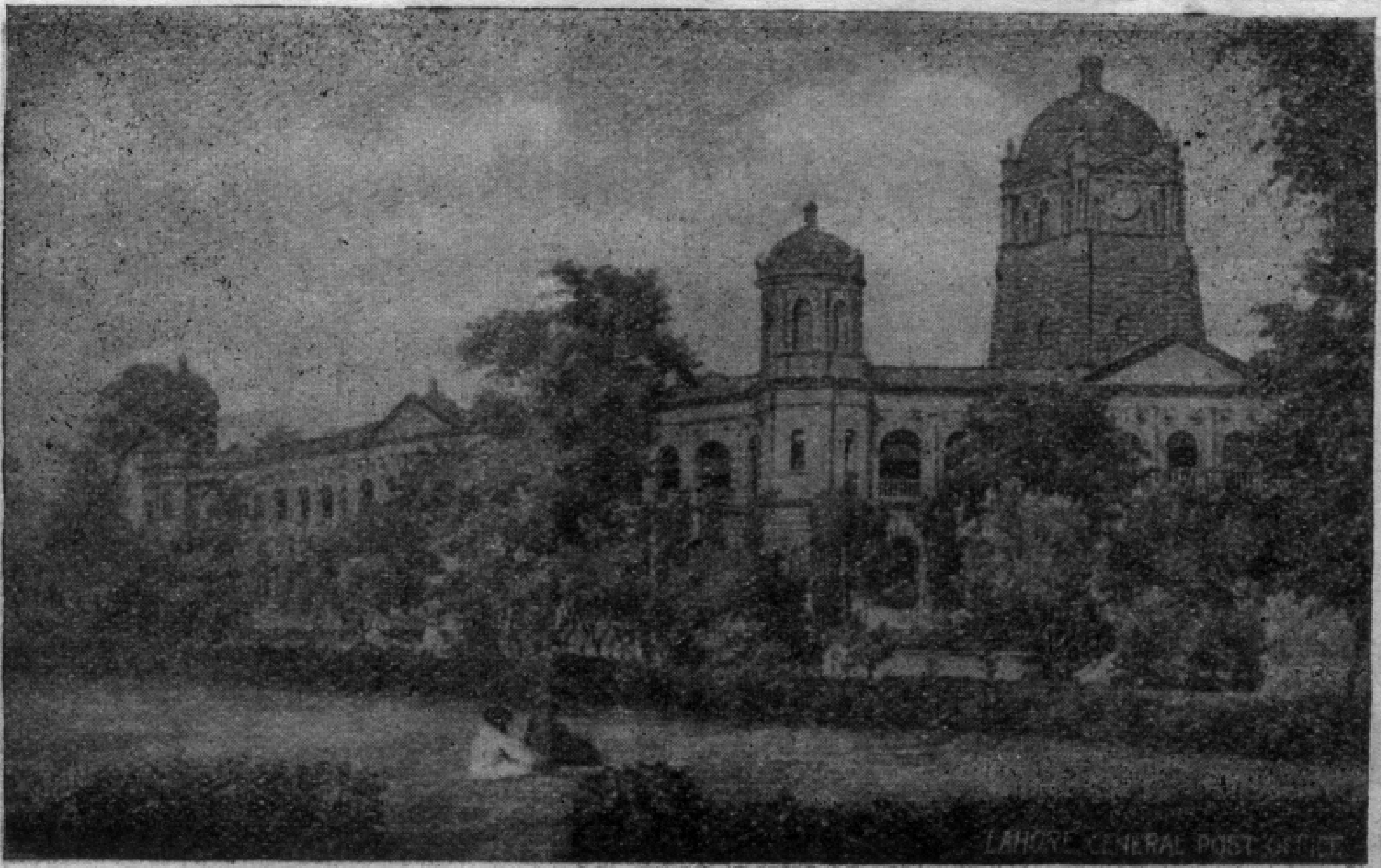
আথেন্স—হাদ্রিয়ানের স্তম্ভ ( 'কলিকাতা রিভিউ'-এর সৌজন্যে )



আথেন্স প্রাচীন গ্রীক.সমাধি ( 'কলিকাতা রিভিউ'-এর সৌজন্যে )

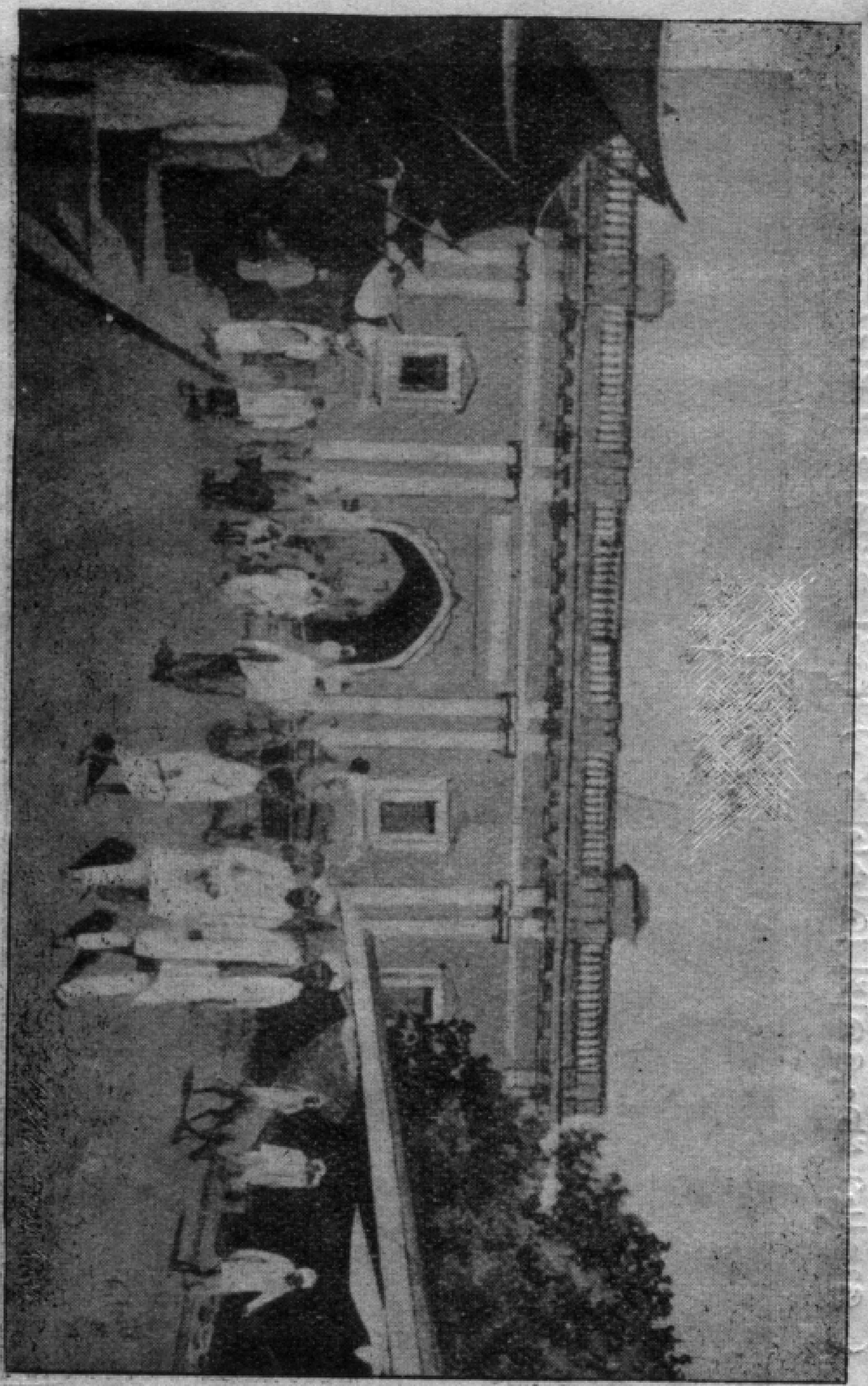


আথেন্স—প্রাচীন গির্জ্জাঘর ( 'কলিকাতা রিভিউ'-এর সৌজন্যে )

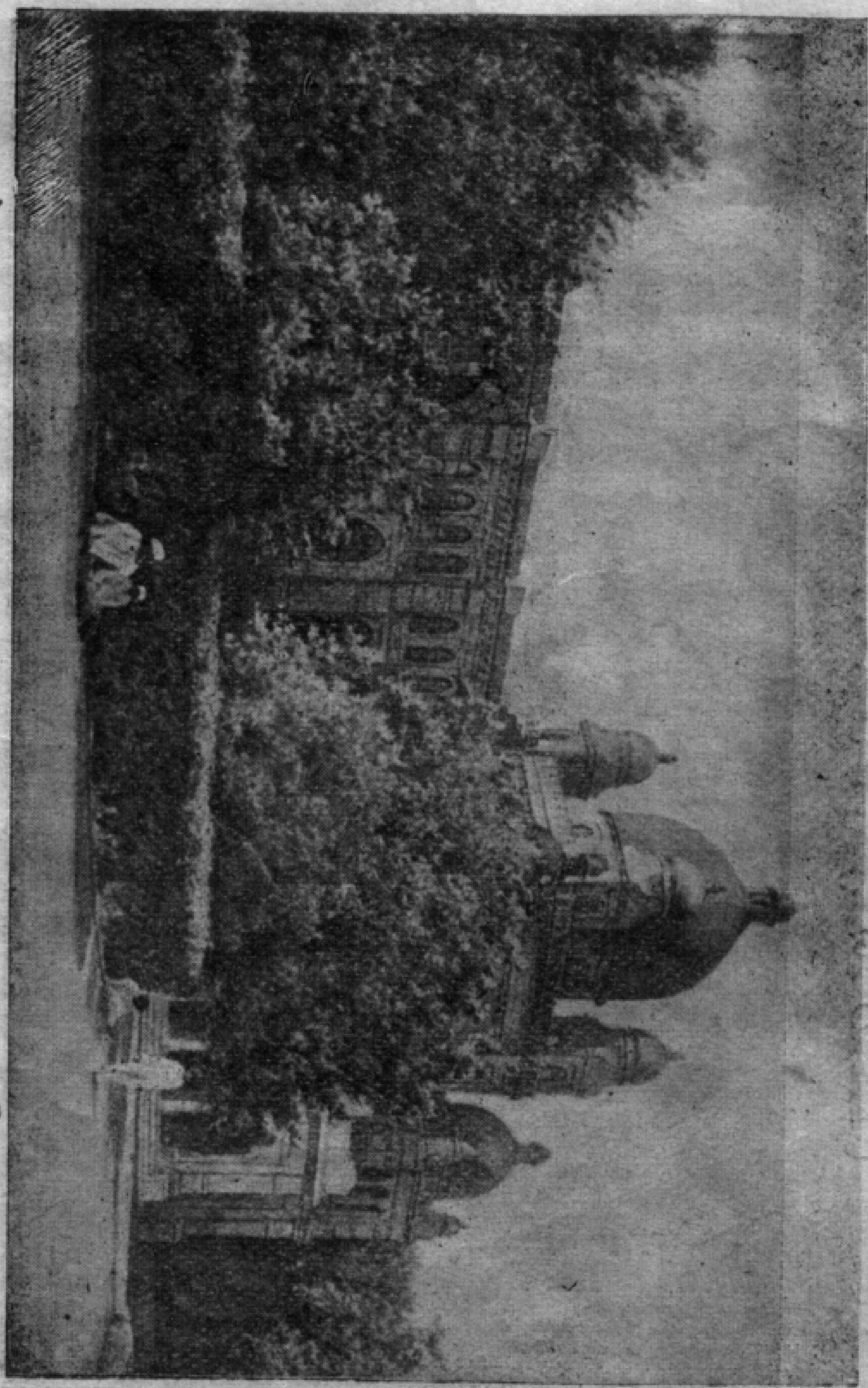



লাহোর—জেনারেল পোষ্ট আফিস

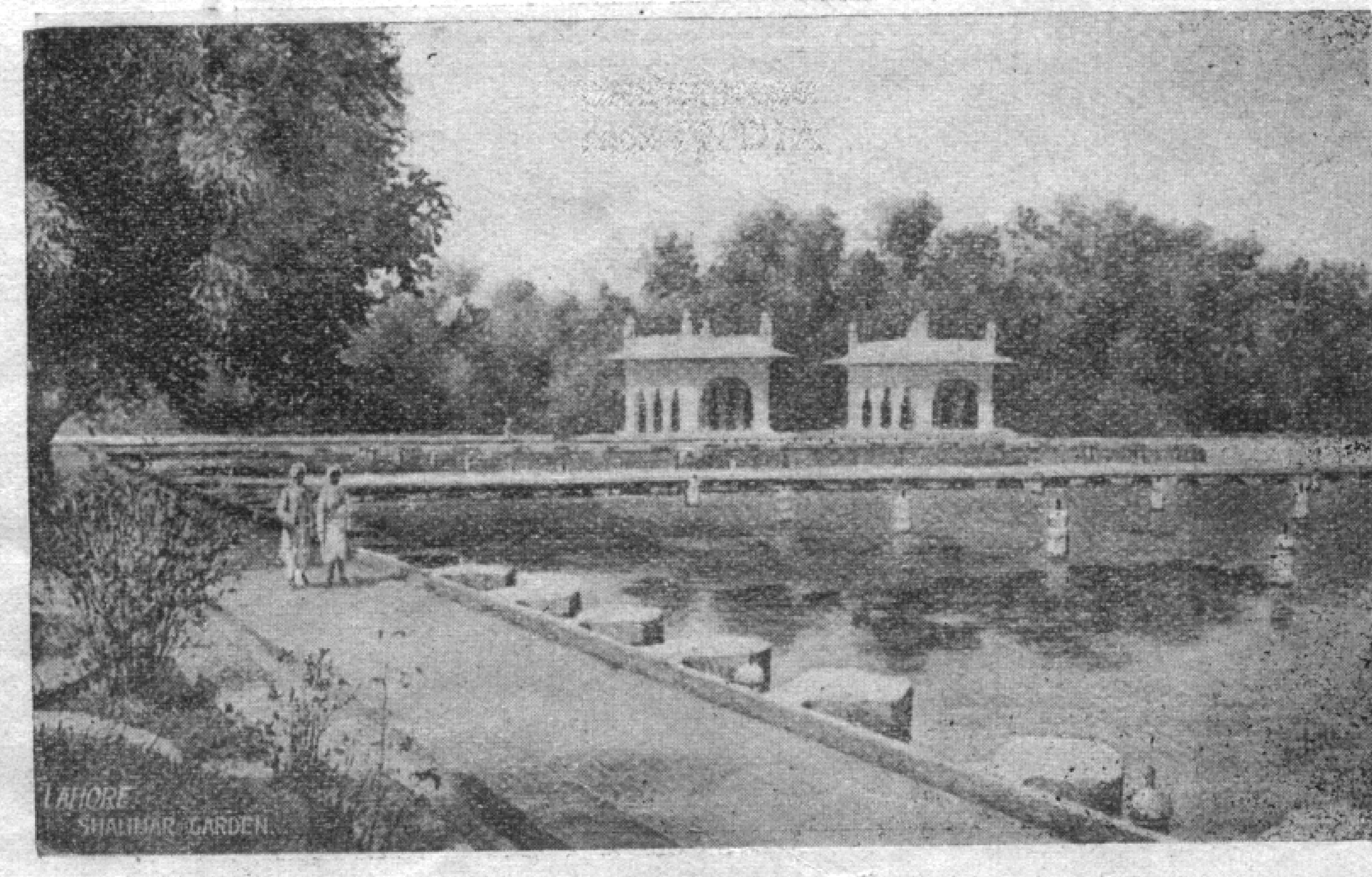
('কলিকাতা রিভিউ'-এর সৌজন্যে)



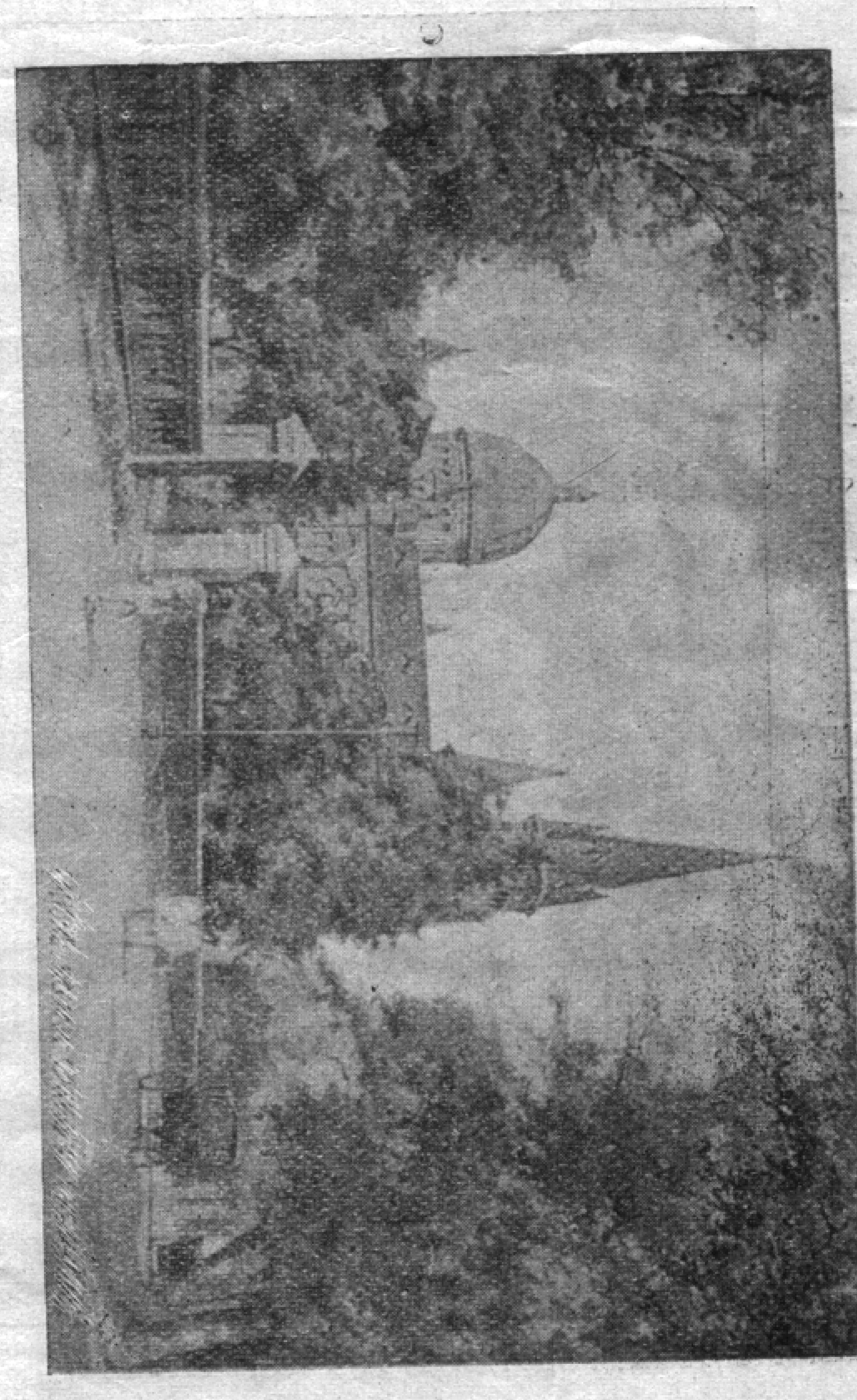
লাহোর—দিল্লী গেট ( 'কলিকাতা রিভিউ' এর সৌজন্যে )



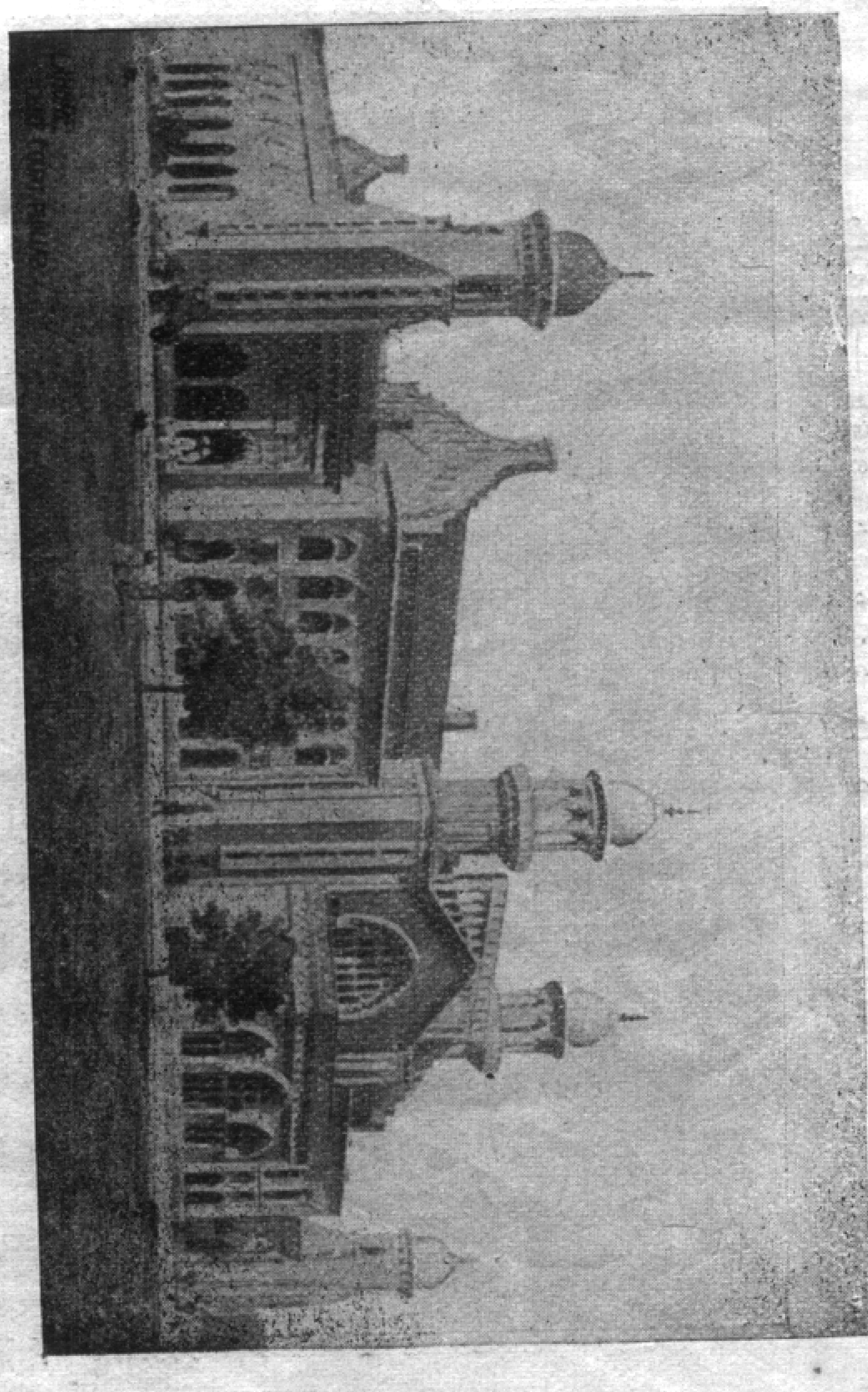
লাহোর—মিউজিয়াম ( 'কলিকাতা রিভিউ' এর সৌজন্যে )



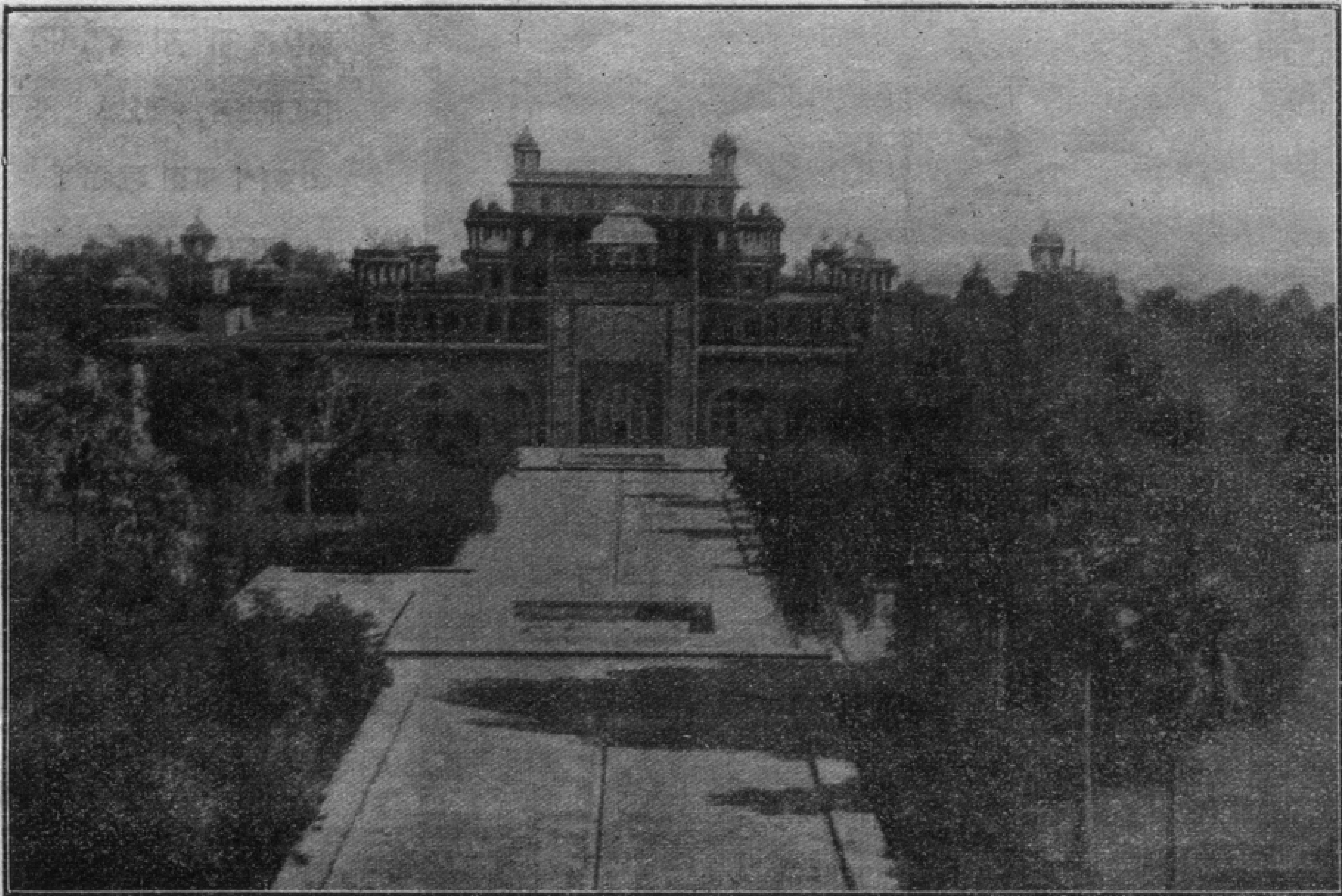

লাহোর—শালিমার বাগ



লাহোর—রোমান কাথলিক গির্জ্জা ('কলিকাতা রিভিউ'-এর সৌজন্যে)



লাহোর—হাইকোর্ট ('কলিকাতা রিভিউ'-এর সৌজন্যে)



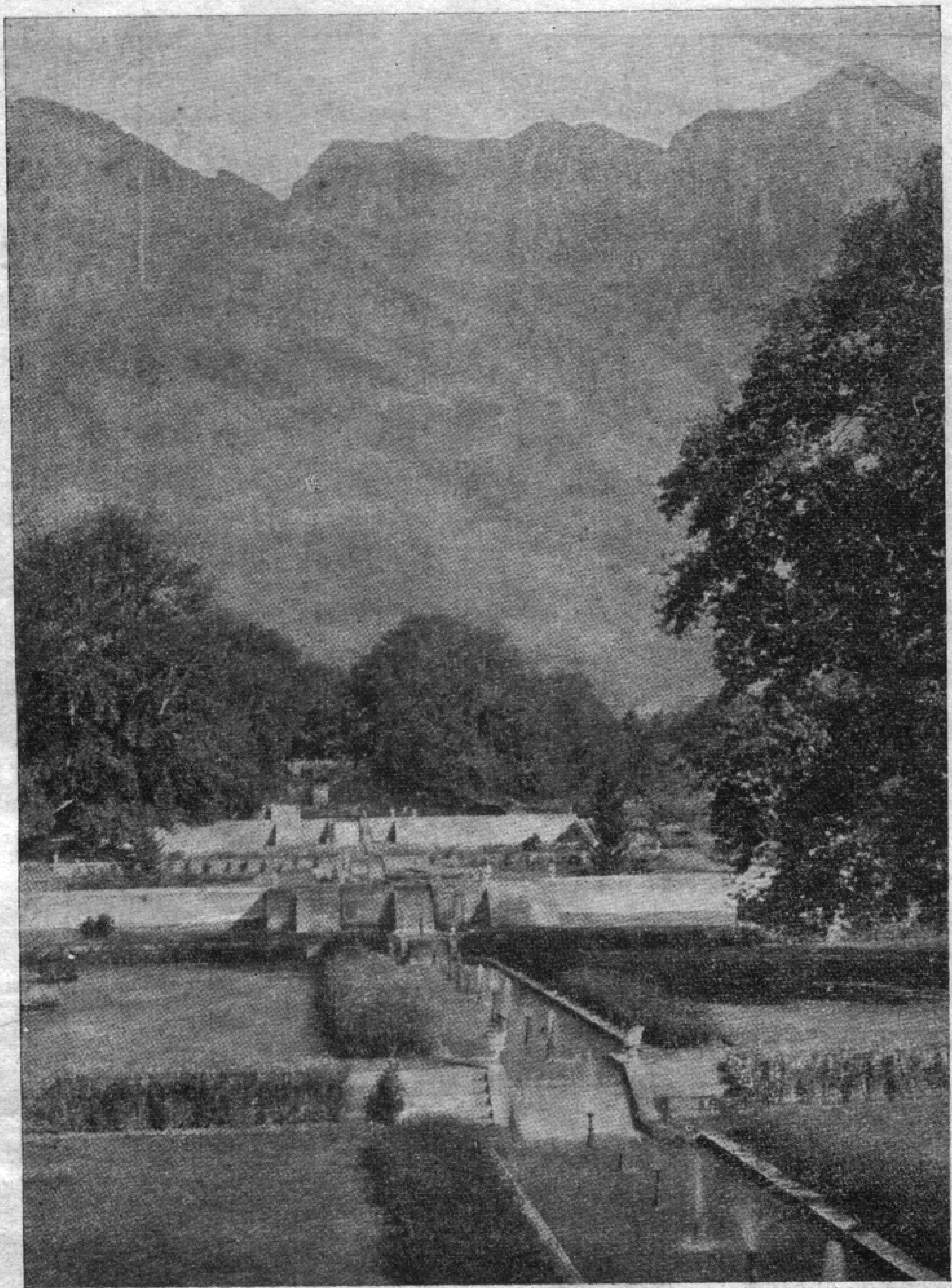
সেকেন্দ্রা

১৯০৫-৬ সালের শীতকালে আবার যাত্রা সুরু হলো। এ যাত্রায় গ্লীডেন সাহেব এলেন ভারতে ; ভারত প্রদক্ষিণ করে তিনি চললেন ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, কোচিন-চীনে, চীনে ও জাপানে। ১৯০৭ সালে গ্রেট বৃটেন। সেখান থেকে মিশর, ভূমধ্য-সাগরবর্ত্তী দেশসমূহ, সুমাত্রা, বোর্ণিও, শ্যাম, ষ্ট্রেট্‌-সেটেলমেণ্ট আর দক্ষিণ আমেরিকা।

গ্লীডেন সাহেব বলেছেন, য়ুরোপের পুলিশ যাত্রীকে সাহায্য করতে ভারী তৎপর। এই যাত্রা তিনি শেষ করেন সোজা পথ ধরে ; আঁকা-বাঁকা গলিতে পারত-পক্ষে ঢোকেন্ নি। তবে যেখানে শীঘ্র পৌঁছুনো যায়, এমন জায়গায় গলিপথও ধরতে হয়েছিল,—আর সে-সব গলি এমন যে তাঁর পূর্ব্বে মোটর নিয়ে তাতে চলার কল্পনাও কেউ কখনো করেন নি। অনেক জায়গায় পথে নদী পড়েচে বা এমনও হয়েছে যে মোটর যাবার মত রাস্তা নেই,—এই সব জায়গায় মোটরকে নদী পার করা হয়েছে ফেরি-বোটে ; রেলেও চালান্ দিতে হয়েছে। তা ছাড়া সমুদ্র পার হবার সময় জাহাজের সাহায্য নিতে তো হয়েছেই। মোটর ডাঙ্গা-পথে যে পাড়ি দিয়েছে, তার হিসেব পাকা পঞ্চাশ হাজার মাইল।



লাহোর সুবর্ণ মসজিদ 'কলিকাতা রিভিউ'এর সৌজন্যে'



কাশ্মীর নিশৎবাগ

ফিজিদ্বীপের অধিবাসীরা এর পূর্ব্বে কখনো মোটর দেখেনি। ফিজির রাজা আর রাজকন্যা মোটরে চড়বার সুযোগ পেয়ে নিজেদের কৃতার্থ ভেবেছিলেন।

যবদ্বীপের সম্রাট গ্লীডেনকে দরবারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, মোটরের সম্মানে রাজপথে আলো দেওয়া হয়েছিল।

ভারতবর্ষে যখন তাঁরা আসেন, তখন প্রয়াগে মাঘমেলায় সাধু-সমারোহ দেখে দু'জনে মুগ্ধ হন্। ভারতবর্ষে এঁরা ৪৩৪৫ মাইল ভ্রমণ করেন।

পৃথিবীর নানা দৃশ্যাবলীর ছবি তিনি স্বহস্তে ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে তাজমহল, নায়েগ্রা-প্রপাত, হিমালয়, আল্পস্ প্রভৃতির চিত্র অনেকেই বহুবার দেখেছেন,—এ সব বিচিত্র দৃশ্য ছাড়া আরো যা যা দর্শনীয় বলে তিনি ফটো নিয়েছেন, তারি কতকগুলি এখানে প্রকাশ করা হলো।

আশা করি, বাঙালী এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ঘরের মায়া ত্যাগ করে বাহিরে পর্য্যটনে বেরিয়ে পড়তে আর বিলম্ব করবেন না! নিজেদের শেখার ও দেশকে শেখাবার বহু বস্তু তাঁরা এ ভ্রমণে সংগ্রহ করবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই!

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

---

## অতিসুখের মাত্রা

অতি-সুখ মানুষকে অধঃপাতের পথে লইয়া যায়। সুইডেনের Race Biological Instituteএর অধ্যক্ষ প্রোফেসর হার্ম্মান লুণ্ডবর্গ এ সম্বন্ধে নিউ ইয়র্কের ঈভ্‌নিং পোষ্টে এক সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। এই সন্দর্ভে তিনি বলিয়াছেন,—অতি-সুখের আর বিলাসের স্রোত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ধ্বংস সাধন করে দেশে হুড়-হুড় করিয়া অর্থাগম হইতে থাকিলে প্রকৃতপক্ষে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় কি না, সে সম্বন্ধে লেখক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অতীত ইতিহাস হইতে জানা যায় দেশে প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকিলে নূতন নূতন অভাবও গড়িয়া ওঠে; বিলাস-চর্চ্চা বাড়িতে থাকে, চিত্তে অবসাদ আসে, কর্ম্মে মানুষের শৈথিল্য জাগে; নারী মাতৃত্বের ভার-বহনে আপত্তি তোলে। দেশের সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মধ্যেই এ ভাবের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তাহার ফলে তাহারা তলাইয়া যায়; অর্থাৎ টাকার জোরে সমৃদ্ধ শ্রেণী কতকটা টিঁকিতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের টাকার জোর তেমন নাই, কাজেই তাহাদের পক্ষে টিঁকিয়া থাকা কঠিন হয়।

লেথক জন্ম-হার-চালনার (Birth-control) পক্ষপাতী। অত্যধিক সন্তানের জন্ম দান করার মানে অভাব আর অভিযোগের সৃষ্টি, স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্কোচ। ভালো স্বাস্থ্যের পঞ্চাশটি লোকের দাম স্বাস্থ্যহীন একশো প্রাণীর চেয়ে ঢের বেশী—ইহাই লেথকের মত।

শুধু যে রাজনীতিক কারণেই ইয়ুরোপ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে তা নয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমিক বিলোপই এ ধ্বংসের প্রধান কারণ। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সমাজের মেরুদণ্ড। তাহার উপরই সমাজ ও রাষ্ট্র নির্ভর করে। সমাজে কাল্‌চার বা অপর কোন গুরুতর কাজ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ধরিয়াই বাড়িতে থাকে। অত্যধিক শ্রমশিল্পে অর্থ আসে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সে এক স্তর নীচে নামাইয়া ধরে। কাজের ঝোঁকে নিম্নশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তালগোল পাকাইয়া এক হইয়া যায়—আর নিম্নশ্রেণীর টান বেশী বলিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহার দলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে নূতন একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া ওঠে বটে, কিন্তু সে শ্রেণী ঐ নিম্ন শ্রেণীরই আর একটি স্বতন্ত্র স্তর মাত্র। ওধারে সমৃদ্ধ-শ্রেণী আর এই শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদও এতথানি বাড়িয়া যায় যে পরস্পরে হৃদয়ের সম্পর্ক দূরে থাক্‌, মুখ-দেখাদেখি অবধি থাকে না। ইহার ফলে শ্রমিকের দলে এই নিম্নশ্রেণী খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে—এবং তাহার ফলে কলা, শিল্প, সাহিত্য অর্থাৎ কাল্‌চারের দিকটা একেবারে থালি পড়িয়া যাইবে বলিয়াও আশঙ্কা হইতেছে। এই দারুণ দুর্দ্দিন যাহাতে না আসে, সেদিকে দৃঢ়-লক্ষ্য হইবার জন্য তিনি সমাজ-হিতৈষীদলকে সচকিত করিয়াছেন।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

---

## সাহারা-বক্ষে

তৃষিত মরুর শুষ্ক নীরস বুকে এতদিনে মানুষের হাসির ফুল ফুটিয়াছে, লোকের কোলাহলে সাহারা মরুর স্তব্ধ প্রান্তর এবার মুখরিত হইয়াছে—অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

চারখানি মোটরে করিয়া রসদ-সমেত সাহারা যাত্রা করিয়াছিলেন। এ-দলের নেতা এম, হুব্রে—আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন হার্ট, একজন ফটোগ্রাফার, একজন বৈজ্ঞানিক ও চারিজন মিস্ত্রী। মরু-যাত্রার জন্য মোটর গাড়ীতে বিশেষ 'গীয়ার্‌-বক্স' লাগানো হইয়াছিল। তিম্বাকৃতু হইতে ৫০০ মাইল দূর-পর্য্যন্ত মোটরের ব্যবহার্য্য তৈল ও অন্য রসদাদি সংগৃহীত ছিল। মরুর বুকে দুই একটা কূপ পাওয়া গেলেও যাত্রীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই গাড়ীতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পাছে কোন দুর্দ্দান্ত দস্যু আক্রমণ করে,—সে আক্রমণ-রোধের জন্য সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল।

ইঁহারা সর্ব্বসমেত দুই হাজার মাইল অতিক্রম করিয়াছিলেন। এ যাত্রা শেষ হয় একুশ দিনে। উটের পিঠে চড়িয়া এই পথ অতিক্রম করিতে যাত্রীদের তিনমাস সময় লাগে। এই মরুর বুকে দুর্দ্দান্ত আরব দস্যু, মেহারিষ্ট ও তুরেগের ভয় প্রবল। উট ছাড়িয়া অন্য উপায়ে যাওয়ার চেষ্টা এই প্রথম।

কিছুকাল পূর্ব্বে জেনারেল লাপারি ও মেজর বিলেমি এরোপ্লেনে চড়িয়া সাহারা অতিক্রমের উদ্যোগ করেন। পথের মধ্যে জেনারেলের মৃত্যু হয়; আর বিলেমি দেশে ফিরিলেন অত্যন্ত কষ্ট সহিয়া, প্রায় মর-মর অবস্থায়।

তাহার পূর্ব্বে সে প্রায় একশত বৎসরের কথা—রেণি কেলি চেষ্টা করিয়া তিম্বাকতু অবধি আসিয়া ছিলেন। তথন এথানে সুদানের দাস-বিপণী বসিত—আর দাস-দাসী বেচিত যত তুরেগ আর বেদুইনের দল। এই তিম্বাকতু অতিক্রম করিতে পূর্ব্বে কাহারো সাহস হইত না। যেমন দারুণ রৌদ্র, মরু ধূ-ধূ করিতেছে—তিম্বাকতুতে তথন লোকজনেরও বসতি ছিল না। এথন তিম্বাকতুতে লোকজনের বসতি হইয়াছে—তারপর দস্যুর ভয়! উটের পিঠে চড়িয়া যাত্রীরা যে মরু-পথে পাড়ি দিত তা'ও এক-একদলে ৫০০০ করিয়া উট থাকিত। তথন বহু ব্যবসায়ী লবণের পরিবর্ত্তে এই তিম্বাকতুর বাজার হইতে দাস-দাসী ও মণি-রত্ন সংগ্রহ করিত।

যাই হোক্‌ হুব্রের দল একটানা অমন চৌদ্দ ঘণ্টা

যাত্রীর দল একটুও দমেন নাই। বেদুইনেরা বলে, "এই মরুভূমি আল্লার বাগান"—এখন সাহারার প্রান্তর আবিষ্কারের ফলে এ বাগানের কি ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য পাশ্চাত্য জগৎ সমুৎসুক রহিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই মরুযাত্রা স্বর্ণাক্ষরে কত কথাই লিপিবদ্ধ করিবে, সে এক কৌতুহলের বিষয়।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

---

# আলোচনা

## অপ্রিয় সত্য

আজকাল প্রায় সব কাগজেই নারীর অধিকার নারীর শিক্ষা-স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন আলোচনা তর্ক দেখতে পাই। সে সব দাবী-দাওয়া দোষারোপগুলি আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য বলে বোধ হয় না। তবে প্রত্যেকেই স্ব স্ব মতানুযায়ী আন্দোলন কচ্ছেন। করবার কারণও যথেষ্ট এবং এ যে একদিন অবশ্যম্ভাবী তাও জানা ছিল। কিন্তু আজ সমগ্র নারী-হৃদয় যা চাইছে, সে কথাটা খুব স্পষ্টভাবে ঐ সব প্রবন্ধে ফুটচে না, মাঝ থেকে অনেক অবান্তর কথা এসে পড়ছে।

নারী পুরুষের কাছে দেহের খোরাক পেয়ে এসেছে, মনের খোরাকও বোধ হয় পাচ্ছে অথবা তা পাবার আয়োজন চলছে; কিন্তু আত্মার খোরাক পাচ্ছে না একেবারেই। এই খাদ্যের অভাবেই তার বুভুক্ষিত পীড়িত হৃদয় জরাগ্রস্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। আর সেই খাদ্যের অন্বেষণেই এই আন্দোলন। আজ তার এ ক্ষুধা মেটাতে পার্ব্বার ক্ষমতা পুরুষের নাই; তাই তিনি নানান্ তুচ্ছ জিনিষে বাজে কথায় সত্যটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। ফলে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে। সব দোষই আজ নারীর,—কিন্তু তা তো নয়। নারী নিজের নারীত্ব থেকে ততটা স্খলিত হয় নি, পুরুষ নিজের পৌরুষ থেকে যতটা হয়েছেন। তুলনায় সে বোধ হয় সহস্রগুণ। নারীর মাতৃত্বই তাদের অতটা স্খলিত হতে দেয়নি। কিন্তু পুরুষের পৌরুষ যা শুধু নিজ শক্তিতেই গড়তে হবে সেটা তাঁদের অলসতা ও তৎসহচর অজ্ঞানতার জন্য ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। জাতীয় জীবনের অবনতির এই একমাত্র কারণ। অন্য যত কারণ উল্লেখ করা হয় সে সব এর তুলনায় অতি তুচ্ছ। কজন স্বামী স্বামীর আদর্শে আছেন, জানতে ইচ্ছা হয়। নিজের শক্তির সীমা না দেখেই তাঁরা সংসারে নেমেছেন—তারপর কি হয়েছে? নারী শোকে দুঃখে আকুল হয়ে তাঁর কাছে গেছে, সেখান থেকে সে কোন সান্ত্বনাই পায়নি! সাংসারিক ব্যথায় জর্জ্জরিত হয়ে পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়েছে, সেখানে সে সহানুভূতির সন্ধানই তৃষা পরিতৃপ্ত হয়নি। সে তো বাজে চলিত কথায় মেটবার নয়, সে যে সত্যান্বেষী।

এই ক্ষুধা মেটাতে না পেরেই আজ সমস্ত পুরুষ জাতি নারীর অন্তরের অন্তঃস্থলে এতদিন ধরে যে একাধারে পতি-গুরু-দেবতা তিনজনের পূজা একা পেয়ে আসছিলেন, তা আর পাচ্ছেন না। এখন এটা ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী তো দূরের কথা, পুরুষও আজ এই গুরু আরোপে শিউরে ওঠেন! কিন্তু এটা তো শিউরাবার কথা নয় বা একদিনও তা ছিল না। বাপ-মা কন্যাকে কতটুকু শিক্ষা দেবেন? না, তার মনের ক্ষেত্রটুকু চষে খুঁড়ে পরিষ্কার করে উর্ব্বর করে দেবেন—বীজ-বপন ইত্যাদি পরের কাজ তো স্বামীরই। যন্ত্রটী নির্দ্দোষ করে গড়ে পিতা স্বামীরূপ যন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন তাঁর কাজ ঐ পর্য্যন্ত—কন্যাকে সৎ পাত্রে দান—ও কন্যার মনের ক্ষেত্রটী বীজ বপনের যোগ্য করে দেওয়া। বাপের কর্ত্তব্য ঐ পর্য্যন্ত—কন্যার বাকী জীবনটা গড়বার ভার তার ভাবী সন্তানের জনকের উপর। তৎন কাজ রইল ক্ষেত্রের ও চাষীর—জমিদারের সেখানে প্রবেশ অনধিকার। স্বামী কি সেটা করছেন? যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এত উদার, এমন বিরাট, আজ সে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দেখে চোখে জল আসে। এ সম্পর্কে কোন উচ্চাভিলাষ নেই—কোন ভাব নেই, দায়িত্বজ্ঞান নেই, এ যেন পুতুল খেলা—তাও কলুষতা-মাখান শুদ্ধ খেলাও নয়। কিন্তু দোষ কি নারীরই? খুঁজলে সীতা সাবিত্রীর মত নারী-চরিত্র এখনও পাওয়া যায় কিন্তু—রামের মত সত্যবানের মত সার্থক-পদ স্বামী কই? আজ চালকবিহীন নারীর জীবন-তরী অকূলে প্রবৃত্তির স্রোতে ভোগের হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে—মাতৃত্বের বিপরীত দিকেই ভেসে যাচ্ছে—আর পুরুষ মূর্ত্তিমান নির্লজ্জের মত তার পেছু ধরে নির্ব্বিবাদে ভেসে যেতে অলসে অঙ্গ ভাসিয়েছে, নচেৎ পুরুষের শক্তিহীন মুখ থেকে এ কথা উচ্চারিত হতো না—"নারী না জাগলে আমরা জাগতে পারি না।" তা না হলে তারা আহ্বান কর্ত্ত নারীকে জাগাবার জন্য—তারা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মের দ্বারা

মেয়ে বিবাহের যোগ্যা হয়েছে ছেলে বিবাহের যোগ্য হয়েছে—কথাটা উচ্চারণ করেন অনেকেই, কিন্তু মানেটা বোঝেন অল্প লোকেই। বিবাহ যে কত বড় ব্যাপার, কি পবিত্র, কি দায়িত্ব-ভরা, কি মহান,—তার পরিণতি যে ভোগে নয়, ত্যাগে ; তা তারা বোঝে না। নিজেদের সখের জন্য বা সন্তানদের কাল্পনিক সুখের জন্য অন্ধভাবে এমন কাজটার বীজবপন ঐ অপরিণত, বিবাহের সম্পূর্ণ অযোগ্য শরীর ও মনে বিবাহের দ্বারা রোপণ করেন যার ফল হয় তীব্র বিষে ভরা। হৃদয়-শতদলের সব কটী পাপড়িই তো ঐ বিবাহের ফলে খোলবার কথা! তা কি খোলে? শতকরা বেশীর ভাগ বিবাহ বিবাহই নয়। ওটা একটা অজ্ঞের অভিনয়—একটা প্রলাপ। সেটা না বুঝেই শস্তা দরে অনায়াসে সুখ শান্তি আনন্দ কিনতে গিয়ে যে কি কেনেন—তার পর যখন দুদিনেই তার বাহিরের চাকচিক্য ঘুচে গিয়ে অন্তরের দৈন্য ও রিক্ততা ফুটে বেরোয়, তখন গভীর হতাশে দু পক্ষেরই হৃদয় ভেঙ্গে পড়ে। বাস্তবিক্ যা সত্য নয়, যা পাপ, মানুষ কর্ত্তে পারে সহস্রবার—কিন্তু তার ভিতরটা তাতে তৃপ্ত হবেনা কখনও। এইটাই সত্যের স্বরূপ।

একটু চিন্তা করে দেখলে স্বামী-স্ত্রীর যে আদর্শটী সেকালে এদেশে ছিল সেটাই যে একমাত্র আদর্শ, আর সেই থেকেই সংসারের যাবতীয় সুখ শান্তি আনন্দ উৎপন্ন হতো, তা বেশ বোঝা যায়। ঐ একটী জিনিষেরই উপর মানব-জীবন প্রস্ফুটিত শতদলের মত আনন্দে, জ্ঞানে, শান্তিতে চারিদিক আমোদিত করেছিল। এখনও যদি গার্হস্থ্য আশ্রমে ঢোকবার আগে সে বিষয়ে পরিপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া যায়, শরীরকে, মনকে বিবাহের যোগ্য করে তবে বিবাহ দেওয়া যায়, স্বামী যদি নিজ জ্ঞানের দ্বারা কর্ত্তব্যের দ্বারা অজেয় মন-শক্তির দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা নিজ পদ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন—তাহলে, পৃথিবীতে এ যাবৎ যতরকম অমনুষ্যোচিত ঘটনা ঘটচে তা সব বন্ধ হবে। আজকালকার কজন স্বামী নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে সাহস করে বলতে পারেন যে হ্যাঁ, আমি কোন নারীর স্বামী হবার যোগ্য? তাই বলচি মাতৃত্বের দায়ে পড়ে—হ্যাঁ, দায়ে পড়েই, নারী ততটা পথ-ভ্রষ্ট এখনও হতে পারেনি, যতটা পথ-ভ্রষ্ট হয়েছে পুরুষ।

ঝগড়া-ঝাঁটির দ্বারা ফল হবে না। যাঁরা গত জীবনের সংস্কারের দ্বারা সংসারকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছেন তাঁদের আমি প্রণাম করি। শুধু তাঁরা হয় পুরুষকে ত্যাগ করে, নয়—ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্যা হয়ে নিজের উন্নতি লাভ কর্ত্তে পারেন। আমাদের কিন্তু সে উপায় নেই। আমাদের যেতে হবে ঐ পুরুষেরই জ্ঞানের উন্মুক্ত কপাটের ভিতর দিয়ে, মাথা হেঁট করে, শিষ্যার মত,—তা সে স্বামীই হোন আর গুরুই হোন। তবে স্বামী গুরু একাধারে হলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মন তো অনেকে বসবে না—একেই বসবে। নারীর হৃদয়ে ভক্তির

শুকোয়নি, সেটা ভেতরে ভেতরেই গুমরোচ্ছে—তাকে মুক্ত করতেই আজ কেউ নেই।

সেই শিক্ষাই তো শিক্ষা যা মানুষকে যথার্থ মানুষ হতে শেখাবে বা সংসারের বিপদে শোকে অটল ধৈর্য্যে সংযত করবে, সেই শিক্ষাই শিক্ষা, যা কর্ত্তব্যের কঠোরতার মধ্য থেকেও আনন্দ-রস আহরণ করাবে। কই সে শিক্ষা? এ সব শিক্ষা যে জীবনের একটা পরীক্ষার সামনে একটা সমস্যার সামনে ঝড়ের মুখে কুটার মত উড়ে চলে যায়। এ শিক্ষার সার্থকতা কোথায়?

নারীর দোষ যতই দেওয়া হোক, যখন বহুকাল ধরে পুরুষই তার শিক্ষকের পদে রত ছিল, তার জ্ঞানের দরজায় প্রহরী ছিল তখন সব দোষ কখনই নারীর নয়। শিক্ষকতায় দোষও আছে। পথ-ভ্রষ্ট পুরুষই তার সর্বনাশ করেছে। সে তো তখনও পতি-দেবতাতে অন্ধ-বিশ্বাসী বিচার-শূন্যা। কখন যে চুপে চুপে তার ভক্তি-সিংহাসনে দেবতার স্থানে অসুর এসে বসেছে, ভাব-বিহ্বলা স্নেহে-অন্ধ নারী তা টেরও পায়নি। তবে আজ পেয়েছে। এ তো স্বামী নয়, এ তো গুরু নয়, দেবতা নয়, এ কাকে পূজা করচি! সে মূর্ত্তির তুলনায় এ মূর্ত্তি এতই হীন! শুধু নারী নয়, পুরুষ নিজেও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে—দু পক্ষই যেন আর এ অসামঞ্জস্য সইতে পাচ্ছে না, তাই পুরুষ বলছে, মুক্তি দাও নারীকে—পূজারীর আসন থেকে সরিয়ে দাও—তবুও এ বলছে না, তুমি যেও না, আমি আবার দেবতা হব। তাতে যে পৌরুষের দরকার।

যেদিন পুরুষ আবার হারানো পৌরুষ নিজ শক্তির দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা লাভ কর্ব্বে, সেই দিনই নারীর নারীত্ব আবার পরিপূর্ণতা লাভ কর্ব্বে। পিতারূপে, ভ্রাতারূপে, স্বামীরূপে, সন্তানরূপে ভাবের স্পর্শ পেলে কতক্ষণ নারীর নারীত্ব আর বিকল পড়ে থাকবে? সে আপনিই জাগবে। নারী জাগলে পুরুষ জাগবে, এ সবও ঐ অপৌরুষের কথা। নারী চিরকাল পুরুষের জ্ঞানের পদানুসরণ করে এসেছে যে। যেদিন নারীর প্রত্যেক দুঃখের অবসান, প্রত্যেক প্রশ্নের মীমাংসা, প্রত্যেক দাহের শান্তি স্বামীর কাছ থেকে পাবে, শুধু দেহের নয়—শুধু মনের নয়—তার আত্মার খোরাক যোগাবার ক্ষমতাও পুরুষ রাখবে, কর্ম্মে জ্ঞানে শক্তিতে সে স্বামী-নামের যোগ্য হবে এ দ্বন্দ্ব তখনই মিটবে ; তার আগে নয়। তখন সবাই বলবে—আমরাও মুক্তি চাইনি, কখনও চাইনি—এই মুক্তিই চেয়ে ছিলাম। পুরুষকে ত্যাগ করে মুক্তি চাইনি। তাতে বিলীন হয়ে মুক্তি চেয়েছিলাম।

শ্রীবিনীতা দেবী।

---

## ভারতে খৃষ্টান

শিকাগো জর্ণাল ভারতের সেন্‌সশের তালিকা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ভারতে খৃষ্টান-ধর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এগারো বৎসর পূর্ব্বে দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা ছিল, ৩৮৭৬০০০ ; গত সেন্‌সশে দেখা গিয়াছে দেশী খৃষ্টানের সংখ্যা ৪৭৫৪০০০, অর্থাৎ শতকরা ২২০৭ হিসাবে বাড়িয়াছে ; এবং এই সঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা অনেক কমিয়াছে।

সেন্‌সশের তালিকা

| | | | |
|---|---|---|---|
| হিন্দু | ... | ... | ২১৬৭৩৪০০০ |
| মুসলমান | ... | ... | ৬৮৭৩৫০০০ |
| বৌদ্ধ | ... | ... | ১১৫৭১০০০ |
| আনিমিষ্ট | ... | ... | ৯৭৭৫০০০ |
| খৃষ্টান | ... | ... | ৪৭৫৪০০০ |
| শিখ | ... | ... | ৩২৩৯০০০ |
| জৈন | ... | ... | ১১৭৯০০০ |
| পার্শী | ... | ... | ১০২০০০ |
| ইহুদী | ... | ... | ২২০০০ |
| বিভিন্ন-ধর্ম্মী | ... | ... | ২৮৩১০০০ |
| | মোট | ... | ৩১৮৯৪২০০০ |

মোটের তুলনায় খৃষ্টানের সংখ্যা তুচ্ছ দেখাইবে, সন্দেহ নাই। তবু জিনিষটায় লক্ষ্য করিবার একটা ব্যাপার এই,—জাতি-ভেদের নিগড় বন্ধনই ইহার জন্ম কতক দায়ী। মুসলমানের মধ্যে জাতিভেদ নাই, চাপ নাই—খৃষ্টানধর্ম্মের মতই সে উদার। কাজেই খৃষ্টান হইতে, হয় ঐ হিন্দুধর্ম্মীরাই বেশী।

হিন্দুর মধ্যে এই জাতিভেদ-প্রথা সমাজে এত বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি করিয়াছে—এবং অসংখ্য মানুষকে হিন্দু জানোয়ারের চেয়েও অধম হীন অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সেই ফাঁক দিয়া হিন্দুধর্ম্মীর একটা বিশাল ক্ষেত্রকে আক্রমণ করিয়া অচিরে করায়ত্ত করিবে। চারিদিকে যখন অগ্রসর হওয়ার ধুম বাধিয়া গিয়াছে, সাম্যের ভেরী বাজিয়াছে, তখন কেহই জানোয়ারের পংক্তিতে অস্পৃশ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে স্বভাবতঃই চাহিবে না। সেকালে ঠিক এই কারণেই বিস্তর হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল,—একালেও ঠিক ঐ একই কারণে অনেকে খৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় লইতেছে। অনেকে বলিবেন, হোক্ খৃষ্টান, তারা ছোট লোক। কিন্তু এটা তাঁরা বোঝেন না, ইহাতে হিন্দুর বলক্ষয় হইতেছে কতখানি! আজ পৃথিবীর পানে এই সব জ্ঞানী মহাত্মারা মুখোস খুলিয়া একবার চাহিয়া দেখুন—দুনিয়াকে চালাইবার শক্তি—এই যাঁহাদের ছোট লোক অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণার উপেক্ষায় আজ কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিতেছেন—তাহাদেরই হাতে ক্রমশঃ জমিয়া উঠিতেছে।

শিকাগো জর্ণাল আশ্বাসের সুরে বলিয়াছেন,-পাদ্রী সাহেব ভারতকে যে উন্নতির স্বর্গে তুলিতে চলিয়াছে, বক্তৃতাবাগীশের দল সে উন্নতির ধারও কখনো ঘেঁষিতে পারিবেন না।

এ কথার বক্র ইঙ্গিত আমরা বুঝিব কবে!

শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী।

---

## নারী-সমস্যা

আজ-কাল "নারীর স্বাধীনতা" "নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য" ইত্যাদি বিষয়ে মাসিক পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। সমস্ত বিষয়েই যাঁহারা বিলাতির অনুকরণ-প্রিয়, তাঁহাদের জন্য Lloyd's Magazine ( June 1920 ) হইতে Mrs. Alfred Praga রচিত The Modern Marriage Problem প্রবন্ধের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

—"সত্যই শতকরা নব্বই জন চঞ্চল-প্রকৃতি নব্যা নারী তাহাদের সংসারের প্রতি, অদৃষ্টের প্রতি সব-চেয়ে-বেশী তাহাদের স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বে অসংখ্য স্ত্রী স্বামীর চরিত্রহীনতায় মনঃকষ্ট পাইয়াছে কিন্তু বর্ত্তমানে স্ত্রীই ব্যভিচারিণী হইতেছে। "তাড়াতাড়ি বিবাহ কর, আর যখন-খুসি বিবাহ-বন্ধন ছেদন কর," নব্যা নারীর পক্ষে ইহা যেন একটা আদর্শ নিয়ম ( motto ) হইয়াছে। পুরুষদের সমুদয় পাপই নারীরা করিতেছে, কোনটাই বাদ নাই, তাহার উপর যদি স্ত্রী আবার ব্যভিচার করে, তবে এ জাতির পরিণাম ভীষণ হইবে। দীর্ঘকাল যদি বিবাহ-বন্ধন-ছেদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকে, তবে স্ত্রী ও স্বামী উভয় পক্ষেরই যে শুধু নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে তাহা নহে, ইহাতে প্রীতিপদ বিবাহ-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ও অপ্রীতিকর বিবাহ সেই তুলনায় হ্রাস পাইবে। বর্ত্তমানে শত শত অসুখী স্বামী-স্ত্রী আছে যাহারা বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। পৃথিবীতে এমন পুরুষ ও নারী আছেন, যাঁহারা শত প্রলোভন ও সুযোগ-সত্বেও চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট করিবেন না, পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম, আত্মমর্য্যাদা বা কর্ত্তব্যজ্ঞান ইত্যাদি যে কারণেই হউক। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কম। যদি বা বর্ত্তমানকালে একনিষ্ঠ প্রেম থাকে, তবে তাহাও, আমার বলিতে ভয় হয়, অত্যন্ত অল্প লোকেরই আছে। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীর অবহেলার দরুণ ( ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ) স্বামী অসচ্চরিত্র হয়, স্ত্রী হয়ত সামাজিক কর্ত্তব্য বা কোন একটা পশু বা একটা-না-একটা কিছু লইয়া মত্ত হইয়া আছে—সেই সুযোগে

অপর একটি স্ত্রীলোক—অধিকাংশ স্থলেই একটী অল্পবয়স্কা যুবতী (girl) স্বামীর কাছে আসিয়া জোটে। মনে রাখিও যে প্রত্যেক বিবাহিত জীবনে অপর একটি স্ত্রীলোক স্বামীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অলক্ষ্যে নিকটেই অপেক্ষা করিতেছে, কখনও বা স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অপর একটী পুরুষও ঐরূপে লুকাইয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বদাই "অপর একটী স্ত্রীলোক" থাকিবেই থাকিবে। এই সত্য কথাটী প্রত্যেক স্ত্রীর মনে রাখা ভাল। প্রকৃতই শতকরা নব্বই জন স্ত্রী ইহা ভুলিয়া বা জানিয়াও গ্রাহ্য করেন না, অবশেষে যখন বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তখন আর প্রতিকারের সময় থাকে না। আমরা কিছুতেই ভুলিব না যে যুবক বা বৃদ্ধ, বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলেই চারিদিক হইতে ভীষণ প্রলোভন-জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। সুন্দরী হউক বা না হউক, যুবতী বা বৃদ্ধা, হায়! সকলেই আজকাল অনবরত পুরুষদের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, সতীত্ব-রত্ন জলাঞ্জলি দিবার জন্য তাহাদের কেবল সম্মতি চাহিতেছে। আমি সুখ চাই, আমার স্বামীর (বা স্ত্রীর) সুখের কথা ভাবিবার দরকার নাই, আমি সুখে থাকিলেই হইল, যাহা আপাত-মধুর, আমার নিকট তাহা সুখ, তাহা আমি নিশ্চয়ই চাই। আমি স্বাধীনভাবে আমার জীবন উপভোগ করিব, ইহাতে আমার অধিকার আছে।

এ সবের প্রতিকার কি? দুজনের মধ্যে একজন হার মানিবে, ইহা কল্পনাতীত। পুরুষ তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে পারে না, স্ত্রীও তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিবে না। নারীর আত্মা যে জাগিয়াছে, এখন "নারী ফুটিয়াছে আপন গৌরবে, আপন মহিমায়", নারী এখন জীবনের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে।

নব্যা নারী বিবাহ ও বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে, তাহার প্রধান কারণ নৈতিক শিথিলতা। ইহা যে গত কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নহে, ইহা বিগত বিশ বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে।"

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

## পারিবারিক নারী সমস্যা

গত ফাল্গুনের 'ভারতী'তে শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায় "পারিবারিক—নারী-সমস্যা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

অন্নদাবাবু এই প্রবন্ধে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহার সারভাগ—নারীর স্বাধীনতা—আর তাহা হইবে আত্যন্তিক স্বাধীনতা (Absolute

বটে, তবে সমগ্র প্রবন্ধে উহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে অন্য কিছু বলিবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখিতে চাই যে আত্যন্তিক স্বাধীনতা আদতেই সম্ভবপর কি না। নারী-সমস্যার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া এ বিষয়ে পূর্ব্বে 'ভারতী' ও 'ভারতবর্ষে' ২।১টী কথা মাত্র ইঙ্গিত করিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে তাহার একটু আলোচনা করিতেছি।

মানুষের পক্ষে—তা কি নর, কি নারী—উভয়ের পক্ষেই চরম স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব—যদি সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষকে থাকিতে হয়। পরস্পরকে পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেই হইবে, আর তা করিলেই অন্যের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। আদিম যুগে যখন সমাজ বা পারিবারিক বন্ধন ছিল না, তখন মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যথেষ্ট ছিল—তবুও একে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিত, শক্তিশালীর নিকট—তা শারীরিক, মানসিক বা যে কোন শক্তিরই হউক না কেন—মাথা নোয়াইতে হইত। মানুষ যখন ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল—তখন নিজেদের জন্মগত অধিকার (Natural Rights) খর্ব্ব করিয়া পরিবার গঠন করিল। আর তাহা না করিলে মানুষকে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে হইত না। অন্নদাবাবু পশুদের ও অসভ্যজাতির যে দৃষ্টান্ত বারবার দিয়াছেন—সেই অসভ্য ও পশুদের অবস্থাতেই থাকিতে হইত—অথবা তার চেয়ে আরও পশ্চাতে থাকিতে হইত? কারণ অসভ্যদেরও সমাজের অনুকল্প একটা জিনিস আছে। Natural Rights সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু লেখা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে মানুষ আপনার সুখের জন্য শান্তির জন্য অবাধ স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তৈয়ার করিল বটে, কিন্তু নারীজাতিকে এমন দাবিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল কেন অথবা অন্য কথায় বলিতে গেলে নারী পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিলেন কেন? উহার একটী উত্তর এই হইতে পারে যে আদিম যুগে শারীরিক বলের প্রাধান্য ছিল, তাই বাধ্য হইয়া নারীকে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং তাহার জের এখনও চলিতেছে। অন্য উত্তর এই যে প্রাকৃতিক কারণবশতঃই নর ও নারীর স্থান পৃথক পৃথক হইয়াছে এবং উহাই সঙ্গত মীমাংসা। নারীর শারীরিক ও মানসিক গঠন ও তাহার প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যই এমন যে তাহার জন্য ঘরই উপযোগী কার্য্যক্ষেত্র। যদি এ কথা বলা যায় উহা পুরুষের অধীনতার ফল তবে তাহার উত্তর এই যে যদি প্রাকৃতিক কারণ এই বিভিন্নতার ফলে না থাকে, তবে নারী প্রথমে ঘরকে বরণ করিলেন কেন? তাই বলিতে হয় নারীকে বাধ্য হইয়া পুরুষের অধীনতা (?) স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

... Division of labour (কর্মবিভাগ) প্রা...

প্রয়োজন। পরিবার, রাষ্ট্র সমাজ প্রভৃতি সবস্থলেই তাই। নারীর প্রকৃতি-অনুযায়ী কাজ নারী লইয়াছেন; পুরুষ লইয়াছেন তাঁহার উপযোগী কাজ। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আলোচনা করা গিয়াছে। প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে যাইয়া নারী যে কতক পরিমাণে পুরুষের উপর নির্ভরশীলা হইয়া পড়িয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। আর নারীদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত অন্নদাবাবু লিখিয়াছেন, "...মাতৃত্ব স্বীকার না করাই ভাল। কারণ মাতৃত্ব স্বীকার কর্তে গিয়ে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়ার চেয়ে, স্বাধীনতার খাতিরে মাতৃত্ব বলি দেওয়া শ্রেয়।" একটু পরেই লিখিয়াছেন—"কিন্তু মাতৃত্ব স্বীকার করে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত।" কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? স্বামীর (অথবা 'সখার') সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ এমন কি সমাজ ও রাষ্ট্রের সাহায্য লইলেও মাতৃত্ব-গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, অথচ মাতাকেই সন্তান প্রতিপালন করিতে হইবে, যেমন পশু ও অসভ্যেরা করিয়া থাকে। কিন্তু একটা কথা এই যে তাহারা হয়ত সন্তান পালন করে (যদিও অন্নদাবাবুর মত-অনুসারে নিশ্চয়ই পুরুষ জাতি--নিরপেক্ষ হইয়া নহে)—কিন্তু 'মানুষ' করিতে পারে না। অন্নদাবাবু অনুগ্রহ করিয়া নারীদের জন্ত কি এমন একটা 'স্কীম' দিবেন যাহা দ্বারা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষ নিরপেক্ষ হইয়া সন্তানকে মানুষ করিতে পারেন? কারণ "পুরুষের উপর নির্ভর করলে নারীর স্বাধীনতা খর্ব্ব হবে।" আর নারীরা যদি মাতৃত্ব স্বীকার করতে অস্বীকার করেন (কারণ স্বাধীনতা খর্ব্ব হইলে 'মাতৃত্ব বলি দেওয়া শ্রেয়।')—তবে ত সব ল্যাঠাই চুকিয়া গেল। হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা যাইবে—পৃথিবীতে তা হইলে মানুষ থাকিবে না। ব্যস্!

নারীর পারিবারিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত অন্নদাবাবু 'আর্থিক স্বাবলম্বনের কথা বলিয়াছেন। অবশ্য তিনি বোধ হয় ইহা ইচ্ছা করেন না যে নারী পারিবারিক অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বা কর্ম্মক্ষেত্রের অধীনতা বরণ করেন। তাহা হইলে সমগ্র নারী-সমাজের পক্ষে আর্থিক স্বাবলম্বন কিরূপে সম্ভবপর? আচ্ছা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতিতে নারীর প্রাধান্য প্রবর্ত্তিত হইল—তাহা হইলে যে "নর-সমস্তার" উদ্ভব হইবে—তাহার সমাধান কিরূপে সম্ভব?

পুরুষ যখন তাহার উপার্জ্জিত অর্থ পরিবারের জন্ত ব্যয় করেন তখন পুরুষকে নারীর দাস বলা যাইবে না কেন? পুরুষ ও নারীর পক্ষ লইয়া ওকালতি করিতে গেলে 'শুক-সারীর তরজা' হইয়া পড়ে। আসর জমাইবার জন্ত এরূপ গলাবাজী বা কলমবাজী করা চলে, কিন্তু কাজের জন্ত নয়। আত্যন্তিক স্বাধীনতা ভাল, আত্যন্তিক স্বাধীনতা বলিয়া কোন জিনিষ মরজগতে নাই। জগৎকে চলিতে হইলে ভাল ও মন্দ, স্বাধীনতা ও অধীনতার Compromiseএর মধ্য দিয়াই চলিতে হইবে। আর এখন পর্য্যন্ত জগতে যা হইয়াছে তা এই Compromiseএর মধ্য দিয়া। এই দুটাকেই বরণ করতে হইবে। যুক্তি-তর্ক খুব চলিতে পারে, কিন্তু যুক্তির সঙ্গে যদি বাস্তব জগতের কোন মিল না থাকে, তাহা হইলে সেই যুক্তিদ্বারা আকাশে ওড়া যায় বটে, কিন্তু আমাদের মত মাটীর জীবের কোন কাজ হয় না। আর জগৎটা Metaphysical Reasoningএর বলে চলিতেছে না, এ কথাও সত্য। নারীর অভিযোগ করিবার যথেষ্ট আছে—বিশেষতঃ আমাদের দেশে। কিন্তু নর বা নারী কেহ যদি প্রত্যেক বিষয়েই পূর্ণ স্বাধীনতা চান্ তবে আদিম বর্ব্বর যুগে গিয়াও তাহা পাইবেন না; সঙ্ঘবদ্ধ জগতের ত কথাই নাই। এ সম্বন্ধে বেশী বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। অন্নদাবাবু যদি তাহার প্রবন্ধোল্লিখিত উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী একটী Constructive Scheme দেন তবে বেশ হয়। আর যদি "নতুন কিছু কর" হিসাবে বাজার গরম করা উদ্দেশ্য হয় তবে স্বতন্ত্র কথা।

নারীদের সম্বন্ধে অন্নদাবাবু এমন কয়েকটী মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহার একটু আলোচনা না করিয়া পারিলাম না। একটা কথা বারবার বলিয়াছেন—সেটা "প্রেমের মিথ্যা অভিনয়" "ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে তাকে (পুরুষকে) হাতে রাখ্তে হয়।" "বিচিত্র বেশভূষা, মোহিনী বিদ্যায় মিথ্যাচার..." ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্নদাবাবুর মতে নারী-সমাজ বারাঙ্গনা-সমাজেরই বিস্তৃত প্রতিরূপ—তবে নারী-সমাজে সমাজ-প্রথার আড়াল আছে এইমাত্র তফাৎ। কারণ "স্বামীর কাছে সে যে ভালবাসা পায় সে কামুকের ভালবাসা।" এবং "বিবাহ ত যৌন-মিলনের নিলজ্জতা ঢাকা দেবার একটী ভাবের আবরণ!" আমরা বলি 'নিলজ্জতা' স্বীকার করা কেন? নারী স্বাধীনতার নাম করিয়া নারী-সমাজের প্রতি এমন জঘন্য ইঙ্গিত আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশের মহিলারা কি বলেন? আবার "তাকে যদি পুরুষ একান্ত আপনারই বলে ভাবে তবে ভালবাসার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়।" চমৎকার! নারী যেন কখনও কোনও পুরুষের "একান্ত আপনার" না নন—তা হইলে ভালবাসার মহিমা ক্ষুণ্ণ হইবে! আবার জিজ্ঞাসা করি, নারী-সমাজ কি বলেন?

এরূপ ভাবে উদ্ধৃত করিতে হইলে সমগ্র প্রবন্ধটাই উদ্ধৃত করিতে হয়। বিবাহের ব্যাখ্যা উপরে দিয়াছি। প্রণয় জিনিষট, "অস্থির"! স্বামীর ভালবাসা 'কামুকতা'—এবং "যখনি তাদের (স্বামী, স্ত্রীর) প্রেমের অবসান হবে তখনি যেন পরিবার বন্ধন হতে উভয়েই মুক্ত হয়।" যেমন "অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে বিবাহ-প্রথা নাই সহবাস করলেই পতি পত্নী এবং ইচ্ছা করলেই বিচ্ছেদ।" অবশ্য উহা খুব উচ্চ আদর্শ আর উহাতে 'কামুকতা' নিশ্চয়ই নাই। "আবার বিবাহ বন্ধন তুলে দিতে হবে" "অবশ্য আধ্যাত্মিক কারণে।" যাহাকে এত সময় পর্য্যন্ত আধিভৌতিক Plain এ ছিলাম এখন একেবারে আধ্যাত্মিকে উপস্থিত!

মোটেই বুঝিতে পারি নাই এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ নর-নারীর 'স্বেচ্ছামিলনে' সূক্ষ্ম স্বার্থের প্রাবল্য হইবে কিরূপে তাহা আমাদের মোটা বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারি নাই। অন্নদা বাবু দয়া করিয়া যদি একটু বুঝাইয়া দেন তবে ভাল হয়।

পশু ও অসভ্যেরা আত্ম-প্রতিষ্ঠ কি না জানি না, তবে তাহদের 'স্বেচ্ছামিলন' হয় ও বিবাহ-প্রথা নাই ; সুতরাং প্রেমের পরিপন্থী 'Obligation' ও নাই। অতএব তাহোরা 'আধ্যাত্মিকতা'র খুবই নিকটবর্ত্তী সন্দেহ নাই। আর পশু ও অসভ্যরাই যে আমাদের আদর্শ ( অন্ততঃ নারী-সম্পর্কে ) তাহা অন্নদা বাবু আকারে ইঙ্গিতে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"আমাদের দেশে বিবাহ ত স্ত্রীভোগের অধিকার" ( অন্যান্য দেশে বোধ হয় অনধিকার ? ) "পাঁজী দেখে ভোগ কর্ত্তে হয়।" স্বেচ্ছা-মিলনে মুহূর্ত্ত-বিবাহে অন্নদা বাবুর কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সামাজিক বিবাহ হইলেই সেই মিলনটা হইল জঘন্য অস্পৃশ্য শ্রেণীর জিনিষ। কারণটা কি ? পাঁজী দেখা সম্বন্ধে অন্নদা বাবুকে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উহাতে স্বেচ্ছামিলন নাই বটে, তবে উহাতে Eugenics এবং Hygiene এই দুইটী বিজ্ঞান আছে। উহা পশুদের আদর্শ মিলন নয়।

বলিবার অনেক কথাই আছে। কিন্তু অন্নদা বাবুকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কি তাঁহার নিজের চিন্তা-ধারার ফল এবং তিনি কি তাহা বাস্তব জীবনের কষ্টি পাথরে ( Actual and Possible ) যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন—না, এটা ইবসেনিয়ান যুগ বলিয়াই যুগ-পূজায় অঞ্জলি দিয়াছেন ?

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

---

# নাত্‌নির প্রেম

ভেবেছ কি দাদামণি
প্রাণটা আমার পুতুল-খেলা,
খেয়াল-মত টান্‌বে বুকে
যখন খুসী কর্ব্বে হেলা ?
ঠাওরেচ এই ছেলে মানুষ
হয়েচে ওর এত কি হুঁস,
মনের মত পার্ব্বে পুরুষ
কত্তে বাছাই বিয়ের বেলা ?
প্রাণটা আমার দাদামণি ভেবেছ কি পুতুল-খেলা ?

সঁপেছিলেন দিদিমা সে
তোমার হাতেই আমায় সাধে !
বরণ করে তুল্‌তে ঘরে
কোন্ হিসেবে কেনই বাধে ?
চুমু দিয়ে বসিয়ে কোলে
বউ বলে আর কনে বলে,—
ভাবচো আমি যাব চলে
অন্য কোথাও দুদিন-বাদে ?
তোমার হাতেই সঁপেছিলেন দিদিমা সে আমায় সাধে।

কাটলো যে মোর আড়াই বছর
স্বামী বলে তোমায় জেনে—
নিলেন যে সব গুরু লোকে
জামাই বলে তোমায় মেনে,
এসেছি যে হৃদয় থেকে
বর বলে ভাই তোমায় ডেকে—
চল্‌বে কেন বস্‌লে বেঁকে
পায়ের তলায় মনটি টেনে !

বাধা দেবেন দিদিমণি ?
অসঙ্গত আমার দাবী ?
জানো যে ভাই কত ছলই
অবাক হয়ে তাহাই ভাবি ;
রাগে হোক বা অনুরাগে
সতীন বলে আগে-ভাগে,
বলুন তিনি কেমন লাগে
কাড়লে এখন ঘরের চাবি !

বিদায় কর ঘটকী-ঘটক
ঘুচুক তাদের বাচালতা,
দেবোনাক মিথ্যা হতে
মায়ের কথা, তোমার কথা !
শাস্ত্র তোমার, মন্ত্র তোমার
গলা টিপে প্রেমকে আমার
রাখবে চেপে ? স্পর্দ্ধা তাহার
অসহ্য তা—অসহ্য তা !
বিদায় কর ঘটকী-ঘটক, ঘুচুক তাদের বাচালতা।

তোমরা কর সতীর বড়াই
ভেবে আমার পায় যে হাসি,
স্বামীর বধূ নে যায় যাদের
পুরুত-ধরা পুরুষ আসি !
রইল আমার দিব্যি গালা
সইব না সে বিয়ের জ্বালা—
তোমার গলায় দেবো মালা,
নয়তো নিজের গলায় ফাঁসি !
বুক-সতী কি দেখবে চেয়ে মুখ-সতীরা সর্ব্বনাশী !

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

---

# বাংলার পণ্ডিত জেতারি

বাংলা দেশ থেকে অনেক ছাত্র বাংলার প্রান্তে বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেত। তাদের মধ্যে থেকে অনেক বড় বড় পণ্ডিত দেখা দিয়েছিলেন। সেই পণ্ডিতদের মধ্যে একজনের নাম—আচার্য্য জেতারি। আচার্য্য জেতারির বাড়ী ছিল—বরেন্দ্র দেশে। আচার্য্য জেতারির জীবনী আমরা তিব্বতী লামা তারানাথের ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে পাই (১)। তারানাথের তিব্বতী বইটীর A Schiefner জার্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। জেতারির পিতার নাম ছিল—গর্ভপাদ। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। জেতারির বয়স যখন সাত বৎসর—তখন থেকে তিনি বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অভিধর্ম্মেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতা লাভ করেন। ক্রমে তিনি উপাসক হলেন আর তাঁর পিতার কাছ থেকে হেবজ্র ও অন্য অন্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করলেন। জেতারির পিতা গর্ভপাদ রাজা সনাতনের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। এই রাজা সনাতন বাংলার পাল রাজাদের সামন্ত ছিলেন। আচার্য্য গর্ভপাদ রাজা। সে সময়েও জেতারি বিক্রমশীলার মঠের উপাধি পান নি। তারানাথের মতে মহীপালের পর মহাপাল বংলাদেশের রাজা হন। রাজা মহাপালের সময় তিনি বিক্রমশীলার মঠে অধ্যয়ন করেছিলেন। যখন জেতারির পাঠ শেষ হল, তখন রাজা মহাপাল স্বহস্তে তাঁকে উপাধি-পত্র দেন আর "পণ্ডিত" উপাধিতে ভূষিত করেন।

এর-পর পণ্ডিত জেতারি বিক্রমশীলার মঠে অধ্যাপকরূপে কিছুকাল ছিলেন। তিনি যখন বিক্রম-শীলায় অধ্যাপকভাবে ছিলেন, তখন রত্নাকরশান্তি তাঁর কাছে সূত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করেন; রত্নাকরশান্তি পরে ৯৮৩ খৃঃ অব্দে বিক্রমশীলার—"দ্বারপাল" নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আচার্য্য জেতারি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন? আমরা দেখেছি যে জেতারি রাজা মহাপালের নিকট থেকে "পণ্ডিত" উপাধি লাভ করেছিলেন। লামা তারানাথের মতানুসারে রাজা মহাপাল ৯৪০ খৃঃ অব্দ অবধি রাজত্ব করেছিলেন। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে আচার্য্য জেতারি—দশম শতাব্দীর প্রথম

বিক্রমশীলার মঠ বৌদ্ধ-তন্ত্রের একটী প্রধান আড্ডা ছিল। সেজন্য দেখা যায় যে এখানে অনেক বৌদ্ধ-তন্ত্র রচিত আর অনুবাদিত হয়েছিল। আবার এখান থেকেই বৌদ্ধ-তন্ত্রবাদ তিব্বতে প্রবেশ করতে পেরেছিল। আমাদের আচার্য্য জেতারিও অনেক বৌদ্ধ-তন্ত্র বিক্রম-শীলাতে রচনা করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বৌদ্ধতন্ত্র রচনা করলেন, এখন যদিও তাঁর সংস্কৃততন্ত্র বর্ত্তমান নেই, তবু তার তিব্বতী অনুবাদগুলি এখনও রয়েছে। আচার্য্য জেতারি নিজে তিব্বতী জানতেন না বোধ হয়, কারণ তাঁর অনুবাদিত একখানিও তিব্বতী বই এখন পাওয়া যায় না। তিনি নীচের তন্ত্র বইগুলি সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন :—

(১) হেবজ্রস্য-সেকনিশ্চয়-নাম (Cordier's Cat. ২য়, পৃঃ ৮৪)
(২) শ্রীদশ-ক্রোধ-বিদ্যা-বিধি-নাম ( " )
(৩) শ্রী-চতুঃপীত-তত্ত্ব-চতুষ্ক (২য়, পৃঃ ১০১)
(৪) নাথ ক্ষোভ্য-সাধন (২য়, পৃঃ ২৮৯)
(৫) আর্য্য-লোকেশ্বর-চিন্তামণি-চক্রবর্ত্তী-সাধন (২য়, পৃঃ ৩১৯)
(৬) সীত-বতী-সাধন (২য়, পৃঃ ৩৬৬)
(৭) মহা-প্রতিসরাচক্র-লেখন-বিধি ( " পৃঃ ৩৬৭)
(৮) মায়াজাল-ক্রমাবলোকিতেশ্বর-সাধন (৩য়, পৃঃ ২০)
(৯) চতুর-মুদ্রা-সাধন-নাম ( ", পৃঃ ১২৩)

এ সব বই তিনি নিজে তিব্বতীতে অনুবাদ করেন নি, ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষুতে অনুবাদ করেছিল। বোধ হয় নীচের তন্ত্রগুলিও তাঁর রচনা :—

(১০) প্রতিসর-সাধন (২য়, পৃঃ ৩৬৬)
(১১) আর্য্য-মহা-মায়ূরী-সাধন ( " )
(১২) মহা-সহস্র-প্রমর্দ্দনী-সাধন ( " )
(১৩) আর্য্য-মহা-মন্ত্রানুধারণী-সাধন ( " )
(১৪) পঞ্চ-রক্ষার্চন-বিধি ( " পৃঃ ৩৬৭)

এর মধ্যে "আর্য্য-মহা-মায়ূরী-সাধন" বৌদ্ধদের খুব প্রিয় বই ছিল। এ বইটী চীনা ভাষাতেও অনুবাদিতহয়েছিল।

আচার্য্য জেতারি "সূত্র" সম্বন্ধে এই বইগুলি রচনা করেছিলেন :—

(১৫) বোধিচিত্তোৎপাদ-সমাদান-বিধি (৩য়, পৃঃ ৩৩২)
(১৬) সুতমত-বিভঙ্গ-কারিকা ( " পৃঃ ৩৫৬)
(১৭) বোধ্যাপত্তিদেশনা-বৃত্তি-বোধি-সত্ত্ব-শিক্ষা-ক্রম-নাম ( " পৃঃ ৩৬৮)
(১৮) হেতু-তত্ত্বোপদেশ ( " পৃঃ ৪৫৪)
(১৯) ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-বিনিশ্চয় ( " )
(২০) বাণাবতার-তর্ক-নাম ( " ৪৫৫)
(২১) সুগত-মত-বিভঙ্গ-কারিকা ( " ৪৯৬)
(২২) সুগত-মত-বিভঙ্গ-ভাষ্য ( " )।

এর মধ্যে (১) হেতু-তত্ত্বোপদেশ ; (২) ধর্ম্ম-ধর্ম্মি বিনিশ্চয় ও (৩) বাণাবতার-তর্ক-নাম—এই তিনখানি বই ন্যায়শাস্ত্রের বই। এই তিনটী বইএর সম্বন্ধে ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মধ্যযুগের ভারতীয় দর্শন পৃঃ ১৩৬-৭ দ্রষ্টব্য।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

---

# নিঃস্বের লুঠ

হয়েছে ডাকাতি ভীষণ ডাকাতি
দীন ভিখারীর ঘরে,
অফলা গাছের মুকুল ঝরেছে
কাল-বৈশাখী ঝড়ে।
সন্ধ্যা গিয়াছে পুড়ে,
জল-সত্রের কুঁড়ে,
তুলট পুঁথির মলাটের ছবি

কঙ্কর ভূমে করকা বৃষ্টি
হয়ে গেছে সারারাত,
ভূমিচম্পার শিরেতে হয়েছে
দারুণ বজ্রাঘাত।
বড় ঝড় লাগিয়াছে,
বন-তুলসীর গাছে,
শ্মশান-শিবের আকন্দ-মালা
একদম গেছে ঝরে।

দেখি নাই কভু শুনি নাই কভু
এত-বড় দাগাদারী,
ভেলুকীর ছবি চুরি করে নিলে
'হাঘরের ঝুলি ঝাড়ি'
মিশরের 'মমি' তুলি,
নিল আস্তরণ খুলি,
ধ্যানী-বুদ্ধের হাত হতে নিল
লীলাপদ্ম কে হরে ?

শিথিল বকুল উড়ে পড়ে ছিল
ও জটিল জটাজুটে
বুঝিতে পারিনে কিবা ফলোদয়
দীন-সম্ভার লুটে।
শিশুটী বিদেশবাসী
ছিল তার কাছে আসি,
মরণ আসিয়া কেড়ে নিয়ে গেল
একবারে একা করে।

উদাসীর হায় একতারাটীতে
যে ঘুঙুর ছিল বাঁধা
তাহা কেটে নেওয়া সে তরে কেবল
কাঁদাইতে গিয়ে কাঁদা!
মালার রেশ্‌মী ডুরি
হায় কে করিল চুরি!
অবোধ কে এল জলধারা দিতে
স্নান-যাত্রার পরে।
হয়েছে ডাকাতি ভীষণ ডাকাতি
দীন-ভিখারীর ঘরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

## সমালোচনা

**মণ্টুর মা**।—শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। কালিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি ছোট গল্পের বই ; গোড়ার 'মণ্টুর মা' গল্পটিতে বইখানির নাম-করণ হইয়াছে। 'মণ্টুর মা' গল্পটি আড়ষ্ট, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিন্দুর ছেলের' হুবহু নকল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে 'মণ্টুর মা'য় অস্বাভিকতা আর অসামঞ্জস্য অত্যন্ত প্রবল। বাকীগুলি কাহারো 'নকল' না হইলেও বৈচিত্র্যহীন, মামুলি প্যাটার্ণের। রচনায় কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাইলাম না।

**রসকলি**।—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চি, রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়, কলিকাতা। কালিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, "রসকলি নূতন ধরণের উপন্যাস। এতে নয়টি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদে দুটি প্রধান চরিত্রের নানান্ দিক দেখাবার চেষ্টা হয়েছে।" এখানি নূতন ধরণের উপন্যাসই বটে, আর সব-চেয়ে উপভোগ্য এইটুকু যে প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ প্রত্যেকটিতে পরিপূর্ণ আর সব-কটি পরিচ্ছেদ মিলিয়া নায়ক ভামিনীভূষণ ও নায়িকা দুর্গকালীকে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছে। উপন্যাসখানি হাস্য-কৌতুকে ভরা। সে হাসি সংযত শুভ্র উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ ; বাচালতার বিন্দুও ইহাতে নাই, আর নাই রসহীন হাসি হাসাইবার দুশ্চেষ্টা। ঘটনাগুলি বাঙালীর ঘরের নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত। গল্পগুলি বিচিত্র অভিনব আর গ্রন্থন-নৈপুণ্য অপূর্ব্ব। বাঙলা সাহিত্যে হাসির এই ঘোর দুর্ভিক্ষের দিনে লেখক হাসির যে পূর্ণ পাত্রখানি ধরিয়াছেন, বাঙালীর পাঠকের চিত্ত সে হাসির খোরাকে দিব্য স্ফূর্ত্তি পাইবে, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

**আমার কারা-জীবনী**।—শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্ত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র চৌধুরী, সিংহ প্রেস কুমিল্লা। মূল্য এক টাকা। লেখক উল্লাসকর দত্তের নাম শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই পরিচিত। স্বদেশীর প্রথম যুগে লেখক আলিপুরের বোমার মামলায় ফাঁসির দায়ে বাঁচিয়া যান আপিলে, তারপর বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির সহিত তাঁর দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। লেখক এই কয়টি পৃষ্ঠায় সেখানকার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদিন পরে তাহার উচ্ছ্বাস মিলাইবার পর যে জিনিষটুকু পাঠককে তিনি দিয়াছেন, তাহা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক আবার তেমনি সরস। অনেক উপন্যাসের চেয়ে বহিখানি মনোরম ও সুখপাঠ্য। বাঙলার রাজনীতির ইতিহাসে এ গ্রন্থখানি প্রভূত আলোকপাত করিবে।

**খোকার বই।**—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ। মূল্য ছয় পয়সা। এখানি বর্ণপরিচয় গ্রন্থ। ছাপা ছবি ভালো।

**ভক্ত নন্দ।**—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এল। মেদিনীপুর, কমলা প্রিণ্টীং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দশ পয়সা। মান্দ্রাজ প্রদেশের অস্পৃশ্য পেরিয়া বংশ-সম্ভূত নন্দর জীবন-কাহিনী। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠে জানা যায় মনুষ্যত্ব অভিজাত-বংশের এক চেটিয়া 'সম্পত্তি নহে। স্পর্দ্ধিত মানুষের সৃষ্ট পেরিয়া ঈশ্বর-সৃষ্ট মনুষ্য জাতিরই একটি অংশ। অভিজাত-বংশীয়ের ন্যায় পেরিয়ারও হৃদয় আছে, মন আছে, এবং সে হৃদয়ের বিশালতা অপূর্ব্ব আদর্শ-স্থানীয়। এ গ্রন্থে মানবতার পূজার কথা আছে। লেখক সে কথা প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

**ঊর্ম্মি।**—শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় মিত্র প্রণীত। দৌলতপুর খুলনা, বি কে প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। কবিতা-পুস্তক। বৈচিত্র্য-হীন, বিশেষত্বহীন, নিতান্তই এলোমেলো রচনা এবং দস্তুর-মাফিক ইহার ললাট-পটে এক প্রতিবেশী-বন্ধুর ভূমিকাও আঁটা আছে।

**মণিমোহন জীবনী।**—শ্রীযুক্ত রামকুমার নাথ সঙ্কলিত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত বনবিহারী নাথ, নাকিকেল-ডাঙ্গা, কলিকাতা। কালিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থে যোগী সমাজের একজন বিশিষ্ট আচার্য্য মণিমোহনের জীবন-কাহিনী ও সঙ্গে সঙ্গে যোগি-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, ইতিহাস সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি নানা-প্রয়োজনীয় তথ্য আলোচিত হইয়াছে। যোগিদিগের অনেক কথাই এ গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। এ বহিখানি বঙ্গের সামাজিক গ্রন্থ—বাঙলার বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি যদি এইরূপ নিজেদের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন তবে বাঙালী-জাতির বিরাটত্বার প্রতিষ্ঠাও হয়, তাছাড়া নিজেরা নিজেদের চিনিতে পারি, জানিতে পারি—ভাই ভাইয়ের পরিচয় পায়। এ গ্রন্থ সকলের পড়িয়া দেখা উচিত।

**গীতি-গুচ্ছ।** স্বরলিপির প্রথম ভাগ। গীতি-রচয়িত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রকাশক এবং স্বর-লিপিকার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী। কলিকাতা, চেরি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা। এই গ্রন্থে ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা স্বনাম-ধন্যা কবি ও ঔপন্যাসিক, বাঙলার মহিলা-লেখিকাগণের অগ্রণী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর ৭১টি গান স্বর-লিপি-সমেত সংগৃহীত হইয়াছে। গানগুলি বিচিত্র ভাবের, বিচিত্র রসের। সবগুলিই বালক বৃদ্ধ যুবা অসঙ্কোচে সকল সভায় গাহিতে পারেন। গানগুলিতে যেমনি কবিতার রস, সুরেও তেমনি মাধুর্য্য ও বৈচিত্র্য এইটুকুই এ গ্রন্থখানির সুললিত বিশেষত্ব। এ দেশে অন্তঃপুরে গানের চর্চ্চা আবার সুরু হইয়াছে, অথচ নির্ম্মল ভাব রসাশ্রিত গান ও তাহার বিচিত্র সুরের বিকাশ-যুক্ত স্বরলিপির বই অতি অল্পই আছে, যাহা তাঁহাদের হাতে অবাধে তুলিয়া দেওয়া যায়। এ বইখানি দেশের এই অভাব দূর করিয়া বিশেষ উপকার করিবেন, সেজন্য লেখিকা ও প্রকাশক উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্হ। এ গ্রন্থের গানগুলিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে,—প্রথম খণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত; সেগুলির কতক উদ্দীপনাময়, কতক মাতৃস্তুতি, আবার কতক সাধনার মন্ত্রের মত। দ্বিতীয় খণ্ডের গানগুলি বিচিত্র রসের, বিচিত্র ভাবের। এ বইখানি বাংলার অন্তঃপুরে সুরের ঝরণা খুলিয়া দিবে, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

**ধর্ম্ম।**—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুহ, বি, এ। আর্ট পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে শরীর মনের শিক্ষা যাহাতে প্রাচ্য আদর্শে সম্পূর্ণ করা যায় এই উদ্দেশ্যে লেখক আশ্রম-প্রতিষ্ঠার উপকারিতার আলোচনা করিয়াছেন, এই গ্রন্থে। সব জায়গায় লেখকের মতের সহিত সাধারণের মত না মিলিতে পারে; তবুও বহিখানি পড়িবার যোগ্য।

**ফুলের ব্যথা।** শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। কলি-কাতা, ৪৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, বিচিত্রা প্রেস লিমিটেড্‌ হইতে শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র সেন গুপ্তের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কাব্য-গ্রন্থ; ৩৮টী খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, 'মনের দরদ থেকেই কবিতার জন্ম।' কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। সেগুলি 'দরদের জায়গায় ঘা দিয়াছে' সত্যই। ভাবে ছন্দে ভাষায় সুরে লেখক রঙের ফুল ফুটাইয়াছেন। ফুলগুলি শুধুই বর্ণ-বাহার নয়, তাহাতে মধু আছে, সেগুলি সজীব প্রাণের তাজা উচ্ছ্বাস, শিশির-সিক্ত, টাটকা রসালো। পাঠক-সমাজে এ কবিতাগুলির আদর হইবে। বহিখানির ছাপা কাগজ বহিঃসৌষ্ঠব ভারী চমৎকার হইয়াছে।

**পরকাল-তত্ত্ব।** (প্রথম খণ্ড) শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরে-শ্বর রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক লিখিত। কাশীধাম, ব্রাহ্মণ রক্ষা সভার আনুকূল্যে তত্ত্ব প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড কার্য্যালয়ের মহা-মণ্ডল যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। নানা বিশেষজ্ঞের মত ও শাস্ত্রাদি গ্রন্থের উক্তির সাহায্যে ও দার্শনিক যুক্তির দ্বারা লেখক পরকালের অস্তিত্ব বুঝাইয়াছেন। গ্রন্থখানি সুচিন্তিত সুলিখিত; এবং বেশ কৌতূহলের সঞ্চার করে। শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

**ভোলানাথের ভুল।** শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি উপন্যাস। লেখক প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব, এক্ষণে কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর। পঁচিশ বৎসরকাল তিনি পুলিশ কোর্টে ওকালতি করিতেছেন; নানা চরিত্রের লোক তিনি দেখিয়াছেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার ফলে অর্থাৎ এই ২৫ বৎসর ধরিয়া যাহা দেখিয়াছেন, 'সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যে' তাহাই আজ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উপন্যাসের দুইটী দিক আছে—কেহ উপন্যাস লেখেন, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, চরিত্রসৃষ্টি বা কোন সত্যের পরিচয়-কল্পে, আবার কেহ বা লেখেন সমাজ-মঙ্গলের জন্য। এ উপন্যাসে লেখক প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, "পাপলব্ধ অর্থ কেহ কখনও ভোগ করিতে পারে না। ইহা আনিতে দুঃখ, রাখিতে দুঃখ, পাইতে দুঃখ। ইহার ভোগ সেরেফ দুঃখময়। পাপে সুখ হয় না, হইবার নয়।" উপন্যাসের কাহিনীটি সুখপাঠ্য, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় কোথাও কোন বিপর্য্যয় বা অস্বাভাবিকতা নাই। বরং সে শৃঙ্খলাটুকু স্তরে স্তরে চলিয়া গিয়াছে, জ্যামিতির সত্য প্রমাণের মতই। লেখকের রচনায় প্রাণ আছে, ভাষা সরল, অনাড়ম্বর; কোথাও বাহুল্য বা ফেনানো নাই। চরিত্রগুলি স্ব-স্ব বিশেষত্বে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বেশ ফুটিয়াছে। চরিত্রগুলির নামকরণেও লেখকের কৃতিত্ব চমৎকার। ভোলানাথ 'এক নম্বরের' ঠক্; ছেলে-বেলা হইতেই তার মনের গতি স্বার্থ-সিদ্ধির পথে চলিয়াছে এবং এই স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সে না করিয়াছে, এমন কাজ নাই। হয় তো সে শুধরাইতে পারিত যদি একটি ভালো স্ত্রীলাভ করিত। কিন্তু তাহা ঘটিল না। সংসারের নিয়মই এই। তার স্ত্রী ধুমাবতী নামের সার্থকতা রাখিয়াছে। সমস্ত সুপ্রবৃত্তিই সে ধুমাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। তার পুত্র রাহুরাম 'বাপ্ কা বেটা। ভোলানাথের বন্ধু গ্রহ-কুমার সত্যই দুর্গ্রহ! অর্থাৎ সঙ্গী ও ঘটনা বদ্ লোকের চরিত্রকে যে পথে সাধারণতঃ লইয়া যায়, ভোলানাথের জীবন-পথে তেমনি সঙ্গী ও তেমনি ঘটনাই জুটিয়াছিল। ভোলানাথের দুর্ব্বল পিতা রাধানাথ, সঙ্কীর্ণমনা মাতা কাদম্বরী, সমস্ত চরিত্রই বেশ গোটা জীবন্তমূর্ত্তিতে ফুটিয়াছে। আর ফুটিয়াছে তুলির অল্প টানে বারাঙ্গনা রায়বাঘিনী ও তার চার কন্যা শঙ্খিকা, শঙ্খিনী, শুভগা ও ভগুহাসিনী। এ উপন্যাসে সমাজের কয়েকটি দুষ্ট ব্যাধি বিশ্লেষণ করিয়া লেখক সকলের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন। সে ব্যাধির উৎপত্তি হয় কি করিয়া, তাহার ধারাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন,—লিমিটেড কোম্পানি যার-তার হাতে লোক ঠকাইবার কি অস্ত্রই যে বনিয়া উঠে, শেয়ার-মার্কেটে মানুষের কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহার চিত্রও সকলে দেখিয়া সতর্ক হইতে পারিবেন। এ বইখানি উপন্যাস-হিসাবে সুখপাঠ্য ত হইয়াছেই, তা ছাড়া লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা হইতে সামাজিক বহু অমঙ্গলের দিকে যে আলো ধরিয়াছেন, তাহার জন্য বাঙ্গালী পাঠক কৃতজ্ঞ থাকিবে। আশা করি, লেখক এইখানেই তাঁর লেখনীকে বিরাম দিবেন না; আরো বহু অমঙ্গলের সম্মুখের পর্দ্দা তুলিয়া তিনি সমাজের চোখের সামনে সেগুলাকে ধরিয়া দিবেন। সমাজ তাহাতেউপকৃত হইবে বহিখানির ছাপা কাগজ চমৎকার হইয়াছে। শ্রীসমালোচক।

---

# গান-হারা

ফাল্গুনে আজ পড়্চে তরল গান ঝরি,
মনে সাধ যায়, নতুন দিনের তান ধরি!
গাইতে গিয়ে গান না আসে,
হায়রে কেবল কান্না ভাসে,
বংশীর সব রন্ধ্রগুলি বন্ধ ভাই!
নাই সুর তার, নাই রাগিণী, ছন্দ নাই!

হায় সজনী, মোর দখিণা বায় বিফল,
নয়নদুটি অশ্রুজলে হিম-শীতল।
রুদ্ধ-গীতের বেদন লেগে
চিত্তে ওঠে তুফান জেগে,—
কেমন ক'রে তোমায় বল সুর শোনাই?
ভাষা নেই মোর, নেই গো গানের মূর্চ্ছনাই!

বাজিয়ে নূপুর ঐ মাধবীর যাত্রা শোন্!
মন, তুই সুধু চুপ ক'রে তার মাত্রা গোণ্!
বোবার স্বপন বোবার বুকে,
লুকিয়ে থাকে ব্যাকুল দুখে,
ফাল্গুনেরি তাল গুণে সে কাল কাটায়,
স্বরলিপির আঁক্ কাটে না হাল-খাতায়।

থাক্ বাঁশরী, মনের মাঝে ঘুমিয়ে থাক্,
ধীর দখিণায় ঝরা-সুর তুই জমিয়ে রাখ্।
হয়তো শীতের শিশিরগুলি,
ভিজিয়ে দেবে রন্ধ্র খুলি—
ধরিস্ তখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় তপ্ত গান,
তৃপ্ত হবে ব্যর্থ যত আর্ত্ত প্রাণ!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# অভিনেত্রী

মুক্তি যে আমার নেই, তা জানি। পতিতার আবার মুক্তি কোথায়? কিন্তু কথাটা যদি ভুলক্রমে আমারি মুখ দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে হয়তো কেউ হো-হো করে হেসে বলে উঠবে—বাঃ,বেশ কথা কইতে শিখেছ তো! তা বটে, তোমার মত সতী-লক্ষ্মী ভুভারতে কি আর দুটি আছেন! এ-সব ভাবাই মিছে……

ঠিক কথা। হাসবে বৈ কি! আমরা হলুম যাকে বলে কুলটা, সমাজের পচা আবর্জ্জনা। শুদ্ধ, পবিত্র হবার কথা না কি আমাদের সাজে?…

মানুষের অন্তরের দানব-ক্ষুধার শান্তিই যে আমরা! যুগে যুগে আমাদের শরীরের ওপর দিয়ে চলে আসছে, তা'র পশু-বাসনার অনন্ত নিগ্রহ-লীলা। বিশ্বের সমস্ত জীব যখন এই দুর্জ্জয় পাপ-স্রোতকে কিছুতেই আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, সভয়ে পিছিয়ে যায়, তখনি আমাদের ডাক পড়ে! আমরা এগিয়ে আসি। আমাদের হৃদয়কে বন্ধন-শিলায় পরিণত ক'রে যত কিছু কঠিন আঘাত সব সহ্য করি! জীবনে তোমরা যাকে সব চেয়ে বড় জিনিস মনে কর, সেই ধর্ম্ম দিয়েই আমরা এই উন্মাদ, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির তর্পণ করি! না করে উপায়ও নেই! এ-যেন তার চির-কালের দাবী!…

আড়ালে বসে তোমাদের সমাজ মুখটি পে, মাথা নেড়ে বলে ওঠেন—কেমন মজা! যাকে বলে বিষে বিষক্ষয়!

অর্থের অভাবে যেদিন হাতে-মুখে রং মেখে দশের সামনে অভিনয় করতে আরম্ভ করলুম, সেই দিন থেকে তিল তিল করে আমার বাহিরে অভিনেত্রীর মোহিনী-মায়া ফুটে উঠে, ভিতরকার পেলব নারী-প্রকৃতিকে একেবারে ধ্বংসের অতল তলে ডুবিয়ে দিল!—আমি হয়ে গেলুম কি! —ঠিক যেন একটা যন্ত্র-চালিত বস্তু-বিশেষের মতো—যার মধ্যে স্পন্দন, অনুভূতি, প্রতিবাদ কোন কিছুই নেই!

গত রবিবারে বিল্বমঙ্গলে 'পাগলিনী'র একটা গান শেষ করে সবেমাত্র থেমেছি, এমন সময় যেন আমার কাণে গেল,—বেশ মিঠে গলা কিন্তু, চেহারাখানাও মন্দ নয়! একটা বিজয়-গর্ব্ব আমার সারা বুক তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়ে দিল। চোখ তুলে চেয়ে দেখলুম, আমারি একেবারে সামনে, খুব সাজগোজ করা একজন সুশ্রী যুবা বসে আছেন—!

অভিনয় শেষ হয়ে গেল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে আমি এসে দাঁড়ালুম, সাজঘরের পাশে খোলা জায়গাটায়। হঠাৎ একটা উঁচু গলার হাসির শব্দে পিছন দিকে তাকিয়ে শুনতে পেলুম—। কি শুনতে পেলুম? …… সেই বাবুটিই তাঁর বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে' বলতে বলতে যাচ্ছেন,—আরে, ছি! ছি! দেখলে তো বিমল আমাদের সেই মিঠে গলার অধিকারিণীকে। বাবা, এ জিনিস অন্ধকারে দেখলে যে মূর্চ্ছা যেতে হয়!—উঃ, আমার কাণে কে যেন একতাল সীসে গলিয়ে ঢেলে দিল!……নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ হয়ে আমি শুধু চেয়েই রইলাম!……

আমার আবার রূপ সৌন্দর্য্য! মরি, মরি! এটা নিশ্চয় জেনো যে, আজ আমার এই দেহটার উপর যদি সাধারণের অধিকার না জন্মাতো, তাহলে একে আমি কোনমতেই এত-বড় অত্যাচার সইতে দিতে পারতুম না! কিন্তু সে শক্তি আমার কোথায়? আমার সংস্পর্শে যারা আসবে তাদের সকলের মন যোগাতে আমায় হবেই। নইলে সবাই যে এই হতভাগিনীকে ছেড়ে চলে যায়! কি লাভ তাদের?……

আচ্ছা! এ কথাটা কি একবারও তোমাদের মনে জাগে না, আমরা এত হাসি, এত গান করি, নেচে বেড়াই, তবুও কেন আমাদের চোখে জল?

…কেন, শুনবে? নিজেদের বুকের ওপর হাত রেখে একমুহূর্ত্তের জন্য ভাবো দেখি—শুধু এই ভাবো যে, কেউ কখনও তোমাদের সম্মান দেখায় নি, পৃথিবীশুদ্ধ সকলে ঘৃণাই করে আসছে, আর যারা নীতিবাগীশ তারা তো তোমাদের দিকে চাইবার আগেই চোখ বুজোয়, সহানুভূতির একটা ছোট কণাও তোমাদের মাথার ওপর ঝরে পড়ে না! চারিপাশ থেকে কেবলি সাড়া আসছে, তৃষ্ণা! তৃষ্ণা! এমন

অবস্থায় মানুষের মনের গতি কি রকম দাঁড়ায়, বল্‌তে পারো ? এখন বুঝ্‌লে তো……

ভালবাস্‌তে আমরাও পারি। অভিনয় করা নয়, যাকে বলে, খাঁটি ভালবাসা। অমন করে' উপহাস করো না গো, উপহাস করো না! তোমাদের টাকা আমাদের নিতেই হবে। ঘরের স্ত্রীর মতো ভরণ-পোষণ কর্‌তে আমাদের পার্‌বে কি ? বড় বিশ্বাসঘাতকের কাজ করে থাকি আমরা! সে কথা সত্যি।—কিন্তু তাই বলে কি যাকে তাকে ভালবাস্‌বো ?……তোম্‌রা নিজেরাও কি তাই পার ? সতী-সাধ্বীকে যে-চোখে তোমরা দেখে থ্যাক, সচ্চরিত্রকে ঠিক সেই চোখে আম্‌রাও দেখে থাকি। তবে আমাদের দোষ……

না গো, না! কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই জানাচ্ছি না! কতকগুলো, নিষ্ক্রিয়, স্বার্থপর লোক কি প্রতীকার কর্‌তে পারে আমাদের ? বর্ষ বর্ষ, যুগ যুগ ধরে' এমনি করেই জ্বল্‌তে হবে আমাদের—হৃদয়ভেদী যাতনার হাহাকার নিয়ে। একদিনের সেই একটা ভুলেরও মার্জ্জনা আমাদের নেই—একেবারেই নেই।…শুধু কি তাই ? এই দলিত তৃষিত বুকের রক্ত নিয়ে পৃথিবীর কোলে দেখা দেবে যারা, সাধারণের কাছে তাদের জীবনও হবে একটা মস্ত মিথ্যা, একটা প্রকাণ্ড ছলনা আর ছি-ছি! তোমরা বিজ্ঞ মানুষেরা তখনি পড়ে ফেল্‌বে তাদের কপালে স্পষ্টাক্ষরে লেখা অদৃষ্টের সেই নিষ্ঠুর পরিহাস, আর তাদের মায়ের অতীত কলঙ্কের কাহিনী। যে-দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে তাদের মা চলে গেছে, সেই দীর্ঘনিঃশ্বাস আবার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌বে, তাদের বুকের প্রতি পাঁজরের খাঁজে খাঁজে। তারপর—কতকাল পরে, কেউ জানে না,—এই পঙ্কিল জীবন-স্রোত সহসা একদিন চিরতরে থেমে যাবে……

কিছু না, কিছু না! শত কণ্ঠে স্বীকার করছি যে, দোষী আমরাই! আমাদের দোষ এই যে, আমরা নারী, অবলা। অপরাধ এই যে, তোমাদের অনেকেরই যত-কিছু অনাচার নীরবে আমরা বহন করে আস্‌ছি। শাস্তি এই যে, সহজে আমাদের মরণ হয় না!………

শ্রীবিনয় চক্রবর্ত্তী।

---

# সমর্পণ

প্রিয়!

এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে॥
তোমার আঁখি কাজল-কালো
অকারণে লাগল ভালো
লাগল ভালো,
পথিক আমার পথ ভুলালো
সেই নয়নের জলে।
আজ্‌কে বনের পথ হারালেম ঘরের পথের ছলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা' বলে॥

আজ দিগ্‌বালিকার আঁখি-পাতা অনেকদূরের কানন-ছায়ে
কাঁপ্‌চে অভিমানে,
একূলা-আমায় পথ দেখাত ঐ বালিকাই চপল পায়ে
দিক হতে দিক-পানে।
মুঠার মাণিক ঠেলে পায়ে
এলেম তোমার কুটীর-ছায়ে
চরণ-ছায়ে,
শ্রান্তি আমার দাও মুছায়ে
দীপ-ঢাকা অঞ্চলে।
আপন মালা পরাও বালা পরাও আমার গলে।
এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে॥

কাজী নজরুল ইসলাম



কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।